রাস্তা পার হওয়ার ক্ষেত্রে অন্তূর তেজ ঠিক বিকেলের রোদের মতোই ক্ষীণ। আব্বু তার হাতটা চেপে না ধরলে চলে না। আব্বু রোজ থাকে না সঙ্গে। আজও নেই। এক পথিক চাচার পেছনে রাস্তাটা পার হয়ে দ্রুত রিক্সা ধরল।

শীতের রোদ, তবু খাড়া দুপুরে তাপ কড়া। বোরকা-হিজাবের আবরণের নিচে ঘামের স্রোত বেয়ে যাচ্ছিল তার।

ভার্সিটিতে ছাত্র পরিষদের কী এক প্রোগ্রাম ছিল। সেসবে অন্তূর ভালো রকমের বিদ্বেষ আছে। কারণ হিসেবে বলা যায়–তাকে শেখানো হয়েছে এবং বাকিটা নিজস্ব।

অন্তূর ধারণা, ছাত্রলীগ—যাদেরকে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অগ্রদূতের নাম দেয়া হয়েছে, তারা মূলত পঙ্গপাল। দলবদ্ধ হয়ে চলা ঘাসফড়িংয়ের জাতকে পঙ্গপাল বলে। দশ-পনেরো লক্ষ একত্রে চলাচল করে। এবং কোনো বিঘাখানেক জমির ফসলি ক্ষেতকে আক্রমণ করলে খুব অল্প সময়ে ক্ষেতের ফসল খুব ভালোমতো পরিষ্কার। এক শ্রেণির লোক অবশ্য এই ক্ষেত পরিষ্কারকে বরবাদ করাও বলবে। তাদের কথা কানে নেয়া উচিত না। ক্ষেতের ফসল উদ্ভিদের জন্য ভারী। উদ্ভিদকে সস্তি দিতেই হয়ত পঙ্গপাল সব

ফসল ভক্ষণ করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে।

অন্তূর ধারণা, বাংলাদেশের ছাত্রলীগ নামক পঙ্গপাল দেশটা অর্থাৎ বাংলার আবাদী ক্ষেতের জন্য তেমনই এক দল পঙ্গপালের সমান।আম্মার কল এসেছে কয়েকবার। তাঁর ভাষায়, খুব জরুরী কাজ। অন্তূ জানে, কোনো জরুরী কাজ-টাজ কিচ্ছু না। কিন্তু ছাত্রনেতাদের মুখ-পেটানো মহাবাণী থেকে মুক্তির একটা ছুঁতো দেয়ায় সে মায়ের প্রতি অল্প কৃতজ্ঞ।

দুপুরের ঝাঁজালো রোদে বাড়ি ফিরে যে জরুরী কাজটা দেখল অন্তূ, তাতে তার মাথাও

দুপুরের রোদের মতোই উষ্ণ হলো। তাকে দেখতে আসা হয়েছে। প্রায়ই হয় এমন। মেহমানদের তাকে দেখার ধরণ সেই জাহিলি যুগের মেয়ে নামক পণ্য কেনা-বেচার মতো। এটা অন্তূর নিজস্ব মত। সে বিষয়টাকে পছন্দ করে না। তারা অন্তূর চুল খুলে ফেলল, একটানে শরীরে জড়ানো ওড়নাটা সরিয়ে গলা, বুক, হাত দেখা হলো। না, মেয়ে ফর্সাই আছে। অন্তূ চোয়ালের পাটি শক্ত করে চুপ করে থাকল। কিন্তু যখন সালোয়ার উঁচিয়ে তুলতে গেল মহিলারা ঠ্যাং দেখবার উদ্দেশ্যে, অন্তূর সীমিত ধৈর্য্যের বাঁধ খসলো। সালোয়ার

ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে স্পষ্ট স্বরে বলল,
-"আপনারা মেয়ে দেখতে এসেছেন নাকি হাঁটে গরু কিনতে এসেছেন?"
পাত্রর মা হতভম্ব হলেন, অসন্তুষ্ট মুখে বলে উঠলেন, "ওমা! এ আবার কেমন কথা? মেয়ে দেখতে এসে মেয়ের পা দেখতে চাওয়া কি অপরাধ নাকি?"-"জি না! ঠিক অপরাধ নয়, মূর্খতা। কারণ আমি কোরবাণীর হাঁটে তোলা কোনো প্রজাতির গবাদী পশু নই, যে সবচেয়ে নিখুঁত, আকর্ষণীয় গায়ের রঙওয়ালা, মাংস বেশী, হৃষ্টপুষ্ট দেখে কিনে নিয়ে যাবেন।"

স্পষ্ট, ঝরঝরে শুদ্ধ ভাষা অন্তূর মুখে, কিন্তু ভাষা কর্কশ। পাত্রের ফুপু মুখ কেমন করলেন, "কোনদেশি কথা যে, মেয়েকে ভালোভাবে দেখা যাবে না? নাকি কোনো দোষ আছে? তাছাড়া কোনো মেয়ে আছে, যে পাত্রপক্ষের মুখের ওপর এরকম বদমায়েশের মতো কথা বলে? আশ্চর্য মেয়ে তো দেখছি! দেখতে আসছি, তো দেখব না?"

-"জি, নিশ্চয়ই দেখবেন। দোষ থাকা চলবে না, দরকার পড়লে মেয়ের দেহের প্রতিটা কোষ পর্যবেক্ষণ করা মেশিন এনে দেখবেন। পরনের সালোয়ার ঠ্যাঙে তুলে তারপর মেয়ের ঠ্যাঙ দেখবেন ফর্সা কি-না? রাইট!"

উনারা মুখ বিকৃত করে বসে আছেন। অন্তূ আলতো হাসল, “দুঃখিত, চাচিমা। এটাকে আপনারা মেয়ে দেখা বললেও, আমি ছোটোলোকি বলছি। মেয়ে দেখতে এসে গাল ফেড়ে মেয়ের দাঁত দেখতে হবে, দাঁত উঁচু-নিচু আছে কিনা! মাথার চুল টেনেটুনে দেখতে হবে, চুল আসল না নকল, আছে না নেই, বড়ো না ছোটো? গলা বের করে, ঘাঁড়ের ওড়না খুলে, হাঁটিয়ে, নাচিয়ে এরপর পছন্দ হলে নিয়ে যাবেন! এটাই মেয়ে দেখা? অথচ বলুন তো, আমি যা যা বললাম, তা শুনতে এমন লাগল না, যে কোনো গৃহপালিত পশুর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। খরিদ্দার এসেছে গোয়াল

থেকে পশু খুলে নিয়ে যেতে!''অপমান, অসন্তুষ্টি এবং বিরক্তি লেগে আছে মুখে তিনজনের। ছেলের ফুপু মুখ খুললেন "তো কীভাবে মেয়ে দেখে? তুমিই শেখাও কীভাবে মেয়ে দেখে?'' কথাটা বলে মুখ ঝামটি মারলেন মহিলা।

রাবেয়া অন্তূর দিকে চোখ গরম করে তাকাচ্ছেন। ঘরে পাড়ার মহিলাও আছেন কয়েকজন, পাশেই ঘটক মহিলা বসা। তিনি বললেন, "এ কেমনে কতা কও, মেয়ে! দেখতে আইলে একটু ভালো কইরেই দেখে মেয়ে। না দেখে শুনে আবার নিয়ে যায় নাকি? বাড়ির বউ হইবা বলে কথা!''অন্তূর কাছে এ

কথার জবাব আছে—দেখেশুনে নিয়ে যাওয়াটা দোষের নয়। তবে দেখার মধ্যে মার্জিত এবং শালীনতার ব্যাপার তো আছে? মহিলাগুলো রীতিমতো তাকে অসম্মানমূলক ভাবে মেয়ে দেখার নামে এক প্রকার অপমান করছেন। একটা মেয়ের পাত্রপক্ষের সম্মুখে মেয়ের আত্মমর্যাদা-মূল্য শব্দের অস্তিত্ব নেই। শুধুই একটি জড় সামগ্রী, যাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, বাজিয়ে, দরদাম করে, পছন্দ হলে দয়া করে কিনে নিয়ে যাওয়া হবে।

এই কথাগুলো চেপে গিয়ে ঘটক মহিলাটির কথার জবাবে চমৎকার হাসল, “বাড়ির বউ হব? কে বলেছে, আমি বলেছি? আমি এখনও

অন্যের মেয়ে। আর অন্যের মেয়েকে বাজারের পণ্যের মতো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখা, দরদামের কথায় আসা যদি বিয়ের উদ্দেশ্যে মেয়ে দেখা হয়, তাহলে বিয়ে বোধহয় আমার জন্য না। আর আমার ধারণা আপনারদের আমাকে দেখেশুনে পছন্দ হলে যৌতুকের কথাও তুলবেন। এক্ষেত্রেও দুঃখিত, চাচি। আব্বু আমাকে খাইয়ে-পরিয়ে, আদর-যত্ন করে, এতগুলো বছর সুশিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন যৌতুকের বদলে বিয়ে দিয়ে আমার বোঝা নামাতে নয়। তাছাড়া আমিও ইচ্ছুক নই, আমার জন্য পয়সা দিয়ে কোনো খেলনা পুরুষ কিনতে।''পাত্রর মা অন্তূর মায়ের দিকে

তাকিয়ে এবার কড়া স্বরে, তাচ্ছিল্যে করে মুখ বিকৃত করলেন, “আপা! সে আপনি মেয়েকে যতই শিক্ষিত করেন, আদর্শ শিখাইতে পারেন নাই। এরকম মেয়ে কার ঘরে যাবে, আল্লাহ মাবুদ জানে। আপনার কপালে কী আছে এই মেয়ে নিয়ে, আল্লাহ-ই জানে! অন্তত কোনো ভদ্র পরিবারে তো যাবে না।”

অন্তূ দীর্ঘশ্বাস ফেলল, “আত্মসম্মানহীনতা যদি আদর্শ হয়, আমি বরাবর অভদ্র এবং জঘন্য আদর্শে পালিত এক মেয়ে। ক্ষমা করবেন এই বেয়াদবকে।”অন্তূ আর বসল না। সকলের বিভিন্নরকম দৃষ্টিকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল নিজের রুমের দিকে।

তার নামে সমাজে রটা কথা নেহাত কম না। প্রতিনিয়তই লোকে তাকে আলোচনায় রেখেছে–অন্তূকে তার মা-বাপ মিনসের মতো মানুষ করছে। নষ্টা মেয়ে, ভ্রষ্টা মেয়ে, বেয়াদব, অসভ্য, আদর্শহীন, ভার্সিটিতে পরিয়ে মিনিস্টার বানাতে চায় মেয়েকে... পাড়ার লোকের দেয়া টাইটেলের অভাবের পড়েনা অন্তূর ভাগে।

কিছুক্ষণ পর সকলকে বিদায় করে রুমে এলেন রাবেয়া বেগম। তিনি কিছু বলতে যাবেন, তার আগেই অন্তূ বলল, "এরকম লোকদের সামনে বসানোর জন্য তুমি আমায় টিউশনি কামাই করিয়ে বাড়ি ডেকে আনলে?

তোমার আক্কেলকে আর কতটা সাধুবাদ জানাব আমি, আম্মা!''রাবেয়া বেগম অসন্তুষ্ট স্বরে বললেন, “একটা থাপ্পড় মারব, বেয়াদব মেয়ে! দিনদিন বেলেহাজ হয়ে যাইতেছ তুমি? বেশি লাই দিয়ে ফেলতেছি নাকি আমি? আর কয়টা পাত্রর সামনে আমার মান-ইজ্জত নষ্ট করবি তুই? মা হিসেবে তোকে পার করতে চাওয়ার কোনো হক নাই আমার? পাড়ার লোকে একের পর কথা কথা বলতে ছাড়তেছে না প্রতিদিন। সে-সবই তো শুনতেছি। তুই পরিস্থিতি বুঝবি কোনোদিন? বেকায়দা মেয়েলোক জন্মেছে আমার পেটে!''

অন্তূ দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে হাসল, “আম্মা, তোমার তো সবসময় আমার উপর অভিযোগ থাকে। ধরে নিয়ে আসো এসব মূর্খ, ছোটো মানসিকতার লোকদের! তোমার কী ধারণা, যার তার গলায় ঝুলে পড়ব আমি? আব্বু তো বলেনা বিয়ের কথা, তুমি কেন কান দাও মানুষের কথায়? আব্বু এজন্যই বলে, তোমার বিবেকে ইমপ্রুভমেন্ট দরকার।”

-“তোর বিবেক কাজে লাগা। তা লাগালেই তো মিটে যেত সব। এই দিয়ে কতগুলার সাথে এমন হইলো? পাড়ার লোকে খুব ভালো কয় এতে, তাই না? ভার্সিটিতে পড়াচ্ছি তা নিয়ে কত কথা শুনলাম, এখন বিয়ে করাচ্ছি

না তা নিয়ে লোকে কানাঘুষা শুরু করছে, এই যে এসব আচরণ করিস, লোকের কানে যায় না? তোর বাপ তো শিক্ষিত অন্ধ। তার আর কী?''টেবিলের ওপর বইখাতা ছিটিয়ে আছে। সেগুলো গোছাতে গোছাতে অন্তূ বলল, "আম্মু! তুমি দু'দিন না খেয়ে থাকো, কেউ তা নিয়ে আলোচনা করবেনা, আর না এক মুঠো ভাত দিয়ে তোমায় সান্ত্বণা দিতে আসবে। কিন্তু যখন তুমি নিজের মতো করে কিছু করতে চাইবে, সেটা তাদের আলোচনার খোরাক জোগাবে। তাহলে যেই মানুষেরা তোমার কষ্টকে আলোচনা করে সুখের রূপ দিতে পারেনা, তাদেরকে তোমার ভালো থাকাকে

কেন খারাপ থাকাতে বদলাতে সুযোগ দেবে? ''শেষের দিকে কঠিন হলো অন্তূর কণ্ঠস্বর। রাবেয়া বেগম বললেন, "তুই এতো অবুঝ ক্যান, অন্তূ? মেয়ে মানুষের এতো মুখরা হতে নেই। সমাজে কথা হয়। বোবার কোনো বিপদ থাকেনা। চুপ থাকলে নাজাত রে আম্মা।

সোজা হয়ে দাঁড়ায় অন্তূ, চোখে-মুখে দ্যুতিময় দৃঢ়তা ফুটে ওঠে, "আমার নাজাত চাই আখিরাতে। বেঁচে থাকতে কীসের নাজাত, আম্মা? যেখানে জীবনটাই টানপোড়েনের এক সমষ্টি মাত্র!''

রাবেয়া আস্তে করে এসে মেয়ের পাশে বসে বললেন, "এখন বিয়ে যদি নাও যদি করিস, পরে করবি তো! তখন যখন লোকে তোর ব্যাপারে শুনতে আসবে আশেপাশে, কী বলবে লোকে? মেয়েলোকের ঠান্ডা মেজাজের, নরম হইতে হয়। এতো কথা, এতো যুক্তি, এতো প্রতিবাদ! তুই বুঝিস না, এইসব বিপদ আনে খালি। এইসব কি পড়ালেখা থেকে আসতেছে? আমি কি এতদূর তোরে পড়ালেখা করায়ে ভুল করছি?"

কিছুক্ষণ চুপ থেকে মুচকি হেসে শান্ত-স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল,"আমাকে অন্তূ থেকে-অ্যাডভোকেট মাহেজাবিণ আরমিণ অন্তূ হতে

এমন বহু চড়াই-উৎড়াই পেরোতে হতে পারে। একজন আইনজীবীর জীবন মুখবন্ধ আর নির্ঝঞ্ঝাট চলতে পারেনা, আম্মা!''

—

সারারাত পড়ার পর সকালের দিকে ঘুমানো হয় রোজ।সেদিন ক্লাসটেস্ট পরীক্ষা ছিল। মাসখানেকের ছুটির পর ক্লাস শুরু ভার্সিটিতে। আজকাল ঘনঘন ছুটি চলে। দেশের পরিস্থিতি ভালো না। চারদিক উত্তাল। ফজরের নামাজও কামাই হয়ে গেছে। উঠে গিয়ে রান্নাঘরে উঁকি দিলো, "কিছু খাওয়ার আছে নাকি, আম্মু?''

তরকারী চুলায় বসাতে বসাতে বললেন রাবেয়া, “কী থাকবে? আব্বুর কাছে যা, দেখ বারান্দায় মুড়ি-চানাচুর দিছি।”

আমজাদ সাহেব খবরের কাগজে ঢুকে গেছেন। অন্তূ পাশে বসল, “কী দেখছো? ”আমজাদ সাহেব গম্ভীর স্বরে বললেন, “সেই গ্রেফতার, বাসে আগুন, হরতাল....” ওর দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে বললেন, “নে। এত রাত জাগতে বলে কে? বলি, সন্ধ্যায় পড়তে বসবি। চোখ-মুখের কী হাল হয়েছে? আজ থেকে আমি বসব পড়ার টেবিলে।”

অন্তূ অল্প মুখ ফুলিয়ে বলল, “আমি এখনও বাচ্চা নেই, আব্বু।”

আমজাদ সাহেব ভরাট গলায় বললেন, “টোস্ট নে। গলা দিয়ে খাবার নামতে চায়না? চা-টুকু শেষ কর।” কিছুক্ষণ চুপ থেকে আনমনে মুচকি হাসলেন আমজাদ সাহেব, “মা বলতো, ‘ও আমজাদ যার শইরে মাংস লাগেনা, তার মাতায় পড়ালেহা ছাই ঢুকবো? আয় তো পাকা আম আনছে তোর আব্বা। দুধ-ভাত মাখাইছি, আয়। পরে পড়বি।”

দাদিকে অন্তূ দেখেনি। আব্বুর দিকে অনিমেষ চেয়ে থাকল। গম্ভীর এই মানুষটা যখন কদাচিৎ সল্প হাসেন, সৌম্য পৌঢ়া চেহারায়

যে জ্যোতি ফুটে ওঠে, আর ওই মেহেদি দেয়া দাড়ির নিচে চকচকে সাদা দাঁতের মসৃণ হাসি, অন্তূর বুকে কাঁপন ধরে যায়। এই মানুষটাকে ছাড়া সে সর্বনিঃস্ব!-"আমাকে আজ নামিয়ে দিয়ে যাবে একটু ভার্সিটিতে?"

আমজাদ সাহেব টান করে ধরে খবরের কাগজের পৃষ্ঠা উল্টালেন, "তোর ভার্সিটি সেই দশটায়, আমি সাড়ে আটটার ট্রেন ধরব, এখনই বের হব। রিক্সা ঠিক করে দিয়ে যাব। খেয়ে যাবি।"

অন্তূ ঠোঁটে ঠোঁট গুজল, "দরকার নেই রিক্সার। শোনো, তুমি গোসল করে যাবে। রোদ ভালোই বাইরে। প্রেশার বাড়বে নয়ত।"

আমজাদ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, “ভার্সিটি থেকে নাকি হলে থাকার কথা বলেছে?”

-“আম্মা কি আর রাজী হবে তাতে?”আমজাদ সাহেব গম্ভীর চোখে তাকিয়ে অন্তূর কপাল ছুঁলেন। কিছু লেগে ছিল, তা সযত্নে মুছে ভারী গলায় বললেন, “সেকেন্ড ইয়ারের ফাইনাল কবে?”

-“ক্লাস টেস্ট চলছে, খুব তাড়াতাড়ি ডেইট পড়বে মনে হয়।”

খবরের কাগজটা অন্তূর হাতে দিয়ে উঠে পড়লেন আমজাদ সাহেব। অন্তূ পিছু ডাকে, “আব্বু!”

পিছে মুড়লেন তিনি, “হু!”

অসহায় দেখায় অন্তূর মুখটা, “কবে ফিরবে তুমি?”

-“দু’দিন দেরি হবে হয়ত। কাজ না থাকলে ফিরে আসবি ক্লাস শেষে। কোথাও দেরি করবি না।”

অন্তূ আস্তে কোরে মাথা নাড়ে, “হু।”

সামনে ফিরে সামান্য হাসলেন। অন্তূ থাকতে পারেনা উনাকে ছাড়া, তার তেজস্বী মেয়ে এই এক জায়গায় কাবু। অথচ পাগলি বোঝেনা, চিরকাল এই আব্বুটা সাথে থাকবে না। সামনের পথ তাকে একা পাড়ি দিতে হবে।

ভার্সিটির সামনে এসে রিক্সা থামল। ক’দিন আগেই তুমুল আন্দোলন হয়ে গেছে

ছাত্রপরিষদের। দেশটা ভালো চলছে। রোজ খু’’ন-গুম-কারাবরণ অবিরাম। থামাথামি নেই, সরকারের ক্লান্তিও নেই। খুব পরিশ্রম করছে দেশটাকে নিজের মতো চালাতে। মানুষজন একটু দুশ্চিন্তায় আছে অবশ্য, তবে সরকার ভালো আছে। সে তার মনমতো দেশ চালাচ্ছে। কেউ ভয়ে বিরোধিতা করে না। করলে কারাগার নেহাত কম নয় দেশে। অস্ত্র এবং দেশপ্রেমিক সৈনিকের সংখ্যাও বেশ। ফটকের ওপর বড় বড় অক্ষরে লেখা— হাজি মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। দিনাজপুরের বাঁশেরহাট থেকে

খুব বেশি দূরে নয় অন্তূদের বাড়ি। হলে থাকার প্রয়োজন পড়ে না বিশেষ।

শহীদ মিনার চত্বরের আশপাশটা বেশ ভালো লাগে অন্তূর। জায়গাটা পার করার সময় পেছন থেকে ডাকল কেউ। অন্তূর পিছু ফিরে দেখল, ছয়জন যুবক। তার সিনিয়র হবে নিশ্চিত। সামনে যে দাঁড়িয়ে, তাকে চেনা চেনা লাগল। আগে দেখা মুখ, তবে মনে নেই বিশেষ কিছু।

সে এগিয়ে এসে হাতের সিগারেটটা অন্তূর দিকে বাড়িয়ে বলল, “নাও, একটা টান দাও! ”

অন্তূ নিঃসংকোচ হাতে নিলো সিগারেটটা। তার একটা দোষ আছে। সে ভেতর আর বাহির আলাদা করতে পারে না। যেমন মনে ঘৃণা রেখে মুখে হাসা যায়। কিন্তু তার সেই দক্ষতা বা অভিজ্ঞতা নেই। সিনিয়রদের প্রতি তার বিদ্বেষ পুরোনো। তা সেদিন বেরিয়ে এসছিল ভুলক্রমে।অন্তূ আধখাওয়া সিগারেটটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বলেছিল, "টান না-হয় দেব একটা, কিন্তু এতে ফযিলতটা কী?"
পাখির মতো চঞ্চল দৃষ্টি লোকটার। অন্তূর চোখে চোখ গেঁথে হেসে উঠল সে, "ফযিলত? এই যে আমি তোমারে টান দিতে বলতেছি, এর চাইতে বড়ো ফযিলত বা হাকিকত কিছু

নাই, ডিয়ার! আর জরুরী তো মোটেই না যে সবকিছুতে ফযিলত থাকা লাগবে! এক টান মারো। স্বাদ ভালো। ব্যাঙ্গন এন্ড হেজেস।''

অন্তূ যথাসম্ভব শান্ত কণ্ঠে বলল, "কিন্তু আপনি টান দিতে বললেই দিতে হবে, তা কেন? এটা আশিভাগ মুসলিমের দেশ, বাংলাদেশ। সেক্ষেত্রে আমিও পশ্চিমা সংস্কৃতির মেয়ে না। সিগারেটে অভ্যস্ত নই আমি।''

সে কপালটা সামান্য জড়িয়ে হাসল। হাসার সময় তার গা দুলে ওঠে, ভঙ্গিমাতে বড় বেপরোয়াপনা। সে বলল, "তবু এক টান মারো দয়ালের নামে।''অন্তূ দু-একবার আশপাশে তাকাল বোকার মতোন। কেউ

আসার নেই বোধহয় তাকে বাঁচাতে। এর অবশ্য কারণ আছে। মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে সে কোনো বিপদে পড়েনি। কিন্তু তারা এসে অন্তূর পক্ষে এবং সামনের জনের বিপক্ষে কথা বললে যা হবে সেটা বিপদ।

হিজাবের আড়ালে অন্তূর শরীরটা দু-একবার ঝাঁকুনি খেলো। তবু পরিষ্কার গলায় বলল, "তবু কেন?"

পেছন থেকে কবীর ক্যাটক্যাট করে বলে উঠল, "কারণ আমরা সিনিয়র। এরপর আর কোনো ফযিলতের খোঁজ করলে তুমি নিখোঁজ হয়ে যাবা। ঠিক বলিনি ভাই?"

পেছনের ছেলেরা হাসল। সে বলল, “আলবাৎ সহি কথা কইছিস।”

সকলে দেখছে ওদের। অন্তূ মাথা নাড়ল, “উমমম! সাংঘাতিক ব্যাপার দেখছি! তবে সিনিয়রের মতো আচরণ আপনাদের একজনেরও নয়।”সে ভ্রু নাচিয়ে বাহবা দিয়ে এগিয়ে অন্তূর মুখের ওপর ঝুঁকে এলো, “তুমি তা জানাবা, সিস্টার?”

অন্তূ ঘৃণায় মুখটা পিছিয়ে নেয়। ভোক ভোক করে গন্ধ আসছে তার মুখ থেকে। অন্তূ নিজ গরিমায় বলে ওঠে মাড়ি শক্ত করে, “জানাতেই পারি। শিক্ষার বয়স হয় না। বলা

হয়, দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন করো।”

কবীর কিন্তু সহৃদয় ব্যক্তি। সে সাবধান করল, “হুঁশিয়ারী করছ? সিনিয়রদের সামনে মুখ চালাচ্ছ? মারা পড়বে, মেয়ে! কবে ভর্তি হয়েছ, কে বড়ো কে ছোটো বিষয়টা বুঝে উঠতে পারোনি মনে হচ্ছে?”

কবীরের খুব হাসি পাচ্ছে ছোট্ট মেয়েটার দুঃসাহসের ওপর। বড় ইচ্ছে করছে নেকাবটা টেনে ছিঁড়ে ফেলতে। ফেলাও তো উচিত। মেয়েটা বেয়াদব।অন্তূ হাসল, “কুকুর ছোটো হোক অথবা বড়ো, তাকে কুকুর বলার সৎসাহসটুকু থাকা অবশ্যই ভালো গুণ! কী

বলেন সিনিয়র মশাই!'' কথাটা অন্তূ, ঘাঁড় বাঁকা করে তাকিয়ে থাকা সেই সিগারেটওয়ালা লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল।

সে ভ্রু কিঞ্চিৎ জড়ায়, যা খুব সূক্ষ্ণ। তার খুব আনন্দ লাগছে। নতুন ধরণের অভিজ্ঞতা এটা। তাদের সামনে কেউ তো কথা বলে না। মেয়েটা নিশ্চিত তাকে চেনে না।অন্তূ আবার বলল, "একটা মেয়ে হেঁটে যাচ্ছে, তাকে ডেকে সিগারেট টানতে বলা, পানির বোতল ভরানো, জুতো পরিস্কার করানো, আজেবাজে কথা চিরকুটে লিখে তা অন্যকে দেওয়ানো, হ্যারাস করা, হুমকি দেয়া, হলে

ডেকে নেয়া–এসব আপনাদের কাছে সিনিয়রের সংজ্ঞা? অথচ আমি যে বই থেকে সিনিয়রের সংজ্ঞা পড়েছিলাম, সেখানে লেখা ছিল–সিনিয়র হলো শিক্ষক, যে জুনিয়রকে আদব শেখাবে, শিষ্টাচার বোঝাবে, একটা ভুল করলে ধমক দিয়ে ভুলটা শুধরে দেবে, কোনো প্রয়োজনে সাহায্য করবে ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছুই লেখা ছিল। সেই বই আপনাদের হাতে পড়েনি। দুঃখজনক। মূলত আপনারা রাজনৈতিক পাওয়ার শো করতে এসেছেন, ভুল বলিনি আমি নিশ্চয়ই!"

সিগারেটটা মাটিতে ফেলে পা দিয়ে চেপে পিষে ক্লাসের দিকে এগিয়ে গেল। ছেলেগুলো

ধরতে যায় অন্তূকে। সে বাঁধ সাধল, “উহু! বয়েজ, কুল কুল! মালটা তো একদম আলাদা রে! সবার চাইতে আলাদা। তার সাথে খেলাটাও হবে একদওওম আলাদা! শালার রাজনীতিতে আসার পর কত্ত ভদ্ররনোক হয়ে গেছি আমি, ভাবা যায়? আমাকে চেনেনি মনেহয়। পাত্তাই দিলো না, ছেহ!”আস্তে করে মুখটা তুলে আকাশের দিকে তাকাল, “কুকুর বলেই খালাস হয়ে গেলে, মেয়ে! পেটে যে কুকুরের ভীষণ খিদে, সেইটা খেয়াল করলে না! নট ফেয়ার, নোপ! দিস ইজ নট ফেয়ার!”

হুট করে আবার আসমান থেকে চোখ নামিয়ে ঘাঁড় নাড়ল দুদিকে, “চ্যাহ! উহহ কী তেজ! আমি ডিস্টার্বড রে!”

সিগারেটটা সে তুলল। সেটা কবীরকে দেখিয়ে বলল, “রেখে দে এটা যত্ন করে। পাখি শিকার করার পর একবার করে এটা দেখব, আর... তাই বলে আমার সাথে এভাবে? এ ও আমাকে চেনে? চেনে রে আমাকে?”

সামনের দাঁতক পাটি ঘষল মৃদু। ঘাঁড়ে হাত বুলিয়ে আড়চোখে সামনে তাকিয়ে দেখল। আবার আকাশের পানে তাকাল, “সামনে ইলেকশন! নিজেকে বাঁচিয়ে চলছি, তাতে দেখতেছি ম্যালা লোকই রঙ্গ-তামাশা দেখায়ে

চলে যাচ্ছে! এইটা কি ঠিক হচ্ছে, বল তো! ইলেকশন তো শেষ হবে তাই না? এরপর কী হবে, তা ভাবছে না কেন এরা?উন্মাদের মতো হাসল সে। ভার্সিটি চত্বরে লোকজন কম এখন। ক্লাসের ফুল টাইম চলছে। লোক থাকলেও তার যায়-আসার কথা নয়। যে পাশ কাটাচ্ছে, সালাম ঠুকে যাচ্ছে তাকে। সে আবার তাকাল অন্তূর দিকে। অন্তূ ততক্ষণে ঢুকে পড়েছে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের বিল্ডিংয়ে।পরদিন ক্লাস শেষে ভীষণ ক্লান্ত অন্তূ। ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর ডেকেছেন। ডাকার কারণ স্পষ্ট নয়। অন্তূকে পিয়ন

থামালো দরজার সামনে, “দাড়ান আপনে। স্যার বিজি আছে। মিটিং চলতেছে ভিতরে।” ভেতর থেকে প্রফেসর ইউসুফ সিরাজীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, “ভেতরে আসতে দাও ওকে।”

অন্তূর একটু সন্দেহ হলো, কোনো গুরুতর বিষয় নয় তো! ভেতরে প্রবেশ করে সালাম জানাল। ইউসুফ সিরাজী মাথা নাড়লেন, “এসো!”আরও কয়েকজন বড়ো বড়ো শিক্ষক রয়েছেন কক্ষে, এবং টেবিলের সামনে ডানপাশে চেয়ারে বসে আছে এক লম্বামতো পুরুষ, পরনে পাঞ্জাবী, মুখে চাপদাড়ি। এলাকায় একনামে বড়ভাই। যার মুখভঙ্গি

একদম স্বাভাবিক, নিচের দিকে তাকিয়ে আছে শীতল দৃষ্টি মেলে। একে অন্তূ চেনে, ভার্সিটির ছাত্র সংসদের মেজর মেম্বার— হামজা পাটোয়ারী। ইউসুফ সিরাজী জিজ্ঞেস করলেন, "গতকাল কী হয়েছিল?"

অন্তূ ইতস্তত না করে বলল, "আমাকে র‍্যাগ দেয়া হয়েছিল, স্যার!"

-"সে তো আর নতুন কিছু নয়। তুমি কী করেছ?" কড়া শোনাল প্রফেসরের কণ্ঠস্বর। অন্তূ দমল না, বলল, "আমাকে সিগারেটে টান..."-"আহ!" ব্যাপারটা যেন শুনতে আগ্রহী নন স্যার, বিরক্ত হলেন, "তুমি কী করেছ সেটা বলো!"

অন্তূ স্যারের সম্মানে বিনয়ের সঙ্গে তবে দৃঢ় কণ্ঠে বলল, "আমাকে ধূমপান করতে বলা হয়েছিল, স্যার। আর তাতে অভ্যস্ত নই আমি। তাই সিগারেটটা নিয়ে ফেলে পা দিয়ে নষ্ট করে দিয়েছি।"

মুখভঙ্গি শক্ত হলো প্রফেসরের। চোখ পাকালেন তিনি, চাপা স্বরে ধমকে উঠলেন, "এই শিখেছ? কার সঙ্গে এই আচরণ করেছ কোনো জ্ঞান আছে সে বিষয়ে? অভদ্র মেয়ে! সিনিয়রদের সঙ্গে এই আচরণ শিখেছ এতদিনে? ভার্সিটিতে আসো বেয়াদবী শিখতে? আদবের বালাই নেই ভেতরে! তুমি জানো, এতে তোমার এডমিশন ক্যানসেল

হতে পারে? নাম কী?''অন্তূ অবাক হলো, উল্টো তাকে ব্লেইম করা হচ্ছে! অবশ্য চমকানোর কিছু নেই। দুনিয়ার সংবিধানের নাম যেখানে অরাজকতা ও সুশাসনহীনতা! সেখানে এটা নেহাত স্বাভাবিক ব্যাপার! নাম বলল সে, “মাহেজাবিণ আরমিণ অন্তূ।''

-“বাবার নাম?''

একটু ভয় হলো অন্তূর, এসব আব্বুর কানে গেলে...আব্বু সম্মানী মানুষ, তামাশা নিতে পারবেন না। জবাব দিলো, “আমজাদ আলী প্রামাণিক।''

-“স্কুল মাস্টার আমজাদ নাকি?''

-“জি!''

-“এখনও মাস্টারি করে?”
-“জি না। রিটায়ার করেছেন বছরখানেকের মতো।”
ইউসুফ সিরাজী হামজাকে জিজ্ঞেস করলেন, “হামজা! তুমি কিছু বলবে?”হামজার মুখভঙ্গি দুর্বোধ্য। বোঝার চেষ্টা করল অন্তূ, অথচ বিশেষ অভিব্যক্তি নেই মুখে। অন্তূর দিকে তাকালও না একবার চোখ তুলে, মৃদু একবার ঘাঁড় নেড়ে দাম্ভিকতার সাথে ডানহাতের তর্জনী আঙুল তুলে ইশারা করল অন্তূকে বের হয়ে যেতে। জলদ গম্ভীর প্রতিক্রিয়া তার। যেন নেহাত অনিচ্ছুক সে অন্তূর সাথে কোনোপ্রকার কথা বলতে।

কক্ষ থেকে বেরিয়ে অন্তূ থমকাল। সে কি কোনো অনিশ্চিত ঝামেলায় জড়িয়ে যাচ্ছে! একটা অজানা বিষণ্নতা টের পেল সে ভেতরে, যা যুক্তিহীন বলেও মনে হচ্ছে, আবার কিছু একটা খোঁচাচ্ছে ভেতরটায় খুব। হামজা পাটোয়ারী কেন বসেছিল ওখানে?আজ প্রথমবার অন্তূ হামজাকে এতো কাছ থেকে দেখল। আগে দেখেছে বিভিন্ন পোস্টার এবং প্রোগ্রামের ব্যানারে, নয়ত ভার্সিটি প্রোগ্রামে বক্তব্য দেওয়া বা নেতৃত্ব প্রদানের সময়। শহীদ মিনার চত্বর পেরিয়ে যাবার সময় মেয়েলি ডাক কানে এলো। মেয়েটা পরিচিত,

নাম তানিয়া। ওর দুই ইয়ার সিনিয়র। এগিয়ে গিয়ে বলল, "জি, আপু!"

-"গতদিন আবার কী হয়েছিল ভার্সিটিতে?"

অন্তূ বসল সিড়ির ওপর, "গতদিন আবার? কেন, এর আগেও কি কিছু ঘটেছে নাকি ভার্সিটিতে?"

তানিয়া জিজ্ঞেস করল, "কোন ইয়ার যেন তুমি?"-"সেকেন্ড ইয়ার।"

-"ও আচ্ছা! ছুটিতে ছিলে তোমরা! ভার্সিটিতে হওয়ার কি আর কোনো কমতি আছে? একের পর এক হয়-ই। তোমার কী হয়েছে গতদিন, জয় আমিরের সঙ্গে?"

অন্তূ কপাল জড়াল, "জয় আমির?"

প্রশ্নটা খুব অপছন্দ হলো তানিয়ার, বিরক্ত হলো, “দুই বছর ভার্সিটিতে পড়ছো, এবার কি বলবে জয় আমিরকেও চেনো না নাকি? ভার্সিটির ছাত্রলীগের সম্পাদককে চেনো না? কাউন্সিলরের ছেলে হামজা পাটোয়ারীকে চেনো?”

-“জি, চিনি।”

-“আর জয় কে? হামজার ফুফাতো ভাই, জয় আমির।”

-“ও আচ্ছা!” একটু দ্বিধান্বিত দেখালো অন্তূকে।

তানিয়ার জয়ের হুলিয়া বর্ণনা করতে শুরু করল, “দুই বছর আগে এখান থেকে অনার্স

শেষ করেছে। শ্যামলা বর্ণের লম্বা করে, থুতনির কাছে একটা তিল আছে। গলায় চেইন, তাতে J লেটার আছে। ডানহাতে ঘড়ি পরে আর বামহাতে ব্রেসলেট..''অন্তূর সেসব শুনতে ইচ্ছে করছিল না। বুঝল, যে তাকে সিগারেটে টান দিতে বলেছিল, সে-ই জয়! আর শুনতে চাইল না এই বিশদ বর্ণনা, দ্রুত মাথা নাড়ল, "জি, এবার চিনেছি।"

-"কী করেছে ওরা তোমার সঙ্গে?" এমনভাবে কথাটা বলল তানিয়া যেন কোনো বিশেষ গোপন রহস্যের ব্যাপারে খোঁজ করছে। অন্তূ বলল, "বিশেষ কিছু নয়, র‍্যাগ দিয়েছিল।"

এবার তানিয়া আরও সতর্ক হয়ে উঠল, “আরে! লজ্জা পাচ্ছ কেন? আমি কাউকে কিচ্ছু বলব না, এসব হতেই থাকে, বলো কী করেছে ওরা তোমার সঙ্গে?”
অন্তূ অবাক হলো, “আশ্চর্য! লজ্জা পাওয়ার প্রশ্ন কেন উঠছে? বললাম তো, সাধারণ র‍্যাগ দিয়েছে। আর কীসব হয়ে থাকে?”
তাচ্ছিল্য করে হেসে উঠল তানিয়াসহ পাশের মেয়েগুলো। তানিয়া মুখ বিকৃত করে বলল, “কেন? তুমি বোধহয় জানো না, র‍্যাগিংয়ে মেয়েদের সাথে কী কী করা হতে পারে?”
-“জি, জানি। তবে আমার সঙ্গে তেমন কিছু হয়নি।”

তানিয়া কেমন অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে তাকায়, “তাই নাকি? যাক, তা যদি সত্যি হয়, তো ভালো। কিন্তু তুমি কী করেছ? তোমাদের নিয়ে কানাঘুষা চলছে ভার্সিটিতে। তোমার সাহস বেশি হয়েছে নাকি?”

-“কানাঘুষা? কানাঘুষার মতো কিছু তো হয়নি! আর সাহসের কী আছে এতে! যা আমার পছন্দ নয়, তাতে আমি সাফ মানা করে দিয়েছি।”তানিয়া চোখ উল্টালো, “মেয়ে, তোমার তো মাথায় দোষ আছে মনে হচ্ছে! তুমি সিনিয়রের সাথে বেয়াদবি করে এসে বলছো কানাঘুষার কিছু হয়নি! হয় তুমি পাগল, নয়ত বোকা অথবা দুঃসাহসী বলা

যায়! কিন্তু এখানে দুঃসাহস টেকার না। তুমি সিনিয়রদের সাথে এরকম অবাধ্যতা করলে কোন সাহসে! জয়কে তো দেখছি তাহলে আসলেই চেনোই না তুমি? ভার্সিটিতে কি ঘাস কাটতে আসো, খবর বা রুলস কিছুরই জ্ঞান রাখো না নাকি!''

অন্তূর খুব বলতে ইচ্ছে করল, ঘাস কাটতে যদি নাও আসি, তবে এসব পঙ্গপালদের খবর রাখতে নিশ্চয়ই আসি না! আসি পড়ালেখার জন্য, তা শেষ করে ফিরে যাই।

চেপে গেল, শঙ্কিত হয়ে উঠেছে ইতোমধ্যেই ভেতরটা। ভয়টুকু সে চাপল ভেতরে, "কীসের খবর রাখার কথা বলছেন?''মেয়েগুলো একে

অপরের দিকে তাকাল, একটু তাচ্ছিল্যে হাসল সকলে। তানিয়া বলল, “এর আগে বহু মেয়ে ভার্সিটি ছেড়েছে জয়ের কারণে, তোমরা তখন এডমিশন নাওনি, তখন জয় সেকেন্ড ইয়ারে ছিল বোধহয়। একটা মেয়ে হলের ছাদ থেকে পড়ে আত্মহত্যা করেছিল। ওরা কী করেছিল মেয়েটার সঙ্গে জানা নেই। কিন্তু একটা কথা পরিস্কার, জয় এক অভিশাপ! আবার ভালোও! ”

-“আবার ভালোও কেন?”-“রাজনীতির চাল বোঝো না? সমাজসেবার কাজবাজ করে দুই ভাই মিলে। পুরো ছাত্র সংগঠনের বেশ ভালোই যোগান দেয় দুজন। ত্রাণ, চিকিৎসা,

স্বাস্থ্, দুর্যোগ—এসবে বহুত অবদান আছে ওদের। এরিয়ার লোকের মনোযোগ কেড়েছে নিজের নেতৃত্বের জেরে অথচ বখাটেপনা ছাড়তে পারেনি, তবে সেটার কোনো প্রমাণ থাকে না, বুঝলে!"

অন্তূ একটা ছোট্ট শ্বাস ছেড়ে জিজ্ঞেস করল, "আমাদের ছুটির মধ্যে কী হয়েছিল ভার্সিটিতে?"

তানিয়া চারদিকে ভালোভাবে তাকাল কয়েকবার, বেশ কিছুক্ষণ চুপ রইল। এরপর নিচু আওয়াজে বলল, "শোনো, তুমি এখনও ছোট। এত বোকার মতো চলবে না।

পরিস্থিতি বুঝে চলতে হয়। নয়ত মারা পড়বে।''

একটু থেমে বলল, "হামজার বাপ কাউন্সিলর এলাকার, তা তো জানো! আর হামজা রাজনৈতিক নেতাকর্মী। আমাদের কমনরুমের আয়া সালমা খালাকে তো চেনো।-"জি, চিনি। ''

-"ওনার বাড়ি হামজাদের ক্লাবের পাশে। ওনার ছোটো ছেলেটার হঠাৎ-ই কী থেকে যেন আঘাত পেয়ে কী হলো! পায়ে ক্যান্সার হলো। এরপর নাকি খালা বাড়ির জায়গা অর্ধেক দাম নিয়ে পাওয়ার-দলিল করে এক হিন্দুর কাছে বন্ধক রেখেছিল, বলা চলে

বিক্রিই করেছিল। তবে শর্ত ছিল খালা নির্দিষ্ট সময়ে টাকা পরিশোধ করলে জায়গা ফেরত পাবে, যেহেতু বসত বাড়ি। কিন্তু চিকিৎসা করেও সেই ছেলে বাঁচেনি আর। একবছরের সময় ছিল, খালা সেই সময়ে টাকা পরিশোধ করতে পারেননি। তার ওপর প্রতি মাসের কড়া সুদের টাকা জমে পুরো জমির দাম উসুল হয়ে গেছিল ওই লোকের। ওই লোক এরপর জায়গাটা খালাকে না জানিয়ে অন্য কারও কাছে বেঁচে দিয়েছিল। তারা এসে তাগাদা দিতে থাকল বাড়ি খালি করার। খালা সময় চেয়ে নিয়েছিল।কিন্তু পরে বিচার শালিশ বোর্ডের কাছে চলে গেল। মানে মেয়র,

কাউন্সিলর, এলাকার মাতব্বর, সমাজসেবকেরা সব ছিল। সব শেষে নাকি বিশাল ঝামেলা হয়েছিল। পরে হামজা আর জয় মিলে সালমা খালাকে সময় দিয়েছিল আরও কিছুদিন। তখন খালার বড়ো ছেলের বউ বাপের বাড়ি জায়গা বিক্রি করে এনে টাকা দিয়েছিলেন কাউন্সিলর হুমায়ুন পাটোয়ারীর কাছে। পরে আর খালা টাকা নিয়ে আসেনি। এরপর বেশ কয়েকবার হামজা ভাই বাড়ি খালি করতে বলেছিল খালাকে। তারা যায়নি, তাদের যাওয়ার জায়গা নেই। কয়েকদিন হলো খালার মেয়ে আঁখিকে পাওয়া যাচ্ছে না। লোকে বলছে এদের

মধ্যেই কেউ হয়ত আঁখিকে তুলে নিয়ে গেছে। জানা নেই মেয়েটার সঙ্গে কী হয়েছে, কী হালে আছে..''

ভার্সিটির ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়েও বুকের ভেতরে ঢিপঢিপ আন্দোলন চলছে, আওয়াজটা খুব কানে বাজছে, নিকাবের নিচে মুখটা ঘেমে উঠেছে। পানি পিপাসা বোধ করল অন্তূ। সে কি কোনো ভয়ানক পরিণতির আভাস পেল আজ! আঁখি! দেখেনি কখনও মেয়েটাকে, তবু হৃদযন্ত্রটা খুব লাফাচ্ছে! আচ্ছা! আঁখি কোথায়? পাওয়া যাচ্ছে না কেন ওকে?এরপর দু'দিন আর ভার্সিটিতে যায়নি অন্তূ। তার সাহসে জুটছে না। সেদিন জয়ের সম্মুখে

দাঁড়িয়ে ভয় হয়নি, অথচ আজ দু'দিন বুকে ভারী শঙ্কা চেপে আছে। আঁখি মেয়েটাকে সে দেখেনি কখনও, নাম ছাড়া কিছু জানা নেই। তবুও আজ দুটো দিন ঘরে বন্দি হয়ে ওই অপরিচিতা মেয়েটার জন্য পরাণ দাপায়। নিজের পরিণতি সম্বন্ধে মাথায় চেপে বসে অকল্পিত এক ভয়!

বাড়ির দরজায় ধাক্কা পড়ল। অলস ভঙ্গিতে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলো সে। মার্জিয়া ভেতরে ঢুকে হাতের ব্যাগটা ধপ করে মেঝেতে রাখল। অন্তূ বলল, "কী হয়েছে, ভাবী! ভাই আনতে যায়নি?"

মার্জিয়া জবাব দিলো না। অন্তূ আবার বলল, “আপনি বোরকা খুলে আসুন, আমি খাবার আনছি, একসাথে খাই।”
মার্জিয়া খ্যাকখ্যাক করে উঠল, “অ্যাই, নাটক করবা না তো, অন্তূ! সহ্য হচ্ছে না গায়ে।”
অন্তূ স্বাভাবিকভাবে বলল, “ঠিক আছে। গায়ে একটু ঠান্ডা পানি ঢেলে আসুন। ভালো লাগবে।”
ছ্যাঁত করে উঠল মার্জিয়া, “তোমার মতো ডাইনির মুখে এর চেয়ে ভালো পরামর্শ শোনার আশা রাখিই বা কই আমি? কথাই বলো গা জ্বালানো সব।”-“কী হয়েছে? ক্ষেপে

আছেন কেন? কার রাগ আমার ওপর দেখাচ্ছেন?''

-“তোমার মতো মা তা রী ননদ থাকতে রাগ আর কার ওপর হবে?''

অন্তূর কণ্ঠস্বর দৃঢ় হয়ে উঠল, “মুখ সংযত করুন আপনার। আপনি জানেন, বেশিক্ষণ আমি আপনার অহেতুক কথাবার্তা নিতে পারব না।''

-“কী করবা তুমি? আমার বোনের সংসার যেভাবে খাইতে লাগছো তোমরা, আমারেও তাড়াবা এইখান থেকে?''

অন্তূ কপাল জড়িয়ে তাকাল ভাবীর দিকে, “তেমন কোনো কথা ওঠেনি, সেটা জানেন

আপনিও। আপনি সাধারণ বিষয়কে নিজের ভেতরের জটিলতা দিয়ে অন্য পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছেন।''

রাবেয়া যোহরের নামাজে বসেছিলেন, দ্রুত সালাম ফিরিয়ে উঠে এলেন, "কী হইছে, মার্জিয়া। কীসব কথা এইসব?'

মুখ ঝামটি মারল মার্জিয়া, "শখ আমার খুব যে, তাই।''অন্তূ বলল, "ভনিতা না করুন বলুন, আমি কী করেছি? আপনার শখ পরেও মেটাতে পারবেন।''

মুখ বিকৃত করল মার্জিয়া, "জানো না তুমি, না? আমার বোনের সংসার তোমাদের জন্যে যদি ভেঙেই যায়, তখন দেখবা আমি

তোমারেও এই বাড়িতে শান্তিতে থাকতে নআ দিয়ে কেমন হিরহির করে টেনে বের করে দিয়ে আসি।

রাবেয়া গর্জে উঠলেন এবার মৃদু স্বরে, “আমার মেয়েকে বের করার বা রাখার তুমি কে? আমার মেয়ের বাপ-মা মরে যায় নাই এখনও যে, তুমি আমার মেয়েকে বাড়ি থেকে বের করবা! এখনও বেঁচে আছে আমার মেয়ের বাপ। কী হইছে, তা বলবা না? না তা তো জানাই নাই তোমার। এত রহস্য করা ক্যান, হ্যাঁ?”

মার্জিয়া চিটপিট করে উঠল, বলতে পারলে তো হতোই। বলতে পারিনা তো আম্মা। আর

না সইতে পারি। আমার বোনের ঘর ভাঙলে আপনার মেয়েকে দেখি এই বাড়িতে রাখে কে?''অন্তিক বাড়িতে ঢুকল, "কী ব্যাপার! কীসের চেঁচামেচি চলতেছে?''

রাবেয়া বললেন, রাবেয়া গর্জে উঠলেন এবার মৃদু স্বরে, "আমার মেয়েকে বের করার বা রাখার তুমি কে? আমার মেয়ের বাপ-মা মরে যায়নি এখনও, যে তুমি আমার মেয়েকে বাড়ি থেকে বের করবা! আমার মেয়েকে তাড়াবা, তার আগে আমি বের করতে পারব না তোমায়? এখনও বেঁচে আছে আমার মেয়ের বাপ।''মার্জিয়া কী কয়, কিছুই বুঝিনা। এমন অশান্তি কয়দিন দেখা যায় ক তো! কী হয়,

কীসের কথা কয়, কিছুর কথাই বুঝিনা। তোর বাপের কানে গেলে ভালো হইতো বিষয়টা?''

মার্জিয়া স্বামীর দিকে তাকাল। অন্তিক চোখ ফিরিয়ে চুপচাপ রুমে চলে যায়। বোন, স্ত্রী অথবা মা—কাউকেই একটা শব্দও বলল না। অন্তূ ঘৃণিত চোখে চেয়ে রইল বড়ো ভাইয়ের চলে যাওয়ার পানে। একরাশ ভাঙাচোরা যন্ত্রণা আর ঘেন্না বোধহয় জড়িয়ে এলো বুকটায়। তরতরে যুবক অন্তিকের এক অ-পুরুষ হয়ে ওঠার গল্পটা অস্পষ্ট তার কাছে। এভাবেই কতগুলো বছর কাটছে এ বাড়িতে। অন্তিক শুধু একটা দেহ মাত্র, যে গোটাটাই মানসিক অস্তিত্ব ও বিবেকবোধমুক্ত।সে

বহুদিন ভাইয়ের সাথে প্রয়োজনীয় ছাড়া অপ্রয়োজনীয় কথা বলে না, হাসে না, একসাথে খায় না। এক অপরিকল্পিত অনীহা এবং বিতৃষ্ণা জেগেছে সবকিছু বুঝে নির্বিকার থাকা অন্তিকের ওপর। মার্জিয়া অকারণেই চিৎকার চেঁচামেচি করে, কেন করে, কীসব বলে, কিছুই বোধগম্য হয়না। আর না অন্তিক কিছু বলে।

শিক্ষিত, তরতরে যুবক অন্তিক। যার পড়ালেখা, সামাজিক সক্রিয়তা, মেধা, কথাবার্তা, হাসি—একসময় সমাজে আলোচিত বিষয় ছিল। আমজাদ মাস্টারের যোগ্য ছেলে থেকে অযোগ্য বিবেকহীন মূর্খ কাপুরুষের

জন্মটা কবে যেন! গোটাটাই রহস্য, ঠিক তেমনই মার্জিয়ার আচরণও!সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি, একটু আগে যে অল্প খিদে পেয়েছিল, তা এখন আর অনুভব হচ্ছে না অন্তূর। আস্তে করে নিজের ঘরে চলে গেল। পেছনে রাবেয়া বেগমের ফুঁপানোর আওয়াজ পেল, ফিরে তাকাল না। অবলা মা তার, আব্বু বাসায় নেই।

পঞ্চগড় গেছেন। আজ ফেরার কথা ছিল, হয়ত ফিরবেন না। অন্তূ পড়ার টেবিলে বসল। অথচ মাথায় আব্বু আর অন্তিকের কথা ঘুরছিল। বই বন্ধ করে টেবিলে মাথা এলিয়ে দিলো। অস্থির লাগছে ভেতরটায়।

লোকে বলে অন্তিক অন্তূর চেয়েও সুন্দর, যুবক হিসেবে। ভীষণ মেধাবি ছিল কলেজ জীবনে। আমজাদ সাহেবের সাথে বাবা-ছেলের সম্পর্ক চমৎকার সুন্দর ছিল। রাবেয়া বেগম বরাবরই সরলা ও অল্প শিক্ষিতা এক বাঙালি সংসারী নারী।

উনার বিপরীতেই আমজাদ সাহেবের গুণগুলোতেই দুটো সন্তান গড়ে উঠেছিল। অন্তূ তখনও ছোট, যখন অন্তিক কৈশোর পেরিয়ে যুবক হচ্ছিল। খুনশুটি, মারামারি, ঝামেলার শেষে আবারও বেহায়ার মতো গিয়ে অন্তূর ঝুঁটি টানার মতো দুষ্টুমির জন্য আমজাদ সাহেবের কাছে শাস্তি কম পেতে

হয়নি তাকে।ভীষণ ডানপিটে আর চঞ্চল, আর সবচেয়ে বেশি জেদি ছিল অন্তিক। তার প্রবল আত্মসম্মানবোধের জন্য মাঝেমধ্যেই এখানে-ওখানে ঝামেলা বাঁধিয়ে এসে মার খেত আব্বুর হাতে।

কলেজ শেষ করে ভার্সিটি ভর্তি হবার পালা এলে অন্তিকের সুযোগ হলো কুষ্টিয়ার ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার। বাড়ি ছাড়তে হলো শিক্ষার সুবাদে। এরপর যা অঘটন ঘটে গেল।মার্জিয়া কুষ্টিয়ার মেয়ে। তাকে ভাগিয়ে নিয়ে চলে এসেছিল অন্তিক। তখন সে থার্ড ইয়ারের ছাত্র, বেকার শিক্ষার্থী।

সেই নিয়ে মাস্টারমশাই আমজাদ সাহেবের নামও খারাপ হয়েছিল বিশেষ। আমজাদ সাহেব হাই স্কুলের এক সামান্য শিক্ষক। উনার আদর্শের চূড়াকে মাটিতে মিশিয়ে যে কাজটা অন্তিক করেছিল, তাতে সবচেয়ে ক্ষতি সে নিজের এবং সবচেয়ে বড় কষ্টটা আব্বুকে দিয়েছিল। অথচ এটা বুঝে অনুতপ্ত ও ব্যথিত হবার বদলে সে বিগড়ে গেল।

দুটো থাপ্পর মেরেছিলেন আমজাদ সাহেব ছেলের গালে। কয়েকটা কথা বলেছিলেন, তার মধ্যে অন্তিকের আত্মসম্মানে লাগা কথাটা ছিল, "বউ তো নিয়ি এসেছিস, খাওয়ানোর মুরোদ আছে?"আর বিশেষ কিছু বলেননি।

এরপর থেকে অন্তিক বদলেছে, মার্জিয়া নিজেকে প্রকাশ করেছে। শিক্ষিত মেয়ে হওয়া সত্বেও আচরণ খুব উগ্র তার। অন্তূ বলেছিল, "ভাইয়া, তুই যে আত্মসম্মানের বড়াই এখনও করছিস, তা কিন্তু খুঁইয়েই তোর মতো মেধাবি এক ছাত্র প্রেমের মতো ছোট কাজ করেছে, আর তা করেছিস ভালো, এই ভরা ক্যারিয়ারকে গাঙে ভাসিয়ে বাপ-মায়ের মন ভেঙে বউ ঘরে আনাটা কোনো আত্মসম্মানবোধ জ্ঞানের পরিচয় ছিল না।" ব্যাস, আর না প্রাণের আব্বু না অন্তূ। কারও সঙ্গে কথা নেই। কী করছে, কী হচ্ছে সবটাতে নির্লিপ্ত, নিঃশব্দ। অথচ মার্জিয়ার

উগ্রতা ও খিটখিটে মেজাজ দিনদিন লাই পাচ্ছে।অন্তূদের এলাকায় একবার ব্রাক ব্রাঞ্চ পরিচালিত গণশিক্ষার কার্যক্রম এসেছিল। সেখানে বয়স্কদের শিক্ষা দেয়া হয়। সে তখন এইচএসসি পরীক্ষা দিয়ে দিনাজপুরেই টুকটাক কোচিং করছে। শখের বিষয়, বড়ো নিরক্ষর মানুষদের শিক্ষা দেয়া। সেও শিক্ষিকা হিসেবে যোগদান করেছিল সেখানে। সেখানেই পরিচয় হয়েছিল তাসিনের সাথে ওর। তাসিন ওর প্রেমে পড়ল। বাড়ির লোকদের সাথে, বিশেষ করে রাবেয়ার সাথে খুব সখ্যতা গড়ে উঠেছিল তার। রাবেয়া মানুষটা যুবকদের সাথে খুব তাড়াতাড়ি মিশে

যান। ভোলাভালা, সরল নারী যাকে বলে। এক পর্যায়ে তাসিন যখন প্রস্তাব দিলো বিয়ের, সাফ মানা করেছিল অন্তূ। সে বিয়ে করবেনা, এমনকি সে কখনও তাসিনকে প্রেমিকের মতো নজরে দেখেনি। তাসিন নিজে থেকেই উতলা হয়ে পড়েছিল। এরপর কিছুদিন কেটে গেল। তাসিন হাল ছাড়ল, মার্জিয়া নিজের বোন বীথির সাথে তাসিনের বিয়ে দিলো। অথচ এখন কেন তাদের সংসারে অশান্তি তা জানার কথা নয় অন্তূর। তাসিনের সাথে কোনোকালেই তার বিশেষ যোগাযোগ ছিল না।অন্তূর ধারণা, বীথির সংসারে কোনো ঝামেলা চলছে।আর এটাকেই

কেন্দ্র করে মার্জিয়া ভাবছে, পুরোনো এই ব্যাপারটার জের ধরে তাসিন বীথিকে অত্যাচার করছে।

ভার্সিটির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেইটের কাছে যেতেই আব্বুর সাথে দেখা হলো। সারারাতের যাত্রায় সকালে বাড়ি ফিরলেন আমজাদ সাহেব।

অন্তূর চোখে-মুখ খেলনা পাওয়া বাচ্চার মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, "এই অসময়ে ফিরলে যে!"

-"কাজ শেষ হয়ে গেল, ফিরে এলাম। অন্তূ, খেয়ে বের হচ্ছিস নাকি না খেয়ে?"

অন্তূ চোরের মতো মাথা নোয়ায়। আমজাদ সাহেব ধমকে ওঠার আগেই অন্তূ বলল, “আব্বু! তোমার গ্রামের জমি বিক্রি করার এমন কী বিশেষ দরকার পড়ল, বলোনি কিন্তু এখনও আমায়!”

গম্ভীর মুখে বললেন আমজাদ সাহেব, “সব কথাই শুনতে হবে কেন? পড়ালেখায় মনোযোগ নষ্ট হবে এসব সাংসারিক বিষয় মাথায় আনলে, মন দিয়ে পড়।”অন্তূ অসন্তুষ্ট চিত্তে তাকায় আব্বুর দিকে। তিনি বললেন, “ভাড়া আছে কাছে?”

অন্তূ মাথা নাড়ল, “আছে।”

আমজাদ সাহেব শার্টের বুকপকেট থেকে পঞ্চাশ টাকা বের করে অন্তূর হাতে দিলেন, "সাবধানে যাবি। ক্লাসশেষে দেরি করবি না, তাড়াতাড়ি ফিরে আসবি।"

অন্তূ একটু সপ্রতিভ হলো, "এ কথা বলছ কেন, আব্বু?"

-"ক্লাস শেষে কোথাও কাজ আছে কোনো?"

-"না, নেই।"

-"তাহলে আর দেরি করার কী আছে? এমনিতেও ভার্সিটি চত্বর আজকাল ভালো চলছে না।"রিক্সা থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে অন্তূ এগিয়ে গেল গেইট দিয়ে। অন্যরকম লাগছে কিছু একটা। জটলা পাকানো

লোকজন ক্যাম্পাসে! একস্থানে চেয়ার, ও বেঞ্চি পাতা। জয় বসে আছে পায়ে পা তুলে। পাশেই হামজা। দুজনের পরনেই সাদা পাঞ্জাবী। বসে বসে ঠ্যাং দুলাচ্ছে দুজন। নভেম্বরের মাঝের সময়টা। শাল জড়ানো গায়ে। দুজনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে ছাত্র সংগঠনের ছেলেরা। মহান দুই ব্যক্তির পাশে দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়ে ব্যাপক ধন্য তারা। হামজা স্বভাবসুলভ গম্ভীর মুখে বসে আছে। জয় এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। স্থির থাকার স্বভাব নেই।শঙ্কিত বুক নিয়ে ভিড় ঠেলেঠুলে একটু ভেতরে ঢুকল অন্তূ। জীর্ণ একটা ময়লা কাপড়ে ঢাকা কোনো মেয়ের শোয়ানো দেহ

মাঠের ঘাসের ওপর পড়ে আছে। সেই মুহূর্তে কারও ধাক্কায় একটু পিছিয়ে এলো অন্তূ। মেয়েটা কি আঁখি!? বুকের রক্ত ছলকে উঠল অন্তূর!

সালমা খালার মেয়েটা এত্ত সুন্দর! অভিশাপে ঝরে পড়া চাঁদের টুকরো বুঝি! ঘন চোখের পাপড়ি যেন এখনই ঝাপটে উঠবে! সেই সুন্দর মুখখানা বিবর্ণ, খামছির দাগে ভরতি, ঠোঁটের কোণে রক্ত জমাট বেধে শক্ত হয়ে গেছে, কালশিটে রং ধারণ করেছে। গাছি গাছি চুল ছিড়ে উঠিয়ে ফেলা হয়েছে! বাকি দেহটা এক টুকরো কাপড়ে ঢাকা। সেই কাপড়টুকুর নিচে এতোগুলো মানুষের ভিড়ে

কোনো এক মেয়ের নগ্ন দেহ পড়ে আছে। অন্তূর মনে হলো, সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে, যার ফলে শরীরটা ভার ছেড়ে দিতে চাইছে।তখন কেউ ধমকে উঠল অন্তূকে, "পিছনে সরে দাঁড়ান, এত কাছে এসে দাঁড়াবেন না। সরুন, পিছিয়ে যান।" স্পষ্ট, বিন্যস্ত ভাষা, ভরাট আদেশমূলক কণ্ঠস্বর। কালচে খয়েরী ইন-শার্টে একটা ফর্সা মতো পুরুষ! অন্তূকে উপেক্ষা করে হাতা গোটাতে গোটাতে গিয়ে লাশের মাথার কাছে বসল। ইন্সপেক্টর রশিদ ডাকল তাকে, "মুস্তাকিন! আপনার ফোন বাজছে।"

মুস্তাকিন ভিক্টিমের দেহ থেকে চোখ না তুলেই বলল, “পরে এটেন্ড করছি, রেখে দিন।”অন্তূ ভিড় ছেড়ে বেরিয়ে এলো। আব্বু রোজ পত্রিকা পড়ে রেখে দেয়, সেখানে এমন ঘটনাগুলো চোখে পড়ে। আজ সেই পত্রিকা ভেদ করে প্রথমবার কোনো খুবলে খাওয়া মেয়ের মরদেহ সম্মুখে এসে পড়েছে! এগুলো আসলেই হয়!

অন্তূ কাঁদে না। আমজাদ সাহেব কাঁদতে শেখাননি। কিন্তু আজ সেইসব শিক্ষা কাজে লাগল না। অন্তূ নেকাবের নিচ দিয়ে ঝরঝর করে অশ্রু গড়াচ্ছে। আরেকটু দূরে এসে মুখের নেকাবটা খুলে ফেলল। ব্যাগের সাইড

থেকে পানির বোতল বের করে পানির ছিটা দিলো মুখে-চোখে। টিস্যু দিয়ে মুখটা মুছে, দুটো শ্বাস নিলো জোরে জোরে।

ধমকাল নিজেকে, আশ্চর্য! এতো ভঙ্গুর হয়ে পড়ছ কেন তুমি, অন্তূ? তুমি তো এমন নও!

কোথা থেকে যেন সালমা খালা বুক চাপড়ে আহাজারি করতে করতে ছুটে এসে ধপ করে বসে পড়লেন মেয়ের লাশের পাশে মাটিতে।

অন্তূর চোখ বোধহয় আবার ভরে উঠেছে। নিজের ওপর রেগে উঠল অন্তূ! কী মুসিবত! এভাবে ভেঙে পড়লে জীবনকে মোকাবেলা করবে কী করে? কীসের মোকাবেলা? ওই তো একটা মেয়ের ছিন্নভিন্ন লাশ পড়ে আছে

মাঠের ওপর। অন্তূও তো মেয়ে! জঙ্গলের জানোয়ারেরা কবে যে মানুষের মতো রূপ ধরে মানুষের সমাজে বাস করতে লেগে পড়েছে, তাদের মোকাবেলা করতে ভঙ্গুর হলে চলবে কেন?সামলা খালাকে সামলাতে যে নারীটি ছুটে এলো, অন্তূর চোখ আটকালো তার ওপর। পরনে বিবর্ণ শাড়ি, মুখটাও মলিন। অথচ সেই মুখের সৌন্দর্য অসামান্য! এদের চেহারার আভিজাত্য মিলছে না পরিস্থিতির সঙ্গে।

কে করেছে এসব? জয়, হামজা? তাদের কথাই প্রথমে মাথায় এলো অন্তূর। কিন্তু তা উচিত নয়। অন্তূ টের পেল, এমনটা হবার

একটা কারণ আছে—সে আজ ক'দিন যাবৎ ওই দুটো নামে আতঙ্কিত বলেই এমন হয়েছে।

শাড়ি পরা নারীটি চাঁদনী। আঁখির ভাবী। মুস্তাকিন তাকে বলল, "আপনারা ওনাকে ভিক্টিমের কাছ থেকে দূরে নিয়ে যান। আমাদের কাজ করতে দিন, এই স্পটে আপনারা না ঢুকলে সুবিধা হয়।"চাঁদনীর চোখে কেমন অদ্ভুত রহস্য! যেই রহস্যটাও এক প্রকার রহস্য যেন! সে কাঁদছে না, একটুও না। অথচ অপলক চেয়ে আছে নিথর চোখে আঁখির মুখের দিকে। সেই চোখের ভাষা অবর্ণনীয়।

অন্তূর মনে হলো, মুস্তাকিন লোকটা কসাই টাইপের। এমনিতেও সরকারী কর্মকর্তারা তা-ই হয়। মুস্তাকিন একটু আঁখির ভাই সোহেলকে ডাকল। সোহেল একদৃষ্টে বোনের লা শে র দিকে চেয়ে আছে, তার চোখে পানি নেই। সেও শুধু তাকিয়ে আছে। মুস্তাকিনের ডাকে এগিয়ে গেল। মুস্তাকিন কোনোরকম শিরোনাম ছাড়া প্রশ্ন করল, "কবে ফিরেছেন দেশে?"

সোহেল আনমনে ছিল, একটু ঝারা মারল যেন নিজেকে, "হ্যাঁ! এইতো চারদিন হলো।
"-"কোন দেশে থাকতেন?"

-"দুবাই।"

-“কী কাজ করতেন সেখানে?”

-“রাজমিস্ত্রি আর সাটারিংয়ের কাজ করতাম।
”

-“আঁখিকে লাস্ট কবে দেখা গেছিল বাড়িতে?
”

খানিকক্ষণ চুপচাপ মাটির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, “চাদনী বলে, সপ্তাহখানেক আগে।”

-“নিজেদের সামলান। এবং আমাদের সাহায্য করুন তদন্তের কাজে। এভাবে কান্নাকাটি করে কোনোরকম বিচার পাবেন বলে মনে হয়। শক্ত করুন নিজেদের।”

এক প্রকার ভয় খেলে গেল সোহেলের চেহারায়, “না স্যার! কোনো বিচার লাগবে না তো। আমরা কোনো বিচার চাইনা, আপনে খালি আমার বোনের লাশ দেন, বাড়ি নিয়ে যাই। কারোর বিরুদ্ধে অভিযোগ নাই আমাদের।”

মুস্তাকিন ঠোঁটে ঠোঁট গুজে নিচে তাকাল, “কেউ হুমকি দিয়েছে আপনাদের?”সোহেল মাথা নাড়ল, “না, না হুমকি দিবে কে?”

তাদের কথোপকথন ছাত্র-ছাত্রীরা শুনছিল। মুস্তাকিন দূর থেকে জয় ও হামজার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, “কাউকে সন্দেহ করছেন?”

সোহেল আবারও দ্রুত মাথা নাড়ল, “না।”
কণ্ঠস্বরে প্রাণ নেই, নিষ্প্রভ গলার স্বর।
মুস্তাকিন বামহাত পকেটে গুজে বলল, “এসে থেকে শুনছি, সকলের ধারণা কাজটা পাটোয়ারী পরিবারের দুই ছেলে করেছে! আপনাদের কী ধারণা?”
সোহেল দ্রুত জবাব দিলো, “না না, স্যার! উনারা ক্যান করবেন এইসব? উনারা তো সব ঠিক করে দিতে চাইছিলেন! আমরাই উঠি নাই বাড়ি থেকে। এখন চলে যাব, ঝামেলা মিটে যাবে।”
অগোছালো, অযাচিত কথা সোহেলের।
বোনের মরদেহ পড়ে আছে বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাঙ্গনে। তারা বাড়ি খালি করার স্বীকারক্তি দিচ্ছে! চরম ঘাপলা বিষয়টায়! আবার সহজও বলা চলে। খুব বেশিই ভয় পেয়েছে হয়ত, অথবা কিছু লুকোনোর চেষ্টা, গা বাঁচানোর চেষ্টা!মেয়েটা গণধর্ষণের শিকার। এবং ধর্ষণটা অপ্রকৃতিতস্থ কারও দ্বারা সংঘটিত হয়েছে! আঁখির দেহ তা-ই বলছে।

মুস্তাকিন গিয়ে হাঁটু ভাজ করে উবু হয়ে বসল চাঁদনীর পাশে। জিজ্ঞেস করল, "আঁখি কবে থেকে নিখোঁজ ছিল?"

চাঁদনী ঘর্মাক্ত মুখটা মুছল মলিন শাড়ির আচল দিয়ে, "সপ্তাহখানেক আগে দুপুরে স্কুল থেকে বাড়ি আসছে, টেস্ট পরীক্ষা চলতেছিল

এসএসসির, বিকালে বাইর হয়ে গেল কোচিংয়ে যাওয়ার জন্য, এই তো ফিরে আসছে, স্যার!''

অন্তূর কলিজায় মনে হলো সজোরে এসে একটা তীর তীব্র বেগে গেঁথে গেল। 'এই তো ফিরে আসছে, স্যার!'

মুস্তাকিন উঠে দাঁড়িয়ে রশিদকে ডাকল, "এদিকে আসুন!''

-"জি, স্যার!'' রশিদ এগিয়ে এলো।

মুস্তাকিন তার হাত থেকে ফোনটা নিতে নিতে বলল, "যত দ্রুত সম্ভব তদন্তের কাজ শুরু করুন। বডিটাকে ফরেন্সিক ল্যাবে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন, এজ সুন এজ পসিবল!''রশিদ

মাথা নাড়ল, আবার বলল, “কিন্তু স্যার! গার্জিয়ানরা তো লাশ বাড়ি নিতে চাচ্ছে। খুব জিদ ধরে আছে। কোনোভাবেই তারা লা শ কাটাছেঁড়া করতে দেয়া রাজী না। আপনি একটু কথা বলুন ওদের সঙ্গে।”

মুস্তাকিন মাথা নাড়ল, “আচ্ছা, কথা বলছি। দ্রুত করুন। ক্যাম্পাসে লোক জড়ো হচ্ছে, একাট হাঙ্গামা হবার চান্স আছে। তার আগেই বডি ট্রান্সফার করুন মর্গে। কখন কে জানে জনতার মাঝে বিক্ষোভ জেগে ওঠে!”

প্রফেসর এগিয়ে এলেন মুস্তাকিনের দিকে। হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করলেন মুস্তাকিনের সঙ্গে, “আমি প্রিন্সিপাল ইউসুফ সিরাজী”

মুস্তাকিন মাথা নাড়ল সামান্য, “সৈয়দ মুস্তাকিন মহান। ইনভেস্টিগেটর— পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) ডিপার্টমেন্ট।”প্রফেসর রশিদের সঙ্গে হাত মেলালেন। রশিদ নিজের পরিচয় দিলো, “রশিদ আলম। ইন্সপেক্টর অব থানা পুলিশ।”
প্রফেসর দুঃখ প্রকাশ করলেন, “কী যে হচ্ছে ভার্সিটিতে আজকাল! ছেলেমেয়েরা আতঙ্কিত, কারা এসব করেছে কে জানে..”
মুস্তাকিন কথার মাঝখানেই ফোন কানে ধরে অন্যদিকে চলে গেল। রশিদ প্রফেসর কথায় অনিচ্ছাকৃত ‘হু’, ‘হ্যাঁ’ ঘাঁড় নাড়াতে থাকল।

মুস্তাকিনকে দেখে হামজা উঠে দাঁড়িয়ে হ্যান্ডশেক করল। জয় কোনোমতো ফোন থেকে মাথা তুলল, “গুড জব, অফিসার!” মুস্তাকিন সামান্য হাসল অদ্ভুত ভঙ্গিতে, “থ্যাংক ইউ!” এরপর হুট করেই বলল, “লোকে আপনাদের দিকে আঙুল তুলছে, আপনাদের কী খেয়াল!”
হামজা হাসল, “আপনি তুলছেন না আঙুল? ”-“আমি আম জনতার থেকে খানিক আলাদা, বলা চলে নিজের পেশার খাতিরেই! প্রমাণ ছাড়া আঙুল তুললে চাকরি থাকবে না।” চোখ মারল হামজাকে মুস্তাকিন।

হামজা ছেলেদের চলে যেতে ইশারা করে। সালমা কাঁদছেন, জোরে জোরে কাঁদছেন বুক চাপড়ে, লোকের চাপা গুঞ্জন, আর পরিবেশে অভিশাপের কালশিটে ধোঁয়া ছড়িয়েছে যেন। জয় জবাব দিলো মুস্তাকিনের, “আপনার চাকরি ধরেন আমি রক্ষা করব, তাইলে আঙুল তুলে জেলে ভরবেন তো?”

মুস্তাকিন বসল দুজনের সামনে একটা চেয়ারে। সূর্যের তেজ ও আলো কমে উত্তরে হাওয়া এসে গায়ে লাগছে। কাধে ঝুলিয়ে রাখা ডেনিম জ্যাকেটটা গায়ে চড়িয়ে বলল, “আপনার শখ অথবা শাস্তি সহ্য করার কনফিডেন্স– কোনটা ধরব?”হামজা প্রসঙ্গ

বদলালো, “কিছু জিজ্ঞেস করতে চান, অফিসার?”

প্রফেসর সিরাজী এসে দাঁড়ালেন পাশে। মুস্তাকিন এবার সরাসরি কথায় এলো, “আপনারা আমাদের ডেকেছেন সকাল আটটার দিকে। তাহলে এখানে লাশ ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছিল ঠিক কখন, সে ব্যাপারে কোনো ধারণা আছে?”

হামজা মাথা নাড়ল, “তা জানে না কেউ-ই। আমাকে কল করা হয়েছে, তখনও আমি ঘুমে ছিলাম। ছেলেরা কল করে জানালো।”

জয়ের দিকে ফিরল মুস্তাকিন। জয় মাথা ঝাঁকালো, “ভাই আমারে জাগায়ে নিয়ে আসছে। আমি ঘুমাচ্ছিলাম।”

মুস্তাকিন জিজ্ঞেস করল, “আপনারা একসঙ্গে থাকেন?”

জয় মাথা নাড়ল, “উহু! এক বাড়িতে। এক ঘরে থাকতাম, লোক বদনাম করবে জন্য থাকা হয় না। বদনাম তো আর কম নাই এমনিতেই”হেসে ফেলল মুস্তাকিন। পরে নিজেকে সামলে বলল, “লাশ এক্স্যাক্টলি কোথায় ফেলা হয়েছিল সেই জায়গাটি দেখান আমাদের। সেটা তো দেখেছেন?”

বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন প্রাঙ্গনের পেছন দিকটা নির্জন, এবং গাছগাছালিতে ছাওয়া। সেখানে সচরাচর লোকের যাতায়াত অতটাও নেই। দিনের বেলা ছেলে-মেয়েরা আড্ডা দিতে নির্জন জায়গাটি বেছে নেয়। রাতে একদম সুনশান। ক্যাম্পাসের অফ-সাইড বলা চলে। সর্ব প্রথম লাশ দেখেছে ঝাড়ুদার। সে প্রথমে বুঝতে পেরেছিল না, ওটা লা শ। কোনোমতো ওড়নাটা জড়ানো ছিল লাশের দেহে। পরে কে বা কারা যেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এনেছে। এটা সকালে এসে থানা পুলিশের কাছ থেকেই শুনেছে সে।

মুস্তাকিন দেখল পুরো আশপাশটা। জয়কে বলল, “আপনার চোখে প্রচুর ঘুম, দেখছি! লালচে হয়ে আছে, রাতে ঘুমাননি মনে হচ্ছে! এখন একটু বিশ্রাম প্রয়োজন!”মুস্তাকিন কথাটা দ্বারা কিছু নির্দেশ করল। জয় চাদরটা গা থেকে খুলে গলায় পেঁচালো ওড়নার মতো করে। হেসে বলল,, “রাতে ঘুমানোর অভ্যাস এমনিতেও নাই আমার, ঘুম আসলে সকালে হয়নি বললে ঠিক হইতো আমার জন্য! সকালে টেনে তুলে আনা হইছে। আসলে আমাদের মতো নেতাকর্মীদের দুঃখ আর পরিশ্রম আপনারা কোনোদিন বুঝবেন না। জনতার মন রাখতে কত যে লোক দেখানো

ঢং করতে হয়! যেমন ধরেন, আমার আসতে ইচ্ছে করতেছিল না, কষ্ট হচ্ছেনা বিশেষ মেয়েটা বা তার পরিবারের জন্য। তবুও আসতে হলো, ইভেন ধর্না ধরে বসে থাকতে হচ্ছে হুদাই এইখানে নিরস মুখে। কার বাল লাড়তেছি বসে? মানুষ তো মরবেই, এই অবধারিত বিষয়ে এইসব ঢং কি মনে-ধোনে কোথাও সয়? তবু সওয়া লাগে, কারণ, তথাকথিত সমাজসেবক আমি। ফাক অফ দিজ ইনট্রোডাকশন!”-“আপনি মানছেন আপনি তথাকথিত সমাজসেবক?”

জয় চাদরটা গলা থেকে হাতে কব্জিতে জড়াতে জড়াতে বলল, “না মানার কী আছে?

আমি ভালো না, তা লোক জানে, আর তা কি আমি জানার আগেই? আমি জানছি, এরপর লোকরে জানাইছি, তখন নৃ লোক জানছে।''

মুস্তাকিন কিছুক্ষণ চুপচাপ চেয়ে থেকে জয়কে জিজ্ঞেস করে মুস্তাকিন, ''তাহলে আপনাকে সন্দেহের তালিকায় রাখব?''

-''উহু! এই কেইসে সাসপেক্ট হিসেবে থাকতে থাকতে উল্টাপাল্টা কিছু প্রমাণ হয়ে গেলে, ফাঁসি হয়ে যাবে, যেহেতু মেয়েটা মরে গেছে। এতো তাড়াতাড়ি মরে কী লাভ? মরব এইরকম কোনো কেইসের দায়েই, তবে একটু বয়সকালে। এখনও বিয়েশাদীই করি

নাই, বিশেষত বাসরটা.... এখন মরাটা ঠিক না। এটা থেকে বাদ রাখেন আমায়।”

মুস্তাকিন হামজাকে বলল, “কাউন্সিলর সাহেবকে একবার থানায় আসতে বলবেন বিকেলে। আপনি আসলেও পারেন।”হামজা পাঞ্জাবীর হাতার বোতাম খুলে তা কনুইয়ে গোটাতে গোটাতে বলল, “আমি আসতে পারব না, আব্বা যাবে। আমার ব্যস্ত সময় কাটছে— নির্বাচন এগিয়ে আসছে সামনে।”

মুস্তাকিন হাঁটতে হাঁটতে আবার পেছন ফিরে দেখল হামজাকে। পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছে চেয়ারটায়। মুখে চাপ-দাড়ি, পুরু ঠোঁটের ওপর ঘন গোফ, গায়ে জড়ানো

চাদরের প্রান্ত ঝুলছে একপাশে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেটে টান দিচ্ছে জয়।

জয় তাকিয়ে আছে একটা বোরকা পরা মেয়ের দিকে। মেয়েটির সাথে মুস্তাকিন ধাক্কা খেয়েছিল। মেয়েটা অপলক চেয়ে আছে আঁখির লা"শের দিকে।

লা"শকে ফ্রিজিং গাড়িতে তোলার ব্যবস্থা চলছে, মর্গ থেকে লোক এসেছে।ঢাকাতে আঁখির লাশ পাঠানো হলো ফরেন্সিক টেস্টের জন্য। তা মুস্তাকিন চেয়েছিল না। সে দিনাজপুরের এম আব্দুর রহিম মেডিকেলে পাঠাতে চাইছিল। ব্যবস্থাও করেছিল। সিনিয়র ইনচার্জ রাজী হননি।

আঁখির মা হাত মুস্তাকিনের হাত ধরে কান্নাকাটি করেছিলেন, “আমার মেয়েটার শরীলটারে আর কোনো শুয়োরের হাতে দিসনা, বাপ! আমারে মা মনে কইরা, আমার কথা রাখ! আমার বিচার লাগবো না। আমার আঁখির দেহডারে দে, বাড়ি নিয়া যাই!”এ কথা ফেলার মতো নয়। অথচ উপরমহল হুট করে সিদ্ধান্ত বদলেছে। এসব নতুন নয় এই লাইনে, তবে এর শেষ অবধি যেতে হলে তাকে সজাগ থাকতে হবে প্রতি পদে।

রাত আটটায় ডিআইজি স্যারের সাথে কথা বলে কার্যালয় থেকে বের হলো। টিমের সকলেরই খুব খাটুনি হবে এই মামলায়।

এখানে কোথাও না কোথাও অতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে রাজনৈতিক বিষয়াদী আর সমাজের উচু পর্যায়ের পদ্ধতিগত বলপ্রয়োগ! যার ঘাপলা খুলতে বেশ বেগ পেতে হবে তাদের।

রাস্তা পার হবার জন্য দাঁড়াল। ফোন বাজছে। ফোন জিনিসটা নেহাত বিরক্তিকর, বিশেষ করে যখন রিং হয়।

মায়ের কল! এখন পুরো দিনের ফিরিস্তি চাইবে। খাওয়া, গোসল, শরীরের যত্ন, বাড়ি ফেরার তারিখ! কল রিসিভ করল না। ক্লান্ত শরীর, ফ্লাটে ফিরে গোসল দিয়ে এরপর নিজেই একবার কল করে নেবে।বিকেলে

থানায় কাউন্সিলর হুমায়ুন পাটোয়ারী এসেছিলেন। মুস্তাকিন গিয়েছিল সেখানে। সে প্রশ্ন করল হুমায়ুন সাহেবকে, "আপনি ভিক্টিমের পরিবারকে জায়গা থেকে উচ্ছেদ করতে চাইলেন, এরপর তারা গেল না, তার মেয়ের সঙ্গে এমন কিছু ঘটল। সন্দেহ যদি আপনার ওপর যায়, তা নিয়ে বক্তব্য কী আপনার?"

হুমায়ুন পাটোয়ারী হাস্যজ্জ্বল কণ্ঠে জবাব দিয়েছেন, "উচ্ছেদ করা কোনো কঠিন কাজ না, মুস্তাকিন। আর এমনও নয় তা আমি পারতাম না। তাই এরকম একটা সহজ ব্যাপারে তার সঙ্গে এমন খারাপ কিছু করার

প্রশ্নও ওঠে না। তারা সময় চাইছে, আমি দিছি। না উঠলে উঠায়ে দিতাম, যেহেতু এইটা আমার কাজ। কিন্তু তাই বলে এমন কিছু..'' মুস্তাকিন ঠোঁট উল্টে ধীরে ঘাঁড় ঝাঁকাল, "আপনার প্রতিপক্ষ দল কে?''হুমায়ুন পাটোয়ারী পান খাওয়া দাঁত বের করে চমৎকার হাসলেন, "সহজ হিসাব। আগের বার যে মেম্বার ছিল এই এলাকার সে, আর এইবার যেহেতু আমি বা হামজা মেয়র পদপ্রার্থী হয়ে নির্বাচনে দাঁড়াব, তাইলে বর্তমান মেয়র সাহেবও বলা চলে আমার বিরোধী। সে কিন্তু আবার আমার বেয়াইয়ের ভাই লাগে!''

মুস্তাকিন আসলে বুঝতে পারছে না, এই কথার ওপর ভিত্তি করে তার এই দুটো লোককে সন্দেহের তালিকায় রাখা উচিত কি-না! হুমায়ুন পাটোয়ারী যা বোঝাতে চেয়েছে তা হলো, তারা হুমায়ুন পাটোয়ারীকে বদনাম করার জন্য আঁখির সাথে এই বিভৎস খেলায় মত্ত হতে পারে। আর কি কোনো সাসপেক্ট থাকতে পারেনা এই খু নের দায়ে! আঁখির পরিবারের সাথে একটা বিশদ আলোচনা দরকার। হতে পারে আরও কেউ কোনো সাহায্য করতে পারবে। কোমড় বেঁধে নামতে হবে। তার আগে ল্যাবটেস্টের রিপোর্ট চাই। আরও জিজ্ঞাসাবাদ করতে তথ্য প্রয়োজন,

যেটা ফরেন্সিক টেস্টের পর আসবে। দু'বার দুপাশে মাথাটা ঝাঁকি দিলো। গাড়ি চালাচ্ছে সহকারী মাহমুদ। হোটেল দেখে তাকে বলল, "গাড়ি থামান।"

মাহমুদ গাড়ি থামাল। মুস্তাকিন নেমে গিয়ে হালকা পাতলা কিছু খাবার কিনে নিলো। ফ্লাটে রান্না করার চাচিটা দু'দিন হলো আসে না। এখন মুস্তাকিনের রান্না করার এনার্জি নেই।

এপার্টমেন্টের গেইটে দেলোয়ার বলল, "স্যার, তোমার তো চিঠি আইছে গো।"দেলোয়ারের দুষ্টু হাসছে। মুস্তাকিনও হেসে ফেলল, "চিঠি শুধু প্রেমিকার কাছ থেকে আসে না।

আজকাল আর প্রেম চিঠিতে হয় না। উন্নত দুনিয়ার প্রেম হয় উন্নত উপায়ে, উন্নত ডিভাইসের মাধ্যমে হয়। হতে পারে দেখ, এটা আমার মৃত্যুর পরওয়ানা পাঠিয়েছে কোনো এক শুভাকাঙ্ক্ষী ভালোবেসে!''

দেলোয়ার দাঁত বের করে হাসল, “তোমারে আর কেডা মারার সাহস করবো? যত বড়ো একখান পিস্তল প্যান্টের ভিত্রে নিয়া ঘোরো! ''-“প্যান্টের ভেতরে পিস্তল? তাও আবার ওত বড়ো? তুই রাইফেল আর পিস্তলকে গুলিয়ে ফেলছিস মনে হচ্ছে! আর প্যান্টের ভেতরে পিস্তল রাখে কেমনে? কোথায় রাখে?''

মুস্তাকিনের বলার ভঙ্গি দেখে হো হো করে হেসে উঠল এবার দেলোয়ার।

মুস্তাকিন ঢুকে গেল ফ্লাটে। দরজা লাগিয়ে খাবার টেবিলের ওপর রেখে, চিঠি নিয়ে বসল। চিঠিটা রেখে দিলো পরিত্যক্ত হালে। বিশেষ আগ্রহ আসছে না তা নিয়ে। সে জানে কার চিঠি। ফ্রেস হয়ে এসে খোলার কথা ভেবে আবার কী মনে করে দায়সারা হাতে চিঠিটা খুলল। বেনামী চিঠি —

‘কী জানি পরিচয় দাও তুমি নিজের? ও হ্যাঁ! সৈয়দ মুস্তাকিন মহান, ইনভেস্টিগেটর অব পিবিআই ডিপার্টমেন্ট, না ?কেইস থেকে সরে যাও, অফিসার! তুমিও ভালো থাকো, আর

আমরাও! নয়ত তোমার এক পিস্তল কতক্ষণ কতভাবে রক্ষা করতে পারবে তোমার জান? যা করতেছ, তা জানের সওদা। হাতে তো পড়বাই। আর যদি সেরকম ইচ্ছা থাকে, তাইলে তোমার রুহুর জন্য মঙ্গল আর মরার পরে বেহশত কামনা করি।'

মুস্তাকিন চিরকুটটা হাতে মুড়ে ময়লার ঝুড়িতে ফেলল। শার্ট খুলে সোফাতে ছুঁড়ল। আরও মাথায় চেপে বসাচ্ছে এরা কেইসটা। এতক্ষণ তাও ঘুম ঘুম পাচ্ছিল একটু ক্লান্তিতে।মোড়ের ওপর রিক্সা থামিয়ে দিলো রিক্সাওয়ালা। অন্তূ বলল, "আর একটু এগিয়ে যাবেন না?"

-“না, আপা। রাস্তা খারাপ। চাকা আইঁটকে যায়। এইটুকুন পায়ে যান।”

রাস্তাটা ভাঙা। ক’দিন আগের বৃষ্টিতে পিচ ক্ষয়ে নিচু হয়ে যাওয়া স্থানগুলোতে পানি জমেছে। সামনেই ক্লাব ঘর। বাইরের দেয়ালে সেঁটে রাখা বিভিন্ন রাজনৈতিক পোস্টার, রঙ-বেরঙের কালিতে রাজনৈতিক সংগঠনের নাম-ধাম লেখা সব। সামনে রাস্তার ওপারে চায়ের দোকান-পাট। ক্লাব ঘরের সামনে লাল চেয়ার পাতা অনেকগুলো। বাঁশের স্ট্যান্ডের ওপর ক্যারাম বোর্ড রাখা। চেয়ারে দুয়েকজন বসে পা দোলাচ্ছে, সিগারেট টানছে, কেউ চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে।রাস্তার করুণ দশা।

কাউন্সিলরের ক্লাবঘরের সামনের রাস্তার এই হাল! অথচ সেই কাউন্সিলর আগামীতে মেয়র পদের প্রার্থী হয়ে বিভিন্ন সম্মেলনে কত কী করে দেবার অঙ্গীকার দিচ্ছেন জনতাদের! আজকালের মাঝে একটা বিশাল সম্মেলন আছে প্রাইমারী স্কুলের মাঠে। সেখানে নিশ্চয়ই হামজা, জয় জম্পেশ একটা করে বক্তব্য রাখবে! এদের জিহ্বা কয়টা? আর বিবেক এবং লজ্জাই বা কোন ফেরিওয়ালার কাছে বিক্রি করে বাদাম কিনে খেয়েছে! ভাবতে ভাবতে কাঁদায় এক পা গেড়ে গেল অন্তূর।

ক্লাবঘরের দিকে তাকাল না। থুতনি বুকে ঠেকিয়ে হেঁটে পার হলো। কালো বোরকা ও কালো ওড়নার নেকাবে মুখ ঢাকা তার। ক্লাবঘরের পাশেই সালমা খালার ছোটো বাড়িটা।

টিনের গেইটে আঙুলের টোকায় দু-তিনবার শব্দ করল। কিছুটা দেরি করে চাঁদনী গেইট খুলে দিলো। অন্তূ বলল, "ভয় পাবেন না, ভাবী। আমি খালার ভার্সিটির এক ছাত্রী। "চাঁদনী নির্লিপ্ত মুখে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে ভেতরে আসার ইশারা করল। টিনের চাল, টিনের বেড়া। তার সামনে একটা ইটের গাথুনিতে তোলা ঘর। মেঝে হয়নি, উপরে

শুধু টিনের ছাঁদ লাগানো হয়েছে, নিচের মেঝে কাঁচা, জানালা-দরজাও লাগানো হয়নি।

চাঁদনী অন্তূকে নিয়ে গিয়ে ঘরে বসাল।

পাশের ঘরে সালমা খালা নামাজে বসে কাঁদছেন। করুণ কান্না। অন্তূর বুক ভার হয়ে এলো। চাঁদনী নাস্তা আনতে উদ্যত হলে অন্তূ চাঁদনীর হাতটা চেপে ধরে বলল, “ভাবী প্লিজ! কোনো আনুষ্ঠানিকতা দেখিয়ে আমায় ছোটো করবেন না। আপনি বসুন, দু মিনিটি কথা বলি! সব মিটলে একদিন এসে নাস্তা করে যাব।”

চাঁদনী মানতে চায়না, অন্তূ জোর করে বসাল।

জীর্ণ একটা সেলোয়ার-কামিজ পরনে

চাঁদনীর। চুলের বেণী উলকো-খুশকো। মুখে মলিনতার ছাপ! দেখতে চরম সুন্দরী চাঁদনী। কালি পড়া ডাগর ডাগর চোখ, আর তা যেন রহস্যময়।-"নাম কী তোমার?"

-"অন্তূ বলে ডাকে সকলে।"

-"আমিও তাহলে তাই বলে ডাকব!" একটু হাসল চাঁদনী। হাসিটা অদ্ভুত, আর সুন্দর।

-"যদি আগেই চলে যেতেন এখান থেকে, তাহলে হয়ত আঁখির এই হাল হতো না বোধহয়।"

মলিন হাসল চাঁদনী প্রত্যুত্তরে, "বহুতদিন থেকেই ক্লাবের ছেলেদের নজরে পড়ছিল আঁখি, আঁখিরে খুব জ্বালাতো ওরা। যাওয়া,

আসার সময় আজেবাজে কথা বলতো।
একবার ক্লাবের একজন বাড়িতে আসছিল তার কোনো বড়ো ভাইয়ের সাথে আঁখির কুপ্রস্তাব নিয়ে। আম্মা তারে একটা খাপ্পড়ও দিছিল।"

অন্তূর জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করল, সেই বড়ো ভাইটা কি জয় আমির? আপনার কি সন্দেহ হয়না জয়ের ওপর? করল না প্রশ্নটা।-"আপনি যে টাকা ফেরত দিতে গেছিলেন মেম্বার সাহেবকে, তা দিয়ে অন্য কোথাও তো জায়গা কিনে চলে যেতে পারতেন!"

চাঁদনী হাসল আবার, কেমন যেন দেখাচ্ছিল চাঁদনীর হাসি, “তুমি ঘটনা লোকমুখে শুনছো তাই না?”

অন্তূ জবাব দিলো না। চাঁদনী বলল, “পুরাটা আর আসলটা শোনো নাই।”

-“এখন শুনি, আপনি বলুন।”

চাঁদনী তাকায় অন্তূর দিকে, “হু? আমি বলব? ”

অন্তূর চাঁদনীকে ভীষণ অন্যরকম লাগছিল। চাঁদনী বিছানার ওপরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কাপড়গুলো ভাজ করতে করতে বলল, “আমি বাপের বাড়ির পাওনা জায়গা আর বিয়ের

গয়না বেঁচে আমার ভাইরে সাথে নিয়ে মেম্বারের কাছে গেছিলাম টাকা ফেরত দিতে।

-"তারা নিলো না?"

-"টাকাগুলা দেখল আর মেম্বার সাহেব বলল, 'আচ্ছা! টাকা যখন যোগাড় করছো, নেয়া যাবে। আমি ওই হিন্দু লোকটার সাথে কথা বলে দেখি।'

-"এরপর?"

অন্যমনস্ক হলো চাঁদনী, "যেভাবে বলছিল, আমরা নিশ্চিত ছিলাম, টাকা নিবে, জায়গা ফেরত পাব।"

-"নিলো কি সেই টাকা?"

চাঁদনী খুব মনোযোগ দিয়ে কাপড় ভাঁজ করতে করতে বলল, “সেই রাতে বাড়িতে লুট হলো।” বলেই হাসল। কী যে অদ্ভুত নির্লিপ্ত শুনতে লাগল চাঁদনীর কথাটা!

কপাল জড়িয়ে ফেলল অন্তূ, “চেনেননি তাদের?”

চাঁদনী হাসিমুখে কাপড়গুলো একপাশে রেখে বলল, “তুমি কখনও ডাকাতি দেখোনি, না?”-“না, দেখিনি।”

-“ওরা মুখোশ পরে ছিল। আর চিনলেই বা কী? যাবার সময় অস্ত্র দেখায়ে খুব ভালো করে সাবধান করে গেল। আর আমরা

সাবধান হয়ে গেলাম। একবার সাবধান না হয়ে হারাই গেছে একটা।"

অন্তূর বুঝল না শেষ কথাটা। চাঁদনী কি আঁখির মেজো ভাইয়ের কথা বলছে? যে ক্যান্সারে মারা গেছে? এখানেও এক রহস্য রইল। চেয়ে রইল ক্ষণকাল চাঁদনীর নির্বিকার মুখটার দিকে। অসীম ধৈর্য্য আর বুঝ মেয়েটির। এমন নিম্নবিত্ত পরিবারে এতো শীতল মস্তিষ্কের একটা বউ! তার চোখের চাহনি, কথা বলার ধরণ, মুখের ভঙ্গিমা –সবই যেন অ-সাধারণ, একটুও সাধারণ নয়! সেদিন শাশুরিকে যেভাবে বুকে জড়িয়ে থামাচ্ছিল, সে এক বিরল দৃশ্য! আজও কেমন অনড়

শক্তিময়ী লাগছে এই মেয়েটাকে! প্রথম সাক্ষাতে কেমন নির্দ্বিধায় কথা বলছে ওর সঙ্গে! একটুও ইতস্তত বা অপ্রস্তুত নয় যেন! মার্জিয়া কি এমন হতে পারতো না? অন্তূ জিজ্ঞেস করল, "আপনি পড়ালেখা জানেন! "চোখ তুলে তাকায় চাঁদনী, "এসএসসি পাশ করছিলাম। মুখ খুললে না তুমি? দেখলাম না তো তোমায়!"

অন্তূ নেকাবটা খুলল অল্প একটু। বেজায় মায়াবতী দেখতে অন্তূ! সবচেয়ে বেশি মায়া লেপ্টে আছে ঘন পাপড়িওয়ালা চোখে, চোখের মণি কুচকুচে কালো, তাতে মুক্ত দানার ন্যায় ভাসছে আলোর প্রতিসরিত বিন্দুরেখা। এক

দেখায় আটকে যাবার মতো, সুন্দর মেয়েটা। কালো নেকাবের প্রান্ত এসে ঠেকেছে ফর্সা কপালটার ওপর, থুতনিটুকুও বের হয়নি। কালো পর্দার আবরণের ভেদে ঝিরঝিরে মোহময়ী চেহারা! চাঁদনী কিছুক্ষণ অন্তূর নত মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, "খুব সুন্দর তুমি।"

-"আপনার কাছে হেরে যাব!"

দুজনেই হাসল।

গেইটে শব্দ হলো। অন্তূ দ্রুত মুখে নেকাব পরে নিলো। সোহেল ঘরের দরজায় এসে থেমে গেল, তার চোখে-মুখে কৌতূহল। অন্তূ সোহেলের অপ্রস্তুত অবস্থা দেখে নিজেই

বলল, “ভাই, আমি অন্তূ! ভার্সিটিতে পড়ি। ভাবীর সঙ্গে এমনিই দেখা করতে এসেছিলাম। আপনি ভেতরে আসুন।”

সোহেল ঢুকল না, দু কদম পিছিয়ে হাত দিয়ে বাঁধা দেবার মতো করে বলল, “বসো তুমি। কথা কও, আমি পরে আসব। বসো, বসো!”

অন্তূর ভালো লাগছিল এই বাড়িতে! সে বলল, “আপনি আসুন, আমি বেরিয়েই যাচ্ছিলাম।”

অন্তূ গিয়ে কান্নারত অভাগী মায়ের পাশে মেঝেতে বসে পড়ল। হাতটা চেপে ধরে বলল, “চেনেন আমায়?”

চিনলেন সালমা অন্তূকে। ভার্সিটিতে কমনরুমে দেখেছেন বহুবার।

“আপনি এভাবে কাঁদছেন কেন? ক্লাবঘরেও পৌঁছাচ্ছে নিশ্চয়ই আপনার কান্নার স্বর! পৈশাচিক আনন্দ দিচ্ছে ওদের আপনার এই আর্তনাদ! নিজের দূর্বলতা অন্তত শত্রুর কাছে প্রকাশ করতে নেই।”

মুখে হাত চেপে কেঁদে উঠলেন সালমা।

অন্তূ বলল, “যখন কেউ কষ্ট দেবার লক্ষ্যে কষ্ট দেয়, তখন একদম উচিত নয়, কষ্ট পাওয়াটা তাদের দেখানো। হয় সেই পরিমাণ সেইভাবে ফিরিয়ে দিতে হয়, অথবা চুপ থাকতে হয়। অন্তত তাদের সামনে।”

সালমা খালা অন্তূর এই ভারী কথা বুঝলেন কিনা কে জানে! বললেন, "কিন্তু ওরা তো করে নাই কিছু!"

অন্তূ জানালার দিকে তাকিয়ে বলল, "নিজেকে সান্ত্বণা দিচ্ছেন?"সালমা কান্না সামলালেন, এরপর বললেন, "ওরা কিচ্ছু করে নাই, অন্তূ! কেডা করছে, আল্লাহ মাবুদ জানে! ওই পুলিশরা আমার বেটির লাশ দিতেছে না ক্যান! আবার কই নিয়া গেছে আমার বেটিরে! আমার বিচার লাগবো না। ওরা রাজনীতি করে, শক্তিশালী সব। আমার বিচার লাগবো না, কিচ্ছু লাগব না আমার। আমি চলে যাব এইখান থেইকা, বহুত দূরে যাব। আমার

মেয়েটারে ওই পুলিশ আবার জানি কই নিয়া গেছে!''

কথা ধরল অন্তূ, "কারা রাজনীতি করে? এই তো বললেন, ওরা কিছু করেনি!''

তার মনে হলো, সে বোধহয় টেনে হিঁচড়েই জয়কে এসবের পেছনে দাঁড় করাতে চাইছে! তার সঙ্গে সেদিন খারাপ আচরণ করেছিল বলে জয় বারবার অপরাধীর জায়গায় নজর আসছে। কিন্তু এটা ঠিক না। ভেতরের উকিল মস্তিষ্কটা ধমকালো অন্তূকে।ক্লাবঘর পার হওয়ার সময় আড়চোখে তাকাল সেদিকে। বুকে একটা চাপা উত্তেজনা কাজ করছে। তাকে চিনে ফেলার মতো কেউ যদি এখন

ক্লাবে থাকে, কোনো তামাশা না হয়ে যায় এখন। যদি জয়ই দেখে ফেলে! ক্লাবঘরের সামনে বড়ো পোস্টারে কাউন্সিলর হুমায়ুন পাটোয়ারীর ছবি টাঙানো। পাশেই আরেক পোস্টারে তার ছেলে হামজার ছবি। এবার ক্যারাম বোর্ডের সামনে ছেলেরা দাঁড়িয়ে আছে, এটা আড়চোখে নজরে এলো। আর ভুলেও তাকালো না সেদিকে।সন্ধ্যার বেশি বাকি নেই। দুনিয়াতে সর্বোচ্চ জঘন্য শব্দের মধ্যে সেরা জঘন্য শব্দ হলো, এলার্মের শব্দ। ঘুম ভাঙল জয়ের। ফোনের এলার্ম তখনও বাজছে। উপুড় হয়ে ছিল। চিৎ হয়ে বকলো, "স্যাঁটাভাঙা এলার্মঘড়ি। বালডা বাজতেই

আছে। সম্বন্ধির ছেলে ঘড়ি আমার, আমি উঠছি হে। এইবার অফ যা।"

ঘড়িটাকে ভাঙতে পারলে ভালো লাগতো। ভাঙল না। টাকার ঘা কলিজায়।

মুখে-চোখে পানি দিয়ে আসার পরেও ঝিমুনিটা ছাড়ছিল না। প্রথমে ঝুড়িতে, পরে একে একে সম্ভাব্য সকল আসবাবে কাঙ্ক্ষিত শার্টটা খুঁজল, পেল না। চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে, "মামি! ওও সতালো নানির মেয়ে..." কাজের মহিলাকে জিজ্ঞেস করল, "সেই শালির চেংরি কই?"

বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন শাহানা, "কী সমস্যা? ষাঁড়ের মতো গলা ফাঁড়তেছিস ক্যান? এই বাড়ির ব্যাটাছেলেদের জন্মগত বদরোগ এই!" জয় দাঁত খিঁচে উঠল, "আমার শার্ট ধোয়া হয়নি কোন সুখে? কার বালডা পরব আমি এখন?"

-"তোর শার্টের খুব আকাল হয়েছে? আলমারী খুললে ছোটোখাটো একটা শার্টের গোডাউনের খোঁজ পাওয়া যাবে, বাদর! সবসময় তোমার শার্টের পেছনেই তো দৌড়াই আমি, আর কোনো কাজ নেই বাড়িতে। অন্যটা পরে বের হওয়া যেত না?"জয় মুখ খুলতে গিয়েও নিয়ন্ত্রণ করল নিজেকে। তার মুখ খুললে বকা

ছাড়া কিছু আসার সম্ভাবনা নেই। মামিকে সামনাসামনি বকা ঠিক না। এরপর কথা বলতে গিয়ে ওই ক্ষ্যাপা স্বরই এলো, "তো একটা বের করে দাও সেই গোডাউন থেকে, পরে বের হই। তোমাদের মতো তো হুদাই ঘরে বসে থাকি না আমি। কাজ আছে, উঠতেই দেরি হয়ে গেছে, আবার শার্টের বাঁড়া নিয়ে রঙ্গ করতেছি আর আধঘন্টা!"তরু বেরিয়ে এসে দাঁড়াল সেন্টার রুমের একপাশে। জয় ওর দিকে ফিরল, কঠিন স্বরে আদেশ করল, "তরু! আরেহ সিস্টার, ইউ আর স্টিল জীবিত নাও? ভালোই হলো।

আমার একটা শার্ট বের করে দে। যা! কুইক!
"

জয়ের ঘরে ঢুকলেই পুরুষালি একটা গন্ধ পাওয়া যায়। মাতাল মাতাল লাগে তরুর! ঘরে বাস করা পুরুষটাই যখন সর্বক্ষণ ওর মাতাল হয়ে থাকার কারণ, এই ঘরটাও ওর কাছে বড়ো কাঙ্ক্ষিত। প্রতিদিন জয় উঠে বেরিয়ে যাবার পর সে পুরো ঘরটাকে পারলে নতুন করে উলোট-পালোট করে, আবার শুরু থেকে গোছায়, বেশিক্ষণ এই ঘরে অবস্থান করার লোভে। যতক্ষণ এখানে থাকবে, বুকের ভেতর কী যে এক শিরশিরানি নেচে বেড়ায়।

আলমারিটা খুলে খুঁজে খুঁজে একটা কালো-লালচে রঙা শার্ট বের করল। আবার দ্রুত ঢুকিয়ে হ্যাঙ্গারে বাঁধিয়ে রাখল। এই ঘরের প্রতিটা বিন্দু তার গোছানো।অবশেষে একটা চেক শার্ট বের করল । সেটাতেও মন লাগল না। ভুলভাল শার্ট নিয়ে গেলে, পছন্দ না হলে নিশ্চিত একটা জঘন্য ভাষায় গালি দিয়ে ছুঁড়ে ফেলবে শার্টটা জানালা দিয়ে।

একবার শার্ট ধোয়া হয়েছিল না, সবগুলো শার্ট বাথরুমে চুবিয়েছিল। পরে ক্লিনার এনে সেসব তুলে বাথরুম বাঁচানো হয়েছে। আবার নতুন শার্ট কিনতে হয়েছিল। না কেনা অবধি হামজার শার্ট পরতো।

একটা মিশ্র ছাই রঙা শার্ট দিলো জয়কে। জয়ের সব শার্ট বেনামী রঙের। নাম না জানা সব কালারের শার্ট বেছে বেছে কিনে আনে। এমনকি শার্ট যেটা কেনে সেটা দোকানে দাঁড়িয়েই গায়ে চড়িয়ে পরনেরটা ব্যাগে করে বাড়ি ফেরা লোক সে। পরেরদিন নতুন সেই শার্ট ধুয়ে, আয়রন করে আলমারিতে তোলা হয়। এরকম হাজারো পাগলাটে স্বভাবসমপন্ন, বদরাগী পুরুষটিকে কেন যে এতো ভালো লাগে মনে মনে তরুর? লোকে শুনলে নিশ্চয়ই বলবের রুচির দোষ আছে তরুর, নয়ত জয়ের মতো নোংরা স্বভাবের ছেলের প্রমে পড়া যায়না।জয় কিছু বলল না, চুপচাপ

শার্টটা পরল গায়ে। তরুকে দিয়েই পারফিউম আনিয়ে নিলো। এই ব্যাপারটা তরু কতটা উপভোগ করে, তা জানে না জয়! তার মন নেচে ওঠে যখন জয় ধমক দিয়ে এটা ওটা ঘর থেকে আনতে বলে তাকে। মনে হয় যেন সে ঘরনী জয়ের!

আজ পৌরসভা অফিসে বৈঠক ছিল। নির্বাচন কাছে। হামজা বলেছিল, ঠিক দুপুরের পর পৌরসভায় পৌঁছে যেতে। আগামী সপ্তাহের শুরুতেই বিশাল এক সম্মেলন নির্বাচন নিয়ে। সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা চলবে। জয় পৌরসভায় না গিয়ে গিয়েছিল পলাশের গাঙের পাড়ের বাড়িতে। সেখানে কিছুক্ষণ

আড্ডা দিয়ে, ক্লাবে গিয়ে ক্যারাম খেলেছে আধঘন্টার মতো, এরপর বাড়ি ফিরে ঘুম দিয়েছে সন্ধ্যা অবধি।

কবীর ড্রাইভিং করতে করতে জিজ্ঞেস করল, “ভাই, আমরা যাচ্ছি কই এখন?”

-“চেয়ারম্যান কাকা ডেকেছে।”কবীর দ্রুত ঘাঁড় ঘুরাল, “চেয়ারম্যান কাকা, আপনাকে ডাকছে? ক্যান?”

-“সম্পত্তির ভাগ লিখে দেবে। তোর কিছু চাই সেখান থেকে?”

বোকা হাসল কবীর, “না মানে! আপনারে ক্যান ডাকছে? উল্টাপাল্টা কিছু করবে না তো?”

-“উল্টাপাল্টা কিছু? বউ নাই নাকি চেয়ারম্যানের? আমায় কেন টার্গেট করবে?” হাসল কবীর। জয় বলল, “আয় তোর এই গেছো বাদরের মতো হাসির একটা ছবি তুলি। বাই এনি চান্স অকালে টপকে গেলে ছবিতে মালা চড়াবো।”ব্যাক ক্যামেরা অন করে কবীরের দিকে ধরল। হঠাৎ-ই একটা বোঝাই ট্রাক সামনে এসে পড়ল ওদের গাড়ির! গাড়ি চালানোর সময় এই মজা বোধহয় কাল হয়ে উঠল ওদের। কবীর প্রথমত নিয়ন্ত্রণ হারাল, দ্রুত স্টিটিয়ারিং ঘুরাল গাড়ি এক সাইডে নেবার জন্য। ততক্ষণে ডান পাশে আরেকটা গাড়ি এসে

পড়েছে। ওদিকে সরার জায়গা নেই। ওদের গাড়ি যে পজিশনে রয়েছে তাতে ট্রাক ওদের গাড়িকে পিষে সামনে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। ওপাশে চাপার জায়গা নেই। কয়েক সেকেণ্ড পাশের গাড়িটা আরও স্লো হয়ে ওদের পাশ আটকে চলল মনে হলো। জয় সবসময় খারাপ কিছুর জন্য প্রস্তুত। কবীরও হলো।কিচ্ছু করার নেই আর, ট্রাক ওদের সামনে খুব কাছে প্রায়। আচমকা পাশের গাড়িটা পাশ থেকে দ্রুত এগিয়ে গেল ওদের গাড়ি পার করে। সেদিক দিয়ে ট্রাকটা চলে গেল ওদের বাঁচিয়ে। ট্রাক চলে গেল নাকি কবীর নিপুন হাতে নিয়ন্ত্রণ করে নিলো,

বলা যায়না! সেকেণ্ড বিশেকের মধ্যে ঘটে গেছে পুরো ঘটনাটা।
জয় গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখল ট্রাকটাকে একবার। এখনও হৃদপিণ্ড ধরাস ধরাস করছে। জয় তাকে বকলো, “শালা, এত লাফাও ক্যান?”
বেশ কিছুক্ষণ পর পেছন থেকে সমনে ঘাঁড় ফেরালো। কবীরকে প্রশ্ন করল, “ট্রাকটা কার জানিস, কবীর?”ঝিরঝিরে বৃষ্টি নেমেছে বাইরে। হামজা এলো রাত এগারোটার দিকে। দোতলার সিঁড়িতে ছাতা বাঁধিয়ে রেখে ভেতরে ঢুকল। রিমি বসে ছিল স্বামীর অপেক্ষায়।

দোতলার সদর দরজা দিয়ে ঢুকতেই একপাশে ডাইনিং রুম, তার আরেক বিভাজনে বসার ঘর। রিমি উঠে এগিয়ে গেল স্বামীর দিকে, হামজার হাত থেকে ওয়ালেট, ফোন, এবং ভেজা হাতঘড়িটা নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এত দেরি হলো কেন? হাতে কী হয়েছে আপনার? ভিজেছেন কেন, ছাতা ছিল না সাথে?"

সাদা পাঞ্জাবীতে কাদার ছিটে। হামজা সব কথা এড়িয়ে তা ঝারতে ঝারতে বলল, "একটা গামছা দাও, আগে।"

রিমি বুঝল, কোনো কারণে মেজাজ থমকে আছে আপাতত লোকটার। বাকি সময় যে হৈ

হৈ করে তাও নয়। গামছায় মাথা মুছতে মুছতে তরুকে ডাকল হামজা, “তরু! এদিকে আয়!”

তরু বেরিয়ে এলো, “কী হয়েছে, বড়ভাই?

”-“তুলিকে ডাক!”

হাত মুখ ধুয়ে পাঞ্জাবীর বোতাম খুলতে খুলতে এগিয়ে গেল টেবিলের দিকে। রিমি রান্নাঘরে ছুটল। তরু ফিরে এসে, আস্তে করে বলল, “ভাই! আপু আসতে চাইছে না। খাবে না।”

-“তুই খেতে বস।”

শাহানা এসে রিমিকে ভাতের পাত্র আনতে ইশারা করে বসলেন হামজার পাশে।

বললেন, “ওই বাদর ফিরবে না? কত রাত হলো, বাড়ি ফেরে কখন সে?”

হামজা গামছায় মাথা মুছতে মুছতে বলল, “যখন ফেরে প্রতিদিন, তখনই ফিরবে। আপনি বসুন।”

-“তা ক্যান ফিরবে? তুই শাসন করার বদলে আশকারা দিয়েই দিন দিন বেয়ারা বানাইছিস ওরে!”

-“নির্বাচনের ঝামেলা এগিয়ে আসছে। এখন একটু ব্যস্তই থাকবে। এই নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করার কী আছে? জয় ছোট বাচ্চা না আম্মা। ওকে নিয়ে টেনশন করতে হবে কেন? আপনি বসুন। শরীর ভালো আপনার?”

-“ভালো।”ভাত তুলে দিলেন শাহানা হামজার প্লেটে। একটু নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, “নির্বাচন আসতেছে বুঝলাম। তোরা কী করতেছিস কিছুই মাথায় ঢুকতেছে না আমার। তোর বাপটা আবার আসবে কখন?” প্লেটে হাত নাড়তে নাড়তে বলল হামজা, “মাথায় না ঢুকে যদি ভালো থাকা যায়, তাহলে আর ঢুকানোর চেষ্টা করবেন না। লবন দিন। বাবা থানায় গেছে। চলে আসবে। ”

-“গেছে বুঝলাম। আসবে কখন?”

-“আপনাকে খেয়ে নিতে বললাম। ওষুধ খাবেন খেয়ে।”

হঠাৎ চমকে উঠলেন শাহানা, “থানায়? আবার থানায়? মাইয়া মরল তো মরল, আমার বাড়ির মানুষগুলারে ফ্যাসাদে ফেলে রেখে গেল!’ হামজা বিরক্ত হয়ে তাকাল, “আহ আম্মা! এই আলাপ কেন? বাবা যদি থানা-কাচারি না ঘুরবে, তো মেম্বার হয়েছে কেন? জনগণের সমস্যায় এগিয়ে যাওয়া বাবার কাজ, কাজ করছে সে। থানায় গেলেই তো আর গ্রেফতার হয়ে যাবেনা! আর গ্রেফতার হবেই বা কেন? ''এরপর গলা উঁচিয়ে রিমিকে ডাকল, “রিমি!” রিমি লেবু কেটে এনে দাঁড়াল। হামজার প্লেটে দুটো শশা ও লেবুর টুকরো তুলে দিলো। হামজার ভেজা চুলে আঁচল নেড়ে চুল মুছে

দিলো। পাঞ্জাবীর কলারটাও ভেজা। রিমি তা গুটিয়ে দিয়ে গিন্নির মতো চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। অসময়ের বৃষ্টিপাত! শীত চলে আসার পর বৃষ্টি নেমেছে আজ প্রকৃতিতে। আরও একটা ডিম তুলে দিলেন শাহানা ছেলের পাতে। হামজার ডিম খুব পছন্দ। মাঝেমধ্যেই প্রেশার হাই হয়ে যায় এই বয়সেই, তবু কোনো কিছুতে মান্যি করতে দেখা যায়না তাকে। হামজা খেতে খেতে রিমিকে বলল, “খেয়ে নাও। সবাইকে আলাদা আলাদা করে বলতে হবে?”

তরু বারবার পানি খাচ্ছিল। হামজা বলল, “এত ছটফট করছিস কেন? আরাম করে খা।”-“কোয়েল পাখি কাঁদছে, বড়ভাই।”

-“তুলি সামলাবে। তুই খা।”

শাহানা বললেন, রিমি, তুমি খাইতে বসো। তুলিকে জয় এসে খাওয়াবেনে।”

রিমি খেতে বসল না। এখন খেতে বসলে চলবে না। হামজা গোসল করবে, বিভিন্ন প্রয়োজনে দরকার হবে। বলল, “আপনারা খেয়ে নিন। আপনার ওষুধ খেতে হবে। আমি আর তুলি আপু পরে খেয়ে নেব। জয় ভাইয়া আসুক, সকলে একসাথে খাবো।”

খাওয়া শেষ করে গোসলে ঢুকল হামজা। রিমি লুঙ্গি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বাথরুমের আধখোলা দরজার বাইরে। হামজা লুঙ্গি পরে এসে বসল বিছানায়। চুল থেকে পানি পড়ছে এখনও, প্রতিদিন রাতদুপুরে গোসল করার প্রয়োজনীয়তাটা কী? ঠান্ডা লাগে না এই লোকের নাকি? বোঝে না রিমি। তামাটে গায়ের রঙে, পুরু চামড়ার হৃষ্ট-দেহি পুরুষটিকে দেখল চেয়ে ক্ষণকাল রিমি। কোনোদিন ভালোভাবে মাথা মুছে আসেনা। পরে রিমির মুছিয়ে দিতে হয়।

শুকনো তোয়ালে এনে মাথাটা ভালো করে মুছতে মুছতে বলল রিমি, "একটু যত্ন নিলে

কী হয় নিজের? এত উদাসীন কেন আপনি?"-"অত যত্ন করার কী? তুমি আছো তো করতে। বিয়ে করাদ একটু ফায়দা হোক।" কড়া চোখে তাকাল রিমি। হামজা কপালের ওপর টোকা মারল একটা। রিমি বলল, "হাত কেটেছে কী করে এখনও কিন্তু বলেননি! আবারও বলছি, নিজের খেয়াল রাখবেন।" হাতটা টেনে ধরে কোলে বসাল রিমিকে হামজা। শাড়ির লুটিয়ে পড়ে থাকা আঁচল কাধে তুলে দিয়ে, পেটসহ কোমড় জড়িয়ে ধরল। কপট চিবিয়ে বলল, "আমিই যদি আমার যত্ন নেব, তাহলে তোমাকে তুলে এনেছি কেন?"

রিমি মাথাটা নুইয়ে নিলো। গম্ভীর হলো হামজার মুখ, একহাত রিমির কোমড় থেকে সরিয়ে ফোন তুলে কাউকে কল করল। রিমি উঠে দাঁড়াল হামজার হাত ছাড়িয়ে। ভেজা মাথায় আরও দু একবার হাত বুলিয়ে স্যাভলন আর তুলা এনে বসল হামজার পাশে। হামজা ফোনটা বিছানায় ছুঁড়ে দিলো বিরক্ত হয়ে। রিমি তার হাতের ক্ষতটা পরিষ্কার করতে করতে বলল, "দেবর মশাই কল ধরছে না, তাই তো? আশাই বা রাখেন কেন? তার ফোন এখন কোথাও পড়ে আছে, সে হয়ত ফোন থেকে দূরে কোনো বিছানায় পড়ে আছে কারো সাথে!"হামজা ভ্রু কুঁচকে

তাকাল, “পুঁচকে মানুষ খুব বুঝতে শিখেছ এ বাড়ির ছেলেকে?”
-“এ বাড়ি, ও বাড়ি কী? ছোটো থেকে এসব দেখে বড়ো হয়েছি। না বুঝলেও বুঝতে হয়েছে। কে কী করছে কখন, কার স্বভাব কী! বিশেষ করে রাজনীতিবিদ আর নেতাদের চরিত্র ভালো হতে নেই বলেই জানি।”
-“তাই নাকি? তো আমার ব্যাপারে কী খেয়াল তোমার? আমি কেমন, তুমি ছাড়াও...”
হামজার হাতের ক্ষততে খামচে ধরল রিমি, “জানে মেরে ফেলব একদম! চেনেন তো আমার বাপ-ভাইদের! কেটে ছিঁড়ে খাওয়াব তাদের দিয়ে।”হামজা হেসে ফেলল। হাতের

দিকে তাকালো। যেই ক্ষততে মলম লাগাচ্ছিল এতক্ষণ সযত্নে, সেখানে খামচে ধরে আছে, রক্ত বের হচ্ছে নখের আচড়ে। হামজা কিচ্ছু বলল না, তার চোখে দুষ্টু হাসি খেলা করছে, তা খেয়াল করে দাঁত খিঁচে জিদের সাথে বলে উঠল রিমি, ‘‘আর জয় ভাইয়ার ব্যাপারে খুব ভালোই জানি।’’

রিমি জানে, হামজা জয়ের ব্যাপারে খারাপ কথা সহ্য করতে পারেনা। কাজ হলো ওর কথায়। হামজার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, ‘‘অন্য কোথাও তো থাকতে পারে, কোনো বিপদও হতে পারে!’’

-“তার আর কী বিপদ হবে? সে নিজেই একটা আস্ত বিপদ মানুষের জন্য, বিশেষ করে মেয়ে মানুষের জন্য!”

জয়ের ব্যাপারে রিমির এসব ত্যাড়ছা উক্তি শুনতে ভালো লাগছিল না হামজার। গম্ভীর হলো, “তোমার ওপর কোনোদিন খারাপ নজর দিয়েছে?”-“না, তা দেয়নি..”

-“তাহলে?”

রিমি তাকাল হামজার কঠিন হয়ে আসা মুখটার দিকে। হাতে এন্টিসেপটিক লাগানো শেষ করে উঠে দাঁড়াল। হামজা বলল, “জয় দুষ্টু, বেপরোয়া, অসভ্য, সেসব সত্যি। কিন্তু মিথ্যাবাদী বা বিশ্বাসঘাতক নয়। জানো তো!”

রিমি কথা বলল না। হামজা হাত ধরে টেনে এনে পাশে বসালো ওকে। এরপর চট করে পা টান করে শুয়ে পড়ল রিমির কোলে মাথা রেখে। চোখ বুজে বলল, “কথা বলছো না কেন?”

-“আমার চেয়ে জয় ভাইয়া বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনার কাছে, তা জানি। কিন্তু কেন?”

হামজা চুপচাপ শুয়ে রয় চোখ বুজে। জবাব না পেয়ে রিমি জিজ্ঞেস করল, “হাত কেটেছে কীভাবে?”-“দেয়ালে ঠেস লেগেছিল।”

-“দেয়ালে ঠেস লাগলে এভাবে কাটে না হাত।”

ভ্রু উঁচিয়ে তাকাল হামজা, “হুঁশিয়ারী করছো আমার সঙ্গে? ইন্টারেস্টিং! তো বলো দেয়ালে ঠেস লাগলে কীভাবে কাটে হাত?”

-“তা জানিনা। তবে মানুষ অথবা লোহা পেটাতে গিয়ে এভাবে হাত কাটে, সেটা জানি। কী পিটিয়ে এলেন?”

-“আমার পেশা দুটোই।”

-“পেটানো! হাহ!”

-“নতুন কী? আমি তো ভদ্রলোক নই, রিমি। ”রিমি খানিক মাথা ঝুঁকালো নিচের দিকে, হামজার চাপ দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে ধীর কণ্ঠে বলল, “ক’দিন বাদে আপনি হবেন মেয়র, এরপর মেম্বার অব পার্লামেন্ট। আমি

হব তার ঘরনী। আব্বু বলতো, রাজনীতিবিদের বউদের বড়ো রাজনীতিবিদ হতে হয়, তবেই না চলবে সংসার! জানেন! আপনার মতো এমন রাক্ষুসে লোকের সাথে আব্বু আমার বিয়ে দিতে কোনোভাবেই রাজী ছিল না! আমি বললাম, বিয়ে করলে এই রাবনটাকেই করব।''

হামজা খপ করে রিমির হাতটা ধরে ফেলল, আরও শক্ত করে কোল চেপে শুয়ে বলল, "কেন তোমার মতো পুচকে রাবনকে বিয়ে করতে চাইল? ভয় করল না তোমার, যদি খেয়ে ফেলি?''

নিঃশব্দে হাসল রিমি। হামজা একেবারে পেচিয়ে ধরে ফেলার আগেই একলাফে গা ঝেরে উঠে সরে দাঁড়াল। হামজা আধশোয়া হয়ে বসে বলল, "রিমি! দরজা আটকে দিয়ে এসো!"-"পারব না।"

হামজা একটা মোটা বই তুলে নিলো হাতে। এখন অভ্যাসবশত চশমা চোখে এঁটে ভারী বইখানা পড়তে বসার কথা। তা না করে ধমক দিলো, "আমি উঠে গিয়ে ধরলে কাল সকালে তোমার খবর 'আমাদের সময়' পত্রিকায় বের হবে, আমাকে টলারেট করতে পারবেনা কিন্তু! অবাধ্যতা পছন্দ না আমার।"

নাক কুঁচকাল রিমি, “ছিহ! কী মুখের ভাষা! আমি আপনার পার্টির মেম্বার না, বউ আপনার! আপনার পছন্দ অপছন্দ আমার কাছে চলবে না।”

হামজা বই রেখে ফোন হাতে নিয়ে বালিশ খাঁড়া করে তাতে পিঠ হেলান দিয়ে বসল। ফোন কানে ধরে রিমির উদ্দেশ্যে বলল, “পালাতে পারবে নাকি?”ওপাশ থেকে কল রিসিভ করল জয়, “হ্যাঁ, সাহেব!”

-“কোথায় তুই? রাত বাজে কয়টা?”

-“দেরি হবে আসতে। ক্লাবে আছি।”

-“ক্লাবে কী করছিস?”

-“ক্যারাম খেলছি।।”

-“ঢকঢক করে গিলছে কে?”

-“আমার নাম জয়। ভদ্রনাম–জয় আমির।”

-“জেনে আনন্দিত ও উপকৃত হলাম।”

-“সাহেব, আপনি বাসায় গেলেন কখন? মামা এসেছে বাসায়?”রিমি এসে কাছে দাঁড়াতেই এক হেচকা টান দিয়ে ফেলে দিলো বিছানায় ওকে। দাড়ি-গোফের মুখটা গলায় ঠেকাল। একহাতে রিমিকে শক্ত করে বিছানার সাথে চেপে ধরে রেখে, অপর হাতে ফোন কানে ধরে বলল, “আসেনি এখনও! তাড়াতাড়ি বাড়ি আয়। দুপুরের পর পৌরসভায় কাজ ছিল, যাসনি। আমার হাতে থাপ্পড় খাসনি বহুদিন!

ঘন্টাখানেকের মধ্যে বাড়িতে পা পড়ে যেন! নয়ত থাপড়ে ত্যাড়ামি সোজা করে দেব।"
কলটা কেটে দিলো জয়। হামজা রিমির দিকে তাকিয়ে বলল, "স্বামীর খেদমতে গাফলতি করতে নেই, জানো না? এই অবাধ্যতা মেনে নেব না আমি।"
রিমি হামজার খোলা পিঠ খামচে ধরল, "জয়কে এতো প্রশয় কেন দেন আপনি? ওকে খারাপ করার পেছনে শতভাগ হাত আপনার রয়েছে। এটা কি ওর ভালো চাওয়া, নাকি ওকে ধ্বংস করা?"
হামজা রিমির ঠোঁটের এক কিনারে আলতো একটা চুমু খেয়ে বলল, "ধ্বংস আর সৃষ্টির

মাঝে যে দেয়ালটা, তা খুব মসৃণ, রিমি! বলতে পারো, মুদ্রার এপিট-ওপিঠ। পদার্থ একই, শুধু পাশ বিপরীত। জয় স্বাধীনচেতা ছেলে, ও জীবনকে যেভাবে ইনজয় করতে চাচ্ছে, আমি ওকে সেভাবে চলতে বলিনি। ও যা করে, শুধু বাঁধা দিতে ইচ্ছে হয়না ওর কোনো কিছুতে। দেখোনা, ও যখন শব্দ করে হাসে, দেখতে আর শুনতে কী চমৎকার লাগে! তার চেয়েও বড়ো কথা, দিনশেষে আমি শুদ্ধ নই।''সকাল সাতটা বাজল অন্তূর ঘুম থেকে উঠতে। ফাইনাল এক্সাম কাছে এগিয়ে আসছে, রাত জেগে পড়তে হয়। মাঝেমধ্যেই অন্তূর ইচ্ছে করে, একরাতে যদি

অনার্সের এই চার বছর শেষ হয়ে যেত, আর সে আইন বিভাগে ভর্তি হয়ে যেত স্নাতক করতে! তার কিছুদিন পর উকিলের ওই সাদা-কালো পোশাকটা গায়ে চড়াতে পারতো! দ্রুত অযু করে এসে ফজরের নামাজে বসল। আম্মা উঠেছে, রান্নাঘর থেকে ঠুকঠাক আওয়াজ আসছে।

বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। বড়ো বড়ো কচুরিপানা জন্মেছে পুকুরে। আজ আর ডাহুক পাখির দেখা পেল না। গ্রিল ধরে দাঁড়াল। মাথায় সারাটা প্যাচ কাটে আজকাল। সকাল থেকে শুরু হয়, গভীর রাতেও শেষ হবার

নাম নেয় না। আব্বুর কাছে গতরাতে জিজ্ঞেস করেছিল অন্তূ, হামজা পাটোয়ারীর ব্যাপারে। হামজা ভার্সিটির ছাত্রলীগ সংগঠনের নেতাকর্মী। তার অনেক উন্নয়নমূলক কাজের নজির আছে জেলায়! বাপের কাউন্সিলর হবার পেছনে তার বিশেষত্ব রয়েছে। তার বাপকে কেউ ভোট দিতো না কোনোকালে, তার বদৌলতে ভোট পেয়ে কাউন্সিলর হয়েছেন হুমায়ুন পাটোয়ারী।হামজা চতুর এবং বাহ্যিক নিখুঁত চলনের এক তরুণ রাজনীতিবিদ। সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষের কাছে তার নাম ভগবানের মতোই, তারা জপে বেলায় বেলায়! আবার তরুণদের কাছেও বেশ সমাদৃত! তবুও

কোথাও যেন ঘাপলা রয়ে গেছে তার মাঝে! ক্ষমতার নেশা নেশার পিছনে খুব ক্ষিপ্রগতিতে ছুটছে হামজা। এবার বাবাকে কাউন্সিলর পদ থেকে সরিয়েছে। চাইলে হুমায়ুন পাটোয়ারী আবারও কাউন্সিলর এবং নিজে মেয়র হতে পারতো। জেলার দুই সমাজসেবক নেতাকর্মী পাটোয়ারী পরিবারেই থাকতো। তা করেনি হামজা। এখানেই হামজাকে চতুর এবং ক্ষুরধার এক রাজনীতিবিদ বলার সুযোগটা আসে।সে যা নাম কামিয়েছে জনসাধারণের কাছে, তা থেকে অনায়াসে বাপ-ছেলে পদপ্রার্থী হলে জিতে যেত দুজনেই।কিন্তু সে এখানে মানুষের মাঝে একটা কৃতজ্ঞতাবোধের

জায়গা রেখেছে যে, হামজা সুযোগ এবং ক্ষমতা থাকতেও তা কাজে লাগিয়ে পদ নেয়নি। বরং সে শুধুই সমাজসেবকের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হতে চায়।

কথাগুলো শুনে অন্তূর মনে হলো, নিঃসন্দেহে হামজা রাজনীতিবিদ হিসেবে চরম ধূর্ত চাল-চলনসম্পন্ন। তাহলে মানুষ হিসেবে কেমন? এটাও নিশ্চিত প্রায়, হামজা জিতে যাবে এবার। অন্তূকে আব্বুকে জিজ্ঞেস করল, "এরপর সরাসরি সংসদ নির্বাচন করবে তাই তো?"

আমজাদ সাহেব হাসলেন, "তাই তো করার কথা। মশারী টাঙিয়ে দিয়ে আয় তো আমার

ঘরে। প্রেশারের ওষুধ খেয়েছি, ঘুম আসছে।
"সে এতদিন যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছে, সেখানে মনে হয়েছিল ওই পরিবারকে তার মতোই সবাই ঘৃণা করে। এখন মনে হচ্ছে, শুধু মাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ ওই পরিবারকে দোষারোপ অবধি করবেনা। অর্থাৎ, আঁখির পরিবার দ্বিধায় রয়েছে, সাথে সেও। সে ঝুলে আছে জয়ের পক্ষ থেকে আসা সম্ভাব্য একশনের জন্য। আবার মনে হচ্ছে, জয় কিছুই করবেনা। করলে করতো তো!
হামজা বিয়ে করল, মেয়র সাহেবের ছোটো ভাইয়ের মেয়ে রিমি আহসানকে। মেয়রের

ভাই ফারুক আহসানের সঙ্গে কীসের এক আলোচনা বেঠকে গিয়ে প্রথম দেখেই রিমিকে পছন্দ হয়েছিল। তরুণ নেতাকর্মী হিসেবে ভালো নাম এবং প্রতিপত্তি তো কামিয়েছে হামজা এই বয়সেই।তার নাম খারাপ করার জন্য আছে একজন, যাকে সে খুব যত্নে পালছে— জয় আমির। হামজার ফুফাতো ভাই। জয়ের বেপরোয়া কার্যক্রম সকলের কমবেশি জানা। তবুও সে ভার্সিটির ছাত্রদলের লিডার। কেন, কীভাবে এটাও ভাবার বিষয়! তা যদি ছাত্রদের কাছে জিজ্ঞেস করা যায়, তারা সমস্বরে স্বীকার করবে, তাদের নেতাকর্মীকে খুব পছন্দ তাদের! জয় ভালো

লিডার তাদের। তার চঞ্চলতা এবং দুষ্টুমি ছাড়া আর কিছু একটা অবর্ণনীয় রয়েছে, যেটা আকর্ষণীয়। দায়িত্বজ্ঞানহীন বলা চলে না। রাজনৈতিক কাজকর্মে যেমন ষোলো আনা, দুষ্টু কাজেও সে ব্যাপক পারদর্শী।সামনেই পৌরসভা নির্বাচন আসছে। বাপের বদলে হামজা নির্বাচনে অংশ নেবে, এই রব মুখে মুখে উঠে গেছে। সরাসরি ছাত্রনেতা থেকে সাংসদ নির্বাচনের বিষয়ে বিভিন্ন জনরব ছড়িয়েছিল তার নামে। চতুর হামজা এতো তাড়াতাড়ি এতদূর উড়ার মতো বোকামি করবে না। সংসদ নির্বাচনকে হাতে রেখে আপাতত সে এবারের মেয়র পদপ্রার্থী।অন্তূর

রাজনৈতিক বিষয়াদিতে আগ্রহ ও বিদ্বেষ দুটোই সমান। সাথে রয়েছে সমাজ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা। নিজের নামের সামনে যেকোনো মূল্যে অ্যাডভোকেট যুক্ত করার প্রয়াসে দৌঁড়ে চলেছে সে। তার জন্য তার সমাজ, রাষ্ট্র, অপরাধ, কূটনীতি, রাজনীতি, সুনীতি, দূর্নীতি—সব জানা চাই, সব।

কাউন্সিলর সাহেব চাঁদনীকে বলেছিলেন, টাকা নেবেন। সেদিন রাতেই সেই টাকা কেউ বা কারা এসে লুটে নিয়ে গেল। এর মধ্যে কাউন্সিলর এবং তার ছেলে হামজার হাত থাকাটা অসম্ভব নয়। তবে, কেউ যদি নিজের আবাস ছেড়ে উঠতে না চায়, টাকা দিয়ে

বিক্রিত বাসভূমি ফেরত নিতে চায়, তাহলে তার বিনিময়ে এত জঘন্য প্রতিদান কোনো সুস্থ মানুষ দেবে না। হুমকি দিতে পারতো, তুলে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখে শর্ত দিতে পারতো! অথচ অমানুষিক বর্বরতা একটা মেয়ের সাথে! আসলে ঘটনা কী?গেইট দিয়ে সরাসরি ঢুকে সমাজবিজ্ঞান বিভাগটা পড়ে একপাশে একটু ভেতরে। গাছপালায় ছেয়ে আছে বিল্ডিংয়ের আশপাশের চত্বরটা। কেউ একজন পেছনে এসে খুব কাছে দাঁড়িয়ে তার নাম ধরে এমনভাবে ডাকল, যেন বহুদূর থেকে গলা উঁচিয়ে ডাকছে। ম্যান

পারফিউমের কড়া গন্ধটা! চমকে উঠে ছিটকে দূরে সরিয়ে দাঁড়াল অন্তূ, “আরমিণ!”

ডাকটা শুনতে এমন লাগছে যেন বহুকালের পরিচিত, এবং ডেকে অভ্যস্ত জয়! অন্তূ নির্বাক চোখে চেয়ে দেখল। খুব কাছে এসে দাঁড়াল জয়, “কুত্তা দেখে ভয় পাও দেখছি, সিস্টার! চ্যাহ! আমি কাহিনি ঠিক বুঝলাম না। একদিন কুকুরকে সিনিয়রের সংজ্ঞা শেখাও, আরেকদিন ভয়ে কুঁকড়ে যাও, ব্যাপার কী?”

অন্তূ জবাব দিলো না। জয় ঘাঁড় বাঁকা করে দেখল অন্তূকে। যেন ওর মুখে খুব মনোযোগ দিয়ে কিছু খুঁজছে।-“জবাব দিচ্ছ না কেন?”

-“ইচ্ছে করছে না।”

জয় বুকের ডান পাশে হাত চাপলো, “ঠুকছো ডিয়ার। উফফফ, পেইন!”
কবীর কানে কানে বলল, “ভাই, হৃদপিণ্ড বামে থাকে।”
-“আমরাটা বিশাল বড় হে শালা। ডান-বামে ছড়ায়ে-ছিটায়ে একাকার। চুপ থাক।”
কবীর কপাল ঠুকলো।অন্তূর মুখের ওপর নজর আটকে হেসে ফেলল চট করে জয়, “জানো! আমি সিংহ বা বাঘ নই! খপ করে থাবা দিয়ে শিকার ধরি না, কারণ আমি বাহাদুর না! তোমার ভাষ্যমতে কুকুর আমি। কুকুরের অনেকগুলো স্পেসিফিক স্বভাব থাকে! তার মধ্যে একটা হলো, ছ্যাঁচড়ামি।

আমি কুকুরের সেই স্বভাবের অনুসারী। কৌশলে ধীরে সুস্থে নির্লজ্জতার সাথে ধরব তোমায়, তুমি ঝরঝর করে ঝরে পড়বে। বুঝতে পারিচো?''

অন্তূর বুকটা কাঁপল। জয়ের মুখের নির্বিকার ওই হাসি গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। শান্ত, স্বাভাবিক স্বরে বলছে কথাগুলো! লোকে জয়কে পাশ কাটাচ্ছে, সালাম ঠুকছে, কেউ হাত মেলাচ্ছে।

-"আমার এলাকায় গেছিলে কেন সেদিন?

''যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে সন্ধ্যা হয়।

এবারেও জবাব দিলো না অন্তূ। জয় অন্তূর দিকে ফিরল, "কেন গেছিলে?''

অন্তূ কথা বলল না। সুন্দর দৃষ্টি মেলে তাকাল জয়। সুন্দর করে বলল, "ইচ্ছে করছে একটানে তোর নেকাবটা খুলে ছিঁড়ে ফেলি, শালী। ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিতে খুব কাঁচা আমি। কেন গেছিলি ওইদিকে?"

ধৈর্যতে মানল না জয়ের কথাটা। এত আত্মমর্যাদাহীন হওয়ার সাহস নেই অন্তূর। নিজের ধিক্কারে মরে যাবে সে।

-"গেছিলাম। কী করবেন? ফাঁসি দেবেন? অথবা রেস্ট্রিকশন দেবেন, আমি কী কী করতে পারব, না পারব?"

কেমন করে যেন হেসে ফেলল জয়, "ছিহ!
তা দেব কেন? জিজ্ঞেস করছি কেন গিছিলে?
রেগে যাচ্ছ কেন?"

জয়ের হাসিতে গা শিউরে উঠল অন্তূর।

ক্যাম্পাস ভর্তি লোক, বেইজ্জতমূলক কিছু না ঘটুক, তা সামলাতে এতক্ষণ চুপ ছিল। এবার আর হলো না। অন্তূ বলল, "ঘুরে দেখতে গেছিলাম।"-"ভিক্টিমের বাড়ি?"

অন্তূ হাসল, "এবার সন্দেহ গাঢ় হচ্ছে আপনাদের ওপর।"

হতাশাজনক শ্বাস ফেলল জয়, "হাহ! ইনভেস্টিগেশনে নেমেছ তাহলে! তাতে তোমার প্রোফিট কী? আর আমাকেই বা দোষী

করতে চাইছ কোন সুখে? আচ্ছা বাদ দাও সেসব। বলো, সন্দেহ সত্য হলে কী করবে?''

-"কিছুই করার নেই?''

-"নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু কী করার আছে?''

অন্তূ দৃঢ় চোখে চেয়ে বলল, "সৃষ্টিকর্তাকে ভয় করুন, তিনি ছেড়ে দেন না।''

জয় মাথার উপরে হাত তুলে আলস্য ভঙ্গিতে বলল, "ধরেও তো না! আছে তো সৃষ্টিকর্তা, না!''

অন্তূর মুখটা কুঁচকে এলো ঘৃণায়, "তিনি ধরলে আর পালানোর পথ পাবেন না।''জয় হাসল, "আচ্ছা আচ্ছা! সেরকম সৃষ্টিকর্তা টাইপের কিছু থাকলে তাকে বলো দ্রুত

আমায় ধরতে। পুলিশই ধরুক অন্তত। বেশিদিন পুলিশের সাথে রেষারেষি না থাকলে নিজেকে খুব দূর্বল লাগে! তুমি প্লিজ কিছু একটা করো, যাতে আমাকে পুলিশ ধরে। আর তুমি নিজের চেয়ে বেশি আমার চিন্তা করছো, প্রেমে পড়েছ আমার?''

অন্তূ কিছুক্ষণ চুপচাপ চেয়ে রইল জয়ের চেহারার দিকে। গোল বা লম্বা আখ্যা দেয়া যায়না চেহারাকে। ফর্সা বা কালোও নয়, শ্যামলাও নয়! তামাটে ইট রঙা চেহারা। নাকটা সরু, হাসিটা অদ্ভুত, জড়ানো। পরনে সাদা ধবধবে লুঙ্গি। পায়ে চাড়ার বেল্টওয়ালা স্যান্ডেল। তার বেল্ট আটকায়না কখনও জয়।

গলায় চেইন ঝুলছে, তাতে ইংরেজি ‘J’ লেটার লকেট হিসেবে রয়েছে। বাম হাতে আজ রিস্টলেটের বদলে একটা রূপালি বালা, ডানহাতে ঘড়ি পরেছে। কী বিশ্রী অদ্ভুত! চুলগুলো ফেঞ্চকাট, সুবিন্যস্ত।অথচ জয়ের আজব মুগ্ধ হবার মতো চেহারা এবং গড়নে অন্তূর ঘেন্না উতলে এলো। বলল, “কী করবেন আপনি আমার? কী করেছি আমি? কীসের নোংরা খেলায় মত্ত হবার পরিকল্পনা নিয়ে বসে আছেন?”

জয় হেসে ফেলল, “ভয় পাচ্ছ, আরমিণ?”

-“জি পাচ্ছি।”

-"কেন কেন?"-"ভয় পাওয়া উচিত। আপনার মতো নোংরা মানসিকতার মানুষের কাছে একটা মেয়ে ভয় না পেলে চলবে কেন?" জয় শান্ত স্বরে বলল, "তুমি এসেছ আমায় খুলতে, আমি গেছিলাম না আমার রঙ দেখাতে তোমার কাছে। সেদিন আমার দেয়া সিগারেট তুমি পায়ে পিষে চলে গেলে? যাক, ধরো নির্বাচনের ঝামেলায় সেটা নাহয় ভুলে যেতাম। তুমি কাল গেছিলে ওই বাড়িতে। কেন? আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ জোগাড় করতে?
"

-“শিক্ষিত মানুষ মূর্খের মতো অযৌক্তিক কথা বলবেন না, বেমানান লাগে। খারাপ লেগেছিল পরিবারটার জন্য, দেখতে গেছিলাম মাত্র।”

-“এইজন্যই কয়, মাগী মাইনষের নাই বারো হাত কাপড়ের কাছা। বোঝেনা বাল, ছিঁড়তে যায় ডাব গাছের ছাল।”

অন্তূ অস্বস্তিতে একটু চেঁচিয়ে উঠল, “রহস্য করবেন না। সোজা করে বলুন, কাহিনী কী?”

জয় আশপাশে তাকিয়ে বলল, “গলার আওয়াজ উচু যেন না হয়, খেয়াল রেখো।” পা দিয়ে মাটিতে থাবা দিয়ে ইশারা করল, “এই মাঠে কবর দিয়ে দেব একদম! আরমিণ, তুমি বলো, তুমি কী চাও? আমার

বিপরীতে খেলে পারবে, তুমি?''রাতে সবাই শুয়ে পড়লে অন্তূ পড়ার টেবিলে বসল। পড়ায় মনোযোগ পাচ্ছিল না। নানান চিন্তা।
দরজায় ধাক্কা পড়ল। ধাক্কাটা কার বুঝল অন্তূ। দীর্ঘশ্বাস ফেলে দরজার খুলল। মার্জিয়া ভেতরে এসে অন্তূকে জিজ্ঞেস করল,
“পড়ালেখার কী খবর তোমার?''
-“ভালোই। বসুন আপনি।''
বসল মার্জিয়া, খুব আন্তরিক স্বরে বলল,
“শোনো, তুমিও তো আমার বোনের মতোই! তুমি আমায় যতটা পর ভাবো, আমি কি আসলেই অতটা খারাপ?''-“জি না, অতটা খারাপ না।''

-“তার মানে একটু খারাপ?” একটু হাসল মার্জিয়া।

অন্তূ বিছানায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বইপত্র তুলে নিয়ে গিয়ে টেবিলে সাজাতে সাজাতে বলল, “কী বলতে এসেছেন?”

-“এমনি আসতে পারি না?”

-“অবশ্যই পারেন। তবে এমনি আসেননি।”

-“তোমার তো অনার্স সেকেন্ড ইয়ার শেষের দিক। তোমার প্রতি একটা দায়িত্ব আছে তো নাকি?

-“আছে তো।”

-“তোমাকে এসে আমার ছোটো বোনের মতো পেয়েছি, সেই হিসেবে তোমার ভবিষ্যত নিয়ে ভাবার অধিকার আছে না?-“জি, আছে।”
-“তুমি নিজে এখন তো একটু ভাবতে পারো..”
-“জি ভাবছি। ভাবছি আমি বিয়েশাদীর কথা। মনের মতো পেলে বিয়ে করে নেব। আপনি এতো টেনশন করবেন না, ভাবী।”
মার্জিয়া এক পলকের ব্যবধানে চেতে উঠল, “তোমার মনের মতোন ছেলে ফ্যাক্টরিতে অর্ডার দিয়ে বানায়ে আনি, কী বলো? তোমার মনের মতো কোনো ছেলেও আছে এই আল্লাহর দুনিয়ায়?”

অন্তূ একটাও কথা বলল না। বই গোছাতে থাকল।

-“কীরকম চাও তুমি? যে তোমার এইসব কটকটে শক্ত কথা মেনে, বিলাইয়ের মতোন তোমার পিছপিছ চলবে এইরকম চাও তো তুমি! তোমার মতো মেয়েকে কোনোদিন কেউ বিয়ে করে নিয়ে বাড়ি তুলবে না। ছেলে মানুষ কি গোলাম? কামাই রোজগার করে খাওয়াবে, আবার তোমার আলগা ভাব দেখবে? ভাব দেখে বাঁচি না আমি তোমার।”অন্তূ স্বাভাবিক স্বরে বিনয়ের সাথে বলল, “মরেও তো আর যাচ্ছেন না, তাই না! আপনি আপনার ঘরে থাকেন, আমি আমার ঘরে। এমন নয়

সবসময় আমার ভাব আপনার চোখের সামনে থাকে। সামনে আসলেও চেষ্টা করবেন, চোখ বুজে অথবা দৃষ্টি ঘুরিয়ে রাখতে। দেখবেন, আর আমার ভাব আপনার চোখে পড়ছে না। আর এমন তো মোটেই নয়, যে আপনার অথবা আপনার স্বামীর কামাই খাচ্ছি এ বাড়িতে। তাহলে আপনার আসলে ব্যথাটা কোথায়?''

নাক শিউরে উঠল মার্জিয়ার। সর্বোচ্চ রাগটা মার্জিয়ার ওঠেই অন্তূর সুবিন্যস্ত ভঙ্গিমায় শান্ত স্বরে বলা দায়সারা কথাগুলোতে।

রি রি করে উঠল সে, "মরিনি এই নিয়ে আফসোস তোমার! আবার ব্যথা!''

-“জি, না। আফসোস নেই। ভুল বুঝছেন আপনি। কথার পেক্ষিতে বলেছি। শান্ত হোন। রাত অনেক, চেঁচালে লোকে খারাপ বলবে।”
-“এই ব্যথা কী, হ্যাঁ? তোমার মুখে জুতা মারা উচিত! আজ কয়দিন আমার শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না, আবার কিছু করে আসছো কবিরাজের কাছে আমার জন্য নিশ্চয়ই! যাতে তাড়াতাড়ি মরি, এইটাই তো বুঝাইলা তোমার কথার মাধ্যমে!”-“আপনার আমাকে সমস্যাটা কী?”
দাঁত খিঁচিয়ে উঠল মার্জিয়া, “তোমাকে নিয়ে সমস্যা যে কোথায়, সেটা তো আমি নিজেও বুঝি না! আসলে তোমার ভাব আমার সহ্য

হয়না, অন্তূ! ওইটাই আমার সমস্যা। তোমার কথাবার্তা সহ্য হয়না আমার। বাড়ির যে অবস্থা, তার ভেতরে জান দিয়ে পড়ালেখা করা। এইটাও সহ্য হয়না।''

অন্তূ ঘাঁড় নাড়ল। সে বুঝেছে।

-“শোনো, কাল আমার চাচাতো ভাইয়ের বাড়ির লোক আসতেছে তোমায় দেখতে। যদি কোনো উল্টাপাল্টা করো, আর আমি বাপের বাড়ি চলে যাই, তোমার ভাই যে তোমাদের শান্তি রাখবে না, তা জেনে রাখো।''

-“ভাই আমাদের কিছু বলবে না, ভাবী। আপনাকে গিয়ে নিয়ে আসবে ও বাড়ি থেকে।
''

দিনকাল ক্রমাগত খারাপের দিকে যাচ্ছে। চারদিক সংকটময়, সংকীর্ণ হয়ে উঠছে। ভাবীর আচরণ দিনদিন রহস্যময় আর আরও উগ্র হয়ে উঠছে।আমজাদ সাহেব খুব গম্ভীর আর শীতল মানুষ, শিক্ষিত মানুষটার ব্যক্তিত্ব প্রখর। তাতে দাগ না লাগাতে তিনি সব করবেন। অন্তূ কথা বলে, অথচ আমজাদ সাহেবের নীরবতার মাঝেই যেন যত তেজ নিহত।

কাল আব্বুর কাছে একজন পাওনাদার এসে বসে থেকে গেছে ঘন্টাখানেক। আব্বু লোকটাকে বেশ তোষামোদ করছিল, যেটা আব্বুর আত্মমর্যাদার খেলাপি অনেকটাই!

লোকটার মুখে সন্তুষ্টি নেই, অথচ আব্বু ক্রমাগত চেষ্টা করছিল লোকটাকে একটু খুশি করার, দুটো দিন সময় চেয়ে নেবার। ভালো লাগেনি অন্তূর। আঁখির কথা মাথায় এলো আবার, এভাবেই সময় চেয়েছিল নিশ্চয়ই আঁখির পরিবার! আচ্ছা, আঁখির এই বিভৎস অবস্থার পেছনে এ ছাড়াও কি আরও কিছু আছে?ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। তার পাগল পাগল লাগে আজকাল। না! এভাবে এটুকুতেই হয়রান হলে তার নামের পাশে অ্যাডভোকেট উপাধি মানাবে না আগামী কালে! তাকে সবকিছুতে স্বাভাবিক থাকার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। সে চেষ্টা করছে

তা-ই। আঁখির ডেডবডির কথা মাথায় আসলেই ভেতরে ভেঙেচুড়ে আসে, মাথায় ভয়াবহ চাপ পড়ে, প্যানিক এসে জড়ো হয়! আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়ে ভেতরের নারীসত্তাটা। মানসিক ভারসাম্য হারানোর জোগাড় হয়, তবুও শান্ত রেখেছে নিজেকে। এই দুনিয়ায় ভঙ্গুর হওয়া যাবে না, একুটুও না।অন্তূদের বাড়ির দু'পাশে পুকুর। কচুরি পানা ভরা। পুকুরটা মেজো চাচা আফজাল আর ছোটো চাচা আফতাবের। মেজো চাচা কুড়িগ্রাম অন্তূর দাদার আসল পৈতৃক বাড়িতে থাকেন আর ছোটো চাচা চুকরির সুবাদে ঢাকা থাকেন।

আছরের নামার আদায় করে বারান্দায় এসে বসাটা ওর অভ্যাস। প্রতিদিন এ সময় কচুরিপানার স্তূপের ওপর ডাহুক পাখরা হাটে। দেখতে ভালো লাগে। আজ দেখা যাচ্ছে না।

তরতর করে ঘুরে বেড়ায় ডাহুকগুলো। আগে অন্তিক এসে ফাঁদ পাতার পরিকল্পনা আটতো পাখিগুলো ধরার জন্য। মারামারি লেগে যেত অন্তূর সাথে। অন্তূর কথা–প্রাণি হত্যা মহাপাপ। আর প্রাণি যদি পাখি হয় তা শিকার করা ডাবল মহাপাপ। সে কোনোদিন অন্তিককে পাখি ধরতে দেয়নি।আজ ভাবীর চাচাতো ভাইয়ের বাড়ি থেকে দেখতে আসার

কথা ছিল। আসেনি। আমজাদ সাহেব দু'দিন পর আসতে বলেছেন। আঁখির কথা মনে পড়ল। আজ দু'দিন হলো খুব জানতে ইচ্ছে করে, জয় আগে ভার্সিটির মেয়েগুলোর সাথে কী করেছে?

বিরক্ত হয়ে উঠল অন্তূ নিজের ভাবনার ওপর। ঘুরে ফিরেই এই ঘেচালে মন চলে যায়! বাড়িতে নীরব অশান্তি চলছে। সরকারী প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার ছিলেন আমজাদ সাহেব। দিনকাল চলেছে কোনোমতো। কিন্তু অন্তূ বড় হয়েছে, অন্তিক বড় হয়েছে, সেই অবস্থায় বাড়ি না করলে নয়।

বাবা হিসেবে শিক্ষা ও সাধ্যমত যোগ্যতা ছাড়া বিশেষ কিছু দিতে পারেননি। অন্তিক যদিও বা জিদ ও ঝামেলা করতো, অন্তূ সেটুকুও করেনি কোনোদিন ছোটোবেলা থেকে আব্বু শখ করে কষ্ট করে কিছু দিতে চাইলে হাসিমুখে অভ্যাস –'লাগবেনা আব্বু, এই জিনিস আমার পছন্দ বা প্রয়োজন না।' সেক্ষেত্রে বাপ হিসেবে আমজাদ সাহেবের কর্তব্য নয় কি সন্তানকে অন্তত একটা উপযুক্ত বাসস্থান দেয়া? শেষ পর্যন্ত এই তো বছর দুয়েক আগে ধার-দেনা করে, এবং কিছু গুছানো টাকা দিয়ে দোতলার কাঠামো তুললেন। একতলার ছাদ হতে হতে টাকার

সংকট পড়ল। পুরোনো বাড়ি ভাঙার ফলে থাকার জায়গার সংকট হলো। সেই অবস্থায় বাড়ির একতলা অন্তত ঠিক করা ফরজ হয়ে দাঁড়াল। এতে আরও অনেকটা ঋণ হয়ে গেল। অন্তূ জানতো না আব্বু শেষ পর্যন্ত বাড়ির কাজ দ্রুত সারতে সুদসহ টাকা ধার নিয়েছেন। যার সুদ-আসল মিলে এখন জানের ওপর উঠেছে।অন্তূর দাদার বাড়ি কুড়িগ্রাম। তবে কোনো এক সূত্রে তিনি বেশ অনেকটা জমির মালিকানা পেয়েছিলেন এই দিনাজপুরেও। আমজাদ সাহেব এখানে বসতি গেঁড়েছেন

দেনার দায় থেকে মুক্ত হতে আমজাদ সাহেব কুড়িগ্রামের জায়গা বিক্রির বায়নামানার টাকা নিয়েছেন। এছাড়া আর উপায় ছিল না, পাওনাদারেরা ঘাঁড়ের ওপর উঠে আছে, সাথে দিন যত যাচ্ছে, সুদের পরিমাণ সমান্তরাল হারে বাড়ছে। বিপত্তি বেঁধেছে মেজো চাচাকে নিয়ে। ভদ্রলোক বিশাল খামারের মালিক। খামার আমজাদ সাহেবের জায়গার অর্ধেকটাতে চলে এসেছে। ক্রেতা লোকটা ততদিন রেজিস্ট্রিতে যাবেন না, যতদিন জমি পরিস্কার, ঝামেলামুক্ত না হয়। এটাই স্বাভাবিক, কোনো ক্রেতাই টাকা-পয়সা খরচা করে ভেজাল জমি কিনতে আসবেন না।

মেজো চাচা আমজাদ সাহেবকে জমিই দিতে রাজী নন। তিনি বলেছেন, “আমজাদ এখানে থাকে না, জমির দেখভাল করে না, তাছাড়া ও তো দিনাজপুর একটা জমি পেয়ে সেখানে বাড়ি করে বসবাস করছে। তাহলে এখানে আবার কীসের জমি পাওনা? কোনো জমি পাবে না ও এখানে!”সেদিন যখন আমজাদ সাহেব গেলেন সেখানে, শালিস বিচার করে অবশেষে রায় এলো, খামার হবার পরেও আমজাদ সাহেবের জমির যে অর্ধেক খালি পড়ে আছে, সেটুকু তিনি পাবেন, বাকিটার আশা ছাড়তে হবে। তাতে যে অর্ধেক বাকি আছে, সেটুকু দিতে রাজী হয়েছেন আফজাল

সাহেব। বাকি যেটুকুতে উনার খামার রয়েছে, সেটুকু উনি দেবেন না। এ নিয়ে বেশি ঝামেলা করলে বাকিটুকুও না দেবেন না। আমজাদ সাহেব কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। তার শুধু একটা কথা মাথায় এসেছে, "জোর যার, মুল্লুক তার।"

প্রতিদিন পাওনাদারেরা আসছে বাড়িতে। আব্বুর শুকনো মুখটা অন্তূর কলিজা ছিদ্র করে বিঁধছে। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষটা কেমন মিইয়ে যান পাওনাদারদের সম্মুখে। মেজো চাচার দাবী, আমজাদ যেহেতু এখানে থাকেনা, ওর এখানকার জমিতে কোনো

অধিকার নেই। তিনি নেহাত ভালো মানুষ বলে অর্ধেকটা তাও দিচ্ছেন!

এসব শুনে অন্তূর রক্ত টগবগিয়েছে। নিম্ন মধ্যবিত্তদের জীবনযাত্রার মান এমনই হয়– এসব বুঝিয়ে সান্ত্বণা দিয়েছে নিজেকে। জীবনটা জটিলতা আর ধ্বংস-ত্রাসে ভরপুর হয়ে উঠছে। সে এই জীবনে এমন পাপ তো করেনি, যার প্রতিদান সরূপ এত কঠোরতা প্রাপ্য!আম্মু চেঁচিয়ে ডাকছে। অন্তূ অতিরিক্ত অন্যমনষ্ক! বারবার ডেকে তার হুশ ফেরাতে হয়। আম্মুর কাছে গিয়ে বলল, “কী হয়েছে?” রাবেয়া বেগম রোদে কুমড়ো বড়ি শুকাতে দিয়েছিলেন। তা তুলছেন বসে।

-"তোর বাপ ডাকতেছে, যা শুনে আয়। তোরে ছাড়া বেহুশ হয় ওই লোক, দূরে থাকিস ক্যান?"

ঘরে ঢুকতেই সুরমা-আতর মিশ্রিত একটা সুগন্ধ এসে নাকে ঠেকল। আব্বু আছরের নামাজ শেষে জায়নামাজেই তসবীহ গুনছেন। অন্তূ এগিয়ে গিয়ে মেঝেতে বসতে অগ্রসর হয়। আমজাদ সাহেব বাঁধা দিলেন, "তুই বিছানায় বস। আমি এই বসাতেই মাগরিব পড়ে উঠব, আজ আর মসজিদে যাব না, শরীর খারাপ।"

অন্তূ কথা শুনল না। আব্বু নিচে বসে থাকলে সে কীভাবে পা তুলে বা ঝুলিয়ে বিছানায়

বসতে পারে? আব্বুর পাশে পা গুটিয়ে মেঝেতে বসে পড়ল। আমজাদ সাহেব কিছু বললেন না। অন্তূ জিজ্ঞেস করল, "শরীর ভালো তোমার?"

-"আছে ভালোই। আলহামদুলিল্লাহ।"কী শুদ্ধতম চেহারা। এক থুতনি চাপ দাড়িতে হালকা পাক ধরেছে, মেহেদির রঙ উঁকি দিচ্ছে। গভীর চোখ, পুরু ঠোঁটের বিশালদেহী মানুষটা! ভারী, গম্ভীর কণ্ঠস্বর! এক পা গুটিয়ে বসেছেন, সেই পায়ের নখে কালো দাগ। অন্তূ তাতে হাত বুলিয়ে বলল, "কোথাও ব্যথা পেয়েছিলে? রক্ত জমেছে নাকি নখে?"

আমজাদ সাহেব বললেন, "ব্যথা পাওয়ার কথা মনে পড়ছে না, তবে ওখানে একটু ব্যথা আছে।"

অন্তূ আব্বুর নখে আঙুল বোলালো।

-"বাড়িতে কী হয়েছে রে অন্তূ?"অন্তূ বাচ্চাদের মতো হাসল, "সব ঠিকঠাক। কী হবার কথা ভাবছো? প্রেশার হা হলে সুখ লাগে তোমার?"

আমজাদ সাহেব গম্ভীর স্বরে বললেন, "তুই আমার মা না, আমি তোর বাপ! হুঁশিয়ারী করছিস আমার সঙ্গে?"

অন্তূ হেসে ফেলল আরও খানিকটা, "করতেই পারি। তুমি অল্ড জেনারেশনের লোক,

তোমাকে ঘোল খাওয়ানো কোনো ব্যাপার নাকি আমার কাছে?”
আমজাদ সাহেব বললেন, “বিয়ে-শাদি করবিনা তাই বলে?”
অসহায় মুখে তাকাল অন্তূ, “তুমিও আব্বু? কাকে বিয়ে করব? ভাবীর আনা ছেলেকে, নাকি আম্মার কাছে আসা ঘটকের পাত্রদের মাঝে কাউকে?”আমজাদ সাহেব কিছু বললেন না। অন্তূ আনমনে বলল, “আব্বু! সামনের দিনগুলো খুব খারাপ যাবে, তাই না?”
আমজাদ সাহেব চোখ মেলে তাকালেন, “তোকে বলেছি কোনোকিছুকে পাত্তা দেয়া যাবেনা। জীবন একটা চক্র রে অন্তূ। সোজা

ভাষায় বললে–বৃত্ত। কোনো এক বিন্দু থেকে একই রেখা বরাবর যতটা আগে এগোবি, রেখাতে চক্রাকারে ঘুরে সেই প্রথম বিন্দুটা ঠিক তত নিকটে আসতে থাকবে। ঠিক যেমন, রাত যতটা গভীর হয়, সকাল তত নিকটে আসে। কষ্টের যত গভীরে ঢুকবি, সুখ ঠিক ততটুকু কাছে আসবে। সুখের ক্ষেত্রেও তাই। সুখের মাঝে যতটা মজে যাবার সুযোগ পাওয়া যাবে, দুঃখকে ঠিক ততটা কাছে কল্পনা করে প্রস্তুত থাকতে হবে। কিছুই চিরস্থায়ী নয়, অন্তূ।"

অন্তূ অভিভূতের মতো চেয়ে রয় আব্বুর দিকে। পঞ্চাশোর্ধ মানুষটা অন্তূকে প্রতিক্ষণে

মুগ্ধ করতে তৎপর। চোখের শীতল, অভিজাত চাহনি, মুখের শুদ্ধতম গাম্ভীর্যতা!-“সুখ কী আব্বু?”

আমজাদ সাহেব বললেন, “সুখ কেবল এক কল্পিত তত্ত্ব। দুঃখের সাপেক্ষে আপেক্ষিক বৈপরীত্বের কল্পিত তত্ত্বকে সুখ বলে। অর্থাৎ, শতভাগ দুঃখের মাঝ থেকে যতটুকু দুঃখ বিয়োগ হবে, ওই বিয়োগফলটাই সুখ। আর কেউ দুনিয়ায় শতভাগ দুঃখী নয়।”

মাথা নত করে হাসে অন্তূ। তার সৌভাগ্য কি তার বাপ নয়?

“আব্বু মেজো কাকার সাথে ঝামেলায় না জড়িয়ে, আম্মুর বাপের বাড়ির জমিটা বিক্রি

করে পাওনাদারদের দিতে পারতে না? জানা নেই কী হবে ওখানে? কাকা ভালো মানুষ না, উনি যেকোনো রকমের বিশ্রী তামাশা করতে দু'বার ভাববেন না। প্রতিদিন পাওনাদারের এই ঘুরাঘুরি আমার চোখে লাগছে খুব!"

আমজাদ সাহেব স্মিত হাসলেন, "আমার লাগছে না?"

অন্তূ সপ্রতিভ স্বরে বলল, "আমার চেয়ে বেশি লাগছে, আর সেটাই পীড়া দিচ্ছে আমাকে। তুমি কেন সহ্য করছো এসব? আম্মুর দত্তরের জমিটা ..আমজাদ সাহেব ডেকে উঠলেন, "অন্তূ! তোর মাকে যেদিন বিয়ে করে আমার ঘরে নিয়ে এসেছিলাম, সেদিন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

হয়েছিলাম, তোর মায়ের বাকি জীবনের সমস্ত ভার আমি বইবো। তার খাবার, কাপড়, থাকার জায়গা, চিকিৎসা–সবের দায়িত্ব আমার না? তাহলে সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যদি ঋণ করি, সেই ঋণ পরিশোধের দায় কার? তার বাপের বাড়ি থেকে সে কী পেয়েছে না পেয়েছে সেটা দেখার আমি কে? কতটুকু যুক্তিযুক্ত তা? যতদিন বেঁচে আছি অন্তত ততদিন তো না। এমনকি মরার পরেও তার একটা ব্যবস্থা করে যাওয়া আমার কর্তব্য! তা পারব কি-না জানা নেই। তাহলে তার ভরনপোষনে খরচা করা টাকার ঋণ তার বাপের কাছে পাওয়া জমির পয়সায় কী করে

পরিশোধ করি? এমনিতেই তাকে জীবনে ভালো তো রাখতে পারিনি আমি। এমন কিছু রেখেও যেতে পারব না, যা দিয়ে আমার অবর্তমানে তার খুব চলবে। তখন ঠিক ওই জায়গা বিক্রি করেই চলতে হবে হয়ত তাকে। এটা আমার কর্তব্যে খেলাপি না? মরার পরেও কর্তব্যের হেরফের হবে, বেঁচে থাকতেও যদি তাই করি..''আমজাদ সাহেব একটু থেমে আবার বললেন, "আমি তোর মায়ের কাছে এমনিতেও ঋণী, খুব ভার এই ঋণের। আমার ছেলের ওপর সেই শখ আমি রাখতে পারিনা, যে সে তার মা আর তোকে দেখবে।''

অন্তূ হাসল। ছেলের ওপর ন্যায্য ভরসা রাখাকে শখ বলছেন এই লোক! মানুষটা ব্যাপক-অদ্ভুত-আত্মসম্মানী।

-“আগামীদিন বিচার আছে। আশা রাখা যায়, ভালো কিছুই হবে। গ্রামের মাতব্বররা আবার শালিস ডেকেছে। জমি পেয়ে যাব, বিক্রি হয়ে যাবে। পাওনাদার আর আসবে না, তুই চিন্তা করিস না।”আর কথা বাড়ায় না অন্তূ, ভাবনায় ডুবে যায়। রাবেয়ার ভাগ্য, নাকি কোনো নেকির ফল? মূর্খ-সরল, সহজ নারীটা হুটহাট তার আব্বুকে কোন কপালে পেয়ে গিয়েছিল? কী করলে এমন কাউকে এই শেষ বেলায় এমন শক্তিমান ছায়ার মতো পাওয়া যায়? হুট

করে অন্তূর ভেতরে অদম্য এক শখ অথবা আকাঙ্ক্ষা জাগল—তার জীবনে এমন কেউ কি আসতে পারে না? ভাবী জিজ্ঞেস করে, তোমার কেমন সঙ্গী চাই? ভাবী বা আম্মা বোঝেনা, তার একজন এমন কর্তব্যপরায়ন পুরুষ চাই, যে একরাশ প্রশান্তি এবং এক বুক আত্মমর্যাদার চাদরে মুড়ানো, এক মুঠো নিঃস্ব সুখ হবে। সম্পদ ছাড়া তার কাছে সব থাকবে। একটু অবাক হলো নিজের ভাবনায়, সম্পদ ছাড়া? উত্তর এলো, হ্যাঁ! সম্পদ ছাড়া যে পুরুষেরা কর্তব্যপরায়ন, তারা স্বর্গীয়। এই তো আব্বু! সংকটেও যে এমন সব কাব্যিক কর্তব্যের বর্ণনা দেয় নিজের অর্ধাঙ্গীনিকে

নিয়ে মেয়ের কাছে!মাগরিবের আজান হলো। রাবেয়া ঘরে ঢুকলেন। আমজাদ সাহেব জায়নামাজের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে হাত বেঁধেছেন। রাবেয়া এসে পাশে দাঁড়াল। অন্তূ এই সুখময় সুযোগ ছাড়তে চাইল না। আব্বুর বাথরুমে অযু করে এলো। আজ সে এই দুই অদ্ভুত সঙ্গীদের মাঝে দাঁড়িয়ে মালিকের সামনে মাথা নোয়াবে।

আম্মু আব্বুর তুলনায় বেশ খাটো। লম্বা, চওড়া, অভিজাত নব্বই দশকের নায়কদের মতো আব্বুর পাশে আম্মুকে কি বেমানান লাগছে? আবার হাসল অন্তূ! উহু! এই দুজনকে বেমানান লাগতে পারেনা, এরা

রবের সৃষ্ট জুটিদের মাঝে একজোড়া। দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে রবের সম্মুখে ঝুঁকতে। কাধে কাধ মেলেনি উচ্চতায়, অথচ মনের মিল অসীম! অন্তূ সব ভুলে বুক ফুলিয়ে একটা ফুরফুরে শ্বাস ফেলে আব্বুর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। আব্বু নীরবে তার জন্য নিজের একপাশে পাশটায় জায়গা রেখে নামাজে দাঁড়িয়েছে। অপর পাশে রাবেয়া বেগম। ইলেকশন এগিয়ে আসছে। প্রতীক বের হবে দিন দুয়েকের মাঝে। গতকাল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। ব্যস্ত সময় কাটছে হামজার, জয়ের দৌঁড়াদৌঁড়ি বেড়েছে।

সকাল দশটা। বাড়ির মেয়েরা রান্না শেষ করল, পুরুষগুলো জাগেনি তখনও। শাহানা বললেন, “এই যাও তো রিমি, দেখো তোমার শশুর উঠলো নাকি?”

রিমি দুটো নোংরা প্লেট সিংকে রেখে বলল, “শশুরআব্বা এমনিতেও এখন উঠবে না, আম্মা! আমি উনাকে ডেকে আসি, সকাল সকাল ডাকতে বলেছিল, দশটা বেজে গেছে।”

রিমি বের হবার সময় তরু ঢুকল রান্নাঘরে। শাহানা তরুকে জিজ্ঞেস করলেন, “জয় উঠছে?”

তরু মাথা নেড়ে ‘না’ জানিয়ে ভাতের গামলাটা নিয়ে ডাইনিং টেবিলের দিকে গেল। রিমি রুমে ঢুকে জানালার পর্দা ঠেলে কাঁচ সরিয়ে দিলো। হামজা উপুড় হয়ে শুয়েছিল। মুখ কুঁচকে নড়েচড়ে উঠল, “উমমহ! কী করছো, রিমি! পর্দা টেনে দাও!”ঘুম জড়ানো পুরুষের কণ্ঠস্বর এতোটা মোহনীয় হয়! তা কি জানে এরা? নিজের মনেই আওড়ালো রিমি। তার চেয়ে বয়সের পার্থক্য একটু বেশিই লোকটার। অথচ রিমির লোকটাকে একটুও ভয় করেনা, সংকোচ হয়না, খারাপ লাগেনা। দাড়ি-গোফ বেড়েছে লোকটার। নিজের যত্নে গাফলতি করছে ব্যস্ততায়। গ্রি

কোয়ার্টার প্যান্ট পরনে শুয়ে থাকা এই লোককে তার পার্টির ছেলেরা এভাবে দেখলে কি নেতা মানবে? ছোটো যুবকের মতো লাগছে।

-"নেতাবাবু! আপনার নির্বাচন তো ফুরিয়ে গেল! উঠুন জলদি, আমার আর মেয়রের বউ হওয়া হলো না!"

চোখ খুলে তাকাল হামজা। চোখের কোণে লালচে হয়ে আছে।

-"তুমি খুব ক্ষমতালোভী, বউ! আমার লোভ নেই তোমার, আছে আমার নেতাগিরির লোভ! আর এর ফলে আমার হাতে তোমার গর্দান যেতে পারে যেকোনো সময়!"রিমি বসল

হামজার উরুর ওপর। অহংকারী ভঙ্গিতে গলা জড়িয়ে ধরল হামজার, এরপর কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে করে বলল, “ঠিক ধরেছেন। ক্ষমতাহীন পুরুষ আমার কাছে মৃত খরগোশের সমান। বাপ-ভাইদের দাপট করে বেড়াতে দেখে বড়ো হয়েছি আমি। পৌরসভার সাবেক মেয়রের ভাইয়ের মেয়ে আমি, আব্বু উপজেলা চেয়ারম্যান। তাদের এক কথায় জেলা কাঁপতে দেখেছি। বউ হয়ে এলাম যার ঘরে, তার কথায় যদি এরিয়া না কাঁপে, ভেতরটা সন্তুষ্ট হবে কী দিয়ে! যখন এসেছি আপনার হয়ে, তখন আপনি কেবল ছিলেন ছাত্রলীগের নেতাকর্মী। ধীরে ধীরে আপনার

উন্নতি দেখব, সাথে আমার পদবীরও, এই আশায়ই তো প্রতিটা বেলা গুণছি। নয়ত সেদিন আপনিই কেন? কারণ, সম্ভাবনা আছে আপনার মাঝে। আব্বুর বয়স যাচ্ছে, চাচা রিটায়ার নিয়েছে নিজে থেকেই। কার ক্ষমতায় বুক ফুলাবো আমি? আপনার, নেতাবাবু!''

-"তোমাকে সব সময় শাড়ি পরতে বলেছি না?''রিমি উঠে দাঁড়িয়ে বিছানা থেকে হামজার টিশার্ট কুড়িয়ে নিলো। হামজা বলল, "আমার একটা পাঞ্জাবী বের করে দাও, তাড়াতাড়ি বের হতে হবে। জয় উঠেছে নাকি?''

জয় কোনোসময় ঘরের দরজা আটকে ঘুমায় না। রাতে তার টাল হয়ে পড়ে থাকার অভ্যাস আছে যেহেতু, ওই অবস্থায় কবীর বা লিমন ওকে ধরে কোনোমতো রুমের সামনে পৌঁছে দিয়ে চলে যায়। হামজার চোখে পড়া পড়া যাবেনা।

তরু রুমে ঢুকল। রুমটা অন্ধকার হয়ে আছে। না ডেকে আগেই আলো জ্বালালে এক্ষুনি উঠে থাপ্পড় মারতে পারে একটা। লুঙ্গি পরনে, আর শার্টটা পড়ে আছে দরজার ডানপাশে ঝুরির ওপর, সেখানে ঝুলছে সেটা। হাতঘড়ি এখনও হাতেই। ওয়ালেট নিশ্চয়ই পকেটে!তরু বিছানার পাশে গিয়ে ঝুঁকে

বসল। আলগোছে হাতঘড়িটা খুলল, পকেট থেকে ওয়ালেট বের করল। নাকে দুর্গন্ধ এসে ঠেকছে জয়ের মুখ থেকে। পুরো ঘরেও একটা ভ্যাপসা গন্ধ ছড়িয়েছে। উঠে দাঁড়িয়ে বোতল খুঁজল, পেল বেড সাইড টেবিলের একপাশে, বাঁকা হয়ে পড়ে আছে।

-"জয় ভাইয়া! শুনছেন? সকাল হয়েছে, ডাকছে আপনাকে হামজা ভাই! জয়!"

জয় চোখ বুজেই উঠে বসল, "এককাপ কড়া করে চা বা ব্লাক কফি আন। শালার হ্যাংঅভার কাটছেই না।"

জয় তরুকে কী চোখে দেখে, জানা নেই তরুর। সব সময় আদেশ, ধমক, ভয়ের ওপর

রাখে। জয়ের আচরণ খিটখিটে। তরু বেশ ছোটো জয়ের। হামজার খালার মেয়ে তরু। জয় সে হিসেবে তরুর খালার ননদের ছেলে। জয়ের যে দায়িত্বশীল একটা লুকানো আচরণ প্রকাশ পায় তরুর ওপর, সেটা তরু দেখেছে খালি। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে ঘুরে আসার সময় তরুর জন্য যা চোখে লাগে কিনে আনে, ডেকে হাতে দেয়। মন খারাপ থাকলে কাছে ডাকলে ধমকে জিজ্ঞেস করে, “মুখ থুবরে আছিস কেন? জামাই মরছে? ”এবার ঢাকা থেকে ফেরার পথে দুটো তাতের শাড়ি এনেছিল সাথে করে। একটা রিমিকে দিয়েছে, আরেকটা তরুর। তরুর

ঝুমকো দুল খুব পছন্দের। সাথে দু-জোড়া কালচে রঙা দুলও ছিল।

মাথা ব্যথা করলে মাথা টিপে দেয়া থেকে শুরু করে মাঝেমধ্যেই অসুস্থ জয়ের পাশে সারারাত জেগে সেবা করার দায়িত্বটুকুও তার। কোনোদিন ভুল করে বসেনি জয়। ভুল হবার আগেই ছিটকে সরিয়ে দিয়েছে তরুকে। অসুখের ঘোরেই কখনও কখনও রুম ছেড়ে বের হয়ে গিয়েছে হোটেলে নিজেকে শান্ত করতে। তরু জানে না, নিজের শারীরিক চাহিদার খাতিরে জয় তাকে কাছে টানলে সে জয়কে ঠেলতে পারতো কিনা! ভাবলেই একটা শিহরণ ছড়িয়ে যায় দেহ-মনে।

জয় ব্রাশে টুথপেস্ট লাগিয়ে ফোন টিপতে টিপতে তুলির রুমে ঢুকল। বালিশে হেলান দিয়ে পা টান করে বসে আছে তুলি। জয়কে দেখেও দেখল না। বিছানায় বসে কম্বলটা ফেলে দিলো মেঝেতে। না ফেলেই দিব্যি বসা যেত।-“রাতে খেয়েছিস?”

-“তা জেনে তোর কী? এখন যা, কথা বলতে ইচ্ছে করছে না”

তুলির গম্ভীর চেহারা।

-“কী আশ্চর্য আশা তোর! তুই বললি আর জয় তা মেনে চলে গেল! ইচ্ছে থাকলেও যাব না, কারণ তুই যাইতে বলতেছিস।”

-“এখন ত্যাড়ামি না করে যা তো জয় রুম থেকে। ভালো লাগছে না।”

-“আর তো কারও ভাতারের সাথে ঝামেলা হয় না, রাইট! তোর মতোন এমনে ড্যাং ড্যাং করে বাপের বাড়ি এসে ছ্যাঁচড়ার মতো পড়ে থাকে না তারা!”বিছানার ওপর থেকে একটা কুশন তুলে ছুঁড়ে মারল তুলি, “আমার বাপের বাড়ি আমি এসেছি, তোর কী? তুইও তো বাপের সম্পত্তি ফেলে এসে মামার বাড়ি পড়ে আছিস ছ্যাঁচড়ার মতো!”

-হাসল জয়, “আমি কি তোর মতো স্বামীর সাথে কামড়াকামড়ি করে অসহায় হয়ে এসে উঠছি? বাপের অগাধ সম্পত্তি পড়ে আছে,

তার পরেও তোর বাপের এই ছোটোলোক মার্কা ভএঙরি বাড়িতে এসে পড়ে আছি। তোমাদ বাপ মা এমনি পীর ভুজে ক্যান, সিস্টার? আমি মরলে কৌন বানেগা কোরপতি?''

-"একটা লাত্থি মারি তোর ঘাঁড়ের ওপর, তার আগে বের হ আমার রুম থেকে। মন মেজাজ ভালো নেই এমনিই।''

-"তোর রুম? এটা তোর রুম কেমনে! সেই কবেই তো তোরে কাল্টি করছে, মামা!''

তুলি করুণ দৃষ্টিতে তাকাল জয়ের দিকে, "আমার ভালো লাগছে না, জয়!''

-“তো আমি কী করব?”ক্ষণকাল বাদে তুলির কণ্ঠস্বর কাঁপল, “আমার মেয়েকে কোল থেকে কেড়ে রেখে বলে, তুই যেখানে যাবি যা, মারা খা গিয়ে। আমার মেয়ে যাবে না তোর মতো খা*** সাথে। আমি সেই বাড়িতে কীভাবে আবার যাব, জয়!”

জয়ের অভিব্যক্তির পরিবর্তন হলো না। এদিক-ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, “মামাকে বলেছিস?”

-“আব্বুকে কী বলব? আরও চিন্তা করবে। সামনে ইলেকশন। এখন আমার ঝামেলা কী করে চাপাই তার ওপর?”

-“সাহেব জানে?”

-“হামজা ভাই? অল্প জানে।”

-“কী চাইতেছিস তুই এখন?”

মাথা নিচু করল তুলি, “আমি কী চাইব? আমার ছোট্ট মেয়েটাকে দেখি না কতদিন হলো। কীভাবে আছে কিচ্ছু জানি না..”

কান্নায় ভেঙে পড়ল তুলি।

জয় বিরক্ত হয়ে ধমক উঠল, “এই থামা! প্যানপ্যান না করে ক কাহিনি কী? সকাল সকাল তোর ক্যাউ ক্যাউ শুনতে আসি নাই ঘুম কামাই করে।”তুলি সুন্দরী। শরীরের বিভিন্ন স্থানে কালশিটে দাগ বোঝা যাচ্ছে, দেহের রঙ ফর্সা হবার ফলে আরও বেশি

বোঝা যাচ্ছে। ফর্সা মুখের ওপর চোখের নিচের কালি খুব চোখে বিঁধছে।

জয় গম্ভীর হলো, “কী হয়েছে?”

কিছুক্ষণ সময় নিলো তুলি। কাঁদছে না ও। জয় তার দুঃখ শুনে সমবেদনা জানাবে না, না সান্ত্বণা দেবে, নরম সুরে আদুরে কণ্ঠে বোঝাবে না। তবু সকল দুঃখ শোনার দাবিদার সে! বাসি পেটে ঘরের মধ্যে সিগারেট জ্বালিয়ে মন ভরে টানছে, আর হাঁটু দোলাচ্ছে।

তুলি অনেকক্ষণ চুপ থেকে বলল, যা এখান থেকে।

-“সীমান্তর নম্বরটা দে।”

-“না! দরকার নেই। আমি কথা বলে নেব, তুই শান্ত হ। মিটিয়ে নেব আমি। আচ্ছা আর কাঁদছি না। জয়..”

জয় তাকাল তুলির দিকে। এখন ঠাটিয়ে দুটো চড় মারতে দ্বিধাবোধ করবে না জয়। সেই সভ্যতা বা আদব নেই ওর মাঝে। হোক বড়ো বা ছোটো, হাত উঠে যায় খুব সহজে। তুলি নম্বর বলল। ফোনে তুলল নম্বরটা জয়। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “খেতে আয়।”-“আমার এখন খিদে পায়নি। পরে খেয়ে নেব, তুই খেয়ে বের হ।”

জয় বের হয়ে যেতে যেতে বলল, “দ্বিতীয়বার আর কেউ ডাকতে আসবে না, আর না আমি

রিপিট করব। ব্রাশ করে এসে যেন টেবিলে পাই তোকে।''

হামজা আর জয় বাড়ি থেকে বের হলো দুপুর বারোটার দিকে। কবীর গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মোড়ের ওপর। এই পথটুকু হেঁটে যেতে হবে। রাস্তার হাঁটার সময় এক মহিলা এগিয়ে এলো ওদের দিকে। দুজনে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেমন আছেন, চাচি?''

চাচি বললেন, "ভালা আছি, বাপ। তোমার আব্বায় যে কইছিল একখান বিধবাভাতার কাড কইরা দিবো। সগ্গলে পাইছে, আমি খালি পাই নাই।''জয়ের দিকে তাকাল হামজা। জয় রোদচশমাটা খুলে বলল, "আপনি কাল

সকালে আসবেন আমাদের বাড়িতে। ওগুলো আমার কাছে দিয়েছে হামজা ভাই, আমি দিয়েছি সকলকে, কয়েকজনেরটা রয়ে গেছে, ওর মধ্যে আপনারটাও আছে।''

মহিলা সন্তুষ্ট মনে চলে গেলেন। এগোতে এগোতে ছোটো দুটো ছেলে সালাম হাত কপালে ঠেকিয়ে সালাম ঠুকল দুজনকে।

এলাকার ফার্মেসির দোকানদার হামজাকে ডেকে বলল, "এই রাস্তায় তো আর হাঁটা যায় না, বাজান। একটু বৃষ্টি হইলেই কাদাপানি প্যাক-প্যাক করে। রাস্তার কাজ কবে ধরবা, হামজা!''

হামজা হাসল, “এই তো, কাকা! নির্বাচনের ঝামেলাটা মিটলে আর কষ্ট করতে হবে না আপনাদের। রাস্তার কাজ এই রাস্তা দিয়েই শুরু করব, ইনশা-আল্লাহ! এলাকার মানুষ আগে আমার। আর এমনিতেও শীত নামানোর বৃষ্টি এসব, শীত এসে গেছে অলরেডি। এখন আর বৃষ্টি বা কাদা হবে না কয়েকমাস।”গাড়িতে উঠে বসল দুজন। হামজা সামনের সিটে উঠতে গেলে জয় এসে হানা দিলো, “তুমি পেছনে যাও, আমি এখানে বসব।”

হামজা বিরক্ত হয়ে বলল, "আমাকে বিরক্ত করতে জন্মেছিস তুই এই জনমটা। তুই বড়ো হবি না এ জীবনে?"

-"চান্স নাই, ব্রো। কথা না বলে পেছনে যাও তো! রোদে গা পুড়তেছে আমার।"

গাড়ি চলছে মেইনরোড ঘেঁষে। হামজা জিজ্ঞেস করল, "সেদিন তোদের গাড়ির কী হয়েছিল শুনলাম!"

জয় গম্ভীর হলো, "কার জানি চুলকানি উঠছে মনেহয় আমায় নিয়ে। একটু মলম লাগানো দরকার, তবে তার আগে হারামির বাচ্চাটার ঘা খুঁজে পাওয়া দরকার!"

হামজা গাড়ির কাঁচ টেনে দিয়ে বলল, “বাবাকে আবার ডেকেছিল থানায়। এরপর থানায় ডাকা হলে, তুই সঙ্গে যাবি।”

মাথা ঝাঁকাল জয়, “অসম্ভব। ওই পুলিশ শালাদের একেকটা মশার কয়েল টাইপ প্রশ্নে আমার মাথা সাড়ে পাঁচশো ডিগ্রি সেন্ট্রিগেড গরম হয়। হাঙ্গামা হবে আমি গেলে।”হামজা মুখ শক্ত করল, “শুয়োরের বাচ্চা। মাইর খাবি। বলি, সবসময় ঠান্ডা মাথা নিয়ে চলবি, রাজনীতি একটা কৌশলগত চক্র। সেখানে তোর এই অভার-টেমপার মাথার জন্য জীবনে তোর উন্নতি হবে না, সাথে আমি তো রোজ ডুবছিই।”

-“আমার..” থেমে গিয়ে দাঁত খিঁচল, “আমার সামনে আমার বদনাম করতেছ তুমি?”
হামজা চট করে হেসে ফেলল, “আমি তোর পেছনে!”
কবীর হেসে উঠল। সিটে মাথা ঠেকাল জয়, চোখ বুজে জিজ্ঞেস করল, “গন্তব্য কোথায়, সাহেব?”
-“মেয়র সাহেবের বাড়ি যাচ্ছি।”জয় দেহটা এলিয়ে দিলো সিটে। মাড়ির দাঁতের আগায় জিহ্বা ঘুরিয়ে হেসে মাথা ফেরালো পেছনে, “ছেলে বড়ো হয়েছে, ভাই! রাত হলেই ক্ষুধা লেগে যায় শরীরে। তোমরা একটা ব্যবস্থা করছো না..”

কবীর জিহ্বা কামড়ালো, “লজ্জা শরম কোন হকারের কাছে বেঁচে বাদাম খাইছেন, ভাই? আপনার কী ব্যবস্থা করবে, হামজা ভাই? বারো থালায় খাওয়া লোককে একটা বিয়ে দিলে পোষাবে? বিয়ে করবি তুমি?”

-“উহু! লাইফটাকে এখনও চেস করার আছে। এতো সকালে বলি হওয়া ঠিক না।”

হামজা সিগারেট ধরালো, “তুই আসলেই মেয়েবাজী শুরু করেছিস, জয়? আমার বিশ্বাস হয় না।”

কবীর হো হো করে হাসল হামজার নাটকে। খপ করে হামজার ঠোঁটের ভাঁজ থেকে সিগারেটটা কেঁড়ে নিজের ঠোঁটের গুজে

অস্পষ্ট স্বরে বলল, “গুজব ওসব। আমি একজন ভালো লোক!”

-“তরুর ব্যাপারে ভেবেছিস কখনও?”হুট করে গাড়ির কাচ তুলে এসি অন করে দিলো জয়। হামজা তৎক্ষনাৎ একটা থাবরা মারল জয়ের কাধে, “মারার আরও বহু প্লান আছে, এভাবে মারলে পাপ বেশি হবে তোর..”

কেশে উঠল হালকা।

জয় বলল, “তাই বলে তরুর দিকে নজর গেল তোমার?”

-“তুই আগে জানালার কাঁচ নামা। শ্বাস আটকে মরে যাব, ধোঁয়া জমে গেছে ভেতরে, ঠান্ডাও লাগছে।”

সিটে মাথা এলিয়ে দিলো জয়, “মরলে লাভ সবচেয়ে বেশি আমার, এবার মেয়র পদ আমার, কনফার্ম! তোমার পাশের জানালা খোলো, বাল!” কবীরকে বলল, “এসি অফ কর।”কবীর আচমকা ব্রেক কষল। জয় নেমে দাঁড়াল। লম্বা শরীরে সাদা লুঙ্গি জয়ের। হামজা নেমে শাল চাদরটা গায়ে পেচিয়ে গাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সৈয়দ মুস্তাকিন মহান দাঁড়িয়ে আছে পকেটে হাত গুজে।“শীত ভালোই পড়ে গেল, হবু মেয়র সাহেব! কী বলেন!”

মুস্তাকিনের পাশে কয়েকজন আইন কর্মকর্তা দাঁড়িয়ে।

হামজা হাসল, “মেয়র সম্বোধন করে কি অপমান করতে চাইছেন, নাকি আগাম শুভেচ্ছাবার্তা জানাচ্ছেন, আসলেই বুঝতে চাপ পাচ্ছি!”

মুস্তাকিন হাসল, “হাসিমুখে যখন বলেছি, শুভেচ্ছাবার্তাই ধরে নিন। রাস্তায় রাস্তায় পোস্টার সাঁটার কাজ শুরু হয়ে গেছে। শুভকামনা আপনার জন্য!”

হাত মেলালো দুজনে। হামজা হাতটা ছাড়িয়ে বুকে রাখল হাসিমুখে।

মুস্তাকিন মহান বিনা কাজে শুভেচ্ছা জানাতে তো আর মাঝপথে বয়ে আসেনি!

-“হামজা সাহেব, দেখুন! লোকের মুখে যা রটে, তাই নাকি ঘটে। যদিও এসব কথার কথা। তবুও, লোকের এত জোরালো সন্দেহ কেন আপনাদের ওপর? এ ব্যাপারে আগেও কথা হয়েছে, তবুও বারবার আসলে বিষয়টা এসে এখানেই ঠেকে যাচ্ছে।”হামজা সোজা হয়ে দাঁড়াল, “দেখুন অফিসার! আপনি কতটা ঠিক বলছেন, বা একটু বাড়িয়ে জানি না। লোকের কতটা সন্দেহ আমাদের ওপর, তা আসলে মেপে দেখার সময় পাইনি ইলেকশনের ঝামেলায়। তবে ততটাও হবে না জানি, যতটা বোঝাতে চেষ্টা করছেন আপনি। লোক টুকটাক ভালোই বাসে

আমাকে। রাজনৈতিক দলে যেহেতু আছি। প্রতিদ্বন্দ্বীহীন নই! মূলত, যে জমিজমা সংক্রান্ত ব্যপার ওই পরিবারে ঘটেছিল, তার বিচার আমি আর জয় করেছিলাম। সর্বশেষে সময় দিয়েছিলাম কিছুদিন। মানুষ জমি সমস্যায় পড়ে বিক্রি করতেই পারে, ওরা আবার তা ফেরত নিতে চেয়েছিল, কিন্তু সময় পার হয়ে গেছিল, তবুও আমি আরও কিছুদিন সময় দিয়েছিলাম। এর মানে এটা কীভাবে হয় যে একটা ছোট্ট পনেরো বছর বয়সী মেয়ে, যে হয়ত আমার বোনের সমান! তাকে এমন নৃশংসভাবে..'' মাথা নাড়ল হামজা, ''যুক্তিতে মেলে আসলে?''

-“কিন্তু এখন একটা বড়ো কাজে হাত লাগিয়েছি, লোকের চোখে এমনিই পড়ে গেছি। যেমন বিপক্ষ দলগুলোর চোখে, তেমন সাধারণ মানুষ একটা ছুঁতো পেলে ছাড়ছে না। বোঝেন তো, রাজনৈতিক নেতাদের সাধারণ মানুষ কোনোকালেই ভালো চোখে দেখেনি। কারণ তাদের চাহিদা অপূর্ণ রয়ে যায় বহু। ''মুস্তাকিন রোদ চশমাটা চোখে আটলো। দারুণ সুদর্শন একজন পুরুষের খেতাব পাওয়ার মতো সবই আছে তার মাঝে। হামজা কথার মাথ-প্যাচে দারুণ দক্ষ, এবং সুবিন্যস্ত কথার কৌশল। এতো কম সময়ে

এত জনপ্রিয়তা এবং পরিচিতি নিয়ে রাজনীতি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে!

মুস্তাকিন প্রশ্ন করল, "আপনি বিপক্ষ দল বলতে কী বোঝাতে চাচ্ছেন, সেই বিষয়টা ক্লিয়ার করুন। এখানে আপনাদের এভাবে বেশিক্ষণ ধরে রাখা ঠিক হবে না, সাথে আমার নিজেরই গা জ্বলছে। দ্রুত কথা সেরে নিই।"

হামজা বলল, "আমার চাচাশশুর। মানে সাবেক মেয়র সাহেব। এবার তাকে হারিয়েই আমাকে জিততে হবে। সে কোনোকালেই আমাকে ভালো চোখে দেখেনি, দেখছে না।"

মুস্তাকিন প্রশ্ন করল, “তা কীসের ভিত্তিতে বলছেন?”হামজা হাসল, “সেদিন জয়কে ডেকেছিলেন তিনি নিজেই। এরপর হঠাৎ-ই জয়ের গাড়ির সামনে বিপদজনকভাবে একটা বোঝাই ট্রাক চলে এসে মেরে দিতে দিতে বাঁচিয়ে চলে গেছে। এটাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করব? এসব আমাদের সাথে হতেই থাকে, তবে এটা কাকতালীয় ছিল না, অফিসার!”

-“আপনাদের গন্তব্য এখন কোথায়?”

-“মেয়র সাহেবের সাথেই দেখা করতে যাচ্ছি।”

মুস্তাকিন হাসল, “সেদিনের ঘটতে যাওয়া এক্সিডেন্টের দায় মেয়র সাহেবকে দিয়েছেন

নাকি? সেই হিসেব চুকাতে যাচ্ছেন?''হামজা হাসল নিঃশব্দে। তার তলোয়ারের মতো রাজকীয় অভিজাত গোফের সরু প্রান্ত পাক খেয়ে গেল হাসির দমকে। মুস্তাকিন আবার বলল, "আচ্ছা, পরে-টরে একবার কার্যালয়ে আসুন। এখানে এই রোদে গা পুড়িয়ে কথা জমছে না। অনেক তথ্যের প্রয়োজন। মানছি এখন ব্যস্ত আপনারা, তবে তবুও একটু আসুন সময় করে। চলি!''

হাত মিলিয়ে গাড়িতে ওঠার সময় জয়কে বলল মুস্তাকিন, "গিয়ে আবার মেয়র সাহেবকে খুন-টুন করে আসবেন না যেন!''

জয় নিজস্ব ভঙ্গিমায় ঠোঁট একপেশে হাসি হাসল, "আমাদের আগে আপনিই দেখছি সিওর, সেদিনের কাজটা মেয়র করেছে!"খাঁড়া দুপুর। বাংলায় অগ্রহায়ন মাস পড়ে গেছে। ঠান্ডা-গরমের কাটাকাটি চলছে। জয় গাড়ি থেকে নামল পরে, হামজা বেরিয়ে গেছে ফোন কানে ধরে। সামনে দোতলা বাড়ি। কবীর জয়কে জিজ্ঞেস করল, "আমি কি যাব ভেতরে?"

জয় ঘাঁড় ঘুরিয়ে তাকালো, "আমার বিয়ের বরযাত্রী হয়ে এসেছ, শালা! আমার সাথে গিয়ে আস্ত মুরগীর প্লেটের সামনে বসবি তাড়াহুড়ো করে?"

হামজা ফোনে কথা সেড়ে এসে দাঁড়াল। জয় খ্যাকখ্যাক করে উঠল, “তোমার ফোন না ঘণ্টা? বালডা সারাদিন খালি বাজতেই থাকে! ”ঝন্টু সাহেবের বাড়িতে আলাদা বৈঠকখানা নেই। চাচাশশুরের বাড়ি ছাড়াও মেয়রের বাড়িতে দুই ঘাঘুর যাতায়াত আগে-পরেই আছে। বসার রুমে বসেই রাজনৈতিক আলোচনা সারেন মেয়র কামরুজ্জামান ঝন্টু। এখন আর ওনার সাথে ওনার সহকারী নেই। ওরা এসেছেই ভর দুপুরে, অসময়ে।

বাজার করার লোক জানিয়ে গেল, “বসুন আপনেরা। বাবু আসতেছে।”

জয় বলল, “যা পারেনা তা মারাতে হবে কেন? ভদ্র বাংলার পেছন মারছে।”

হামজা শক্ত মুখে তাকিয়ে বলল, “তোর খাপছাড়া মুখে লাগাম দে, জয়। নয়ত একটা থাপ্পড় মারব, দুটো দাঁত পড়ে যাবে সামনের পাটি থেকে।”-“ব্যাপার না। তবে তাতে তোমার হাজারখানেক ভোট কমবে এবার।”

-“তুই একাই হাজার ভোট মারবি?”

-“আমার বাচ্চারা মারবে। এখন আবার জিজ্ঞেস করোনা, এতো ছোটো বয়সে এতোগুলা কেমনে জন্মাইছি। আসলে সবই ক্যাপাসিটির ব্যাপার!”

-“বড় ভাই আমি তোর।”

জয় অবাক হলো, “আঃ! জানতামই না! আগে বলেননি কেন, সাহেব! আপনি আমার ভাই, অথচ পরিচয়ই ছিলনা! এই সুখ আমি সইব কেমনে?”

ঝন্টু সাহেব নিচে নামলেন। মেয়র সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, “কী খাবে তোমরা?”

জয় ফোন থেকে চোখ না তুলে বলল, “চা-পানি খাওয়ার হলে দুপুরে আসতাম না, মেয়র কাকা। দুপুরের ভোজে কী কী আছে সেটা বলুন।”

মেয়র সাহেব হাসলেন, “খারাপ নেই, পছন্দ হবে তোমাদের। খেলে তো ভালোই, এরকম আন্তরিকভাবে খেতে কয়জন চায়!

''-"আলোচনার ক্লাইম্যাক্স ভালো হলে খেয়েই যাব। এখন চা-কফি মার্কা সস্তা খাবার রাখুন।''

মেয়র বললেন, "হু, শুরু করো।''

-"আপনি বসে যান। আমাদের পরিবার থেকে কেউ মেয়র পদপ্রার্থী হয়ে নির্বাচন করছে এবার, জানেন তো।''

মেয়র হেসে ফেললেন, "কেন, ভয় পাচ্ছ নাকি? আমি বিরোধী দলে থাকলে তোমাদের পরিবারে ভোট পড়বে না!''

হামজা হাসল, "ভয়? ভয় নয়। আমার ছেলেরা আপনার সাথে হাঙ্গামা করবে, কাকা। আমি সুষ্ঠু নির্বাচন চাইছি, তাই আপনি বসে

গেলে ঝামেলা থেকে বেঁচে গেলেন। প্রোফিট আপনার, এডভাইস আমার।”

মেয়র বললেন, “রাজনীতিতে এতোগুলো বছর কাটিয়েছি, হাঙ্গামার সাথে পরিচিত না হয়েই? বেশিদিন বরং ঝামেলা না হলেই খুব মিস করি ঝয়-ঝামেলাকে। তো এভাবে কি সব প্রার্থীকে হাঙ্গামা থেকে রক্ষা করতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে অনুরোধ করে আসবে? তোমার মতো এমন শুভাকাঙ্ক্ষী বিরোধী কয়জনের কপালে জুটেছে রাজনৈতিক জীবনে?

”-“অনুরোধ করছি?” হাসল হামজা, “কাকা! আমি শুধু ছাত্রলীগ করে যে জনতা আর ফেম জুটিয়েছি, আপনি পাঁচ বছর মেয়র থেকে

কেন, আরও দশ বছর সময় নিলেও তার একাংশ নিজের করতে পারবেন না।''

-"আচ্ছা! ক্ষমতাধারী হয়ে গেছ তাহলে! তো সেই হিসেবে এখন তুমি ক্ষমতার জোরে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন নির্বাচন করতে চাও?''

-"উহু! তাহলে সেই জিতকে জেতা বলা চলবে নাকি? আমি শুধু আপনাকে বসতে বলছি।''

-"তুমি বললে আমি বসে গেলাম। ভয় পেয়েছি খুব তোমাকে, জামাই আব্বা!'' নাটকীয়তার সুরে বললেন মেয়র।

স্বাভাবিক স্বরে জবাব দিলো হামজা, "কিন্তু আমি তো আপনাকে ভয় পেয়ে বসতে

বলিনি। ভালোভাবে বুঝেশুনে বসে পড়ুন। বুঝলে আপনি আপনা থেকেই বসে যাবেন অবশ্য!''-“কী বুঝব আমি?''

-“কত কিছুই তো রয়ে গেছে বোঝার!''

মেয়র সাহেব শান্ত স্বরে বললেন, “এমন কী বোঝার রয়েছে, যার জন্য নির্দিষ্ট করে শুধু আমাকেই বসে যেতে হবে? এবং সেটা তোমার বলাতে! আমাকে দূর্বল আর নিজেকে বেশি পাওয়ারফুল ভেবো না। ঝড় কিন্তু আগে পাওয়ার হাউজকেই ড্যামেজ করে, বাপ!''

হাসলেন মেয়র সাহেব কথাটা বলে।

হামজা হাসিমুখে বলল, “আপনি বসে না গেলে বিশাল তামাশা খাঁড়া হবে, কাকা! যেটা

এমনিতেও আপনার নির্বাচন ডাউন করবে।
"মেয়র সাহেব প্রত্যুত্তর করলেন, "তামাশা আমরা না করতে শিখেই রাজনীতিতে আটাশ বছর কাটাইনি, এটা ভুলে যাচ্ছ কেন, পাগল ছেলে! তুমি তো সেদিনের ছেলে! যাহোক, বলো কেন বসতে হবে আমাকে?"
-"আমি চাইছি, তাই! এটুকুই যথেষ্ট। আপনি আমার প্রতিপক্ষ বলে বলছি— এমনটা ভাবাটা কেমন উদ্ভট হয়ে যাবে না? নির্বাচন কেমন হওয়া চাই জানেন! হাজার কয়েক প্রার্থীর ভিড়ে আমি জিতে বসে থাকব, এমন। ইনফেক্টে, আমি আপনাকে আর নির্বাচন করতে

দেব না, ব্যাস! এজন্য আপনি বসে যাবেন। এর চেয়ে বড়ো কারণ দরকার নেই আর।”
স্বাভাবিক ভাবে জানতে চাইলেন মেয়র সাহেব, “না চাওয়ার কারণ?”
হামজা চুপচাপ কিছুক্ষণ মেঝের দিকে চেয়ে থেকে ঠোঁট কামড়াল। এরপর বলল, “এই যেমন সেদিন আপনি জয়কে ডাকলেন কথা বলার জন্য। এরপর নিজেই আবার বোঝাই করা ট্রাক পাঠালেন জয়ের গাড়ি পিষতে। এতে উদ্দেশ্যটা কী? আপনি ডেকে আপনিই কেন জয়কে মারবেন? এই প্রশ্ন উঠবে মার্ডারের পেছনে! আপনি সন্দেহের তালিকা থেকে মুক্ত হবেন, জয় টপকে যাবে। চ্যাহ!

হাজার বছর পুরোনো টেকনিক। এজন্য আমি বলি, রাজনীতি তরুণ জনতাদের জন্য। বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানুষের এসব মারপ্যাচের জগৎ থেকে অবসর নেয়া উচিত। এরকম মুর্খ খেলায় মজতে আমি লজ্জা পেয়েছি, জানেন! আমার প্রতিপক্ষ এতো কাঁচা হলে কী করে চলবে?”মেয়র সাহেব শুধু চেয়ে রইলেন হামজার দিকে সূচাল চোখে। হামজা জিজ্ঞেস করল, “কেন মারতে চেয়েছেন জয়কে?” মেয়র সাহেব চাপা স্বরে বললেন, “জয় নিঃসন্দেহে ছাত্রনেতা হিসেবে খুব দায়িত্বশীল ভাইস প্রেসিডেন্ট। অথচ তলে তলে কুকীর্তির অভাব রাখে না সে। তা তো আর অজানা না

আমার! তবুও কোনোদিন তোমার গিট্টু খুলতে যাইনি সোসাইটিতে, বাচ্চা মানুষ তুমি। দাপট করে বেড়াচ্ছ, বেড়াও। একাই ঝরে যাবে দিন গেলে। কিন্তু এবার জয় কী করল! একটা মেয়েকে খেয়েদেয়ে ভোগে পাঠিয়ে দিয়েছে! তা করেছে, তাতেও দোষ দিচ্ছি না, পুরুষ মানুষ করতেই পারে। কিন্তু আমার ডাক পড়ল দু'দিন পিবিআই ডিপার্টমেন্টে। বাড়িতে তল্লাশি চলল উল্টে-পাল্টে।" এপর্যায়ে মেয়র সাহেব বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন, "আমার রেপুটেশন খেতে উঠেপড়ে লেগেছ দুই ভাই। আমি তোমাদের জান হজম না করে ছেড়ে দিই কী করে? এখন আবার এসেছ হুমকি

দিয়ে লাঠি কেঁড়ে নিতে! বাচ্চাদের খেলাঘরের মতো বিবেচনাবোধ তোমার। তোমার নিজেকে কাঁচা খেলোয়ার মনে হয় না, হামজা?''আজও ঝন্টু সাহেবের যে চিন্তাধারা এবং শীতল দাপুটে আচরণ, তাতে হামজা খুব মজা পায় বরাবরই এই লোকের বিরুদ্ধে পলিটিক্যাল ট্রিক্স চালিয়ে। মনের মতো বিরোধী মনে হয় এনাকে। হামজা চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। পরে বলল, "জয় এসব করেছে, তা কোন ভিত্তিতে বলছেন আপনি?''

মেয়র পান খাওয়া লালচে দাঁত বের করে ক্যাটক্যাটে হেসে উঠলেন "আবার ভিত্তি খুঁজছে, ছেলে! দেখো কাণ্ড!''

হামজা জানালো, “জয় এসব করেনি।”
-“তা নাহয় প্রসাশন জানে, আমি তুমি তো জানি জয় করেছে।”
হামজা জোর দিয়ে বলল এবার, “প্রসাশন যা জানে, আপনার আমারও তা-ই জানার। কারণ, সত্যিটা তা-ই। দুনিয়ার সব অপরাধ তো আর জয় একা করতে পারে না! ওরও তো একটা ক্লান্তি আছে অপরাধ করে! কালুও করতে পারে কাজটা! রাজনের লোকেরা করতে পারে! দিনাজপুরে যে একটা শীর্ষসন্ত্রাস ত্রাসের সাম্রাজ্য গড়ে তাতে বাদশাহী করছে, তা ভুলে যাচ্ছেন আপনি, কাকা!”মেয়র সাহেব চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ

হামজার দিকে। শান্ত শীতল, ধূর্ত নেতাকর্মী হামজা। কোনো কিছুতে বিচলিত হবার প্রবণতা দেখা যায়না তার চেহারায়। মেয়র সাহেব বললেন, “রাজন নাও করতে পারে। তুমিও করতে পারো! ব্যাটাছেলে মানুষ বলে কথা! তুমি ভিত্তি খুঁজছিলে না! ভিত্তি দেই তোমাকে। ধরো, যে ঘটনাটা ঘটেছে মেয়েটার সাথে, তা তোমরা করেছ কোনো কারণে, আর এখন তার দায় আমার ওপর চাপিয়ে আমাকে বদনাম করে ডাউন করতে চাইছ। দুটো নিশানা, একটা তীর! হতে পারে না কি এরকম? আমাকে বসিয়ে মেয়র হবে পাটোয়ারী পরিবারের কেউ। এটাই তো

বলতে এসেছ। যখন দেখলে নির্বাচন খুব কাছে এসে গেছে, প্রতীক বের হয়ে গেছে। আমাকে জেলে পুরা হলো না, তীর লাগল না আমার গায়ে, তোমরা তিন বাপ-ব্যাটাই জন্মের ফাঁসা ফেঁসে গেছ, আর বাড়ি চলে এসেছে বাড়ির ছেলে দুটো!" কথা শেষ করে সোফায় গা এলিয়ে বসলেন ঝন্টু সাহেব। হামজা ডানে-বাঁয়ে ঘাঁড় ঘুরিয়ে গম্ভীর স্বরে বলল, "বেশি বুঝছেন আপনি, কাকা! জয় কিছুই করেনি। আমি যা কামিয়েছে এই লাইনে, এবার চাইলে সংসদ নির্বাচন করলে সংসদের একটা সিট আমার ঘাঁড়ে পড়ে যেত নির্ভেজাল ভাবে। তবে এতো তাড়াতাড়ি লাফ

দিয়ে কলা খাওয়ার নয় আমার। মোরঅভার, এবার নির্বাচন করছেন না আপনি, সোজা কথা। ধরে নিন এটা আপনার পাওনা শাস্তি অথবা আমার জোর, হতে পারে সেই জোরের জেরে শুধুই আমার ইচ্ছে। আপনার শাস্তি এই যে, প্রতীক বের হবার পরে আপনি নিজে গিয়ে নির্বাচন অফিসে নিজের নামটা কেটে আসবেন লাল কালিতে। ভোট কেন্দ্রে আপনার নাম এবং প্রতীকের কোনোরকম ব্যালট পেপার থাকবে না। আপনি যা করেছেন তা তো ভারী পড়বেই আপনার ওপর।''

-“ও তুমি চিন্তা কোরো না, বাপ! আমি ভার বয়ে নেব।”জয় এতক্ষণে হেসে ফেলল, “একটু বেশিই ভার, কাকা! আপনার শক্তিতে নাও কুলাতে পারে! এই বয়সে ঘাঁড় বেঁকে গেলে মুশকিল, মেরুদণ্ডের হাড় ভেঙে গুড়ো হবার চান্সও আছে।”

-“তাই নাকি?”

জয় ফোনটা হাতের মধ্যেই ঘুরাতে ঘুরাতে বলল, “আপনার ইট-বালুর বিশাল ব্যবসা আছে না? কার নামে যেন চলে! আপনার বউ থুক্কু চাচির নামে, নাকি মেয়ে! ঝিরি এন্টারপ্রাইজ। ঝিরি কার নাম, কাকা?”

মেয়র সাহেব ভ্রু কুঁচকালেন। জয় ফোনের স্ক্রিনটা ঘুরিয়ে ধরল। সেখানে দেখা যাচ্ছে–লণ্ডভণ্ড অবস্থায় সন্ধ্যার আকাশের নিচে গাড়ির ফ্রন্ট গ্লাস ভেদ করে খুব কাঁপাকাঁপির সাথে তোলা এক ভিডিও। কয়েক সেকেন্ড পর তার এঙ্গেল চলে গেল

গাড়ির ভেতর থেকে জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে পেছন দিকের দৃশ্যকে শ্যুট করা কোনো ভিডিও ফুটেজ। যেখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে ট্রাকটা এতক্ষণে এইগাড়ির সামনে ছিল, তা গাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে এখন পেছনে চলে গেছে। ট্রাকের পেছনে বেশ বড়ো করে রঙ দিয়ে লেখা ‘ঝিরি

এন্টারপ্রাইজ’।ভিডিওটা তৈরী হয়ে গেছিল জয়ের ফোনের ব্যাক ক্যামেরাতে, সেদিন যখন সে কবীরের ভেটকানো ছবি তুলতে ক্যামেরা অন করেছিল। ঝন্টু সাহেবের মুখভঙ্গিমা দেখে বোঝা গেল না, তিনি কী করবেন! খুব খাঁটি রাজনীতিবিদ, বহুবছরের চলাচল এই পথে তার।

দুজনে বেরিয়ে এলো বাড়ি থেকে। পাশেরটাই হামজার শশুরবাড়ি। জয় খোঁচা মারল, “যাও শশুর বাড়ি, মধুর হাড়ি ভেঙে পেট ফুলিয়ে এসো। মানে আমি আবার গেলে প্রেগনেন্ট হয়ে পেট ফুলবে, তা বলছি না। গিলবে, গিলে পেট ফুলাবে। তোমাদেরই তো দিন,

আমরা বাল সিঙ্গেল মানুষ। না আছে বউ, না শশুরবাড়ি!''হামজা কনুই দিয়ে গলা আকড়ে ধরল জয়ের। রাস্তার মাঝেই দুজনের কুস্তি বেধে গেল এক চোট। কবীর একটু দূরে দাঁড়িয়ে খালি হাসে। জয় একসময় নিজেকে ছাড়িয়ে হাঁপায়, "তোমার ওই পাণ্ডবের মতো হাত দিয়ে আমার গলা চাপলে, রুহু ব্যথায় না হোক, বিরক্তিতেই বেরিয়ে আসবে। এই গায়ে ডিও-মিও কিছু মারো না? ছেহ! কী গন্ধ! ভাবী কাছে আসে তো?''

হামজা আবার তেড়ে গেল রাস্তার ওপরেই। জয় ঝেরে দৌড়, সাথে গালাগাল দিচ্ছে। একটু দূরে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে হাঁটুতে হাত

রেখে দম ফেলে বলল, তুমি থানায় না কোথায় যাবে যাও, আমাকে এখন আর পাবে না। কবীর চলে আয়, আমরা আজ পিকনিক করব। রাতে ব্যাডমিন্টন ম্যাচ আছে আমার।''

-"ভালো হ।''

-"আলগা জ্ঞান দিতে আসবে না। কানে ব্যথা হয় আমার।''সকাল সাতটার বাস। আমজাদ সাহেব রাবেয়া এবং অন্তূর সিট খুঁজে ওদের বসিয়ে দিয়ে পাশের দোকান থেকে একটা পানির বোতল কিনতে নামলেন। অন্তূ আর রাবেয়া পাশাপাশি সিটে বসেছেন। আমজাদ সাহেবের সিটটা আলাদা। কিন্তু দেখা গেল সেখানে এক সিটে একটি মহিলার জায়গা।

অন্তূ উঠে দাঁড়াল, “আব্বু, তুমি আম্মার পাশে বসো। আমি ওই আন্টির কাছে বসছি।

”আমজাদ সাহেব একটু ভাবলেন, পরে গিয়ে বসলেন রাবেয়ার পাশে। অন্তূকে বললেন, অসুবিধা হলে ডাকতে।

অন্তিকের আসার ছিল আজ বাপের সাথে। এসেছে অন্তূ। জোয়ান চাচাতো ভাইয়েরা এসে নিজেদের বাপের পাশে দাঁড়াবে, আমজাদ সাহেবের সেই কপাল নেই। ছেলে বলছে, বউকে ডাক্তারের কাছে নিতে হবে।

অন্তূর একটা বড়ো ভাই আছে, এ কথা স্বীকার করতেও বাঁধে তার আজকাল। সে জানেনা, অন্তিক কেন এমন হলো।

অন্তূকে নিতে চাইছিলেন না আমজাদ সাহেব। মেয়ে মানুষ শালিসে গিয়ে অত লোকের মাঝে দাঁড়াবে, লোকে ভালো চোখে দেখবে না ব্যাপারটা। অন্তূ দৃঢ় গলায় বলেছে, “আব্বু, আমি কোনোদিন যেন তোমার দূর্বলতা না হয়ে উঠি! আর তার কারণ যদি শুধু হয়– আমি মেয়ে। তবে আমার মেয়ে হওয়ার প্রতি আজ ধিক্কার। আমি যাব তোমার সঙ্গে। আর কিছু না হোক, তোমার সন্তান হিসেবে তোমার পাশে গিয়ে তোমার অবলম্বন হিসেবে দাঁড়ানো আমার কর্তব্য। আর তোমার কাছে আমি এমন চিন্তা-ধারা আশা করিনা–সমাজ কী বলবে? সমাজকে এড়িয়ে, পায়ে পিষে, আগে

পা বাড়াতে তোমার কাছেই শিখেছি। তুমিই বলো– সমাজের মুখ আছে বলবে, খারাপও বলবে, ভালো খুব কমই বলবে। এই সমাজকে তোয়াক্কা করা মূর্খতা এবং আত্মনির্ভরশীলতাহীন কাজ। এই সমাজ প্রতিবাদী চেতনাধারীদের নিকট চিরদিন পদদলিত। সমাজের বিরুদ্ধে গিয়ে যারা কিছু করে মরেছে, তারাই কেবল অমর হয়ে রয়ে গেছে যুগে যুগে।''আমজাদ সাহেব স্নেহভরে তাকালেন মেয়ের দিকে। বাসের সিটের সাথে মাথা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে আছে। নেকাবের আড়ালে মুখটা দেখা যাচ্ছে না। অথচ চোখদুটো বুজে থাকার পরেও হালকা

কুঁচকে আছে। তিনি গম্ভীর স্বভাবে মানুষ, সামনে ভালোবাসা দেখাতে অক্ষম, তাই হয়ত অন্তূ কোনোদিন বুঝতে পারবে না–বাবার কলিজার এক টুকরো মাংসপিণ্ডের নাম অন্তূ। কুড়িগ্রাম পৌঁছাতে প্রায় বেলা খাঁড়া হলো। গ্রামের রাস্তাঘাট পেরিয়ে হেঁটে আসার সময় অন্তূর খুব ছোটোবেলার কথা মনে পড়ছিল। আব্বুর হাত ধরে অন্তিক আর সে আসতো দাদুর বাড়িতে। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে আব্বুকে পাশ কাটিয়ে ওর চুলের ঝুটিতে টান মেরে আবার অপরপাশে হাঁটা শুরু করতো। অন্তূ চিৎকার করলে অন্তিক আব্বুকে বলতো, “এই প্যাপুকে কোথা থেকে তুলে এনেছ

আব্বু? খালি সারাদিন ম্যা ম্যা করে। কিছু হয়েছে ওর, কোনো সমস্যাই নেই, তবুও ক্যা ক্যা করে উঠছে। যেখান থেকে এনেছিলে, সেখানেই ফেলে দিয়ে আসবে। আমার এসব প্যাপু লাগবেনা। শুধু শুধু ভাগ বসাতে এসেছে।"

অন্তূ আরও জোরে চেঁচাতে থাকলে অন্তিক হেসে লুটোলুটি খেতো রাস্তার মাঝে। সেসব দিন ফুরিয়েছে, কিন্ত ফুরোনোটা কি খুব জরুরী ছিল? সম্পর্কে যখন এতো মায়া, তবে সেই সম্পর্কের সমীকরণের মান ধ্রুব নয় কেন, জীবনের মোড়ে মোড়ে বদলে কেন যায়?আজ অন্তূ একা একপাশে আব্বুর কাধে

কাধ মিলিয়ে হাঁটছে, অপর পাশে অন্তিকের থাকার কথা ছিল। নেই! সেই রাস্তা আছে, আব্বু আছে, অন্তূ আছে, অন্তিক কেন বদলেছে?

অন্তূর মেজো ফুপুর বাড়ি দাদা বাড়ির পাশে। এই ফুপুকে দাদাভাই নাকি বেশি ভালোবাসতেন। এজন্য নিজের ভাতিজার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে কাছেই রেখেছিলেন। তার বাড়িতেই দুপুরে খাবার খেল তিনজন।

বোনকে ডাকলেন আমজাদ সাহেব, “মাজেদা! তোর কী মনে হয়, ওই জায়গা আমার প্রাপ্য না? এটা আসলেই কোনো যুক্তি–যে আমি এখানে থাকিনা বলে জায়গা পাব না? জায়গা

পরিস্কার না হলে ক্রেতা জায়গা কিনবে না, ঋণে ভরে আছি। লোকজন দুবেলা বাড়ি বয়ে আসছে। মেজো ভাই এতো মূর্খ আর স্বার্থপর হলো কবে?"

মাজেদা দুঃখ প্রকাশ করলেন, "ছিল নাই বা কবে? আমি আর কী কইতাম, ভাই! আমার মেয়েডারে খোজার সাথে বিয়ে দিছে, পুকুরটায় মাছ চাষ করে খায়, আমার কোনো অধিকার নাই সেইখানে। আমি নিজে মরতেছি এই দুঃখে, তোরে আর কী কই!মেজো ভাইয়ের ধর্ম-ঈমান নাই!"অন্তূ শুনল। কিছু বলল না। তার মাথায় আব্বুর শুকনো, অস্থির মুখখানা চক্রাকারে আবর্তন করছে।

শালিস বসল আছরের নামাজের পর। সেখানে আফজাল সাহেব পুঁথি তুলে আনলেন সেই মোঘল আমলের। কবে আমজাদ এখান থেকে চলে গিয়েছিল, আর আসেনি, তার জমি চাষবাস করে সে ঠিকঠাক রেখেছেন, দিনাজপুরে জমি পেয়েছে, সেখানে থাকছে, আবার এখানে ভাগ নিতে আসবে কেন? অন্তূ বেশিক্ষণ চুপ থাকতে পারল না অন্তূ রুখে দাঁড়াল। মাতব্বর মশাইকে বলল, "চাচাজান! আমার দুটো কথা আছে। এখন এটা বলবেন না, আমি ছোটো মানুষ, মেয়ে মানুষ। বড়ো এবং পুরুষ যখন সস্তা আলাপ জুড়েছে এখানে, তখন ছোটো এবং

মেয়েলোককে তো দাঁড়াতেই হবে সঠিক কথা বলতে! ''এরপর আর কেউ অবশ্য কিছু বললেন না। অথচ বিরূপ দৃষ্টি আটকে রইল কিছু কিছু ভাইরাস টাইপের মানুষগুলোর। অন্তূ চাচাকে বলল, "আপনি খুব যুক্তিসঙ্গত কথা বলেছেন, কাকা! আব্বু এখানে থাকেনা সুতরাং এখানকার জায়গা তার প্রাপ্য নয়। সেই সূত্রানুসারে, আপনিও দিনাজপুর থাকেন না। ওখানে আপনার যে পুকুর হিসেবে জায়গা পড়ে আছে, ওটা আপনার পাওনা নয়। উত্তম বিচার। এক কাজ করুন, আগামীকাল কোর্টে চলুন, আপনার ওই জায়গা আব্বুর নামে, এবং আব্বুর এই

জায়গা আপনার নামে রেজিস্টার করার দুটো দলিলে দুজন সই করবেন। এবং তা স্বয়ং আমি তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে করাবো। কোনো গড়মিল হবেনা, আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। তো ওই কথাই রইল, কাকা! কাল কোর্টে আসুন!''

সকলে একদম থ মেরে গেল। ক্ষেপে উঠে দাঁড়ালেন আফজাল সাহেব, "চড়ায়া দাঁত ফালায়া দিমু, বেয়াদ্দপ মেয়েলোক! তোর মতোন কুলাঙ্গার মাইয়া জন্ম দিয়া আবার এই পাড়ায় জমি নিতে আইছে তোর বাপ! একঘরে করতো এই সমাজ তো মতো মাইয়ারে এই পাড়ায়!''অন্তূ হেসে ফেলল, "জি

জি! কেন নয়! এই পাড়ার এই সুবিচারের ভয়েই তো এই পাড়ায় আসিনা জীবনে! অতি উত্তম বিচার হয় এই এলাকাতে। আর এমন সুসমাজে আমার মতো মেয়ে থাকলে প্রতিক্ষণে তামাশা হবে। এজন্যই দূরে আছি, লেখাপড়া করছি, ভালোই চলছে। আজ আব্বুর বাপের ওয়ারিস সূত্রে পাওনা জায়গা বিনা নোটিশে আপনার হয়ে গেছে! এত চমৎকার বিচার যে এলাকায় হয়, সে এলাকার পা রাখার যোগ্যতা আমার নেই। সেই যোগ্যতা অর্জন করতে অনেক নিচে নামতে হবে, কাকা! অত নিচে আমি নামতে

পারব না। এই বিচার দেখতে আসব এই পাড়ায়, সাহস আছে নাকি আমার!”

অন্তূর মুখে নেকাবের আড়ালে শুধু গাঢ় চোখদুটো স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, সেই চোখে প্রতিবাদ, সেই চোখের তারায় তারায় সাম্যবাদ! আফজাল সাহেব অনেক রকমের বাহানা করলেন, এটা-ওটা তুলে নিজের কীর্তন গাইতে লাগলেন। কিন্তু কাটিয়ে দিলো অন্তূ।এক বুড়ো মাতব্বর গোষ্ঠির লোক আমজাদ সাহেবকে বললেন, “ও আমজাদ মাইয়ারে উকিল বানাইলেও তো পারো গো! মাইয়া তো সোন্দর, ভালা কতা কইতে পারে

দেখতিছি। মাইয়াডারে পড়াইও, বহুদূর যাইব হে।”

আমজাদ সাহেব হাসলেন, “দোয়া করবেন, চাচা। সেই আশাই আছে।”শেষ অবধি মুখে মুখে একটা ফয়সালা এলো, আফজাল সাহেবের গোয়ালের যে অংশ আমজাদ সাহেবের জায়গায় চড়ে গিয়েছে, সেটুকু ভেঙে জায়গা বের করে দিতে হবে। এবং যেহেতু গোয়াল ইট-পাথরে গড়াও নয় ওই অংশ! সুতরাং যথাসম্ভব জলদি ভেঙে ঝামেলা মিটিয়ে দিতে হবে, যাতে আমজাদ সাহেব দ্রুত বিক্রি অথবা যা খুশি করতে পারেন।

অন্তূ সন্তুষ্ট হতে পারল না। মুখের এই কথা ঘুরে যেতে চোখের পলকও ঠিকমতো ফেলতে হবেনা। কোনো ডকুমেন্ট- স্ট্যাম্প পেপার ছাড়া এই কথাগুলো কত আনা সুষ্ঠুভাবে মানবে তার কাকা, সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়ে গেল।মার্জিয়ার চাচার বাড়ির লোকসকল আসছে। মার্জিয়া রান্না করছে যত্ন করছে। রাবেয়াও টুকটাক উৎসাহী। অন্তূকে বুঝিয়েছেন, দেখতে এলেই বিয়ে হয়না। তাছাড়া কুটুমও। আমজাদ সাহেব বাজার গেছেন হালকা পাতলা দই-মিষ্টির ব্যবস্থা করতে!

অন্তূর বুক ভার, মুখ গম্ভীর। টেবিলে কনুই ঠেকিয়ে বইয়ে নজর বুলাচ্ছে। জানা নেই লোকগুলো কেমন হবে, তাদের সামনে বসার পর কী প্রশ্ন করবে, শেষ অবধি কী হবে! জীবনসঙ্গী আব্বুর মতো হতে হবে, কথা শেষ। অবশ্য এটুকু ভরসা আছে, যেন-তেন কারও কাছে সম্বন্ধ করবেন না আমজাদ সাহেব। বই ছেড়ে উঠে পড়ল, পড়ায় মনোযোগ আসছে না।

আলো-বাতাসপূর্ণ ঘরটা আমজাদ সাহেব অন্তূকে দিয়েছেন। বারান্দায় কিছু টব রাখা আছে। অ্যালোভেরা, পাথরকুচি, নয়নতারা, পাতাবাহার গাছ আছে। বারান্দা থেকে আলো

ঠিকরে আসছে রুমে। রুমের মাঝে কিছুক্ষণ পায়চারী করল।

পরনে কালো সেলোয়ার-কামিজ। ওড়নাটা সিল্ক সুতির, গায়ে জড়ানো, যার আঁচল মাটি ছুঁয়ে ঝুলছে। চুলের বেণী খুলেছে অল্পক্ষণ, চুলগুলো এলোমেলো। ফুরফুরে ঠান্ডা হাওয়া আসছে বারান্দার গ্রিল ভেদ করে খোলা দরজা দিয়ে ঘরের ভেতরে। অন্তূ পায়চারী করতে করতে হঠাৎ-ই গেয়ে উঠল গুনগুনিয়ে,~আগে কত বৃষ্টি যে দেখেছি শ্রাবণে, জাগেনি তো এত আশা, ভালোবাসা এ মনে...

অন্তূ থমকাল। সে এমন যুবতী সুলভ আচরণ সচরাচর করেনা! মুচকি হাসল।
ফর্সা দেহে কালো পরিচ্ছদ দারুণ চমকাচ্ছে, তার ওপর সূর্যরশ্মির প্রতিসরণাঙ্কন ঝিকিমিকি করে উঠছে মাঝেমধ্যেই! বাড়ির দরজায় কেউ এসেছে। পায়চারী থামাল, আবার শুরু করল। আমজাদ সাহেব ফিরেছেন। রাবেয়া দরজা খুললেন। দৃশ্য অন্যকিছু। তিনটে যুবক দাঁড়িয়ে আছে। জয়ের পরনে চিরায়ত সাদা থানের লুঙ্গি। ছিপছিপে লম্বা দেহটাতে লুঙ্গি বেশ মানায় তার সাথে। হাসিমুখে সালাম দিলো সুন্দর করে, "আসসালামুআলাইকুম, চাচিমা! আমি জয় আমির! মেম্বারের ভাগ্নে!"

রাবেয়া পিছিয়ে দাঁড়িয়ে হাসলেন, “ওহহো জয়! আয় আব্বা, ভিতরে আয়!”
জয় ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, “আপনি চেনেন আমাকে?”
-“চেনবো না? রাস্তায় রাস্তায় পোস্টার দেখি তো! হামজার পাশে তোমার ছবি দেখি!”জয় চমৎকার লাজুক হাসল। রাবেয়া নাশতা আনতে গেলেন। জয় হাসল। আরমিণের মা খুব লোকসুলভ নারী। এদিক-ওদিক তাকিতুকি করল কাঙ্ক্ষিত মানুষটির দেখা পাবার আশায়। কবীর ও লিমনকে বলল, “মহাদেবের ভক্ত নাকি রে তোরা! আবার আলাদা করে বসার দাওয়াত দেব? বস।”

অন্তূর রুম থেকে হালকা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। অন্তূর ধারণা মেহমান এসেছে। পরক্ষণে মনে হলো, পাওনাদার এসে আম্মার সাথে বিবাদ বাঁধিয়েছে! খানিক মানসিক প্রস্তুতির সাথে চুলগুলো হাত দিয়ে একটু এদিক-ওদিক থেকে সরিয়ে দ্রুত কালো ওড়নাটি জড়িয়ে নিলো মাথা-দেহে। ওড়নার বর্ধিত এক প্রান্ত দ্বারা মুখটা ঢাকলো আলতো করে।

বসার রুমে পা রাখতেই চোখাচোখি হলো জয়ের সাথে। ঝাঁকুনি দিয়ে কেঁপে উঠল শরীরটা অন্তূর। থমকানো হাতের শিথিলতায় মুখের আবরণ সরে ঠোঁট ফাঁকা হলো সামান্য!

জয় চোখ সরালো না বেহায়ার মতো গিললো অন্তূর সুরতটুকু। এর আগে সে তার চপল প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে দেখেনি। তার দৃষ্টিতে বহুকিছুর সংমিশ্রণ। প্রথমেক্রূর হাসি ছিল, সেটা এক সময় বিলীন হয়ে অভিভূত হয়েছে চোখদুটো, ধীরে ধীরে সময়ের আবর্তনে তাতে মিশেছে ক্রমশ মুগ্ধতা। বেশি হলে চার সেকেন্ডের ব্যবধানে অঘটন ঘটলো।

চোখের পলকে মুখের আবরণ তুলে নিলো অন্তূ। মেরুদণ্ড শক্ত করে দাঁড়াল, "আপনি? আপনি এখানে এসেছেন কেন? বাড়ি অবধি পৌঁছে গেছেন। আগে থেকেই চিনতেন আমার বাড়ি?"

জয় নিজস্ব ভঙ্গিমায় নজর ফিরিয়ে নিলো। পায়ের ওপর পা তুলে বসল। সোফার উপরিভাগে একহাত ছড়িয়ে বেশ আরাম করে অন্তূর প্রশ্নের জবাব দিলো, “বাড়িতে অতিথি এলে এভাবে ট্রিট করো, আরমিণ! নট গুড! ছ্যাহ”

-“অতিথি ভেদে আচরণের রঙ ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়!”

-“হ। আমারে অতিথি হিসেবে একটু বেশিই পছন্দ হবারই কথা। আফটার অল আমি।”

অন্তূ মুখের কাঠামো শক্ত করল। রাবেয়া এলেন। তার মুখে স্মিত হাসি। জয় নিজের ফর্ম চেঞ্জ করে ভদ্র হলো। রাবেয়ার হাতের

ট্রের দিকে চেয়ে বলল, “আরে আন্টি! এসব কী? দুটো কথা বলতে এসেছি, তা না শুনে কীসব আয়োজনে লেগেছেন!”-“উমম! ছেলে বেশি কথা বলো।” স্বর নরম করলেন, “খা বাপ। ঠাণ্ডা পানি আনি।”

অন্তূ হতাশ হলো। তার মা’টা ভীষণ সরল। যেকোনো যুবক-যুবতীকে খাতির করেন। মহানবী যুবকদের ভালোবাসতেন, তাই। জয় এক টুকরো খাবার তুলে দাঁতের আগায় ছোট্ট কামড় দিয়ে রাবেয়ার চোখ বাঁচিয়ে অন্তূকে চোখ মারল। শয়তানের মতো হাসল। রাবেয়াকে জিজ্ঞেস করল, “আজ কোনো

আয়োজন আছে নাকি বাড়িতে, চাচিমা? গমগম করছে বাড়ি কেমন?''

রাবেয়া হাসলেন, ''হ বাপ! আমার ছেলের শশুরবাড়ির লোক আসবে, সাথে অন্তূরে দেখতে আইতেছে।''

জয় ভ্রু উচিয়ে হাসল, ''আচ্ছা!''

অন্তূ মায়ের ওপর বিরক্তিতে দাঁতে দাঁত খিঁচল। কিন্তু ভেতরে গেল না। কী উদ্দেশ্যে এসেছে জয় আমির, তা অনিশ্চিত। রাবেয়া জিজ্ঞেস করলেন, ''ক্যান আইছিলি বাপ?''

জয় হাসল, ''আসলে চাচিমা! ক্লাবের চাঁদা নিতে এসেছিলাম। জোর জবরদস্তি নেই কোনো, ইচ্ছে হলে..

রাবেয়া উঠে দাঁড়ালেন, “এমনে বলতেছ ক্যান! পাড়ার ক্লাব তো আমাদের সুরক্ষা, হামজা, তুমি এরা তো সুনার ছেলে। দাঁড়া। ”রাবেয়া গেলে অন্তূর ওপর খ্যাকখ্যাক করে উঠল জয়, “আম্মাজান তো ভালোই! তুমি শালি এরম খিটখিটে ক্যান?”

অন্তূ ঝাঁজিয়ে উঠল, “দুর্ভাগ্যবশত আম্মা আপনার প্রকৃতি জানে না। কেন এসেছেন সেটা বলুন!”

-“তোমারে দেখতে আইছিলাম। তুমি যা খ্যাচড়া!”

-“ধন্য করলেন।”

জয় ঢকঢক করে এক গ্লাস পানি খেল। অন্তূ বেশ শান্ত করে বলল, “আপনাদের ক্লাবের জন্য চাঁদা চাইতে আসতে লজ্জা করল না? কী কাজে লাগে ওই শয়তানের ঘাটি?”

জয় হাসল, “বাড়ি বয়ে এসে যদি থাপড়ে যাই, ব্যাপারটা খারাপ দেখাবে না, আরমিণ? চুপ করো, নয়ত তোমার মা টা মানবো বলে মনে হয় না, থাপড়ে চারটে দাঁত উপড়ে দেব। বাড়ি অবধি যখন চলে এসেছি, তোমার টুঁটি চেপে ধরে দম আঁটকে মারতে কতক্ষণ?”অন্তূ চুপ রইল। সে ভয় পাচ্ছেনা, এমন নয়। জয়ের মতো উগ্র ছাত্রনেতাদের ভয় পাওয়াই তো নিয়ম। ওরা জঙলি।

জয় মুখ ভেঙচায়, "আজ নাকি বলি দেয়া হবে তোমার। কোন মনসুর আসতেছে দেখতে?"

নজর ঘুরিয়ে পুরো আপাদমস্তক উপর-নিচ করে দেখল অন্তূর। ভালোই লাগছে তার। অন্তূ সেই নজর লক্ষ্য করে জমে গেল যেন। বাড়ি বয়ে এসে এক অমানব তার শরীর মাপছে। আল্লাহ পাক কবে পিছু ছাড়াবেন এই শয়তানের থেকে? রাবেয়া উৎফুল্ল পায়ে রুমে ঢুকলেন। তার হাতে জড়ানো, মুচরানো দুটো শ টাকার নোট। জয় কবীরকে ইশারা নিতে।

রাবেয়া বললেন, "চলবে এতে?"

টাকা জয় দেখেইনি। তার নজর ছিল অন্তূর শরীরে। দ্রুত মাথা হেলিয়ে বলল, "চলবে?

হ্যাঁ হ্যাঁ চলবে, চাচিমা। না চললে ধাক্কা মারব।
''আমজাদ সাহেব ভেতরে ঢুকে একটু অবাক হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সালাম দিলো জয়, "আসসালামুআলাইকুম, কাকা! ভালো আছেন? শরীর-টরীর ভালো!''

আমজাদ সাহেব তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে গম্ভীর হাসলেন, "ভালোই। কী ব্যাপার?''

জয় বলল, "এইতো কাকা, বিশেষ কিছু নয়!''

-"কবে এসেছ ঢাকা থেকে?''

-"দিন কয়েক হলো। আপনি নাকি রিটায়ার করেছেন?''

-"করতে তো সকলকেই হয় রে, বাপ।''

আমজাদ সাহেব ভেতরে ঢুকে গেলেন। অন্তূ গেল না। রাবেয়া জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার আব্বা-আম্মারা সব ভালো আছে তো ,জয়?”
জয় একটু বিপাকে পড়ল যেন এবার। ঠোঁট কামড়াল, “ওপারে ভালোই আছে মনেহয়। মরার পর আর দুঃখ কীসের মানুষের?
”আঁতকে উঠলেন রাবেয়া, “সেকি! কেউ নেই?”
জয় জবাব দিলো না। অন্তূ এই প্রথম জয়ের মুখটা কিঞ্চিৎ শুকনো দেখল, প্রথমবার রসিক জয়কে গম্ভীর দেখালো। রাবেয়ার মায়া হলো তাগড়া ছেলের ওমন নীরব অপারগ মুখ

দেখে। সস্নেহে কাছে গিয়ে বসে চুলে হাত বুলালেন, “একা থাকো বাড়িতে?”

জয় মাথা নাড়ল, “মামার কাছে থাকি। আচ্ছা, আজ আসি। আবার আসব!”

রাবেয়া বলল, “আবার আসবে। মাঝেমধ্যেই আসবে কিন্তু। জয় বলে ফেলল, “আচ্ছা, আম্মা! চাচিআম্মা।” ভুলেই বলল অথবা ইচ্ছে করে বোঝা গেল না।

-“আম্মা বললে পাপ হবে নাকি? বলতে মন চাইলে বলবে!”

যাওয়ার উদ্দেশ্যে পা বাড়িয়ে ফিরে তাকাল অন্তূর দিকে। ঠোঁটের কোণে বাজে হাসি। অন্তূ চোখ নামিয়ে নিলো। বুকে অস্থিরতা, আতঙ্ক।

জয় বেরোনোর সময় সেদিন পাড়ার দুটো মহিলা ঢুকেছিল অন্তূদের বাড়িতে। জয় সহ কবীর, লিমনকে ঘুরে ঘুরে দেখছিল তারা। অন্তূর ভয় হলো। বাঁকা নজর, বাকা চিন্তাধারা মহিলাদের! না-জানি কোথায় গড়ায় এই নীরব দৃষ্টি।

বাইরে বেরিয়ে রোদচশমা চোখে লাগাল। বাইরে রোদ। কবীর বলল, "ভাই! আমাদের ক্লাবের চাঁদার জন্য তো আগে এইদিক আসা হয় নাই!"

-"তাতে কী?"

-"গতকালের পিকনিক আজ আছে, সেইজন্য টাকা নিলেন?"

জয় বিরক্ত হলো, “তোর মনে হয়, আমাদের পিকনিক এসব টাকায় হয় বা হবে? গু খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিস, নাকি বেশি খাচ্ছিস? এ ব্যাপারে আর প্রশ্ন করিস না।”

কবীর গোমরা মুখে বলল, “কী করব এই টাকার?”

জয় হাসল, “কত দিয়েছে?”

-“দুইশো!”

-“যা, আর কিছু লাগিয়ে এক প্যাকেট ব্যানসন এণ্ড হ্যাজেস আন। যদি হয়, তো এক বোতল বাংলা মালও আনতে পারিস। পিকনিকে যতক্ষণ রান্না শেষ না হয়, চলবে।”ক্লাবের পেছনে বিশাল খোলা মাঠ। সেখানে

ব্যাডমিন্টনের তারজালি টানানো, লাইট লাগানো হয়েছে, কোর্ট আঁকানো হয়েছে। কেউ কেউ র‍্যাকেট দিয়ে শার্টল কর্ক টুকাচ্ছে সেখানে।

ক্লাবের দোতলা মরিচা ধরা বিল্ডিং। দোতলার ওপরে পেছনের দিকে, মাঠের ওপরে খোলা বারান্দা বা ছাদ অথবা সিঁড়িঘরের মতো। সাত-আটজন ছেলেরা দাঁড়িয়ে-বসে আছে সেখানে। অর্ধেক কার্নিশের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আপনমনে সিগারেটের ধোঁয়া গিলছে জয়। এই সময় সে গা গরম রাখতে ব্যাডমিন্টনে নেমে পড়ে। জম্পেশ পিটিয়ে যায়। ঘেমে-নেয়ে একাকার হয়ে যায় শরীর।

আজ রান্নার কাছে না গিয়ে বরং উদাস চোখে ওপরে উঠে এসেছে গিটারটা কাধে নিয়ে। তারপর থেকে একটা করে সিগারেট জ্বালাচ্ছে।

হামজা ঢুকল। সকলে একযোগে দাঁড়িয়ে সালাম ঠুকল। হামজা জয়ের পাশে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, “কী ভাবছিস?”

-“ভাবছি না।”

-“কী হয়েছে, কোনো সমস্যা?”

-“সমস্যাই তো।”

-“কী?”জয় তাকাল, “আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, আমার জীবনে

কোনো সমস্যা নাই। এই সমস্যাটা একটা সমস্যা না, ভাই?"

হামজা গম্ভীর মুখে বলল,"সিগারেটটা দে।"

জয় দিলো না। হামজা কেঁড়ে নিলো সিগারেটটা জয়ের ঠোঁট থেকে। তাতে টান দিয়ে বলল, "ভাবুক হয়ে আছিস কেন?"

-"আজ আরমিণকে দেখলাম।"

-"বিশেষ কিছু?"

-"না, নতুন কিছু।"

তাকায় হামজা। জয় স্বগতোক্তি করে, "চেহারা দেখেছি আজ ওর, ভাই।

-"তাতে কী?"-"শালী মেলা সুন্দরী আছে। মানে বহুতই তো দেখছি, এত ভালো লাগে

নাই কাউরে দেইখা! একদম যারে কাড়াক টাইপের সুন্দরী! কী চোখ, নাক, ঠোঁট, মাইরি! তাক লাইগা গেছিল আমার, সিরিয়াসলি।''

হামজা হেসে ফেলল, "মাথার সার্কিট ফিউজ হয়ে গেছে তোর?''

-"হ। আগে বহু মাইয়া দেখছি, মাগার আমারে বিশেষভাবে আকর্ষণ করবার পারেনাই। আগেও ওর চোখ দেখছি, কিন্তু সেই রকমভাবে খেয়াল করি নাই। আজ কিছুক্ষণ খালি ভ্যাবলার মতো চাইয়া দেখছি। ছ্যহ! এমনিই যে ভাব শালীর, আবার যদি এমনে ঠুটকা খাই তাইলে তো...''

-"অবশেষে বিশাল সমস্যায় পড়েছিস। অর্থাৎ তোর সমস্যা শেষ।"

জয় হামজার চোখে তাকিয়ে হো হো করে হেসে উঠল, সাথে হামজাও। চট করে হাসি থামিয়ে বলল, "ইচ্ছে করে কানের নিচে চাইর খান বাজাই!"

কথা শেষ করে ঢোক গিলল, যেন কথা ফুরায়নি তবুও থামল জয়। হামজা হাসল, "এরপর?"

জয় হাসফাস করে উঠল, "এরপর থেকে শান্তি লাগতেছে না। বুকে বড় জ্বালা। আকাশের দিক তাকায়া আছি, মাঝেমধ্যেই ফর্সা মুখটা ভাইসা উঠতেছে। যেমনে আগে

সিনেমায় দেখতাম, চিঠির পাতায় চিঠি প্রেরকের মুখ, ওমনে।"-"দেখতে খুব ভালো? "

-"না। মেলা ফর্সা!" নিজের হাতের পিঠ দেখিয়ে বলল, "মানে আমার গায়ের রঙের সাথে মিলবে না। হিংসা হচ্ছে আমার। আমার সাথে দাঁড়ালে আমারে কালা লাগবো দেখতে। কালা জামার ভিতর দিয়া হাটা সেই ফর্সা দেখা যাইতেছিল.."

হামজা হেসে ফেলল, জয়ের আর সব ফিউজ হয়ে গিলেও সে জীবনে নিজের ভাব নষ্ট করে কারও তারিফ করে না। জীবনে একটা প্রেম করেনি। গার্লফ্রেন্ডের নাকি কথা মানতে হয়,

তারিফ করতে হয়, রাগ মানাতে হয়! জয় নিজেও কপালে হাত রেখে চোখ বুজে হেসে ফেলল। ধপ করে চেয়ারে বসে হাসিমুখেই ঘাঁড়ে হাত ঘষে আকাশের দিকে চোখ বুজে মুখ তুলে আড়মোড়া ভাঙল। হঠাৎ-ই বলে উঠল, “আরমিণকে লাগবে আমার!”

হামজা সিগারেট ফেলে দিলো, “লাগবে? গ্রোসারি শপের পণ্য নাকি?”-“ভাই, জ্বালানোর জন্য হইলেও লাগবে। আমার তো এই টুকুও সহ্য হইতেছে না, আমি ছাড়া কেউ ওরে দেখবো! আজ নাকি কোনো শালার ছেলে দেখতে আসছিল ওরে, ওই শালারে পোন্দাতে মন চাইতেছে। এই শালা কবীর

আর লিমনও দেখছে। এই শালা, তোরা তাকাইছিস ক্যা? চোখ সংযত রাখতে পারো না শালা? পুরুষের মূল গুণ হইলো, চোখের পর্দা করা। কিলবিল করে, না?”

কবীর জিজ্ঞেস করল ইতস্তত করে, “ভাই, আপনে কি মাইয়ার প্রেমে পড়ছেন?”

গলা কাঁপিয়ে হাসল জয়, “হ। অত্যাধিক মাত্রার প্রেম। এই প্রেমের খাতিরে ওই চেংরিরে কুরবান করতেও রাজী আছি রে কইবরা!”সিড়ি বেয়ে নামতে নামতে বলল, “ওসব আমার সিলেবাসের নাই হে! প্রেম হচ্ছে একটা কামিটমেন্ট, মানে আঁটকে থাকা। জয় আমির কোথাও কখনও কামিটেড হতে

পারে না। ওসব ভুদাইদের কামকাজ। মেয়েবাজি আলাদা বিষয়, কিন্তু ওসব কাব্যিক প্রেম-পিরিতি আমার সিস্টেমে নাই! ছোটোলোকি কারবার।''

নেমে গেল গিটারটা কাধে করে খোলা ছাদ থেকে। হামজা নেমে এলো জয়ের পিছু পিছু। বেশ ঠান্ডা পড়েছে। একটা স্লিভলেস শার্ট গায়ে জয়ের। কালো জ্যাকেটটা ঝুলছে কাধের ওপর।

বেশ কিছুক্ষণ একটানা র‍্যাকেট পিটালো। গা ঘেমে প্যাকপ্যাকে হয়ে উঠল। চিৎকার করল মিউজিক বক্সের পাশে বসা থাকা ছেলের ওপর, “গানের সাউন্ড বাড়া! ভাত খাও নাই

শালা, দুপুরে! এনার্জি ড্রিংক কিনে এনে দেই একখান?''

ধুম-ধারাক্কা গান বাজছে। জয় একাধারে র‍্যাকেট পিটিয়ে গেল। শার্টল কর্ক সামনে আসছে তো গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে পিটিয়ে যাচ্ছে। একবারও মাটিতে পড়ার সুযোগ দিলো না। এমনভাবে দাঁত খিঁচে খিঁচে পিটিয়ে আঘাত করছে যেন কোনো চাপা ক্ষোভ ঝারছে ওই পেটানোতে।ক্লান্ত হয়ে এসে ভেজা ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল।

এই পথ আগেরই মতোন, ঠিক তেমনই আছে
এই রাত সেই রাতের কত কথা বলে..
চলে যাওয়ার বিষাদ সুর, এখনও হৃদয়ে বাজে

তারপরেও কেন যেন এইখানেই ফিরে আসে
সব ভুলে গিয়ে আবার হারাতে চাই...
তারপরেরটুকু আর গাইল না। আবার নতুন সুর তুলল গিটারে। এবারে ঝাঁজাল সুর উঠছে। ছেলেরা বিমোহিতের মতো ঢুলছে তালে তালে। জয়ের প্রানোচ্ছল চঞ্চলতা ক্লাবের ছেলেদের প্রাণশক্তি যোগায়। ওরা নেশাক্ত একেকটা জয়ের ওপর।

জয়ের গানের গলা অদ্ভুত সুন্দর। কেমন এক গা ছমছমে মাথায় কেঁপে ওঠে গলাটা! যখন সে গলা ছেড়ে ব্রান্ড পার্টির মতো মাথা নাড়িয়ে পাগলের মতো গান গায়। জয় আবার গাইল,তুমি কি দেখেছ কভু, জীবনের পরাজয়

দুঃখের দহনে করুণ রোদনে তিলে তিলে
তার ক্ষয়
সকলে বিমোহিতের মতো চেয়ে রয় জয়ের বোজা চোখ দুটোর পানে। গলা ছেড়ে, মনের গভীর থেকে গান গাইছে। একমাত্র বোধহয় গান গাওয়ার সময় জয় মনের গভীরে ডুব দেয়, অন্যথায় তাকে কখনও সিরিয়াস বা ইমোশোনাল হতে দেখা যায় না। অথচ এই গিটার তার বহিঃপ্রকাশ, অল্প একটু সত্যতা আর পরম স্নেহের ধন। আবারও অন্য সুর তুলে গলা বাজিয়ে চেঁচিয়ে গাইল,খাঁজার নামে
পাগল হইয়া,
ঘুরি আমি আজমীর গিয়া রে

এত করে ডাকলাম তারে, তবু দেখা পাইলাম না
ওরে পাগল ছাড়া দুনিয়া চলে না, ওরে ....
মন পাগল ছাড়া দুনিয়া চলে না..
রান্নার কাজে এসব দেখাশোনায় খুব পটু। নিজের একার তদারকিতে ক্লাবের শত শত ছেলেকে পালছে। যারা ওর পাপ দেখেনা। হাতাটা হাতে নিয়ে মাংসে নাড়া দিতে গলা ছাড়ল,
তুই পাগল তোর মন পাগল
পাগল পাগল করিস না
পাগল ছাড়া দুনিয়া চলে না...হামজা ফোনে কথা বলছিল। দেখে মনে হয় সহ্য হলো না।

দৌঁড়ে গিয়ে হামজার কাধে ওঠার চেষ্টা করল। হামজা তাল হারিয়ে পড়ে যেতে নিয়ে আবার ফোন-টোন রেখে মাঠের ওপারেই তেড়ে গেল জয়ের দিকে। জয় ছুটছে অন্ধকারের দিকে, পেছনে তেড়ে দৌড়াচ্ছে হামজা। এখন বেশ কিছুক্ষণ দুজন অন্ধকারে কাটাবে। মাঠের আঁলের ওপর বসে কীসের গল্প জমাবে। হামজার কাধে মাথা রাখবে জয়। এরপর রাত ফুরিয়ে যাবে।
দুজন দৌড়ে আবার ঘুরে এলো। হামজা হাঁপিয়ে গিয়ে বসল শিশির ভেজা মাঠের ওপর। খানিক বাদে কোত্থেকে দৌঁড়ে এসে

হামজার কোলে মাথা রেখে ঠান্ডা ঘাসের ওপর টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল জয়। জয়ের সামনে হামজা নেতৃত্ব ও গাম্ভীর্য কোনোদিন টেকে না। যত সিরিয়াস মুহূর্তই হোক, ওই জয়ের সাধ্যি আছে হামজাকে জ্বালিয়ে এক মুহূর্তে সব পণ্ড করার।ভোটের হিরিক বেঁধেছে চারদিকে। শোরগোল লেগেছে এলাকা জুড়ে। পোস্টার লাগানোর ব্যস্ততা চলছে চারদিকে।

পিবিআই কার্যালয়ে নতুন ব্যস্ততা। আঁখির মর্গ-টেস্টের রিপোর্ট এসেছে। মুস্তাকিনের পূর্ব-ধারণা কাঁটায় কাঁটায় মিলেছে। তার সন্দেহ মাফিক কারও বিরুদ্ধেই কোনো প্রমাণ

আসেনি রিপোর্টে। মুস্তাকিনের এখন ইচ্ছে করল রিপোর্ট তৈরী করা ডাক্তারের মুখের ভেতরে পিস্তলের নল ঢুকিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করতে, যে কারা আঙুল ঘুরিয়েছে রিপোর্ট অবাস্তব এবং স্ক্রিপটেড তৈরিতে!বেশ কিছুক্ষণ রিপোর্ট দেখে সেটা ছুঁড়ে ফেলার মতো টেবিলে ছুঁড়ে ফেলল। এমন কিছুই রিপোর্টে নেই যা দ্বারা অপরাধী শনাক্ত করা যায় বা কোনো ক্লু পাওয়া যায়! পুরো নিরপেক্ষ একটা রিপোর্ট। যেখানে শুধু প্রকাশ পেয়েছে আঁখিকে মারা হয়েছে কীভাবে, তার দেহে কী কী ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

লাশ আঁখির বাড়িতে পাঠানো হয়েছে। এখন আর ওদের বাড়িতে গিয়ে বিশদ জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়া এই কেইস টানার এনাদার কোনো ওয়ে রইল না।মুস্তাকিন বেরিয়ে এলো নিজের কেবিন থেকে। বাইরে কিছু কাজবাজ রয়েছে। বোরকায় আবৃত একটা মেয়ে এগিয়ে আসছে কার্যালয়ের ভেতরে। দাঁড়াল মুস্তাকিন, ভ্রু কুঁচকে চেয়ে রইল। মেয়েটাকে চোখে পরিচিত লাগছে। ভার্সিটি চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল, ধাক্কাও খেয়েছিল তার সঙ্গে এই মেয়েটাই!দুপুর দুটোর মতো বাজে। শীতের রোদ বাইরে। মেয়েটা এসে দাঁড়াল মুস্তাকিনের সামনে। তার চোখে কোনো

ইতস্তত ভাব নেই। দৃঢ় চোখের চাহনি, আত্মবিশ্বাস ভরপুর তাতে। মাহমুদ এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "ম্যাডাম, কোনো প্রয়োজনে এসেছেন? কিছু বলতে চান?"

মেয়েটা মাথা নাড়ল। মাহমুদ বলল, "জি, কার সঙ্গে কথা বলতে চান!"

মেয়েটা মুস্তাকিনের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি কি কিছুটা সময় দিতে পারবেন?"

মুস্তাকিন ভ্রু জড়িয়ে মেয়েটাকে দেখে হাতঘড়িতে সময় দেখল। তারা বসল বাইরের একটি ডেস্কে।

চেয়ারে বসে টিবিলের ওপর হাত রেখে দু'হাত একত্র করে কয়েক সেকেন্ড দেখল

মেয়েটাকে মুস্তাকিন। এরপর বলল, “জি বলুন, কী বলতে চান?” কণ্ঠস্বর ভারী, কৌতূহলি।-“আমি মাহেজাবিন আরমিণ অন্তূ। দানেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী।”

-“জি, চিনতে পেরেছি। কিন্তু আপনাকে কোন নামে সম্বোধন করা যায়?”

-“লোকে আরমিণ অথবা অন্তূ ডাকে।”

-“আমি কোন নামটা বেছে নেব?”

-“আপনার ইচ্ছেমতো!”

মুস্তাকিন এবার সোজা হয়ে বসল, “তো মিস অর মিসেস অন্তূ! কী বলতে চান?”

-“মিস।”

মুস্তাকিন ঘাঁড় কাত করল। অন্তূ বলল, “আপনাদের টিম রিসেন্ট যে কেইসে কাজ করছে, সে ব্যাপারে কথা বলার ছিল!” মুস্তাকিন সন্তর্পণে কপাল জড়াল, “আপনি কিছু জানেন? আই মিন, কী বলতে চান এ ব্যাপারে?”

-“আপনারা কতদূর পৌঁছেছেন?”মুস্তাকিন মাথা নাড়ল, “দুঃখিত। আম জনতাকে আমাদের তদন্তের ব্যাপারে এভাবে তথ্য দিতে পারি না।”

-“তা দিতে পারেন না। তবে তা না জানলে আমি গতিবিধি বুঝব কী করে?”

জহুরী চোখে তাকাল মুস্তাকিন, “আপনি কীসের গতিবিধির কথা বলছেন? কী জানেন, খোলাশা করুন। বুঝতে পারছি না।”

-“লাশ আসার পর আঁখিদের বাড়িতে গিয়েছিলেন?”

-“না, যাইনি।”

অন্তূ বলল, “আমি ওখান থেকেই আসছি। আবারও নতুন করে ঘা জেগে উঠেছে বাড়ির। আপনারা কাউকে সন্দেহ করছেন না? রিপোর্ট কী বলছে?”

সরাসরি এভাবে একটা মেয়েকে এত দ্বিধাহীন এসব কথা বলতে শুনে একটু অপ্রস্তুত বোধ করল মুস্তাকিন। কথাগুলো খুব পেশাগতভাবে

বলছে অন্তূ। মুস্তাকিন চোখ নামিয়ে ভাবুক হয়ে রইল কিছুক্ষণ। এরপর বলল, “আপনি ঠিক কী বুঝাতে বা বলতে চাচ্ছেন, অন্তূ! ”-“রিপোর্ট দিয়ে নিশ্চয়ই তেমন কিছু বের হয়নি, তাই না অফিসার!”

মুস্তাকিন ভ্রু কুঁচকে ফেলল। অন্তূ বলল, “আমার প্রথমে জয় এবং হামজার ওপর সন্দেহ হয়েছিল।”

-“আর এখন? এখন হচ্ছে না? হলে কেন হয়েছিল, আর না হলে কেন হচ্ছে না?”

অন্তূ হাসল, “ব্যাপারটা অতটাও সরল-সহজ নয়, তা আপনিও জানেন, অফিসার! এভাবে ধারণার ওপর ভিত্তি করে কেইস মিলে যাবার

মতো কেইস নয় এটা। আপনি কি এটা জানেন, কিছুদিন আগে আঁখির মেজো ভাই সোহান মারা গিয়েছে?''

মুস্তাকিন জবাব না দিয়ে তাকিয়ে রয় অন্তূর দিকে। অন্তূ বলল, "এই ব্যাপারটা নিয়ে ঘাপলা কাজ করছিল আমার ভেতরে। আজ তো কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার মতো অবস্থায় নেই ও বাড়ির লোক। তবে আমার মনেহয় সোহানের মৃত্যুটা স্বাভাবিক ছিল না। এখানেও কোনো ব্যাপার আছে।''মুস্তাকিন হাত দুটো একত্র করে গুটিয়ে থুতনির কাছে নিয়ে এলো। শার্টের ওপর দিয়ে তার বাহুর পেশি ফুলে উঠেছে। কব্জিতে ঘড়ি। গলার কাছে

শার্টের বোতাম খোলা, হাতা গোটানো কনুই অবধি। বিন্যস্ত পোশাক ও চেহারা। সন্দিহান কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, "আপনি এসবে এত ইন্টারেস্ট নিচ্ছেন কেন?"

অন্তূ চুপ রইল ক্ষণকাল। হঠাৎ-ই বলল, "আজ আমি চুপ থাকব, তামাশা দেখব। আঁখির পরের শিকারটা আমি হব না, এমন গ্যারান্টি কার্ড তো পাইনি! আর তাছাড়াও.."

মুস্তাকিন সপ্রতিভ হয়ে চাইল, ভ্রু উচালো, "তাছাড়াও?"

-"তাছাড়াও আঁখির পরিবার ভয়ে বারবার বলছে, বিচার চাইনা। ধরুন ওদের হয়ে সেই

সকল জানোয়ারদের বিচার আমি চাই।'' চাপা তেজ বহির্ভূত হলো অন্তূর কণ্ঠস্বর ভেদ করে। মুস্তাকিন মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তো আপনি কী চাইছেন?
আমাদেরকে সাহায্য করতে
চান এই কেইসে?''-"উহু! সাধারণ মেয়ে আমি। এতখানি সক্ষমতা নেই, এরকম একটা ভয়ানক কেইসে মাথা ঢুকিয়ে এক্টিভিটির সাথে আপনাদের সহায়তা করব। তবে এটুকু দাবী জানাতে এসেছি, যেকোনো মূল্যে এই কেইসের শেষ দেখবেন আপনারা। আঁখির মৃত্যুর জন্য না হোক, মেনে নিলাম কোনো না কোনো একদিন মানুষের হায়াত ফুরোয়।

সকলের কপালে স্বাভাবিক মৃত্যু লেখা থাকে না। কিন্তু ওর সম্মানহানি এবং ওর সাথে হওয়া অত্যাচার যেন চাপা না পড়ে যায় আপনাদের গাফলতির নিচে। এই অনুরোধটুকু করতে এসেছিলাম।"

মুস্তাকিন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো না। কিছুক্ষণ চুপ রইল। পিবিআই এর কার্যালয়ে এসে পিবিআই অফিসারের কার্য গতিবিধিতে আঙুল তোলার সাথে সাথে বিচার দাবী করছে। ইন্টারেস্টিং লাগল মুস্তাকিনের কাছে ব্যাপারটা।

-"তবে প্রমাণ এবং ক্লুর খুব অভাব কেইসটাতে। এমন কোনো সূত্র এখন অবধি

আমাদের টিম পায়নি, যা দ্বারা এই কেইস এগোতে পারে। এরকম আর কিছুদিন না পেলে কেইস এমনিতেই চাপা পড়ে যাবে। তবে আমাদের চেষ্টা জারি আছে।''

অন্তূ বেরিয়ে এলো। কিছুক্ষণ চেয়ে দেখল মুস্তাকিন অদ্ভুত মেয়েটিকে।

অন্তূ রাস্তা পার হওয়ার উদ্দেশ্যে রাস্তার পাশে এসে দাঁড়াল। তখনই সামনে দিয়ে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল হামজার গাড়িটা। অন্তূ টের পেল না।যতক্ষণ দেখা যাচ্ছিল, জয় ক্ষ্যাপা চোখে দেখল অন্তূকে।ঘাঁড় ফিরিয়ে হামজাকে বলল, ''অন্তূ পিবিআই

ডিপার্টমেন্টের সামনে? “কাহিনিই বুঝতে পারতেছি না শালীর!”

হামজা গম্ভীর স্বরে বলল, “গরম রক্ত, প্রতিবাদ ভরা। হয়ত ওই মেয়েটার বিচারের জন্য লড়তে চাচ্ছে! তুই নজরদারী করছিস কেন ওর ওপর?”

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল জয়, “তোমার সৎ নেতাগিরি আর নীতি পেছনের পকেটে রাখো! ওর সন্দেহ আমার আর তোমার ওপর! এবারেও কি তোমার নীতিকথা শোনাবে, নেতাজি!”

হামজার হাতের পিঠে গাঢ় জখম। জয় যতদ্রুত সম্ভব গাড়ি চালাচ্ছে। চেপে রাখা

টিস্যু রক্তে ভরে উঠেছে। অথচ হামজা নির্বিকার ভঙ্গিতে ভ্রু কুঁচকে তাকাল, “আমার-তোর ওপর কেন? আমি-তুই ওর কী করেছি? ”

জয় স্টিয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতে জবাব দিলো, “চলো, জিজ্ঞেস করে আসি।”গাড়ি এসে থামলো এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে। ভেতরে ভর্তি রয়েছে দলের কয়েকটা ছেলে। গতকাল মারামারি হয়েছে ভার্সিটির মোড়ে ঝন্টু সাহেবের ছেলে মাজহারের লোকেদের সাথে। অবশেষে জয় যখন গিয়েছিল, শেষ পর্যায়ে তার হাত কেটেছে, কপাল ফেটেছে, পিঠে আস্ত একটা

লাঠি ভেঙেছে। জয়ের টুকটাক ব্যান্ডেজ লাগলেও মাজহারের ছেলেদের অবস্থা খারাপ। কিন্তু সবচেয়ে বড় আঘাত পেয়েছে হামজার সেক্রেটারী লতিফ।

দলের লোকেদের হামজা সর্বদা কেবিনেই এডমিট করায়। আম জনতার ভিড়ে রিস্ক থাকে এসব মামলায়। দুজন গিয়ে বেডের পাশে দাঁড়াতেই লতিফের বউ কাঁদতে কাঁদতে উঠে এলো। এখনও বেহুশ লতিফ। লতিফের কোমড়ের ওপর পেটের বাঁ পাশে ছু রি কা ঘা ত করা হয়েছে মারামারির কোনো একসময়ে। রাস্তার পাশে পড়ে ছিল সে। হামজা অবশ্য নির্বাচনের আগে প্রস্তুত ছিল এসবের জন্য

একবার।মারামারির সূত্রপাত ঘটেছে সকালের দিকে। মাজহারের ছেলেরা ক্লাবঘরে ইট-পাটকেল ছোঁড়াছুঁড়ির মাধ্যমে ঘটনার শুরু। জয়ের মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষা ক'দিন বাদে। সপ্তাহখানেকের মধ্যে দু'দিনের জন্য ঢাকা যাবে সে। ক্লাবে সে ছিল না তখন, হামজা পড়তে বসার জন্য চাপে রেখেছে, কিছুদিন কারবার থেকে দূরে থাকতে বলেছিল। কিন্তু ইট-পাটকেল ছুঁড়ে মাজহারের ছেলেরা থামেনি। নোংরা ভাষায় হামজাকে গালি দিয়েছে। তখন হামজার ছেলেরা বেরিয়েছিল। দুপুর বেলা লতিফের সাথে এই অঘটন ঘটে যাবার পর জয় বিকেলে পড়ালেখা ছেড়ে

বেরিয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যার পর ভার্সিটি মোড়ে তুমুল মারামারি শুরু হলো দুই দলের। লাঠিসোটা, ককটেল, সাথে ছুরি ছিল ছেলেদের হাতে। জয় দুটো ছেলেকে বেদম পিটিয়েছে, সেসময় প্রতিরোধ করার জ্ঞান থাকেনা জয়ের। এটা তার অপারগতা। যখন কাউকে মারতে শুরু করে, তাকে বৃষ্টির মতো মারা যায়, সে একনিষ্ঠ চিত্তে শুধু ছেলে দুটোকে মেরেছে। তার মাঝে নিজে জখম হয়েছে বেশ ভালোমতোই।মাজহার নিজে উপস্থিত ছিল না। সকালে জয়কে না ডেকেই হামজা পৌঁছে গেছিল পলাশের ডেরায়। দিনাজপুরের নামকরা সন্ত্রাস পলাশ আকবর

আর রাজন। দুজনের সাথে ভালো মিল মাজহারের। সাথে দুটোকে মহাজনও বলা চলে। কড়া সুদে টাকা ধার দেয় মানুষকে, পরে তার বদলে জমি, ঘরের জিনিস অথবা ব্যবসা কেঁড়ে নেয়ার বহু নজির আছে। সেখানে গিয়ে মেরে এসেছে হামজা মাজহারকে। জয় সেখান থেকে নিয়ে আসছে হামজাকে। এখন অবধি জিজ্ঞেস করেনি, মাজহারের কী অবস্থা। কীভাবে মেরেছে, কী হাল করেছে! হামজা খুব শান্ত-শীতল মেজাজের পুরুষ। যতক্ষণ না জয়কে আঘাত করা হয়, তাকে ক্ষেপতে দেখেনি ছেলেরা। কিন্তু লতিফের স্ত্রীর কান্নাকাটি দেখেছে সে

রাতে, লতিফের বাচ্চাদুটোর শুকনো মুখ দেখেছে। লতিফের রক্তাক্ত শার্টখানা দেখেছে। হামজাকে চেয়ারে বসিয়ে রেখে জয় দ্রুত গেল নার্সকে ডাকতে। এই অসময়ে হাসপাতালে নার্সের সংখ্যা কম চারদিকে। ব্যস্ত নার্স দাঁড়াতে বলল জয়কে। হুট করে জয়ের মেজাজ চটলো, অমানুষের মতো হয়ে উঠল মুহুর্তে, দাঁত খিঁচে উঠল, "ওঠ, তাড়াতাড়ি ওঠ! তোর পাশে যে মগা দাঁড়ায়ে আছে ওরে বল, ক্যানোলা ঢুকায়ে দিক এই লোকের! তুই আমার সাথ চল। ভাইয়ের হাতে রক্ত পড়তেছে, শুনতেছিস না কথা!" চেঁচিয়ে উঠল শেষের দিকে।

নার্স কেঁপে উঠল। দ্রুত উঠে দাঁড়াল। রাগে শরীর কাঁপছে জয়ের। এখানে হামজা থাকলে নির্ঘাত একটা থাপ্পড় মারত কোনো মেয়ের সাথে এমন দূর্ব্যবহারের ফলে। নার্সকে নিয়ে এসে দাঁড় করালো হামজার পাশে। আসলে অনেকটা রক্ত বেরিয়ে সাদা পাঞ্জাবী রঙিন হয়ে উঠেছে হামজার। গালের পাশে কালশিটে দাগ দেখা যাচ্ছে। এটা অস্বাভাবিক নয়, নির্বাচনের আগে এমন অঘটন ঘটারই ছিল। ঝন্টু সাহেব ও তার ছেলে যে চুপচাপ বসবে না, এটা জানা কথা। নার্স ভয়ার্ত গলায় বলল, “কিছু ওষুধ আনতে হবে।”জয় তাড়া দিলো,

“হ্যাঁ, বলেন সিস্টার কী কী ওষুধ লাগবে? আমি এনে দিচ্ছি, দ্রুত বলেন!”

নার্স অপ্রস্তুত হলো, কিছুক্ষণ আগে কী ব্যবহার ছিল, এখনই আবার সিস্টার বলছে! একটা কাগজে নাম লিখে দিলো। জয় কারও হাতে দিলো না কাগজখানা। নিজে দৌঁড়ে বেরিয়ে গেল ওষুধ আনতে। হামজা চেয়ে রইল জয়ের যাবার পথে। নিজের হাতের তালুতে ব্যান্ডেজ জড়ানো, কপালে ব্যান্ডেজ, কোমড়ে ঘা। সে ছুটছে ভাইয়ের ওষুধ আনতে। হামজা এটাই সবাইকে বোঝাতে পারেনা, পুরো পৃথিবীর জন্য জয় আমির

জঘন্য এক নাম, সেও মানে। কিন্তু বিশেষভাবে তার জন্য ওই ছেলেটা বিশেষ! লতিফের চিকিৎসার সমস্ত খরচা হামজা বহন করল। কেবিনের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল সকলে। শেষ রাতের দিকে সার্জারি করা হয়েছে লতিফের। এখনও সেন্স ফেরেনি। চিন্তিত মুখে নিজের ব্যথা ভুলে উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে পায়চারী করে চলল হামজা। সে কোনো সময় চায় না তার জন্য দলের ছেলেরা মূল্য দিক। সেদিন নিষেধ করে আসার পর হামজা নির্বাচন অফিসে গিয়ে ঝন্টু সাহেবের আপিল বাতিল করে এসেছে। তাতে যে ঝন্টু সাহেব ক্ষেপবেন তা জানা কথা। তবে আঘাতটা

লতিফকে করে ওর পরিবারকে বিদ্ধস্ত করে তোলাটা ঠিক হয়নি ঝন্টু সাহেবের। মাজহার ভালো ঘা খেয়েছে। যতদিন নির্বাচন শেষ না হচ্ছে, ঝামেলা যে টুকটাক লেগেই থাকবে, এ-ও জানা কথা। নির্বাচনের পরেও কোনো বিশেষ ঝামেলা হওয়ার চান্স রয়েছে।রাত করে বাড়ি ফিরল হামজা। জয় ঢুকে পড়ল নিজের ঘরে। তার পড়ালেখায় গাফলতি চলবে না এখন। ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে ডাকল মামিকে। দ্রুত পায়ে তরু এগিয়ে গেল, "কী হয়েছে, জয় ভাইয়া? খালামণি অসুস্থ, ব্যথা বেড়েছে। কিছু দরকার?"

জয় জ্যাকেটের চেইন খুলে ইশারা করল জ্যাকেটটা খুলে নিতে। তরু জ্যাকেট খুলে নিয়ে সেটা হ্যাঙ্গারে বাঁধিয়ে রাখল। জয় বাথরুমে ঢুকতে ঢুকতে বলল, "এককাপ গরম কফি বানিয়ে দে তো। আমি মামির কাছ থেকে ঘুরে এসে খাবো। আর ঘরটা ঝাড়ু দে, পায়ে নোংরা বাঁধছে!"

তরু ঝাড়ু দিতে দিতে দেয়ালের দিকে তাকায়। চারদিকে বড়-ছোট ফ্রেমে বাঁধানো জয়ের ছবি, ওয়ালমেটে ভর্তি ঘরের দেয়াল। জয় যখন মামির রুমে এলো, দেখল, হামজা মায়ের মাথার কাছে বসে আছে। মামা বারান্দার পাশে চেয়ারে বসা। মুখ বাঁকাল

জয়, “ওখানে বসে কি নিজেকে বীরপুরুষ প্রমাণ করতে চাইতেছ? বারান্দা দিয়ে ঠান্ডা আসছে না? পরে তো খেঁক খেঁক করে কাশবে। তোমার কাশির আওয়াজ শুনতে একটুও ভাল্লাগে না, মামা! দরজা আঁটকে বসো!”

শাহানা ব্যথায় কুঁকড়ে গেছেন। হামজা মাথা নিচু করে বসে আছে মায়ের শিওরে। জয় বকে উঠল, “শালার ডাক্তাররা যদি কষ্টের সময়ে চিকিৎসা না করতে পারবে, তাইলে ডাক্তার ট্যাগ লাগানোর মানে কী? ব্যথা এখন, সার্জারি করবে মাস কয়েক পরে, এইটা কোনো চিকিৎসার মধ্যে পড়ে?”তুলি জবাব

দিলো, “তুই চুপ থাক! না বুঝে চেঁচাবি না। সবকিছুই তো আর তোর মুখের বকার মতো সহজ না! আগে ওষুধ খাইয়ে, ভেতরে একটা সার্জারির মতো পরিবেশ তৈরী করে এরপর সঠিক সময়ে সার্জারি করবেন ডাক্তারেরা। তোর মতো পদার্থবিজ্ঞান পড়ে অপদার্থ হয়নি তারা। ডাক্তার ওরা ভালো বোঝে।”

জয় দাঁত খিঁচে বকতে গিয়ে আবার চুপ করল। এখানে সবার মন খারাপ, এখন চুপ থাকা ভালো মানুষের কাজ। জয়ের ধারণা, সে খারাপ হলেও মাঝেমধ্যে একটু ভালো মানুষের মতো আচরণ দেখিয়ে লোককে চমকে দেয়া ভালো।

বাইরে বেরিয়ে এলো। বাড়িটা খুব বিষণ্ন লাগছে। জয়ের ভালো লাগছে না বিষয়টা। কালই গিয়ে কোয়েলকে আনতে হবে। ও থাকলে এখন দৌঁড়ে এসে কোলে উঠে আবদার করতো, “মামা! আমিও ব্যান্ডেজ লাগাবো। এরপর দুজন চক্কেত কিনতে যাব। ম্যাচিং ম্যাচিং হবে তোমার আমার ব্যান্ডেজ। ”শরীরের ব্যথা রাত বাড়ার সাথে সাথে প্রকট হচ্ছে। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালো। কোমড়ের ক্ষততে টান ধরেছে, পুরো গা-হাত-পা বিষব্যথা হয়েছে, এখন বোঝা যাচ্ছে। জয়ের রুমটা বাড়ির পেছন দিকে। এখান থেকে বাড়ির পেছনের জঙ্গল চলে

গেছে। বিশাল ফাঁকা পতিত জমি পড়ে আছে, সেখানে জঙলি গাছ-পালা জন্মেছে। তরু কফি রেখে চলে যাবার সময় জয় ডাকল, “খাবারটা রুমে দিয়ে যা তো!”জয় জানে, ও না বললেও মেয়েটা ঠিক নিয়ে আসতো। কেন এত যত্ন করে জানার বা বোঝার চেষ্টা করেনি কখনও জয়। তবে এই নিঃসঙ্গ পাপে ভরা জীবনে এই মেয়েটার বেশ মনোযোগ পায় সে। তরু খাবার আনল, জয় তখন বিছানায় বসা। তরু খাবার রেখে চলে গেল না। দাঁড়িয়ে রইল। জয় জিজ্ঞেস করল, “দাঁড়িয়ে আছিস কেন?” চিকন, মিষ্টি কণ্ঠস্বর তরুর, “আপনি নিজে খেতে পারবেন? আমি খাইয়ে দেব?”

অবাক হলো না জয়, সে জানতো এমন কিছুই বলবে তরু। চেয়ে রইল তরুর মুখের দিকে কয়েক সেকেন্ড। এরপর মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। যত্ন করে খাওয়াতে বসল তরু। খাবার চিবোতে চিবোতে একবার তরুকে দেখে নিয়ে নিঃশব্দে হাসল জয়, “আমি খারাপ, লোকে নাম শুনলেই নাক ছিটকায়। তুই বিশেষ এই যত্ন কেন করিস?”
তরুর চোখের ঘন পাপড়ি নড়ে উঠল। একবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলো। আস্তে করে বলল, “হাঁ করুন!”
জয় লোকমাটা গালে না নিয়ে আবার হাসল, “ভালোবাসিস আমায়?”হাত থেমে গেল

তরুর। চোখের কোণে জলের ছিটা জমেছে। জয় হালকা ব্যস্ত হলো, “এই পাগলি, এই! কাঁদছিস কেন? আমি স্বয়ং পাপ, আমাকে ভালোবাসতে নেই। এজন্য আমিও পাপকেই ভালোবাসি অবশেষে। জীবনে এমন সব নিকৃষ্ট পাপ করে রেখেছি, কেউ যদি তার শাস্তি কোনোদিন দেয় আমায়, তাহলে তা হবে আমার জঘন্য মৃত্যু! আবার আমার পাপের পেছনে এমন কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নেই, যা শোনার পর মানুষ ইমোশনাল হবে, বা বলবে এই জন্য আমি বাধ্য হয়েছি বা এমন হয়েছি। সবই করেছি ক্ষমতার জোরে। তুই যে আমায় ভালোবাসিস, তুইও সমান পাপী। কারণ

আমার মতো পাপীষ্ঠকে কোনো সুন্দর মনের মানুষ ভালোবাসতে পারেনা, তা জানি আমি। যে কোনোদিন আমায় ভালোবাসবে, বা বেসেছে, আমি জেনে নিই, তার ভেতরেও আমার মতোই পাপ আছে। নয়ত কেউ আমার পক্ষপাতিত্ব করতে পারেনা।''তরু চুপচাপ খাবার খাওয়ায় জয়কে। সযত্নে মলম লাগিয়ে দিলো পিঠের ক্ষততে। ওষুধগুলো খাইয়ে দিয়ে, জয়ের হাতের ঘড়ি, শার্টটা খুলে দিলো। শুইয়ে দিয়ে কম্বলটা গলা অবধি তুলে দিয়ে মাথার কাছে বসল। গভীর মনোযোগের সাথে জয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো, চুল টেনে দিলো, কপাল টিপে দিলো। জয় চোখ

বুজে চুপচাপ নেয় সেই সেবাগুলো। একদৃষ্টে চেয়ে রয় তরু জয়ের মুখের দিকে। খোঁচা দাড়ির গালটা হাত দিয়ে আদর করতে ইচ্ছে করছে। জয়ের নিঃশ্বাস ভারী ভারী পড়তে শুরু করে। বহুদিন এভাবে পাশেই শুয়ে পড়েছে সে জয়ের। অথচ সকালে উঠে নিজেকে অক্ষত অবস্থায় দেখে জয়ের প্রতি ভালোবাসা বেড়েছে। একটা তাগড়া পুরুষের পাশে রাত কাটিয়ে যখন বোঝা যায়, পুরুষটি হাতও লাগায়নি নারী শরীরে, সেখানে প্রেম জাগার নয়? তরু মানে, জয় খারাপ। কিন্তু তার আপেক্ষিকতায় জয়ের খারাপের শিকার হয়নি সে, সুতরাং তার ভালোবাসা জায়েজ।

হঠাৎ-ই তরু একটা অকাজ করে বসল। গাঢ় একটা চুমু খেলো জয়ের কপালে। ফিসফিস করে বলল, “আপনাকে ভালোবাসা যদি পাপ হয়, আপনাকে ভালোবেসে আমায় যদি পাপী হতে হয়! তো পাপই ঠিক, আমি সেই পাপই করেছি। প্রেমিকা না হয়ে বরং আপনার পাপীষ্ঠা নারীই হয়েছি। তবুও আমি আপনাকে ভালোবেসেছি, জয় আমির! একথা অনস্বীকার্য, একথা চিরধার্য!''জয়ের ঠোঁটের এক কোণ প্রসারিত হয়ে উঠল। অবচেতন কানেই কথাগুলো শুনে ফেলল জয়? তরু আর বসল না, দৌঁড়ে বেরিয়ে গেল জয়ের রুম থেকে।

সকাল নয়টায় হামজার ঘুম ভাঙল জয়ের

গলাভাঙা গানে। হিরিক বেঁধে গেছে যেন গানের। সে কোনোসময় বিষণ্ন থাকেনা। সিচুয়েশন যেমনই হোক, অল টাইম চিল! এটা তার স্লোগান! ভেসে আসছে টুংটাং গিটারের সুর আর আধভাঙা গলায় তোলা সুর,

~মনে পড়ে বারবার, সময়ের কারবার, রাস্তারা ফেরোয়ার হারিয়েছে আজ..
চাওয়াদের শেষ নেই, জানি তবু পারি কই,
চড়ে বসি বারবার স্বপ্ন জাহাজ..
চাইলে চলে যা যদি, না থাকে উপায়,
সুঁতোয় বাঁধা জীবন ছেড়ে পালাবি কোথায়.....

হাতের ব্যান্ডেজ নিয়েই শুরু করে দিয়েছে টুংটাং গিটার বাজানো!

নড়তে চড়তেই হামজার মুখচোখ কুঁচকে উঠল গায়ের ব্যথায়! রিমি নেই। রাত থেকে মেয়েটা কথা বলছে না। গলা বাড়িয়ে ডাকল, "জয়..জয়! এদিকে আয়। জয়.."জয় আওয়াজ দিলো, "জি সাহেব।"

রুমে ঢুকে বলল, "চালু হয়ে গেছে তোমার ভাঙা রেডিও! ওটা থামাও তো, ঘ্যারঘ্যার করছে।"

ধপ করে শুয়ে পড়ল বিছানার ওপর হামজার পাশে। হামজা জিজ্ঞেস করল, "আমার ডাক

শুনতে ভাঙা রেডিওর মতো ঘ্যারঘ্যারে লাগছে?''

-"এত ভালোও লাগেনা শুনতে। ওই ধরো.."

কুশন তুলে মুখের ওপর ছুঁড়ল হামজা, "কীসের মতো লাগে তাইলে?"

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল জয়, "বললে চাকরি থাকবে না।"

-"চাকরি তোর এমনিতেও থাকবে না। আমি যদি তোর গানের গুণগান করি, তুই তো মেয়েলোকের মতো হাত-পা আঁছড়ে কাঁদতে লেগে যাবি! সেই হিসেবে আর হারুণফাটা মার্কা গলায় গান গাইবি না, বাড়ি থেকে পাছায় লাথি মেরে বের করব তোকে।''জয়

ভাব নিয়ে থ্রি-কোয়ার্টার প্যান্টের পকেটে একহাত রেখে দাঁড়াল, “তোমার বাপের এই ঘুনপোকা ধরা ভেঙরি বাড়িতে আমি আছি, শুকরিয়া আদায় করো!”

-“বিশাল কামাই করছিস থেকে! যা ভাগ!”

-“ও তুমি বুঝবা না, ব্রোহ! মামির কাছে জিজ্ঞেস কোরো, সে বুঝিয়ে দেবে, আমি হলাম সোনার ডিম দেয়া রাজহাঁস!” অকপটে খোঁচা মারা কথা বলে দাঁড়িয়ে রইল জয়। হামজা হাই তুলে বলল, “যা, গিয়ে পড়তে বস। তার আগে ওখান থেকে আমার তোয়ালেটা দে।”

জয় চোখ ছোট করে তাকায়, “ক্যান, তুমি উঠতে পারতেছ না? পরনে কোনো জাঙ্গিয়া-টাঙ্গিয়াও নাই নাকি?”

একলাফে বিছানা থেকে নামল হামজা, দাঁত খিঁচল, “এদিকে আয় শুয়োর, তোর জাঙ্গিয়া খুলে তোকে শহর ঘুরিয়ে আনবো আজ আমি! ”দৌঁড়ে ঘর ছাড়তে ছাড়তে জয় চেঁচায়, “ছিহ ভাই! ছোট ভাইয়ের ইজ্জত মানে জাঙ্গিয়া নিয়ে টান পাড়াপাড়ি করতে বাঁধলো না তোমার? আমি ভার্জিন একটা, সরল-সহজ নিরীহ ছেলে, ভাই! সব রেখে সোজা জাঙ্গিয়াতে হামলা? নাউযুবিল্লাহ! এই মুখ আর সমাজে দেখানোর যোগ্য রাখলে না আমার!”

হেসে ফেলল হামজা। হাতের কুশনটা সজোরে ছুঁড়ে মারল। গোসলে যাবার জন্য তোয়ালে ঘাঁড়ে করে রিমিকে ডাকল কয়েকবার। জবাব এলো না। খানিক বাদে তরু এলো, "কী হয়েছে, বড় ভাইয়া? কিছু দরকার?"

গম্ভীর চেহারায় মাথা দুলালো হামজা, "তোর ভাবীকে দরকার!"

মুখ লুকিয়ে ফিক করে ঠোঁট চেপে হেসে ফেলল তরু। রিমি এলো। মুখ ভার। এসেই বিছানা গোটাতে শুরু করে রিমি। হামজা এগিয়ে গিয়ে পেছন থেকে জাপটে ধরল রিমিকে, কাধের ওপর থুতনি ঘঁষে বলল, "কী

হয়েছে ম্যাডামের? কথা না বলার ব্রত রেখেছেন নাকি?''রিমি ছাড়ানোর চেষ্টা করল হামজাকে, হামজা আরও শক্ত করে পেট চেপে ধরল। তার লোমশ বুকটা ঠেকল রিমির পিঠে। দমল না রিমি, মুচরামুচরি করছে খুব। হামজা এবার রিমির হাত দুটো মুঠো করে চেপে ধরে নিজের দিকে ঘোরালো। হামজার বিশালদহী শরীরের তুলনায় নেহাত ছোটোখাটো অভিমানিনী মেয়েটা। হামজা কপট চিবিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে, এমন করছ কেন? আমার দিকে তাকাও, রিমি!''

তীক্ষ্ণ চোখে তাকায় রিমি, জবাবদিহি চাওয়ার মতো শক্ত মুখে বলে, “মাজহার ভাইকে মেরেছেন আপনি? কেন?”

হামজা নরম হলো, ব্যান্ডেজ করা হাতটা শিথিল করে রিমির থুতনিতে বুলাতে বুলাতে বলল, “তোমাকে বলেছি না! আমার কাজ এবং পার্টির ব্যাপারে না ভাবতে। এসব বিষয় তোমার মাথায় রাখতে হবে না, এই নিয়ে রাগ করে আছ? চ্যাহ! আমার দিকে তাকাও, এদিকে দেখো!” থুতনি উচিয়ে ধরল হামজা।

-“আপনার পার্টির ব্যাপার? এটা আপনার পার্টির ব্যাপার বলে মনে হয়? মাজহার আমার চাচাতো ভাই!”

হুট করে হামজা শক্ত হলো যেন, ঘাঁড় কাত করল, “আর আমি?”-“আর আপনি কী? অমানুষ স্বামী আমার! তাই তো? মাজহার ভাইকে ওভাবে কেন মেরেছেন জানোয়ারের মতো?”

-“আমার ক্ষতগুলো নজরে আসছে না, তোমার?”

-“আপনার ক্ষত? সেটা মাজহারকে মারতে না গেলে তো হতো না! ওকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কতটা মারলে তা করতে হয়? কী মার মেরেছেন ওকে? মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন? ও আপনাকে আগেই মেরেছে? নাকি আপনার জানোয়ার মার্কা হাত থেকে

নিজেকে রক্ষা করতে আপনাকে আঘাত করেছে?''

হামজা শাসিয়ে উঠল, চোখ লাল হয়ে উঠেছে তার, ওভাবেই চিবিয়ে বলল, "মাজহার জয়কে মেরেছে। তুমি বেশি কথা বলছো, রিমি!''-"একদম ঠিক বলেছেন, নেতাবাবু! আজ একটুও কম কথা বলার ইচ্ছে নেই আমার। জয়কে মেরেছে বলে আপনি ওকে মেরে ফেলার মতো করে মারবেন?''

-"জীবিত কবর খুঁড়ে মাটি দিয়ে দেব। বুঝেছ তুমি! কেউ জয়ের গায়ে হাত লাগালে, তার হাতটা গুঁড়ো করে ফেলব ভেঙে।'' চিবিয়ে উঠল হামজা।

-“বাহ বা! নেতাবাবু! জয়ের সামনে সবাই পর, আর আপনি আপনার শীতল স্বভাবের বিপরীতে এক পশুর সমান? কেউ আপনার কেউ না? আমাকেও চিনতে পারছেন না? জয় এতই আপন আপনার?”

-“তুমি তোমার নিজের কথা বলোনি, রিমি! মাজহারের হয়ে উকালতি করছো, দরদ দেখাচ্ছ। কেন? সে তোমার চাচাতো ভাই বলে? ওয়েল! তাহলে, জয় আমার জান। এবার বোঝো, ওর শরীর থেকে র ক্ত ঝরলে আমার কোথায় ব্যথা লাগে! তোমার চাচাতো ভাইকে বলে দিও, দরকার পড়লে আমাকে যেন কুপিয়ে চারভাগ করে ফেলে আমার

ওপর রাগ থাকলে, কিন্তু জয়ের গায়ে আঁচ লাগলে, জীবন্ত পুড়িয়ে ফেলব!''রিমি অবাক হবার সাথে সাথে কেঁদে ফেলল, গলা ও থুতনি ভেঙে এলো তার, "তার মানে আপনার কাছে নিজের অথবা আমার কোনো মূল্য নেই?'' এগিয়ে এসে হামজার ব্যান্ডেজ করা কব্জিতে হাত রাখল আলতো করে, "আপনার কিছু হলেও সমস্যা নেই? আমি তারপর ভেসে বেড়াব আপনাকে ছাড়া, তাতেও সমস্যা নেই আপনার? শুধু জয়ের কিছু হলে ব্যথা লাগে আপনার বুকে?''

-"অবুঝের মতো কথা বলো না!'' হামজা নরম হলো একটু।

-“অবুঝের মতো তো এতদিন ছিলাম! আজ প্রথমবার বুঝলাম, আমার জায়গাটা কোথায় আপনার জীবনে! আমি শুধুই একটা অপশন অথবা উদ্বাস্তু হয়ে রয়ে গেছি আপনার কাছে! সামান্য এক জয়ের জায়গা নিতে পারিনি আপনার ভেতরে..”

-“আমায় রাগিও না, রিমি! চেনোনি আমায়। একটা মানুষের ভেতরে সবার জন্য আলাদা আলাদা স্থান থাকে। জয়ের জন্যও তেমনই আলাদা একটা বিশেষ স্থান আছে আমার ভেতরে! তার মানে এই নয়, তোমাকে আমি ভালোবাসি না। ভালোবেসেই বিয়ে করে এনেছিলাম, ভুলে বসেছ সব? এক চাচাতো

ভাইয়ের খাতিরে তুমি আমার অবস্থান ভুলে যাচ্ছ মনেহয়!''

-''আপনিও তো জয়ের সামনে আমার অবস্থান ভুলে বসেছেন।''-''শুরুটা কাল রাত থেকে তুমি করেছ। আমি যখন জখম হয়ে রুমে এলাম, তোমাকে ডেকেও বারান্দা থেকে রুমে আনতে পারিনি, শরীরের ব্যথা নিয়ে ওভাবেই কাতরাতে কাতরাতে শুয়ে পড়েছি। তারপর টের পেয়েছিলে জয় উঠে এসে কম্বল টেনে দিয়ে, ব্যথার ওষুধ খাইয়ে, আবার একচোট ঝগড়া করে গিয়েছে রুম থেকে? জয় আমার জীবনে বিশেষ কিছু, এটা অনস্বীকার্য সত্য!''

-''বিশেষ নয়, গোটাটাই ওর আপনি!''

-“না বুঝে কথা বোলো না। জয় পুরো দুনিয়ার জন্য জঘন্য এক ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠলেও, সেদিনও আমার কাছে, এবং চিরদিন ও আদরের। লোকের সাপেক্ষে না, আমার সাপেক্ষে বিচার করলে ওকে ভালোবাসা আমার জন্য জায়েজ।

-“কেন? সে কী এমন মহান লোক?

”-“কোনোদিন ওর শার্টটা খুলে পিঠের দিকে নজর দিও। এখনও দগদগে একটা ঘায়ের দাগ বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে পিঠে। যখন তুমি এসেছিলে না আমার জীবনে যখন নেতা হয়ে উঠিনি আমি, সেকালেও জয় নিজের শরীরে গুলি খেতে আমার সামনে এসে পিঠ পেতে

দিয়েছিল। তখন আমি ছাত্রনেতা হয়ে উঠিনি। ওর সেই পিঠ পেতে খাওয়া গুলি আজ আমায় বাঁচিয়ে না রাখলে তোমার ভালোবাসা অবধি পৌঁছাতাম না আমি। তার আগেই আমার কিচ্ছা ফুরিয়ে যেত। আমার বুকের গুলি পিঠে খাওয়া ওই নষ্ট ছেলেটাকে এই হামজা পাটোয়ারী খুব ভালোবাসে। ও আমার ফুপাতো ভাই না, আমার জান! পর্ববর্তীতে তুমি ওর বিপক্ষে কোনোদিন কথা বলতে এসো না। আমি চাই না এ নিয়ে কোনো ভাগাভাগি হোক! আমার জীবনে জয়ের তুলনা শুধু জয়, ও আমার বিজয়-জয়।''রিমি কেন জানি ফুঁপিয়ে উঠল। হামজা দুটো শ্বাস নিয়ে

রিমির একদম কাছে গিয়ে দাঁড়াল, “রাজনীতিবিদের বউ হতে গেলে বহু পারিপার্শ্বিক বুঝ আর ধৈর্য্য থাকতে হয়। আমি ভাবতাম, তোমার তা আছে। আজ তা ভুল লাগছে। মাজহার তোমার চাচাতো ভাই হওয়ার আগে, আমার প্রতিপক্ষ। তার সঙ্গে ঝামেলা হলে তুমি তোমার স্বামী অথবা ভাই, কার পক্ষে থাকবে সেটা তোমার বিষয়। কিন্তু আমি আমার গতিবিধি থেকে পিছপা হতে পারি না। রাজনীতিতে চলতে গেলে, বহু সম্পর্কে জবাই করে সামনে এগোতে হয় এক পা এক পা করে। তাই করে এগিয়েছি! তুমি জানোনা সেসব।”

-“তাহলে জয়কে জবাই করেননি কেন আজও? ওর সাথেকার সম্পর্ককে জবাই করবেন কবে?”

কপাল জড়িয়ে ফেলল হামজা, খানিক পরে ধাতস্থ হয়ে জবাব দিলো, “ও কখনও আমার পথে বাঁধা হয়ে আসেনি।”-“আর যদি আসে?
”

কিছুক্ষণ রিমির জেদি মুখের দিকে চেয়ে থেকে হেসে ফেলল হামজা, “তুমি দেখছি জয়কে নিজের সতিনের মতো হিংসা করো!”

একরোখা কণ্ঠে বলল রিমি, “তার চেয়েও খারাপভাবে। আমার ওকে সহ্য হচ্ছে না, একটুও না।”

-“কেন?”
-“ওর কাছে গিয়ে আপনি ভাগ হয়ে গিয়েছেন আমার থেকে। আজ আমার সাথে চোখ রাঙিয়ে, আমাকে শাসিয়ে কথা বলতে দ্বিধা করেননি। আর কিছু বললে গায়ে হাতও তুলতেন!”
এবার হামজা একটু সপ্রতিভ হলো। কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়ে নরম সুরে নিজেকে উপস্থাপন করার সুরে বলল, “এতটা নিচু আর কাপুরুষ আমি কখনোই হতে পারব না যে, কোনো নারী, বিশেষ করে তোমার গায়ে হাত উঠবে। আর সবটাই ভুল ধারণা তোমার!

”অভিমানে জড়ানো কণ্ঠে বলল রিমি, “তাই হোক, তবে এই ভুল নিয়েই বাঁচতে চাই।”

-“এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তুমি।”

হামজা আজ বের হলো না। জয়কে কঠোর নিষেধাজ্ঞা দিলো। সকাল দশটা অবধি ঘরে বসে থেকে দম আটকে গেল জয়ের। তরু এসে দুবার দেখে গেছে। ওষুধ দিয়ে গেছে সকালে।

ছাদে গিয়ে বসল। ছাদে দুটো বিভাজন। ছোট্ট এক টুকরো তরু চেয়ে নিয়ে ফুল গাছ লাগিয়েছে। বাকিটা ছাদটা জয়ের চিলেকোঠা, ছোটো আমগাছ, কবুতরের খাঁচা।

তরু এসেছিল কয়েকবার দেখতে। শরীর ভাঙা। রোদে বসে আছে।

তরু বলল "গোসল করবেন না? পানি ভরেছি।"

-"পরে করব। থাক।"

পা মেলে বসে বইয়ে চোখ বুলালো। গিটারটা তুলে নিয়ে গান গাইল, তো কখনও ঠান্ডা হয়ে পড়ে থাকা চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে।তরু এসে জিজ্ঞেস করল, "শরীর খারাপ লাগছে?"

-"না। ঊনিশ শতকের মেয়েলোকের মতো ঘরবন্দি জীবন কাটাচ্ছি, তো শরীর আর মন আবার লুঙ্গিডান্স দেবে নাকি এই অবস্থায়! যা তো তুই! কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান করিস না,

মা! মেজাজ চটে যাচ্ছে যেকোনো কিছুতেই! যাহ!”

দুপুর দেড়টার দিকে এই শরীরেই বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। সম্ভব নয় এভাবে ঘরে পড়ে থাকা। হামজা তখন ব্যথার ওষুধ খেয়ে ঘুমাচ্ছে নিজের রুমে।বেশ ভালো রোদ বেরিয়েছে দু'দিন বাদে। আগের দু'দিন সূর্যের তেজ কম ছিল। ক্লাস শেষে বিল্ডিং থেকে বের হয়ে শহীদ মিনারের সম্মুখে এসে দাঁড়াল অন্তূ।

-“অন্তূ!”

পেছন ফিরে তাকাল অন্তূ। প্যান্ট-শার্টের ওপর সাদা রঙা বিশাল একটা শাল জড়ানো জয়ের

শরীরে। উদ্ভট ব্যাপার। সাধারণত পরে লুঙ্গি। তাছাড়া কড়া রোদ বেরিয়েছে, তাতে চাদরের প্রয়োজন নেই। ঘৃণায় চোখ নত করল অন্তূ। জয় সামনে এসে দাঁড়াল, "তোমার নাম কে রেখেছিল?"

-"আপনার কাছে প্রয়োজনীয় কোনো টপিক থাকে না, তাই না? অবশ্য যুক্তিযুক্ত বিষয় আপনার সাথে যায়ও না!"

-"তুমি শালী চটকানা খাবা। থাপড়ে তোমার মুখের নকশা বদলে দিই, তার আগে প্রশ্নের উত্তর দাও!"

অন্তূ বিরক্তি গিলে চোখ বুজে বলল, "আব্বু রেখেছ। এখন আমি যাই?"

জয় যেন শুনতে পেল না শেষের কথাটা, "তোমার বাপ এই ভেটকি মার্কা নাম ছাড়া মুল্লুক ঘুরে আর কোনো নাম পায় নাই? অন্তূ, আরমিণ! কীসব বেওড়া নামের বাহার!"

অন্তূ নাক কুঁচকে তাকাল, বেওড়া কী?-"তখন গিয়ে শুধরে দিয়ে আসতেন, তা তো আর দেননি। এখন সেই পুরনো পুঁথি গাওয়ার মানে হয়না। কোনো প্রয়োজন আছে আমার সঙ্গে?"

চমৎকার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, "হু! আছে তো, সুইটহার্ট! তোমার সাথে বহুত প্রয়োজন আছে আমার। তবে আপাতত কথা আছে তোমার সঙ্গে।"

-“আমার সঙ্গে কী কথা আছে, আপনার?”
জয় পিছনের দলের উদ্দেশ্যে মুখ বেঁকিয়ে অসহায়ত্বের ভান করে বলল, “উফফ! কেউ বোঝা একে, আমার সাথে তেজ না দেখাতে। আমি ডিস্টার্বড হই খুব।”
অন্তূ তাড়া দিলো, “জলদি বলুন। আমার কাজ আছে।”
জয় নাক টানলো আবারও, গলার স্বর বসে গেছে, শুনতে আতিফ আসলামের মতো লাগছে কণ্ঠস্বর, “উহহু রে! এত হুটোপাটা করলে তোমাকে দেখতে আরও বেশি গরম লাগছে, সুইটহার্ট!”

-"সুইটহার্ট!"কাধ ঝাঁকালো জয়, "ইয়াপ! সুইট-হার্ট! আমার সাপেক্ষে তুমি একখান সুইটহার্ট। আমি তো ভালো না। মাগায তোমার কাছে একটা সুন্দর, মিষ্টি হৃদয় আছে, সুতরাং তুমি সুইট-হার্ট অথবা মিষ্টি-হৃদয়!"
অন্তূ তাচ্ছিল্য হাসল, "সেই সূত্র অনুসারে তো আমি সকলেরই সুইট-হার্ট!"
জয় হুট করে দাঁতে দাঁত পিষলো, "জানে মেরে ফেলব, খালাস হয়ে যাবে একদম দুনিয়া থেকে, আমি বাদে তুমি আর যার যার সুইটহার্ট! আমি ডেকেছি এই নামে, সুতরাং শুধুই আমি ডাকব।"

নিজস্বতা দেখানোর এই ভঙ্গিমাটাও কেবলমাত্র জয়ের রসিকতারই অংশ, বুঝে অন্তূ চুপ রইল।

-“চলো! কোথাও বসি!”

অন্তূ হাসল, “আপনার মাথা নষ্ট, সিনিয়র।”

ঘাঁড় নেড়ে সম্মতি জানায় জয়, “ঠুকছো সিস্টার! তা একটু আধটু অবশ্যই! তাই বলে তুমি খোঁটা দিতে পারো না আমায়!”

অন্তূ সুন্দর করে হাসল, “নাটক শেষ হয়েছে আপনার? শো শেষ হলে এবার আমি যাই?”

জয় মাড়ির দাঁতে জিহ্বা ঠেকিয়ে হাসল, “নাটক ভালো লেগেছে তোমার? ভালো লাগলে আর একটু করি!”
-“খুব বাজে ছিল!”জয় ঘাঁড় চুলকালো, “হু! শুনেছিলাম, প্রেমে পড়লে মানুষের মেধা হারিয়ে যায়। আমারও নাটক কথার গুণ হারিয়ে গেছে, তোমার প্রেমে পড়ে। উফফ! কী যে প্রেম প্রেম পাচ্ছে তোমায় দেখে! ইচ্ছে করতেছে, দাঁত চোপড়ার স্ট্রাকচার বদলে দিই। এত প্রেম কেন তোমার মধ্যে? প্রেমের গোডাউন যেন!”
জয়ের নাটক দেখে অন্তূর ঘৃণার উদ্রেক হওয়ার সাথে সাথে হাসিও পেল। একটা

মানুষ কতটা খারাপ মানসিকতার হলে কাউকে জ্বালাতন করতে এমন বাজে পন্থা অবলম্বন করতে পারে?

শহীদ মিনারের সিঁড়ির ওপর বসল জয়। বসার সময় চাদর উঠে যাওয়ায় ক্ষত দেখা গেল। পৈশাচিক এক আনন্দ হলো অন্তূর।-“আরমিণ!”

-“হু!”

-“চলো বিয়েশাদী করে ফেলি! কত বয়স হয়ে গেল আমার, কতকাল একা ঘুমাব অত বড় বিছানায়?”

অন্তূ অতি ধৈর্য্যের সাথে হাসল, “ভাবনাটা ভালো। তবে সব ভাবনা বাস্তবায়িত করতে হবে কেন?”

-“ভাবনা বাস্তবায়িত না করলে চলে। কিন্তু, চাহিদা! সেটা পূরণ না করলে কী করে চলবে?”

ঠোঁট উল্টে সায় দিলো অন্তূ, “যুক্তি আছে যুক্তিতে! এই সৌভাগ্য আমার কোনো নেকির ফল, যে আমি আপনার চাহিদা হয়ে উঠেছি!”

জয় বেশ উৎসাহিত কণ্ঠে বলল, “এক্স্যাক্টলি! কোনো না কোনো নেকির কাজ তো করেছিলেই জীবনে, এজন্যই তো আমি তোমার প্রেমে মজে যাচ্ছি দিন দিন। কী

জাদুটাই করলে, শালী তুমি! মেরে ফেলো আমায়!”

কবীর একটু নড়েচড়ে উঠল এবার, কাশল গলা খাঁকারি দিয়ে। জয় দ্রুত পিছে ফিরল, “কী রে! তুই আবার অস্ত্র বের করছিস নাকি? আরে শালা, প্রেমিকার প্রেমে মরা আর তোর মতো ব্রয়লারের অস্ত্রের আঘাতে মরা এক না রে পাগলা! তার ওপর প্রেমিকার সামনে তোর হাতে জখম হয়ে মরলে মান-ইজ্জত কিছু থাকবে?”

অন্তূ জিজ্ঞেস করল, “আপনার জরুরি কথাটা বললেন না এখনও!”-“আ’লাভিউ! প্রেমে পড়ে যাও আমার!”

অন্তূ হাসল, “এই জনমে তো না!”
-“পরের জনম অবধি অপেক্ষা করতে বলছো?”
-“জি, একদম! যেটার কোনো অস্তিত্ব নেই।”
-“তাহলে তো যা হওয়ার আর করার, এই জনমেই করতে হবে।”
-“এত খারাপ দিন আমার জীবনে কোনোদিন আসবে না।” অন্তূর শীতলভাবটা কেমন ন্যাপথলিনের টুকরোর মতো বাষ্প হয়ে যাচ্ছে যেন, কড়া হয়ে উঠছে কণ্ঠস্বর।
জয় উঠে দাঁড়াল, “তোমার জীবনে এত ভালো দিন আমি রাখব না যে, তুমি আমায় ভালো না বেসে পার পাবে! চ্যালেঞ্জ কোরো না

আমায়। আমি সিরিয়াস হয়ে গেলে খুব বাজেভাবে ফেঁসে যাবে!''কথাটা দারুণ প্রভাবিত করল অন্তূকে। কর্কশ গলায় বলে উঠল, "ধরুন, চ্যালেঞ্জ করলাম! এতটুকু দৃঢ়তা তো আমার এই আমি'র ওপর রাখি আমি যে, এমন কোনো দূর্বলতার অস্তিত্ব নেই এই জগতে, যেটা আপনার মতো সভ্যতাহীন, আদিম পশুকে ভালোবাসতে বাধ্য করতে পারে আমায়! যেখানে স্বয়ং মৃত্যুকে আমি চ্যালেঞ্জ করছি এর পেক্ষিতে। মরণ স্বীকার করলাম আপনার কথার বিপরীতে।''

সতর্ক করার মতো করে করে শান্ত স্বরে বলল জয়, "আরমিণ, তোমার এসব

কনফিডেন্স আমায় আবার সিরিয়াস না কোরে তোলে, দেখো!''অটল হলো অন্তূর কণ্ঠস্বর, "আপনার এই কথাটাই আমার জিদের আগুনে কেরোসিনের দ্রবণ ঢালছে।''
-"খুব খারাপভাবে হারবে, তুমি!''
-"খুব ভালোভাবে পিছু হটবেন আপনি। আমার মান-মর্যাদা ও সম্মান ছাড়া আমার এই গোটা জীবনে দ্বিতীয় কোনো পিছুটান বা দূর্বলতা রাখিনি আমি।''
জয় আর কথা বলল না। চমৎকার মুচকি হাসল।রাবেয়া বেলা এগারোটার দিকে মায়ের বাড়ি গেলেন। বড়ো ভাইয়ের কাছে কিছু ধার পাওয়া গেলে তাও পাওনাদারদের একটু

ঠেকানো যাবে, সময় পাওয়া যাবে চাইলে। আমজাদ সাহেবের অ-রাজী গম্ভীর মুখ দেখেও গেছেন রাবেয়া। অন্তূও চলে এলো। আব্বুর উদ্বিগ্ন মুখ, আর কাতর চোখের চাহনি ভালো লাগেনা।

বছরখানেক আগে রাবেয়ার পিত্তথলিতে পাথর ধরা পড়ল। তৎক্ষণাৎ সার্জারি করিয়েছিলেন আমজাদ সাহেব। আব্বু-আম্মু দুজনেরই হাই ব্লাড প্রেশার, ওষুধ পানির খরচা, অন্তূর পড়ালেখা, যাবতীয় দরকার গোটা সংসারের, সবই বইছেন আমজাদ সাহেব। সব করতে ঋণ করতে হয়েছে আমজাদ সাহেবকে। অন্তিক একটা দোকান করেছে বড়ো বাজারের

মধ্যে। অন্যরা তার চেয়ে ছোটো ব্যবসা করে মাসে লাখ টাকা আয় করছে। অন্তিকের দোকান দিনদিন খালি হচ্ছে, পুঁজিসহ নেই হয়ে যাচ্ছে। বাড়িতে টাকাপয়সা দেয়না অন্তিক, আমজাদ সাহেবও চাননা। এখনও তিনিই যেন বাড়ির একমাত্র কর্তা, অথচ চাকরি থেকে রিটায়ার করেছেন বহুদিন আগে। তার কর্ম বিশেষ উচ্চপদস্থ ছিল না। স্কুলমাস্টার। পুরো পরিবারসহ অন্তিকের বউয়ের ভারটাও নিশ্চুপ বহন করছেন তিনি। অন্তিক নিজের এই লালবাতি জ্বলা ব্যবসার ব্যাপারে কোনো আলাপ আব্বুর সাথে করেনা।

অন্তিক অকালে বউ আনার পর স্বপ্নভাঙা আমজাদ সাহেব মার্জিয়ার সামনে দাঁড় করিয়ে দুটো থাপ্পড় মেরে বলেছিলেন, “খেতে দিবি কোত্থেকে? সেই তো আমার ঘাঁড়েই চড়ে বসবি, অন্য উপায় আছে? আর কতদিকে যাব এই সামান্য কামাই নিয়ে? এই আমিই তোকে জন্ম দিয়েছিলাম, দুই হাতে এতদূর টেনে এনেছিলাম, তোকে নিয়ে রাতভর স্বপ্ন বুনেছি জালের মতো? দেখ, বিশ্বাস করার উপায় রাখিসনি আজ সেসব। ইচ্ছে বহুত ছিল, সেসব এক লহমায় গুড়ো করতে বাঁধেনি তো বিবেকে না?বিবেক থাকলে হয়ত বাঁধতো। বয়স কত হয়েছে, বিয়ে করে এনেছিস? তাও

আবার আমার নামের সম্মান ডুবিয়ে? কী কাজ করিস? বউকে খাওয়ানোর মুরোদ আছে? চাকরি-বাকরি করার যোগ্যতা হয়েছে? আমার ছেলে এমন মূর্খ হবে, তা জানলে হয়ত তোকে দুনিয়াতেই আনতাম না!''

অন্তূ প্রথমবার সেদিন আব্বুকে নিজের অভিজাত ব্যক্তিত্ব থেকে বেরিয়ে প্রথমবার এমন কমদামী, সাধারণ বাক্যে, মূর্খ-সরল ধরণের কথা বলতে শুনেছিল। এরপরের দিন থেকে আজ অবধি চুপচাপ সব ভার বহন করছেন, কোনো অভিযোগ আর করেননি দ্বিতীয়বার। কিন্তু অন্তিক বোধহয় বাপের সাময়িক ক্ষোভকে ধরে রেখে কিছু

বিচ্ছেদমূলক কাজ করে বসেছিল। একই বাড়িতে থাকে, সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া করে, মাথা তুলে তাকায়না, আব্বুর সাথে কথা বলেনা, ধার ধারে না কোনোকিছুর। সে যে আছে দুনিয়াতে, তার অস্তিত্বের খোঁজ পাওয়া মুশকিল।সেসবের পরদিনই বড়ো বাজারে দোকান নিলো সে। সপ্তাহখানেকের মাঝে সেই দোকানে কমপক্ষে লাখ পাঁচেক টাকার মাল তুলল। টাকা কোথায় পেয়েছে, তার হদিস কেউ জানেনা, আর না জানানোর প্রয়োজন মনে করেছে অন্তিক কোনোদিন। আমজাদ সাহেব বহু খোঁজ চালিয়েও বের করতে না পেরে হাল ছেড়েছেন।

মাসখানেকের মধ্যেই দোকানে ক্ষয় শুরু হলো, উন্নতির জায়গায় ক্রমান্বয়ে অবনতি। বেচাকেনা হয় কিনা কে জানে! কিন্তু একটা পয়সা ঘরে আসেনা, কোথায় যায় কেউ জানেনা। প্রথমে সকলে ভেবেছিল, অন্তিক খারাপ পথে গেছে, নেশা করে হয়ত। সেসবও খোঁজ নিয়ে দেখার পর পাওয়া যায়নি।

অন্তিক কেমন যেন হয়ে গেছে। মুখ-চোখ শুকনো, শরীর শুকিয়ে সুদর্শন ছেলেটা একদম ষাট বছরের বুড়ো হয়ে গেছে। খাচ্ছে বাপের ঘাঁড়ে, আছে বাপের পাখার নিচে, অথচ তার আত্মসম্মান নাকি তীব্র অভিমান

অথবা অন্যকিছু কে জানে!দুপুরের রান্নাতে হাত লাগিয়েছে মার্জিয়া। অন্তূ গিয়ে থালাবাসন মাজতে গেলে মার্জিয়া বলল, “অন্তূ! একা ছিলাম, কাজ করতেছিলাম, ভালোই তো ছিলাম। কী দরকার তোমার এখানে আসার? সকাল থেকে রান্না করতে পারতেছি, বাসন মাজতে হাত ক্ষয়ে যাবেনা আমার। রাখো তো, যাও এইখান থেকে।”

অন্তূ কথা বলতে চাইল না। তবুও বিনয়ের সাথে বলল, “আপনি চাইলে এখন একটু বিশ্রাম নিতে পারেন, ভাবী। আমিই রান্না করছি।”-“সবচেয়ে বেশি গা জ্বলে কখন জানো?”

-“জানি না। আপনার বা কখন সবচেয়ে বেশি গা জ্বলে, আমার জানার কথা তো নয়!”

মার্জিয়া দাঁত খিঁচে আবার সামলালো নিজেকে, “তোমার সামলে আসলে। তুমি যতক্ষণ সামনে থাকো, আমার গা তিরতির করে পোড়ে। বিশেষ করে তোমার শান্ত, নরম কথায়।”

অন্তূ আস্তে করে বলল, “আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি।”

থালাবাসন মাজা হলে রান্নাঘরে ছড়িয়ে থাকা কৌটা, বিভিন্ন জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে লাগল।

মার্জিয়া বলল, “আমার চাচাতো ভাইকে পছন্দ হয়নি তোমার?”

-“হয়নি এমন নয়।”

-“তাইলে কোনো জবাব তো দিলা না!”

-“আসলে ভাবী, এখন বিয়েই করতে চাইনা আমি। বিয়ে করার মতো হলে তো আর ভেগে যাব না! আপনারা যেখানে খুশি, ভালোমন্দ বুঝে দেবেন!”

-“ভেগে যাবেনা তার গ্যারান্টি কী?”অন্তূ চুপ রইল। মার্জিয়া আবার বলল, “বিয়ে ক্যান করবা না? বয়স কি পনেরোতে পড়ে আছে তোমার, কচি ভাবো নিজেকে? কমপক্ষে

বাইশ-তেইশ বছর বয়স চলতেছে। মেয়ে মানুষ কি আবার ত্রিশ বছরে বিয়ে করে?"

-"বয়স একটু বাড়িয়ে বললেন। যাহোক, পড়ালেখা অথবা সংসার, দুটোই এককভাবে করতে হয়। আউটসাইড পিছুটান নিয়ে দুটোর কোনোটাই ভালো হয়না। সংসার করলে শুধু সংসার, পড়ালেখা করলে পড়ালেখা। অনার্সের আর দুটো বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। এরপর এলএলবি করে বার কাউন্সিলর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে একটা নিম্ন আদালতে চাকুরী পেতে হলেও চাপ কম নয়, ভাবী। এখন বিয়ে নয় আপাতত।"

চোখ গরম করে তাকিয়ে ছিল মার্জিয়া। সে নরম সুরে বলল, “আপনি কেন এত আগ্রহী আমাকে বিয়ে দিতে?”

-“অনেক কারণ আছে।”

-“একটু বলুন, আমি শুনতে আগ্রহী।”মশলা কষানোর ঝাঁজ নাকে লাগতেই অন্তূ কেশে উঠে মুখে ওড়না চেপে ধরল। তরকারীতে পানি দিয়ে মার্জিয়া ফিরলো ওর দিকে, “তুমি খুব জাননেওয়ালার নাটক করলেও বহুত কিছুই জানো না। তার ওপর জোয়ান মেয়ে বাড়িতে থাকলে তোমার বাপ মায়ের চিন্তা না থাকলেও আমার হয়। তার ওপর তোমার যে স্বভাব-চরিত্র আর তেজ, ছেলে পাওয়া গেলে

হয়। আমার বোনের সংসার নড়বড়ে হয়ে গেছে তোমার জন্য, তোমাকে পড়ালেখা করাতে গিয়ে আমার শ্বশুরের হাতের অবস্থা খারাপ... অন্তূ যাও তো! আমার কথা বলতে মন চাচ্ছে না তোমার সাথে।''

খুব অগোছালো লাগল কথাগুলো। অন্তূর মনে হলো, ভাবী যা বোঝাতে চাচ্ছে, তা আসলে পারছে না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। খানিক পরে আপন মনেই বলল মার্জিয়া, "একটা টাকা যৌতুক-ফৌতুক কিচ্ছু চায়নি, তোমাকে পছন্দ হয়েছে, আরও পাঁচ-সাত ভরি গহনা দিয়ে নিয়ে যাবে। তাতে অন্তত সংকট কমতো একটু।''

অন্তূ হাসল, “বিক্রি করবেন নাকি আমায়? আর গহনা দিলে তো আমার গায়ে অথবা আলমারিতে থাকবে, সংকট কমবে কী করে? কী এমন সংকট লেগেছে বাড়িতে যে আমায় বিক্রি করা গহনা দিয়ে বাড়ির সংকট কমাতে হবে!”

দরজায় কেউ এলো। পাওনাদার! দীর্ঘশ্বাস ফেলল অন্তূ।আমজাদ সাহেব ডাকলেন অন্তূকে, “এদিকে আয় তো, অন্তূ!”

অন্তূ মুখ বৃত করে গি দাঁড়িয়ে অবাক হলো। মুস্তাকিন মহান বসে আছে। কেন এসেছে এই লোক? সেদিন সে গিয়েছিল সেই ব্যাপারে কিছু বলতে এসেছে!

আমজাদ সাহেব মৃদু হাসলেন, “এটা আমার মেয়ে।” অন্তূকে বললেন, “ও আমার ছাত্র, হাইস্কুলে পড়তো, আমি তখন ওদের ক্লাসটিচার ছিলাম। সৈয়দ মুস্তাকিন মহান, পিবিআই অফিসার! নামটা কি ঠিক বললাম? মুস্তাকিন ইতস্তত হেসে মাথা নাড়ল। শুদ্ধতম হাসি, পরিপাটি এক সৌম্য চেহারার পুরুষ মানুষ। পরনে পাঞ্জাবী থাকায় আরও ভালো লাগছে দেখতে। শাল চাদর জড়ানো। সেদিন কার্যালয়ে এমন বিশেষ লাগেনি। হালকা রঙা পাঞ্জাবীতে ফর্সামতো শরীর, পেটানো হাতের ত্বকে কালো বেল্টের হাতঘড়ি নজরে এলো। সুপুরুষের আখ্যা পাবার মতো

সবকিছু আছে মুস্তাকিনের মাঝে। ভ্রুটা চটা পড়া, জোড় ভ্রুতে পুরুষ মানুষ এমনিতেই একটু বেশি নেশা ধরানো হয়। হাসিটা চমৎকার সুন্দর! বসে আছে বিনয়ী ভাবে নিজের প্রাক্তন শিক্ষকের সম্মুখে, মুচকি হাসি ঠোঁটে ঝুলছে। এভাবে কোনোদিন আগে পরখ করেনি কাউকে অন্তূ।মুস্তাকিন বলল, "আমি জানতামই না স্যার, এটা আপনার মেয়ে। ছোটোবেলায় স্কুলে দেখেছি বোধহয়, এরপর সেদিন ভার্সিটিতে একবার দেখা হয়েছিল। কিন্তু হিজাবের আড়ালে, তার ওপর বড়ো হয়ে গেছে, চিনতে পারার কথা না।" সৌহার্দপূর্ণ কণ্ঠস্বর।

-"ভার্সিটিতে? তুমি কী করছিলে ওখানে?"
-"সামাজিক খোঁজখবর থেকে বেশ দূরে চলে এসেছেন, স্যার! একটা ভয়ানক রেপ-কেইস ঘটে গেল আপনাদের এরিয়াতে। জানেন না? সেটার তদন্তে আছি।"
-"স্যার স্যার করছিস কেন, বাপ! তোরা কত বড়ো মানুষ হয়ে গেছিস, এসব ডাক শোনার যোগ্যতা পেরিয়ে গেছিস, আমার থেকে বহুত বড়ো হয়ে গেছিস! আগে মনে হতো তুই লম্বা হবি না বেশি, আজ তো দেখছি নকশাই বদলে গেছে দেহের গড়নের!"মুস্তাকিন মাথা নিচু করে হেসে ফেলল, "স্যার, আমি আপনার কাছে চিরদিন নিয়মিত বেতের বাড়ি

খাওয়া ছাত্র। আপনারা কোনোদিন ছোটো হবেন না, আর না আমি বড়ো। এসব কথা বলে আজও সেই একইভাবে লজ্জায় ফেলছেন, যেভাবে স্কুলে পড়া না করে গেলে অপমান করতেন। আজও নাম ধরে একবার ডাকুন, আমি নস্টালজিক হয়ে যাব নির্ঘাত! কিন্তু আপনার দীপ্তির সাথে সাথে অভিজাত্য কমে এসেছে, স্যার! কোনো ট্রমাতে আছেন, মনে হচ্ছে!''

আমজাদ সাহেব হাসলেন, ‘‘কবে শিফ্ট হয়েছিস দিনাজপুর?''-‘‘মাসছয়েক হলো।''

আমজাদ সাহেব অন্তূকে ইশারা করলেন, ‘‘যা..''

তার ধারণা ছিল, পুলিশ বা সরকারী চাকরিজীবীরা সব আঙ্কেল টাইপের, তেলের ড্রাম মার্কা ভুড়িওয়ালা, টাকলু আর বয়স্ক, দেখতে বিকট ধরণের হয়।

আমজাদ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "মামার বাড়িতেই থাকছিস?"

-"না, ফ্লাট ভাড়া করে থাকছি।"

-"বউমাকে আনলি না? ছেলে মেয়ে কয়টা হয়েছে? কবে মরে-টরে যাব, দেখা করতে এলো না ওরা বাপের বুড়ো স্যারের সাথে?"

গম্ভীর মানুষটার এই সহজ দিকটা অনেকের অজানা, অথচ মুস্তাকিন খুব জানে স্যারের এই মুক্তমনা, হাস্যজ্জ্বল রূপকে। হেসে ফেলল

ও, “স্যার, আগে এটা তো জিজ্ঞেস করতেন, বিয়ে করেছি কিনা!”

আমজাদ সাহেব গম্ভীর হলেন, “বয়স কত তোর?”

-“কত বলে মনে হয়, স্যার আপনার?

”আমজাদ সাহেব আপাদমস্তক দেখে বললেন, “আন্দাজ করে কথা বলার অভ্যাস নেই আমার। তবে দেখতে বেশ ফিটফাট হয়েছ! আগে তো মুটু ছিলে, শরীরের মেদ নেই হয়ে গেছে, শুধু বড়ো বড়ো চোখ দুটো আছে..”

মুস্তাকিন কপালে আঙুল ঘষতে ঘষতে ধীরে ধীরে হেসে ফেলল , “লজ্জা পাচ্ছি, স্যার!”

আমজাদ সাহেব বললেন, “কন্যারাশি তোর?”

মুস্তাকিন এবার শব্দ করে হেসে উঠল। নিঃশব্দে হাসলেন আমজাদ সাহেবও। মুস্তাকিন মুগ্ধের মতো চেয়ে রইল গৌরাঙ্গ মানুষটির সুলভ হাসির দিকে। তরতরে তেজী হাসি, স্যারের! মুস্তাকিনের সবচেয়ে প্রিয় শিক্ষক সর্বকালের সব শিক্ষকদের মাঝে। হালকা মেহেদীর রঙে রাঙানো দাড়িতে, সাদা লুঙ্গির সাথে ফতোয়া পড়া লম্বা, আত্মবিশ্বাসী পুরুষটি মুস্তাকিনকে বরাবর মুগ্ধ করে। মুস্তাকিন হাসি সামলালো, "কেন, স্যার? ছেলেদের লজ্জা পাওয়ার অধিকার নেই?"অন্তূ ট্রে ভর্তি নাশতা আনলো। মুস্তাকিন বলে উঠল, "স্যার! এটা ঠিক হলো না.."

আমজাদ সাহেব গম্ভীর হলেন, “হু! এখন তুই আমায় ঠিক-ভুল শেখা।”

-“স্যার, তা বলিনি আমি..”

-“আপাতত আর কিছু বলতে হবেনা এ ব্যাপারে। তুলে নে এক এক কোরে। আম্মা, পানি দিলি না?”

অন্তূ পানি আনতে গেল। আমজাদ সাহেব বললেন, “একসাথে দুপুরের খাবার খাওয়ার সময়টুকু হবে?” ভারী শোনালো কথাটা।

মুস্তাকিন ভ্রু চুলকে হাসল, “এভাবে বললে সময়ের সাহস নেই না হওয়ার!”

কেকের একটা পিস উঠিয়ে নিয়ে হাতে রেখে বলল, “অন্তিকের কী খবর?”

-“আমি ভেবেছিলাম না তুমি প্রসাশনে ঢুকবে।
”

মুস্তাকিন বুঝল, স্যার কথা এড়াতে চাইছেন। সেও আর গেল না ওদিকে, “আমি নিজেও ভেবেছিলাম না, অথচ ছোটো চাচার বদৌলতে হয়ে গেল, আর অমত করিনি।”

-“বিয়ে-শাদী করবি না?”

স্যার একবার তুমি বলছে, একবার তুই। বেশ উপভোগ্য লাগল বিষয়টা। কেকের টুকরো চিবিয়ে জবাব দিলো,

“ভাবিনি এখনও।”

-“ভাবার সময় আসছে, না যাচ্ছে?”

-“সময় কোথায় সংসারকে সময় দেবার মতো? সারাদিন দৌড়ের ওপর আছি। আম্মা তো জিনের মতোওপর ঘাঁড়ে ভর করে আছে, তিনবেলা ফোন করে কান চিবোচ্ছে।

”দুপুরের খাবার বেড়ে দিতে মার্জিয়া এলো না। অগত্যা অন্তূকে তদারকি করতে হলো। আব্বুই তুলে তুলে খাওয়াচ্ছিল, সে হাতে হাতে সাহায্য করল। মাঝেমধ্যেই আব্বুর পুরোনো ছাত্ররা আসে আব্বুর কাছে। এরকম সচরাচর দেখা যায় না, ছাত্ররা সচরাচর শিক্ষকদের ভুলে বসে। অথচ আমজাদ সাহেব শিক্ষকের চেয়েও বড়ো কিছু তার ছাত্রদের কাছে।

অন্তূ গরুর মাংস তুলে দিলো তার প্লেটে। সঙ্গে সঙ্গে মুস্তাকিন মুখ তুলল, “গরুর মাংসে সমস্যা আছে আমার। খাইনা..”আমজাদ সাহেব বললেন, “শুনে দিবি তো! আচ্ছা, আরেকটা পরিষ্কার প্লেটে নতুন কোরে ভাত তুলে দে।”

মুস্তাকিন বাঁধা দিলো, “ব্যাপার না, তার প্রয়োজন হবেনা। আপনি শুধু মাংস তুলে নিন।”

অন্তূ একটু অপ্রস্তুত হলো, মাংস কী করে তুলবে? চামচ দিয়ে তুলতে গেল, মুস্তাকিন হাসল, “হাত দিয়ে তুলুন না! পাত থেকে চামচ দিয়ে মাংস তোলা যায়?”

প্লেট থেকে হাত দিয়ে মাংস তুলে নেয়ার পর অন্তূর শরীরে অস্বস্তি জেঁকে বসল। খাওয়া শেষ করে হাত মোছার জন্য গামছা চাইল মুস্তাকিন। অন্তূর মনে হলো, আগে যে দু'দিন মুস্তাকিনকে দেখেছে, খুব পেশাগত, শক্ত লেগেছিল। আজ একদম তা লাগছে না, সহজ, মিশুক ও ব্যক্তিসুলভ লাগছে। তোয়ালেতে হাত মুছে সেটা আবার অন্তূকে ফেরত দেবার সময় অন্তূর দিকে তাকিয়ে ছিল মুস্তাকিন। বেশ বেলেহাজ দৃষ্টি। অন্তূর মুখ দেখতে পাওয়া যাচ্ছেনা, এই বিষয়টাই যেন মুস্তাকিনের কৌতূহল ও অনুরাগ বাড়িয়ে তুলল অন্তূর দিকে মনোযোগী হতে। অন্তূর

চেয়ে বেশ খানিকটা লম্বা মুস্তাকিন। প্রসাশনের লোকদের একটা নির্দিষ্ট লম্বা উচ্চতা থাকে। একটা ঢোক গিলল মুস্তাকিন, ওড়নায় আড়াল করা মুখের ওপর দেখতে পাওয়া চোখদুটোকে গিলে নিলো বোধহয়। বেশ অস্বস্তিতে পড়ল অন্তূ। আমজাদ সাহেব হাত ধুতে রান্নাঘরে উঠে গেছেন, ভিমবার লাগিয়ে হাত ধোয়ার উদ্দেশ্যে।

মুস্তাকিন অন্তূকে জিজ্ঞেস করল, "কোনো ইয়ারে পড়ছেন?"-"সেকেন্ড ইয়ারের ইয়ার ফাইনাল দেব।"

-"কোন অনুষদে?"

-"এলএলবি।"

-“বাপরে, হবু উকিল ম্যাডাম!”
অন্তূর কী হলো জানা নেই, কেমন আড়ষ্ঠতা ভর করল। মাথাটা নত করে মৃদু হেসেও ফেলল। এই প্রথম বোধহয় সে আর পাঁচটা মেয়ের মতো কারও সামনে বেশ অপ্রস্তুত আর সংকুচিত হয়ে পড়েছে। মুস্তাকিন নিচু আওয়াজে বলল, “এজন্য সমাজের কুকীর্তি নিয়ে বেশ ক্ষোভ আছে আপনার মাঝে।”
অন্তূ কথা ঘোরালো, “আমি আপনার অনেক ছোটো বোধহয়। আপনি বলছেন, শুনতে ভালো লাগছে না।”
ঘাঁড় চুলকালো মুস্তাকিন, “খুব বড়োও না। মানে অতটা অন্তত বড়ো না, যে চোখে

লাগবে। আমি যখন এইটে পড়তাম, আপনি থ্রি অথবা ফোরে ছিলেন বোধহয়।”-“মনে নেই।”

-“আমি মেয়েদের তুমি বলতে পারিনা, নিজের কাছে খুব লেইম লাগে ব্যাপারটা। এরা মায়ের জাত, এদের সামনে খুব কুঁকড়ে যায় আমার তেজ, আর শক্তি। বলা চলে মেয়ে জাতিকে ভয় পাই আমি, মানে ধরুন, কী থেকে কী হয়ে যাবে, কোথাও অসম্মান বা তাদের মনঃকষ্টের কারণ হবে আমার কোনো কথা বা আচরণ। অভ্যাগত কারণে হলেও আপনি থেকে তুমিতে আসা খাটুনির কাজ হবে।”

মুস্তাকিনের বলার ধরণটা অবলীল ও সরল ছিল, অন্তূর ভালোই লাগল শুনতে। হাসি পেল অল্প। আব্বুর ছাত্রের মুখে আব্বুর আদর্শের কথা শোনাটা চমৎকার একটা অনুভূতি বলে মনে হলো অন্তূর। এই আদর্শই তো সে ছোটোবেলা থেকে দেখেছে আব্বুর মাঝে!
পাঞ্জাবীর হাতা গুটাতে গুটাতে আমজাদ সাহেবের পেছনে গেল মুস্তাকিন।
আমজদ সাহেব আবার বসলেন নিজের জমিজমার সমস্যার কথা তুলে। সব খুলে বলেছেন, আবারও একবার মনে করালেন। চলে যাবার সময় দরজা অবধি গেলেন আমজাদ সাহেব, "আবার আসবি কিন্তু।

অবসর সময়টা কাটতে চায়না, আজকাল।

''মুস্তাকিন বাড়ির ভেতরে চোখ ঘুরালো। কিছু খুঁজে চলল তার চোখদুটো। অকারণেই বোধহয় এই অযাচিত, অপ্রাসঙ্গিক চোখের চাহিদা! ব্যতিক্রমে মস্তিষ্ক মনোযোগী হয়। সেদিন অন্তূ কার্যালয় থেকে আসার পর বেশ কয়েকবার খেয়ালে এসেছিল অবশ্য এই আলাদা ধাঁচের অপরিচিতার কথা।

দেখা পেল। টিবিলের ওপর ছিটিয়ে থাকা থালাবাসন গোছাচ্ছে। স্যারকে বিদায় বলে সামান্য গলা উঁচিয়ে অন্তূকে বলল, "আসি, উকিল ম্যাডাম! মন দিয়ে পড়ুন, আউটসাইডের চিন্তা না করলে বোধহয়

আপনার জন্য ভালো। সমাজ দেখার জন্য আমরা আছি, আপনার পুরো ফোকাস এখন বইয়ের পাতায় হতে হবে।''

আমজাদ সাহেব মৃদু হাসলেন, "দোয়া করিস, বাপ! একই জেলায় আছিস, তোদের জুনিয়র, দেখেশুনে রাখিস রাস্তাঘাটে। যেসব কিছু ঘটছে ভার্সিটিতে, চিন্তা হয় ওকে নিয়ে। খুব বেপরোয়া হয়েছে, বেপরোয়াপনা সাধারণত আজাব বয়ে আনে।''মুস্তাকিন আবার একবার তাকালো অন্তূর দিকে, "আপনার মতোই হয়েছে, স্যার! আসি। ফ্লাটে যাবেন সময় কোরে, এককাপ চা খেয়ে আসবেন ছাত্রর হাতের।''

অন্তূ এবার তাকিয়ে দেখল বাইরের দিকটা। শালটা কাধের ওপর তুলে, রোদচশমাটা পরে নিলো মুস্তাকিন। অন্তূর চোখের সামনে জয় এসে দাঁড়াল। ঘৃণায় মুখে বিরক্তির রেখা ভাঁজ আকারে পড়ল। এই শাল, রোদচশমা, পাঞ্জাবী সব বেশেই জয়কে দেখেছে অন্তূ, অথচ এমন সুপুরুষ লাগেনি। পুরুষত্ব একটু হলেও আছে মুস্তাকিনের মাঝে, অন্তত নারীকে সম্মান করার মনুষত্বটুকু আছে। হুট করে দুজনের তুলনা করে ফেলল কেন অন্তূ, জানে না। কিন্তু আজকাল জয়ের নোংরামিগুলো মাথায় এঁটে থাকা অবস্থায় ব্যতিক্রম এক পুরুষ চরিত্রে উপস্থাপন, একটু ভাবতে বাধ্য করল

ওকে।অন্তূর একা খেতে বসে খাবারে অনীহা এসে যাচ্ছিল।

ভাবীর ঘরে গিয়ে দেখল, ভাবী উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। ডাকল, "ভাবী! আসুন খেয়ে নিই, দুপুর পেরিয়ে যাচ্ছে।"

-"আমি খাব না, মাথা ধরেছে খুব। ডেকো না আমায়।"

-"শরীর খারাপ নাকি আপনার? জ্বরটর আসবে হয়ত। চা বানিয়ে দেব, খাবেন?"

মার্জিয়া জবাব দিলো না। অন্তূ আর খেলো না। চা খাওয়া যায়।

আপনমনেই একটা পরিচিত কল্পিত দৃশ্য ভেসে উঠল চোখের সামনে, তার পরনে সাদা

শাড়ি, তার ওপর এডভোকেটের বিশেষ কালো পোশাকটা। সে কয়েকটা ফাইল হাতে নিয়ে রিক্সা থেকে নেমে সুপ্রিম কোর্টের ফটক পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ভেতরে।ভাবনা ভঙ্গ হলো, পানি ফুটে গেছে। চা পাতি ঢেলে দিয়ে আরেক ভাবনায় মন গেল। চোখের সামনে চিরাচরিত কল্পিত একটা দৃশ্য এসে দাঁড় হওয়া, আর বাস্তবে তার সুপ্রিম কোর্টের উকিল হিসেবে ভেতরে হেঁটে এগিয়ে চলার মাঝে দূরত্ব কতটুকু? আর সেই দূরত্বের রাস্তাটা সহজ কতটা? ঝঞ্ঝাট আর ঝড়ো হাওয়ার বেগ কেমন? কম না বেশি? রাস্তায় বিছিয়ে আছে রক্তগোলাপের কাঁটা নাকি

রক্তরঙা কৃষ্ণচূড়ারা? তবে রাস্তার রঙটা লালচে, এটা কল্পনায় এলো অন্তূর।-“আরমিণ! ”

অন্তূ পেছন ফিরে তাকাল। জয় হাসল তার নিজস্ব ভঙ্গিতে, “তোমায় একটা চুমু খেতে ইচ্ছে করছে খুব।”

অন্তূ চোখ বুজে গাঢ় শ্বাস ফেলল।

-“চ্যাহ! রাগছো কেন? মামা একটা বিয়ে করায়ে দেয় না। তার কোনো মেয়েই পছন্দ হয় না। কিন্তু আমার তো বয়স হয়েছে!” চট করে হেসে ফেলল কথার মাঝেই, “আচ্ছা! যাও এখন চুমু-টুমু বাদ! বিয়ের পর মন ভরে চুমু খাব, ঠিক আছে?”অন্তূ ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে

নিলো। জয়ের ভয়ে পেছনের ছেলেরা জোরে হাসতে না পেরে সবগুলো মুখে রুমাল চেপে ধরেছে। জয় ঘাঁড় ঘুরিয়ে তাকাল, "হাসতেছিস ক্যান? আমার প্রেমিকাকে আমি চুমু খাই অথবা এখানেই... উপভোগ কর শালা, উপভোগ কর। হাসবি না। নো হাসাহাসি।"

অন্তূ চলে গেল। জয় হাতের তালু উঁচিয়ে ধরল, "আরে.. কথা তো শুনে যাও.." কথা অসম্পূর্ণ রেখে জোরে শব্দ করে গা কাঁপিয়ে হেসে লুটিয়ে পড়ল জয়। প্রানখোলা হাসি হাসছে সে। পা বাঁকিয়ে কুঁজো হয়ে দুই হাঁটুতে হাত রাখল। হাসি থামছে না ওর।

ছেলেরা দেখল জয়ের মনখোলা অট্টহাসি। ওরাও হেসে ফেলল। কোনো মানুষই একক রূপী হয়না, সবারই ক্ষেত্রবিশেষ একাধিক রূপ থাকে। জয়েরও আছে, একের অধিক ভিন্ন ভিন্ন রূপ। অন্তূকে জ্বালাতে পেরে যে সে পরিতৃপ্ত, অন্তূর বিরক্তি তাকে আনন্দ দিচ্ছে, এই হাসি তারই বহিঃপ্রকাশ। অন্তূর কানে অবধি পৌঁছালো সেই হাসির আওয়াজ।

জয় ঠোঁটে সিগারেট চেপে লাইটার চাইল কবীরের কাছে।-"ভাই! আপনে কি মেয়েটারে সত্যিই..''

গম্ভীর মুখে চোখ নামিয়ে তাকাল জয়,

"নিজের কাজে কাজ রাখ, যাহ!''

আলিম ঠোঙা ভরে গাছের পেয়ারা এনেছে জয়ের জন্য। জয়ের পছন্দ পেয়ারা। পথে হাঁটতে হাঁটতে পেয়ারা বণ্টন করল সবাকে। পথে যেসব জুনিয়রদের সাথে দেখা হলো, ওরা সালাম দিয়ে হাত মেলাতে এলো, সকলকে দিলো একটা একটা কোরে। এক মেয়ের ওড়না গলার সাথে ফাঁসির দড়ির মতো পেঁচানো। জয় একবার আপাদমস্তক দেখে বলল, “গলার দড়িটা হয় খুলে ফেলো, অথবা গায়ে রাখো। ফাঁস-টাস লেগে মরে গেলে সেই দোষও আমার হবে। লোকের ভেতরে আমাকে দোষারোপ করার বীজাণু ছড়িয়ে গেছে।আদারওয়াইজ আমার আবার

মুখ ভালো না, সাথে চোখ তো আরও খারাপ! আজুবাজু কিছু বললেই নেতাগিরির নাম বদনাম হবে। ধরো, পেয়ারা খাও।''শহীদ মিনার চত্বরের সিঁড়িতে বসল। আশপাশে মেয়ে-ছেলেরা বসে হাসাহাসি করছিল। একে অপরের গায়ে ঢলে পড়া হাসি। জয় ঠোঁট থেকে সিগারেট নামিয়ে চোখ উঠিয়ে তাকাল একবার সেদিকে। থমথমে হয়ে উঠল আশপাশ। মাথা নিঁচু করে সালাম দিয়ে উঠে চলে গেল সবগুলো সেখান থেকে।

শেষ অবধি জয়ের ভাগে পেয়ারা জুটল না। রোজ হয় তার সাথে এমন। বিলাতে বিলাতে নিজের পাত খালি। সবাই একজোটে

নিজেদের পেয়ারা এগিয়ে দিলো জয়ের দিকে। জয় স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ঘাঁড় নাড়ল, "খা তোরা, খাব না আমি।"-"ভাই!" কতর স্বরে একযোগে ডেকে উঠল সবাই।

জয় বিরক্ত হলো, "একেকটা তো দেখতেছি সুপার ড্রামা কুইনের মেল ভার্সন! পেয়ারার বদলে ওমন করে কলজে কেটে দাও দেখি সম্বন্ধির চেংরারা। চার-আনা পিস পেয়ারা খা তোরা, আমার লাগবেনা। পারলে একটা মিষ্টি স্বাদের বেশি করে জর্দা মেরে পান কিনে দে। চিবোই।"

কবীর একটা দারুণ কাজ করল। নিজের হাতের পেয়ারাটা জয়ের হাতে ধরিয়ে দিয়ে

দৌঁড়ে ডানদিকে গেল। যে মেয়েটাকে জয় পেয়ারা দিয়েছিল সে তখনও দাঁড়িয়ে ছিল, তার কাছে গিয়ে বলল, “পেয়ারা দাও।” মেয়েটা অবাক হলো। বুঝল না, বলল, “হু?” কবীর পেয়ারাটা কেঁড়ে নিলো। দৌঁড়ে এলো দলের কাছে। কিছুক্ষণ কেউ মুখ বন্ধ করল না, কথা বলল না। খানিক সময় যেতেই সবগুলো হু হা করে হেসে উঠল। রাহাত কাঁধ থাপড়ায় কবীরের, “মামা! কী কামডা করলি? কেঁড়ে নিয়ে চলে এলি? ভাই, তোকে আমি এ বছরের সেরা পেয়ারা ফেরত এওয়ার্ড দেব। সাথে থাকবে দুই বালতি পেয়ারা ভাজি, এবং পেয়ারার হালুয়া।”কবীর গম্ভীর মুখে বলল,

“ভাই! একটা ডাউট, আপনে আসলেই যদি মেয়েটাকে ভালো না বাসেন, তাইলে..”

জয় চোখ তুলল, “আমি যা বলি, করি–তা যেকোনো মেয়ে ভয় পেয়ে হোক আর ভালো লেগে, সায় দিতো, মিঠা কথা বলতো, আড়চোখে তাকাতো, দেখতো আমায়, লজ্জা পেত–যে লজ্জায় লজ্জা না, থাকে আসলে নির্লজ্জতা। দু একদিন গেলে গা ঘেঁষতো, এরপর আমার মনোযোগ পাওয়ার চেষ্টা করতো। এসব যেকোনো মেয়েই করতো। ভয়েই হোক অথবা ইচ্ছে করে। ওদেরকে জ্বালানোর কিছু নেই। সুঁতো না টানতেই গায়ে আঁছড়ে পড়া খানকি সব। ওদের জ্বালালে

বিরক্ত হতো ওরা? বা সেটা কি জ্বালানো হতো না নিজের ব্যক্তিত্ব আর পদের নাম বিসর্জন দেয়া হতো?"

-"ঠিক কথা, ভাই।"ভার্সিটি ক্যাম্পাস ফাঁকা প্রায়। জয় সিগারেটে টান দিলো আরেকটা, "আরমিণ সেরকম?"

-"না, ভাই!"

-"আমার আচরণ, কাছে যাওয়া, কথা বলা সবেতে ওর গা চিটমিট করে ওঠে। ঠিক যেমন ধর, ফুটন্ত বালুতে মুড়ির চাউল যেরকম। আর এখানেই মজাটা। তুই জানিস না, আমি ওর সামনে গেলে ও ঠিক কতটা অস্বস্তি আর ঘৃণা নিয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে

থাকে। ধরে নে একটা আজাব আমি ওর কাছে। আসলে ওকে বিরক্ত করার ইন্টারেস্টটা এখানেই।''-“কিন্তু, ভাই..''
জয় হাসল, “রাহাত! ছাড় দেয়া আর ছেড়ে দেয়াকে গুলিয়ে ফেলিস না, বাপ। ছাড় দিয়ে রেখেছি, সুঁতো আমার হাতে। সুঁতো জড়াতে শুরু করলে হুড়মুড়িয়ে এসে আমার খপ্পরে পড়বে। ও আমাকে চ্যালেঞ্জও করেছে, জানিস?''
আর কাউকে কিছু বলতে দিলো না। কবীরের দিকে তাকাল, “এ অমলেট! গিটার দে আমার!

ওর কোলে গিটার তুলে দিলো কবীর। তাতে টুংটাং সুর তুলে বজ্র কণ্ঠে গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে গেয়ে উঠল,

ধরো কলকি মারো টান, গাঞ্জা বাবার আশেকান

মইরা গেলে সঙ্গে কিছুই যাবে না...

গা দুলিয়ে হেসে ফেলল নিজেই। ছেলেদের অবস্থাও বেকায়দা। জয় গিটার নামিয়ে রেখে সিঁড়ির দিকে ঝুকে বসল। গা কাঁপিয়ে হাসছে, হাসির দমকে শরীর দুলছে তার। ছেলেরা ভীষণ ভক্ত জয়ের। নেতা নেতা ভাব, সভ্যতার বড় অভাব।সামনে দিয়ে একটা

ছেলে হেঁটে যাচ্ছিল। জয় ডাকল, "এই! শোন! এদিকে আয়!"

ছেলেটা এসে দাঁড়াল। জয় আগাগোড়া চোখ উপর-নিচ করে দেখল একবার। প্রশ্ন করল, "নাচতে পারিস?"

ছেলেটা বোকার মতো চেয়ে আছে। জয় বিরক্ত হলো, "নাচতে পারিস নাকি?"

ছেলেটা না বুঝেই বোধহয় ঘাঁড় নাড়ল। জয় জিজ্ঞেস করল, "কী কী নাচ পারিস?" কথা শেষ করে কবীরের দিকে কাধ ঝুঁকিয়ে চিবোতে চিবোতে বলল, "আজকাল খুব সুরসুরি টের পাচ্ছি ভেতরে! আগুন বেড়ে গেছে।"

কবীর উদ্ভট হাসল, “ভাই! কী কন না কন! দিনের বেলায় কেমনে কী? রাতে একটা ব্যবস্থা হবে না-হয়!”

ভ্রু জড়াল জয়, “দিনের বেলা সুরসুরি ওঠা যাবে না, নাকি? এখন বুঝতেছি মানুষ বিয়ে ক্যান করে? দিন হোক বা রাত, যখন তখন.. ফুলটাইম..”-“ভাই, আপনেও জীবনে বিয়েশাদী করবেন? মানে আপনার হাবভাব দেখে কিন্তু কোনোদিন মনে হয়না যে আপনি বিয়ে করবেন।”

-“কথা খারাপ বলিস নি, তুই। আমিও ভাবছি কয়দিন ধরে, তোকে একটা বিয়ে দেব, এরপর বউটাকে আমি আর তুই ভাগ করে

নেব। ভাগাভাগি এক মহৎ মানসিকতার পরিচয়। সবে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ। সপ্তাহে তিনদিন তোর, তিনদিন আমার। বাকি শুক্রবারটা আমার বোনাস।''

রাহাত হেসে গড়াগড়ি খায়, "ভাই! বউ ওর, কিন্তু বোনাস আপনি কেন পাবেন?''

-"বিয়ে কে দেবে হে, শালা? যেই ফকিরের সিরনি খাও, সেই ফকির চেনো না? তোর মনে হয় কবীরের জীবনে বিয়ে হবে আমি না সুপারিশ করলে?''-"ভাই কিন্তু আপনি বিয়ে করবেন না কেন?''

জয় পেয়ারাতে কামড় দিলো, "পুরুষ দুই প্রকারের। এক–বিবাহিত, দুই–জীবিত। তবে

বেশিদিন বেঁচে থাকা ঠিক না। বেঁচে থাকার কোনো টেস্ট নেই। থুহ। ''

-"ভাই! তার মানে পুরুষ বিয়ে করলে বেঁচে থাকে না?''

জয় মাথা নাড়ল, "চান্সই নেই।'' নজর ঘুরিয়ে সামনে দাঁড়ানো ছেলেটাকে বলল, "একটা জম্পেশ বেলী ডান্স দে তো! নাচ!''কবীর ফিসফিস করল, "ভাই! ও তো ব্যাটা মানুষ! ওর বেলী ডান্সে আপনার আগুন কেমনে নিভবো?''

ঠোঁট থেকে সিগারেট নামিয়ে জয় ছেলেটার দিকে অতিষ্ট নজরে তাকিয়ে, আঙুলে তুড়ি বাজিয়ে তীব্র বিরক্তি নিয়ে সামনের রাস্তার

দিকে আঙুল ইশারা করল, "এ যা, ভাগ এখান থেকে! যা, সামনে থেকে সর! শোন, আবার যাইয়া উপর মহলে কমপ্লেইন করবি না, এটা র‍্যাগ না রে পাগলা। আমার ভালোবাসা। আমি আছিই কিছুদিন। আর বদনাম ভাল্লাগে না আজকাল, বয়স হচ্ছে তো!"

প্রফেসর এদিকেই এগিয়ে আসছেন! জয় উঠে দাঁড়িয়ে আরেকটা লম্বা টান দিলো সিগারেটে। স্যার যখন একদম সামনে এসে দাঁড়াল, তার মুখের সামনে একবার ধোঁয়া ছেড়ে তারপর তা মাটিতে ফেলে জুতো দিয়ে চেপে দাঁড়িয়ে সালাম দিলো, "সালাম, স্যার! কী অবস্থা?"

-“তোমার কী অবস্থা?”হাতদুটো মাথার ওপর তুলে অলস ভঙ্গিতে বলল জয়, “বিন্দাস চলছে!

নাক কুঁচকালেন প্রফেসর, “কী করছো আজকাল?”

-“যা করছি, আপনি স্যার মানুষ, বলা ঠিক হবে না। আপনাদের একটা ইজ্জত আছে না!
”

-“এতো রঙ-তামাশা আর ভালো থাকাথাকি আসে কোত্থেকে?”

মাথার ওপর থেকে হাত নামাল জয়, “ভালো থাকা একটা পেশা, স্যার!”

-“পেশা?” প্রফেসর স্যার কপাল কুঁচকালেন।

মাথা নাড়ল জয়, "জি স্যার, পেশা।"
-"তাই নাকি?"স্যার রেগে যাচ্ছেন। জয় তাতে লম্বা হাসল, "হ, স্যার। এই পেশায় দরকার— যা ইচ্ছে তা করার ক্ষমতা, আর মন-মানসিকতা। যখন যা ভালো লাগবে, যাতে আনন্দ এবং মজা পাওয়া যাবে, তা করার সাহস এবং পাওয়ারটুকু থাকলে অলওয়েজ ভালো থাকা যায়। সেটা খারাপ অথবা ভালো, এই চিন্তা করলে আপনি এই পেশার যোগ্য না। তাইলে আপনাকে ওই মাল গিলে ডিপ্রেশন কাটাতে হবে।"
-"তোমার কাছে এই পেশা আছে বলে তুমি মাল গেলো না? সিগারেট টানো না!"

-“ওটা তো ইশটাকিল, স্যার। জোয়ান ছেলেপেলে আমরা। রাত হলে দু-এক প্যাগ মাল পেটে না ফেললে চলে?”

এবার চূড়ান্ত রাগলেন স্যার, “বজ্জাত ছেলে, তোমার সাথে কথা বলাই তো উচিত হয়নি আমার!”

-“এমন ভাব করছেন যেন, আজকেই প্রথম অনুচিত কোনো কাজ এবং শব্দের সাথে পরিচয় হলো আপনার? দিনে কয়টা উচিত কাজ করেন? যেসব কাজ করেন আপনি, আমিও অত খারাপও না। মুখ খুলায়েন না, স্যার। বদনাম করছেন মুখের ওপর।”এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে আর কথা বলছে জয়। এটা

তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। কোনো সময় চোখের চাহনি এবং ঘাঁড় স্থির থাকেনা। পাখির মতো তাকিতুকি চলতে থাকে। প্রফেসর জিজ্ঞেস করলেন, "কবে এসেছ ঢাকা থেকে?"

-"আবার ঢাকা ফেরার সময় হয়ে এলো, আপনি আসার কথা বলছেন!"

-"পরীক্ষা কবে?"

-"পরশুদিন যাব।"

পাখিদের মতো চোখের চাহনি এবং ঘাঁড়টা সবর্ক্ষণ ছটফটে, চঞ্চল, বেপরোয়া জয়ের। প্রফেসর বললেন, "ভালো হও, বখাটে হচ্ছ দিনদিন!"

-“একটা বিয়ে দিয়ে দেন তাইলে! ভালো হয়ে যাই!’’

-“তোমাকে মেয়ে দেবে কে? এমন বাপ নেই দেশে আমার জানামতে! দিনকে দিন যা হাভাতে হচ্ছ! এক নম্বরের ম্যানার্সলেস তুমি! ’’জয় সোজা হয়ে দাঁড়াল, নাক শিউরালো, “দিলেন তো মুডটার আব্বা-আম্মা করে? ম্যানার্স কী জিনিস? হোয়াট ইজ ম্যানার্স! সেতা খায় না গায়ে মাখে? ম্যানার্স আর আমি একসাথে! এই অসম্ভব বাক্যটারে উচ্চারণ করার খুব দরকার ছিল আপনার এই মুহুর্তে? যান, যান! কোথায় যাচ্ছিলেন, যান। আপনার উদ্দেশ্যে সম্মান দেখিয়ে আবার সিগারেটটা

ফেলে দিলাম! আঠারো টাকা একটা সিগারেটের দাম!''

গম্ভীর মুখে তাকালেন স্যার, "শুধরাবে না।''

এগিয়ে গেলেন প্রফেসর।

জয় আনমনেই বলল, "শুধরালে কি আপনার মেয়ে বিয়ে দেবেন আমার সাথে?''

স্যার পেছন ফিরলেন, "কচু দেব।''

জয় স্যান্ডেলের ফিতা লাগাতে লাগাতে মুখ না তুলেই বলল, "লাগবেনা, ওটা আপনিই জুস করে খাইয়েন, পেট কমবে। আমার এলার্জি আছে, গা চুলকায়।''স্যার কপালে হাত ঠুকলেন! কবীর জিজ্ঞেস করল, "কী করবেন ভাই এখন?''

-“তুলির শ্বশুরবাড়ি যাব। কোয়েলকে আনতে যাব, সীমান্ত শালার চুলকানি বাড়ছে। ভালো একটা মলম কিনে নিয়ে গিয়ে একটু লাগিয়ে দিয়ে আসি। জনসেবা করাই তো কাম আমার।”

-“ভাই, মাইরেন না ওরে। সামনে কিন্তু নির্বাচন। হামজা ভাই জানলে আমি শেষ।”

নতুন একটা বাছাই অনুষ্ঠিত হবে আবার। কিন্তু জয় তাতে অংশগ্রহন করবেনা। হামজা জয়কে বলেছিল, “আমার পদটা তুই নে। নমিনেশন পাইয়ে দেব আমি।”

জয় জানিয়েছে, “শখ নেই। এই পদই ভারী পড়তেছে আমার ওপর। এইটাই কখন জানি অন্য কারও ঘাঁড়ে চাপায়ে দেবোনে।”

-“মাল-টাল খেয়েছিস? মাথা ঠিক আছে? পদ কি মুড়ির মোয়া তোর কাছে?”-“ভাই! ভালো হওয়া সহজ কাম, ঠিক ততটাই কঠিন হলো ভালো হওয়ার নাটক করাটা। যেটা আমাকে ছাত্রনেতা হিসেবে প্রতিমুহূর্তে করতে হচ্ছে। কোনোরকম অসভ্যতা, অশালীনতা, উশৃঙ্খলতা চলবে না। শালা মার্কা কথা একখান। ক্যান, বাল! আমি যদি আসলে ভালো না হই, তাইলে আমি নাটক করব ক্যা? তাও আবার বিনা পয়সায়। আমি ভালো

না, তবুও মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য নাটক করতে হবে? যাত্রাপালার জোকার আমি? এসব ভারী নাম, ভালো মানুষের পদক, কর্তব্যপরায়নতা–এসবে গা চুলকানি আছে আমার। তবুও শুধু রয়ে গেছি ক্ষমতা হাতে রাখার জন্যে। নয়ত এই বালের পদ আমার সাথে যায়না, তুমিও জানো।”

হামজা গম্ভীর চোখে তাকালো। হামজার চোখের মণি আলকাতরার মতো কালো রঙা। তাতে যেন চোখের দৃষ্টি আরও সূঁচালো লাগে দেখতে।জয় বোঝানোর মতো করে বলল, “চ্যাহ! আমার কথা বোঝার চেষ্টা করেন না ক্যা বাল? আমি আমার স্বাধীনতা হারায়ে

ফেলছি এই দায়িত্ব পালনে। নেতার মেলা গুণ থাকা লাগে, আমার নাই। প্রতিদিন আরমিণ আমার সাথে যা করে যাচ্ছে, তুমিই কও, ক্যান সহ্য করতে হইতেছে? আমি চাইলেও কষে চারটা থাপ্পড় লাগায়ে কানে ঝিঝি ডাকাতে পারিনা, মন ভরে বকতে পারিনা শালিরে। কারণ, আমি ছাত্রদলের লিডার। চ্যাটের বাল আমার।"

হামজা এ ব্যাপারে কিছু বলল না। সতর্ক করল, "বাড়ি থেকে বের হবি না।"

-"হলে কী?"হামজা শীতল চোখে তাকাল, "এ কথার খেলাপি হলে নিজের হাতে হাঁটুর হাড় ভাঙবো আমি, তোর। মাজহারের ছেলেরা

তিনবেলা নজর রাখছে বাড়ির ওপর। তোর ভাবী ওই বাড়ি যাবে বলে জিদ ধরে বসে আছে। বিকেলে সম্মেলন আছে, একটা হাঙ্গামা হবেই হবে। সাবধান করলাম, বাইরে যাস না।"

জয় ঘড়ি দেখল, দশটা বাজছে বেলা। ছাদে গিয়ে কবুতরের খাবার দিয়ে, দুটো কবুতর ধরে আনলো কচি দেখে। তরুকে ডেকে বলল, "পাতলা ঝোল রান্না করতে বলবি। মামি আর আমি খাবো। মামির শরীর ভালো? "

-"এখন ব্যথা কম। আপনি কোথায় যাবেন? হামজা ভাই কিন্তু বের হতে নিষেধ করেছে।

আমি গিয়ে বলে দেব আপনি বের হচ্ছেন।

''জয় চোখ বুলালো তরুর ওপর, "ভাড়ায় চালিত? হামজা ভাই ভাড়া দেয় তোরে আমার পেছনে লেগে থাকতে? কানটা দুই চড়ে গরম করে দেব, সম্বন্ধির চেংরি।''

হামজা রুমে এলো। রিমি বিছানার ওপর বসে আছে। গায়ের ওড়নাটা পরিত্যক্ত হালে বিছানায় পড়ে আছে। খেয়ালহীন, উদ্ভ্রান্তের মতো বসে আছে। হামজা গিয়ে বসল সামনে, "সকাল থেকে খাওনি কেন কিছু?''

-"আপনার পয়সায় কেনা কিছু খাওয়ার রুচি আসছে না।''

হামজা চরম ধৈর্য্যশীল পুরুষ। তবুও যেন ধপ করে আগুন লেগে গেল ভেতরে। তা গিলেও ফেলল মুহুর্তে। হাসল অল্প, "তাহলে কার পয়সায় খাবে? স্বামীর পয়সায়ই তো খেতে হবে তোমাকে।"

-"আপনি স্বামী?"

-"হিসাবে তো তাই আসে।"

-"ওই হিসেব ভুল ছিল।"

-"তাই নাকি? তো এখনকার নতুন সঠিক হিসেবটা কী?"

-"আপনি জানোয়ার, জংলি পশু, অত্যাচারী, ক্ষমতলোভী কুকুর। আমি আব্বুর কাছে যাব যখন বলেছি, তখন যাবোই। আপনি জানেন

আমার জিদকে। আপনাকে চেনাতে ভুল ছিল অনেক।''

হামজা নিজে উঠে গিয়ে খাবার আনলো। তা রিমির সামনে রাখতেই প্লেট ধরে গায়ের জোর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল রিমি। হামজা তাকিয়ে দেখল একবার প্লেটটা। রশিদা খালা দৌঁড়ে এলেন, প্লেট উঠাতে গেলে হামজা বলল, ‘‘উহু!''

রশিদা তাকালেন। হামজা দু’ধারে মাথা নাড়ল, ‘‘আপনি যান। যে হাত থেকে পড়েছে, ওই হাতেই উঠবে। সমস্যা নেই, যান আপনি। ''রিমিকে জিজ্ঞেস করল, ‘‘কী করবে ওই বাড়ি গিয়ে?''

-“দেখবো নিজের চোখে, আপনার মতো জানোয়ারের হাত কোনো বাড়িতে পড়লে সেই বাড়ির হাল কী হয়?”

-“চুরমার হয়ে যায়। তা দেখে কী হবে?”

ফুঁসে উঠল রিমি, “আপনার একটুও আফসোস নেই এসব নিয়ে?”

-“অভ্যাস নেই আফসোস করার। আমি নিজের কাজে কোনোদিন আফসোস করিনি, রিমি। সেটা যতই নিকৃষ্ট কাজ হোক না! আমাদের কাজই বিতর্কিত। এটা পলিটিক্সের পলিসি।”

রিমি ডুকরে উঠল। হামজার বুকে কঠিন দুটো ঘুষি মারল, “চোখের সামনে থেকে যান।

আপনাকে সহ্য হচ্ছে না আমার।”-“যা করছি দলের প্রয়োজনে। তোমার চাচা আমাকে মারতে চাইলে ভালোভাবে মিটিয়ে নিতাম। কিন্তু সে আমার দূর্বলতা খুঁজে বের করে সেখানে আঘাত করছে বারবার। এটা ভয়ংকর, রিমি। যে তোমাকে নয় বরং তোমার দূর্বলতাকে টার্গেট করে, সে তোমার জন্য জাহান্নামের মতো ভয়ানক। আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করছে গোপনে, অথচ প্রকাশ্যে আর খারাপভাবে জয়ের দিকে হাত বাড়াচ্ছে। একবার ট্রাক চাপা দিয়ে, পরের বার ছুরির আঘাত করে। মাজহারের প্রাপ্য ছিল যা, তা

পেয়েছে ও। এ নিয়ে তুমি বেশি বেশি করছো। পছন্দ হচ্ছে না ব্যাপারটা।"

ঝরঝর করে কেঁদে উঠল রিমি, "আপনি বন্দুক চালাতে জানেন, জানা ছিল না আমার।
"

-"হাস্যকর।" হামজা ঠোঁট বাঁকিয়ে অদ্ভুত ভয়ানকভাবে হাসল, আমি বন্দুক চালাতে পারিনা? এটা তোমার ফ্যান্টাসি, রিম। তুমি আমাকে এক ভদ্রলোক হিসেবে ভাবতে চাও, বাস্তবে যা আমি নই।"-"আপনাকে নিয়ে আমার ধারণাগুলো কাঁচের মতো খানখান হয়ে গেছে। আপনার পিস্তল এই দুই বছর বাদে সেদিন দেখলাম কাবার্ডের গোপন সিন্দুকে

তোলা। কেন, হামজা! এইসব লুকোনো রূপ কেন রেখেছেন নিজের মাঝে?”

হামজা শক্ত হাতটা রিমির কোমল গালে রাখল, “আরও আছে। যেসব ধারণ করতে তোমাকে কঠিন বেগ পেতে হবে। এখন থেকে প্রস্তুত হও। নয়ত সেসব সহ্য করতে পারবে না।”

রিমি অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, “আমার ভাই ছিল না, মাজহার ভাইয়া আমাকে কোলে-পিঠে চড়িয়ে মানুষ করেছে। আপনি তার পেট ছিদ্র করে রেখে এসেছেন? আপনি মানুষ?

হামজা হাসল, “মানুষই তো। রাজনীতির মানুষ।”-“রাজনীতিতে মানুষ ক্ষমতার জন্য এত নিচে নামতে পারে? আব্বু বা চাচ্চুকে তো নামতে হয়নি এমন! আপনি একটা ধোঁকা, একটা যন্ত্রণা। যা আমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে, আমি সইতে পারছি না। আপনার মুখ দেখেও বুক ভেঙে আসছে।”

হামজা হাসল, “তুমি বোকা, আর সরল, রিমি। তোমার বাপ-চাচা কী করেছে তা তো আর তোমার সাথে আলোচনা সভা ডেকে করেনি! নিজের বাপ-চাচা তোমার কাছে খারাপ হবে না, এটাই স্বাভাবিক। আর রইল কথা, মাজহারের। তো ও তোমাকে কোলে

পিঠে করে মানুষ করেছে বলে তোমার এত মায়া, আর আমি আমার এই হাতে জয়কে মানুষ করেছি, আমার কী? তোমার এই জিদ কোথায় গিয়ে থামবে, কোন কোন মোড় পাড়ি দেবে জানা নেই। তবে এসব ঝেরে ফেলো মাথা থেকে। ওই বাড়ি থেকে যেদিন তোমায় নিয়ে এসেছি আমার নামের কবুল পড়িয়ে, তুমি আমার হয়েছ। অতএব আমাকে ঘিরে চিন্তাধারা থাকা উচিত তোমার। বাপের বাড়ি পর হয়েছে, আমি তোমার জাত-পরিচয় এখন।''রিমিকে কান্নারত রেখেই বেরিয়ে পড়ল হামজা। সাদা ধবধবে পাঞ্জাবীর ওপর ঘিয়ে রঙের মুজিব কোট, বেশ মানিয়েছে

শ্যামবর্ণের লম্বা শরীরটাতে। গাড়িতে ওঠার আগে কবীর দ্রুত গিয়ে গাড়ির দরজা খুলতে গেল। হামজা রোদচশমা খুলে বলল, "এসব ফর্মালিটি দেখাবি না আমার সঙ্গে। পছন্দ না আমার।"

চারদিকে পোস্টারে ছেয়ে গেছে পথঘাট। মাইকিং চলছে রাস্তায় রাস্তায়। সেসব পেরিয়ে এগিয়ে চলল হামজার গাড়ি পলাশের ডেরার দিকে।

দিনাজপুর শহরের সন্ত্রাস বিস্তারের কর্মসূচি যার হাতে নিয়ন্ত্রিত। রাজন ও তাঁর ভাতিজা পলাশ। হামজার মোটেও ইচ্ছে ছিল না রিমিকে কাঁদিয়ে এসব করার। কিন্তু চাচাশ্বশুর

মশাই খুব লাফাচ্ছেন। পাত্তাই দিচ্ছেন না হামজাকে। আজও ক্লাবঘরের জানালার কাঁচ ভেঙে গুড়িয়ে দিয়ে গেছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়েছে, জয়কে কেইসে ফাঁসানোর জন্য খুব শক্ত পরিকল্পনায় নেমেছে ঝন্টু সাহেব। সুতরাং পলাশের সাহায্য একান্তই দরকার এসময়। ভোটের আমেজে এলাকা রমরমা হয়ে উঠেছে। আজ বিকেলের সম্মেলনে কিছু লোক লাগবে হামজার। পলাশ দিতে পারবে সেই লোক।হামজা বেরিয়ে যেতেই জয় বেরিয়ে পড়ল ভার্সিটির ক্লাবের উদ্দেশ্যে। সেখানে ঝামেলা হয়েছে ছাত্র হোস্টেলে কিছু একটা। সাদা লুঙ্গি ও শার্ট পরে তরুকে

ডাকল। তরু এলে বলল, “তোর বড় শালটা নিয়ে আয়, এসে আবার দিয়ে দেব। নাকি সমস্যা হবে?”

তরু কথা না বলে বেরিয়ে এলো। তার জানটা যেখানে হাজির, সেখানে শালের কথা বলছে। শালটা জয়ই আগের বছর কাশ্মির থেকে কিনে এনে দিয়েছিল।

ভার্সিটিতে ঢুকতেই ছেলেরা ভিড় করে ফেলল জয়কে ঘিরে। এজন্য সাধারণত জয় ভার্সিটিতে ঢোকে মুখে রুমাল বেঁধে, ক্যাপ পরে, পেছনের ঝোপঝাড়ের রাস্তা দিয়ে। সামনে দিয়ে ঢুকলেই সালামের জবাব দিতে আর ছেলেদের ভিড়ে বিরক্তি ধরে যায়।

অনেকে হ্যান্ডশেক করতে এগিয়ে এলো। ভালো আছে কিনা, জিজ্ঞেস করল। ছেলেরা পেছনে, সামনে জয় হেঁটে এগিয়ে গেল ক্লাবের পথে। পথে হিন্দু ম্যাডাম শ্যামলী দাসের সঙ্গে দেখা হলো, জয় লম্বা করে একটা সালাম দিলো, "আসসালামুআলাইকুম, ম্যাম।"ম্যাম অল্প হাসলেন। এই কাজটা জয় ইচ্ছে কোরে করে। হামজা থাকলে ধমক দিতো, সালাম নিয়ে ইয়ার্কি ঠিক না। কিন্তু জয়ের কাছে যুক্তি আছে। শান্তি সবার ওপরই বর্ষন করা যায়। তার ওপর জয়ের তো কোনো ধর্ম নেই!

কার্যালয়ে গিয়ে চেয়ার টেনে বসল। প্রথমেই এলো একদল সেকেন্ড ইয়ারের পরীক্ষা শেষে ফাইনাল ইয়ারের বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন বিষয় নিয়ে। জয় হিসেব দেখে কাগজটা টেবিলে রেখে বলল, "এতোসব বড়োলোকি আয়োজন করার মানে নেই কোনো। জিলাপি অথবা বাতাসা ছিটিয়ে হরিরলুট দিয়ে দে।"
-"ভাই এই একটা কথা?"-"কথা না? কথা কাকে বলে, বলতো? মনের ভাব প্রকাশ করতে যে ধ্বনি বা আওয়াজ গলা দিয়ে বের হয়, সেটাই ভাষা বা কথা। সেই হিসেবে আমারটা কথা ছিল না?"

কপাল চাপড়ালো ওরা সব। বোঝা গেল, জয় এ ব্যাপারে আর কথা বলতে আগ্রহী নয়। তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। মজার ছলে আন্তরিক কথা, আর আন্তরিক স্বরে বানোয়াট ভন্ডামি করা লোক সে।

পেপার ওয়েট নিয়ে খেলতে খেলতে বলল, "হোস্টেলে কী হয়েছে?"

একজন বলল, "ভাই.. ভার্সিটিতে গতদিন বিকেলে আপনাকে নিয়ে বিতর্ক লেগেছিল। আপনি নাকি সেকেন্ড ইয়ারের একটা মেয়েকে হ্যারাস করছেন। মেয়েটা কমপ্লেইন করেছে সাধারণ সম্পাদক মুকুলের কাছে। আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, আপনি

ওকে বাজেভাবে ডিস্টার্ব করেন ভার্সিটিতে আসলে। সাথে..'' থেমে গেল ছেলেটা। বাকিটা বলতে ভয়।জয় হেসে ফেলল নিঃশব্দে। চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজল ছাদের দিকে মুখ তুলে বিরবির করল, "আরমিণ, আরমিণ, আরমিণ! কী যে করো তুমি? এই তো খেয়াল থেকে বের হয়ে যাচ্ছ, আবার ঠিক কোনো না কোনো বেয়াদবী করে আগুন জ্বালাচ্ছ ভেতরে।

চোখ খুলল, "সাথে? কী রে? থামলি কেন? শুনছি, বলে যা।থামিস না।''ছেলেটার মুখ শুকনো। জয় সোজা হয়ে বসল, "বিক্ষোভ চলছে এই নিয়ে, তাই তো? তোমাদের কী

মনে হয়, এতে আমার পদত্যাগ করাতে পারবে তো? এরকম এই নীরব বিক্ষোভ করছে সবগুলো মহিলা মানুষের মতো পেছনে লুকিয়ে? ছ্যাঃ! শালারা হিজড়ার বংশ সব। এদের দিয়ে আদৌ সমাজে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা হবে? এই যে গেইট দিয়ে ঢুকলাম, একটা খোয়া পর্যন্ত ছুঁড়ল না কেউ! বিদ্রোহ-সংগ্রাম পারেনা এরা! অথচ ছাত্র-রাজনীতিতে আছে। লজ্জাজনক! সামনে এসে একটা বকা পর্যন্ত দিলো না কোনো শালা! এই নাকি এরা ছাত্রলীগ, এরা যুবসেবক! শালারা, বালের আন্দোলন শিখেছে। আমি হামজা ভাইকে মানাতে পারছি না পদত্যাগের জন্য। কত

দুঃখে আছি। অজান্তে হলেও আমার পদত্যাগ করিয়ে একটা উপকার করতে পারতো ব্যাটাশশালারা, খাস মনে দোয়া দিতাম।''

সবার মুখে আতঙ্ক ছেয়ে গেল। জয় আমির পদত্যাগ করতে চায়! এই লোক মজার ছলে কঠিন সত্যি কথা বলে।

জয় ডাকল, "সেজান, কাল সকালে ওদের কার্যালয়ে আনবি। আন্দোলন শেখাবো, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো শেখাবো। যাহ।''সকলে হাহাকার করল, "ভাই! আপনি কি পদত্যাগ করতে চান? মানে..''

পেপার ওয়েট হাতে তুলে উঠে দাঁড়াল জয়। রাহাতকে বলল, "আগামীকাল একটা

সম্মেলন ডাক, সকলে যেন উপস্থিত থাকে। কাল না হলে পরে কিন্তু দেরি হবে। কাল রাতে গাড়ি আমার, ঢাকা থেকে ফিরতে দেরি হবে কয়েকদিন।''বহুদিন, বেশ বহুদিন পর জয়কে কার্যালয়ে পাওয়া গেল সেদিন। রাজনৈতিক কর্মীর মতো সাদা ভদ্র পাঞ্জাবীতে নয়, জয় আমিরকে দেখা যায় তার চিরচেনা ভূষনে। লম্বা শরীরে সাদা ধবধবে থানের লুঙ্গি, একটা শার্ট। তার ওপর শাল জড়ানো। পায়ে চামড়ার স্যান্ডেল, তার বেল্ট খোলা। প্রয়োজনমতো ক্ষেত্রবিশেষ বদমাশ, রসিক জয় আমিরের চেহারায় ফুটে ওঠে গম্ভীর এক নেতৃত্ববোধ। অনেকদিন পর কার্যালয় থেকে

সে দলবলসহ ক্যাম্পাসে নেমে চক্কর দিলো চারদিকে।
এলএলবি বিভাগের ছাত্রী অন্তূ। সেখানকার হেড হলেন শিক্ষিকা মনোয়ারা রেহমান। জয় অনুমতি চাইল দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে,
"আসবো, ম্যাম?"
-"এসো।"ম্যাম কিছু লিখছেন। জয় সালাম দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত, পরে বলল, "বসতে বলবেন না, ম্যাম?"
চশমার ফাঁক দিয়ে আড়চোখে তাকিয়ে ইশারা করলেন ম্যাম। বসল জয়, "কেন ডেকেছেন? নাস্তা এনেছেন ভালো কিছু? আপনার হাতের পাটিসাপটা খাই না কতদিন, ভেবেই খিদে

লাগছে। পানি আছে, ম্যাম? দুটো ঘুমের ওষুধ খাবো। আমার আবার ঘুমের ওষুধ পেটে পড়ার পর কাজ শুরু হতে দেরি হয়। এখন খেলে তবে বাড়ি গিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারব।''মনোয়ারা ধমক দিলেন, “সাট-আপ! চুপ করে বোসো।''

জয় ঠোঁটে আঙুল ঠেকালো, “ওকে। কিন্তু শুধু চুপ করতে বললেই হতো। বসে তো আমি আছিই।''

মনোয়ারা কটমটিয়ে তাকালেন। জয় হাতের পেপার ওয়েটটা টেবিলে ঘুরিয়ে খেলছে। ঠোঁটে বাচ্চাদের মতো দুষ্টু হাসি। মনোয়ারা

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।-“কতটা নিচে নেমেছ তুমি, ভাবো না সে নিয়ে তাই না?”

-“ম্যাম! ভাবিনা, তার একটা কারণ আছে। ভাবলে নিচে নামতে কষ্ট হয় অথবা নিচে নামার ইচ্ছেটা আর থাকে না, এইজন্য ভাবিনা।”

মনোয়ারা কপালে হাত চাপলেন, “ফাজলামি পেয়েছ? আর একটা বাজে কথা বললে থাপ্পড় মারবো একটা।”

-“রেগে যাচ্ছেন কেন?”

-“খুশি হবো তোমার বাদরামিতে?”

-“খুশি হওয়াই তো উচিত। দুঃখিত হবার কিছু দেখছি না।”

-"মানুষ বড় হবার সাথে সাথে বদলায়, তোমার আরও অবনতি হচ্ছে। যখন অনার্সে ভর্তি হলে, ভাবলাম ছোটো মানুষ, শুধরে যাবে। আজ অবধি একটুও শুধরেছো?"

-"আপনি খামোখা রেগে যাচ্ছেন, ম্যাম! করেছি টা কী?"

-"তুমি জানো না, তাইনা?"

-"আমার মাথায় তো জট নেই। ধ্যান-ট্যান করিনা। জানব কীভাবে?"

-"তর্ক করছো?"জয় মুখে আঙুল দিলো।

-"তুমি নিজেই বলো তো, একজন ছাত্রনেতার সাথে এরকম অসভ্য কর্মকাণ্ড যায়? ভার্সিটিতে মেয়েরা যদি তোমার কাছেই

নিরাপদ না হয়, তাহলে জুনিয়ররা তোমার কাছে কী শিখবে? তোমার শাসন মানবে তারা?''

জয় মাথা নাড়ল, ''জি না, মানবে না। আমি হলেও মানতাম না।''

ধমকে উঠলেন ম্যাম, ''চুপ্প, ফাজিল। তোমায় আমি কী করব, জয়? এত দায়সারাভাবে জীবনযাপন কোরো না, কোথায় গিয়ে আঁটকে যাবে, তখন কিন্তু ছটফটানিতে লাভ হবে না বিশেষ!''

জয় হাসলো, ''ম্যাম, আমি জানি, আমার পরিণতি খুব একটা ভালো না। কিন্তু আমার

সেই পরিণতিকে ভয় লাগেনা। এই রোগের ওষুধ নেই?''-“তুমি পাগল, জয়।''

-“বেশি না। অল্প।''

-“একসময় আসবে আমার কাছে সময় করে, কথা বলব। জীবনে পাপ তো কম করলে না, এখন থামা উচিত নয়?''

-“না। থামবো কোন সুখে? ট্যাকা-পয়সা দেবেন থামলে?''

মনোয়ারা চুপচাপ চেয়ে রইলেন। জয় আলগোছে হাসল ম্যামের চোখের দিকে তাকিয়ে, “পাপ করতে করতে থামলে মানুষ আর বাঁচে না, ম্যাম। আমি আর কিছুদিন

বাঁচবো, ভাবছি। বিয়েশাদী না করে মরা ঠিক না।''

মনোয়ারা জয় আমিরের এক হাসিতে ঝলসে গলে গেলেন যেন। জয়ের চোখের দিকে তাকাতে নেই। এটা তিনি মানতেন আগেও। যখন ভার্সিটিতে ছিল, এত্ত সব কুকর্ম করে বেড়াতো। অথচ গালি ঝারলে বা মারলে যে ছেলে রাগেনা, কখনও যে সিরিয়াস হয়না, ঠোঁটের দুষ্টু হাসি অথবা রসিক কথাবার্তা থামেনা, তাকে শাস্তি দেবার উপায় কী?

মনোয়ারা কপট কঠিন স্বরে বললেন, "এখন বলো, কী হয়েছে মেয়েটার সঙ্গে তোমার?

''জয় হাঁ করে শ্বাস নিলো। কিছু বলতে

প্রস্তুতি নিলো সে। এরপর সুন্দর করে বলল, “রাগারাগি হয়েছে।”

-“রাগারাগি হয়েছে? জুনিয়রের সাথে রাগারাগি?”

-“আরমিণ আমার প্রেমিকা, ম্যাম! কিন্তু ও এখন আর আমাকে চায়না। কথা বলতে গেলেই, ছ্যাঁত করে ওঠে শালি, এড়িয়ে চলে, এরপর গতকাল আবার অভিযোগ করেছে।” একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জয়, “এখন আপনি যদি গিয়ে ওকে এই কথা জিজ্ঞেস করেন, ও এটাও স্বীকার করবে না যে ও আমার প্রেমিকা।”

তাজ্জব বনে গেলেন মনোয়ারা, “তোমার প্রেমিকা? তোমার মতো ক্যাঙ্গারুর প্রেমিকা? এসবও বিশ্বাসও করে মরতে হবে?”-“কেন বিশ্বাস করতে পারছেন না?”

মনোয়ারা চুপচাপ জয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এরপর না চাইতেও আচমকা হেসে ফেললেন, “তুমি কী ভাবো আমায়? আমি জানিনা তোমায়?”

জয় হাসল, “কী জানেন?”

মনোয়ারা গম্ভীর হবার চেষ্টা করলেন। অথচ লাভ নেই। তাই তিনি কৌশলে বোঝানোরচেষ্টা করলেন বেপরোয়া ষাঁড়টাকে, “আর জ্বালাবে না মেয়েটাকে। তোমার নিজের

রেপুটেশন খারাপ হয়, এই খাতিরেও তো বদমাশি ছাড়তে পারো!''

জয় বোঝানোর চেষ্টা করল, ‘‘সত্যিই ও আমার গার্লফ্রেন্ড, ম্যাম।''

মনোয়ারা কঠিন হতে গিয়েও হাসলেন, ‘‘গেটা আউট। কান ধরে দাঁড় করিয়ে রাখব এবার। বের হও আমার রুম থেকে।''

জয় বাইরে বেরিয়ে এলো হাসতে হাসতে ম্যামের কক্ষ থেকে। আপন মনেই বলল, ‘‘আরমিণ! কেন যে এত সহজভাবে নাও আমায় তুমি? কেন? হোয়াই?''পলাশের ডেরা উপজেলার শেষ প্রান্তে। চারপাশে বিশাল বিশাল গাছ, তার পাশে একটা পুকুর আছে।

পুকুরের পেছনে দোতলা বাড়ি, ওপরে শ্যাওলা পড়া রুফটপ টাইপের।

হামজা বসল। পলাশ এলো গায়ে শার্ট জড়াতে জড়াতে। পরনে থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট, নেমে আছে কোমড়ের নিচ অবধি।

-“এমন সব সময়ে আসো, এই তো কেবলই গেলাম রুমে। এসব সময় মাঝপথে চলে আসা যায় নাকি?”

হামজা বলল, “দরকার বলেই এসেছি। রঙ-তামাশার জন্য রাত আছে, কাজের জন্যই দিন। রাতে তো আমি আসব না, অন্তত কাজের কথা বলতে! তখন এসব কাজ

সারবেন।''-"মন বা শরীর তো আর দিন-রাত বোঝেনা। হোটেলে গেছিলি?''

-"ওখানে পাইনি বলেই এখানে এসেছি।''

দু'হাত একত্র করে ঝুঁকে বসল হামজা, "মাজহারের খবর পেয়েছেন?''

-"হুম! কাজটা ঠিক করো নাই। বহুত হাঙ্গামা সইতে হবে এর বদলে। অলরেডি কিছু একটা হইছে বলেই আসছো! ঠিক বলছি না? ''

-"না, ঠিক বলেন নি। তেমন কিছুই হয়নি। তবে হবে বলে আশঙ্কা করছি। আপনি আবার মাজহারকে সাহায্য করছেন না তো?''

-“আরে নাহ! আমার কাছে আসে, বসে, দু একটা ফুঁক মারে, চলে যায়।”
-“অবাস্তব, পেট বানানো কথা শুনতে এখানে আসিনি, পলাশ ভাই। বাজে কথা রেখে সোজা কথায় আসুন!”
-“তো তুই কী চাস আমার কাছে? তোর শত্রুগুলোরে আমার শত্রু বানায়ে ফেলি? এখানে বসে ব্যবসা-কারবার চালাতে গেলে দিনাজপুরের সব রাজনীতিবিদকেই দরকার আমার। আমার কারবারের কাছে আমি আপোস করিনা, জানিস তো তুই।”হামজার জন্য নাশতা এলো। পলাশ খেতে ইশারা করল। হামজা তা উপেক্ষা করে বলল, “আজ

যদি মাজহারের লোক কোনো হাঙ্গামা করে, আপনার কারবারেও ভাটা পড়বে। এখানে বসে কলকাঠি নাড়ার সুযোগ আমি দেবোনা বোধহয় আর।''

-''ইশ! কথা কোন দিক থেকে কোন দিক নিয়ে যাচ্ছ? আমি শুধু কারও সাথে সম্পর্ক নষ্ট করতে চাই না। আর এইটাও চাই, তুমি আর মাজহার এক হও। যেহেতু আমারও তোমাদের প্রয়োজন, তোমাদেরও আমাকে। অথচ দুজন এক হইতে পারো না, মাঝে পিষে মরতেছি আমি।''

-''অথচ মেয়র হচ্ছি আমি। মাজহারের গোষ্ঠীশুদ্ধ রাজনীতি থেকে উপড়ে ফেলবো।

তাহলে ওদের সাথে আপনার সম্পর্ক রাখার বিশেষ দরকার হবে বলে মনে হয় না!''পলাশ সিগারেট ধরিয়ে ঠোঁটে চেপে বলল, "চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।'' সোফার ওপর শরীরের ভার ছেড়ে বসল।

হামজা শুনলো না বোধহয় সেই কথা, সোজা সাপটা বলল, "আজ সম্মেলনে যদি একটা আওয়াজও আসে ওদের, সামান্য পরিবেশ নষ্ট হলেও আপনার ধান্দার শিকড় একটানে উপড়ে তুলে ফেলে দেব আমি। মাজহার ঢাকায় চিকিৎসারত। ওর ছেলেরা আতঙ্কগ্রস্থ। অথচ আমি জানি, আপনার লোকজন মাজহারের হয়ে ক্লাবে প্রতিদিন

গণ্ডোগোল করতে যাচ্ছে। আপনি ওদের নিষেধ করবেন।”

পলাশ চুপচাপ তাকিয়ে রইল একটু হামজার দিকে, পরে গম্ভীর হলো, “আমি ওদের যেতে বলিনি।”

-“আমিও আমার ছেলেদের যেতে বলব না। ওরা নিজেরাই দড়ি ছিঁড়তে খুব ওস্তাদ। আর জয়কে তো চেনেন!”

-“এত হাইপার হয়ে এই লাইনে টিকবি কেমনে? তুই শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করেই এত তাড়াতাড়ি এইখানে আসছো। এখন আমি যা বলি মন দিয়ে শোনো।”-“সংক্ষেপে শেষ করুন, সময় কম হাতে।”

-“জয় কোথায় এখন?”

-“বাড়িতে।” কথাটা মুখে বললেও মনের ভেতরে খট করে উঠল হামজার। যে ডানপিটে ছেলে, আসলেই বাড়িতে আছে তো? রাগে শরীরের লোম দাঁড়িয়ে গেল হামজার। সবকিছু অসহ্য লাগছে কেন জানি।

পলাশ বলল, “জয় তোর সাধের গোয়ালের পাগলা ষাঁড়। ওরে তুই ভালো শক্ত দড়িতে আটকাস নাই কোনোদিন। এইজন্য ভুগবি খুব। যতই গুছায়ে রাখতে চাও আব্বা গোয়ালটারে, পাগলা ষাঁড়টা যতদিন খোলা আছে, তোমার দূর্ভোগের শেষ থাকার কথা না। নির্বাচনের আগে যে কামড়া করছিস

তুমি, আমি খালি ভাবতেছি ওরা এখনও কেইস ফাইল করে নাই ক্যান তোর নামে? সাবধান থাক, ঝড়ের আগের নীরবতা বলেও একটা কথা আছে। ঝন্টু সাহেব ছেলেকে নিয়ে ব্যস্ত, চিন্তিত। কিন্তু মাজহার সুস্থ হোক, ফিরে আসুক, খেলার দিন গেল না, আসতেছে। নির্বাচন ক্যান্সেল করছিস, ছেলেটারে আধমরা করছিস মেরে। এই সময় ঠিক না এসব।''হামজা চুপচাপ শুনলো। পরে জিজ্ঞেস করল, "রাজন মামা আসবে কবে?" সিগারেট ফেলে দিয়ে বলল পলাশ, রাজধানীর ব্যস্ততা মেলা। ঠিক নেই কবে আসে এক ঝলক।''

-“আর কিছু বলতে চাচ্ছিলেন। মুখের ভেতরে না রেখে বলে ফেলুন।”

হামজার কথায় হেসে ফেলল পলাশ, “তোরে আমার খুব ভাল্লাগে, হামজা! একদম সফল গ্যাংস্টার, তুই। তবে আমারে যে পদে পদে দরকার তোর, এইটা ভুলবি না।”

পলাশের চোখের রঙ ধূসর, ঠিক বিড়ালের মতো জ্বলজ্বল করে। হাসলে কেমন এক গা ছমছমে ভাব ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশে। চেহারাটা অন্যরকম দেখতে। ভ্রুর মাঝখানে ফাঁকা নেই, জোড় ভ্রু, খাঁড়া নাকের ডগায় সূক্ষ্ণ বিভাজনের কারণে নাকটা অদ্ভুত লাগে দেখতে। কথা বলার সময় ঠোঁটে একটা

প্যাচপ্যাচে হাসি লেপ্টে থাকে। এই হাসি দিয়েই দিনাজপুরের কালোবাজার জমজমাট চলছে পলাশের হাতে।হামজা বেরিয়ে এলো। তার মন অশান্ত হয়ে আছে। অস্থির হাতে ফোন করল বেশ কয়েকবার জয়কে। জয় প্রতিটা কল গুণে গুণে কেটে দিলো। ফোন ভাইব্রেট হলো হামজার। রিপন কল করেছে। মিনিট চারেকের মতো শুধু বলল ওপাশ থেকে, হামজা শুনল। মাথায় রক্ত উঠে গেল। সোজা গাড়িতে উঠল বাড়ির উদ্দেশ্যে।
তরু অসময়ে হামজাকে দেখে চমকালো। হামজা রাগে না, খুব শান্ত মানুষ। রাগলে মানুষ থাকেনা, এটাও সত্য।

-“জয়! জয় কই?”তরু কথা বলল না। মাথা নত তার, হাত-পা শিরশির করছে। তরুর নীরবতা হামজাকে ক্ষুব্ধ করে তুলল। হাতের ফোনটা এক আঁছাড়ে চার খণ্ড করল। বকে ওঠে, “জানোয়ারের বাচ্চা! বের হয়ে গেছে? বললাম, বাইরে পরিস্থিতি খারাপ, বের হোস না। বের হইছে আবার ভার্সিটিতে গিয়ে অকামও করা সারা। তোরা কেউ দেখিসনি যখন বের হইছে? দেখিস নি?”

তরু ঠকঠক করে কেঁপে উঠল। দৌঁড়ে এলো সকলে।

-“সবগুলা ভ্যাড়াচ্চুদা একেকটা নাকে তেল মেরে ঘুমাও? ওই শুয়োরের বাচ্চা, আজ বাড়ি

আসলে... ” ডাইনিং টেবিলের ওপরে থাকা জগটা এক বাড়িতে মেঝেতে ফেলল। ঝনঝন করে গুড়ো হয়ে গেল সেটা।

হুমায়ুন পাটোয়ারী এগিয়ে এলেন, “কী হইছে? ক্ষেপছিস ক্যান? জয় বাচ্চা ছেলে? ওরে নিয়ে এত ভয় পাওয়া লাগবে? কি শুরু করছিস?”তুলি বের হয়ে এলো, “তোমার ছেলে কি মানুষ, আব্বু? কোয়েলকে আনতে যাওয়ার কথা ছিল, জয় সেখানে গেছে হয়ত!” হামজা তাকালো তুলির দিকে। তুলি চুপ করে গেল। হামজার চোখ দিয়ে রক্ত ছুটে বের হচ্ছে। চোখ বুজে ক্ষেপে যাওয়া গোখরা সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস নিলো

নিজেকে শান্ত করতে। সোফার পাশে হাতের ডান সাইডে কাউচের ওপর জয়ের হেডফোন পড়ে আছে। সেটা তুলে ছুঁড়ে মারল শূন্যে। সেটা গিয়ে দেয়ালে লেগে ভেঙে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল।

হুমায়ুন পাটোয়ারী বললেন, “তুই শান্ত হ। ওর কিচ্ছু হবে না..”দাঁত আঁটকে বলল হামজা, “আব্বু কথা কম বলেন, আপনি। তুলি ভেতরে উঠে যা, যা..” গর্জে উঠল হামজা। তুলি চোখ বুজে ফেলল সেই বজ্রকণ্ঠে। তবে নড়ল না।তরুর গা কেঁপে উঠল অজান্তেই। হাতের লোম দাঁড়িয়ে গেছে, শিউরে উঠল শরীরটা।

-"বাইরের পরিস্থিতি সম্বন্ধে ধারণা আছে আপনার কোনো? ফোন লাগান, ফোন লাগান কুত্তার বাচ্চারে। জলদি, জলদি করেন! ফোন কই আপনার, ফোন কই?"

হুমায়ুন পাটোয়ারী দৌঁড়ে গিয়ে ফোন আনলেন। ফোন করলেন জয়কে। জয় দুবার কেটে তিনবারের বার রিসিভ করে। হামজা ফোন কানে ধরতে ধরতেই মাড়ি পিষল, "বান্দির বাচ্চা! কই মরতে গেছিস? আজ আমার সামনে আসলে তোর রুহু না বের করে নিই আমি। হারামির বাচ্চা, শালা শুয়োর! কতবার নিষেধ করে গেছি আমি তোরে? পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাড়ি না আসলে

খু ন হয়ে যাবি আমার হাতে। জীবিত পুঁতে রাখবো একদম! কথা কানেও যায়না, মাথায়ও ঢোকেনা?”সেই মুহুর্তে ভেতরে ঢুকল জয়। তার কানে ফোন ধরা তখনও। হামজা ফোন নামিয়ে রেখে এগিয়ে গেল জয়ের দিকে। জয় একলাফে সোফা টপকে ওপাশে গিয়ে দাঁড়াল, "ভাই, থামেন বাল। আমি কিন্তু ছোটো বাচ্চা না। কাজ ছিল, বের হইছিলাম। সবার সামনে মারলে বেইজ্জতি হবে আমার।”

হামজা তেড়ে ধরতে গেলে জয় ছিটকে দাঁড়াল, "আমারে কি তোমার ভুদাই মনে হয়? ওরা আসবে, আমার ক্ষতি করে চলে যাবে, আর আমি পেছন মারা খেয়ে চেগায়ে পড়ে

থাকব ওইখানে?''হামজা নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়েও পারলো না। বিশ্রী ভাষায় বকলো, "আর একটা কেইস যদি ভরে দেয় তোর পেছন দিয়ে, তারপর? এমনিতে কি চারদিকে প্যারার অভাব? কীসের সম্মেলন ডেকে এসেছিস কালকে? আর মাত্র পনেরো দিনও নেই নির্বাচনের। এই সময় তোকে টলারেট করবো নাকি যা যা ঝামেলা বেঁধে আছে চারদিকে, আরও ঝেপে ঝেপে আসছে, সেগুলো টেকেল দেবো? তোর ঝন্টু আব্বা তোর নামে কয়টা কতরকমের কেইস ফাইল করবে, তোরে ফাঁসি দড়িতে না ওড়নায় ঝুলাবে, আমার নির্বাচন চাঙে না মাচায়

তুলবে সেই পরিকল্পনা আঁটছে। ভার্সিটিতে তোর বিপক্ষে আন্দোলন চলছে, নির্বাচনের দিন এগিয়ে আসছে। শুয়োরের বাচ্চা, এবার ভালো হ। চাপ নিতে নিতে আমার ধৈর্য্যে টান লাগলে সব গুলারে একসাথে কুচি কুচি করে কেটে পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দেব। একেরকম কর্ম করে রাখো, তা সামাল দেয়ার জন্য একা আমি?''হুট করে হামজা রুখে গেল জয়ের দিকে। গায়ে হাত লাগার আগেই মাঝখানে তুলি এসে দাঁড়াল, "থাম! রাগ উঠলে পাগল হয়ে যাস? মানুষের চামড়া আছে তোর মাঝে? এই জন্যই তো ভাবী তোকে ঘেন্না করে।''

হামজা চোখ বুজল, “তুলি সরে যা সামনে থেকে। তোর গায়ে হাত দিতে চাচ্ছি না, আমি। বেশিক্ষণ মনে রাখতে পারবো না, তুই মেয়ে মানুষ।”

-“ভুলে যা। পারলে ভুলে গিয়ে মার আমায়। ওর শরীর ভালো? তুই ওকে মারতে যাচ্ছিস, তার আগে নিজের দিকে দেখ। সব ভুল ও-ই করে, তোর কোনো ভুল নেই? তুই তোর চাচাশ্বশুরকে নির্বাচন থেকে বাদ করেছিস কেন? এখন ওরা ক্ষেপে গেলে সামাল দেয়া কষ্ট হচ্ছে, তার ভাগ জয় কেন নেবে? তুই ক্ষমতার লোভে বহু আগে জানোয়ার হয়ে গেছিস, জয়কেও বানিয়েছিস। শোধ। এ

বাড়ির কোনো পুরুষ বা মেয়েলোকটা ভালো? কেউ কাউকে কাঁদা ছোঁড়ার নেই।''হামজা সরে এলো। জয়ে সোফা টপকে হামজার সামনে এসে দাঁড়ায়, "ভাই!"

হামজার কাধের দুপাশে নিজের দু হাত জড়িয়ে পিছিয়ে নিয়ে গিয়ে সোফায় বসিয়ে দিলো হামজাকে। এরকম নির্লজ্জের সামনে চেয়েও হামজা কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারেনা আর। মুখ কঠিন করে ভারী শ্বাস ফেলতে লাগল।

জয় পা ফাঁক করে বসল সোফাতে পাশেই, "ঠান্ডা হও, তুমি। সব ঠিক আছে। যা হয় দেখা যাবে। কিছু না হতেই তা হবে আশংকা

করে যদি অশান্তি করো, তাইলে না হওয়া অবধি যে শান্তিটুকু পাওয়ার ছিল, সেটা থেকেও তো বঞ্চিত হচ্ছি আমরা।''হামজা দাঁত খিঁচল, "ফাক ইওর প্লেসান্ট্রি!

জয় হামজার কোলে মাথা রেখে শুয়ে বলল, "ফাক ইউ টু ব্রো।''

হামজা মাথা এলিয়ে বসল, "তুই কী করেছিস আরমিণের সাথে?''

-"খবরদার ভাই, একদম এসব মেয়েঘটিত বিষয়ে জড়াবে না আমায়। আমি ভার্জিন ছেলে, ভালো ছেলে। তুমি আরমিণকেই গিয়ে জিজ্ঞেস করো, ও আমার সাথে কী করেছে?''

সকলের কানে বোমা ফাটলো যেন। তরু ভ্রু কুঁচকাল, আরমিণ আবার কে? কোন মেয়ে জয়ের সাথে কী করেছে? হামজা বলল, “কীসব বাজে কথা বলছিস? ও কী করবে তোর সাথে?”

-“আমি কিছু না করে ভুল করছি। শালী, আমার নামে অভিযোগ করছে, আমি নাকি ইভটিজিং করি ওকে। কসম, এখন অবধি ছুঁয়ে পর্যন্ত দেখিনি। মুখটাই দেখছি ভুলেভালে একবার। পাগল-ছাগল চেংরি, ইভটিজিংও বোঝেনা।”চাঁদনীর সাথে আবার দেখা করতে গিয়ে সেদিন ওদের পায়নি অন্তূ। ঘর-বাড়ি আছে, মানুষ নেই। আজব ব্যাপার। আঁখির

লাশ মাটি হয়েছে দুই সপ্তাহও হয়নি। হতে পারে হামজারা উচ্ছেদ করে দিয়েছে ওদের। আশেপাশের বাড়িতে খোঁজ করতে যেতে পারেনি সংকোচে। পাশেই হামজার ক্লাব। পুরো এলাকা পোস্টারময়। গাড়িতে গাড়িতে মাইকিং চলছিল। বিশ্রী অবস্থা।

শহরের ভেতর ঢুকে ভীষণ অস্বস্তি হলো অন্তূর। আব্বু ছাড়া একা চলার অভ্যাস নেই। চার মাস আগে দুটো ছাত্র পড়াতো। নিজের ব্যস্ততায় এবং আমজাদ সাহেবের নিষেধে বাদ দিয়েছিল। একজনের কাছে দুই মাসের বেতন পাওনা ছিল। তা কোনোদিন চাইতে যায়নি অন্তূ। সেদিন ফেরার পথেই তাদের বাড়ি

পড়েছিল। মহিলা দেখতে পেয়ে খুব খাতির করে ভেতরে বসিয়ে নাশতা করিয়ে সেই টাকা জোর করে হাতে ধরিয়ে দিলেন। অন্তূর ফুরফুরে লাগছে মনটা! পুরুষেরা ভাবে, তারাই বোধহয় শুধু বেকারত্বে পিষে মরে, শখ-আহ্লাদ পূরণের ব্যর্থতায়। তারা বুঝবে না, মেয়েরাও স্বপ্ন দেখে নিজের যোগ্যতার জোরে হালাল উপার্জনের টাকায় দুটো মানুষের হাতে কিছু তুলে দিয়ে তাদের কপট রাগের স্বীকার হতে।এখন অন্তূ পুরো টাকাটা দিয়ে একটা দামী রোলেক্স ব্রান্ডের ঘড়ি কিনে নিয়ে যাবে আব্বুর জন্য। আব্বু হাসবেন না, একটুও না, বরং গম্ভীর হয়ে বলবেন, "বেশি বড় হয়ে

গেছিস? এসব আনতে কে বলেছে? তোর এটা নেই, সেটা নেই। এটা দিয়ে কিনে নেয়া যেত না? যা নিয়ে যা তোর ঘড়ি, লাগবে না আমার। আমি ঘড়ি পরি না এখন আর।''

অন্তূ চুপচাপ রেখে চলে আসবে। তৎক্ষণাৎ ঘড়িটা হাতে তুলে নেবেন আমজাদ সাহেব। উল্টে-পাল্টে দেখবেন, অল্প-বিস্তর হাসবেন। সেই হাসিও যেন গম্ভীর দেখাবে। এরপর হাতে পরবেন ঘড়িটা। আবার খুলে রেখে দেবেন পুরোনো আলমারির ডান পাশের ড্রয়ারে।

ঘড়ি কেনা শেষে ফেরার গাড়ি থামালো অন্তূ। চালক বলল, ''আপা, ওঠেন। তাড়াতাড়ি

ওছেন, ট্রাফিক শালারা বেশিক্ষণ দাঁড়াইতে দেয়না এইখানে।''

গাড়ির ভেতরে ঠেসেঠুসে বসার মতো কোনোমতো জায়গা রয়েছে। সব যাত্রী পুরুষ। অন্তূ বলল, "পরের গাড়িতে চলে যাব, যান আপনি।''

-"আরে আপা! সমস্যা কী? সবার ঘরেই মা-বোন আছে। এরা কেউ আপনার ভাই, কেউ বাপের মতোন। বসেন, তাড়াতাড়ি চলে যাই। ''অন্তূ হাসল, "জি একদম সঠিক কথা বলেছেন। বেগানা বলে শুধু একটা শব্দ রয়েছে, এর কোনো যুক্তি নেই। হুদাই এই শব্দটার উৎপত্তি। কারণ, যেহেতু বাড়িতে মা

বোন সবার রয়েছে, সুতরাং বাইরের সবাই সবার মা-বোন। এতে সন্দেহের অবকাশ নেই–পৃথিবীতে সবাই সবার মা-বোন। তো ভাই, আপনি আপনার কোন মা বা বোনকে বিয়ে করেছেন? জায়েজ হয়েছে তো বিয়ে?”

-“ফাজলামি করার জায়গা পান না। নাটক? এইসব ঘোমটার তলে যে খেমটা চলে, তা তো লোক জানেনা? রাস্তাঘাটে বের হন ক্যান তাইলে? এত যখন দেমাগ, তখন উড়োজাহাজে চড়ে পথঘাটে চললেই পারেন।”

অন্তূ মাথা নাড়ল, “আপনার পরামর্শ আমি মনে রাখবো, ভাই। এরপর যতদিন উড়োজাহাজ কিনতে অথবা যার তার পাশে

গা লাগিয়ে চট করে বসে যেতে না শিখি, ততদিন আর বের হবো না।''লোকটা কিছু বলতে উদ্যত হতেই অন্তূর কণ্ঠস্বরের শীতলতা পিল্টে কঠিন, দৃঢ় হয়ে উঠল, "যান, দাঁড়িয়ে থাকবেন না আর।'' লোকটা আবার কিছু বলতে নিতেই অন্তূর কথার বিচ্ছুরণ তীব্রতর হলো, "আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়ে আসিনি, আমার কথাগুলো শোনার জন্য। আপনি এসে দাঁড়িয়েছেন, কথা তুলেছেন। যান...যান।'' নাকের পাটা শিউরে উঠল অন্তূর, চোখ তির্যক হলো।গাড়িওয়ালা চলে গেল, অন্তূকে বাজে ভাষায় গালি দিতে দিতে। অন্তূর কানে এলো, গায়ে লাগল না।

সে এদিক-ওদিক তাকাল। দৃষ্টি থামলো। অন্তিক রাস্তা পার হচ্ছে। সাথে একটা কালো কুচকুচে লোক। ভয়ংকর চেহারা-সুরৎ। গলায় কমপক্ষে বিশ-পঁচিশ রকমের চেইন। হাতে বালা, ঘাঁড়ে ট্যাটু। অন্তিকের মুখ-চোখ শুকনো। যে ছেলে কোনোদিন আম্মা অল্প ধমকে কথা বললে, সাতদিন হোটেলে খেত। তাকে লোকটা শাসিয়ে কথা বলছে বোধহয়, অন্তিক বাধ্যগতের মতো মাথা নাড়ছে, খুশি করার চেষ্টা করছে লোকটাকে। অন্তূ ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে রইল। অন্তিক আর অন্তিক নেই, জীর্ণ-শীর্ণ এক ভিখীরি দেহে পরিণত হয়েছে। চোখের নিচটা কালো, মুখে মলিনতা।

সেদিনের ঝামেলা মিটিয়েছে হামজা। জয়কে আর ভার্সিটিমুখো হতে দেয়নি। সে গিয়ে প্রিন্সিপাল এবং সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে ছোট্ট একটা মিটিং করে ঝামেলা মিটিয়ে এসেছে। তা কতটা মিটেছে, জানা নেই। রাতের গাড়ি জয়ের। সে ঢাকা যাবার সময় কোনোদিন কার ব্যবহার করেনা, বাসে যায়। এতে তার ইন্টারেস্টটা কী, তা জয় জানে ভালো।রাত দশটার সময় দুজন হোটেলে বসে আরাম করে খেল। এরপর দুটো সিগারেট ধরালো। জয় সিগারেটে টান দিয়ে হামজাকে বলল, “আমি তিন দিনের ভেতর ফেরার চেষ্টা করবো। তুমি ছেলেদের এলার্ট থাকতে

বোলো। আর এত চিন্তা কোইরো না, হুদাই। তোমার যে প্রতিদ্বন্দী গুলা ভোট করতেছে, তাদের লোক টাকা নিয়েও ভোট দেবে না। একটাই অপশন তাদের কাছে, তুমি। মাজহার সুস্থ হতে হতে ইলেকশন শেষ হয়ে যাবে। খুব খারাপ কিছু হবেনা।''

হামজা কথা না বলে সিগারেট ঠোঁটে নেয়।

বের হবার সময় জয় একটা পরনে হাফ-স্লিভ টিশার্ট পরেছে। জ্যাকেট অথবা গরম কাপড় কিছু নেই। ওভাবেই দৌঁড়ে ছাঁদে গেল। কবুতরের ঘরে পানি দেয়া দরকার। সে চলে গেলে তরু কতটুকু যত্ন করবে এদের, তা বলা যায়না। ফোনের ফ্লাশ জ্বালিয়ে

ভালোভাবে দেখল কবুতরগুলোকে। একা একাই দু-চারটা কথাও বলল কবুতরদের সাথে। নেমে এসে তরুকে শাসালো, “কবুতরদের যেন ঠিকমতো পযিচর্যা করা হয়। নয়ত বাড়ি ফিরে সবগুলোকে লাত্থি মেরে বের করবো বাড়ি থেকে।”

ঘড়িতে সাড়ে দশটা বাজে। বের হওয়ার আগ মুহুর্তে রিমির কথা মনে পড়ল। ওকে একটু জ্বালানো দরকার বের হওয়ার আগে। রিমি কাপড় ইস্ত্রী করছিল। জয় লম্বা করে একটা সালাম দিলো। যেন কতদূর থেকে মেহমান এসেছে। রিমি তাকালো, কথা বলল

না।-“রেগে আছেন কার ওপরে, আমার ওপরে?”

-“রেগে কেন থাকব?”

-“মহিলা মাইনষের রেগে থাকার জন্য বিশেষ কারণ দরকার হয়না।”

রিমি ঠ্যাস দিয়ে বলল, “হ্যাঁ, আপনি যখন বলছেন তখন তাই। আফটার অল মেয়েলোকের ব্যাপারে খুব জানাশোনা আছে আপনার।”

গায়ে মাখলো না জয় কথাটা, প্যাচপ্যাচে হাসি হাসল, “আছে বলেই তো বলছি। সে যাক গে, পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি। আপনার আল্লাহ নামের একটু দোয়া কালাম পড়ে ফুঁ-টু দিয়ে

দ্যান। আমার তো মা-টা নাই, দোয়া-টোয়া চাইবো কার কাছে?''-"আপনার আবার দোয়া লাগে নাকি? আপনি দোয়াতে বা আল্লাহতে বিশ্বাস করেন?''

জয় কথা বলল না। রিমি বলল, "মা নেই, মামি তো আছে! তার কাছে দোয়া চান গিয়ে।
''

জয় বসল বিছানার ওপর, "ভাবী! ভাই এমনিতেই খুব টেনশনে আছে। বোঝেন তো, কত দিকের চাপ। ইলেকশনের ঝামেলা তো বোঝার কথা আপনার, তার ওপর চারদিক বহুত ফ্যাসাদ লেগে আছে। এই সময় ভাইয়ের দরকার আপনাকে। অথচ সপ্তাহ

হয়ে গেল, আপনি কথা বলেন না, কোনো কিছুতেই আপনার উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে না। ভাইয়ের মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, তার ওপর দিয়ে কী চলে যাচ্ছে। এখন খুব করে তার আপনাকে দরকার। আপনি তার বউ, তার পেরেশানী দূর করতে আপনার বিকল্প নেই। রাগ করে থাকবেন না এখন আর। আমিও থাকবো না কয়েকদিন ভাইয়ের পাশে। আপনিও মুখ ফিরিয়ে থাকলে...এবারে গলার নরম স্বর পরিবর্তিত হয়ে জয়ের নিজস্বতা এলো, "সমস্যা বা ঝামেলা যদি আমায় নিয়ে হয়, আমি তো আর ক্ষমা-টমা চাইব না, জানেনই। অথবা আফসোসও

করবো না। আপনি কীসের আশায় রেগে থাকবেন তাহলে? অন্তত যতদিন বেঁচে আছি, এভাবেই চলবে হয়ত। তাই বলে তো আর চিরদিন রেগে থাকতে পারবেন না। তো ক'দিন আগ আর পিছ। কেননা, এখনই ঠিক হয়ে যান। আমি জিনিসটাই এমন, ভাবী। যেখানেই আমার অবস্থান, তার আশপাশে কিছু না কিছু ক্ষয় হয়-ই। এটা আমার নিজস্বতা বলা চলে। মেনে নিন। আসি, ভালো থাকবেন।"

অকপটে নিজের অশিষ্টতা স্বীকার করে বের হয়ে গেল জয়। হামজা বাইরে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সোফার হাতলে ঝোলানো শাল

চাদরটা ওড়নার মতো গলায় পেঁচিয়ে নিলো। বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে দুটো টিকেট কাটলো হামজা। পুরো দুটো সিট জুড়ে একা লাগে জয়ের। পাশে চায়ের দোকানে বসে দুজন দু-কাপ চা খেল। এক প্যাকেট সিগারেট কিনে নিলো জয়। ঘাঁড়ে গামছার মতো ইয়ার-ফোন ঝুলছে। বাসে ওঠার আগে হামজা জয়কে অন্ধকারের দিকে নিয়ে গেল। ওদিক-ওদিক তাকাতে তাকতে জয়ের হাতে চাদরের আড়ালে তার সেমি-অটোমেটিক পিস্তলটা তুলে দিলো। জয় বিরক্ত হলো, "এই শালার কী দরকার? ও আমার হাতে থাকলেই একটা পাপ কাজ হয়ে যাবে। তার চেয়েও বড় কথা,

আমি বিপদক্ষেত্র থেকে দূরে যাচ্ছি। তুমি থাকবে এখানে, মালটা তোমার দরকার হবে।''হামজা গম্ভীর স্বরে বলল, “চুপচাপ এটা প্যান্টের বেল্টে গুঁজে ফেল। আমার বাপ হওয়ার চেষ্টা করবি না। আর এটা তোকে পাপ করার জন্য নয়, বরং সেল্ফ-ডিফেন্সের জন্য দিচ্ছি। এই বাসেও তোর সাথে মৃত্যুদূত যেতে পারে। বাসে ঘুমিয়ে পড়িস না যেন। ইয়ারফোনের সাউন্ড হাই রাখবি। পরীক্ষা শেষ করে এক ঘন্টাও ওখানে দেরি করবি না। সোজা দিনাজপুরের বাস ধরবি।''

কথা শেষ করে একটা ছোট্ট পকেট ছুরি এগিয়ে দিলো হামজা, “এটা পকেটে রাখ।

ভালোভাবে পরীক্ষা দিস। এসব কোনো চিন্তা মাথায় রাখার প্রয়োজন নেই। পরীক্ষা খারাপ হলে আমার কাছে জায়গা হবে না, তোর। সুতরাং, সম্পূর্ণ মনোযোগ যেন শুধু পরীক্ষায় থাকে। বাসের জানালা খোলা রাখবি না। আর টি-শার্টটাই বা পরেছিস কেন? ওটা সহ প্যান্টাও খুলে ফেল। খুব গরম পড়ছে তো, পৌষ মাস বলে কথা, চারদিকে খুব গরম।''জয় হেসে ফেলল নির্লজ্জের মতো, “জ্যাকেট আনিনি সাথে। আমার শীত লাগেনা, জানোই তো। কবীরকে বলে দিয়েছি, ও সবসময় সাথে থাকবে তোমার। মামাকে রাত-বিরাত বের হতে দিও না।''

হামজা নিজের জ্যাকেটটা খুলে ফেলল। জয় নিষেধ করার সাহস পেল না। এই পাবলিক প্লেসে হামজা ঠাস করে একটা চড় মারলে, মান-ইজ্জত থাকবে না। জ্যাকেটটা কনুইতে বাঁধিয়ে, পিস্তলটা প্যান্টে গুজে চাদর জড়িয়ে নিলো গায়ে। বাসে উঠতে গিয়ে আবার দৌঁড়ে ফিরে এলো, "লাইটার বা দিয়াশলাই কিছুই নাই আমার সাথে। লাইটারটা দাও।"
হামজা লাইটার বের করলে তা হাতে না নিয়ে আলতো করে একবার বুকে বুক মেশালো জয়। পরে লাইটার নিয়ে দৌঁড়ে গিয়ে সবে চলতে শুরু করা বাসে উঠল লাফিয়ে।পরদিন অন্তূর 'ইন্ডাক্টরি এনথ্রোপলজি' পরীক্ষা। অন্তূর

মনেহয় নৃবিজ্ঞান হলো সবচেয়ে বাজে সাবজেক্ট সমাজবিজ্ঞা বিভাগের। বাকিগুলোও ভালো না, তবে এটা অসহ্যকর।

অনেকক্ষণ যাবৎ আম্মু ডাকছে খাওয়ার জন্য। অন্তূ ঠিকমতো জবাবও দিতে পারেনি।

দরজার বাইরে থেকে অনুমতি চাইলেন আমজাদ সাহেব, "আসবো?"

অন্তূ বিরক্ত হলো, "আব্বু, এই স্বভাবটা যাবেনা তোমার? আমার ঘরে ঢুকতে কীসের অনুমতি?"

আমজাদ সাহেব বরাবরের মতো জবাব না দিয়ে ভেতরে এসে দাঁড়ালেন, "চল, আমি

খেতে বসব।''-“আচ্ছা, তুমি খেয়ে নাও, আমি সময় পেলে খেয়ে বের হবো।''

-“আমি খেতে বসবো।''

-“আব্বু! আমি পরে খাচ্ছি। ক্ষুধাই লাগেনি, মানে রুচিই পাচ্ছিনা।''

ধমকে উঠলেন আমজাদ সাহেব, “কিন্তু আমি এক্ষুনি খেতে বসবো।''

অন্তূ হার মানলো। তাকিয়ে থাকলো আব্বুর দিকে। ঘিয়ে রঙা শাল জড়ানো লম্বাটে চেহারা, চাপ দাড়িতে মেহেদী। আমজাদ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, “তাকিয়ে আছিস কেন?''

-“একটু বসো তো আব্বু।” ছিটিয়ে থাকা বই খাতা সরিয়ে দিলো অন্তূ।

আমজাদ সাহেব বসলেন, জিজ্ঞেস করলেন, “এভাবে চেয়ে আছিস কেন? কী হয়েছে? প্রস্তুতি ভালো তো?”

অন্তূর খাতা এগিয়ে নিলেন। তাতে চোখ বুলিয়ে বললেন, “লেখার লাইন এখনও ঠিকমতো সোজা হয়নি।”

হাসল অন্তূ, “আমি সোজা হয়েছি?”-“আমি বেত হাতে করা বাদ দিয়েছি যে।”

অন্তূ হেসে ফেলল, “বেত হাতে করলে, ইশ! খামোখা ভয় পেতাম। তখন যদি বুঝতাম তুমি শুধুই ভয় দেখাতে বেত দেখাচ্ছ, এত

ডিসিপ্লিনড, ভালো মেয়ে হতাম না আমি, প্রমিস!”

হেসে ফেললেন আমজাদ সাহেব, “এখন বেত হাতে তুললে ঠিক মারবো। চল, তোর আম্মা বসে আছে। দেরি হলে একটা ছোট-খাটো ঘূর্ণিঝড় বয়ে যাবে।”

-“একটা প্রশ্ন করব?”

-“না, আগে খেতে চল। ধান্দাবাজি আমার সাথে না। না খেয়ে পরীক্ষা দিতে যায় কেউ?”

অন্তূ চেয়ে রইল কিছুক্ষণ আব্বুর দিকে। চোখ দুটো সজল হয়ে উঠল, অল্প পানি ছলছল করে উঠল। হুমায়ুন আহমেদ বলেছেন, হিমুরা পকেটে টাকা নিয়ে ঘোরে না। অন্তূ সেটাকে

নিজের মতো করে বলে, অন্তূরা কান্না করে না। আজও একবার নিজেকে কথাটা বলে গলাটা কড়া করার চেষ্টা করল, “আব্বু! সবার আব্বু তোমার মতো হয় না, তাই না?

”হাসলেন আমজাদ সাহেব, “আমি কেমন রে, অন্তূ?”

অন্তূ বুঝি বলতে পারে মুখে এ কথা? তার কান্না পাচ্ছে। কিন্তু অন্তূরা কাঁদে না। সে কান্না গিলে বলল, “মোটামুটি ভালো না।”

ফের হাসলেন আমজাদ সাহেব, “আমি জীবনে বিশেষ কিছুই দেইনি তোকে, শুধু নিজের কর্তব্য পালন করার চেষ্টা করেছি, শেষ অবধি সেটাও সুষ্ঠুভাবে পারিনি। সেসব

ধরে রাখিস না। আমার তো মা নেই, তোকে মাঝেমধ্যেই 'মা, মা' বলে ডাকি। এই সুযোগটা কেনার সামর্থ্য আমার নেই। তুই বিনামূল্যে দিয়ে রেখেছিস। তার বদলে কী দিতে পেরেছি তোকে?''

অন্তূ সহ্য করতে পারল না। বুকের ভার বাঁধ মানবে না বেশিক্ষণ। চোখ বুজে অনুরোধ করার মতো বলে উঠল, "চুপ করো, আব্বু! চুপ করো, আব্বু। ''নিজেকে সামলালো। আব্বুর দিকে তাকিয়ে অন্তিকের কথা মনে পড়ে মুখ মলেন হতে গিয়েও হলোনা। যারা কম হাসে, তাদের হঠাৎ হাসি মিলিয়ে দেয়ার সাহস অন্তূর নেই, বিশেষ করে আব্বুর।

হুট করে আব্বুর উরুতে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। এভাবে ছোটোবেলায় সে আব্বুর উরুতে মাথা রেখে পড়া শিখতো আব্বুর কাছে। ওভাবেই ঘুমিয়ে গেলে, আমজাদ সাহেব আবার ডেকে তুলতেন জোর করে খাওয়ার জন্য। নিষ্ঠুর লাগতো তখন আব্বুকে। কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে ভাত খাইয়ে দেয়া। সকালে টেনে তুলে স্কুলে নিয়ে যাওয়া। অন্তূ রাস্তাটা কোনোদিন আব্বুর হাত জড়িয়ে ধরে পার হয়নি, একটা আঙুলের মাথা ধরতো। পুরো হাত ধরলে সে আব্বুর ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়বে, নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে। অথচ আব্বুর

হাতের আঙুল ধরা ছাড়া পাড় হতে সে জানেনা।

আমজাদ সাহেব অন্তূর উস্কো-খুস্কো চুলে আলতো হাত রেখে বললেন, “চল, খেয়ে নিই। তোর মা আজ বাড়িছাড়া করবে আমাদের।”হঠাৎ-ই নিজের জীবনে আব্বু সত্ত্বাটার সমস্তটুকু উপস্থিতি যেন বুকের ভেতর এক থলে তরল আবেগ হয়ে জমেছে, ভার অনুভূত হচ্ছে বুকের ওপর সেই তরল। চোখ ফিরিয়ে নিলো। বইখাতা গোছাতে গোছাতে আনমনে নিজের স্বভাবসুলভ দৃঢ় গলায় বলল,

-“আব্বু! শোনো, তুমি আবার কোনোদিন আমায় রেখে চলে-চলে যেও না, বুঝলে? আমি কিন্তু রাস্তাটা পার হতে শিখিনি এখনও। তুমি না জোর করলে খেতে যাওয়ার অভ্যাসটাও হয়নি এখনও। আরও অনেক সমস্যা।”

আমজাদ সাহেব কেমন করে যেন হাসলেন, “শিখে যাবি সব। মানুষ অভিযোজন ক্ষমতা সম্পন্ন প্রাণী, অন্তূ। সামাজিক কোনো মানুষকে জঙ্গলে ফেলে আসলে সে চার পায়ে চলতে অবধি শিখে যায় বেঁচে থাকার তাগিদে।”

অন্তূ দিশেহারা হয়ে তাকায়, অস্ফূট ডাকে, "আব্বু!"

থেমে আবার ডাকে, "তোমার যাওয়ার হলে আমায় সঙ্গে নেবে, প্লিজ? আমি আত্মনির্ভরশীল। কিন্তু তোমার আঙুলের ডগা আঁকড়ে ধরি যে অংশ দিয়ে, ওইটুকু তো ফাঁকা। তোমার আঙুলটাকে সর্বক্ষণ খুব দরকার আমার।"

অন্তূর কণ্ঠে শাসনের স্বর, অথচ গলাটা গুলিয়ে আসছে, থরথরিয়ে কাঁপছে ঠোঁটদুটো, একসময় এবার থুতনিটা ভেঙে এলে অন্তূ অন্যদিকে ফেরে।আমজাদ সাহেব প্রাণভরে মুচকি হাসলেন। হাই স্কুলের প্রবীণ প্রিন্সিপাল

একবার বলেছিলেন, "বুঝলে আমজাদ! অন্তূ হলো তোমার ফটোস্ট্যাট কপি। কিন্তু বোধহয় মেশিনের গড়বরে ছেলে না হয়ে মেয়ে হয়ে গেছে।"

অন্তূরা জানেনা বাপেরাও অন্তূর মতোই। মুখ ফোটে না তাদের।

-"কেউ চিরকাল থাকেনা, অন্তূ। যিনি থাকবেন, তিনি তোর রব। আমি কেবল মাধ্যম একটা। আর তুই আমার আমানত। এই ক্ষণস্থায়ী সাক্ষাতে এত মায়া লাগাতে নেই, অন্তূ। মায়া মূর্খদের দেহে পরজীবীর মতো বাস করে। শুষে শুষে খেয়ে ফেলে

তাদের জীবন রসকে। তুই তা নিজের ভেতরে রাখবি না।”

অন্তূ নিজের ওপর বিরক্ততে নাক-মুখ কুঁচকে, শক্ত গলায় বলল, “আব্বু! হুট করে এত বুকে হাহাকার লাগছে কেন, বলতো!”আমজাদ সাহেব হেসে হাত নেড়ে ইশারা করলেন, “এদিকে আয়।”

অন্তূ মেঝেতে বসে আব্বুর উড়ুতে মাথা ঠেকায়। কখনও এভাবে প্রকাশ করা হয়নি এসব, আজ ঠেকানো দায় হচ্ছে।

অন্তূর মাথায় হাত রাখলেন তিনি, “আমি আছি। যতদিন আছি, আমি আছি। আমি না থাকার কালে যা আসবে তোর ওপর, তার

দায় আমায় দিস না। সাধারণ এক মানুষ হয়ে এত ওজন বয়ে নিতে পারবো না আমি।’’

অন্তূর মুখ তুলল।তিনি হাতটা শক্ত করে চেপে ধরলেন অন্তূর, যেন অদম্য এক সাহস তিনি অন্তূর ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা চালালেন, “আমি থাকব না চিরকাল। কিন্তু তোকে নিজের জীবদ্দশা কাটিয়ে তবে রবের কাছে ফিরতে হবে। জীবন একটা চক্র, জীবন একটা রণক্ষেত্র। সেখানে তোর হাতিয়ার হলো, আত্মবিশ্বাস আর ঢাল তোর ধৈর্য। এই দুটোকে সবসময় শাণ দিয়ে পিঠে সজ্জিত করে রাখবি। মনে রাখবি, ধৈর্য নামক ঢালটা যেন বেশ পুরু হয়। ছোটোখাটো আঘাতে

তার কণাগুলো ছিটকে না যায়। যে পথে পা বাড়াতে চলেছিস, এই সমাজ তোকে ভালো রাখবে না, অন্তূ। ভালো থাকাটা ঠিক আমারও পছন্দ নয়, কারণ যেখানে এই জগৎসংসারে ভালো থাকার একমাত্র অপশনটা হলো, অন্যায়ভাবে জীবনযাপন। সেখানে ন্যায়কে অবলম্বন করে ভালো থাকতে চাওয়ার বোকামি আমি করিনি। তাই তোকেও আর বাঁধা দিইনি এই দুর্গম পথে এগিয়ে যাওয়া থেকে।''আমজাদ সাহেব হাঁটতে হাঁটতে বললেন, "সবসময় মনে রাখবি, যা ঘটছে, তা ভয়ংকর নয়। কারণ তা তোর সামনে রয়েছে, সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়ে তা মোকাবেলা

করতে পারবি তুই। কিন্তু ভবিষ্যতে যা ঘটবে তা সম্বন্ধে তোর কিঞ্চিৎ ধারণা নেই, সুতরাং সেটা হলো বেখবরে উঠে আসা তাণ্ডবপূর্ণ ঝড়। যার পূর্বাভাস বা সচেতনতা নেই তোর কাছে। আর যা সম্বন্ধে জানিস না, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যায় না, তাই সেটা ভয়ানক। অর্থাৎ, ভবিষ্যতে যা আসছে তার তুলনায় সামনে থাকা বিপদ খুব নগন্য, দূর্বল এক ফাঁড়া মাত্র। ভবিষ্যতের অজানা বিপদের চেয়ে এটা দূর্বল, আর এই দূর্বল বিপদের চেয়ে তুই বহুগুণ শক্তিশালী, বহুগুণ।”

অন্তূ আজ অবধিও কোনোদিন আব্বুকে ছাড়া কোনো ছোটখাটো পরীক্ষাও দিতে যায়নি।

তিনি স্যান্ডেল খুঁজে পেলেন না, পরে দেখলেন অন্তূ তা পরিষ্কার করছে একটা কাপড় ঘষে। গম্ভীর হলেন আমজাদ সাহেব, “তোকে নিষেধ করেছি না, এসব করতে? স্যান্ডেল পায়ের জিনিস, তা আবার ঘষেমেজে পরিষ্কার করার কী আছে? সুফিয়ানা ভালো না। তুই আর কোনোদিন স্যান্ডেল পরিস্কার করবি না।” অন্তূ পাত্তাই দিলো না।রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে বরাবরের মতো আব্বুর আঙুলের ডগাটা নিজের তর্জনী আঙুলি দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল অন্তূ। ভার্সিটিতে ঢুকে বুকের কম্পন বাড়ল। না-জানি কোন দিক থেকে জয় আমির এসে দাঁড়ায়।

আমজাদ সাহেব ফাইলটা অন্তূর হাতে ধরিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ উপদেশ দিলেন। যেন অন্তূ কিন্ডার-গার্টেনের শিক্ষার্থী। এবং সে যাচ্ছে পরীক্ষা দিতে, তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে দিচ্ছেন আমজাদ সাহেব। অন্তূ হাসল। আমজাদ সাহেব পকেট থেকে শ টাকার একটা নোট বের করে বললেন, "আবার নিতে আসতে হবে নাকি? নাকি চলে যেতে পারবি?"
অন্তূ ঘাঁড় নাড়ল, "আসতে হবেনা। আমি চলে যাব।"যতক্ষণ অন্তূ বিল্ডিংয়ের ভেতরে ঢুকে বারান্দা পার হলো, ততক্ষণ অপলক চেয়ে রইলেন আমজাদ সাহেব। অন্তূ আড়াল হলে, অল্প সিক্ত চোখটা ওপরের দিকে তুলে ভেজা

ভাবটা লুকানোর চেষ্টা করলেন। আজ অন্তূ দ্বিতীয় বর্ষের ফাইনাল দিতে ঢুকছে। ক’দিন পরে এলএলবি চূড়ান্ত পরীক্ষায় বসবে। তখনও এভাবেই গিয়ে চাতক পাখির মতো চেয়ে থাকবেন তিনি অন্তূ বের হবার অপেক্ষায়। ক’দিন বাদে মাস্টারমশাই থেকে তিনি এডভোকেট মাহেজাবিন আরমিণ অন্তূর বাবা হতে যাচ্ছেন। বুকটা ভরে উঠল, চোখ জ্বালা করতে লাগল খুব। অন্তূটা বড় হয়ে গেল। এই তো ক’দিন আগে হাত ধরে স্কুলড্রেস পরে, মাথায় দুই ঝুঁটি করে স্কুলে যেত অন্তূ। আমজাদ সাহেব চোখ ফেরালেন। আস্তে করে হেঁটে বেরিয়ে এলেন ভার্সিটির

ফটক পেরিয়ে।পরীক্ষা শেষ না-ই করতে পিয়ন এলো হলে। অন্তূ তখন হিমশিম খাচ্ছে লেখা শেষ করতে। অল্প সময় বাকি। লেখা অনেক। তারই মাঝে পিয়ন জানালো, মনোয়ারা রেহমান নিজের কক্ষে ডেকে পাঠিয়েছেন আরমিণকে।মনোয়ারা রেহমান চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে ছিলেন। অন্তূ অনুমতি চাইলে চোখ মেলে বললেন, “এসো।
”

অন্তূ চেয়ারে বসল। মনোয়ারা চশমা চোখে আটলেন। অন্তূকে দেখলেন দু’বার। পরে বললেন, “বুঝতে পারছো তো, কেন ডেকেছি?
”

-“জি, বুঝতে পারছি।”
-“জয় আর তোমার সম্পর্ক কতদিনের?”
অন্তূর মস্তিষ্ক হুটহাট বিষয়টা ধরতে পারল না। কয়েক সেকেন্ড পর হুট করে কথাটা বোধগম্য হতেই কপাল টান করল। কেন যেন মনে হলো, ম্যাম ওকে ভড়কাতে বলেছেন কথাটা। অন্তূ বলল, “আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই, ম্যাম!”-“হু, নেই। ছিল তো! সেটা কতদিনের ছিল?”
মনোয়ারা আশা করেছিলেন অন্তূ থতমত খাবে, অবাক হবে, অথবা লজ্জা পাবে নয়ত উত্তেজিত হয়ে উঠবে। অথচ উনাকে অবাক

করে অন্তূ শান্ত চোখে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, “এ কথা কোথা থেকে শুনেছেন?”

-“সম্পর্ক ছিল কিনা সেটা বলো। থাকলে কতদিনের কতদিনের ছিল?” কঠিন হতে চাইলেন মনোয়ারা রেহমান।

অন্তূ নির্বিকার স্বরে বলল, “আমি এবং জয় এই দুটো শব্দের সাথে সম্পর্ক শব্দটা মাত্রাতিরিক্ত বেমানান, ম্যাম। কথাটা আপনি হয় আমাকে ডিস্ট্র্যাক্ট করতে বলছেন, অথবা যদি কারও কাছে শুনে থাকেন, তবে সেটা গুজব ছিল। বাস্তবতা একেবারেই ভিন্ন।”

মনোয়ারা কপাল জড়ালেন। মেয়ে এতটা নির্লিপ্ত, স্পষ্টভাষী আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিধার।

-“কে বলেছে এই কথা, ম্যাম!”

মনোয়ারা অন্তূর কথা অগ্রাহ্য করে বললেন, “নিকাবটা খোলো।”

অন্তূ খুলল। মনোয়ারা কয়েক সেকেন্ড যাবৎ খুঁটিয়ে দেখলেন। চোখ ফিরিয়ে বললেন, “এসবের মাঝে ফাঁসলে কী করে, মেয়ে?”অন্তূ শ্বাস নিলো একটা, ঠোঁট কাঁমড়ে বলল, “জানিনা, ম্যাম। কীভাবে কোথা থেকে জলের প্রবাহ কোথায় গড়াচ্ছে, বুঝতে পারছি না।”

মনোয়ারা এতক্ষণে সম্পূর্ণ মনোযোগ অন্তূর ওপর নিক্ষেপ করলেন, হাত দুটো একত্র করে টেবিলে কনুই ঠেকিয়ে জানালেন, “জয় পাগল। পাগল না ঠিক, তাণ্ডব। পাগলরা তো

মানুষ নিয়ে খেলতে জানে না, মজাও পায় না তা কোরে। কিন্তু জয় ক্ষুধার্ত পশুর মতো, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। কী করেছিলে? ওকে অপমান করেছিলে? এতটা বিদ্রোহী হওয়া শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, বুঝলে? ভার্সিটিতে র‍্যাগিং খায়নি কে? তবুও মুখ বুজে থাকে কেন? এ ব্যাপারে আগে শোনোনি কোনোদিন?"

-"শুনেছি তো অনেককিছুই। তবে তা আমার ভেতরে সহনশীলতা আনেনি, বরং ক্ষিপ্ত করেছে।"

মনোয়ারা অস্পষ্ট দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, "সমাজটা ক্ষমতার, আর ক্ষমতা সব জয়দের।

তুমি একটা সাধারণ মেয়ে এত প্রতিরোধ গড়বে? তোমার অতি মূল্যবান সম্মানকে জয় সাবানের মতো পানিতে ভিজিয়ে ঘষে ঘষে একটু একটু করে ক্ষয় করবে। প্রতিদিন পানিতে ভেজাবে, ফেনা উঠবে। তোমার সম্মান ক্ষয়ে ধুয়ে যাবে পানির সাথে। কারণ জয় বাঁধনহারা, বেপরোয়া।''অন্তূর ভেতরটা অস্থির হলো, তবুও অটল বসে রইল।

মনোয়ারা বললেন, "ধৈর্য্যের এত ঘাটতি তোমার মতো বুদ্ধিমতি মেয়ের সাথে সাথে মানাচ্ছে না, মেয়ে। এই যে শীতল, কঠোর, কেয়ারলেস ভাবটা, এটার আসল প্রয়োজন

ছিল জয়ের সামনে। এর জন্য ক্ষতিগ্রস্থ হবে তুমি।”

দৃঢ় হলো অন্তূর কণ্ঠস্বর, “ম্যাম! নিজের সামনে নিজের আত্মমর্যাদাকে এক-কোপে বলি হতে দেখেও ধৈর্য্য ধারণ করার মতো পুরু ধৈর্য্য নেই আমার। তার ফলে ক্ষতি আমার হবে এ-ও জানি। এবং তা মঞ্জুর। আমার ধৈর্য্যের প্রাচীর এইসব ক্ষেত্রে খুব পাতলা, মসৃণ। নিজের অজান্তেই তা চিরে প্রতিরোধ বেরিয়ে আসে। জানি, এটা বোকামি। তবে এই বোকামিকে এড়ানোর মতো মোটা চামড়া আমার নেই।”

মনোয়ারা অদ্ভুত হাসলেন, “আমাদের সমাজে ক্ষমতাবানদের দুটো ধরণ আছে, আরমিণ। কেউ কেউ ক্ষমতার জোরে তৎক্ষণাৎ থাবা দিয়ে ধরে, আর কেউ ছাই হাতে মাখিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে যত্ন করে ধরে। তবে ভয়ানক দ্বিতীয়টা। ছাই দিয়ে মাছ ধরলে আর ছুটতে পারেনা, জানো তো! জয় খুব জেদি। তোমার অপমানগুলো কতটা বাজেভাবে পুষে রেখেছে ভেতরে, তা জানা নেই আমার। ওর চিন্তাধারা আর সবার মতোন না। ও বহু পুরোনো জিনিস পুষে রেখে খুব জঘন্যভাবে তার কর্যা চুকিয়ে নেয়।”-“জয় তা করবে বলছেন?”

-“জয় জলন্ত। কিন্তু জানো, আগুনের চেয়ে পানি মারাত্মক। পানির ছিটায় আগুনকে নেভাতে মুহুর্ত সময় লাগে। যেখানে আগুনের পানিকে বাষ্প করে খুব সামান্য পরিমাণ অবস্থার পরিবর্তন করতেও অনেকটা সময় ও একই সঙ্গে বাহ্যিক তাপ প্রয়োগের প্রয়োজন পড়ে।”

অন্তূ যেন কিছু বুঝল। ম্যাম বুঝি পানির হদিশ দিলেন। যার থেকে অন্তূর অতি-সাবধানতা দরকার। মনোয়ারা বললেন,-“জয় যখন অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তি হলো, এক ছাত্রনেতার সাথে ঝামেলা হয়েছিল। ছেলেটা জয়কে লেজকাটা, বেজন্মা বলেছিল। জয়

হেসেছিল সেদিন। দু বছর পর সেই ছাত্রনেতা বেরিয়ে গেল অনার্স শেষ কোরে। ততদিনে জয় একটা পাকাপোক্ত খুঁটি গেড়ে ফেলেছিল ছাত্র সংগঠনে। এরই মাঝে হামজা সাধারণ ছাত্রকর্মী থেকে ক্রমান্বয়ে পদোন্নতি পেল। এরই মাঝে এমন বহুত কর্মকাণ্ড দুজনে করে ফেলেছিল, যাতে কোরে দুজন আলোচনায় এসেছিল, মানুষ ওদের চিনেছিল। ওরা লেগে গেল গণসেবায়। ধীরে ধীরে নেতৃত্ব ছড়ালো দুজনের। লোকজনের মনোযোগ পেয়ে গেল হামজা। ছাত্ররা দিনদিন জয়ের পিছনে স্রোতের বিপরীতে ছুটে আসা পিঁপড়ের মতো ভিড় করতে শুরু করল।সে বছর সেই

ছাত্রনেতার বোন ভর্তি হলো ভার্সিটিতে। রাতের বেলা গার্লস হোস্টেলের দেয়াল টপকে রুমে গিয়ে জয়ের পার্টির দুটো ছেলে মেয়েটাকে নোংরা স্পর্শ করেছিল। ভিডিও বানিয়েছিল সেটার। সেটা পরেরদিন পুরো ভার্সিটি দেখল। ছেলেদুটোর মুখ চেনা গেল না। সেই ছাত্রনেতা এলো।

জয় সামান্য হেসে বলেছিল, ‘ভাই, আপনি যে কারণে আমাকে বেজন্মা, জারজ, লেজকাটা বলেছেন, সেই কারণটা যথেষ্ট ছিল না এই নামগুলো ধারণ করার জন্য। এজন্য ওই গালিগুলো আমার ওপর জায়েজ হওয়ার মতো ঘটনা ঘটিয়ে দিলাম। আমি যা না, তা বলে

গালি দিয়ে আপনি মিথ্যাবাদী আর পাপী হবেন কেন? আমার বাপ-মা নেই, কিন্তু জন্ম তো আমায় অবৈধভাবে দেয়নি। কিন্তু আপনি বকলেন তা বলে। তাতে হয় আমার নিজেকে প্রমাণ করতে হতো যে আমি অবৈধ না, অথবা অবৈধদের মতো কাজ করে প্রমাণ করতে হতো যে আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনি যা বলেছেন তা-ই কায়েম হোক, আমিই আপনার গালাগালির জন্য নিজেকে উপযুক্ত করে নিলাম।'

তার পরের দিন সেই মেয়ে আত্মহত্যা করল।

''মনোয়ারা অদ্ভুতভাবে হাসলেন এ পর্যায়ে, "আমরা যে বিষয়টাকে সিম্পলি চিন্তা করি, ও

সেটাকে জটিলভাবে, কঠিনভাবে সাজায়। ও রাজনীতিতে এসে বহুবার বহুভাবে জখম হয়েছে, এই জয় আমির একটা ছেলে নয়, একটা ধ্বংসাত্মক সত্ত্বা। সে মার খেয়েছে, শরীরে সেসবের গর্ত রয়ে গেছে। আর কী কী হয়েছে ওর সঙ্গে, তা জানার উপায় নেই। ও নিজেকে প্রকাশ করে না। ব্যাপক সমালোচিত হয়েছে। কিন্তু কেউ ওকে এড়াতে পারেনি।" অন্তূ কেমন করে যেন হাসল, "আমার মনে হচ্ছে, আপনিও এড়াতে পারেননি। খুব আগ্রহভরে ব্যাখ্যা করছেন লোকটার নোংরামি।"-"তোমাকে জানাচ্ছি—সবশেষে জয়ের কর্মকান্ড আসলেই জারজ সন্তানদের

মতোই। ওর জিদ ওকে এই পদ দিয়েছে,পাওয়ার দিয়েছে। আবার দিনশেষে দুই ভাইয়ের নিখুঁত চতুরতা জনগণের কাছে ওদের সব কুকর্মকে ছাপিয়ে নেতা কোরে তুলেছে। আমাদের দেশের লোকজন খুব ভুক্তভোগী। তারা অল্প একটু সুবিধা পেলেই যে কারও যেকোনো রকম নোংরামি ভুলে তাকে সালাম ঠুকতে শুরু করে।
সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে সমাজ সম্বন্ধে এই ধারণাটুকু স্পষ্ট।''
অন্তূ যেন চেয়ারের সাথে মিশে যাচ্ছিল। জয়কে এতদিন বখাটে মনে হয়েছে, হামবড়া

লেগেছে। কিন্তু এরকম নিকৃষ্ট, কলুষিত জিদের অধিকারী মনে হয়নি।

আনমনে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ-ই একটা ডাক শুনে থামল। আব্বুকে দেখে বুকের ভেতরটা ছ্যাঁত করে উঠল। যদি কখনও খারাপ সম্মানহানিকর কিছু হয় ওর সাথে, এই মানুষটা সহ্য করতে পারবে? পারবে না। তখন অন্তূ কী করবে? শরীরটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল অন্তূর।আমজাদ সাহেব ভ্রু কুঁচকে এগিয়ে এলেন, "এ জগতে আছিস তুই?"

অন্তূ হাসার চেষ্টা করল, "তুমি এসেছ নিতে? চলে যেতাম আমিই।"

হাঁটতে হাঁটতে গম্ভীর হলেন আমজাদ সাহেব, "সেই কখন থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছি। পিয়ন যদি না জানাতো প্রফেসর ডেকেছেন তোকে, আমি চলেই যেতাম।"

অন্তূ খেয়াল করল, আব্বু খুব ঘামছে। শীতের দুপুরের রোদ কড়া নয় মোটেই, তার মাঝেও মুখটা সিক্ত লাগছে। অন্তূ বলল, "আব্বু, সোয়েটারটা খোলো।"-"কেন? দরকার নেই.." -"খুলতে বললাম, খোলো। আমি দাঁড়াই, খোলো ওটা তুমি ওটা। কাল রাতে বোধহয় প্রেশারের ওষুধ খাওনি তাই না? কোথায় গেছিলে এখন?" কড়া অন্তূর কণ্ঠস্বর।

আমজাদ সাহেব সোয়েটার খুললেন, অন্তূ তা নিয়ে নিজের কনুইতে বাঁধিয়ে রেখে বলল, “কোথায় গেছিলে, বলোনি কিন্তু এখনও!” আস্তে কোরে বললেন আমজাদ সাহেব, “মুস্তাকিনের সাথে দেখা করে এলাম।”-“তুমি তোমার পেরেশানী থেকে আমায় দূরে রাখতে চেয়ে কী প্রমাণ করতে চাও? যে আমি তোমার বাড়ির ক’দিনের অতিথি, তোমার দুঃখ-কষ্টের কথা জানানো উচিত নয় আমায়। কোনোমতো উপর-উপর হাসিমুখে ফর্মালিটি দেখিয়ে বিদায় দিলে মিটে যাবে, এমন কিছু? ”

পাগলি ক্ষেপে গেছে। আমজাদ সাহেব হাসলেন।

রিক্সায় উঠেও অন্তূ আর কথা বলছিল না। অথচ যতক্ষণ উনার সাথে অন্তূ বাহিরে থাকে, দু’বছরের শিশু হয়ে যায়। এটা কী, আব্বু? ওটা কী, ওখানে কী হয়েছে, এটা কেন হয়েছে? দেখো কী হচ্ছে, এই-সেই—সব প্রশ্নের ভিড়ে টিকে থাকা মুশকিল হয় আমজাদ সাহেবের।রিক্সার হুড তুলে দিলেন, রোদ মুখে লাগছিল। আনমনেই বললেন, “পেরেশানী ছাড়া জীবন চলার উপায় নেই। এ তো লেগেই আছে। সেই সব যদি পিড়ি পেতে তোর কাছে বলতে বসি, তারপর

নিজের ঝামেলায় তোকেও জড়িয়ে ফেলি— বাপ হিসেবে যে ছোটোলোকিটা প্রকাশ পাবে আমার মধ্যে তার দায় তুই নিবি? এসব কথা তোর কানে কেন দেব আমি? এমনিই তো সারাদিন নিজের চেয়ে বেশি সংসারের চিন্তায় লেগে আছিস। বলেছি, তোর কাজ শুধু পড়ালেখা করা। সংসারের চিন্তা করার ইচ্ছে থাকলে পরের বাড়ি পাঠিয়ে দিই, সংসারের টানপোড়েন ঘাঁড়ে তুলে দেবার হলে বাড়িতে রাখবো কেন তোকে?''

গম্ভীর স্বরে বলা কথাগুলোকে উপেক্ষা কোরে বলল অন্তূ, "তুমি তোমার লেকচার থামাও, আব্বু। এটা তোমার ক্লাসরুম অথবা আমি

তোমার ছাত্রী নই। বলবে না, বলবে না। আমিও জানার জন্য মরে যাচ্ছি না।”

কথা শেষ কোরে দুজন দুজনের দিকে শক্ত চোখে তাকালো একবার।অন্তূর মতে বিকেল হলো দিনের সুন্দরতম সময়। সিঁড়ির নিচে পাটি বিছিয়ে পড়তে বসেছিল সে। রাবেয়া পাশেই বসে চাউল খুঁটছিলেন। মার্জিয়া ধীর পায়ে এসে একবার কাপড়-চোপড় নিয়ে গেছে। রাবেয়া বলতে চেয়েও চুপ রইলেন, ‘এই অসময়ে গোসল কোরো না।’ পাছে আবার খিটখিট করে উঠবে মার্জিয়া।

রাবেয়া অন্তূকে পেলে কোনোসময় চুপ থাকেন না। বোকা বোকা কথা বলে অন্তূর কাছে কড়া

কথা শোনা, অথবা নিজের অতীতের গল্প শোনানো, নয়ত হাসি-মজা করেন। আজ চুপচাপ আনমনে চাউল খুঁটছেন। অন্তূ বই রেখে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে? চিন্তায় আছো নাকি?"

কেমন কোরে যেন একবার তাকিয়ে আবার চোখ নামালেন রাবেয়া। অন্তূ ভ্রু কুঁচকাল, "কাহিনি কী? চুপ কোরে আছো কেন? কী হয়েছে, আম্মা?"

রাবেয়া নিচুস্বরে বললেন, "ওই হারামী কাল রাতে বাড়ি আসেনি। কী যে করতেছে কোথায়, আল্লাহ মাবুদ জানে। আমার আর

ভাল্লাগেনা এসব।''-“বাড়ি আসেনি রাতে? আব্বু জানে?''

-“চুপ কর। আস্তে কথা কইতে পারিস না, মেয়েমানুষ!'' এদিক-ওদিক তাকালেন রাবেয়া আতঙ্কিত চোখে।

-“না, পারিনা। কোনো পাপ তো করিনি যে, তা লুকাতে বিরবির করতে হবে। গতরাতে বাড়ি আসেনি, আবার রাত আসতে যাচ্ছে, তুমি আব্বু বা আমায় জানানোর প্রয়োজন করোনি?''

মার্জিয়ার ঘরে ঢুকে দম আঁটকে এলো অন্তূর। জানালা-দরজা কিছুই খোলেনি। শরীর ভালো যাচ্ছে না মার্জিয়ার। মার্জিয়া খুব সুফি মেয়ে।

ঘরবাড়ি সবসময় ঝকঝক করে তার বদৌলতে। আজ পুরো ঘর একটা পরিত্যক্ত গুদামের চেয়ে কম লাগছে না। বাথরুম থেকে আওয়াজ পেল মার্জিয়ার। দৌঁড়ে গেল। বেসিনের ওপর ঝুঁকে হরহর করে বমি করছে মার্জিয়া। অন্তূ দ্রুত বাহু চেপে ধরল মার্জিয়ার। কোনোমতো ধরে এনে বিছানায় শোয়ালো ওকে অন্তূ।

পাশে বসে বালিশ ঠিক করে দিয়ে লাইট জ্বালালো ঘরের। চারদিকে বন-জঙ্গলের মতো হয়ে আছে। অন্তূ মাসেও একবার এ ঘরে ঢোকেনা। চারদিকের হাল দেখে অবাক হলো।মার্জিয়ার কপালে হাত চেপে বলল, "কী

হয়েছে আপনার? এত শরীর খারাপ কিছু বলেননি তো! নিজেকে কী ভাবেন আপনি, আর আমাদেরই বা কী ভাবেন? আমরা কি আপনাকে খেয়ে ফেলার ওঁত পেতে আছি, এমন মনে হয়? আপনার সাথে শত্রুতা কোরে দু-চার পয়সা পেলে তাও নাহয় ভেবে দেখতাম আপনার সাথে শত্রুতা বজায় রাখার।''

মার্জিয়া চুপচাপ চেয়ে রইল। মার্জিয়ার কাছে এমন নমনীয়তা আশা করা যায়না। আস্তে আস্তে তার চোখ ভিজে গলা ভেঙে এলো, "ও গতকাল সকালে বাড়ি থেকে বের হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনো খবর নেই, ফোন বন্ধ।''

অন্তূর চোয়াল শক্ত হলো, “তা কাকে বলছেন? চেনেন আমাকে? আমার বাপ-মা আমি এই বাড়িতেই পাশের ঘরেই থাকি, তা জানেন আপনি? এসব পার্সোনাল কথা আমাদের অচেনাদের কাছে বলবেন না, ভাবী। ক্ষতি কোরে বসলে তো আর উঠে আসবে না! গোপন কথা গোপন রাখুন।”

ভারী পা ফেলে বেরিয়ে এলো অন্তূ ঘর থেকে।

বোরকা পরে বেরিয়ে যাবার সময় রাবেয়া হায়হায় করে উঠলেন, “কোথায় যাচ্ছিস তুই? অন্তূ? এই...”

অন্তূ সোজা হেঁটে দরজার কাছে গিয়ে বলল, “ডাকাতি করতে। যাবে সঙ্গে? সাহস নেই অত তোমার, আমিই বরং যাই।”রাবেয়া দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। অন্তূটা ভীষণ গম্ভীর, রাগ ও মেজাজ ভীষণ তিরিক্ষ। তিনি ভেবছিলেন, অন্তিক আজকের মধ্যে ফিরে আসবে, জানানোর দরকার নেই কাউকে। অন্তূকে বললে তা তৎক্ষণাৎ আমজাদ সাহেবের কানে যাবে, একটা তামাশা হবে।

খানিক বাদেই অন্তূ কঠিন মুখে একইভাবে ফিরে এলো। রাবেয়ার কোনো কথার জবাব দিলো না। সোজা মার্জিয়ার রুমে গেল। পেছন পেছন দৌঁড়ে এলেন রাবেয়া। অন্তূ মার্জিয়ার

হাতে প্রেগনেন্সি কিট ধরিয়ে দিয়ে বাথরুম অবধি এগিয়ে দিয়ে বলল, “যান, টেস্ট কোরে আসুন। মুখের দিকে চেয়ে থেকে সময় নষ্ট করবেন না, দ্রুত যান।”

রাবেয়া অবাক হলেন। অন্তূ প্রেগনেন্সি কিট কিনতে গিয়েছিল! বললেন, “আমি তো কিছুই বুঝিনি..মার্জিয়া?”

-“তা শিওর হলে তো আর আবার পরীক্ষা করার মতো উদ্ভট শখ জাগতো না আমার, আম্মু?”রাবেয়া চুপ রইলেন। একটু পর আবার নিজেই বিরবির করলেন, “অন্তিক কোনদিনও রাত বাইরে কাটায় না, অন্তূ।

আমার ভাল্লাগতেছে না। কই গেছে, সন্ধ্যা লাগতে যাচ্ছে, এখনও আসলো না।''

অন্তূ একবার তাকাল তার সরলা মায়ের মুখপানে। তাকে ভীষণ ভয় পান রাবেয়া। অন্তূ চোখে আশ্বস্ত করল, "কিছু হয়নি। শান্ত হও!''সন্ধ্যার পর আরও দু'বার বমি করেছিল মার্জিয়া। অন্তূ সোফার ওপর ছিটিয়ে থাকা কাপড়গুলো ভাঁজ করে ঘরটা ঝাড়ু দিয়েছে। অন্তিক খুব খিটখিটে মানুষ, বিছানার বসার সময় চাদরে হাত বুলিয়ে বসার অভ্যাস আছে।

কিটে প্রেগনেন্সি পজিটিভ এসেছে। তারপর বেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কেঁদেছে মার্জিয়া।

রাবেয়া প্লেটে কোরে ভাত আনলেন। মার্জিয়া খেতে অস্বীকার করল, রুচি নেই তার। অন্তূ জিজ্ঞেস করেছিল, “নিজে টের পাননি শরীরের এই অবনতি দেখেও?”

মার্জিয়া সে-সব এড়িয়ে কাতর স্বরে বলে, “তোমার ভাই আসছে না কেন, অন্তূ? আমার ভালো লাগছে না এমনিতেই শরীরটা, তার ওপর এই টেনশন!”অন্তূ মার্জিয়ার কাতর মুখ থেকে নজর ফেরায়, গম্ভীর স্বরে বলে, “টেনশন না করুন। আব্বু মসজিদ থেকে আসলে বলছি, কিছু একটা করা যাবে। আপনি চুপচাপ শুয়ে থাকুন, পারলে কিছু খেয়ে নিন। এই সময় নিজের সাথে সাথে

আরেকটা প্রাণের যত্নে থাকতে হবে আপনাকে।”

রাবেয়া খুব জোর কয়েক লোকমা খাবার তুলে দিতে পারলেন মার্জিয়ার গালে। কেঁদে কেঁদে মুখ-চোখ বসিয়ে ফেলেছে। দিনশেষে মেয়েটা অন্তিককে ভীষণ ভালোবাসে, এ চিরন্তন সত্য।

অন্তূ চলে এলো বাইরে। তার মাথায় বহু নেতিবাচক ভাবনা আসছিল। সেদিন একটা গুণ্ডা ধরণের নোংরা লোকের সাথে কোথাও যাচ্ছিল অন্তিক।অন্তূর মাথা ভার হয়ে এলো। কী অধঃপতন অন্তিকের! আমজাদ সাহেবকে তার ছেলের ব্যাপারে এমন কথা কীভাবে বলা

যায়? দিনদিন পারিবারিক পরিস্থিতি এত সংকটাপন্ন হয়ে উঠছে কেন?

আমজাদ সাহেব জামায়াত শেষে ফিরলেন। দু'বার 'আব্বু' বলে ডেকেও কিছু বলতে পারছিল না অন্তূ। আমজাদ সাহেব গম্ভীর হলেন, "কথা কেন এমন গলায় আঁটকাবে? স্পষ্ট কথা বলতে শেখাইনি আমি? চোর বা অপরাধীরা কথা সাজাতে গিয়ে হুমড়ি খায়। তুই কি সেরকম কিছু বলতে যাচ্ছিস?"

অন্তূ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তোমার ছেলে কাল সকালে বেরিয়েছে, এখন অবধি বাড়ি ফেরেনি। মানে প্রায় দেড় দিন হলো তার পাত্তা নেই বাড়িতে। আব্বু, তুমি চিন্তিত না

হও। সে বাচ্চা নয়, চলে আসবে। তবুও তোমাকে জানানো প্রয়োজন বলে মনে করলাম।''শেষের দিকে অন্তূ সামাল দেয়ার দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে। আমজাদ সাহেব তসবীহ রেখে উঠে গিয়ে পুকুরের পাশের জানালাটা আঁটকে দিয়ে বললেন, "বাচ্চা বোঝাচ্ছিস? আসলেই কি আমি এত দূর্বল আর অপদার্থ হয়ে উঠেছি যে, ছোট ছোট বিষয়গুলোও নিতে পারছি না আজকাল?''

-"তেমনটা নয়। কিন্তু একের পর এক যা হচ্ছে...''

-"এটাকেই তবে জীবন বলে, অন্তূ। যখন দেখবি জীবন সমতল রাস্তায় বেশ আরামে

গড়িয়ে গড়িয়ে দুলদুলিয়ে চলছে, তখন বুঝবি তুই স্বপ্নে আছিস, অল্পক্ষণের মাঝে ঘুম থেকে জেগে উঠবি। কারণ, বাস্তবতা হলো পাহাড় কেটে বানানো সরু রাস্তা। যার পদে পদে বাঁক, উঁচু-নিচু খাদ আর যেকোনো সময় জীবন নামক গাড়িটা উল্টে পড়ার সম্ভাবনা দিয়ে ভর্তি। এসবে যেদিন ভয় পাবো, তার আগে আমি মাটির তলায় শায়িত হয়ে যাবো।
”

অন্তূ চেপে চোখজোড়া বন্ধ করে ফেলল। বিরবির করল, “প্লিজ আব্বু, প্লিজ চুপ করো। কিচ্ছু হয়নি, হবেও না।”

আমজাদ সাহেব বের হবার মুহুর্তে অন্তূ কোত্থেকে দৌঁড়ে এসে হাত চেপে ধরল হুড়মুড়িয়ে। আমজাদ সাহেব গোমরা মুখে বললেন, "পাগলামী না কোরে ঘরে গিয়ে পড়তে বোস। সেদিন পরীক্ষা দিয়ে এসে দুইদিন বেশ ফাঁকিবাজি করেছিস। আমি এখনই ফিরে আসবো।"-"আমিও।"

-"আমিও কী?"

-"এখনই ফিরে আসবো। একটু ঘুরে আসি চলো।"

ধমক দিলেন আমজাদ সাহেব, "বড় হসনি? আর কবে বড় হবি? আমি কি শখে যাচ্ছি যে, পিছু নিতে হবে?"

-“আব্বু, তুমিই বলতে–সন্তান বাপ-মায়ের কাছে কোনোকালে বড় হয়না। সে আমি যত বড়ই হই, আমার বয়স যতটুকু বাড়ছে, তোমারও বাড়ছে, সুতরাং তোমার তুলনায় আমি যা তাই রয়ে গেছি কিন্তু। ঠিক বলেছি না?”

অন্তূ চাইল রসিকতার মাধ্যমে আব্বুর টেনশন কম করতে।

আমজাদ সাহেব হার মানলেন, মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, “চাদর নিয়ে আয়, যা। ঠান্ডা লাগেনা গায়ে?”

অন্তিকের দোকান বন্ধ পাওয়া গেল। পাশের দোকানদার জানাল, কাল থেকে দোকানই

খোলেনি। এরপর বেশ কিছুক্ষণ নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল দু'জন রাস্তার পাশে।অন্তূ ঠিক বুঝতে পারছিল না আব্বুর অভিব্যক্তি। গম্ভীর মানুষদের এই এক সমস্যা, তাদের উত্তেজনা বা শান্তভাব সবই একরকম, চুপচাপ। সে বুঝতে পারছিল না, কী কোরে পরিস্থিতি সামলে নেয়া যায়? অন্তিক গতকাল বাড়ি থেকে দোকানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে দোকানেই আসেনি, তাহলে কোথায় গিয়েছে? এখন কোথায় খুঁজবে ওকে, কোথায় যেতে পারে? অবচেতন মস্তিষ্কে থেকে থেকেই নেতিবাচক ভাবনা উঁকি মারছে, অন্তূ ধমকে তাদের ভেতরে পাঠালো।

আমজাদ সাহেব আচমকা শক্ত কোরে চেপে ধরলেন অন্তূর বামহাত খানা। অন্তূর মনে হলো, সে এবার এই গোটা মহাবিশ্ব-ব্রক্ষ্মাণ্ড জয় করে ফেলতে পারবে নিমেষেই, তাতে তার গায়ে একটুও আচড় লাগার সম্ভাবনা নেই আর। চোখ বুজে দুটো শ্বাস ফেলে বলল, আব্বু, "তোমার ছেলের দুটো কলেজ লাইফের বন্ধুকে চিনি আমি। তুমিও তো চেনো।"আব্বুর হাত ধরে রাস্তা পার হলো অন্তূ। চাদরের এক প্রান্ত কাধ থেকে পড়ে গেছে। আমজাদ সাহেব অন্তূর হাত ছাড়লেন না, বরং বাম হাত দ্বারা চাদর কাধে তুলে দিয়ে একটা ধমক দিলেন, "সর্দি লাগলে এক

পয়সার ওষুধ কিনে দেব না, মনে রাখিস। ভালোভাবে চাদর জড়িয়ে নে গায়ে, ঠান্ডা কিন্তু কম নয় বাইরে।"

বন্ধুরাও এখন সংসারী হয়ে গেছে। পুরনো শিক্ষককে দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমজাদ সাহেব সকলের অনুরোধ নাকচ করে কেবল অন্তিকের খোঁজ করে বিদায় হলেন। সম্ভাব্য সকল জায়গায় খোঁজ করেও বিশেষ ফায়দা হলো না। এখনও অন্তিকের নম্বর দুটোই বন্ধ।

দুজন রাস্তার পাশে উঁচু ফুটপাতের ধারে বসল। অন্তূর বুক কাঁপছে। চুপচুপ বসে থাকা আব্বুর মনে কী বয়ে যাচ্ছে, তা আন্দাজ

করতে চাইল। খুব কোরে মনে হলো, যদি সে ম্যাজিক জানতো, এখনই অন্তিককে এনে সামনে দাঁড় করাতো, এরপর এক লহমায় ভেঙে দিতো বাপ-ছেলের মাঝের কঠোর দেয়ালখানা। বুকের ভার সহ্য হচ্ছিল না ওর। অসহায় লাগছিল খুব। সে কেন পারে না, আব্বুর পেরেশানীর সহজ সমাধান হতে? সমস্যাগুলো তার নাগালের মাঝের হয়না কেন?বেশ কিছুক্ষণ দুজন চুপচাপ পাশাপাশি বসে রইল। রাস্তার ওপাশে ফুটপাতে ভাপা পিঠা বিক্রি হচ্ছে। আমজাদ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, “পিঠা খাবি?”

অন্তূ তাকাল আব্বুর দিকে। অল্প হাসল। মানুষটা বরাবর নিজেকে পাথর প্রমাণ করতে চেষ্টা করে, যেন এই জগতের কোনো ব্যথা বা উদ্বেগ তাকে কাবু করতে পারেনা। দিনশেষে পরিবারের কর্তব্য পালন করতে গিয়ে এত এত জটিলতা এবং দেনা-পাওনা ঘাঁড়ে কোরে বসে আছে, তবুও যেন মনে হয় না তার কর্তব্য সে ঠিকঠাক পালন করছে। অন্তূ মাথা নেড়ে বলল, "উহু....আব্বু?"

-"হু।" আনমনে বললেন আমজাদ সাহেব।

-"থানায় একটা জিডি করলে হয়না?"

-"আমিও ভাবছি।"

থানায় একটা সাধারণ বিবরণে ডায়েরি করে দুজনে বেরিয়ে এসে থানার বাইরে দাঁড়াল। আমজাদ সাহেব ফোন করলেন কাউকে। অন্তূ ইশারায় জিজ্ঞেস করলে বললেন,

"মুস্তাকিনকে জানিয়ে রাখি।"

অন্তূ আর কিছু বলল না। তার মনে হলো, খুব শীঘ্রই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। চিন্তা করার কারণ নেই, সে শুধু শুধুই এত বেশি ভাবছে।টিকিট কাউন্টারে টুকটাক ভিড়। রাজধানী শহর বলে কথা। হাতঘড়িতে সময় দেখল জয়। ১১:৫৩ বাজে। সে ফ্ল্যাট থেকে বের হয়েছে সোয়া এগারোটার দিকে। এরপর বিয়ার কিনতে গিয়ে দেরি হয়েছে। দৌঁড়ে

বাসে উঠল। এত রাতেও সবগুলো সিট বুক। তার জন্য একটা সিট রয়েছে একটা মেয়ের পাশে। মেয়েটা জানালার ধারে বসে আছে। জয় গিয়ে দাঁড়িয়ে কাঁধ থেকে ব্যাগ খুলতেই মেয়েটা উঠে দাঁড়িয়ে খ্যাকখ্যাক কোরে উঠল, "একদম এখানে বসবেন না। আমি আপনার পাশে বসে যেতে পারব না। এখানে বসবেন না, আপনি। আমি বসতে দেব না।"

বাস ছাড়বে এক্ষুনি। জয় রাগ সামলে বলল, "আর কোনো সিট-টিট ফাঁকা নাই, দুজনের বসার জন্য যথেষ্ট জায়গা আছে দুইটা সিটে। আপনি বসেন, অসুবিধা হবে না।"

মেয়েটা কর্কশ সুরে জোরে কোরে চেঁচিয়ে উঠল, “বললাম না আমি আপনার পাশে বসে যাবো না। যেতে পারব না কোনো ছেলেমানুষের পাশে বসে আমি.. অন্তত রাতের জার্নি...”-“চুপ কর, শালি! চুপ!” জয় চট কোরে নিয়ন্ত্রণ হারালো, “গলার ভেতরে এক খাবলা টিস্যু গুজে দেব আর এক ফোঁটা আওয়াজ গলা দিয়ে বের হলে, চুপ থাক... শালির মেয়ে!”

সকলে উঠে দাঁড়াল। হেল্পার এগিয়ে এলো। জয় দাঁত খিঁচে বলল, “ওই চেংরি, নাম তুই, নাম। নেমে যা বাস থেকে..”মেয়েটা কেঁপে উঠল। জয় আঙুল নাচিয়ে ইশারা করল,

“বের হ, সিট থেকে বের হ, বের হর বের হ। নাম, যাহ! তোর সিটের মায়রে চুদি... তুই আমার পাশে ও দূর, তোরে আমি এই বাসেই যাইতে দেব না।”

মেয়েটা কিছু বলতে নিলে জয় ঠোঁটে আঙুল চাপল, “চুপচাপ নেমে দাঁড়া, নয়ত একটা লাত্থি মেরে নামিয়ে দেব, পড়ে যাবি, মাজা-টাজার নকশা পাল্টে যাবে।।”

হেল্পার কিছু বলতে আসলে জয় থামাল, “তুই চুপ থাক। ওইদিক সরে দাঁড়া। উকালতি করতে আসলে বাসটা পেছন দিয়ে ভরে দেব একদম, শালা!”মেয়েটার দিকে ফিরে বলল, “শালি! ভদ্রতা মারাও? ভদ্রতা শিখাস

আমারে? যে মাগী কোনো ছেলের পাশে বসে যেতে পারবে না, সে রাত বারোটার সময় একা যাতায়াত করে হে? পাগলে থাপায় আমারে? ভাতের বদলে কি খড় খাই? ভদ্রতাকে কোনোমতো সম্মান দিতে ইচ্ছে করলেও ভদ্র সাজা বিষয়টা হজম হয় না আমার। তোরে দেইখা লাগতেছে না, তুই বিপদে পড়ছোস কোনো। তার মানে সেচ্ছায় রাত-দুপুরে একা সফর করবার পারো, আর ছেলে মাইনষের পাশে বসতে পারো না? তোর মতো বালডারে লাড়ে কোন শালা? আমারে দেইখা কি বালব্যাটা মনে হয় যে তোর পাশে বসলেই সুরসুরি উঠে যাবে!

সুশীলা নারী তুমি? শালি আমার! নাটক? তোরে আমি সিনেমা দেখাই, দাঁড়া।''পকেট থেকে মানিব্যাগ বের কোরে বলল, "দে, টিকেট দে। দে... টিকেট দে, তোর!''

জয় টিকেটের দাম মেয়েটার হাতে শক্ত কোরে গুজে দিয়ে টিকেট কেড়ে নিয়ে সিটে ফিরে এসে বসল। হেল্পার তখনও দাঁড়িয়ে। জয় সিটে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে বলল, "আপনার আবার কী সমস্যা? মাথা কাজ না করলে বাসের দরজার সাথে জোরে কোরে মাথাটা ঠুকে দেন, ক্লিয়ার হয়ে যাবে। দুইটা সিটই এখন আমার। এবার গাড়ি ছাড়েন, এমনিই পৌঁছাতে সকাল হবে।''হেল্পার ভয়ে

বলতে পারল না, গাড়িতে অ্যালকোহল অ্যালাউড না।

বাসের লাইট অফ হলে জয় শব্দ কোরে বিয়ারের ক্যান খুলে তাতে দুটো চুমুক দিয়ে গলা ছেড়ে গান ধরল।

ফজরের আজানের সময় বাস দিনাজপুরে প্রবেশ করল। অন্ধকার ভালো কোরে কাটেনি। তার ওপর ঘন কুয়াশার আচ্ছাদনে এক হাত দূরের পরিবেশ স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হবার জো নেই। জয়ের শরীরে শীত নেই। কনকনে শীতেও দরকার পড়লে ডাবল ব্লাঙ্কেল গায়ে দিয়ে ফ্যান চালিয়ে ঘুমায়।

ফ্যানের শব্দ না কানে এলে ঘুম ভালো হয় নি।

পুরো ক্যানে কোনোমতো নেশা হয়। এখনও বেশ খানিকটা তরল বাকি ক্যানে। মাথা ঝিমঝিম টের করছে। নেশা পুরো না হলে কঠিন হ্যাংঅভার চড়ে। হাঁটতে গিয়ে পা টলছে।নিচের তলার পুরোটা জুড়েই হামজার স্টিল-ওয়ার্কশপ। সেটা পেরিয়ে দোতলার সিড়ি ভেঙে দরজায় টোকা দিলো। কলিং বেল চাপার আগেই যেন হুট করে দরজাটা খুলে যায়। জয় চমকে গিয়ে আবার সামলালো নিজেকে। তরু দাঁড়িয়ে আছে দরজা খুলে।

ভেতরে ঢুকে কাধের ব্যাগ নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, “ঘুমাসনি তুই?”

জবাব দিলো না তরু। জয় জানে, সারারাত এভাবেই বসার ঘরে দরজার কাছে বসে ছিল তরু। জয় জেলার বাইরে গেলে যেদিন ফেরার কথা থাকে, দরজার কাছে থাকে, জয় আসলে যাতে দরজা খুলতে দেরি না হয়ে যায়!

জয় বলল, “খাবার কী আছে রে? ক্ষুধা লাগছে, ভাত দে! তার আগে একটু গরম কালা কফি দে, গা গুলায়ে আসতেছে, আবার খিদেও লাগতেছে।”তরু ঠোঁট উল্টালো, “ছোটমাছ রান্না আছে।”

জয় দাঁত খিঁচে আবার চুপ করল। জুতোটা খুলে পা ঝেরে উড়িয়ে দিয়ে বলল, "বাঙালি জাতিডা যেরকম বালের জাত, খাওয়া-দাওয়াও বাল মার্কা। ওই জিনিস খাই আমি?"

-"তাহলে ডিম ভেজে দেই? নরমাল ফ্রিজে অল্প একটু মাংস রান্না আছে, গরম করে দেই ওটা। সকালে ভালো খাবার দেব। এখন এটুকু দিয়ে চালান।"

কমন বাথরুমে ঢুকল জয়। পা ফসকে যেতে চাইল একবার। তরু খেঁকিয়ে উঠল, "এসব কচু না গিললে কী খুব অসুবিধা হয়? ধরব আমি?"-"নাহ তো! মাতাল হই নাই আমি,

একদম ফিট আছি। তুই তাড়াতাড়ি কফি বানা, তার আগে আমার গামছা দিয়ে যা।"
-"এটা গোসল করার সময় হলো? আজেবাজে জিনিস গিলবেন, আর বেখাপ্পা সময়ে গোসল কোরে সর্দি বাঁধাবেন !"
জয় মাতালের মতো নাটকীয়ভাবে কাঁধ দুলিয়ে হাসল, "সভ্য হয়ে, নিয়ম মেনে কোন শালা বড়লোক হইছে? আমি এত অসভ্য হয়েও বড়লোক!"
কফি পড়ে রইল ওভাবেই। জয় গোসল কোরে বেরিয়ে সোজা এসে খাবার টেবিলে বসল। এই পৌষের শীতে ভোর পাঁচটার

দিকে গোসল করে কেউ এত নির্লিপ্ত থাকতে পারে? তরু নাক কুঁচকালো।

খাবার দিয়ে চলে যাবার সময় জয় ডাকল, "এএ চেয়ারে বস।"

-"আপনি খান, আমি ঘুমাবো।"

জয় শুনল না। বলল, "তুই তো রাতে খাসনি।
"

তরু থতমত খায়, "খাইনি মানে?"

-"বাংলা কথা বুঝিস না? আমি আসলে খাবি, তাই খাসনি।"

পুরোপুরি নিশ্চিত জয়। তরু লজ্জা পেল, "আপনি খান।"

জয় মৃদু ধমক দিলো, “তুই না বললেও খাবো আমি। বসে পড়, প্লেটে খাবার নে। একা একা খাইতে ভাল্লাগেনা আমার।”খেতে খেতে একবার তাকালো জয় তরুর দিকে। নির্দিধায় সুন্দরী, মায়াবতী উপাধি পাওয়ার যোগ্য তরু। আজ এই নির্ঘুম রাতের শেষে জয়ের ক্লান্ত-আধমাতাল চোখে আরও সুন্দর দেখতে লাগছে। তার যত্নের কেউ নেই কোথাও, তরু ছাড়া। হুট কোরেই চোখে ধরে গেল জয়ের। সে চোখ নামালে তরু তাকাল। ভেজা চুল, পরনে সাদা লুঙ্গি, ঘাঁড়ে গামছা। মাথা নিচু কোরে খাচ্ছে আর পা দোলাচ্ছে জয়।

তরুর দেখার মাঝেই হুট করে বলল জয়, "এভাবে তাকায়ে থাকিস না। তোর নজরের প্রেমে-টেমে পড়ে গেলে শেষে জাত যাবে। "তরু হেসে ফেলল, মাথা নুইয়ে নিলো। জয় দেখল, স্নিগ্ধ হাসি তরুর। মেয়েটা চঞ্চল, তবে তার সামনে আসলে খুব গুছিয়ে নেয় নিজেকে, একজন কর্তব্যপরায়ন নারী হয়ে ওঠে। শেষরাতে তাদের এই নৈশভোজের অভ্যাস খুব পুরনো।

তরু হাসি সামলে বলল, "প্রেমে পড়ার হলে কবে পড়তেন।" একটু থেমে আবার বলল, "আপনার আসলেই ভালোবাসা আসেনি কোনোদিন আমার প্রতি?"

জয় বাচ্চাদের মতো মাথা নাড়ল, “উহু! ভালোবাসা জিনিসটা আমার সিস্টেমের বাইরে, ওসব বুঝি না আমি। তোর ওপর কোনোদিন ভালোবাসা আসেনি। তবে মায়া আছে একটা।”

তরু ভ্রু কুচকায়, অবাক হয় “মায়া? তা কেন?” সে আশা করেনি জয়ের মুখে এমন কথা শোনার।

-“সেবাযত্ন করিস, তার ভাড়া।” রসিক হাসি হাসে জয়।

তরু স্মিত হাসে। চোখ ফেরায় না।

খানিক পর জয় আনমনে বলে, “কারণ আমারে কেউ কোনোদিন নিঃস্বার্থ ভালোবাসে

নাই, ভালোই বাসে নাই। আমার মনে হয়, তুই একমাত্র একটা পাগল, যে আমাকে বিনা স্বার্থে কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া মনোযোগ ও ভালোবাসা দিয়েছিস। চালাক হ, তরু। প্রতিরোধ গড়ে তোল আমার বিরুদ্ধে। বিদ্রোহ কর, বিদ্রোহ। জয়দের ভালোবাসতে নেই।" তরু চমকে উঠল, "খালা, খালু আপনাকে... "জয় হেসে ফেলল কেমন করে যেন। অর্ধেকটা খাবার ভর্তি প্লেটের মাঝে পানি ঢেলে হাত ধুয়ে ফেলে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বলল, "আমি বিশাল বড়লোকের চেংরা। "

কথাটা বলেই চোখ মারল জয়, “বাপের সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র মালিক আমি। এমনিতেও আমি বেশিদিন দুনিয়ায় থাকব না, তাতে আমার পর সবকিছু অটোমেটিক্যালি আমার পালনকারীদের হয়ে যাবে। যেটাকে তুই তাদের ভালোবাসা বলতে চাইছিস, সেই তথাকথিত যত্ন আমি রাস্তার কারও কাছেও পেতাম। আমার নামে আমার ধোঁকাবাজ বাপ-মা মোটা টাকার গুদাম রেখে গেছে।”তরু অবাক হয়ে বলল, “কিন্তু হামজা ভাই..”
জয়ের হাসিটা এবার রহস্যজনক দেখতে লাগল, ঘাঁড়ে হাতের তালু ঘষে বলল,

“ভালোবাসা আর প্রশ্রয়ের মাঝের পার্থক্য তুই বুঝিস না, না? আমিও বুঝতাম না।”

মাঝখানে একটু থেমে দু’বার মাথা ঝাঁকি দিলো জোরে করে। ঝিঝিম করছে মাথাটা। সামলে বলল, “ভালোবাসায় প্রশ্রয় কম থাকে, খুব কম। সেখানে কঠোর শাসন থাকে, আবার ক্ষেত্রবিশেষ প্রবল ছাড়। রাস্তার অপরিচিতকে ধরে তুই শাসন করতে যাবি না। যার ওপর টান লাগে, মায়ার টান... যেইটারে তোরা ভালোবাসা বলিস, তারে মানুষ শাসন করে। আমারে কেউ কোনোদিন শাসন করে নাই!”

তরু কেঁপে উঠল নিজের অজান্তেই। জয় কখনোই নিজেকে নিয়ে বলে না। কোনোভাবেই না। জয়ের উদ্ভট হাসির সাথে এমন সব কথাগুলো খুব বিঁধছে।-“আমি যখন একের পর সিগারেট ফুঁকে যাই, হামজা ভাই কোনোদিন ধমক দিয়ে বলে নাই, সিগারেট ফেল, আর ছুঁবি না। ক্লাস এইটে প্রথমবার সিগারেট ঠোঁটে রেখে আগুন জ্বালাইছি, হা হা হা! তখন গলা জ্বলতো খুব। একেকবার ধোঁয়া গেলার সময় গলা দিয়ে পুড়তে পুড়তে যেত নিকোটিন। কেউ সেদিন চটাং করে একটা থাপ্পড় মেরে কেড়ে নেয় নাই সিগারেটটা। গলা পুড়েছে, আমি ধোঁয়া টেনে গেছি। এক

সময় সঁয়ে গেল, আর ছাড়তে পারলাম না। হামজা ভাই জানল, কিন্তু কিছু বলল না। কলেজে উঠার পর দেখতাম বন্ধুরা ইচ্ছামতো চুল কাটতে পারে না, বাপ নাকি মারবে। আমি যেমন খুশি, যেভাবে খুশি, যা খুশি করে বেড়াতাম। সবাই আমায় এজন্য লিডার মানতে শুরু করল, আমি ওদের কাছে স্বাধীনচেতা, ভাবের গুরু হয়ে উঠলাম। তখন মনে হতো, শালার আমারই তো জীবন! আর কী লাগে? সবগুলা শালা দুর্ভাগা, কী জীবন ওদের? ইচ্ছেমতো কিছু করতে পারেনা, বাপের গোলাম সবগুলা, সবগুলা খবিশ! হা হা হা! ''টেবিলে ঝুঁকে পড়ে ঘাঁড় মুচড়ালো

এদিক-ওদিক। পর পর চোখের পাতা ঝাপটালো কয়েকবার। চোখ বুজে হাসল আবার, "পরে বুঝলাম, ওদের মতো দুর্ভাগা আমি চাইলেও হইতে পারব না। ওরা দুর্ভাগা কারণ ওদের বাপ-মা আছে। চুল কেটে বাড়ি গেলে বাপ মারে, মা গালি দেয়। সিগারেট টানলে বাপ জানলে খবর খারাপ হবে। আমার এসব হওয়ার চান্স নাই, কারণ আমার তো বাপ-মা-ই নাই! হে হে! কে মারবে, গালি দেবে? আমাকে শাসন করার তো কেউ নাই? আমিই সিকান্দার, আমি বাদশা!"

টেবিলের এক কোণে কফির মগ রাখা ছিল। কফি ঠান্ডা শরবত হয়ে গেছে, তাতে চুমুক

দিয়ে বলল, “রাত করে বাড়ি ফিরলে হামজা ভাই জানলে দু চারটা গালি দেয় মুখে, কিন্তু তা ভয় পাওয়ার মতো না। মাল গিলে ঢুলতে ঢুলতে বাড়ি ঢুকলে মামি যত্ন করে ঘরে তুলে শুইয়ে দিয়ে যায়। আমার বন্ধুরা বলতো, রাত এগারোটার সময় বাড়ি ঢুকলে মা নাকি বাপের কানে অভিযোগ লাগায়, পরে বাপ পেদানি দেয় ইচ্ছেমতো। মা জাতের ওপর চরম রাগ হতো আমার! আমার মামি তো রাগ করে না, আমি শেষ রাতে বাড়ি ফিরলেও দিব্যি হাসিমুখে দরজা খুলে চুপি চুপি ঘরে তোলে আমায়! আমার মাও নাই, ভয়ও নাই। কেন এত সুখ পেয়েছি বলতো আমি? কারণ

আমার অপরাধ আর বখাটেপনা দেখে দুই গালে কষে দুটো থাপ্পড় মারার মতো বাপ নামক বিপদটা ছিল না আমার, চুল বড় করে কাটলে তা ছোট করে কেটে আসতে ফের আবার সেলুনে পাঠানোর জন্য মা নামক ঘ্যানঘ্যানে রেডিও ছিল না আমার। দিনদিন পাওয়ার আর জিদ সমান্তরাল হারে বাড়ছে খালি।''দাঁত বের করল হাসল জয়, "মামার সাথে চাকরের মতো ব্যবহার করেও কোনোদিন একটা ধমক খাইনি।'' ডান কানে তর্জনী আঙুল ঢুকিয়ে ঝাঁকালো, দুবার চোখ ঝাপটে মুচকি হাসল আবার, "প্রতিমাসে ব্যাংক থেকে আমি যে পরিমাণ টাকা উঠাই,

তার একভাগও লাগেনি আমার কোনোদিন এত আয়েস করে চলার পরেও। বাকিটা এই বাড়ি খেয়েছে। আমায় কোনোদিন শাসন করা হয় নাই, আমারে ভালোবাসা হয় নাই!"

একটু থেমে বলল, "অর্থাৎ একজন মানুষের জন্য তার আশেপাশের মানুষের ভালোবাসার প্রকার ভিন্ন। হামজা ভাই আমার প্রশ্রয়দাতা। কিন্তু, ওই যে আর পাঁচজনের মতো ধমক-ধামক টাইপের ভালোবাসা পাই নাই আমি।"

তরুর মনে হলো, জয়কে দেখে যতই মনে হোক সে মাতাল হয়নি, সে বেশ ভালো রকমের ভিনটেজ কনডিশনে আছে। নয়ত তার ওপর বোমা মেরেও একটা দুঃখের বা

ব্যক্তিগত আলাপ বের করার উপায় নেই। সে বিরবির কোরে বলল, “সব বুঝেও কেন খারাপ হলেন আপনি?”জয় উঠে দাঁড়াল, পরে আবার চেয়ার কনুই রেখে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বলল, “খারাপ হয় না তরু, খারাপ জন্মায়। তরু প্রতিবাদ করল, “উল্টো বললেন। খারাপ হয়ে কেউ জন্মায় না, পরে জীবনের ধারায় তারা খারাপ হয়।”

মাতালের মতো মাথা দুলায় জয়, “অহ, ভুল বলেছি? তাইলে হবে হয়ত তাই। কিন্তু আমার খারাপ হবার পেছনে কোনো কারণ নাই। আমি খারাপ তাই আমি খারাপ। কারণ আমি খারাপ।”

মাথা ঝুঁকিয়ে খানিক চুপ থেকে আবার অন্য স্বরে বলল,

“যখন খারাপ হয়েছি, তখন বুঝি নাই। আমায় কেউ ভালো হতে বলে নাই। অথবা খারাপ হওয়া থেকে আটকায়নি। তা বুঝলাম তো এই তো সেদিন। মানুষ আঠারো বছরে ম্যাচিউর হয়, আমি পঁচিশের কোঠা পেরিয়েও ঠিকমতো কিছুই বুঝিনি। যা বুঝছি তা বোঝা ঠিক হয়নি।”

হুটহাট জিজ্ঞেস করল তরু, “আপনি বিয়ে করবেন না?”জয় ভাবুক হবার নাটক করল,

“করলে তোকে করতাম। যত্ন তো কম করিস না আমার! কিন্তু বাইরের থালায় স্বাদ চেখে

বেড়ানো পাবলিক আমি, শুধু শুধু কাউকে ঘরে তুলব ঘর পাহারা দিতে? তাছাড়া ভালো না বেসে বিয়ে করা ঠিক না, আমি কারও প্রেমে পড়ি নাই কোনোদিন। তুই মায়ায় বাঁধিস, কিন্তু আমি জানি ওইটারে ভালোবাসা বলে না। তোর যত্ন-মনোযোগ আমার ওপর অপরিহার্য তরু, তুই ছাড়া দিন চলে না। কিন্তু কেন যে তোকেও ভালোবাসতে পারলাম না! ভালোবাসলে সত্যি বিয়ে কোরে বাড়ি নিয়ে যেতাম! শালা আমার আর উন্নতি হবে না রে! ”

তরুর চোখদুটো সজল হয়ে উঠেছিল। ভাঙা কণ্ঠে ক্ষোভের সাথে বলল, "মায়া কেন লাগে? দয়া হয় আমার ওপর, তাই না?"

-"উহু! দয়া না, মায়া।"

-"মায়া কেন আছে?"জয় এবার প্যাচপ্যাচে হাসল, "আমিও অনাথ, তুই বাপ-মা থেকেও অনাথ। চোরে চোরে খালাতো ভাই।"

আকাশ পুরোপুরি আলোকিত প্রায়। জয় রুমে যেতে যেতে বলল, "খাওয়া শেষ করে একবার রুমে আয়।"

তরু জয়ের রুমে ঢুকল মিনিট পাঁচেক পরে। জয় জানালার ধারে দাঁড়িয়ে সিগারেটে টান

দিচ্ছিল। বোঝার উপায় নেই জয়কে। মাতাল নাকি স্বাভাবিক, কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। তরুর উপস্থিতি টের পেয়ে বিছানার ওপর থেকে একটা ব্যাগ তুলে তরুর দিকে এগিয়ে দিলো, “এবার চুপচাপ আমার রুম থেকে বের হয়ে যাবি উইদাউট এনি প্যানপ্যান।” তরু দেখল, ভেতরে একটা নীল শাড়ি। ডুকরে কান্না পেল। মাঝেমধ্যে এত নিষ্ঠুর আর রহস্যজনক লাগে জয়কে। কী বলে, কী করে বোঝার উপায় থাকেনা। জয় বারবার জিজ্ঞেস করে, কেন তরু ভালোবাসে জয়কে? তরু জানে না তা ভালোবাসা কিনা। তবে জয়ের কথায় আজ সে নিজের অনুভূতির

নতুন নাম পেয়েছে। মায়া। হ্যাঁ, মায়াই বটে। নয়ত কী? ছেলেটার জন্য অসীম মায়া লাগে তরুর। তরু জানে, জয় নোংরা। আবার সে এটাও মানে, সে নিজেও নোংরা তাই জয়ের প্রতি এই মায়া। হোক, সে নোংরাই তবে। এখন যেমন মন চাইছে, শক্ত ওই বুকে উত্তাল ঢেউয়ের মতো আঁছড়ে পড়তে। অথচ অনুমতি নেই প্রকৃতির, সায় নেই উদ্দীপনাবাহী সংবেদনশীল কাঠামোর। শুক্রবারের সকাল। রাতে জিডি করে আসা হয়েছে। কিন্তু কোনো খবর নেই। তবু কেন যেন অন্তূ আশাহত হতে পারছিল না। তার মনে হচ্ছিল সব ঠিক হবে, কিছুই হয়নি।

আমজাদ সাহেব বাজারে গেলেন, তখন সকাল দশটা। অন্তূ বসে পড়ছিল শীতের সকালের তপ্তহীন রোদে। যাওয়ার সময় আমজাদ সাহেব অন্তূর পাশে বসে ছোট্ট একটা লিস্ট তৈরি করে নিয়েছিলেন। রাবেয়া রসুন-পেয়াজ কেটে রাখলেন সেই রোদেই। মার্জিয়াকে আর ডাকা হয়নি। সারারাত নিশ্চয়ই না ঘুমিয়ে সকালের দিকে ঘুমিয়েছে এই শরীরে!ঘড়ির কাটা যখন দুপুর সাড়ে বারোতে, আমজাদ সাহেব এলেন না। অথচ উনার ফেরার কথা বড়োজোর সাড়ে এগারোটা। চারদিকে জুময়ার আজান ফুরিয়ে এলো, তিনি ফিরলেন না। অন্তূ বারবার

কোরে গেইটে গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে এসেছে। আব্বুর দেখা না পেয়ে ফিরে এসেছে। রাবেয়া অতিষ্ঠ হয়ে বসে ছিলেন।

সময় পেরিয়ে দুপুর দুটো বাজল, আমজাদ সাহেব এলেন না। অন্তূর ভাবনার টনক নড়ল। সে কমপক্ষে বিশ-পঁচিশটা কল এতক্ষণে করেছে আব্বুর নম্বরে, বারবার বন্ধ বলার পরেও। ছাদে গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে এলো, দূর রাস্তার মোড় অবধি চেয়ে রইল কতক্ষণ। আমজাদ সাহেবের পাত্তা নেই। রোদ গায়ে লাগছিল না অন্তূর। সে দাঁড়িয়ে রইল ছাদের রেলিং ঘেষে ঘোলা চোখে। মনটাকে কেটে ভেতর থেকে আলাদা করে

ফেলতে ইচ্ছে করলো। আজেবাজে চিন্তারা ভিড় করছে সেখানে। খুব জ্বালাতন করছে। দুপুরে রান্না হয়নি, খাওয়াটাও হয়নি। সকালে আব্বুর সাথে বসে ঘি-আলুভর্তা দিয়ে আম্মুর হাতের খিচুড়ি খেয়েছিল।

ছটফটানি বাড়ল যখন সন্ধ্যা হলো। সময়ের আবর্তন রাত দশটার কাঁটা অতিক্রম করল। আমজাদ সাহেব বাজার থেকে ফেরেননি তখনও। খুব লম্বা বাজার করছেন।

অন্ধকার চারপাশ। পূর্ণচাঁদ আকাশে। ছাদে দাঁড়িয়ে থেকে অন্তূর খুব হিংসে হলো ওই আলোকিত চাঁদকে। আব্বু বাড়ি ফিরল না এখনও, তার খোঁজ তো চাঁদ রাখেনি। বরঞ্চ

জ্বলজ্বল করছে আকাশ পানে। স্বার্থপর খুব চাঁদটাও। অন্তূর দুঃখে সে একটুও দুঃখী নয়। অন্তূ চেয়ে রইল পাড়ার সরু গলির মোড়ে চেয়ে। বারবার চোখে ভেসে উঠছে আমজাদ সাহেব বাজারের থলে হাতে সরু রাস্তাটাতে ঢুকছেন। হ্যালুসিনেশন হতে থাকল অন্তূর। আমজাদ সাহেব ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে বাজারের ব্যাগ অন্তূর হাতে ধরিয়ে গম্ভীর স্বরে বলছেন, "আরে! একটা জরুরী কাজ পড়ে গেছিল। আমি কি বাচ্চা ছেলে? এত চিন্তা করতে হবে কেন তোর? ফোনে চার্জ ছিল না, বন্ধ হয়ে আছে।"বাড়িতে শুধু তিনজন মেয়ে মানুষ। রাত বারোটার দিকে রাবেয়ার

চেঁচামেচিতে ছাদ থেকে নেমে এসেছিল অন্তূ। বাড়ির মেইন দরজা আটকাতে গিয়ে আরও কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল আব্বু অপেক্ষায়। আব্বু আসলই না!

জানালার ধারে বই নিয়ে বসে জানালাটা খুলে দিয়েছিল। রাবেয়া ঘরে এসে আরেক দফা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন জানালা খোলা নিয়ে। ঠান্ডা হাওয়া আসছে, তা যেন শুষে নিচ্ছিল অন্তূ। একদৃষ্টে চেয়ে ছিল বাইরের অন্ধকার কুয়াশাচ্ছন্নতায়।

চুপচাপ এভাবে বসে থাকায় বুকের ব্যথাগুলোয় যেন আগুনে তুষের ছিটা পড়ছিল। অন্তিক আজ তিনদিন বাড়ি

ফেরেনি। আব্বু সকালে বেরিয়েছে, রাত দুটো বাজল, সেও ফিরল না। অন্তূর কান্না পাচ্ছে কি? আবার কখনও শক্ত হয়ে উঠছে চোয়াল। নানাভাবে ভেবেও কোনো রকম ব্যাখ্যা বের করতে পারেনি। অন্তিক কোথায় গেছে, আব্বু আসছে না কেন?রাবেয়া সেদিন অন্তূর ঘরে ছিলেন। কেন জানি তিনি অনেকটা সময় নিয়ে লম্বা একটা মোনাজাত করলেন নামাজ শেষে। আম্মুর কান্নার গুনগুনানি অন্তূর কানে গলিত লোহা হয়ে ঢুকছিল। বাইরে রাত বাড়ার সাথে সাথে যখন ঝি ঝি পোকার ডাক প্রকট হয়ে এলো, তখন চোখের পানি শুকিয়ে রাবেয়া কাত হয়ে শুয়েছেন কোনোরকমে।

অন্তূ কম্বল তুলে দিলো উনার গায়ে। এরপর তিন-চারবার আব্বুর নম্বরে ডায়াল করল। রিসিভ হলো না। অযু করে এসে তাহাজ্জদের নামাজে বসেছিল, তখন রাত তিনটা ছুঁই-ছুঁই। নামাজে খুব বিঘ্ন ঘটছিল, কেন জানি কান্নারা বাঁধ মানছিল না। কান্নার তোড়ে সিজদা লম্বা হচ্ছিল, নাক টানতে হচ্ছিল বারবার। বুকের ভেতর কয়েকবার দম আটকালো। এসবের কারণ স্পষ্ট নয় অন্তূর কাছে। তবে বুকে তুমুল ঝড় উঠেছে, কঠোর আশঙ্কারা নেচে নেচে কীসব অলুক্ষুনে কথাবার্তা বলতে চাইছে।জয় এসেছে, তা হামজা জানতে পারল সকাল দশটার দিকে। জয়ের রুমে গিয়ে

তাকে পাওয়া যায়নি। অথচ তার এতক্ষণ চিৎপটাং হয়ে পড়ে থাকার কথা। বেড-সাইড টেবিলের ওপর বিয়ারের ক্যান উল্টে পড়ে আছে। বিছানায় কম্বল ছড়ানো। হাতঘড়ি, ওয়ালেট, পারফিউম—সব নিজেদের জায়গায় পড়ে আছে। তার মানে জয় আশেপাশেই কোথাও আছে, দূরে বের হলে এসব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে একাকার হয়ে থাকতো। তরুকে ডাকল হামজা। তরু এলো না, গলা উঁচিয়ে জবাব দিলো।

-"জয় কখন এসেছে কাল রাতে?"

তরু চেঁচিয়ে জবাব দিলো, "ভোর রাতে।"

-"আবার তাহলে বের হয়েছে কখন?"

-"সকাল আটটার দিকে বের হয়ে গেল। বলে গেল, এক্ষুনি আসবে। আপনি কল করুন, বড়ভাইয়া।"

হামজা এসে সোফায় বসে রিমিকে ডাকল, "এক কাপ কফি বা চা কিছু একটা দাও।" রিমি আস্তে করে বলল, "আসছি।"হামজার মনে পড়ল, আজ সকালে ছোট্ট একটা মিটিং ছিল ক্লাবে জয়ের। মাঝখানে আর দু'দিন তিনরাত বাকি নির্বাচনের। চারদিকটা এতটা ঠান্ডা থাকার কথা না থাকলেও ঠান্ডা, কারণ আসল প্রতিপক্ষ এখনও হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ির ওপর আছে। লোক মারফতে খবর পাওয়া গিয়েছে খুব শীঘ্রই রিলিজ করা

হবে ওকে। হামজা মনে মনে প্রস্তুত যেকোনো কিছু মোকাবেলার জন্য। তবে হাঙ্গামা নির্বাচনের পর হলে সুবিধা হয়। আর সেটার শতভাগ চেষ্টা করতে হবে।

রিমি কফি দিয়ে চলে যেতে অগ্রসর হলে পেছন থেকে ডাকল হামজা, "আজ যাবে ওই বাড়ি?"

-"না।"হামজা চোখ তুলে তাকিয়ে কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, "আমি নিয়ে যাব, আমার সঙ্গে চলে আসবে।"

কফির গরম ঠোঁটে লেগে নড়েচড়ে উঠল হামজা। দ্রুত কাপ নামিয়ে বলল, "এত গরম

কেন? পরের বার কফি বানালে এত গরম পানি ব্যবহার করবে না।”

-“আপনারই বা এত তাড়াহুড়ো কীসের? ঠান্ডা হতে তো ঘন্টাখানেক সময় লাগবে না।”

গম্ভীর স্বরে কথাটা বললেও তাতে অল্প একটু অভিমানও যেন শুনতে পেল হামজা। অথচ মেয়েটার অভিমান তার ভালো লাগে না। নির্বাচনের মুহুর্তে সকলের মনোনয়নের পাশাপাশি রিমির সম্পূর্ণ মনোযোগ চাই তার, নয়ত বেশ নার্ভাস ফিল হবে।

-“যাও, তৈরি হও।”-“যাব না, আমি। আর এমনিতেও মাজহার ভাই বাড়িতে আসেনি এখনও।”

হামজা যেন শুনল না কথাটা, বলল, “এ জন্যই নিয়ে যাব। ও আসলে তুমি এমনিতেও ওই বাড়িতে যাবার অনুমতি পাবে না। তৈরি হয়ে নাও।”

-“যাব না আমি। আপনি আমায় আপনার বন্দিনী করে রাখতে চান? ক্ষমতার লোভ আপনাকে অমানুষ করে তুলছে দিনদিন, তা বুঝতে পারছেন না। আপনাকে আমি ভালোবেসেছিলাম কোনোদিন, এটা ভাবতেও নিজের ওপর ঘেন্না লাগে আজকাল। দয়া করছেন আমার ওপর, ও বাড়ি নিয়ে যাবার অফার কোরে?” যথাসম্ভব অশিষ্ট ভাষায় কথাগুলো বলল রিমি।হামজা কফির মগ

সেন্টার টেবিলে রেখে হাসল, অসীম ধৈর্য্যশীল এক পুরুষের মতো নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, “নিজেকে চেনা যতটা মুশকিল, তার চেয়েও বেশি কঠিন হলো নিজের মানুষদের চিনতে পারাটা। তুমি চিরকাল ওই বাড়ির সকলের হাসি মুখ আর আদুরে আচরণ পেয়ে বড় হয়েছ, ওদের ব্যাপারে তোমার ধারণা ওই অবধিই সীমাবদ্ধ, কিন্তু ওটা শুধুই নিজের পরিবারের জন্য বরাদ্দ। যেমন আমি এই বাড়ির জন্য এক হামজা, গেইট পেরিয়ে রাস্তায় পা রাখলে আরেকটা কেউ। মাজহার আমার কাছে এত এত ছাড় পেয়েও বহুত কিছু করেছে এতদিনে, এবার তাহলে ভাবো

এবার সুস্থ হয়ে কী করতে পারে? আর এবার ও ফিরে যা করবে, আশাকরি আমার ওপর দিয়ে যাওয়া সেই চাপ দেখে তোমার ভাইয়ের ওপর ভালোবাসায় একটু চিড় ধরতে পারে। ”রিমির হাত চেপে ধরল হামজা। রিমি তা ছিটকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, “আমার ভালোবাসায় চিড় ধরাতে খুব চেষ্টা করে যাচ্ছেন, তাই না? আল্লাহ জ্বালিয়ে ভষ্ম করে দিক আপনার চেষ্টাকে। দরকার পড়লে এই বাড়িতেই পচে মরবো, যখন আপনার মতো জাহিলের সাথে বিয়ে হয়েই গিয়েছে, তখন আপনার বাড়িতেই মরণ হোক আমার! আপনার মতো অমানুষ শত্রুতা পুষবে, এটা

আর এমন অস্বাভাবিক কী? কিন্তু যে মাজহার ভাই আমাকে আপন বোনের মতো বুকে চেপে মানুষ করেছে, তার রক্ত ঝরার কারণকে না আমি ক্ষমা করতে পারি, আর না কোনো বিবেচনা!

-"শত্রুতা আমি শুরু করিনি। শত্রুতা ওরা শুরু করেছে, এবং সেটাও বহুদিন আগে। যেবার প্রথম আমি ছাত্রনেতা নির্বাচিত হয়েছিলাম, মাজহারের ছেলেদের মাঝে কারও বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্ট্রোল হাতানোর ছিল, সেটা না পারায় এই শত্রুতার শুরু। এরপর দিনদিন আমার জনপ্রিয়তা বেড়ে যাওয়া তোমার চাচা, চাচাতো ভাই, বাপ এদের

শত্রুতার আগুনে পেট্রোল ঢেলেছে। তোমাকে বিয়ে করতে চাইলাম। প্রথমে রাজি হলো না, পরে রাজী কেন হলো জানো? আমি বাড়ির জামাই হয়ে গেলে ওদের হাতের লাঠি হয়ে যাব, আমার ক্ষমতা এবং জনপ্রিয়তার ভাগ পাবে ওরা। তা যখন হলো না, তখন একের পর আক্রমণ পেয়েছি এই কয় বছরে ওদের থেকে। কিছুই বলিনি কোনোদিন। কিন্তু আমার পর যখন জয় নেতাকর্মী হলো, তখন আবার নতুন কোরে জ্বলে উঠেছে তোমার বাপ-চাচার। এবার বলো, শত্রুতা কারা পুষছে, আর এর সমাধান কী? কোনো সমাধান নেই, এভাবেই যতদিন চলে। আর

এরপরেও তুমি অবুঝ হলে, তোমার ওপর কঠোর হতে বাধ্য হবো বোধহয় আমি ''রিমি আর এক মুহুর্ত দাঁড়াল না। তখনই গান গাইতে গাইতে ঢুকল জয়, "হামজা ভাইয়ের হবে জয়, ও ভাবী গো.. হামজা ভাই খারাপ লোক, জয়ের মালা তারই হোক, উড়ছে পাখি দিচ্ছে ডাক, হামজা ভাই জিতে যাক... ও আমার ভাবী গো, ও প্রাণের ভাবী গো..''
হামজা হেসে ফেলল। জয়ের পরনে দুধের মতো সাদা ধবধবে একটা লুঙ্গি। তার ওপর ছাইরঙা শার্ট পরেছে। কোলে কোয়েল। কবীর ঢুকেই কপালে হাত ঠুকে সালাম করল। ওকে বসতে ইশারা করল হামজা। তার পেছনে

দুজন একটা মস্ত বড় অ্যাকুরিয়াম বয়ে নিয়ে এসে বসার ঘরের মেঝেতে রাখল।

হামজা ভ্রু কুঁচকে বলল, “এসব টেনে এনেছিস কোন দুঃখে? অল্প একটু টেমপার উঠলেই যাতে ওটাকে আগে ভাঙা যায়?

”কোয়েল জয়ের কোল থেকে নেমে দৌঁড়ে এসে মামার কোলে চড়ে বসে। জয় লুঙ্গি একহাতে উঁচিয়ে ধরে রুমে গিয়ে কিছু টাকা এনে লোকদুটোকে দিয়ে বিদায় করল।

হামজার পাশে বসে কোয়েলকে বলল, “যা, এবার তোর মাকে ডেকে আন। তোর মার কাঁদার পানির চোটে সবগুলো বালিশের তুলো পঁচে গেছে।”

তুলি কোথা থেকে দৌঁড়ে এসে কোয়েলকে কোলে তুলে নিয়ে এ-গালে ও-গালে চুমু খেতে লাগল, এক পর্যায়ে কেঁদে ফেলল। হুট করে কিছু মনে হতেই কোয়েলকে নামিয়ে জয়কে জিজ্ঞেস করল, "তুই কী করেছিস ওই বাড়ি গিয়ে? মেরেছিস সীমান্তকে, তারপর এনেছিস কোয়েলকে?"

জয় বিরক্ত হয়ে বলল, "মহিলা মানুষ কোনোদিন ভালো হবে না? তোকে মেরে মুখের নকশা বদলে বাপের বাড়ি পাঠিয়েছে, তারপর.....। মেয়েটাকে রেখে দিয়েছিল জোর করে, তারপরেও কলজে ফাটতেছে সোয়ামীর জন্য? সামনে থেকে যা, ন্যাকা কান্না দেখলে

ডায়াবেটিস বাড়ে আমার। সুগার আছে ন্যাকামিতে।”

কোয়েল এসে কোলে চড়ে বসে আধভাঙা স্বরে জিজ্ঞেস করল, “জয়! ওই মাতগুলোকে বের করে খেলি আমি? বেল কোলে দাও একটাকে?”জয় মাথা নাড়ল, “তার আগে তোমাকে আমি পানিতে চুবিয়ে খেলবো দশ মিনিট, এরপর মাছকে পানি থেকে বের কোরে তোমার কাছে দেব খেলার জন্য।”

হামজা কেড়ে নিলো কোয়েলকে, জয়কে বলল, “তার আগে আমি তোর পেছনে দুটো লাত্থি মেরে খেলি, তারপর বাড়ি থেকে বের করে দেই? শয়তানে লাড়ে তোকে?”

-“শয়তানকে আমি লাড়ি। এইটা আমার প্রিয় কাজ, ব্রো!”
হামজা গম্ভীর হলো হুট করে, “সীমান্তকে মেরেছিস?”
জয় সোফায় পা তুলে বসে বলল, “না, সুন্দরমতো জিজ্ঞেস করেছি কেন মেরেছিস তুলিকে?”
-“তো কী বলল?”-“কাম নাই করার মতো, বাল নাই ছেঁড়ার মতো, তো বউ পিটাইছে। আমারও কাম অথবা বাল ছিল না হাতে, আমিও দুই চারটা লাগায়ে আসছি। পরে বাপের মার খাওয়া দেখে এই কোয়েলের ডিম

কাঁদা ধরল, তারে নিয়ে যাইয়া অ্যাকুরিয়াম কিনে দিয়ে শান্ত করছি।”

-“মিছিল হয়েছে সকালে? ঝামেলা হয়েছে কোনো?”

-“না। শুনলাম মাজহার শালার পায়ে নাকি খাঁটি স্টেইনলেস স্টিল ঢুকাইছে! ওই শালা দিনাজপুর ব্যাক না করা অবধি বিশেষ ঝামেলা হবার কথা না। পেছনে যতই বদনাম পাবলিক করুক, জয়ের নামে ডরায় তো সবাই! এইটুকুই যথেষ্ট! মাজহার আসবে নির্বাচনের আগের দিন। রিলিজ করবে কাল-টাইল মনেহয়!”

রিমি এসে জয়ের পাশে বসল। তার হাতে খাবারের প্লেট। খাবার তুলে জয়ের মুখের সামনে ধরে বলল, "খাননি সকালে?"-"সেহরীর সময় খাইছিলাম। আসলেই চরম খিদে লাগছে, ধুর, ওই মাছ দিয়েন না, ডিমের টুকরোটুকু দেন।"
রিমি কপাল জড়িয়ে বলল, "আপনার এত আহ্লাদ আসে কোত্থেকে?"
জয় নির্লজ্জের মতো হাসল, "দয়ালের কাছ থেকে সরাসরি সাপ্লাই হয় আমার কাছে।"
হামজা টাউজারের পকেট থেকে ফোন বের করল। রিমি এক আজব চরিত্রের মেয়ে। সব কিছুকে ছাপিয়ে তার জিদ। যে জয়ের ওপর

তার অসীম ঘৃণা, আজ তার সাথে মিছেমিছি মিল বজায় রাখছে হামজাকে জ্বালাতে। জয় রিমির নাটক বুঝেও কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাবে না, বরং হে হে করে হাসবে, এটা তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য!

জয় খাবার চিবোচ্ছিল, হামজা বলল, "ভোট কেন্দ্রগুলোতে এক্সট্রা নিরাপত্তার জন্য কিছু পলাশ ভাইয়ের লোকের দরকার পড়বে। আমি চাচ্ছিনা অন্তত সেদিন কোনো তামাশা হোক। বদনামসহ ভোট লাগবে না আমার। হামজা পাটোয়ারী নিখিল ভোটে, মানুষের মনোনয়নে জিতেছে, এই রব যেন লোকের মুখে মুখে থাকে। দুপুরের পর পলাশ ভাই

ডেকেছে তোকে, ত্যাড়ামি না করে গিয়ে দেখা করে আসিস। তার হেরফের হলে কিন্তু অবস্থা খারাপ হবে তোর!''জয় উঠে অ্যাকুরিয়ামের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে মাছগুলোকে পর্যবেক্ষণ করল। আঙুল দিয়ে কাঁচের ওপর খুঁচিয়ে বেশ জ্বালালো মাছগুলোকে। ভেতরে একটা গোল্ডফিশ, দুটো অ্যাঞ্জেল ফিশ, আর এক জোড়া কালশিটে রঙের অস্কার ফিশ এনেছে। গোল্ড ফিস সে একটা কিনেছে কেন, সে-ই ভালো জানে। বহুবার ছোটো-বড় বহু ধরণের অ্যাকুরিয়াম কিনেছে, আবার রাগের সময় ওগুলোকে আগে ভাঙে। কবুতর, মাছ, খরগোশ—

যেকোনো একটা কিছু পোষা প্রাণী হিসেবে থাকে সবসময় তার সংগ্রহে।

মাছের সামনে থেকে উঠে বলল, "দুপুরে যেতে পারবো না, ঘুমাবো আমি। বিকেলে গোসল করবো, খাবো। যাবো ঠিক সন্ধ্যার আগে। দু এক কলকি টেনেও আসবো তাহলে!"

হামজা বকে উঠল, "কলকি টানার খবর পেলে এক কোপে বলি দিয়ে দেব, শুয়োরের বাচ্চা। যে কাজে পাঠাচ্ছি, তা কোরে ফিরে আসবি।"সকাল থেকে বাড়িতে রান্না হয়নি। সকালে একবার বমি করেছে মার্জিয়া।

অন্তূর ফোনটা বেজেছিল দুপুরের দিকে। অন্তূ দিন-দুনিয়া ভুলে ঘরে ছুটলো, নিশ্চয়ই আব্বু ফোন করেছে। কিন্তু স্ক্রিনে অপরিচিত একটা আনসেভড নম্বর। তবুও অন্তূর চোখ ভিজে উঠল, কণ্ঠনালি থেকে কান্না ছিটকে এলো এক মুহুর্তে। তার ধারণা, আব্বুর ফোনে চার্জ নেই, অন্য কারও নম্বর দিয়ে কল করেছে। কল রিসিভ করেই কঠিন বোকার মতো ঝারি মারল একটা, "বয়স বাড়ার সাথে সাথে আক্কেল জ্ঞান কি গুলিয়ে খেয়ে ফেলেছ? একটা কল করে জানিয়ে দেয়া যেত না, যে কোনো কাজে আটকে গেছ? বাড়ির প্রতি তোমার না হয় টান নেই... আমারও তোমার

ওপর টান নেই, তবে জলজ্যান্ত একটা মানুষ উধাও হয়ে গেলে একটু ভাবনা হয় তো নাকি?রাবেয়া দোড়ে এসে দাঁড়ালেন মেয়ের পাশে। অন্তূ ফোনে বলে চলল, "তো কখন আসবে বাড়িতে? আর..."

-"হ্যালো!" ভরাট এক ধাতব কণ্ঠস্বর ভেসে এলো ফোনের ওপাশ থেকে। অন্তূ থমকালো। আব্বুর কণ্ঠস্বর গম্ভীর, তবে তা চির-পরিচিত, এটা নয়। পিপাসার্ত মুখে চুপ রইল অন্তূ, তার ঠোঁট ফাটফাট করছে।

-"বেশি প্যাঁচাল না পেরে যে ঠিকানাটা বলছি, সেখানে চলে আসিস। আর..আর একটা পাখিও যেন সাথে না আসে বা জানতে না

পারে কিছু।" সংক্ষিপ্ত হুমকি-বাণীটি কর্কশ এবং হিংস্র ছিল।

কল কেটে গেল। সাথে সাথে একটা মেসেজ এলো। সেখানে একটা ঠিকানা লেখা—কাহারোল থানার নয়াবাদ মসজিদ।রাবেয়া ঝাঁকাচ্ছেন ওকে অনবরত, বাবরার প্রশ্ন করেছেন। অন্তূ নিশ্চুপ চেয়ে থাকল ফোনের স্ক্রিনে। অন্তূর মাথায় এলো, ঠিকানায় উল্লিখিত জায়গাটা ঢেপা নদীর তীরে নির্জন এলাকার দিকেই নির্দেশ করছে। অন্তূর মাথা কাজ কথা বন্ধ করে দিয়েছে ইতোমধ্যেই। রাবেয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর না পেয়ে ছটফট করছেন। অন্তূ চট করে মুস্তাকিনকে কল

করে বসল। কেন করল, সে জানেনা। ফোনে পরিস্কার জানিয়ে দেয়া হয়েছে, একটা পাখিও যেন টের না পায়। তবুও ফোন করেছে অন্তূ। সতন্ত্র এক এফবিআই অফিসারকে ডাকছে সে।মুস্তাকিন এলো ঠিক বিশ মিনিটের মাথায়। ততক্ষণ অন্তূ ঠিক একই জায়গায়, একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল। মুস্তাকিন এসেছে টের পেয়ে নিস্তেজ হাতে মুখটা ওড়নার প্রান্তে আড়াল করে দাঁড়াল। মুস্তাকিন ঘটনা জানতে চেয়ে প্রশ্ন করল, অন্তূ জবাব দিলো গা ছাড়া ভাবে। তার চোখের কাতরতা মুস্তাকিনের দৃষ্টি এড়ানোর নয়, তবুও যথাসম্ভব শান্ত সে।

অন্তূকে জিজ্ঞেস করল, “আপনি ভয়েসটাকে চেনেন অথবা আগে শুনেছেন?”

অন্তূ অবচেতনের মতো মাথা নাড়ল, “না।”

রাবেয়া চেয়ার এনে দিলে মুস্তাকিন বসে বলেছিল, “বাহাদুরী করে একা যাবেন ঠিক আছে। এরপর আপনার সাথে কী হবে, তা দেখার জন্য ওখানে কে থাকবে? প্রথমে অন্তিক, পরে স্যার, এরপর আপনি, এরপর এ বাড়ির কার পালা?”

অন্তূ নিশ্চুপ। মুস্তাকিন বলেছিল, “আমি ফোর্স ডাকি, তারা গোপনেই আপনাকে প্রোটেক্ট করবে, ওরা জানতে পারবে না কেউ গিয়েছে

আপনার সঙ্গে। এবং তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব আমার।”

অন্তূ রাজি হয়নি, “প্রয়োজন নেই, অফিসার! আমি কোনো ধরণের ছোট্ট একটা রিস্কও নিতে প্রস্তুত নই। আমার মন বলছে, ওরা ভয়ংকর। কথার খেলাপি হলে খারাপ কিছু হতেই পারে!”

রাবেয়া কান্না লুকালেন শাড়ির আঁচলে। অন্তূ নিস্তেজ পায়ে এগিয়ে গিয়ে আলতো কোরে একবার আম্মুকে জড়িয়ে ধরেছিল। বেরিয়ে যাবার সময় মুস্তাকিন সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল, “এক ঘন্টা সময়। এর মাঝে না ফিরলে আপনি না ফিরলে আমি ইচ্ছেমতো

পদক্ষেপ নিতে পারি।''মুস্তাকিন কেমন কোরে যেন চেয়ে ছিল মিনিটখানেক অন্তূর চোখের দিকে। সেই চোখের রহস্য বোঝার উপায় নেই। এরপর আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বিদায় জানিয়েছিল, "গড ব্লেস, ইউ।''

বাঁশের হাঁটের ওপর থেকে গাড়িতে কোরে নয়াবাগ যেতে কমবেশি আধঘন্টা সময় লাগে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

নয়াবাগ মসজিদের অদূরে দাঁড়িয়ে থেকে তার ভেতরে এক প্রকার ছটফটানি কাজ করছিল। অন্তূ জানে না, এই অনিশ্চিত প্রবাহধারা তাকে ধাওয়া কোরে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। মিনিট দুয়েক বাদে দুটো লোক এসে নিয়ে

গেল অন্তূকে। ওদের দেখে মনে হচ্ছিল, অন্তূকে মেহমানদারীর উদ্দেশ্যে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে। চারপাশের লোক আসল ঘটনা আন্দাজ করতে পারবে না এদের আচরণ দেখে, হয়ত বুঝলেও কিছুই বলবে না। রাজত্ব এদের, শাসন এদের। সমাজটা এদের নোংরা পায়ের তালুর তলে পদদলিত। রাস্তাটা ক্রমশ ঢালু হয়ে এগিয়ে গেছে। দুপাশে বন, জঙলি এলাকার মতো। এককথায় নির্জন একটি জায়গা। অন্তূ হাসল। তার হাসি পাচ্ছে, নিজের জীবনের ঘটনাপ্রবাহের ওপর, এবং অনিশ্চিত আগামী কালের ওপর। আবার হাত-পা শিরশির

করছে। সেটাকে পাত্তা দিলে মানসিকতা মেরুদণ্ডহীন এক কেঁচোর মাফিক হয়ে পড়বে। যাকে আলতো পায়ের চাপে পিষে মারা যায়। অন্তূ চাইল শক্ত হতে। কিন্তু পারা যাচ্ছে না। নারীমন মচকে যাচ্ছে।

একদম নির্জন জায়গাটির কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে একটি বাংলো অথবা কোয়ার্টারের মতো বিল্ডিং। রঙচটা দেয়াল, মরিচা ধরা লোহার জানালাগুলো। ওর পেছনে হাঁটছিল লোকদুটো। এত কাছে, গা লাগিয়ে হাঁটছে, এতক্ষণে বেশ কয়েকবার প্রায় ছোঁয়া লেগেছে।বাড়ির গেইটের ভেতর দিয়ে ঢুকতেই চোখে অন্ধকার দেখল। ঘুপছির

মতো ভেতরটা, বিশ্রী গন্ধ আসছে চারপাশ থেকে। অন্তূর মাথা চক্কর কেটে উঠল অসহ্য দুর্গন্ধে। মদ এবং ড্রাগসের গন্ধ মিশে একাকার হয়ে একটা ভ্যাপসা পেট গুলানো দুর্গন্ধের সৃষ্টি করেছে। সিঁড়িতে ওঠার সময় বেশ কয়েকবার লোকদুটো যেন ওকে ইচ্ছে কোরেই ছোঁয়ার চেষ্টা করল।অন্তূর কিছুই করার নেই। তার মনে হতো, সে প্রতিবাদী, অল্প হলেও। তার সামনে কোনো অন্যায় টিকার নয়। কিন্তু আজ ওসব কাজ করছে না। হাত-পা অবশ হয়ে আসছে। কলেজের ছোকড়াদের, অথবা পাড়ার মহিলাদের সম্মুখে প্রতিবাদী আওয়াজ উঠানোটাই জীবনের জিত

এবং নিরাপত্তা নয়। আজ মনে হচ্ছে, তার প্রতিবাদ বোধহয় শুধুই মহিলা এবং সাধারণ অসভ্যদের সামনে সীমাবদ্ধ। নয়ত এখানে কেন সে একটা চলন্ত পুতুলের মতো হেঁটে চলেছে এভাবে? কোনোই প্রতিবাদের ভাষা মুখে আসছে না, হাতে উঠছে না। শরীরে কম্পন ধরেছে, মনে নারীসুলভ দূর্বলতা বিরাজ করছে। অসহায়ত্বের চাদরে পুরো অন্তূ-সত্ত্বাটা বাজেভাবে ঢাকা পড়েছে। অর্থাৎ এই সমাজের খারাপদের সম্মুখে টিকে থাকার মতো প্রতিবাদ রপ্ত করা সাধ্যের বাইরে? সে নাহয় পারেনি, আচ্ছা না-ই বা পারল! কিন্তু মুস্তাকিন? সে একজন

এফবিআই অফিসার। তার কাছে নাকি হুমকি-চিরকুট আসে, শাসানো ফোনকল আসে। মাঝপথে কেইস দাবিয়ে দেয়া হয়! সমাজে আসলে কাদের বিচার এবং রাজ চলছে? কারা ভালো আছে? চিৎকার কোরে কেউ যেন কানের তালা ফাটালো এটা বলে—খারাপদের! খারাপরা, খারাপরা ভালো আছে। একমাত্র খারাপেরা তুলনামূলক ভালো আছে। দোতলায় নিয়ে যাবার পর অন্তূর মনে হয়েছিল তাকে কোনো কক্ষে বন্দি কোরে দেয়া হবে। নারী-মন আতঙ্কে গুঙরে উঠছিল। কিন্তু তাকে বদ্ধ রুমগুলো পার করে

রুফটপের সামনে নিয়ে যাওয়া হলো। চারপাশ ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে এসেছে। রুফটপটাও পুরোনো, সবুজাভ শেওলা পড়েছে, পুরোনো বিল্ডিং। মাগরিবের আজান শোনা গেল এবার।

রুফটপে পা রেখে মাথা তুলে আশপাশ দেখল। লোকদুটো গা ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েজন পুরুষের সম্মিলিত হাসির আওয়াজ পেয়ে তাকাল। সোফাতে গা এলিয়ে বসে আছে একজন পুরুষ। জ্বলজ্বলে বিড়ালের মতো চোখ, খাঁড়া নাক অনেকটা খিলানের মতো, পাটাগুলো যেন ফনা তুলে আছে। ঠোঁটে প্যাচপ্যাচে হাসি ঝুলছে। তার সম্মুখে

পিঠ ফিরিয়ে বসে আছে আরেকটি লোক। এক মুহুর্তের জন্য অন্তূর মনে হলো, এই পিঠ ফেরানো পেছনটাকে সে চেনে।চারদিকে কুয়াশা ঘন হয়ে আসছে, দিনের আলো ফুরিয়েছে। রুফটপটাকে বাইরে থেকে পুরোনো পরিত্যক্ত জায়গা বলে মনে হলেও এখন বুঝল, এক অভিজাত বৈঠকখানার চেয়ে কম নয় এটা। গোলাকার সারি কোরে সাজানো সোফার সেট, সেন্টার টেবিল। টেবিলের ওপর সারি ধরা মদের বোতল, ড্রিংকিং গ্লাস, সোডার কৌটা, মেডিসিনের পাতা, মোড়ানো কাগজ, বিটলবন, স্ন্যাক্স, ছুরি ইত্যাদি পড়ে আছে।

অন্তূ চোখ বুজে শ্বাস ফেলল। আলো জ্বললো। অন্তূ চূড়ান্ত মরণের জন্য প্রস্তুত। সামনে বসা লোকটি হাতের গ্লাসটি নামিয়ে রেখে মনোযোগী দৃষ্টি মেলল অন্তূর গোটা শরীরে। যেন আকর্ষণীয় কিছু পেয়েছে হুট কোরে। কিন্তু এবার পেছন ফিরে বসে থাকা লোকটা অনীহার দৃষ্টি মেলে পেছনে ফিরল একবার। তার দৃষ্টি কেঁপে উঠে বিদ্যুতের মতো ধাক্কা খেল যেন অন্তূর ওপর।জয়! অন্তূ হতবিহ্বল চোখে তাকিয়ে দেখল জয়কে। ধীরে ধীরে বিস্ময়ভাবটা কেটে মন-মস্তিষ্ক ও গোটা শরীর জুড়ে এক বিদ্বেষী ঘৃণারা লাফিয়ে উঠল যেন। এরা এত নিচে নামতে পারে? জয় সেদিন

ভার্সিটি প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জ নিয়েছিল, সেসবের জেরে এসব করছে? অথবা অন্তূকে দমাতে। প্রশ্ন অনেক, উত্তর নেই যথাযথ। পেছন থেকে একজন ধাক্কা মারল অন্তূকে। ভেতরে ধপ কোরে আগুন জ্বলে উঠল যেন। আরও দুটো ঠেলা তাকে সহ্য করতে হলো। জয় চট কোরে উঠে দাঁড়ায়। তার চোখদুটো হাসছে। সেখানে এখন বিস্ময় থাকার কথা, কিন্তু তা ছাপিয়ে দুষ্টু হাসি প্রকট। হাতের ধোঁয়া ওঠা কলকিটা টেবিলে ফেলে বলল, "ও কে? ওরে এইখানে নিয়ে আইছেন ক্যান? কী সমস্যা?"সোফায় বসা লোকটা চার হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে, তার নজর এখনও অন্তূর

শরীরে। অন্তূ একদৃষ্টে চেয়ে ছিল জয়ের দিকে। জয় এবার কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করল, “ওরে এইখানে আনছেন ক্যান, পলাশ ভাই?” প্যাচপ্যাচে হাসি শোনা গেল। বিড়ালের মতো জ্বলজ্বলে চোখগুলো কীসের নেশায় যেন জ্বলছিল পলাশের। সরু নাকের খিলানের মতো পাটাটা কাঁপে, যখন পলাশ হাসে। অন্তূর ঘেন্না এলো সেদিকে তাকিয়ে। জয় খেঁকিয়ে উঠল, “হের বাল! ওরে ক্যান নিয়ে আসছেন এইখানে? এইডা জিগাইছি। ওর কী কাম এইখানে?”

পলাশ তখনও অন্তূর দিকে চেয়ে। জয় দুই-ভ্রুর মাঝে আঙুল ঘষে দাঁত খিঁচল, “পলাশ

ভাই, কিছু জিজ্ঞেস করতেছি। হাসি অফ করে জবাব দিয়ে এরপর হাসেন।''অন্তূ চমকে উঠল। পলাশ? দিনাজপুরের শীর্ষ সন্ত্রাস? বাজারের প্রতিটা দোকানে কসাইয়ের মতো চাঁদাবাজি থেকে শুরু কোরে নতুন নতুন পাপের সৃষ্টিকর্তা পলাশ ও রাজন। দেখেছিল না কোনোদিন লোকটাকে। আন্ডারওয়ার্ল্ড বলে একটা কথা আছে, আর সেখানকার জানোয়ারেরা আন্ডারগ্রাউন্ডেই বিচরণ করে সাধারণত। অন্তূর মাথায় এলো না, তাকে কেন এই নরকে আনা হয়েছে? মহাজন পলাশ। মানুষকে টাকা ধার দেয় সুদের চুক্তিতে। সময় এতটা কম দেয়, যে একজন

ঋণী লোকের পক্ষে অত দ্রুত সুদসহ টাকা জোগাড় সম্ভব হয়না। পলাশ তার বদলে বউ-বাচ্চা, জমির দলিল, বাড়িঘর, ব্যবসা, সবশেষে জান নিয়েও নিজের সুদসহ টাকা আদায় কোরে নেয়। এমন বহু কথা শুনেছে অন্তূ পলাশের ব্যাপারে। এটাই কি সেই পলাশ? জয় এখানে কেন? অন্তূর খুব দূর্বলতা বোধ হচ্ছিল।

চারপাশে দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে আছে পলাশের লোকগুলো। দেখতে নর্দমার পাশে ক্ষুধার্ত অবস্থায় শুয়ে থাকা কুকুরের মাফিক রূপ সবগুলোর।

পলাশ হেসে জয়ের দিকে তাকায়, “এত ক্যান ব্যস্ত হইতেছিস, বাপ! এমন টসটসে মাল ঘরে রেখে এসে কীসব আউল-ফাউল জিনিস বন্ধক রেখে মানুষ ট্যাকা ধার নেয়, বোকার দল সবগুলা!”

জয় নাক-মুখ জড়িয়ে বিরক্ত হয়ে মদের বোতল তুলে নিয়ে তাকে দুটো চুমুক দিলো। আস্তে কোরে অনাগ্রহী স্বরে জিজ্ঞেস করল, “অন্তূর বাড়ির লোকও কি সুদের টাকা নিয়েছে নাকি আপনার কাছে?”-“হ।”

-“এই শালীর বাপরে তো এমন লোক মনে হয়না!”

পলাশ হাসছে। চোখদুটো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। সেই হাসিতে রহস্য মেশানো। কিন্তু তাতে জয়ের কোনো আগ্রহ নেই। তার গলা জ্বলছে আজ। মদে অল্প সোডা এবং পানি না মেশালো।

পলাশ এগিয়ে গিয়ে অন্তূর খুব কাছে দাঁড়ায়। অন্তূ চেয়েও পেছাতে পারল না। পিছনে আরও দুটো লোক দাঁড়িয়ে। পলাশের শরীর থেকে দুর্গন্ধ আসছে। অন্তূর মনে হলো সে যখন তখন গলগল করে বমি করে ফেলবে। এতটা কাছে কোনো পুরুষ কোনোদিন আসেনি তার। বিরবির কোরে সৃষ্টিকর্তাকে ডেকে ওঠে অন্তূ। পলাশ জিব বের করা

কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকছে ওর শরীরের। বোরকা এবং নেকাবের ওপর দিয়েই যেন কীসের পৈশাচিক স্বাদ পাচ্ছে পলাশ।

অন্তূ চোখ বুজে ডুকরে উঠল নীরবে, 'আল্লাহ পাক! পানাহ চাই এসব থেকে, তুলে নিন আমাকে, রক্ষা করুন।'

পলাশ স্থির হয়ে দাঁড়াল। প্যাচপ্যাচে হাসি দিয়ে বলল, "তোমারে ক্যান নিয়াসছি এইখানে?"-"বলেননি এখনও।" অন্তূর গলাটা কেঁপে উঠেছিল। ইজ্জতের ভয় তাকে কাহিল করে তুলেছিল।

-"তুমি চেনো আমারে?"

অন্তূ নিজেকে গোছাতে গিয়েও এলোমেলো হয়ে গেল, “কেন এনেছেন আমাকে এখানে? আমি কি কোনো অপরাধ করেছি?”

পলাশ হাসছে। সেই হাসিতে পশম দাঁড়িয়ে যায়। পলাশ বলল, “তোমারে মনেহয় কিছুই কয় নাই অন্তিক, হ্যাঁ?”

অন্তূ চোখ নামালো। চোখ বুজে শ্বাস ফেলল।

-“তোমার ভাই যখন বউয়ের গয়না নিয়ে এসে টাকা চাইছিল আমার কাছে, আমি অবশ্য ওরে কইছিলাম, ‘বউয়ের গয়না দরকার নাই, বউডারে আনলেই পারতি!”

ট্যাকা আর পরিশোধ করা লাগতো না। ছেঁমড়া দেখলাম জ্বলে উঠছিল, অথচ ট্যাকারও প্রয়োজন, কিছু বলবার পারেনাই, হাহাহা!" অন্তূ অবাক হলো। বুকে ভার অনুভূত হলো।-"পরে কইল, 'না, আমি গয়নাই রাখতে চাই, ভাই। দোকানে যা কামাই হবে, তা দিয়ে মাসে মাসে আপনার টাকা দিয়ে সময় ফুরানোর আগেই শোধ করে দেব।' শালার ছাওয়াল পারল তো না। সেই হয়রানি পেরেশানী হইলো, দোকানডাও গেল, রাখতে পারল না। শেষ পর্যন্ত দুইদিন আগে নাকি নিজেও পালাইছে। অথচ তোমারে আনলে খুশি হয়ে দেখা যাচ্ছে ওর ব্যবসাডারে

নিজহাতে চিরদিন প্রোটেক্ট করতাম! তোমারে আনে নাই ক্যান আগে?"

এবার ঝুঁকে পড়ল পলাশ অন্তূর ওপর, "জানতাম না যে তুমি এত সুন্দরী! জানলে অন্তিক ছেমড়াডার সুদ, আসল, চাঁদা, দোকানের কামাইয়ের ভাগ সবডা মাফ করে দিতাম। মেয়েলোকের ওপর কিচ্ছু নাই, কারবারও না। আমি মেয়েলোকের খাতিরে বহুত ত্যাগ করবার পারি।"

অন্তূর শরীর কাঁপছে থরথর করে। নিজের ওপর রাগ হলো তার। এত অস্থির হয়ে পড়ছে কেন সে? কোনোভাবেই শান্ত হতে পারছে না। কোনোমতো জিজ্ঞেস করল,

“আমার আব্বু কোথায়?”-“আহহ! কথা তো শ্যাষ হয় নাই। শোনো, অন্তিক ছেড়াডা আমার থেকে লুকায়ে, না পালায়ে যদি তোমারে আনতো আমার কাছে, তোমার বাপডারও এত ভোগান্তি হইতো নাহ! যেহ! আমি জানতামই না তুমি এরম..”

অন্তূর কলিজাটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। অনিয়ন্ত্রিতভাবে এক চরম ভুল হয়ে গেল তার দ্বারা। থাবা দিয়ে পলাশের শার্ট খামছে ধরে বলল, “এই জানোয়ারের বাচ্চা, কী বললি তুই? আব্বু কোথায়? আব্বু তোর কাছে? কী করেছিস তুই আব্বুর সাথে? আব্বু কই, কোথায় আব্বু?....”

এতক্ষণের জমে থাকা পানি ঝরঝর কোরে গড়িয়ে পড়ল নেকাবের নিচে। হুংকারটা কান্নার সাথে মিশে নির্মম আর্তনাদের মতো শোনালো।জয় বিরক্ত হয়ে একটা সিগারেট ধরাল। বকে উঠল বিরবির করে, “শালীর ধার কমবে না তবু।”

পলাশকে দেখে মনে হচ্ছে, তার প্রিয় খাবারটা খেয়ে তৃপ্তির হাসি হাসছে, এতটা পৈশাচিক তার মুখের ভঙ্গি। অন্তূ শুনেছিল, মহাজন আর সন্ত্রাসরা পিশাচদের আরেক বংশধর। অন্তূর বুকে কাঁপন ধরেছে। পলাশ শার্ট থেকে অন্তূর হাতটা ছড়ানোর নাম কোরে বাজেভাবে জড়িয়ে ধরে ছুঁয়ে দিলো হাতটা।

অন্তূ ঝটকা মেরে হাত ছড়িয়ে পিছিয়ে যায়। ধাক্কা খায় পুরো দেহটা দুটো পুরুষের সাথে। ঘেন্না আসল নিজের শরীরের ওপর। কোথাও পুরুষের ছোঁয়া লাগা বাকি রইল না গোটা দেহে। ছটফট করতে করতে দূরে সরে দাঁড়াল।

ফুঁপানো কান্নায় নেকাব ভিজে উঠল। জয় সোফা ঘুরিয়ে নিয়ে বসেছে। সে খুব আরামে আছে। যাত্রাপালা দেখতে এসেছে। সামনে খেলা হচ্ছে, সে দেখছে। তার হাতে স্বল্প মাত্রার বিয়ারের ক্যান। এবার অন্তূর দৃঢ় বিশ্বাস জাগল, জয় সব জানে, সব। তবুও কেন নাটক করল প্রথমদিকে?

অন্তূ চেঁচিয়ে উঠল, “আব্বু কই?” চেঁচানোও নিদারুণ আহাজারির মতো ন্যায় শুনতে লাগল, “আমার আব্বু কই? ও আব্বু! আমার আব্বুকে কোথায় রেখেছেন? কোথায় আমার আব্বু? আব্বু..” সবে কথা বলতে শেখা ছোট্ট শিশুটির মতো অবুঝ স্বরে ডেকে ওঠে অন্তূ আবার।“আব্বু? ও আব্বু? আব্বু?”—পাগলের মতো এদিক ওদিক খুঁজল আব্বুকে। অবুঝ শিশু যেমন অচেনা জায়গায় কাতর হয়ে ওঠে, অন্তূ তার চেয়েও সহায়হীন এতিমের মত কাতরাচ্ছে রুফটপের এক পাশে দাঁড়িয়ে। পলাশ বারবার দেখছে অন্তূর চোখদুটো। পলাশের মনে হলো, ভিজে ওঠা পাপড়ির জন্য

মেয়েটার চোখদুটো তাকে বেশি মাতাল করছে। নোংরা চাহিদায় উতলা হয়ে উঠছে তার পুরুষ দেহ। অন্তূর আর্তনাদ একেকবার কানে যাচ্ছে আর কামনা-তাড়নার আগুনে কেরোসিনের ছিটা পড়ছে। এগিয়ে গেল অন্তূর দিকে। ক্ষুধার্ত পিশাচ যেমন রক্ত পেলে জ্বলজ্বলে হেসে ওঠে, ওরকম হেসে বলল, "আব্বুকে দেখতে চাও, সুন্দরী? তার মানে তুমি আমার কাছে কিছু চাও?"

অন্তূ থেমে যায়। অবুঝের মতো তাকিয়ে থাকে পলাশের দিকে। পলাশ কোমল স্বরে বলল, "লেনদেন বোঝো? নেয়া-দেয়া। তুমি

কিছু চাচ্ছ আমার কাছে। এর বদলে আমারও তো কিছু চাওয়া থাকতে পারে। পারে না?''

অন্তূ হাল ছেড়ে দিয়ে আস্তে কোরে বলে, "পারে।'' তারপর একটু সপ্রতিভ হলো, "আমি বুঝতে পারছি। অন্তিকের টাকাটা পরিশোধ করতে হবে। সে তো জানি। কিন্তু এখন তো কিছু বলেননি, আমি সাথেও আনিনি। কথা দিচ্ছি, আগামী....''

পলাশ আঙুল তুলে অন্তূর ঠোঁটে নেকাবের ওপর দিয়ে চেপে ধরল, "হশশ! এত কথা না। আমি চেয়ে নিই, তুমি দাও।''

অন্তূ তাকিয়ে রইল। তার সরলতা ব্যর্থ গেল বোধহয়।

পলাশ খুব সাবলীলভাবে বলদ, “নেকাবটা খোলো, দেখি মুখটা।”অন্তূ থমকে দাঁড়াল। পলাশ বোঝালো, “উমহ! লেন-দেন।আমি তোমার মুখ দেখবো, তুমি তোমার আব্বুর মুখ!”

পাথরে পরিণত হলো অন্তূ। নির্বাক চোখে দেখল পলাশকে। পলাশ এগিয়ে যায় আরেকটু ওর দিকে। বে-খবর আক্রমণ করে বসে অন্তূর ওপর। খপ করে অন্তূর মেয়েলি হাতদুটো নিজের থাবায় পুড়ে অন্তূর পেছনে আটকে ধরে। তাতে পলাশের শরীরের সামনের অংশের সিংহভাগ ছুঁয়ে যায় অন্তূর নারীদেহ। অপর হাত দিয়ে অন্তূর বুকের

ওপরে গলার নিচে লেহন করার মতো হাত বুলায়, যেমন কোরে কুকুর তার খাবার চাটে জিহ্বা দিয়ে। অন্তূ হাত মুচড়ানোর বৃথা চেষ্টাটা করল না। চোখদুটো বুজে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে সেদিনের পাথরের চোখ বেয়েটপ টপ করে কয়েক ফোটা তপ্ত জল গড়িয়ে পড়ল।বিরবির করে ডেকে ওঠে অন্তূ, "আল্লাহ!"

অন্তূ হার মানলো, "আমি খুলছি নেকাব। আমি খুলছি..."

পলাশ পারতো নিজে খুলতে। খুলল না। সে অন্তূকেই বাধ্য করল। এতে তার চোখে-মুখে জিতে যাওয়ার চমক। অন্তূর কাছ থেকে

সরতে ইচ্ছে করছিল না। তবুও নিজেকে টেনে নিয়ে অল্প সরে দাঁড়াল যেন।

অন্তূ হাত কাপছে। নেকাব অবধি উঠছে না। এতগুলো বছরে কোনোদিন কেউ মুখ দেখেনি তার। আজ দেখবে। শরীরের ওপর ঘেন্না লাগছে। এই শরীরের বিভিন্ন জায়গা আজ নষ্ট হাতের ছোঁয়া পেয়েছে। নিজেকে একপেশে নষ্টা বলেই মনে হচ্ছিল তার। তবুও কেন যে নেকাব খুলতে হাত উঠছিল না মুখের ওপর। ছোঁয়ার চেয়ে নজর বেশি ভয়ানক?সন্ধ্যার আকাশে কুয়াশার আবরণ পরিবেশকে আরও গুমোট কোরে তুলেছিল। পলাশের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। আবার এগিয়ে এলো অন্তূর দিকে,

“খুলবা নাকি টেনে খুলে ফেলব? আমি একটা কথা বলতেছি, ওইডার পিছনে সাহস দেখায়ে আবার চুপ কইরা আছো? ঠিক না।”

হাত বাড়ায় পলাশ। অন্তূ সেদিন এই মুহূর্তে কেন যেন জয়ের দিকে তাকিয়েছিল একবার। তবে খেয়াল কোরে দেখলে তার চোখে অল্প আশা দেখতে পাওয়া যেত বোধহয়, যা সে জয়ের কাছে করেছে। কোনো যুক্তি নেই সেই আশার, তবুও অন্তূর বোধহয় সেই ভয়টা লাগেনা জয়কে, যেটা পলাশের জন্য তৈরি হয়েছে এই কিছুক্ষণে।

জয় আরাম কোরে বসে বিয়ারের ক্যানে চুমুক দিচ্ছে। তার সামনে কিছু ঘটছে, তেমন

খেয়াল নেই তার মাঝে। নিজের এমন বোকা আশার কথা ভেবে তাচ্ছিল্য এলো অন্তূর নিজের ওপর।

জয়ের চোখে-মুখে তখন স্পষ্ট লালসা। তাকে একনজর নগ্ন অবস্থায় দেখার লালসা। তার অবশ্য রাগ হচ্ছে, অন্তূকে এত লোক দেখবে, যে চেহারাটা তার নিজের পছন্দ! কিন্তু বাঁধা দিলো না। এখন নেকাবটা খুলে ফেললে অন্তূর চেহারা দেখতে পাবে সে। দু'চোখে তার অধীর অপেক্ষা। চেহারা দেখার চাহিদাকে ছাপিয়ে পলাশকে ঠেকানোর ইচ্ছে বা প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল না সে।পলাশ অন্তূর বাহুটা জড়িয়ে ধরার সময় অন্তূর

বুকের ওপরের ওড়নার প্রান্তটুকু পলাশের হাতের থাবায় এলো। অন্তূ হাত দিয়ে ঠেকানোর চেষ্টা করলে পলাশ অন্তূর হাতটা খামচে ছুঁড়ে ফেলে পেছনের দিকে। সজোরে আঘাত হানে হাতটা গিয়ে পেছেনের খচখচে দেয়ালে। নিশ্চিত চামড়া ছিলে র-ক্ত বেরিয়ে এসেছে।

পলাশ অকথ্য ভাষায় গালি দিয়ে বলে, "খোল শালি! ন্যাকামি মারাস?"

একটানে খুলে নয় বরং ছিঁড়ে ফেলে অন্তূর চেহারার আবরণটা। অন্তূর গলা থেকে একটা সরু আহাজারী বেরিয়ে আসে। যেই

আহাজারিতে চোখ তুলে তাকায় জয়। আর নজর ফেরায় না।

পলাশ ঝটকা খেয়ে অল্প সরে দাঁড়াল অন্তূকে ভালোভাবে দেখার জন্য। মেয়টার কান্না থেমে গেছে, চোখের পাপড়ি ভেজা, অথচ পানি গড়াচ্ছে না। মুখটা লাল হয়ে আছে। চিকন ঠোঁটের কিনারা মাঝেমাঝে উত্তেজনায় কেঁপে উঠছে। জয় ও অন্তূর এক দুর্বোধ্য দৃষ্টিবিনিময় হলো সেই মুহুর্তে।পলাশ হাসছে। তার হাসি কথা বলছে, বলছে—জীবনে প্রথম হয়ত বহুল আকাঙ্ক্ষার বস্তু সামনে দেখতে পেয়েছে চোখদুটো। সে অভিভূত, সে আসক্ত। নিঃশ্বাস জোরে জোরে পড়ছে পলাশের।

আশপাশে কমপক্ষে দশ-পনেরোজন পুরুষ অন্তূকে গিলছিল। অন্তূ তাকিয়ে ছিল জয়ের দিকে।

কিন্তু জয় হুট কোরে নজর ফিরিয়ে বিয়ারে ক্যানটার পাশে রেখে ঘাঁড় ঘুরিয়ে হাঁ কোরে শ্বাস ফেলল। অন্তূর আর কান্না পাচ্ছে না। আব্বু বলতো, ছাগল যদি জবাই-ই হয়ে গেল, সেটাকে কাবাব করা হোক, ঝোল রেঁধে খাওয়া হোক, অথবা কিমা করা হোক ছাগলের কি আর কিছু যায় আসে?

পলাশ হেসে উঠল এবার শব্দ কোরে, "আরিব্বাস! তোমার বাপের ঘরে যে এরম একখান আইটেম আছে, জানলে কি আর

বেঁচারা...''অন্তূর ভেতরে একটা তীব্র যন্ত্রণা শুরু হলো। সে আজ প্রদর্শনীর পণ্যের মতো এতগুলো পুরুষের মাঝে প্রদর্শিত হচ্ছে। আব্বু বিষয়টা সহ্য করতে পারবে?
নেকাবের একাংশ ছিঁড়ে পলাশের হাতে গেছিল, সেটা পলাশ ছুঁড়ে ফেলেছে। যে অংশটুকু অন্তূর গলায় পেঁচিয়ে ছিল, তা সে নিস্তেজ হাতে আস্তে কোরে খুলে ফেলে দিলো অন্তৃ। এখন শরীরে বোরকা, বুকের ওপর এক টুকরো ওড়না আছে। সকলে দেখছে তাকে।
অন্তূ প্রস্তুত হয় আমজাদ সাহেবকে যেকোনো হালে দেখতে। বুকে মুচড়ামুচড়ি শুরু করেছে,

অন্তূ বাঁ হাতের তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল সজোরে চেপে ধরে বুকের মাঝখানটায়। আকাশের দিকে তাকিয়ে সৃষ্টিকর্তার কাছে কিছু অভিযোগ করল।দু'জন দু'পাশে ধরে আমজাদ সাহেবকে নিয়ে ছাদের ঘরে প্রবেশ করল। সে জায়গাটি আলোকিত। তার পাশের অন্ধকারের ভেতর বসে আছে জয়।

অন্তূ কয়েক কদম পিছিয়ে ছাদের দেয়ালের সাথে ঠেকে দাঁড়াল। শরীরটা থরথর করে কাঁপছে আবার। অন্তূ হাউমাউ করে কেঁদে উঠল মুখে হাত চেপে ধরে, কিন্তু আওয়াজ হলো না।

আমজাদ সাহেব থরথরে কাঁপা হাতটা বাড়াতে চায়, চোখে-মুখে আতঙ্ক, ডেকে ওঠেন অস্পষ্টস্বরে, "অন্তূ!"

অন্তূ চোখ বুজে ফেলে। আমজাদ সাহেবের মুখটা থেতলানো প্রায়। শার্টের অধিকাংশ ছেঁড়া। হাতে কাচাকাচা দাগ। টলছেন উনি, চোখ খুলে রাখতে পারছিলেন না। ড্রাগ দেয়া হয়েছে বোধহয়। মেহেদি রঙানো দাড়িওয়ালা থুতনিতে গভীর থেতলানো ক্ষত। কী দিয়ে মেরেছে এরা?অন্তূ দৌঁড়ে গেল আব্বুর দিকে। পলাশ মাঝে এসে দাঁড়াল। অন্তূর পুরো শরীরটা আন্দোলিত হয় একবার পলাশের দেহের দেহের ধাক্কায়, মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে

গুটিয়ে গেল যেন একদম আগুনের তাপে পলিথিন যেমন কুঁচকে ঝলসে যায়, ঠিক তেমন। আমজাদ সাহেব কিছু বুঝলেন কিনা কে জানে? যতদূর সম্ভব কড়া ড্রাগ উনার শরীরে।

আমজাদ সাহেবের কোনোদিকে খেয়াল ছিল না। সে কেবল অবচেতন অথবা প্রায় অচেতন চোখে মেয়েকে দেখছিলেন। পলাশের হাতের বেষ্টনিতে গ-লা-কা-টা মুরগীর মতো ছটফট করছে অন্তূ। তার মাথা আলগা, বুকের ওড়না ঠিক নেই, মুখে পর্দা নেই।সহ্য করতে না পেরে টলমলে মাথাটা নামিয়ে নিলেন। ভিখিরির মতো ভিক্ষা চেয়ে উঠলেন, "ও

পলাশ! আব্বা আমার! আমার মেয়েটাকে ছেড়ে দাও, আব্বা। ও বাচ্চা মানুষ। পাপ আমার ছেলে করেছে, আমি করেছি জন্ম দিয়ে। ও তো কিছু করে নাই আব্বা। তুমি কী করছো ওর সাথে? আমার মেয়ের পর্দা কই? ও ছোট মানুষ বাপ! ওরে ছাড়ো। তুমি আমাকে মারো, ও পলাশ! আমাকে মারো, দেখবে ঠিক অন্তিক আসবে। তুমি আমাকে আরও মারো, পলাশ। পলাশ শোনো, আমি আমার সব দিয়ে দেব। তুমি কত টাকা পাও, তার ডাবল ডাবল দেব। পলাশ..'' তার বলা কিছু শব্দ বোঝা গেল, কিছু আর্তনাদ অস্পষ্ট জমা হলো কুয়াশাচ্ছন্ন প্রকৃতির হাওয়ায়

বোধহয়।জয় একদৃষ্টে চেয়ে ছিল আমজাদ সাহেবের দিকে। ওর ভেতরটা রাগে নাকি হিংসায় অথবা জিদে জ্বলে উঠল। ও-ও মার খেয়েছে। কতবার কতভাবে মার খেয়েছে! শরীরে বিভিন্ন স্থানে বাঁশসুই গাঁথা হয়েছিল, তার ওপর লবন না দিয়ে পার্টির ছেলেরা বিট-লবনের গুড়ো ছিটাতো। খুব চিৎকার করেছে জয় বন্ধ ঘরে। কই কেউ তো বলেনি সেদিন, 'বাপ! ছেলেটাকে ছেড়ে দাও? আর কষ্ট দিও না আমার জয়কে!' ন্যাকামি যত্তসব! জয় কি বেঁচে নেই? সেসব আঘাতের দাগ এখনও আছে শরীরে। এখন ওর রাজ চলে পুরো দিনাজপুরসহ এই বাঁশের হাটে। ওর

পিঠ বাঁকিয়ে হিপবোনের ওপরে কোমড় সংলগ্ন কশেরুকাতে টান ফেলা হতো, তা চিকিৎসা করতে পিঠে স্টেইনলেস রড ঢুকিয়ে কতদিন হাসপাতালের বেডে মরার মতো ফেলে রাখা হয়েছিল ওকে। ওর তো বাপ-মা কেউ আসেনি! বেশি পরিমাণ ড্রাগ দেয়ার ফলে কান-নাক এমনকি চোখের পানির সাথে রক্ত উঠে আসতো। তার জন্য এভাবে কেউ কাঁদেনি। শুধু হামজা প্রতিবেলা ঢাকা মেডিকেল কলেজ যাতায়াত করতো। তরু তখন ছোট প্রায়, সে থাকতো জয়ের পাশে। এই অবস্থায় মেয়ের জন্য এত ছটফটানি বাপের? বাপেরা কি এমনই হয়? সব বাপ?

তাইলে তার বাপ কেন তাকে ফেলে রেখে ওপারে চলে গেছে? ফেলে গেছে তাকে এই দুনিয়ায় নষ্টামি কোরে বেড়ানোর জন্য? ঢোক গিলল জয়। দুই ঢোক মদ গিললো। হিংসা হচ্ছে অন্তূর ওপর, ঘেন্না আসছে। ওই মেয়ে বহুতবার অপমান করেছে ওকে ভার্সিটিতে। আজ অন্তূও অপমান হয়েছে, বাঁচাতে যায়নি জয়। শোধ।পলাশ অন্তূর হাতটা আরও শক্ত করে ধরে হাসল, "কাকা! ডাক্তার, কসাই আর আমরা যদি মানুষের অনুরোধে গলি, তাইলে এসব পেশা ছেড়ে ট্রাস্ট এনজিও খুলতে হবে। যেখানে মানুষ-গরু সব ধরণের প্রাণির জান বাঁচানো হবে, তাদের সব ইচ্ছা

পূরণ করা হবে। ডাক্তার প্রতিদিন হাজার রোগীর মৃত্যুর ঘোষনা দেয় হাতের পার্লস চেইক করে, তাদের মাঝে সব রোগীর আত্মীয়রাই চেঁচায়ে কাঁদে, সেখানে কোনো একজনের কাঁদা বিশেষ লাগার চান্স আছে? কসাইয়ের ক্ষেত্রেও তাই। সব গরুই ছটফটায়, উঠে পালাতে চায়, তাই বলে কি সে জবাই করে না? আমাদের কাহিনিও সেম। আপনার মাইয়াডারে ভাল্লাগছে। সুন্দরের কাছে সকলে কাবু, আমিও। মাইয়াডারে দেন, সব মাফ।"

আমজাদ সাহেবের বোধশক্তি ড্রাগের প্রভাবে বিলুপ্ত প্রায়। পলাশ একটা চমৎকার প্রস্তাব

দিলো, “কাকা! আমার অনেকগুলো হোটেল আছে, জানেন তো। অনেক মেয়েরা কাজ করে সেইখানে। মানে বুঝতে পারতেছেন, আমি কী বলছি? আপনাদের এত অভাব। আপনার মেয়ে ভালো আয় করবে।”

আমজাদ সাহেব ঢলে পড়লেন মেঝের ওপর। ঢিপ করে আওয়াজ হলো, যখন তার মাথা ছাদের ওপর পড়ল।

পলাশ অন্তূর কাধে নিজের মাথাটা রাখে জোর কোরেই। কুকুর যেমন গন্ধ শোঁকে, ওভাবে নাক টেনে বিশ্রী আওয়াজ করে মুখ দিয়ে। অন্তূর হাতের যেখানটায় পলাশ চেনে ধরেছিল, সেখানকার শিরাগুলো ফুলে উঠেছে,

রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। অন্তূর এরই মাঝে নিজের ওপর তাচ্ছিল্য হয়। সিনেমায় এমন দৃশ্য দেখে মানুষ, বাস্তবে তো আড়ালে ঘটে এসব, তাই মানুষ প্রাক্টিক্যালি দেখতে পায়না। আচ্ছা! আঁখির সাথে কী হয়েছিল? এরাই কি করেছিল সেসব? যারা এদের শিকার হয় তারা আর বেঁচে থাকে না মানুষকে তাদের ওপর হওয়া অত্যাচারের বর্ণনা করার জন্য! তাই মানুষ কঠিন সত্যিগুলোকে আজ সিনেমার দৃশ্যের নাম দেয়।

পলাশ হাত ছেড়ে একহাতে অন্তূর চুলগুলো মুঠো কোরে ধরে অপর হাতে অন্তূর কোমড়টা

পেঁচিয়ে ধরল। নাকটা অন্তূর গলার সাথে ঘঁষল একবার খুব আরাম করে।

জয় উঠে দাঁড়ায় চট করে, "ছাড়েন, ভাই!"

পলাশ শুনলো না। জয় মনোযোগ দিয়ে হাতের নখের কোণা কাঁমড়ে নখ কেটে বলল, "ছাড়েন, ছাড়েন। ছেড়ে দেন ওকে।"কথা শেষ কোরে চোখ তুলে তাকাল এবার। অন্তূ চোখ বুজে আছে। ঝরঝর কোরে পানি পড়ছে চোখ বেয়ে। ঘেন্নায় চেহারাটা কুঁচকে আছে।

জয় ডেকে উঠল, "পলাশ ভাই!

পলাশ পেছন ফেরে, "হু!"

-"ছাড়েন ওরে। আর দরকার নাই। এ-ই যথেষ্ট। আর না। ও বিরক্ত হচ্ছে মনে হয়।"

পলাশ খুব তৃপ্তি কোরে হাসল, “চুপচাপ গিলে যা আপাতত, পরে ভাগ দেব।”

জয় উঠে এগিয়ে গিয়ে শান্ত হাতটা পলাশের হাতের ওপর রাখে, “ভাই! ছাড়েন ওরে। ছাড়তে বলতেছি আমি।”

উহ্য-লুকানো জিদ জয়ের স্বরে। পলাশও জিদ কোরে শক্ত কোরে চেপে ধরতে যায় জয়কে। ওর ছেলেরা পজিশন নিচ্ছে নিজেদের।

আচমকা জয় জানোয়ারের মতো গর্জে উঠল, “ছাড়! ছাড়তে বলতেছিনা? ছাড়!”

পুরো রুফটপ কম্পিত হয় সেই স্বরে।

একদম গুমোট হয়ে উঠল পরিবেশটা। ক্ষেঁপা মহিষের মতো শ্বাস ফেলল জয়।পলাশের

হাতটা খামছে ধরে অন্তূর কোমড় থেকে সরিয়ে দেয় জয়। তার চেহারা দেখতে তখন মানুষের মতো লাগছিল না। জেদে বেসামাল। অন্তূর হাতটা তখনও পলাশের থাবায়। জয় পলাশের হাতের ওপর নখ গেঁথে দিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করল যেন, "ছেড়ে দেন পলাশ ভাই, জিদ উঠতেছে আমার।"

পলাশ হেসে উঠল, "জয়, আমি জানি তুই ক্ষ্যাপা। তবে পাগল বা বোকা না। ও এখন আমার জিনিস। আমি কী তুই জানিস। কিন্তু এখন এইরকম বোকামি করতেছিস ক্যান ভাই? কার সাথে কী করতেছিস, হুশ আছে?

একটা মা*গীরে ছাড়াইতে তুই ...কেমনে কী জয়? আমার সাথে ..''জয় পলাশের হাত মুচড়াতে মুচড়াতে বলল, "ব্যাপার সেইটা না, পলাশ ভাই। আপনি ওরে ধরেন, সমস্যা তো নাই। আপনার ইচ্ছে হইছে, আপনি ধরবেন । ধরবেন, এরপর যা মনে চায় করবেন। পারলে টেনে-টুনে ছিঁড়ে ফেলবেন। অ্যাবসিউলুটলি আই জাস্ট ফা-কিং ডোন্ট কেয়ার এবাউট দ্যাট। বাট, আপনি আমার কথা শুনবেন না? ভিত্রে কেমন জানি শুয়োর নাচতেছে, ভাই। মন চাচ্ছে সবগুলারে একদম ছেঁচে ফেলি! আপনার ইচ্ছে হইছে, আপনি ওরে ধরবেন। কিন্তু আমি যে বললাম,

ছাড়েন। এই কথা মানার জন্য আপনার ওকে ছেড়ে দেয়ার ছিল। ওকে ধরাটা সমস্যা না। আমি যে বললাম, ছাড়েন, এইটা আপনি শুনতেছেন না, এইটা সমস্যা! একবার না, কয়েকবার কইছি ছাড়তে!''

পলাশের লোকেরা ক্ষিপ্র পায়ে এগিয়ে আসে জয়ের দিকে। চারপাশে তখন ঘন অন্ধকারের কুয়াশারা ভিড় জমিয়েছে। জয় খিঁচে এক টান মেরে অন্তূকে ছাড়িয়ে নেয় পলাশের হাত থেকে। পলাশ অল্প ছিটকে পড়ল। জয় পেছনের শার্ট উঁচিয়ে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের কোরে হাতে রাখতেই সকলে একটু পিছিয়ে গেল।

অন্তূ দৌঁড়ে গিয়ে বসে পড়ে আব্বুর পাশে। অল্প আলোতে দেখতে পায় আব্বুর কানসহ বিভিন্ন স্থানে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে সিগারেট ঠেকিয়ে। ত্বক ঝলসে গেছে সেসব স্থানের। অন্তূর চোখের সামনে ভাসছে, যখন আব্বুর কানে জলন্ত সিগারেটের হল্কা চামড়া বিদীর্ণ করে ক্ষত তৈরি করছিল, তখন কেমন লেগেছিল আব্বুর! আর্তনাদ কোরে থামতে বলেছিল ওদের?জয় পিস্তলের ব্যারেল টেনে বুলেট লোড কোরে নিলো। পলাশের চোখ মৃদু আলোতে জ্বলজ্বল কোরে উঠল। মুখে সেই প্যাচপ্যাচে হাসি। যা দেখতে ভীষণ ভয়ংকর লাগে। যেন সূর্যগ্রহণের রাত, তার

ওপর পলাশের মৃদু আওয়াজের অমানুষিক হাসি রাতটাকে কলুষিত নাম দিচ্ছিল। পলাশ বলল, "জয়! আমি কিন্তু, পলাশ আজগর! আমার মাথা সব সময় ঠান্ডা, বাপ! একদম বরফের মতোন ঠান্ডা। আমার ইশারায় মানুষও ঠিক ওইভাবেই রক্ত জমাট বেঁধে মরে।"

জয় হেসে ফেলল, পিস্তলের মুজেল দিয়ে গলা চুলকে বলল, "পরশুদিনের ভোটকেন্দ্রে আপনার মতো পলাশ আর মাজহারের মতো খা-ন-কির ছাওয়াল যদি দুই-হাজারও উপস্থিত থাকে। আমি জয়, আমি জয় আমির এক এক হাজারের মাঝে একেকশো কোরে লাশ

বিছাবো। তাই দেখবেন বাকি নয়শোরা ওদের জানাজায় উপস্থিত হবে, গন্ডোগোল করার কেউ থাকবে না। সুষ্ঠু, স্বাভাবিক ভোটে হামজা পাটোয়ারী পরশুদিন মেয়র নির্বাচিত হবে।”

জয় পিছিয়ে এসে অন্তূর কাছে ঝুঁকলো, "আরমিণ! দ্রুত ওঠাও তোমার বাপকে। আমরা বের হবো জলদি। দ্রুত..”

কথা শেষ হলো না। এক খাবলি থুতু এসে মুখে পড়ল জয়ের। অন্তূ বলে উঠল, "তোদের মতো জানোয়ারের বাচ্চাদের মাঝে কারও সাহায্য লাগব না আমার। তোর মতো জারজদের কারও বাপকে বা মেয়েকে বাঁচাতে

হবে না।”পলাশের সরু হাসির আওয়াজ পাওয়া গেল। সাথে লোকগুলোও হাসছে জয়ের অবস্থা দেখে। জয় আরও চমৎকার কোরে হাসল। অন্তূর ওড়না তুলে মুখের থুতুটুকু মুছে আরও সুন্দর কোরে হাসল, “তুমি আমায় থুতু দিলে, তোমাকেও লোকে থুতু দেবে, সত্যি বলছি। তবে সেসব ঋণ মিটমাট পরে হবে।” এবার একটু আওয়াজ নিচু করল জয়, “কিন্তু এখন ওঠো, জলদি। হাজার হোক, আমি একা। পিস্তলেও যদ্দূর সম্ভব বড়জোর দুইটা বুলেট আছে। আমি ফাইটিং পারি না অত ভালো। ওঠো, দ্রুত ওঠো। আমি সাহায্য করবো তোমার বাপরে

উঠাইতে?''বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এলো ওরা, তখন ইশার আজান পড়ছে চারদিকে। কুয়াশাচ্ছন্ন প্রকৃতি। ঠান্ডায় অন্তূ থরথর কোরে কাঁপছিল, কিন্তু চেহারা উদ্দীপনাহীন। ক্ষত-বিক্ষত আমজাদ সাহেবের অচেতন বিশাল দেহটা বহন করা মানসিকভাবে ক্ষত-বিক্ষত অন্তূর পক্ষে অসম্ভব। আমজাদ সাহেব এখন পুরোপুরি অচেতন।

সিঁড়ি দিয়ে যখন উনাকে নামাচ্ছিল জয় বলল, "এইখানে নিয়ে আসার অল্পক্ষণ আগেই ড্রাগ দেয়া হইছে হয়ত।''

অন্তূ তাকাল না। তার ভয় হচ্ছে। জয় এখন তাকে কোথায় নিয়ে যাবে? সে এক কুকুরের

কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে আরেক নেকড়ের সাথে পথ চলছে না তো! অন্তূর শুধু চোখের সামনে ভাসছে, জয়ের চোখের সেই লোলুপ দৃষ্টি–যখন তার পর্দা হটানো হচ্ছিল, কী বিশ্রী আগ্রহ নিয়ে চেয়ে ছিল জয় আমির!জয় যখন আমজাদ সাহেবকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে আসছিল, পলাশ কিছু বলেনি। হয়ত পিস্তল অথবা জয়ের ক্ষ্যাপা স্বভাবের জন্য বলেনি তৎক্ষণাৎ কিছু। অথবা রহস্য! জয়ের জানা নেই পলাশের শিকার ছিনিয়ে নেয়ার পেক্ষিতে পলাশ কী করতে পারে পরবর্তিতে।

সিঁড়িটা ঘুটঘুটে অন্ধকার ছিল। একবার পা ফসকালে তিনজনই ঘাঁড়ের শিরা ছিঁড়ে মরার

চান্স ছিল। জয় আমজাদ সাহেবকে নিজের লম্বাটে শরীরের সাথে ঠেকনা দিয়ে দাঁড় করিয়ে পকেট থেকে মোবাইল বের কোরে ফ্লাশ অন কোরে অন্তূর হাতে দিয়ে বলেছিল, "ধরো এইটা।"

অন্তূর বুকের ধরফড়ানি তখনও থামেনি, আর না ঘেন্নার আগুন নিভেছে। তবু সে যান্ত্রিক হাতে ধরল ফোনটা। গোটা ঘটনাটার হিসেব মিলছে না। তার মনে হচ্ছে, এখানে যা দেখা গেছে, তার চেয়ে বেশি অদৃশ্যমান ঘাপলা ঘটনাটিতে ভরপুর।অন্তূ আব্বুর একটা বাহু আগলে ধরে হাঁটছিল। আমজাদ সাহেব অচেতন, ব্যথা বোধহয় টের পাচ্ছেন না। কিন্তু

অন্তূর বুকের ব্যথা উপশমের ওষুধ কোথায়? এই বিদারক ঘা কি জীবনে ভরাট হবে? জয়ের হুট কোরে তার মাথায় এলো, সে এসব করছে? কেন? ননসেন্স কাজকর্ম সব। সে যুব-সেবক হিসেবে এসব করতেই পারে! তবে সেটা খেয়ালমতো! তাই বলে আরমিণের বাপের সাহায্য? একবার তীব্র ঘৃণার চোখে দেখল আরমিণকে। চোখদুটো আক্রোশে জ্বলজ্বল করে উঠল।

অন্তূ টের পেল ঠান্ডায় অথবা আতঙ্কে তার হাত এবং হাঁটু বিশেষত, খুব বাজেভাবে কাঁপছে। শরীরের চাদরটা ওখানেই ধস্তাধস্তিতে পড়ে গিয়েছিল। এখন এক

টুকরো ওড়না আছে বুকে। মাথায় কিছু নেই। সে অল্প একটু ওড়না তুলে মাথায় রাখল। অভ্যাসবশত, যেই মুখটা আবৃত করার জন্য আপনা-আপনিই হাতের ওড়না মুখে উঠে যাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে হাত নামিয়ে ফিক কোরে হেসে ফেলল, চোখে এসে পানি জমলো এক দলা।ভেতরের যন্ত্রণারা ধিক্কার দিলো ওকেকে, "বোকা মেয়ে! তুই তো জবাই হয়েই গেছিস! তোর আর কিছু বাকি আছে? মুখ ঢেকে এখন আর নাটক না করলেই নয়? যা সংরক্ষিত রাখতে হয়, তা শতভাগ অক্ষত রাখতে হয়। সেখান থেকে এক রত্তি দানা খসলে পুরো সংরক্ষণের মান হারায়, সেটা অসংরক্ষিত হয়ে

ওঠে। এই আবরণ খোলার পর তা দর্শনে কতকগুলো পুরুষ মজা লুটেছে! নাটক না কোরে সামনে হাঁট। বাইশ বছরের এই সংরক্ষণের খোলশে আজ ইঁদুর ঢুকেছে। তাও সেই ইঁদুর তাড়িয়েছে কে জানিস? আরেকটা পশু। যে তোকে ধরলে হয়ত শুধু তোর সম্ভ্রমই নয়, বোধহয় গোটা তোকে খাবলে খেয়ে ফেলবে।''বাঁশের ঝাড়টার দিকে তাকিয়ে লম্বা লম্বা টান দিচ্ছিল মুস্তাকিন সিগারেটে। সামনে চোখ যেতেই মনে হলো, অন্তূ আসছে। একা নয় সে, তার পাশে আরও দুটো পুরুষ অবয়ব চট করে হোলস্টারে হাত গেল। পিস্তলটা বের কোরেই তাক করে

ধরল। জয় হেসে উঠল, “আরে! আরে! মুস্তাকিন সাহেব যে!”

হাসি থামিয়ে মিছেমিছি গম্ভীর হলো, “ভেতরে যাননি কেন? আর একটু হলেই খানিক পর তিনটা লাশ উদ্ধার করতে হতো আপনার! আমাদের কথা না-ই বা ভাবলেন, অন্তত লেডিস..”

এই পরিস্থিতিতেও এমন নোংরা মশকরা... অবশ্য জয়ের কাছে আশা করাই যায়। অন্তূর দিকে তাকিয়ে মুস্তাকিনের মুখ কালো হয়ে এলো। পর মুহুর্তে দ্রুত আমজাদ সাহেবকে আগলে নিলো জয়ের কাছ থেকে। অন্তূর মুখটা মুস্তাকিন প্রথমবার দেখল। ক্ষণকাল

চোখ ফেরালো না। জয় সিগারেট ধরিয়ে একপাশে গিয়ে দাঁড়াল।আমজাদ সাহেবের নড়বড়ে দেহটা দুজন কনস্টেবলের ভারে দিয়ে শরীরে থাকা চাদরটা খুলে অন্তূর দিকে এগিয়ে দিলো। অন্তূ যন্ত্রের মতো হাত বাড়িয়ে চাদরটা নিয়ে গায়ে জড়িয়ে নেয়। মুস্তাকিন প্রায় রুষ্ট কণ্ঠে বলল, "মুখ ঢেকে নিন, অন্তূ! ওখানে কী হয়েছিল পরে শুনছি।"

অধিকারবোধ অথবা কর্তব্য! যাই হোক, ছিল মুস্তাকিনের স্বরে।

জয় মুস্তাকিনকে বলল, "তোহ! যান তাইলে আমার গাড়ি আসবে। ভিআইপি লোক তো!" চোখ মারল কথা শেষে।

মুস্তাকিন হাসল, "খুব শীঘ্রই দেখা হবে।"

জয় মাতালের মতো কাধ দুলালো।

ওরা চলে যেতেই জয় পেছনে তাকায়।

পুরোনো দুতলার রুফটপ থেকে পলাশের জ্বলজ্বলে চোখদুটো যেন জয়কেই দেখছিল।

পুরো দলসহ দাঁড়িয়ে দেখছে এদিকের কাণ্ড।

আমজাদ সাহেবকে একটা প্রাইভেট হাসপাতালে ভর্তি করালো মুস্তাকিন। সে লোক পাঠিয়েছে রাবেয়াকে আনতে।

রাত দশটা বাজবে। অন্তূ বসেছিল বেঞ্চের ওপর। বেশ কিছুক্ষণ নির্লজ্জের মতো দেখল মুস্তাকিন মেয়েটাকে। আসলেই যা সহজে পাওয়া যায় না, তা হুট কোরে পেলে মানুষের

আগ্রহ পেয়ে বসে। মুস্তাকিনও রেহাই পেল না সেই আগ্রহ থেকে। অন্তূকে দেখা যায়না, আজ যাচ্ছে। যদিও বিষয়টা মুস্তাকিনের ভালো লাগছিল না।

ধীরে হেঁটে এসে অন্তূর পাশে বসল।

রক্ত শুষে বেরিয়ে গেলে মানুষের মুখের বর্ণ বোধহয় অন্তূর মতো হয়! প্রাণ নেই মুখে, উদ্দীপনার বড্ড অভাব। হাঁটুর ওপর দুহাত একত্র কোরে থুতনিতে ঠেকিয়ে আনমনে চেয়ে আছে। অন্তূর দেহ সেখানে বসা ছিল, তার নজর ছিল না এই জগতের কোথাও! প্রথমে কিছু বছর অন্তিকের অস্বাভাবিক হয়ে যাওয়া। তারপর সেদিন তার নিখোঁজ হওয়া।

এরপর আব্বুর। এরপর অন্তূকে ডাকা। বাকিটা আরও ঘোলাটে। জয়ের আচরণ আরও রহস্য বাড়িয়ে দিচ্ছে। হিসেবটাকে সাধারণভাবে সমাধান করা যাচ্ছে না। কোথাও একটা কিন্তু থেকে যাচ্ছে।

-“স্যারকে ওরা কেন নিয়ে গিয়েছিল?”

মুস্তাকিন ঝুঁকে বহল মেঝের দিকে।

-“কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।”

একরোখার মতো বলে উঠল মুস্তাকিন, “আপনার ইচ্ছেটাকে প্রাধান্য দিতে ইচ্ছে করছে না আমার। বলুন।”

অন্তূ সেই নিস্তেজ স্বরেই কিছুক্ষণ পর বলল, "ইচ্ছে দুজনের দুটো। কারটাকে প্রাধান্য দেব?"

-"আমারটাকে!"এ পর্যায়ে জেদি লাগল মুস্তাকিনকে।

-"জোর করছেন?"

চোখ তুলে তাকাল অন্তূ। মুস্তাকিন চমকে উঠল। ভয়ানক সেই চোখ। লাল টকটকে। এক ধরণের জেদ ও যন্ত্রণার সংমিশ্রণে ভরপুর।

-"যা ভাববেন তাই। কী হয়েছিল ওখানে?" একটু থেমে অপরাধীর মতো বলল, "আমার উচিত হয়নি, সময় এক ঘন্টা দেওয়া। আমি

ভাবছিলাম, সাধারণ কিডন্যাপিং কেইস।

''-“গিয়ে কী করতেন?''

-“কিছুই করার ছিল না বলে মনে হয় আপনার? এইহাতে মার্ডারও করেছি, ম্যাডাম! যখন উপরমহল থেকে ঘুষ খেয়ে আমাকে অর্ডার করা হয়েছে প্রমাণ নষ্ট কোরে আসামী ছেড়ে দিতে, রাতের অন্ধকারে লাশ বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছি আসামীদের। সিনিয়রদের কথা অমান্য করিনি।'' মুস্তাকিনের কথাবার্তা উগ্র লাগছিল শুনতে, সেই চেনা ভদ্রলোককে ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে এক গোপন বিপ্লবী সত্ত্বা। অন্তূ কথা বলল না। তার নিজের কথা ভাবার অবকাশই নেই মস্তিষ্কে। সবটুকু জায়গা ভিড়ে

আছে আব্বুর কানের সেই সিগারেটে পোঁড়া ক্ষত।

ছুটে পালাতে ইচ্ছে করছিল কোনোদিকে। এই নোংরা দেহ, কুলষিত জীবনকে ফেলে নির্জন জনমানবশূন্যের দিকটা তাকে ডাকছিল। চোখের সম্মুখটা অন্ধকার হয়ে এলো যখন, তখন ওপার থেকে আমজাদ সাহেব ডাকছেন। ওই তো আমজাদ সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। আরে! পরনে সাদা ধবধবে পাঞ্জাবী! এত্ত অভিজাত লাগছে আব্বুকে দেখতে। অন্তূ ছুটে যায় আব্বুর দিকে। আব্বুর ডান হাতের তর্জনী আঙুলটা চেপে ধরে তারা হেঁটে যাচ্ছে। যাচ্ছে, যাচ্ছে, তারা

চলছে.. আর আসছে না দৃশ্যটা। সবটা অন্ধকার। রাত হয়ে গেছে। এই তো সবে বসন্তের বিকেল ছিল। এত্ত তাড়াতাড়ি রাত নামল? সব ফুরিয়ে গেল!মুস্তাকিন চমকে উঠল। ধপ কোরে পড়ে গেছে অন্তূর শরীরটা বেঞ্চি থেকে উপুড় হয়ে। ওকে ধরে উল্টাতেই মুস্তাকিন থমকাল। অন্তূর নাক বেয়ে রক্তের প্রবাহ নেমেছে। ঠোঁটের কাছে দাঁত আঁটকে আছে! দাঁত ছাড়ালে নিশ্চিত ঠোঁট কেটে রক্ত বেরিয়ে আসবে।

ডাক্তার পার্লস রেট চেইক করতে কব্জি ধরেই বললেন, "কীসের ট্রমায় আছে এইটুকু মেয়ে!

পোশাকের এই হাল কেন? আপনার কে হয় মেয়েটা?''

মুস্তাকিন জবাব দিলো না। কে হয় অন্তূ ওর? জানেনা ও।অন্তূকে জানানো হলো না মুস্তাকিনের, আঁখির কেইসটা হাতে নেয়ার পর পলাশই তাকে হুমকি দেয়া চিরকুট পাঠিয়েছিল। ফোনকলে বাজে ভাষায় গালি দিয়েছিল, খুন করার ধমকি দিয়েছিল। আঁখির রেপ এবং মার্ডারের সাথে অতপ্রোভভাবে জড়িত পলাশ! তবে সে একা নয়। আরও কেউ বা কারা আছে।-‘‘মেয়েটা আপনার স্যারের মেয়ে, তাই তো?''

মুস্তাকিন মৃদু মাথা নাড়ল।

ডাক্তার কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, “দেখুন অফিসার! আপনি নিজেই যেখানে উপস্থিত সেখানে পুলিশ কেইসে যাবার আগে আপনার সাথে আলাপ করে নিচ্ছি। মেয়েটার কথায় পরে আসছি। ওর বাবার শরীরে ভালো মাত্রার বুপ্রেনরফিন ড্রাগ ইঞ্জেকশন পুশ করা হয়েছে। সাথে যে চোরাই-আঘাতের চিহ্নগুলো রয়েছে দেহে, পর্ববর্তীতে সেসব স্থানে টিউমার এবং তা থেকে ক্যান্সারের সৃষ্টি অবধি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বুঝতে পারছেন, কেমন চোরাই মারের শিকার হয়েছেন লোকটা? কিন্তু এসব কারা করেছে, কেন করেছে? এই প্রশ্ন উঠলেই চিকিৎসকবাদী

কেইস ফাইল করা আমাদের কর্তব্য। সেটা আপনার জন্য ঠেকে রইল। এরকম একটা কেইসে আমরা এভাবে চুপ থাকিনা। কিন্তু যেখানে স্বয়ং আপনি.. তবুও থানায় জানাতে..''

মুস্তাকিন ব্যস্ত হয়ে উঠল, "বুঝতে পেরেছি। ওসবের আর দরকার নেই। অন্তূ...মানে মেয়েটার কী অবস্থা, সেটা বলুন, ডক্টর! ''-"গভীর ক্ষত মানসিকতায়। কোনো ঘটনা তাকে আঘাত করেছে, যা তার জন্য একযোগে নেয়া বোধহয় কঠিন হয়ে পড়েছে। আমরা বোকা নই, অফিসার। ওর কন্ডিশন যেটুকুই দেখেছি, এবং গেট আপ যা ছিল

এখানে আসার পর, আই থিংক ওকে রেপ করার চেষ্টা করা হয়েছে। পরনে বোরকা ছিল, তাও অক্ষত নয়, আবার ওর বাবার এই হাল...আপনারা কি কিছু লুকোতে চাচ্ছেন? একটা মেয়ের জন্য ব্যাপারটা মরণসম প্রেশার-ইমপেক্টেড তার মানসিকতার ওপর। আপনারা ব্যাপারটাকে ফ্যান্টাসি হিসেবে নিচ্ছেন যেন! কোনোরকম পদক্ষেপ নেই, আমি বুঝতে পারছি না বিষয়টা। এ নিয়ে কোনো ঝামেলা হবে না তো? ব্যাপারটা ব্যাপক গোলমেলে। মানে...''

মুস্তাকিন থামালো, "রিল্যাক্স, ডাক্তার সাহেব। আসলে আমি নিজেও পুরোটা জানিনা।

হয়েছে অনেক কিছু তা আমিও জানি, তবে.. অন্তূর এক্সাক্ট অবস্থাটা জানতে চাচ্ছি। আমিও জানিনা কী হয়েছে! ওর কী অবস্থা?''

-“মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছে। প্যানিক অ্যাটাক হচ্ছে বারবার। ম্যান্টালি প্রেশার ফিল করছে অতিরিক্ত। যে কারণে বিভিন্ন ধরণের হ্যালুসিনেশন ক্রিয়েট হচ্ছে ওর সামনে। ইল্যুশন আসছে মস্তিষ্কে। সি নিড'স মেন্টালি সাপোর্ট এন্ড লটস অফ রেস্ট।'নির্বাচনের সকালে ঘুম ভাঙল দশটায়। এখনও অবধি বাইরে সব ঠিকঠাক। দলের কাউকে কোনো কেন্দ্রে এজেন্ট হিসেবে রাখেনি হামজা। কারচুপির বদনাম ছাড়া বিপুল ভোটে জিততে

চায় সে। শুরুতে ক্যারিয়ারটা সর্বোচ্চ দাগমুক্ত রাখতে হবে। সামনের ধাপগুলো মানুষের আস্থা নিয়ে এগোতে হবে।

ঝন্টু সাহেব নির্বাচনে নেই। মাজহারের শরীর এখন পুরোপুরি ভালো না, তবে টুকটাক চলাচল করতে পারছে। সবকিছুর বদলা হিসেবে আজ ভোটকেন্দ্রগুলোতে খুব খারাপ কিছু ঘটার চান্স রয়েই যায়। আবার সারাদিন না হোক, ভোট গণনা অথবা ঘোষনার পরেও ঝামেলা হতে পারে।তুলি এসে বসল হামজার পাশে, “ভাই! কোয়েলের দুধ ফুরিয়ে গেছে, একটু কাউকে পাঠা দুধ এনে দিতে।”

হামজার সাথে তুলির সম্পর্ক ভালো না। আগে ছিল, এখন নেই। এখন দুজন দুজনের সাথে কথা বলতেও আঁটকে যায়। সীমান্ত মন্ডলের সঙ্গে পালিয়ে বিয়ে করার পরিণামে দুই ভাই-বোনের এই দূরত্ব। সীমান্তর এত মারধর সহ্য করেও তুলি ও বাড়িতে রয়ে গেছিল, হামজা আনতে যায়নি, আসলেও বলে না চলে যেতে। হামজা তুলির কাছে বাচ্চাদের মতো অনুরোধ করেছিল, সীমান্তকে ভুলে যেতে। এরপরেও তুলির এই পদক্ষেপ হামজাকে বহুদূরে টেনে এনেছে।

জয় উঠে এসে ঝারি মারল একটা, “কাঁদছে কেন মেয়ে? দুধ ফুরিয়ে যাবার পর বলার

কারণ কী? সেই সময়টুকু কি দুধের পাতিল গুলিয়ে খাওয়ানোর পরিকল্পনা থাকে? এইসব বালবেটিরা বাচ্চা মানুষ করছে!''

তুলি কিছু বলল না। সে ব্যতিক্রম কিছু আশা করে না জয়ের কাছে। সাদা ধবধবে লুঙ্গি পরনে, যেটা দেখলে হামজা প্রায়ই বলে, 'তুই কি লালন ফকিরের ভক্ত? ওরা এমন কাফনের কাপড়ের মতো লুঙ্গি পরে।'

হামজা তখনও বসেছিল সোফাতে। চিন্তিত মুখ, উদ্বেগে ভ্রু কুঁচকে আছে। সোফাতে মাথা ঠেকিয়ে চোখ বুঁজে কপালে আঙুল নাড়ছিল। জয় কথা বলল না। হামজা সেদিনের পর আজ প্রায় দু'দিন কথা বলে না জয়ের সাথে।

এরকম বেহুদা কাজ যে জয় এই প্রথম করেছে, এমন নয়। বন্ধুত্বকে শত্রুতায় পরিণত করার হাত দক্ষ তার। তাও আবার অহেতুক সব কারণে এসব উল্টাপাল্টা কাজ করে বেড়ায়।রুমে গিয়ে লুঙ্গির ওপর খয়েরীরঙা একটা শার্ট পরে বেরিয়ে গেল বাইরে। গোয়ালার ফার্ম বাড়ি থেকে কিছুদূর হেঁটে। আজও নিচতলার ওয়ার্কশপে কাজ চলছে। রাস্তায় লোকজনের চলাচল দেখল। কেউ ভোট দিয়ে আসছে, কেউ যাচ্ছে। একটা অন্যরকম আমেজ দেখা গেল রাস্তায়, পোস্টারগুলো এখনও সেঁটে রাখা, অথবা ঝুলছে ওপরের তারে।

যাওয়ার সময় সাথে রাহাত ছিল। জয় হাঁটার সময় হাতে লুঙ্গি উঁচিয়ে ধরে হাঁটে। লম্বা ছিপছিপে জোয়ান শরীরে লুঙ্গিতে অন্যরকম অভিজাত্য ফুটে ওঠে তার শরীরে।পায়ে চামড়ার স্যান্ডেল, বেল্ট খোলা। হাতে একটা রুপোর বালা।

আশপাশের লোকেরা যারা হামজাকে ভোট দিয়ে ফিরছিল, হাত উঁচু কোরে বৃদ্ধা আঙুলের টিকা দেখিয়ে ঘাঁড় নেড়ে হাসল। রাস্তার উঠতি বয়সী ছেলেরা সালাম ঠুকল। দৌঁড়ে এলো কেউ কেউ হ্যান্ডশেক করবার জন্য। ডেইরি ফার্মের পেছনে মাজহারদের আস্তানা। সেখানে ঢুকতেই নাক কুঁচকে ফেলল রাহাত,

“ভাই! কোনে ঢুকতেছেন? বাইরে খাঁড়াইয়া দুধওয়ালা বেডারে ডাইকা আনি। গন্ধ লাগতেছে।”

জয় গুন গুন করে গান গাইছিল, ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি, জন্ম দিয়েছ তুমি মা, তাই তোমায় ভালোবাসি—গোয়ালের মাঝ দিয়ে গান গাইতে গাইতে দিব্যি হেঁটে এগিয়ে গেল ভেতরের দিকে। রাহাত বুঝল না, জয় ভেতরে কেন যাচ্ছে! গোয়ালাকে পাঁচ লিটার দুধ ভরে রাখতে বলে, লুঙ্গিতে কাছা মারতে মারতে এগিয়ে গেল ডেইরিফার্মের চারপাশে দেয়া উঁচু দেয়ালের

দিকে। তখনও গান গাইছে, "জয় বাংলা, বাংলার জয়, হবে হবে হবে হবে জয়... জয় আমির আর বাংলার জয়.." থেমে গেল, "আরে শালার!" আবার গান ধরল, "জয় বাংলা, বাংলার জয়..."

লুঙ্গির কাছা পেছনে গুজে একলাফে চড়ে গেল প্রাচীরের ওপর। অল্প একটু মাথা বের কোরে দেখল, ওপাশের মাঠে এক গোল মিটিং বসেছে। জয়ের ভাবনা ভুল হবার নয়। সেখানে মাজহার শুধু চেয়ারে, স্ক্র্যাচে ভর করে বসে আছে। পলাশকে ওখানে দেখে হাসি পেল জয়ের। এই দুনিয়ায় জাদু বলতে যদি কিছু থেকে থাকে তো সেটা মানুষের রূপ

পরিবর্তনের ব্যাপারটা। ম্যাজিকের মতো এক লহমায় নিজের পুরো ধারা বদলে আসল রূপে চলে আসতে মানবজাতি সময় নেয়না। এতদিন পলাশ স্বীকার করতো না যে তার মাজহারের সাথে সম্পর্ক ভালো, আবার তলে তলে হামজা ও জয়কে হাতে রেখেছিল নিজের শক্তি, কিছু গোপন ব্যাপার ও পার্টনারশিপ বহাল রাখতে। আরও একজন পিঠ এপাশ কোরে ঘাসের ওপর বসে আছে সেই মিটিংয়ে। তাকে দেখে জয়ের হো হো কোরে হাসি এলো। জোকারদের মুখোশ নেহায়েত মুখোশ। অথচ মানুষ যে মুখোশ পরে ভালো মানুষদের ধোকা দিয়ে তাদের

সাথ মিশে থাকে, এটা বোধহয় খুব সস্তা তবে শক্ত মুখোশ!জয়ের এই বিষয়ে গর্ব আছে নিজের ওপর, সে অন্তত নিজের নোংরামিগুলো সারাদিন সদিচ্ছায় স্বীকার কোরে বেড়ানোর বাহাদুরীটুকু আছে। সে কোনোদিন কারো কাছে নিজেকে ভালো প্রমাণ করতে চায় না, মিথ্যা রূপ প্রকাশ কোরে মানুষকে ধোঁকা দেয়াকে সস্তা, ছোটোলোকি কারবার মনে হয় তার। সে খারাপ, এটা তার বুক উঁচিয়ে বলার যে প্রবণতাটা আছে, নিজের সেই গুণটাকে সে ভালোবাসে।

দুধটা রাহাতের হাতে দিয়ে জয় ভোটকেন্দ্রের দিকে গেল। রাহাতের কাছ থেকে ছোট্ট একটা ড্যাগার নিলো প্রয়োজনে প্রতিরক্ষার জন্য। পেছন থেকে ডাকল, শোন!

-“কন ভাই।”

“বড় সাহেবকে গিয়ে বলবি, দ্রুত যেন তৈরি হয়ে বেরিয়ে আসে বাইরে। আমাদের অনুপস্থিতিতে নাটক জমাতে পারে প্রতিদ্বন্দ্বীরা। সেইগুলা দেখা লাগবে তো। ইট’স এন্টারটেইনমেন্ট।”নিঃশব্দ শীতের রাত। দেড়টা পেরিয়ে গেছে। ঘড়ির কাঁটার আওয়াজ কানে লাগছে। রাবেয়া বোধহয় তাহাজ্জুদের নামাজে বসেছেন।নিজের

বিছানায় শুয়ে আছেন আমজাদ সাহেব। পিঠে থেতলে মারা হয়েছে, শুতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। অন্তূ পায়ের কাছে বসে রইল চুপচাপ হাটুতে থুতনে ঠেকিয়ে। দুনিয়াটাকে পর মনে হয় তার খুব। মাথাটা শূন্য। জীবন এক নিষ্ঠুর খেলোয়াড় বুঝি!অন্তিক যেদিন বিয়ে কোরে আনলো, আমজাদ সাহেব ভৎসনা করেছিলেন তাকে। অন্তিক যবর ত্যাড়া ছেলে। বিশেষ কোরে তাকে তুচ্ছজ্ঞান করলে সে সইতে পারতো না ছোট থেকেই। সেদিন উনার তাচ্ছিল্যটুকু গভীরে লেগেছিল, অথচ সে বাপের সেইসকল কথার পেছনের ভালোবাসার শাসনটুকুকে এড়িয়ে গিয়েছিল।

জিদের বশে এমন বহু সত্য মানুষ কোরে এড়িয়ে যায়। অন্তিকের মাথায় ভূত চাপলো, সে প্রমাণ করে দেখাবে, সে রোজগার জানে, নিজের বউকে নিজে পালন করতে পারে। কিন্তু গয়নাগুলো মার্জিয়া এনে দিয়েছিল বাপের বাড়ি থেকে। মার্জিয়া অন্তিকের চেয়েও বেশি জেদি। অন্তূ নিশ্চিত, পুরোটা অন্তিকের না, বরং বেশির ভাগ উৎসাহ মার্জিয়ার। কারণ সেদিনের অপমান মার্জিয়াকে ঘিরেই করা হয়েছিল।সেই গয়না বন্ধক রেখে পলাশের কাছে সুদের চুক্তিতে টাকা নিলো অন্তিক। কিন্তু পলাশ কোনো যেনতেন মহাজন নয়, একেবারে নরক থেকে উঠে আসা এক

অভিশাপ। সুদের টাকা দেবার জন্য যে আয়টা দোকানে হওয়ার কথা, তা পলাশের ছেলেরা প্রতিদিন টুকটাক কোরে চাঁদা তুলেই খেয়ে ফেলতো। দোকানে ভাঁটা পড়তে শুরু করল। অন্তিকের নিজের ব্যবসা খাঁড়া করা তো দূর, পুঁজিই ফুরিয়ে যেতে লাগল। বাড়িতে কানাকড়ি আসার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ দোকানের মাল দিনদিন কমে আসল পুঁজি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছিল। অথচ তখনই পলাশের পুরো আসল টাকা, আর সপ্তাহের হিসাবে নির্দিষ্ট টাকার সুদ জমে জমে পাহাড় হচ্ছিল। অন্তিক লজ্জার মরণে এ কথা বাড়িতে বলার সাহস পায়নি। যতদিনে সে বুঝতে পেরেছিল

নিজের ভুল, ততদিনে আব্বুর সামনে এসে দাঁড়ানোর মুখ সে হারিয়ে ফেলেছিল। যে আব্বুকে টক্কর দিতে এতকিছু, সেই টক্করের খেলায় যখন তার ধ্বংস নেমে এলো, সে আর আব্বুর সামনে এসে দাঁড়াতে পারেনি।

দিনদিন মৃত হয়ে উঠছিল।

মার্জিয়া জেদি মেয়ে। তাকে সুখ দেয়ার ক্ষমতা ছিল না অন্তিকের। সে ঋণে ডুবে প্রায় মৃত। আবার মার্জিয়ার বাপের বাড়ির গয়নাও সে খেয়ে ফেলেছে, সে চাইলেও বউকে শাসন করতে পারেনি। বা সেই মানসিকতাই হয়ত ছিল না। শিক্ষিত ছেলেটা একটা সন্ত্রাস

মহাজনের কাছে এভাবে শোষিত হয়ে নিজের ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছিল খুব খারাপভাবে। মার্জিয়া সব জেনে শুধু গজরাতে পেরেছে। সে এ বাড়ির লোকেদের দায়ী করতো সে এই অবস্থার জন্য। অন্তূ এবং ওর বাবা-মাকে এজন্য সহ্যই করতে পারেনি কোনোদিন। অন্তূর গাল বেয়ে টসটসে গরম জল গড়িয়ে পড়ল। সেই কান্নায় আওয়াজ অথবা মুখের অঙ্গভঙ্গি নেই। এতকিছু হয়ে গেছে, অথচ কোনোদিন আন্দাজ করার সুযোগ পায়নি। ভালোবাসলে মূল্য চুকাতে হয়। আমজাদ সাহেব বাপ হিসেবে, সন্তানকে ভালোবাসার দায়ে এই মূল্য চুকালেন। কিন্তু সে? সে

কীসের দানে বলি হলো পলাশের হাতে? বোন হিসেবে? এরকম তো কথা ছিল না! তাহলে বড়ভাইকে গোপনে ভালোবাসার দায়! ছোটবেলার সেইসব সুন্দর খুনশুটির দায়? কীসের দায় চুকিয়েছে অন্তূ?দূর থেকে বোমাবাজির আওয়াজ আসছে। অন্তূ বুঝে আলতো কোরে ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল। নিশ্চয়ই জিতে গেছে হামজা! এই মাঝরাতেও তার উল্লাস যাপিত হচ্ছে! একের পর এক বোমা-আতশবাজি ফুটছে। বিকট আওয়াজে যেন ছাদের ওপর এসে পড়ছিল সেগুলো। কয়েকটা গুলিও ফুটলো। আমজাদ সাহেব নড়েচড়ে উঠলেন, তবে কড়া ওষুধের প্রভাবে

ঘুম ভাঙল না পুরো। তার খানিক বাদেই সেই মাঝরাতে বাড়ির সামনে দিয়ে বিশাল রবে মিছিল চলে গেল। এই উল্লাস ত্রাসের রাজত্ব শুরু হবার উল্লাস!শেষ রাতের দিকে থামলো উল্লাস। তবুও দূর থেকে ধুমধাম গানের আওয়াজ ভেসে আসছিল। পুরো দিনাজপুর মেতে উঠেছিল যেন উৎসবে! ভোজন চলছে, নাচানাচি হচ্ছে, এমন একটা আমেজ ঘরের ভেতর থেকেও টের পাচ্ছিল।

কাঁদার পরে মানুষ খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তার ওপর মানসিক চাপ। রাবেয়া জায়নামাজে শুয়ে পড়লেন। অন্তূ বসেছিল ওভাবেই। এটা চলে আসছে এমনভাবেই। সে অসুস্থ হলে

আমজাদ সাহেব ঘরে আসতেন না, বসে থাকতেন অন্তূর ঘরে সারারাত। রাবেয়া পাশে ঘুমিয়ে নিতো। আমজাদ সাহেব অসুস্থ হলে অন্তূকে বসে থাকে সেভাবেই।

একদম নিরব হয়ে গেছে পরিবেশ। তার ওপর ঠান্ডা আবহাওয়া, শীতের রাত। এমন এক ভৌতিক মুহুর্তে দরজায় করাঘাত পড়ল। করাঘাত যেন চাপা হাতে পড়ছে, হাত শব্দ বাঁচাতে চাইছে, সংকোচে জমে গেছে।

বেশ কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ ও ইতস্তত কোরে খুলতে উঠে গেলেন রাবেয়া। অন্তূর মস্তিষ্ক আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে উঠল।সে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, সাহসগুলো এক বেলায় দুমড়ে

রেখে দিয়েছে পলাশ ও জয় মিলে! প্যানিক কাটেনি। এখনও মনে হচ্ছে, এবার তার সাথে আবার কোনো নারকীয় ঘটনা ঘটবে। ধীর- স্থির পায়ে এক লম্বা পুরুষ ঘরে পা রাখল। তার পায়ে প্রাণ নেই, চোখের দৃষ্টিতে চঞ্চলতা নেই। নজর থেমে আছে বিছানায় শুয়ে থাকা লম্বাটে অসুস্থ শরীরটার দিকে। নিস্তরিৎ পায়ে এগিয়ে এলো বিছানার দিকে। অন্তূ তাকিয়ে দেখল না। শক্ত হয়ে বসল। এতক্ষণের আতঙ্ক দূর হয়ে, এক বুক ঘেন্না তার শিরদার বেয়ে নেমে যাচ্ছিল।

পুরুষ অবয়ব ধপ কোরে বসে পড়ল আমজাদ সাহেবের পায়ের কাছে। আস্তে আস্তে হাত

এগিয়ে দিলো উনার পায়ের ওপর। বহুদিন পর এই ঘরে প্রবেশ তার, আমজাদ সাহেবের এত কাছে আসা। ঝুঁকে বসে রইল বেশ কিছুক্ষণ। টপ করে এক ফোঁটা জল পড়ে আমজাদ সাহেবের পায়ের ওপর বিছানো কম্বলে। অন্তূ উঠে বেরিয়ে এলো রুম থেকে। আমজাদ সাহেব চুপচাপ চেয়ে ছিলেন। অন্তিক উনার অসুস্থ হাতদুটো জড়িয়ে ধরে হাতের ওপর কপাল ঠেকিয়ে বসে রইল। ছেলেদের কান্না টের পাওয়া যায় না। অন্তিক খুব জেদি ছিল, ছোট বেলায় আমজাদ সাহেব শাসন করার জন্য মারলে সে আর ভাত খেত না। কোনোভাবেই কেউ খাওয়াতে

পারত না, যতক্ষণ না আমজাদ সাহেব আবার আদর করে খাওয়াবেন। খাওয়ার আগে ঠিক এভাবেই আব্বুকে জড়িয়ে ধরে আহ্লাদ করে কাঁদতো।

কিন্তু সেদিন রাতে আমজাদ সাহেব কিছুই বললেন না। অন্তিকের ভেতরের যন্ত্রণা বাড়ছিল এতে। এরপর পা দুটো জড়িয়ে ধরে বসে রইল। সকাল হলো, সে পা আর ছাড়েনি। কতবার কতভাবে ছুঁয়ে দিচ্ছে আব্বুর আঘাতগুলো, পাগলের মতো প্রলাপ বকছিল। মার্জিয়াও এসে বসল একটু বেলা বাড়লে। জেদি মেয়েটার মুখেও রা নেই। অপরাধীর মতো মুখ কোরে বসে ছিল।বেলা

এগারোটার দিকে মুস্তাকিন এলো। আমজাদ সাহেবকে সালাম কোরে এসে দাঁড়াল, রাবেয়া চেয়ার এনে দিলেন। বসল না সে চেয়ারে, যে মাদুরটা পাতা ছিল, তাতে সবার সাথে পা গুটিয়ে বসে পড়ল। চেয়ারে বসে আছেন আমজাদ সাহেব। হুট কোরে অন্তূ কেন যেন একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা তুলে বসল, "আঁখির কেইসটা কতদূর এগোলো, অফিসার?"

-"কেইস টানার জন্য দড়ি লাগে, সেটার প্রান্ত হারিয়ে ফেলেছি। থেমে আছে, বলা চলে বন্ধ হয়ে গেছে।"

-"আপনি বলেছিলেন ওরা নাকি বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে?"

-“হ্যাঁ। আমি গিয়ে পাইনি। আপনি গিয়েছিলেন না?”

-“আমিও পাইনি।”

-“তাহলে যে জিজ্ঞেস করছেন?”অন্তূ কথা বলল না। তার মুখে পর্দা নেই, শুধু মাথায় ওড়না দেয়া। অন্তূ যতক্ষণ চুপ রইল আর কেউ কথা বলল না। সে নিজেই সময় নিয়ে বলল, “এর মাঝে তিনদিন অলরেডি কেটে গেছে, আজ চতুর্থ দিন। ওরা এই দু’দিনে কোনো মুভমেন্ট দেখায়নি। ব্যাপারটা জটিল। অন্তিক এখন বাড়িতে। যদিও আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আসলে কীসের জন্য কী হচ্ছে, তা ধারণা করতে গেলে মাথায় প্যাচ

লেগে যাচ্ছে। ওরা এবার বাড়ি চলে আসলে পুরো পরিবার শুদ্ধ টুকরো টুকরো কোরে কেটে রেখে যাবে, হয়ত। তাই আমি চাচ্ছিলাম, থানায় একটা ছোট্ট রিপোর্ট কোরে সাধারণ শালিসের মাধ্যমে পলাশের কাছে কিছুদিন সময় চেয়ে নিতে। যাতে কুড়িগ্রামের জমিটা বিক্রির জন্য আর খানিকটা সময় পাই।''

মুস্তাকিন একটু ভেবে বলল, "থানায় এ নিয়ে আলাপ করাটা কতটা ঠিক হবে, বলতে পারছি না। পলাশ ব্যাপারটা কেমনভাবে নেবে জানা নেই। আর খবর পেয়েছি, রাজন আজগর দিনাজপুর নেই।''-"ওদের বিরুদ্ধে

এমনকি কারও বিরুদ্ধেই কোনো অভিযোগ করব না আমি, শুধু অন্তিকের ঋণের বিষয়টা জানাবো, এবং পলাশ আজগরের সাথে একটা আলোচনার মাধ্যমে আইনতভাবে খানিক সময় আমরা চেয়ে নিতে চাই।''

মুস্তাকিন মাথা নাড়ল। কিছুসময় চুপ থেকে বলল, ‘‘আপনি কি ভরসা হারিয়েছেন আমার ওপর, অন্তূ?'' নির্লিপ্ত শোনালো মুস্তাকিনের স্বর।

-‘‘ভরসার প্রশ্ন উঠছে না, অফিসার! তাছাড়াও আপনার ডিপার্টমেন্ট আলাদা। আপনি খুন-খারাবীর প্রশাসনিক দায়িত্বে আছেন। আমাদের ব্যাপারটা তা নয়।''আজ মুস্তাকিন

অন্তূর জলদগম্ভীর, শীতল বুদ্ধিমতি রূপটা আরেকবার পর্যবেক্ষণ করল। যার কথার ভার, চোখের শান্ত চাহনির ঝাঁজাল তেজস্ক্রিয়তা এবং মানসিক কাঠিন্য খুব নজরে আসছিল। অথচ এই মেয়েটাও কেমন মরিচা ধরা পাতলা লৌহখণ্ডের ন্যায় ক্ষয় হয়ে গেছিল সেদিন। মানসিকতায় শক্তির ওপর আঘাত ঠিক ইট-বালু-সিমেন্টের কাঁচা গড়নে পানির মতো কাজ করে। যত পানি দেবে, তত মজবুত হবে যেন।

অন্তূর পরীক্ষা আছে আজ। সে বের হবার সময় অন্তিক ডাকল। বহুত দিন পর অন্তিক ডাকল। অন্তূ ভাবান্তরহীন ভাবে ফিরে

তাকাল।-“এই অবস্থায় একা যাবি না। চল আমি সাথে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসি।”

অন্তূ হেসে ফেলল, “ধুর! বেঁচা গরুর দাঁত ধরে টানছিস কেন? তাতে কি গরু আর ফিরবে মালিকের কাছে? আমি সোল্ড আউট রে! পণ্যের মতো কম্পানি থেকে শহর-বাজারের শোরুমগুলোর মালিকদের কাছে সেম্পল হিসেবে দেখা হয়ে গেছি, এখন আর প্রোডাক্ট স্টকে নেই। অলরেডি সোল্ড। তুই আরাম কর। আমি চলে আসবো।”

অন্তিক মাথা নত করল না, লজ্জাও পেল না। সে তাকিয়ে দেখল অন্তূর দাপুটে পা ফেলে বেরিয়ে যাওয়া। অন্তূর কাছে সে গুরু ছিল,

তবে নিচে নেমে গেছে কয়েক বছর আগে। ততদিনে ছোট্ট অন্তূ বড় হয়ে গেছে। সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

তার তো আরও বহু ভৎসনা প্রাপ্ত। বাপ-মা-বোন ক্ষমা না করলে তার ক্ষমা নেই। এরকম ছোট-খাটো কটুক্তিতে তার সুখ হচ্ছিল, অন্তূর কাছে মাথা আরও নত হয়ে আসছিল। মানুষ চিরকাল মোটেই নিজের আত্মগৌরব ধরে রাখতে সক্ষম হয় না। নিজের দোষে তা কখনও কখনও খুব জঘন্যভাবে মরা পাতার মতো ঝরে পড়ে। ঠিক যেমন সে, আজ নিতান্তই নর্দমার কীট। অবাঞ্চনীয় জেদের বশবর্তী হয়ে সর্বস্ব ধ্বংস করা এক

অভিশাপ।পরীক্ষা শেষ কোরে ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে অন্তূ গেল থার্ড ইয়ারের ফর্ম ফিল-আপের জন্য। মনোয়ারা রেহমান ওকে দেখে মৃদু হাসলেন, "ভালো আছো?"
মলিন হাসিটা লুকিয়ে সে বলল, "আলহামদুলিল্লাহ, ম্যাম! আপনি ভালো?"
মনোয়ারা মাথা নেড়ে বসতে বললেন। এক মুহুর্তের জন্য অন্তূর দিকে তাকিয়ে হুট করে যেন থমকালেন ভদ্রমহিলা। অন্তূর মুখ খোলা, পর্দা নেই তাতে। তবে সংগোপনে এড়িয়ে গেলেন এই ব্যাপারটা। মনোয়ারা কিছু বুঝলেন বোধহয়, "কিছু বলবে, অন্তূ? তোমার

সাথে এমন ইতস্ততবোধ যায়না। আমি তোমাকে স্পষ্টভাষী হিসেবে দেখতে চাইবো।" আশ্বস্ত হয়ে বলল অন্তূ, "ম্যাম! আমাদের কমনরুমে যে সালমা খালা কাজ করতেন, উনার সম্বন্ধে কী কী জানা আছে আপনার? "সন্দিহান স্বর মনোয়ারার, "কেন জিজ্ঞেস করছো?"

অন্তূ খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। কিছু ভাবলো। একটু রহস্যমণ্ডিত লাগল ব্যাপারটা। এরপর আচমকা সহজ গলায় বলল, "জানিনা। আসলে উনার মেয়ের ওভাবে মৃত্যু..."

-"উনার মেয়ে? আঁখি উনার মেয়ে ছিল?"

অন্তূ অপ্রস্তুত হলো, "জি ম্যাম! উনার মেয়ে আঁখি।"

-"ও আচ্ছা। তো তুমি কেন জিজ্ঞেস করছো সেসব ব্যাপারে?"

অন্তূ কথা খুঁজে পেল না আর। প্রসঙ্গ এড়াতে বলল, "আমাদের নতুন সাজেশন দেবার কথা ছিল না, ম্যাম?"

বেরিয়ে আসার সময় ফের একবার ডাকলেন মনোয়ারা, "শোনো মেয়ে! এতক্ষণ অনধিকার চর্চা হবে বলে জিজ্ঞেস করিনি, তবে না করে পারলাম না। তোমায় দেখে ঠিক লাগছে না। আমার অভিজ্ঞতাকে বোধহয় ফাঁকি দিতে পারেনি তোমার চতুর চোখ।"অন্তূ হাসল,

“সুযোগ পেলে পরে কখনও সরল চোখে তাকাবেন, ম্যাম। পড়ে নেবেন সবটা, আজ জোর করবেন না। আমার জন্য দোয়া করবেন।”

একটা সরু দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। জীবন তার সাথে বেশ গভীর নিষ্ঠুর খেলায় মত্ত হয়েছে। জিতবে কে? জীবনের সাথে নাকি জেতা যায় না, হার নিশ্চিত জেনেও সে কি একবার লড়বে? হারার জন্য লড়াটা বোকামি হবে না? আবার না লড়ে জিতে যাওয়াটাও কি ছোটলোকি হবে না?

ভাবনা শেষ হলো শহীদ মিনারের সম্মুখে এসে। মেরুদণ্ড বেঁয়ে এক শঙ্কিত হাওয়া

মস্তিষ্কের নিউরণ কোষে আনদোলন তুলল যেন। জয়...জয়...জয় আমির! এই পথটা তার বহু হেনস্থার সাক্ষী! আজ দেখা হবে? না হবার চান্স বেশি। গতকাল নির্বাচনে জেতার উৎসব করে এখন হয়ত ঘুমাচ্ছে!অন্তূ হাসল, এরা সুখী, কারণ এরা খারাপ। অন্তূ অবাক হলো, আশ্চর্য! সে নিজেও তো খারাপ, তবুও তার জীবনে এত ঝঞ্ঝাট কীসের? নাকি নিয়তির কাছে তার খারাপ মানসিকতার খবর পৌঁছায়নি? নিয়তি নিজেও জানেনা অন্তূ কতটা স্বার্থপর, হিংস্র আর কূটিল। আবার সময়সাপেক্ষে খুব দূর্বলও, এই বিষয়টাকে অবশ্য ঘৃণা করে অন্তূ। দূর্বল কেন সে?

পুরোপুরি খারাপ হতে হবে তাকে, গোটাটা আপাদমস্তক, প্রতিটা শিরার প্রবাহধারায় খারাপের তরল ঢুকাতে হবে। পলাশ ভালো আছে, জয় ভালো আছে, এ সমাজে এমন সব জয়-পলাশেরা এক ডাকে সুখী মানুষ। সেও সুখে থাকবে, শুধু একবার খারাপ হয়ে গেলেই তার সুখ আর ঠেকবে না কোথাও। নিজেকে এ পর্যায়ে পাগল মনে হলো অন্তূর। সেই রাস্তা। জয়-হামজার ক্লাবের রাস্তা। ক্লাবটাকে বেলুন, ফুল বিভিন্ন ধরণের সরঞ্জামে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। একগাদা চেয়ার জড়ো করা পাশের মাঠটায়। বেশ কিছু ডেকচি, প্লেট, শামিয়ানা ইত্যাদিও দেখতে

পেল। উৎসব বেশ জমজমাট পালিত হয়েছে। অন্তূর বুকটা আবার একটু কাঁপলো। ক্লাবের সামনে কেউ নেই। দুপুর গড়ানো সময়। সবগুলো নাচানাচি-লাফালাফি কোরে হয়ত বিশ্রাম নিচ্ছে এখন?ঘরবাড়ি ওভাবেই পড়ে আছে, শুধু মানুষগুলো নেই। চাঁদনীর কথা অন্তূর মাঝেমধ্যেই মনে পড়ে। মেয়েটাকে একদিনেই কেন জানি মনে ধরে গিয়েছিল। আর সালমা খালা? উনার কান্নাজড়িত মুখটার কথা মনে পড়লে বুক ভার হয় অন্তূর। অন্তূর চাঁদনীকে দরকার। ওর বিশ্বাস মেয়েটা অনেককিছু জানে। অন্তূ এটাও ভেবে বের করেছে এই দু'দিনে, এসব তাদের পরিবারের

সাথে শুধুই ঋণের টাকার দায়ে বোধহয় হয়নি। কিছু একটা ঘটছে, ঘটেছে, চলছে পিঠপিছে। যা আন্দাজের বাইরে।কী হতো, যদি না জয় সেদিন ওকে শেষ মুহূর্তে রক্ষা না করতো! ভাবতেই বিষিয়ে উঠল ভেতরে ভবনাটা। এক জানোয়ারের সাপেক্ষে আরেক জানোয়ারকে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছে যেন পাগল মনটা! তবু সে কৃতজ্ঞ ওই নোংরা লোকটার কাছে। অন্তত নিশ্চিত সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষার খাতিরে।

টিনের বেড়া কেটে বানানো দরজাটা চাপানো ছিল। তা চেপে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করতেই কেমন ক্যারক্যার শব্দ করে উঠল। অন্তূ

সাবধান হলো। কোনোমতো ভেতরে মুখ দিতেই একটা বিশ্রী গন্ধ এসে সুরসুর কোরে নাকের গভীর প্রবেশ করল। বমি এসে গেল অন্তূর। ওড়না তুলে নাকে চেপে ধরল। এই ক'দিনে একটা বসত বাড়িতে এমন দুর্গন্ধের উৎস কী? কিছু মরে পড়ে আছে নাকি? ঘরগুলো ফাঁকা। জিনিসপত্র কিছুই নেই। যত এগিয়ে যাচ্ছিল, গন্ধটা আরও প্রকট হয়ে নাকে আসছিল। মাটির রান্নাঘরে ইঁদুর মাটি তুলে ছোট ছোট পাহাড় বানিয়েছে। চাঁদনী যে ঘরে তাকে বসিয়েছিল সেখানেও উঁকি দিলো একবার। ফাঁকা সেসব। অথচ গন্ধের উৎসটা আসছে আসলে ওই বিল্ডিং থেকে। যেটা অন্তূ

এর আগের বার এসেও দেখেছিল। ওভাবেই পড়ে আছে। শুধু ছাদ হয়েছে, নিচে মাটি, জানালা-দরজা কিছুই নেই।কৌতূহল দমাতে না পেরে সেখানে উঠে গেল অন্তূ। ইটের ওপর ইট রেখে সিঁড়ি তৈরি করা। যেটা আগে ছিল বলে মনে পড়ল না। বালু বিছানো মেঝে। দুটো পাশাপাশি ঘর। একঘরে উঁকি দিয়ে ফাঁকা পেল। ওপর ঘরে যেতেই একদম পেট গুলিয়ে এলো অন্তূর। শক্ত করে ওড়না চাপল নাকে। অবাক হয়ে দেখল ঘরটা। একটা মাদুর, দু-তিনটা চটের বস্তা, চাটাই, পিড়ি ইত্যাদি বিছানো। তার ওপর ছিটিয়ে পড়ে আছে অনেকগুলো কাঁচের বোতল,

ক্যান। বোতলগুলো অ্যালকোহলের। মোড়কের মতো কাগজ ছড়িয়ে আছে পুরো ঘর জুড়ে। তাতে নিশ্চয়ই নেশাদ্রব্য ছিল? একটা জিনিস, যা অনেকগুলো এখানে-ওখানে পড়ে আছে, তা দেখে প্রথমে বুঝতে পারছিল না অন্তূ, এগোলো আসলে কী? একটু পরেই মাথায় এলো, এ তো কলকি। গাঁজার কলকি বা স্টিক তৈরির তিনকোণা আকৃতির মোড়ক। এসবের গন্ধও আসছে, তবে এমন বিশ্রী আর তীব্র যেন নয়, যা নাকে আসছিল। এই ঘরের ফাঁকা জানালায় চাটাই বেঁধে দেয়ায় ঘরের ভেতরে দিকটা অন্ধকার প্রায়। অন্তূ আরও কিছুটা এগিয়ে গেল।গা গুলিয়ে এলো ওর।

মাংস পঁচার গন্ধ নাকি খুব বিশ্রী হয়, অন্তূর মনে হচ্ছিল এরকম নোংরা দুর্গন্ধ তার নাকে আগে প্রবেশ করেনি কখনও। সে আরেকটু ঝুঁকল। বেকারীগুলোতে যে পাতার ওপরে কোরে বিস্কুট, রুটি সেঁকতে দেয়া হয় তুন্ডুরীতে, সেই পাতা। তার ওপর ঘন, শুকনো সাদা-লালচের মিশ্রণে কেমন ক্রিম জাতীয় পদার্থ লেপ্টে আছে। সাদা পদার্থগুলো আলাদা হয়ে আছে জায়গায় জায়গায়। অন্তূ বুঝতে পারছিল না জিনিসটা কী আসলে? কী লেগে আছে লোহার পাতাগুলোর ওপর। খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। কী ধরণের পদার্থ? কোনো ক্রিম অথবা রাসায়নিক দ্রব্য? হুট

কোরে জট খুলল যেন। ঘন অফ-হোয়াইট রঙা ক্রিম জাতীয় পদার্থ কী তা বুঝতে পেরে ঘেন্নায় গা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। পায়ের পাতা শিরশির কোরে উঠল। পুরুষের বীর্য! অন্তূ কয়েক কদম পিছিয়ে এসে কেঁপে উঠল। একটু ধাতস্ত হতেই ভাবনায় এলো, তাহলে এই পদার্থটির সাথে রক্ত কেন? পরে বুঝতে পারল, ওখানে পড়ে শুকিয়ে আছে রক্ত-পুঁজ এবং বীর্য—মানবদেহের বর্জ্য পদার্থের সবচেয়ে ঘৃণ্য ও নোংরা তিনটি পদার্থই এখানে পড়ে আছে। অন্তূর শরীরের পশমগুলো তখনও দাঁড়িয়ে আছে, লোভকূপগুলো শিউরে আছে। পেটে মোচড়

দিয়ে আসছিল। এখানে কী হয়? মদ-জুয়ার আসর বসে, তা তো বোঝা গেল নাহয়! তবে এগুলো কী? কেন? কী ঘটে এখানে? নাকি সে-ই বেশি ভাবছে?হতে পারে, কারও ক্ষত ড্রেসিং করা হয়েছে এখানে? বদরক্ত ও পুঁজ ফেলা হয়েছে! তাহলে বীর্যর মতো এমন একটা অবাঞ্ছিত পদার্থ এমন একটা জায়গায় খোলাভাবে? এই পদার্থ কি এভাবে পড়ে থাকার মতো কিছু? কী ধরণের নোংরামি হয় এই পরিত্যক্ত ঘরখানায়?

সে যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো, আছরের আজান পড়ছিল। হাত-ঠান্ডা হয়ে এসেছে, কেমন ঘোর লেগে গেছিল। সাধারণ স্বাভাবিক

জীবনটা কবে থেকে যেন এমন উদ্ভট সব পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার অভ্যাস গড়ে নিলো!
এই ভয়টাও ভেতরে কাজ করছিল না, যে পাশেই ক্লাবঘর, কেউ দেখে ফেলবে তাকে। খানিক হেঁটে তবে রাস্তায় উঠতে হয়।
বাড়িটার চারপাশে কোনো বসতি নেই। অন্তূ ভেবে পাচ্ছিল না, এখানে আসলে হয় কী? আর বাড়ির লোকগুলোই বা গেল কোথায়? কেউ জোর কোরে উঠিয়ে দিয়েছে? কারা উঠিয়ে দিয়েছে? ক্লাবের মালিকেরা?

পাশের বাড়িতেই ঢুকল সে, দ্বিধা-সংকোচ ঠেলে। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করল, “ওই বাড়ির লোকেরা কোথায় গেছে?”

বাড়ির মহিলা বললেন, “হুট কোরে একদিন আইছিল, পরে আবার চলে গেছে হয়ত। কারও সাথে তেমন সম্বন্ধ ছিল না ওদের, যতদিন ছিল এখানে।”অন্তূর চোখ-মুখ কুঁচকে উঠল, “মানে? হুট কোরে এসেছিল মানে? সালমা খালা এখানকার বাসিন্দা না?”

-“ও মা! তা হবে কেন? কয়েকমাস আগেই তো আইছিল এইখানে।”

অন্তূ বূঝতে পারছিল না কিছুই। সালমা খালাকে কমনরুমের আয়া হিসেবে সে

এডমিশন নেয়ার পর থেকে দেখছে, অর্থাৎ সে-ই দেখছে প্রায় দুবছর যাবৎ। এসেছে তারও আগে। আর জায়গা বিক্রি, ওসব ঝামেলা...অন্তূর অসহ্য লাগছিল ভাবতে। সামলালো নিজেকে, "আচ্ছা, বুঝেছি। ওরা কবে গেছে এখান থেকে বলতে পারবেন? আর সোহেল ভাইয়া কি বিদেশ চলে যাবার পরে ওরা গেছে এখান থেকে?"

মহিলা বিরক্ত হলেন, "বললাম তো, ওরা কারও সাথে মিশতো না এইদিকের। কেডা বিদেশ গেছে, কি দেশে আছে তা কেমনে বলব? খালি ওই বাড়িতে থাকতো ওরা, এই জানি!"-"আর আঁখির লাশ? মানে লাশ মাটি

হবার পরপরই চলে গেছে ওরা? নাকি তার আগে?''

-"সেসব অত জানি না। খালি জানি এখন আর থাকে না ওরা।'' মহিলা ক্যাটক্যাট করে উঠল।

অন্তূর ইচ্ছে করছিল নিজের মাথার ওপর রাস্তার একটা ভাঙা ইট তুলে ধারাম কোরে বাড়ি মারতে। মাথাটা জং ধরে আসছে। তার মানে কি আঁখির লাশ আসেইনি বাড়িতে? মুস্তাকিন বলেছিল, এসেছে, তাহলে নিশ্চয়ই এসেছে। হয়ত পরিবারের কাছেও পৌঁছেছে, তবে পরিবারটা এখান থেকে যেখানে উঠে গেছে সেখানে। তাহলে নিশ্চয় পুলিশ ফোর্স

জানে চাঁদনীর ঠিকানা?অন্তূর মাথায় আরেকটা প্যাঁচ খুলে গেল, নিশ্চয়ই জমিজমার ক্যাচাল মিটমাট হয়ে গেছে? আর চাঁদনী বলেছিল, ওরা এখানে আর থাকবে না। জমি ফেরত পেলেও তারা অন্যত্র চলে যাবে এই এলাকা ছেড়ে। আর এমন অবস্থায় যে কেউ-ই তাই করতো। এত বড় দাম চুকানোর পর কে এই জাহান্নামে পড়ে থাকে? অন্তূর খেয়াল এলো, সালমা খালাকেও আর ভার্সিটিতে দেখা যায় না, কিন্তু কবে থেকে তা ঠিক মনে আসছিল না।

অর্থাৎ, সে ভেতরে যেসব দেখল, সব এই জায়গার নতুন মালিকের কারসাজি? তার কি

জানানো উচিত এ ব্যাপারে পুলিশকে? নিশ্চয়ই জানাবে? অন্তূর হুট কোরে একটা বিষয় মাথায় এলো, সে যে অসহ্য গন্ধটা পাচ্ছিল, সেটা কি ওই রক্ত-পুঁজ থেকে আসছিল? রক্ত-পুঁজ অথবা বীর্য—কোনোটা থেকেই ওমন নাড়ি-ভুঁড়ি উগড়ে আসা দুর্গন্ধ আসে না। আর এইরকম একটা রহস্যমণ্ডিত বাড়ি এমন বিনা কোনো নিরাপত্তায় হেলায় ফেলে রাখা হয়েছে।জমিটা এক হিন্দু লোক কিনেছে। সেই লোক এখানে কোনো অনৈতিক কাজ করছে না তো? কিন্তু এখন চাঁদনীরা কোথায় আছে? সোহেল কি আবার বউ-মাকে ফেলে বিদেশ চলে গেছে? আর

আঁখির ছোট ভাই সোহান ক্যান্সারে মরেছিল। সেটাও এক রহস্য। চাঁদনীকে জিজ্ঞেস করেও সেদিন উত্তর পায়নি। খুব সংনমিতভাবে এড়িয়ে গেছিল চাঁদনী বিষয়টা। সে দারুণ চাপা এবং অদ্ভুত। অন্তূর অনেক, অনেককিছু জানার ছিল চাদনীর কাছে। কিন্তু কোথায় পাবে ওদের? কোনো খোঁজ জানা নেই।থানার গোলঘরে পলাশ যখন ঢুকছিল, অস্বাভাবিকভাবে অন্তূর গা'টা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠেছিল। শীতের মৌসুম, তব গা ঘেমে উঠছিল। পলাশের ঠোঁটের ওই মিচকে হাসি, জ্বলজ্বলে চোখদুটো, তীরের ফলার মতো নাকের পাটা—ধারালো অস্ত্রের মতো

বিদীর্ণকারী। এসব সময় নারীমনকে অন্তূ ঘেন্না করে। ভয়ে জড়িয়ে যাওয়া মানসিকতা! বারবার পলাশের সেই ছোঁয়াগুলো শরীর ছুঁয়ে যাচ্ছিল। অন্তূ মনে মনে কৃতজ্ঞ জয় আমিরের ওপর।

পলাশ খুব শান্ত এবং ঠান্ডা একটা মানুষ। একটুও উত্তেজিত হয় না থানায় কথাবার্তা বলছিল খাঁটি শুদ্ধ ভাষায়। শিক্ষার প্রয়োগ করছিল। খুব গুছিয়ে আইনকে বিভ্রান্ত করার চাল। কিছুদিন সময় পাওয়া গেল পলাশের কাছে। ব্যাপারটা এমন প্রমাণিত হলো– অন্তূদের পরিবার ঋণ-খেলাপি করেছে, আর পলাশ নিতান্তই উদার। সে লিখিত সময়

পেরিয়ে যাবার পরেও সময় দিচ্ছে।বেরিয়ে যাওয়ার সময় চট করে এক পলক অন্তূর দিকে তাকিয়েছিল পলাশ। ওই সময়টুকুর মাঝে পলাশের ঠোঁট হেসেছে, খুব সূক্ষ্ম হাসি। এই হাসিটাই জয়ের ঠোঁটের কোণে বহুবার লক্ষ্য করেছে সে। পলাশের চোখ যেন বহুদিন ধরে খুঁজছে অন্তূকে।

অন্তিক পাশে পাশেই ছিল। মুস্তাকিন আগে আগে হাঁটছিল। থানার সদরঘরে বসে অন্তিক বলল, "আব্বু এখন মোটামুটি সুস্থ, মুস্তাকিন। তোমার সময় থাকলে আমরা কালই রওনা হব কুড়িগ্রাম। দেরি করার সাহস পাচ্ছি না।"

-“আমার সময় হবে। কালই যাই একদফা। এমন নয় যে একদিন, একবেলা গেলেই কাজ হাসিল হয়ে যাবে। দু- একদিন ঘোরাঘুরি করা লাগতে পারে।”

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করতে আজ আর ইতস্তত বোধ করল না সে। অন্তূর দিকে প্যাকেট ইশারা করে বলল, “ক্যান আই?”অন্তূ সামান্য মাথা নাড়িয়ে অন্যদিকে ফিরল। সিগারেটে টান দিয়ে মুস্তাকিন বলল, “অন্তূকে একা রেখে যাবেন?”

-“হ্যাঁ, একাই থাকতে হবে। ওর ভাবীকে গতকাল ওই বাড়িতে রেখে এসেছি। এখানে

যেসব চলছে, এর মধ্যে অসুস্থ শরীরে আরও কষ্ট পেত।''

অন্তূ অনেকক্ষণ ধরেই কিছু বলতে চাচ্ছিল। মুস্তাকিন তা বুঝে বলল, "কিছু বলবেন?'' আঁখিদের ওই বাড়িতে যা দেখেছে, অন্তূ তা আপাতত চেপে গেল। শুধু বলল, "চাঁদনীর মানে ওই ভিক্টিম মেয়েটার ভাবী এবং মা এখন কোথায় থাকে, সেটা জানেন নিশ্চয়ই! বডি পাঠিয়েছিলেন! আমি দেখা করতে চাই ওদের সাথে।''মুস্তাকিন কিছুক্ষণ চেয়ে রইল অন্তূর দিকে, পরে বলল, "আমি পাঠাইনি বডি। থানা থেকে পাঠানো হয়েছিল। আমাদের ডিপার্টমেন্ট ভিক্টিম-বডি নিয়ে

বিশেষ কাজ করে না। আমি জেনে আপনাকে জানাবো। তাছাড়া জরুরী নয় এই সময় ওদের সাথে দেখা করা।''

মুস্তাকিন চলে গেল, থানার সদরঘর ফাঁকা তখন। অন্তূ উঠে এগিয়ে যেতেই অন্তিক ডাকল, "অন্তূ! মুখে ওড়না চেপে বাইরে বের হ।''

অন্তিকের কণ্ঠস্বর রুষ্ঠ। মুস্তাকিনের ওভাবে তাকিয়ে থাকা সহ্য করতে পারেনি, তবুও খুব কষ্টে চুপ ছিল।

অন্তূ পেছন ফিরল না। সামনে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, "যাওয়ার সময় যেভাবে এসেছি, ওভাবেই যাব।''-"একটা ভুল করেছি জীবনে,

তার জন্য তুই মূল্য চুকিয়েছিস, মানছি। কিন্তু তাই বলে এতটাও বোধহয় অপদার্থ পুরুষ হয়ে যাইনি, যে বোনকে রাস্তায় প্রদর্শন করাতে করাতে নিয়ে যাব। আসার সময় সাথে ছিলাম না আমি, তখনকারটা মাফ। এখন আছি। মুখ ঢেকে ফেল নয়ত তোকে থাপ্পড় মারার অধিকার হারাইনি আমি আমার এক ভুলের মাধ্যমে। আমার ভুলের জন্য তোকে যা পোহাতে হয়েছে, তার বদলে যেকোনৌ সাঁজা দে, চলবে। তাই বলেআমি তোকে তোর বেপর্দার ব্যাপারে শাসন করতে পারব না, এমনটা মোটেই নয়।।''

বহুদিন পর অন্তিক পূরোনো অন্তিকের মতো কথা বলল। অন্তূ তাতে ফিরে তাকিয়ে তাচ্ছিল্য করে হাসে, “অনিচ্ছাকৃত পাপেরই যদি এত বড় মূল্য চুকাতে হয়, তাহলে না জানি ইচ্ছাকৃত পাপ করলে কতটা মূল্য দিতে হবে।-“ইচ্ছাকৃত পাপ করব না আমি কখনও।”

-“করলেই বা কী? আর কিছু হারানোর নেই। এখন যা হারাবে, তা আর গায়ে লাগবে না। করতে পারিস।”

অন্তিক কেমন করে হেসে উঠল, “তোর কথায় এত ধার কেন রে?”

-“এই ধার কাজে লাগে না সময়মতো। অযথা!”

-“মুখ ঢেকে ফেল, অন্তূ। তুই আমাকে ঘেন্না করতেই পারিস, তাতে আমি আমার কর্তব্য পালনে দ্বিধাবোধ করতে পারি না।”

-“তুই জুয়ারুদের চেয়েও বেশি নিকৃষ্ট, তা স্বীকার করতে তুই ভয় পেতেই পারিস, তাতে আমি তোকে ঘেন্না করতে একটুও দ্বিধাবোধ করব না।”অন্তূ বেপরোয়া পায়ে হেঁটে এগিয়ে যায়। অন্তিক দ্রুত এগিয়ে গিয়ে পা মেলালো। তখন অন্তূর মুখটা ওড়নায় আবৃত।

অন্তিক প্রশান্তিতে মুচকি হাসল। ছোটবেলা থেকে অন্তূ কঠোর এক ব্যক্তিত্বের মুখোশে

নিজেকে আবৃত রেখে বেড়ে উঠেছে। বয়সের চেয়ে ব্যক্তিত্বের ওজন ভারী লাগে। অনুশোচনাটুকু গিলে ফেলল অন্তিক। অন্তূ রাস্তা পার হতে শেখেনি। আব্বুর হাত ধরে পার হওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় না সে। অন্তিক সেদিন আলতো করে বোনের হাতটা চেপে ধরল। রাস্তা পার হতে হতে ধীর আওয়াজে বলল, "আমাকে ক্ষমা করার ইচ্ছে আছে তোর, অন্তূ? আমি পুরো জীবন অপেক্ষা করব, মাসুলও দেব সব রকমের। তোকে ঘেন্না কাটাতেও বলব না আমার ওপর থেকে, শুধু মুখ ফিরিয়ে থাকিস না।"ক্লাবঘরে একটা আয়োজন করা হয়েছে। হামজা খুব শীঘ্রই

পৌরসভায় মেয়র পদে অধিষ্ঠিত হবে। জয় আর কবীর মিলে বিরিয়ানী রান্না করেছে। জয় ভালো বিরিয়ানী রাঁধতে জানে। ছেলেদের খাওয়াতে হয় প্রায়ই!

মাজহারের হাতে গুলি খাওয়ার, লতিফকে হামজা লম্বা এক ছুটি দিয়েছিল। অসুস্থ শরীর, তার ওপর পরিবার থেকে এ অবস্থায় সায় থাকে না আবারও সেই প্রাণঘাতী কাজে পুনরায় যোগ দেয়াতে। হামজা তার পরিবারের খরচা বহুদিন চালিয়েছে, সম্পূর্ণ চিকিৎসা নিজের টাকায় করিয়েছে। এখন বেশ সুস্থ সে, বলা চলে পুরোপুরি ঠিকঠাক।

দলের ছেলেদের ওপর হামজার অবদান অপরিসীম।
লতিফ খেতে খেতে বলল, “এত ভালো রান্না কই থেইকা শিখছো, জয়? মনে হচ্ছে বাড়ির মহিলাদের হাতের বিরিয়ানী খাচ্ছি।’’হামজা বসেছে সোফায়। জয় শুয়েছে টান হয়ে হামজার কোলে মাথা রেখে। পা দুটো তুলে রেখেছে সেন্টার টেবিলের ওপর। ভিডিও গেইম খেলছে ফোনে।
জয় খুব দুঃখিত স্বরে বলল, “জীবনে বেশি বেশি চিল মারতে যাইয়া আর এসব বান্দরের পাল খাওয়াইতে পিকনিক এত করছি, রান্নার হাত গ্রীষ্মকালীন আমের মতো পাকা, ভাই!

খান খান, খালি একটু দোয়া কইরেন আমার জন্য, যাতে খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যায় একটা। একা রাত কাটতে চায় না। খুব দুক্কে আছি। আর্জেন্ট বউ দরকার।''

সকলে হেসে উঠল। জয় ফোনে চোখ রেখেই হঠাৎ-ই আনমনা হয়ে বলল, "আরমিণ আবার আসছিল এই বাড়িত্। আচ্ছা ওই ছেঁড়ির জীবনে দুঃখের কি খুব অভাব? দড়ি ছিঁড়ে মারা খেতে চারদিক যেচে পড়ে ঘুরে বেড়ায় দুঃখ জোগাড় করতে।''হামজা জিজ্ঞেস করল, "ওখানে কেন গেছিল?''

জয় হাসল, "হুমায়ুন আহমেদের উপন্যাসে পড়ছিলাম, সোন্দরী চেংরিরা বোকা হয়।

আসলে ওই শালী একটু বেশি সোন্দরী তো! মাথায় মাল কম! ছেঁড়ির ধান পোঁড়ে চুলায়, ওই শালি পানি ঢালে পা-ছা-য়। তাইলে কি হইলো? না জানি কীসব দৃশ্য দেইখা আসছে! কইলজের ওজন কতখানি হইলে এত কিছুর পরেও থামেনি? এ তোরা কেউ ওই ছেঁড়িরে যাইয়া কইয়া আসবি, ওর সাথে সামনে কী কী হইতে পারে।''

-''তুই নিজে দেখেছিস ওকে?''-''হ। দুপুরে এইখানেই ঘুমাইছিলাম। বিকেলে উঠে পেছনের বারান্দায় দাঁড়াইতেই একনজর দেখা হয়ে গেল!''

হামজা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে সোফায় হেলান দিয়ে বসল, "হতে পারে দেখেনি কিছু! দেখলেও বিশেষ কিছু দেখার কথা না। ওই বাড়ির মহিলাদের খুঁজতে গেছিল। এখনও কি সেসব পড়েই আছে ওখানে?"

-"তাই তো থাকার কথা! ওসব দেখছে আমি নিশ্চিত, আর দেখলে শশুরবাড়িতে জানাবে এইটা ডাবল নিশ্চিত। তুমি খালি ভাবো, কতখানি সাহসের দরকার ওসব দেখেও চুপচাপ বেরিয়ে আসা।"

লতিফ হেসে উঠল, "সাহসই যদি না থাকবো, তাইলে কি আর তোমার মুখে খাবলা ধইরা থুতু ছোঁড়ে! ওইডাতই তো বুঝা যায় মাইয়ার

কলজে বারো হাত।''সকলের মাথায় বাজ পড়ল কথাটা শুনে। কিন্তু জয়ের মুখে অপমান নেই। সে খুব দুঃখের সাথে বলল, "হ। কামডা ভালো করে নাই। মাগার..." জয় হেসে ফেলল।

হামজা জয়ের সেই হাসিটাই কেড়ে নিয়ে চট কোরে হেসে ফেলল লতিফের দিকে তাকিয়ে, "আপনি কী করে জানলেন এসব, লতিফ ভাই? আপনার তো জানার কথা না!''

আধখাওয়া সিগারেটটা দু আঙুলে চেপে ধরে নেভালো, তাতে বোধহয় হাতের পুরু চামড়াতে অল্প খানিক সেঁক লাগলো। আবার তাকালো লতিফের দিকে, "ভাবছিলাম খাওয়া

শেষ হলে আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করব।
আপনি নিজে থেকেই খুব ফাস্ট দেখছি!
''সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে ফেলে বলল, "এসব লাইনে বাটপারি করতে গেলে সতর্কতা খুব জরুরী। এখানে সবাই খেলোয়ার, সবার মাথাই ফুল স্পিডে ঘোরা কাটার মেশিনের মতো চলে। অল্প একটু ভুল হলেই ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবেন। আপনার আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।''

হাস্যজ্জ্বল চোখে কথাগুলো বলে আরাম করে উঠে দাঁড়াল হামজা।

উঠে বসল জয়। ফোনটা পাশে রেখে হাতদুটো হাঁটুতে গেঁড়ে পিঠ বাঁকিয়ে বসল।

চোখ হাসছে তার, শার্টের কলারের ওপর দিয়ে শিকল আকৃতির চেইনটা ঝুলে আছে নিচের দিকে। তাতে ইংরেজি হরফ 'J' এর লকেট। বাঁ হাতের রিস্টলেটটা কব্জি থেকে কনুইয়ের একটু ওপরে পড়ে রইল। পরনে সাদা ধবধবে লুঙ্গি, তার ওপর কালো জ্যাকেট পরেছে। পাড়া, ক্লাব এমনি চলাচলে তাকে কোনোসময় ফরমাল পোশাকে দেখা যায় না। লুঙ্গি, শার্ট, চামড়ার জুতোই চলে। গ্রাম্য মোড়লের মতো দেখতে লাগছে ওকে। পাশেই হামজা দাঁড়িয়ে আছে। সাদা পাঞ্জাবী পরিহিত, কালো শাল জড়ানো।ঠোটের কোণে হাসি জমে থাকা অবস্থায় কেমন করে যেন তাকিয়ে

রইল জয় লতিফের দিকে। হামজা মিটিমিটি হাসছে। এই হাসি লতিফের ওপর ওর করা সবটুকু ন্যায়পরায়নতার হিসেব শুষছে। কোনোদিকে ফাঁক রেখেছিল না হামজা লতিফের ভরন-পোষনে। তার দাম সে আস্তে কোরে আদায় তো করে নেবে, এই হাসি দ্বারা সে লতিফের দ্বারা প্রতারিত হবার দুঃখটুকু ঢাকতে চাইল!

লতিফের আর খাওয়া উঠছে না। সে বুঝতে পারছে, আজ তাকে কেন আপ্যায়ন করে এখানে আনা হয়েছে।

জয় হায় হায় কোরে উঠল, "আরে আরে করতেছেন কী, লতিফ ভাই? আমি কি

জানোয়ার নাকি যে খাওয়া অবস্থায় মারবো কাউকে, হোক সে যতবড় জোচ্চর আর বিশ্বাসঘাতক। খাওয়া শেষ করুন, আরামসে কথা বলি। এ কবীর...আমার জন্যও এক প্লেট আন তো, লতিফ ভাইয়ের সাথে বসে খাবো। যা।''

লতিফ ছটফটিয়ে উঠল। হামজা শালটা ডান কাধে তুলে নিয়ে বলল, ''আমি বাড়ি যাচ্ছি। এখানে এখন থাকা ঠিক হবে না। আফটাল অল নতুন মেয়র আমি। আমার কিছু নৈতিক দায়িত্ব আছে। আমার সামনে কোনো অকাম ঘটবে, আর আমি তাকিয়ে দেখব, কিছু তো করব না, এটা ঠিক না। দু'দিন আগে অনেক

বিশ্বাস কোরে জনগণ ভোটে তুলেছে আমায়। কাজ ফুরোলে তুই দেরি করিস না ফিরতে। আজ রাতে দাবা খেলব আমি আর তুই। অনেকদিন খেলি না।'হামজা হেলেদুলে হেঁটে বেরিয়ে যায়।

জয় আরাম কোরে বসে গপাগপ বিরিয়ানী খেতে বসল। বিশাল বিশাল হাতে বিশাল বিশাল লোকমা। তার খাওয়ার ধরণ ভালো না। ভদ্রলোকেরা দেখলে এক শব্দে বলবে, অসভ্য, জঙলিদের মতো করে খায় জয়। গপগপ করে এক প্লেট বিরিয়ানী খুব রুচির সাথে মনোযোগ দিয়ে খেয়ে ঠান্ডার রাতে ঠান্ডা ঠান্ডা বোতল নিয়ে বসল। লতিফ কাকুতিভরা

চোখে বসে আছে। হাত ধুয়ে জয় লতিফের প্লেটটাকে ইশারা করে বলল, "যাহ রেখে আয়। লতিফ ভাই আর খাবে না। ভাই, হাত ধুয়ে নেন, আমার প্লেটেই ধুয়ে ফেলেন, আমরা আমরাই তো! যা করেছেন করেছেন, আর তো এরপর করার সুযোগ পাবেন না! তাহলে আর কীসের কী? তখন আমরা ভাই ভাই! আসেন মদ খাই।"

জোর করে মদ পান করালো লতিফকে। নাক-মুখ দিয়ে উঠে এলো তা। বিরিয়ানী উগরে এসে বুক জ্বলে ছারখার লতিফের। জয় গিলে যাচ্ছে ঢকঢক করে।-"বিশ্বাস করো জয়.." মিনতি করে ওঠে লতিফ। ওর চোখে-

মুখের আকুলতা বোধহয় জয়কে খুব আনন্দিত করল।

সে মাথা নাড়ল দু'পাশে, "আমি অবিশ্বাস করি না কাউকে। আপনাকেও করার কিছু নেই। আপনি সত্যি বলবেন, আমি শুনব, বিশ্বাস করব। আপনি বলুন, লতিফ ভাই! আপনি কী কোরে জানলেন ওই মেয়েটা সেদিন পলাশের রুফটপে দাঁড়িয়ে আমার মুখে থুতু ছুঁড়েছিল? আর ওই মেয়েটাই কাল ওই পরিত্যক্ত বাড়িতে এসেছিল। এসব আপনি কীভাবে জানলেন?"

আর বলার কিছু নেই লতিফের। তার রুহু কাঁপছে। জয় হাসল, "আপনারে হামজা ভাই

আজ মাসের বেশি ছুটিতে রাখছে দলের যেকোনো কাম থেকে। ক্যান? কারণ আপনে নাকি আমারে বাঁচাইতে নিজে গুলি খাইছেন। বদলে হামজা আপনার চিকিৎসা করাইছে, সবধরণের এক্সট্রা নিরাপত্তা দিছে। আপনার জন্য মাজহারকে মেরে শত্রুতা বাড়াইযছে। আর আপনে সেই মাজহারের সাথে হাত মেলাইলেন? ছিঃ!

অবশ্য এর কারণ আছে।সে আপনাকে ডেকে বোঝাইলো, হামজার পার্টিতে থাকলে এভাবেই জখম হত হবে আপনাকে। অথচ আপনার জন্য যে মাজহারকে মেরে আমি আর হামজা সোসাইটির সকল সাইটে

বদনামী এবং শত্রুতা কামিয়েছি এটুকু দেখলেন না আপনি? শ্যাহ! ইজ্জতই রইল না, শালা। মাজহারের সাথে আপনি মিলছেন গুলি খেয়ে, ওদিকে পলাশ খা-ন-কির বাচ্চা দ্বিমুখী পাগল শালা, শালার ছাওয়াল টাল, সাইকো! ভাবে যে আমরা কিছু বুঝিইনা, গু খাই। ও আমাদের হাতে রেখে আসলে মাজহারের সাথে কাজ করতেছে। সেদিন আবার ওই শালীর জন্য একদম সরাসরি একটা বিরোধীতা লেগে গেল। আর এই সংকটময় সময়ে আপনি দলের সাথে ঘাতকতা করতেছেন। কন এইডা কি ঠিক?''একটু থেমে ঘন ঘন মাথা নাড়ল জয়, "নট গুড,

লতিফ ভাই! তার ওপর আবার থুতুর ব্যাপারটা আমার ছেলেদের সামনে বলে আমার ইজ্জতের এগারোটা বাজালেন!"

লতিফ আহাজারী করল, "জয়! বিশ্বাস করো আমি যাইনি। মাজহার এসেছিল। আমি কিচ্ছু করিনি ওদের সাথে মিশে। খালি এইটুকু শুনেছি তুমি সেদিন ছিলা ওইখানে।"

-"তা জানি আমি। কিন্তু, কিন্তু, কিন্তু ছোটবেলায় পড়ছিলাম, ছোট বালুকনা আর বিন্দু জল মহাদেশ আর মহাসাগর গড়ে। আজ ও আপনাকে জানাইছে, কাল আপনি ওকে জানাবেন, এই ধারাবাহিকতা চলতে দেয়া মূর্খতা হয়ে যাবে না? এজন্য কষ্ট করে

এতদিন ধরে মাস্টার্স কমপ্লিট করলাম? তাছাড়া এসবও ইস্যু না। ইস্যু হলো, বিশ্বাসঘাতকদের নাকি আপনাদের সৃষ্টিকর্তাও ঘেন্না করে।''ব্যস্ততার সাথে কবীরকে বলল, "এইহ! শশুরবাড়িতে কল কর তো! বল, ক্লাবের পাশে এক পরিত্যক্ত বাড়িতে কিছু অপ্রীতিকর মাল-মশলা পাইছি, ষাঁড়। তাড়াতাড়ি পোলিশ পাঠান।''

ওসি সাহেব বোধহয় থানায় বসেই ঘুমাচ্ছিলেন। কল রিসিভ করলেন দেরি করে। জয় নিজেই ধরে লম্বা একটা সালাম দিয়ে খাঁটি শুদ্ধ ভাষায় বলল, "স্যার! আমাদের ক্লাবের পাশে একটা বাড়িতে কিছু

অপ্রীতিকর জিনিস পেয়েছি। ড্রাগ, অ্যালকোহল জাতীয় জিনিস পড়ে আছে, আর সাথে একটা লাশও আছে মনেহয়, স্যার। ঘরের কার্নিশে কাফনে মুড়ানোর মতো কিছু একটা আছে, স্যার। বিশ্রী গন্ধ আসছে মানুষ পঁচার মতো। থাকা যাচ্ছে না এই ঘরে। আমার ধারণা, ওটা লা-শ-ই হবে।''

ঘরের এক কোণে কিছু ব্যাটিং স্টিক ও হকিস্টিক, চাপ্পর-চাপাতি, লাঠি, ছুরি ইত্যাদি গাদা করা আছে। জয় হেলেদুলে হেঁটে গিয়ে রডের মাঝ থেকে একটা কালো কুচকুচে রড তুলে আনলো। দুই চুমুক মদ গিলে সোফার ওপর বসে পড়ল ধপ করে।তখন ক্লাবঘরে

চারজন ছেলে আছে। বাকিরা খেয়ে বিদেয় হয়েছে। লতিফকে ওরা শক্ত করে ধরল। টেবিলের ওপর রাখা টিস্যুবক্স থেকে অনেকটা টিস্যু তুলে মুড়িয়ে যতটা যাবে না তার চেয়ে বেশিটা টিস্যু লতিফের মুখে গুজে দিলো জয়। লতিফের চোখে পানি, চোখদুটো বারবার অনুরোধ করছে ক্ষমা করে দিতে। জয়ের খুব সুখ লাগছে। ভিক্টিমের চোখে ভয় না দেখলে অত্যাচার করে মজা নেই। শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে হাতের রডটা দিয়ে লতিফের হাঁটুর ঠিক অস্থি-সন্ধির ওপর আঘাত করল। গুঙরে উঠল লতিফ, অথচ আওয়াজ এলো না বাইরে। হাঁটু ভেঙে বসে

পড়ল। ছটফট করে উঠল মেঝেতে পড়ে। জয় লতিফের অপর পায়ে ঠিক একই স্থানে হাঁটুর জোড়সন্ধির ওপর কষে একটা রডের আঘাত লাগালো।লতিফ অজ্ঞান হবার আগে জয় মুচকি হেসে আশ্বাস দিলো , "চিন্তা করবেন না, লতিফ ভাই। আমি আপনার ভালোর জন্যই এসব করতেছি। আপনার এই পা আর পৃথিবীর কোনো ডাক্তার জোড়া লাগাতে পারবে না। আপনি হেঁটে হেঁটে এর কাছ থেকে ওর কাছে বিশ্বাসঘাতকতা এবং অকৃতজ্ঞতার মতো পাপ করতে যেতে পারবেন না আর। আমরা তো নষ্ট মানুষ, পাপ নিয়েই বেঁচে আছি। কিন্তু এই যে

আপনে আর পাপ করার সুযোগ পাবেন না, এই ব্যবস্থা করে আমি আজ একটা ভালো কাজ করলাম। তাছাড়াও আপনার পরিবারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমি বহন করব, কথা দিচ্ছি।''
কবীরকে বলল, "পুলিশ আব্বারা খুব তাড়াতাড়ি এসে পৌঁছাবে। তোরা লতিফ ভাইকে আব্দুর রহিম মেডিকেলে এডমিট করিয়ে আয়। জ্ঞান ফেরার পর সরিস না ওর কাছ থেকে, আবার জবানবন্দি দিলে ফেঁসে যাব। এত তাড়াতাড়ি মরা যাবে না আমার।
''রাহাতের সাথে ছেলেগুলো লতিফকে গাড়িতে বসিয়ে চলে যায় হাসপাতালের উদ্দেশ্যে। রয়ে গেল কবীর।

জয় রড রেখে এসে সোফাতে বসল আরাম করে। শরীর ঘেমে উঠেছে। টিস্যু দিয়ে ঘাম মুছল। কবীর আস্তে কোরে জিজ্ঞেস করে, "ভাই, পলাশ কী করেছিল মেয়েটার সাথে? মানে..."

-"আরেহ! জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ ক্যাডার জসিমউদ্দীন মানিক একশোটা ছাত্রীকে রে-প কোরে সেঞ্চুরি পার্টি করেছিল, সেই ইতিহাস ভুলে গেছিস? ওই হিসেবে পলাশ কিছুই করে নাই।"

ঢকঢক করে এক গ্লাস পানি গিলে ফের বলল, "ব্রাশ আর পেস্ট নিয়ে আয় আমার

জন্য একটা। শশুর আব্বাদের সামনে মদের গন্ধ নিয়ে যাওয়া ঠিক না।”

জয় ঘষে ঘষে দাঁত মাজলো। একটু পারফিউম মারল শরীরে। কবীর জিজ্ঞেস করল, “ভাই, আপনে যে পুলিশ ডাকলেন, পলাশ ভাই জানলে কী হবে? মানে আপনে ছাড়া আর কেডা খবর দিতে পারে পুলিশরে? আসলেই তো লাশ এখনও ওই ঘরেই আছে।”-“আরমিণের দোষ দিয়ে দেব? কী কস? পলাশ পাগল কিন্তু জানে আরমিণ ওর বাড়িত গেছিল, ওসহ দেখছে। বলে দেই যে পুলিশরে ওই শালী খবর দিছে। যে বলিটা আগের বার

দেয় নাই শালীরে, এবার দিয়ে দেবে। আমি এইচ-ডি ছায়াছবি দেখব এবার।''

কবীর জানে, জয়ের কোনো কথাই আন্তরিক না আবার যেকোনো কথাই আন্তরিক। সে কখন সত্যি আর মিথ্যা বলে বোঝা যায় না। হাসতে হাসতে সত্যি আর আন্তরিক স্বরে মিথ্যা বলে। সে জিজ্ঞেস করল, "সত্যিই, ভাই?''

-"না, মিথ্যা।''

বিশ্বাস করল কবীর। কারণ জয় যেকোনো পরিস্থিতিতে রসিকতা করে ঠিকই, তবে মিথ্যা কথা বলেনা। কিছুক্ষণ চুপ থেকে হুট করে কিছূ মনে পড়েছে, এমন ব্যস্ত হয়ে বলল,

“ভাই! ওই বাড়ির জমিন তো আপনাদের নামে এখন, তাই না? তাইলে পুলিশ যদি জিগায় যে আপনাদের বাড়িতে এরকম একটা ঘটনা কী করে ঘটল, মানে ফেঁসে যাবেন না? ”

জয় উঠে দাঁড়াল, “তোকে কে বলেছে জমি আমাদের?”-“না মানে...ওই যে শুনছিলাম, আপনারা নাকি বিচার-টিচার করলেন। আমি ভাবছি জমি আপনারা দখল করছেন শেষমেষ!”

জয় গা দুলিয়ে বাচ্চাদের মতো হাসল, “রাজনীতি বুঝিস না রে পাগলা... জমি পলাশের। আজীবন ওই জমি পলাশের। কে

জানি টাকা ধার নিছিল। শোধ করতে পারে নাই। তার বউ আর জমিডা ওর হয়ে গেছে।’’ -“তাইলে ওই মহিলারা থাকতো যে।’’-“হ। ওসব গল্প বানানো হইছিল। এইখানে বেনিফিট পলাশ এবং আমাদের সমান। পলাশ তার জমি ফাঁকা করে ফেলল সামাজিক উপায়ে, খুব যুক্তিগতভাবে, আবার কেউ জানলোও না জমিটা পলাশের। আর আমি আর হামজা ভাই হিরো হয়ে গেলাম সেই সুবিচারগুলোর মাধ্যমে। লোকে ভালোবেসে ভোট দিলো সাহেবকে। এভাবে চলতে থাকলে সামনের সংসদ নির্বাচনে একটা আসন আমাদের। তবে জমির আসল মালিক

পলাশ, এটা আর গোপন থাকবে না। হিন্দু-ফিন্দু বলে কিচ্ছু নেই, পুলিশ আসলেই এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। বুজিচিস?''

কবীর কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। এসব যখন ঘটেছে সে তখনও দলের বিশিষ্ট কোনো মেম্বার ছিলনা, সে এসবের কিছুই জানতো না। বেশ কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করল, আপনি যে হুট করে এসব করতেছেন, "পলাশ ভাই জানলে বা বুঝতে পারলে কী হবে, কিছু ভাবছেন?''বাইরে পুলিশের গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। জয় একহাতে লুঙ্গি উঁচিয়ে ধরে অপর হাতে টেবিলের ওপর থাকা ফোনটা তুলে নিয়ে হেঁটে বেরিয়ে যেতে যেতে জবাব

দিলো, “না ভাবিনি। পরে ভাববো। তবে এখন থেকে নতুন করে খেলতে হবে আবার, অনেকদিন খেলি না। লোক আমাকে হালকা ভাবে নিচ্ছে রে আজকাল!”পুলিশ এলো। স্থানীয় মানুষজন অভ্যস্ত এতে। মানুষজন গাজিপুরকে যখন শিল্প এলাকা বলা হয়, এটাও তবে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক এলাকা বটে। পুলিশের আনাগোনা চলতে থাকে। জয়কে নিয়ে থানা পুলিশের ওসি বেলাল আহমেদ ঢুকলেন পরিত্যক্ত বাড়িটাতে। এখানে নাকি কিছুদিন আগেও লোক বাস করতো। তাদের ব্যপারে বিশেষ জানাশোনা নেই কারও। এখন আর তারা থাকেনা, কবে

গেছে সেটাও জানা নেই কারও।অসহ্য দুর্গন্ধ ঘরটাতে। লাশপঁচা গন্ধ। এখনও সেই সকল নেশাদ্রব্যের অবশিষ্টাংশ পড়ে আছে চটের বস্তা এবং মাদুরের ওপর। সকলে নাকে চেপে ধরে ভেতরে ঢুকল শুধু জয় বাদে।
কনস্টেবলেরা ঘরের এক কোণে ছাঁদের নিচে ভেতরের কার্নিশের ওপর থেকে মোড়ানো মানবদেহের মতো বস্তুটা নামাতে শুরু করল। বেলাল সাহেব গেলেন বেকারী কারখানার সেই পাতাগুলোর কাছে। তিনি দেখে যতটুকু বুঝলেন, রক্ত-পুঁজ পড়ে আছে। মনে হচ্ছে, কারও দেহের পুরোনো ক্ষত ড্রেসিং করা হয়েছে। কিন্তু যে জিনিসটা বেলাল সাহেবকে

হয়রান করে তুলল, সেটা হলো ইষৎ আঠালো ধরণের অফ-হোয়াইট পদার্থটি। হুট করে উনার মাথায় জিনিসটা দেখে যা এলো, তার কোনো ব্যখ্যা খুঁজে পেলেন না।

কবীর কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে অবাক হয়ে জয়কে জিজ্ঞেস করে, "ভাই, ওটা কী? না মানে আমি যা দেখছি, আপনিও কি তাই দেখছেন?"

-"তুই কী দেখছিস? আমি তো একটা সুন্দর মেয়ে দেখতে পাচ্ছি, যাকে আমার এই মুহুর্তে বিয়ে করে ফেলা উচিত।"এই মুহুর্তে রসিকতা জয়ের কাছে আশা করা যায়। কবীর কিছুক্ষণ চুপ রইল। ফরেনসিকের কেউ

আসবে বোধহয়। বেলাল সাহেব বাইরে অপেক্ষা করছেন। জয়, কবীর এবং কনস্টেবল ঘরের ভেতরে। কবীর কৌতূহল দমাতে না পেরে ফের জিজ্ঞেস করে, "ভাই, এই মার্ডারটা কে করছে? আপনি? আপনি কী করে জানলেন এখানে লা-শ আছে? না মানে আপনি... ভাই, খু-নটা আপনি করছেন?"

-"না। প্রশ্ন একটা একটা করে কর। সব জমাট বেঁধে যাচ্ছে মাতার ভেতরে।"

কবীর চুপ রইল। কিন্তু বেশিক্ষণ পারল না, পুনরায় জিজ্ঞেস করল, "তাইলে কে করছে, তা জানেন?"

-"এতক্ষণ জানতাম না, এখন জানতে পারলাম।"

আমার মনে হয় আপনে আগেও জানতেন। জয় হাসল, তাই নাকি?-"মানে?" বেশ জোরে বলে ফেলেছিল, দ্রুত গলা নামিয়ে বলল কবীর, "মানে, বুঝিনি। আপনি আবার কী করতেছেন, ভাই? হামজা ভাই আপনারে দেখে রাখতে বলছে, এবার কিছু হইলে আমায় ছাড়বে না।"

-"কানের গোড়ায় প্যানপ্যান না করে ওই জিনিসটা অল্প একটু আঙুলের আগায় তুলে আন। প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। সাইন্সে মাস্টার্স কমপ্লিট করার কিছু তো ফায়দা হোক!"

কবীর হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। জয় বিরক্ত হলো, "ওমনে ভ্যাবলার মতো চাইয়া আছো ক্যান, বাল! নিজের ঢোল নিজে নাই পিটাইলে ও ঢোলে মরচে ধরে যাবে, তাও কোনো দুলাভাই বাজাবে না। আজকাল মানুষ প্রশংসা করতে চায় না মাইনষের।

আর....ওয়েট! আমি মাস্টার্স পাশ করি নাই? করছি তো! যা অল্প একটু তুলে আন।"

-"ওয়াক থুহ! ছিহ! এসব ছোট কাজ করাবেন আমায় দিয়ে?"

-"বিনা তেলের অমলেট! পজিটিভ ভাবতে শেখ, যে বালডা ভাবছিস, তা না ওইটা, আমি নিশ্চিত। আরেকটু নিশ্চিত হই, আন যা।

''কবীর চোখ বুজে পদার্থটি তুলে এনে সামনে ধরল।সর্বপ্রথম কবীরের হাতটা টেনে জয় নাকের কাছে নেয়। কবীর নাক কুঁচকে চোখ বুজে ফেলল। জয় হাতটা ঝটকা মেরে সরিয়ে বলল, "ওসি মারাইছে! একটা সাধারণ বিষয়কে ঘুরায়ে-পেঁচায়ে ভেবে সমাধান বের কইরবার পারে না, সেই শালাও থানার ওসি হয়ে বসে আছে। তো আমরা ভালো হব কোন দুঃখে? এই হাবুলদের জন্যেই তো ভালো হওয়া হয় নাই আমার। তুই নাহয় ঘাস খাওয়া গরু, ও তো ওসি। ও ক্যান উল্টাপাল্টা ভেবে বাইরে যাইয়া দাঁড়ায়ে রইল?''

আশ্বাস পেয়ে স্বাভাবিক হলো কবীর, “ভাই, কী এইটা? মানে দেখতে তো আজেবাজে জিনিসের মতোনই লাগতেছে অনেকটা!
”পদার্থটি দু আঙুলে ঘষে চেয়ে থেকে বলল, “মেলাটোনিন লিক্যুইড।”
-“কী কাম এইডার? এইডা এইখানে কী করতেছে?”
-“লুডু খেলতেছিল বসে, খেলবি তুই?” বিরক্ত মুখে চেয়ে থেকে আবার বলল, “এক ধরণের হরমোন লিক্যুইড। ওই শালা পাগল পলাশ! ওরে কি আমি শখ কইরা পাগল কই? শালার ভিত্রে যতগুলা মানসিক রোগ আছে, অতগুলা দুনিয়াত আবিষ্কারও হয়নাই। শালার ঘুমের

সমস্যা আছে। ব্রেইন থেইকা ঠিকমতো হরমোন বয়না। পার্টিকুলারলি যহন অকাম করে, তারপর একেবারে চাট্টি-বাট্টি গোল হইয়ে যায়। খু-ন কইরা আলোর সামনে গেলে পাগল হইয়া যায় পুরা। এই লোকটারে মারার পর, নিশ্চিত এইখানে বইসা এই হরমোন লিক্যুইড পুশ করছে। কয়েক বোতল গিলছে, এরপর যাইয়া মরার মতো ঘুম পাড়ছে।''

-"পলাশ মারছে এই লোকটাকে?''

বাইরে বেরিয়ে আসতে আসতে বলল জয়, "হ, এইবার সিওর আমি। ওই পাগল ছাড়া কারও এরম ধরণের মেন্টাল কেইস নাই।

আমার শালটা আন, জ্বর-ঠান্ডা লাগলে তরু ঘ্যানঘ্যান করে। এবার একটু সমাজ সেবার নাটক করি, কী আর করার!''কবীরের কেন জানি বিশ্বাস হলো না জয়ের কথাগুলো। সে পুরুষ মানুষ। পলাশ যদি মেলাটোনিন হরমোন লিকুইড ব্যবহারই করে তো ওখানে পড়ে থাকার তো কথা না। কিন্তু জয়কে আর কিছু জিজ্ঞেস করল না।

শাল এনে দিলে জয় তা পেঁচিয়ে নিলো শরীরে। দাঁড়িয়ে রইল বাইরে। সমাজের অনৈতিকতার বিচারে সে খুব তৎপর, তাকে দেখতে এমনই লাগছিল। একজন নীতিবান, বিপ্লবী ছাত্রনেতার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল

পুরোটা সময়, অথচ একটুও আগ্রহ পাচ্ছিল না পুলিশদের বোকামি দেখতে।

ইনকুয়্যেরি শেষ হতে মাঝরাত হলো। ফরেনসিক স্পেশালিষ্ট জিনিসটাকে মেলাটোনিন হরমোন লিক্যুইড বলে শনাক্ত করলেন। বেলাল সাহেব জিহ্বা কামড়ালেন। তিনি সিমেন ভেবেছিলেন, তা জয়ের কাছে বলে হাসলেনও একদফা। তার বদলে জয় মুখে হেসে, মনে মনে দুটো খাঁটি বাংলা গালি দিলো ওসি সাহেবকে।বাড়ির মালিক সেই হিন্দুকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। কেউ জানেনা এই বেওয়ারিশ জমিটা আসলেই কার, সবার জানামতে কোনো সনাতনধর্মী

লোকের। যে এখানে বসবাস করে না, কিনেছে সালমা বেগমের কাছে, পরে আর ফেরত দেয়নি। সালমা বেগম উঠে চলে গেছেন এখান থেকে। এই কাহিনিই জানানো হয়েছে মানুষকে। অর্থাৎ একেক স্থানের লোক এই কাহিনিটাকে একেক রকমভাবে জানে। আসল কাহিনি কোনটা, অথবা তাদের জানাগুলোর মাঝে আদতেও আসল কাহিনি আছে কিনা, সে ব্যাপারেও ধারণা নেই কারও। এলাকার লোক জানে পড়ে ছিল এই জমি বছরের পর বছর। এরপর একদিন সালমা বেগম কিনেছেন, থাকতে শুরু করেছিলেন কিছুদিন আগে। অন্য এলাকা

বিশেষ করে ভার্সিটি এলাকার লোক আরও অন্যরকম কিছু জানে। কারণ, তাদের ভার্সিটিতে সালমা বেগম আয়া হিসেবে বহু আগে থেকে কাজ করতেন, ভার্সিটি এরিয়ার ধারণা তিনি হয়ত এখানেই থাকেন শুরু থেকে। এবং এই জমির প্যাঁচাকলে মেয়েটিকে খুব নৃশংসভাবে হারিয়েছেন।খুনটা কমপক্ষে চারদিন আগে হয়েছে। ওভাবেই সাদা বস্তায় মুড়িয়ে কার্নিশে তুলে রাখা হয়েছে। এখানে শুধু হিন্দু লোকটাকে পাওয়া গেলেই কেইসটা সলভ হয়ে যাবে না। হতে পারে উনি বহুদিন আসেননি এখানে, তার এই পরিত্যক্ত জমিতে কোনো বদমাইশদের আড্ডা জমে বসেছিল।

ওসির নজর ক্লাবের ছেলেদের ওপর পড়ল, তবে চেপে গেলেন তিনি। করলেও গোপনে তদন্ত করতে হবে এদের সন্দেহ করে। প্রকাশ্যে করা যাবে না। হামজা-জয় চতুরতার লেভেল ছাড়িয়ে এতদূর গেছে, তারা প্রকাশ্যে অনৈতিকতা করে বেড়াবে, অথচ ধরার ফাঁক থাকবে না।

ক্লু একটাই, রক্ত-পুঁজ। এগুলো কার? কাকে ড্রেসিং করা হয়েছিল? মৃতদেহের নয়। কারণ, মৃতদেহে কোনো ক্ষত নেই। তাকে ড্রাগ দিয়ে মারা হয়েছে।

নতুন মেয়র হামজা পাটোয়ারী। মাঝ দিয়ে হামজা বাবা হুমায়ুন পাটোয়ারীকে ঘরে বসিয়ে

ওয়ার্কশপের কাজের ভার দিয়েছেন। নতুন একজনকে পৌরসভার কাউন্সিলর বানিয়ে নিজের হাতে রেখেছে। পুলিশরা আজকাল পুলিশ নয়, তারা কাঠের আসবাব। তাদেরকে ঘরের যেকোনো স্থানে, যেকোনোভাবে, যেকোনো ভূমিকায় সাজিয়ে রাখতে পারে রাজনীতিবিদ এবং সন্ত্রাসশ্রেণীরা।অন্তূর পরীক্ষা ছিল আরেকটা। ভার্সিটি চত্বরে গুঞ্জন।।পরে জানতে পারল, তার দেখা লাশটি ছিল সোহেলের। অর্থাৎ আঁখির বড় ভাইয়ের। অন্তূ নিশ্চিত, পলাশ সোহেলকে মেরে ফেলেছে। ওরা তো বাড়ি ছেড়ে উঠেই গেছে, তবু কেন মেরেছে? ঙ

অন্তূর দেখা পদার্থটি নাকি হরমোন লিক্যুইড। এ ব্যাপারেও অন্তূর সংশয় রয়ে গেল। আজকাল নিজেকে সাধারণ মেয়ে মনে হয় না তার, সে বহুত অযাচিত বিষয়ের সাক্ষী, সহজ বাংলায় সে এক রহস্যবিদ হয়ে উঠেছে। এই ভাবনাতেও হাসি পেল অন্তূর। হুট করে জীবনের ধারাবাহিকতা বদলে গেছে। এর শুরু কোথায়? যেদিন জয়ের সাথে দেখা হলো, সেখান থেকে বোধহয়।পাড়ার লোকে জানে, আমজাদ সাহেবের জমি নিয়ে ভাইয়ের সাথে ঝামেলার চলছে। আজ তিনি যাবেন তার একটা সমাধান করতে। কথাটা রাবেয়া বলে এসেছেন প্রতিবেশিদের। তারা যেহেতু

এই ভয়াবহ সংকটাপন্ন অবস্থায় পুরো একটা দিন থাকবেন না বাড়িতে, প্রতিবেশি সকলকে একটু নজর রাখতে বলে এসেছেন, বাড়ির ওপর। মেয়েটা একা থাকবে, কোথা থেকে কী মুসিবত এসে হামলে পড়বে, আল্লাহ ছাড়া কেউ থাকবে না রক্ষা করার!আমজাদ সাহেব মানসিকভাবে কেমন আছেন, তা তার গাম্ভীর্য ছেঁদ করে বুঝে ওঠার উপায় নেই। শারীরিকভাবে চলার মতো। শরীরে বিভিন্ন স্থানে রক্ত জমাট বাঁধা। কড়া ডোজের ব্যথার ওষুধ এবং অ্যান্টিবায়োটিক উনার শরীরের সমস্ত জীবনীশক্তি শুষে শুধু খোসাটা ছেড়ে দিয়েছে যেন। ডাক্তার রিলিজ করার সময়

বলেছিলেন, এইসব স্থানে একসময় জমাট বাঁধা রক্তের দানাগুলো টিউমারে পরিণত হতে পারে। রক্ত-চাপ অতিরিক্ত বেড়ে গিয়েছে উনার। রোজ দুবেলা 'ওমলেসি ৪০ মি.গ্রা' এর টেবলেট খেতে হচ্ছে। সাথে ঘুমের ওষুধ। অর্থাৎ, অল্প খানিক আর বাড়লে ব্রেইনে স্ট্রোক এট্যাক হতে সময় নেবে না। অন্তূ নিজহাতে ওষুধ খাইয়ে, বেশ কিছুক্ষণ আব্বুর সাথে কথা বলে রুমে এসেছিল সুই নিতে। উনার পাঞ্জাবীর কলারে একটা বোতাম ছিঁড়ে গেছে।তখন অন্তিক এলো রুমে। বহুবছর পর এলো। অন্তূ সহজভাবে নিতে পারল না ব্যাপারটাকে। বিছানায় বসতেই প্রশ্ন

ছুঁড়ল, “অন্তিক! মানুষ দেনার দায়ে পড়লে কুকুর হয়ে যায়?”

অন্তিক নির্লজ্জের মতো হাসল, “বউ যদি বাপের বাড়ি থেকে এক পোটলা গয়না এনে দিয়ে বলে, নাও, এগুলো দিয়ে ব্যবসা করবে। যাতে তোমার বাপ না বলতে পারে, তুমি অপয়া, বউ খেতে দেবার মুরোদ নেই। তাহলে বোধহয় হয়।”-“তাতে ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলে পুরুষ? আমি বুঝতে পারছি না, আজই বা কী এমন বদলেছে যে তুই বদলে গেছিস? এই তো দুদিন আগেও কথা বলতি না, হুট করে কী নতুন নাটক শুরু করেছিস? অবশ্য

লাইফে বিনোদনের দরকার আছে, দে তুই একটু বিনোদন দে।”

-“আব্বু, তোমার মেয়ের মূখের ভাষা এত কঠোর কেন?”

আমজাদ সাহেব কথা বললেন না।

অন্তিক বালিশ টেনে নিয়ে অস্থায়ীভাবে শুয়ে পড়ল। পায়ের ওপর পা তুলে শুয়ে বলল, “ওই যে একটা কথা আছে না? মেহনত করো চুপচাপ, এরপর আওয়াজ করে লোককে জানাও নিজের সফলতার কথা।”

হো হো করে হেসে উঠল অন্তিক, “আমি সেটাই এপ্লাই করতে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, একবার সফল হলে আব্বুর

কাছে যে অপরাধ করেছি, সফল হয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বলব, আব্বু আমি ততটাও অপদার্থ না, যতটা তুমি ভেবেছিলে।কিন্তু শালা কপালের পাল্টিবাজী দেখেছিস? পলাশের ছেলেদের চাঁদা দিতে আরও ঘর থেকে নিয়ে যেতে হয়েছে। পুঁজি খেয়েছে, আমাকে খেয়েছে, মার্জিয়া আরও কত কী এনে দিয়েছে সেসব বিক্রি করে নিয়ে গিয়ে দিয়েছি, অথচ ওদের ক্ষুধা মেটেনি। আমার এইসব ব্যর্থতা, হতাশা তোরা কেউ না জানলেও মেয়েটা জানতো সব, সহ্যও করতো। আর এই কৃতজ্ঞতায় ওর সব অসভ্যতামি সহ্য করে গেছি। এই পরিণতি নিয়ে আব্বুর সামনে

দাঁড়াতে পারিনি। লজ্জায় দু'বার মরার চেষ্টা করলাম, তাতে তোদের ওপর মার্জিয়ার ক্ষোভ আরও বাড়ল। মেয়েটা বহুত ত্যাগ করেছে এই সংসারে এসে। আমার অবস্থা দেখে, সেসব একসাথে সইতে সইতে কবে যে এমন জাহিল নারী হয়ে উঠেছিল! মাঝেমধ্যে মনে হতো, ওর মানসিক অবস্থা বিগড়ে গেছে আবার ওই হাল দেখে। আমার ওই অবস্থার জন্য আব্বুকে দায়ী করতো ও। আব্বু নাকি কঠোর, গম্ভীর। তাই ওনার সামনে দাঁড়িয়ে আমি সত্যি বলতে পারি না। বোনের গহনা এনে দিয়েছিল ব্যবসা করার জন্য। ওর বোনের শশুরবাড়ি থেকে তালাক দেবার কথা

বলছিল গহনা ফেরত দিতে না পারলে।”অন্তূ এতক্ষণে নির্লিপ্ততা ভেঙে তাকালো অন্তিকের দিকে। এই নিয়ে একদিন উল্টা-পাল্টা ঝামেলা হয়েছিল মার্জিয়ার সাথে। মার্জিয়া কথা শুনিয়েছিল অন্তূকে। অন্তিক কিচ্ছু বলেনি সেদিন।

বেশ কিছুক্ষণ আপন মনে প্যাঁচাল পেরে উঠে বসল অন্তিক। ঝুঁকে বসে বলল, “আমি বোধহয় পাগল হয়ে গেছি রে, অন্তূ! আমার কোনো কিছুতেই কোনো রিয়েকশন আসেনা, না লজ্জা, না সম্মান, না কোনো হেলদোল। যা হচ্ছে, সব কেমন তুচ্ছ লাগে আমার জীবনের খেলার কাছে। বোনকে পুরুষ দিয়ে ছুঁইয়ে

দিয়েছি, বাপের মন ভেঙেছি, পড়ালেখা ছেড়েছি, সব ছেড়েছুঁড়ে যে মেয়েটাকে ঘরে আনলাম, তাকে অবধি ধ্বংস করে ছেড়েছি। আমি আত্মহত্যা করলেও কি পাপ হতো, মহাপাপ? হতো রে অন্তূ?''

-“না হতো না। আত্মহত্যাতে কোনো পাপ নেই, ওটা একটা সাহসের বিষয়। কঠিন সাহস না থাকলে কেউ এই দুঃসাহসিক কাজ করতে পারে না। তুই আর আমি একসাথে সুইসাইড করব, কেমন? একা মরলে মজা পাব না, তুই সঙ্গে থাকলে মরতে ভালো লাগবে।''

অন্তূকে দেখল অন্তিক। কেউ কেউ অতিরিক্ত যন্ত্রণায় ভেঙে পড়ে আর কেউ বা অন্তূর মতো নিষ্ঠুরতায় ঢেকে ফেলে নিজেকে।সকাল আটটার পর বেরিয়ে গেল সকলে। আমজাদ সাহেব অন্তূকে বললেন, "দরজা আঁটকে পড়তে বস। বিকেলেই ফিরে আসব আমরা।" যতদূর দেখা গেল, গলির মাথা অবধি চেয়ে দেখল অন্তূ আব্বুর ধীর পায়ে হেঁটে যাওয়ার দৃশ্য।

পড়ায় মনোযোগ পেল না। কেমন এক অস্থিরতা ঘিরে ধরছে। ঘুরে ফিরেই পলাশের রুফটপ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। নফল নামাজে বসতে ইচ্ছে করল অন্তূর।

গোসলের পানি শরীরে ঢালার সময় প্রতিটা পানির ফোঁটা তাকে সতর্ক করতে চাইছিল যেন। অদ্ভুত এক আশঙ্কাজনক আতঙ্কে ছটফট করছিল ভেতরটা। কোনোকিছুতেই মন টিকছে না। আশপাশটা ঠিক তেমন গুমোট হয়ে আছে, কালবৈশাখী ধেয়ে আগে পরিবেশে যেমন থমথমে অসহ্য তপ্ত নিস্তব্ধতা বিরাজ করে।

ধুপ করে একটা শব্দ হলো কোথাও। ট্যাপের পানির আওয়াজে তা প্রকট হলো না কানে, তবে কানে এলো ঠিকই। শরীরে এক প্রকার কম্পন টের পেল অন্তূ। গোসলটাকে তার বিষাক্ত লাগছে। কীসের গোসল করছে আল্লাহ

জানে! গোসলের পানি শরীরে এমন জ্বালা ধরায়?গেইটে ধুমধাম আওয়াজ হচ্ছে। করাঘাতগুলো ধীরে ধীরে শক্ত ও ভারী হয়ে উঠছিল। অন্তূ সম্বিত পেয়ে দ্রুত শরীর মুছে শুকনো কাপড় পরতে লাগল। কারা এসেছে? ওদিকে গেইট ধাক্কানোর মাত্রা ক্রমশ বিকট হয়ে উঠছে। অন্তূ কোনোরকম মাথায় গামছা পেঁচিয়ে তার ওপরই ওড়নাটা দেহে পেঁচিয়ে নেয় ব্যস্ত হাতে।অন্তূর ধারণা পলাশের ছেলেরা এসেছে। সে দরজায় কান বাধালো। বেশ লোক জমেছে। আজকাল তাদের বাড়িটা মানুষের আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে

কিনা। একটু কিছু হলেই মানুষ আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসে।

দুটো শ্বাস ফেলে গেইট খুলল সে। হাতটা থরথর করে কাঁপছে। কী আশ্চর্য! অন্তূ বুকভরে দম নিলো।

জয়ের ক্লাবের ছেলেরা দাঁড়িয়ে আছে। কবীরকে অন্তূ চেনে, সে চুপচাপ এককোণে দাঁড়িয়ে কেমন করে যেন তাকিয়ে ছিল অন্তূর দিকে। অন্তূ বেশ বিনয়ের সাথে বলল, "কেন এসেছেন আপনারা? কিছু হয়েছে?"

-"জয় ভাইকে ডাকতে এসেছি। একটু ডেকে দেন।" রাহাত বলল। তার অভিব্যক্তি একদম সরল-বাস্তব।

অন্তূ নিজেকে যথাযথ শান্ত রেখে বলল, “জি? বুঝতে পারছি না!”জয় ভাইকে ডেকে দেন। কাজ আছে ক্লাবে। কতক্ষণ হইলো ভেতরে ঢুকছে। বলেন আমরা আসছি।

অন্তূর হাতের আঙুলের ডগা লাফাচ্ছে। হাতের তালু ঘেমে উঠেছে। বুকের ভেতর ঢিপঢিপ করছে। সে মুঠো করে তার কামিজ চেপে ধরে বলল, “মশকরা করার মতো মেজাজ নেই আপাতত আমার। আপনারা কী বলছেন, বুঝতে পারছি না অথবা এরকম কোনো ইঙ্গিত বুঝতে চাইছি না।”

রাহাত জয়কে ডাকতে ডাকতে ভেতরে এগিয়ে যেতে যেতেঞ বলল, “এই যে,

ছোটআপু। আপনার সাথে আমাদের মশকরার সম্পর্ক না। জয় ভাই ঢোকার আগে বলছিল, একটু পর যেন ডাকি তারে। ক্লাবে ঝামেলা হইছে। উনাকে দরকার। একটু ডাকেন উনাকে। চলে যাইতে বললে চলে যাচ্ছি, কিন্তু উনাকে জানানো খুব দরকার। খবরটা জানিয়ে চলে যাব, কিন্তু তবুও ডাকেন একটু। ঘুমাচ্ছে নাকি?" রাহাত পারফমেন্স ভালো ছিল। সন্দেহের অবকাশ নেই তার অভিব্যক্তিতে। অন্তূর মাথায় যেন টগবগিয়ে আগুন জ্বলে ওঠে। ততক্ষণে পাড়ার লোক ঘটনায় বেশ আগ্রহ পেয়ে বসেছে। কেউ কেউ নিজেদের মাঝে আলোচনা শুরু করেছে, তো কেউ

অপেক্ষা করছে আগামী দৃশ্য দেখার। অন্তূ অনেক কষ্টে সামাল দেয় নিজেকে, “তো আপনার ভাষ্যমতে, আপনাদের জয় আমিরের বাড়ির ভেতরে থাকার কথা?”

রাহাত আর কথা বলল না। আত্মবিশ্বাসী গলায় ডাকা শুরু করল, “জয় ভাই? জয় ভাই? ঘুমায়ে গেছেন নাকি?”

অন্তূর নাক শিউরে ওঠে, “বাড়াবাড়ি করবেন না যেন। ধৈর্য্যেও একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে বহন করি আমি। এখান থেকে জুতো দিয়ে পিটিয়ে বের করবে লোকে আপনাকে। নাটক না করে বেরিয়ে যান। অনুমতি ছাড়া ভেতরে ঢুকছেন কোন সাহসে?”রাহাতের কান অবধি

পৌঁছালই না সেসব। তার মুখে-চোখে আত্মবিশ্বাস ভর্তি গাম্ভীর্য এবং দৃঢ়তা। সে আবার ডাকে, “জয় ভাই? ঘুমাই গেছেন নাকি? জয় ভাই...”

অন্তূ মাথা ফাঁকা লাগছিল। সে জানে, ভেতরে কেউ নেই। তবুও বুকের ভেতরে ধুপধুপ আওয়াজ হচ্ছে, রাহাতের চোখে মুখের আত্মবিশ্বাস তাকে ভঙ্গুর করে তুলছিল। সামনের আগ্রহী জনতার মুখের দিকে তাকিয়ে তার শরীরে কম্পন উঠে যাচ্ছিল। জয় বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে। সবে ঘুম ভেঙেছে তার। হাই তুলল একটা। অন্তূ দেখল সেটা কৃত্রিম। জনগণ তা বুঝল না কেবল।

জয় ঘুম ঘুম গলায় বলল, “কী সমস্যা? এত ডাকাডাকি কীসের?”

অন্তূ জমে গেল। তার মস্তিষ্ক এবং হৃৎপিণ্ড একত্রে কার্যক্ষমতা হারাল। জয়ের পরনে শুধু একটা থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট, সেই প্যান্টের ওপর দিয়ে নিচের আন্ডারওয়্যারের অল্প কিছুটা দৃশ্যমান হয়ে আছে। নীলচে-কালো শার্টটা হাতে ছিল, গায়ে কিছু নেই, তা কাধে রাখতে রাখতে ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে গেইটের কাছে দাঁড়ায় জয়। দেখতে বিশ্রী লাগছিল ব্যাপারটা। এবং তা সপষ্ট নোংরা ঘটনার ইঙ্গিত দিচ্ছে।অন্তূর মনে হচ্ছিল, সে মরে যাচ্ছে। আঁটকে থাকা নিঃশ্বাসটুকু কম্পিত

তরঙ্গ মতো বাতাসে আঁছড়ে পড়ে। জয় অন্তূকে জিজ্ঞেস করল, “কী ব্যাপার আরমিণ! এত লোকের ভিড় ক্যান? কী হইছে?”

অন্তূ নির্জীব হয়ে উঠল। লোকেরা এবার একে একে নিজেদের মূল্যবান মন্তব্য পেশ করল। সর্বপ্রথম অবাক চোখে এগিয়ে এলেন পাশের বাড়ির দুজন মহিলা, “আরে? এইডা ওই যে মেম্বারের ভাগনি না? জয়! ওওও! ঘোমটার তলে খেমটা চলে মাইনষে কি আর এমনি কয়? এই যে শোনো সগ্গলে, আইজকা যা দেখতেছ নতুন কিচ্ছু না। আমরা একদিন হেরে বাড়িত যাইয়াও ওই পোলারে দেখছি। ছেঁড়ির মা কত আদর কইরা খাওয়াইতেছিল,

ছি ছি ছি! থুহ! মাস্টারের মাইয়া! হুহ! আবার মুকুশ পইরে বেড়ায়। কাউরে মুখ দেহায় না। ভণ্ডামি দেখছো? ঘরের ভিত্রেই যদি প্রতিদিন এমনে বেটাছেলে পাওয়া যায় হেই আবার বাইরে কারে মুখ দেহাইবো? দরকারই তো নাই। নষ্টামি তো ঘরের ভিত্রেই চলতাছে।

''একজন লোক জিজ্ঞেস করে মহিলাকে,

"আগেও দেখছেন নাকি ওই চেংরারে... মাইনে জয়রে?''

মহিলা তাচ্ছিল্য করে একদলা থুতু মাটিতে ফেলে, আড়চোখে উদ্দেশ্য তার অন্তূর ওপর,

"হ দেখছি মানে? ওর মায় তো আব্বা আব্বা কইরা খাওয়াতেছিল। আমরা ঢুকতেই তাত্তারি

বাইর হইয়া গেল। ওর বাপ আইলো, হেইও ভিত্রে চইলে গেল, কিস্যু কইল না। ওইদিনই সন্দে হইছিল। আবার এই ছেঁড়ি সেদিন দেখলাম মুকুশ না পইরাই বাইরেত্তে ঘুইরা আইলো।''

অন্তূ চোখ বুজে সজোরে শ্বাস টেনে নেয়। জয়ের ভবিষ্যতবাণী মিথ্যা হয় না! এক রত্তিও ভুল বলে না জয়।ওর তো গণক হওয়া উচিত! সেদিন পলাশের ছাদে হাসতে হাসতে কী চমৎকার করে বলেছিল, ''তুমি আমায় থুতু দিলে, আরমিণ? লোকেও তোমায় থুতু দেবে, সত্যি বলছি!''জয়ের প্রতি মুগ্ধতায় অন্তূর দুচোখ ভিজে ওঠে অন্তূর। একটা

লোকের এত জেদ? নিজের অপরাজেয়, অনৈতিক শক্তির ওপর এত দম্ভ? এত তার কূটিলতা? আর শক্তিও তো অগাধ! বাঁচাতেও পারে, মারতেও! সেদিন বাঁচিয়ে এনেছে আজ মারার জন্য! ঠোঁটের কিনারায় হাসি ছলকায় অন্তূর। বহুবার সতর্ক করেছে জয় ওকে, অথচ খুব হালকাভাবে নিয়েছে সে। ভার্সিটিতে প্রতিবার জয়ের চোখে তাকিয়ে রুহু কেঁপে উঠলেও পরে ভুলে যেত জয়ের নির্লিপ্ততা দেখে। অথচ জয় বলেছিল, "সে সে থাবা দিয়ে ধরেবে না, কুকুরের ছ্যাঁচড়ামির মতো ধীরে সুস্থে নির্লজ্জতার সাথে ধরবে, ঝরঝর করে ঝরে পড়বে অন্তূ।"

অন্তূ অবাক হলো সবচেয়ে বেশি, সবার অভিনয়ে।বাস্তবের চেয়েও বেশি বাস্তব তাদের অভিব্যক্তি। সাজানো, পরিকল্পিত ঘটনাকে জীবন্ত করে তুলেছে ওদের অভিনয়।

এক বৃদ্ধা এগিয়ে আসে, "এই ছেঁড়িরে একঘরে করো বাপু সকল। এইসব পাড়াডার বদনাম করবো। ও ছেঁড়ি, এত দেহি পদ্দা করো, তুমার পদ্দার উপ্রে থুহ। ঘরে বেডা শুয়াইয়া রাখতে দিয়া বাপ-মায় গেছে কোনে? ছি ছি ছি ছি? বাপের জর্মে এইসব দেহিনাই।"অন্তূ চুপচাপ দাঁড়িয়ে শোনে সবার মূল্যবান মন্তব্য। কেউ কেউ বলছে, 'এইজন্যিই তো কই, দজ্জা খুলতে এত দেরি লাগাইতেছ ক্যা?

সেই কখন থেকে আইসা এই ছেঁড়াগুলান ডাকতেছিল, খোলে না তে খোলেই না।'

অন্তূর বিয়ে নিয়ে এসেছে বহুলোকে বহুবার। অন্তূ অপমান করতো অথবা প্রত্যাখান। তারা আজ তাকে ছাড়বে কেন?

মহিলা এসে এক থাবায় অন্তূর মুখ থেকে ওড়নাটা টেনে খুলে ফেলে। বেরিয়ে আসে সদ্য গোসল করা গামছাটা মোড়ানো ভেজা মাথাটা। সকলে কয়েক সেকেন্ড হাঁ করে হিসেব মেলায়! এবার তারা দৃঢ় বিশ্বাসে ফেটে পড়ে। চমৎকারভাবে প্রমাণ হয়ে গেল তাদের কাছে অন্তূর নোংরামি। এতক্ষণ সন্দেহ ছিল তাদের। এবার আর রইল না। 'নষ্টামি করে

লাং শুইয়ে রেখে আবার গোসল করে বের হয়েছে!'—গুঞ্জন উঠল।

'ওহ! তাইলে কুকাম করে লাংরে বিছানায় শুয়াইয়া রাইখা ফরজ গোসলে ঢুকছে মা-গী? হেরপর সেইখান থেকে বাইর হইয়া আইছো? ওরেছিঃ ছি ছিই!' রব উঠল মন্তব্যের।অন্তূ অন্তত মোড়ানো গামছাটা মাথায় রাখতে চেয়ে তাও পারল না। মহিলা টেনে হিচড়ে খুলে ফেলে গামছাটা। পিঠ বেয়ে ছিটকে পড়ল ভেজা লম্বা চুলগুলো। কাঠের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রয় অন্তূ। সে অবাক হচ্ছে, তার কোনো প্রতিক্রিয়া আসছে না, কান্না পাচ্ছে না।

জয় একটা সিগারেট ধরিয়েছে। ধোঁয়া গিলছে। অন্তূ না তাকিয়েও টের পায়, জয়ের চোখদুটো হাসছে। খিলানের মতো নাকের পাটা'দুটো ফুলে ফুলে উঠছে, আবার ভ্রু জোড়া অহংকারে পুরু হয়ে উঠছে। জয় খারাপ কিছু করার পর খুব সজল হয়ে ওঠে, যেন সে খানিক জীবনীশক্তি পায়। তার খারাপ হওয়ার পিছনে কোনো কারণ নেই, সে খারাপ তাই সে খারাপ।অনেক লোক জমেছে খেলা দেখতে। এক বৃদ্ধা এবার হই হই করে উঠলেন, "ওই ওই ওই, তুমরা কি এমনেই দাঁড়াইয়া ওই মা-গীর ঢং দেখবা? চুল-নাক

কাইটা বাইর করো ওসব বালাই দ্যাশ থেকা।
"

কেউ কেউ পরামর্শ দিলো, শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ব্যাভিচারের শাস্তি মাটিতে গলা অবধি পুঁতে আশিটা বেত্রাঘাত। অন্তূ তাদের আলোচনা খুব মনোযোগ সহকারে দেখছিল এবং শুনছিল।

অন্তূর দিকে তাকাল জয়। চোখাচোখি হলো দুজনের। অন্তূর ঠোঁট দুটো হেসে উঠল। যে কেউ দেখতে পাবে না সেই হাসি। তরল রক্তের মতো চিকচিক করছিল সেই হাসি অন্তূর চোখের তারায়।

পুরুষ এবং কলঙ্ক এ দুটো শব্দ একসাথে হয় না কখনও। কলঙ্ক শব্দটি নারীসত্ত্বার জন্য প্রযোজ্য কেবল। পুরুষ কলঙ্ক বইতে জন্মায় না জগতে। তারা স্বাধীন, তারা আমরণ কলঙ্ক-বিচ্ছিন্ন। একই পাপের মাশুল পুরুষ ও নারীর জন্য ভিন্ন হয় এ সমাজে। নারীর মসৃণ চামড়ায় বরং কলঙ্কের জন্য অনুকূল পদার্থ লেগে থাকে, নারী কলঙ্কের জন্য এবং কলঙ্ক নারীর জন্য চুম্বকের মতো আকর্ষিক। একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে দুটোকে আনলে দুটো ছিটকে এসে পরস্পরের দেহে লেপ্টে যায়; চিরতরে। জয়ের ক্ষমতা অসীম। তার দিকে আঙুল তোলার সাধ্যি কারও নেই। তারা অন্তূর

দোষের কলঙ্কও অন্তূর গায়ে এবং জয়েরটুকুও একসঙ্গে অন্তূর গায়েই ছিটিয়ে দিচ্ছিল।

মৌলবী সাহেব এলেন। সব শুনলেন। বেশ কিছুক্ষণ চুপ রইলেন। হামজা এসে বসেছে। তাকে চেয়ার দেয়া হয়েছে মৌলবি সাহেবের পাশে।

অন্তূর খোলা চুলগুলো শুকিয়ে গেছে। আজ সবাই পরাণভরে অন্তূকে দেখেছে। মাস্টারের মেয়েকে সেই ছোট বেলায় দেখেছিল সবাই, এরপর বহুবছর আর দেখেনি কেউ। অথচ মাস্টারের মেয়ে যে ঘোমটার তলে তলে নষ্টামি করতো তা কি কেউ আন্দাজ করতে পারেনি? কতবার তারা মাস্টারকে বলেছিল,

ভার্সিটিতে না পড়িয়ে বিয়ে করিয়ে দিতে। মেয়েটার দেমাগ ছিল বেশি। আজ পঙ্গু হয়েছে তো! পাড়ার পুরুষেরা মন ভরে দেখল অন্তূকে। ফর্সা শরীরে খয়েরী রঙা ঢিলেঢালি সেলোয়ার কামিজ, ওড়নাটা গায়ে আছে কোনোমতো। উস্কো-খুস্কো লম্বা লম্বা চুল পিঠে অবহেলিতভাবে ছড়ানো।হামজার পরনে সাদা ধবধবে পাঞ্জাবী। মেয়র সে। তার মুখটা কঠিন মৌলবি সাহেব বললেন, "যেহেতু অবিবাহিত নারী-পুরুষ ব্যাভিচারে লিপ্ত হইছে, সেই হিসাবে শরীয়তের বিধান হইল, দুইজনকে দোর্রা মারা। মরে গেলে গেল, বেঁচে থাকলে পাপ মুক্ত।"

একে অপরের দিকে চাওয়াচাওয়ি করে লোকেরা। এইসব আগের কালে দেখা যেত। এখন এসব উঠে গেছে। মানুষ প্রকাশ্যে অকাম করে বেড়াচ্ছে। তবুও পাড়াটা তো আর বোর্ডিং বা হোটেল না!—সবার আলোচনা একই রকম। তারা এর একটা বিহিত চায়। আর তাছাড়াও সকলের মাঝে একটা চাপা ক্ষোভ বোধহয় জয়ের জন্যও কাজ করছিল। জয় খারাপ তা সবাই জানে, সবাই। অথচ ভয়ে কেউ মুখে আনলো না, বোঝাতে চাইল না কিছুই।

অন্তূ আকাশের দিকে তাকায়। কয়েকবার প্রাণভরে আব্বুকে ডাকল। কোনো সাক্ষ্য

প্রমাণ প্রয়োজন হয়নি তাকে ব্যভিচারিণী বলার জন্য। জয়ের ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা আর অন্তূর ভেজা চুল যথেষ্ট। আব্বু আসবে বিকেল বা সন্ধ্যায়। অন্তূ চায়, তার আগে তাকে মেরে ফেলা হোক।

এতক্ষণে তার একটা শব্দও শোনেনি কেউ বা বলার সুযোগ দেয়নি। সে আর বলতেও চাইল না। কলঙ্ক এখন অ-প্রমাণিত হলেও মুখে মুখে একটা দাগ এবং রটনা থেকে যাবে। সবচেয়ে ভালো হয় মরে গেলে। অন্তূর খুশি লাগছিল খুব।

বেশ কিছুক্ষণ নিরবতা পুরো জনতার মাঝে। তা ভাঙল হামজা। মৌলবিকে বলল, “আর

কোনো বিকল্প নেই এর? আপনাদের ভাষ্যমতে যা হবার হয়ে গেছে। আর কোনো গ্রহনযোগ্য শাস্তি বা মীমাংসা আছে?''

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। এরপর একজন বৃদ্ধলোক এগিয়ে আসে হামজার দিকে। বৃদ্ধদের সাথে সামাজিক কর্মের মাধ্যেমে হামজার বেশ খাতির আছে। লোকটা হাইকোর্টের সাবেক উকিল। তিনি যেন রাগত স্বরে তাচ্ছিল্য করে চট করেই বললেন, ''আর কী করবে? যা ঘটনার বিবৃতি আসছে, বিয়ে দিয়ে বাড়ি নিয়ে যাবে?''সকলে সপ্রতিভ হয়ে উঠল। এই পদ্ধতিই তো চলমান এখন। দোর্রা মারার প্রচলন এবং কাল চলে গিয়েছে। এখন

কেউ অকাম করলে ধরে বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়। হামজা নিজস্ব গাম্ভীর্য বজায় রেখে অথচ চট করে বলে ওঠে, "ধরুন যদি দিয়ে দিই? আপনারা তা গ্রহণ করবেন, সম্মতি দেবেন? সিদ্ধান্ত আপনাদের হাতে।"

অন্তূ হৃদযন্ত্রটা লাফিয়ে উঠল। হামজা অতিরিক্ত চতুর। তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সে এত চমৎকারভাবে নিজেকে উপস্থাপন করছে, মানুষ এতক্ষণে তাকে মহান ধরে নিয়েছে।

বৃদ্ধ বললেন, "বিয়ে দিতে চাও, তুমি?"

-"আমার যদি আপত্তি না থাকে মেয়েকে জয়ের বউ করে ঘরে তুলতে! যা করেছে

জয়ের সাথেই তো করেছে! আপনাদের মতামত কী?''অন্তূ মাথাটা ঝিনঝিন করে ওঠে। সকলের মাঝে গুঞ্জন উঠল। মনে হলো বেশ পছন্দ হয়েছে বিষয়টা সবার।

জয় গর্জে উঠল হামজার কানে, "পাগল হইছো তুমি? ওই শালীর মেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরবে, তবুও দেখা যাচ্ছে আমায় কবুল করবে না। আমিও ওরে বিয়ে করতে পারব না। ওর সাথে আমার পোষায় না, আমার ওর মাঝে বিশাল ঘাপলা আছে... মাঝে কাহিনি জটিল। এসব বাদ দাও। অন্যকিছু করো।''

হামজার কানে গেল না সেসব।

অন্তূ হুড়মুড়িয়ে মৌলবির সামনে যায়, "হুজুর? আমার কিছু কথা বলার আছে। আমার কথাটা একবার শুনুন। আমি..." উদ্ভ্রান্তের মতো ঢোক গিলল মেয়েটা, "....আমি কিছু কথা বলতে চাই।"

মৌলবি অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। অন্তূ অনুমতির অপেক্ষা করে না, "বিশ্বাস করুন এমন কিছুই হয়নি। যা দেখেছেন আপনারা সব চোখের ধাঁধা। মানে আমি বোঝাতে পারছি না ব্যাপারটা। আপনাদের যা দেখাতে চাওয়া হয়েছে, আপনারা তাই দেখছেন। আসলে এমন কিছুই হয়নি। কৌশলের কাছে হেরে গেছেন আপনারা। এখানে নিখুঁত একটা

ট্রিক্স খাটানো হয়েছে।''কারও কানেই যেন গেল না অন্তূর ভারী শব্দের কথাগুলো। অন্তূর শিক্ষিত, মার্জিত, যুক্তি-তর্কের কথা হিতে বিপরীত কাজ করতে শুরু করল। অন্তূ থামে না। বলে চলে, "জয় আমির আমাদের বাড়িতে কী করে ঢুকেছে সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই আমার। আমি গোসলে ছিলাম, তাই গেইট খুলতে দেরি হয়েছে। জয় আমির ভেতরে কী করে এলো সেটাই অস্পষ্ট আমার কাছে..''

উপস্থিত জনতা বিরক্ত হয়ে গেল, "তো কী চাইতেছ? মানে এইসব নাটক দিয়া কী বুঝাইতেছ, ওইডা কও! এই ছেঁড়িরে কেউ

ধরেন তো।’’অন্তূ গর্জে উঠল, “আমি কোনো পাপ করিনি, আমি বিয়ে করব না। আপনারা জুলুম করছেন আমার ওপর...’’

থপ করে একদলা থুতু এসে মুখে পড়ে অন্তূর গলার কাছে। জয় অসন্তুষ্টিতে চোখ বুজে ফেলে—ইশ! অল্পের জন্য থুতু মুখে লাগেনি। আর একটু উপরে ফেললেই মুখে পড়ত থুতুটুকু। অন্তূর ছোঁড়া থুতু জয়ের চোয়ালের ওপর দিয়ে চোখের কিনারা ঘেষে লেগেছিল। মহিলাটা ঠিকমতো থুতুও দিতে জানেনা! মহিলাকেও কিছু অশ্রাব্য গালিগালাজ করল জয়।থুতু ছুঁড়ে দিয়ে মহিলা চুল ধরে টেনে তুলল অন্তূকে। অন্তূর শরীরের এক পাশ

থেকে ওড়নাটা পড়ে গেল। চোখদুটো বুজে জোরে করে ডেকে উঠল অন্তূ, “আব্বু!” টুপ করে এক ফোঁটা অশ্রু পড়ল মাটিতে।

অন্তূ খারাপ মেয়ে। তার শরীরে ওড়না তুলে দেবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করল না কেউ। মহিলা বলল, “লাংয়ের সাথে বিছানায় যাইতে মন চায়, বিয়ে কইরা তার বাড়িত যাইতে মন চায় না? এতক্ষণ তাও যা ভাবনায় আছিলাম, তুই তো তার চাইতেও বেশি শয়তান মাইয়া! আমার মাইয়া হইলে জিন্দা কবর দিয়া থুইতাম। মাইয়ারে বয়স চৌদ্দ হইতেই বিয়া দিয়া দিছি। তোর মতোন বে-শ্যা পুষি নাই কলেজে পড়াইয়া।”

অন্তূ তার তপ্ত চোখদুটো তুলে তাকাল, “আমি কিচ্ছু করিনি, অপবাদ দিচ্ছেন চাচি আপনি।”

ওড়নাটা তুলে বুকে জড়িয়ে নিলো।“হ, কিছু করোস নাই। খালি লাংয়ের সাথে বিছানায় শুইছিস। তাই তো কই বিয়া করবার চায় না, ভার্সিটিত পড়বার চায়, হুহহ? সেইদিন মা খাওয়াইছে, আইজ ঘরে স্বয়ং ব্যাটাছেলে ঢুকাই দিয়া বাইরে গেছে গা! এতই যহন রঙ মনে তাইলে আবার বিয়া করবার চাও না ক্যা তারে?”

অন্তূর সহ্যক্ষমতা ছড়ালো, চিৎকার করে উঠল ও, “আর একবার কেউ আমার বাপ-মায়ের দিকে নির্দেশ করে কথা বললে পড়ে থাকা

ইট তুলে তার মাথাটা দুই খন্ড করতে আমার হাতে বাঁধবে না।”

জনতাদের একজন বিরবির করে বকে উঠল, “মা-গীর তেজ এখনও কমেনি? ঘরে বেটাছেলে ঢুকানো মাইয়ার মুখে...”অন্তূর কানে এলো কথাটা, জবাব দিলো, “জি না, তেজ একটুও কমেনি। কী করবেন আপনি? আমার মুখে কী? মেরে ফেলবেন? আপনারা না পরিকল্পনা করছিলেন, বেত মারার? শুরু করুন। আপানদের ভাষ্যমতে পাপ যখন করেছি, শাস্তি আমার পাওয়া উচিত। শরীয়ত অনুযায়ী শাস্তি দেয়া শুরু করুন। কোনো নাটকীয় শাস্তির জন্য প্রস্তুত নই আমি।

আপনাদের আন্দাজ করা পাপের শাস্তি কখনও বিয়ে হতে পারে না। বেত্রাঘাত করুন।”

মৌলবি সাহেব জিজ্ঞেস করলেন জয়কে, “তোমার কী মতামত?”

জয় অন্তূর ওপর থেকে চোখ ফিরিয়ে বলল, “হুহ? আমার? আমার মত...আমার আর কী মত? আপনারা বললে বিয়ে করব! না করার কিছু নেই।” শেষে আস্তে করে চিবিয়ে বলল, “আফটার অল শালী সুন্দরী, আমার বদনাম তার গায়ে আমার নামের।”অন্তূ চোখ দিয়ে অনুরোধ করে ওঠে, “প্লিজ! এমন করবেন না। আমি সত্যি বলছি অনেকদূর চলে যাব।

আর কোনোদিন অসম্মান করব না আপনার, আপনি ‘না’ বলুন...’’

জয় অনড় চোখে চেয়ে থাকল। তার কিছুই করার নেই। সে যা চেয়েছে, তাই হয়েছে- অন্তূর মুখে থুতু পড়েছে। এখন কী হচ্ছে বা হবে তা নিয়ে তার কোনো লাভ-লোকসান নেই।

কাজী আনতে গেল হামজার দুটো ছেলে। অন্তূ বুঝল, বিয়ে না করতে চাওয়ার কারণ হিসেবে তার চরিত্রের সাফাই গাইলে কেউ শুনবে না। তাকে অপরাধ মেনে নিতে হবে বাঁচতে হলে। সে মৌলবীকে বলল, “হুজুর। আমি পাপ করেছি।’’ জিহ্বায় আটকাচ্ছিল কথাখানা।

একটু থেমে মিনতি করল, “আপনি তার শাস্তি দিন আমায়। বিয়ে পড়ানোটা কি শরীয়তের শাস্তি হবে, বলুন? আমার কথা বুঝতে পারছেন আপনি?” অন্তূর শরীরটা থরথর করে কাঁপছে, বারবার ঝাঁকুনি খাচ্ছে।

-“আমায় বেত্রাঘাত করে মেরে ফেলুন, আমায় ফাঁসি দিয়ে দিন, অথবা আমায় এক বোতল বিষ....হুজুর। আমি যা করেছি, তার শাস্তি আপনি আমায় আশিটা না বরং তার দ্বিগুণ একশো ষাটটা মারুন। আপনি জয় আমিরের আঘাতগুলোও আমাকে দিন। ওই লোকটার ভাগে যে বেত্রাঘাত আছে, সেগুলোও আমায় মারুন। জয় আমিরের কোনো দোষ নেই।

''মৌলবির সামনে মিনতি করাটা বেক্কলে কাজ হচ্ছে। অন্তূ হামজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। প্রবল আত্মসম্মানী অন্তূ অনুরোধ করে উঠল, "মেয়র সাহেব! আপনি কি ভাইয়ের শরীরের আঘাতের চিন্তা করছেন? নিতে হবে না। সে কিচ্ছু করেনি। সব পাপ, দোষ আমার। আমি করেছি পাপ, আমার শাস্তি পাওয়া উচিত, দরকার। আমি যদি ওর আঘাতগুলো নিই..? এখানে আমায় শূলে চড়িয়ে পাঁচ খন্ড করা হলেও তা মঞ্জুর। আমায় মেরে ফেলুন। বদনাম ধুয়ে যাবে। আব্বু আসার আগে মেরে ফেলুন।''

হামজা স্থির চোখে তাকিয়ে বলল, “পাগলামী করছো, আরমিণ! বদনাম যখন হয়ে গেছে। সত্য-মিথ্যার ধার সমাজ ধারবে না। তোমার শরীরে ট্যাট্টু ছেপে গেছে।”

-“কীসের ট্যাট্টু, মেয়রসাহেব!”

-“বদনাম অথবা জয়..”

অন্তূ মাথা নাড়ে, “ট্যাট্টু মোছা যায় না, না?”

-“যায় না।”-“আমি যদি ত্বক পুড়িয়ে ভস্ম করে দিই, অথবা উপড়ে তুলে ফেলি শরীরের চামড়া?”

-“তাতে বাঁচতে পারবে? তোমার শরীরে দশটা আঘাতও সইবে না। দোর্রা আশিটা বেত একসাথে বেঁধে আশিটা আঘাত করে

মারা হয়। তুমি দু-চারটাতে প্রাণ হারাবে। কলঙ্ককে সাথে নিয়েই মরবে। এড়িয়ে যাওয়ার পথ নেই।''

অন্তূর দিকে ঝুঁকে নিচু আওয়াজে বলল "বেঁচে থাকলে নিজের কাছে সান্ত্বণা থাকবে, তুমি পাপটা করো নি। আমি তোমাকে বুদ্ধিমতি বলেই জানি। কিছুক্ষণ আগেও তোমার শীতলতায় লোকে অবাক হয়েছে, এত ভেঙে পড়ছো কেন?রিল্যাক্স। প্রস্তুত হও! পাটোয়ারী বাড়ি তোমার অপেক্ষায়।''

অন্তূ আস্তে কোরে পিছিয়ে এলো কয়েক কদম। কিছু ভাবছে সে। কিছু জবাব মিলছে। হামজাকে তার বড্ড ভয় করছে। পলাশ এবং

জয়ের চেয়েও বেশি ভয়। হামজা দেহে বাস করা ক্যান্সার কোষের মতো। নীরব ঘাতক। চারদিকে গুঞ্জন থামেনি। যেহেতু মেয়ে বিয়ে করতে চাইছে না, তার মানে বিয়ে দেওয়াটাই ওর শাস্তি। চমৎকার যুক্তি সমাজের।বসে রইল অন্তূ সিঁড়িতে। আজান পড়ছে। স্বভাববশত ওড়না তুলে মাথায় দিলো। আজ আর দৌড়ে গিয়ে ওযু করে নামাজ পড়তে বসল হলো না। চরিত্রহীনদের নামাজ পড়ার দরকার নেই। আব্বুর টুপিটা খুঁজে দেয়া হল না। আব্বু এ সময় আছরের নামাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যায়, অন্তূ গেটটা আটকে

নামাজে বসে। অন্তূ নির্বাক চোখে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

জয় একটা চেয়ারে বসে পড়ল। পরনে এখনও থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট। হাঁটুর নিচে ঘন পশম। পা দুলাচ্ছে বসে। দেখতে ক্লান্ত লাগছে। সে এত কিছু ভাবেনি, এখনও ভাবছে না। চিরদিন লাগামহীনের মতো অপরাধ করেছে, কোথাও এমন দ্বিধা-দ্বন্দ ভরা পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। কেউ প্রতিবাদ করেনি কখনও। সব গুলিয়ে যায় অন্তূর সামনে। সবকিছুর বাজি পাল্টায়, এমনকি তার লাগামছাড়া অপরাধেরও। অন্তূর ওপর রাগটা তরতর বাড়ছে, জেদ উঠছে।

অন্তূ মাটির কাছে অনুরোধ করে, 'ফাঁক হয়ে যা। আমাকে এই মুহুর্তে জায়গা দে তোর গর্ভে। নাকি তুই-ও ভুল বুঝছিস আমায়? আমাকে কি তোরও বলাৎকার মেয়ে মনে হচ্ছে, মাটি? তুই কথা বলিস না? তোর বুকে দাঁড়িয়ে মানবসন্তান এত কিছু ঘটায়, তোর ধৈর্য্যে কুলায় সবটা? তোর বুকে ভার অনুভূত হয়না?মাটি জবাব দেয় না। অন্তূ চেয়ে থাকে মাটির দিকে।

নামাজ শেষে কাজীকে সাথে নিয়ে লোকজন ফিরল। হামজাও সবার সাথে নামাজ পড়ে ফিরল। সকলে যে যার স্থান নিয়ে আলোচনা শুরু হলো ছোট্ট একটা।

পাড়ার প্রবীণরা হামজাকে জিজ্ঞেস করলেন, “তো তুমি কী বলো? বিয়ে পড়ানো শুরু করা যাক?”

হামজাকে বলার সুযোগ দিলো না অন্তূ। চিৎকার করে উঠল, “বললাম না বিয়ে হবে না? আমাকে এখানে কেটে শত টুকরো করলেও কোনো রকম বিয়ের আয়োজন হবে না এখানে। আমি যা করেছি, তার জন্য বিকল্প যেকোনো শাস্তি দিন আমায়, আমি তৈরি আছি।”-“কিন্তু আমরা চাইতেছি না তোমারে জিন্দা মাটিতে পুঁততে।তারচে..”

-“কিন্তু আমি তো চাইছি, আমাকে পোঁতা হোক, বেত্রাঘাতের সাঁজা দেয়া হোক!

আপনাদের ব্যথা লাগছে কেন? মার পড়বে আমার শরীরে। তাছাড়াও আমার মতো চরিত্রহীনের জন্য এত মানবিকতা দেখালে বরং আপনারা কিন্তু গুনাহগার হবেন আল্লাহর কাছে। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে আঘাত করা শুরু করুন।''

লোকজন ফাঁপড়ে পড়ে গেল। অদ্ভুত চোখে ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে দেখল। এখনও মেয়েটার কথার যুক্তি, ভাষার বিন্যস্ততা, চোখের প্রতিবাদ এক বিন্দু কমেনি। যুক্তি-তর্কের ঊর্ধ্বে জয়ের অপরাজেয় মস্তিষ্কেও বিস্ময় খেলে গেল। চোখ সরাল না অন্তূর ওপর থেকে। অন্তূর মুখে ঘাম জমেছে, বুকটা

ওঠানামা করছে, চোখদুটো কাতর অথচ অগ্ন্যুৎপাতের গলিত লাভা যেন ঠলকে পড়ছে। সন্ধ্যা হবার অল্প অল্প বাকি। আমজাদ সাহেব হেঁটে এগিয়ে আসছেন। রাবেয়া উনার ডানবাহু ধরে এগিয়ে আসছে বাড়ির দিকে ক্রমশ। অন্তিকের লম্বা মাথাটা দেখতে পাওয়া গেল উনাদের পেছনেই। অন্তূ যেন ফুরিয়ে গেল এক লহমায়, সমস্ত জীবনীশক্তি ত্যাগ করে এক দলা মাটির স্তূপে পরিণত হয় মেয়েটা। এই কথাগুলো এই লোক কীভাবে আব্বুর কানে তুলবে? আব্বুর কেমন লাগবে শুনতে অন্তূর ব্যাপারে এমন সব কথা?

আমজাদ সাহেব অবাক হলেন বাড়ির সামনে ভিড় দেখে। অন্তূর অবস্থা দেখে সৌম্য মুখখানা অস্থির হলো। একে একে লোক আমজাদ সাহেবকে নিজেদের মনমতো করে রসাত্মক কাহিনি জানাতে শুরু করে।

-“মাইয়া তোমার অকাম তো করছে, মাগার সেই লাংয়ের লগে বিয়াত্ বসবার চায় না।”

কেউ আবার বলে, ‘আমজেদ! মাইয়ারে ব্যবসায় দিছো নাকি? ব্যবসা যারা করে, হেরা বিয়ে করবার চায় না।”

কথাগুলো সহ্য করতে পারে না অন্তিক। তেড়ে যায় মারতে ক্ষ্যাপা পাগলের মতো। লোকটাকে দুটো ঘুষি মেরে নাক দিয়ে রক্ত

বের করে আনলো। লোকের মেজাজে বিরূপ প্রভাব পড়ল এতে। পাপীর ভাইয়ের এই আস্পর্ধা তারা ভালোভাবে নেবে কেন? আমজাদ সাহেব থামালেন ছেলেকে। অনেকক্ষণ যাবৎ শুনলেন দাঁড়িয়ে পাড়ার ও সমাজের প্রতিটা স্বাধীন নাগরিকের নিজস্ব মূল্যবান মন্তব্যগুলো। কেউ জয়কে বলছে না। জয় পুরুষ, জয় হামজার ভাই, হুমায়ুন পাটোয়ারীর ভাগ্নে, এই অঞ্চলের অভিজাত পরিবার, আমির পরিবারের একমাত্র উত্তরসূরী। জয়কে বলতে নেই।

মাগরিবের আজান শোনা যায় চারদিকে। মাথা থেকে পড়ে যাওয়া ওড়নাটা আর তুলে মাথা

ঢাকে না অন্তূ। দেহ ব্যবসায়ী মেয়েরা তা করে নাকি? তার পর্দা পলাশ নিজের শক্তিশালী হাতে খুলেছে তা আর অন্তিক চাইলেই উঠে পড়বে নাকি?

আমজাদ সাহেব ধীরে হেঁটে এসে বসেন অন্তূর পাশে। বেশ খানিকক্ষণ কেউ কথা বলে না। শ্বাস ফেলে না কেউ-ই। অন্তূর ভেতরে মৃত্যুর নেশা জাগে। আর মৃত্যুর আগে পাশে বসা আব্বুর চেহারাখানা একবার দেখতে চায় সে।

-"বিয়ে দিতে চায় ওরা তোকে, অন্তূ। করে নে বিয়ে।" নির্মল কণ্ঠস্বর আমজাদ সাহেবের।

অন্তূ হেসে ওঠে, “মেরে ফেলো আব্বু, আমায়। তোমার হাতে মরণ আমি ধন্যবাদান্তে গ্রহন করব। দাফন করে ফেলো। মিটিয়ে দাও আমার নাম।”-“বিয়ে করে নে, অন্তূ।”

-“আমায় তুমি মেরে ফেলো।”

-“অন্তূ বিয়েটা ক...”

-“আমায় মেরে ফেলো, আব্বু।”

-“বিয়ে করে নে, অন্তূ...”

অন্তূ চেঁচিয়ে উঠল, “মেরে ফেলো তুমি আমায়। নিজহাতে মারো। এমনিতেও তো বেঁচে নেই, তবুও আমায় মারতে এত দ্বিধা! অথচ যখন বেঁচে ছিলাম, কেউ বাঁচানোর ছিল না এই আসমান-জমিনে। তুমিই বা কেন

সহমর্মিতা দেখাচ্ছ, আব্বু? মরা মেয়েকে মুক্তি দাও। তার আত্মাটা আঁটকে আছে, খুব ছটফটাচ্ছে ছাড়া পেতে।''এতক্ষণে অন্তূ তার হৃদয়ের ক্ষরণ টের পেল। অন্তূদের কান্না বিশেষ মানুষেরা ছাড়া কেউ দেখতে পায় না। সে কখনও রাবেয়ার সামনেও কাঁদে না। রাবেয়ার গুনগুনানি তার কানে আসছে। এক ধারে বসে হু হু করে কাঁদছেন।

আমজাদ সাহেব অন্তূর হাতটা নিজের হাতের ওপর রেখে বললেন, "কোন অপরাধে মারি তোকে বলতো, অন্তূ? আমার মতো দূর্বল, হাতকাটা বাপের ঘরে জন্মানোর অপরাধে? তোকে মেরে নিজেকে জবাব কী দেব, আমি?

শিখিয়ে দে। যে পাপ তুই করতে পারিস না, সেই না করা পাপের শাস্তি দেবার উপায় বল।
”

-“পাপ করেছি, আব্বু! চুপ থাকতে না পারার পাপ। ভেতরের ঘেন্নাকে ভেতরে চেপে মিথ্যা তোষামদ না করতে না পারার পাপ। তোমার শেখানো আদর্শ আজ খুব ভারী পড়ছে আব্বু আমার ওপর। এত পাপের পরেও পাপ নেই বলছো?”-“পাপ করলে তোকে আমি মেরে ফেলতাম। করিসনি তুই, তাই বাঁচিয়ে রাখছি, আর তার বদলে এক নিকৃষ্ট মৃত্যু দিচ্ছি তোকে। গ্রহণ কর।”

-“কী আশ্চর্য, আব্বু! মৃত্যুটা মৃত্যু হোক, এরকম নরকবাস দিচ্ছ কেন?’

-“এটা নীতি, অন্তূ। অপরাধ না করা মানুষেরা আজকাল কঠোর সাঁজা ভোগ করে। অবশ্য তাদেরও অপরাধ আছে। তাদের অপরাধ—তারা অপরাধ করেনি। তুই নিজে যখন জানবি তুই পবিত্র, এটা ভেবে বেঁচে থাকাটা কি বাহাদুরী না? আর যে অপরাধ করিসনি, তা মেনে নিয়ে ভীরুর মতো মরে যাওয়া কি তোর জন্য ধিক্কারজনক না?’’

অন্তূ কথা বলে না। আব্বুর কথাগুলো খুব নিষ্ঠুর।

-"বীরেরা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালায় না, অন্তূ। তুই পালাতে চাইছিস। তুই মরে গিয়ে প্রমাণ করতে চাইছিস–তোর ভেতরে জীবনের সম্মুখীন হবার শক্তি নেই। বিয়ে করে নে, অন্তূ।"

অন্তূর বাঁধ ভাঙে। কান্নারা ছিটকে আসে, "আমায় তুমি আর এ কথা বোলো না, আব্বু। আমি সহ্য করতে পারছি না। আমার ব্যথা লাগছে।"-"আমার লাগছে না, অন্তূ। কী করি বলতো?"

-"তুমি খুব নিষ্ঠুর, আব্বু!"

-"তোকেও হতে হবে, অন্তূ। বানাতে তো তা-ই চেয়েছি ছোট থেকে। সেসব প্রয়োগ কর।"

-“তুমি এত কঠোর হয়োনা আব্বু আমার ওপর। আমায় জিবীত পুড়য়ে ভস্ম করে দাও। আচ্ছা, তুমি যা বলছো, তা তুমি সহ্য করতে পারবে?”

অন্তূর দিকে এতক্ষণে প্রথমবার তাকান আমজাদ সাহেব, “না পারলেই বা কী?”

অন্তূ মাড়ি আঁটকে চোখ বোজে। আব্বুর চোখে তাকানোর ভয়াবহ কাজ সে করতে পারবে না। চোখ বুজে কেমন করে যেন ডেকে ওঠে, “আব্বু!”

-“ডাকছিস কেন, অন্তূ? হাতবাঁধা বাপদের তোদের মতো অন্তূরা ডাকবে না।”

-“দোষ তো তোমার। জানো না, আমি তোমায় ছাড়া কত নিরুপায়! তবু একা রেখে গেলে? দেখেছ আমি বলতাম তুমি ছাড়া এক মুহুর্ত টিকবো না আমি। প্রমাণ হলো তো! তুমি স্বার্থপর কেন, আব্বু?”

-“নিয়তির দোষ দিবি না? প্রকৃতি আর নিয়তি দেখ ঠিক জিতে গেল অপরাধ কোরে। তুই ওদের দোষ দিলি না। দোষ দিচ্ছিস আমার।” কেমন করে যেন হাসলেন আমজাদ সাহেব।

-“তুমি আমায় মেরে কেন ফেলছো না?

”-“মারছি না তো কী করছি? এইতো বেশ কয়েকবার মরতে বললাম। আবার বলছি— বিয়ে করে নে, অন্তূ।”

অন্তূ চেপে ধরে আব্বুর কম্পিত হাত, শক্ত করে মুঠো করে ধরে রাখে, ছাড়ে না। মাথাটা নুইয়ে হু হু করে কাঁদে বাপের কাছে।
এতক্ষণ তার সাথে যা যা অন্যায়-অবিচার হয়েছে সবকিছুর নীরব নালিশ জানায়। বাপ একবারও জিজ্ঞেস করে না, তুই কী করেছিস, অন্তূ? সন্দেহ শব্দটা অচল এখানে, এখানে কথা জবানে নয়, চোখে হয়। এই সম্পর্কটা অগাধ আশ্বাসের, ভিত্তিটা নিগূঢ় বিশ্বাসের।
-"অন্তূ, তোকে কাঁদতে দেখতে ভালো লাগে। না আমার। ছোটবেলা থেকে কাঁদতে শেখাইনি তোকে।"

অন্তূ চোখ মুছল, “কাঁদছি না। ও কথা আর বলবে না। তুমি শুধু হাতটা ধরে থাকো আমার। ছাড়বেনা কিন্তু।”

-“আমি বলব। যতক্ষণ তুই ‘হ্যাঁ’ না বলবি, আমি বলব।”

অন্তূ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকায়। ভয় এবং ভরসাহীনতা পেয়ে বসে এই মুহূর্তে অন্তূকে। সে ভুলে যায়, এটা তার আব্বু। আব্বুর হাতে চেপে রাখা হাতটা শিথিল হয় তার, এই অসহায়ত্ব অন্তূর সইতে পারে না। ওমনি আরও শক্ত বন্ধনে চেপে ধরেন আমজাদ সাহেব হাতটা।গাঢ় চোখে চেয়ে বলেন,

“লোকেরা কী বলেছে, ভুলে যাচ্ছিস? ব্যবসা যারা করে, তারা বিয়ে করতে চায়না।” অন্তূর চোখের পাতা ও থুতনি থরথর করে কেঁপে ওঠে। আমজাদ সাহেবের ভেতরের আগুন জ্বলছে। সেই আগুন স্পর্শ করে অন্তূকে। সে সজল চোখে চেয়ে থাকে মেহেদীরঙা চাপদাঁড়ি ভূষিত এক মহাপুরুষের দিকে। তার চোখে মহাপুরুষই বটে! সে জীবনে এমনই এক মহাপুরুষ চেয়েছিল। তবে চাওয়া আর পাওয়ার একটা জটিল শত্রুতা আছে। অতএব এ দুটো একত্রে মেলে না কভু। বরাবর পিছলে যায় দুটো পরস্পর থেকে।

আমজাদ সাহেব যত্ন করে ওড়নাটা তুলে অন্তূর মাথায় দিলেন। আলতো হেসে বললেন, “হুমায়ুন আহমেদ কী বলেছিলেন জানিস,
~ কখনও তোমার মুখটা বন্ধ রাখতে হবে, গর্বিত মাথাটা নত করতে হবে, স্বীকার করে নিতে হবে যে তুমি ভুল। এর অর্থ এই নয় যে, তুমি পরাজিত। এর অর্থ তুমি পরিণত এবং শেষবেলা বিজয়ের হাসিটা হাসার জন্য ত্যাগ স্বীকারে তুমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।”কাজী সাহেব কাবিননামা লিখলেন,
‘জাভেদ আমিরের একমাত্র পুত্র জয় আমিরের সঙ্গে—

থামলেন কাজী সাহবে। জয়কে জিজ্ঞেস করলেন, “দেনমোহর কত বাঁধবো, বাপ?”
-“কোটিখানেক বাঁধেন, আমি কি কোনোদিন ছেড়ে দেব নাকি?”
কাজী সাহেব বললেন, “ছেড়ে দেয়ার সময় দেনমোহর আদায়ের হুকুম নেই। নিয়ম হলো, দেনমোহর পুরো মিটিয়ে তবে স্ত্রীর কাছে যেতে পারবে, বাবা।”
-“তাইলে এক টাকাও বাঁধার দরকার নাই।”
দ্রুত ঘাঁড় নাড়ে জয়। কবীর আর রাহাত ফিক করে হেসে ফেলল। হামজা বলে, “বাঁধেন লাক্ষ দশেক। পরিশোধ করেই কাছে যাবে।”উপস্থিত জনতা অবাক হয়ে চেয়ে

থাকে। কত উদার পাটোয়ারী পরিবার! এত উদার কেন এরা? একটা মেয়ের জীবনে আর কী চাই? সবই তো দিচ্ছে পাটোয়ারী পরিবার! অথচ ঘরে তুলছে চরিত্রহীন এক মেয়েকে! কবুল বলার আগ মুহূর্তে অন্তূ আব্বুর দিকে তাকায় আমজাদ সাহেব মাটির দিকে তাকিয়ে আছেন। পাশে দাঁড়িয়ে আছেন রাবেয়া, চোখের পানি ছলছল করছে, কিন্তু পড়ছে না। পাশে অন্তিক। তার দৃষ্টিতে অসহায়ত্ব ছাড়াও আরও কিছু। অপলক অন্তূকে দেখছে। জয়কে কবুল বলতে বলা হলে সে বেহায়ার মতো ঘোষনা করে কবুল পড়ল। যেভাবে মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভাষন দেয়। ছেলেরা একসাথে

ধ্বনি দিয়ে উঠল, "জয় বাংলা! জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু!"

মুখে মিষ্টি তুলে দিলো হামজা। মানুষ খাওয়ার আগে বিসমিল্লাহ পড়ে, জয় মুখে মিষ্টি নেবার আগে 'বিসমিল্লাহ' বলার বদলে স্লোগান দিলো —'জয় বাংলা।' এরপর গালে মিষ্টি ঢুকালো। ছেলেরা তার সাথে সমস্বরে স্লোগান দিলো, "জয় বাংলা!"বিয়ের আসর নয়, রাজনীতির মঞ্চ এটা। বিশাল এক সম্মেলন চলছে যেন। কাজী সাহেব কয়েক বার 'কবুল' বলতে বললেও অন্তূ শুনতে পায় না। আব্বুর দিক থেকে চোখ ফেরে না তার। আব্বু কিছু বলুক, কিছু করুক, একবার চোখ তুলে দেখুক

অন্তূকে বলি হবার আগে! তাকালেন না আমজাদ সাহেব।

কবুল বলতে ঠোঁট নাড়াতে গিয়ে আবার থামে। আমজাদ সাহেব ধীর পায়ে ভেতরে পা বাড়ালেন। তিনি বসে থাকলে ওই অন্তূ জীবনেও কবুল পড়বে না। পাগলিটাকে কীভাবে বোঝাবেন–উনার কিছু করার নেই! স্বয়ং নিজহাতে বোধহয় খু-ন করে এলেন অন্তূকে। সেই লাশ দেখতে ভালো লাগছিল না। হাতটা মেলে ধরলেন চোখের সামনে। উনার মনে হলো, র-ক্ত লেগে আছে তাতে। অন্তূর কলিজা চুইয়ে পড়া র-ক্ত।আস্তে করে শুনতে পেলেন, পেছনে অন্তূ প্রাণহীন স্বরে

বলছে, ‘কবুল।’ কাজী সাহেব আলহামদুলিল্লাহ বললেও অন্তূ বলেনি। হুড়মুড়িয়ে বসে পড়লেন আমজাদ সাহেব মেঝের ওপর দরজার কপাট আঁকড়ে ধরে। অন্তূ আজ ফুরিয়ে গেছে, বাপের মান রাখতে, নিজেকে একবার গজিয়ে তোলার প্রয়াসে অন্তূ আত্মহত্যা করেছে। অন্তূ জয় আমিরকে ‘কবুল’ করেছে।রাত দশটা আটত্রিশ মিনিট। হামজা জয়কে নিয়ে অন্তূদের বাড়ি থেকে বেরিয়েছে ইশার আজানের পর। জয়ের আজ পলাশের হোটেলে যাবার কথা ছিল। পলাশ অপেক্ষা করছে। কিন্ত হামজার সাথে সে এলো আব্দুর রহিম মেডিকেল হাসপাতালে।

বহিঃবিভাগ দিয়ে ঢুকে এগোতেই জরুরী বিভাগ। কেচিগেইটের ওপাশে বেঞ্চিতে বসে আছেন লোকজন। কেউ কেউ বারান্দার গ্রিল ধরে আছে। উঁকি-ঝুঁকি মারছে ওয়ার্ডের ভেতরে। পাঁচশো শয্যার এই বিশাল হাসপাতালে লতিফকে খুঁজে পাওয়া সহজ কাজ নয়। কিন্তু আজ বিকেলে কেবিনে শিফ্ট করা হয়েছে লতিফকে। হামজার নির্দেশ। কেবিনের দরজা চাপানো ছিল। স্পেশাল কেবিন রুম। হামজা ঢুকতেই লতিফের স্ত্রী আসমা উঠে দাঁড়াল এককোণে। হামজা বাঁধা দিলো, "আপনি বসুন, ভাবী। লতিফ ভাইয়ের পাশে বসুন আপনি। জয়.."

জয় বারান্দায়। সামনে দিয়ে একটা মেয়ে হেঁটে যাচ্ছিল, সে মনোযোগ দিয়ে দেখল যতদূর দেখা যায়। দেখতে ভালো লাগল। তবু দুটো বাজে গালি দিলো মনে মনে। হাসপাতালে কেউ এভাবে পটের বিবি সেজে আসে? যখন সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল, কোমড়টা ন্যাকামিতে বেশিই দুলছিল। জয়ের ইচ্ছে করল, ধপ করে একটা কোমড়ের ওপর লাথি মেরে কোমড়টা সোজা করে দিতে। আবার ভালোও লাগছিল দেখতে।লতিফ ঘুমাচ্ছে। তার এক পায়ে রড-রিং গেঁথে দেয়া হয়েছে, অপর পায়ে অস্ত্রোপচারের দরকার পড়েনি, হাঁটু অবধি ব্যান্ডেজ। জয়ের হাতের

চর্চা কমে যাওয়ার ফল। ডানপায়ে রিংটা গেঁথে আছে যেখানে, দেখলে কেমন গা শিরশির করে ওঠার মতো। এক পা ফুলে চার পায়ের সমান হয়েছে। অচেতন পড়ে আছে লতিফ। জয় জানে, ডানপায়ে যখন সে প্রথম আঘাতটা করে, দশ মিলির মোটা রডের আঘাতে জয়ের সমস্ত শক্তি ক্ষয় হয়েছিল। হাঁটুর নিচে ফিমারের হাড্ডিগুলো চূর্ণ হয়ে গেঁথে যাবার কথা ভেতরে মাংসপেশির ভেতরে। তা-ই হয়েছে। এই রিং এই পা ঠিক করতে পারবে বলে মনে হয় না। পরের আঘাতটা করার সময় দয়া করেছে জয়।

হামজা লতিফের ছোট্ট মেয়েটাকে কোলের ওপর বসিয়ে আদর করছিল। হামজার কাছে বেশকিছু চকলেট পেয়ে বাচ্চাটি খুব খুশি। হামজা আসমাকে সান্ত্বণা দিলো, ভাবী, আপনি কাঁদবেন না। যারা লতিফ ভাইয়ের এই হাল করেছের প্রত্যেকে তাদের ন্যায্য শাস্তি পাবে। আসমা কেঁদে ফেলল, “কে করছে এই কাজ বলেন তো? এইবারও কি..”

-“এবারও মাজহার। আগেরবার গুলি করেছে, এবার পায়ে রডের আঘাত। কেন করেছে জানেন? যাতে লতিফ ভাই আর আমাদের কাজে না লাগতে পারে। আচ্ছা ভাবী, পুলিশ

আসলে আপনি কি মাজহারের বিরুদ্ধে বয়ান দিতে পারবেন?”

মহিলার চোখে-মুখে দ্বিধা। মহিলাকে চুপ থাকতে দেখে হামজা হতাশ হয়, “তাহলে আর কী? এভাবেই আমার লোকগুলো আহত হতে থাকবে ওদের হাতে। যেহেতু আপনিও বয়ান দিতে পারবেন না।”

মহিলার ওপর হামজার চাল খাটলো। মহিলা বলল, “আমি দেব বয়ান। আপনের কথা চিন্তা করতেছি না। আমার স্বামীরে ওই হারামজাদা দুইবার এমনভাবে জখম করছে, তারে পুলিশে ক্যান, আমি তারে ফাঁসিতে ঝোলাবো।”

দুই ভাই প্রসন্ন হাসল। জয়ের তো কান্না পেয়ে যাচ্ছিল মহিলার এই বাহাদুরীতে। এখানে মূলত তাকে ফাঁসিতে ঝোলানোর কথা চলছে। মহিলা জানলে তার সামনে বলতো না এভাবে।হামজা বলল, "এমনও হতে পারে, দেখবেন মাজহার আসবে দেখতে লতিফ ভাইকে। ও কিন্তু স্বীকার করবে না, কাজটা ও করেছে। নিশ্চিত দোষ দেবে আমার অথবা জয়ের। আমার কথা মিলিয়ে নেবেন।"
অপারেশনের বিল মেটানো হয়নি। হামজা কল করে দেয়ার পর বকেয়াতে অস্ত্রপচার সম্পন্ন হয়েছে। আসমার সামনে হামজা কয়েকটা বড় বড় বান্ডেল তুলে দিলো

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হাতে। কমপক্ষে ওখানে লাখ পাঁচেক টাকা তো হবে। অথবা হতে পারে তারও বেশি। আসমা কৃতজ্ঞতায় সজল চোখে চেয়ে থাকে সাদা পাঞ্জাবী পরিহিত টগবগে পুরুষটির কর্তব্যপরায়ন শক্ত দেহের পানে। চলে আসার সময় মেয়েটার কপালে গাঢ় একটা চুমু খেয়ে আসমার হাতে হাজার দশেক টাকা ধরিয়ে দিলো হামজা। প্রয়োজনীয় ওষুধ-পত্র, অন্যান্য দরকারে খরচ বাবদে। তাছাড়া সকালে তো আবার আসছে সে!হামজা সরদার পরিবারের কাছে অনেক আগে শিখেছিল—বিশ্বাসঘাতকেরা এই জগতে সবচেয়ে নৃশংস শাস্তির দাবিদার। এদের

ওপর দয়া করা এক প্রকার পাপ। প্রাণের হত্যায় যতটা না লোকসান আছে তার চেয়ে কঠোর হত্যাকান্ড হলো বিশ্বাসের হত্যা। প্রাণের হত্যাকারীর শাস্তি যদি মৃত্যু হয়, বিশ্বাসের হত্যাকারীর শাস্তি আরও শোচনীয় হওয়া উচিত। যেটা জয় করেছে। লতিফ মরলে মুক্তি পেয়ে যেত, অথচ এই অবস্থায় সে প্রতিক্ষণে মরবে। এটা ওর শাস্তি। সাথে হামজার কার্য হাসিল।

গাড়িতে ওঠার সময় জয় দাঁড়িয়ে রইল ফুটপাতে।

হামজা জিজ্ঞেস করল, "তুই বাড়ি ফিরবি কখন?"

-“ভালো লাগতেছে না। তুমি যাও। আমি হোটেলে যাব।”জয়ের শরীরে পাতলা একটা ডেনিম জ্যাকেট। সাদা লুঙ্গি পরনে। হামজা শরীরের চাদটা খুলে ছুঁড়ে মারে জয়ের শরীরে, “এটা পেঁচিয়ে নে। ঠান্ডা লাগলে গালে-মুখে থাবরাবো ধরে।”

জয় চুপচাপ চাদর গায়ে জড়ায়। গাড়ি ছাড়ার আগ মুহূর্তে গাড়ির জানালায় হাত রাখে, “কিছু টাকা দাও। পকেট খালি আমার।”

হামজা পকেট থেকে মানিব্যাগটা বের করে জয়ের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, “হোটেলে যাচ্ছিস, থামাচ্ছি না। তবে শুতে একা যাস বিছানায়। আজ কিন্তু বিয়ে হয়েছে তোর!

তোর বউয়ের সামনে ছোট যেন না হতে হয় আমাকে তোর কুকীর্তির জন্য।''

কবীর কথাটা বুঝে ফিক করে হেসে উঠে জয়কে খোঁচায়, ''বিছানায় একা যাইয়েন, ভাই। এখন কিন্তু ভাবী আছে আমাগো।''অথচ জয় নিশ্চুপ। স্থির চোখে বিদায় জানায় হামজাকে। আজ তার রসিকতার ছুটি। গাড়ি যখন আড়াল হলো, তখনও জয় দাঁড়িয়ে রাস্তার পাশে। সে কোথাও যাবে বলে মনে হলো না। কবীরের কাছে একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে লাইটার জ্বালায়। কবীর চেয়ে দেখে তা। জয় সচরাচর সিগারেট টানে না। তার সিগারেটে টান দেয়ারও কিছু বিশেষ

পরিস্থিতি আছে। কোনো ব্যাপারে হয়রানী বোধ হলে অথবা মন অশান্ত এবং দুষ্ট সত্ত্বা শান্ত থাকলে আনমনে সিগারেটে ঠোঁট লাগাতে দেখা যায় তাকে।

উদাস পায়ে হাঁটতে হাঁটতে ব্রিজের দিকে এগিয়ে যায় জয়। কবীর জিজ্ঞেস করল, "ভাই? আজকে মেয়েটার সাথে যা করলেন, তা কি ঠিক....''জয় রক্তখেঁকো পশুর মতো দাঁত খিঁচে ওঠে, "চুপ! একদম চুপ। ওই বিষয়ে কোনো কথা কইবি না। তোর খুব মায়া হইতেছে ওই শালীর জন্য, হ্যাঁ? তোরও হাল ওর মতো করি? তারপর দুজন একসাথে গলাগলি ধরে কাঁদবি?''

কবীর বুঝল না, জয়ের কী হয়েছে। চুপচাপ সাথে চলল। সঙ্গ ছাড়া যাবে না। জয় গিয়ে ব্রিজের কার্নিশ ধরে দাঁড়ায়। সিগারেটের ধোঁয়াগুলো মিশে যায় অন্ধকারে। সোঁ সোঁ করে গাড়ি চলে যাচ্ছে পেছন দিয়ে। কবীর দাঁড়িয়ে আছে পাশে।

জয় বিরক্ত হলো, "আমার সাথে কী তোর? যা, বাড়ি যা। ক্লাবঘর তালা মেরে চাবি হামজা ভাইয়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি গিয়ে ঘুমা। আমার সাথে থাকার কিছু নাই।"

কবীর কোনো জবাব দেয় না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে জয়ের পাশে। তার সন্দেহ, জয় হোটেলে যাবে না। কিন্ত কেন? হোটেলটা

পলাশের তাই? এরকম ভয় যে জয়ের মাঝে নেই তা সে জানে। পলাশ চরম বেহায়া। হাজার হলেও আবার জয়কে ডাকবে। জয়কে ছাড়া তার আসর জমে না।জয় চেয়ে থাকে অন্ধকারের দিকে। ব্রিজের নিচের ছোট ছোট খুঁপরিগলোতে হলদেটে লাইট জ্বলছে। অথচ জয়ের চোখে ভেসে ওঠে, অন্তূ আর আমজাদ সাহেবের বসে থাকার দৃশ্যটুকু। হিংসায় রক্ত টগবগিয়ে ওঠে ওর। ও শেষ কবে জাভেদ আমিরের কোলে চড়েছিল? তখন এতটাই ছোট ছিল যে সেসব উপভোগ করার মতো মানসিক বিকাশ ওর হয়নি। অন্তূর সাথে ওর

বাপের সাথে যা ভাব! সব ন্যাকামি যত! কী থেকে কী হয়ে গেল!

শুধু ইচ্ছে করছিল, পাড়ার লোকগুলোর একেকটাকে কেটে টুকরো করতে। ওদের ন্যাকামি আর হামজার সম্মান বাঁচাতে আজ বিয়ে করে আসতে হয়েছে।তরুর সামনে গিয়ে দাঁড়ানোটা অস্বস্তিকর হবে। এটাই মূল কারণ রাতটা বাড়ি না ফেরার। যত রাতেই ফিরুক, দেখা যাবে মেয়েটা সোফার ওপর বসে ঝিমোচ্ছে। রাতের খাবারটা খায়নি, জয়ের সাথে খাবে বলে। জয়কে খেতে দিতে হবে বলে ঘুম আসলেও ঘরে গিয়ে শোয়নি। জিজ্ঞেস করবে, “কোথা থেকে আসছেন? এত

রাত করে ফিরতে হবে কেন? কোথায় ছিলেন এতক্ষণ?''জয় তরুকে মিথ্যা বলতে পারে না। কোনোদিন বলেনি। মেয়েটার কাছে জয় খুব যত্নের, ওর সাথে জয় কোনোদিন বিরূপ হয়নি। আজ সত্যি বলে নিজের নোংরা জীবনের একমাত্র প্রতিক্ষিণীর মন ভেঙে গুঁড়ো করতে তার ভালো লাগবে না। মেয়েটা ওর একাকীত্ব সইছে, কিন্তু নিজে না, অথচ অন্য কাউকে জয়ের পাশে মানতে পারবে না। জয় হেঁটে ব্রিজের নিচের খুঁপরিগুলোর দিকে এগোয়। এখন ওই খুপরিতে বসবাস করা ভূমিহীন লোকগুলোর বাড়িতে যাবে, ওদের ঘুম কামাই করিয়ে আবোল-তাবোল কথা

বলবে রাতভর। কারও বাড়িতে ছোট্ট পিকনিকের আয়োজনও করতে পারে। কবীরকে বলবে, এই এই জিনিস কিনে আন। মাটির চুলোর পাশে বসে নিজে রাঁধবে, শেষ রাতে সবাইকে সাথে নিয়ে খাবে। সারারাত গলা ভেঙে গান গাইবে। ফজরের আজানের সময় বাড়ি ফিরবে। লোকগুলোও সায় দেয়। বরং চরম খুশি হয় এই পাগল লোকের হুটহাট উপস্থিতিতে।

এসব ভেবে কবীর বিরক্তিতে মাথা ঝারা দেয়। হতাশ শ্বাস ফেলে জয়ের পেছনে যায়। পিছু সে ছাড়তে পারবে না, কেন পারবে না

জানে না। শুধু জানে জয়ের পেছনে যেতে হবে তাকে, সাথে থাকতে হবে।

—

রাত বারোটা পার। কুয়াশায় বারান্দার গ্রিল অবধি দেখা যায় না। অন্তূ বসে থাকে বারান্দার মেঝের ওপর ঘরের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে। সারারাত হু হু করে উত্তুরে হাওয়া নাকে-মুখে ঢুকেছে। ঠান্ডার চোটে পিঠ বেঁকে এসেছে, সেসব কিছুই গায়ে লাগেনি অন্তূর। সন্ধ্যারাতে বিয়ে পড়িয়ে রেখে কাজী সাহেব বেরিয়ে গেলেন। একে একে লোকজন নিজেদের নৈতিক দায়িত্ব পালন করে তৃপ্ত মনে নিজ নিজ ঘরে ফিরল।

বেরিয়ে যাবার সময় হামজা বলে গেছিল, “এখানে থেকে পরীক্ষাটা শেষ করো। আমি জানি তুমি আজ যেতে চাইবে না। যেতেও বলছিও না আপাতত। তবে আমাদের বাড়ির বউয়েরা বাপের বাড়িতে থাকে না, রেওয়াজ নেই। পরীক্ষা শেষ হওয়া অবধি থাকো, এবং নিজেকে শান্ত করো। লোকে যা-ই জানুক, তুমি জানো কিছুই হয়নি। সো ডোন্ট বি আপসেট! হু!?”

লোকটা দেখতে অতিকায় শুদ্ধ-বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। এই ছদ্মরূপ তার আসল প্রকৃতিকে আড়াল করেছে। তবে আসল হামজাটা কে? কী? কেমন?

আজ অন্তূর এই মরণক্ষণে আমজাদ সাহেব এলেন না অন্তূর কাছে। আসতে নেই। রাবেয়া এসে পাশে বসলেন। অন্তূ একটুও তাড়াহুড়ো করল না চোখের পানি মুছতে। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না তা। কিন্তু কথা বলতে তার ভয়। কণ্ঠস্বর ও নাক আটকে আছে। আম্মুর সামনে কাঁদতে নেই।-“ঘরে যা, অন্তূ।”

অন্তূর আস্তে কোরে শুয়ে পড়ল শীতল মেঝের ওপর। মাথাটা মায়ের কোলে রেখে বলল, আজ তোমার বোঝা হালকা হলো, “আম্মা। তোমার অন্তূ বিয়ে করবে না করবে না, দেখো হয়ে গেছে।”

চুলে হাত বুলালেন রাবেয়া, “চুপ কর, অন্তূ। ওঠ, ঘরে চল। জ্বর বাঁধাবি?”

-“আম্মা! কাঁদছো কেন? কাঁদার মতো কথা বললাম?”

-“কাঁদতেছি না। ওঠ তো অন্তূ। থাপ্পর মারব কিন্তু একটা। এইখানে ঠান্ডা।”

-“তাতে কী? ভালোই লাগতেছে। তুমি ঘরে যাও। তুমি বুঝবা না ঠান্ডার হাওয়ায় বসে থাকার আরাম। যাও যাও! আব্বু একা।

”-“মরে যাইতে চাস? তাইলে আমারে আগে মার।” কণ্ঠটা আবার ভেঙে এলো রাবেয়ার, “আমিই তো তোরে জন্ম দিয়ে পাপ করছি রে মা! তোরে জন্ম না দিলে এই দিন তোর

জীবনে আসতোই না। আমার গর্ভের দোষ। ওঠ অন্তূ। কার কী হচ্ছে, জানি না। আমার কিন্তু সহ্য হইতেছে না শোন। ওঠ্!"

অন্তূ উঠে বসে, "ধুরু! ভাবলাম একটু শীত বিলাস করব, এখানে ইমোশোনাল সিন চলছে। ওঠো, চলো। শুয়ে পড়ি।"

অন্তূ মুখ-চোখ ধুয়ে এলো। পানি বরফের মতো ঠান্ডা। এসে বাচ্চা মেয়ের মতো বিছানায় শুয়ে কম্বল পেঁচিয়ে হু হু করে কেঁপে বলল, "ওরে ঠান্ডা রে! আম্মা লাইট বন্ধ করে দিয়ে যাও। সেই শীত, বাপরে!"

রাবেয়া অন্তূকে কেমন করে যেন তাকিয়ে দেখলেন। অন্তূ ঠিক ছোটবেলার মতো কম্বল

মুড়ি দিয়ে অল্প একটু মুখ বের করে ঠকঠক করে গা কাঁপাচ্ছে। যন্ত্রণা লুকোনোর ব্যর্থ চেষ্টা।

রাবেয়া চলে গেলে অন্তূ স্থির হয়ে গেল। কতক্ষণ অন্ধকারে ছাদের দিকে চেয়ে রইল। এই শীতের রাতে বুকে জ্বলা আগুনের সাহস খুব বেশি। এত ঠান্ডা, এত কুয়াশা তবু বুকের উত্তাপ গমগম করছে।

অন্তূ উঠে গিয়ে বারান্দার দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে। নিশ্চুপ এক মাঝরাত। ঝুপঝুপ করে বৃষ্টির মতো চোখের দুই কোণ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ল। কান্না জমে বুকটা কাঁপছে। অন্তূ মাথাটা দেয়ালে ঠেকিয়ে

বাইরের অন্ধকার কুয়াশার দিকে তাকিয়ে রইল নিথর চোখে।তার জীবন, সম্মান, স্বপ্ন, আব্বুর মান-মর্যাদা সব শেষ। শেষটা সে করেছে। কেন সে গেছিল সেদিন জয় আমিরের সঙ্গে বেয়াদবী করতে গেছিল? এত বোকা হলে চলে? তা কিছুই রইল না। নাহ নিজেকে ক্ষমা করা যাচ্ছে না। অন্তূ আস্তে কোরে হাতের তর্জনী আঙুল তুলে বুকের মাঝখানটায় চেপে ধরল। সেখানে ভেঙেচুড়ে আসছে। শীত বাড়ছে। পা দুটো ঠান্ডায় অবশ হয়ে আসছে। অন্তূ একটা খেলা খেলার চেষ্টা করল। এই শরীরের যন্ত্রণা, এটা কি তার বুকের ব্যথার চেয়ে বেশি তীব্র নাকি কম?

জিতল বুকের ব্যথা। শরীরের ব্যথা অনুভূত হচ্ছে না। সে অনড় বসে রইল মাথা ঠেকিয়ে। ফজরের আজান হলো। উঠল না নামাজ পড়তে। বসে রইল ওভাবেই।

রাত দুটোর দিকে রোজকার মতো অন্তূকে দেখতে এলেন আমজাদ সাহেব। তিনি আজ লুকিয়ে দেখতে এসেছিলেন। অন্তূ ঘুমালে দেখে চলে যাবেন। কিন্তু অন্তূকে ওভাবে ঠান্ডার মাঝে বারান্দার মেঝেতে বসে থাকতে দেখে বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে উঠল। অসুস্থ শরীর নিয়ে বসলেন অন্তূর পাশে।

অন্তূ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল না। ওভাবেই বলল, “ঠান্ডা লাগবে, আব্বু। ঘরে যাও।”-“তোর লাগছে না?”

-“বুঝতে পারছি না। তুমি অসুস্থ, এখানে বসে থেকো না, যাও।”

কিছুক্ষণ চুপ থেকে আমজাদ সাহেব জিজ্ঞেস করেন, “আমার বাপ হবার চেষ্টা করিস না, অন্তূ?”

-“তা করব, আমার সাধ্যি? বাপ তো তুমি, আব্বু। স্বার্থপর বাপ। বাপ হিসেবে তুমিই ঠিক আছো। আমি তোমার বাপ হলে এমন করতাম না। ভুলভাল কিছু করতাম। তুমি ঠিক কাজ করেছ।”

আমজাদ সাহেব কী অদ্ভুত এক হাসি যে দিলেন! হেসে বললেন, “কী করতি তুই, বল।
”

-“মেরে ফেলতাম।”

-“তাই তো করেছি। বাঁচিয়ে রেখেছি?”অন্তূ এবার তাকায় আব্বুর দিকে। আমজাদ সাহেব থমকে গেলেন। চোখদুটো কালিতে ঢাকা। ত্বক তীব্র ঠান্ডায় বিদীর্ণ হয়ে সাদা রক্তশূন্য হয়ে উঠেছে। চোখদুটো ফোলা, চোয়ালের ওপর শুকনো জলরাশির ধারা। বাপের ভেতরটা কেমন করে উঠল!

-“এত কঠোর মৃত্যু বাপ হয়ে দিলে মেয়েকে? আব্বু, তোমার একটুও দয়া হলো না আমার ওপর?”

এই যে অন্তূ! আবারও ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। তার একমাত্র দূর্বলতার জায়গা!

অন্তূ একটা আবদার করে, “আব্বু!”-“হু?”

-“চলো, আমরা কোথাও চলে যাই, আব্বু। এখনও আকাশ ফর্সা হয়নি ভালোমতো। চলো আমরা দূরে কোথাও চলে যাই। যাবে আব্বু?”

-“না, অন্তূ। আজ আমার খুশির দিন। আজ যা করেছি, এরপর আর কোনোদিন খারাপ থাকব না আমি। আমি এক কন্যাদায়গ্রস্থ বাপ ছিলাম। আজ সেই বোঝা ঝেরে ফেলেছি,

বিয়ের বয়সী মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছি আজ। ঋণমুক্ত, দায়মুক্ত আজ থেকে আমি। চলে যাব কেন?''

আমজাদ সাহেবের মেহেদী রাঙা দাড়ি বেয়ে একফোঁটা পানি বড় নিঠুরভাবে বয়ে গেল। অন্তূ খিঁচে চোখদুটো বুজে ফেলে। বাপের চোখের পানি সন্তানদের দেখতে নেই। অন্তূর চোখের উচিত এই মুহুর্ত থেকে নিজেদেরকে অন্ধ ঘোষনা করা।অন্তূ আলতো করে মাথা ঠেকাল আব্বুর কাধে, "তোমাকে অভিনন্দন, আব্বু। তোমার অন্তূর বিয়ে হয়ে গেছে। জয় আমিরের সাথে। তোমার আর চিন্তা নেই।''

আমজাদ সাহেব নিজের শরীর থেকে চাদরটা খুলে অন্তূর পা দুটো গুটিয়ে চাদরটা জড়িয়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে আবার আচমকা অন্তূর পায়ে হাত ছোঁয়ালেন, "আমাকে ক্ষমা করতে পারবি মা? মা রে! ও মা!"

অন্তূ ছিটকে উঠল। দু'হাত দিয়ে আব্বুর পা জড়িয়ে ধরে আকুতি করে উঠল, "আব্বু, প্লিজ না। এত বড় পাপী কোরো না আমায়। আব্বু দয়া করো।

-"মা! আমার মা!"

আমজাদ সাহেব কেমন করে ডেকে উঠলেন। অন্তূর হাত পা অনড় হয়ে উঠল। আমজাদ সাহেব অন্তূর হাতদুটো মুঠো করে ধরে

বললেন, "মা! তুই আমার মা। আজ তোর ছেলেকে ক্ষমা কর মা। আজ তোর সাথে এই অধম বাপ যা করেছে, তুই আমায় বাঁধাস না না অন্তূ!"অন্তূ আর নিজেকে সামলায় কী করে? আব্বুর হাতের মুঠোর ওপর কপাল ঠেকিয়ে হু হু করে কেঁদে উঠল, "পাগল হলে, আব্বু! এমন করছো কেন? বাঁচতে দেবে না আমায়? তুমি এমন করলে আমি কিন্তু কিছু করে ফেলব আব্বু! একদম আমাকে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করবে না খবরদার!"

ফস ফস করে কয়েকটা নিঃশ্বাস ফেলেন আমজাদ সাহেব। বুকের ওঠানামা বাড়ল।

অন্তূ আৎকে উঠল, “কী হয়েছে আব্বু? প্রেশারের ওষুধ খাওনি?”

আমজাদ সাহেব অস্থিরভাবে জোরে জোরে শ্বাস ফেলে বললেন, “আমার কিচ্ছু হয়নি। মার খাবি এবার আমার হাতে কিন্তু! চাদর গায়ে জড়িয়ে বস।”

-“আব্বু ওঠো! চলো ঘরে যাই। এখানে ঠান্ডা। ওঠো তো, তাড়াতাড়ি!”

আমজাদ সাহেব আবদার করার মতো বললেন “এত ব্যস্ত হোস না তো, অন্তূ। বস, দুটো কথা বলি। আমি তোর সাথে কথা বলতে এসেছি, অন্তূ। অন্তূ? শোন, শান্ত হ। আমার কিচ্ছু হয়নি।”

অন্তূ গলা উঁচিয়ে রাবেয়া বেগম ও অন্তিককে ডাকে। আমজাদ সাহেব তখনও আস্তে করে বলেন, "আমি আর কিছুক্ষণ তোর সাথে কথা বলি, অন্তূ?"অন্তূ ডুকরে ওঠে, "ওমন কেন করছো, আব্বু? এভাবে কেন কথা বলছো? কীসব বলছো তুমি? আব্বু, তুমি এমন করলে কিন্তু..."

অন্তিক এলো। রাবেয়া দৌঁড়ে এলেন।

আমজাদ সাহেব আবার বলেন, "অন্তূ, তোর সাথে আমার বোঝাপড়া আছে অনেক। একটু সময় দে আমায়, এত অস্থির হোস না। আমি কিছুক্ষণ বসি তোর কাছে? কথা বলি কিছুসময় তোর সাথে বসে?"ভোররাতে কলিং

বাজছে পাটোয়ারী বাড়ির দোতলায়। -বালায়ে মেহেরবানী, দারওয়াজা খুলিয়ে...টিংটিংটুংটাং- তরু চট করে চোখ খুলে উঠে দরজা খুলে দেয়। জয় ভেতরে এসে চাদরটা গা থেকে খুলে হাতে রাখে। তরু ভ্রু কুঁচকায়, এটা এখন তার ওপর ছুঁড়ে মারার কথা। অথচ জয় তাকাচ্ছেও না। তরু জিজ্ঞেস করে, "কোথায় ছিলেন এতক্ষণ? এই শেষরাত মানুষের বাড়ি ফেরার সময়?"

জয় নিগূঢ় চোখে তাকায় মেয়েটার দিকে। তরু আবার জিজ্ঞেস করে, "এত দেরি কেন?"

জয় চোখ সরায় তরুর চোখ থেকে,
“খেয়েছিস রাতে?”
-“খেয়েছি।”জয় হাসে, “এত খাস তবু মিথ্যা বলতে শিখিস না।”
-“খেলে মিথ্যা বলা শেখা যায়?”
জয় হাসে।
আস্তে কোরে বলল তরু, “আপনি খাবেন না?
”

জয় বলল না খেয়ে এসেছি। কেবল নিশ্চুপ মাথা নেড়ে সম্মতি দেয়। জয় ভয় পায় তরুর অভিমানকে, ভয় পায় ওই মেয়ের চোখের কাতরতাকে। এই নিঃস্ব জীবনের একমাত্র যত্নকারী, আগলে রাখার মানুষ তরু জয়ের।

সেই মেয়েকে দুঃখ দিতে জয়ের মতো পাষাণ্ডের কলিজা কাঁপে খুব।
খেতে বসে তরু আবার জিজ্ঞেস করে, "কোথায় ছিলেন? এত দেরি তো করেননা ফিরতে?"
জয় হেঁটে ঘুরে এসে তরুর পাশে দাঁড়িয়ে জগ উঠিয়ে নিতে নিতে ফিসফিস করে বলে, "তোকে খু-ন করে এসেছি আজ।"তরু আৎকে ওঠে অজান্তে। জয় মিথ্যা বলে না। হাসতে হাসতে কঠিন সত্য বলে। তবুও হাসে, "আপনার হাতে আমার খু-ন, মঞ্জুর।"

জয় মাথা নাড়ে, “উহু! যে উপায়ে আজ তোরে খু-ন করে আসলাম, তুই সইতে পারবি না।”

তরু কথা বলেনা, চেয়ে থাকে জয়ের দিকে। জয় ঘুরে ওপারে গিয়ে টেবিলে বসে খাবারে হাত রেখে বলে, “বুঝলি তরু! তোরে ভালোবাসতে না পারাটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। এমন হইলেও হইতো, আমি তোরে তোর মতো করে ভালোবেসে, বিয়ে করে এক জীবন পাড়ি দিতাম।”

তরু ছটফটিয়ে ওঠে, “এসব কথা কেন উঠছে?

-“ওঠার কথা বলে উঠতেছে।”

-"আমি কি কোনোদিন চেয়েছি ওভাবে? আপনি পারেননি, আমিও তো আর বলিনি। এভাবে তো চলছে বেশ! আমি আপনাকে চরম নির্লজ্জতার সাথে ভালোবাসি। আপনাকে ভালোবাসার সময় আমার আত্মসম্মান থাকেনা। এবার আবার জিজ্ঞেস করবেন না যেন কেন ভালোবাসি আপনাকে। আমি কিন্তু বলব না।"

জয় হাসে, "আমি জিজ্ঞেস করলেই তুই বলবি।"-"জিজ্ঞেস করবেন আপনি?"

-"করব। বল, কেন ভালবাসিস আমায়?"

তরু মসৃণ হাসে, "তিনবোনের পর যখন আমি মায়ের গর্ভে, তখন বাপ ভেবেছিল

এবার একটা ছেলে হবে। হলাম আমি। বাপ আমায় মানলো না। মায়ের পক্ষে সম্ভব হলো না আমাকে মানুষ করা। চলে এলাম খালার কাছে। চারবেলা খেটেছি, দুবেলা খেয়ে আশ্রিতার জীবনে মানুষ হয়েছি। হামজা ভাই পড়ালেন টুকটাক, তুলি আপার কাছে শুয়ে থেকেছি। আমারও শখ থাকতে পারে, একথা কারও স্বরণে আসেনি। তবে এক নোংরা মানুষের কাছে আমি দুটু চুলের ক্লিপ, একজোড়া হাতের চুড়ি, চোখের কাজলের স্টিক, চুলে গোঁজার ফুলের খোঁপা, ভারত থেকে আনা শাল চাদরখানা, নবীরবরণের শাড়ি, রাস্তার মোড়ের মামার দোকানের

ঝালমুড়ি, বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়া চালতার আচার—পেয়ে এসেছি কাল ধরে তার হাত থেকে। আমি যখন ছোট্ট ছিলাম, এ বাড়িতে এক ত্যাড়া ছেলের বাস ছিল। যার কাজের ঠিক নেই, কথায় রস নেই, লোকে বলে নিকৃষ্ট লোক সে। সেও বলে, আমি নাকি তার থেকে এসব আদায় করে নিয়েছি নিজের যত্ন দিয়ে। অথচ আমি ছোট ছিলাম। যত্ন করা বুঝতাম না। তুলি আপা একবার চুল ধরে মারতে এলো, সে গিয়ে তুলি আপাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে বলল, 'ছোট মানুষ, ওকে মারবি না আর। নয়ত আমি তোর কান ফাটিয়ে হাসপাতাল করব।' এবার বলুন, আমি তাকে

যত্নে ভালোবেসেছি, নাকি ভালোবাসতে বাধ্য করেছে?''তরুর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি পড়ছে। অথচ কথা আটকাচ্ছে না মেয়েটার। জয় তা দেখে হাসল। আজ সে এক মহাপাপ করে এসেছে। তার খুব আনন্দ লাগছে। কীসের যেন বিষাদ-আনন্দ আন্দোলনে নেমেছে জয়ের বুকে। ধীরে ধীরে তা সংক্রামক ব্যধির মতো ছড়িয়ে পড়ছে ভেতরে।

জয় জিজ্ঞেস করল, "আর কোনো কারণ নেই?''

তরু চোখ মুছে হাসে, "আছে তো। মেয়ে মানুষ রহস্যমণ্ডিত, জানেন না? তারা কী

থেকে যে কীসে আটকে যায়? কেউ কেউ কোনো পুরুষের গোপন নিঃসঙ্গতায় আটকে যায়। বাপ-মাহীন বেপরোয়া জীবনে আঁটকে যায়। যদিও তার পাপগুলোকে ক্ষমা করে নয়। আপনি পাপী, জঘন্য পাপী। আর আমি সেই পাপীর নির্লজ্জ প্রেমপিপাসী। সাহিত্যিক কথাবার্তা না?''

দুইজন হো হো করে হেসে ফেলে। তরুর চোখে পানি, জয়ের চোখ জ্বলছে, লাল হয়ে উঠেছে চোখদুটো। কিন্তু জয় কাঁদতে পারে না, কারণ সে কাঁদতে শেখেনি, কাঁদা ব্যাপারটা কেমন হয় সে জানে না। অনেকক্ষণ দু'জন হাসল মাথা নিচু করে।জয় যখন

খাওয়া শেষ করে ঘরে যায়, তখন ফজরের নামাজ শেষ হয়েছে মসজিদগুলোতে। সে গিটারটা নিয়ে বারান্দায় বসে। কুয়াশা যেন মোটা চাদরের মতো প্রকৃতিতে বিছিয়ে আছে। তরু ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে আস্তে করে কোয়েলের পাশে। তার ওপাশে তুলি ঘুমাচ্ছে। টুংটাং গিটারের শব্দের সাথে ভেসে আসছে জয়ের ভাঙা গলার আওয়াজ,–আমি বা কে, আমার মনটা বা কে....

আজও পারলাম না, আমার মনরে চিনিতে..
ও পাগল মনরে! মন কেন এত কথা বলে....
আমি যত চাই আমার মনরে বোঝাইতে,
মন আমার চায় রঙের ঘোড়া দৌড়াইতে..

ও পাগল মনরে..বিপদের সময় দীর্ঘায়িত হয়। সেদিন সকাল হতে বোধহয় স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি সময় লেগেছিল।

অন্তূর বারান্দাতেই আমজাদ সাহেব হরহর করে বমি করে ফেললেন। খাওয়া নেই সারাদিন, বমিতে শুধু পিচ্ছিল মিউকাস জাতীয় পদার্থ উঠে আসছিল। বেশ কয়েকবার বমির উপক্রম হলো, দু'বার বমি করলেন। উনাকে তুলে এনে অন্তূর বিছানায় শুইয়ে দেয়া হলো, তখন রাত সাড়ে তিনটার মতো বাজে। উনি চোখে ঝাপসা দেখছিলেন, চোখের সামনে দুনিয়াটা ঘুরছিল চরকীর মতো। চোখের শিরায় রক্ত জমে উঠল।

চোখের মণি হলুদাভ-লালচে হয়ে উঠল। প্রেশারেরওষুধ খাওয়ানোর পরেও রাতের বেকায়দা সময়ে কোনো রকমের উন্নতি দেখা গেল না উনার শরীরে।অন্তিক বেশ কয়েকবার গিয়ে ঘুরেও গাড়ি পেল না। সময়ের সাথে সাথে আমজাদ সাহেবের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠছিল। অন্তূ এবং রাবেয়া বেগম উনার হাতে-পায়ে তেল মালিশ করে দিলেন। প্রচুর ঘামছিলেন আমজাদ সাহেব। শীতের রাতে উনার গলা ঘেমে ভিজে উঠেছিল। অন্তূ আন্দাজ করল, ব্লাড-প্রেশার ১৮০/১২০ পেরিয়ে গেছে। ওষুধ খাওয়ানোর পরেও তা ডাউন করছিল না।

সকাল ছয়টায় যখন উনাকে হাসপাতালে ভর্তি করা গেল, তখন উনার ভেতরে যেসব উপসর্গ প্রকাশ পাচ্ছিল, অন্তূর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল তাতে। আমজাদ সাহেব মাথার ব্যথায় ছোট বাচ্চার মতো ছটফট করছিলেন। চোখে দেখছিলেন না। অন্তূকে একবার রাবেয়া বলে ডেকে উঠলেন। অন্তূ অনিয়ন্ত্রিতভাবে অন্তূ ডুকরে ওঠে তখন।

খানিক বাদে বোঝা গেল উনার একপাশ অকেজো হয়ে এসেছে বোধহয়। নিথর লাগছে ডানপাশটা। ডাক্তার দৌঁড়ে এসে উনার ব্লাড প্রেশার মাপলেন, মুখটা ছোট হলো ডাক্তারের। কথা বললেন না। দ্রুত নার্সকে

আদেশ করা হলো উনাকে সিটিস্ক্যান রুমে শিফ্ট করার জন্য। চলে যাবার সময় শুধু এটুকু বলে গেলেন, “রোগীর উচ্চ রক্ত-চাপ অনিয়ন্ত্রণে। গড সেইভ হিম।”অন্তূ চুপচাপ বসে রইল বেডের ওপর। এখন বড় ডাক্তার নেই। হাসপাতালে বড় ডাক্তার রাউন্ডে আসবে কমপক্ষে সকাল দশটায়। অন্তূ বাচ্চাদের মতো অন্তিককে জিজ্ঞেস করে, “ওরা কী বলছে? কী বোঝাতে চাইছে? আব্বুর ব্রেইনে স্ট্রোক হয়েছে? কী বলতে চাচ্ছে রে ওরা?” অন্তিক জবাব দেয় না। চুপচাপ পাশে বসে হাত চেপে ধরে অন্তূর। থরথরিয়ে কাঁপছে অন্তূর দেহ। চোখদুটো অশান্ত, চঞ্চল। কাঁদছে

না। আমজাদ সাহেব বলতেন, ‘ব্যথার ওপর ব্যথা লাগলে নাকি মানুষ ব্যথাহীন হয়ে পড়ে। আঘাতের ওপর আঘাত মানুষের সহনশীলতা বাড়িয়ে দেয়।’

ডাক্তার জানালেন, “রোগীর উচ্চ রক্তচাপ বেড়েছে কোনো জটিল উত্তেজনা এবং দুশ্চিন্তার ফলে। আর তা অনিয়ন্ত্রণে যাবার ফলে..”

আপাতত উনাকে সাধারণ ওয়ার্ডেই রাখা হলো। ডাক্তাররা কী বুঝছেন, বলছেন না কিছুই। বেড পাওয়া গেল না। মেঝেতে মাদুরের ওপর কাঁথা বিছিয়ে শোয়ানো হয়েছিল আমজাদ সাহেবকে।আধাঘন্টাও

হয়নি ঘুমিয়েছে জয়। দরজায় ধুমধাম আওয়াজ। জয় গায়ের কম্বল মাথায় তুলে তার ওপর বালিশ তুলে কান ঢাকে। কাচের দরজায় যে ধাক্কাধাক্কি চলছে, ভেঙেও যেতে পারে আর কিছুক্ষণ এমন চললে।

হামজা আবারও কর্কশ স্বরে ডেকে উঠল, “জয়! এই শুয়োরের বাচ্চা, উঠবি তুই? ওঠ হারামজাদা।”

মাথার ব্যথায় মাথাটা খন্ড-বিখন্ড হয়ে আসছিল জয়ের। চোখের নিচে দাগ পড়ে গেছে, চোখ লাল হয়ে আছে ঘুমের অভাবে।

হামজা ভেতরে ঢুকে বলল, “আরমিণের বাপ হাসপাতালে। যা ওখানে, দ্রুত বের হ।”

জয় ভ্রু কুঁচকে হাই তুলে বলল, “শালীর বাপের আবার কী হইলো দুম করে? ডায়রিয়া না কলেরা?”

-“দুম করে হয়নি? তোকে ধরে বলি দিলেও গায়ের আগুন নিভবে না। যা বলছি, সেটা কর। জনগণ জানে গতকাল কী হয়েছিল। এর দায় আমার রেপুটেশনের ওপর এসে পড়লে তোকে জীবিত দাফনাবো আমি।”

-“আমার জন্যে হইছে নাকি? সেদিন পলাশ মারছে, সেজন্যেও অসুস্থ হতে পারে। আর আমি ওইখানে যায়ে কী করব? ওই শালীর মেয়ে এমনিই সহ্য করবার পারে না আমারে।”-“কথা বাড়াচ্ছিস কেন? বাথরুমে যা, ফ্রেশ

হ। কোনো প্রয়োজন হলে তার ব্যবস্থা করবি, আশেপাশেই থাকবি ওদের। যা বুঝলাম শুনে, স্ট্রোক হয়েছে হয়ত। পাপ করেছিস, তার মাশুল হিসেবে অথবা তোর বিয়ে করা বউয়ের খাতিরে। যাহ।''

জয় বিরক্ত হয়ে ঝারি মারল, "আমার ঘুমে মাথা ভেঙে আসতেছে। ধোনের অসুখ হইছে এক ঠাপ দিয়া!''

হামজা নরম হলো, "যা। মাঝেমধ্যে সেক্রিফাইজ করা স্বাস্থের জন্য ভালো, আর রেপুটেশনের জন্যও। ফিরে এসে ঘুম দিবি। ''-"ভাই, আমি না তোমারে বুঝি না।

মাঝেমধ্যে মন চায় মাথার খুলিডা উড়াই দিই।'' জয় দাঁত খিঁচে ওঠে।

-"আমিও বুঝিনা আমাকে। তুইও বোঝার চেষ্টা করিস না। আমি পরে যাব। পাশের এলাকায় রাস্তার কাজের কন্ট্রাক্ট সাইন করা হয়েছে, তা দেখতে যেতে হবে। তুই যা এখন, আমি পর আসছি।''

জয় অলসভাবে হেঁটে বিছানার দিকে যেতেই ধমকে ওঠে হামজা, "আবার গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লে বিছানাটা আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেব আমি।''

জয়কে ধরে ঠেলে নিয়ে বাথরুমে ঢুকিয়ে ব্রাশে টুথপেষ্ট লাগিয়ে হাতে ধরিয়ে দেয়

হামজা।-“কখন কী হয় ওখানে, জানাস আমায়। তোর কাজকর্মে কতদিন ধৈর্য্য বজায় রাখতে পারব, আমি বুঝতে পারছি না। তবে আশা থাকবে, রাজনৈতিক কাজের বাইরে তোর নোংরামি যেন নিয়ন্ত্রণে থাকে। আমি যেমন প্রশ্রয় আর আদর দিয়ে মাথায় তুলতে পেরেছি তোকে, পাপ বেশি হয়ে গেলে, একবার ধৈর্য্যে টান লাগলে এক আছাড়ে তোর রুহুটা বের করে নিতে হাত কাঁপবে না, জানিস তুই। তাই পাপও সেই অবধি করবি, যে অবধি আমার ধৈর্য্যচ্যুতি না ঘটে।”
কথাগুলো বলতে বলতে রুম থেকে বেরিয়ে আসে হামজা।

জয় গলা উঁচিয়ে নির্লজ্জের মতো বলে, "আমি কিছুই করি নাই, বাল। ভালো মানুষ বলে যে পারে দোষ দিয়ে যায়। তোমার তো খালি অভিযোগ আমার ওপর। যাই করি সহ্য হয় না।"

-"জিহ্বাটা টেনে ছিঁড়ে ফেলি, এগিয়ে আয় এদিকে আমার কাছে। গলার আওয়াজ উঁচু হচ্ছে কেন?"

জয় ব্রাশ মুখের মধ্যে রেখে একহাতে লুঙ্গি উঁচিয়ে ধরে বলল, "জিহ্বা ছেঁড়ার ইচ্ছা তোমার হইছে, আমি ক্যান আগায়ে আসব? তুমি আসো.."লুঙ্গি ঘেঁষে যাচ্ছিল বাথরুমের ভেজা মেঝেতে। টেনে শক্ত করে বাঁধল

সেটা। হাত দিয়ে মুঠো করে লুঙ্গি ধরে দুই ঠ্যাঙের মাঝে গুঁজে আয়নার দিকে তাকায়। দেখতে কালো লাগছে চেহারাটা। আয়নার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, “ও দয়াল! জান নিবা নাও, দম ক্যান বাইর হইয়া যায়?” চোখ লাল হয়ে আছে ঘুমের অভাবে। হামজার কণ্ঠ শোনা গেল, “দেরি করিস না, জয়। তাড়াতাড়ি বের হ।”সিটিস্ক্যান রুম থেকে বের করে ওয়ার্ডে আনার পর আমজাদ সাহেবের একপাশ পুরোপুরি অবশ পাওয়া গেল। উনাকে পাঁজাকোলা করে ধরে মাদুরে শোয়ানো হলো। পড়ে রইলেন ওভাবেই। অপলক তাকিয়ে আছে তার চোখদুটো অন্তূর

দিকে। জোরে জোরে শ্বাস নেয়ার চেষ্টা করছিলেন। অন্তূর থেকে চোখ ফিরিয়ে রাবেয়ার দিকে তাকালেন। কম্পিত বাঁম হাতটা এগোতে চাইলে কাঁদতে কাঁদতে তা চেপে ধরেন রাবেয়া। কথা বলতে গিয়ে ঠোঁট বেঁকে আসে আমজাদ সাহেবের। অন্তূ ছটফটিয়ে উঠে দাঁড়ায়। এই দৃশ্য দেখতে নেই। অন্তূ পারছে না।

যে মানুষটার ভরাট কণ্ঠস্বর ও স্পষ্ট ভাষায় বলা দামী কথা আর ধমক শুনে অভ্যস্ত অন্তূ, সে মানুষের অর্ধঙ্গ অসুস্থতা দেখা যায় না। অন্তূর চোখ বাঁধা মানতে চায় না। কিন্তু স্বার্থপর আব্বুর জন্য সে কাঁদবে না। যে

তাকে এই পরিস্থিতির সামনে, এই অবস্থার মধ্যে ফেলে এভাবে অসুস্থতার ভয় দেখায় তার জন্য অন্তূ কাঁদবে না।

রাবেয়া উনার মুখের কাছে কান এগিয়ে নিয়ে গেলেন অস্পষ্ট কণ্ঠে একপেশে ধরণের স্বরে শোনা যায়, "আমায় তুমি ক্ষমা কোরো, রাবেয়া। তোমাকে কিছুই দিতে পারিনি এই জীবনে। আমায় বাঁধিয়ে রেখো না, তুমি। মাফ কোরে দিও আমায়। অন্তূকে দেখে রেখো।"

আরও অনেক কিছুই বলার ছিল, পারলেন না বোধহয়।রাবেয়া উনার হাতের ওপর কপাল ঠেকিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠেন। অন্তূ বসে আব্বুর শিওরে, "তুমি কীসের ক্ষমা

চাইছো? আম্মু বোকা, আম্মু তোমায় ক্ষমা করতে পারে, আমি অন্তূ তোমাকে কোনোদিন ক্ষমা করব না, আব্বু। আচ্ছা, কী ভেবে এসব বলছো তুমি? কিচ্ছু হবে না তোমার। এখনও রিপোর্টই আসেনি। চুপচাপ শুয়ে থাকো।”

পাগলের মতো বলে চলে অন্তূ। অন্তিকের চোখে পানি চিকচিক করে ওঠে। আজ কতগুলো বছর সে এই দেবতাতূল্য মানুষটার সাথে কথা বলেনি। তার সাথে কথা না বলেই আব্বু কোথায় যাচ্ছে? এই ক'দিনে সুযোগ বা সাহস পায়নি কথা বলার। সেদিন যখন ক্ষমা চাইল, আমজাদ সাহেব চুপচাপ তাকিয়ে ছিলেন কেবল। অন্তিক পুরুষ মানুষ,

পুরুষদের কাঁদতে নেই। চোখদুটো রক্তলাল হয়ে ওঠে অশ্রু জমে। আমজাদ সাহেব হাসার চেষ্টা করলেন বোধহয়, অথচ ঠোঁট বেঁকে গেল। অন্তূ সহ্য করতে না পেরে উঠে দৌঁড়ে বারান্দায় যায়। আবার ফিরে আসে ছুটতে ছুটতে। অন্তিকের ঠোঁটদুটো কাঁপছে, অথচ কিছুই বলতে পারল না ছেলেটা।ছেলেরা বাপের সামনে বোবাপ্রাণী, এরা জান দেয়া স্বীকার তবে মুখ ফুটে বাপের কাছে ক্ষমা বা ভালোবাসা প্রকাশে চরম ব্যর্থ। চোখের ভাষায় আব্বুর কাছে কাঁদলো ছেলেটা, ক্ষমা চাইল, কত কথা বলল, সব দুজনের চোখের ভাষায় সীমাবদ্ধ। অভিমান, অভিযোগ, আড়ষ্টতা ও

বহুদিনের বাকহীনতা জমে জমে যে শক্ত দেয়ালটা বাপ-ছেলের মাঝে খাঁড়া হয়েছিল, তা ভাঙে দুজনের নীরব দৃষ্টি বিনিময়ে। অন্তিক বেরিয়ে যায় রাবেয়াকে নিয়ে। অন্তূকে আব্বুর কাছে বসার সুযোগ দেয়। সে অপদার্থ ছেলে, ছেলে হবার যোগ্যই না। অন্তূ ছিল আব্বুর একমাত্র অবলম্বন।

অন্তূ বসে আব্বুর সামনে। কান্না থামানোর উপায় নেই তার কাছে আজ। হাতটা চেপে ধরে অঝোরে কিছুক্ষণ কাঁদল অন্তূ। আমজাদ সাহেবের চোখ ছলছল করে। তবে পানি গড়ায় না।

অন্তূ ডেকে ওঠে, “আব্বু? তুমি কী বোঝাচ্ছ? তুমি আমায় রেখে চলে যাচ্ছ, এটা বোঝাচ্ছ? তুমি পাষাণ্ড জানতাম। তবে এত্ত পাষাণ্ড আব্বু তুমি? আব্বু! আমি কী করে কী করব একা? আব্বু.....আব্বু? আমি তো এক পা-ও চলতে পারি না তোমায় ছাড়া। তুমি আমায় এসব ভয় দেখিও না! আমি জানি, কিচ্ছু হবে না তোমার। এসব মিছেমিছি ভয় অন্তূ পায় না। বুঝলে!”থামে অন্তূ। কান্নাটুকু গিলে ফের বলে, “তুমি এত তাড়াতাড়ি যেতে পারবে না। আমি যেতেই দেব না তোমাকে। মগের মুলুক নাকি? তুমি বললে আর চলে গেলে? আমায় কী মনে হয় তোমার? যেতে দেব আমায়

ফেলে? সে তুমি যাবে ভালো কথা। চলো, আমায় নিয়ে চলো। সেদিন যখন তোমার কাছে মরণ চেয়েছি তুমি মারোনি আমায়, অথচ আজ নিজে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। আচ্ছা, আব্বু! পৃথিবীর সব বাপেরাই কি তোমার মতো কঠোর স্বার্থপর হয়? আজ আমার উত্তর চাই। তুমি চুপ করে থেকো না। তোমার গলার ভারী আওয়াজ শুনতে চাই আমি। বলো যে, ‘না সব বাবা এমন হয় না, শুধু তুমিই এমন নিষ্ঠুর, পাষাণ্ড, মায়াহীন, কঠিন স্বার্থপর বাপ।’ বলো। আমি একজন স্বার্থপর বাপকে ভালোবেসেছি, বলো আব্বু, স্বীকার করো। আম্মা কাঁদছে কেন? তুমি কী

বলেছ? চলে যাচ্ছ, তাই বলেছ? কথা বলো, কথা বলো...''টপটপ করে পানি পড়ে অন্তূর চোখ দিয়ে। মেয়েটা নাক টানে, আর আব্বুকে ঝাঁকায়। একেকটা করে অভিযোগী প্রশ্ন করে, “শোনো আব্বু। আমার একটা কথা রাখো, রাখবে? আব্বু, রাখবে? আমি চলো তোমার সাথে যাই। একা একা থাকতে ভালো লাগবে না আমার, বুঝেছ! আমি তোমার সাথে যাব। তুমি না চাইলেও যাব। তোমার তো আমার প্রতি মায়া নেই। তুমি পারবে চলে যেতে আমায় ফেলে। কিন্তু আমি তো থাকতে পারব না তোমায় ছেড়ে। সকালে ফজরের নামাজের অযুটা তোমার সাথে করি, তখন তোমায়

লাগবে আমার। ঘুম থেকে উঠতে দেরি করলে দরজায় এসে ধাক্কাধাক্কি করার জন্য তোমাকে লাগবে আমার। কোথায় পাব বলো? জবাব দাও। আমাকে নিতে হবে সাথে, আমি যাব তোমার সাথে। একা যেতে দেব না স্বার্থপরের মতো আমায় ফেলে। আমার পরীক্ষা দিতে যাবার সময় তোমাকে লাগে আমার, বুঝতে পারছো তুমি? আমি পরীক্ষা দিতে একা যেতে পারি না। কে নিয়ে যাবে আমায়? বিকেলে চা আর টোস্ট খাবার সময় পাশের চেয়ারে তুমি না বসলে আমার চলে না। তখন কোথায় পাব তোমায়?''আমজাদ সাহেব কথা বলছেন না। অন্তূ অধৈর্য হয়ে

উঠল, “ইশ রে! কিছুই কি বলবে না তুমি? শোনো, আমায় এই ব্যবস্থাগুলো করে দাও, তারপর ভাববো তোমায় যেতে দেয়া যায় কিনা! ওহ, আমি একা রাস্তাও পার হতে পারি না। আমায় রাস্তা পার হওয়াও শেখাতে হবে। নয়ত তো তুমি যেতে পারবে না। এতই সহজ নাকি তোমার জন্য অন্তূকে ফেলে চলে যাওয়া? শোনো আব্বু! রাতের খাবারটা তোমার পাশের চেয়ারে বসে খাই আমি, ভুলে যাচ্ছ? তুমি না ডাকলে রাতে খেতে যাই আমি? পড়তে পড়তে তোমার ধমকানো ডাক কানে না এলে তো উঠতেই মন চায় না আমার। আম্মার কথা কানেও লাগে না

আমার। কে ডাকবে আমায় খেতে, সেই জবাব দাও আগে। বেশি রাত জেগে পড়লে কে আমায় রাতে এসে দেখে যাবে, বিস্কুটের কৌটোটা এগিয়ে দিয়ে একটা ধমক দেবে, ‘দুটো বিস্কুট খেয়ে পানি খেয়ে ফের পড়তে বস। একাধারে পড়লে শরীর খারাপ হবে, মনোযোগ পাবি না। নে, খা। একটু হাঁটতে যাবি? চল বাড়ির সামনে দুই পাক মেরে আসি দুজন।’ কে বলবে, এই ব্যবস্থা আগে করো তুমি। আমায় কে ডেকে ধমকে বলবে, মশারিটা টাঙিয়ে দে তো অন্তূ। আজ মশা খুব বেশি।’ তুমি বুঝতে পারছো আমার সমস্যাগুলো? আমার পদে পদে সমস্যা

তোমাকে ছাড়া। একটা দিন কাটাতে পারব না। দেখলে তো কাল, তুমি ছিলে না, আর কী হয়ে গেল আমার সাথে!''আমজাদ সাহেবের চোখের কোণা বেয়ে কয়েক ফোঁটা জল কানের গোড়া দিয়ে চুইয়ে পড়ে। অন্তূ চোখদুটো মুছে নড়েচড়ে বসে। নাক টেনে শান্ত স্বরে বলার চেষ্টা করে, "আব্বু? বুঝলে, আমার বুকের ভেতর খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। তোমারও হচ্ছে? হচ্ছে না, জানি। কারণ তুমি খুব স্বার্থপর, আব্বু। খুব স্বার্থপর।''

গা কাঁপিয়ে কেঁদে ফেলল অন্তূ, "তুমি একাটাও কথা বলছো না, আব্বু? কী করেছি আমি? কীসের অপরাধে এই যন্ত্রণা দিচ্ছ?

তুমি বুঝতে পারছো না, আমি সহ্য করতে পারছি না? আব্বুউউ? তুমি জবাব দিচ্ছ না কেন? আমায় কষ্ট দিয়ে কী পাচ্ছ? আমার সহ্য হচ্ছে না তো। আমি সইতেই পারছি না। কী করব, বলো তো!"

বুকের মাঝখানটায় আঙুল গেড়ে বলল অন্তূ, "এই এই এখানে কেমন যে লাগছে, তুমি বুঝলে ঠিক কথা বলতে। তুমি টেরই পাচ্ছ না। তুমি খুব কঠোর আব্বু, খুব নিষ্ঠুর।"

অন্তূর বিলাপে আশপাশের লোকজন থমকে যায়। কারও কারও চোখে ছলছলে পানি নেমেছে। আমজাদ সাহেবের চোখের কোণা বেয়ে একফোঁটা পানি সরু হয়ে গড়িয়ে পড়ে।

অন্তূ তা সযত্নে মুছে দিয়ে বলে, “কাদছো কেন তুমি? কিচ্ছু হয়নি তো। আচ্ছা, আমি আর কাঁদছি না। তুমিও কাঁদবে না কেমন?” আমজাদ সাহেব নিশ্চুপ। বাচ্চারা যেমন ঘুমন্ত মানুষকে ঝাঁকায়, অন্তূ ওইভাবে আমজাদ সাহেবকে ঝাঁকালো, “আব্বু!”অন্তূ ঝেরে উঠে দাঁড়ায়। চিৎকার করে ডাক্তার ডাকে। নার্স আসে, ডাক্তার আসে। অন্তূকে অন্তিক সরিয়ে নিয়ে যায় টেনে। ধরে রাখা যায় না অন্তূকে। পাগলের মতো লাফালাফি করছে মেয়েটা। অন্তিক শক্ত হাতে টেনে ওকে বারান্দায় নিয়ে যায়।

রিপোর্ট হাতে নার্স আসে। মহিলা ডাক্তার তা দেখেন চোখ বুলিয়ে। হেমোরেজিক স্ট্রোক। অর্থাৎ মস্তিষ্কের ধমণিগাত্র বিদীর্ণ হয়ে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে রক্ত বেরিয়ে তা জমাট বেঁধে গেছে। রোগী বাঁচানোর সুযোগ এই স্ট্রোক দেয় না। উন্নত চিকিৎসা প্রাপ্তি অবধি যাবার সুযোগ থাকেনা এই ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনে। ডাক্তার রিপোর্ট রেখে বেরিয়ে গেলেন চুপচাপ।

মেঝের ওপর পড়ে আছে আমজাদ সাহেবের নিথর দেহটা। নাক দিয়ে রক্ত আসছে। কান দিয়েও বেরোবে বোধহয় রক্ত। এই লাশ বেশিক্ষণ না রাখার পরামর্শ দিলেন

ডাক্তারেরা। যেদিক দিয়ে সম্ভব এখন গলগলিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

অন্তূ চুপ করে বসে রইল হাসপাতালের নোংরা মেঝের ওপর। জলন্ত আগুনে পানি ঢালার পর ঠিক আগুন যেমন ধপ করে নিভে যায়, ওভাবে নিভে গেছে অন্তূটা। একদৃষ্টে চেয়ে আছে অন্তূ ওই তো দূরে পড়ে থাকা লম্বাটে দেহাবয়বের দিকে।জয় হাসপাতালের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে গেইটের সামনে দাঁড়ায়। অস্থির লাগছে ভেতরটায়। দ্রুত একটা সিগারেট ধরিয়ে ঠোঁটের ভাঁজে রাখে। অন্তূর কান্না খুব জ্বালাতন করছে। তখন ইচ্ছে

করছিল, গিয়ে মেয়েটাকে ঠাটিয়ে দুটো চড় মেরে আসতে। ওভাবে আহাজারি করে কাঁদার কিছু তো নেই। বাপ কি আর মানুষের মরে না? জাভেদ আমির মরেনি? জয়ের সামনে মরণের প্রক্রিয়া চলেছে উনার, জয় কি বেঁচে নেই? এত ন্যাকামির কী আছে? বারবার চোখের সামনে অন্তূর কান্নাজড়ানো পাগলের বিলাপ ভেসে উঠছে। বিরক্তিতে দু চারটা গালিও বেরিয়ে এলো মুখ দিয়ে। এসব আবেগ বোধ করার মতো বোধশক্তি তার মাঝে নেই। সে স্বাধীনচেতা মানুষ। আবেগ ভালো মানুষকে খারাপ কাজ করতে বাধ্য করে, উল্টো খারাপ মানুষদের নিজের কাজ

থেকে দূরে আনে। জয় ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল। তার খারাপের কোনো চিকিৎসা নেই, কারণ খারাপ হওয়াটা তার রোগ নয়, তার সত্ত্বাগত বৈশিষ্ট্য। আধখাওয়া সিগারেটা দূরে ছুঁড়ে মারল।বিকাল তিনটায় আমজাদ সাহেবের শেষ দুপুরে শেষ গোসল হচ্ছিল। জয় চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল ভিটির ওপর। অনেক লোক জড়ো হয়েছে মূর্দা বাড়িতে। তারা কটূক্তি করতে ভুলছে না। গতকালের তাজা ঘটনা মরলেই চাপা পড়বে কেন? মেয়ের চরিত্রের দোষের ভাগ বাপেরও যায়।

বসার ঘরের মেঝেতে খুঁটির সাথে পিঠ ঠেকিয়ে চুপচাপ বসে আছে অন্তূ। উঠানের

ওপর ত্রিপল টাঙিয়ে ভেতরে তার আব্বুর শেষ গোসল হচ্ছে। সে চুপচাপ বসে দেখছে। কান্না পাচ্ছে না তার। আব্বুর সাথে খুব যেতে ইচ্ছে করছে। অবশ্য সে যাবেই। কেউ ঠেকাতে পারবে না তাকে। জয় তাকিয়ে দেখছিল অন্তূকে।

দুটো ছেলে এগিয়ে এলো। সালাম দিলো। জয় খেয়াল করল না। দুজন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও জবাব না পেয়ে ডাকল, "জয় ভাইয়া? "জয় আনমনার মতো বলে, "হু!"

দৃষ্টি তখনও অন্তূর দিকে। রাগ হচ্ছে তার। মনে মনে ঠাস করে অভ্যাসবশত দুটো গালি দিলো, "মানুষ বাপ মরলে কাঁদে, শালী

সেটাও করছে না। মানে হাগল-পাগল বিয়ে করাই দিছে আমার সাথে! তোর বাপ মরছে, তুই কাঁদবি, চিল্লায়ে কাঁদবি। তা না করে এমনভাবে বসে থাকার কারণ কী? কখন জানি ফিট খাইয়া পইড়া থাকবি। কাঁদলে একটু হালকা লাগে।''

জয়ের ইচ্ছে করল, এগিয়ে গিয়ে ঠাস করে একটা চড় মেরে বলতে, ‘‘কাঁদ, জোরে-জোরে কাঁদ। চুপচাপ আছিস, বেশি চাপ পড়তেছে মাথায়। মূর্ছা যাবি। সেন্স হারানোর আগে কেঁদে হালকা হ শালী।''

ছেলেদুটো অধৈর্য্য হয়ে বলেই ফেলল, “ভাই, একটা সেলফি নিই? ফেসবুকে আপলোড করব।”

উঠতি বয়সী ছেলেরা। রাজনৈতিক নেতাদের সাথে ছবি তুলে ফেসবুকে দিতে পারাটাও একটা বাহাদুরী তাদের কাছে। এতে তারা এক ধরণের শক্তি অনুভব করে। জয় ভ্রু কুঁচকে গম্ভীর হয়ে তাকায়, “তাতে উপকারটা কী?”

ছেলদুটো চুপসে গেল, “না মানে... আচ্ছা সেলফি লাগবে না। আপনার ফেসবুক একাউন্টটা দেবেন ভাই? আমরা এড হতাম।

''জয় চোখ বুজে ভারী শ্বাস ফেলল, মনে মনে বলল, "ফেসবুকের মাইরে..."

গালিটা প্রকাশ্যে দিলো না। এরা এক প্রকার সামাজিক শক্তি। জয়ের খুব শক্ত ভক্ত, তা বোঝাই যাচ্ছে। জয় মাথা নাড়ল, "আমার কোনো ফেসবুক একাউন্ট নাই। ওসব বাল-ছাল পোষায় না আমার। ফেসবুকে কী কাম? কী করে ওই ধোন-বাল দিয়া?"

ছেলেদুটো যারপর নাই অবাক হলো, "আপনার ফেসবুক একাউন্ট নাই?"

-"হ, নাই। পারলে ফোনে একমাত্র কলিং সিস্টেম ছাড়া আর কিছু রাখতাম না। কিন্তু ফাংশনালভাবে বহুত কিছুই পড়ে আছে।

যেসব আমার বালের কামেও লাগে না। যাহ, ভাগ।''

একে তো ঘুম নেই তার ওপর কীসের যে এক বোঝা চেপে আছে মাথায়। অদ্ভুত এক প্রেশার-ফিল হচ্ছে। অস্থির লাগছে সবকিছু। লোকালয় থেকে দূরে যেকোনো এক নির্জন জঙ্গলে অন্ধকারে খানিকক্ষণ বসে কয়েক বোতল অ্যালকোহল গিলে আসতে পারলে ভালো লাগতো।বিষাদ ঘিরে আছে বাড়িতে। গোসল করিয়ে এনে আমজাদ সাহেবের লাশ রাখা হলো। আজ মার্জিয়ার চোখদুটো ভেজা দেখা গেল। মেয়েটা উদ্ভ্রান্তের মতো বসে সেই শ্বশুরের জন্য অসুস্থ শরীরে চোখের পানি

ফেলেছে, যাকে সে চিরদিন বিরূপ চোখে দেখে এসেছে, শুধু অভিযোগ ছাড়া কিছুই ছিল না ওই মানুষটার ওপর।

রাবেয়াকে সামলানো যাচ্ছে না, বারবার দাঁত আঁটকে যাচ্ছে উনার। হামজা বসে রইল সোফার ওপরে। তার ছেলেরা মৃতদেহ দাফন-কাফনের সমস্ত ব্যবস্থাপনা করে ফেলেছে। অন্তূ আর অন্তিক মূর্তির মতো বসে ছিল দুই ভাই-বোন। অন্তূ দেখল সেই জায়গাটা, যেখানে সেদিন তাকে দাঁড় করিয়ে নষ্টা প্রমাণিত করা হলো, সেখানেই আব্বুর লাশের খাটিয়াটা রাখা হয়েছে। মেঝের ওপর বসে দেয়ালে হেলান দিয়ে তাকিয়ে থাকল খাটিয়ার

দিকে। তার চোখে-মুখে অবিশ্বাস। লোকজন যা ভাবছে তেমন কিছুই না। কী বাজে কথা! তার আব্বু নাকি আর নেই! এ-ও কখনও হয়?লাশ নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি যখন চলছিল। জয় এলো অন্তূর কাছে। হাঁটু গেড়ে সামনে বসে আস্তে কোরে বলল, “আরমিণ! চলো, এখন তোমার বাপরে নিয়ে যাবে ওরা। চলো!
”

অন্তূ নিস্তেজ পায়ে উঠে দাঁড়াল আস্তে করে। জয় তাকে ছোঁয়ার সাহসটা করল না এ অবস্থায়। অন্তূ হেঁটে গিয়ে বসল খাটিয়ার পাশে মাটির ওপর। বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল আব্বুর মুখের দিকে। চেহারাটা উজ্জ্বল

হয়েছে। চোখে সুরমা, মেহেরাঙা দাড়ি ভেজা। ভুরভুর করে আতর, গোলাপ জল, কর্পূরের গন্ধ ঢুকছে নাকে।

অন্তূ ডাকল, "আব্বু....আব্বু.... ও আব্বু! আব্বু, আব্বু গো..."

আমজাদ সাহেব সাড়া দিলেন না। নিষ্ঠুরভাবে চুপটি মেরে ওভাবেই শুয়ে রইলেন। একটুও বুঝতে চেষ্টা করলেন না অন্তূর ভেতরে কী হচ্ছে!-"আব্বু তুমি কী ভয়ানক স্বার্থপর! সকালে প্রতিদিন ডেকে ডেকে তো ঠিক আমার ঘুমটা ভাঙিয়ে দিতে। আজ এই যে ডাকছি, তুমি উঠছো না, ঠিক আরামে ঘুমাচ্ছ! এটা কি ঠিক আব্বু?"

জয়ের ভেতরে কী হচ্ছে! আশ্চর্য এক ধরণের ব্যাপার। সে অন্তূর পেছেনেই দাঁড়িয়ে ছিল। তার ভেতরে কী এক অদ্ভুত অনুভূতি চলছে। হনহন করে বেরিয়ে গেল গেইট দিয়ে। বাড়ি থেকে একটু দূরে গিয়ে একটা চুরুট ধরালো। ছোট বাচ্চার মতো করে চোয়ালটা খাটিয়ার ওপর ঠেকিয়ে উদাস বাচ্চার মতো চেয়ে থাকে অন্তূ আব্বুর দিকে। আব্বুর ঠোঁটদুটো হাসছে যেন। লোকে দেখলে আরেকবার মেলাতে পারবে, অন্তূর সুশ্রী নাকটা আমজাদ সাহেবের কাছে পাওয়া। অন্তূর চোখের কোণা পেরিয়ে নিস্তেজ ঝরনার মতো পানিগুলো গড়িয়ে খাটিয়ার ওপর পড়ে। কিন্তু অন্তূ স্থির

চোখে চেয়ে আছে আব্বুর মুখের দিকে। শেষ দেখা দেখছে সে আব্বুকে। আর কোনোদিন দেখতে পাবে না ওই অভিজাত মুখখানা, আর কোনোদিন গম্ভীর স্বরে অন্তূকে ডেকে পাশে বসাবে না, আর কখনও ধমকে বলবে, ‘রাতে খেয়ে তারপর ঘুমাবি।’অন্তূ আস্তে কোরে ঢলে পড়ে খাটিয়ার ওপর থেকে মাটিতে। পড়ে রইল ওভাবেই। তার জন্য অপেক্ষা করার নয়। লোকজন অন্তূর চেতনাহীনতার মাঝেই অন্তূর আব্বুকে অন্তূর কাছ থেকে চিরতরে সরিয়ে নিয়ে গেল।

খাটিয়ার একপাশ হামজা ধরে, অপর পাশ দুটো অন্তূর চাচাতো ভাইয়েরা। আরেকটা

অন্তিকের জন্য খালি। অন্তিক বাথরুমে ঢুকেছে। বের হবার নাম নেই।

মুখ বিদ্ধস্ত, চোখ লাল, ফোলা। টুপি পরতে পরতে বেরিয়ে আসে অন্তিক বাথরুম থেকে। খাটিয়ার একপাশ হামজা ধরেছে, তাতেও কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালো না ছেলেটা।

আমজাদ সাহেব বলতেন, ছাগল জবাই হবার পর মাংসের সাথে যাই করা হোক, ছাগলের আর যায় আসে না।লোকে বলে, আজ মরলে কাল দু'দিন। আমজাদ সাহেবকে ছাড়া মাঝে দু'দিন কেটে গেছে।

অন্তূকে স্নায়ুর দূর্বলতা কাটানোর স্যালাইন দেয়া হয়েছিল। সে দুটো দিন প্রায় অবিরাম

অচেতন। এর মাঝে খাওয়া-দাওয়া নেই। পাগলামি থামাতে বাধ্য হয়ে ঘুমের ইঞ্জেকশন দেয়া হয়েছে। আশ্চর্যজনকভাবে শুধু ওষুধ এবং পানির ওপর দুটো দিন কেটে গেছে। চোখদুটো বসে গেছে, চোখের পাতা ফোলা, ঠোঁটের চামড়া শুকনো, ত্বক ফ্যাকাশে। অন্তূকে দেখে লাগছিল, বহুদিন কোনো কবরে বাস করে ফের জীবিত হয়ে উঠে এসেছে।

অন্তূ দু'দিন পর উঠল সন্ধ্যার পর। প্যারালাইজড রোগীর মতো উদ্দীপনাহীন শরীর। চোখ খুলে কিছুক্ষণ ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকল। কিছু মনে পড়ছে না। সব মনে পড়ছে, কিন্তু সেসব কেমন যেন জটলা

বাঁধা, ঝাপসা। কুণ্ডলীর মতো মস্তিষ্কে জট পাকিয়ে আছে, স্পষ্ট হতে সময় লাগল। আচমকা শরীরটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে বমি করে ফেলল অন্তূ। বমিতে শুধু পিচ্ছিল সর্দি আর কালচে তরল উঠে আসছিল। পুরো শরীরে এক রত্তি জোর নেই উঠে বসার মতো। বমি হবার পর আর কোনো জীবিত মানুষের মতো লাগছিল না অন্তূকে। ঘরের সকলে এক পর্যায়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল অন্তূর নির্জীব অবস্থা দেখে।

অন্তিক দৌড়ে গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনলো। পার্লস রেট নেই বলা চলে। কোনোরকম বিট করছিল। অন্তূ চোখের মণি ঘুরিয়ে দেখল

ডাক্তারকে, আর নজর ফেরালো না। চেয়ে রইল ডাক্তারের দিকে। ডাক্তারসাহেব একের পর এক প্রশ্ন করছিলেন।-“কেমন লাগছে তোমার? কোনো রকম ভ্রম দেখছো চোখে? কিছু খেয়েছ? দেখো, তুমি শিক্ষিত মেয়ে। পৃথিবীর চিরন্তন সত্যগুলোর মাঝেমৃত্যু সবচেয়ে উপরে রয়েছে, যেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। এভাবে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ, যা বোকামি হচ্ছে। কিছু খেয়ে নাও। আমি বুঝতে পারছি তোমার মনের অবস্থা, কিন্তু... ডাক্তার সাহেব থামলেন। অন্তূ প্রতিক্রিয়াহীন, কোনো রকমের উদ্দীপনা নেই তার চোখে-

মুখে। বেশ কিছুক্ষণ ওভাবেই নিশ্চুপ থেকে হঠাৎ-ই বলল, "ডাক্তার কাকা!"

-"হ্যাঁ, মা।"

-"দুটো ঘুমের ওষুধ দেবেন আমায়?"ডাক্তার অন্তূর মুখের সেই কাতরতা দেখে আৎকে উঠলেন। অপার্থিব কাকুতি। যেন কোনো মৃতর ডাক!

-"না রে মা। আর না। যে পরিমাণ ঘুমের ইঞ্জেকশন আজ দুইদিন দিয়েছি, তোমার শরীরের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতির জন্য যথেষ্ট। এখন তুমি উঠবে, কিছু খাবে। এরপর আমি কিছু ওষুধ দেব সেগুলো খাবে। সুস্থ হওয়া লাগবে তোমার। বুঝছো?"

অন্তূ আচমকা কী করল! হুড়মুড়িয়ে উঠে ডাক্তারের পা জড়িয়ে ধরল, "ডাক্তার কাকা, দিন দুটো ঘুমের ওষুধ। শুনুন কাকা, আমি চুপচাপ শুয়ে আছি জন্য আপনারা বুঝতে পারছেন না। ওই যে ওই, ওই বিছানার ওখানে এসে আব্বুর বসার কথা এখন। আমি অসুস্থ, আব্বু এসে ওইখানে বসে থাকার কথা। বসছে না, দেখেছেন? ডাক্তার কাকা, দিন দুটো ঘুমের ওষুধ কাকা। কাকা আমার ওপর এইটুকু দয়া করুন।"

অন্তূকে ছাড়ানো যাচ্ছিল না। ডাক্তার সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেলে অন্তূর ফুপুকে বললেন, "ওকে সামলান। ট্রমা নিতে পারছে না। ওর কেমন

চিকিৎসা দিলে কোনো উন্নতি হবে, বুঝতেই পারছি না। আমজাদ ভাই যে করলেন মেয়েটার সাথে!"ডাক্তার বুঝলেন, অন্তূ বেশিক্ষণ এই অবস্থায় চেতনা ধরে রাখতে পারবে না। মানসিকভাবে পুরোপুরি ডিস্ট্রয়েড মেয়েটা। অন্তূ উঠে বসে পাগলের মতো এদিক-ওদিক তাকায়, আর শুয়ে পড়ে। শুয়ে ঠিক গলাকাটা মুরগীর মতো ছটফট করে। আবার উঠে বসে বুকের মাঝে আঙুল চেপে ধরে মালিশ করে বারবার। হাঁ করে শ্বাস নিয়ে আবার মাথার চুল টেনে ধরে। এদিক-ওদিক তাকায়, কাউকে খুঁজছে ওর বিকৃত মস্তিষ্ক। চোখের পানিগুলো আঁটকে আছে,

পড়ছে না। দাঁত চেপে বুক চেপে ধরে।
আবার নিঃশব্দে ডুকরে উঠে মাথা নিচু করে নিঃশব্দে আর্তনাদ করে।
মাথা তুলে বলে, “ডাক্তার কাকা, আমায় ঘুম পাড়িয়ে দিন। আমায় ঘুম পাড়ানোর ওষুধ দিন। আমায়....দুটো ঘুমের ওষুধ দিন। আপনার কাছে অনুরোধ করছি, কাকা।”
হাতজোর করে অন্তূ।
ডাক্তার চেয়ার থেকে নেমে অন্তূর সামনে বসে মাথায় হাত রাখেন, “আমজাদ ভাই কী করলেন, বুঝতে পারছি না। এই পাগলিকে রেখে খোদা তাকে টান দিলেন কেন? ধৈর্য্য ধরো তুমি, আম্মা।”অন্তূ অনেকক্ষণ ওরকম

চামড়া ছিলা পশুর মতো তড়পে একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আস্তে কোরে মেঝে ঘেষে গিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে। সামনের দেয়ালে একটা ক্যালেন্ডার ঝুলছে। আজ ২৯-ই নভেম্বর, ২০১৪। তার বিয়ে হয়েছে ২৬-ই নভেম্বর ২০১৪। অন্তূ অপার্থিব দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল দিনপঞ্জিকার দিকে।

ডাক্তার সাহেব বিস্মিত চোখে দেখলেন অন্তূকে। তিনি যা বুঝলেন, তা ভয়ানক। অন্তূ নিজের একাধিক সত্ত্বার ওপর চমৎকার নিয়ন্ত্রণ পেয়ে বসেছে। এমন নয় যে সে যখন সত্ত্বা হারাচ্ছে, তখন অন্য সত্ত্বাকে ভুলে যাচ্ছে। মাইন্ড কন্ট্রোল করতে পারছে

মেয়েটা। ভয়ানক এক মানসিক রোগ। সে নিজেই নিজের ভয়াবহতা বুঝতে পারছে। আবার ভয়াবহতার ওপর কাবুও রয়েছে। অর্থাৎ তার নিজ নিয়ন্ত্রিত একাধিক মানসিকতা তার ভেতরে জায়গা পেয়েছে। অন্তূ চট করে নিজেকে শান্ত করে তুলেছে। এখন দেখে মনে হচ্ছে, কিছু ভাবছে। চুপচাপ হাঁটুতে থুতনি ঠেকিয়ে মেঝের দিকে চেয়ে আছে। হাঁটুসহ পুরো শরীর দুলছে রকিং চেয়ারের মতো।

তার ঘুম পাচ্ছে খুব। ঘোর লেগে আসছে। ক্ষুধা লাগেনি, তবে অল্প পানি পিপাসা পেয়েছিল। ডাক্তার চলে গেলেন। ঘর ফাঁকা

হয়ে এলো। অন্তূ টের পেল, আব্বু এসে পাশে বসেছে। অন্তূ হেসে জিজ্ঞেস করে, “কেমন আছো, স্বার্থপর আব্বু?”আমজাদ সাহেব মৃদু হাসলেন, “আমি ভালো আছি। তোকেও ভালো থাকতে হবে। কিছু খাসনি কেন?” মৃদু ধমক দিলেন আমজাদ সাহেব। অন্তূ ফুপুকে ডেকে বলে, “আমার জন্য খাবার নিয়ে আসুন তো। আর পানি আনবেন বেশি করে, গলা শুকিয়ে আসছে খুব।” আব্বুর উদ্দেশ্যে হাসল, “এবার খুশি?”

আমজাদ সাহেব জবাব দেন না। চুপচাপ বসে থাকেন অন্তূর পাশে। অন্তূ গপাগপ খেলো অনেকটা খাবার। বমি হবে বোঝা যাচ্ছে। তবু

খেলো। খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল আব্বুকে, “আমি কি পাগল হয়ে গেছি, আব্বু?”

আমজাদ সাহেব মাথা নাড়েন, “উহু। তুই কূটিল হয়ে গেছিস। আর এই কূটিলতা তোকে অনেক কিছু দেবে। বুঝলি অন্তূ, গন্তব্যে পৌঁছাতে অত স্বাভাবিক আর সরল থাকা নয়, বরং নিগূঢ় পাগল আর জটিল হতে হয়।”

প্রথম কথাটা আব্বুর মতো লাগল না। আব্বু এরকম কথা বলতো না, অন্তূ বলে এমন কথা। তবে শেষের কথাটা আব্বুর হতে পারে।অন্তূ খাবারের লোকমা মুখে তুলে আব্বুর দিকে তাকায়। আব্বু বসে আছে তার

পাশেই দেয়াল ঘেঁষে। অন্তূ টের পায়, তার আর যন্ত্রণা হচ্ছে না বুকে। একটুও কষ্ট লাগছে না। একদম স্বাভাবিক, সুখী লাগছে নিজেকে। হ্যাঁ, অবশ্য একটু অস্বাভাবিক লাগছে সবটা। চারপাশটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। অদ্ভুত!লতিফের কেবিন নং-৪। জ্ঞান ফেরার পর সে বিশেষ কোনো কথা বলেনি। আসমাও জিজ্ঞেস করেনি কিছু। কেবল সে মনে মনে তৈরি মাজহারের বিরুদ্ধে একটা বিহিত করতে।

রাত আটটার দিকে মাঝারি উচ্চতার এক লোক ঢুকল কেবিনে। ডান হাতে তার আর্ম স্লিং বাঁধানো।

-“ভালো আছেন, ভাবী? আমি মাজহার আলমগীর। লতিফ ভাই কেমন আছে এখন?” লতিফ কথা বলার চেষ্টা করল। মাজহার নিজেও খুব সহজ মুখে কথা বলে সবসময়। আসমা সিঁটিয়ে বসে রইল। এই মাজহারই তার স্বামীর এই হাল করেছে। মাজহার একটা চেয়ারে বসে লতিফকে বলল, “কী দল করতেন এতদিন, এবার কি বুঝতে পারছেন কিছু? ওই দুই শুয়োরের বাচ্চা মানুষের বাচ্চাই না।”আসমা বুঝতে পারছিল না কিছু। মাজহার ফের বলে, “আপনি এই অবস্থায় আমার বহুত কাজে আসতে পারেন। জয়কে ধরার একটা সূবর্ণ সুযোগ আপনার এই

অবস্থা। পুলিশের কাছে জবানবন্দি দিতে হবে কিন্তু আপনার! পাটোয়ারী বাড়িকে ফোকলা না করা অবধি মরণ নেই আমার। জিন্দা হয়ে ফিরে আসছিই একমাত্র ওই বাড়ির তিন ব্যাটার কবর খুঁড়বো বলে। আব্বা আসতে চাইছিল, পরে-টরে এসে দেখে যাবে। আপনার কোনো খরচা-পাতি দরকার?''লতিফ মাথা নাড়ল মৃদু। মাজহার আশ্বাস দেয়, "তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যাবেন আপনি। আমি একটা কেইস ফাইল করে দিই। আর আমার হিসেব আমি পুলিশ দিয়ে না, নিজে মেটাবো। তবে একটু সময় নেব।''

চোখের ইশারায় জানতে চায় লতিফ, "দেরি কেন?"

-"কিছু হিসেবে বাকি আছে, এখনই দুইজনকে উড়ানো যাচ্ছে না, মাঝখানে পলাশ ভাই দাঁড়ায়ে আছে। পলাশ ভাই ধৈর্য্য ধরতে বলতেছে। সে কী চাচ্ছে, বা কারণ কী বুঝতেছি না। কিন্তু কিছু করারও নেই তার ওপর দিয়ে। আর হারামজাদা দুইটা আরও খানিক সময় পাবে আমার কাছে। অথচ লতিফ ভাই, যতদিন আমার রক্তের বদলা আমি না তুলব ওদের থেকে আজরাইলও আমায় মারতে পারবে না।"

মাজহার আরও কিছুক্ষণ কথা বলে চলে যায়। আসমার মনে হলো, মাজহার ছেলেটা খুব বদমেজাজী আর বোকা। কিন্তু এতক্ষণের কথায় সে যা বুঝেছে, তা বিশ্বাসই হচ্ছিল না। সংশয় কাটাতে স্বামীকে জিজ্ঞেস করে, “তোমাকে আসলে মারছে কে?”ক্লাবের ছাদ থেকে পলাশের শহরের ভেতরের নাইটক্লাবের বিল্ডিংটা দেখা যায়। রঙ বেরঙের আলো জ্বলছে বিল্ডিংয়ের গা বেয়ে।

হামজা এসে দাঁড়াল পাশে। কাচের বাটি ভর্তি করে কাঠবাদাম, পেস্তা ও কাজু নিয়ে দাঁড়িয়ে খাচ্ছে জয়। কাজু বাদাম খেলে গা চুলকায়, এলার্জি আছে তার। তবু খাওয়া বাদ দেওয়া

যাবে না। এক মুঠো ভরে নিয়ে মুখে পুড়ল। হামজা এসে দাঁড়ানোর পরেও কোনো কথা বলল না, চোখও ফেরালো না।

হামজা নীরবতা ভেঙে বলল, “নারীর চোখের পানি অম্লের মতো। তা জারে সাজিয়ে রাখলে ঠিক আছে, তাতে বেশি মনোযোগ দিয়ে কাছে টানলে ক্ষয় হয়ে ঝলসে যাবি।”

ওয়াহ ওয়াহ! কবি কবি মেজাজ, কবির নেই তো লজ্জা লাজ! আমার কবিতাডা কেমন হইলো কও!

হামজা হাসল, কথার লাইন কাটছিস।-“তাই নাকি? তাইলে তো বড় দুর্দিন চলে আসছে আমার, হ্যাঁ? আইজকাল মাগী মাইনষের

চোখের জলে ডুবে ডুবে মরে যাচ্ছি? মেজাজ খারাপ করা কথা না বলে বাড়ি যাও।''

-“তাকা তো আমার দিকে।''

জয় তাকাল, হেসেও ফেলল হো হো করে। জয়ের অট্টহাসির আওয়াজটা খুব অদ্ভুতুরে শোনায়। হেসে বলল, “কী বোঝাইতে চাচ্ছ?''

-“ঘায়েল হলে পুরুষ মাতাল হয় আর নারী কুচক্রী। নারীর কুচক্র অস্ত্রের চেয়েও বেশি ক্ষয়সাধক।''

জয় ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল, “জয়কে ক্ষয়ও করা যায়? জেনে ভাল্লাগলো। এমন ভাবনা ভাবার ক্ষেত্রে অধঃপতনটা তোমার নাকি আমার?''

-“যেহেতু আমি সঠিক ভাবছি, তাই অধঃপতনটা তোর।”

মাছি তাড়ানোর মতো হাত নাড়ায় জয়, “হামজা ভাই জিন্দাবাদ!”

-“জয়, তুই যদি মাটির তৈরি ফুলদানী হোস, তো সেই মাটি দিয়েছে জমিন অর্থাৎ তোর বাপ। কিন্তু সেই মাটি পিটিয়ে হাতের দক্ষতায় সাজিয়েছি কিন্তু আমি তোকে। তোর চেয়ে তোকে ভালো জানা মানুষটা আমি। আমার লেখা বই তুই।”

দুটো কাজুবাদাম মুখে তুলে নেয় জয়, আওয়াজহীন হাসে, “তোমার লেখা বই? তা হোক বা না হোক, শয়তানী কালামের বই

আমি। যার প্রতিটা মন্ত্র প্রয়োগ করো নিজের স্বার্থে।’’

-“এ আর পুরোনো কথা কী? আমি স্বার্থপর, এ কথা পূর্বদিকে সূর্য ওঠার মতোই চিরন্তন সত্য।’’

জয় কাজু বাদাম চিবোচ্ছে। খানিক চুপ থেকে হাসে হামজা, “মাঝেমধ্যেই অভিযোগ হয় তোর আমার ওপর, তাই না?’

-“অভিযোগ? ওসব সস্তা লোকেদের হয়। আমি হাইফাই, ভিআইপি মানুষ, ওসব ছোটলোকি ব্যাপার আমার হয় না। তবে হওয়া উচিত। তুমি ভালোবাসো না আমায়। সব ভণ্ডামি। তবে হয়না কেন জানো, কারণ

আমি ভালোবাসার মতো লস প্রজেক্ট টাইপ অনুভূতির আশা রাখিনা কারও কাছে। অদ্ভুত এক সম্পর্ক, বর্ণনা করা যায়না তোমার-আমার প্যাঁচ। না আমি তোমায় ভালোবাসি না তুমি আমায়। তবুও দূরত্ব সঁয়না, জটিল কেইস। ঠিক বলিনি?'' হাত উপরে তুলে আড়মোড়া ভাঙে জয়।

হামজা গা ঘেঁষে দাঁড়ায় জয়ের, জয়ের জ্যাকেটের চেইন খোলা ছিল। তা লাগিয়ে দিয়ে বলল, “ঠান্ডা লাগেনা তোর? ধাক্কা মেরে ফেলে দিই ছাদ থেকে।''

-“এক শর্তে ধাক্কা মারার অনুমতি দিতে পারি।''

হামজা ভ্রু কুঁচকে তাকায়। জয় আবদার করার মতো নাটক করে বলে, “আমার জন্য একটা ফাইভ-স্টার কবরের ব্যবস্থা করতে হবে।”হামজা হেসে ফেলল। এরপর অনেকক্ষণ নীরবতা। হামজা টের পায়, জয় অস্থির, অশান্ত। বেশ কিছুক্ষণের নীরবতা ভেঙে বলে, “তোর জন্য আমার অনুভূতি শূন্যের মতো, জয়। সংখ্যার আগে বসাবি তো ওটা মূল্যহীন লাগবে, যেটাকে তুই আমার প্রশ্রয় বলিস। কিন্তু সংখ্যার পরে বসালে দেখবি, সমান্তরাল হারে সংখ্যার মান বাড়ছে। একক থেকে দশক, শতক, হাজার, অযুত...

ওটা ভালোবাসা কিনা জানি না, তুই যা ধরে নিবি তাই।”

জয় কিছু গাল থেকে উগরে দেবার মতো হেসে ওঠে, “এসব কাব্যিক কথা রাখো। ভালোবাসা আবেগী অনুভূতি, আবেগের সাথে জয়ের কোনো আপোষ নেই। মেয়েলোক চাহিদার সামগ্রী আমার কাছে, নাথিং ইলস।”

জয়ের কথা কানে গেল না যেন, আচমকা স্বর বদলে গেল হামজার, “তোর চোখে আফসোস দেখার অভ্যাস নেই আমার। পাপ করে এসে সেই পাপের খেয়ালে ডুবে থাকতে দেখার অভ্যাস নেই, তা শেখাইনি আমি। পাপ যেখানে হয়েছে, সেখানেই রয়ে গেছে, তুই

ফিরে এসেছিস। তা সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে শেখাইনি। জয়, আমি ছাড়া অন্য কিছু তোর অস্থিরতার কারণ হয় তা সহ্য করতে পারি না আমি।''হাতের কাজু বাদাম দুটো হাতে ধরে জয় তাকিয়ে থাকে হামজার দিকে।

-“তোকে গড়েছি আমি। খারাপ হোক ভালো হোক, একটু একটু করে গড়ে তুলেছি তোকে। সেই তোর ভাঙনের কারণ অন্যকিছু হলে তা বরদাস্ত করতে পারব না আমি। সৃষ্টিকর্তা মানুষকে জান দেয়, কেড়ে নেয়ার মালিক সে। তোকে গড়েছি আমি, ভাঙার হলে, আঘাত করার হলে তা করব শুধুই আমি। তোর ওপর আঘাতের অধিকার শুধু

আমার, আমার। বিয়ে দিয়েছি, বউকে ভালোবাসবি, চলবে। কিন্তু আমি ছাড়া কোনো ভাঙন তোর চোখে দেখা গেলে দুনিয়াটা জ্বালিয়ে দেব, কসম।"

জয় কাজুবাদাম দুটো গালে পুরে গলা জড়িয়ে ধরল হামজার, "তুমি তো দেখতেছি মহিলা মাইনষের চেয়েও বেশি হিংসুটে! রাশিগত সমস্যা আছে নাকি? কন্যারাশি? আমার কিচ্ছু হয় নাই। খালি শান্তির অভাব। একটা গান গাই? ওরে শান্তি কেন নাই রে দুনিয়ায়.."-"সান্ত্বণা আশা করছিস আমার কাছে?"

-"করতেছি না। যা তুমি দেবে না, সেই আশা করব ক্যান? আরে বাপ, কিছুই হয় নাই আমার। মেয়ে মাইনষের মামলা বোঝোই তো। আগুন জ্বলতেছে বুকে, আগুন নেভানো দরকার। হোটেলে যাই চলো, একটু সুখ দরকার। আমি গরম হয়ে আছি খুব, ঠান্ডা হলেই সব ওকে। ওহ, তোমার তো ঘরে বউ আছে, তুমি ক্যান যাবা? আমরা বাল বিয়াইত্তা ব্যাচেলর পাবলিক... "

হামজা বিরক্ত হয়, "মিথ্যা হাসি সবার ঠোঁটে মানায় না। বিশেষ করে তোর ঠোঁটে পাপের হাসি আর নিষ্পাপ হাসি ছাড়া হাসিই মানায় না। হাসিস না, বিরক্ত লাগছে। কিছুক্ষণ

আনমনে দাঁড়িয়ে থাক, দুঃখগুলো ক্লান্ত হয়ে গেলে চলে যাবে। আমি আসছি।''জয় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। সম্পর্কে সবসময় খাঁটি অনুভূতি প্রয়োজনীয় না, সম্পর্কে সততা দরকার, একমাত্র সততা। তার আর হামজার সম্পর্কের বিশেষত্বই এটা। দুজনের কাছে দুজনের কোনো কপটতা নেই। যা মনে তাই মুখে। বানোয়াট কিছু দেখানোর চেষ্টা নেই, এখানেই দুজন অবিচ্ছেদ্য। জয় চেয়ে থাকে অন্ধকার আকাশের দিকে। হামজা খুব হিংসুটে একটা ব্যাপারে। জয়ের কোনো ক্ষতি হামজার ওয়াস্তে হলে ঠিক আছে, কিন্তু অন্যকিছুর জন্য নয়। কারণ, হামজা মানে

জয়ের দুঃখের অধিকার শুধু তার, সুখের অধিকার যে কারো হতেই পারে।

মদের বোতল এনে রাখে হামজা টেবিলের ওপর। অলস ভঙ্গিতে চেয়ারে বসতে বসতে বলে, "পাপীদের ধ্বংস কোথায় জানিস?"

-"জানা দরকার।"

-"এক পাপের পর, পরবর্তী পাপের আগে কিছুটা সময় নেয়ায়। মানুষের ভেতরে আবার বিবেক নামক এক চুলকানি আছে। পাপ করে কিছুটা সময় দিলেই ওই শালা কুরকুর করে ওঠে। আর সেখান থেকেই এক ক্রমশ বর্ধনশীল ছিদ্র তৈরি হয়— ধ্বংসের ছিদ্র। এজন্য বুদ্ধিমান পাপীরা থামে না, একাধারে

অবিরত পাপ করে যায়, বিকেককে কুরকুর করে ওঠার সময় দেয় না।''

জয় হাসল, "আমি পাপের মাত্রা কমিয়ে এনেছি, তাই তো? বিবেকানন্দ নাচছে ভেতরে।''

-"বিবেকানন্দ ভালো লোক ছিল, বিবেকের মতোই ভালো। বস। বহুদিন পর তোর নামে জাস্ট এক প্যাগ মারব। তোর ভাবী কিছু বললে তোর দোষ।''-"ভাবীর অবস্থা কী? সে কি ঠিকঠাক হয়েছে?'' জয় বসে চেয়ারে। হামজা চোখ খিঁচে এক ঢোক গিলে বলে, "মেয়ে মানুষ তৈরির মাটিতে সৃষ্টিকর্তা সামান্য পরিমাণ বিষ মিশিয়ে দেয়। যেটা সাধারণত

মায়া হয়ে রয়ে যায় মেয়েলোকের মাঝে। কিন্তু কোনো আঘাত পেলেই সেই মায়া বিষ হিসেবে প্রকট হয়। এজন্যই ওই জাতের থেকে সাবধানের মার নেই। গলা জ্বলছে আজ।''

-“রেকর্ডার অন থাকলে ভাবীর জন্য একটা স্পেশাল গিফট তৈরি হতো।''

-“অন করিসনি কেন? আমার সব কথা জরুরী। সবগুলো বিশ্ব-সংবাদ হবার যোগ্য।''

জয় হো হো করে হেসে ওঠে, “তোমার কি চড়ে গেছে?''

-“আমার চড়েনি, তবে আর একবার এমন পেট বানানো বাটপারি হাসি হাসলে কান

সারার নিচে এমন একটা মারব, তোর চড়ে যাবে। হাসি যখন আসছে না, মাথা ভার লাগছে, মন মতো গিলে গিয়ে ঘুমা। নাটক করছিস কেন?

জয় ঠোঁটে আঙুল চাপল, "ওকখে। চুপ করলাম। হাসি পেলে অনুমতি নিয়ে হাসব। সরি সরি।"

-"কাল রাতে মাজহার গেছিল লতিফের কাছে। আগামীকাল তোকেও একবার সাক্ষাৎ করে আসতে হবে। এরপর তোকে ট্যুরে পাঠাব কয়েকদিনের। ট্যুর থেকে ফিরলে বউ এনে দেব। ঢাকা যাবি?"জয় নিঃশব্দে হাসল। জয়ের মতো আজগুবি কথা বলার চেষ্টা

করছে হামজা। আর জয় উল্টো চুপচাপ আজ। হামজা গ্লাস শেষ করে নিজস্ব ভঙ্গিতে ঠোঁট বাঁকিয়ে নির্মল হাসল, "আমি তোর শিক্ষক নই, জয়। শিক্ষকের মনে থাকে ক্ষমা আর হাতে থাকে দণ্ড। আমার মনে তোর জন্য ক্ষমার ভাণ্ডার থাকলেও হাতে কোনোদিন দণ্ড উঠাইনি। কারণ আমি শিক্ষক নই, তোর কারিগর। আর গড়ে তুলতে শুধু যত্নের প্রয়োজন হয়, প্রশ্রয় দিতে হয়। ভালোবাসা আমার কর্ম নয়। আমি তোকে ভালো-টালো বাসি না।"

-“বাসা লাগবে না। ওসব আমার পোষায় না। চলো গান ধরি।” জয় উদাস চোখে আকাশের দিকে মুখ তুলে গেয়ে ওঠে,

ইট গামলায় ইট বানাইয়া, চৌদিকে ভাটা সাজাইয়া

মাঝখানে আগুন জ্বালাইয়া দিলো গো...

ভিতরে পুড়িয়া সারা, মাটি হইয়া যায় অঙ্গারা

এখন আমি কী করি উপায়...সাতদিন পর শুক্রবার বাদ জুম’আ মসজিদে কিছু মিলাদ ও দান-সদকা, দোয়া করা হলো। ততদিন অন্তূর চাচা-ফুপুরা ছিলেন দিনাজপুরে।

শনিবার সকাল সকাল উনারা তৈরি হলেন ফিরে যাবার জন্য। অন্তিকটা কেমন মৃতপ্রায়

হয়ে উঠেছে। সে সাতদিনে দু তিনবেলা খাবার খেয়েছে। সেটাও উল্লেখযোগ্য হারে সামান্য। মার্জিয়া ধমকে, জোরপূর্বক খাইয়েছে। সে চাচাদের জন্য গাড়ি ডাকতে গেল বাসস্ট্যান্ড অবধি পৌঁছে দেবার। আফজাল সাহেব অন্তূকে ডেকে কাছে বসালেন। অন্তূর হাড্ডিসার দেহটা পোশাকের নিচেও লুকোনো যায় না। একটা কালো ওড়না শরীর ও মাথায় জড়িয়ে অল্প একটু জায়গা নিয়ে সোফায় বসে রইল।

চাচা বললেন, "আইজ কয়দিনে তো ম্যালা পাওনাদারের যাওয়া-আসা দেখলাম। বিষয়টা খারাপ লাগছে আমার, বুঝছো? ভাই তো আর

নাই। তুমি আর অন্তিক এক সময় আসো কুড়িগ্রাম সময় করে। জমিজমা বিক্রির আর দরকার নাই। ও আমার খামার যেমনে চলতেছে চলুক। পাওনাদারের টাকা মিটমাট করে দিবানি আমি। ভাইয়ের দেনা শোধ না করে যাব কই?''অন্তূ সামান্য হাসল, "তার প্রয়োজন হবে না, কাকা।''

-"ক্যান? এই কথা ক্যান?''

অন্তূ কথা শেষ করতে চাইছিল পাশ কাটিয়ে। মাথার চাঁদিতে তীক্ষ্ণ এক চিনচিনে ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে। তা খুব শীঘ্রই মারাত্মক পর্যায়ে যাবে।

সে তাকাল চাচার দিকে, “আপনি যা বলছেন, তা শুনতে দয়া করার মতো লাগছে, কাকা। আমার ধারণা আপনি সেটাই করতে চাইছেন। যেটা গ্রহন করতে শেখানো হয়নি আমাকে।”
-“কথা বেশি শিখছিস? পাকনা মাইয়া এক থাপ্পরে দাঁত ফালায়া দিমু। বেলেহাজ মেয়েলোক। কাকার সামনে কেমনে কথা কইতে শিখাইছে তর বাপে ওইডা আগে শুনি।”
অন্তূ আর কথা বলল না। হাতের তালুর দিকে তাকিয়ে রইল মনোযোগ সহকারে। তার নির্লিপ্ততায় ধৈর্যহীন হলেন আফজাল সাহেব, “কথা ক। কী চাস?”-“ওই জমি আপনার

কাছ থেকে হাসিল করার পেছনে দৌঁড়ে ভালো পেরেশানি গেছে, আব্বুর! পাওনাদারদের এতদিন যখন ঠেকাতে পেরেছি, আর ক'টা দিন সবুর করে নেবে ওরা। আমি ওই জমি হাসিল করে তা বিক্রি করেই বরং পাওনা মেটাবো। আবার আসবেন, কাকা! বাইরে গাড়ি এসে গেছে বোধহয় আপনাদের।"

আফজাল সাহেব অপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, "বাপরে কথা! সাহস ভালোই তর। ওই চেংরি! আমি না দিলে কেমনে হাসিল করবা জমি? কিচ্ছু তো আর নাই, তবুও দেমাগ কমে নাই? ভালো বুইঝা পাওনা টাহা দিতে

চাইলাম, আবার দেমাগ দেহাও? আমি দেখমুনে কেমনে আমার থেইকা জমি আদায় করো, আর পাওনা মিটাও। হ দেখুমনে আমি।''

অন্তূ মুচকি হাসল, ‘‘আপনি সে চিন্তা কোরে চাপ নেবেন না, কাকা। বয়স হয়েছে। এ বয়সে উত্তেজিত হওয়া উচিত না। সে-সব আমার জিম্মা, ইনশাআল্লাহ সামলে নেব। আপনার গাড়ি এসে গেছে। আবার আসবেন। আল্লাহ হাফেজ।''অন্তূ বসে থাকে ওভাবেই। বাড়ি ফাঁকা হতেই রাবেয়া কাঁদতে শুরু করলেন। অন্তূর মাথার ব্যথাটা চিটমিটিয়ে উঠল। অন্তূ ধমকে উঠল, ‘‘কান্না থামাও।

জোয়ার নেমেছে চোখে? কান্নার জন্য বিশেষ পরিস্থিতির দরকার হয়। লোকের আর স্বামী মরে না? তারা আজীবন কাঁদে? কাঁদলে আড়ালে কাঁদবে, খেয়াল রাখবে কান্নার করুণ সুর যেন আমার কান অবধি না পৌঁছায়। অসহায়ত্ব ও চোখের পানিকে ঘৃণা করি আমি।''

অন্তূ চেয়ারটার ওপর মাথা এলিয়ে দিয়ে চেয়ে থাকে ছাঁদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে। মার্জিয়া এসে বসে। অন্তূ ওভাবেই জিজ্ঞেস করে, "শরীর ভালো আপনার?''

-"অন্তূ......''মার্জিয়ার ক্ষমাপ্রার্থী সুরের ডাকটা অন্তূর কানে পৌঁছাতেই ছাদ থেকে চোখ

সরিয়ে সোজা হয়ে বসে, হাত উঁচিয়ে ধরে মার্জিয়ার উদ্দেশ্যে। থেমে যায় মার্জিয়া।
অন্তূ স্থির নজরে তাকিয়ে বলে, "আমি বাংলা সিনেমার মমতাময়ী নায়িকা নই, ভাবী। পুরো সিনেমাতে যে যা-ই করুক, শেষে সব মাফ করে বুকে জড়িয়ে নেয়া, তারপর খালি ভালোবাসা আর প্রেম। আমি ছাড়িও না ধরিও না।"
শোনো অন্তূ!
-"একটা কথা বলব ভাবী?"
-"হু!"অন্তূ শূন্যে দৃষ্টি মেলে উদাস স্বরে বলল, "যাকে জীবিত অবস্থায় দেখেনি মৃত্যুর পর তাকে দেখতে হায় হায় করতে করতে ছুটে

যাওয়ার বিষয়টা মানুষের ভেতরে থাকা আবেগের সবচেয়ে ময়লা দিকের একটা। মৃতদেহ একটা ঘরের আসবাবের চেয়েও মূল্যহীন জড়, তা দেখাতে ফজিলত কী? আব্বু আজও যদি এই সোফায় এসে বসতো, আপনি এখানে এসে দাঁড়াতেন না আব্বুর সামনে।''

মার্জিয়া কেঁদে ফেলল।

অন্তূ কপাল চেপে ধরে বড়ই অনীহার সাথে বলল, "আপনি কেন কী করেছেন তার বিচারে যাবার রুচি নেই আমার আপাতত। কিন্তু আমার আব্বু অবহেলিত হবার মতো মানুষ না। কিন্তু আপনি তার একমাত্র ছেলের

স্ত্রী হিসেবে তাকে একবার ‘আব্বা’ বলে ডাকেননি। তার নাতিকে গর্ভে ধরেছেন, সামনে গিয়ে সেই খবরটা দেননি। কিন্তু তিনি খেলনা কিনে এনে আম্মুর আলমারীতে রেখেছে।”অন্তূ আলগোছে উঠে চলে যেতে যেতে বলল, “পরবর্তিতেও অন্তত আব্বুকে নিয়ে কোনো শব্দ যেন আপনার মুখে উচ্চারিত না হয়, অন্তত আমার সামনে।”

পড়াটা হচ্ছিল না। আব্বু এসে বিছানায় বসে অন্তূর খাতাপত্র নেড়েচেড়ে দেখে বলছে না, “লেখা তো ডাক্তারদের মতোন হয়েছে, অথচ হবি উকিল। কাহিনি কী?”

রাত বারোটা বাজছে। অন্তূ ছটফটিয়ে উঠে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। আব্বু এসে পাশে দাঁড়ায় অন্ধকারে দাঁড়ালে। আগামীকাল সকালে তার পরীক্ষা। আব্বুকে ছাড়া সে প্রথমবার পরীক্ষা দিতে পারবে। অন্তূ রুমে এসে ঘুমের ওষুধ খুঁজল। নেই। অন্তিক সরিয়ে নিয়েছে। আবার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

অন্তিক এসে পাশে দাঁড়ায়। বেশ কিছুক্ষণ নীরবে কাটার পর অন্তূ বলে, “তোর বউ-বাচ্চার পরিবারে আম্মাকে শামিল করে নে। আর পরিবার চালাতে একটা কাজের ব্যবস্থা

কর। টাকা-পয়সা যা লাগবে, ব্যবস্থা করা যাবে।''

অন্তিক হাসে, "খুব গৃহিনী হয়ে গেছিস? কখনও জিজ্ঞেস করিসনি আমাকে কিছুই আমার ব্যাপারে।''-"রুচি নেই রে।''

-"ভালোই। আচ্ছা, আম্মার ব্যবস্থা হলো, আর তোর? তোর কী?''

-"আমার কী? আমার বড়লোকের ছেলের সাথে বিয়ে হয়েছে। আমি ফিট থাকব। এ আর কী!''

অন্তিক চুপ রইল। অন্তূ হঠাৎ-ই জিজ্ঞেস করে, "পলাশ আজগরের কাছ থেকে কত টাকা নিয়েছিলি?''

-“পাঁচলক্ষ।”

-“মার্জিয়া তোকে স্টিমেটলি গহনা দিয়েছিল কত টাকার?”

-“দুই লাখ টাকার মতো।”

-“এছাড়াও কিছু আছে। বলছিস না।”

-“তুই শুনতে চাইছিস না।”

-“হ্যাঁ। চাওয়াটা অপ্রয়োজনীয়। আর হারানোর কিছু নেই। হারানোর থলি ভরপুর। এখন কারণ জানাটা সময়ের অপচয় আর শব্দ দূষণ হবে।”-“শব্দ দূষণ?”

-“হ্যাঁ। তুই বলবি, সেই আওয়াজ আমার কানে যাবে। যা সময়মতো আসেনি, যখন তোর বলার ছিল।”

-“বলার মতো উপযুক্ত সময় ছিল না। তাই অনেককিছু হয়ে গেছে।”

-“এখনও এমন কিছু ঘটেনি যে বলার উপযুক্ত সময় এসেছে। বাদ। কিছুই হয়নি।”

-“ভুল বুঝতেছিস।”

-“আচ্ছা, বুঝতে দে। তো তোকে পলাশ আজগর দুই লাখ টাকার গহনার বদলে পাঁচ লক্ষ টাকা দিলো?”

অন্তূ তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে, “শিক্ষা মানুষের মূর্খতা দূর করতে পারে হয়ত, তবে বোকাদের তো কোনো চিকিৎসা নেই। মহাজনদের কাছে যা বন্ধক রাখা হয়, তার মোট মূল্যের ততটুকু তারা মানুষের হাতে

দেয়, যতটুকু বাদ দিয়ে মূলটাকা এবং সুদসহ তাদের হাতে থেকে যায়। যাতে সময়মতো টাকা পরিশোধ না করলেও জিনিসের মূল্য মূলটাকা ও সুদের যোগফলের সমান হয়। সেখানে পলাশের মতো একজন নরকের কীট তোর কাছ থেকে দুই লক্ষ টাকার জিনিস রেখে পাঁচলক্ষ টাকা ধরিয়ে দিলো, তুই তা নিয়ে ব্যবসা শুরু করলি, সাহস বটে.... উমম দুঃসাহস বলা চলে।''অন্তিক চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল, জবাব দিলো না। অন্তূ বলে, "জিদ আর পলাশ তোর দোকান খেয়েছে, বাপটাকে খেয়েছে, বোনের ইজ্জত খেয়েছে। আফসোস, অন্তিক তোকে খেয়ে ফেলেনি। পলাশ তোকে

ছিঁড়ে খেয়ে ফেললে আব্বু বেঁচে যেত, আমি বেঁচে থাকতাম, পরিবার বেঁচে যেত।''

অন্তিক অদ্ভুতভাবে হাসে, "তুই নিষ্ঠুর হয়ে গেছিস, আব্বুর চেয়েও বেশি।''শনিবার দিবাগত রাত। প্রায় আড়াইটা বাজছে। লতিফকে ব্যথার ওষুধ খাওয়ানোর ফলে শুয়ে পড়েছিল। আসমা বসে ঝিমোচ্ছে। তার মেয়ে জ্বালাতন করছে, শুতে পারা যাচ্ছে না। পুঁচকে সন্ধ্যার পর ঘুমিয়ে রাতে জাগে।

কেবিনের দরজায় ধাক্কা পড়ল। বেশ কিছুক্ষণ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগে দরজা খুলতেই হুড়মুড়িয়ে ভেতরে ঢুকে দরজা আঁটকে দিলো জয়।

আসমার আতঙ্কিত মুখের দিকে তাকিয়ে জয় নিজের স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে হাসল, লাইট জ্বালান, ভাবী। বেশি অন্ধকারে থাকলে চোখ নষ্ট হয়। আল চেঁচাবেন না যেন ভুলেও, তাতে শব্দদূষণ হয়।''

মহিলা ভয়ে জুবুথুবু হয়ে বলে, ''ক্যান আসছেন?''

জয় দু'পাশে মাথা নাড়ল, ''লাইট জ্বালান।''

লতিফের ঘুম ভাঙল। ভয়ে শীতের রাতে ঘাম ছুটেছে বেচারার শরীরে।

জয় কোমড় থেকে পিস্তল বের করে ম্যাগাজিন খুলে বুলেট চেইক করতে করতে

বলল, “শরীর ভালো, লতিফ ভাই?”লতিফ উঠে বসার চেষ্টা করল। পারল না। জয় পিস্তল লোড করে তাকাল, “বিশ্বাসঘাতকদের বাঁচিয়ে রাখতে নেই, লতিফ ভাই। সব নীতিতেই তাই। তবে বিশেষত রাজনীতিতে বিশ্বাসঘাতকতা শুকনো খড়িতে দাউদাউ করে জ্বলা আগুনের মতো। আজ আমাদের সাথে গাদ্দারি করেছেন, কাল মাজহারের সাথে করবেন। আপনাকে মেরে ফেলা উচিত। আপনি যে-কারো জন্যই ক্ষতিকর। এখন যেহেতু মাজহারের হয়ে কাজ করছেন, কয়দিন পর আপনার ছোবল মাজহারও খাবে। তোহ....আজ শত্রুপক্ষের

একটা উপকার করব। সবার ভালোর জন্যই মারব আমি আপনাকে, মাইন্ড কইরেন না।'' লতিফ কিছু বলতে চাইছিল। জয় হাত নেড়ে থামায়, ''শুনেছি, ফেরাউন মৃত্যুর দূতকে সামনে দেখে তওবা করেছিল, আপনাদের আল্লাহ কিন্তু ওর তওবা কবুল করেন নাই। মৃত্যুকে সামনে রেখে গুনাহ কবুল করলে সেই গুনাহগার ক্ষমা পায় না, লতিফ ভাই। ''লতিফ অবাক হয়। এই জলদগম্ভীর জয়কে সে দেখেনি। জয় চঞ্চল, বদমাশ, সবসময় তার চোখে-মুখে ফুটে থাকে এক বিদঘুটে রসিকতা ভরা শয়তানী হাসি। যার কথার উচ্চারণ অশুদ্ধ, মূর্খতায় পূর্ণ। আজ জয়কে

লাগছে উচ্চ শিক্ষিত মৃ-ত্যুদূত। এই জয় বরফশীতল পিণ্ড।

পিস্তল তাক কোরে ধরল জয়। আসমা এক কোণে দাঁড়িয়ে মেয়েটাকে জাপটে ধরে কাঁপছে। জয় জিজ্ঞেস করল, “ছেড়ে দেবার কথা ছাড়া আর কিছু বলতে চান, ভাবী? সংক্ষেপে শেষ করুন।”

জয়ের নিষেধ করা কথাটাই বলে আসমা, “ছেড়ে দ্যান। ক্যান মারতেছেন? ছেড়ে দ্যান... ”

জয় সঙ্গে দাঁতে দাঁত চেপে, এক চোখ বুজে ট্রিগার প্রেস করে। ঠিক যেমন কিশোরেরা বন্দুক হাতে পাখি তাক করে রাবার বুলেট

ছোঁড়ে, ভীষণ মজা ফুটে ওঠে মুখে। ক্যাচছ করে একটা আওয়াজ বেরোয়। আসমা খিঁচে চোখ বুজে ফেলে। ছোট্ট মেয়েটা ডুকরে কেঁদে ওঠে।গুলিটা বালিশ ফুঁড়ে ঢুকে যায় লতিফের মাথা থেকে এক ইঞ্চি ফাঁকে। নিখুঁত নিশানা। লতিফের শ্বাস ছুটছে। জয় বাচ্চা মেয়েটাকে কাছে ডাকে বাচ্চাটা আসতে চায় না। জয় হাসে, হাসিটা আসমার কাছে ভয়ানক লাগে। কিন্তু বাচ্চাটা কেন জানি এগিয়ে যায়। জয় মেয়েটার ঝুঁটিতে হাত নেড়ে জিজ্ঞেস করে, “চলো, তুমি বলো। তোমার আব্বুর ওপর গুলি চালাবো, না ছেড়ে দেব? তুমি যা বলবে তাই করব। ভেবেচিন্তে বলবে কিন্তু।”

-“গুলি তালালে কী হবে?”
জয় হাসল, “গুলি চালানোর পর, তুমি তোমার আব্বুকে হাজার ডাকলেও সে আর উত্তর দেবে না তোমার ডাকের। কিন্তু একটা মজার ঘটনা দেখতে পাবে তুমি। আমার হাতের এই পিস্তল থেকে একটা বুলেট ছুটে গিয়ে তোমার আব্বুর ঠিক কপাল বরাবর বিঁধবে। খুব চমৎকার একটা দৃশ্য, আমি ট্রিগার দাবাতেই শাঁআআ করে একটা বুলেট ছুটে যাবে তোমার আব্বুর দিকে। দারুণ মজা লাগবে তোমার দেখতে বিষয়টা।”
মেয়েটা জয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে, “দালুন লাগবে দেখতে?”-“খুবই দারুণ লাগবে।”

-“কিন্তু আব্বু কথা বলবে না কেন?”
জয় সোজা হয়ে দাঁড়াল, “বুলেট গিয়ে কপালে লাগার পর আর কথা বলতে ইচ্ছে করবে না তোমার আব্বুর। শ্বাস নিতে ইচ্ছে করবে না, হাঁটতে ইচ্ছে করবে না, তাকাতে ইচ্ছে করবে না, উঠে বসতে ইচ্ছে করবে না। চুপচাপ শুধু চোখ বুজে শুয়ে থাকতে শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করবে। শুয়ে থাকবে।”
-“তাল মানে আমি চক্কেত আনতে বললে সেতাও আনবে না? আমার সাথে খেলবে না আর?”
-“না।”

জয় চোখ নত করে বাচ্চা মেয়েটার দিকে কেমন করে যেন চেয়ে থাকে। মেয়েটার নিষ্পাপ মুখ। জয়ের ভেতরটা বিদ্রোহ করে ওঠে। তার কিছু হচ্ছে, কপালের ডানপাশে চিরচির করছে।

মেয়েটা বলল, “তালে গুলি মেলো না।”জয় গম্ভীর হয়ে উঠল, “মজাদার দৃশ্যটা? সেটা দেখতে চাও না?”

-“চাই তো। তুমি তোমাল কপালে কলো গুলি। আমি দেখি দালুন দিশ্য।”

জয় চোখ বুজে দাঁত চেপে ধরে, “স্বার্থপর!? বাচ্চা মেয়েটাও স্বার্থপর!”

দৌঁড়ে লতিফের কাছে যায় মেয়েটা, “আব্বু তুমিও দেখবে? ও আমাদের মজা দেখাবে? কী হলো, কলো গুলি তোমাল কপালে। আব্বু আল আমি দেখি।”

জয় তির্যক চোখে মেয়েটাকে দেখল। ইচ্ছে করে মাথার ওপর তুলে এক আঁছাড় মারতে। ভ্রু জোড়ার ওপরে ফেঞ্চ-কাট চুলের এক গোছা পড়ে আছে। তা হাত চালিয়ে উপরে ঠেলে বলল,

-“চলে যান, লতিফ ভাই। শহর নয়, জেলা ছেড়ে। আশপাশের জেলায় নয়, দূরবর্তী কোনো জেলায় চলে যান বউ-বাচ্চা নিয়ে। দেশের শেষ সীমানায় চলে যান। কতক্ষণ এই

সিদ্ধান্তে কায়েম থাকতে পারব বুঝতে পারছি না। কসম দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হলে আর মিস হবে না টার্গেট। এখন এক হাঁটায় বেরিয়ে যাব এখান থেকে। ফের ফিরে আসার ইচ্ছা জাগার আগে আমার নাগাল সীমানার বাইরে চলে যাবেন।''আসমার দিকে চেয়ে হাসল জয়, "উনাকে বোঝাবেন, আজ ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু একটা ভাবনা মাথায় আসতে পারে যে, মারতে তো এসেছিল জয়। বেঁচে গিয়ে সুযোগ যখন পেয়েছি, বদলা নিয়ে নিই, মেরে ফেলতে পারতো, সুযোগ পেয়ে আমিই বদলা নিয়ে নিই। আসতে পারে লতিফ ভাইয়ের মাথায় এমন কথা। তাই বলছি, একটু

বোঝাবেন, এমন ভাবার দরকার নেই। বোকামি করে ছাড়ছি না, আসলে বুঝতে পারছি না কেন ছাড়ছি। যতক্ষণে বুঝতে পারব, ততক্ষণে আর ছাড়ার মানসিকতা থাকবে না। তাই এখন আপাতত বুঝতেই চাইছি না। কারণ এখন আপাতত ছাড়তে চাইছি।''লতিফকে বলল, “লতিফ ভাই, আমার মানুষ মারতে ওয়েপন লাগে না, হাতের প্র্যাক্টিস আছে কমবেশি। বংশ পরম্পরার রক্ত-দোষ তো। বদলা নিতে আজকের উপহার পাওয়া জীবনটা হারাতে আসবেন না। আমার দেয়া উপহার কেউ যত্নে না রাখলে খুব রাগ হয় আমার। চলি ভাবী।

আর হয়ত দেখা হবে না কোনোদিন। ভালো থাকবেন। মেয়েটাকে ভালোভাবে মানুষ করবেন, যেহেতু ওর কাছে বাপ-মা দুটোই রইল।

বেরিয়ে যায় জয়। বাচ্চা মেয়েটা দৌঁড়ে আসে খানিকটা পিছনে, তবে দরজার বাইরে যায় না। জয় আড়াল হয়ে যায়। আসমার চোখ ঘোলা হয়ে আছে, উদ্ভ্রান্তের মতো চেয়ে থাকে জয়ের যাওয়ার পানে। ছেলেটা এলো, কী থেকে কী করল, কিছু কথা বলল, চলে গেল। অদ্ভুত, অদ্ভুত, ভয়ানক অদ্ভুত!

—

জয়ের নামে দুটো কেইস ফাইল করেছেন ঝন্টু সাহেব। অনেকগুলো অভিযোগওকরতে ছাড়েননি। সুযোগ পেলে কারও নামে মামলা কম দিতে নেই। এটার একটা কারণ আছে। বাংলাদেশের আইন কখনও কখনও কোনো অপরাধীর বিশ-পঁচিশটা অপরাধ ফাইল আলমারীতে ফেলে রেখেও অপরাধীকে সুখে জীবন কাটাতে দেয়। হতে পারে মামলা শ-খানেক হলে একটু মাঠে নামল!

ঝন্টু সাহেব কাঁচা লোক না। তিনি জয়ের সবরকম বদগুণ ও কর্ম নিয়ে আলাদা আলাদা অভিযোগ মেরে এসেছন।

পুলিশকে বলেছেন, “শুনুন অফিসার। জয় জুয়া খেলে। তো একবার একজনের বউ অবধি কেড়ে নিয়েছিল।”

আপনি জানলেন কী করে?

খুব বিপাকে পড়লেন উনি, “আমার কাছে খবর থাকে।”-“আচ্ছা, তারপর?”

-“তারপর আর কী? মাইনষের বউ তাসে জিতে কী করে? সেও তাই করেছে!”

কথাটা আংশিক সত্যি। কিন্তু পুরোটা না। জয়ের সবরকমের বদভ্যাস উল্লেখ করা হয়েছে। জয় জুয়া খেলে, নারীবাজীর দোষ আছে, মারিজুয়ানা সেবনের অভ্যাস আছে। এমনকি রাজনৈতিক দায়িত্বসূমহ ঠিকমতো

পালন করে না সে। ভার্সিটির কাজে বিশেষ এক্টিভিটি নেই তার। সেসব ব্যক্তিগত দোষ জয়ের, কিন্তু আপাতত আসল দোষ হলো, সে একজন লোককে মারাত্মক জখম করেছে। এছাড়াও বহু মিথ্যা দোষ আরোপ করে কেইসকে শক্ত করার চেষ্টাও করেছেন ঝন্টু সাহেব। কিন্তু ভাবার বিষয় হলো, তিনি হামজার ব্যাপারে কিছু বলেননি। হামজা মাজহারকে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ঘুরিয়ে এনেছে। সেটা উল্লেখ করেননি।

কথাগুলো জানিয়ে কবীর দম ফেলল। হামজা চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থেকে জয়কে ডাকল। জয় ঘুমাচ্ছিল। বসার ঘরে ঢুকতেই হামজা

ধমকে উঠল, "লুঙ্গি উচু করে বাঁধ্। ঘর ঝাড়ু দেবার জন্য আর ঝাড়ু কিনব না। তোর লুঙ্গি যথেষ্ট।"

এবার লুঙ্গিটা উঁচু করে ঠিক কোমড় অবধি তুলে বাঁধল। আরেকটু তুললে ইজ্জতহানি হতে পারতো। কবীর কপাল চাপড়াল।তার পিঠে চাপড় মেরে সোফায় বসে তরুকে ডাকল জয়, "আদা-মশলা-মরিচ-পেঁয়াজ, রসুন মেরে একটু পানি গরম করে দে রে, তরু। গলায় কুঁড়কুঁড়ানি উঠতেছে।"

তরু কটমট করতে করতে এসে বলল, "একটু হলুদ-ধনিয়ার গুড়ো, সয়াবিন তেল, জিরেও দিই?"

-"যদি গলার ব্যথা সারাতে কার্যকর হয়, তাইলে আলবাৎ দিবি। সাথে একটু মাল মেশাতে পারিস। অত্যান্ত সুন্দর একটা ড্রিংক তৈরি হবে।"

হামজা গম্ভীর মুখে বলল, কর্কশ স্বরে বলল, "লতিফকে রেহাই দিতে পাঠিয়েছিলাম তোকে?"-"রেহাই? ছিঃ! অপবাদ দিচ্ছ। জয় বাংলার নামে শপথ করে বলতেছি, আমার-তোমার পেছন বাঁচাইছি আমি।"

হামজা শীতল চোখে তাকিয়ে রইল। জয় বলল, "সামনে ইলেকশন, মাজহার আর ওর আপন বাপ আমার নামে অলরেডি মামলা মারছে, পলাশের সাথে পুন্দাপুন্দি চলতেছে,

ভার্সিটির হলে সিন নিয়ে ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে। এই বাঁশগুলাই আমি-তুমিসহ পুরা পার্টি মিলে পেছন পেতে দিয়েও নিতে পারব না। তো মনে করো, এইসবের মাঝেও যদি লতিফের ইন্নালিল্লাহ করে আরেকটা বাঁশ বাড়ানোর কি খুবই দরকার?"

হামজা শব্দহীন হাসল, তুই শুধু এই কারণে ওকে ছাড়িসনি।

জয় কথা বলল না। হামজা বলল, "লতিফকে যেন কোনোভাবেই খুঁজে পাওয়া না যায়। তবেই ওর গুম হবার সাসপেকশনটা শুধু মাজহার আর ওর বাপের ওপর থাকবে।"

জয় উঠে যায়। সদর ঘরে দুটো মহিলা এসেছে। হামজার কাছে জন্ম নিবন্ধনের কাগজ সাইন করাতে। এটা কাউন্সিলরের কাজ, অথচ এখানে কেন এসেছে বুঝতে পারল না।মশলার ঝাঁঝ রিমির সহ্য হয় না। কাশি উঠে যায়। মুখে শাড়ির আচল চেপে মসলা কসাচ্ছে। শাহানা মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কাজের মহিলাগুলোর হাতের রান্না খাওয়ার অভ্যাস নেই এই বাড়ির পুরুষদের। তরু পানির পাত্র চুলোয় বসিয়ে গরম মশলা বের করল। খুব তাড়ায় আছে সে। দুটো লবঙ্গ, এলাচি, দুই টুকরো আদা, এক চিমটি

লবন দিলো পানিতে। দারুচিনি দেবে কিনা তা ভাবার বিষয়।

-“এত তাড়াহুড়ো করে পানি গরম করছো কার জন্য?”

“জয় গলার ব্যথায় পাগল হয়ে যাচ্ছে।”

রিমি কূটিল হাসল, “পাগল হচ্ছে না-কি তোমায় বানাচ্ছে?”

-“কী বলো, কিছুই বুঝলাম না, ভাবী।”

-“এজন্যই তোমার এই দুর্দশা।”

-“কী দশা?”-“বললে কূটনামি হবে। নিজে দেখলে ভালোভাবে অনুভব করতে পারবে।”

-“ওরে বাবা! ধাঁধা বানাচ্ছো কেন? বলো না কী হইছে আবার? আবার কী করেছে সে?”

-“তোমার এই আহ্লাদের কতটুকু মর্যাদা আছে তোমার পরাণপ্রিয় জয় আমিরের কাছে?”

তরু দু’পাশে মাথা নেড়ে মুচকি হাসল, “তোমার যে কেন এত শত্রুতা ওর সাথে? অবশ্য আমার ভালোই লাগে তোমাদের এই ফাইট।”

-“আমার খুব খারাপ লাগে, তরু। তোমার জন্য। চোখ থাকতে অন্ধ, মাথার দরজা বন্ধ, এমন লোকেরা খুব ভালোভাবে ঠকে যায়। বুঝলে?”

-“ধুরু! যা বলবে, বলো তাড়াতাড়ি। আমার কিন্তু পানি গরম শেষের দিকে।”

-“কোন আশায় করছো এসব?”তরু বিরক্ত হলো একটু, কিন্তু চেপে বলল, “আরেহ! কী করছি? খুলে বলো না!”
-“আগে বলো, এই যে জয় আমিরের পেছনে নিজেকে লুটিয়ে দিচ্ছ, কোন আশায়? কী ভেবে?”
মুখটা ছোট হয়ে গেল তরুর। কথা বলতে পারল না। চোখদুটো এক মুহূর্তে ঝাপসা হয়ে এলো।
-“জবাব দাও। কেন করছো এসব?”তরু ছলছলে চোখে রিমির কঠিন মুখের দিকে চেয়ে বলল, “এভাবে বলছো কেন ভাবী? আমার কিছুই চাওয়ার নেই ওর কাছে। মায়া,

ভাবী। খুব মায়া লাগে। ওর তো কেউ নেই। আমি ছাড়া কে দেখবে ওকে?''

রিমির মুখে আচমকা মলেন হাসি নেমে এলো, স্নেহভরে তরুর দিকে চেয়ে বলল, "গর্দভ মেয়েলোক! এটাই বোঝতে চাচ্ছি। ওর অনেকে আছে। তোমার কেউ নে পাগলি মেয়ে। ওর তুমি ছাড়াও লোক আছে।''

তরু বিভ্রান্ত হয়ে বলল, "কে আছে? না, ভাবী। যেদিন থেকে ওকে পেয়েছি, আমি ছাড়া ওর কেউ নেই।''

-"রাগাবে না আমায়। আমি যা জানি, তুমি জানো না। শুধু ভাবছি কথাটা বললে কীভাবে সহ্য করবে? সাহস হচ্ছে না আমার। শুধু

বলছি তুমি আজ থেকে ওই নিমোকহারামের ফরমায়েশ খাটবে না। তাহলে আমি তোমাকে এই বাড়ি থেকে বের করে দেব।''তরু অবিশ্বাসে বোবা হয়ে গেল। চোখটা এবার ভরে উঠল। আস্তে কোরে ডাকল, "ভাবী!" রিমি চোখ ফিরিয়ে নিলো। সে কঠিন হবার চেষ্টা করে বোধহয় পারছে না। তরু রিমির আচরণে আহত হয়ে চেপে ধরল, "কী হয়েছে, ভাবী? তোমার কসম লাগে, খুলে বলো। তুমি আমার ওপর রাগ-টাগ ঝারো, কিন্তু তো কখনও এভাবে কথা বলো না আমার সাথে?''

-“আগে ভাবতাম, দেরিতেই হোক, তবে জয় তোমাকে এড়াতে পারবে না। অথচ মনেই ছিল না, এই বাড়ির ছেলেরা শয়তানকেও শয়তানী শেখায়।”

তরু ভ্রূ জড়াল, “আগে যা ভাবতে, এখন ভাবতে দোষ কী?”রিমি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হেসে ফেলল, “তা জানলে তো আর এভাবে ফরমায়েশ খাটতে দৌঁড়ে আসতে না। সত্যি বলতে আমার তোমাকে কথাটা জানাতে কষ্ট হচ্ছে, মেয়ে। কিন্তু তুমি ওই নিমোকহারামটার জন্য এত উতলা হয়ে ওর গোলামি খাটবে, এটা আমি দেখতে পারব না।
”

তরু কথা বলল না। তার বড় অস্থির লাগছে। রিমি বলল, “তোমার আশিক জয় আমির বিবাহ করিয়া সারিয়াছেন, তরুনীধি খাতুন। চমকে গিয়ে নিজেকে বোকা প্রমাণিত কোরো না, তরু। বরাবর জয়ের ওপর তোমার পাগলামীতে আমার তোমার উপর শুধুই মায়া হয়েছে। আমি জানতাম, শীতের মৌসুমের গাছের পাতার মতো ঝরে পড়তেই হবে তোমাকে একদিন। সে-দিন এলো শেষমেষ।”

শেষের দিকে উদাসীন হয়ে পড়ল রিমি, ”তোমার হামজা ভাইকে আমিও ভালোবেসেছিলাম, তরু। তার বদলে সে শুধুই নিজের রূপ দেখিয়ে আমাকে খানখান করে

ফেলেছে। ক্ষমতালোভী, নোংরা একেকটা রাজনীতিবিদকে ভালোবেসেছি আমি এই জীবনে। আব্বু, কাকা, মাজহার ভাইয়া, অবশেষে এই লোকটাকে। আমি সব বুঝি, জানো! তবুও এদের মায়া কাটাতে পারিনা।''তরু এই জগত ত্যাগ করেছে যেন। সে চমকে গেছে কিনা বোঝা গেল না, তবে অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল চুলার পাশে। জয় আমির মিথ্যা বলে না। সে সেদিন বলেছে, সে সেদিন তরুকে খুন করে এসেছে। জিজ্ঞেস করলে, বিয়ের কথাও স্বীকার করতো। কিন্তু তরু জিজ্ঞেস করেনি। জয় নিজের বিরুদ্ধে

যেকোনো ধরণের জঘন্য মিথ্যাকে নির্বিঘ্নে স্বীকার করার জোর রাখে, আর এ তো সত্য। জয়ের ডাক শোনা গেল, “তরু! মরে গেছিস? গরম পানি দিয়ে যা হেহ, গলা আঁটকে আছে একদম। বের হব আমি, তাড়াতাড়ি আয় বাল। শার্টটাও আয়রণ করে রাখিসনি, কার বালডা পরে বের হব আমি?”

তরুকে তবুও চুপচাপ চুলার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল রিমি, “এ বাড়ির কোনো বেটাছেলেই মানুষ না, সবগুলো একেকটা রক্তখেঁকো জানোয়ার। প্রমাণ না পাওয়া অবধি বিশ্বাস না করলেও চলবে। একথা খুব তেতো

শোনায় আমার মুখে, তাই না? সত্যি কথা তো, এইজন্য।''

—

আজ রবিবার। রবি মানে সূর্য। তাই সূর্যটাও নিজের সবটুকু তাপ ছেড়ে টগবগ করে উদিত হয়েছে আজ।

সকাল সাড়ে দশটার দিকে মুস্তাকিন এসেছে। বসে আছে। অন্তূ বই-খাতা গুছিয়ে রেখে বসার ঘরে যাবার আগে অভ্যাসবশত মাথায় ওড়না তুলতে গিয়ে হাসে, বেশ্যার মাথায় ওড়নার পর্দা! হাস্যকরই তো। মুস্তাকিন মাথা নত করে বসে আছে। তার অভিব্যক্তিটা অব্যক্ত।

-“কেমন আছেন, মুস্তাকিন সাহেব?”

অন্তূর আওয়াজে নিরস মুখে তাকায় মুস্তাকিন, “ঢাকা ছিলাম। কিছুই জানতাম না। কী থেকে কী হয়ে গেছে এই ক’দিনের ব্যবধানে!”

অন্তূ হাসার চেষ্টা করল, “কোনো একদিনের ব্যবধানে দেখবেন এই পৃথিবীতে কেয়ামতও ঘনিয়ে এসেছে। যা ঘটবে, তার আভাস খুব কমই পাওয়া যায়, মুস্তাকিন সাহেব। কী ব্যাপার, তাকাচ্ছেন না কেন আপনি?”

-“ইচ্ছে করছে না।”-“কেন?”

-“বুঝতে পারছি না। আমার এতক্ষণেও বিশ্বাস হচ্ছিল না, এই সবে আপনার কথার

ধরণে বিশ্বাস করার তাগিদ টের পাচ্ছি। কী থেকে কী হয়েছে?''

মুস্তাকিনের দিকে চেয়ে অন্তূ মলিন হাসল, "সেদিন আব্বুদের কোথায় নামিয়ে দিয়েছিলেন?''

-"সেদিন স্যারের নিষেধ না মেনে আমি ওনাদের সাথে আসলে এসব কিছুই...''

-"কিছুই বদলাতো না। কিছুই করার ছিল না ওখানে। রটনা রটে যাওয়া, আর বাঁধ ফুঁড়ে পানির স্রোত মুক্ত হয়ে যাওয়া একই। সেই পানিকে ফেরানো যায় না, রটনা মুছে ফেলা যায় না। ছাড়ুন সে কথা।''

মুস্তাকিন বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইল অন্তূর দিকে। নিজেকে সামলে চোখ ফিরিয়ে বলল, “কেউ অন্তত অসম্মান করার সাহস পেত না আমার সামনে আপনাকে। আর লোকে কী বলল, তাতে প্রভাবিত হবেন কেন আপনি? লোকের কথায় আসে-যায় না।”অন্তূ আলতো হাসল। উদাসীন হাসি, “খুব আসে যায়, মুস্তাকিন সাহেব। আত্মসম্মান অবধি ঠিক আছে, কিন্তু যখন প্রশ্ন সম্মানের ওঠে, তখন লোকে আপনাকে সম্মান দিলেই সেটা কেবল সম্মান। সম্মানের ব্যাপারটা হলো, আপনারে বড় বলে বড় সে-ই নয়, লোকে যারে বড় বলে, বড় সে-ই হয়।”

-“কিন্তু লোকে যদি বড়কে ছোট বলে?”
-“সেটাও ভুল নয়। তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে তো তা ঠিক। তাদেরকে দেখানো হয়েছে বিধায় তারা ছোট দেখছে। নয়ত এত ছোট করে দেখার সযোগ ছিল কোথায় তাদের?
মুস্তাকিন আস্তে কোরে মাথাটা নত করল। কিছু ভাবল। সোফার হাতলে হাত এলিয়ে মাথা নিচু করে বসে রইল। হাতের ঘড়িটা জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। আজ অবধি মুস্তাকিনকে কখনও পুলিশের ইউনিফর্মে দেখেনি অন্তূ। প্রতিবার এমন ফরমাল গেট-আপে দেখা গেছে।-“পরীক্ষা চলছে না আপনাদের? আজ নেই?”

-“আজ শেষ হবে। দুপুর দুটোয় পরীক্ষা আছে।” একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, “আপনার তদন্ত কতদূর? কোনটা নিয়ে আগাচ্ছেন?”

অন্তূ কাটাতে চাইছে। মুস্তাকিন টের পেল।

-“নতুন কিছু হাতে এসেছে।” নিস্তেজ লাগছিল মুস্তাকিনের স্বর। তাকাচ্ছিল না অন্তূ দিকে। নিজের বাঁ হাতের তর্জনীতে থাকা গাড়ির চাবির দিকে চেয়ে আছে।

-“নতুন কিছু? পুরনোগুলো আনসলভড রেখে নতুন কেন?”

-“পুরোনো কোনটার কথা বলছেন?”অন্তূ গভীর চোখে মুস্তাকিনকে পরখ করে চোখ

নামালো, “আখির রেপ এণ্ড মার্ডার মিস্টিরি, ওর মেজো ভাই সোহানের খু-নের রহস্য, বড় ভাই সোহেলের লা’শ পাওয়া গেছে ওই বাড়িতে যেখানে সালমা খালারা থাকতেন, কিন্তু এখন তারাও নিখোঁজ। চাঁদনী ভাবী, সালমা খালা গেছেই বা কোথায়, হুট করে হারিয়ে গেছে, সেখানেই বড় ছেলের লাশ পাওয়া গেল। এগুলো কি পছন্দ হয়নি আপনার কেইস হিসেবে?”

মুস্তাকিন একটু চুপ থেকে শান্তভাবে মাথা নাড়ল, “সব মাথায় আছে। তবে যেটা নেই সেটা হলো তদন্তের উপাদান—ক্লু। ক্রাইমগুলো শুধু হয়েছে, তবে সেগুলোর

বিশেষ কোনো সূত্র নেই যা ধরে অপরাধী অবধি এগোনো যায়। আঁখির কেইসটা বন্ধ হয়েছে ফরেন্সিক রিপোর্ট পাওয়ার সাথে সাথেই। কারণ, সেখানে একটা সাসপেক্টেরও বিরুদ্ধে কোনো রকম ক্লু ছিল না। সোহানের মৃত্যুর ব্যাপারটা সবার জানা। আর সেদিন সোহেল মরল, ওটারও কোনো সূত্র নেই শুধু ওই রক্ত পুঁজ আর মেলাটোনিন হরমোন সেম্পল ছাড়া।''

অন্তূ ভ্রু জড়াল। মেলাটোনিন হরমোন? সে যেটাকে নোংরা জিনিস ভেবে ভুল করেছিল। এখনও তার সন্দেহ আছে বিষয়টা নিয়ে।-''ভার্সিটির এক মেয়ে বলেছিল

সোহানের মৃত্যুর ব্যাপারে, সেটা ঝাপসা। আপনারা আঁখির লাশ পাঠিয়েছিলেন, আপনাদের জানার কথা, চাঁদনীরা কোথায় আছে? কোথায় পাঠিয়েছিলেন লাশ?''

-"আমি পাঠাইনি। ডিপার্টমেন্ট থেকে পাঠিয়েছিল।''

-"ওদের থেকে তথ্য কালেক্ট করতে পারবেন না?''

-"পারলে দেব আপনাকে। কিন্তু আপনার এসব জেনে কী হবে? কী প্রয়োজন?'' হাসল মুস্তাকিন।

অন্তূ হাসার চেষ্টা করল, কিছু বলল না।

-“কালেক্ট করে জানাবো আপনাকে। উকিল হতে এখনও বছর কয়েক বাকি, এখনই এত খাটবেন না, এনার্জি বাঁচিয়ে রাখুন, নয়ত বিতৃষ্ণা ধরে যাবে নিজের পেশার প্রতি।”
অন্তূ কিছুক্ষণ নির্বিকার পরে জিজ্ঞেস করল, “সোহানের ব্যাপারটা কী?”
কিছুক্ষণ নীরবতা। পরে চোখ তুলে তাকিয়ে একটা দম ফেলে বলল, “যদি বলি, সোহানকে জয় আমির মেরেছে, বিশ্বাস করবেন?”অন্তূ ভ্রু কুঁচকাল সামান্য, “অসম্ভব কিছু নয়। অবিশ্বাস করার মতো ব্যাপার দুনিয়াতে খুব কম। কেন মেরেছে জয় আমির সোহানকে?”

-“রাজনৈতিক মামলা। সোহান মাজহারের পার্টির লোক ছিল। তখন হামজা সবে ঝন্টু সাহেবের ভাতিজাকে বিয়ে করেছে। হুমায়ুন পাটোয়ারী কাউন্সিলর, জয় ছাত্রনেতা হয়ে উঠেছে, হামজা পুরোদমে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল রাজনীতিতে। কিন্তু এতে ঝন্টু, মাজহার বা হামজার শ্বশুর কোনোরকম সুবিধা করতে পারেনি হামজার ক্ষমতার ওপর। একটা ভাঙন। এরপর কিছু একটা ঝামেলা হয়েছিল মাজহারের সাথে, যা এখনও চলছেই। সেই জের ধরেই জয় সোহানকে অমানুষিক মার মেরেছিল। এরপর ছেলেটার ক্যান্সার হলো, আর ওর চিকিৎসার জন্যই সালমা খালা জমি

বিক্রি করেছিল।’’অন্তূ বিশেষ আগ্রহ পেল না। কিছু কথা নতুন অবশ্য, তবে শেষের কথাগুলো তানিয়ার কাছে সে শুরুতেই শুনেছিল। কোনো চমকপ্রদ কাহিনি লাগল না। কিন্তু চাঁদনীর ওই কথাটা খুব ধাক্কাধাক্কি করছিল ভেতরে—’সাবধান না হয়ে একটাকে হারিয়েছি।’ চাঁদনীর সব কথাই ভারী, তবে এটা যেন মেয়েটা খুব উদাসীনতা আর রহস্য ভরে বলেছিল। মুস্তাকিনের বর্ণনা সাদৃশ্য আনতে পারল না তার সাথে।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে অন্তূ প্রসঙ্গ বদলায়, “আপনার মা-বাবা কোথায় থাকেন? স্কুলে আমি আপনাকে দেখেছি খুব কম, তেমন

দেখা হয়নি, আর উনাদের ব্যাপারে কিছু জানিইনা।''

-"আম্মা দিনাজপুরেই তবে পাশের গ্রামে থাকেন। বাবা ঢাকায়।''

-"আচ্ছা, উনারা একসাথে থাকেন না। আর ভাইবোন? আপনাদের পারিবারিক ব্যাপারটা বুঝলাম না..''

-"পরে বলব কোনোদিন।'' মুস্তাকিন হাসল সামান্য।দরজায় করাঘাত পড়ল। অন্তূ আৎকে উঠল অজান্তেই। এই করাঘাত তাকে আতঙ্কিত করে তুলল। মস্তিষ্কের স্মৃতিতে দরজার করাঘাতে এক ভয়ানক অভিজ্ঞতা সংরক্ষিত রয়েছে।

দরজা খুলতেই জয় প্যাচপ্যাচে হাসল, "হোয়াটস-আপ, ঘরওয়ালি?"

সানগ্লাসটা শার্টের নিচ প্রান্তে মুছে মুঠো করে ধরে তবে তাকাল চোখ তুলে অন্তূর দিকে। তবুও যতক্ষণ মাথা নিঁচু করে ছিল, বোঝা যাচ্ছিল জয়ের ঠোঁট এবং সাথে ধূর্ত চোখদুটোও হাসছে।

কথা শেষ হতেই বাতির সলতে কমানোতে ক্রমশ আগুনের বহর ছোট হওয়ার মতো জয়ের হাসিটা নিভলো। কণ্ঠ চেপে জিজ্ঞেস করল, "ও এইখানে কী করতেছে?"

অন্তূ জবাব দেবার প্রয়োজন মনে করল না।

জয় ফিসফিস করে বলল, "আমার অনুমতি

আর ইচ্ছা ছাড়া তুমি পরপুরুষের সাথে সাক্ষাতে যাবে, এইটা কি ঠিক? নোপ! দিস ইজ নট ফেয়ার, ঘরওয়ালি। খু-উ-ব রাগ হচ্ছে ব্যাপারটাতে।''

অন্তূ কিন্তু এবার মুচকি হাসল, "আপনার রাগের কারণ হওয়ার জন্য আমি খুব দুঃখিত, জয় আমির। কিন্তু পরপুরুষ ঘরে ঢোকানোটাই কি আমার বৈশিষ্ট্য নয়?''

অন্তূর এই দুঃসাহস আর ঔদ্ধত্যে জয়ের ভেতরের রক্ত টগবগিয়ে ফুটিয়ে তুলল। জয় দাঁত চেপে ধরে চোখ বুজে বকে উঠল, "শালীর মেয়ে..''জয় কপালে হাত রেখে

সালাম দিলো মুস্তাকিনকে। মুচকি হাসল মুস্তাকিন, “বসুন। হালচাল ভালো?”

-“খারাপ থাকার জন্য যে বিশেষত্বটা দরকার, সেইটা আমার নাই। খারাপ থাকে ভালো মানুষেরা। আমি খারাপ মানুষ।”

অন্তূ আবার এসে বসতে বাঁধা দিলো জয়, “উহহহু। ভেতরে যাও, আরমিণ। দ্রুত তৈরি হয়ে এসো। তোমার এক্সাম আছে।”

অন্তূ নিষেধ শুনেই বরং বসে পড়ল, “দুটোয় এক্সাম। এগারোটা বাজছে।”

জয় ক্ষণকাল মেঝের দিকে চেয়ে থেকে বলল, “আজ পরীক্ষা পিছিয়েছে। বারোটায় পরীক্ষা।”

-“হঠাৎ!?”

জয় বলল, “আজ শেষ পরীক্ষা। ভার্সিটিতে কিছু ঝামেলা হয়েছে, পরীক্ষার সময় পিছিয়েছে।”-“তো আপনি এ কথা এভাবেই সবার বাড়ি বাড়ি ও হলে গিয়ে জানিয়ে আসছেন?”

-“তুমি অনুমতি দিলে তাই হবে। ভার্সিটির সব ছাত্রীগুলারে বিয়ে করব, এরপর সবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে আসব। একটু জামাই আদরও পাওয়া হবে।”

-“অনুমতি আছে। করে ফেলুন।”

মুস্তাকিন চুপচাপ বসে ছিল। জয়ের মনে হলো, তার দ্বারা এর চেয়ে বেশিক্ষণ ভদ্র

আচরণ করা অসম্ভব। সে বিশাল বড় হেসে মুস্তাকিনকে বলল, “তো মুস্তাকিন সাহেব, কী কাজে এসেছিলেন, সেসব যাক। আমার মনেহয় আপনার কাজ শেষ। এখন আসত পারেন। আমার বউডার পরীক্ষা আছে তো, বাইর হইতে হবে। ফর্মালিটির চোটে উঠে যাইতে পারতেছে না। ভদ্রলোকের মেয়ে তো। আপনি গেলে তবেই উঠে তৈরি হত যেতে পারবে।”

অন্তূ চোখ বুজল। তামাশা তৈরি করতে জয়ের কোনো পূর্বপ্রস্তুতির দরকার পড়ে না। কিছুটা লেহাজ, সংকোচ নেই তার মাঝে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মুস্তাকিন খুবই স্বাভাবিকভাবে বের হয়ে গেল। জয় একাই বসে রইল। কেউ উঁকি দিয়েও দেখল না জয়কে সেই ঘরে।

অন্তূ কিছুক্ষণ পর তৈরি হয়ে সামনে এলো। তার চোখ ফোলা, নাক লাল হয়ে আছে। কেঁদেছে সে।-"বোরকা কই, তোমার?"

-"চলুন, দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

-"বোরকা পরে এসো। বসছি আমি।"

অন্তূ খুব সাবলীলভাবে মাথা নেড়ে বলল, "চলুন।"

জয়ের স্বর বদলে গেল, “আমি উঠলে এমন একটা থাপ্পর মারব, কান দিয়ে গলগল করে রক্ত বের হয়ে যাবে।”

-“আচ্ছা, মারুন। তবে তাড়াতাড়ি। যত তাড়াতাড়ি মারা শেষ হবে, আমরা তত তাড়াতাড়ি বের হতে পারব।”

জয় উঠে দাঁড়াল অন্তূর সামনে, “বোরকা না পরে কী প্রমাণ করতে চাইতেছ?”

-“আমি কিছু প্রমাণ করতে চাইছি না। ওই দায়িত্ব আপনার ছিল। তা আপনি খুব ভালোভাবে পালন করেছেন। আর কিছু প্রমাণ করার নেই।’-“এই শালির মেয়ে! এইজন্য তুই ল্যাংটা হয়ে বাইরে যাবি?”

-“যার ইজ্জত নেই, তার ঈমান নেই। আর ঈমান হলো পোশাক। সেই হিসেবে আমি ল্যাংটাই।”

-“তোর যুক্তিরে চুদি আমি, শালি। যা বললাম, কর।”

-“যুক্তির সাথে খারাপ কাজ না করে তার প্রেক্ষিতে পাল্টা যুক্তি দিলেও পারেন। ঘরে পরপুরুষ ঢোকানো মেয়েলোক বোরকার মতো সম্মানিত পোশাক পরবে না।”

জয় চার আঙুলে অন্তূর গাল চিপে ধরল, “আমার কোনো কর্মে আমার জীবনে আফসোস হয় নাই। তা করানোর চেষ্টা করলে মেরে পুঁতে রেখে যাবো। আমার

সামনে দুঃসাহস দেখিয়ে কম ভোগান্তি পোহাসনি। আগে যেভাবে চলতি, সেইরকম চলবি। বোরকা পরে আয়।”

-“এটা আমার বাড়ি। আম্মু-ভাবী পাশের ঘরেই আছে। আপনি আমার সাথে এমন করে তাদের কষ্ট দিচ্ছেন। শুধু শুধু আমার ভেতরে জেদ বাড়ছে, কী লাভ?”জয় গাল ছেড়ে গলা চেপে ধরল, দুই হাত দিয়ে। অন্তূর শ্বাসনালি আঁটকে এলো।

জয় বলল, “তোর ভয় লাগে না আমাকে, না? কোনো একদিন একদম শ্বাস আঁটকে মেরে ফেলব, শালীর মেয়ে। আমারে কি বালব্যাটা মনে হয় তোর? আমি আমার মুখের ওপর

কথা বলা সহ্য করা ভুলে গেছি বহুবছর। কেউ কথা কয় না, সেই সাহস রাখিনি কারও ভেতরে। তুই বলিস, একমাত্র তুই। ক্যান? তোরে কি বেশি প্রশ্রয় দেই আমি? নয়ত ভয় লাগে না ক্যা তোর আমারে।''অন্তূ কথা বলার প্রয়োজন মনে করল না। জয় নিজে গলা ছেড়ে দিলো। অন্তূর চোখের শিরায় রক্ত উঠে এসেছিল।

জোরে কয়েকটা শ্বাস ফেলল অন্তূ। গলা শুকিয়ে গেছে, পানি খাওয়ার দরকার। অন্তূর বড় দুর্দিন এসেছে। তার আব্বুর ঘরে ঢুকে কেউ তাকে আঘাত করে। কিন্তু অন্তূর কান্না পেল না। অসহায়দের কাঁদতে নেই।

সাদা রঙা একটা সেলোয়ার-কামিজ পরনে,
সাদা ধবধবে ওড়না মাথায়-গায়ে জড়িয়ে
ফাইইলটা হাতে ধরে বেরিয়ে গেল অন্তূ।
গলাটা ব্যথা হবে খুব। কণ্ঠনালিতে চাপ
লেগেছে, মাথায় চাপ অনুভূত হচ্ছে।
অন্তূ গলির ভেতরে অনেকটা এগিয়ে গেছিল।
জয় বড় বড় পা ফেলে অন্তূর সামনে গিয়ে
দাঁড়াল, "পেছনে গাড়ি দাঁড়ায়ে আছে।
রাস্তাঘাটে মার খাস না আমার হাতে।"
অন্তূ হেসে উঠল, "হুশ! রাস্তাঘাটে
দেহব্যবসায়ী হিসেবে কত খ্যাতি অর্জন
করেছি কোনো হিসেবে আছে আপনার?
চারদিকে তাকান, দেখেছে জানালা-দরজা

সবকিছুর ফাঁকে জোড়া জোড়া চোখ আমায় দেখতে মগ্ন। মার খেলে কী?''-"গাড়িত্ যায়ে বসো।''

-"হেঁটেই যাব আমরা।''

-"রাস্তাঘাটে ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছিস?''

যতদূর পাড়ার রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল, লোকে কেউ কেউ নিজেদের পায়ের কাছে থুতু ফেলছিল। ঘুসুর ঘুসুর করছিল, 'নষ্টামি করা স্বামী নিয়া দেখো কেমনে ঢ্যাংঢ্যাং কইরা রাস্তায় বাইর হইছে, আর এই জয় ছেড়াডা এত শয়তান.. খাটাশ..ছেড়া...'

বিভিন্ন ধরণের কথা আসছিল। আজ আর শুধু অন্তূকে বলা হয়নি, শুনতে হলো জয়কেও।

জয়ের হাত-পায়ে শিরশির করছিল। বেশ কয়েকবার অনিয়ন্ত্রণে চলে গিয়ে আবার সামলে নিলো নিজেকে।

মোড়ের ওপর তারা দুজন দর্শনীয় বস্তু হলো সবার কাছে। লোকে গাড়ি থামিয়ে হলেও তাদেরকে দেখার সুযোগ হাতছাড়া করছে না। করা উচিতও না। ক'দিন আগে জয় আমির নষ্টামি করে ধরা পড়ে এই মেয়েটাকে বিয়ে করেছে। দেখা দরকার। জয়ের ইচ্ছে করল অন্তূকে জবাই করে ফেলতে। তার মনে হলো, এই পরিস্থিতিতে ফেলার জন্যই অন্তূ হেঁটে এসেছে।

অন্তূ একটা রিক্সা ডাকলো, “ভার্সিটির গেইটে নামিয়ে দেবেন।”

জয় লাফ মেরে উঠে বলল, “থানার দিকে গাড়ি ঘোরান, মামা।”

অন্তূ তাকালো। জয় না তাকিয়েই বলল, “তোমার পরীক্ষা দুপুর দুটোয়।”রাত এগারোটা। কনকনে শীতের রাতে খালি পায়ে মেঝেতে দাঁড়িয়ে থাকা সাহসিকতার ব্যাপার। তরুর ভেতরে আজ সেই সাহস এসেছে। হু হু করে শীতল বাতাস নাকে-মুখে ঢুকছে। তরু দাঁড়িয়ে রইল বারান্দার গ্রিল ধরে। তুলি ঘরের ভেতরে কোয়েলকে ঘুম পাড়াচ্ছে। জয়ের গান গাইতে গানতে ঢুকল,

—তুমি মা হারা ছেলে জাহানারা ইমামের, একাত্তরের দিনগুলি, তুমি নকশি কাঁথার মাঠের জসিমউদ্দীনের মুঠো মুঠো মাটির ধুলি...

তুলি গম্ভীর মুখে তাকাল, "গান যখন ভুলভাল নিজের মনের মতো গাইবি, তখন নিজে গান বানিয়ে গাইতে পারিস না?"

জয় আরও জোরে চ্যাঁচালো, "তুলি, ও তুলি, ও তুলি তুলি তুলিরে, দোলনায় উঠে আমি দুলি, গাছের ওই ডাল ধরে ঝুলি..."তুলি রেগে উঠল, "চিৎকার করলে লাথি মারব একটা, বের হ আমার ঘর থেকে। বাবু ঘুমাচ্ছে, যা বের হ।"

জয় বারান্দায় গিয়ে তরুর পাশে দাঁড়াল। তরু চমকে উঠল, “কিছু লাগবে আপনার? ডাকলেই হতো আমাকে।”

-“শোন তরু! তোকে এমন একটা যোগ্য পাত্রের কাছে বিয়ে দেব, তুই তখন আমায় ভেবে গান গাইবি,

—চলে গেছো তাতে কী, নতুন একটা পেয়েছি, সরকারী চাকরিজীবী।”

পোলের আলো এসে অন্ধকার দূর করেছে বারান্দার। সে আলোয় তরুর ছলছলে চোখদুটো সজল হয়ে উঠল।

জয় গ্রিলের ওপর একটা ঘুষি মারল, “চোখের মায়ায় বাঁধার চেষ্টা? শীট, শীট ম্যান!

বাঁধা পড়ার সিস্টেম নাই ভেতরে।'' এরপর বাচ্চাদের মতো করে আহ্লাদ করার নাটক করে বলল, ‘‘আমি পাখি ঘর বুঝিনা রে...''

তরু হাসল, ‘‘তবুও ঘর বাঁধলেন, না বুঝেই বাঁধলেন।!''-‘‘ঘর বাঁধিনি। এক জঙলি-বিলাইকে খাঁচায় পুড়ছি, সেইটাও পরিকল্পনাহীনভাবে। তুই দেখিস নাই ওই শালীরে, শালী একদম ফায়ার, দেমাগ দেখলেই ভয় লাগে...''

-‘‘আজ দেমাগী না হয়ে হেরে গেলাম নাকি!''

-‘‘জিতে গেলি। কারণ তুই আমায় পাসনি।''

-‘‘খুব সুন্দরী সে?''

-“মানুষ হিসেবে তোর মতো সুন্দর না। শালীর তেজ খুব বেশি।”

-“আর রূপ?”

-“হ....সুন্দর আছে।”-“আচ্ছা। এত সাফাই গাইতে হবে না। শুনুন, না পেতে পেতে এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছি আমি, আজকাল চেয়ে কিছু পাওয়ার কথা ভাবলেও খুব ভয় লাগে, যেন কোনো অস্বাভাবিকতা তা। ছোট থেকে বাপের আদর পাইনি, মায়ের কোল, আঁচল কিছুই পাইনি। নিজের একটা ঠিকানা পাইনি, হুট করে আপনাকে পেয়ে গেলে সামলাতে পারতাম না। চা খাবেন আপনি? আদা-চা

খেতে ইচ্ছে করছে। আমার জন্য বানাতে যাচ্ছি , আপনার জন্য বানাবো?"

তরু চলে যায় জয়ের সামনে থেকে। জয় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তুলি এসে বসল পেছনে বেতের মোড়ায়।

আজকাল জয়ের মনেহয়, সে পাপ করে। আগে মনে হয়নি। আগে মনে হতো, ওসব ক্ষমতা। ক্ষমতা আছে, করবেই, এসব তার স্বাধীনতা। কিন্তু আজ ব্যাপারটা অনুশোচনারও নয়। তরুর প্রতি যে স্নেহ এবং মায়াটা কাজ করে, সেটা খুব জ্বালাতন করছে।পররক্ষণেই মনে পড়ে, অনুশোচনা হতেই পারে। পাপ বেশি হলে অনুশোচনা হয় মাঝেমধ্যেই, তবে

সেটাকে ধরে রেখে পাপ করা থামানো উচিত নয়। হামজা ভাই বলেছে। পাপ জয়ের রক্তকণিকায় মিশে গেছে। তা ছেড়ে দিলে চলবে? এ চলবে, যতদিন না নিঃশ্বাস থামে। জয় চলে এলো। তুলি অন্ধকারচ্ছন্ন বারান্দার কোণায় বসে থাকে। আজ কতগুলো মাস বাপের বাড়ি এসে পড়ে থাকা মেয়েটার চোখদুটো উদাস। জয়ের সাথে কথা বললে ভালো লাগে। জয় ছাড়া আর কারও সাথে সংলাপ বাড়ে না তার। চাপা স্বভাব। কিন্তু জয়ের ঠ্যাস মারা, কপট কটূক্তিতেও তুলির ভেতরে শান্তি কাজ করে। পাগল জয় ঠ্যাস মারতে মারতে সমস্যাটা শুনে নেয়, এরপর

ধমকে উঠে আরেকটা গালি দিয়ে কান্না থামায়। কিন্তু আজ জয় নিজেই অশান্ত, ওকে থামিয়ে নিজের বিষাদ চাপাতে ইচ্ছে করল না তুলির।রাত দেড়টায় দাবার বোর্ড নিয়ে বসল জয়। অনেকক্ষণ দেখল বোর্ডটাকে। এলোমেলোভাবে ইচ্ছেমতো একেকটা ঘুটিকে আরেকটা দিয়ে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলো। হামজা এসে বসে পাশে। জয় না তাকিয়ে হেসে উঠল, "বউ রেখে আমার কাছে আসছো রাত দুপুরে। মতলব তো ভালো ঠেকে না।" হামজা কষে একটা ঘুষি মারল বাহুতে। বোর্ডটা ঘুরিয়ে নিলো নিজের দিকে। ঘুটি সাজাতে সাজাতে হঠাৎ-ই স্বর বদলে বলল,

“সব সয়, বদনামি ছাড়া। সেটাই কানে আসছে তোর বদৌলতে। তোকে কী করা যায়, তুই বল।”-“কোথায় শুনলে বদনামি?” -“আরমিণ আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে দশ গ্রামে।”

জয় ভ্রু কুঁচকায়। আজ যে সে তা নিজে প্রত্যক্ষ করেছে, সেটা চেপে গিয়ে বলে, “কোন খা-ন-কির চেংরা কী বলে বেড়াচ্ছে? ওই বাড়িতে আছে, লোকে কথা শোনাচ্ছে। এই বাড়ি আসলে তো আর কোনো শুয়োরের বাচ্চার সাহস হবে না কথা শোনানোর! সামনের শুক্রবার তুলে আনতেছি...এরপর

দেখব কোন সম্বন্ধির পোলার পেছন চুলকায়..
''

-“শিওর!”-“হ। আমি দেখবার চাই, কোন বা-ই-ঞ্চ-দে-র জয় আমিরের ঘরের বউকে কথা শোনানোর হিম্মত হয়। আমি জাস্ট এইটা দেখার জন্য হলেও তুলে আনবো। ওই বাড়ি, চেংরী শালী পড়ে আছে, কথা তো শুনবেই। এইডা তো আমার দোষ না। কিন্তু সমস্যা হলো, লোকজন খুব উড়াউড়ি করতেছে। আচ্ছা, আমি কি মরে গেছি? এরা আমায় আজকাল পাত্তা দিচ্ছেনা। যা তা করে বেড়াচ্ছে। আর আমিও সহ্য করে যাচ্ছি। ঠিক

করতেছি? শ্যাহ! লোক দামই দিচ্ছেনা আজকাল।”

হামজা ঘরে ঢুকল। রিমি হামজার পাঞ্জাবী ইস্ত্রি করছিল। অলস ভঙ্গিতে বিছানায় শুয়ে বলল, “তোমার ভাই-চাচারা হাত-পা ধুয়ে আমার পিছনে লেগেছে। শ্বশুরবাড়ির লোকের সাথে দ্বন্দ করতেই যদি দিন যায়, আর সব পার্টি সামলাবো কখন?”রিমি হাত থামিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল হামজার দিকে। তখনই তড়াক করে উঠে বসে হামজা, রিমির হাত থেকে ইস্ত্রি কেড়ে নিয়ে কপাল টান করে, “পাঞ্জাবী পোড়াবে? এত বেখেয়ালী হয়েছ কবে?”মার্জিয়ার শরীরে দিনদিন গর্ভাবস্থার

লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে, শরীরটা অসুস্থও হচ্ছে ঘনঘন। ডাক্তার দেখিয়ে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। রাস্তার মোড়ে রিক্সা নামিয়ে দেবার পর হাঁটতে হাঁটতে মার্জিয়া আনমনেই বলল, "বোরকা ছাড়া তোমাকে দেখতে একটুও ভাল্লাগে না, অন্তূ।"

-"জয় আমির কী বলে জানেন? 'আমার খুব ভালো লাগে, যখন কারও আমাকে ভালো লাগে না।' কথাটার মর্ম আছে, তাই না?"

-"তোমারও কি তাই? মানে আমার এখন তোমাকে দেখতে ভাল্লাগতেছে না, এইটা তোমার ভাল্লাগতেছে?"

অন্তূ অল্প হাসল, “চরিত্রহীনদের বোরকা পরতে নেই, ভাবী।”মার্জিয়া গম্ভীর হয়ে বলল, “তাহলে ওই জানোয়ারের কথা বলবা না আমার সামনে। হইতে পারে তোমার স্বামী। কিন্তু আমার শ্বশুর একটা কথা বলতো, ‘গু এর এপিঠ-ওপিঠ সমান। তা খোঁচাতে গেলে তুমি নিজেই নাপাক হবে, ছিটে তোমার গায়ে লাগবে, তাতে তোর শরীর নোংরা হবে, এতে গু-এর কি কোনো ক্ষতি আছে?’ তুমি কী করতে চাও বলো তো? তোমার কিছুই বুঝি না আমি।”

-“কিছুই করতে চাই না। কিছু না করতে চাওয়াটাই এখন সবচেয়ে বড় করতে চাওয়ার বিষয় আমার।”

মার্জিয়া ক্যাটক্যাট করে উঠল, “আবার শুরু করলা? বলছি না, তোমার এসব হেঁয়ালি কথা শুনলে রাগ হয় আমার? সহজভাবে কথা বলবা আমার সাথে।”-“কঠিনের কী আছে? আপনাদের সমস্যা আমার বোরকা না পরা নিয়ে। আম্মু এজন্য কথা বলে না আমার সাথে।”

অন্তূ চুপচাপ কিছুটা দূর হেঁটে হঠাৎ-ই বলতে লাগল, “আপনি ছিলেন না সেদিন। আমার গায়ে থুতু পড়েছিল মানুষের ছুঁড়ে দেয়া। কেন

জানেন? পুরুষ ঘরে ঢুকিয়ে কাপড় খোলার অপরাধে। শুনতে খারাপ লাগছে? আরও খারাপ কথা শুনুন। টেনে হিচড়ে খুলে ফেলা হয়েছিল আমার বুক থেকে ওড়নার পর্দা। মাথায় জড়ানো গামছাটা কেঁড়ে নিয়ে চুলগুলোকে আলগা করে ফেলা হয়ছিল। এই সুন্দর যাত্রাপালার দর্শক ছিল সেদিন হিউজ পরিমাণ। কিছু বলবেন?''

মার্জিয়ার হাঁটার গতি কমে যায়। অন্তূ নিঃসংকোচে, নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল, "ওড়না ছাড়া আমাকে অতগুলো দর্শক দেখলো, চোখের তৃষ্ণা মেটালো, নোংরামি করে ধরা পড়ার দ্বায়ে বিয়ে দিয়ে দিলো নাংয়ের সাথে।

এরপর সেই শরীরে বোরকা জড়ানো, মুখ ঢাকাটা পাগলামী হবে না?''মার্জিয়া তাকিয়ে রইল অন্তূর দিকে। অন্তূ সাবধান করল, "সামনে তাকিয়ে হাঁটুন, হোঁচট খাবেন।" বাড়ির গলি সামনেই, আর কয়েক পা এগোতে হবে। রাস্তায় লোক নেই। ওদের পার করে একটা গাড়ি গিয়ে থামল সামনে। ওরা দুজন হেঁটে গাড়িটা পার করে এগিয়ে যাওয়ার সময় কেউ ডাকল, "শোনো!" অন্তূর বুকটা ধুক করে ওঠে। প্রখর মস্তিষ্কে কণ্ঠস্বরটা চাপ ফেলল। এই কণ্ঠ চেনে অন্তূ। ফিরে তাকায়। হুডির টুপি মাথায় পলাশের।

মার্জিয়া জানতে চায়, “কে এইটা, অন্তূ? চেনো তুমি? এইটা জয়ের বড় ভাই নাকি?”

অন্তূ জবাব না দিয়ে ভাবীর হাতখানা চেপে ধরল। পলাশ আজগর এগিয়ে আসে, ঠোঁটে লেগে আছে স্থায়ী সেই হাসি।

অন্তূ শুধায়, “ভালো আছেন?”পলাশ হেসে উঠল, “তোমাদের ওখানেই যাচ্ছিলাম। সেই কবে থানা থেকে আসলাম, এরপর আর খোঁজ নাই। অন্যসব লোকের এতদিনে বউ, বাচ্চাসহ সব চলে যায়। তোমাদের সাথে কিছুই করলাম না তেমন। আগের সব ঋণকারীদির সাথে না-ইনসাফি হয়ে যাবে। দেখা যাবে, ওরা অভিযোগ তুলবে, ওদের

সাথে যা হয়েছে, তোমাদের সাথে নয় কেন? ঠিক বলিনি?''

-"হ্যা ঠিক বলেছেন। আসলেই আমাদের এত সুযোগ দিয়ে ঠিক করেননি। আমরাও ঋণী, ওরাও ঋণী। ওরা যদি এতকিছু হারায়, এত অত্যাচারিত হয়, আমরা কেন না?''

পলাশ কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, "চলো, গাড়িতে ওঠো। একসাথে যাই।''

অন্তূ মার্জিয়াকে বলল, "ভাবী আপনি চলে যান এটুকু। আমি আসছি খানিক বাদে।''

পলাশকে বলল, "বাড়িতে গিয়েও আমার সঙ্গেই কথা বলবেন। চলুন আশপাশেই কোথাও বসে কথা বলি। ভাবী, আপনি

বাড়িতে চলে যান। আমি আসছি।''এটাই পলাশ আজগর। মুখরা, বদমেজাজী মার্জিয়া একদম মিইয়ে গেছিল। ভয়াতুর চোখে অন্তূর দিকে চেয়েছিল। অন্তূ চোখে আশ্বাস দিয়ে বলল, “যান। কিচ্ছু হবে না আমার। এটুকু ভরসা রেখেছি নিজের ওপর। আম্মাকে বলবেন, ওষুধ কিনতে গেছি। আপনার অসুস্থ লাগছিল, আগে ফিরেছেন। আমি চলে আসব, ইনশা-আল্লাহ। আল্লাহ হাফেজ।''

মার্জিয়া যেতে যেতে বারবার পিছন ফিরে তাকাচ্ছিল। পলাশ অন্তূকে বলল, “আচ্ছা তোমার বাড়িতে আজ আপাতত গেলাম না। গাড়িতে ওঠো। অন্য কোথাও যাই।'+

-“পায়ে হেঁটে যাই চলুন। একটু হাঁটাও হবে। সন্ধ্যার রাস্তায় হাঁটতে খারাপ লাগবে না। ”পলাশ ভ্রু কুঁচকে ঠোঁটদুটো একপাশে বাঁকিয়ে হাসছিল। অন্তূর ভেতরে ধুকপুক করছে। মস্তিষ্ক সেই আতঙ্ক ভুলতে পারেনি। পলাশ যে কফিশপে নিয়ে গেল, কফিশপ হিসেবে বেশ লাক্সারিয়াস। ভেতরের আলোকসজ্জা ডার্ক। পলাশকে দেখে ম্যানেজার দৌড়ে এসে সালাম দেয়। অন্তূ বুঝল, কফিশপটা পলাশের নিজস্ব। পলাশ গা ছেড়ে দিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। অন্তূ চারপাশে তাকাচ্ছিল। লোকজন নেই। ভেতরের পরিবেশটা তৈরি করা হয়েছে

আলো আঁধারের সংমিশ্রণে। টেবিলের ওপর তিনটে গ্লাস, একটাতে টিস্যু রাখা। একটা পানির বোতল, আর একটা কাঁচের ফুলদানি।
-"ভয় পাচ্ছ?"
অন্তূ উপর-নিচ ঘাঁড় নাড়ল, "পাচ্ছি।"পলাশ হো হো করে হাসল, "প্রয়োজন নেই। বসে পড়ো। পাবলিক প্লেসে দুষ্টুমি করার ক্লাস পেরিয়ে এসেছি বহুদিন আগে। ছোট বয়সে ওসব করতাম। যাকে তোমরা ভদ্রলোকেরা বলো, ওই বখাটেপনা। পাবলিকের সামনে খেলি দেখানোটা প্রাথমিক ছাত্রদের কাজ, আমি হাইস্কুলের মাস্টার।"

অন্তূ পলাশকে যতবার, যতক্ষণ দেখেছে, ততবার ততক্ষণ পলাশের ঠোঁটে হাসি আর জ্বলজ্বলে চোখদুটোয় ভয়ানক এক ইশারা খেলতে দেখেছে। পলাশ কফি আনতে বলল একটা ছেলেকে।

-"আপনার টাকা দু'দিনের মধ্যে দিয়ে দেব। আপনি ছাড়াও আরও কিছু পাওনাদার আছে। জমি বিক্রি করতে হবে। জমি নিয়ে কিছু সমস্যা রয়েছে। সেগুলো মীমাংসা হচ্ছে না বিধায় দেরি হচ্ছে। এর মাঝে আব্বুর ইন্তেকাল হলো। আমি আপনার কাছে দু'দিন সময় চাইছি। এবার আমি সময় নিচ্ছি।

"-"তোমার বাবা মারা গেছে? ইন্না লিল্লাহ।"

পলাশ দুঃখিত হওয়ার নাটক করল। অন্তূর শরীরকে বেশ কিছুক্ষণ চোখে গিলে হাসি প্রসারিত করে বলল, "সুন্দর একটা ঘ্রাণ পাচ্ছি, তোমার শরীর থেকে আসছে বোধহয়। "

অন্তূ তাকাল, "আমি কোনো সুগন্ধি ব্যবহার করিনি।"

হা হা করে হেসে ওঠে পলাশ, "গরু মরলে শকুন খোঁজ পায় কীভাবে? গরু মরার আগে সুগন্ধি মেখে মরে? মেয়েদের শরীরের নিজস্ব একটা ঘ্রাণ আছে, তার তুলনা বিশ্বের কোনো পারফিউমের সাথে হয় না।"

অন্তূর শরীরটা ঝাঁকি দিয়েছ উঠল। জীবন তাকে কোন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তা এখনও বুঝে ওঠা যাচ্ছে না।পলাশ গা ছেড়ে আরাম করে বসে ঘাঁড় বেঁকিয়ে বলল, ভাবছি, "তোমার পাশে গিয়ে বসলে গন্ধটা আরও ভালো পাওয়া যাবে। তাছাড়া খালি খালি চেয়ার ফাঁকা রয়েছে তোমার পাশেরটা।"

অন্তূর দৃষ্টি টেবিলের দিকে ছিল। মুচকি হেসে ফেলল, "শুধু ভাবছেন? এতটাও আশা করিনি আপনার কাছে। আপনার এতক্ষণে বসে পড়ার কথা ছিল। আপনার সাথে ব্যাপারটা মানায়।"

পলাশ ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে অন্তূর দিকে ঝুঁকে আসে। চোখের পলকে অন্তূ টেবিলের উপরে থাকা কাঁচের ফুলদানিটা তুলে কাঠের চেয়ারে আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে ফুলদানি ভেঙে তিন টুকরো। হাতে থাকা টুকরোটাপলাশের গলায় উঁচু হয়ে থাকা স্বরনালীর ওপরে ধরল।পলাশ চমকে গিয়ে ঝুঁকে পড়া থেকে সোজা হলে অন্তূ উঠে দাঁড়াল। ভাঙা কাঁচের চাপে পলাশের গলার চামড়ায় ছেঁদ পড়ে, কয়েক বিন্দু রক্ত বেরিয়ে আসে।

-"ভুললে চলবে, সেদিন কোনোরকমে আপনার ডেরায় ছিলাম, আজ পাবলিক

প্লেসে। জবাই করে রেখে যাব একদম। তারপর মরার পর যা করার করবেন আমার। জয় আমির আর আপনার মধ্যে ফারাক একটাই—জয় বেঁচে থাকা নিয়ে খুব বিরক্ত, মৃত্যুকে বোধহয় খুব একটা ভয় পায় না। কিন্তু আপনি মৃত্যুকে খুব ভয় পান।”

অন্তূ কাঁচের টুকরো ফেলে দিলো ছুঁড়ে। ফ্লোরে পড়ে খানখান হয়ে গেল। অন্তূ বসে পড়ে চেয়ারে। পলাশ ধীরে ধীরে দু-কদম পেছায়। টেবিলের উপর থেকে টিস্যু নিয়ে গলার রক্তটুকু মুছে নেয়ার সময় মুখ বিকৃত করে। আচমকা রেস্তোরা কাঁপিয়ে তোলে পলাশের ফেটে পড়া অট্টহাসির শব্দ।

বাচ্চাদের মতো হাতে তালি দিলো পলাশ, “মাইন্ড ব্লোয়িং!”আবারও হাসে হা হা করে। চেয়ারে বসে পড়ে ধপ করে। দৃষ্টি স্থির অন্তূর ওপর, “আমি ভাবতেছিলাম। আমি সত্যিই খুব হয়রান ছিলাম, জয় কাত হলো কীসে? তুমি জানো? মানুষ যেমন ঠোঁটের সিগারেট কেঁড়ে নেয়, ও সেভাবে মেয়ে ভাগাভাগি করেছে আমার সাথে। আর ও তোমাকে বাঁচিয়ে নিয়ে গেল সেদিন আমার সাথে ঝামেলা করে। অথচ ও আমায় চেনে। কিন্তু তুমি সেদিন যেভাবে কাঁদছিলে, ছেঃ! আর পাঁচটা মেয়ের মতো লেগেছিল। মাগার এরপর একটা চমক,

'থুহ!' সোজা জয়ের মুখে। আমি খুব ভেবেছি, আমার বউকেও বলেছি তোমার কথা।"

পলাশ চট করে থামল। কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ধুম ধরে চুপচাপ। কিছু মনে পড়েছে যেন, এভাবে তুড়ি বাজালো, "ওয়েট! আসছি। এক মিনিট।"

হাই-কমিশন ব্রান্ডের, ব্যালেন্ডেড স্কচ উইস্কি মদের বোতল নিয়ে ফিরল। গলগল করে গ্লাসে ঢেলে তাতে চুমুক দেবার আগে বলল, "নেবে এক সিপ?"

অন্তূ মাথা নাড়ল, "উহু।"

চোখ বুজে পুরো এক শট শেষ করে গ্লাস টেবিলে রেখে বলল, "এবার কথায় এনার্জ

আসবে। তোমাকে সেদিন একদম সাধারণ লেগেছিল। শিট! হতাশ আমি নিজের ভাবনায়।”

উঠে যেতে যেতে বলল, “জয় যেমনই হোক, ওর রুচি ভালো এটা আমি জানতাম। বড় বংশের ছেলে তো! আজ প্রমাণ হলো আর একবার।”একটা ট্রে এনে বসল আবার। তা থেকে এক টুকরো আদা, কয়েকটা পুদিনা পাতা, সোডার কৌটা থেকে খানিকটা সোডা, দু টুকরো লেবু, দুই চামচ চিনি দিয়ে তাতে উইস্কি ঢাললো। দুই চুমুক খেয়ে বলল, “বারবার ভালো লেগে যাচ্ছে তোমাকে। আমার বউ না থাকলে একটা চান্স নিতাম

তোমার ওপর। তোমাদেরকে একরাত পর ছেড়ে দেয়া যায় না, বুঝলে! রেখে দেবার মতো, তুমি। কিন্তু আমি আমার বউকে খুব ভালোবাসি।''

-“আসলেই। বোঝা যায়। অনেক বেশি ভালোবাসেন আপনার স্ত্রীকে আপনি।''

-“তোমার কাছে ভালোবাসা মানে কী?''

-“বুঝি না।''অন্তূর দিকে কফি এগিয়ে দিয়ে বলল, আমার সমস্যা কী জানো? আমাকে ভয় পাওয়া লোকের তো অভাব নেই, সেসবের ভিড়ে ব্যতিক্রম হিসেবে আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা কারও সামনে খুব কাবু হয়ে যাই। দুনিয়ার খারাপ মানুষের আরেকটা স্বভাব

আছে। এরা ভালো মানুষের ওপর খুব সহজে পিছলা খায়। একে বলে বিপরীতে আকর্ষণ বোধ করা। পজিটিভ-নেগেটিভ তারের মতো ব্যাপার আর কী! বুঝছো?'' গা দুলিয়ে হাসল পলাশ।

সাধারণ দেখতে লোকটা। কোনো জাকজমকতা নেই। অভিজাত্য আছে, তবে তা প্রকাশের যেন তাগিদ নেই ভেতরে। হুডির টুপি নামানো। নকশালদের মতো অস্বাভাবিক লম্বা কাঠামো। জ্বলজ্বলে চোখের মাঝ দিয়ে খিলানের মতো নাক। হাসলে গা ছমছম করে ওঠে। অথচ সারাক্ষণ হাসে ঠোঁটদুটো।পলাশ জিজ্ঞেস করল, "আর তো কথাই বলছো না?

শুধু কি টাকার জন্য এখানে এনেছি তোমাকে? তুমি চাইলে এই মুহুর্তে টাকা সব মওকুফ করে উল্টো আমি তোমাকে টাকা দিতে পারি।"

অন্তূ চুপচাপ বসে রইল। মাথাটা ফাঁকা লাগছে। উঠে যাবার জন্য পা চলছে না।

-"আচ্ছা, আর কী কী পর্যবেক্ষণ করেছ আমার? বলো শুনি। তোমার কথা শুনতে খারাপ লাগছে না। শ্যাহ! গলার কাছে জ্বলছে, এই একটা কাজ করলে?"

অন্তূ বলল, "এখনও তেমন কিছুই জানা হয়নি। সাধারণ জ্ঞান দিয়ে বিচার করতে জানাশোনার দরকার পড়ে না। যা পর্যবেক্ষণ

একদিনেই করেছি।''পলাশ আবারও ঝুঁকে পড়ে অন্তূর কানে ফিসফিস করে বলল, "তোমার পর্যবেক্ষণ আর আমার অভিজ্ঞতা, তোমার মানুষ খুন করার ইচ্ছা–বিদ্রোহ আর আমার পেশা। চলো এই নিয়ে একটা সিন্যামাটিক খেলা খেলা যাক।''

ম্যানেজার এসে পলাশের হাতে একটা ইনটেক্ট মদের বোতল ধরিয়ে দিয়ে চলে যায়। পলাশ হিপফ্লাস্কে মদ ঢেলে নিতে নিতে বলে, "তোমার পেছনে আমার লোক পড়ে থাকবে। আমার আদেশেই থাকবে। ছেড়ে তো দিতে পারি না তোমাকে। বিন্দু জলের মতো বহুদূর গড়াবে তুমি, যা বুঝলাম। তুমি আজকের

মতো শিউরে উঠে যতদিন বাঁচতে পারবে, ততদিন খেলা তোমার। কিন্তু হারলে দামী মূল্য চেয়ে নেব আমি।”

-“আমি কোনো খেলা খেলছি না যদিও। আপনি আমার ভাইয়ের পাওনাদার। ভাই অপারগ টাকা পরিশোধ করতে, তাই তা আমার জিম্মায়। তবুও যদি ধরুন, আমি জিতে যাই...”

পলাশ হুডির টুপি মাথায় তুলল, “কী চাও?”

-“তখন চেয়ে নেব।”

পলাশ মাথা দুলিয়ে হাসে, “সাবধানে থেকো। আসছি, খোদা হাফেজ।” কপালে তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল ঠেকিয়ে সালাম জানানোর

ভঙ্গিমায় ইশারা করে মদের বোতলটা হাতে ধরে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, “রুবেল! ম্যাডামকে কফি না খাইয়ে যেতে দিস না। ”সোমবার বিকেল চারটা। ছাঁদের ওপর পাশের বাড়ির পুঁচকে ছেলের ঘুড়ি এসেছিল। তখন জয় কবুতরকে দানা খাওয়াচ্ছিল। ঘুড়িটা ছাদে পড়তেই ধরেছে। তা তো পুঁচকেটাকে ফেরত দেয়-ইনি, লাটাইটা অবধি জোর করে কেঁড়ে নিয়ে সে এখন নিজে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। সাদা লুঙ্গিটা দুপাশ থেকে এনে দুই ঠ্যাঙের মাঝে আঁটকে রেখেছে। খালি গায়ে গলায় লাল টকটকে চওড়া গামছা ঝুলছে। কিন্তু লুঙ্গি-গামছার সাথে পায়ে কালো চামড়ার

বেল্টওয়ালা ফ্ল্যাট স্যান্ডেল। এটা এক অসঙ্গতি, তার ওপর আবার চামড়ার স্যান্ডেলটার বেল্ট খোলা।দুর্দান্ত উড়ছে ঘুড়িটা। পুঁচকে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। জয়ের ভয়ে জোরে কাঁদার উপায় নেই। জয় বলে দিয়েছে, "কান্নার সাউন্ড কানে আসলে এখনই ধরে একদম দা দিয়ে কোপ মেরে সুন্নতে খৎনা করে দেবো।"

পুঁচকে এমন ভয়ানক রিস্ক নেয়নি। সে নিঃশব্দে ফোপাচ্ছে, আর দেখছে নিজের ঘুড়িটা জয় কীভাবে হানাদার বাহিনীর মতো দখল করে উড়াচ্ছে। জয় জিজ্ঞেস করল, "তোর ঘুড়ির দাম কত রে?"

-“কাগজ কিনে বানাইছি। তুমি আমার ঘুড়ি দাও।”

-“তোতলু শালা, সেই কাগজ তো আর তোর রূপ দেখে দেয় নাই দোকানদার। যে ফটকা মারা সুরত তোর। কাগজের দামই ক হে। ”-“ছয় টাকা।”

-“তোর বোন আছে?”

-“বিয়ে হয়ে গেছে।”

-“শিট! আমি মানুষ খারাপ হলেও লোক ভালো। ভাবলাম, তোর বোনকে জ্বালানোর দামে তোর ঘুড়িটা ফিরিয়ে দেব। সেই বালিতে গুড়। মাইনষের এঁটোতে মিছেমিছিও মুখ রোচেনা আমার। বিয়ে দিবি ভালো কথা,

আর ক'দিন পরে দিলেই আজ ঘুড়িটা ফেরত পেয়ে যাইতি।''

-"এএঅ্যা! আমার ঘুড়ি দাও।''

-"ওয়েট! ওই শালা তোতলু, তোরে আমি জিগাইছি, তোর বোন আছে কিনা? তুই 'বিয়ে হয়ে গেছে' কইলি ক্যা? বিয়ের প্রস্তাব দিছি আমি? তুলে মারব এক আঁছাড়?''

ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল পুঁচকে। জয় ঠোঁট কামড়ে থাপ্পড় তুলে শাসালো, "চুপ কর! এত বিশ্রীভাবে কেউ কাঁদে? হারুনফাটার মতো গলা নিয়ে কাঁদিস ক্যান, বোয়াল? যার কণ্ঠ ভালো না, তার উচিত জীবনে না কাঁদা।''

নিচে থেকে কবীরের চ্যাঁচানো শোনা যায়,
“ভাই, নামেন। আইছি।”
-“তো কী? নাচবো একচোট? আইছিস, দাঁড়া। পায়ে মরিচা ধরছে?”ঘুড়ির সুঁতো লাটাইয়ে পেঁচিয়ে তা ছুড়ে দিয়ে বলল, “তোতলু, ধর তোর ঘুড়ি। আজ প্রথমবার শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি, তোর ওই বিশ্রী কান্নার অভিশাপ সাথে করে গেলে, দেখা গেল গাড়ি উল্টে মরে পড়ে রইলাম। শ্বশুরবাড়ি তো যাওয়া হবেই না। জীবনে বাসর না করেই ম্যারিড-ব্যাচেলর অবস্থায় মরা লাগবে। বাসর না করে মরা ঠিক না। কতকাল স্ট্রিটফুড খাবো? এবার লিগ্যালি ঘরের খাবার খেয়ে মরব।”গেইটের

সামনে দাঁড়িয়ে কবীরকে জিজ্ঞেস করল, “জামাই জামাই লাগতেছে আমায়?” কবীর মুচকি হাসল। রাবেয়া দরজা খুলতেই সালাম দেয় জয়, “ভালো আছেন, আন্টি?” জুতো পরেই ঢুকে পড়ল ভেতরে।রাবেয়া কথা বললেন না। তার মুখে কালবৈশাখীর মেঘ জমেছে। জয় ঢুকল। হাতের মিষ্টিগুলো হাতে না দিয়ে নিজেই ভেতরে এগিয়ে টেবিলের ওপর রাখল। কমপক্ষে পাঁচ-সাত কিলো মিষ্টি। পেছন ফিরে ঠোঁট কামড়ে হাসল, “সবাই স্বার্থপর, দেখেছেন? স্বার্থের কাছে সম্পর্ক, স্নেহ, আদর, আচরণসহ সব বদলে যায়, জীবনও। এর আগেরবার এসেছিলাম,

আপনি আপনাকে ‘আম্মা’ ডাকতে বলেছিলেন। কারণ আমি এতিম, খুব মায়া হয়েছিল আপনার। এর মাঝে আপনার কিছু ক্ষতি করেছি, আজ জবাবই দিচ্ছেন না। সুযোগ হলে জুতো তুলতেন আমার মুখে। অথচ আজও কিন্তু আমি সেই এতিমই আছি, নাকি বাপ মা বেঁচে উঠেছে আমার? এমন কেউ নেই দুনিয়ায় যে নিঃস্বার্থ ভালোবাসে। এইজন্য আমার মানুষকে ভালো লাগে, তারা সচেতন খুব, বোকা না। আপনাকেও ভালো লাগছে।’’

বিকৃত মস্তিষ্কের জয়। তার যুক্তি ও ধারণা মানুষ সমাজে তুলে ধরার উপযোগী নয়। যার

কাছে পাপকে পাপ মনে হয়না, সে পাপ এবং পাপীর ঊর্ধ্বে। আশপাশ দেখে জিজ্ঞেস করল, "অন্তিক আছে?"

রাবেয়া কথা বললেন না। উনাক দেখে যতটা নিরুপায় লাগছিল, তার চেয়ে বেশি দৃশ্যমান চোখের তারায় জয়ের জন্য ঘৃণা।জয় ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাতদুটো মাথার ওপরে তুলে শরীর বাঁকালো, "আচ্ছা, আপনিই ওকে জানিয়ে দেবেন। আমাকে আবার খুব ঘেন্না-টেন্না করে নিশ্চয়ই! আমি আবার আমার হেটার্সদের সামনে বেশি ঘুরঘুর করি। তখন মানুষ কটমটায়, কিন্তু সাহসে জোটে না কিছু বলার। তখন নিজের শক্তিকে অনুভব করি। তখন

আবার একবার বুঝি, আমি শক্তিশালী। ভালো না ব্যাপারটা?''

অসভ্যর মতো অল্প হেসে সিরিয়াস হলো, ''কাহিনি হচ্ছে, আমাদের বাড়ির বউয়েরা বাপের বাড়ি পড়ে থাকেনা। শুক্রবার আরমিণকে তুলে নিতে আসব। এখানে তেমন কিছু করতে হবেনা। খুব বেশি লোক আসবে না বরযাত্রী হয়ে। যাদের না বললেই না, টুকটাক ভাই-ব্রাদার আসবে কয়েকজন। বিশ-পঁচিশ জনের মতো। আপনাদের কোনো ঝামেলা করতে হবেনা। বৃহস্পতিবার বাজার পাঠিয়ে দেব। সকালে বাবুর্চি চলে আসবে। টুকটাক সহযোগীতা করলে ওরাই সব করে

ফেলবে।''রাবেয়ার চোখে-মুখের বিরূপতা অগ্রাহ্য করে এগিয়ে গেল ভেতরের দিকে। ভেতরে ঢুকতেই থমকে দাঁড়াল। পলাশের কাছ থেকে ফিরে একগাদা কাপড়-চোপড় ভাঁজ করতে লেগেছে অন্তূ। পেছন ফিরে ছিল। জয় ঠোঁটদুটো ফাঁক করে একটা ঢোক গিলল। নিয়ন্ত্রণহীন চোখদুটো মাথা থেকে পা অবধি স্ক্যান করে অন্তূকে। ঠোঁট কাঁমড়ে সামান্য হেসে ডাকল, "ঘরওয়ালি!"

অন্তূ পিছনে তাকায়। নির্বিকার, নির্লিপ্ত চাহনি। পুনরায় নিজের কাছে মনোযোগ দেয়। জয় হেলেদুলে হেঁটে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়ায়। ডাকটা শনতে এমন লাগে, "আরমেইণ!"

অন্তূ জবাব দেয়না। গলা উঁচিয়ে বলে জয়, "সেদিন ঢোকার সময় তেমন একটা খেয়াল করিনাই। এইসব পড়ে থাকা জমি তোমার বাপের নাকি? হলে অন্ততপক্ষে দত্তরটা ভালো পাবো। তোমাকে বিয়ে করার কিছু তো বেনিফিট হবে!"

ফোন ভাইব্রেট হচ্ছিল, নাক-মুখ কুঁচকে রিসিভ করল, "ক সম্বন্ধির পোলা! তোর বউ মরার সংবাদ দিলে একটা ললিপপ খাওয়াবো।"রাহাত মিনমিন করে বলল, "ভাই, আমার তো বউ নাই। কিন্তু আপনার বউ মানে ভাবীজানরে নিয়া কিছু বলার জন্য কল দিছি।"

জয় জবাব না দিয়ে শিষ বাজালো দু'বার।

-"আপনি কি গেছেন শ্বশুরবাড়ি? ভাবী বাসায় পৌছাইছে?"

জয় চুপচাপ কলটা কেটে দিলো। রুমে এসে অন্তূর বিছানার ওপর টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল জুতো পরা অবস্থায়। পাশেই বসে অন্তূ মনোযোগ দিয়ে কাপড় ভাঁজ করছে।

চোখদুটো বুজে শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় গেছিলে?"-"ভাবীকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছিলাম।"

-"আর কোথাও যাওনি কেন?"

-"পলাশের সাথে কফিশপে গেছিলাম।"

জয় চোখ বুজেই হাসল নিঃশব্দে। হাসিমুখে বলল, "কেন? সেদিন তোমায় মারা খাওয়া থেকে আমি বাঁচিয়েছি বলে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করছে না? দড়ি ছিঁড়ে মারা খেতে গেছিলে? নাকি পলাশ যা করতে গিয়েও ছেড়ে দিয়েছিল সেদিন, তার বাকিটুকু উপভোগ করতে গেছিলে?"

এমন একটা অশিষ্ট, নোংরা কথায়ও বিশেষ কোনো প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হলো না অন্তূর মাঝে। যেন সে অতি-স্বাভাবিক কিছুই শুনছে মাত্র। অল্প হাসল, "সবার চরিত্র তো আর আপনার মতো ময়লা, দুর্গন্ধে জড়ানো না। আপনার আর আমার কোনো তুলনা হয়?

আপনি হলেন নর্দমায় জন্মানো পতঙ্গ, আমি মনেহয় অত খারাপ না। ঠিক না?''জয় সম্মতি জানালো, "ঠিক। তবে একদিনেই আমার সব পড়ে ফেলবে? নিজেকে লিখতে বহুবছর লাগিয়েছি আমি। একদিনে গড়িনি নিজেকে, অথচ তুমি আয়ত্ত্ব খুব দ্রুত করে ফেলছো আমায়। নট ফেয়ার, ঘরওয়ালি!''

অন্তূর মন বিদ্রোহ করে ওঠে, 'আপনার মতো নিচু মানের উপন্যাস পড়ার আমার রুচি কোথায়, জয় আমির?' কথাগুলো চেপে জিজ্ঞেস করল, "মহাভারত পড়েছেন?''

-"পুরোটা পড়িনি।''

-"শকুনি মামা নিশ্চয়ই আপনার খুব প্রিয়?''

-“দুর্যোধনকেও ভালো লেগেছিল।”

-“স্বাভাবিক।”

-“হু, আসল কথা বলো।”

-“শকুনি মামা বলেছিলেন, ‘সুগন্ধ, দুর্গন্ধ এবং মানুষের স্বভাব কখনও লুকায়িত থাকেনা।’ অর্থাৎ এগুলো আবিষ্কার করার জন্য বেশি খাটুনি করার প্রয়োজন নেই। যার কাছে যা নেই, সে তার মর্যাদা বা কুফল কিছুই বোঝেনা। একজন সম্মানী ব্যক্তি আরেকজনের সম্মানকে খেলার বস্তু মনে করবে কোন দুঃখে? যার চরিত্র ভালো, সে অন্যকারও চরিত্রকে বাজারে তুলতে পারে? ”জয় মাথা নাড়ল, “পারেনা। কথা ঠিক,

আমার সম্মান নেই, আমি তোর সম্মানের মর্যাদা বুঝিনা, ভবিষ্যতে বোঝার কোনো সম্ভাবনাও নেই। কিন্তু এখন তোর ভণ্ডামি তোর কাছে রাখ। পলাশ, মুস্তাকিনের সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ করে আমার সামনে তোর সন্ন্যাসী সাজার চেষ্টা খুবই ভালো লাগছে আমার। তবুও এই ধরণের বালের প্যাচাল এখানেই থামা, নয়ত বালিশ চাপা দিয়ে খু-ন করে রেখে যাব। তোর লেকচার আমার কোনোকালেই ভালো লাগেনা। বউ মারা ভালো কাজ, কিন্তু ভালো কাজ আমি করিনা। মারার হলে ঠুকঠাক মেরে ফেলে রাখা কোনো কাজের কথা না। মারলে কোনোদিন জানটা

একটানে বের করে নেব। যা বলতে এসেছি, শোন্।”

অন্তূ ভাঁজ করা কাপড় র‍্যাকে সাজিয়ে রাখার জন্য উঠে দাঁড়ায়। জয় আবার টান হয়ে শুয়ে বলল, “শুক্রবার দিন লোক আসবে ও বাড়ি থেকে। মার্কেট করতে হবে। ভাবী বলল, আজকাল নাকি মার্কেট মেয়েরা নিজেরা করে, তোমাকে নিয়ে যেতে বলেছে মার্কেটে। তাছাড়া মা-গী মাইনষের বাজার জীবনে করিনাই, ওসব বালছাল আমি কিনতে পারব না। কাল সকালে তৈরি থেকো।”-“আপনাদের পছন্দ মতো কিনলেই চলবে। ফ্যাশন নিয়ে আমার কোনো সেন্সিটিভিটি নেই।”

জয় খুঁটিয়ে দেখে অন্তূকে। নারীদেহের প্রতিটা ভাঁজে জয়ের পৌরুষ নজর পরিভ্রমন করে শেষ অবধি থামে অন্তূর কাধ থেকে বুক অবধি। নিঃশ্বাস ভারী হয়। জোরে করে শ্বাস ফেলে ঘাঁড় ঘুরায় অন্যদিকে। তখনই অন্তূ বলে ওঠে, "কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে।" জয় বালিশটা খাটের বক্সের সাথে হেলান দিয়ে তাতে পিঠ এলিয়ে দিয়ে বলল, "এমন ভাব করছো, যেন আমি সব শর্ত মঞ্জুর করতে চেয়ে তোমায় ও বাড়ি নিয়ে যাবার প্রস্তাব দিয়েছি? বিয়ে হয়েছে, তুমি দায়বদ্ধ। কী শর্ত দেবে? সিনেমার হিরোদের মতো আলাদা শোয়াবে?"

অন্তূ কথা বলল না। জয় খ্যাকখ্যাক করে উঠল, “নাটক কোরো না, কী চাও বলো।” আস্তে করে উঠে পা ঝুলিয়ে মাথা নত করে বসে, দু’হাতের তালু বিছানায় ঠেকালো।-“কুড়িগ্রামে আব্বুর কিছু পৈত্রিক জমি আছে। মেজো চাচা সেটা দখল করে আছে, সেখানে নিজের খামার দিয়েছে। পলাশের পাওনা ছাড়াও আব্বুর বেশ কিছু ঋণ আছে। প্রতিদিন বাড়ি বয়ে লোক আসছে। আব্বু যাওয়ার পর ওরা ভয় পাচ্ছে, আমরা হয়ত টাকা আর দেব না। তাগাদা বেড়েছে। আপনি জমিটা কাকার কাছ থেকে দখল নিয়ে সেটা বিক্রি করে টাকা এনে

দেবেন। খামার পরিস্কার না হলে ক্রেতা রেজিস্ট্রিতে যাবেনা।''

জয় কিছুটা সময় নিয়ে মাথা তুলল, চোখা স্বরে বলল "আমাকে তোমার দখলদার মনেহয়?''

অন্তূ অবাক হবার ভান করে সামান্য হাসল, "আপনার মনে হয় না? শুধু আমার কেন, সবারই মনেহয়। রাজনীতিবিদদের কাজ কী? দখল করা। সেটা হোক ক্ষমতা, সম্পত্তি, মানুষের অধিকার অথবা জনসাধারণের জীবনের সুখ। আপনাদের নৈতিক দায়িত্ব—দখলদারী। তবুও লোকে আপনাকে পছন্দ করে? হতাশ আমি।''

জয় বাঁকা হেসে ঘাঁড় ঘুরালো, “কারও পছন্দের হতে আসিনি দুনিয়ায়। বেঁচে থাকার জন্য এসেছি, নিজের মতো করে বাঁচবো।”

বেশ শান্ত দেখালো জয়কে।-“কাল মঙ্গলবার। সকালের গাড়িতে কুড়িগ্রাম পৌঁছাতে বেলা সাড়ে এগারোটার মতো বাজবে। কাল রেজিস্ট্রি না হলে আগামীপরশু—বুধবার হবে। টাকাটা এনে হিসেব করে নিজহাতে পলাশকে দিয়ে আসবেন। পলাশের পাওনা–সুদসহ বারোলক্ষ দাবী করেছে ও। ওখানে জমি আব্বুর চার কাঠার বেশি। কমবেশি লাখ বিশেক টাকা আসতে পারে। বুধবারের মাঝে

এই কাজগুলো শেষ করে ফেলুন।

বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠানের কাজের জন্য রইল।”

-“আদেশ করছো?”

-“আপনার মনে হচ্ছে?”

-“না।”

অন্তূ হাসল, “তাহলে করছি না।”

-“তুমি যাবেনা কেন সাথে?”

-“আপনি যাচ্ছেন তো। চলবে।”

-“ভরসা করছো?”

-“আপনার মনে হচ্ছে?”

-“না।”

-“তাহলে করছি না।”

জয় মৃদু ধমকে উঠল, “আমি একা গিয়ে কার বাল ছিঁড়বো ওখানে? কাউকে চিনি আমি?”

-“কল করব আমি। বলে দেব সব। আর এটুকু যদি সামলে নিতে না পারেন, তাহলে আর মাস্তান হওয়ার ফায়দা কী?”অন্তূর সূক্ষ্ম অপমানে জয় ধৈর্য্যহারা হয়ে উঠল। এক চোটে বসা থেকে উঠে অন্তূর পেছনের চুলগুলো মুঠো করে ধরে হিঁচড়ে পিছনে ঠেলে নিয়ে গেল। তাতে সবে গুছিয়ে রাখা কাপড়ের র‍্যাকটা উল্টে পড়ে যায়। অন্তূ পিঠটা সজোরে ধাক্কা খায় দেয়ালে। পিঠে আঘাত পেতেই অন্তূ থাবা দিয়ে খাঁমচে ধরে জয়ের কলার। বুকের ওপর আঁচড় লেগে চামড়া উঠে যায়

জয়ের বুকের। অন্তূ ছাড়েনা। মাংসাশীর মতো খাবলে ধরে চিবিয়ে বলে, “মাস্তান নন আপনি, আপনি কুকুর। ভুলটা শুধরে নিয়েছি। এবার ছাড়ুন। মানুষের ভুল হয়ে যেতেই পারে। মাস্তান তো ভালোই, আপনি কি আর তেমন? রাস্তায় রাস্তায় কিছু কালো কুকরেরা ঘুরে বেড়ায় না? মানুষ দেখলেই হামলে পড়ে। আপনি তাই।”

জয় এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া দেখালো।ও বোধহয় শুনতে পেল না অন্তূর ভৎসনাগুলো। পাছড়াপাছড়িতে অন্তূর ওড়না পড়ে যায় একপাশ থেকে। এর আগেও দেখা হয়েছে এভাবে অন্তূকে। তখন যে চাহিদা জাগেনি,

তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করেনি, এমন নয়। পরিস্থিতির প্রতিবন্ধকতায় চাপা পড়েছে সেসব। আজ হলো না, ক্রমশ তীব্র পৌরুষ দেহটা পাগলামী শুরু করল জয়ের। বুকের আঁচড়ে যখন জ্বলন উঠেছে, জয়ের শরীরটা আচমকাই অন্য চাহিদায় মনোযোগ পেল। অন্তূ সুন্দরী, এত কাছ থেকে আরও বেশি লাবণ্যময়ী লাগছিল। ক্ষুধার্ত জয়ের এত কাছে, হাতের থাবায় মেয়েটাকে পেয়ে, এত কাছ থেকে ছুঁয়ে থেকে জয়ের ক্ষুধাটা জেগে উঠল। সাতাশ বছরের যুবক ছেলেটার সামনে অন্তূর ক্ষিপ্ত নিঃশ্বাসে উঠানামা করা বুকটা নেশাদ্রব্যের ন্যায় লাগল। জয়ের নিঃশ্বাস ভারী

হলো, পশমে ঢাকা বুকের ভেতরটায় আলোড়ন উঠল। অন্তূর চুলে থাকা হাতটা শিথিল করে অপর হাত দিয়ে অন্তূর একপাশে ঝুলে থাকা ওড়নাটা একটু একটু করে টেনে নিয়ে হাতের মুঠোয় গোছাতে শুরু করল।অন্তূ থমকে যায়। জয় অন্যমনস্কভাবে অদ্ভুত স্বরে বেহায়ার মতো আবদার করে, "একটা চুমু খাই তোমার ঠোঁটে?"

অন্তূকে প্রতিরোধ করার সময়টুকু দেয়না জয়। বিরবির করে ওঠে, "মেয়ে মানুষ জীবনে স্বীকার করবে না।"

দাড়িগোফের মুখটা অন্তূর ঠোঁটে লাগায়। শক্ত একটা চুমু। অন্তূর ওড়নাটা তখনও জয়ের

হাতে পিষে যাচ্ছে। যতটা জোর জয় সুতোর ওড়নাতে দিচ্ছিল, ঠিক ততটা হিংস্র হয়ে ওঠে তার ঠোঁট, এবং অপর হাতটা। অন্তূ জয়কে বাঁধা দিতে হাত তুলতেই ওড়নাসহ হাতটা চেপে ধরে অন্তূর চোয়ালে অপর হাত গেড়ে দেয়। অন্তূর হাতের কব্জির নিচের র-ক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যেতে চায়। জয়ের হাতের রিস্টলেটের আঁচড়ে নরম হাতের চামড়া বিদীর্ণ হয়।

এভাবে কেটে যায় মিনিটখানেক। জয় সরে দাঁড়ায়। হাঁপিয়ে উঠার মতো জোরে জোরে বিক্ষিপ্ত শ্বাস ফেলতে ফেলতে বলে, "এবার কী বলবে? ধ-র্ষ-ক? চলবে, তাই বলো।"আর

এক মুহুর্ত দাঁড়ায় না। অন্তূর ওড়নাটা হাতের মুঠোয় পেঁচিয়ে বেরিয়ে যায় ঘরের বাইরে।
অন্তূ শান্তভাবে জয়ের যাওয়ার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে থুহ করে দু'বার থুতু ফেলে মেঝেতে। হাত দিয়ে ঠোঁট ঘঁষে। আবার থুতু ফেলে। ওপরের দিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্য হাসে, "আমার স্বামী এই কুকুরটা। এভাবেই সহ্য করতে হবে প্রতিবার যখন কাছে আসবে? কী বিধান আপনার? মানা করলে নাকি আপনার ফেরেশতারা অভিশাপ দেয়! আপনি মহান, মালিক আমার!
অন্তিক আবার একটা ছোট্ট দোকানের খোঁজ করেছে। মানুষের ব্যক্তিত্ব নষ্ট হতে

বাধ্যতামূলক একবার ব্যক্তিত্বহীনের মতো কাজ করাই যথেষ্ট। অন্তিকের জন্য তার পরিবারের সাথে যা হয়েছে, তা সে ভুলতে পারেনা। সব ভুলে নিজেকে সংসারে সক্রিয় করার মনোবলটুকু নিঃশেষ হয়ে গেছে কোথাও। রাতে মার্জিয়া বলল, জয় আমির এসেছিল। সে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। যেভাবেই হোক বিয়ে হয়ে গেছে, আব্বু নিজে বিয়ে দিয়ে গেছে। আর বলার কী থাকে? অন্তিকের কাছে জয় আমির, নর্দমার পঁচা নাপাক ময়লা। যা ঘৃণ্য, বর্জনীয়। তার কারণে অন্তূর সাথে যা হয়েছে তা ছিল অপরিকল্পিত। অন্তূর জন্য কলিজা ফাটে, অথচ সান্ত্বণা

দেবার ভাষা নেই। আবার মনেহয়, ওর বোন এমন দূর্বল নয়। অন্তূর কাছে যুক্তি, ধৈর্য্য, কথার বাণ, প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের সাহস সব আছে।অন্তূ বারান্দায় এককাপ কড়া চা আব্বুর বসার চেয়ারখানাতে রেখে আব্বুকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি চা-তে চিনি খাও না কেন, বলো? পানসে লাগে না? আমি তো জীবনে তোমার চা মুখেও দিতে পারিনা।" আমজাদ সাহেব বেতের তৈরি রকিং চেয়ারে বসা। চেয়ারটা তিনি যেদিন শখ করে বানিয়ে আনলেন, কী যে খুশি লেগে ছিল মুখে-চোখে। গাম্ভীর্য্যের পেছনে এক সৌখিন মানুষ ছিলেন। অন্তূ চেয়ারে হেলান দিয়ে আব্বুর দিকে চেয়ে

থাকে। আজ কোনো কথা বলছে না, জবাব দিচ্ছে না। অন্তূ ছটফট করে উঠল, "কী হয়েছে তোমার, আব্বু? কথা বলছো না কেন? তোমার অভিমান সহ্য করার সাধ্যি আমার নেই। তোমরা আর কত কী সহ্য করাবে আমাকে?"

অনেকক্ষণ পর বললেন আমজাদ সাহেব, "তুই চলে যাচ্ছিস, অন্তূ? ওই বাড়ি কিন্তু যাব না, আমি। তুই আসিস রোজ, আমি এখানেই থাকব।"অন্তূ চমকে উঠল। একথা কেন মাথায় আসছে? অন্তিক এসে বসে আব্বুর চেয়ারটায়। আব্বুর অবয়বটা মিলিয়ে যায়। অন্তূ চারদিকে তাকায় আকুল হয়ে। অন্তিক

জিজ্ঞেস করল, “চা-টা আমি খাবো? একটু চিনি এনে দিবি?”
দুই ভাইবোন অনেকক্ষণ যাবৎ চেয়ে থাকে একে অপরের চোখের দিকে, ঘোর নীরবতায় কাটে ততক্ষণ। অন্তূ পরে উঠে দাঁড়ায়। ছোট চিনির কৌটা এনে দুই চামচ চিনি দেয় অন্তিকের কাপে। অন্তিক যেন লজ্জিত বোধকে পাত্তা না দিয়ে বলে, “চা আব্বুর জন্য বানিয়েছিলি, তাই তো? বড় ভাই বাপের মতো হয়। চা-টা খাওয়া খুব বেশি অসঙ্গতি হবেনা। আমি তোর তেমন ভাই নই অবশ্যি! ঠিক বলেছি?”-“এমন ভং ধরিস কথাবার্তায়, যেন খুব শিক্ষিত আর বিজ্ঞ তুই। অনার্স পাশ

না-ই করতে বরের মালা গলায় তুলেছিস। আমার সামনে বুজর্গী কথাবার্তা বলতে আসবি না। বিরক্ত লাগে।"

অন্তূর ঠ্যাস মারা কথাতেও অন্তিক হেসে ফেলল, "পাপ আর বিদ্যুৎ প্রথমে এদের নিজেদের বাপকে মারে, শুনেছি। আমার পাপও ছাড়েনি আমায়।"

অনেকক্ষণ মাথা ঝুঁকিয়ে চুপচাপ বসে থেকে বলে অন্তিক, "পলাশ কী করেছিল তোর সাথে?"

-"পলাশের ব্যাপারে কিছু জানিস? এমন কিছু যা জানা উচিত আমার?" প্রসঙ্গ এড়িয়ে নিজে প্রশ্ন করল অন্তূ।

সকাল এগারোটার দিকে অন্তিককে সাথে নিয়ে অন্তূ রওনা হয় মুস্তাকিনের ফ্লাটের উদ্দেশ্যে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলগুলো হাতে খোঁপা করার মুহুর্তে রাবেয়া রুষ্ট কণ্ঠে বললেন, "বোরকা ছাড়ছিস? এমনে চলাফেরা করে মেয়েমানুষ? জাহান্নামী হয়ে গেছিস, তুই? আল্লাহরে ভয় লাগেনা? বেপর্দা, বেহায়াদের মতোন চলাফেরা করতে শিখছিস?"অন্তূ খোঁপাতে ছোট্ট ক্লিপ লাগাতে লাগাতে বলে, "কীসের পর্দার কথা বলছো, আম্মা? বেশ্যার শরীরে বোরকার পর্দা? যে মেয়ে পুরুষ ঘরে ঢোকায়, তার পর্দা?" মাছি তাড়ানোর মতো হাত নাড়ে অন্তূ, "মূর্খ তুমি।

মনের সান্ত্বণায় পর্দা করে রাস্তায় বের হয়ে মানুষের যে নোংরা ভাষাগুলো শুনব, তাতে পাপ বাড়বে, আম্মা। কী বলো তো, মানুষের আসল পোশাক সম্মান। তা আছে আমার? কাপড়ের পোশাকে শরীর ঢাকলেই কী আর না ঢাকলেই বা কী? নেহাত সভ্যতার খাতিরে পোশাক পরা। যখন সম্মানের ভূষন দেহ থেকে খুলে পড়ে গেছে! কীসের পোশাক গায়ে চড়াবো? লোক দেখানো হয়ে যাবেনা? আর ওটাকে 'রিয়া' বলে। যা হারাম। ওষুধ খেয়ে নিও, বের হচ্ছি।''

মুস্তাকিন থাকে দিনাজপুর বাঁশেরহাটের ঢাকাদক্ষিন রোডের মিসরা উদ্দীন সরণীতে।

ফ্লাট বলতে ছয় তলা বাড়ির এক ইউনিট। মুস্তাকিনের ঠোঁটের কোণে সেই মুচকি হাসি ঝিকমিক করছিল। নিজের হাতে নাশতা বানিয়ে আনলো। সোফায় বসে বলল, “কী ব্যাপার? রাস্তা ভুল করে?”-“প্রয়োজনে।” মুস্তাকিন হাসল, “প্রয়োজন ছাড়া মানুষ নিঃশ্বাসও ফেলতো না। নেহাত বেঁচে থাকার প্রয়োজনে মিনিটে কমবেশি বিশবার শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলে। কী প্রয়োজনে এসেছেন?” চুপচাপ তাকিয়ে রইল অন্তূ। মুস্তাকিনকে ওর কোনোদিন সাধারণ কেউ মনে হয়নি। কিছু একটা আছে লোকটার মাঝে, কিছু একটা! সেই কিছু একটা যে কী, তা আন্দাজ করা

দুঃসাধ্য যেন। লোকটা যেকোনো পরিস্থিতিতে অস্বাভাবিক রকমের শান্ত থাকার বিশেষ গুণসম্পন্ন।

মুস্তাকিন হাসল, "উকিল হবার আগেই যদি এভাবে স্ক্যান করেন, এনার্জি লস, ম্যাডাম! এই জহুরী দৃষ্টিকোণকে বাঁচিয়ে রাখুন, আপনার ভবিষ্যত পেশায় অতি প্রয়োজনীয়। এখনই খরচা করবেন না অপ্রয়োজনে।"

লোকটা হাসে বেশি।-"তো আপনি বলছেন, আপনাকে নিরীক্ষণ করার প্রয়োজন নেই? নিজেকে খাঁটি বলছেন?"

ফের হেসে ফেলল মুস্তাকিন, "খাঁটি? সে তো স্বর্ণও হয়না। চব্বিশ ক্যারেটকে লোকে খাঁটি

স্বর্ণ বলে জানে। অথচ এটা জানেনা, স্বর্ণে খাদ না মেশালে গহনা তৈরী করা যায়না। স্বর্ণ নরম ধাতু, ওতে খাদ না মেলালে তা দিয়ে অলংকার গড়া যায়না, গড়লেও তা মজবুত হয়না। আর খাঁদ মেশানো স্বর্ণ কখনও চব্বিশ ক্যারেট হয়না।''

অন্তূ চোখে হাসল, "অর্থাৎ, খাঁটি মানুষেরা দূর্বল, তাই না? আমিও বুঝি আজকাল।''

-"আমি একটু ব্যাকডেটেড মানুষ, কফিতে তৃপ্তি কম পাই। চা ভালো বানাতে পারি, টেস্ট করে দেখুন, নয়ত পরিশ্রম বৃথা যাবে।

''-"কথা শেষ করে নেব। ঠান্ডা হোক। আপনি আমায় পলাশের ব্যাপারে বলুন। কিছুই

লুকোবেন না। এবং এটা জিজ্ঞেস করবেন না, কেন জানতে চাইছি।"

-"আপনার উকিল হওয়াও ঠিক আছে, শুনানী পেশ করায় খুব দক্ষ হবেন। তবে রাজনীতিতে গেলে ভালো হতো। কথার ভাষনেই পার্টি আপনার। ভালো কথা জানেন, খুব সাজানো।"

অন্তূ চুপ রইল। অন্তিক দর্শকের মতো বসে আছে, দৃষ্টি অন্তূর মুখের দিকে। যেন মনেই নেই, এমন ভঙ্গিতে মুস্তাকিন জিজ্ঞেস করল, "এটা কত সাল চলছে যেন?"

অন্তূ জবাব দিলো, "২০১৪ চলছে।

"-"রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের মাঝে

পরস্পরের সম্পর্কগুলো যেমন উপরি হয়, ঠিক তেমনইভাবে রাজনীতিতে থাকতে গেলে বিভিন্ন ধান্দার বিভিন্ন ধরণের লোকের সাথে লেওয়াজ করে চলতে হয়। সেভাবেই একটা লেওয়াজ ছিল হামজা ও জয়ের পলাশের সাথে। হামজা পলাশের সমসাময়িক জুনিয়র। পলাশ হাজি মোহাম্মদ দানেশ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স পাশ করে বেরিয়েছে প্রায় আট বছর আগে। ভার্সিটিতে থাকাকালীন সে ছিল ওখানকার ছাত্রদলের এক সাধারণ সম্পাদক। অথচ ভার্সিটির পাঠ চুকিয়ে বের হতেই সে ছাত্রদল থেকে একদম অব্যাহতি নিয়ে নিলো। ব্যবসা শুরু করল নিজের। ধীরে ধীরে চাচা

অর্থাৎ রাজন আজগরের সাথে মিলে হয়ে উঠল বিশিষ্ট এক সন্ত্রাস সাথে মহাজন ব্যবসায়ী। সে সামলায় এখানকার কারবার, ঢাকাতে আছে রাজন আজগর।পলাশ রাজনীতি ছেড়েছিল এর অবশ্য একটা কারণ আছে। ওর অনার্স ফাইনাল ইয়ার পরীক্ষার আগে একটা ছাত্র সংগঠন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তার আগেই এক নোংরা কুকর্ম করে ফেলেছিল সে। এক গরীবের বউকে ক্লাবে তুলে এনে ধ-র্ষ-ণ ও শারিরীক নিপীড়ন করে ছেড়ে দিয়েছিল। সেই মহিলার পরেও তার বিরুদ্ধে ছাত্রী হোস্টেলের কোনো ছাত্রীকে এমন কিছু করার অভিযোগ

উঠেছিল। এরপর ছাত্রসংসদ থেকে বের হয়ে আসতে হলো তাকে। এই ক্ষোভে রাজনীতি ছেড়ে সন্ত্রাসনীতিতে যুক্ত হয়ে যায় সে। মানুষকে টাকা ধার দিয়ে তা শোধের ব্যবস্থা রাখে না, পরে বাড়ির মেয়েরা তার শিকার হয়। যা অন্তূর সাথে হয়েছিল। জয় জানে সবই। কিন্তু সে জানতো না, অন্তূদের মতো রক্ষণশীল পরিবারের কেউ পলাশের কাছে ভিড়বে। পলাশ ছাত্র-রাজনীতি থেকে বেরিয়েছিলই কেবল নিজের অমানুষিক মস্তিষ্কের চাহিদাগুলো চরিতার্থ করবার জন্য। দিনদিন এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল সে, তার শক্তির নিচে অল্প জায়গা পেলেও তা যে

কারও জন্য বিশাল ব্যাপার। তবে ওকে দেখলে ওর শক্তি সহজে আন্দাজ করার জো নেই। খুব ঠান্ডা এবং সাধারণ চলন ওর। চালচলনে খুব সাধারণ এবং আকর্ষিক গুপ্ততা আছে। ওর যে মাথায় দোষ আছে, এটাও ওর শিকার ছাড়া কেউ ধরতে পারবেনা। তবে চার-পাঁচ বছর আগে পলাশের জন্য চারিপাশটা এতটাও অনুকূল ছিল না। প্রশাসন পুরোটা মরেনি তখনও। সাল–২০১০ এর শেষের দিক। রাজনৈতিক বিপর্যয় পুরো দেশ জুড়ে। বঙ্গবন্ধুর হত্যা মামলার রায় কার্যকর হলো, আরেক দফা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার

হলো, বিএনপি নেত্রীর নিবাস পরিবর্তন। তখন দেশের অবস্থা খুব উত্তেজিত। সেই সময় হামজা কেবলই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল রাজনীতিতে।তার সাথে ভাবটা পলাশ গড়ে তুলেছিল নিজের সুবিধার্থে। এরপর থেকে দুই পক্ষ পরস্পরের জন্য ব্যাক-আপ সাইড হয়ে গেল। কিন্তু মাজহার তখন জয়ের বিপরীতে ভার্সিটির ছাত্র সংসদ থেকে ছিটকে পড়ার শোকে হতবিহ্বল। অথচ হামজার জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। তার বিপক্ষে সরাসরি লড়ার হাত কোনোদিনই শক্ত হয়ে ওঠেনি মাজহারের। বাপ মেয়র থাকা সত্ত্বেও তরুণ রাজনৈতিক নেতা, হামজার দাপট

চলছিল চারদিকে। চাচাতো বোনকে বিয়ে দেয়ার পেছনে মাজহারের একটা দারুণ পরিকল্পনা থাকলেও তা কোনোদিন সফল হয়নি। হামজা ঠিক যতটা চতুর, তেমনই ভয়ানক। সে নিজের অর্জনের ভাগ দেয়না কাউকে। পলাশের সাথে নিয়মিত উঠাবসা শুরু করল। এরপর সমস্যাটা তৈরি হয়েছিল হামজা ও জয়ের বেপরোয়া চলন নিয়ে। মাজহার পলাশকে খুব মান্য করে চললেও জয় আর হামজার কাছে পলাশ তেমন একটা অধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি কোনোদিন। আরও বহুত ব্যাপার আছে, যেগুলো শুধু ওরা জানে, ওরা। আপনার না জানা ভালো।''

মুস্তাকিন কথা শেষ করল। অন্তূ উঠে দাঁড়ায়, "জয় আমিরের ব্যাপারে কী জানেন?"
-"জয় আমির? এক যুদ্ধাপরাধীর ছেলে।" খুব সংক্ষেপে জবাব দেবার চেষ্টা করছিল মুস্তাকিন।
অন্তূ বেরিয়ে আসে মুস্তাকিনের ফ্ল্যাট থেকে। রাস্তা পার হবার জন্য দাঁড়াতেই নজরে আসে, ছোট্ট একটা মেয়ে, বাবার সাথে রাস্তা পার হচ্ছে। অন্তূর বুকটা ধরাস করে ওঠে। তখনই ডান হাতটা চেপে ধরে অন্তিক। তাড়া দেয়, "রাস্তা ফাঁকা, চল পার হই।বিগত ২০১৪ এর ৫ই জানুয়ারী দশম জাতীয়সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ভোট দিতে গেছিলেন না

আমজাদ সাহেব, কাউকে যেতেও দেননি। অন্তূ তখন নতুন ভোটার। সে আব্বুকে খুব আগ্রহের সাথে বলে, "কাল আমি নাগরিক হব, আমার প্রথম ভোট দেব।"

আব্বু হেসেছিলেন, "তোর জন্য ব্যালট পেপার বেঁচে থাকলে নাহয় ভোট দিতি। আজ রাতেই সেসবে সিল পড়ে যাবে। কষ্ট করে ভোট দিতে যাবার ঝামেলা নেই। জনগণের খাটুনি কমাতে সরকার দেখ কত কী করে! তবুও লোকে বলে, রাজনীতি আর রাজনৈতিকতা ভালো না।"সে খবরের কাগজে পড়েছিল, নির্বাচনের আগের রাতে কমপক্ষে পাঁচশো ভোটকেন্দ্র আগুনের হল্কায় দাউদাউ করে

জ্বলেছে। বিশ-পঁচিশ জনের মৃ-ত্যু-র খবর যদি ছাপাই হয়, আমজাদ সাহেব ধারণা করলেন, মৃত্যু এর চেয়ে অনেকবেশি হয়েছে, আহত অগণিত। তার মধ্যে নিশ্চয়ই শিবির আর বিরোধীদলীয় বিএনপির ছেলেরা বেশি মরেছে! অন্তূ সতর্ককণ্ঠে জিজ্ঞেস করেছিল, "আব্বু! তুমি কি জামায়াত শিবিরকে সমর্থন করো?"

আমজাদ সাহেব বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলেছিলেন, "আমি অন্তত এ দেশের বর্তমান ক্ষমতায় থাকা স্বৈরাচার নেতাদের সমর্থন করি না।"অন্তূদের ভার্সিটি ছুটি হয়ে গেল। চারদিকে হাহাকার। মাসজুড়ে স্কুল-কলেজে

ছুটির পর ছুটি। একে একে জেলে যায় লোকে, তার কয়েকদিন পর তাদের ফাঁসির রায় কার্যকর হয়। সুবিচারে দেশ ভরে উঠতে লাগল কানায় কানায়। লোকে রাতে বাইরে বের হয় না সুবিচারের ভয়ে। কোথাও তাদের ওপর না সুবিচার ঘটে যায়! এমনিতেই এত সুবিচার এই ১৪৭৫৭০ বর্গ কি.মি. সীমানার দেশে আঁটছে না, উতলে পড়ে যাচ্ছে। বাইরে বের হওয়া লোকের নিশ্চয়নতা নেই ঘরে ফেরার। বিনা নোটিশে কারাদন্ড হয়ে যায় আজকাল মানুষের। এভাবে পেরিয়ে যায় প্রায় ছয়মাসের মতো। জুলাই মাসে সবকিছু সামান্য স্বাভাবিক হওয়ার পরেই সবকিছু

চলতে শুরু করল। কতদিন এভাবে চলা যায়? উত্তাল ঢাকা শান্ত যেন। নির্বাচন থামানো যায়নি, ঠিক ক্ষমতায় বসে পড়েছে ভক্ষকগণ। এই শোক এবং হতাশায় আর বিরোধী বিপ্লবীরা একে একে জেলে যাওয়ায় হতাশায় নিমজ্জিত তারা। আইনস্টাইন বলেছিলেন, পৃথিবীর প্রায় সকল তুলনাকে আপেক্ষিকতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। আপেক্ষিকভাবে বিরোধীদলগুলো নির্বাচনের পর ঠিক যতটা হতাশা নিয়ে দমে গেল, হামজা জয়ের মতো ছাত্রলীগের তরুণেরা উপরমহলের প্রশ্রয়ে তত বেশি হুংকার দিয়ে নিজেদের জাহির করার সুযোগ হাতিয়ে

নিলো।অন্তূ জয়কে কবুল করেছিল ২৬ নভেম্বর, ২০১৪। ষোলো দিন পর আজ ১২ই ডিসেম্বর, ২০১৪; রোজ শুক্রবার। অন্তূ বিয়ের সাজে বসে এসব ভাবে। অবাক হয়, জীবন তাকে কোথায় এনে দাঁড় করিয়েছে? সে ধীরে ধীরে সাধারণ একটা স্বপ্নদেখা মেয়ে থেকে কেমন আন্তর্জাতিক ও রাষ্ট্রীয় বৈষম্যের দিক ঝুঁকে পড়ছে। কীসের সংগ্রামের আগুন বুকে ধিকধিক করে জ্বলছে? পরিস্থিতি তার ভেতরে যে আগুন জ্বালিয়েছে তা তাকে আর কতদূর নিয়ে যাবে?

অন্তূ মাঝেমধ্যেই বিরক্ত হয় নিজের ওপর। সে আজ এমন প্রতিবাদ করতে না গেলে,

সহ্য করা শিখলে জীবনটা এর চেয়ে অন্তত ভালো হতো।তখনই আব্বুর সেইসব শিক্ষা এসে সামনে দাঁড়ায়, “অন্তূ! পরিণামের চিন্তা যদি তোকে প্রতিবাদ করা থেকে পিছপা করে তোলে, সহ্য করতে শেখার পরামর্শ দেয়, সেই চিন্তাধারায় অল্প একটু কেরোসিন ঢেলে ছোট্ট একটা দিয়াশলাই জ্বালিয়ে দে। আর যদি সবাই এটা করতে পারতো দেশে কখনোই স্বৈচারার সোচ্চার হয়ে ওঠার সুযোগ পেত না। পৃথিবীতে ক্ষমতা এবং দূর্বলতা আলো এবং অন্ধকারের মতো। অন্ধকার না থাকলে আলো কখনও দৃশ্যমান হতো না। এখানে আপেক্ষিকতার সূত্র খাটে। দূর্বলতার

আপেকিকতায় ক্ষমতা জাহির হয়। তুই যতক্ষণ দূর্বল, তার তুলনায় বরং তোর সম্মুখে কেউ শক্তিশালী। যখন তুই-ও শক্তিশালী, তখন তোরা দুজন বরাবর। কাটাকাটি হয়ে যাবে শক্তির, আর কারোটাই তখন শক্তি থাকবে না। ঠিক যেমন আলোর বিপরীতে আলো অতুলনীয়। অন্যায়ের প্রতিবাদ করার ফলে যে ক্ষতিগুলো জীবনে নেমে আসে, এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে যারা ক্ষতি ও অবিচারের সম্মুখীন হয়, আল্লাহ তায়ালা তাদের বলেছেন, মজলুম। আর তিনি স্বয়ং প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—নিশ্চয়ই তিনি তার মজলুমদের সাথেই আছেন।''অন্তূ

ভেতরে বিপ্লবের আগুন জ্বলে ওঠে। শুরুটা হয়েছিল, একটা বোরকা পরা মেয়েকে সিগারেট হাতে তুলে দেয়ার মাঝ দিয়ে। এরপর প্রতিটা দিন একটা মেয়েকে নিয়ে রঙ্গ-তামাশা কথা তরুণ যুবনেতার বিরুদ্ধচারণ দিয়ে শুরু এই কাহিনি আজ অন্তূকে, পর্দাহীন, মনুষত্বহীন, সুস্থতাহীন এক অস্বাভাবিক চিন্তাধারার মানুষের পরিণত করেছে।

মেয়েরা যুদ্ধে ইজ্জত দিয়েছে, গর্ভের ছেলে, মাথার সিঁদুর, গায়ের কাপড়...কেন? কেন শুধু ওরা দিয়েছে? ওরা কেন কেড়ে নিতে পারেনি? ওরা কেন কেঁড়ে নিতে আসা

হানাদারের বুকে বটির কোপ বসাতে পারেনি, চালের বাটাম খুলে কেন দিতে পারেনি মাথায় একটা বাড়ি, সেসব কুকুরদের র-ক্তে কেন চুড়ি পরা হাতদুটো ধুয়ে ফেলতে পারেনি? আজও কী হচ্ছে? সেদিন আঁখি কেন একাধিক নারকীয় পিশাচদের দৈহিক খোরাক হয়েছে? কেন দিখণ্ডিত করে ফেলতে পারেনি সেইসকল ক্ষুধার্ত জন্তুদের পাপী দেহপিণ্ডটাকে? অন্তূর সাথে কি এর কম কিছু হয়েছে?এত হানাহানি কীসের? যারা শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায় তারা কেন জেলে পঁচে মরছে? গত ২০১৩ এর ১২ই ডিসেম্বর এক ইসলামি রাজনৈতিক নেতাকর্মী আব্দুল কাদের

মোল্লাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়া হলো। তার অপরাধ, সে মুক্তিযুদ্ধের মানবতাবিরোধী অপরাধী। টুপি, দাড়ির সাজে একজন মুসলমানবেশী রাজনৈতিক নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হয়েছিল, তা কতটুকু সত্যি? যদি এভাবে সকল জামায়াত পার্টির সদস্যরা অপরাধী হয়, তাদের তো ধরে জেলে পুড়ে দেয়া হচ্ছে, অথবা পড়িয়ে দেয়া হচ্ছে কালো মুখোশ, ঝুলে পড়ছে ফাঁসির কাষ্ঠে। এরপর ক্ষমতায় আছে নিশ্চয়ই মুক্তিযোদ্ধা, এবং দেশপ্রেমিকে মানুষেরা! তাহলে এই রাহাজানি, সহিংসতাগুলো কাদের কাজ? সকল অপরাধীর শাস্তি হয়ে গেছে।

এখন গোটা বাংলা শান্তিতে ছেয়ে যাওয়ার কথা। তবুও কেন শহরে শহরে বাস-ট্রাম পুড়ছে, মানুষ মরছে, ছিনতাই, নির্যাতন, অপরাধের সীমা থাকছে না? জয়েরা কেন এত শক্তিশালী? হামজারা কী করে জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়ে ওঠে? বাংলাদেশ তো মুসলিমের দেশ, বাংলাদেশ তো সকল ধর্মের ঐক্যের দেশ! তাহলে শান্তি কেন নেই? অথচ প্রতিটা ধর্মেই তো জীবনবিধান রয়েছে। তবুও কেন এখানে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের ধার ধারার মতো সংবিধান নেই? সংবিধানে কেন ধর্ম নেই? ধর্মের ডাক দেয়া মানুষগুলো কেন শেলের শিক ধরে দাঁড়িয়ে

কালকুঠুরিতে?মার্চের ষোলো তারিখে অন্তূ গেল থানায়। চাচার নামে কেইস ফাইল করতে। আমজাদ সাহেব জানতেন না, যে অন্তূ টুকটাক বিষয়গুলো জেনেও আরও জানার জন্য না-জানার ভান করছে।

পরেরদিন বঙ্গবন্ধুর ৯৪তম জন্মদিন। থানার গেইটে এক পুলিশ থামিয়ে অন্তূকে বলল, "বোরকা খুলে ভেতরে যান। হিজাব খুলে ফেলুন। মুখ দেখান।"

-"বোরকার ওপর দিয়েই তল্লাশি করুন।"

-"ম্যাডাম, যা বলছি তা করুন। আজ জঙ্গির দল বোরকার আড়ালে বের হবে কত এমন।

এসব পর্দা সব স্থানে চলেনা। খুলে ভেতরে যান।''

অন্তূ ধৈর্য্য হারায়। জ্বালা ধরানো হাসি হেসে বলেছিল, ''কোথাও শুনেছিলাম, 'ধান পোড়ে চুলায়, পানি ঢালে পাছায়।' আপনি সারাদেশে আছেন? যেখানে বোরকার তলে আসলেই ধান পুড়ছে, সেসব জায়গায় গিয়ে পাহারা দিন বরং। কর্তব্যপরায়নতার নাটক করে অজায়গায় পানি ঢালবেন না। নয়ত দেখবেন ওদিকে ধান পুড়ে সিদ্ধ-পাতিলটাসহ ব্লাস্ট হয়ে গেছে।''অন্তূ আর দাঁড়ায়নি সেদিন। সেই কর্তব্যপরায়ন পুলিশ অফিসারকে কথা বলার সুযোগ না দিয়েই চলে এসেছিল।

অন্তূর বরযাত্রী আসলেই খুব বেশি নয়। হুমায়ুন পাটোয়ারী, হামজা, পার্টির বিশিষ্ট কিছু ছেলেরা ছাড়া আর কেউ আসেনি। জয়ের পরনে সাদা শেরওয়ানি। মাথাটা খালি, পাগড়ি নিয়ে পিছে পিছে ঘুরছে রাহাত।

খাওয়া শেষ করে অন্তূকে বের করে নিয়ে যাওয়া হলো। অন্তূ একফোঁটা কাঁদল না। অন্তিক বোনের হাতটা চেপে ধরে গেইট অবধি নিয়ে যায়। রাবেয়া দূরে দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঝরঝর করে পানি পড়ছিল অসহায় মায়ের চোখ দিয়ে। অন্তূ এগিয়ে গিয়ে বলে, "আম্মা! বিদায় দাও। নতুন এই জীবনে কিছুদিন বেঁচে থাকতে

চাই। বেঁচে থেকে কিছু নতুন অভিজ্ঞতায় ভিজিয়ে ফেলতে চাই হাতদুটো। সেই অভিজ্ঞতা সামলে নেয়ার দোয়া কোরো। আমি আসব তোমায় দেখতে। খবরদার ওই পাপের ইট-বালুতে গড়া দালানে তোমার পা ফেলো না, আম্মা। আব্বু আমায় যেদিকে দিয়ে গেছে, তা আমার মাঝে থাক। তোমরা পা নোংরা করতে যেও না। দেশের পরিস্থিতি ভালো না, আর না মানুষ, সমাজ ময়লা হয়ে গেছে। তোমরা সরল মানুষ কোনোরকম বেঁচে থাকলেই অনেক।''

রাবেয়া হু হু করে কাঁদেন। অন্তূ বড় হয়ে গেছে। ছোট ছোট প্রতিবাদ থেকে জন্ম নেয়া

অন্তূ কিছু বিঁষমাখা অভিজ্ঞতার আয়োজনে আজকাল কেমন যেন লাগামছাড়া হয়ে গেছে। অন্তিক ফিসফিস করে বলে, "যতদিন ছিলি, কথা হয়নি বহুবছর। আজ বহুত কথা টের পাচ্ছি ভিতরে। বলার সুযোগ নেই। বহুদিন রাতে ঘুমাইনি, চোখদুটো খুব জ্বলছে। তোর চোখ জ্বলছে না?"

-"জ্বলছে না। আম্মার খেয়াল রাখিস। ভাবী আর তোর বাচ্চার হাল ধর। হতাশা হলো দূর্বলদের দেহে লেগে থাকা জীবাণু। যা তোকে গ্রাস করেছে। হতাশা ঝেরে একবার জিতে ফেরার মতো করে গা ঝারা দে। দেখবি নিজেকে পুরুষের মতো মনে হবে। যা

করেছিস, সেইকাল পেরিয়ে এসেছিস। আমিও তো জীবনে কতকিছু করেছি। পর্দাও করেছি। আজ এই বিয়ে সাজে শ মানুষ দেখছে। এখন কি সেই অতীতের বোরকা পরা অন্তূকে ভেবে কাঁদবো? নতুন করে শুরু কর। আম্মার তোকে প্রয়োজন, ভাবীর তোকে প্রয়োজন, তোর বাচ্চার তোকে প্রয়োজন।'' অন্তূর স্বর হালকা কাঁপলো পর্দার কথা বলতে গিয়ে।-“আর তোর? তোর প্রয়োজন নেই আমাকে?''

-“আমার আমাকে খুব প্রয়োজন। এছাড়া আশপাশে প্রয়োজনীয় কিছু তেমন চোখে পড়ছেনা আপাতত।''

গাড়ি তখন চলছে হাইওয়ের ওপর দিয়ে। অন্তূর পাশে জয় নেই। সে পেছনের গাড়ির ড্রাইভার। উদ্ভট কর্ম খুব মানানসই তার সাথে। সামনের গাড়িতে হামজা ড্রাইভারের পাশে ছিল। রিমি বসেছে অন্তূর পাশে, ওর কোলে কোয়েল। একদৃষ্টে অন্তূকে দেখছে, বোঝার চেষ্টা করছে। কবীর আর একজন মুরব্বী এবং হুমায়ুন পাটোয়ারী পেছনের সিটে। অন্তূ তাকিয়ে আছে নিজের বাঁ হাতের তালুতে। মেহেদিতে রাঙা হাতে কী খুঁজছে কে জানে!বিকট একটা আওয়াজে কানের তালা লেগে গেল। রিমি কান চেপে ধরে নিচু হয়। গাড়ি থামতেই ছুটে বেরিয়ে যায় হামজা ও

হুমায়ুন পাটোয়ারী। ককটেল পুড়ছে জয়ের গাড়ি থেকে দুই হাত দূরত্বে। গাড়ি ছিটকে এসে উল্টে যাবার আগে ব্রেক কষতেই জয়ের কপালটা স্টিয়ারিংয়ে সজোরে ধাক্কা খায়। কপালটা চিড়ে দিখণ্ডিত হয়ে গেছে। দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। হামজা পাগলের মতো ছুটে যায়। গাড়ির কাঁচ তোলা ছিল। দিগ্বিদিক শূন্য হয়ে আশপাশে তাকায়। কিচ্ছু নেই। একদৌড়ে সামনের গাড়িতে ফিরে ভরা বোতলটা আনে। গ্লাসের ওপর দুটো আঘাত করে। কাঁচ চিড়ে গিলেও ভাঙে না। এবার দুটো ককটেল ফাটে রাস্তার ওপর। গাড়ির পেছনে আগুন জ্বলে ওঠে। কেউ কেউ সজাগ

হয়ে উঠলেও রক্তাক্ত শরীরে নেই একফোটা জোর। কেউ-ই বের হবার মতো অবস্থায় নেই।

রিমি কোথা থেকে যেন একটা ভাঙা ইটের টুকরো এনে হাতে ধরিয়ে দেয় হামজার। হামজা এক পলক সেদিকে তাকিয়ে জয়কে বলে, "মাথা তুলিস না কিন্তু।"ইটের চারটে আঘাতে কাঁচ ভেঙে হাত ঢুকিয়ে কাঁচের লক খোলে। যা ধারণা করেছিল তাই। জয় অর্ধচেতন। ওকে হিচড়ে বের করে বুকের সাথে চেপে ধরে দৌড় লাগায় সামনের দিকে। যখন তখন অ্যালকোহল ভর্তি বোতল এসে পড়তে পারে গায়ে। হামজা অপরহাতে

রিমির হাতটা ধরে ছোটার চেষ্টা করে। আরও দুটো ককটেলের বোতল সামনে এসে পড়ে। পরেরগুলো গাড়ির ওপর। কে মরল কে বাঁচলো তা পরে হবে। আরও কিছুদূর এগিয়ে আসার পর গাড়িতে এসে তিনটা কাঁচের বোতল গ্রেনেড হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। তরলগুলো গড়িয়ে পড়তেই বোতলের কর্কের আগুনে দহন শুরু হয়ে যায়।জয়ের হাতের চামড়া ছিলে মাংস উঠে এসেছে। কপালে চাপটি ধরা র-ক্ত। ভ্রুতে এসে র-ক্ত চাপ ধরেছে। গোটা সাদা শেরওয়ানি রক্তে ভেজা। এবার হামজা খেয়াল করে, কপাল অল্প, আসলে কপালের কোণা দিয়ে মাথার ডানপাশ ফেটে গেছে।

কান দিয়ে রক্ত চুইয়ে পড়ছে। এতক্ষণে জয় একেবারে জ্ঞান হারায়। হাত-পা ছেড়ে দেয় হামজার কাঁধে। লোকজন দূর থেকে দেখে দৃশ্য। দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। ফুল সাজানো গাড়ির পেছনটা জ্বলছে। লাল টুকটুকে শাড়ি পড়া বউ দাঁড়িয়ে সামনে গাড়ির দরজার সামনে।হুমায়ুন পাটোয়ারী জয়ের হাতটা ধরে ঝাঁকায়, জয়? মামা? ও জয়...

হামজা বলে, "আব্বু, আপনি আরমিণকে বাড়ি নিয়ে যান। এখানে কিচ্ছু হয়নি। মাঝপথে কল আসায় আমরা জরুরী কাজে ঢাকা গেছি, কেমন? বউভাত দু'দিন পর হবে। গান-

বাজনার কমতি রাখবেন না। লোকজন যা আছে, সবার ভালো আপ্যায়ন করবেন। খুব শীঘ্রই ফিরব আমরা। এ খবর নিজে থেকে লিক না হওয়া অবধি এরকম কিছুই হয়নি, ঠিক আছে?''

পথ এখনও বেশ খানিকটা বাকি পাটোয়ারী বাড়ির।গাড়ি থেকে নামার পর সামনে শত শত লোক। পুরো পাড়া এসেছে জয় আমিরের বউ দেখতে। তার উপর যে তামাশা করে জয় আমির বিয়ে করেছে! আজ অন্তূর রাঙা গম্ভীর সুশ্রী চেহারাটা গিলে খেল কত-লোকে। মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে চোখের নজর ঘোরায় অন্তূ। দোতলা বাড়ি। বেশ বড় বাড়ি।

তখনই অন্তূর মাথায় আসে, হামজা করে কী? মেয়র হয়েছে সেদিন। জনগণের টাকা-পয়সা মেরে বড়লোক হতেও তো সময় লাগার কথা। এত বড় বাড়ি, গাড়ি বিলাসিতার উৎস কি শুধু এই ওয়ার্কশপ? লোহার ব্যবসায় এত আয়? অন্তূর বিশ্বাস হয়না। আবার মাথায় ঘুরছে জয়ের রক্তাক্ত মুখটা। ঘাঁড়ের পেছন দিয়ে সেই র-ক্তের স্রোত। এরকম র-ক্ত প্রথমবার আব্বুর দেহে দেখিছিল সে।

পার্টির ছেলেরা ভরা চারদিকে। সবার মাথায় লাল গামছা বাঁধা। এই বাড়িতে যে এত বড় আয়োজন, তা বরযাত্রীর সংখ্যা দেখে বোঝা যায়নি। কিছু বিশেষ লোক মোতায়েন করা

হয়েছে, তাদের হাতে লাঠি, ফাঁড়া খড়ি, কেউ কেউ চাদর পড়েছে। হাঁটার সময় হাতের রাম-দা গুলো বেরিয়ে আসছে চাদরের প্রান্ত থেকে। এইসব নিরাপত্তা কেন? হামলার ভয়? কীসের হামলা?ছোট বেলা। সন্ধ্যা লেগে যায় বউ ঘরে তুলতে তুলতে। আজ পাটোয়ারী বাড়ির মেইন গেইট খুলে দেয়া হয়েছে। সিড়ি বেয়ে বেয়ে উঠে আসছে দলে দলে লোক। গেটের ডানদিকে ছোট্ট বাগান, তার বাঁ পাশে ওয়ার্কশপের সীমানা শুরু। ডানদিকের ঝোপের পাশ ঘুরে গেছে একটা গলি। তা বোধহয় বাড়ির পেছনের দিকে যায়। কিন্তু

বাড়ির পিছনে বিশাল প্রাচীর তোলা। ওদিকে এই রাস্তা কীসের?

অন্তূর মাথাটা নত ছিল। যখন দরজায় পা রাখল, শাড়ির কুচি ধরে এগিয়ে অল্প মাথাটা তুলতেই একটা মেয়ের জ্বলজ্বলে চোখ নজরে এলো। অন্তূকে গিলছে যেন চোখদুটো, দুটো ঢোক গেলাও নজরে আসে অন্তূর। কৌতূহল তৈরি হলো মেয়েটার প্রতি।বাসরটা সাজানো হয়েছে কাঁচাফুলে। জয়ের ঘরে পা রাখতেই যে জিনিসটা চোখে বাঁধে—ঘরের দেয়ালভর্তি জয়ের ছবি। সবচেয়ে বড় ছবিটা সাদা পাঞ্জাবী পরা, গলায় চাদর পেঁচানো। ওটা দরজার সামনের দেয়ালে টাঙানো। একটা

খাট, ড্রেসিং টেবিল, কাঠের আলমারি, ছোট্ট দুই সিটের সোফা(কাউচ), বুকশেল্ফ, কর্ণার শোপিসটা রাখা বাথরুমের দরজা থেকে একটু দূরের দুই দেয়ালের কোণায়। অন্তূর তাচ্ছিল্যই এলো। এসব বড়লোকির চলাফেরার সোর্স কী? চাঁদাবাজি! জয় এখন কোথায়?

একের পর এক লোক আসছিল। দেখছিল, কেউ কেউ মুখ দেখে টুকটাক উপহার বা টাকা হাতে গুঁজে দিচ্ছিল। সেই সময় কোথা থেকে কোয়েল ছুটে এসে কোলে চড়ে বসে অন্তূর মুখ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে শুরু করে। হাস্যকর ছিল দৃশ্যটা। কোলে চড়ে বসে মুখ

দেখা। তুলি পাশে জিজ্ঞেস করল, “পছন্দ হয়েছে বউমণিকে?”-“বউ?”

-“জয় মামার বউ এটা। তোমার রিমি মামির মতো আরেকটা মামি। মামিকে ভালো লেগেছে তোমার? কোলে চড়ে বসলে যে!”

কোয়েল আধোস্বরে বলে, “জয় তো...”

থেমে গিয়ে চেয়ে থাকে অন্তূর দিকে বাচ্চাসুলভ দৃষ্টিতে, যেন বুঝতে চেষ্টা করছে ব্যাপারটা। দারুণ মায়া লেগে গেল অন্তূর। গালটা টেনে দিয়ে ভালো করে টেনে কোলে বসিয়ে একহাতে জড়িয়ে রাখলো কোয়েলকে। তুলি মিষ্টি হেসে নিজের পরিচয় দেয়, “আমি তোমার এক ননদ। তোমার তো আপন ননদ,

ভাসুর কেউ নেই। আমি হামজার ছোটবোন।
''অন্তূ হাসল অল্প। তুলি অল্প টিস্যু ছিঁড়ে সযত্নে অন্তূর মুখের ঘাম মুছে দেয়, "কী করে কী হলো, সেটাই ভাবছিলাম। জয় এমন ঘর বাঁধার ছেলে না। তবুও দেখেছ সাথে আসেনি! তুমি তো ভীষণ সুন্দরী! এত ঘামছো কেন? চিন্তা করছো কী নিয়ে? চার্জার ফ্যান দেব?''

-"উহু। ঠিক আছি।'' অন্তূর পর্যবেক্ষক দৃষ্টি কিছু আবিষ্কার করে ফেলে তুলির মুখে। ফর্সা ধবধবে চেহারায় কালচে দাগগুলো খুব দৃষ্টিকটু। ঘাঁড়ের কাছের জখমটা ওড়নার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে। চোখের নিচে

কালি পড়া, যা জানান দেয় বহুরাত ঘুমায়নি চোখদুটো। অথচ দারুণ সুন্দর চেহারা তুলির। হামজার মতোই নাক-চোখ, তবে হামজা পুরুষ হিসেবে এমন ফর্সা না।

রিমি এসে দাঁড়াতেই তুলি চমকায়, "মুখটা এমন ছোট লাগছে কেন তোমার, ভাবী? জয় আর হামজা ভাই কই? ওরা কি আজকের দিনটাও স্বাভাবিক পালন করতে পারতো না? " রেগে উঠল তুলি।

রিমি যান্ত্রিক স্বরে জানায়, "রাস্তায় গাড়িতে হামলা হয়েছিল। জয়কে বোধহয় আপনার ভাই রাজধানীতে নিয়ে গেছে।আঁৎকে ওঠে তুলি। মুখটা বিবর্ণ হয়ে যায়। দরজার বাইরে

ধপ করে বসে পড়ে তরু। মৃত ঝরনার মতো ঝিরঝির করে গড়িয়ে থুতনি ছোঁয় নোনাজল। শাহানা জানতে পেরে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে হামজার জন্য। তার ভয় হয়, ঢাকা যেতে যেতে আবার যদি হামলা হয়?

লোকের আনাগোনা কমলো রাত এগারোটার দিকে। তোড়জোড় কমে গেল। ঠিক খবর হয়ে গেছে, বিয়ের গাড়িতে হামলা হয়েছে। পুলিশ এসেছিল। হুমায়ুন পাটোয়ারী সামলে নিয়েছেন।অন্তূ ঘরটা দেখল দৃষ্টি ঘুরিয়ে। বেড-সাইড টিবিলের ওপর কাঁচের বৌল ভর্তি কাজুবাদাম রাখা। তার পাশে ছোট্ট একটা হিপফ্লাস্ক পড়ে আছে। অন্তূ কর্ক খুলে

শুঁকলো। মদের বিশ্রী গন্ধ, তবে তরল নেই। হলুদ একটা স্মাইলি হ্যান্ড প্রেস বল পাওয়া গেল ড্রয়ারে। এটা ব্যবহার করা হয় মেজাজ ঠান্ডা রাখতে। মানসিক বিশেষজ্ঞরা এটাকে হাতের মুঠোয় রেখে প্রেস করার পরামর্শ দেন মেজাজ শান্ত রাখতে। ড্রয়ারে ছোট-বড় ছুরি অনেকগুলো। বুলেট-কেস পড়ে আছে। অনেকগুলো সিগারেটের বাক্স, দেয়াশলাই, লাইটার। কাগজের মোড়কে বিভিন্ন রকম বড়ি পেল অন্তূ। দুটো খালি সিরিঞ্জ। স্লিপিং ড্রাগের বলেই মনে হলো।ভারি গহনা ও শাড়ি খুলে সুটকেস থেকে একটা সাদা লম্বা জামা বের করে নিলো। বাথরুমে এগোনোর পথে গয়না

তুলে রাখার জন্য আলমারি খুলল। সারি সারি শার্ট, পাঞ্জাবী, টি-শার্ট, প্যান্ট ঝুলছে। দুধ-সাদা থানের মতো লুঙ্গি ভাঁজ করে রাখা। নিচের তাকে পারফিউমের কৌটো, বেশ কয়েকটা ঘড়ির বক্স সাজিয়ে রাখা। অন্তূ অবাক হয়ে দেখল, একটা দুমড়ে যাওয়া আধখাওয়া সিগারেট। অন্তূ থমকে দাঁড়িয়ে থাকে। জয়ের সাথে প্রথম সাক্ষাতের কথা মনে পড়ে। এই সিগারেটের টুকরো পায়ে পিষে ফেলার মাঝ দিয়ে জয় নামক অভিশাপের আগমন হয়েছিল তার জীবনে।

[অবরুদ্ধ নিশীথে ঢুকলাম বলা চলে। এতদিন শুধুই ভংচং চলেছে। পটভূমি, পেক্ষাপট অথবা

মুখবন্ধ চলছিল। আস্তে আস্তে এখন মূল অবরুদ্ধ নিশীথের পথে এগিয়ে যাব।

কথা হলো, এটা রাজনৈতিক উপন্যাস/কাহিনি। কেউ যদি এটাকে সুশ্রী পাঞ্জাবী পরিহিত জনদরদী নেতা এবং বীরবল তরুণ রাজনীতিবিদের গল্প ভেবে পড়েন, তাদের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। রাজনৈতিক কাহিনি বলতে রাজনীতির সাথে জড়িত একজন মানুষের কাহিনি বুঝিনা আমি। আসলে তা বোঝায়ও না। রাজনৈতিক উপাখ্যান মানে হলো, ঘাত-প্রতিঘাত, সংঘাত, বিদ্বেষ, কিছু মতবাদ, প্রতিহিংসা, জনগণের অধিকার, মানবাধিকার বিপর্যয় ইত্যাদি, বহুত

কিছু। ওসব আমি তুলে ধরার সাধ্য রাখিনা।
তবে...
এখানে আমার মতামত বা উপস্থাপনার সাথে অনেকের মত মিলবে না। হয়ত বিতর্কিত চঞ্চলতা তৈরি হবে। সেসব প্রস্তুতিসহ অবরুদ্ধ নিশীথের সাথে চলার অনুরোধ রইল।নবমদিন অন্তূর পাটোয়ারী বাড়িতে।
সারাদিন বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা, ঘুরে ফিরে জয়ের ঘরটা দেখা, রান্নাঘরে গিয়ে রিমির পাশে দাঁড়িয়ে থেকে আবার রুমে আসা।
সকালে হুমায়ুন পাটোয়ারী ডেকে বললেন, "আরমিণ, আম্মা!" সুমধুর ডাক।

অন্তূ কাছে গেলে সহস্যে বললেন, “মামা শ্বশুরকে এক কাপ চা দিতে পারো?” অন্তূ রান্নাঘরে যেতে যেতে ভাবে, “আসল শ্বশুরের খবর নাই, মামা শ্বশুরের ঘুম নাই, তার আবার চা চাই।” বাংলার সব ঘরে চা এর চলন নেই নিয়ম করে। উচ্চবিত্তরা এসব মানে।পাটোয়ারী সাহেব ভালো লোক। ব্যবহার, কথাবার্তা সব আন্তরিক। অন্তূর উনাকে ভালোই লেগেছে। কিন্তু শাহানা অন্তূকে সহ্য করতে পারছেন না। অন্তূ বাড়িতে পা না-ই রাখতে বাড়িতে র-ক্তের ছাপ লেগেছে। রিমির হাতের কব্জি বয়ে জয়ের রক্ত এসেছিল সেদিন, জয় আসেনি।

দুই ভাই রাজধানীতে পড়ে আছে। কল করলেও হামজা কিছু বলেনা বিশেষ। বলে, “সব ঠিক আছে। জলদি দিনাজপুর ফিরব।” জয়ের অবস্থা কিছুই বলেনা। সেসবের জন্য তার অন্তূকে দায়ী মনেহয় শাহানার। আগামীকাল থেকে দু’দিন হরতাল। বহুদিন থেমেছিল এইসব অবরোধ। আবার শুরু হলো কীসে, কে জানে! ওরা আসতে যে আরও কয়েকটা দিন লাগবে, এটা বোঝা যাচ্ছে। শাহানার শরীরে কোনো উন্নতি নেই। সে সারাদিন পেটের ব্যথায় কাঁতরায়। কথা বলার লোক নেই তার। অন্তূ গিয়ে বসেছিল। দু চার কথা শুনিয়ে রুম থেকে বেরোতে বলেছেন।

বিকেল বেলা তুলির রুমে ঢুকতেই ফিডার রেখে দৌড়ে এসে ঝেপে পড়ল কোয়েল, “আরিণ! চলো চক্কেত কিনে আনি। জয়টা আসছেনা। তুমি ওর বউ, তুমি চলো।”

অন্তূ কানে গলিত সিসার মতো ঢোকে ‘জয়ের বউ’ কথাটা। সে হাসে, “পরে যাব, আম্মা। চলুন, এখন দুধটুকু শেষ করুন। নয়ত চকলেট কিনে দেব না।”

অন্তূ বসে থাকে কিছুক্ষণ। পরে দ্বিধা ভেঙে জিজ্ঞেস করে, “দুলাভাইকে তো দেখলাম না আসতে! মেয়েকে দেখতে আসেনা? আপনি কি এখানেই থাকছেন?

-“এত দ্বিধা করছো কেন? সৌজন্যের কিছু নেই। সরাসরিই প্রশ্ন করো, যা মনে আছে।”
হাসল তুলি।
-“কী হয়েছে আপনার দুলাভাইয়ের সাথে?
”তুলির মনে হয়, জয়ের বউটা অন্তর্যামী। নতুন এ বাড়িতে এসে শুধু সবার চাল-চলনে অন্তূ যেসব সত্যগুলো বুঝে গেছে, তা সাধারণ চিন্তার মেয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। তুলি করুণ হাসে, “এতগুলো দিন এসে রয়েছি। এ বাড়ির কেউ-ই জিজ্ঞেস করেনি একবারও। তুমি কেন করছো?”
-“আমি এ বাড়ির কেউ নই।”

তুলি চেয়ে থাকে অন্তূর মুখের দিকে। চোখে-মুখে অনেককিছু, কিন্তু সেসব নীরব। চোখ যেসব কথা বলে এই মেয়ের, তা বোঝা যায়না। শুধু বোঝা যায়, বহু কথাই বলে যায় নিঃশব্দে।

ওড়নাটা মাথায় পরে শাড়ির আঁচলের মতো করে। কপাল অবধি পড়ে থাকে। চলনে একটা অভিজাত্য আছে। তুলির খুব পছন্দ হয়েছে জয়ের বউকে। এখন সে বুঝতে পারে, যা তা ধরে আনেনি, জয়।অন্তূ নামাজ শেষ করতেই ঘড়িতে—১১:৪৩।

বাড়িতে খাওয়াদাওয়ার কোনো ঠিক নেই এদের। কেউ অসুস্থ, কেউ বা বিষণ্ন, কেউ

ঘুমন্ত। অন্তূ নিজেই খাবার বেড়ে নিয়ে খেতে বসল। খানিক পরে হুমায়ুন পাটোয়ারী এসে বসে বললেন, "খাবার দে তো, আম্মা! কেউ খাক না খাক, আমি তুই খেয়ে বাঁচি।"

অন্তূ খেতে খেতে জিজ্ঞেস করে, "আপনার হাই-প্রেশার আছে, মামা?"

-"না। কিন্তু অ্যাজমার ভাব আছে।"

-"তাহলে মাংস খাবেন না। ওটা আমি আমার জন্য বের করেছি। আপনি ডাল দিয়ে খেয়ে নিন। আমি তরুকে ডেকে আনছি।"অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন হুমায়ুন সাহেব। সিরিয়াস, গম্ভীর, আবার কেমন অদ্ভুত মেয়েটা বাড়িটাকে দুই বাহুতে আঁকড়ে ধরেছে নাকি

নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

তরুকে রুমে না পেয়ে ছাদের দিকে পা বাড়াল অন্তূ। সে ওখানেই বেশি কাটায় আজকাল। একা একা, নির্জনে। অন্তূর দিকে তাকায় না। অন্তূর এটাও বোঝা হয়ে গেছে, তার কাছে সর্বোচ্চ ঘৃণ্য পুরুষটারও একটা বিরহিনী আছে! আশ্চর্য হলেও আশ্চর্য নয়। কারণ মানুষের মন বড় বিচিত্র। তরুর কাছে হয়ত জয়কে ভালোবাসার কারণ আছে!

অর্ধেক সিঁড়ি উঠতেই রিমির চিৎকারে বাড়ি কেঁপে উঠল। অন্তূ পিছু ঘুরতেই ওর আগে তরু নেমে আসে পাশ কাটিয়ে। ধাক্কায় অন্তূ

পড়ে যেতে নিলে তরু বাহু চেপে ধরে গম্ভীর হয়ে বলল, “এত নড়বড়ে হলে চলবেনা। সিড়িঘরের দরজা আঁটকে দ্রুত নেমে এসো।”এবার সকলে শুনতে পায়, সজোরে ঠাস করে কাঁচ ফাটার আওয়াজ। বেরিয়ে আসে রিমি, তার বাহুর ওপরে কামিজের হাতা রক্তে ভেজা। কাঁচের আঘাত পেয়েছে। অন্তূ ভেতরে ঢুকে দেখে, রিমির ঘরের জানালার কাঁচে তিনটে ছিদ্র। পাথর ছড়িয়ে আছে মেঝেতে। অন্তূ থাকা অবস্থায় আরও দুটো পাথর এসে অন্য জানালার কাঁচ ভেঙে দেয়ালে ছিটকে পড়ে। নিচে যেন বিক্ষোভ শুরু হয়েছে এত রাতে। দলে দলে পদচারণার আওয়াজ বাড়ির

চারপাশে টহলের মতো ঘুরছে। অন্তূ বেরিয়ে আসে দ্রুত। রিমি সাবধান করে, “আরমিণ, এখানেই দাঁড়ান। ঘরে যাবেন না। জয় ভাইয়ার ঘরে হামলা সবসময় আগে হয়।”দরজায় করাঘাত পড়লে খুলে দেয় অন্তূ। কবীর অন্তূকে সালাম দেয় কপালে হাত ইশারা করে। হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে ঢোকে। রিমিকে বলে, “রাহাত মরে গেছে, ভাবী। ক্লাবঘরে আগুন জ্বলছে। সব শেষ। ক্লাবের সব শেষ। বিরোধী দলের শুয়োরের বাচ্চারা ক্লাবঘর জ্বালিয়ে দিয়ছে।”
রিমি চেয়ারে বসে পড়ে শ্বশুরকে বলে, “আব্বু! আপনার ছেলেকে কল করুন তো।

এই সময় বাড়ির লোকগুলোকে মারবে সে? জয় ভাইয়ার চিকিৎসা বাড়িতে হবে। জেলায় ফিরতে বলুন। আমি আর এসব নিতে পারছি না। আমি কিন্তু ও বাড়িতে চলে যাব।''

তুলি বলল, "শান্ত হও, ভাবী। আব্বু আপনি নিচে যান। গেইট খোলার দরকার নেই। এসব করছে ওরা গেইট খেলানোর জন্য। নিচে যান। মেইন ফটকে লোক দাঁড় করান।''

হুমায়ুন সাহেব বললেন, "কবীর? নিচে কে কে আছে রে?''-"সবাই আছে, মামা। আপনি বললে একশান নেবে।''

-"দরকার নেই। দুই ভাই জেলায় নেই। এখন একশান নেবার কিছু নেই। ওর ফিরুক, যা করার করবে। চল।"

তুলি তরুর হাতে কোয়েলকে দিয়ে পেছনের বারান্দায় যায়। খানিক বাদে ফিরে এসে রিমির পাশে বসে বলে, "পেছনের জঙ্গলে দলে দলে ঢুকেছে সব। হরতাল ডেকেও একটা রাত সহ্য হয়নি হারামজাদাগুলোর! আবার ক্ষমতা চায়? গদিতে বসলে এইসবই করে বেড়াবে!"অন্তূ চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখছিল। সবাই যেন পেশাগত এসব ব্যাপারে। খুব অভ্যস্ত লাগছিল সকলকে। এবার বলে উঠল, "বিএনপির কথা বলছেন? আওয়ামীলীগই বা

গদিতে বসে কী শান্তি প্রতিষ্ঠা করে ফেলল? মোটকথা, গদিতে যেই থাকুক, খেলা একই রঙের দেখাবে। দলের লোকে কিছুই না। যা যায় সব তো জনগণের! ওরা তো শুধু নিজেদের মধ্যে ধরাধরি খেলে বিনোদন নেয় জীবনের!"

অনেকক্ষণ আর কেউ কথা বলল না। বারবার সবাই অন্তূর দিকে তাকাচ্ছিল। অন্তূ সযত্নে একটু স্যাভলন মাখিয়ে রিমির হাতে একটা কাপড় বেঁধে দিলো। রিমি জিদ ধরে বলে, "কাল সকালে যদি এ বাড়ি না ছেড়েছি, আমার জিহ্বা কাটা পড়ুক। ওই লোক আসুক বাড়িতে। না নিজের জীবনের গ্যারান্টি

রেখেছে, না আমার। আমার বাপ চাচা রাজনীতি করেনি? এমন কখনও বাড়ির লোক নির্যাতন সঁয়নি। কারণ ওদের এ বাড়ির লোকদের মতো ক্ষমতার লালসা ছিল না। রাজনীতি বহুলোকে করে, এদের মতো জান হাতে করে মাঠে নামা রাজনীতিবিদের মুখে আগুন দেই আমি।'' রাগে কটমট করে ওঠে রিমি।কল লাগালো হামজাকে, ‘‘আপনি আসবেন? নাকি আমি বাড়ি ছাড়ব? কী করছেন কোথায়? বাড়ির নিরাপত্তা দিতে পারেন না, কীসের নেতাগিরি দেখান? বাড়িতে এরকম মরতে রেখে কোথায় মরতে গেছেন নিজে?''

-“শান্ত হও তুমি। আজ রাতে রওনা দেয়া হলোনা। নিচে এখন দেখো হাঙ্গামা থেমেছে। পুলিশ গেছে, ছেলেরা এসে জমেছে। ওরা সারারাত থাকবে ওখানেই। আর কিছু হবেনা। শান্ত হও, আসছি আমি। জয়কে চাইলেও হাসপাতালে রাখার উপায় নেই। ও তিনদিন আগে হাসপাতাল ছেড়েছে জ্ঞান ফিরতেই। আমি গাড়িতে, পরে কথা বলছি।”

-“ফিরবেন কবে?” গর্জে উঠল রিমি।

-“কাল রওনা দেব। বললাম তো, আর কিছু হবেনা। খেয়ে নাও। ভেতরের ঘরে শুতে যাও। ঘরে থাকার দরকার নেই।আসলেই বাইরের গেটের ওপর ধুমধাম আঘাত

কমেছে। পাথর ছোঁড়াছুঁড়ি বন্ধ হয়েছে। অনেকের সমস্বরের আলোচনার গোঙানি ভেসে আসছে। অন্তূ নিজের ঘরে এসে বারান্দায় দাঁড়াল। জয়ের ঘর ডান পাশে। পেছন থেকে, সামনে থেকে সমান। বেলকনিতে দাঁড়িয়ে রাস্তায় ভিড় দেখা যায়। পোলের লাইট বোধহয় ভেঙে ফেলেছে ওরা। অন্ধকারে জটলা বাঁধা লোকজন। আগামী দু'দিনের হরতালে বাড়ি ফেরাও মুশকিল হবে জয়েদের। অবশ্য ওদের জন্য মুশকিলের কিছু নেই। একটা কথা খুব খঁচখঁচ করছিল, জয় যদি তিনদিনে চেতনা ফিরে হাসপাতাল ছাড়ার শক্তি পায়, তাহলে তো ঢাকা নেবার প্রয়োজন

ছিল না। ঢাকাতে নিশ্চয়ই অন্যকাজে গেছে দুইভাই! আবার হতে পারে, জয়ের শরীরে ব্যথাটাই কম!ক্লাবঘর পুরোটা পুড়ে যায়নি। আবাসিক যে বিল্ডিংটা ছিল, ওটার ভেতরটা ঠিক আছে টুকটাক। বাইরের দেয়ালে কালি পড়েছে।

জয় ফিরল তারও সপ্তাহখানেক পর। সকলে স্বাভাবিক নিলেও অন্তূ অবাক হয়েছিল। এখনও মাথায় ব্যান্ডেজ, হাতে ব্যান্ডেজ। চোখ-মুখে অসুস্থতা স্পষ্ট। অথচ জয় দিব্যি হেঁটে ভেতরে ঢুকেছিল। কাউকে ছুঁতে দেয়নি নিজেকে। আঘাত নেহাত কম ছিল না। হামজা পরিস্থিতি সামলে নিতে পটু। মিথ্যা

বলেছিল। এতদিনের চিকিৎসার সাথে সাথে কিছু কাজ করেও ফিরেছে।বালিশে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে বসা ছিল জয়। তখন রাত সাড়ে এগারোটা। পরনে ঘিয়ে রঙা প্রকাণ্ড শাল জড়ানো। সকলে ভিড় করে আছে জয়কে। হামজা বিছানার ওপর জয়ের পায়ের কাছে ক্লান্ত ভঙ্গিতে টানটান হয়ে শোয়া। জয়ের মুখ অসম্ভব গম্ভীর। চোখে-মুখের ভাব গাঢ়। শুধু মামিকে জিজ্ঞেস করল, "শরীর কেমন?"

শাহানার ব্যথা অসহ্য পর্যায়ে চলে গেছে। জরায়ুতে ঘা তার। এই সংকটের মাঝে অপারেশনের সুযোগ নেই বললেই চলে।

হুমায়ুন সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, “বিএনপি হঠাৎ ক্ষেপেছে কেন আবার?”

হামজা বলল, “ওরা ক্ষেপে ছিল না কবে? ক্ষমতা হারানোর পর থেকেই ক্ষেপে আছে। এবারের নির্বাচনের পর মাঝখানে কিছুদিন হতাশা পালন করেছে, তাই মনে হয়েছে স্বাভাবিক হয়ে গেছে সবকিছু। সংসদ নির্বাচনের বছর পূর্তি হবে। ওদের জ্বলন আবার বেড়েছে। ঢাকার পরিস্থিতি ভয়াবহ। ”-“সেদিনের হামলা ওরাই করেছিল?”

-“না। আবার হ্যাঁ-ও। বিএনপির দল ভারী হয়েছে, বুঝতে পারছ না? ক্ষমতায় এসেছে

একদল। আর আসেনি বহুদল। ওই বহুদল এখন ধীরে ধীরে আর-এক দল হচ্ছে।''

-"মাজহার নাকি তোর সাথে কথা বলতে চায়।''

-"কথা নেই আমার কোনো। ও শালা ধান্দাবাজ। ওর বাপের অফিসে কাল কয়েকটা জঙ্গি ঢুকেছিল, এখন হাত মেলাতে চাইবেই। না মেলালে আবার নতুন ফন্দি আঁটবে আমাকে বাঁশ দেবার।''

-"রাস্তার কাজ থেমে আছে। কনট্র্যাক্টর এসে ঘুরে গেছে কয়েক দফা।''

-"ওদের তো ওলিফলি বেঁধে গেছে। রাস্তার কী বাল হয়েছে? কয়েকদিন আগেও প্রাইমারী

স্কুলের সম্মেলনে নতুন বিল্ডিং মঞ্জুর করা হলো। ভরে না জনগণের? এই পরিস্থিতিতে রাস্তার কাজ হয়? কয়েকটাকে বোম মেরে উড়িয়ে দিয়ে গেলে তবে হয়ত সুখে থাকার চিন্তা দূর হবে জনগণের!''

আর কেউ কথা বলল না। শান্ত হামজার এই কথাগুলোই আগুনের মতো গরম। সহজে না রাগা মানুষটার সামান্য একটু চেতে যাওয়াও অনেক। রিমি বেরিয়ে গেল ভারী পা ফেলে। জয় চুপচাপ খাটের সাথে হেলান দিয়ে চোখ বুজে ছিল।অন্তূ গরম পানি নিয়ে ঘরে ঢুকল। হামজা বলল, "পেসক্রিপশনটা আমার কাছে

দাও। বুঝিয়ে দিচ্ছি। এন্টিবায়োটিক দিয়েছে। সময়মতো খাওয়াবে।”

অন্তূ কাগজ এগিয়ে দিয়ে দাঁড়াল। জয় চোখ খুলে তাকায়। আটসাঁটো জামা যদিও পরেনি অন্তূ, তবুও শরীর মাপা হয়ে গেল ওর চোখ দিয়েই। অভিজ্ঞ চোখদুটোর একটুও অসুবিধা হলোনা নারী শরীরের ভাঁজগুলো কাপড়ের ওপর দিয়ে পরিমাপ করে নিতে। তাতেই নিঃশ্বাস ভারী হলো। এদিক-ওদিক তাকালো বারবার।

অন্তূ ওড়নাটা শাড়ির আঁচলের মতো মাথায় দিয়েছে। আগের চেয়ে যেন ভিন্ন দেখতে লাগছে। এটাই বোধহয় বিয়ের জাদু! হাতে,

গায়ে কোনো ধরণের অলংকার না থাকা সত্ত্বেও বউ বউ লাগছিল। জয়ের বুক ওঠানামা করে। র-ক্তে তেজ বাড়ে। অধৈর্য্য হয়ে উঠল এক মুহুর্তে। রাশভারী গলায় বলে উঠল, "মামা, বের হও রুম থেকে।"

সকলে একে একে বেরিয়ে যায়। হামজা গম্ভীর হয়ে বলল, "ডাক্তার তোকে উত্তেজিত হতে নিষেধ করছে। নতুন রক্ত দেয়া হয়েছে শরীরে।"জয় গোঁয়ারের মতো বলল, "বাইরে যাও।"

অন্তূ ওষুধ খুলছিল। অস্বস্তিতে হাত-পা অসাড় হয়ে আসে। ইচ্ছে করছিল, ছুট্টে পালিয়ে যেতে এই সীমানা যেতে। ঘৃণ্য এই লোকটার

সাথে একঘরে কী করে থাকবে, তা ভাবার শক্তিটুকুও ভেতরে নেই। তার ওপর বেলেহাজ লোকেরা খুব বিপজ্জনক। অন্তূর র-ক্ত জমাট বেঁধে আসে যেন। জয় আদেশ করে, "দরজা আঁটকে দিয়ে এসো।" ভালোভাবেই ওষুধগুলো খেলো আস্তে আস্তে। অন্তূর পা দুটো যেন চাকা হয়ে গেছে। একা একাই ছুটতে চাইছে। আড়ষ্ঠতায় শরীরটা ভার হয়ে উঠছিল, ঠিক যেমন ভূতের ভয়ে মানুষ ভার হয়ে ওঠে। হেলান দিয়ে বসে আছে জয়। শার্টের বোধহয় নিচের দুটো বোতাম লাগানো। ওপরের খোলা বোতামেল মাঝ দিয়ে পশমে ভরা বুকে নজর যেতেই গা

ঝিমঝিম করে ওঠে অন্তূর। আল্লাহকে ডেকে উঠল, পানাহ চেয়ে উঠল ভেতরটা। মিনতি করে উঠল যেন, মুক্তি চায়।জয় ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বড় বড় শ্বাস নিচ্ছিল। শরীর ঘেমেছে অল্প। অন্তূ উঠে যেতে উদ্যত হতেই বলল, “পানি দাও। আরেকটু পানি খাবো। ওষুধ আঁটকে আছে গলায়।”

অন্তূ গ্লাস এগোতেই জয় থাবা দিয়ে খপ করে ধরে হাতের কব্জি। অন্তূর হাতের শিথিলতায় ঝনঝনিয়ে গ্লাসটা পড়ে ভেঙে যায় মেঝেতে। ঝাঁকি মেরে ওঠে অন্তূর দেহটা। হাতটা মুচড়ায় জয়ের মুঠোর মাঝে। মুখটা শক্ত হয়ে ওঠে অন্তূর। তীক্ষ্ণ চোখে তাকায় জয়ের

দিকে। জয় শীতল চোখে চেয়ে থেকে জিজ্ঞেস করে, "হাত মুচড়াচ্ছো কেন, ঘরওয়ালি? এতগুলো দিনে একা শুতে খারাপ লেগেছিল, হ্যাঁ?"চোখদুটো হেসে ওঠে জয়ের। সেই হাসি, সেই হাসি জয়ের। ভ্র-টা নাচায় নিজস্ব ভঙ্গিতে। একটানে অন্তূকে বিছানায় ফেলে ব্যান্ডেজ জড়ানো হাতেই ওড়নাটা হিঁচড়ে খুলে ফেলে। হাতের ক্ষততে বোধহয় টান লাগতেই মুখ কুঁচকায়। মাথার ব্যান্ডেজর ওপর রক্তের তরল দেখা দেয়। কারণটা বোঝা যায়না। প্রথমে একটা চুমু ঠিক কণ্ঠনালির ওপর খেয়ে মুখ তুলে আস্তে করে বলে, "মোহরানা বাকি রইল। পরে শোধ করব সেসব।"সে-রাতে

জয়কে খু-খার জঙলির খাদকের মতো লেগেছিল। অন্তূর চোখের আর্তনাদ, হাতের প্রতিরোধে জয় বোধহয় শক্তি পাচ্ছিল আরও। ধীরে ধীরে জয় যত উত্তাল হলো, ওর কপালের ব্যান্ডেজে তাজা রক্তের দাগ গাঢ় হচ্ছিল।

অন্তূর কান্না পেয়েছিল, কতকিছু ভাবনা এসেছিল। কিন্তু সে কাঁদেনি, অন্তত জয়ের সামনে না। একদিন এরকম কিছুরই আশঙ্কাকে জনগণ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে কত কী করে ফেলছে! এই পর্যন্ত এনে ফেলেছে ওকে। অথচ আজ আসলেই তেমন কিছু হচ্ছে। জয় নামক অভিশাপ আজ অন্তূকে

ছুঁয়ে দিচ্ছে, তাও আবার দলিল আছে হালালের। কিন্তু কেউ আজ ধরতে আসছে না, বদনাম রটতে আসছে না। আচ্ছা আজ বলাৎকার হচ্ছে না? অন্তূর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে ছোঁয়া হচ্ছে। ওহ! আজ তো জয়ের কাছে হালাল সার্টিফিকেট আছে।জয় শুয়ে পড়ার পর অন্তূ বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। তার শরীরে তখন জয়ের বিশাল শালটা জড়ানো। এই বারান্দা দিয়ে বাঁয়ে তাকালে বাড়ির সামনের রাস্তা দেখা যায়। আর ডানে বাড়ির পিছনের পতিত জায়গা। বেশ কিছুক্ষণ আকাশের দিকে চেয়ে রইল ওভাবেই। আব্বুর কথা মনে পড়লে এখন আর কান্না

পায়না। কলিজাটা চিড় ধরে, তবে ফোট ফাটে না। আজ ফাটল। ঝরঝর করে অশ্রু গড়ালো চোখ দিয়ে। নিজেকে খুব অপবিত্র লাগছিল। খুব গভীরভাবে লেগে আছে জয় আমিরের ছোঁয়া গোটা দেহে।

দূরে কোথাও বাচ্চা কাঁদছে। কেউ কাঁদছে। অন্তূ চমকালো। এত রাতে আবার কে কাঁদছে? করুণ সেই স্বর। কোথা থেকে আসছে কান্নার আওয়াজ? গা-টা ছমছম করে ওঠে। ঘড়িতে তখন রাত চারটা। আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল অন্তূ। ভেতর থেকে জড়ানো গলায় জয় ডাকে, "ঘরওয়ালি? ভেতরে এসো। এত রাতে মেয়ে মানুষ বাইরে

দাঁড়ানো ঠিক না।''অন্তূ জবাব দেয়, "অভিশাপ তো ভেতরে শুয়ে আছে, জয় আমির। বাইরেটাই বরং আমার জন্য নিরাপদ।''

চোখ বুজেই ঠোঁট এলিয়ে হাসে জয়, "ভুল বলোনি। তবে এটা আমার বিশেষত্ব।''ব্যান্ডেজ থাকা অবস্থায় গোসলে সমস্যা হচ্ছিল জয়ের। ক'দিন ওভাবেই গোসল করেছে। গোসল না করে থাকতে পারেনা কিছুতেই। একদিন বেশি বিরক্ত হয়ে একটানে ব্যান্ডেজ খুলে ফেলে দেওয়ার সাথে সাথে র-ক্ত বের হয়ে এলো ক্ষত থেকে। ওপরের চটা উঠে গেল কাপড়ের সাথে। অভ্যাসবশত চিৎকার করে ডাকল, "তরুউউউ...!'' পরে বিরবির করল,

“যাহ! শালা, ভুল বাড়ির কলিংবেল চেপে ফেলেছি। বউয়ের হাতে ঝাটার আদর খাওয়ার মোক্ষম সুযোগ। এমনিতেই আমার যে খান্নাস বউ!” ভুল শুধরে অন্তূকে ডাকল। অন্তূ আসবেনা, সেটা জানা কথা। জয়ের ডাক শুনে সে আরও বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অবসরে বসে থাকলে, কাজ তৈরি করে নিয়ে সেই কাজে মন দেয়। সেদিন রাতে ওষুধ দেবার জন্য ডাকল জয়। অন্তূ কোয়েলের সাথে খেলছিল। কোয়েলকে রেখে শো-কেসের সকল শোপিস নামিয়ে আবার সেগুলো ঝেরে পরিষ্কার করতে শুরু করল। জয়কে ওষুধ দিয়েছে হামজা, পানি গরম করে দিয়েছে

রিমি।সকাল সকাল ভার্সিটি গিয়ে ঘুরে এসেছে একবার। কপালে মেডিটেপ লাগানো। এরপর ফিরে কোনোমতো খেয়ে আবার ক্লাবে গেছে। ক্লাবের মেরামত চলছে। হরতালে হাইওয়ে বন্ধ প্রায়। মোড়ের ওপর চায়ের দোকানে বসে দু-কাপ চা খেয়ে, একটা কড়া জর্দা মেশানো পান চিবোতে চিবোতে বাড়িতে ঢুকলো। পানের পিক ফেলতে গিয়ে তা লেগে গেছে সাদা লুঙ্গিতে। ওয়ার্কশপে কাজ চলছে। সেখানে ঢুকে আবোল-তাবোল কিছুক্ষণ ঠুকঠাক কাজ করল। লোহার দন্ড বানানো হচ্ছিল। আগুন থেকে গলিত লোহার পিন্ড উঠতেই তাতে চোখ আঁটকালো ওর। টকটকে

লাল, গলিত আগুন যেন। দৌড়ে গিয়ে হাতুর তুলে পেটাতে আরম্ভ করল সেটাকে। বেশ মজার কাজ শীত শীত এখনও আছেই প্রকৃতিতে। তবুও ঘেমে গা ভিজে উঠল। কাঁচা ফুলগুলো শুকিয়ে মড়মড়ে হয়ে গেছে। হামজা পৌরসভর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাবার সময় অন্তূ ডাকে, "মেয়র সাহেব!"হামজা থামে। পাঞ্জাবীর হাত গুটিয়ে বলল, "কিছু বলবে?"

-"ফুলগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। আমি খুলতে পারছি না। শক্ত করে সেট করা হয়েছে ওগুলো। একটা লোক পাঠাবেন, ওগুলো খুলে দিয়ে যাবে।"

হামজা বেরিয়ে যেতেই শাহানা বললেন, “এইভাবে কথা বলতে শিখছো?”

-“কীভাবে?”

-“বড়ভাই ডাকা যায় না? ‘মেয়র সাহেব’ কী? ”-“বড়ভাই একটা ছিল। সেটাকেই ডাকা হয়নি বহুদিন। তাছাড়াও কাউকে সম্বোধন আমি আমার মনমতো করি, মামিমা। উনি মেয়র, মেয়র ডাকলে ক্ষতির কিছু নেই। ভুল বলেছি?”

ফুলগুলো যেভাবে আঁটকানো হয়েছে, বিছানার ওপর বো-মা পড়লেও তার ছিঁড়বেনা যেন। তোষক তুলতে হলো। ছেলেদুটো তোষক উচু করে তুলতেই খাটের ক্লেটের ফুটো দিয়ে কিছু

চোখে পড়ল অন্তূর। দ্রুত থামালো ছেলে দুটোকে। আদেশ করল, ক্লেটগুলো টেনে তুলে ফেলতে।খাটের ক্লেটের নিচে মেঝের ওপর সারি সারি টাকার বান্ডিল সাজানো একপাশে। এত টাকা যে কেউ একসাথে দেখেনি জীবনে। বাকিটা রিভলবার, পিস্তল, রাইফেল ইত্যাদি ধরণের অ-স্ত্র-তে সজ্জিত। অন্তূ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ক্যাটারিংয়ের ছেলেদুটো যেন জমে গেছে। জয়ের পদচারণার আওয়াজ আসে। সে গান গাইতে গাইতে ঢুকছে,

এই আছি এই নাই, হাসি গাই কষ্ট ভুলে যাই

জীবনটা সিগারেটের ছাই, ছোক দিয়ে তাকে উড়াই

কী হবে ভেবে আর, যে জীবন দম গেলে নাই...

মুখে পান থাকায় গান জড়িয়ে যাচ্ছিল কণ্ঠে। চট করে থেমে হেসে ফেলল ঘরের অবস্থা দেখে। ছেলেদুটোকে চলে যেতে আদেশ দিয়ে অন্তূর খুব কাছে পেছনে এসে ফিসফিস করে বলল, "চেনো, ওগুলো কী?"

অন্তূ ছিটকে দূরে সরে যায়। কয়েকবার মুখ চিবিয়ে থুহ করে পানের পিক ফেলল ঘরের ভেতরেই। পরে বলল,"আমি ছুঁলে ফোঁসকা পড়ে যায়, ঘরওয়ালি?"

-“ঝলসে যায়। আপনি ছুঁলে ক্ষয় হয়ে যায় যেকোনো কিছুই, তা তো জানেন!”

-“একেই বলে ঘরের বউ। কয়দিন হয়েছে, এর মধ্যে একদম মুখস্ত করে ফেলেছ আমায়, হ্যাঁ?”

-“এই টাকা কীসের?”

মুখ ঝামটি মারল, যেন মোটেই কোনো ভালো জিনিস নয়, নাক কুঁচকে নাটক করে বলল, “জাল টাকা। নজর দিলে চোখের ক্যালরি লস। লাভ নাই। পলাশের মাল সব।”অন্তূ সম্মতি জানালো, “আমিও ভাবছিলাম, বাংলাদেশে লিগ্যাল পয়সায় বড়জোর ডাল-ভাত খেয়ে বেঁচে থাকা যায়, সেটাও র-ক্ত ঘাম

করে ঝরিয়ে। কিন্তু আপনারা ভালো কোনো পজিশন না পেতেই এত ফুলে ফেঁপে উঠেছেন, সোর্সটা কী? জাল টাকার ব্যবসা! ওয়াহ! হাততালি আপনাদের জন্য। পলাশ আপনাদের পার্টনার?''

জয় বুকে হাত রেখে মাথা নত করল, যেন সে তার কর্মের বাহবা নিচ্ছে, প্রশংসায় বুক ভরে উঠেছে তার। এরপর বলল, "অথচ তোমার জন্য সেই পার্টনারের সাথেও তিড়িংবিড়িং করেছি। তবুও তোমার ভেতরে কোনো কৃতজ্ঞতা নেই। পেলাম তার বদলে থুতু। এটা কি ঠিক?''অন্তূ গর্বে বুক ফুলিয়ে বলল, "তার বদলে আমিও পেয়েছি,

অনেককিছু পেয়েছি। কী পেয়েছি, জানেন?....থাক ওতসব প্রাপ্তি খেয়ালে এলে র-ক্তে জ্বালা ধরে যায়। পাপ কাজের দুর্দমনীয় ইচ্ছেরা খুব জ্বালায় আমাকে। হাতটা আরেকটু শক্ত হোক। মুখে যতই যা বলি, হাত কিন্তু এখনও নরম রয়ে গেছে আমার।"

দাঁতকপাটি আঁটকে বলল জয়, "থুতু কেন দিয়েছিলে আমায়?"

-"প্রথম থেকে শুরু করে পলাশ আমার সাথে যা যা করেছে আপনার সামনে, আপনি বাইস্কোপ দেখছিলেন?..."

কথা কেড়ে নিলো জয়, "তুমি আশা করেছিলে আমার কাছে?"আক্রোশে মুখ লাল হয়ে ওঠে

অন্তূর, “এক মুহুর্তের জন্য আমি আপনাকে মানুষ ভাবতে চেয়েছিলাম সেদিন। নিজের স্বার্থে মানুষ কত সত্যি ভুলে যায়। আমিও ভুলে গেছিলাম, আপনি জঙলি। এরপর পরিস্থিতি যখন চরমে, তখন এসে জীবন দান করছেন...! ব্যাপারটা কেমন হলো বলুন তো, বলির পাঠাকে যত্নে লালনের মতো। ঠিক বলিনি?”

পান চিবোতে চিবোতে মুচকি হাসি ঠোঁটে রেখে মাথা নাড়ল জয়, “ঠিক বলেছ।”অন্তূ দৃঢ় চোখে তাকিয়ে শান্তভাবে বলল, “শুকরিয়া আদায় করুন, এই যে এতগুলো দিন নির্দিধায় রাতে মাতাল হয়ে ঘুমান, বন্ধ ঘরে। সেই

সুযোগে আপনার গলাটা কেটে দুইভাগ করে ফেলিনি। ওটা খুব সস্তা কাজ হয়ে যাবে। মাঝেমধ্যেই ইচ্ছে করে, তবে আপনাকে ওভাবে মারাটা খুব নিচু কাজ হবে। আপনি জানেন, আপনি থুতু পাবার কতটা যোগ্য। ইউ নো হোয়াট! একে বলে বাটারফ্লাই ইফেক্ট। সেদিন থুতু দেবার মতো ছোট্ট একটা কোএন্সিডেন্স থেকে আমি-আপনি বহুদূর পৌঁছাবো, দেখবেন। তার মূলে থাকবে এক বন্ধ রাত, এক অবরুদ্ধ নিশীথ। তার ফলে নেমে আসবে হাজারও অবরুদ্ধ নিশীথ, যার সংমিশ্রণে থাকবে একেকটা অবরুদ্ধ নিশীথ।''একদৃষ্টে চেয়ে থেকে ছোট ছোট শব্দে

হাসতে হাসতে হো হো করে হেসে উঠল জয়, "এতদিনে লাইফে এডভেঞ্চার এসেছে। সেই কবে বন্দি দশা ছেড়েছি, এরপর আর কেউ আঁটকাতে পারেনি আমায়। শালার...ঘরে মউত নিয়ে জীবনযাপনের চেয়ে বড় এডভেঞ্চার আর হয়-ই বা কী? হু দ্য ফা-কিং সে, লাইফ ইজ আগলি? ইজ দেয়ার ইজ সাচ এন এডভেঞ্চার ইন লাইফ, এক্সাক্টলি হেয়ার ইজ দ্য আলটিমেট ফান ইন লাইফ!"

অন্তূ প্রলম্বিত এক শ্বাস টেনে বলল, "এগুলো?"খুব উৎসাহিত হলো জয়, "এগুলো? চেনো না? শ্যাহ! এত ভালো হওয়া ঠিক না। ওগুলো বিশ্বের সবচেয়ে বেশি

ব্যবহৃত মাল। কালাশ'নিকাভ-এর ডিজাইন করা রাইফেল, AK-47। চালিয়ে দেখবে একটা? বের করব? আমার ওপরেই চালাও একটা, যাও, হাত শক্ত হোক.. কপালে মেরো না। পায়ে-টায়ে মেরে চর্চা করো... বের করি দাঁড়াও...''

অন্তূ চোখ বুজে গাঢ় শ্বাস ফেলল। তার কাছে এটাকে বাড়ি কম, জাহান্নাম বেশি লাগতে শুরু করেছিল এই সময়টাতে। একের পর ঘটনাগুলো খুব বিষণ্ন করে তুলছিল অন্তূকে। মানসিক ভাঙন ধরে যাচ্ছিল মাঝেমধ্যেই। জয়কে মারার আগে ওকে আবিষ্কার করার একটা অদম্য কৌতূহল ছুটে বেড়াচ্ছিল রন্ধ্রে

রন্ধে।একরাতে খেতে বসে ছোট মাছের তরকারী মুখে নিতেই মুখ চেপে ধরে উঠে যায় তুলি। বেসিন অবধি পৌঁছানোর আগেই গলগলিয়ে বমি করে ফেলে। তরু দৌড়ে গিয়ে ধরে।সেদিন জানা গেল, তুলি গর্ভবতী। আড়াইমাস চলছে। কাউকে জানায়নি। তরু যেহেতু সাথে থাকে, তরু জানতো শুধু। তুলি জানাতে দেয়নি কাউকে।

অন্তূ জিজ্ঞেস করল, ‘‘কতদিন হলো এসেছেন এখানে?’’

-‘‘দুইমাস পেরিয়ে যাচ্ছে।’’অন্তূ বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, ‘‘কী হয়েছিল, বা সমস্যা

কী, জিজ্ঞেস করলে কি অনধিকার চর্চা হয়ে যাবে?''

তুলির বোধহয় কান্না পেল। কাঁদল না। তরু কোয়েলকে নিয়ে ছাঁদে উঠে যায় কবুতর দেখাতে। তুলি বলল, "প্রেমের বিয়ে ছিল। যতদিন মেয়ে হয়নি, হামজা ভাই মেনেই নিয়েছিল না। অথচ ওর কাছে রোজ সীমান্তর যাওয়া-আসার মাঝ দিয়েই সম্পর্ক হয়েছিল আমাদের। সীমান্ত ভাবীর কাজিন। মেয়ে হবার পর যখন এ বাড়িতে আসা যাওয়া শুরু করলাম, তারপরও ভালো ছিল। কিছুদিন পর থেকে কথায় কথায় গায়ে হাত তুলতো। কোনোদিন এ বাড়িতে বলিনি। সেই সুযোগ

ছিল না। আব্বু তো বাড়ির ধার ধারেনা। সব হামজা ভাই। কিন্তু ওকে কখনও এসব বলার সাহস হয়নি। ভুল আমি করেছি, ও তো কোনোকালেই মেনে নেবেনা এসব। পরে বুঝলাম, ঝন্টু মামার নির্দেশ এসব।''-"ঝন্টু সাহেব মাজহারের বাবা না?''

-"আমার মামা শ্বশুরও। রিমি, মাজহারের বড়ফুপুর ছেলে আমার স্বামী।''

-"এরপর?''

-"আমি ভাবতাম, আমার ওপর অত্যাচার করতো যাতে আমি হামজাকে মাজহারের বিরোধিতা করা থেকে থামাই। রাজনীতিকে ঘেন্না করার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ দুটো নেই

আমার কাছে। কিন্তু র-ক্তে জড়িয়ে থাকা এই নষ্ট নীতিকে এড়িয়ে চলতে আর পারলাম কই!নির্বাচনের সময় এগিয়ে আসার সাথে সাথে তা আরও বেশি খারাপদিকে গেল। আমি যেকোনো কিছুতে বাঁধা দিতে গেলেই অমানুষিক অত্যাচার সঁয়েছি। নেশা করা, স্মাগলিং, মানুষ মারা, চাঁদাবাজি—সহ্য করতে পারতাম না আমি। আর কত? মারও খেয়েছি গা ভরে। ভালোই লাগতো, জানো? কারণ আমার তো যাওয়ার জায়গা নেই। কোথায় যাব, যেখানে আসব, এখানে সেসবের ঘাঁটি গাড়া। তবুও মেয়েকে রেখে চলে এলাম। অথচ কিছুই জানানোর রুচি হয়নি।''

-“শুধুই মারধর করতো?”-“নেশাও করে। মারাত্মক নেশা। আমি এবোর্শান করিয়ে ফেলব, আরমিণ। আমার মনেহয় আমার ছেলে হবে। বাপের ছেলেও যদি বাপের মত হয়? ওকে দুনিয়াতে আনার ইচ্ছে নেই। ওই বাপের ছেলে হয়ে ও দুনিয়াতে না আসুক। আমি বহুদূর চলে যাব এসব থেকে। আমার ভাল্লাগেনা। আই কান্ট টলারেট এনিমোর...” উত্তেজিত হয়ে ওঠে তুলি।

অন্তূ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সাধারণ মানুষের কাছে এসব বেশ অজানা। অথচ উচ্চশ্রেণীর মানুষের সমস্যাগুলোও কেমন উচ্চ উচ্চ পর্যায়ের। এসবের মাঝে আছে কী? নে-শা,

র-ক্ত, নোংরামি, বিশ্বাসঘাতকতা, অনাচার, অবিচার, লোভ, প্রতিহিংসা...! সেই বা এসব থেকে কম কীসের? এই সকল লোকদের বউদের অন্তূ আগে বেশি ঘেন্না করতো—তারা থামাতে পারেনা পুরুষদের? আজ সে নিজে কোথায়? সে কী করতে পারছে? নিজের ওপর ঘৃণা চেপে যায় অন্তূর।

বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে আবারও ভাবে বিষয়টা। রাজনৈতিকতায় ভালো কি কিছুই অবশিষ্ট নেই আর? এত হাহাকার কেন? এর সাথে জুড়ে থাকা মানুষগুলো এত নোংরা কেন? সবাই কি নোংরা? ভালো নেই কেউ? তুলির শরীরের অনেক দাগ দেখেছে অন্তূ।

সেসব দেখলেই অন্তূর মন চায়, বউকে আঘাত করা পুরুষদের কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে দিতে। পরে মনে পড়ল, তার সাথে কী হচ্ছে? সে জয়কে মেরে ফেলেছে? অন্তূ চিটমিট করে উঠল নিজের ওপর বিতৃষ্ণায়। আজকাল নিজেকে সহ্য হয়না অন্তূর। নাপাক, নির্লজ্জ, আত্মমর্যাদাহীন রাস্তার মেয়ে মনেহয়। 'মূল্যহীন পতঙ্গ' বলে মাঝেমধ্যেই ডেকে ওঠে নিজেকে।জয় বাড়িতে ঢুকে রুমে আসেনা প্রথমে। ডাইনিং স্পেস পেরিয়ে ওপারের স্টোরের দিকে যায়। বহুবার হামজা এবং হুমায়ুন সাহেবকেও যেতে দেখেছে অন্তূ। নেশা করতে যায় নিশ্চয়ই তিনজনই!

জায়গাটায় যাওয়ার রুচি আসেনি কখনও অন্তূর। এ বাড়িতে অনৈতিক কাজ হয় সেটা ধরে ফেলেছে অন্তূ। পেপার পড়ে অন্তূর কাছে তার বিশদ ব্যাখ্যা করা আমজাদ সাহেবের স্বভাব ছিল। অ-স্ত্রের ব্যবসা নাকি রাজনীতিবিদের লেওয়াজ ছাড়া স-ন্ত্রা-সরা করতে পারেনা, অন্তূ শুনেছে আব্বুর কাছে। কারণ প্রশাসন রাজনীতিবিদদের চেটে বাঁচে। প্রশাসনকে হাতে রেখে নিজেদের ধান্দা চালাতে রাজনীতিবিদের যদি অল্প কিছু ভাগ দিলেই চলে, তো স-ন্ত্রা-সরা সংসদের এই জিহ্বা বের করে শ্বাস নেওয়া কুকুরগুলোকে হাতছাড়া করবে কোন দুঃখে?এই পাটোয়ারী

বাড়িটি হলো একটা অস্ত্র সংরক্ষণাগার, জাল টাকার বাক্স, শয়তানের নিরাপদ বাসস্থান। অন্তূর দমফাটা হাসি আসে এসব ভাবলে। আরেহ! কী বুদ্ধি এদের! প্রশাসনের সাহস কী যে, কোনো পলিটিশিয়ানের বাড়িতে হানা দেয়? রেড মারে! তল্লাশি চালায়! সরষের মধ্যে ভূত! সেই সরষে দিয়ে দেশের ভূত ছাড়াতে গেলে ব্যাপারটা যেমন হওয়া উচিত, তেমনই হচ্ছে, সেভাবেই পরিচালিত হচ্ছে স্বাধীন বাংলা, জয় বাংলা। পুলিশফাঁড়িতে ড্রাগ, অস্ত্র, নারী, শিশু পাচারের কারখানা—এমন কাহিনি পুরোনো। সাথে এটাও পুরোনো, যে সাদা খানদানী পোশাকে আবৃত

জনদরদী, নেতাগোছের মানুষগুলোর শতভাগ নিরাপত্তা নিশ্চিত বাড়িগুলোও একই কাজে ব্যবহৃত হয়। অন্তূ ভুল ঠিকানায় চলে এসেছে। অথবা হতে পারে, ভুল ঠিকানাকে সঠিক করে তুলতে জানটা হারাতে হয়!

জয় মদ গেলে সোফায় বসে। এক প্যাগ করে ঢালে, গ্লাস উচিয়ে ধরে অন্তূকে বলে, "এক সিপ নেবে?"অন্তূ বলে, "আপনি অভার-ডোজ খেয়ে মরে যান, প্লিজ।"

জয় গম্ভীর হয়ে বলল, "আমি মরলে তোমার কোনো লাভ নেই।"

অন্তূ তাচ্ছিল্য করে হাসে, "লাভ!" গাঢ় চোখে তাকিয়ে বলল, "মানুষের মতো দেখতে

আপনার মতো জঙলি পশুগুলো আরও কত মানুষের অমানুষ হয়ে ওঠার কারণ হয়! দেখেছেন, কতটা নিচে নামিয়েছেন আপনি আমায়, কারও মৃত্যু কামনায়ও কী এক অদ্ভুত সুখ পাচ্ছি! দিনদিন ঠিক আপনারই মতো র-ক্তচো-ষায় পরিণত হচ্ছি।"

জয় হেসে ফেলল, "আমার মৃত্যু কামনা করার লোকের অভাব নেই। অত ভিড়ের মধ্যে তোমার নামটা নিমেষেই হারিয়ে যাবে। অন্যকিছু কামনা করো। এই যেমন ধরো, পঙ্গু হয়ে যাওয়া, কুষ্ঠোরোগে আক্রান্ত হওয়া, প্যারালাইজড হয়ে পড়ে থাকা—এসব।" দুই চুমুক গিলে আবার বলল, "আর বললেই তো

আর এখনই মরে যাওয়া যায়না! কয়দিন পর মরব। কিছু কাজ বাকি।''-"কয়দিন পর কেন?''
-"তুমি আর কয়দিন বেঁচে থাকো।''
-"আমাকে সাথে নিয়ে মরবেন?''
-"হ। নয়ত পরে যদি আবার আমি মরার পর আমার সম্পত্তি নিয়ে অন্যকারও সাথে ভেগে যাও?''
-"আপনার কোনোকিছুকেই কিছু মনেহয় না, না? অল ইজ ওয়েল, অল থিংস আর নরমাল, ফাইন!?''
জয় মাথা দুলিয়ে গানের তালে নাচার মতো চোখ বুজে হাসল, "অভিজ্ঞতা বেশি তো!

বহুতকিছু দেখেছি, বহুত কিছু ঘটেছে আমার সাথে।'' চোখ মারল অন্তূকে। এরপর হো হো করে হেসে ফেলল।

জয়ের পুরো শরীরে বিশ্রী সব দাগ আছে। গোসল করে যখন খালি গায়ে বের হয়, উন্মুক্ত দেহটা কী যে ভয়ঙ্কর লাগে দেখতে! অত ভয়ানক দাগ কীভাবে হয়েছে তা মেলাতে পারেনা অন্তূ। জিজ্ঞেস করল, "শরীরের দাগগুলো কীসের?''জয় বাচ্চাদের মতো অন্তূকে মুখ ভেঙচালো, "কীসের দাগ ওগুলো? '' বেশ ভাব নিয়ে বলল, ''ইশপেশাল ট্যাট্টু। এই ট্যাট্টুগুলো শরীরে খোদাই হবার সময় যা

লেগেছিল না! উফফ!'' রসিকতা করে উচ্চারণ করল কথাটা। ভ্রু নাচিয়ে বলল, "ভালো না?'' অন্তূ আবারও খেয়াল করে, চটা ধরা ডান ভ্রু-র চুলের ভেতরে একটা গভীর ক্ষত আছে জয়ের। কাছে না গেলে খেয়াল করা যায়না। বিয়ের পর বিষয়টা নজরে এসেছে। সেদিকে তাকিয়ে বলল, "সকালে উঠে সারাদিন আবার বহু পাপ করতে হবে আপনার! আপনার বোধহয় মাথায় চড়ে গেছে। শুয়ে পড়ুন।''জয় হাসল, "দুই-চার বোতলেও চড়বেনা। এই মদ শালাও ভীষণ ধরিবাজ। মাতাল হবার জন্য খাই, এত টাকা খরচা করে কিনি, অথচ মাতাল করেনা। তোমার মতোই। বিয়ে

করলাম, দেনমোহরবাবদ নাকি টাকা দিতে হবে, আবার বস বসে খাওয়াচ্ছি তিনবেলা, পোশাক, যাবতীয় খরচা দিচ্ছি। কোনো কামে তো আসোই না, আবার একটু কাছে গেলে কারেন্ট লাগা রোগীর মতো ঝিরঝির করে ওঠো। লস প্রজেক্ট।''

অন্তূ বিছানায় জয়ের দিকে মুখ করে শুয়ে গায়ে চাদর তুলে নিয়ে বলল, "খুন করেছেন কয়টা?

-"বেশি না।''

-"প্রথমটা কবে করেছিলেন?''জয় ঘাঁড় ম্যাসাজ করতে করতে বিরবির করল, "শালী ইন্টারভিউ নিতে বসে গেছে রাত্তিরবেলা।''

বোতল ধরে কয়েক ঢোক গিলে বলল, “উমমম....২০০1 এ সম্ভবত। বয়স তখন পনেরো বছর আমার যতদূরসম্ভব। ক্লাস টেনে ছিলাম, আমি।”

অন্তূ ভ্রু কুঁচকাল। ২০০২-এ সংসদে ছিলেন বিরোধীদল। আর উপদেষ্টা ভূমিকায় ছিল জামায়াতে ইসলামী। সেই সময় জয় কাকে খুন করেছে? পনেরো বছরে মানুষ খু-ন! আর কী কী করে রেখেছে জয় আমির!বেলা না পেরোলে ঘুম ভাঙেনা জয়ের। অন্তূ সকাল সকাল উঠে রান্নাঘরে গিয়ে দেখে রিমি আর কাজের মহিলা রান্না করছে। রিমি বলল, “আরমিণ, জয় ভাইয়ার বাগানে লেবুগাছ

আছে। কয়েকটা লেবু ছিঁড়ে এনে দিন। সাব-মার্সিবল অন করে জগগুলোও ভরে ফেলুন। মেয়র পৌরসভায় যাবে।''

ডাইনিং রুমে তরু বসে ছিল। মটরশুটি ভাঙছে একমনে অন্তূ গিয়ে কিছুটা তুলে নিয়ে বলল, "তোমার আমার ওপরে রাগ অথবা ঘেন্না, কোনটা বেশি প্রকট?''মুখ না তুলে বলল তরু, "কোনোটারই অধিকার নেই।''

-"রাগ, ঘৃণা, পছন্দ, ভালোবাসা...এসবের জন্য অধিকার লাগেনা। অধিকার অভিমান, অনুরাগ, অনুযোগ, অভিযোগে লাগে। তোমার অনুভূতি আমার ওপর অভিমান টাইপের না। ঘৃণা টাইপেরই হবে কিছু!''

তরু চোখ তুলল, “কারণ নেই কোনোটারই। তবুও তা কেন মনে হলো?”

অন্তূ অদ্ভুতভাবে হাসল, “চোখ লুকাতে খুব কাঁচা, অদক্ষ তুমি।”

তরুর চোখে এবার পানি উপচে পড়তে চায়। পানি যেন সবসময় সেখানে মজুতই থাকে। অন্তূ সামনে এলে তার বাঁধ ভাঙে। ওড়নার প্রান্তটা মাথার ওপর তুলে আঁচল হাতি ধরে বেরিয়ে যায় অন্তূ। টুপ করে একফোঁটা পানি পড়ে তরুর চোখ বেয়ে।বাগনটা বেশি বড় না। ফুলগাছ নেই। এ বাড়িতে ফুল বোধহয় কারও পছন্দ না। তিনটা লেবু পেড়ে আরেকটু এগিয়ে যেতেই একটা লোহার গেইট। অন্তূ

ভ্রু কুঁচকায়। প্রাচীরঘেরা জায়গাটায় শেষ প্রান্ত ঘেঁষে গেলেই ওয়ার্কশপের বিশাল এড়িয়ার দেয়াল। তাহলে বাড়ির পেছন দিকে এই দরজা কীসের? বাড়ির নকশাটাই অদ্ভুত। বেশ কিছুক্ষণ ঘুরেফিরে দেখেও কোনো সমাধান বা নকশা আয়ত্ত্বে এলো না। লোহার গেইটটা ধরে দু তিনটা ঝাঁকি দিয়েও লাভ হলোনা। বাইরে থেকে তালা মারা নয়। অর্থাৎ ভেতর থেকে আঁটকানো। এখানেও আবার কেউ থাকে নাকি?

আনমনে পেছন ফিরতেই থমকে দাঁড়াল অন্তূ। হামজা জিজ্ঞেস করল, "এখানে কী করছো?"

-“এত নিঃশব্দে তো বিড়ালও পা ফেলতে পারেনা, মেয়র সাহেব! তার ওপর শুকনো পাতার ওপর হেঁটে এসেছেন!”-“আরও অনেককিছুই পারি আমি। আপাতত তোমার ধারণাও সে অবধি পৌঁছায়নি।”

-“বলাবাহুল্য। অভিজ্ঞ মানুষদের কথাই আলাদা। আমার পিছু নিয়ে এসেছেন?”

-“তুমি নিজেকে খুব দক্ষ গোয়েন্দা ভাবছো?” সূক্ষ্ম হাসল হামজা।

-“উহু! কৌতূহলি হয়ে পড়েছি আপনাদের বাড়িতে এসে।”

-“কৌতূহলি বিড়ালের সামনে ফাঁদ ছাড়া অন্যকিছু থাকার সম্ভাবনা খুব কম।”

-“বিড়ালকে ফাঁদে ফেলার এমন কী দরকার?
”

-“মাছ না খেয়ে যায়।”

অন্তূ হেসে ফেলল, “আপনি কি ভয় পাচ্ছেন আমায়, মেয়র সাহেব?

-“তুমি হালকাভাবে নিচ্ছ আমায়।”

-“ছিহঃ! এতবড় ভুল আমি কখনোই করব না।”

-“এই-যে নজরদারী! এটাও তো মস্তবড় ভুল।
”

-“ভুল জীবনের চালিকাশক্তি। যে ভুল করতে ভুলে যায়, তার জীবন ওখানেই থেমে যায়। ভুলের পেছনে ছুটেই তো আমরা পরিণতিতে

পৌঁছাই।"হামজা এবং অন্তূর একটা দূর্জ্ঞেয় দৃষ্টি বিনিময় হয়। হামজা কিছুক্ষণ চুপ থেকে হেসে ফেলল, "তোমাকে বিয়ে দিয়ে এনেছিলাম কেন, বলো তো!"

-"আমাকে আটকাতে। আপনি জানতেন আমি বাইরে থাকলে, আমার ওপর নজর রাখা একটু টাফ হবে। তাই পাশের ঘরে এনে রাখলেন! ভুল করেছেন, বিশাল ভুল।"

-"ভুল জীবনের চালিকাশক্তি।" অন্তূর বলা কথাটা অন্তূকে মনে করিয়ে দিয়ে চোখ মারল হামজা।রাতের বেলা হাইওয়ে ব্রিজে দাঁড়িয়ে হামজা জয়কে বলল, "বাঘিনীর চেয়ে আহত বাঘিনী বেশি ভয়ানক হয়। কমন তবে

গুরুত্বপূর্ণ কথা। তোর বউকে নিয়ে বিপত্তি বাঁধবে দেখছি।''

হাসতে হাসতে "মেরে ফেলব?'' কথাটা এমনভাবে বলল জয়, দুজনের চোখাচোখি হওয়ায় হো হো করে গা দুলিয়ে হেসে ফেলল।

-"তুই কি প্রেমে পড়ে যাচ্ছিস?''

-"দেখতে, শুনতে ভালো। শরীরটা টানে, কিন্তু শালি খুব কড়া। প্রেম-টেম টের পাচ্ছিনা।''

-"পড়লেও বেশি পড়িস না।''-"আচ্ছা।'' পিচ করে এক খাবলা থুতু ফেলল ব্রিজের নিচে।

-"মেয়েলোকের প্রেমে পড়া আমাদের শরীরের জন্য হানিকারক।''

দুজন বেশ কিছুক্ষণ পাগলের মতো দম ছেড়ে হাসলো। থামেই না হাসি। উল্টাপাল্টা কী কথা বলে আবার হাসে। জয় প্রস্তাব দেয়, “রাস্তা ফাঁকা। চলেন, একটা দৌঁড় প্রতিযোগীতা হয়ে যাক।”

বহুদিন পর জয় ‘আপনি’ সম্বোধন করল হামজাকে। হামজাকে রেখে ঝরঝর করে ‘রেডি, 1, 2, গোও’ বলে ঝেরে দৌড় লাগায়। কিছুদূর পৌঁছে চিৎকার করে বলে, “আমি জিতে গেছি। তোমার শরীর ভারী হয়ে যাচ্ছে। বউয়ের সঙ্গ কমাতে হবে।”হামজা তেড়ে যায় জয়কে মারতে। জয় দৌড়াচ্ছে, বহুদূর দৌড়ে যায় দুজন। সামনে বিস্তীর্ণ মাঠ। অল্প কুয়াশা।

দুজন থেমে দুটো সিগারেট জ্বালায়। জয় গান ধরে,

ভেবে দেখেছ কি..তারারাও যত আলোকবর্ষ দূরে;

তারও দূরে, তুমি আর আমি ক্রমে যাই সরে সরে...এক সকালে দোতলার দরজায় কলিং বেলে চাপ পড়ছিল। অন্তূ দরজা খুলল। ডাকপিয়ন দাঁড়িয়ে আছে। তুলির নামে পত্র এসেছে। রেজিস্টার করা পত্র। তুলি তখনও কোয়েলকে নিয়ে ঘুমাচ্ছিল। অন্তূ চিঠিটা গ্রহন করল তবে খুলল না। স্বভাব নেই তার এরকম।দুপুর গড়িয়ে যাবার পর অন্তূর মনে পড়ল, তুলিকে চিঠি দেবার কথা। তুলি চিঠি

খুলে ধুম ধরে বসে রয়। চোখে-মুখে প্রতিক্রিয়া নেই। অভিব্যক্তিহীন নজরে চেয়ে রইল দেয়ালে ঝুলানো ক্যালেন্ডারের দিকে। জানুয়ারীর ৩ তারিখ আজ। দেশ উত্তাল ঢেউয়ে ভাসমান। অবরোধ, হরতাল, র-ক্তার-ক্তিতে পিচের রাস্তা রঞ্জিত হয়ে উঠছে চারদিকে। সহিংসতা, বর্বরতার খবরে কান পাতা যায়না। তার মাঝ দিয়েও পারিবারিক, ব্যক্তিজীবনের টানপোড়েনে একটুও ভাঁটা পড়েনি। জীবনটা কেমন যেন! খুব পাগল, খুব এলোমেলো এই জীবনের পরিকল্পনাগুলো। ওর এসব পরিকল্পনা মোতাবেক পরিচালিত

হতে হতে মানুষ কবে কবে যেন নিথর হয়ে যায় তবুও থামেনা জীবন।
অন্তূ পত্র খোলে। ডিভোর্স পেপার। জ্বলজ্বল করছে এক সিগনেচার—সীমান্ত এহমাদ। তুলির সিগনেচারের জায়গা ফাঁকা।অন্তূর কাছে এ বাড়িতে আপাতত সবচেয়ে রহস্যমণ্ডিত মানুষ তুলিকে মনেহয়। সেদিন বলা কথাগুলো কেন যেন অন্তূকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি সত্যি হিসেবে। অন্তূর শাণিত চিন্তাধারায় কথাগুলো খুব অগোছালো আর বানোয়াটের মতো লেগেছিল। হামজাকে কিছু বলেনা, তুলি নিজের বাপকে কিছু বলেনা, জয়কে বললে টেনে হিঁচড়ে যেখানে পায়ের

কাছে এনে ফেলবে, জয়কেও বলেনি! কারণটা খুব অপরিপক্ক লেগেছে।পালিয়ে বিয়ে করেছে। সেটা মেনে নেবার পরেও এই দ্বিধা! তার ওপর আবার হামজা নিজেই জোয়ান, তাগড়া পুরুষ। সে এই আধুনিক যুগের পুরুষ তার ওপর যে ফেরেস্তার মতো নৈতিকতা তার! সেখানে তুলির কথাগুলোতে অসংখ্য অসঙ্গতি ছাড়া বিশেষ কিছু পায়নি অন্তূ। আঘাতের দাগগুলো দেখালে সীমান্তর নামে কেইস হবে দশটা। তার ওপর সেই লোকই ডিভোর্স লেটার পাঠিয়েছে! অন্তূ একটুও বিভ্রান্ত নয়, তার হবু উকিল মাথাটা মোটেই মানতে পারেনা, আর না মেলাতে!

শাহানার অপারেশনের ডেইট ফিক্সড হয়েছে। তার আগে ওনাকে কিছুদিন মেডিসিনের ওপর রেখে ব্যথাটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।সকাল সকাল হুমায়ুন দোতলার ব্যাকইয়ার্ডের খোলা জায়গায় বসেন। শাহানা এই শরীরেও স্বামীর জন্য বড়া এবং চা করে নিয়ে গিয়ে পাশে বসে রইলেন। দুজনের মাঝে কখনও ঝামেলা হতে দেখা যায়নি। পরস্পরের সবকিছুর ভাগিদার যেন দুজন। পাপ, দুঃখ, সুখ..সব। হুমায়ুন সাহেবের আজ ক'দিন পানের খুব নেশা জেগেছে। অন্তূকে ডাকলেন, "আরমিণ....আম্মা শুনতেছ?"

-"জি, মামা। কিছু দরকার?"

-“দুটো পান বানায়ে আন তো, আম্মা!”অন্তূ পান বানাতে পারেনা তেমন। তবুও চুন, সুপারি, জর্দা, খড়—সব দিয়ে দুটো পান বানিয়ে এনে দিলো। রান্নাঘরে রিমি খাটছে। এই মেয়েটাকে অন্তূর কেন জানি খুব ভালো লাগে। বলাবাহুল্য, অন্তূ বেশ খিটখিটে মেজাজের। কখনও কখনও তার মনের ভাবের সাথে মুখের আচরণের মিল পড়েনা। এটা হয় যখন সে কাউকে ঘেন্না করে। কারও প্রতি ঘেন্না জন্মালে তার সাথে আচরণে কপটতা চলে আসে। আবার ওর কথাবার্তাও খুব বিঁষঢালা টাইপের। যে যেমন, তার সাথে তেমন। কিন্তু রিমিকে ভালো লাগে ওর।

বাপের বাড়িতে এত সমৃদ্ধি থাকার পরেও এ বাড়িতে সাধারণ বউয়ের মতো সারাদিন চারদিক সামলে চলে। কিন্তু হামজার সাথে সম্পর্কের সমীকরণটা খুব জট পাকানো। সব কাজ করছে, বউয়ের কর্তব্য পালন করছে চুপচাপ, কিন্তু সেখানে আন্তরিকতার বড্ড অভাব। প্রথমে মনে হতো, বাপের বাড়ির লোকের সাথে বিরোধিতার কারণেই বোধহয় হামজার ওপর ক্ষিপ্ত রিমি। কিন্তু এখন বিষয়টা আরও জটিল লাগে।জয় বাড়িতে নেই আজ দু'দিন। কী কাজে বেরিয়েছে কোথায়! অন্তূ সারাদিন এ বাড়িতে টইটই করে ঘোরে। মনটা কী সব যে বলে যায়! তার মধ্যে বেশি

যে কথাটা বলে—এ বাড়িতে তার আশেপাশে গা ঘেঁষে এমন বহুত ভয়ানক ব্যাপার আছে, যা তার খালিচোখে ধরা পড়ছে না। তবে যা চোখে লাগালে সেসব দেখা যাবে, সেটাই বা কী? সেদিন ঝাড়ু হাতে নিয়ে পুরো বাড়ি ঝাড়তে লাগল। কাজের মহিলাটা পিছে পিছে ঘুরেছিল ঝাড়ু কেড়ে নেবার জন্য। শেষ অবধি একটা ধমকও মেরেছে আ না পেরে, "আপনি আছেন বলে ব্যাপারটা এমন তো নয়, আমি কাজ করলে তা পাপের পর্যায়ে পড়ে। আরও কাজ তো আছে, সেগুলো করুন।"এ বাড়ির নকশাটাই অদ্ভুত। অন্তূ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। এসব বড় বাড়ির নকশা তার কাছে

অদ্ভুত লাগাটাই স্বাভাবিক। এদের কত রকমের ঘর, কত রকমের ইউনিট থাকে সব। বিশাল ডাইনিং স্পেস পেরিয়ে লিভিং রুমের বাঁ দিকে পড়ে থাকা ঘর। ওটার পাশ দিয়ে দেয়াল ঘেঁষে যে সরু রাস্তাটা গেছে, ওটাকে একটা চিকন বারান্দার মতোই লাগে। বাইরে থেকে বোঝা যায়না, দোতলা সাধারণ এই বাড়িটার ভেতরটা বেশ বিস্তৃত। অন্তূ সেদিকে এগিয়ে যেতেই সরু বারান্দার শেষ পর্যায়ে একটা কাঠের দরজা। কী সে কারুকাজ! এত ঝলমলে কারুকাজ দোতলার সদর দরজায়ও নেই। অন্তূ সেদিকে এগিয়ে

যেতেই পেছন থেকে রিমির গম্ভীর ডাক শুনে থেমে গিয়েছিল।

-"এদিকে কী করছেন? এদিকটা পরিষ্কার। এখানে ঝাড়ু দেবার কিছু নেই।"

অন্তূর পর্যবেক্ষক দৃষ্টি জড়িয়ে যায়, "আপনি কি কিছু লুকোচ্ছেন, রিমি?"-"কী লুকোচ্ছি?"

-"সেটা আপনি বললে জানতে পারব।"

-"আপনি যখন এটা বুঝছেন যে লুকোচ্ছি, তখন এটাও বোঝা উচিত যে কী লুকোচ্ছি! আমি জানি, লুকোচ্ছি না।"

অন্তূ মৃদু হেসে উঠল, "এখানে আমি আবার আসব, তাও আপনি জানেন। চুপ থাকার

সিস্টেম নেই আমার ভেতরে। জয় আমিরের মতো কথা শিখেছি, তাই না?''

রিমি আনমনে হাসল, "আপনি সাধারণ মেয়ে, আরমিণ। হাত খালি আপনার, মেয়ে মানুষ আপনি। সাধারণভাবে বাঁচার চেষ্টা করলে বরং দীর্ঘজীবী হবেন। নয়ত ফুরিয়ে যাবেন।''

-"চিরজীবী হতে পারব কীসে?''

"সেটা তো হওয়া যায়না।''-"তাহলে আর দীর্ঘজীবন দিয়ে করব কী? আজ চুপচাপ বেঁচে থেকে যদি চিরদিন এভাবেই বেঁচে না থাকা যায়, বরং একদিন মৃত্যুর হাতে ধরা দিতেই হয়, তো কেননা আজ মরি! কিছু করে মরি? শোনেননি! কাল করবে তো আজ, আজ

করবে তো এক্ষুনি। জীবনে মৃত্যু যখন অবধারিতই তো তা আজ হোক, আজ তো এখন!''

রিমি সেদিন বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ চেয়ে থেকে বলেছিল, "জয়ের সাথে বিয়েটা স্বাভাবিক ছিল না, তাই না? কী করে আপনার মতো মেয়ে এই আগুনে এসে পড়ল বলুন তো?''

অন্তূ মলিন হেসেছিল। কোনো জবাব দেয়নি। কুড়িগ্রামের সেই জমি সাফ করতে গিয়ে অন্তূর চাচাতো ভাইকে বেশ ঘা লাগাতে হয়েছিল। সে স্থানীয় মাস্তান টেনে এনেছিল। তাদের সাথে একচোট ঝামেলা করতে হলো।

ওখানে জয়ের দাপট কিছু ফিকে পড়ে গেছিল। তবুও শেষ অবধি রেজিস্ট্রি হলো। চার কাঠার বেশি জমি। পজিশন ভালো। তবুও অন্তূ যত আশা করেছিল, সেটা হয়নি। লাক্ষ বিশেক টাকার মতো এসেছে। অন্তূ জানে, জয় বিয়ে তোলার আগেই পলাশকে টাকা মিটিয়ে দিয়েছে। কারণ পলাশ আর ঝামেলা করতে আসেনি। বাকি টাকার খোঁজটা করার সুযোগ পায়নি।

রাত এগারোটা বাজলো দিনাজপুর পৌঁছাতে। পলাশ এ-সময় হোটেলে থাকে। টিপটাপ ছয়তলা হোটেল এপার্টমেন্ট। জয়কে দেখে পলাশ হাসল, "ভালো?"জয় মুখ কুঁচকে বলল,

“আপনার কী অবস্থা? গন্ধ লাগতেছে নাকে, কী বালের পারফিউম মারেন গায়ে! এয়ার ফ্রেশনার মারেন, বালডা।”

পলাশ হাই তুলে বলল, “ঘুম পাইতেছে রে। থাকবি এইখানে? চল রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়ি।”

-“না। শ্বশুরের চেংরার ঋণ শোধ করতে আইছি।”

পলাশ হো হো করে হাসল, “তুইও শেষ পর্যন্ত...শ্যাহ, বেটাছেলে মাইনষের জীবনডাই এরম। শান্তি নাই রে, খুব বেদনা।”-“ভাই, নাটক কইরেন না তো। আর কথায় কথায়

হাসবেন না। জার্নি করে আসতেছি। কিছুই সহ্য হচ্ছে না গায়ে।''

-"তুই আমার সাথে খুব খারাপ আচরণ করিস, জয়। তবুও আমি কিছুই বলি না। এইটা আমার ভালোবাসা না?''

-"স্বার্থ। আমি আপনার কাছে আসি, এইটা আমার স্বার্থ, আপনি এতকিছুর পরেও সব ভুলে চুপ থাকেন, এইটা আপনার স্বার্থ। ধান্দা চালানোর স্বার্থ। ভণ্ডামি কথাবার্তা ভাল্লাগতেছে না। কামের কথায় আসি।''

পলাশ গি দুলিয়ে হেসে মাথা নাড়ল, "হু, আসি।''

-“সেদিন আমার সম্বন্ধির বাড়ি গেছিলেন আবার?”
-“যাওয়াটা কি অস্বাভাবিক? সেদিন তোর বউ বড় মুখে সময় নিলো আমার কাছে। তবুও এতগুলা দিন চুপ করে আছি। আমি দিনদিন ভালো হয়ে যাচ্ছি রে জয়।”
-“গিয়ে কী করছেন?”-“তোর সম্বন্ধির বউ মনেহয় পোয়াতি, ঠিক না?” কী যে নোংরা হয়ে উঠল এতক্ষণে পলাশের চাহনি।
জয় নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। পলাশ হাসছে, ভয়ানক হাসি, সেই হাসিতে কী যে হিংস্রতা খেলে যায়! দুজন লোক এসে কিছু

স্ন্যাক্স আর হালকা ড্রিংক দিয়ে গেল। পলাশ বলল, “কত টাকা এনেছিস?”

-“দাবী কত আপনার?”

-“বেশি না। যা হয় তাই। কিন্তু গহনা ফেরত দিতে পারব না। তার বদলে তুই টাকা কেটে রাখ। গহনা খরচা হয়ে গেছে।”-“আরমিণের ভাবীর গহনা। ওইগুলা দেন। আমি কথা দিছি, নিজহাতে আপনারে টাকা পরিশোধ করে গয়না নিয়ে যাব। গয়না আরমিণের ভাবীর মায়ের বাড়ির। টাকা পাবেন, টাকা নেন।”

পলাশ গম্ভীর হয়ে সোফায় দু হাত এলিয়ে বলল, “ইললিগেল কিছু করছি না। টাইম

আপ। অর্থাৎ গহনা আমার। নিয়ম অনুসারে গহনা বিনা কথায় আমার। কিন্তু টাকা আমি গহনার দামের বেশি দিয়েছিলাম, বিধায় গহনার মূল্য মাইনাস করে তুই টাকা দিবি আমায়।''

-"আজ আপনি জায়েজ, আমি না-জায়েজ, যান। টাকা পুরোটা নেন। খানিকটা বেশিই নেন। তবুও গহনা চাই। আমি কথা দিছি সেই কবে। এমনিতেই বহুদিন পার করছি বাটপারি করে।''

পলাশ দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "তোর-আমার এতদিনের সম্পর্কে একটা মেয়ে আজ দিয়ে দু'বার ধাক্কা কষলো। খেয়াল করেছিস

ব্যাপারটা?''জয় হাসল, “খালি আমার-আপনার না। ও আমার সাথে আরও অনেকের, অনেকের সাথে আরও অনেককে নড়িয়ে চড়িয়ে রেখে দিয়েছে। তবুও ওর মনেহয় ও কিছুই করেনি, ওর হাত শক্ত হয়নি। সামথিং হ্যাভ স্পেশাল ইন হার, ইস’নট দ্যাট? পলাশ ঠোঁট কামড়ে হাসল, “আই অলসো একনোলেজড! বাট আ’ম ওয়ার্ন ইউ, ইউ’ল হোল্ড হার ডাউন অ্যা বিট। মেয়ে মানুষের ওড়াউড়ি দেখার অভ্যাস নেই আমার। ইউ নো ওয়েল, মেয়েলোকে কী পরিমাণ চুলকানি আছে আমার। হাউএভার, যদি এমন বেপরোয়া হয়; আই ইভেন ডোন্ট নোও, হাউ

লং আ'ল বি এবল টু সাপ্রেইস টু মাইসেল্ফ অফ কাটিং হার স্কোয়াড্যার..!

জয় ঢকঢক করে দুই গ্লাস পানি খেলো। হাতের কব্জি দিয়ে বাচ্চাদের মতো মুখটা মুছে বলল, "আপনি আরমিণের বাপের বাড়ি থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখুন, তাতেই চলবে। বাকিটা আমি সামলে নেব।"রাবেয়ার কণ্ঠে অভিমান, "মনে পড়েনা তোর আমাকে?"

অন্তূ মৃদু হাসে, "মনে পড়ে। ভেতরে অনেক কথা আর ঝীবনের প্রতি ক্ষোভ জমেছে, আম্মু। আব্বু চলে গেল আমায় রেখে। বলার মতো কেউ নেই। তোমাকে বললে বোকার মতো চেয়ে থেকে শুনবে, বুঝবে না বিশেষ।

তবুও দরকার তোমাকে। সামনে বসিয়ে কথাগুলো বলার পর যে, গালে-মুখে হাত বুলিয়ে চুল বাঁধতে বসবে, ওই আদরটুকু দরকার আমার। কিন্তু আসতে পারছি কই?''

-"খুব কাজ নাকি রে ওইবাড়ি?''

মলিন হাসল অন্তূ, বুঝতে দিলো না রাবেয়াকে, "অ-নেএ-ক কাজ, আম্মু। আম্মু, শরীর ভালো তোমার?''

-"তোরে খুব দেখতে মন চায়, অন্তূ! একটুও ভালো লাগেনা বাড়িতে। তোর বাপ চলে গেল, তুইও ফেলে চলে গেলি, অন্তূ। আমারে জ্বালানোর মানুষ দুইটা নাই। কী করি ক তো সারিদিন? ফরমায়েশ খাটবো কার আর? কারা

ধমকাবে আমারে? আমার দম আঁটকায়ে আসে রে, অন্তূ!''

-''আরেকবার ডাকো তো অন্তূ বলে! এ বাড়িতে কেউ ডাকেনা এই নামে। তখন বুঝি এই ডাক যে কারও মুখের নয়, আমার লোকদের ডাক এটা। আরেকবার ডাকো..''-''তুই ভালো আছিস তো, অন্তূ!''

-''খারাপ আছি নাকি? বড় দোতলা বাড়ি, অভাব-অনটন নেই, চিন্তাভাবনা নেই—বেশ চলছে, আম্মু।''

-''সত্যিই বলতেছিস?''

অন্তূর মনে হলো, তার বোকাসোকা, সরলা বাঙালি আম্মুটা বেশ বুঝমতির মতো কথা

বলছে। শ্বশুরবাড়ির ঘানি টানা মেয়ের মায়েরা বুঝি মেয়ের কণ্ঠেই বহুত কিছু বুঝে ফেলার বিশেষত্ব ধারণ করে? অন্তূর এক দেহে বহু সত্ত্বার বাস। তার মাঝ থেকে এই মুহুর্তে কোমল, বাচ্চা সত্ত্বাটা খুব ধাক্কাধাক্কি করছিল। মনটা হাহাকার করে উঠছিল—এভাবে আব্বু কেন কল দেয়না! গম্ভীর কণ্ঠে কেন জিজ্ঞেস করেনা, "কবে আসবি এ বাড়িতে? আসা লাগেনা তোর মাকে দেখতে? তোর মা দেখতে চাইছে তোকে।"

নিজের কথা বলবে না। চাপা স্বভাবের মানুষদের ভালোবাসা অন্যরকম সুন্দর হয়। অন্তূর গলি ধরে আসে। রাবেয়া ডেকে ওঠেন,

“অন্তূ!”অন্তূর বুকটা ধুক করে ওঠে, “কী হয়েছে, আম্মা!”

রাবেয়া চুপ থাকেন। অন্তূ বোঝে, কোনো বিষয়ে দ্বিধা-দ্বন্দে ভুগছেন রাবেয়া। সে অভয় দেয়, “কী হয়েছে, আম্মু? কিছু বলবে? কী সমস্যা?”

অবশেষে বলেন রাবেয়া, তুই না বলছিলি, পলাশরে টাকা দিয়ে এরপর কনে সাজবি...

-“হ্যাঁ, তো...” গর্জে ওঠে অন্তূ। পর-মুহুর্তে জলের মতো শান্ত কণ্ঠে বলে, “পলাশ গিয়েছিল নাকি বাড়িতে?” দৃঢ় বিশ্বাস নিজের ধারণায় অন্তূর।

রাবেয়া চুপ ওপাশে। অথচ অন্তূর ধারালো মস্তিষ্কের আন্দাজের সাথে রাবেয়ার অস্পষ্ট ফুঁপানো কান্না দুয়ে-দুয়ে চার মিলে যায়। অন্তূ হাসে মৃদু, আম্মু! টাকা দিয়ে দেয়া হয়েছে। ও এমনিই গিয়েছিল, হয়ত শয়তানী করতে। গিয়ে বলেছে নিশ্চয়ই, টাকা পায়নি? মিথ্যা বলেছে। আর যাবেনা। নিশ্চিন্ত থাকো। জয় আমিরকে বলে সেই ব্যবস্থা করব আমি।"

রাবেয়া এরপর অন্তূর খোঁজ খবর জিজ্ঞেস করছিলেন, বিভিন্ন ধরণের কথা বলছিলেন অন্তূর সাথে। সেসব আর কানে যায়না অন্তূর। মাথাটা আওলে ওঠে। দ্রুত বলল, "পরে কথা বলব, আম্মু, এখন রাখি। মামা শ্বশুর

ডাকছেন আমায়।অন্তূ হিসেব মিলিয়ে নেয়—জয় মিথ্যা কথা বলেছিল। একটুও অবাক হবার মতো বিষয় নয়। বরং নিজের ওপর অবাক হলো, জয়ের কথা মেনে নিশ্চিন্তে থাকার কথা ভেবে। আক্রোশে মাথার চুল টেনে ধরে অন্তূ। না জানি পলাশ বাড়িতে গিয়ে কী করে। এসেছে! সে সময় নিশ্চয়ই অন্তিক বাড়িতে ছিল না!

যন্ত্রণা ওকে কত দূর্বল করে তুলেছে। ও কেবলমাত্র আব্বুর ক্ষেত্রে দূর্বল। সেখানেই বারবার আঘাত করা হয়েছে! পলাশের রুফটপে, সেদিন মানুষের সম্মুখে, হাসপাতালে, খাটিয়ার পাশে, জয় যেদিন

কাছে এলো সেদিনও...ঘেন্নায় অন্তূর কান্না থেমে মুখটা কুঁচকে যায়। নিজেকে আবর্জনার চেয়েও বেশি ময়লা লাগে। সেদিনের মানসিক দূর্বলতা ওকে এতটা নিচে নামিয়েছিল, ভাবতেই গা শিরশির করে ওঠে। ছিহ! বারবার হাত দুটো নিশপিশ করে—সেদিন জয়ের রক্তাক্ত ক্ষততে একটা আঘাত কেন করেনি জয়কে? কতগুলো ছুরি গচ্ছিত রেখেছে নিজের কাছে, তার একটা জয়ের দেহে চালাতে পারেনি কেন? এরপর থেকে জয়কে রাতে মন ভরে মদ খেতে দেয় অন্তূ। বেশি খেলে সোফাতেই ঢলে পড়ে, এরপর নিশ্চিন্তে ঘুমানোর চেষ্টা করে সে।জয় বাড়ির

ফিরল রাত দুটোর দিকে। হুমায়ুন সাহেব দরজা খুলে দিলেন। দু চারটা কড়া কথাও শোনালেন। বিপক্ষ হলো শাহানা, "চুপ করো, তুমি। কী করছে এমন? একসময় নিজেই ঠিক হয়ে যাবে। বয়স কত হইছে ওর? ও আরমিণ? ঘরে তোলো তো জয়কে!"

অন্তূ বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। ঘৃণায় চোখ বুজে গায় শ্বাস ফেলে অন্তূ। প্রশ্ন করে বাতাসকে, এই সকল নোংরা নারীগুলোকে তৈরী করতে নিশ্চয়ই কোনো নর্দমার মাটিই ব্যবহার করেছিলেন সৃষ্টিকর্তা!

জয় ঝারা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে বলে, "কী বালের আদিক্ষেতা দেখাচ্ছ? ছাড়োহ.."

বাথরুমে ঢুকে চোখেমুখে পানি নিয়ে এসে বিছানায় বসে অন্তূকে ডাকে, "ঘরওয়ালি! এক গ্লাস তেঁতুলের শরবত বানিয়ে আনো। দু ঢোক গিলেই শালার হ্যাংঅভার কাজ করতেছে!"

অন্তূ সামনে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, "কোথায় গিয়ছিলেন?"

-"যা বললাম, তা করো আগে। পরে ইন্টারভিউ নেবে।"-"আমি যা বললাম, সেটার জবাব দিন।" অন্তূর হুংকারে বদ্ধ চার দেয়াল গুঙরে উঠল যেন।

জয় মাথা তুলল, "তুমি কি চাচ্ছ আমি উঠি? এক ধাক্কায় দোতলা থেকে সরাসরি বেহেশতে

পৌঁছে যাবে। নিষেধ করেছি না, চেঁচাবে না। কানে কোনো সমস্যা নেই আমার!”

অন্তূ মুহূর্তের মাঝে মোটা কাঁচের ফুলদানিটা তুলে ছুঁড়ে মারে জয়ের দিকে। ফুলদানিটা জয়ের কপালের শুকিয়ে যাওয়া ক্ষততে লাগে। গলগলিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে, লুটিয়ে পড়ে জয় মেঝেতে।

পরক্ষণেই অন্তূর গা'টা শিরশিরিয়ে কেঁপে ওঠে, সে টের পায় সে হ্যালুসিনেট করছে। তীব্র ইচ্ছে বিভ্রম হয়ে চোখে ধরা দিচ্ছে। অসীম ধৈর্য্যের সাথে জিজ্ঞেস করে, “আপনার গালে জিহ্বা কয়টা?”

-“আল্লাহর রহমতে একটাই। তোমার কয়টা, দেখি হাঁ করো তো!” পা ঝুলিয়ে শুয়ে পড়ে জয়।

-“কোথা থেকে আসছেন?”

-“কত কাজই তো থাকে আমার। প্রতিদিন তো আর ঘরে বসে থাকিনা। আজ আর বিশেষ কী!”অন্তূ দাঁতে দাঁত ঘষে, “আই আস্ক টু ইউ এগেইন, হোয়ার ডিড ইউ গো? এবার মিথ্যা বললে, আল্লাহর কসম, আমি আপনার জিহ্বাটা টেনে আলাদা করে ফেলব কণ্ঠনালী থেকে।”

জয় ভ্রু কুঁচকে উঠে বসে কিছুক্ষণ অবুঝের মতো চেয়ে থাকে অন্তূর দিকে। পরক্ষণেই

ক্ষুধার্ত পশুর মতো উঠে দাঁড়িয়ে থাবা দিয়ে ধরে অন্তূকে, "বান্দির বাচ্চা! তোর কলিজা বের করে ওজন করে দেখব..আর একবার আওয়াজ করবি তো.."

-"তোর মতো জানোয়ারেরা পারে কী? বাটপারি, চুরি-চামাড়ি, অবিচার, আত্মসাৎ করে লোকজনের মুখ খোলার আগে তাদের কলিজাটা বের করে মুখ বন্ধ করা! এই তো! আর কিছু পারলে তবে নাহয় করতি। আমার সাথেও নাহয় তাই করবি!"

জয় অন্তূর গাল চিপে ধরল, "ভয় পাসনা কেন তুই আমাকে? আমি তোকে ছাড় বেশি দেই, নাকি তোরই ভয় কম? ভয় পাসনা তুই

আমাকে?”-“তোর মতো রাস্তার ছেলেকে ভয় পাওয়ার আগে আমার শরীরটা শেয়াল-কুত্তায় ছিঁড়ে খাক। যে কথা রাখতে পারিস না, তার আশ্বাস কেন দিস? একটা ছুতো রেখেই দিয়েছিস, পলাশ জানোয়ারের আবার আমাদের বাড়িতে যাবার? প্রতিদিন কতলোকে মরে, দাফন হয়ে যায়, অথচ পলাশ অথবা তোদের মতো বেজন্মাদের হায়াৎ লম্বা।”

জয় আস্তে করে ছেড়ে দেয় অন্তূকে। শান্ত স্বরে বলে, “বেজন্মা না, আমি। আমার থেকে ছাড় পাওয়া বন্ধ হলে কুকুরের মতোই ছিঁড়ে

খাওয়া হবে তোমার পরিবারকে। এটা ভুললে চলবে না।''

অন্তূ দেয়াল ঘেঁষে মেঝেতে বসে পড়ে। চোখের পানি ছাপিয়ে কড়া কণ্ঠে বলে, "মেরে ফেলছেন না কেন? শুধু জান ছাড়া আর কিছুই তো বাকি রাখেননি! কী আছে আর আমার, আমার পরিবারের...! দুনিয়াটা আপনাদের। আমরা তো সব মাটির পোকা। আপনারা হাঁটছেন, পিষে মুচড়ে যাচ্ছি আমরা। এবার নাহয় কবর দিয়ে দিন। না সইতে পারছি, আর কিছু করতেও পারছি না। এটা বড় যন্ত্রণার।'' অন্তূ মাথাটা দেয়ালে এলিয়ে দেয়।জয় চেয়ে থাকে অন্তূর মলিন মুখশ্রীতে।

এখন শান্ত, অথচ মিনিট খানেক আগে বাঘিনীর মতো গর্জন করছিল। বহুরূপিণী। জয় চোখ ফেরায় না। অন্তূ ছাদের দিকে তাকিয়ে আনমনে বলে চলে, "র-ক্তের ভাইকে ক্ষমা করিনি। যদিও ও যা করেছে ইচ্ছে করে করেনি। অথচ আপনি, পলাশ, হামজা পাটোয়ারী যা করছেন, সব পরিকল্পনামাফিক, নিজেদের ক্ষমতা জাহির করতে। কিছুই ছাড়লেন না! আর কত, জয় আমির? পলাশকে প্রতিদিন দেখতে হচ্ছে না, ও দূরে আছে। অথচ আপনি রোজ সামনে আসেন, এক ঘরে, এক ছাদের নিচে। আমার-আপনার সম্পর্কের নামটাও কী জঘন্য! চ্যাহ! সহ্যের

সীমা মাপার ফিতা দরকার। আমি একটু বেশই ধৈর্য্যশীল, তাই না?''

জয় চুপচাপ চেয়ে থাকে। অন্তূর চোখের কোণা পেরিয়ে একফোটা জল গড়াতে যাচ্ছিল, অন্তূ সেই নোনাপানিটুকু আঙুলে মুড়ে এমনভাবে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, যেন কোনো অপবিত্র, নোংরা কিছু চোখে বিঁধে ছিল।জয় কপালে হাত চালিয়ে জোরে জোরে শ্বাস ফেলে। বেড-সাইড টিবিলের ওপর থেকে হ্যান্ড প্রেসিং বলটা তুলে হাতের মুঠোয় চাপতে থাকে বারবার। অন্তূ চোখ বুজে বসে থাকে মেঝেতে। অস্পষ্ট স্বরে বিরবির করে, "আব্বুকে মেরে ফেললেন আপনি! অথচ

কায়দা এত নিখুঁত, দোষ দেয়া যায়না আপনাকে। ঠিক আজরাইলের মতো। মানুষ মরলে কেউ আজরাইলকে দোষ দেয়না। দোষ হয় রোগ অথবা মৃত্যুর কারণের। বোকা মানুষ জাতি ভুলে বসে, রুহুটা নিয়ে গেছে সৃষ্টিকর্তার দূত। আমার পর্দা কেড়ে নিলেন! উহু, বিনা কারণে নয়। কারণ আছে অবশ্যই! জানেন? একবার থুতু দিয়েছিলাম আমি আপনাকে। অন্যকেউ হলে কী করতো? হয়ত একবারের বদলে দুবার, আচ্ছা তিনবার থুতু দিতো আমার মুখে। কিন্তু যেখানে কথা জয় আমিরের... আপনার ওপর মুগ্ধতা জমানোর একটা বাক্স কিনতে চাইছি। আপনি এত

চমৎকার কেন? আর পাঁচটা মানুষের সাথে আপনার বিকৃত মস্তিষ্কের জিদেগুলোর একটুও মিল নেই। পুরোই ডিফরেন্ট!''অন্তূ নিয়ম করে বাগানে যায় আজকাল। ওই লোহার লাল গেইটটা! অন্তূ রোজ যায় একবার করে। ফেরার সময় এক পুরুষকে ঢুকতে দেখা গেল। হাতে কয়েকটা ব্যাগ। অন্তূর দিকে বারবার তাকাচ্ছিল। লোকটাকে উঠে যাবার সুযোগ দিয়ে নিজে ওয়ার্কশপের দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে থেকে পরে উঠে এলো দোতলায়।

পরে জানা গেল, এটাই তুলির স্বামী। হুমায়ুন সাহেব ডেকেছেন। হামজা এসে বসল।

কোয়েল দৌড়ে এসে আব্বুর গলা জড়িয়ে ধরে কোলে চড়ে বসে। এক ব্যাগ চকলেট ও বিভিন্ন খাবার-দাবার ধরিয়ে দিলো সীমান্ত। হাস্যোজ্জ্বল চেহারা। কথাবার্তা কী সুন্দর করে বলছে কোয়েলের সাথে। বুকের সাথে জাপটে ধরে বসে আছে মেয়েকে।

অন্তূর ফের সন্দেহ হয়—এই লোক এত খারাপ? আসলেই? মারধর, নেশা-ভাং, ডিভোর্স!বৈঠকে জয় নেই। ক্লাবে গেছিল সকালে। গতকাল এক মিছিল শেষে হানহানি হয়েছে। কার নাকি বুক ফুঁড়ে গুলি চলে গেছে। বেশ কয়েকজন আহত বিরোধীপক্ষের হামলায়। এসব অবশ্য হামজার পার্টির সাথে

হয়নি। হয়েছে সংসদ সদস্য মহোদয়ের বাড়ির সামনে। সেখান থেকে জয় যাবে ভার্সিটিতে। সুতরাং সে এই বৈঠকে নেই বরাবরের মতো।

তরু চা বানিয়ে দিলে, অন্তূ তা ট্রে-তে তুলে, নাশতা সাজিয়ে এনে সোফার সেন্টার-টেবিলে রাখে। কথা তুলল হামজা, সরাসরি বলল, "দেখ সীমান্ত, সংসারে ঝামেলা সবার হয়। কিন্তু ডিভোর্সের ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না! আমি অবুঝ নাকি ঘটনা বেশি জটিল? তোর এরকম সিদ্ধান্তের বিশেষ উপযুক্ত কারণ খুঁজে আজ দু'দিন এত হাঙ্গামার মাঝেও বেশ হয়রান আমি।" সীমান্ত চুপচাপ বসে রইল।

আর কোনো মেয়েলোক নেই বৈঠকে। অথচ অন্তূ দাঁড়িয়ে রইল ট্রে হাতে নিয়ে। হামজা বলতে পারল না সরাসরি, বারবার আড়চোখে তাকালো, অন্তূ সেসব অগ্রাহ্য করে দাঁড়িয়ে রয়। শাহানা কাশতে কাশতে এসে বসলেন। বেশ কিছুক্ষণের নিরবতা ভেঙে হুমায়ুন বেশ সাহেব কিছু বলতে গিয়েও বললেন না। শাহানা বেশ কোমল স্বরে বললেন, "তুমি জানো সীমান্ত? তুমি আবার বাপ হইযে যাইতেছ, এই সময় এইসব...."

-"ওটা আমার বাচ্চা না।"ঘরটা থমকে যায় সীমান্তর ছোট্ট একটা বাক্যে। অন্তূ কিঞ্চিৎ ভ্রু জড়িয়ে ফেলে। বসার ঘরে থাকা পুরোনো

ঘড়ির পেণ্ডুলাম ঢং-ঢং করে বেজে উঠে জানান দেয়—বিকেল ০৪:০০ বাজছে।হামজা নীরবতা ভাঙল, “তোর বাচ্চা না, কার বাচ্চা? ”

সীমান্ত একটু নড়েচড়ে ওঠে এবার। ঢোক গিলল কয়েকটা, ঠোঁট চাটলো জিভ দিয়ে। মেয়েকে কোল থেকে নামিয়ে মাথা নিচু করে বলল, “আমি তুলিকে তালাক দিতে চাইনি, ভাই। আর না আমি ওকে পাঠিয়েছি এ বাড়িতে। ও নিজে চলে এসেছে এখানে, ডিভোর্স ও চায়...” সীমান্তর কথায় জড়তা। হামজা কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। গলা উঁচিয়ে ডাকল তুলিকে। বজ্রের মতো শোনা

যায় কণ্ঠস্বর। তুলি যন্ত্রের মতো হেঁটে এসে বসে। তার মুখের সেই মেকি হাসি নেই, যেটা সবসময় অন্তূ খেয়াল করেছে। মনে হয়েছে, খুব ধৈর্য্যের সাথে তুলি নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে যেন। হামজা জিজ্ঞেস করল, "এবার বল, কী সমস্যা? মেজাজের নিয়ন্ত্রণ হারাবো খুব তাড়াতাড়ি। কী হয়েছে তোদের, সমস্যা কী?"

তুলি চুপ থাকে। হামজা বেশ কয়েকবার জিজ্ঞেস করল। কেউ কোনো কথা বলল না। হামজা অপেক্ষা করে চুপচাপ। সীমান্তর চোখে-মুখের কাতর অস্থিরতা হামজার জহুরী চোখ এড়ায় না। অন্তূর দৃষ্টি সীমান্তর চোখে

স্থির। ওর চোখে ভয়, আতঙ্ক।-“কী হয়েছে, তুলি? থাপড়ে কথা বের করার স্বভাব কিন্তু পুরোনো আমার।”

তুলি খানিক সময় নিয়ে বলে, “মেয়ে হবার পর শ্বশুর বাড়ি থেকে ও আমাকে ফ্ল্যাটে নিয়ে এলো। রোজ ফ্ল্যাটে পার্টি হতো। সেখানকার মদ পরিবেশক অথবা বাইজি যাই বল, সেটাই ছিলাম আমি। দিনের পর দিন পর পুরুষের ছোঁয়া লেগেছে আমার গায়ে ওর সামনে। ও যেন তাতে আনন্দ অনুভব করতো। কারণ ওর আনা বন্ধুরা মদের সাথে আমার শরীর ছুঁয়ে যে আনন্দটা পেতো, সেটা হলো অতিথি সেবা। অতিথিকে ঘরে আনলে তাকে সর্বোচ্চ

আপ্যায়ন করাই তো ভদ্রলোকের নীতি। সেটাই করা হয়েছে। মদের সাথে আমি ফ্রি।”

এ পর্যায়ে হুমায়ুন সাহেব উঠে চলে যান। শাহানা উশখুশ করছিলেন। অন্তূর শরীর অবশ লাগছিল। পা দুটোতে ঝিঝি ধরে যাচ্ছিল তুলির মুখের এসব গা শিউরে ওঠা কথা এত সাবলীলভাবে শুনে। এরা কি মানুষ? সাধারণ সমাজের সভ্যতা থেকে কতটা বিমুখ এরা! দুনিয়াতে কত কিছু ঘটে রোজ, অন্তূর মনে হতো সেসব শুধু সংবাদপত্রেই লেখা থাকে। জয়ের সাথে দেখা হবার পর থেকে সংবাদপত্রের খবরগুলোকে খুব সাধারণ মনে হয়, বরং মনে হয় বাস্তবতা

এর চেয়েও কলুষিত।তুলি আনমনে বলল, “এ বাচ্চা কার, আমি নিজেও জানিনা। মাতাল হয়ে বেহুশে ঘুমিয়ে থাকা স্বামীর সামনে রাতের পর রাত ধ-র্ষি-তা হয়েছি। কার বা বাচ্চা, কীভাবে বলি?”

অন্তূর শরীরটা ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে। হাতের লোমকূপ দাঁড়িয়ে যায়। দু আঙুলে সজোরে কপাল চেপে ধরে মুখ লুকানোর চেষ্টা করে। এরপর যা হবে তাও আশাতীত ছিল। হামজা বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ মেঝের দিকে চেয়ে থাকল। সীমান্তর শরীরটা ঘেমে চুইয়ে পড়ছিল। চোখে-মুখে নিদারুণ কাঁকুতি। ভদ্রলোকের পোশাক ও চালচলনের মাঝেও

চোখদুটো লাল। অর্থাৎ এখনও বোধহয় নেশার প্রভাব আছে শরীরে। নীরব ঘরটায় ওর হৃদস্পন্দন কানে ধরার মতো। হামজা ঝুঁকে পড়ে সেন্টার টেবিলের পা-দানি থেকে চাপ্পর তুলে নেয়। পশুর মাংস ছড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয় এই অস্ত্র। তুলি মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে বেরিয়ে যায় রুম থেকে। কোয়েল যেতে চাইছিল না। বারবার ডাকে, "বাবা, বাবা...মাম আমাকে নামাও, আমি বাবার কাছে বসব..."শাহানা অসুস্থ পায়ে উঠে চলে গেলেন তুলির পেছনে। অন্তূ ঠাঁই দাঁড়িয়ে। হামজা সীমান্তর শরীরে মোট চারটা কোপ বসায়। তার সাদা টি-শার্টের সামনের দিকটা নতুন

রঙে রঙিন হয়ে ওঠে। অন্তূ চোখ ফেরায় না। তার হাতের কব্জির ওপর ছিটে এসে লাগে গরম তরতরে তরল রক্ত। এভাবে সে কোরবানীর ঈদে বাড়ির সামনে কত কসাইকে গোটা গরু জবাই করে মাংস বানাতে দেখেছে। হামজাকে একজন দক্ষ কসাইয়ের মতো লাগে দেখতে। পুরো হাতে মুখে রক্ত, চাপ্পরের ধারালো প্রান্ত ঢেকে গেছে রক্তে। সোফা থেকে এলিয়ে পড়ে সীমান্তর দেহটা। পুরোপুরি পড়ে যাওয়ার আগে রক্তাক্ত চাপ্পরটা বগলে গুঁজে সীমান্তর দেহটাকে ভালোভাবে যত্ন করে সোফায় হেলান দিয়ে বসায়। ঘাঁড়ে দুটো কোপ লেগেছে। প্রথমটাতে মৃত্যু

নিশ্চিত। তার পরের আঘাতগুলো করার সময় হামজার মুখে এক প্রকার তৃপ্তি খোঁজার আভাস পাওয়া যায়।সোফায় বসে কোনো নম্বরে ডায়াল করে স্পিকার লাউড করে বেসিনের দিকে যায়। তৃপ্তি করে খাওয়ার পরে মানুষ যেমন হাত ধোঁয়, সেভাবে পানি গড়িয়ে হাত ধোঁয়, চাপ্পরে লেগে থাকা রক্ত ধুয়ে এনে ফোন কানে নিয়ে বলে,

“কয়েকজন ছেলেকে পাঠা।”হামজা সোফায় মাথা এলিয় বসে থাকে। দাঁড়িয়ে থাকে অন্তূ। তার সীমান্তর মৃত্যুর জন্য খারাপ লাগছে না, খুব ভালো লাগছে। হামজার ভূমিকাটাও ভালো লাগছে আজ প্রথমবারের জন্য। স্বামী

হিসেবে সীমান্ত যা করেছে, তার পেক্ষিতে ভিক্টিম হিসেবে তুলি ও তার বড় ভাই হিসেবে হামজা আজ যা করল, তা অন্তূর ভেতরে দারুণ এক শক্তি ও মুগ্ধতা কাজ করাচ্ছিল। এভাবে যদি এই জাতের সকল পুরুষ বলি হতো, এমন পুরুষের সংখ্যা ভয়ে হলেও বেশ কমে আসতো। খুব ভালো লাগছিল সীমান্তর ঘাঁড় বেয়ে জমাট বাঁধা রক্তের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়া নতুন রক্তের প্রবাহ দেখতে। আর দু একবার জীবিত করে আরও দু তিনবার এভাবে মারলেও অন্তূ ঠিক একরকম তৃপ্তি পেত যেন। কিন্তু আফসোস এক জায়গায়, এভাবে অন্তূ জয়কে মারতে

পারেনি। সম্মানহানী মানুষ হত্যার সমান। যেটা জয় করেছে, হামজা সেটাকে সাপোর্ট দিয়েছে। অন্তূর কি উচিত নয়, হামজা, জয়, পলাশকেও এরকমই এক প্রকার মৃত্যু দেয়া! অন্তূর লজ্জা লাগল। সে হামজার মতো শক্তিমান নয়! ধিক্কার জানালো নিজেকে। হামজা খুব ভালো। কী চমৎকার একটা বিচার করল নিজের বোনের ক্ষেত্রে। আর অন্তূ নিজের জন্য কিছু করতে পারেনি।

ছেলেরা এলে হামজা আদেশ করে, "রাতে এটাকে ভার্সিটির পুরোনো আমবাগানের ঝোপে ফেলে আসবি।"

রিমি পেছনে এসে কখন চুপচাপ দাঁড়িয়েছে, টের পাওয়া যায়নি।আছরের নামাজ পড়তে যাচ্ছিল লোকজন। জয় ফটকের সামনে দাঁড়ানো। রাস্তার ওপারে দোতলায় ভাড়াটে একটা মেয়ে আছে। বয়স পনেরো-ষোলো। জয়কে ফলো করে সুযোগ পেলেই। উড়ন্ত জয়কে দেখতে পাওয়া বেশ মুশকিল। আজ জয়কে দাঁড়াতে দেখে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। কত ভালো ভালো ফরমাল পোশাকের ছেলেদের ওপর এমন আকর্ষণবোধ না করার জন্য অবশ্য আফসোসও হয় ওর। জয় ফোনে কথা বলছিল দাঁড়িয়ে। সাধারণ একটা শার্ট গায়ে। সাদা লুঙ্গি পরনে, তা মাটি ছুঁয়ে পরে

সবসময়। ডান হাতে লুঙ্গি উঁচু করে ধরে দাঁড়ানোতে পায়ের চামড়ার বেল্টওয়ালা চটি দেখা যাচ্ছে। সেটার বেল্ট আঁটকায়না, খোলা। লম্বা শরীরে সাদা লুঙ্গি, শার্ট, চামড়ার স্যান্ডেল খুব মানায় জয়ের সাথে। তার চলাফেরাই এমন। ভদ্রলোকি পোশাকে নিজেকে সাজাবার যেন কোনো তাড়া নেই। এই পোশাকেও চমকপ্রদভাবে ভীষণ অভিজাত পুরুষ লাগে দেখতে। লুঙ্গি হাতে গুছিয়ে ধরে দুই ঠ্যাঙের মাঝে গুঁজে দাঁড়াচ্ছে বারবার, তবুও উঁচু করে পরছে না। মেয়েটার কাছে সবকিছুই আকর্ষণীয় লাগে।অন্তূ বিষয়টা বারান্দা থেকে খেয়াল করে তাচ্ছিল্য করে হাসে। মানুষ সেই

সকল আলুর মতো, যা খোসার ওপর থেকে দেখতে শতভাগ সতেজ এবং কাটলে পুরোটাই ফেলে দেবার অবস্থা বেরোয়। এমন আলু আম্মুকে কাটতে দেখলে অন্তূ ভীষণ অবাক হয়ে চেয়ে থাকতো। ওপর থেকে আন্দাজ করার উপায় নেই, ভেতরটা এতটা কুৎসিত।

গাড়ি চলে যায় রাস্তা দিয়ে। পাড়ার কুকুরগুলোর সাথে জয়ের সম্পর্ক খুব ভালো। রুটি, চা, মাঝেমধ্যে কোল্ড ড্রিংসও টেস্ট করতে দেয় জয়। মাঝেমধ্যে কুকুরগুলোকে মদেও চুমুক দিতে হয় জয়ের বদৌলতে। বাড়িতে খাওয়া মাংসের হাড়গুলো জড়ো করে

নিয়ে গিয়ে কুকুরকে দেয়। দারুণ পিরিত তার কুকুরের সাথে। জয়কে দেখে রাস্তার ওপর ঘুরঘুর করছিল আজও কুকুরগুলো, বাচ্চাকাচ্চাসহ।কপালের ক্ষততে টান ধরে মাঝেমধ্যেই। গভীর ক্ষত শুকিয়ে গিয়েও জখম হয়ে আছে। সেখানে আঙুল চেপে ধরে রইল। যারা আক্রমণ করেছে সেদিন, মা-বাপ তুলে খাঁটি বাংলায় গালি ঝারছিল। তখনই শোঁ করে একটা বাইক চলে যায়। সজোরে ধাক্কা খায় একটা বাচ্চা কুকুর। জয় তৎক্ষণাৎ চেঁচিয়ে বকে ওঠে বাইকওয়ালাকে, "এই শালির ছাওয়াল, বাইঞ্চোদ! ভ্যাড়াচ্চুদা শালা.. ধর শালারে..ধর.."

ততক্ষণে বাইকওয়ালা আরও জোরে বাইক টেনে চলে গেছে। জয় দৌড়ে যায় কুকুরটার কাছে। মা কুকুরটা করুণ চোখে বাচ্চাকে দেখে এগিয়ে আসে। জয় তুলতে গেলে হাঁ করে কামড়াতে আসলেও জয় কোলে তুলে নিয়ে ফটকের ভেতরে নিয়ে এসে ঘাসের ওপর শোয়ায়। ছোট্ট কুকুরটায় পিঠের মাংস ছিঁড়ে গেছে রাস্তার ঘর্ষণে। অন্তূ দৌড়ে নেমে আসে দোতলা থেকে। জয় উত্তেজিত হয়ে বলে, “ঘরওয়ালি, কুত্তারে কি ডেটল-ফেটল বা স্যাভলন লিক্যুইড টাইপ কিছু দেয়া যায়?”-“প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে সেটাই দিতে

হবে। ভ্যাটেনারীর সরঞ্জাম তো আর নেই আমাদের কাছে।"

-"তো নিয়া আসো! চেহারা দেখতেছ আমার? এমনি সময় তো তাকাও না!"

অন্তূ চলে গেলে বিরবির করে বলে, "এজন্যেই মেয়েলোকের বুদ্ধি হাঁটুর নিচে!"

জয় যত্ন করে ডেটল লিক্যুইড লাগায়। অন্তূর কেমন ঘোর লেগে আসে চোখে। বড় কুকুরটা অস্থির হয়ে ঘুরঘুর করছে বাচ্চার পাশে। একবার জয়ের গা ঘেঁষছে, আবার মুখ ঠেকাচ্ছে বাচ্চার শরীরের সাথে। অন্তূর বুকে ব্যথা ওঠে। আব্বুর মুখটা বুকের মাংস খাবলে ধরে। জয় কোলের ওপর ছোট্ট কুকুরটাকে

রেখে গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। অন্তূ বসে পাশে। একটু দ্বিধা নিয়ে হাত বাড়াতে যায় কুকুরের দিকে। আবার গুটিয়ে নেয়। ভয় হয়, যদি কামড়ে দেয়! জয় বলে, "থাক, হাত দিও না। হাতে নোংরা লাগবে। ভয় পাচ্ছ যখন, তখন আর ন্যাকামি করতে হবে কেন? ওড়না ভালোভাবে মাথায় টেনে নাও, অর্ধেক চুল তো বের হয়েই আছে।"অন্তূ গাঢ় চোখে তাকিয়ে ব্যঙ্গ হেসে বলে, "শয়তানও বোধহয় আপনাকে দেখে ভাবে, যখন আপনাকেই তৈরি করা হবে, তখন তাকে বানানোর কী দরকার ছিল?"

কুকুরের গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বলে জয়, "ওরে শালি! আয় তাইলে আইজও লোক জড়ো করে খুলে ফেলি ওড়নাটা?"

-"তা বোধহয় করবেন না। আজ তো আবার ওই একটা তথাকথিত পরিচয় আছে আমার! আপনার বউ। তো আমার ইজ্জত গেলে আগে যাবে আপনার। আর আপনাদের কাছে তো স্বার্থপরতাও লজ্জা পেয়ে যায়। আপনাদের বাড়ির মেয়ের ইজ্জত দামী। আর আমার বাপের মেয়ের ইজ্জত থুতুর বদলা নেবার উপাদান! এই দেখুন, এখন আমার আবার ইচ্ছে করছে, থুহ করে একদলা থুতু আপনার

মুখে ছুঁড়ে মারতে। শ্যাহ! কী বলব বলুন, জয় আমির! গালে আমার একমুঠো আউশ চাল।"

অন্তূ আর দাঁড়ায় না কথাগুলো বলে।তুলি এবং শাহানাকে একসাথে ভর্তি করানো হবে হাসপাতালে। তুলির এবোর্শান, শাহানার চিকিৎসা।

খানমান পাতার সাথে কালোজিরে ভর্তা জয়ের খুব পছন্দের। সেটা ভেজে রেখে অন্তূ কোয়েলকে গোসল করাতে যায়। তুলির অসুস্থতা বেড়েছে খুব। গোসল করাতে করাতে বেশ আনমনা হয়ে পড়ছিল অন্তূ। আজ কয়টা দিন ধরে এত বেশি চাঁদনীর কথা মনে পড়ে। আঁখির লাশ, সালমার কান্না,

সোহেলের মৃত্যু! অন্তূর পাগল পাগল লাগে। এত এত জটিলতা! কতরকমের কত কী বয়ে চলতে হচ্ছে, এবং স্বাভাবিকভাবে। জলে বাস করে কুমিরের সাথে লড়াইটা কতটা সুখকর হবে? চাঁদনী কোথায় গেছে? কী হয়েছে ওদের? মুস্তাকিনের সাথে দেখা নেই কতদিন! সেই লোকই বা কী করছে?রান্নাঘর থেকে শিল-নোড়ার আওয়াজ আসছিল। অন্তূ ব্যস্ত হয়ে বলল, "তরু, এটা আমার কাজ। তুমি কেন করছো? আমি বাটবো, তার আগে কোয়েলকে গোসল করিয়ে এলাম। ওঠো তুমি, আমি করছি।"

ভাত উতলাচ্ছিল চুলোয়। আঁচ কমিয়ে দিল অন্তূ। তরু বলল, “অধিকার নেই, তাইনা?” -“এগুলো নাটকীয় ভাবনা। আমি নাটক এড়িয়ে চলতে পছন্দ করি। তুমি বোধহয় জানো, জয় আমিরের সাথে আমার তেমন সম্পর্ক না। তবে তথাকথিত সম্পর্কের জের ধরে এসেছি যখন এ বাড়িতে, কাজটাও আমারই। তুমি করছো, আমার ভালো লাগছে না বিষয়টা।”-“তুমি আমার সাথে যে ভালো আচরণটা করো, সেটা মন থেকে করো, নাকি লোক দেখানো?”

অন্তূ মুচকি হাসল। অল্প একটু লবন তুলে পাটায় দিলো। তরু আজ প্রথমবার খেয়াল

করল, অন্তূ হাসেও। খুব নিষ্পাপ হাসিও হাসতে জানে এই মেয়ে। তখন এত স্নিগ্ধ লাগে! অথচ সবসময় মুখটা কেমন গম্ভীর, আর চোখদুটো জ্বলজ্বল করে জ্বলে। আজ নতুন এক অন্তূকে দেখে তাকিয়ে থাকে। অন্তূ হাসি ঠোঁটে রেখে বলে, "আব্বু কী বলতো জানো? আব্বু বলতো,'তুমি একটি সতন্ত্র আয়না হও

মানুষ তোমার সম্মুখে যে অঙ্গভঙ্গিতে এসে দাঁড়াবে,

তুমি ঠিক তার প্রতিবিম্ব হয়ে যাও।

লোকে যা করবে, সেটাই তুমি নিজের মাঝে দেখিয়ে দাও।'

আমি কথাটা খুব মানি, তরু।

‘আমার সম্মুখে কেউ উষ্ণ, আমি গরম

সে ঠান্ডা, আমি শীতল

সে কঠিন, আমি নিষ্ঠুর

সে ব্যথিত, আমি ব্যথাতুর!’তুমি কখনও খারাপ আচরণ করোনি আমার সঙ্গে। তুমি কষ্টগুলোকে ভেতরে পুষে ধুঁকে ধুঁকে সঁয়েছ। তুমি ছিলে নীরব। তোমার সঙ্গে খারাপ আচরণ করার প্রশ্নই ওঠেনা। বরং তুমি যদি চাও, আমরা ভালো বন্ধু হতে পারি। তুমি আমার ছোট-বড় নও, সমবয়সীই হবে, রিমি ভাবীর মতো। বন্ধু হবে?”

তরুর হাত থমকি গেল। অন্তূর মতো একগুঁয়ে, গম্ভীর মেয়ের কাছে বন্ধুত্বের প্রস্তাব আশাতীত লাগে তার কাছে। অন্তূকে প্রথমদিন থেকে খুব চাপা আর অদ্ভুত মেয়ে হিসেবে দেখেছে। আজ খুব অন্যরকম লাগল। ওকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অন্তূ হাসল, "হবে তোমার আমার ওপরে অনেক ক্ষোভ। কিন্তু আমি যদি বলি, আমি তোমার সবচেয়ে সবচেয়ে উপকারী মানুষটা! মানবে? "তরু জবাব দিলো না। অন্তূ ঠোঁট প্রসারিত করে প্রলম্বিত মুচকি হেসে বলল, "ধরো, তোমার দিকে একটা বিষধর সাপ এগিয়ে আসছিল তোমাকে বিষদাঁত ফোটাতে। তুমি

তাকে সাদরে আহব্বান করছিলে, কারণ তোমার ধারণায় সে বিষধর নয়। মাঝখান থেকে আমি সাপটার লেজে পাড়া দিয়েছি। সাপ তখন কী করল বলো তো! তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে ছোবলটা আমায় মারল। বুঝতে পারছো আমার কথা? অজান্তেই জয় আমিরের লেজে পা রেখে তোমার ছোবলটা বোধহয় আমি খেয়েছি। একটা মানুষকে আমরা চেনার বাইরেও তাকে চেনা এবং জানার মতো বিস্তৃত ব্যাপার থাকতে পারে। ঠিক যেমন আমি যেটুকু জানিনা বা বুঝিনা, তুমি ঠিক সেটুকুই জানো জয় আমিরের ব্যাপারে। অপরদিকে তুমি যেটুকু জানো বা

ধারণা নেই সেইটুকুই আমার জানা এবং দর্শনে জয় আমির।"

অন্তূ ভাত মার ফেলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তরু বেশ খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে অন্তূর দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করে, "জয় ভাইয়া কী করেছে তোমার সাথে?"

অন্তূ মনোযোগ সহকারে ভাতের মার ফেলতে ব্যস্ত। তরু উত্তরের আশায় চেয়ে থাকে।

হুমায়ুন সাহেব টিভিতে খবর দেখেন, আবার রোজ নিয়ম করে পত্রিকাও আসে বাড়িতে। হামজার পত্রিকা পড়ার অভ্যাস আছে। রিমি সেগুলো জড়ো করে পত্রিকার ঝুড়িতে রাখে। সেখান থেকে অন্তূ এনে পড়ে। রোজ রোজ

সহিংসতা, খু-ন, ফাঁসি, বোমাবাজি, হামলা, অবিচার...২০১৫ এর ফেব্রুয়ারিটা এই করেই চলে গেল। ২০১৪ এর নির্বাচনের বছরপূর্তিতে দেশ এতটা উত্তাল হয়ে উঠছে কেন, তার জবাব আছে, তবে সেসব ব্যাখ্যা না করা ভালো। বিরোধী দলীয় চেয়ারপার্সন অবরুদ্ধ, মহাসচিব গোয়েন্দা দফতরে আঁটক। তাদের রুখতে প্রসাশনের সাথে সাথে রাজনৈতিক কর্মীরাও সমানতাল দিয়েছে। অন্তূ ভাবে এর মাঝে কি জয়, হামজা নেই? এরা বিরোধী দলকে থামাতে কিছু করছে না? গাড়ি ভাঙচুর, আগুন দেয়া, অবরোধ চলছে তো চলছেই।প্রশাসনের চেয়ে এগিয়ে আছে

রাজনীতিবিদরা। তারা প্রতিরোধে নেমেছে। কয়টাদিন জয়, হামজাকে দিন-রায এক করেও বাড়িতে পাওয়া যায়না। মিছিল যায়, অন্তূ তা ঘরে বসে শোনে। জয় ফুরুৎ করে আসে। গালে মুখে কয়েক মুঠো গিলে, পোশাকটা পরিবর্তন করে বেরিয়ে পড়ে ফের। কোথায় যায়, কী করে সেসবের খবর নেই। মহাব্যস্ত তারা। বিরোধী দলকে রুখতে তাদের পায়ের সুঁতো ছিঁড়েছে। এদে, কিছু না। এরা মরল, বাঁচল সবই এদের হাতে কামাই। শিকার সাধারণ মানুষ। রাস্তায় নিরাপত্তা নেই, চলাচলে শান্তি নেই, সারাক্ষণ আতঙ্কে রাস্তাঘাট জর্জরিত। এই বুঝি আগুন জ্বলে

উঠল, লেগে গেল মারামারি। পুলিশ এলো, গোটাকয়েক লোককে গ্রেফতার করে নিয়ে চলে গেল। তখনও রাস্তার মাঝে আগুন জ্বলছে, গাড়ি পুড়ছে, কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলি মিশছে বাতাসে।

ফের যেন ২০১৩ ফিরল ফিরল রব। চারদিকে হাহাকার, রক্ত, আর বন্দিত্ব। আবার সেই ২০১৩, আবার ফাঁসি, আবার গ্রেফতার...!অন্তূ জয়ের রকিং চেয়ারটায় বসে রাতের পর রাত ভাবে, আর দোলে। তার চোখে ঘুম নেই। মাঝেমধ্যে আব্বু এলে কথা হয়। জয়, হামজা কত রাত বাড়ি ফেরে না। কোথাকার কোন বৈঠকে, সম্মেলনে পড়ে থাকে।সারারাত

বাইরে থেকে সকাল এগারোটায় জয় বাড়ি ফিরল একবার। পরনে কালো পাঞ্জাবী, ডান হাতে ঘড়ি, বাঁ হাতে রূপোর রিস্টলেট ঝুলছে কব্জির ওপর। পায়ে চামড়ার স্যান্ডেল। পরিপাটি পরিচ্ছদ। কিন্তু চুলগুলো এলোমেলো, চোখদুটো রক্তলাল। সারারাত নির্ঘুম থাকার ফল। মুখটা গাম্ভীর্যে ছেয়ে আছে, যেটা পাঞ্জাবী গায়ে চড়ালে আপনা-আপনি চলে আসে তার চেহারায়। তখন দেখতে পাক্কা রাজনীতিবিদ লাগে।

রিমি খাবার বেড়ে দিলে পাঞ্জাবীর হাতা গুটিয়ে বসে পড়ল। গপাগপ খেতে শুরু করার কথা এখন। কিন্তু তা করছে না জয়।

রিমি আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, “আপনার ভাই কোথায়?”-“কাজে আছে।”

রিমি চুপচাপ চলে যাচ্ছিল। জয় ডাকল, “ভাবী?”

-“কিছু দরকার?”

-“হাত কাটা আমার। খাইয়ে দেন। কাটছে তো কাটছে, শালা ডান হাতটাই! নাকি চামচ দিয়ে চালাব?”

ডানহাতের পুরো তালুটা ব্যান্ডেজে জড়ানো। রিমি নাক-মুখ কুঁচকে বলল, “আর নাটক করবেন না তো। এমনিতেই আপনাকে দেখলে গা জ্বলে আমার, তার ওপর যদি ঢং করেন।”

এগিয়ে এসে প্লেটটা ঝারি মেরে কেড়ে নিয়ে খাবার মাখাতে শুরু করে। জয় অল্প হাসল নিঃশব্দে। খাবার মুখে নিয়ে থু থু করে ফেলে দিলো, “সেই বালের মাছই দিছেন? হাজারবার কইছি, মাছ পছন্দ না আমার। মাছ আমি খাই না। আর কিছু নাই? তা দিয়ে ভাত দেন।”

রিমি ধমকে উঠল, “এত আহ্লাদ কীসের আপনার? যা দিচ্ছি, তাই দিয়ে খেয়ে উঠুন। আপনার মতো দামড়াকে খাওয়ানো ছাড়াও আরও কাজ থাকে আমার।”-“আর কিছুই রান্না করেন নাই?”

তরু আজ আর ডিম ভাজতে গেল না। তার চোখে-মুখে কীসের যেন ক্ষোভ দেখা যায় জয়ের জন্য। এই ঘৃণাটা জয় অন্তূর চোখে দেখেছে। তা দেখে মুচকি হাসল জয়।

আরমিণ বাড়িতে পা রাখার পর পরিবেশ বদলেছে, চেনা পরিবেশ অচেনা হয়েছে। তার কবুতরগুলোকে সময় দেয়া হচ্ছে না আজকাল। ছাদে দানা ছিটিয়ে, পানি দিয়ে খোপগুলো দেখল। নতুন ডিম ফুটলে খুব খুশি লাগে!

জয় জীবনে যতবার এলার্ম সেট করেছে, কিছু না কিছু কাণ্ড ঘটেছে। শেষরাতে এসে ঘুমানোর পর সকাল সকাল এলার্ম বাজলে

ফোন তুলে ঝাটাকসে এক আঁছাড়, ফোন ভেঙে ছয় টুকরো। এভাবে কয়েকটা ফোন ভাঙল। একদিন এই দুঃখে সে একটা তরতাজা মোরগ কিনে এনেছিল। সে শুনেছে, মোরগ রোজ ভোরে চেঁচায়, তাতে ঘুম ভাঙে। এভাবে দু-তিনদিন মোরগটা চেঁচালো। কিন্তু সহ্য করা যাচ্ছিল না আর।একদিন সকাল চারটার দিকে এসে ঘরে এসে শুয়েছিল জয়। মোরগ তার খানিক বাদেই আল্লাহর নামে গলা ফেঁড়ে ডাকাডাকি শুরু করল। একলাফে বিছানা ছেড়ে উঠে ছাদে গিয়ে মোরগটাকে জবাই করে নিচে এসে রিমির হাতে মোরগ ধরিয়ে দিয়ে বলল, “আজ মোরগের ঝোল

খাবো দুপুরে। ভালো করে কষিয়ে রান্না করবেন।”

কিন্তু কবুতর ভোরে চেঁচায় না। সে নিত্য নতুন জাতের কবুতর এনে ছাদ ভরে ফেলেছে।

অন্তূ বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। জয় ঘরে আসতে আসতে ডাকল, “ময়নার মা, ঘরে আছো? ও ময়নার মা?”

অন্তূ নাক কুঁচকায়, হোয়াট ইজ ময়নার মা?

জয় ঢুকল, আর অন্তূ তাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল রুম থেকে। জয় বিছানার চাদর ফেলে তোষক টেনে তুলে কাঠের ক্লেটগুলো উঠিয়ে ফেলল। টাকা অথবা অস্ত্র থাকার

কথা। নেই। এক ঝটকায় মাথায় রক্ত উঠে গেল। কপালে আঙুল চেপে ধরে ডাকল,

“আরমিণ! আরমিণ....”

রিমি বসার ঘরের সিলিং ফ্যান পরিস্কার করাচ্ছে এক ছোট ছেলেকে দিয়ে। অন্তূ ঘরে ঢুকল, “জি!”-“টাকা কোথায়?”

-“টাকা? ওগুলো টাকা ছিল না। কাগজ ছিল, টাকার মতো দেখতে। মূর্খ নাকি আপনি? জাল টাকা কি টাকা?”

জয় দাঁত কিড়মিড় করল, “ধৈর্য্যের পরীক্ষা নিও না। টাকাগুলো কোথায়?”

-“পুড়িয়ে দিয়েছি।”

-“পুড়িয়ে দিয়েছিস?”

-"হ্যাঁ, পুড়িয়ে দিয়েছি।"

জয় থাবা দিয়ে ধরল অন্তূকে। গায়ের ওড়না টান দিয়ে খুলে অন্তূর গলায় পেঁচিয়ে ফাঁস টেনে বলল, "খানকির মেয়ে, আরেকবার বল, 'টাকা পুড়িয়ে দিয়েছিস।"

অন্তূ জয়ের পাঞ্জাবীর কলার চেপে ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে দক্ষিণ দিকের জানালার দিকে নিয়ে যেতে যেতে বলল, "এবার আর বলব না, চল দেখাই তোকে। তোদের কালো বাজারীর মাল আমি পুড়িয়ে দিয়েছি। যা দেশের-দশের ক্ষতি করে, তা বিছানার নিচে রেখে আমি চোখ বুজে ঘুমাতে পারি না।"ওড়নার ফাঁস শক্ত করে জয়।

অন্তূও ঠিক একইভাবে জয়ের বুকের ত্বক খামচে ধরে চিবিয়ে বলল, "আমি ব্যথা পাচ্ছি, ওড়নার প্যাঁচ শিথিল করুন।"
-"তোর এত সাহস ক্যান মাগীর বাচ্চা, হ্যাঁ? ভয় লাগে না তোর আমাকে?"
-"আপনাকে ভয়? কোনো তো কারণ থাকা চাই কাউকে ভয় পাবার? আপনার মতো কাপুরুষকে ভয় পেয়ে আমি আমার নারীসত্ত্বাকে কলঙ্কিত করতে দুনিয়াতে জন্মাইনি, জয় আমির।"
জয় এতই জোরে ফাঁস আঁটকে ধরল, অন্তূর চোখ উল্টে আসার উপক্রম হলো। অথচ অন্তূ দমল না। জয় নিজেই হার মেনে হাত শিথিল

করে গাল চিপে ধরল, "মনডা চাইতেছে ঠ্যাঙ বরাবর টান মেরে ছিঁড়ে দুইভাগ করে ফেলি। তোর সাথে কী করা উচিত, বুঝেই উঠতে পারতেছি না আমি। হয়রান লাগে খুব।"

অন্তূ বলল, আমি ব্যথা পাচ্ছি। ছেড়ে দিন আমাকে। আমি আবলা নারী না। স্বামীর নির্যাতন সহ্য করার মতো ক্যাপাসিটি আপাতত অন্তত নেই আমার মাঝে।"-"তুই টাকা পোড়াইছিস ক্যান, শুয়োরের বাচ্চা? সত্যি কথা বল, কোথায় রাখছিস টাকা। বাইরে লোক দাঁড়ায়ে আছে কিন্তু। এইখানেই জ'বা"ই করে মেঝেতে দা"ফ'ন করে রেখে যাব একদম।"

অন্তূ নরম হলো, “কোথায় যাবেন ওই টাকা নিয়ে?”

জয় তাতে একটু বিভ্রান্ত হলো, “কোথায় টাকা?”

-“জালটাকা দিয়ে কী করেন আপনারা? আপনারা না দেশপ্রেমিক?”জয় আবার নিয়ন্ত্রণ হারাল। কিন্তু অন্তূকে ধরার আগেই অন্তূ জয়কে ধাক্কা মেরে জানালার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, “দেখতে পাচ্ছেন? কালো ছাইয়ের স্তূপ, দিয়াশলাইয়ের বাক্স, আপনার আধখাওয়া মদের বোতল! পুড়িয়ে দিয়েছি। কাল যখন ইনশাআল্লাহ আইনজীবী হবো, নিজের ভেতরটা যখন আমার কাছে কৈফিয়র

চাইবে–আমি একসময় আমার সামনে দিয়ে আমার দেশের নিরীহ জনতাদের অধিকার নষ্ট হতে দেখেছি, দেশের ক্ষতি হতে দেখেছি, কিন্তু কিছুই করিনি, নিজের কাছে বড় ছোট হয়ে যাব। এই গ্লানিটুকু যাতে না বইতে হয়, ব্যাস পুড়িয়ে দিলাম।"

জয় ওড়না ছেড়ে দিয়ে হতবাক হয়ে চেয়ে রইল, "এ চেংরী, তুই কি পাগল রে! পাগলামী শুরু করছিস? শালা আমিই তো ভু/দা/ই হয়ে গেছি রে। তুই আজ কয়দিন করছিসটা কী? সিরিয়াসলি, এত ধৈর্য্যশীল না আমি। ওই...ওই তুই.... বাপ, তুই কী মনে করিস, আমায়?"জয় মাথার চুল টেনে ধরে

বিছানায় বসে পড়ল। বিশ্বাস করা শক্ত, একটা মেয়ে ওর সাথে কী কী করে যাচ্ছে! ওকে হার মানতে হচ্ছে মেয়েটার জেদ আর সাহসের কাছে। পলাশকে কী বলবে? এর মধ্যে মাজহারদের ভাগ ছিল। নতুন শত্রুতা তৈরি হবে ফের। ওদেরকে বোমা মেরেও বিশ্বাস করানো যাবে না যে, কোনো মেয়েলোক জয়ের বিরুদ্ধে গিয়ে এতদূর পৌঁছাতে পারে।

-"আর অস্ত্র! সেইসবের কী করছিস, চুদির বোইন? তোরে আমি..."

অন্তূ শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করল, "কী করবেন অস্ত্র দিয়ে?"

অথচ জয় এক মুহুর্তের মাঝে উঠে দাঁড়িয়ে পিস্তলটা ঠেকালো অন্তূর থুতনির নিচে, "একদম পুঁতে ফেলব ওইগুলার কিছু হইলে! দাম তোরে বিক্রি করে মেটাবো, শালি! আমি বের হব। তাড়াতাড়ি ক অস্ত্র কই, খা-ন-কি-র বাচ্চা!''

-"আমার আম্মু সেরকম না। নিজের পরিচয় আমার ওপরে চাপানোর চেষ্টা করবেন না। ''জয়ের নিজেকে পাগল পাগল লাগল এক মুহুর্ত। বন্দুকের নলকে কণ্ঠনালির ওপর রেখে অন্তূ যা করছে, তা জয়কে হতবিহ্বল করে তুলল।

কিন্তু পরিস্থিতি স্মরণে আসতেই জয় নিয়ন্ত্রণ হারালো, অধৈর্য্য পশুর মতো অন্তূকে ছেঁচড়ে নিয়ে দেয়ালের সাথে বাড়ি মারল অন্তূর পিঠটা। দুম করে আওয়াজ হলো একটা। অন্তূ কোনোভাবেই তাগড়া জয়ের শরীরের শক্তির সাথে পেরে উঠল না, ঠিক যেমন সেদিন রাতে পারেনি নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করতে। মেরুদণ্ডের হাড় মচমচ করে উঠল।

তবু বলল না, অস্ত্র কোথায়। ব্যথাগুলো আর অনুভূত হচ্ছে না। আব্বুর মুখটা খুব মনে পড়ছে। আব্বু অন্তূকে সবসময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে শিখিয়ে শেষ অবধি মরণ দিয়ে গেছে নিজ হাতে।

জয়ের কল বাজল। জয় অন্তূকে চেপে ধরে রেখে অন্য হাতে ইন-কামিং কল রিসিভ করে বলল, "আসতেছি। দাঁড়ান নিচে। আর যেন কল না আসে আমার কাছে।"

ফোন বিছানায় ছুঁড়ে মেরে অন্তূকে বলল, "ওই এইদিক তাকা। আমায় ভো–দা–ই মনে হয় তোর, হ্যাঁ? ভয় লাগে না একটুও? তোর কি মনে হয়, আমি দূর্বল তোর ওপর? ছাড় দেই বেশি, এইজন্য?"

-"কোনটাকে ছাড় দেয়া বলছেন? আমি শুনতে চাই।"-"এত কথা বলিস কেন তুই?"

-“কথা আমি কম বলি। কিন্তু বলি তিক্ত কথা। যা শুনতে ভালো লাগে না। তা এমনিতেই বেশি মনে হয়।”

-“আরমিণ! তোর লইয়্যার-স্পিচ আমাকে শোনাবি না। কসম জিহ্বা টেনে ছিঁড়ে আনবো। নিচে গাড়ি দাঁড়ায়ে আছে, রাজধানীতে যাওয়া লাগবে রাতের মধ্যে। টাকার জন্য আপাতত কিছু বলতেছি না। অস্ত্র লাগবে, এক্ষুনি লাগবে। বুঝতেছিস তুই?”

-“কেন লাগবে অস্ত্র?”

-“তাতে তোর যায়-আসা যাবে না। তোরে আইনজীবী হিসেবে ঘরে আনি নাই।

-“তা ঠিক। কিন্তু আমার ভেতরে তো সেরকমই কিছুর বসবাস। চোখ ও হাত অক্ষত থাকতে স’ন্ত্রা’সীদের হাতে মরণ-খেলনা তুলে দিতে পারি না।”

জয় কিছুক্ষণ অন্তূর চোখের দিকে চেয়ে থেকে চট করে হেসে ফেলল, “তাইলে চোখ আর হাত দুইটা আলাদা করে দেই তোমার সুন্দর দেহ থেকে?”-“করতে পারেন। আমারও দায়ভার কমে যেত!”

-“ঘেন্নাই যখন করিস তখন আমার জিনিসে হাত লাগাস ক্যান? তোরে বলছি না, আমার কাজ থেকে দূরে থাকবি? তুই চাস না, তোর কাছে আসি না, দূরে থাকি। তোরে খাওয়া,

পড়া, কীসের অভাবে রাখছি? আমি যাই করে বেড়াই তাতে তোর কী?"

অন্তূ কিচ্ছু বলল না। পিঠটা অসহ্য ব্যথায় ভেঙে আসছে। খানিক বাদে ক্লান্ত হয়ে ছেড়ে দিল জয়। সামনের মানুষটার চোখে ভয় বা উদ্বেগ না দেখলে অত্যাচারের শক্তিটা ম্রিয়মাণ হয়ে আসে। তার জেদের সামনে কখনও কেউ দাঁড়াতে পারেনি। কিন্তু অন্তূর একগুঁয়েমি আর চোখের তেজে কোনো দূর্বলতা খুঁজে পায় না জয়।

জয় ফ্যান চালিয়ে ঘর্মাক্ত শরীরে পিস্তল রেখে ধপ করে বসে বিছানায়। পাঞ্জাবীর বোতামগুলো আলগা করল। কপালের কিনারা

বেয়ে টপ টপ করে ঘাম ঝরে পড়ছে। চুলগুলো চপচপ করছে ঘামে ভিজে। ড্রয়ার খুলে রিমোট বের করে এয়ারকন্ডিশনার অন করে দিলো। দরজা- জানালা সব খোলা। অন্তূ আস্তে কোরে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল। হাত, গাল, পিঠ বলছে, 'অন্তূ একটু কেঁদে নে।' অন্তূ তাদেরকে বলল, 'আমার কেউ নেই রে। একা একা কাঁদতে নেই, কান্না দেখার লোক না থাকলে। আমার কান্না শুনে ব্যথিত হবার কেউ নেই আমার কাছে। কিন্তু তা দেখে আমার দূর্বল বুঝে হেসে ওঠার লোক অনেক।''-"অস্ত্রগুলো কোথায় রেখেছিস, আরমিণ?''

-“না দিলে কি মেরে ফেলবেন?” অন্তূর গলার স্বর বসে গেছে।
জোরে জোরে শ্বাস নিতে নিতে বলল জয়, “বুঝতে পারছি না।” আঙুল দিয়ে কপাল চিপে ঘাম ফেলল।
-“ভেবে বলুন, না দিলে কী করবেন?”
-“এসিড মেরে জ্বালিয়ে দেব, তোকে।”
ক্লান্ত স্বরে বলল অন্তূ, “তাই করুন তাহলে। আমারও বেঁচে থাকতে ভালো লাগছে না। খুব বিরক্ত হয়ে গেছি। ধুর, এটা কোনো জীবন হলো?”-“তবুও বলবি না, ওগুলো কোথায়?”
-“নিজের মুখে অন্তত না। মুখ আমার কাছে কৈফিয়র চাইবে।”

জয় শব্দ করে শ্বাস ফেলল, "তোমার দুঃসাহসের পরিণাম তোমার পরিবারের ওপর গড়াতে খুব কষ্ট হবে আমার, ঘরওয়ালি।"
অন্তূর ভেতরটা আঁৎকে উঠল। তা চেপে হাসল সামান্য, "লাভ কী হবে তাতে, এই বিরোধিতার সীমা বাড়া ছাড়া? আব্বু বলতো, বাঁকা লোহাতে বেশি জোরে আঘাত করলে তা সোজা হবার বদলে উল্টো দিকে বেঁকে যায়। সেটাতে আপনি যো জোরে আঘাত করবেন, তা সোজা হবার মাত্রা ছাড়িয়ে তত বিপরীতে বাঁক নেবে।"
জয় কিছুক্ষণ চুপচাপ চেয়ে রইল অন্তূর মুখের দিকে। অন্তূ নিজের বাঁ হাতের তালুর দিকে

চেয়ে আছে। জয় জিজ্ঞেস করল, "কেমন মৃত্যু চাও, তুমি?"

অন্তূ যেন সম্বিত পেল, "হু?" মুচকি হাসল, "আপনার খুশিমতো, যা দেবেন, সব মঞ্জুর!"

জয় চোখ বুঁজে শক্ত ঢোক গিলল, "অস্ত্রগুলো কোথায় রেখেছ?"

অন্তূ সেই একই প্রশ্ন করে, "কী করবেন আপনারা অস্ত্র দিয়ে?"

জয় হার মানল, "রাজধানীতে সম্মেলন আছে। লাগবে ওগুলো। বের করে দাও।"

অন্তূ ক্ষণকাল চুপ থেকে বলল, "রাজনীতি কাকে বলে?"

-"বুঝি না, আমি। অস্ত্রগুলো বের করে দাও।"

-“বিরোধী দলের করোটি উড়াতে খুব দরকার, তাই তো? বুঝি আমি। রাজনীতির জন্মলগ্নে তাদ মূলনীতি ছিল, জনসেবা। সেসব এখন পুরোনো হয়েছে। এখনকার মূলনীতি হলো, গদিতে বসা। আর গদিতে বসতে হবে বিরোধী দলের আগের করা শত্রুতার প্রতিশোধ নিতে। কে কী করেছিল, কে বিরুদ্ধে কথা বলছে, কে প্রতিবাদ করছে.. এটা গণতন্ত্র! কিন্তু পাঁচবছর ফুরোলেই গদি ছেড়ে সুষ্ঠু নির্বাচন হতে দিতে হবে, এমন কোনো সংবিধানও নেই। এই পাঁচ বছরে যা করা হলো গদিতে থেকে, গদি থেকে নামলে বাঁচার উপায় আর থাকে না। সুতরাং

পরেরবারের নির্বাচনে যে করেই হোক গদিতে থাকতে হবে, অন্তত বেঁচে থাকার জন্য। নয়ত বোরকা, শাড়ি, গাউন পরে বিদেশ পালাতে হবে।''

জয় চুপ করে বসে ছিল। সে বেশ মনোযোগী শ্রোতা। কাজুবাদামের পাত্রটা তুলে নিলো। কয়েকটা চিবোতে চিবোতে বলল, কেউ একজন বলেছিলেন, রাজনীতি নিয়ে কোনোকিছুর ব্যাখ্যা করছেন তো আপনি হেরে যাচ্ছেন। রাজনীতি অব্যাখ্যাত। শের-ই-বাংলা বলেছিলেন, লাঙল যার, জমি তার। লাঙল ছাড়া যাবে না।''

অন্তূ হাসল, অথচ আপনারা জমির মালিক নন। লাঙলচাষী কেবল। যারা অন্ধ। হাতরে হাতরে চিরকাল রোদে পুড়ে, কাদায় নেমে গতর খাটিয়ে লাঙল চষে যাবেন, কিন্তু ভাই, জমির মালিক মহাজন।

শিক্ষিত আপনি। এটুকু বুঝতেই চলতো, আপনারা হাতিয়ার। দিনশেষে একটা রাষ্ট্র, একটা সমাজ, একটা পরিবার, একটা ব্যক্তি, একটা জীবন ও একটা পরকাল নষ্ট। অথচ কোনো এক মহাজন গদিতে বসে তার দক্ষ হাতে একসঙ্গে এতকিছু ধ্বংস করে যাচ্ছে প্রতিক্ষণে।আপনারা ওই দলকে মারতে যাবেন, ওরা আপনাদের মারতে আসবে।

এতে প্রধানদের দলীয় বিরোধ বজায় থাকবে। মাঝের ক্ষতি আপনার, বিরোধী কর্মীর, জনগণের। হাসিল মহাজনের।

জয় একবারও দৃষ্টি ফেরায়নি, যতক্ষণ অন্তূ কথা বলেছে। মনোযোগ দিয়ে শুনল কথাগুলো। অন্তূ থামলে বলল, “এমনও হতে পারে, আগে আমার ওপর হামলা হয়েছে, তার পর আমি শুধু প্রতিক্রিয়া দেখাতে যাচ্ছি!
”

অন্তূ হেসে ফেলল, “এমনও হতে পারে, তার আগে আপনি হামলা করেছিলে, এরপর তারা প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, এখন আপনি, এরপর আবার তারা, এরপর আপনি....চমৎকার চক্র

না? আমার তো বেশ লাগছে। এটাই এতক্ষণ বুঝিয়েছি, আপনি বোঝেননি। যেই দলই নির্বাচন জিততে চাউক না কেন, উদ্দেশ্য তো সেই একাটাই— ক্ষমতা প্রাপ্তি, আর সেই ক্ষমতায় বিরোধীদের কাছ থেকে আগের করে রাখা আক্রমণের প্রতিশোধ তোলা।''-“আমার বিষয়টা আলাদাও হতে পারে।''

-“আপনি নিজেকে ডিফেন্স করার চেষ্টা করছেন, জয় আমির! যেটা আপনার সাথে একদম মানায় না।''

জয় হাসল, “এত সততা দিয়ে কী করলে জীবনে?''

-“আপনার অনুশোচনা হয় না?''

জয় মাথা নাড়ল, “অনুশোচনা হলে পাপীরা বাঁচে না আর, ঘরওয়ালি। হয় বুক পেতে দেয়, নয়ত আত্মহত্যা করে। আমার কিছুদিন বেঁচে থাকা দরকার।”

-“সেই লোভও বিশেষ একটা নেই আপনার! তা জানি আমি। শুধুই নিজেকে ক্ষয় করতে ছুটে চলেছেন। ফিরে আসার পথ নেই?”

-“ইচ্ছেও নেই। অভ্যাস হয়ে গেছে।”অন্তূর পিঠে অসহ্য ব্যথা অনুভব হচ্ছিল। পাঁজরের হাড়ে টাস ধরে আসছিল। জয় কিছুক্ষণ অন্তূর দিকে চেয়ে থাকল ভ্রু কুঁচকে। কী আন্দাজ চট করে উঠে গিয়ে আলমারী খুলল! আলমারীর ড্রয়ারের নিচে ফাঁকা

চেম্বারগুলোতে অস্ত্রগুলো গাদা করে রাখা। এত সামনে অস্ত্রগুলো রেখেছে অন্তূ, পাল্লা খুললেই দেখা যাবে। অল্প-সল্প বিরক্ত হলো জয় নিজের ওপর। তার আচরণ তার কাছে অসহ্য ঠেকছে।

অস্ত্রগুলো ব্যাগে ঢুকিয়ে এনে অন্তূর সামনে দাঁড়ায় জয়, "প্রথমে বললেই হতো, আলমারীতে আছে।"

অন্তূ তাকিয়েও দেখল না জয়কে। জয় আস্তে করে বলল, "আমি না থাকলে তোমাকে বাঁচানোর কেউ থাকবে না।"

অন্তূ পিঠ চেপে ধরে দাঁড়াল জয়ের সামনে, "ওষুধ খেয়ে রোগ সারানোর চেয়ে, রোগ না

হওয়াটাই কি বেশি ভালো না? একই পদার্থে রোগ তৈরি ও সারানোর উপাদান থাকলে তা ক্ষতিকর হিসেবেই গণ্য হবে।"

জয় খুব কাছে এগিয়ে এলো অন্তূর। নরম হাতে থুতনি ছুঁয়ে দিলো অন্তূর, যেখানে পিস্তলের মুজেল ঠেসেছিল। অন্তূ চোখ বুঁজে নাক কুঁচকে ফেলে মুখ সরাতে চায়, যেন কোনো বর্জ্য-নোংরা তার চোয়াল ছুঁয়েছে। জয় ধরে ফেলল, ঠোঁটে হাসি রেখে বলল, "বাই এনি চান্স, আর ফিরে নাও আসতে পারি। আদারওয়াইজ, ফিরতে দু'দিন দেরি হবে। চোখের ঘৃণাটুকু বাঁচিয়ে রেখো। খরচা যেন না হয়। এই ঘৃণা যেন কখনও

অন্যকারও জন্য না আসে তোমার চোখে। এর ওপর শুধু আমার হক আছে।’’অন্তূ নির্বিকার দাঁড়িয়ে রইল।

-“একটা চুমু খাই?’’ জয় অন্তূকে বলার সুযোগ না দিয়েই বলল, “‘না’ বলবে না। তুমি চাও না বুঝে আমি কিন্তু কাছে আসি না। আজ যখন মুখে চেয়েছি, ‘না’ শুনতে ভালো লাগবে না। ‘না’ বললে যদি জোর করি, চুমুতে ফিল আসবে না।’’

অন্তূ নির্বিকার। জয় টের পায় অন্তূর দুইচোখের স্পষ্ট আক্রোশ। নিশ্চিত আঘাত করবে। গম্ভীর মুখে ঝারা মেরে ছেড়ে দেয় অন্তূকে। পাঞ্জাবী খুলে শার্ট পরে বিছানার

ওপর থেকে পিস্তল তুলে হোলস্টারে গুঁজে নেয়। অস্ত্রের ব্যাগ হাতে তুলে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে, "আসি, খেয়াল রেখো নিজের। বদদোয়া করতে ভুলে গেলে কিন্তু ফিরে এসে থাপড়াবো ধরে। প্রতিবেলা বদদোয়া চাই।" অন্তূ পিঠ চেপে ধরে ধপ করে বসে পড়ে মেঝেতে। ওভাবেই কতক্ষণ পড়ে ছিল পিঠের ব্যথায় অচেতনের মতো। আব্বু এসে বসেছে পাশে। অন্তূর আর কষ্ট হচ্ছে না। এবার কান্না পাচ্ছে। কান্না শোনার মানুষ এসেছে। অন্তূর ব্যথাগুলো অবশ হয়ে আসছে।শাহানার জরায়ুতে টিউমার। সেটার অপারেশন হামজা ঢাকায় করাতে চায়। ব্যথা নিয়ন্ত্রণের জন্য

ওষুধ চলছে। অন্তূ অসুখটা জানতে পেরেছে ক'দিন হলো।

তুলিকে প্রাইভেট ক্লিনিকে ভর্তি করা হলো। তরু সাথে গেছে। কবীর পুরুষের দায়িত্ব পালন করছে। শাহানা এবং হুমায়ুন সাহেব দুপুরের দিকে বেরিয়ে গেলেন তুলির কাছে। বাড়িতে তখন রিমি আর অন্তূ। রিমির সাথে বসে কথা বলতে খারাপ লাগে না অন্তূর। অনেক কথা বলা যায়। রিমি অবাক হয়ে শোনে, কখনও স্তব্ধ হয়ে যায়। কখনও দৌড়ে রুমে গিয়ে দরজা আঁটকে দেয়। অন্তূর কথা শুনতে তার ভালো লাগে। শুধু শুনতেই ইচ্ছে করে।ঘড়িতে তখন তিনটা বেজে আঠারো

মিনিট। দোতলার সদর দরজায় করাঘাত পড়ল। কলিং বেল থাকা সত্ত্বেও কেউ হাত দ্বারা দরজায় আঘাত করছে। দরজা খুলল অন্তূ। বুকের ভেতরটা এক মুহুর্ত ঢিপঢিপ করে উঠল। বিস্ময়কর দৃশ্য! সে কতদিন খুঁজেছে চাঁদনীকে। আজ চাঁদনী তার দুয়ারে। কিন্তু অদ্ভুত রূপে। অন্তূ মেলাতে পারল না বিষয়টা। চাঁদনী দাঁড়িয়ে আছে। তার সাথে দুজন মহিলা।বিকেলের নরম রোদ দোতলার সিঁড়িঘরের জানালা পেরিয়ে চাঁদনীর মুখে পড়ছিল। কী যে মোহিণী লাগছিল দেখতে। অন্তূর কপালটা সন্তর্পণে কুঁচকে যায়। পা

থেকে মাথা অবধি স্থির নজর ঘুরিয়ে দেখে বিস্ময়ে। ভ্রমের মতো লাগছিল।

আকাশী রঙা জামদানী শাড়ির পাড়টা সোনালী। দু-হাতে সোনালী রুলি বালা চাঁদনীর। বিশাল একটা খোঁপা করেছে ঘাঁড়ের ওপর। খোঁপাতে স্বর্ণালী মোড়ক। অন্তূ আন্দাজ করতে চায়, এটা ঠিক কতটা অভিজাত্যের পরিচয়! পরিমেয়, দুর্বোধ হাসি চাঁদনীর ঠোঁটে। ঊনিশ শতকের কোনো উচ্চ জমিদার বংশের ঠাকুরাইন/গিন্নি দাঁড়িয়ে আছে যেন তার সম্মুখে। দুটো দাসী সাথে। চাঁদনীর এই রূপ অন্তূর ভেতরে হাজারও সংশয় তৈরী করে। শাড়ির বিশাল আঁচলটা

পিঠ পেঁচিয়ে এনে বাঁ হাতের তালুতে ধরেছে। অন্তূর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষক নজর এড়িয়ে চাঁদনী অদ্ভুতভাবে মুচকি হাসে, "তুমি কিন্তু এখনও আমায় ভেতরে আসতে বলোনি।" রহস্যে ভিজে উঠছিল চাঁদনীর মুখখানা।

অন্তূ নজর নামায়, "আসুন।"

চলনের ভঙ্গিমাই অন্যরকম চাঁদনীর। সেদিনের মতো ম্লান নয় মুখশ্রী, হালকা প্রসাধনী আর অভিজাত্যে মেতে আছে চেহারাটা। রিমি চিনতে না পেরে তাকিয়ে থাকে। চাঁদনী সোফার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে বলল, "তুমি কিন্তু বসতেও বলোনি, অন্তূ!" চাঁদনীর চোখে-মুখে রহস্যের ঘনঘটা।

সোফায় বসে এদিক-ওদিক তাকাল চাঁদনী, "সকলে বাড়ি ফিরবে কবে?" যেন সে সব জানে।
রিমি ভ্রু কুঁচকে চেয়ে থাকে। সে চিনতে পারছে না মেয়েটিকে। এত ঐশ্বর্যপূর্ণ রূপ, নারীটি কে? আরমিণ পরিচিত বলেই মনে হচ্ছে।বেশ কিছুক্ষণের পর্যবেক্ষণ ও নীরবতা কাটিয়ে অন্তূ স্থির গলায় প্রশ্ন করল, "কে আপনি?"
হেসে ফেলল চাঁদনী, "তুমি চেনো আমায়।"
-"ছদ্মবেশ! কিন্তু কোনটা ছদ্মবেশ? এটা অথবা ওটা?"

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ চেয়ে থেকে চাঁদনী মসৃণ হাসে, "তোমার কাছে কোনটাকে আসল আর কোনটা ছদ্মবেশ মনে হচ্ছে?"

-"ধারণা নেই। কে আপনি?" অন্তূর তির্যক নজর পলকহীন চেয়ে থাকে চাঁদনীর হাস্যবদনে।

-"নাশতার ব্যবস্থাও কিন্তু করোনি তুমি।"

রিমির দিকে তাকাল অন্তূ, "নাশতা চলে আসবে।" অন্তূর রাশভারী, গম্ভীর অভিব্যক্তি। নজর বুলায় চাঁদনীর ভূষনে, মুখে দৃষ্টি স্থির করে প্রশ্ন করে, ".....আপনি কে?"

সুস্থির নজরে তাকায় চাঁদনী। খানিকক্ষণ চেয়েই থাকে অন্তূর দিকে। পরে বিন্যস্ত শব্দে

উচ্চারণ করে, “রাজন আজগরের মেয়ে, রূপকথা আজগর আমি।”রিমি অবাক হলো। রাজন আজগরের মেয়ে এটা? এখানে কী করছে? আরমিণই বা চিনলো কী করে? অন্তূর নাকের পাটা ফুলে ওঠে, ভ্রুর মাঝে ভাঁজ পড়ে আলগোছে, “অর্থাৎ আপনি পলাশ আজগরের চাচাতো বোন?”

-“বউ। পলাশ আজগরের বিয়ে করা বউ।” স্থির কণ্ঠে বলে চাঁদনী। মুখে স্মিত হাসি। অন্তূর বুকের স্পন্দন উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ে একটু। এক মুহূর্ত দম আঁটকে চেয়ে থাকে। রিমি ওদের কথোপকথনের অধিকাংশই বুঝতে পারছিল না। অথচ কিছু একটা আগ্রহ

পাচ্ছিল। সে উঠল না নাশতার ব্যবস্থা করতে। বসে থাকল।

চাঁদনী অন্তূর নজর তাক করেই চেয়ে আছে। তার গোলাপী ঠোঁটে জুড়ে মৃদুমন্দ হাসি। হাসি বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, "ঘেন্না লাগছে আমায়? "-"না। এখনও লাগছে না। যেহেতু পুরোটা জানিনি।"

অন্তূর চিন্তাধারায় ধন্য হবার মতো হাসল রূপকথা, "সেদিন আমার সাথে কথা বলে তোমার আমার ওপর অনেক রকমের সন্দেহ কাজ করেছিল, ঠিক বলেছি?"

অন্তূ নির্বিকার জবাব দেয়, "ঠিক বলেছেন।"

-“চাঁদনীর চেহারার ঝলক দেখে সে যে ওই বাড়ির বউ, এতে সন্দেহ হয়েছিল, ঠিক বলেছি?”

-“ঠিক বলেছেন।”

-“চাঁদনীকে এসএসসি পাশ একটা সাধারণ মেয়ে মনে হয়নি। ঠিক বলেছি?”

-“ঠিক বলেছেন।”

“চাঁদনীর কথাবার্তা ওর অবস্থানের সাথে না মেলায় খুব সংশয় জেগেছিল ভেতরে। ঠিক বলেছি?”

-“ঠিক বলেছেন।” মুখস্ত পড়ার মতো কথা বলছিল অন্তূ।

রূপকথা হাসল, "তবে আমার কিন্তু সেই এক দেখায় তোমাকে খুব পছন্দ হয়েছিল, সন্দেহ-টন্দেহ কিছু হয়নি। জানো?"-"না, আজ জানলাম।" একরোখা তবে শান্ত কণ্ঠে বলল অন্তূ, "তাহলে সালমা খালা কি পলাশের মা? রূপকথার হাসি বাড়ল, "বোকা অন্তূ! এজন্য বলা হয়, মানুষের বয়স যত বেশি হয়, যে যতদিন বেশি বাঁচে, তার অভিজ্ঞতা তত বেশি। কারণ মানুষ মরণের এক মুহূর্ত খানিক আগেও অসম্ভব এক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। তুমি যা জানবে, সেটাকে কখনোই চূড়ান্ত ভাবা উচিত নয়। তুমি যতক্ষণ বেঁচে আছো, প্রস্তুত থাকবে সম্পূর্ণ

নতুন সব অভিজ্ঞতার জন্য, যার কোনো ধারণাও ছিল না আগে তোমার। পৃথিবী বৈচিত্র্যময়।"

অন্তূ কথা বলল না। রূপকথা এবার শব্দ করে হাসল, "সালমা খালা যদি পলাশের মা হয়, আঁখি পলাশের বোন, সোহান পলাশের ভাই, তাহলে সোহেল কে?"অন্তূর ভেতরে অস্বস্তি প্রকট হয়ে উঠলেও চোখদুটো নির্লিপ্ত হয়ে চেয়ে রইল, "কে?"

-"পলাশের চাকর। যাকে সে ওই বাড়িতেই খুন করেছে। সোহেলের বউকে দরকার পড়ল একসময় পলাশের। ছেলেটা রাজি ছিল না। সে আসলে জানতো না, খিদে পেলে বাঘ

নিজের পাছার চামড়া কেটে খায়, আর পলাশ তো নোংরা কুকুর। নিজের লোকের বউকে ছাড়ার মতো নাকি সে? বেচারা মরল, বউটাও গেল।" রূপকথা যেন খুব প্রফুল্ল এসব বলে।
-"আর.."-"আঁখি?.... হ্যাঁ, মেয়েটার ওপর বেশ মায়া জন্মে গেছিল আমার। যদিও মৃত্যুর আগে আমি ওকে দেখিনি।"
অন্তূর ঘাঁড়ে মোচড় মেরে উঠছিল অভ্যন্তরীণ উত্তেজনায়। গাঢ় স্বরে বলল, "সোহান?"
-"এ গল্পে সোহান বলতে কারও অস্তিত্ব নেই, শুধুই বিভ্রান্তিকর একটা নামমাত্র, গল্প তৈরিতে ব্যবহৃত হয়েছিল।" ধীরে ধীরে

রূপকথার হাসি কমে আসছিল, “সোহানের ব্যপারে তুমি কী জানো?”
-“চাঁদনীর দেবর। জয় ওকে রাজনৈতিক দ্বন্দে খুব অত্যাচার করেছিল। সেইসব আঘাত ক্যান্সারে পরিণত হয়। ওর চিকিৎসার জন্য সামলা খালা জমি বন্ধক রেখেছিল। কোনো হিন্দুর কাছে সম্ভবত। .... এটাও বানোয়াট গল্প, তাই তো?”রূপকথা চুপ রইল ক্ষণকাল, এরপর বলল, “আঁখির নাম আঁখি না। একটা সুন্দর আছে ওই সুন্দর মেয়েটার, মনে নেই আমার। ওর ভাই সোহান না হলেও ভাইও ছিল একটা। যার কাহিনি সোহানের কাহিনির মতোই, তবে সত্যি।”

অন্তূ মানসিকভাবে খুব বিপর্যস্ত বোধ করছিল। পিঠে ব্যথায় সোজা হয়ে বসা দায়, তার ওপর চাপা বিস্ময়ে শিরদাড়া টনটন করছিল। কিছুক্ষণ মেঝের দিকে ঝুঁকে বসে থেকে বলল, "সালমা কে?"

-"রূপকথা পূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকায়, তুমি কখনও পতিতালয়ে যাওনি, না? ঘুরে দেখতেও যাওনি!"

-"যাইনি।"

-"ওখানে একটা সর্দারণী থাকে। যে মেয়েদের বেচা-কেনা করে, কাস্টমার ধরে, মহল্লার সব মেয়ের দেখভাল করে, লেনদেন করে, মেয়ে যোগাড় করে..এইসব। সালমা আমার বাবার

দাসী। বাবার রেড লাইট আবাসিক হোটেলের সর্দারণী সে।''অন্তূ চোখ বুজে গায় শ্বাস ফেলল, "সে আয়া ছিল আমাদের ভার্সিটির।''

-"সরি টু সে। কোনো ধরণই সবার ওপর খাটেনা। ক্ষেত্রবিশেষ যেকোনো সূত্র নির্দিষ্ট কিছু তত্ত্বের জন্য প্রযোজ্য হয়ে যায়। ঠিক তেমনই ভার্সিটির সব মেয়েই যেমন তোমার মতোন না, আবার সব মেয়ে ওইসব বেশ্যাদের মতোও না। সালমা খালার কাছে হলে থাকা মেয়েদের একটা জোট ছিল। যারা সেচ্ছায়, কোনো বিনিময় ছাড়াই দেহ বিলাতে আগ্রহী। যুবতী বয়স যাকে বলে আর কী! তাদের শরীরে জ্বলন কিছু কিছু পুরুষের

চেয়েও বেশি। খারাপ লাগছে আমার কথা শুনতে?"

অন্তূ চোখ বুজেই বলল, "না।.....এজন্য সে আয়ার কাজ করতো ভার্সিটিতে?"

-"বাবার দাসী। বোঝোনি কথাটা? যেভাবে কাজে লাগাবে, লাগতে হবে তাকে। বাবার কাছে আসার আগে নব্বই দশকের যাত্রাপালার নাচনেওয়ালী ছিল। ওখান থেকে বাবা তুলে এনেছিল।"

অন্তূ কেমন করে যেন চেয়ে রইল। রূপকথা কিছু একটা বুঝে ম্লান হাসল, "আমাদের অভিনয় নিয়ে ভাবছো? খুব নিখুঁত ছিল তাই

না?''-“আপনারটা বেশ কাঁচা ছিল। বাকিদেরটা ঠিকঠাক।''

এবার রূপকথার অভিব্যক্তি খুব রহস্যময় দেখাল। চোখ চঞ্চল হয়ে উঠল। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল বারবার। অন্তূ কপালে আঙুল চেপে মাথা নিচু করে জিজ্ঞেস করল, “কেন করেছেন, এসব?''

-“পতিভক্ত স্ত্রী, আমি। তার আদেশ এবং চাওয়া আমার ওপর অবশ্য পালনীয়। সে আমাকে ভীষণ ভালোবাসে। আর আমি তার জন্য এটুক করতে পারব না? জমিটা একটা হিন্দুর ছিল। হিন্দু সেটা বন্ধক রেখে পলাশের কাছে টাকা নিয়েছিল চড়া সুদে। সেই টাকা

শোধ করেনি, জমি পলাশের। লোকটা লোকজন ধরা শুরু করল। কিন্তু পলাশ সেখানে তার একটা আবাসিক হোটেল বানাবে ভেবেই হিন্দুকে টাকা ধার দিয়েছিল। হিন্দু কান্নাকাটি করলেই ছেড়ে দেবে সে? কিন্তু সবখানে জোর-জবরদস্তি করতে নেই। রেপুটেশন বলতে একটা কথা আছে। সুতরাং গল্প বানাতে হলো। এর মাঝে আঁখি মানে ওই মেয়েটার মার্ডার হয়ে গেল। সব গুলিয়ে একটা জোরাতালির গল্প বানাতে হয়েছিল। সেখানে অভিনয় করেছিলাম আমরা কয়েকজন। খুব কষ্ট করতে হয়েছিল। কতগুলো দিন সারাদিন ওই টিনের ঘরে

থাকতে হয়েছে। রাত গভির হলে তবে বাড়ি ফিরতে পেরেছি।''অন্তূ শ্বাস আঁটকে বসে ছিল। দুনিয়াটা আসলেই বৈচিত্র্যময়। একটুও ভুল বলেনি রূপকথা। তার পিঠের ব্যথা কমে গিয়ে মাথা ব্যথা প্রকট হচ্ছিল। হুট করে রূপকথা বলল, "সেদিন রূপটপে তোমার কান্না, চিৎকার খুব করুণ ছিল।''

অন্তূ পাথর হয়ে গেল যেন। রূপকথা অন্তূকে দেখে ঠোঁট কামড়ে হাসল। মেয়েটা হাসে বেশি, অথচ সেগুলো হাসি নয়, অন্যকিছু। বলল, "এবার আমাকে খুব ঘেন্না লাগছে, তাই না?''

-“না। পুরোটা শুনিনি এখনও।” মূর্তির মতো কঠিন অন্তূর মুখের অবয়ব।

রূপকথা অবাক হলো, ভ্রু জড়িয়ে ফেলল।

অন্তূ বলল, ওখানেই ছিলেন আপনি?

-“তোমার বাবাকে সেবাও করেছিলাম, তিনি অবশ্য তখন বেহুশ ছিলেন। মেরে জ্ঞানহারা করে ফেলে রাখা হয়েছিল।”অন্তূর বুকটা ছলাৎ করে ওঠে। কোথা থেকে যেন কঠিন এক দলা যন্ত্রণা এসে বোধহয় হৃদযন্ত্রের রক্ত সঞ্চালনে বাঁধা হয়ে দাঁড়াল। নিষ্পলক চেয়ে রইল রূপকথার দিকে।

অন্তূ অনেকক্ষণ যাবৎ সোফায় হেলান দিয়ে বসে ছিল চুপচাপ, নজর ছিল ছাদের দিকে।

কাঁদেনি মেয়েটা, সমস্ত কলজে ছেঁড়া ব্যথাটুকু শোষণ করেছে নিজের মাঝে। নিজেকে আঁটকে রাখতে পারবেনা এই ভয়ে আজ অবধি আব্বুর কবরখানা জিয়ারতে যায়নি। কীসব আব্বুর সাথেকার পুরোনো স্মৃতি ভেতরটাকে ঝাজরা করে তুলছিল। অন্তূ জোরে শ্বাস নিয়ে এক লহমায় নিজের কাঠিন্যে ফিরে এলো, "কেন করেছেন, এসব? "

দীর্ঘ নীরবতা। গুমোট এক সন্ধ্যা। পাঁচজন নারী সামনা-সামনি বসে আছে। শুধু ঘড়ির টিকটিক আওয়াজ জানান দিচ্ছে, সময় প্রবাহমান, সময় থামেনা।-"সবার বাবা

আমজাদ সাহেবের মতোন হয়না, অন্তূ। কিছু বাবা রাজন আজগরের মতোও হয়।...আমাকে অস্ট্রেলিয়া পাঠানো হলো খুব অল্প বয়সে। স্নাতক শেষ করে ফিরলাম দেশে। বাবা ঢাকা থেকে ফিরল। রাতে ডেকে বলল, 'রূপ! মামণি...আপনারে আর আমার কাছে রাখতে চাচ্ছি না।'

আমি বেশ লজ্জা পেয়ে গেলাম, 'আমি যাচ্ছি না কোথাও।'

বাবা হাসতে হাসতে বলল, 'কোথাও যেতে হবেনা। শুধু তোকে নিজের কাধ থেকে ঝারতে চাইছি।''

এ পর্যায়ে মলিন হাসল রূপকথা, “জানতে পারলাম, পলাশ ভাইয়ার সাথে বাবা বাঁধতে চায় আমাকে। পালাতে চেয়েছিলাম আমি। লুকিয়ে দেশের বাইরে চলে যেতে চেয়েছিলাম। বাবা কেন এমন চাইল, জানো? বাবার ধান্দা সামলানোর ক্ষেত্রে বড় চাচার ছেলে পলাশ বাবার চেয়েও বেশি দক্ষ। আর তাকে হাতে রাখতে, সম্পত্তি নিজের রক্তের কাছে রাখতে সে নিজের ঔরসজাত মেয়েকে বলি দিতে পারে বাবা শখের সাথে। এ অবস্থায় তুমি হলে কী করতে, অন্তূ?

”-“বাবাহীন সন্তান আমি, এই পরিচিতিতে জীবন কাটিয়ে দিতাম।”

-“ওটা তো জারজের পর্যায়ে চলে যেত। তুমি বাস্টার্ড বলে পরিচিত হতে।”

-“আপনার বাবার মতো বাবাকে বাবা মানার চেয়ে কি ভালো নয়, আমি পিতৃপরিচয়হীন, অজন্মা হয়ে বাঁচব?”

উদাস হয়ে পড়ল রূপকথা, “আমি পারিনি। বাবার স্বার্থপরতার কাছে মানসিকভাবে হেরে গেছিলাম।”

-“এরপর?”

-“এই, তুমি আমার বাসররাতের গল্প শুনবে? ”অন্তূ জবাব দিলো না। রূপকথা সোফাতে শরীর এলিয়ে শাড়ির কুচি গুটিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে বসল, দৃষ্টি ছাঁদে নিবদ্ধ। এত

সুন্দরী এই রূপকথা। তার ওপর এমন সাজসজ্জা। ঠিক যেন রাজকুমারী লাগছে। অথচ মুখটা ম্লান এখন।

-“পলাশ ভাইয়াকে একটা বাংলো বানিয়ে দিয়েছিল, বাবা। সেখানে কাঁচা গোলাপের বাসর। বসে আছি আমি, মৃত্যুর অপেক্ষা করছি। পলাশ এলো। হাতে অ্যালকোহলভর্তি হিপফ্লাস্ক। ফুলের ওপর ছেঁচড়ে আধশোয়া হয়ে পড়ল। দেরি করার সময় নেই তার। ঢকঢক করে খানিক গিলে একটানে আমার শাড়ির প্রান্ত ধরে টান দিলো। শাড়ির পাড় ছিঁড়ে পলাশের হাতে চলে গেছিল, জানো? খুব শক্ত হাত, বুঝলে?”

অন্তূ চুপচাপ তাকিয়ে রয় রূপকথার দিকে। মেয়েটা ছাদের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে, "স্যাডিজম বোঝো? স্যাডিস্ট?"

-"না।"

-"ভয়াবহ মানসিক রোগ। সাধারণ পুরুষেরা নারীকে স্পর্শ করে এবং আদরের মাধ্যমে নিজেদের শারীরিক চাহিদা মেটায়। এই রোগে আক্রান্তরা কী করে জানো?"

অন্তূ তাকিয়ে রইল।-"ধর্ষকামী হয়। অর্থাৎ সাধারণভাবে নারীদেহ ভোগ করে এরা সন্তুষ্টি পায়না। নারী শারীরিক যন্ত্রণায় যত বেশি চিৎকার করে, এদের কানে সেই চিৎকারের আওয়াজ, নারীর দেহের ক্ষত এবং মুখের

করুণ কাতরতা এদেরকে যৌন সুখ দেয়। অর্থাৎ, এরা নারী শরীরকে অমানুষিক আঘাতের মাধ্যমে সুখ পায়।''

অন্তূর ভেতরটা অস্থির হয়ে উঠল। এই তৃপ্তিটা অন্তূ সেদিন রূফটপে পলাশের মুখে দেখেছিল, যখন অন্তূ কাঁদছিল। অন্তূ অবাক হলো। জয় অসংখ্যবার বলেছে, পলাশ পাগল, ওর মানসিক সমস্যা আছে, ও শালা সাইকো। জয় আমির সাধারণভাবে কাঠিন সব সত্যি বলে, বোঝার উপায় থাকেনা। অন্তূ কপাল চেপে ধরল। রূপকথা বলল, "আমার শরীরে অনেক দগদগে দাগ আছে, দেখবে?''

অন্তূ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, "এরপর কী হয়েছিল?"রূপকথা হাসল, "বাসর হলো। যা এতদিন অন্যসব মেয়েরা সঁয়েছে, তা আমি সইলাম। চাবুক দিয়ে পেটানো হলো আমাকে। আমার প্রতিটা আত্মচিৎকার পলাশের মুখে হাসি ফুটাচ্ছিল। একটা মজার কথা শুনবে, অন্তূ?"

অন্তূ তাকায়। রূপকথা হাসল, "বাবা আমাদের বাসর ঘরের বাহিরে সোফায় বসে ড্রিংক করছিলেন। আমার চিৎকারে প্রতিটা ইটের গাঁথুনি কেঁপেছিল সেদিন। বাবা খুব শক্ত লোক, তাই না?"

বাবারা এমন হয়? অবিশ্বাস্য! অন্তূর মনে হলো, তার সাথে কিছুই হয়নি। এই দুনিয়ার কোপানলে সে পড়েইনি। উহু! জয় এমন নয়। জয় ঘৃণ্য, তবে তুলনায় গেলে জয় অনেক সুস্থ্য। জিজ্ঞেস করল, "এরপর?"

-"আমাকে উল্টো করে শক্ত করে খাটের সাথে বাঁধল পলাশ দড়ি দিয়ে।"

অন্তূ আর শুনতে চাইল না। তার ভেতরে অদ্ভূত ধরণের এক হিংস্রতা কাজ করছে, সাথে ম্যান্টালি ডিপ প্রেশার ফিল করছিল, শরীরটা অবশ হয়ে আসছে। রূপকথা থামল না, "সারা পিঠে কোনো মাংসাশী প্রাণীর মতো কামড়েছিল পলাশ। যেন সে খুবলে মাংস

খেতে চায়। আমার চিৎকার কমে আসলে তার আঘাত জোরালো হচ্ছিল। সে চিৎকার শুনে, এবং আমার কান্নায় তৃপ্তি পাচ্ছিল।''অন্তূ হাত উঁচিয়ে ধরল। সে আর শুনতে চায়না। নিতে পারছে না। রূপকথা সোজা হয়ে বসল, "তোমার মনে প্রশ্ন আসছে না? বাবা কী করে সহ্য করছিল? বাবারা আবার এমন হয় নাকি? ''

অন্তূ উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে আর নিতেই পারছে না। তার সামনে বাবা মানে আমজাদ সাহেব। এক ব্যক্তিত্ববান, গম্ভীর, কর্তব্যপরায়ন, নিখুঁত মানুষ। অস্থিরচিত্তে এদিক-ওদিক তাকাল। ঘেমে উঠেছে

শরীরটা। তার মনে হচ্ছিল, সে কোনো ডার্ক ম্যাগাজিন পড়ছে, এসব বাস্তব হতে পারেনা। হাত পা ঘষতে ঘষতে বসে পড়ল। রূপকথা একদম স্বাভাবিক, চোখে-মুখে বরফের মতো শীতলতা। মনে হচ্ছে, সে খুবই রিল্যাক্সে আছে। অন্তূ বলল, "আপনার তথাকথিত বাবা অর্থাৎ রাজন আজগরও পাগল?"

রূপকথা হেসে ফেলল, "পেডোফেলিয়া বোঝো?"

-"বোঝান। আজ অনেককিছু বোঝার আছে আমার।"-"শিশু নির্যাতনের প্রবণতা। অর্থাৎ, যা পলাশ নারীর সাথে করে, বাবার তা ছোট্ট বাচ্চাদের সাথে করার নেশা আছে। পলাশ

সেক্সুয়াল স্যাডিস্ট। বাবা পেডোফিলিক স্যাডিস্ট। অর্থাৎ এরা মানুষকে অত্যাচারের মাধ্যমে তাদের আত্মচিৎকারের আওয়াজে তৃপ্তি পায়।''

রিমি পাথরের মতো বসে ছিল। এতক্ষণ সে যেন শুধুই ঠাকুরঘরে সাজিয়ে রাখা মূর্তি। নিঃশ্বাসও ফেলেনি বোধহয়। এবার বিক্ষিপ্ত, এলোমেলো একটা শ্বাস ফেলল। পুরো বংশটাই পাগলের কারখানার শ্রমিক! অন্তূ অনেকক্ষণ পর জিজ্ঞেস করল, "এসব হয়েছে আপনার সাথে, আর আপনি কী করেছেন?''

-"করিনি বলছো! অনেক কিছু করেছি। আমি যা করেছি, তা নিতে পারবে তো? ...আমি কী

করেছি, তা জানো তুমি।”অন্তূ স্থির চেয়ে থাকল। রূপকথা বলল, “মানুষ ব্যথার কাছে খুব স্বার্থপর হয়ে যায়, অন্তূ। যেকোনোভাবে সে নিষ্কৃতি চায়। আমিও তাই চেয়েছি, তার জন্য এমন সব নোংরা কাজ করেছি, যার ক্ষমা নেই। পলাশ যা বলতো, শুনতে শুরু করলাম, শর্ত— সে আমার কাছে আসবেনা। হাজার রাত নিজের ঘরে বসে অন্য মেয়েদের মরণ চিৎকার শুনতে শুনতে আমি জানোয়ার হয়ে গেছি, অন্তূ। কিচ্ছু মনে হয়না। শুধু মনে হয়, আমার সাথে তো হচ্ছেনা, আমি তো বেঁচে গেছি। শরীরের ব্যথাগুলো আর ওইসব নারকীয় রাত মনে পড়লে আমি আরেক

পলাশ হয়ে যাই। নিজেকে ওই জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে সব কবুল।''অন্তূ আন্দাজ করে ফেলল অনেককিছুই। রূপকথা বলল, "পলাশকে সুস্থ করার জন্য চেষ্টাও করেছিলাম, জানো? নিজের রূপে, এবং দেহে আকৃষ্ট করতে চাইতাম, যেমনটা স্বাভাবিক পুরুষেরা হয়। বাবা ঢাকায় থাকতো। বাড়ি ফাঁকা। ওর চোখে পাগলামির নেশা দেখলে নিজেকে বাঁচাতে ওর কাছে গিয়ে ঘেষতাম, চুমু খেতাম, স্বাভাবিকভাবে উত্তেজিত করার চেষ্টা করতাম। কিন্তু দিনশেষে আরেকবার ওর পাগলামির শিকার হতে হতো। এমনও হয়েছে গতরাতে বেহুশ করে ফেলে রেখেছে

আমাকে। আমি উঠতে পারছি না। নিজেই ডাক্তার এনে চিকিৎসা করিয়েছে। কাঁচা ঘা। তার ওপর সেই রাতে আবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে। একটা পাগলের সাথে দিনের পর থাকতে থাকতে, আর এইসব দেখতে দেখতে আমিও পাগল আর হিংস্র হয়ে উঠলাম। নিজের জায়গায় অন্য যেকোনো মেয়েকে ছেড়ে দিতে মন চাইতো, তবুও নিজেকে বাঁচানোর লোভ সংবরণ করতে পারিনি। ''রিমির চোখ ভিজে উঠেছিল, হাত-পা তড়তড় করে কাঁপছে। এবার টুপ করে পানি পড়ল কোলের ওপর। একটা মেয়ে হয়ে আরেক

মেয়ের মুখে যা শুনছিল, সহ্য সীমার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল সব।

অন্তূ জিজ্ঞেস করল, "আপনি সেদিন ওই বাড়িতেই ছিলেন, যখন আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল?"

-"রুফটপের পাশের ঘরেই ছিলাম।" আনমনা হয়ে উঠেছিল রূপকথা।

-"আর আঁখি?...."

-"আঁখি না ওর নাম। ওই মেয়েকে যা করা হয়েছে, এই বাড়িতে করা হয়েছে। পলাশও ভাগ পেয়েছিল, শেষে। এখানে এসে।"অন্তূর শরীরটা অসাড়ল হয়ে উঠল। তাদের কথা মাঝে বারবার নিস্তব্ধতা নেমে আসছিল,

আবার শুরু হচ্ছিল। দাসী মহিলা দুটো স্বাভাবিক। খুব পরিচিত ঘটনাই বলছে রূপকথা।

অন্তূ চট করে একটা হিসেব মেলালো, দামী হিসেব। শাহানার জরায়ুতে টিউমার। সে জানে, এ অবস্থায় স্বামীসঙ্গে যায় না মহিলারা, পারেনা। ডাক্তারের নিষেধ থাকে, তাছাড়া সহ্য না করতে পারার একটা বিষয় থাকে। হুমায়ুন পাটোয়ারীর হাস্যজ্জ্বল চেহারাটা মনে পড়ল অন্তূর। শরীরটা ঝিনিঝিন করে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল।অন্তূর মাথায় শুধু ঘুরছিল, আচ্ছা! পলাশ কি এই পৃথিবীতে একাই এমন নির্যাতনকারী? হামজারা কি একাই

ক্ষমতালোভী? আর জয়েরাই শুধু এমন শক্তিশালী সামাজিক ব্যক্তিত্ব! আর নেই? অন্তত বাংলাদেশেই অসংখ্যা রয়েছে। অন্তূ এটা ভেবে নাক ছিটকাতো, এদের বাড়ির লোক কী করে? বউ, মেয়ে...এরা কী করে? রুখতে পারেনা?

ধারণাটা এত বাজেভাবে হারবে, তা জানতো কে? সে নিজেও তো এতগুলো দিন এ বাড়ির বউ হয়ে এসেছে। পেরেছে নাকি ওই স্টোর রুম পেরিয়ে কাঠের দরজা ভেদ করতে? অথবা বাগানের পেছনে, প্রাচীরের কাছের ওই লোহার গেইটের ভেতরে ঢুকতে? হামজার বিরুদ্ধে বলতে, জয়কে থামাতে? বরং সে

নিজেই অবরুদ্ধ, বন্দি। রূপকথারা এভাবেই মরতে মরতে বেঁচে আছে? আচ্ছা, এসব পুরুষদের সঙ্গিনীরা সবাই কি এমন শিকার? নাকি ব্যতিক্রম আছে?

অন্তূ রূপকথাকে বলেছিল, “পলাশ ঘুমায় না? রান্নাঘরে বটি বা ছুরি থাকেনা? হাতও তো আছে আপনার!”

রূপকথা হেসেছিল, “কেবল পলাশের একটা মানসিক রোগের ব্যাপারে শুনলে।”-“আর কত আছে? সে কি মানসিক রোগের ফ্যাক্টরি?”

-“স্বাভাবিক মানুষদের মতো ঘুম আসেনা ওর। অর্থাৎ, শরীরে স্বাভাবিকাভাবে ঘুমিয়ে

পড়ার হরমোন মেলাটোনিন ক্ষরণ হয়না দেহে। আর্টিফিশিয়ালি মেলাটোনিন পুশ করতে হয় দেহে। এরপর ঘুমায়। সেটাও নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে।''

-''আপনি ফেরাউনের ঘর করছেন, রূপকথা!''

-''আছিয়া বলে লজ্জিত কোরো না। মা আছিয়ার মতো ইমাণী জোর নেই আমার, আর না আছে প্রতিবাদের ক্ষমতা।''

থেমে থেমে আরও অনেক কথাই হয়েছিল ওদের। হঠাৎ-ই অন্তূ নিষ্ঠুরের মতো জিজ্ঞেস করেছিল, ''আপনি এখানে এসব জানাতে এসেছেন আমায়? কী বাবদে?''

রূপকথা হেসে ফেলল, "উকালতি র-ক্তে জড়িয়ে তোমার? না না, সন্দেহ ভালো। বিশ্বাস করার নয় কাউকে।"

-"শব্দটাকে ভীষণ সস্তা লাগে আজকাল।"

-"লাগারই কথা। এমনিতেই সচেতন তুমি। আরও হচ্ছ।...পলাশের সাথে দেখা হবার পর কতদিন কেটে গেছে তোমার?"

অন্তূ অবাক হলো। রূপকথা সেটাও জানে! সে বলল, "বেশ অনেকদিন।""এরপর আর বের হওনি না?"

-"বিয়ের পর ভার্সিটি যেতে দেয়া হয়নি, থার্ড ইয়ারের ক্লাস তো শুরু হয়েছে ক'দিন হলো। বন্দি জীবন যাপন করছি আপাতত।"

-"বের না হলেই ভালো। এজন্যই জানাতে এসেছিলাম। কোনো স্বার্থ-টার্থ নেই। বলতে পারো তোমার নিজের অর্জন। তোমার মতো মানুষদের এড়িয়ে চলা মুশকিল, বুঝলে! জয় আমিরকে জিজ্ঞেস করলে সে যদি বলে কখনও, তো বুঝবে এটা। আর পাঁচটা মেয়ের মতো নও যেমন তুমি, এটা খুব সহজেই ধরা পড়ে তোমার চোখে তাকালে। ব্যতিক্রমের সাথে মানুষের আচরণ ব্যতিক্রমই হয় সচরাচর। আমিও তাই করছি। সাবধানে থেকো। পলাশ তোমায় ছাড়বে না। জয় নামক ঢালে বাঁধা পড়ে আছো এ বাড়িতে। বাইরের জগত তোমার জন্য ভালো নয়।

পলাশ ছাড়াও বহুলোক আছে জয়ের সাথে সম্পর্কিত হিসেবে তোমার ক্ষতি করার।”

অন্তূ ভাবল, হয়ত মাজহার। নাকি আরও কেউ, বা কারা?অন্তূ এটা বুঝল, সে অনেকটাই ব্যাক-আপ পেয়েছে জয়ের কাছে। অন্তূদের একটা বুড়ো হিন্দু স্যার ছিলেন। তিনি একবার বলেছিলেন, “পেছন মেরে বালুর ছ্যাঁক দেয়া বুঝিস রে, তোরা?” তখন বোঝোনি অত। আজকাল আমজাদ সাহেবসহ এসব বুজুর্গ, প্রবীণদের কথার মর্ম খুব গাঢ়ভাবে মনে পড়ে। জয় হলো সেই লোক, যে পেছন মেরে আবার বালুর ছ্যাঁক

দিয়ে ব্যথা কমাতে আসে! অন্তূর হাসি পায় এসব ভাবলে।

বোঝা গেল, জয়ের ফিরতে দেরি হবে ক'দিন। অন্তূ ভাবল, এই ফাঁকে বাড়ি থেকে ঘুরে এলে হয়না? ভাবি অসুস্থ, অন্তিক কী করছে না করছে? আম্মুকে দেখার ইচ্ছেটাও হচ্ছিল।অন্তূকে অবাক করে দিয়ে সকাল এগারোটার দিকে পাটোয়ারী বাড়ির দরজায় অন্তিক এলো। অন্তূ ভাবেনি এমনটা। স্মিত হাসি ছেলেটার মুখে। হাতে দু প্যাকেট মিষ্টি, ছোট্ট দুটো অসময়ের তরমুজ, ব্যাগে অনেক রকম খাবারের পাত্র, নিশ্চয়ই রাবেয়া কিছু বানিয়ে দিয়েছেন! অন্তূর অদ্ভুত লাগল।

অন্তিক ছোট বোনকে দেখতে এসেছে তার শ্বশুরবাড়ি, সাথে এনেছে কুটুমবাড়ি আসার ঐতিহ্য। এই হাসিটা অনেকদিন দেখা হয়নি অন্তিকের চোখে। সে খুব হালকা এবং খুশি যেন। অন্তূ বুঝতে পারল না তার কী করা উচিত! আব্বুর কথা মনে পড়ছিল খুব। অন্তিকের সাথে আব্বু থাকতে পারতো না কি? বুকটা হু হু করে ওঠে তার। ভোলাই যায় না আব্বুকে? তবুও খোদা তায়ালাদ ইই নিষ্ঠুরতা!

রিমি খুব যত্ন করল অন্তিকের। দুপুরে না খাইয়ে যেতে দিলো না। এতসব কিছু আনার জন্য ধমকালোও। অন্তূর কিছু করতেই হলো

না। যা সব রিমিই সামলাচ্ছিল। যেন সে নিজের ভাইকে আপ্যায়ন করছে।

যাবার সময় আচমকা অন্তিক বোনের হাতটা ধরল, অদ্ভুত গলায় বলল, "ক্ষমা করিসনি, না?"-"ধরে রাখিনি। তুই এসেছিস, খুশি হয়েছি আমি। ভাবি ভালো আছে? আম্মু?"

অন্তিক একটা শপিং ব্যাগ ধরিয়ে দিলো, "এটা রাখ, অন্তূ। আমার নিজের রোজগারের টাকায় কেনা। সুদ বা অনৈতিকতা নেই একটুও, আমার খাটুনির আয়। ফুড-বেভারেজ কোম্পানির ড্রাইভারের চাকুরি পেয়েছি।"

অন্তূ চেয়ে রইল অন্তিকের দিকে। কত বদলে গেছে অন্তিক! ঠিক সেই পাঁচ-সাত বছর

আগের অন্তিক। অন্তিক চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, “তুই ভালো আছিস, অন্তূ?”

-“ভালো নেই?” ম্লান হেসে চেয়ে থাকে অন্তূ। অন্তিক হাসল, “ভাগ্যের পরিহাস?”

-“জানিনা তো। তুই বলতে পারসি, কী ঘটছে এসব?”দু ভাই-বোনের বিদায়ের ক্ষণটাও অদ্ভুত ছিল। অন্তিককে এগিয়ে দিতে গেল না অন্তূ। অথচ যেই না সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল, অন্তূ দৌড়ে সিঁড়িঘরের জানালা খুলে দাঁড়ায়। রাস্তায় দেখা যাচ্ছিল অন্তিককে, হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছে। যতদূর দেখা গেল, চেয়ে রইল।

পেছনে এসে দাঁড়ায় রিমি। সে কাল সারারাত ধরে অন্তূর গল্প শুনছে।

দুপুরে গোসল করে পরল সেই পোশাকটা। সে বুঝল, ভাবি বানিয়েছে জামাটা। মার্জিয়া টুকটাক ভালোই দর্জির কাজ জানে। বারবার আয়নার সামনে গিয়ে নিজেকে দেখছিল। বিয়ের পর বাপের বাড়ি থেকে আসা তোহ্ফা!

রিমি মুগ্ধচোখে দেখে বলল, "খুব সুন্দর দেখাচ্ছে আপনাকে, অন্তূ!"

অন্তূ চমকালো, এ বাড়িতে কে অন্তূ ডাকতো না তাকে।

হুমায়ুন পাটোয়ারী শাহানাকে নিয়ে ফিরলেন বিকেলের দিকে। অন্তূ সামনে গেল না। ওর

মনে হচ্ছিল, ও বমি করে ফেলবে আর নয়ত হাত র-ক্তে ভিজে উঠবে। দিনের দুপুরে র-ক্তে হাত ধুতে নেই। তার হাত তো আর হামজার মতো দক্ষ নয়।তরু তুলির কাছে একা ছিল। রিমি সন্ধ্যার পর বেরিয়ে গেল ক্লিনিকের উদ্দেশ্যে। তরু একা একা সামলাতে পারবেনা।

সীমান্ত নিখোঁজ। এ নিয়ে চারদিকে তোলপাড় চলছে। পুলিশ ফোর্স নিয়ে চারদিকে খোঁজ চালাচ্ছে তারা। ঝন্টু সাহেব চেষ্টার ত্রুটি করছেন না। বোনের ছেলে গুম! প্রথম সন্দেহ পাটোয়ারী বাড়ি তাদের। কিন্তু হাতে ক্ষমতা না থাকলে সন্দেহ ভোঁতা। হামজাকে কল

করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। সে বলেছে, তার কাছে এসেছিল ঠিকই, তবে চলে গেছিল দশ মিনিট পরেই। এরপর আর দেখা হয়নি। সে মেয়র মানুষ। তাছাড়া দাপটই আলাদা। প্রসাশনের কর্মকর্তারা খুব বেশি জোর দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারেনা।

অন্তূ ঘরের দরজাটা ইশার আজান পড়তেই আঁটকে দিলো। তার মনে কীসের এক শঙ্কা জেগেছে। হুমায়ুন পাটোয়ারীর মুখটা মনে পড়লেই বুকের ভেতর ছ্যাঁৎ করে উঠছে। শরীরে এক প্রকার শিহরণ টের পাচ্ছিল। রাতে খেতেও বের হলো না আর। শাহানা কতবার ডাকলেন। নামাজ পড়ে খেয়ে নেবে,

বলে কাটিয়ে দিলো। এত বড় বাড়িতে ওরা তিনজন, তার মাঝেও ও একা। গা শিরশির করছিল।

বেডসাইড টিবিলের ওপর পড়ে আছে জয়ের কাজুবাদামের পাত্রটা। সারা ঘরের দেয়ালে অনেক ছোট ছবি টাঙানো। ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে করতে বারবার সেসবে চোখ পড়ে অন্তরাত্মা পুড়ে উঠছিল। আঁখির লা-শটা চোখ থেকে সরছে না। বহুদিন ভুলে ছিল। তা তাজা হয়েছে। ত্বকের নিচে মাংসপেশীতে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল, উত্তেজনায়।জয় যদি আঁখির শরীরের একটা ক্ষতর জন্যও দায়ী হয়, অন্তূ ওয়াদা করে

ফেলল চট করে—এক কোপে ধর থেকে মাথাটা আলাদা করে ফেলবে সে জয়ের। আর হুমায়ুন পাটোয়ারীর? হামজা, পলাশ? এরা ওর নাগালের বাইরে। তাই বলে মাফ? রাত তখন একটা বাজে। অন্তূ তখনও উদাস পায়ে ঘরের মেঝেতে পায়চারী করছে। পা শিরশিরে অসহ্য উত্তেজনা। র-ক্তে আগুন জ্বলছে। অথচ নারীমনে দ্বিধা। হুমায়ুন পাটোয়ারীকে নিজের সন্দেহের ওপরই এত ভয় লাগছিল। অন্যকেউ হলে হতো। মামাশ্বশুর মানুষ যদি নোংরা হাত অল্পও বাড়ায় তার দিকে? অন্তূর গা'টা মৃগী রোগীদের মতো কাঁপুনি দিয়ে ওঠে। নিস্তব্ধ,

অবরুদ্ধ রাত। ঘরের জানালা-দরজা সব বন্ধ। তবুও অন্তূর মনে হচ্ছিল, কেউ যেন ওই দরজা ভেঙে এসে তার দিকে হাত বাড়াবে। সে এই ভয়টা প্রথম অনুভব করেছিল পলাশের রুফটপে।জানালার বাইরে কেউ গুঙরে উঠল না? অন্তূ সজাগ হয়ে ওঠে। কোনো মানুষের চাপা ঘোৎ-ঘোৎ আওয়াজ। গা ছমছমে লাগছিল। যেন কেউ কোনো জীবন্ত কারও র-ক্ত পান করছে। জয়ের রুম সদর ঘরের শুরুর দিকেই। বাড়ির গড়নটাই আজব। বাইরে থেকে একরকম, ভেতরটা অন্যকিছু। অন্তূর মনে হলো, নিচ থেকে গোঙানি বা ধস্তাধস্তির আওয়াজ আসছে। পরে

ভাবল, বদ্ধ ঘর, বাতাসের ঘাটতির কারণে এমন ভোঁতা আওয়াজ কানে বাজছে।
দোতলার সদর দরজায় টোকা পড়ছে এবার। অন্তূ সচেতন হলো। এই মাঝরাতে কে এসেছে? জয়? দ্বিধায় ভুগতে ভুগতে এক সময় ড্রয়ার খুলে পছন্দমতো একটা ড্যাগার তুলে নিলো হাতে। ছোটখাটো অস্ত্রাগারই বটে জয়ের রুমটা।
দরজার সামনে গিয়ে মিনিট পাঁচেকেও ওপাশ থেকে জবাব পেল না মনমতো। যতবার জিজ্ঞেস করল, “কে?” প্রতিবার অস্পষ্ট স্বরে শুনতে পেল, “খোলো।”জয়? ‘তুমি’ সম্বোধন ব্যাপারটি খুব গোলমাল তৈরি করল। ড্যাগার

হাতে উচিয়ে ধরে দরজা খুলতেই কেউ একজন হুড়মুড়িয়ে ঢুকে দরজা আঁটকে তবে পেছন ফিরল। অন্তূ তখনও ড্যাগার নিয়ে প্রস্তুত। অথচ আগন্তুকের মাঝে তাকে আক্রমণ করার কোনো তাড়া নেই।

অন্তূ অবাক হলো। মুখটা কালো হাজী রুমালে বাঁধা। কালো জ্যাকেট, কালো প্যান্ট, হাই-বুট জুতো পায়ে, হাতে কালো গ্লাভস। শরীরের শুধুমাত্র চোখ এবং মাথাভর্তি ঘন চুল ছাড়া কিছু দেখতে পাবার উপায় নেই। চোখের মণি ডাইনিং স্পেসের ডিম লাইটের আলোয় জ্বলজ্বল করছিল। অন্তূ পেছন ফিরে দেখল,

হুমায়ুন সাহেবের রুমের দরজা এখনও ভেতর থেকে বন্ধ। গভীর ঘুম।

অন্তূ শক্ত করে জিজ্ঞেস করল, "কে আপনি?"

আগন্তুক ঠিক জয়ের মাফিক লম্বা। আশপাশ দেখে নিয়ে বলল, "আপনি জয় আমিরের স্ত্রী, সঠিক ধরেছি?" ভরাট স্বর, গমগমে তেজ যেন কণ্ঠের আগায়।

অন্তূ সে জবাব না দিয়ে বলল, "আপনি কে? এভাবে ডাকাত অথবা আততায়ীর মতো কারও অন্দরে প্রবেশ করাটা অভদ্রতা বোধহয়।"-"তাহলে আমি আজ ভদ্রলোক নই। ভদ্রলোক হবার যুগ নয় এটা। পথ ছাড়ুন।"

-“উদ্দেশ্য না জেনে ভেতরে যেতে দেবার নয়। কে আপনি, জবাব দিন।”

-“উদ্দেশ্য জানলে যেতে দেবেন, এমনটাও মনে করছি না।”

-“কেন এসেছেন এখানে? সোজা জবাব দিন।”

-“আমার মনে হয়না, আপনি আমায় আসলেই রোধ করতে চাইছেন। কারণ আপনি নিশ্চিত এতক্ষণে, আমি আপনার বিশেষ ক্ষতি করব না। আর আপনি ছাড়া আপাতত বাড়িতে উপস্থিত আর কারও চিন্তাও বিশেষ নেই আপনার মাঝে।”

-“হুশিয়ারী করছেন?”

-“ধারণা করছি। সময় কম হাতে, সরে দাঁড়ান।”

-“ভেতরে কী কাজ আপনার?”

“আপনার মামাশ্বশুরের ঘরটা কোনদিকে? ঘরটা দেখিয়ে দিন।”অন্তূ ভ্রু জড়াল। তার ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয় তাকে কিছু ইঙ্গিত দিচ্ছিল যেন। আগুন্তককে তার কেন জানি ভয় লাগছিল না আশ্চর্যজনকভাবে। এত কড়া পাহারার পর লোকটা দোতলায় উঠে এসেছে, অথচ কোনো আক্রমণাত্মক অভিব্যক্তি নেই...আজব! আগুন্তুক অন্তূকে বলল, “আসুন আমার সঙ্গে।

”

হুমায়ুন সাহেবের দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলল, “ডাকুন।”

অন্তূ ডাকল। আগুন্তুক দরজার সামনের থেকে সরে একপাশে দাঁড়াল। যেই না হুমায়ুন সাহেব দরজা খুললেন, অমনি পা বাড়িয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ল হুড়হুড় করে। হুমায়ুন সাহেব চমকে বলল, “কে রে? কে তুমি? কে, কে? কে এইটা, আরমিণ?

”-“বসুন, চাচা। উত্তিজত হবেন না। ভেতরে এসে বসুন।”

শাহানা হৈ চৈ শুরু করে দিলেন। আগুন্তুক বলল, “চাচিমা, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি

অসময়ে এসেছি ঠিকই, তবে আমার কাছে এটাই সময়।''

হুমায়ুন সাহেব তাকিতুকি করছেন। বোধহয় অস্ত্র-সস্ত্র কিছু খুঁজছেন। আগুন্তুক বলল, "আমি একটা গল্প শুনতে এলাম আপনার কাছে। আল্লাহ পাক আমাকে সবর দিয়েছেন, আমি তার কাছে আরও সবর প্রার্থনা করছি। যা জিজ্ঞেস করব, কোনো রকম শিরোনাম বা অজুহাত ছাড়া বলে যাবেন।''

-"কে তুমি?''

-"আজ পরিচয় থাক। আখিরাতে জাহান্নামে যাবার পথে আমার-আপনার আবার দেখা হবে। মৃত্যুর আগে কিছু মহাপাপ আর কুফরি

করে মরব আমি। জাহান্নামের দিকে এগিয়ে যাবার পথে পরিচিতিসহ অনেক আলাপ হবে। আপাতত মূলকথায় আসি।''অন্তূ অবাক হয়ে গেল। হুমায়ুন সাহেব দরদর করে ঘামছেন! পাপ তার চোখে-মুখে চামড়ার মতো দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। কে এই আগুন্তুক? বিছানায় বসে শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করছে,

"মুমতাহিণাকে এই বাড়িতেই মারা হয়েছিল, তাই তো?''

হুমায়ুন সাহেব হাত দিয়ে ঘর্মাক্ত মুখ মুছলেন। শাহানা স্বামীর কাছে এগিয়ে গিয়ে বাহু চেপে ধরলেন। আগুন্তুক ফের বলল,

“কী হয়েছিল মুমতাহিণার সাথে আসলে? আপনি কখন গেছিলেন ওর কাছে?”

অন্তূ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। মুমতাহিণা ওরফে আঁখি! এটা কে তাহলে? মুমতাহিণার ভাই? কিন্তু সে তো মরে গেছে। কী সুন্দর নামটাকে এই জানোয়ারের দল বিকৃত করে রেখে দিয়েছিল। কোরআনুল কারিমে একটা সুরা আছে মুমতাহিণা নামে।হুমায়ুন সাহেব মুখ খুলছিলেন না। এক পর্যায়ে আগুন্তুক উঠে দাঁড়িয়ে পিস্তলটা ধরল ঠিক হুমায়ুন সাহেবের গালের ভেতর। ট্রিগারে বারবার ছটফটে হাত রেখেও আবার সরিয়ে নিচ্ছিল।

শাহানা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেছিলেন। আগুন্তুক অনুরোধ করল, “চাচিমা, আপনি চিৎকার করবেন না। আমার হাতে সময় কম। রাত ফুরিয়ে আসছে। আমি কিছু জানতে এসেছি, তা উনি বলছেন না, সময় কেটে যাচ্ছে, এভাবে ছাড়া উপায় নেই। আমি আপনার কোনো ক্ষতি করব না। আল্লাহর ওয়াস্তে, চিৎকার করবেন না। এটুকু রহম করুন।”

মুমতাহিণাকে যখন আনা হলো এখানে, তার আগে তাকে পলাশের হোটেলে রাখা হয়েছিল। এখানে আনার পর বেশ কিছদিন আঁটকে রাখা হলো। মেয়েটা চমৎকার

মায়াবতী ছিল। যেন এরাবিয়ান সংস্কৃতি থেকে উঠে আসা কোনো শাহজাদী। লম্বা হাতার ঢিলা পোশাক, চুলগুলো দেখা যেত না কখনও, ওড়না মাথায় থাকতো সবসময়। ওকে রোজ খাবার দিতে যাবা বা দেখাশোনার দায়িত্ব হুমায়ুন সাহেবের ছিল। বাড়ির মেয়েদের কিছু জানানো যাবেনা। জয় তখন ঢাকাতে। তার সামনে মাস্টার্স পরীক্ষা। হামজা সারাদিন বাইরে থাকে, বিভিন্ন কাজে। হুমায়ুন সাহেব যেতেন তিনবেলা বাড়ির গ্রাউন্ড ফ্লোরের নিচের ঘাঁটিতে। স্ত্রী থেকেও বিপত্নীক হয়ে গেছিলেন স্ত্রীর রোগের জন্য। কিন্তু পৈশাচিক পুরুষত্ব কি বাঁধ মানে?

এমনও হয়েছে, রোজ দু-তিনবার তিনি ধর্ষণ করেছেন মুমতাহিণাকে।তবুও মেয়েটা বেঁচে ছিল কোনোরকম, তাকে বাঁচিয়ে রাখা হলো। কিন্তু পলাশের হোটেল থেকে ওই চাঁদের টুকরো কিশোরী অক্ষত চলে এসেছে, পলাশ সুযোগ পায়নি তাকে নষ্ট করার, পাগলামী করার। পলাশ চুপচাপ বসবে? কেন বসবে? সে-ই গেল শেষবার ষোলো বছরের সেই অর্ধমৃত মুমতাহিণার কাছে। এরপর আর মুমতাহিণাকে দৈববলেও বাঁচানো সম্ভব নয়। অন্তূর শরীরটা থরথর করে কেঁপেছিল সেসব শুনে। মুমতাহিণার লাশ নীলচে হয়ে উঠেছিল। কতদিন পর লা-শ ছেড়েছিল কে

জানে? অথচ অচেনা যুবক জমাট বরফের মতো শীতল।

আগুন্তুক সে- রাতে হুমায়ুন পাটোয়ারীর বুকে কম-বেশি সত্তরটা ছুরিকাঘাত করেছিল। তাকে থামানোর উপায় নেই, থামানোর কেউ নেই-ও। অন্তূ একদৃষ্টে চেয়ে দেখছিল যুবকের খুবলে খাওয়া। রক্তে ছুটে এসে দু এক ফোঁটা অন্তূর শরীরে লাগতেই শরীরটা শিহরণে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। জয় ভুল বলেনা, মানুষের র-ক্ত কখনও কখনও অমৃত সুধার মতো লাগে। অন্তূ ভাবছিল, এত সন্তুষ্টিদায়ক দৃশ্য সে কি আগে দেখেছে জীবনে?

হুমায়ুন পাটোয়ারীর যকৃত এবং হৃৎপিণ্ডের টুকরোগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছুরির ডগায় উঠে এসেছিল। অন্তূ তৃপ্তির সাথে দেখেছিল তা। বুক ভরে শ্বাস নিয়েছিল।এসবের আগে শাহানা আর্তনাদ করে আগুন্তুকের পায়ের কাছে বসে পড়েছিল, “বাপ! মারিস না, বাপ। আমার নাকফুল খুলে নিস না, তুই। আমি উনারে খুশি করতে পারিনাই। যা করার করেই তো ফেলছে, আমার নাকফুল কেড়ে নিস না, তুই। ছেড়ে দে। তোর দোহাই লাগে। ভাব তো, তোর মা যদি এমনে বলতো! পারতি, পারতি কথা না রাখতে। ছেড়ে দে, বাপ। মারিস না। আমার সুখ-

দুঃখের সাথী। আমার পাপ-পূণ্যের সাথী.....''অন্তূ এগিয়ে গিয়ে শাহানার ঘাঁড়ের কাছে বাঁ-পা দিয়ে কষে একটা লাত্থি মেরেছিল। শাহানা ছিটকে পড়ে গেলেন। দমলেন না। আবার উঠে এসে যুবকের পায়ের কাছে বসে আহাজারি করে উঠতেই কাঁচের ফুলদানিটা তুলে অন্তূ বিকট আওয়াজে শাহানার মাথায় আঘাত করে। কাঁচের ফুলদানী চুরমার হয়ে গেঁথে যায় শাহানার কপাল ও মাথায়। আগুন্তুক ততক্ষণ বিমূঢ় চেয়ে ছিল। আক্রমণ করেনি, সরায়নি শাহানাকে, একটুও খারাপ খারাপ আচরণ করেনি, যেন সে শেখেনি সেসব। কিন্তু অন্তূর

সহ্য ক্ষমতায় আসেনি। শাহনার র-ক্তে হাত ভিজতেই একটা অদ্ভুত সুখ অনুভূতি হলো। ইচ্ছে করল, যে ঠোঁট দিয়ে মিনতি করেছে শাহানা স্বামীকে বাঁচানোর, সেই ঠোঁটদুটো কেটে পশু দিয়ে খাওয়াতে। অনেক রকম হিংস্র ইচ্ছে জাগছিল অন্তূর শাহানার জন্য। এইসকল নারীদের সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়ই পঁচা গু মাটিতে পরিণত হওয়া মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন! এদের চেয়ে জঘন্য নারীও কি আর আছে সৃষ্টিকর্তার এই সুন্দর দেখতে দুনিয়াতে? নেই বোধকরি। এরা ময়লা, এরা নরকের ক্ষুধা মেটানোর খাবার। এজন্যই বোধহয় বুজুর্গজনেরা বলে গেছেন, সৃষ্টিকর্তা

জুড়ি বেছেই মেলান। খারাপ লোকের বউ সচরাচর ভালো হয়না।

আগুন্তুক যখন থামল, তখন পুরো ঘর একটা লা-শকা-টা ঘরের চেয়ে কম লাগছিল না। ছুরির আঘাত হুমায়ুন পাটোয়ারীর পাঁজরের হাড় গুড়ো করে মেরুদণ্ড ছেঁদ করে বেরিয়েছিল। আগুন্তুকের কালো জ্যাকেটে লাল র-ক্তের ছিটা দৃশ্যমান না হলেও উন্মুক্ত চোখের পাতা, ভ্রুতে র-ক্তের চাপড়ি পড়েছিল।

আগুন্তুক চলে যাবার সময় একবার অন্তূর দিকে তাকিয়েছিল। দুর্বোধ্য সেই দৃষ্টি বিনিময়। সন্তুষ্ট দুটো প্রাণ একে অপরকে

শুকরিয়া জ্ঞাপন করল? বোঝা গেল না। ওই চোখদুটো অন্তূ ভুলবে না কখনও। মুখটা দেখা হলো না, জানা হলো না পরিচয়, হলো না বিশেষ কথা। তবুও তারা খুব পরিচিত একে অপরের। তাদের মানসিকতা এবং পথ তো এক!সকালে দেখা গেল, ওয়ার্কশপের সামনে এবং বাগানের ধারে ছেলেদের যে আবাসিক একতলা বিল্ডিংটা আছে, সেখানে লা-শ বিছিয়ে আছে। ধ্বংসলীলা চলেছে অন্ধকার এক অবরুদ্ধ রাতে।

ঢাকায় সম্মেলনের জেরে রোডে-ঘাটে হানাহানি তো চলেছেই। আবারও জামায়াত ইসলামীর কয়েকজনের ফাঁ-সি-র রায়

কার্যকর হলো। দেশে উত্তাল শিবিরগোষ্ঠী। বিরোধী দলের নেতৃবর্গরা তখন অবরুদ্ধ আছে। কতজনের মৃত্যুদণ্ড জানান দেয়া হলো, কতগুলো গোপন হলো, সে খবর রাখল কে? জনগণ তখন নিজেদের জীবন নিয়ে অতিষ্ঠ। চারদিকে হাহাকার। রাজধানীর জনজীবনে শোক লেগেছে। মাসের হিসেবে তখন দেশে শতাধিক করে লোক মরে। আসলে কত মরে, জানে কে? মেধাবী ছাত্ররাও নজরে পড়ছিল তখন। গণপিটুনি, গুলি করে মারা, অথবা না জানা সব মরদেহ উদ্ধার রোজকার কাহিনি। তখন দেশটা সন্ত্রাশদের, তখন দেশটা

ক্ষমতাসীনদের ও বিশৃঙ্খলের রাজত্বে বন্দি গোটা দেশটা।

সেসব ছেড়ে হামজা ও জয়কে দিনাজপুর ফিরতে হলো। জয়ের পায়ের গোড়ালিতে ব্যান্ডেজ। হাতের কনুইতে টেপ মারা, ভ্রুর ওপরে কেটে গেছে। হামজার ডানহাত মারাত্মক আহত।তারা পৌঁছাল ইশার নামাজের পর। শাহানা হাসপাতালে, অবস্থা খারাপ। তুলি অসুস্থ অবস্থায় চলে এসেছে বাড়িতে। বাড়ি ভর্তি লোকজন আর পুলিশ। কিন্তু কোথাও অন্তৃ নেই।

জয় ঘরে ঢুকতেই হতবাক হয়ে গেল। মেয়েটা কোথায় গেছে? মামার লাশের পাশে

পুলিশসহ বিভিন্ন গভমেন্ট এজেন্সি থেকে লোক এসেছে। মেয়রের বাড়িতে মেয়রের তারই বাবার এমন নৃশংস হ-ত্যাকাণ্ড! সেসব ফেলে জয় ছুটল অন্তূকে খুঁজতে। গালির খই ফুটছে মুখ দিয়ে। এই অসময়ে হয়রানী না করালেই না! অন্তূদের বাড়িতে গিয়ে যখন জানল, অন্তূ যায়-ইনি সেখানে। তখন টনক নড়ল। বকে উঠল, "শালির মেয়ে! পেরেশানী ছাড়া আর কিছু করালো না জীবনে!"কোথায় যেতে পারে? এমন কোনো জায়গা নেই, যেখানে অন্তূর মতো ঘরবন্দি মেয়ে যেতে পারে। হন্য হয়ে চারদিকে খুঁজল। কোথায় খুঁজবে এই রাতের বেলা মেয়েটাকে?

মাথা গরম হয়ে উঠছিল। গোটা শহর ঘুরল। এতক্ষণের উত্তেজনা শেষে চট করে মাথায় এলো, খু-নি অন্তূর কোনো ক্ষতি করেনি তো? ঘড়িতে রাত বারোটা। শেয়াল আর ঝিঝি পোকার ডাক কবরস্থানের এই নিশুতি নীরবতায় গা ছমছমে একটা পরীবেশ তৈরি করেছে। জয় খাদেমকে খুঁজে পেল না। শরীরের ব্যথাগুলো টনটন করছে। শরীরটা ছোট হয়ে গেছে, ক্ষত বেশি এই জীবনে। এমন কোনো স্থান কি বাকি আছে, যেখানে ক্ষতর দাগ নেই? জয় হুটহাট ভাবে, গায়ের ব্যথার কথা আরমিণ জানলে এখন বলতো? নিশ্চয়ই বলতো, “কর্ম অনুযায়ী ফল

পেয়েছেন। আঘাত কেউ অকারণে করেনি নিশ্চয়ই আপনাকে।''দীর্ঘশ্বাস গোপন করে এদিক-ওদিক তাকাল। এখানে না পেলে কোথায় খুঁজবে? মনে মনে ঠিক করল, দেখা হওয়া মাত্র কান-সারার ওপর কষে একটা ঘুঁষি মারবে। এখানে এলেও, আসলে যে এখানে আসার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়নি, এটা নিশ্চিত সে।

কবরস্থানের গেইটটা এত রাতেও খোলা। জয় সন্দেহমাফিক এগিয়ে গিয়ে আশানুরূপ দৃশ্যটাই দেখল। অন্তূ কবরস্থানের গেইটের কাছে হাঁটু ভেঙে বসে অনুরোধ করছে খাদেদের কাছে, “চাচা, একটাবার আব্বুর

কবরের কাছে যেতে দিন...আমি আব্বুর সাথে দুটো কথা বলেই চলে আসব। দোয়া এখানে দাঁড়িয়েই করব। কথা দিচ্ছি।''

পেছন থেকে অন্তূকে চিনতে এক রত্তিও ভুল হলোনা জয়ের। দম ছাড়ল এবার। অবুঝের এই আবদারে খাদেম ব্যথিত কণ্ঠে বললেন, ''মা'রে! এত করে বলা লাগতো না আমারে। কিন্তু কবরের সীমানায় তোদের মায়ের জাতদের ঢুকতে নেই যে...''অন্তূ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে। জয় গিয়ে সামনে বসল। অন্তূর মানসিক অবস্থা দিনদিন বিগড়ে অপ্রকৃতস্থ হয়ে উঠছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ''চাচা!

আজ চলুন নীতি ভাঙি। আমি সাথে করে নিয়ে যাচ্ছি ওকে। দু মিনিটে ফিরব।”

খাদেমের নিষেধ শোনার লোক না জয়। অন্তূ লুটিয়ে পড়ে বাচ্চা শিশুর মতো আমজাদ সাহেবের কবরের ওপর। হু হু করে কেঁদে ওঠে। জয়ের কানে খুব লাগছিল কান্নাটা। কী যে করুণ সেই স্বর এই নির্জন রাতে বাপের কবরে পড়ে মেয়ের কান্না! নিয়ম মানেনা মায়া, না মানে রীতি! অন্তূকে টেনে উঠানো যাচ্ছিল না। জয় আপাতত ভুলে গেল সমস্ত হিংস্রতা, যা এতক্ষণে অন্তূর ওপর জন্মেছিল। হাঁটু মুড়ে সামনে বসে বলল, “আরমিণ! রাত হয়েছে। কখন এসেছ এখানে? কোথাও

গেছিলে, তুমি। কোথায়— তা এখন জানতে চাইলাম না। এমন একটা পরিস্থিতি, পারছি না টেনে একটা থাপ্পর লাগাতে। আর কত জ্বালাবে আমায়? ওদিকে কেয়ামত হয়ে যাচ্ছে। চলো, আবার আনবো তোমায়।''অন্তূ হাত ছড়িয়ে নিলো। জয় বসে থাকে চুপচাপ। শরীরটা ব্যথা। কী যে দৌড় ঝাঁপ গেছে শরীরটার ওপর! দুজন মিলে দোয়া করল কবরের পাশে দাঁড়িয়ে। জাভেদ আমিরের লাশ পাওয়া গেছিল না। জয়ের তা মনে পড়ল। এখানে তাঁর লাশ থাকলে সে কি আসতো জিয়ারত করতে? সে তো এসব

শেখেইনি অন্তূর মতো! পাপী সে। তার প্রার্থনা রব কবুল করে?
রোডে পলাশের বাহিনীর সাথে দেখা হলো। তাঁদের পাঁয়তারায় স্পষ্ট, আজ পারলে জয়কেও ছাড়বে না। পিষে রেখে যাবে। হামজার ভয় পাবেনা আজ, অর্ডার আছে এমন। জয় মিটমাট করার চেষ্টা করল, পারল না যখন, পিস্তল বের করতে হলো। তাতেও ভয় পেত না বোধকরি! কিন্তু কিছু ডিল, কিছু স্বার্থ!হুমায়ুন পাটোয়ারীর লা-শ পচন ধরেছে, তবু তদন্ত ফুরায়নি। হামজাকে বহুবার জিজ্ঞেস করা হলো, "আপনার বাড়িতে কার

এত বড় সাহস? এ বাড়ির পাহারা ও নিরাপত্তা...''

বাড়িতে থৈ থৈ করছিল বিভিন্ন তদন্ত সংস্থার লোক।জয়-হামজ চুপ। তাদের কাছে জবাব নেই, তবে ব্যখ্যা আছে। বিশ্বব্যাংকেও ডাকাতি হয়, অর্থাৎ সেরকম ডাকাতও আছে। হবে হামজাদের বাড়ি খুব ক্ষমতায় ঘেরা। কিন্তু সেই ক্ষমতার সাথে টক্কর দিতে পারা লোকটাই তো হয় প্রতিদ্বন্দী? এ আর অবাক হবার কী? প্রতিদ্বন্দী কি কখনও দূর্বল হয়? বাহিনী বিশাল ছিল। কিন্তু অন্তূ বলল, ওপরে শুধু একজন এসেছিল। নিচের ধস্তাধস্তিও সে শুনেছে।

এরপর? আর জবাব নেই। জয় কোনো প্রশ্ন করল না। সে তার বউকে যেন মুখস্ত করে রেখেছে। সারাদিন আইনী কর্মকর্তাদের আনাগোনা। মেয়রকে টপকে অন্তূকে তারা প্রশ্ন করতে কমই সুযোগ পেল। তার ওপর অন্তূ কথা বলছিল না। সে পারমাণবিক বোমার মতো। ওকে প্রশ্ন করতে দিলে, ঢাকনা খুলে যাবে। মেয়র নামক ব্যাক-আপটা অতটাও শক্ত নয়, সেই ঝাপটাকে ঠেকাতে পারবে না। হামজা সচেতন।

হামজার বাপ মরেছে। মা মৃত্যুসজ্জায়। অথচ সে নির্লিপ্ত। তার কোনো হুটোপাটা নেই। মানুষ যখন অমানুষিকতার উচু পর্যায়ে চলে

যায়, দুনিয়ার পার্থিব ‘মায়া’ ব্যাপারটা বুঝি ঘোলা হয়ে আসে।সময় পেয়ে জয় শান্ত স্বরে অন্তূকে জিজ্ঞেস করল, “কোথায় গেছিলে?”

-“আব্বুর কবরখানা জেয়ারত করতে।”

জয় শান্ত চোখে তাকাল, “আমি, জয় আমির। বুঝে চুপ থাকা লোককে তুচ্ছজ্ঞান করতে নেই, আরমিণ। সাতাশে জন্মাইনি আমি। পূর্ণ দশমাস পেটে থেকে জন্মেছিলাম।”

-“আমি কোথায় গেছিলাম, সেটা তেমন জরুরী কিছু না। তবু যদি জানতে চান, আমার একটা শর্ত আছে। সুযোগ লুফে নেয়া ভালো।”-“কী শর্ত?”

-“আপনাদের ওই গোপন ঘরের চাবি কার কাছে থাকে? এটা জানতে চাই।”

-“গণ্ডির বাইরে মৃত্যু থাকে, আরমিণ! তা পার কোরো না। তোমায় মারতে আমার খুব বেশি কষ্ট হবেনা।”

-“ঠিক আছে, তাহলে বাদ দিন।”

-“আমি কিছু জিজ্ঞেস করেছি।”

-“আমিও তো শর্ত দিলাম। চাবি চাইছি না তো, শুধু জানতে চাইছি চাবি থাকে কোথায়?”

-“বিশেষ কিছুই নেই ওই ঘরে। তুমি কখনও যাওনি, তাই এত কৌতূহল। যা জিজ্ঞেস করছি, জবাব দাও, নয়ত একটানে কণ্ঠনালী ছিঁড়ে আনবো। ধৈর্য্য নেই আমার।”

অন্তূ চুপ। জয় অধৈর্য্য হয়ে এগিয়ে আসতেই অন্তূ চট করে হাতে কাঁচের লম্বা ভারী পারফিউমের কৌটা তুলে নিলো। জয় হতবাক হয়ে যায়। অন্তূ বলল, “মৃ-ত্যুটা বিষয় না, কিন্তু কারও ক্ষমতার দাপট দেখাটা অন্যায়। ক্ষমতার দাপট নিয়ে কাছে আসলে জান না নিয়ে ছাড়ব না।”

জয় বাউচি কেটে অন্তূর বাহুর নিচে হাত গলিয়ে সোজা অন্তূর চুলের মুঠি চেপে ধরল। মেয়েরা কাত এই এক জায়গায়। হাত শিথিল হতেই কাঁচের কৌটা কেড়ে নিয়ে ভেঙে ফেলল জয়। বলল, “দুঃসাহস কতখানি তোর কলিজায়, আরমিণ? একদিন কলজেটা বের

করে ওজন করে দেখব।''-"আল্লাহ আপনার ইচ্ছা পূরণ করুন।''

-"কোথায় গেছিলে?''

-"চাবি কোথায়?''

-"কোথায় গেছিলে?''

-"চাবি..." উচ্চারণ করতে পারে না অন্তূ। একটা গাঢ় চুমু খেয়ে বসে জয়। অন্তূ কষে দুটো আঘাত করল বুকের ওপর, জয় নিরুদ্বেগ। লম্বা সময় পর অন্তূকে ছেড়ে বলল, "এর চেয়েও খারাপ কিছু করি, তার আগে প্রশ্নের উত্তর দাও। যে লোকটা এসেছিল, ওর সাথে কী কথা হয়েছে তোমার? আমরা না থাকা অবস্থায় বাড়িতে কী কী হয়েছে? অনেক

কিছু হয়েছে। লোকটার ব্যাপারে বল্। খুব দরকার আমার। বছরের পর বছর ধরে যাকে খুঁজছি, সে বাড়িতে এসে ঘুরে গেছে। বল বল, কী জানিস ওর ব্যাপারে? সাহায্য কেন করেছিস?'' জয়কে অন্তর্যামী মনে হলো। -“কিছুই জানিনা। কথা হয়নি, তবে আমি সাহায্য করেছিলাম আপনার মামাকে নরকে পাঠাতে। এ নিয়ে কোনো দ্বিধা তো নেই আপনার! এবার বলুন, চাবি কোথায় রাখা হয়?''-“এত জেদ তোর? এত জেদ কেন তোর? এত সাহস কোথায় পাস, বান্দির বাচ্চা?'' অন্তূকে বিছানায় ফেলে বুকের ওপর উঠে বসল জয়। গলা চিপে ধরে অশ্রাব্য

ভাষায় আরও দুটো গালি দিয়ে বলল, “তুই কী চাস? বাড়িটা জাহান্নাম হয়ে গেছে যেদিন থেকে এসেছিস। এত কীসের তেজ, তোর?”
অন্তূর মুখে রক্ত জমে লালচে হয়ে উঠল মুখটা, শ্বাস আঁটকে গেছে, চোখের শিরা লাল হয়ে উঠেছে, তবুও সামান্য ‘উহ’ শব্দ করল না বা কোনোরকম দূর্বলতা প্রকাশ করল না।
ছেড়ে দিয়ে হাঁপাতে লাগল জয়। অন্তূকে আঘাত করা আর মূর্তি ভাঙা একই কথা।
বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে ক্ষিপ্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, “শালি, তোর চাবি চাই, না?”
অন্তূ ছাদের দিকে তাকিয়ে রইল। জয় বলে উঠল, “তোর পা-ছা যদি তুই দড়ি ছিঁড়ে কুত্তা

দিয়ে মারা দিস, তো আমি কতক্ষণ লাঠি নিয়ে বসে থাকব?''খাটের এক কোণায় মশা-নাশক অ্যারোসোলের ভর্তি লোহার কৌটা রাখা থাকে। আকস্মিক অন্তূ সেটা তুলে ঠিক জয়ের মুখ বরাবর কষে ছুঁড়ে মারল। থুতনিতে লাগতেই গাঢ় এক জখম তৈরি হয়। জয় হাত সামনে এনে দেখল, র-ক্ত ঝরছে থুতনি থেকে। অন্তূ তাকিয়ে দেখছে তা। তার মুখে তৃপ্তি, চোখদুটো গমগম করছে জলন্ত শিখার মতো, "তোকে বসে থাকতে বলিনি তো। তোর ভালোমানুষি তোর কাছে রাখ। তোকে কে বলেছে, আমায় বাঁচাতে লাঠি নিয়ে বসে থাকতে? তুই যা করেছিস, সে তুই ভুল

করেই কর, আর জিদে অথবা ক্ষমতায়, তা যদি আমি অন্তূ কোনোদিন ভুলে যাই, আমি এক বাপের সন্তান না। অথচ আমার বাপ একটাই—আমজাদ আলী প্রামাণিক।''দু'দিন বাদে শাহানা মরে গেলেন। সীমান্তর লা-শ পাওয়া গেছে। প্রথম সন্দেহ হামজা পাটোয়ারী। এবার আবার দু'দল করে ইন্টেরোগেশনে আসে। একদল ওর বাপ-মায়ের জন্য, আর একদল সীমান্তর জন্য। রোজ রাজধানী থেকে কল আসে, তদন্তকারীরা বাধ্য হয়ে চলে যায়। উপরমহলের কথা না শুনলে চলে বুঝি প্রসাশনের?

পরিস্থিতি সবার জন্য কেয়ামতের সম। অন্তূকে পলাশ ছিঁড়ে খাবে, হামজা কী করবে তা বোঝা যাচ্ছেনা, জয় কী করছে তা ঘোলা ঘোলা। জয়ের পেছনে কত কেইস ফাইলে জমা হয়ে আছে। এসব সন্দেহ তার ওপর হামজার সমান এসে পড়ছে। অথচ সে দিব্যি ঘুরছে, খাচ্ছে, ভার্সিটি যাচ্ছে, কার্যালয়ে বসছে, কবুরতকে দানা খাওয়াচ্ছে, অন্তূর সাথে সাথে সেধে সেধে ঝগড়া করছে। তার দিন যেন ভালোই কাটছে। আজকাল খুব সিগারেট টানতে দেখা যায় তাকে।

হামজা বেশিদিন এভাবে টিকতে পারবেনা, তা তার বাড়ির পিঁপড়ের দলও জানে। কতদিন

তাকে প্রোটেক্ট করবে উপরমহল? যতদিন স্বার্থ আছে? পূরা না করতে পারলে তারাই হামজাকে উড়িয়ে দিতে দ্বিধা করবে নাকি? তার মাথার ওপর ফাঁসির দড়ি রঙ্গ করে নাচছে।তবুও পৌরসভার উন্নতি করে চলেছে সে। রাস্তাঘাট তৈরি করছে, সরকারী প্রাইমারী স্কুলগুলোতে বেঞ্চি বানিয়ে দিচ্ছে নতুন। সরকার যা বাজেট দিচ্ছে, তার পুরোটা সেসব কাজে লাগাচ্ছে না, সেটা আলাদা বিষয়। জন্মনিবন্ধনের একটা সামান্য কাগজ সাইন করাতেও হাজার টাকা নিচ্ছে, রাস্তাগুলো বছর না ঘুরতেই পিচ উঠে গর্ত তৈরি হবে, সেসব আলাদা বিষয়। তবে সে শীতে কম্বল দেয়,

গরমে টিউবয়েল বসায়, ভাতার কার্ড দেয়। আর জয় ছাত্র সংসদ দেখছে।

তবুও কেন যে বদনাম খড়ের গাদায় আগুনের মতো ধিক ধিক করে বাড়ছিল চারদিক। এটা রাজনীতিবিদের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বদনাম না হয়ে পলিটিক্স করা যায়না।এ বাড়িটা স্বাভাবিক না। বাড়ির প্রতিটা ইটও অস্বাভাবিক। কাল এ বাড়ির বাপ-মায়ের শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান। গোটা এলাকার লোক খাবে। সে-রাতে অন্তূকে ডাকা হলো। হামজা প্রশ্ন করল, "আম্মাকে তুমি আঘাত করেছিলে?"

-"হ্যাঁ।"

-"আর আব্বুকে?"

-“ওই লোকটা।”

-“চিনতে পারোনি তাকে?”

-“না।”

-“লম্বা ছিল?”

-“হ্যাঁ।”

-“আর?”

-“আর কিছু দেখতে পাইনি। মুখ বাঁধা ছিল।”

-“তবুও সাহায্য করলে?”

-“আমি সাহায্য করেছি, তা কী করে বলছেন, আপনি?”

-“তুমিও বোকা না, আরমিণ। আর আমিও হামজা পাটোয়ারী।”

-“তাহলে তো সব ধারণাই আছে আপনার। আর জিজ্ঞেস করছেন কেন?”

-“তবে তোমার ধারণা নেই নিজের অবস্থা সম্বন্ধে।”-“না না, আছে। আছে বলেই তো কিছু মনে হয়না। দেখুন, মানুষের দূর্বল ক্ষেত্র দুটো—শরীরের ব্যথা আর সবশেষে প্রাণটা। কিন্তু মেয়েদের দূর্বল ক্ষেত্র তিনটা—ইজ্জত, শরীরের ব্যথা আর সবশেষে মৃত্যু। বাহ্যিকভাবে আমার সম্মান নেই, তা রাখেননি আপনারা, ঠিক। কিন্তূ আসলে তো আছে। আর সেটা রক্ষা করতে আমার কোনোমতো শ্বাস চলাই যথেষ্ট। আজ আর আমি বোধহয় সেই পলাশের রূফটপের অন্তূ রইনি, মেয়র

সাহেব। আর রইল, মরণ! ওটা তো শখে শখে কবুল। এটা কোনো জীবন হলো? ছিহঃ!

''হামজা জয়কে বলল, "তোর বউয়ের পড়ালেখাটা বন্ধ করে দে। এত না পড়লেও চলবে। যথেষ্ট শিক্ষিত হলো, এখন সংসার সামলাক, সংসারে কাজও বাড়বে। একটা বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে নে।''

অন্তূর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। হামজা ভয়ানক সে জানে, কিন্তু শান্ত মানুষের ভয়াবহতা ঠিক কতটা ভয়ানক হতে পারে? পড়ালেখা না করা, জয়ের সংসারে জয়ের বাচ্চা পালন করা, এর চেয়ে বড় দূর্বলতা নেই তো, নাহ নেই আর কিছু অন্তূর! হামজা ঠিক তা-ই

পয়েন্ট করেছে। অন্তূ আজ সত্যিই ভয় পেয়ে গেল আরেকবার হামজাকে। কঠিন ভয়। চোখে-মুখেও সেই ভয় ফুটে উঠল। সে পাগলের মতো পেছন থেকে ডেকে উঠল, "মেয়র সাহেব! পড়ালেখা বন্ধ করে আপনি আমায় আঁটকে রাখতে পারবেন বলে মনে করেন?''

হামজা পেছন ফিরে সুমিষ্ট হাসে, "শুধু তোমায় বাঁচিয়ে রেখে আমি শেষ অবধি অনেক কিছুই করব, আরমিণ! চোখ দুটোর যত্ন নাও, দেখতে হবে সেসব।''বিশাল ডুপ্লেক্স বাড়ি। কাঁচের সমোরহ চারদিকে। সুস্থ চোখে অভিজাত্যের কমতি চোখে পড়ার

অবকাশ নেই। দেয়ালগুলো অবশ্য রোজ আওয়াজহীন চিৎকারে বলতে চায়, আমি অমুকের র-ক্তের বদলে আদায় করা টাকায় কেনা, অথবা কোনো আসবাব হয়ত অভিমান করে স্বীকার করেনা, ওটা কেনার টাকা পলাশ কারও বউ ছিনিয়ে নেবার ভয় দেখিয়ে আদায় করে নিয়েছে, মেঝের টাইলসগুলোও অবশ্য বলেনা মুখে—আমার মূল্য অমুক মুদি দোকানদারের সারাদিনের পরিশ্রমের টাকা চাঁদাবাজিতে খোঁয়া যাওয়া পয়সায় কেনা। ওরা জড় বস্তু, ওরা এসব কেন বলবে?

পলাশ হেলে-দুলে ঢুকল হলরুমে। তার কানে এসব চিৎকার মধুর ঠেকে। আজ মদ-টদ

খেয়ে আসেনি। সোফায় বসে চেঁচাল,

“রূপ?..রূপ! নিচে আয়।”

রূপকথা এসে জিজ্ঞেস করল, “কিছু লাগবে, তোমার?

-“হু, পাশে বস।”রূপকথা জানে, পলাশের কী লাগবে। কিছু প্রশ্নের উত্তর।পলাশ রূপকথার ঘাঁড়ে মুখ থুবরে আধশোয়া হয়ে বলল, “পাটোয়ারীদের বাড়িতে গেছিলি কেন রে? একা একা ভালো লাগেনা বাড়িতে, তাই তো? ”

রূপকথা চোখ বুঁজল, “আমায় মেরে ফেলো না কেন? তোমার নিষ্ঠুরতা আজকাল ব্যথাও দেয়না আমায়।”

-“ধুর। মারব কেন? ছোটবেলা থেকে ভালোবাসি তোকে। এতদিনের ভালোবাসায় কেউ একেবারে মারে?”

-“ঠিকই বলেছ। রোজ মারতে হলে একেবারে মারা উচিত নয়।”

-“কিন্তু তুই আমায় মারতে চাস। এটা জেনে কষ্ট পেলাম। আমি তো খারাপ না।”

-“না। আমি মারতে চাই না তোমায়। কিন্তু তুমি যাদের ওপর অন্যায় করো, তারা যদি তোমায় মারে, আমি তাদের বাঁধা দেবার পাপটুকু করতে চাই না।”পলাশ অবাক হবার ভান করে, “এই সাহস কোথায় পেয়েছিস,

রূপ? আগে ছিল না। তুই বদলেছিস অনেক।
''

পলাশের চুলের মাঝে হাত গলায় রূপকথা, "ব্যথার ওপর ব্যথা দিলে আর ব্যথা লাগেনা। আমার মনেহয় তাই হয়েছে। আমার মনেহয় ধৈর্য্য ফুরিয়ে গেছে, অথবা পাগল হয়ে গেছি।
''

কী সুন্দর দেখতে লোকটা! চোখ, নাক, চুলের বাহার! সুদর্শন স্বামী রূপকথার। তার সাথে খুব মানায় পলাশকে। লোকটা হাসলে খুব সুন্দর দেখায়, নাকটা কুঁচকে চোখদুটো ছোট হয়ে যায়। রূপকথা চুলে হাত বুলিয়ে দিলো। অদচ মনটা বিষে জেরে আছে। মানুষ মনের

কথা শোনে, কে বলে? মনকে লুকিয়ে উপরি রঙে নিজেকে রঙ দিয়ে বছরের পর বছর কেটে যায় এই দুনিয়ায়। তাদের সম্পর্কটা অবর্ণনীয়।

-"জয়ের বউয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলি কিছুক্ষণ? চোখ দিয়ে কিছু ইনপুট করেছে তোর ভেতরে?"

রূপকথা হাসল, "ওকে তুমি ভয় পাও?"

-"না। ও আমাকে ভয় পায়না, এটার জন্য দুঃখ পাই আমি।"

-"ঠিকই। ভয়ানক মানুষদের যারা ভয় পায়না, তাদের চেয়ে ভয়ানক নেই।"

-“তুই কি ওর মতো হতে চাচ্ছিস?” সোজা হয়ে বসে রূপকথার পেট জড়িয়ে ধরে পলাশ। এই সুন্দর শরীরে হাজারও শুকনো ক্ষত।-“চাইলেই কি সম্ভব? আমি তো তোমার শিকার। ছয় বছরের বিবাহিত জীবনে মনুষ্যত্বহীন কুকুরে পরিণত হয়েছি। আমি নোংরা। আমি কেন ওর মতো হতে যাব।”
-“তুই প্রতিবাদ করছিস, রূপ। আগে করতি না।”
-“না, করছি না। সে সাধ্যি আমার নেই। তবে আজকাল আশা রাখি, খুব তাড়াতাড়ি মুক্ত হবো আমি।”

-“না। হবিনা। আমি এত দূর্বল না। গোড়া থেকে উপড়ে ফেলব একদম সবকটাকে। তুই চিন্তা করিস না, তুই মুক্তি পাবি না।”আবারও এক নারকীয় রাত। অনেকদিন পরেই। আজ মেয়ে আনেনি পলাশ। মানসিক বিশেষজ্ঞ একবার বলেছিলেন, “অধিকাংশ সাইকো খুব লজিক্যাল এবং কুল হয়। বদমেজাজও এক প্রকার সাইকোপ্যাথ, তবে সেটা হালকা, ভয়ানক নয়। কিন্তু যত শান্ত, তত মারাত্মক।” তবুও আজ রূপকথার সুখ সুখ লাগল। সে কীসের যেন আশা করে আজকাল। কেন যেন মনে হয়, এসবের দিন ঘনিয়ে আসছে। সব বদলাবে। এই অবরুদ্ধ রাত কাটবে। স্বপ্ন

দেখাও এক প্রকার সুখ।জয় রোজ অন্তূকে অত্যাচার করে, বিভিন্ন প্রশ্ন করে, কোনো কাজ হয়না। মাঝেমধ্যেই জয়কে সর্বজান্তা মনে হয়। মানুষের আন্দাজশক্তি কতটা প্রখর হতে পারে!? জয় যেমন সেদিন চট করে বলল, "পলাশের বউ এসেছিল বাড়িতে?" অন্তূ চুপ। জয় বলল, "এসে কী কী বলে গেছে?"

-"আপনি তো সব জানেন, আপনার সব ধারণা শতভাগ মিলে যায়। এত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা নিয়েও...আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। অতীত-টতীত ভুলিনি, সেটা আলাদা বিষয়। সেটা বড় কথা না। বড় কথা হলো,

আমি জানি, আপনি সব জানেন। আমার এমন কোনো প্রশ্নই নেই, যার উত্তর আপনার কাছে নেই। জিজ্ঞেস করলে বলবেন সেসব?"

নরম করে বলল অন্তূ।-"না।"

অন্তূ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "চলুন, কিছুটা ডিসকাস করা যাক।"

জয় কথা না বলে সিগারেট জ্বালিয়ে দিয়াশলাই রেখে বলল, "তুমি স্বার্থপর, ঘরওয়ালি।"

-"নিঃসন্দেহে।" মাথা দুলিয়ে হাসল অন্তূ।

জয় তাকায়। অন্তূর চোখে একটুও গ্লানি নেই, আত্মগরিমায় পরিপূর্ণ চোখদুটো। যেখানে বারবার জয়ের মরণ হয়। জয় আজকাল

গম্ভীর হয়ে পড়েছে, দুষ্টু সত্ত্বার ঘাটতি দেখা দিয়েছে। সেসব ভেঙে আজ হেসে ফেলে গান গেয়ে উঠল,

দুই নয়নে তোমায় দেখে

নেশা কাটে না.... দেখার আশা মেটেনা,

হাজার নয়ন দাও না আমায়, লক্ষ নয়ন দাও না...

এক হৃদয়ে...আর গাইল না, চট করে থেমে গেল। অন্তূ নির্লিপ্ত। জয় কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে মন্ত্রপুতের মতো চোখের ভাব করে বলল, "আমার কাছে যদি একটা মন থাকতো না! পাক্কা তোর ওপর পিছলা খেত, আরমিণ!"

অন্তূ নির্বিকার মুখে চোখ ফেরায়, ‟আল্লাহ বাঁচিয়েছে, ভাগ্যিস নেই।”

জয়ের মুচকি হাসির দমক বাড়ল, ‟ভাগ্যিস নেই।” গা দুলিয়ে হাসল অপলক চেয়ে থেকে।

অন্তূ প্রসঙ্গ বদলায়, ‟আপনি খেয়াল করেছেন কিনা জানিনা। এত কিছুর পরেও কিন্তু মুস্তাকিন মহান এ বাড়িতে এলো না। এত সব তদন্ত সংস্থার মেলা হলো বাড়িতে, পিবিআই ডিপার্টমেন্টের কত কর্মকর্তা এলো-গেল। অথচ সে আসেনি একবারও। বিয়ের পর তাকে একবার দেখিওনি। বিষয়টা ঘাপলা লাগেনা, আপনার?”

-“না, লাগেনা।” লম্বা একটা টান দিয়ে ধোঁয়াটুকু গিলে ফেলল।অন্তূ অনেকক্ষণ ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে রইল। কোনো কথা বলতে পারল না হতবিহ্বলতায়। জয় জিনে আঁছড় করা লোকের মতো গটগট করে বলল, “তুমি সেদিন মুস্তাকিনের সাথে দেখা করতেই বের হয়েছিলে বাড়ি থেকে। তার বাড়িতে দেখলে, পিবিআই অফিসে দেখলে, কোথাও পেলেনা। এরপর পলাশের ছেলেদের তাড়াও খেয়েছিলে রাস্তায়... এরপর আরও কোথাও গেছিলে, বলছো না... সেটা কোথায়?”

অন্তূ হতবুদ্ধি হয়ে গেল, “আপনার ঘাঁড়ে জিন চালান করা আছে?”

-“সবটা আন্দাজ।”

-“এত নিখুঁত?”জয় হাসল, তো গাল ভর্তি ধোঁয়া বাতাসে মিশলো। হাসি চওড়া করে বলল, “অভিজ্ঞতা বেশি আমার, বারবারই তো বলি। তুমি এই যে ছুটছো, কৌতূহলের পেছনে, একদিন তুমি আমার চেয়েও বেশি ভয়ানক হয়ে উঠবে, ঘরওয়ালি। আমি বুঝি তোমাকে।”

-“আমিও বুঝি আপনাকে।”

-“আমি জানি। তাই তো দূরত্ব মেটেনা।”

-“না মিটুক কখনোই।”

জয় অন্তূর দিকে চোখ তুলে অস্পষ্ট হাসে, “না মিটুক।”

—

সকাল সকাল জয়ের ফোন বাজছে। অন্তূ রান্নাঘর থেকে ছুটে এলো। অথচ জয় তখনও বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। উপুড় হয়ে ঘুমায় জয়। অন্তূ দু'বার ডাকল, "জয়? জয় আমির! আপনার ফোন বাজছে। গরম খুন্তির সেঁক দিয়ে ঘুম ভাঙাতে হবে? নাকি মরে-টরে গেলেন?"

-"না। জীবিত।" চোখ খুলল জয়।

ফোন হাতে নিয়ে স্ক্রিনে তাকিয়ে আবার ফিরিয়ে দিলো অন্তূকে, "তোমার ভাবী। কতা কও।"

ভ্রু জড়ায় অন্তূ, "নম্বর কোথায় পেলেন?"

-“সেদিন তোমায় খুঁজতে গিয়ে নিয়েছিলাম।”
মার্জিয়া কথা বলতে পারছিল না। কণ্ঠস্বর দিয়ে রীতিমত ফুপড়ি উঠছে। অন্তূ স্পিকার লাউডে দিয়ে বলল, “কী হয়েছে? কী হয়েছে, ভাবী?”-“তোমার ভাই...তোমার ভাইয়ের গাড়ি....অন্তূ, কারা জানি তোমার ভাইয়ের গাড়ি পিষে দিয়ে গেছে, অন্তূ।”
কেউ একজন কেঁড়ে নিলো ফোন। ভালোভাবে বলল, “অন্তূ! তোর ভাইয়ের নাড়ি-ভুড়ি সব রাস্তায় রাস্তায়। কোম্পানির গাড়ি ছানাবড়া হয়ে গেছে। আগুনে পুড়ে ছাই। অন্তিক খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে, অন্তূ।”

জয় দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে বসল। অন্তূ মেঝের ওপর বসে পড়ার আগে হামজার শান্ত, জমাট বরফের মতো শীতল মুখটা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। অন্তূর চোখ পরিষ্কার তো! নাহ, ঘোলাটে জলে ভরে উঠেছে। হামজা চোখ পরিস্কার রাখতে বলেছিল।অন্তূ যখন উঠে দরজার দিকে এগিয়ে যাবে, জয় বাহু চেপে ধরল, "ঘরওয়ালি, ঘরওয়ালি! যাচ্চ কোতায়?"

অন্তূ তাকাতেই চোখ বুজে মাথা ঝারা দিয়ে চোখ ঝাপটে ফের বলল, "কোথায় ছুটলে?" অন্তূ হতবাক হয়ে গেল। জয় জানায়, "এ বাড়ির বউয়েরা যখন-তখন বাপের বাড়ি

যায়না। ভাবীকে দেখেছ একবারও বাপের বাড়ি যেতে?''

-"পাগলামি করছেন, আপনি?'' অন্তূ কণ্ঠে বিস্ময়। তার কণ্ঠস্বর কাঁপছে।

-"না। পাগলামি করব কোন সুখে? আমি একটা ভালো জাতের মাতাল, পাগল না।''

জয়ের রসিকতা সহ্য হলো না অন্তূর। ব্যাকুল হয়ে বলল, "অন্তিকের—''

-"দেখার মতো না। দেখেই এসেছি রাতে—''

অন্তূ তড়িতাহতের মতো ছিটকে তাকায়। জয় অপ্রস্তুত হবার নাটক করে যেন, ভ্রু উচিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে ঘাঁড় চুলকায়। অন্তূ খানিকক্ষণ কথা বলতে পারেনা, পরে নিস্তেজ গলায়

বলল, "কী অপরাধ করেছিল আপনাদের কাছে আমার ভাবীর গর্ভের সন্তান?''জয় দুপাশে মাথা নাড়ে, "চ্যাহ্! জন্মের আগে কেউ অপরাধ করেনা।''

অন্তূ হাত ছড়ানোর চেষ্টা করল একবার, পরে থেমে গেল। দৃষ্টি সরালো না জয়ের মুখ থেকে। পাগলের মতো অল্প হাসল, "আমি করেছি অপরাধ! বলছেন না কেন?''

জয় দরজাটা একহাতে আঁটকে দিয়ে অন্তূকে টেনে এনে বিছানায় বসিয়ে কপালে একটা চুমু খেয়ে সিগারেট জ্বালালো। অন্তূ বিছানায় আঘাত করে হাত দিয়ে, "শিট! অপরাধ করলাম আমি, আর ওই বাচ্চাটা দুনিয়ায়

এসে বাপকে দেখবে না। ড্যাম, ড্যাম, ড্যাম! ড্যাম অন মি।'' টুপ টুপ করে কয় ফোঁটা পানি পড়ে বিছানায়। আবার শুকিয়েও যায়না, অন্তূ জীবনে কেঁদেছে খুব কম, আমজাদ সাহেব পছন্দ করতেন না।

জয় বসল পাশে। অন্তূ জিজ্ঞেস করে, "আমাকে যেতে দেবেন না ওই বাড়ি?''

-"না। তোমার একটু রিল্যাক্স দরকার। কিছুদিনের দৌড়-ঝাঁপে ক্লান্ত, তুমি। হামজা ভাই এতক্ষণে চলে গেছে। গিয়ে বলেও দিয়েছে হয়ত, তুমি যাবেনা। অন্তিকের ওপর রাগ তোমার। ঠিক না?''

অন্তূর মেঝের দিকে তাকিয়ে যান্ত্রিক গলায় বলে, “হ্যাঁ, ঠিক। কিন্তু ওর সন্তানের ওপর ছিল না, জানেন? তা সত্ত্বেও ওর সাথে আমি পাপ করে ফেলেছি। আমার ক্ষমা নেই।”জয় সিগারেটে টান দেয়, “ওসব কাটাছেঁড়া দেখতে পারবে না, তুমি।”

-“আচ্ছা। দেখতে যাব না, ওসব।”

তোতাপাখিকে শেখানো বুলির মতো বলে অন্তূ।

জয় মেঝের দিকে ঝুঁকে বসে সিগারেটের আগায় টোকা দিয়ে জমাট ছাই ফেলে মেঝেতে। হামজার কল আসছে বারবার, তারা দুজন মরা বাড়ি যাবে, কত কাজ পড়ে

আছে তাদের। অন্তূ আস্তে করে উচ্চারণ করে, “কেন?”

খানিক সময় নেয় জয়, তারপর বলে, “রাজনীতি পুরোটাই একটা নীতির ভাণ্ডার, ঘরওয়ালি। হোক তা দূর্নীতি অথবা সুনীতি। নীতি। তার মাঝে মেজর একটা নীতি কী জানো? জনগণকে কাবু রাখা। কিন্তু আমাদের দ্বারা কখনোই সম্ভব না জনগণের মন জিতে তাদের হাতে রাখা। তাহলে উপায়? কিন্তু হাতে তো রাখতে হবে!” দীর্ঘশ্বাস ফেলল, “ভয়। এটা কার্যকর। জনগণের মনে যতদিন আমাদের জন্য কলজে কাঁপা ভয় আছে, ততদিন আমরা আছি। ওটা পুঁজি আমাদের।

তোমার ভেতরে তা নেই হয়ে যাচ্ছিল। বিদ্রোহী আর রাজ-প্রতিদ্বন্দীরা জানের ভয়হীন হয়। তাই বলে কি এদের কাবু করার জায়গা নেই? থাকে। এদের পরিবার..''একটু থেমে বলে, ‘‘আমি বলেছিলাম, তোমার পরিবারকে আঘাত করতে দুঃখ পাবো আমি। অন্তিককে আঘাত করার সময় খারাপ লেগেছিল আমার। তোমার ভাবী গর্ভবতী, অসহায় মা। জেদ কি ভালো কিছু বয়ে আনে, আরমিণ?'' ঠোঁট একপাশে বাঁকা করে ‘চ্যাহ চ্যাহ' শব্দ করে মাথা দোলায় জয়।

অন্তূ মন্ত্রপুতের মতো দুপাশে মাথা নেড়ে সম্মতি দেয়, ‘‘না। ভালো কিছু বয়ে আনেনা।

খুব খারাপ অবধি যায়। আমি...আমি আমার অপরাধগুলো সব গুলিয়ে ফেলেছি, মনে করান তো পাপগুলো—মনে পড়েনা পাপ। তবে এত বড় বড় দাম যখন দিচ্ছি, কিছু তো করেছি। কী?''

-"তোমার ভয়হীনতা।'' হ্যান্ডপ্রেসিং বলটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বলল, ''হামজা ভাই আর আমার পথ একটা, গন্তব্য দুটো। বিষয়টা এমন—এক রাস্তার মিলিত মোড়ের ওপর লাগোয়া দুটো বাড়ি। আমি যাব একটাতে, হামজা ভাই অপরটায়। কিন্তু পথ তো একটাই, একই স্থানে। সেখানে তুমি একটা বেরিকেট। হয় সেটা সরিয়ে দিতে হবে

নয়ত আধভাঙা করে পথ ক্লিয়ার করতে হবে। তোমার নিজস্ব দূর্বলতা নেই। কিন্তু তোমার ভাবী, মা...তাছাড়া অন্তিক আমার আর হামজা ভাইয়ের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের মামলা করেছিল। রেপুটেনশ বলতে তো কিছু আছে নাকি? এসব কি ঠিক করেছে?''-''না। ঠিক করেনি।'' অন্তূ চোখ তুলে তাকায়, ''এত হিংস্র মনে হয়নি কখনও আপনাকে।''

-''তুমি আমায় চেনোই কতটুকু?'' জয় ঠোঁট কাঁমড়ে হাসে। আবার জিহ্বা বের করে ঠোঁট ভেজায়।

-''আমি মূর্খ, নির্বোধ। ঠিক বলিনি?''

জয় হো হো হা হা করে হাসে। এই হাসিটা অবর্ণনীয়। আনমনে কেউ জোরে হাসলে ভৌতিক লাগে। জয় পারে। তার আনমনা চোখ, ঠোঁটে ফেঁড়ে গা দুলানো হাসি, এটা তার বৈশিষ্ট্য। পাখির মতো ঘাঁড় নেড়ে ওদিক-এদিক তাকায়। অস্থির-চঞ্চল জয় আমির।

সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে মেঝের ওপর। গতরাতে এসে গোসল করেছিল সেই মাঝরাতে। খুন করে এসে গোসল করতে হয়? হামজার জন্যও গরম পানি করতে দেখছে রিমিকে। হামজাও গোসল করেছে? অন্তূ ভাবে। তার মাথায় আবোল-তাবোল

ভাবনারা আসছে। কে যেন ডাকছে। সে স্পষ্ট শুনছে। নাম ধরে ডাকছে ওকে। সারা দিলেই বলছে, “মরে যা। যন্ত্রণা কমে যাবে। তোর মতো মেয়ের মরে যাওয়া খুব দরকার।”অন্তূ শুধায়, “মরলেই সব যন্ত্রণা শেষ হয়ে যাবে?” সে বলে, “পাক্কা। তোর বাঁচার হক-ই তো নেই। তুই তোর বাপকে খেয়েছিস, নিজের পর্দা, ক্যারিয়ার, পরিবার, সম্মান, শান্তি, অবশেষে ভাইটাকে, সাথে কিছু অমানুষ শত্রুও লেলিয়ে নিয়েছিস নিজের পেছনে। একটা বাচ্চার বাপকে তার জন্মের আগে খেয়ে বসে আছিস। তোকে বাঁচার হক কে দিয়ে রেখেছে?”

-“তাহলে মরে যাওয়াই উচিত, আমার?”
-“আলবাৎ তাই। জয়ের ড্রয়ারে অনেক রকমের মেডিসিন-ড্রাগস থাকে। কোনোটা অভার-ডোজ হলেই তুই মুক্ত। তোর মতো নির্বোধদের বাঁচতে নেই, অন্তূ। মুক্ত হ, ব্যথা কমিয়ে ফেল। এত যন্ত্রণা গিলে এমনিতেও সুস্থ থাকবি না।”
সাদা পাঞ্জাবীর ওপর আলমারী খুলে নতুন আতরের শিশি বের করে পুরো শরীরে আতর লাগায় জয়। পাঞ্জাবীর কলার টেনে বোতাম আটকায়। হাতে থাকা শিকলের মতো রিস্টলেট খুলে কালো ঘড়ি পরে, গলার চেইনটা পাঞ্জাবীর গলার আড়ালে রাখে। মরা

বাড়ি ভদ্র হয়ে যাওয়া উচিত।অন্তূর নাকে আতরের ঘ্রাণ যেতেই পরিবেশ ভুলে অন্য টাইমলাইনে বিচরণ করতে শুরু করল। সে দেখতে পায়, সামনেই আমজাদ সাহেবের লাশ। চোখে সুরমা, গোলাপজল ছেটানো হচ্ছে, আতর, কর্পূর ইত্যাদির গন্ধ আসছে। চট করে আমজাদ সাহেবের মুখটা বদলে অন্তিক হয়ে যায়। অন্তূ কেঁপে ওঠে থরথর করে। তার জন্য হয়েছে সব। সে কী করে ফেলেছে! তার দুঃসাহস, তার লাগামহীন জবান, তার আপোষহীন চিত্ত— ফলসরূপ মার্জিয়ার শুকনো মুখ অন্তূর বুকে চিড় ধরায়। ওই ছোট্ট জানটা যখন দুনিয়ায় আসবে,

বাবাকে পাবেনা, সে কি জিজ্ঞেস করবেনা, ‘কেন আমার বাবা নেই?’ মার্জিয়া কি বোঝাবে না, ‘তোর ফুপুকে জিজ্ঞেস কর।’ কী জবাব দেবে অন্তূ?অন্তূর মনে হয়, সে বোধহয় তলিয়ে যাচ্ছে কোথাও। সে কি চেতনা হারাচ্ছে? না, এত দূর্বল তো না সে! প্রতিবাদ! বিদ্রোহ, সত্যের সন্ধান, অন্যায়কে অন্যায় বলা, আপোষ না করে রুখে চলা—এসব কী দিলো তাকে? অভিজ্ঞতা! প্রকৃতি কিছু নিলে বিনামূল্যে নেয়না। এই তো অন্তূকে কতশত অভিজ্ঞতা দিলো, এসব কি টাকায় পাওয়া যায়? জয়ের অনেক অভিজ্ঞতা, তারও নিশ্চয়ই হারাতে হয়েছে?অন্তূ ভাবে, এরপর

জয় পশু হয়ে গেছে। অন্তূও তাই হবে একদিন? চুপচাপ মানুষ মারতে হাত কাঁপবে না? মানুষকে গাড়ি চাপা দিয়ে খণ্ড খণ্ড করে এসে রাতে সে চুপচাপ শান্তির ঘুম ঘুমাবে? জয়ের মতো?অন্তূর আনন্দে বুক নেচে ওঠে। সে তো খালি শিখেছে, মুখ চালাতে। ক্ষমতা আসলে চোখের চাহনিতে, হাতের অস্ত্র চালনার দক্ষতায়, নীরবে উপড়ে ফেলায়। অন্তূ নিজেকে অভিশাপ দেয়, ‘পুড়ে মরে যা তুই। সেবার মনে হয়েছিল, এবার বুঝি কী না কী করে ফেলবি! তোর বাপ মরেছে, টাল হয়েছিস তুই, এবার দুনিয়াটা শাসন করে ফিরবি। তোর মতো মূর্খ আর জাহিরি

লোকের তো মরে যাওয়া উচিত। মরে যা তুই।'

নিজেকে দেয়া অভিশাপ অন্তূর খুব পছন্দ হয়। সে হালকা হাসে। সে কেবল চায়— জয়ের মতো বহুরূপী, আর হামজার মতো শীতল হতে। পাবরে? ওরা কথা বলেনা। ওদের মুখ অচল, হাত ও মাথা সচল।

অন্তূকে ঘরে আটকে রেখে জয় বেরিয়ে যায়। খুব সুন্দর দেখাচ্ছে জয়কে। ঠিক যেন শ্যামা-রাজকুমার সাদা ভূষনে। খাঁটি বনেদি পুরুষ লাগছিল। অন্তূ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে জিজ্ঞেস করে, 'বাদের প্রতি-বাদ করবি আর?'অন্তূর মনে

হয়, আয়নার ভেতরের অন্তূ সাঁয় দিচ্ছে, ঘাঁড় নেড়ে বলছে, 'আমৃত্যু করে যাব। তাতে এ জান থাক আর যাক। এ মাথা নোয়ানোর নয়, জুলুমকারীদের হ্যাঁ-তে হ্যাঁ মেলানোর নয়, মুখ বুজে অন্যায় সহ্য করার নয়...'

দুম করে ভরা পানির বোতলটা তুলে ছুঁড়ে মারে কাঁচের ওপর। ঝনঝনিয়ে ভেঙে পড়ে ড্রেসিং টেবিলের কাঁচ। এখন আর ওই অন্তূকে দেখা যাচ্ছে না। অন্তূ জোরে জোরে শ্বাস ফেলে। সেই অন্তূকে বলে, 'আর কখনও আমার কাছে এলে জ্যান্ত পুঁতে রাখব। এই তুই আর তোর নীতি যা কেঁড়ে নিয়েছিস আমার কাছে, সেসব আমার গেছে, তোর তো

একফোঁটা আঁচড়ও লাগেনি গায়ে। সমাজ তোকে কিছুই বলেনা, তুই যে কত বেপরোয়া, তুই উজানের টানে বেতাল-উত্তাল সমুদ্রের বিক্ষিপ্ত আগুন জরা ঢেউ, তা কেউ দেখেনা। অথচ তোর মোহে, তোর নির্দেশনায় আমি নিঃস্ব, আমি কাঙাল, আমি পাগল, আমি বোকা!''অন্তূ চিৎকার করে চুল টেনে ধরে। ছুঁটে এসে হাতের কনুইতে লেগেছে এক টুকরো কাঁচ। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোলে অন্তূ সুখের শ্বাস ফেলে। কার্যকর তো ভীষণ! মানসিক যন্ত্রণাকে ভুলতে শরীরের ব্যথা ভীষণ কার্যকর ঠেকল অন্তূর কাছে। ক্ষততে যে জ্বলুনি উঠেছে, তা মানসিক যন্ত্রণা থেকে

মনোযোগ সরিয়ে আনছিল। কোনো ব্যথাই অনুভূত হচ্ছে না। চোখ বুজে আসতেই একটা দুধের বাচ্চা এসে মাথায় হাত রাখে অন্তূর। দেখতে অনেকটা আমজাদ সাহেবের মতো, চোখদুটো অন্তিকের মতো। অন্তূ চমকে ওঠে। হামজা সাদা পাঞ্জাবীর সাথে সাদা ধবধবে একটা টুপি হাতে নেয়। নাগরা জুতোটা পায়ে চড়াতে চড়াতে জয়কে বলে, "জানাজা কয়টায়?"

-"দেরি হবে।"জয় চামড়ার স্যান্ডেলের বেল্ট লাগায় না জীবনে। ওভাবেই বেরিয়ে যাচ্ছিল। কলার ধরে পেছনে টেনে আনে হামজা,

“থাপড়ে মুখের নকশা বদলে দেব, শুয়োর। পা তোল।”

বাঁ পা দিয়ে মোড়া টেনে এনে ডান পা মোড়ার ওপর রাখে জয়। হামজা ওর স্যান্ডেলের বেল্ট লাগিয়ে দিয়ে কষে একটা চাপড় মারে পিঠে। পিঠ ঘষতে ঘষতে বেরিয়ে যায় জয়।হামজা ও জয় প্রধান প্রতিনিধিত্ব করল অন্তিকের লা-শ দাফনের। অন্তিক জয় ও হামজার বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের অভিযোগ করেছিল। শুধু এই কারণ হলে চলতো। এটাই তো শুধু কারণ না ওকে মারার। অন্তূর এত বাড়াবাড়ি মানা যাচ্ছিল না। বাড়িতে শত্রু ঢুকে ওর কারণে বাপ-মাকে মেরে বেরিয়ে

গেছে। বাইরের একতলা বিল্ডিং জ্বালিয়ে গেছে, পার্টির দুটো ছেলে মরেছে, কয়েকজন চিকিৎসাধীন। অন্তূ খড়ের গাদায় লাগা আগুনের মতো ধিকধিক করে বাড়ছিল। জয়ের সাথে যা করে অন্তূ, সবই তো কানে যায় ওর। এমনকি স্বয়ং তাকেও তোয়াক্কা করেনা মেয়েটা।

সেদিন অন্তূ মুস্তাকিনের কাছে বের হবার পর রাস্তায় যখন পলাশের লোক অন্তূকে ধরতে এলো, মার্জহার এসে ওকে রক্ষা করে বাড়ি নিয়ে গেছে। অন্তূ গিয়েছে, কথাবার্তা বলেছে, আবার সেটা স্বীকার না করে চাবি চায়।

চোখে ভয় নেই, জানের মায়া নেই, থামার সম্ভাবনাও নেই। হামজা কত ধৈর্য্য ধরবে? রাবেয়াকে হামজা বলল, "খালা মা। আরমিণ আসল না। পরে-পাছে এসে দেখা করে যাবে। আপনারা গেলেও পারেন, নিষেধ নাকি? যান না কেন?"

রাবেয়া তখন শোকে বিহ্বল। মার্জিয়ার জ্ঞান থাকছিল না, বারবার দাঁত লেগে যাচ্ছিল। কথাটা শুনেও বিশ্বাস করল না মার্জিয়া। কথাও বলল না।

হামজা ও জয় লা-শ মাটি দিয়ে বাড়ি ফিরল মাঝরাতে।-"সেদিন কোথায় গেছিলে?"

হামজার প্রশ্নটা চরম শান্ত। জেনেশুনে প্রশ্ন করছে, তবুও মুখটা আন্তরিক। অন্তূ খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলে, "ঝন্টু কাকার ছেলে মাজহার নিয়ে গেছিল।"

-"তুমি গেলে?"

-"তো কি মারামারি করার ছিল রাস্তায়? তাছাড়া সে উপকার করেছিল আমার। কৃতজ্ঞতা কাজ করছিল তখন।"

হামজা মসৃণ হাসল। একহাতে সে জয়ের চুলে হাত বুলাচ্ছে। পায়ের ওপর পা তুলে বসা। কালচে খয়েরী ফতোয়ার সাথে সাদা পাজামা। অভিজাত দাম্ভিক চেহারা।ঘরে পরার কালো চামড়ার স্যান্ডেল। নেতাগিরি মানায়

হামজার সাথে বেশ। অন্তূ মুচকি হাসে, ”আপনার হাসি সুন্দর, মেয়র সাহেব। যে কেউ বিভ্রান্ত হবে এতে।’’জয় হামজার কোলে শুয়ে পা তুলে দিয়েছে সোফার মাথায় নকশার ওপর। সে টিভি দেখছে। ইংরেজি সিনেমা চলছে। হরর, সাই-ফাই মুভি—প্যান্ডোরাম। ভয়ানক সব সাউন্ড, দৃশ্য। সে চোখ বড় করে গিলছে।

অন্তূর কথা শুনে ঘাঁড় ফেরালো, “এএ চেংরী, এই! মুখ সামলে। তোর ভাসুর লাগে। মানিস বা না মানিস, খারাপ নজর দিবি না। আমি জীবিত এখনও।’’

অন্তূ জবাব দেয়না। অনুশোচনা বা আফশোস শব্দদুটো এ বাড়িতে বড়োই অকার্যকর। নিজের বাপ-মা মরায় যে মানুষের চোখে অল্প একটু কাতরতা পরিলক্ষিত হয়নি, শুধু ভেতরে পুড়েছে বোধহয়, তাদের কাছে আশা করতে নেই শোক। অন্তূও আজকাল চেষ্টা করে সেইরকম হতে।

হামজা বলল, "এরপর?"-"ঝন্টু সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, সীমান্তকে এই বাড়িতে বাড়িতে মারা হয়েছে কি-না?"

-"হু?" ভ্রু উঁচিয়ে মাথা নাড়ে হামজা।

-"আমি বললাম, 'আমার সামনে।"

-"বলে দিলে?" হামজা হেসে ফেলল। গম্ভীর মানুষ হুটহাট হাসলে ভালো লাগে না ভয়ানক?

অন্তূ হাসল না, মুখের আকৃতির একটুও পরিবর্তন হলো না। সে বলল, "হ্যাঁ, বলে দিলাম। আব্বু কী বলতো জানেন? বলতো, 'অন্তূ, সবচেয়ে সস্তা পাকস্থলী কোন প্রাণীর, বলতো?' আমি ভাবতাম, সেই প্রাণীর পাকস্থলী বোধহয় বাজারে খুব অল্প দামে বিক্রি হয়। অনেক খুঁজেও না পেয়ে বলতাম, 'তুমি বলো, আব্বু।' আব্বু বলতো, 'যাদের পাকস্থলী অন্যায়-সত্যকে হজম করে ফেলতে পারে ভেতরে।' এরপর আমিও শিখলাম,

আমার পাকস্থলীকে দামী বানাতে হলে অন্যায়-সত্যকে উগড়ে দিতে হবে। তবে এখন আমি ভয় পাই। আর এসব করব না।''

-"ভয় পাও?'' দাঁতে জিহ্বা ঠেকায় হামজা।

অন্তূ হাসে, "পাই তো। আপনাকে পাই, জয় আমিরকে পাই। পাবো না কেন, বলুন? এইটুকু বয়সে শুধু কথা বলে যত বড় বড় পর্যায়ের শত্রু কামিয়েছি আমি, আপনারা এতদিনের রাজনৈতিক জীবনে কামাতে পেরেছেন? তাই সেসব বাদ। আমি ভালো হয়ে যাব। আর দু-একটা ভাই থাকলে নাহয় রিস্ক নিতাম। আর নেই। এবার বা কার পালা

আসবে! তারচেয়ে চুপচাপ মেনে নেয়া কি ভালো না?”

-“ওখানে তারপর কী হলো?”

-ঝন্টু সাহেব বললেন, ‘তুমি সাক্ষী দেবে?’ আমি বললাম, ‘এরপর আমায় বাঁচাবেন আপনি?’ তিনি বললেন,

‘হ্যাঁ, অবশ্যই। তুমি শুধু প্রত্যাক্ষদর্শী সাক্ষী নও। বরং ওই বাড়ির বউ-ও। আরও অনেককিছুই জানো ওই বাড়ির ব্যাপারে। সেইসব বলবে। এর বদলে ঝড়ঝাপটা আসবে, আমি সামলে নেব।”

জয় এ পর্যায়ে চট করে বলে উঠল, “সম্বন্ধির নাতি আমার। আমার বউ সাক্ষী দিলেই

ব্যাটাশশালা একেবারে আমার বালগুলো ছিঁড়ে বোঝা বেঁধে ফেলতো! শালা এবোর্টেড!''অন্তূ বলল, "আমি হেসে বললাম, 'ওদের হাত থেকে নিজেদের সামলাতে পারছেন না, নিজের ভাগ্নিকে সামলাতে পারলেন না, এখন মরে গেছে, তবুও কোনো প্রমাণ পেলেন না। আমাকে সামলে নেবেন?' ঝন্টু চাচা খুব অপমানিতবোধ করছিলেন বোধহয়, কিন্তু কিছু বললেন না। এতে খালি আমার একটা উপকার হলো, আরেকটা নতুন শত্রু জোগাড় হলো।''

জয় হো হো করে হেসে ওঠে। হামজা হামজা কপালে হাত চেপে নিঃশব্দে হাসল। অন্তূ

উদাস হবার ভান করে বলল, “নিজেকে আজকাল মাফিয়া হয়। ওদেরও মনেহয় একসাথে এত শত্রু পাড়ি দিতে হয়না। শুধুই আমার মুখের জন্য। শ্যাহ!”

রিমি কিছু নাশতা আর শরবত দিয়ে বসল পাশের সোফায়। অন্তূ চুপচাপ চেয়ে থাকে জানালার বাইরে। আনমনা দৃষ্টি। চোখদুটো ঘোলা হয়ে আবার পরিষ্কার হয়। সে কেমন নাটকবাজ হয়ে যাচ্ছে। বুকে পাথর চেপে ঠোঁটে হাসা সহজ না। এটা তার জন্য সুবিধার হবে নাকি ক্ষতির?হামজার বাড়ি ফিরতে রাত হয়। জয় বাড়ি ফিরেছে বিকেলে। গোসল

করে বের হলে রিমি ঘরে খাবার দিয়ে এসেছে। অন্তূ তুলির ঘরে ঢুকল। তুলি মরার মতো বিছানায় পড়ে থাকে। আজকাল কোয়েলের সবটুকু যত্নও তরুর। তার কাছে প্রায় রোজই ইন্টেরোগেশনে আসে তদন্ত সংস্থার লোকজন। তারা যখন তুলির সাথে হওয়া ঘটনা শুনল, এরপর থেকে সন্দেহ জোরালো হয়েছিল, যে ও অথবা এ বাড়ির লোকই সীমান্তর খুনটা করেছে। কিন্তু আজ ক'দিন দেখা যায় লোকজন আর আসেনা। গতরাতে শোনা গেল, হামজা তার এক পার্টির গুপ্ত কালপ্রিটকে সীমান্তর খুনি সাজিয়ে আইনের আওতায় দিয়ে দিয়েছে

অলরেডি। আর ফাঁক নেই তাকে সন্দেহ করার। কালপ্রিট স্বীকার করেছে সে সীমান্তকে খুন করেছে, পুরোনো শত্রুতার জেরে। কেইস ডিসমিস।ঝন্টু সাহেব ক্ষমতা হারানো এক দাঁড়কাক। মাজহার শুধু ফণা তোলা সাপের মতো ফুঁসে বেড়াচ্ছে চারদিকে। এখন কেইস চলছে, বাপ-মা মরার। হামজা খুব লড়ছে। নয়ত সন্দেহ করে বসবে পাবলিক। বাপ-মার খুন হলো, তবু থানা-কাচারিতে দৌড়াদৌড়ি নেই? সে দৌড়াচ্ছে। অথচ কালপ্রিটকে সে জীবন থাকতে পুলিশের হাওলা করবেনা। তাকে তার প্রয়োজন, জয়ের প্রয়োজন।

অন্তূ তরুকে ডেকে নিয়ে বারান্দায় এসে বলল, আমার একটা উপকার করবে?-"কেন করব তোমার উপকার?"

গম্ভীর মুখে তরুকে একটুও মানায় না। অন্তূ হাসল মৃদু, "অকারণে।"

তরু চুপ। সে চারদিকে দেখছে, জানছে। অন্তূ সেই লুব্রিকেন্ট, যে আসার এ বাড়ির বদ্ধ জানালার মরিচা ধরা সিটকিনিগুলো একে একে খুলতে শুরু করেছে। অন্তূ বলল, "আমার সাথে যাবে।"

-"কোথায়?"

-"আমি কোনো খারাপ বা ক্ষতিকর জায়গায় যেতে পারি বলে মনে করো, তুমি?"

-“হেঁয়ালি করবেনা।”

-“আচ্ছা, করব না।”

তরু দাঁড়াল না, ভেতরে চলে গেল চুপচাপ। অন্তূ ওভাবেই দাঁড়িয়ে থাকে। ঘাঁড় ফেরায় না। তরু বাথরুমে ঢুকতে ঢুকতে বললে, “দ্রুত তৈরি হবে। হাত-ধুয়ে নিই আমি। ”আলতো হাসে অন্তূ। এই বারান্দা থেকে বাড়ির পেছন দেখা যায়। বিশাল ডোবা ওই সামনে, কালো কাদামাটিই বেশি তাতে পানির চেয়ে। হামজা ও জয়কে দেখে আন্দাজও করা যায়নি ওরা এত গভীর। ছিঁচকে রসিক আর অল্প-সল্প দাপুটেই লাগতো কেবল।

জয় খাচ্ছিল। কোয়েল বারবার প্লেটের ওপর হাত চালাচ্ছে, আমার চলকেত দিয়ে তারপর খাও। জয়, ও জয়, জয়ইইইই! জয়, আমার কথা শোনো..

জয় এতক্ষণে মাছের কাটা বেছে বেশ একটা মিশন কমপ্লিট টাইপের ভাব নিয়ে তাকাল কোয়েলের দিকে, “ক, সম্বন্ধির চেংরী, ক। কী সমস্যা, তোর? ওই ভাবী শালির মেয়েকে বলি, আমি বাঙালি তবে মাছে-ভাতে না। ও শালি! আমারে মাছ দিয়েন না, মাছের বালডা আমি বাছতে পারিনা, আমারে দিয়েন না। ভাতের নিচে পানি উঠে বন্যা হয়ে যাচ্ছে, তবুও মাছের কাঁটা বাছা শ্যাষ হয়না।”কোয়েল

জোরে করে খামচি দিয়ে ধরল জয়ের হাত,
“আমার চলকেত দাও।”
-“বাংলা ভাষার সাথে জোচ্চরি করছিস, বেইমান। তোর তো দেশদ্রোহীতার শাস্তি হওয়া উচিত। চলকেত কী? চকলেট। বল, মামা... ও থুক্কু; আমাকে তো আবার কেউ বালের দামটুকুও দেয়না। ক যে, জয়! চকলেট দাও, চকলেট।”
অন্তূ রুমে ঢুকতে ঢুকতে শুধরে দিলো,
“চকলেট কোনো বাংলা শব্দ না।”
-“দ্যাহো! আরেক বেইমান হাজির। এ আবার দেশের সাথে না স্বয়ং ঘরের স্বামীর সাথে বেইমানী করা বেইমান।”

অন্তূ কিছুক্ষণ এমনভাবে ইতস্তত করল, যেন সে বাড়িওয়ালার কাছে চুরি করার অনুমতি চাইবে। জয় বলল, “এমনি তো মুখটা হাওড়ার ব্রিজের মতো। এখন এমন লাউডগা সাপের মতো কুঁচকে যাবার কী হলো? কী সমস্যা?”

-“আমার কিছু টাকা লাগবে।”

অন্তূর টাকা চাওয়ার এই কঠিন সংকোচ দেখে জয়ের একটু হাসিই পেল, তাছাড়া আজ তার মনটাও ভালো। জিজ্ঞেস করল, “কী দরকার?”-“সব দরকার বলা যায়না। ফার্মেসির দোকান তো আছে আশেপাশে, না?”

-“আমাকে বলো আমি এনে দিচ্ছি অথবা কাউকে দিয়ে আনিয়ে দিই।”

-“তা যদি হতো, তো করতাম নিশ্চয়ই! টাকা দেবেন কি-না!”

-“তোমারে টেকা-পয়সা দিয়ে পুষে আমার কী লাভ? লস প্রোজেক্টে মাল ঢালতেছি।”

অন্তূ কথা বলল না। জয় সোফার ওপর উড়িয়ে ফেলে রাখা প্যান্টের দিকে ঈশারা করে বলে, “ওখান থেকে নাও।”

মাত্র বিশটা টাকা অন্তূ বের করে নেয় হাতে, তবুও মনে হলো তার হাত কাঁপছিল, শিরশির করে কাঁপছিল, চোছে-মুখে অন্ধকার নেমে এসেছিল।অন্তূ যখন রুম থেকে বেরিয়ে

যাচ্ছিল, জয় মনোযোগসহকারে খাবার মাখাতে মাখাতে বলল, "বাপের বাড়ি যাচ্ছ।"
অন্তূ পেছন ফিরল, অকপটে বলল, "হ্যাঁ।"
জয় চোখ তুলে তাকায় না, অন্তূ বেরিয়ে যায় চুপচাপ।
জটিল এক সম্পর্ক-রেখার ওপর দৌড়ে কতদূর পৌঁছা যায়? মানুষের জীবন-পরিণতিতে নিশ্চিতভাবে মৃত্যু দাঁড়িয়ে, কিন্তু সম্পর্কগুলোর?অন্তূদের বাড়ির গলিটা ঢালাই রাস্তা, দুপাশে সারি সারি বাড়ি। তরু চুপচাপ হাঁটছিল। অন্তূ বলল, "তোমার কি খারাপ লাগছে?"

-“আগে বললে কী হতো যে বাপের বাড়ি আসছো?”

অন্তূ মুচকি হাসল। হাসিটা মিথ্যা। অন্তূর চোখে-মুখে নিদারুণ এক অস্থিরতা। এই গলিটা! এই সেই গলি, সেই পাড়া। আজ পাড়ার লোকেরা দেখছে সে ননদের সাথে বাপের বাড়ি আসছে। অন্তূকে দেখে এক মাঝবয়সী মহিলা থামলেন, “কী রে চেংরী! ভাই মরল, দেখলাম না তো তোরে! আসিস নাই?”

অন্তূ কিছু না বলে কেবল মুচকি হাসল, হাঁটা থামালো না। তার শরীরে বোরকা নেই। সেলোয়ার-কামিজ। চওড়া ওড়না শরীরে

জড়ানো। তবুও নিজেকে নগ্ন লাগে, মনেহয় শরীরটা খোলা। বোরকা ছাড়ার পর হাতে গুণে দু একবার বাইরে বেরোনো হয়েছে। নীরবতা ভেঙে কঠিন এক প্রশ্ন করে তরু, "হ্যাভ ইউ বিন রেপড বাই জয়, আরমিণ?"
আশ্চর্যজনকভাবে অন্তূ হাসল, "যদি বলি তার চেয়েও বড় কিছু, মানবে?"
তরু তাকিয়ে রইল। অন্তূ বলল, "ধর্ষিতা হয়ে বদনাম হলে সান্ত্বণা থাকে। কিন্তু মিথ্যা অপবাদ কতটুকু সয়, তরু?"
তরু কথা বলতে পারল না। অন্তূ জিজ্ঞেস করে, "তুমি কি তোমার মায়া হারিয়েছ তার প্রতি?"

-"জানিনা। তবে সামনে যেতে কেমন গা গুলিয়ে আসে আজকাল, অপ্রস্তুতবোধ করি। কেন—তা ভেবেছি। উত্তর পাইনি। আর কতদূর?"

-"সামনেই।"বাড়িটা আর বাড়ি নেই। পুরোনো মর্গের মতো গা ছমছমে, নিস্তব্ধ যেন, প্রাণের অভাব। হু হু করে কান্নার আওয়াজ আসছে। অসময়ে রাবেয়া নামাজে বসেছেন। অন্তূ রান্নাঘর দেখল, মনে হলো কমপক্ষে দু'দিন কোনো রান্না হয়নি। ঘরবাড়ি মাকড়সার জালের দখলে। জানালাগুলো কতদিন ধরে বন্ধ। কাপড়চোপড় ছিটিয়ে আছে।

আমজাদ সাহেবের ঘরটার দিকে চোখ যেতেই অন্তূর বুকটা সজোরে ছলাৎ করে লাফিয়ে উঠল। পুরো শরীরটা ঝনঝন করে কেঁপে উঠল। অন্তূ পা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সেখানেই। চোখ ফেটে পানি এসেছে, তা ততক্ষণ টের পেল না, যতক্ষণ না ঝরঝর করে ঝরে পড়ল সেগুলো। সাহস হয়না অন্তূর ওই ঘরে ঢোকার। বোঝা গেল, রাবেয়া ওই ঘরে যান না। হয়ত শূন্যতা সহ্য হয়না!অন্তূ আস্তে করে ওখানেই মেঝের ওপর বসে। চেয়ে থাকে ঘরটার দিকে। সেই ফতোয়া, শার্ট ঝুলছে আলনায়, ওই তো জায়নামাজটা। টুপি কোথায়? টুপিটা রোজ হারাতো। অন্তূকেই তা

খুঁজে দিতে হতো মসজিদে যাবার আগে।
আব্বুর মশারীটাও বাঁধা হয়না কতকাল! অন্তূ নিজেকে সামলাতে পারেনা। কতদিন, কতকাল নাকি প্রথমবার এত জোরে, চিৎকার করে কেঁদে ওঠে অন্তূ। ইটের দেয়ালে কাঁপন ওঠে সেই কান্নায়। সব তার পাপ। তার কর্মের ফল। এই অবধি যা সব হারিয়েছে সবই নিজের দোষে।

হুড়মুড়িয়ে সেখানে আসেন রাবেয়া। মার্জিয়া কাছে আসেনা, দূরে দাঁড়িয়ে দেখে। তরু এসে ধরে অন্তূকে।

বিকেল হয়ে আসছিল। অথচ অন্তূ যাবার নাম নেয়না। তরু বলতে পারছিল না। তার জিভ

সরে না অন্তূকে বলতে, 'চলো, ফিরতে হবে।
'মার্জিয়ার পেট উঁচু হয়েছে খানিক। রাবেয়া চেয়ারে বসা। মার্জিয়া বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসলে অন্তূ আলগোছে মেঝের ওপর ঠেসে বসে। থরথরে গলায় ডাকে, "ভাবী?"
মার্জিয়া তাকায়, নিষ্প্রভ দৃষ্টি তার। বদমেজাজ বা কড়মড়ে দৃষ্টি নেই আর।
-"আমি কি ক্ষমা চাইব আপনার কাছে?"
-"তাতে তোমার ভাই সামনে এসে দাঁড়াবে আমার সামনে, অন্তূ?" ঠিক ছোট্ট বাচ্চার মতো অবুঝ শোনায় মার্জিয়ার কথাটা।

কঠিন ভালোবাসার স্বামী মার্জিয়ার। বয়স কত হবে? পঁচিশ? ভরা জীবন-যৌবন, পেটে প্রথম সন্তান। সে নাকি বিধবা। মানা যায়?

-“আপনি আম্মাকে নিয়ে কুষ্টিয়া চলে যান।”মার্জিয়া চুপ করে থাকে। অন্তূ বলে, “ওখানে ব্যবস্থা আছে? আম্মুর থাকার জায়গা হবে?” অন্তূ ডাকে, “ভাবী, ডাক্তারের কাছে যাবেন? আমার হাতে সময় নেই। আপনারা গতকাল সকালের গাড়িতে কুষ্টিয়া রওনা হবেন। আমি টুকটাক জিনিস বেঁধে দিয়ে যাচ্ছি। আপনি খান না কতদিন? আমার পাপের শাস্তি আমি পাচ্ছি, পাব চিরকাল, পেতে থাকব। ও নিয়ে

ভাববেন না। কিন্তু বাচ্চাটাকে কষ্ট দেবেন না।
”

অন্তূ পায়ে হাত রাখে। মার্জিয়া চমকে ওঠে। অন্তূর দ্বারা এমন কাজ অবিশ্বাস্য। অথচ আজ চট করে ফেলেছে। অন্তূ হাত সরায়না, দু'হাতে মার্জিয়ার পা ছুঁয়ে বলে, “ওই ছোট্ট জানটাকে ভালো রাখবেন ভাবী? আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে, শুধু আপনার স্বামী ছাড়া একদিন আপনাকে সবকিছু দিয়ে ভরিয়ে দেব আমি। আমার ওয়াদা রইল আপনার কাছে। আপনার ছেলে থেকে শুরু করে আপনার লাইফটাইম রিসপন্সিবলিটি আমার। শুধু কিছুটা সময় দিন আমায়। আর নয়ত মেরে

ফেলুন। কিন্তু আমি মরলে উকিল হবে কে? বেঁচে থাকার চেয়ে বড় কথা হলো, উকিল হওয়া। আব্বু রোজ তাগাদা দেয়, ধমকে যায় এসে। আমার নামের আগে অ্যাডভোকেট লাগাতে হবে তো। এইজন্য মরতে পারছি না। আপনি এটুকু সুযোগ দিন আমায়, কেমন? ''মার্জিয়ার চোখ ভরে উঠলেও পানি গড়ায় না। কোনো কথাও বলেনা সেই বদমেজাজী মার্জিয়া।

অন্তূ রান্নাঘরে যায়। রান্না বসায় চুলোয়। তরু কী ভেবে কী করল কে জানে? সে আন্দাজ করে করে অধিকাংশ প্রয়োজনীয় জিনিস গুছিয়ে ফেলল বড় বড় কয়েকটা ব্যাগে। অন্তূ

রান্না করছিল। তরু থালাবাসনগুলো ধুয়ে ফেলল। রাবেয়ার সাথে অনেকক্ষণ বসে কথা বলল। মার্জিয়াকে সান্ত্বণা দিলো।

সন্ধ্যার পর দুজন যায় বাসের টিকেট কাটতে। টাকা দিলেন রাবেয়া। জয়ের কাছ থেকে আনা বিশ টাকার অবশিষ্ট দশ টাকা তাদের এবারের গাড়িভাড়া গেল।

সব ঋণমুক্ত। রাবেয়ার কাছে জমি বিক্রির বেশ কিছু টাকা এখনও গচ্ছিত আছে। তা নিয়ে মার্জিয়ার মায়ের বাড়িতে গেলে খুব একটা অসুবিধা হবেনা। অন্তূ নিজহাতে জোর করে মার্জিয়াকে খাওয়ালো। রাবেয়াকে খাইয়ে দেবার সময় অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রইলেন

রাবেয়া, “মা হয়ে গেছিস আমার?”-“মা কি মেয়ের স্বামী-ছেলে-সুখ কেড়ে নেয়, আম্মু? অভিশাপ বলো অভিশাপ।”

রাবেয়া অন্তূকে জড়িয়ে ধরে এত কাঁদলেন, তা দেখে তরু কখন যে শব্দ করে কেঁদে ফেলল, খুব লজ্জা পেয়েছিল মেয়েটা পরে। অথচ কেন যে বুক ফাটছিল! অন্তূ বলল, “আম্মা! রোজ নামাজে দোয়া কোরো তো তোমার অভিশাপের জন্য! একা থাকবো, বুঝতেই পারছ! কবে দেখা হবে জানিনা। তবে হবে আবার ইনশা-আল্লাহ। ফোন করব আমি রোজ।”

আমজাদ সাহেবের একটা জিনিসও নিতে দিলো না অন্তূ। স মাঝেমধ্যে আসবে তো আব্বুর ঘরে। ঘরটাতে তিনটা তালা মারল। কেউ যদি হামলা করেও, ওই ঘরে আগুন না লাগা অবধি কোনো ক্ষতি যাতে না হয়। নিজের ঘরের দিকে তাকিয়ে হাসল অন্তূ,
"ভুলে গেছিস আমায়? অনেক পর হয়ে গেছি আমি। যদি কখনও ফিরে আসি স্থায়ীভাবে, আবার তোর বিছানায় গা ছেড়ে ঘুমাবো, ইনশা-আল্লাহ।"নিজের বই-খাতা সব বেঁধে সাথে নিলো। পথে তরু জিজ্ঞেস করল,
"এখন কোথায় যাচ্ছি আমরা?"
-"তালা-চাবির দোকানে।"

-“তালা কিনবে? তালা তো মারলে, আর নেই? উনারা তো সকালে বের হবেন!”

-“একটা চাবির নকল বানাবো।”

-“মানে?”

-“রিমি ভাবী গতরাতে একটা চাবি দিয়েছে।”

তরু চেয়ে রইল অনেকক্ষণ, তারপর আস্তে করে বলল, “স্টোররুমের চাবি, তাই না?”

-“গিয়েছ কখনও সেখানে?”

-“গোডাউন তো ওটা। লোহা-ইস্পাত ইত্যাদি থাকে। আমি যাইনি কখনও।”

অন্তূ মোড়ে এসে রাস্তা পার হবার জন্য তরুর হাতটা চেপে ধরল। আজ খুব দক্ষ পথচারীর মতো সে-ই কাউকে হাত ধরে রাস্তা পার

করল। তরু জিজ্ঞেস করে, “আমায় নিয়ে এসব করছো, ভয় করছে না? ভরসা করো?” অন্তূ আনমনে হাসে, “অ-ভরসার কিছু তোমার চোখে কোনোদিন দেখিনি আমি, তরুনীধি। আমার একটা বোন থাকলে তোমার মতো হতো।”জয় সকাল সকাল বেরিয়েছিল ক্লাবে। পৌরসভায় যাবার আগে হামজা কল করে খানিক ঝারল বাড়ি ফেরার জন্য। সে ফিরল দুজনকে সাথে করে। তাদের টানতে টানতে দোতলায় নিয়ে আসছে, “আয়। আজও নিশ্চয়ই আমার শালীরা আমার পছন্দের কোনো মাছই রান্না করে রেখেছে। তোরা খেয়ে যাবি, আয়।”

ব্রাশ তখনও হাতে। ব্রাশ করতে করতে সকালে শহর ঘুরে আসা পুরোনো স্বভাব তার। টানতে টানতে এনে ডাইনিং রুমে ওদের দাঁড় করিয়ে ডাকে, "ভাবীই? আরমেইণ! খেতে দে। তরু কইরে? কই রে তোরা সব। এ যা বস টেবিলে। আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসি।"বাথরুমে ঢুকে মুখে-চোখে পানি দিতে গিয়ে লুঙ্গির তলা ভিজে গেল। আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেকে একটু রোগা লাগল। শুকিয়ে গেছে শরীরটা। এমনিতেই ছিমছাম, লম্বু গড়ন দেহের, তার ওপর আরও শুকনো লাগছিল। আয়নার দিকে তাকিয়ে

বলে, "হরি রে হরি। সবাইক বানাইলা মোটা-তাজা, আমারে বানাইলা খড়ি!"

হামজা, জয়, ছেলেদুটো সব একসাথে বসে হুড়পাড় করে খেল। হামজা বলল, "তোকে একবার থানায় ডাকা হয়েছে।গিয়ে দেখা করে আসিস।"

-"ধ্যাৎ! আমি একা যাইতে পারব না।"

-"তো চল, কিছু লোক ভাড়া করে নিয়ে যাই! ষাঁড়!"

বাঁকা চোখে তাকায় জয়, হুমকি দেয়, "আমি যদি এখন ঝোল ফেলে তোমার সাদা পাঞ্জাবী নষ্ট করে দিই?"

না চাইতেও হেসে ফেলল হামজা। স্নেহভরে খানিকক্ষণ জয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, "বয়স কত তোর? বড় হবি না?"প্লেটে একটা মাছ তুলে দিয়ে সেটার কাঁটা বেছে দিয়ে বলল, -"এবার খা। যদি আসল সমস্যা কাঁটা বাছাই হয়, তাইলে সমস্যা শেষ। এবার মাছ খা।"

জয় খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে হামজার দিকে। চট করে বলে, "আজ কী বার?"

-"মঙ্গলবার।"

-"মঙ্গলবারে মাছ খাইনা আমি।"

হামজা হাসে। দুম করে একটা মারে জয়ের পিঠে। উঠতে উঠতে বলে, “আজ দুই-তিনটা বোতল আনিস। ছাদে বসব রাতে।”

ত্যাড়ার মতো বলে জয়, “পারব না।

”-“লাত্থিটা ঠিক ঘাঁড় বরাবর মারবো।”

-“মুখ খারাপ করায়েন না, ভাই।” গম্ভীর হয়ে বলে জয়।

হামজা জয়ের কপালের দাগে হাত ছুঁইয়ে জিজ্ঞেস করে, “ব্যথা আছে?”

-“ওভাবেই একটু হাত বুলাও তো। ভালোই লাগতেছে।”

নিচে হট্টোগোল শোনা যাচ্ছিল। জয় এগিয়ে গিয়ে গলা উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে, “কী রে, মিনাজ? কী সমস্যা?”

-“ভাই, চাঁদা নিতে আইছে কারা জানি।”

-“ওয়ার্কশপে চাঁদা? তাও আবার এই ওয়ার্কশপে? কিডারে আইছে, পাগলে থাপাইছে নাকি তারে?”

-“চিনিনা, ভাই। চাঁদা চাইতেছে।”

-“চাঁদা ওর শ্যাঁটার মধ্যে ভরে দিচ্ছি, আমি। আসতেছি দাঁড়া।”

ধুপধুপ করে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে যায় জয়। হামজা পিছে পিছে যায়।রাত পৌনে একটায় বাড়ি ফিরে আর খেল না, জয়। অন্তৃ

জিজ্ঞেস করে, "এখন নিশ্চয়ই গিলতে বসবেন?"

-"ছাদে যাব। ভাই বসে আছে।"

-"মদের বোতলের কর্ক খোলে কীভাবে?"

-"এক শট মারবে নাকি, ঘরওয়ালি?"

-"না। হারাম।"

-"খেয়ে-টেয়ে ইস্তেগফার পড়ে তওবা করে নিও।" ঠোঁট বেঁকিয়ে চোখ টিপ মারে জয়। অন্তূ জিজ্ঞেস করে, "সাথে কিছু স্ন্যাক্স টাইপের কিছু নেবেন?"জয় ভ্রু উঁচিয়ে তাকায়। খুব কাছে এসে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে আসে অন্তূর দিকে। অন্তূ যতটা পিঠ বাঁকালো, ঠিক ততটা ঝুঁকে এক ইঞ্চ দূরত্ব রেখে ফিসফিস

করে বলে, "চোরের বাণী মিষ্টি হয়, ভক্তিতে ভরপুর হয়, ঘরওয়ালি। এনিথিং রং?"

অন্তূ ছিটকে সরে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনাদের বিরোধীতা করার সাধ্যি আর কোথায়, আমার? তার চেয়ে বরং মেনে নিয়ে বেঁচে থাকা ভালো না?"

-"বাড়ি ফাঁকা তোমাদের। ওরা আবার মেনে নিয়ে কোথায় গেল?"

অন্তূ একদৃষ্টে তাকিয়ে হাসে, "আপনি খুব শেয়ানা, জয় আমির।"

জয় কপাল উঁচিয়ে বলে, "আর তুমি?"

-"গর্দভ।"দুপাশে মাথা নেড়ে অন্তূর কথার বিরোধীতা করে বলে, "কোথায় গেছে, ওরা?"

-"আমাকে বলেনি। শুধু বলল, দূরে কোথাও চলে যাবে, যেখানে আমার মতো মেয়ের মুখ না দেখতে হয়।"

জয় হো হো করে হেসে উঠল। আচমকা হাসি থামায়। অন্তূর গলাটা ঘর্মাক্ত হালকা। ওড়নাটা বুকের ওপর পড়ে থাকলেও গলার নিচ থেকে বুক অবধি উন্মুক্ত। চিকন একটা স্বর্ণের চেইন, মসৃণ গলাটাকে নেশাদ্রব্যের মতো করে তুলেছে। সেই নেশায় জয়ের নিঃশ্বাস ভারী হলো। ঠোঁট ফাঁক করে জোরে জোরে কয়েকটা শ্বাস ফেলে। নজর সরিয়ে অন্তূর হাত থেকে বোতলদুটো নিয়ে চটপটে পায়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

অন্তূ চিন্তিত মুখে পায়চারী করছিল ঘরে। খানিক বাদেই জয়কে ফিরে আসতে দেখে চমকে উঠল। অস্বাভাবিক লাগছিল জয়কে দেখতে। এদিক-ওদিক পাখির মতো তাকাতে তাকাতে জিজ্ঞেস করে, "আমি কাছে আসি, তা তুমি চাও না, না?"-"হ্যাঁ।" অকপট স্বীকারক্তি।

-"আমি কি তোমার চাওয়ার ধার ধারি? এসব ম্যানার্স আমার সাথে পোষায়?" হাঁপানোর মতো শ্বাস ফেলে জয়। চোখে-মুখে আবেদন। অন্তূ আতঙ্কিত চোখে পিছিয়ে যায় কয়েক কদম। আচমকা হাতটা চেপে ধরে টেনে আনে জয় ওকে। জোরে জোরে শ্বাস ফেলে

আদেশ করে, “শার্টটা খুলে দাও।” জয়ের রোজকার এই অভ্যাস। ঘরে ঢুকে প্রথমে বলবে, ‘শার্টটা খুলে দাও।’ অন্তূ কোনোদিন মানেনা সেই কথা। কিন্তু আজকের বলাটা আলাদা শোনায়। মাতাল হয়ে ফিরলে সে যে অন্তূর কাছে আসার চেষ্টা করেনা, এমন নয়। কিন্তু খেলে খায় অতিরিক্ত, জবরদস্তি করার বিশেষ শক্তি থাকেনা ভেতরে, ঘুমে ঢলে পড়ে।অন্তূর মনে হলো, আজ বুঝি নিস্তার নেই। জয় আবার বলে, “শার্টটা খোলো, কুইক।”

অন্তূ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। জয় আকস্মিক অন্তূর খোলা ঘাঁড়ের ওপর মুখ থুবরে পড়ে।

দুটো চুমু খায় সেখানে। অন্তূর চুলের পেছনে হাত দেয়, আলতো করে আঙুল নাড়ায় সেখানে। গায়ের অনেকটা ভার অন্তূর ওপর ছেড়ে দিয়ে বলে, "শরীর ভালো লাগছে না, মনটাও। আজ হয় অভার-ডোজ অ্যালকোহল নয় তুমি। মনটা তোমাকেই বেশি টানছে, ঘরওয়ালি।"

জয়ের আজকের ছোঁয়া নমনীয়, অথচ অন্তূর শরীরে যেন বিঁষ প্রবাহিত হয়ে শিরা-উপশিরায় পৌঁছে যাচ্ছিল। হুট করে ভাবে, সে তো বিবাহিতা মেয়ে। জয়-ই হোক, জয় যদি এই জয় না হয়ে একটা স্বামী জয় হতো, সে কি এই সুন্দর স্পর্শগুলোকে অনুভব করতো

না, সায় দিতো না? ততক্ষণে ঘেন্নারা অন্তূর লোমকূপগুলোতে খোঁচা দেয়, শিউরে ওঠে তীব্র আক্রোশ আর বৈরাগে।বোতলের কর্কটা কেমন এক কায়দায় যেন জয় একহাতে খুলে ফেলে। একটা শব্দ হয়, বুদবুদ আকারে অনেকটা কোমল পানীয় মেঝেতে ছিটকে পড়ে ছোট হুইস্কির বোতলটা থেকে। অন্তূ সেটা কেড়ে নেয়। বোতলগুলোর মাঝে কোনোটাতে ডায়াজিপাম ড্রাগ মেশানো আছে। রিমি মিশিয়ে আবার কর্ক আঁটকেছে। আজ আর পরিকল্পনা সফল হবেনা বোধহয়। জয় মুখ তুলে চায়, অসভ্যর মতো হাসে, "তুমি কি

চাচ্ছ ইনডাইরেক্টলি? মদ না তুমি, তুমি না মদ?'' হা হা করে হাসে।

অন্তূ জয়কে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বলে, "কোনোটাই না। বসুন বিছানায়। চোখ-মুখ বসে গেছে, আপনার। রাতে আজকাল কোথাও থাকছেন, সকালে ফিরছেন। কী হয়েছে?''

লম্বা শরীরটা অল্প কুঁজো করে লুঙ্গি উঁচিয়ে ধরে খাটের কাছে এগিয়ে গিয়ে ধুপ করে শুয়ে পড়ে, অর্ধেকটা পা ঝুলে থাকে মেঝের দিকে। চোখ বুজে বলে, "এভাবে কথা বলোনি কখনও আমার সাথে তুমি।''-"কী করব? ঘেন্না লাগে যে!''

হাসে জয়, “জায়েজ।”
যখন হাসে, তখন সারাক্ষণ ঠোঁটে হাসি থাকে। বিরক্ত হয় অন্তূ। সোফায় বসতে যাচ্ছিল। জয় বলে ওঠে, “এখানেই বসো। ধরব না তোমায়। তুমি অনুমতি দিলে হোটেলে যাই? আধাঘন্টার মধ্যে ফিরব, ততক্ষণ বই-টই পড়ো একটা। চট করে এক পাক মেরে আসি, খিদে পেয়েছে।”
অন্তূ খাটের কাছে এসেও দু কদম পিছায়, মুখ দিয়ে ছিটকে বের হয়, “ছিহ!”
জয় হো হো করে হেসে ওঠে, “আমাকে কি হাফ-লেডিস মনে হয়, তোমার?”

-"তো, রোজ আমায় না পেয়ে হোটেলে যান? আপনি লম্পট, নোংরা, চরিত্রহীন, ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ।"

জয় উঠে বসে অন্তূর হাত ধরে টেনে বিছানায় পাশে বসতে ইশারা করে জয়, "বসো।"

অন্তূ বসে চুপচাপ, জয়ের হাতটা সরিয়ে দেয় আস্তে করে। জয় পূর্ণদৃষ্টি মেলে তাকায় অন্তূর চোখের দিকে, জিজ্ঞেস করে, "একটা ছেলে পূর্ণ যৌবন পায় কত বছরে, জানো?"অন্তূ জবাব দেয়না। জয় বলে, "কম-বেশি পনেরো বছরে।আমার জন্ম ১৯৮৭। সেই হিসেবে এখন বয়স সাতাশ পার। অর্থাৎ যৌবন প্রাপ্তির পর একযুগ কাটিয়ে এসেছি। শুকনো

শুকনো কাটাতে বলছো? পুরুষের দ্বারা সম্ভব? সম্ভব, সন্ন্যাসীদের দ্বারা। শুনেছি তাঁরাও নাকি পাগল হয়ে যায়।''

অন্তূর বিরক্ত লাগছিল এসব শুনতে। তবু চুপ করে চেয়ে রইল। জয় বলল, "বিয়ে করলাম এইতো পরশুদিন। সেদিন নারীসঙ্গ হালাল হলো। তাও আবার দেনমোহর বাকি।'' হেসে ফেলল জয়, "বিশ বছরের ওপারে কোনো ম্যাংগো পুরুষকে চরিত্রবান ভাবলে হয় তুমি মূর্খ নয়ত কঠিন বোকা। চরিত্র শুধু মেয়েলোকের কাছে নষ্ট করতে হয়না, মোরওভার, বহুত উপায় আছে। আমি কিন্তু বিজ্ঞানের ছাত্র।''অন্তূ কথা বলছিল না। জয়

আচমকা অন্তূকে চমকে দিয়ে ওর কোলের ওপর মাথা রেখে পায়ের ওপর পা তুলে শুয়ে পড়ল। অন্তূর হাতটা টেনে চুলে রেখে চোখ বুজল। অন্তূ মনে হলো, তাকে কয়েক গ্রাম বিঁষ টুপ করে গিলে ফেলে যেন সেটা হজম করে নিতে হলো। চোখ বুজে ভারী শ্বাস ফেলল।

জয় খানিকক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকে ওভাবেই। হঠাৎ-ই আনমনে বলল, "আমি প্রথম সিগারেটে টান দিয়েছি কবে, জানো? তেরো বছর বয়সে। সাল–২০০০। গলা জ্বলতো খুব। প্রথম খুন করেছি পনেরো বছর

বয়সে। সাল—২০০২। প্রথম মেয়েলোকের কাছে গেছি আঠারো বছর বয়সে। সাল–২০০৫। তুমি তখন কোথায় ছিলে? কবে এসেছ, তুমি? তুমি এলে এই তো সেদিন। ততদিনে আমি বহুত কিছু পার হয়ে এসেছি।''

অন্তূ চেয়ে রইল জয়ের বন্ধ চোখ-জোড়ার দিকে। ভ্রুর নিচে অনেকটা জায়গা, চোখের পাতার ওপরে। চটা পড়া ভ্রু। ডাগর ডাগর চোখ জয়ের, গভীর, খাঁদে পড়া। আচমকা সেই চোখ খুলে অন্তূর চোখের মণি বরাবর তাকালো জয়। অন্তূর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একটুও নড়চড় আসেনা, জয় তা দেখে হাসে, "২০০৭ এর এক সম্মেলনে মারামারি করতে গিয়ে

বিরোধী দলের দুটো লোক মার্ডার হয়ে গেছিল। কিছুদিন পর আমাকে নিয়ে গিয়ে....লেপ-তোষক সেলাই করার সুঁচ দেখেছ?''-"দেখেছি।''

-"সেই সুঁচ সারা শরীরে ফুটিয়েছিল। পিঠে একটা বিশাল ক্ষত আছে। ওখানে চাপ্পর দিয়ে কুপিয়ে লবন লাগিয়েছিল। সেগুলো এখন সারাদেহে...''

-"ইশপেশাল ট্যাট্টু, তাই তো?''

জয় হো হো করে হাসল, "এই না হলে আমার ঘর-ওয়ালি।''

-"এখন প্লিজ চুপ করুন। এসব শুনতে বিরক্ত লাগছে। অন্য কথা বলুন, আর নয়ত ঘুমান।

আমার পরিবারে কেউ কোনোকালে কসাই ছিল না, এসব শুনতে ভালো লাগার কথা না আমার।''

-''কষ্ট লাগছে না, তোমার?'' ঠোঁট কামড়ে হাসে জয়।-''না। ওরা কোনো খারাপ কিছু করেনি। আপনি দুটো প্রাণ নিয়েছেন, সেই হিসেবে ওরাই মহান। অন্তত আপনার প্রাণটা দিয়েছে, যার মূল্য অমূল্য। আপনি কিন্তু দুটো প্রাণ নিয়েছেন, শুধুই অহেতুক ক্ষমতার লড়াই, যার কোনো ভিত্তি নেই। কেবল ওই সকল স্বৈরাচার, পুঁজিবাদী, সুবিধাবাদী লোকদের পা চাটতে গিয়ে এইসব করেন আপনারা। ভাগ দেয় ওরা আপনাদের? যা

তো সব ওরাই ভোগ করে, আপনারা কুকুরের মতো লেজ নাড়িয়ে বেড়ান মাঝ থেকে। আবার এই পার্টির হয়ে মারামারি করার মূর্খতাকে আজকের যুবসমাজ বাহাদুরী হিসেবেও নিয়েছে, কে বোঝাবে ওরা যে আসলে ওইসকল নেতাদের পা চাটা জিভ বের করা কুকুর।''জয় অনেকক্ষণ চেয়ে রইল, "কোনো আপোষ না, না? একটুও আপোষ না, কোথাও না?''

-"অন্তত অন্যায়ের সাথে না।''

চট করে উঠে বসে জয়। খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলে, "ঘরওয়ালি! আপনি মারাত্মক এক উকিল হবেন, আই স্যোয়ার! তবে ভালো

উকিলদের কিন্তু জানের ঝুঁকিও ভালো থাকে। তখন হয়ত আমি থাকব না! আমি আর বেশিদিন বাঁচব না।”

অন্তূ জিজ্ঞেস করে, “আপনার খারাপ হবার গল্প নিশ্চয়ই বেশ ট্র্যাজেডিক?”

-“আমার খারাপ হবার কোনো গল্প নেই। ওসব সিন্যামাটিক চিন্তা বাদ দাও। অতীত কোনোদিন মানুষকে খারাপ বানায় না, বড়োজোর বিদ্রোহী বানায়। লোকে আমায় খারাপ বলে, যদিও আমি আমার মধ্যে কোনো খারাপ দেখিনা। আমার খারাপ হবার পেছনে কোনো কারণ নেই। আমি খারাপ, তাই আমি খারাপ, কারণ আমি খারাপ। কারণহীন

কারণে আমি খারাপ।''অন্তূ হতাশ শ্বাস ফেলে। 'যতবার বোঝার চেষ্টা করবে, ততবার ব্যর্থ হবে।' এরকম একটা অদৃশ্য ব্যানার ঝুলিয়ে রেখেছে যেন জয় নিজের চারপাশে। অন্তূ জিজ্ঞেস করল, "ড্রয়ারে এইসব ড্রাগ কীসের? কী করেন এগুলো দিয়ে?''জয় ড্রয়ার থেকে কিউব বের করে নিয়ে মেলাতে মেলাতে বলল, "ড্রাগ দিয়ে কী করে মানুষ?''

-"আপনাকে কখনও নিতে দেখিনি।''

-"তুমি আমায় চোদন খাইতেও দেখো নাই, ঘরওয়ালি। তোমারে ঘরে আনার পর প্যাদানি দিয়ে ফেলে রাখলে দেখতে পেতে।'' কিউব মেলাতে খুব মনোযোগী সে, "মেরে যখন ছাল

ছড়িয়ে ছেড়ে দিতো আমায়, তখন কী করতে বলো? হাসপাতালে পড়ে থাকব, কোন আমলে সেই ব্যথা কমবে, সেই আশায় বসে থাকব? অত ধৈর্য্য কোনোকালেই নাই আমার। অভার-ডোজ ড্রাগ পুশ করে বসে থাকি।দেহের সেন্সিটিভিটির ওপর সাডেটিভ কাজ করা শুরু করলে ব্যথা অনুভূত হয় না ঠিকঠাক। অনুভূতি নাশ হয়ে, রিফ্লেকশনলেস হয়ে যায় শরীর। এরপর আল্লাহর ওয়াস্তে অনির্দিষ্টকালের জন্য ঘুম বা সাবকনসেশন। জেগে থাকলেও দুনিয়ার খেয়াল নাই। ড্রেসিং করাও আমার পক্ষে সম্ভব না সেন্সিটিভ অবস্থায়। বিরক্ত লাগে শরীরে ব্যথা লাগলে।

রাগ হয়। একে তো থকথকে কষানি ঝরা ঘা, তার ওপর যদি কাঁচি, ছুরি, ওষুধ, তুলো মেরে খোঁচায়...তখন কড়া ড্রাগ ছাড়া উপায় নাই।''অন্তূ কপাল চেপে ধরে আস্তে করে বলে, "টাল লোক।" স্পষ্ট জিজ্ঞেস করে, "আপনি এডিক্টেড হয়ে যাননি?"

-"তখন কিছুদিন করে রিহ্যাবে থাকি।" আনমনে বলল। সে খুবই মনোযোগ সহকারে কিউব মেলাচ্ছে।

অন্তূ চোখ বুজে আঙুল দিয়ে কপাল চেপে ধরল, "কতবার মার খেয়েছেন জীবনে?"

জয় এবার তাকাল চোখ তুলে, চোখে-মুখে রসিক ভাব ফুটিয়ে তুলে বলে, "মেলা-বার।"

-“কেন?”

-“অকাম করছি, চোদন খাইছি। সোজা হিসাব। তুমিই তো বললে, অকারণে কেউ কাউকে মারেনা।”

-“ভুল বলিনি। আপনি অকাম করেছেন কেন?
”

-“আমার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য কী, জানো? আমার কোনো যুক্তি নেই। তুমি যদি আমার এক কাজের সাথে আরেক কাজ রিলেট করতে যাও, প্যাচ ওখানেই লাগবে। আমার যখন যা-আআ মন চায়, তা-ই করি। সেই ক্ষমতাটুকু হাতে রাখি। মন আর মেজাজ মুহুর্তে মুহুর্তে ব্যতিক্রম কিছু করতে চায়,

আমি তা-ই করি। তো আমার কাজে যুক্তি খোঁজা আর টাকলার কাছে চিরুনী খোঁজা এক হলো না?”অন্তূ চুপ রইল। সে আজকাল নিজেকেই বোঝেনা, জয়কে বোঝার প্রশ্নও ওঠেনা। নিজের মানসিকতার এমন কঠোর পরিবর্তন ওকে প্রতিক্ষণে অবাক করে। জয় কিউব এলোমেলো করে ফের মেলাতে মেলাতে বলল, “মেরে ফেলোনি কেন আমায়?”

অন্তূ বেশ কিছুক্ষণ নির্লিপ্ত থেকে অল্প হাসল, “মৃত্যু যদি শাস্তি হিসেবে দিতে চাওয়া যায়, তাহলে শর্ত কী বলুন? সামনের জনের চোখে মৃত্যুর ভয় থাকতে হবে, ঠিক বলিনি?”

জয় চোখ তুলে তাকায়। অন্তূ বলল, “সেটা আপনার নেই। আমি নিজেকে দিয়ে বুঝি— আমাকে মৃত্যু দেয়া এক প্রকার মূল্যবান উপহারের সমান আজ। সেটা কেউ দিলে সেটা কি আমার জন্য শাস্তি হবে? আপনার চোখে মৃত্যুর ভয় নেই, শরীরে আপনার ব্যথা নেই, জয় আমির।”জয় শব্দ করে হেসে ফেলল, “তো...ছেড়ে দেবে আমায়?”

অন্তূ মুচকি হেসে মাথা নামায়, ঠোঁটের কোনের হাসি চওড়া হয়। অল্প চোখ তুলে ফিসফিস করে বলে, “আঘাত ভুলতে আছে, তবু আঘাতকারীকে নয়। শরীর ও মন ক্ষত রাখেনা, ভরাট করে নেয় কোষের বিভাজনে।

তাই বলে দাগ মিলিয়ে যায়না। বোকামি হোক অথবা অন্যায় সহ্য করতে না পারার ব্যর্থতায়; হারানো তো আর কম হারাইনি। তার একটা দায় আছে তো আপনাদের, নাকি?''

-"ভুলবে না আমায়, তাই বলছো তো?''

-"আসামীকে ভোলা উচিত নয়, জয় আমির।''

জয় গা দুলিয়ে আলতো হাসে, একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বলে, "স্বামী নই, না?''

-"আসামী হিসেবে খারাপ তো নন। এই ঢের।

''জয় আবার শুয়ে পড়ল অন্তূর কোলে। আরাম করে মাথা রাখে। কোমড়টা আলতো হাতে জড়িয়ে ধরে পেটের দিকে মুখ লুকোনোর মতো করে মুখ গুঁজে জায়গা

খোঁজে। অন্তূ মাড়ির দাঁত আঁটকে চোখ বুজে শ্বাস ফেলে।

খানিকক্ষণের জন্য যখন বোতল নিয়ে বাইরে গেছিল, ছাদে যায়নি। সেই স্টোররুমের ওপারের দরজার ওপার গেছিল। অন্তূ টের পায়। আজকাল খুব যেতে দেখা যায় সেখানে। দিনে কয়েকবার, বারবার। বাড়িতেও থাকছে না ঠিকমতো। বিক্ষিপ্ত ঘুড়ির মতো বাতাসের সাথে পাল্লা দিয়ে ফনফন করে ঘুরছে। উদ্দেশ্য অজানা। কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে যেন। কিছু করছে। হুমায়ুন পাটোয়ারী মরার পর থেকে দুই ভাইয়ের গতিবিধি অস্বাভাবিক। রাতে বাড়ি ফেরে ক্লান্ত

হয়ে। চোখে-মুখে এক প্রকার তাড়া, খুঁজে ফেরার ব্যর্থতা।একবার সকাল সকাল পুলিশ এলো পাটোয়ারী বাড়িতে। হামজা ওয়ার্কশপে ছিল, পুলিশদেল সাথে নিয়ে দোতলায় এলো। জয় সকালে উঠে কোথায় বেরিয়েছিল। সে এলো খানিক পর। সদর দরজায় ঢুকেই পুলিশ দেখে চওড়া হাসল। ইন্সপেক্টর রশিদের দিকে চেয়ে কপালে হাত তুলে সালাম ঠুকে বলল, “কী অবস্থা, স্যার! ঠিকঠাক?”

-“তোমার খবর ভালো?”

মাথার ওপর হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙল, “আমি অলওয়েজ বিন্দাস থাকি।”

-“এখন কেমন আছো?”

-“বরাবরের মতো ফার্স্ট ক্লাস।”-“থানার আলমারিগুলোর তাক যদি সব তোমার ফাইলেই ভরা থাকে, চলবে তাতে?”

-“চলতেছে তো। সাবানের ফেনার ওপর পা পিছলে যেমন ছোঁৎ করে চলে যায় না? ওইরকম চলে যাচ্ছে।”

-“তারপর যে ধপাস করে পড়ে যেতে হয়, সেটা ভুলে যাচ্ছ।”

-“বি পজিটিভ, স্যার। নিজেকে সামলে নেবার দক্ষতা থাকলে পড়তে পড়তে না পড়ে সোজা খাঁড়া হওয়াটা বিশেষ কোনো আশ্চর্য ব্যাপার না।”

পুলিশ মাথা নাড়ল, “আর পারবে না। পিছলাতে পিছলাতে দেয়ালের দিকে যাচ্ছ। পিঠ ঠেকে যাবে এবার।”

-“দেয়ালটা কোন ব্র্যান্ডের সিমেন্টে তৈরি, স্যার? মজবুত খুব? না মানে, দুই নম্বর সিমেন্টের তৈরি হলে, বেশি জোরে যদি ধাক্কা খাই, দেখা গেল দেয়াল ধসে পড়ল। আমার পিঠ-টিঠ দুই-চার খণ্ড হয়ে যাবে, সেটা পরের হিসাব। তবে দেয়াল পেরিয়ে যেতে পার। ”জয়ের রসিকতা অবিরাম চলতে থাকল। জয় ফ্যানের রেগুলেটর ঘুরিয়ে স্পিড হাই করে এসে গা এলিয়ে সোফায় বসল। পুলিশ বলল, “কী কী করে বেড়াচ্ছ আজকাল?”

-“গলায় একটা খাঁকারি মারেন। কিছু আঁটকে আছে। জোরে কোরে কাশি দেন একটা।”

-“সব অভিযোগ বাদ দিয়ে যেটা মূখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে—তোমার স্ত্রীকে তুমি জোরপূর্বক তুলে এনেছ

মানহানিসহ বিভিন্ন নির্যাতন এবং মতের বিরুদ্ধে বিয়ে করেছ, পরিবারকে জিম্মি করে।
”

-“যাহ শালা! সাংঘাতিক কেইসে ফেঁসেছি তো এবার। তবুও কিছু নারীবাদী বিটিশশালী গলা ফাঁটাবে— আমাদের অধিকার দাও। আমরা নারী, আমরা বাল ছিঁড়তে পারি।” মুখ চেপে ধরল নিজের, “ক্ষমা, স্যার, ক্ষমা। কীসব

ভালো কথা যে খারাপ সময়ে বেরিয়ে যায় মুখ দিয়ে!”

-“অভিযোগ কি সত্যি?”জয় বুকে হাত দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর ভঙ্গিতে বলল, “অভিযোগ করেছেন আমার স্বর্গীয় শালা সরি সম্বন্ধিবাবু। যেহেতু সে স্বর্গীয়, তাই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার চান্স নেই, কবর থেকে কেউ ইন্টারভিউ দেয়নি কোনোদিন। তার বোনকে ডাকুন। আমি কী বলব? আমি বললে নিজেকে ডিফেন্সই তো করব, নাকি নিজের সম্মানের হরির লুট বিলাবো?”

জয় গলা হাঁকালো। অন্তূ এসে দাঁড়াল কিছু সময় পর। জয় বলল, “বেয়াই বাড়ির

লোকজন এসেছে, কিছু প্রশ্ন করবে তোমায়। সসম্মানে জবাব দাও, গিন্নি!”

অন্তূ বসল না, দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। জয় তরুকে ডাকে। তরু এসে দাঁড়ায় আস্তে করে। জয় আদেশ করল, “আমার জন্য ফুল এক প্লেট ভাত আন তো। মাছ-টাছ দিস না, কেমন? মাছ আমার অত্যাধিক পছন্দের। এজন্য খাইনা। ফ্রিজে রান্না করা মাংস থাকলে তা গরম করে আন।”

পুলিশদের দিকে তাকিয়ে বলল, “খেয়ে নিই, কেমন! আপনারা কথা বলেন। জেলের পঁচা রুটি খেলে ডায়রিয়া হয় আমার। বাড়ির ভাত ভালো করে গিলে যাই, তাও দু একদিন পেট

ঠান্ডা থাকবে অন্তত। তারপরের দিনগুলো বরফ লাগাবো।''সেন্টার টেবিলের ওপর পুরো ভুরিভোজ নিয়ে বসে গ্রোগ্রাসে গিলতে থাকল জয়। আশপাশের পুলিশের দল ঘিরে আছে। অন্তূকে প্রশ্ন-টশ্ন করছে। জয় দুনিয়া-দারী ভুলে খেয়ে যায়। বিশাল হাতের তালুতে একেকটা লোকমা বড় বড় করে মুখে দেয়া তার স্বভাব। ছোট লোকমায় খাবার খেতে পারেনা। খাওয়া ছাড়া এই মুহূর্তে আর কিছু তার বোধে নেই যেন। সে খাচ্ছে, পানি নিচ্ছে মুখে, তরুকে ডেকে সালাদ আনাচ্ছে, লবন কম হয়েছে বলে ঝারি মারছে। খাওয়ার হিড়িক বাঁধল তার।

বাড়ির লোক এবং পুরাতন অফিসারেরা অবাক হলো না ওর এমন আচরণে। কিন্তু নতুন যারা এসেছিল, তারা হতবাক চোখে দেখে গেল জয়ের অদ্ভুত নির্লিপ্ততা। যার চোখে পুলিশের ডর নেই, জেলে যাবার উদ্বেগ নেই। বরং সে পুলিশ বসিয়ে রেখে খাচ্ছে। অন্তূকে জিজ্ঞেস করা হলো, “আপনাকে রোজ টিজ করতো, জয় আমির। কথাটা সত্যি?” জয় খুব আশাবাদী, অন্তূর তেজদীপ্ত কণ্ঠে ‘হ্যাঁ’ শোনার জন্য। এরপর তাকে দু একদিন হাজতেও কাটাতে হবে, ভেবে কষ্ট লাগছিল। হাজতে গেলে তার কবুতর কে দেখবে, মদ পাওয়া যাবেনা ওখানে, অন্তূর সাথে ঝামেলা

করা হবেনা, সবচেয়ে বেশি কষ্ট লাগছিল, যে বউকে সে খাওয়া-পড়া দিয়ে পুষছে, সে তার সাথে বেইমানি করবে, তাকে পুলিশে ধরিয়ে দেবে। কষ্টে পেট ফেটে হাসি আসছিল, হাসল না। পুলিশরা পাছে পুরাটাই পাগল ভাববে। অল্প-সল্প ভাবলে চলে, পুরোটা পাগল প্রমাণিত হওয়া ঠিক না।

কিন্তু খাওয়া রেখে তড়াক করে চোখ তুলে তাকাল, যখন অন্তূ বলল, "না।"

একে একে সকল অভিযোগ নাকচ করল অন্তূ। জয় এঁটো হাত প্লেটে ডুবিয়ে হতভম্ব হয়ে চেয়ে থাকে অন্তূর দৃঢ়, আত্মবিশ্বাসী মুখের দিকে। তার মনে হলো, সে হ্যালুসিনেট

করছে। অথচ সত্যিই অন্তু সবগুলো অভিযোগ অস্বীকার করল। জয় গভীর চোখে তাকিয়ে থাকে শুধু, চুপচাপ...।

পুলিশেরা অবাক হয়ে, কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করল, "তাহলে আপনার ভাই এমন একটা অভিযোগ ডায়েরি করলেন কেন?"অন্তু পেশাগত মিথ্যাবাদীর মতো স্পষ্ট স্বরে জানায়, "বাড়ির কেউ সম্মত ছিল না বিয়েতে। ওদের পছন্দ ছিল না, জয় আমিরকে। ওরা এই বিয়ে মেনে নেয়নি। আমাকে অনেকবার ফিরিয়ে নিতে চেয়েছে, আমি যাইনি। এক্ষেত্রে তাদের ধারণা হলো, জয় আমির হয়ত প্রেসার ক্রিয়েট করে আমায় ধরে রেখেছে। তেমন

কিছুই নয়। আমি সদিচ্ছায় এবং সজ্ঞানে সংসার করছি। ওটা শুধুই মাত্র আমার বাড়ির লোকের আক্রোশ ছিল।”

সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করল রশিদ, “আপনি কি কাউকে ভয়য় পাচ্ছেন? সত্যি লুকোচ্ছেন?”

-“আপনার তাই মনে হচ্ছে?”

রশিদ উপহাসের হাসি হেসে মনে করিয়ে দিলো, “এ ঘটনার দিন দুয়েক পর আপনার ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যুর সংবাদ পেয়েছি আমরা।”-“সড়ক দূর্ঘটনার ঘটনা এই প্রথম শুনেছেন?”

-“সড়ক দুর্ঘটনা?”

-“খু-ন মনে হচ্ছে?”

-“আমি কিছু বলিনি, আপনিই বলছেন, ম্যাডাম।”
-“আপনি যা ঈঙ্গিত করছেন, আমি সেটাই কেবল স্পষ্ট করে দিলাম, অফিসার।”
আর কিছু বলার থাকেনা। অগত্যা আপাতত চলে গেল তারা। জয়, হামজা তখনও হিসেব মেলাতে ব্যস্ত। তরু ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে রইল। রিমি রান্নাঘরে কাজবাজ করছে। জয় অবশিষ্ট খাবারে পানি ঢেলে হাত ধুয়ে উঠে পড়ে। তার অস্থির লাগছে। মেজাজ বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে অকারণেই অথবা অজ্ঞাত কারণে। অন্তূর দিকে বারবার তাকায়। অস্থির-চঞ্চল চোখে তাকায়। মেয়েটার দৃষ্টি

জানালার বাইরে।কোত্থেকে যেন একটা লাল রঙা শাড়ি কিনে আনল জয়। লাল তার প্রিয় রঙ। আর কোনো রঙ প্রিয়র তালিকায় নেই। র-ক্তের রঙ লাল, জীবনে প্রথমবার র-ক্তের রঙ দেখার পরেই রঙটাকে জয়ের ভালো লেগেছিল, অতিরিক্ত ভালো। এরপর কোনো রঙকে ভালো লাগেনি আর।

অন্তূকে বলল, "ঘরওয়ালি, এটা পরবেন আজ গোসল করে। শালার বিয়েই তো করলাম আমি। বাসরে বউ ফেলে গেলাম হাসপাতালে। তেলতেলে কপাল। শাড়ি পরা অবস্থায় দেখিই নাই তোমায়। ওই বাড়ি থেকে বের হবার সময় একবারই দেখেছিলাম, তাও ভালোমতো

না। আজ পরো, একটা ছবি তুলবোনে দুজন। ঠিক আছে?''-“নেই।''

-“ঠিক নেই?''

-“না।''

-“পরবে না?''

-“উহু!''

-“কেন?''

-“ইচ্ছে করছে না।''

-“পরবেই না?''

-“পরবোই না।''

হাসে জয়। খানিকক্ষণ কেমন করে যেন চুপচাপ তাকিয়ে থাকে অন্তূর উদাস মুখখানির দিকে। অন্তূ জয়ের দিকে না তাকিয়েই বলে,

“এভাবে তাকিয়ে থাকবেন না। অস্থির লাগে।
”

জয় আস্তে করে বলে, “আমারও।”বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। বসন্তের রোদে ছাদে কবুতরের ঘরের সামনে বসে শাড়িতে খানিক মদ ঢেলে দিয়াশলাই জ্বালায়। কাপড়ের লাল রঙটা পুড়ে যখন ছাই হয়ে কালো হয়ে আসছিল, রাগ লাগে জয়ের। পছন্দের রঙটা বদলে অন্ধকারে ছেঁয়ে যাচ্ছে। র-ক্ত আর অন্ধকার তো প্রায় একই। দুটোই বিনাশী। তবুও আজ দুটোকে এক করতে পারে না জয়। অন্ধকারকে তার অপছন্দ না। তবু আজ আগুনের ওপর রাগ হচ্ছিল খুব। অথচ

নেভালো না। আগুন আর পাপের মধ্যে তফাত নেই। এক প্রান্তে ধরে গেলে পুরোটাকেই পোড়া অথবা গোটা মানুষটাকেই পাপী সম্বোধন করা হয়। ফেরার পথ? জ্বলতে দেয় শাড়িটা। ভাবে, আচ্ছা! ছাই হয়ে যাওয়া ওই কালো রঙকে কি আর লালে ফেরানোর উপায় নেই? উত্তর আসে, না। সময়ের মতোই তো ছাই আর পাপ। খড়ি পুড়ে ছাই হয়, তার স্তূপ থেকে পুনরায় খড়ির জন্ম হয়না। পাপের স্তূপ থেকে পূণ্যের জন্ম হয়না। রঙহীনতা থেকে রঙের জন্ম হয়না। চলে যাওয়া কিছুই ফেরে না। যা ফেরে, তা গেছিল না।

গা ঘামলে সহ্য করতে পারেনা জয়। আজ শার্টটা ভিজে উঠল। তবু জলন্ত আগুনের খুব কাছে তপ্ত সূর্যকিরণের নিচে বসে রইল। কবুতরগুলো গা ঘেঁষছে, আজ তাদের মালিক আদর করছে না, কথাও বলছে না। তারাও হতাশ হয়ে ফিরে ফিরে যাচ্ছিল।ডাইনিং টেবিলের ওপর আঙুল বাজাতে বাজাতে গান ধরে জয়,

প্রতিদিন কত খবর আসে যে কাগজের পাতা ভরে,

জীবনের পাতার কত যে খবর রয়ে যায় অগোচরে

কেউ তো জানেনা প্রাণের আকুতি বারেবারে
সে কী চায়
স্বার্থের টানে প্রিয়জন কেন দূরে ঠেলে সরে
যায়...
ধরণীর বুকে পাশাপাশি কভু কেউ বুঝি কারও
নয়..

মাথা দুলিয়ে গলা ছেড়ে গান গাইছিল। হামজা আসবে, এই সন্ধ্যা মাথায় নিয়ে চারটে গপাগপ খাবে দুজন, এরপর বেরোবে। হামজা এসে জিজ্ঞেস করে, "তোকে আবার স্বার্থের টানে দূরে কে ঠেলল?"

-"হ্যার বাল। সবসময় জরুরী না গানের সাথে জীবনের কাহিনি মিলবে। মন চাইতেছে

গাইলাম। গানটা প্রিয় আমার। তুমি চান করতে যাবা?”

-“তুই করবি না?”

-“তোমার মতোন খাইস্ট্রা তো না আমি। সবসময় পরিষ্কার থাকি। ডেটল সাবান মাখি। নিরানব্বই ভাগ জীবাণুমুক্ত থাকি।”হামজা গোসলে যায়, জীবনে তোয়ালে নেয় না। সেটা রিমিকে দিয়ে আসতে হয়। রিমি একটা নতুন পাঞ্জাবী ও পাজামা ইস্ত্রি করে বিছানায় রাখল। চিরুনি, পারফিউম, মুজিব কোট ইত্যাদি রেখে বেরিয়ে যাচ্ছিল। হামজা ধরল, “আমাকে এড়িয়ে চলতে ভালো লাগে?”

-“কিছু লাগবে, আপনার?”

গম্ভীর হামজা কড়া স্বরে জোরালো করে বলল, "তোমাকে লাগবে।"

-"আছি তো।"

রিমিকে ঘুরিয়ে নেয় হামজা নিজের দিকে। মুখটা উঁচু করে ধরে। রিমির চেহারায় বদল এসেছে, সেই চাঞ্চল্য আর নেই, পুরোদস্তুর পুরোনো গিন্নির মতো রূপ। যেখানে শুধু কর্তব্য পালনের তাগিদ, মনের চাহিদার অভাব।

হামজা বলল, "আমার দিকে তাকাও। আরমিণের রোগ লেগেছে, হ্যাঁ? তোমার, তরুর... ওর মতো বিদ্রোহী হয়ে গেছ সকলে? খুব তাড়াতাড়িই কাবু করে ফেলেছে সে

তোমাদের?''-"খারাপ তো কিছু করেনি। একসময় আমিও বিমুখ ছিলাম ওর থেকে। চট করে একদিন বুঝলাম, গোটা বাড়ি ভয় পায় ওকে, ওর তেজ এবং নির্ভীক চোখকে। আমি আকাশ থেকে পড়েছিলাম যখন টের পেলাম, আপনি চিন্তিত ওকে নিয়ে। কিছু তো আছে। নেই? সত্যকে বলে দেবার এবং অন্যায়কে অন্যায় বলার জন্য মাত্রার চেয়ে বেশি দুঃসাহস আছে ওর। হারাতে ভয় নেই। কিছু তো ক্রেডিট পাওয়া উচিত। হারালে লোকে দমে যায়। ও প্রতিবার দ্বিগুন জেদে ঝলসে ওঠে।''

-“তাতে ক্ষতিটা কার?” নিঃশব্দে হাসে হামজা। চোখদুটো জড়িয়ে যায়, নাকের দুপাশে ভাঁজ পড়ে, কাধটা দুলে ওঠে।
রিমি চোখ ফেরায়, “অথচ আপনারা শঙ্কিত ওকে নিয়ে।আমি তো রাজনৈতিক পরিবার থেকে উঠে আসা মেয়ে। তবুও আপনার কাছে কাবু হয়ে পড়ে আছি দিনের পর দিন। পতিসেবা করে চলেছি। একটা সাধারণ মেয়ে বাড়িতে ঢুকতেই গোটা নকশা বদলে ফেলেছে, আপনার-জয়ের ভিত নড়িয়ে রেখে দিয়েছে।”
-“ভুল মানুষের আঁছড় লাগিও না, গায়ে। ওর কাছে কিছুই নেই, নিঃস্ব ও। শুধু শুধু

আমাদের কাজে বাগড়া দিতে আসছে। আচ্ছা রিমি, তোমার কি নিজেকে আমার বাধ্য মনে হয়?''রিমি বিভ্রান্ত হয়ে তাকায়। হামজা বলে, "আজ থেকে আমার কোনো কাজ করতে হবেনা তোমাকে। রাগ করে বলছি না কথাটা। তবে আজ তুমি আমার কোথাও একটা আঘাত করে বসলে। ভাবতাম, শুধু একটু অভিমানে জড়িয়েছ। নয়ত তুমিও খুব একটা পবিত্র পরিবারের নও। তোমার সব স্বাভাবিক লাগার কথা। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, গোটা রঙ বদলে গেছে তোমার। তোমার ধারণা তোমার সই, রিমি।''রিমি অপ্রস্তুত হয়ে যায়। হামজা শান্ত মানুষ, ফায়সা কথা বলেনা। যা

বলে তার একটাও অহেতুক না। হামজা বলল, "নন দ্য লেস, লেট মি রিমিইন্ড ইউ ওয়ান থিং—ওর সাথে যা হয়েছে, তার সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই। ও তুমি নও। আর না আমি জয়। ওদের সম্পর্কটাই একটা যুদ্ধ-বিগ্রহের ওপর স্থাপিত। আমার-তোমার তা ছিল না। কিন্তু তুমি ছোট্ট একটা বিষয় থেকে অনেগুলো দিন দূরত্ব বাড়িয়েছ। এত চাপা হতে নেই। ছোট মানুষ তুমি।"

রিমি তাকিয়ে থাকে। হামজার মুখটা অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে উঠেছে। রিমি মুখ ফিরিয়ে নেয়। তবু তীব্র অভিযোগ আর অভিমান তাকে কথা

বলতে দেয়না। হামজা জিজ্ঞেস করে, "কিছু বলবে?"
-"কী বলার আছে? কী বলব আমি?" কেঁপে ওঠে কণ্ঠটা। এইসব সময় রিমির কখনোই বিশ্বাস হয়না, এই লোকটা তাকে ভালোবাসেনা। কোনোদিন মারেনি, কড়া কথা বলেনি। চোখে সবসময় গভীর এক অনুভূতি। রিমি বোকা বনে যায় এই লোকের সামনে বরাবর। সেই ছোট্ট রিমিকে কত ভালোবেসে ওর বাবার কাছ থেকে চেয়ে এনেছিল। বাপ-ভাইয়ের স্বার্থ ছিল হামজার সাথে বিয়ে দেওয়ায়, হামজা ছিল নিঃস্বার্থ।হামজা চট করে আলতো হাসে। কাছে আসে রিমির। দুই

চোয়ালে হাত রেখে দাড়ি-গোফের মুখটা এগিয়ে নিয়ে শব্দ করে রিমির ঠোঁটের কিনারায় চুমু খায় একটা। রিমির চোখ বুজতেই এক ফোটা তপ্ত জল গাল বেয়ে যায়। ভেজা ঢোক গেলে একটা। আচমকা হামজা ফিসফিস করে বলে, "তুমি জানো, আমি কোনো পাটোয়ারী বাড়ির ছেলে-টেলে কেউ নই?"

রিমি বিদ্যুতে শক খাওয়ার মতো ছ্যাৎ করে দু পা সরে যায়। হামজা হাসে, শব্দ হয়না। পাজামা-পাঞ্জাবী পরে, চুল ঠিক করে, পারফিউম লাগায়। কোট গায়ে চড়াতে রিমির

দিকে তাকালে রিমি আস্তে কোরে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, “কে আপনি?”

-“ঢাকা মোহাম্মদপুর বস্তির কোনো এক কুটুরিতে অত্যান্ত অবহেলায় জন্ম নেয়া একটা ছোটলোক, নোংরা, নিঃস্ব প্রাণ, আমি।” ভ্রু নাচায়, “কী? এবার একেবারে তালাক? হা হা হা!” এত জোরে শব্দ করে কখনও হাসেনি হামজা। গা’টা ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে রিমির। কথা বেরোয় না।হামজা বলে, “আমার মা বলে যাকে জানো, শাহানা পাটোয়ারী। সে সন্তান জন্মদানে জন্মগত অক্ষম নারী। নারীত্ব ছিল না তার মাঝে। ছোটবেলা থেকে হুমায়ুন পাটোয়ারীকে এ থালায়-ও থালায় মুখ দিতে

দেখেছি। তাকে বাঁধা দিইনি, কারণ সে আমার বাপ না বরং আমিই তার বাপ হয়ে উঠেছিলাম। কৃতজ্ঞতা অথবা বাপের ধর্ম যা-ই বলো, খানিক প্রশ্রয় দিতে হয়, দিয়েছি তাকে, বাপ হিসেবে ছেলেকে যা দিতে হয়, আমি তাকে সব দিয়েছি। আমাকে শাহানা মা নিয়ে এসেছিল এখানে, আমি তখন দুই বছরের বাচ্চা। রাজধানীর রাস্তার ধারে ময়লায় গড়াগড়ি খেতাম। পাটোয়ারী বাড়ির সবাই বড়লোক হলেও হুমায়ুন পাটোয়ারী চিরকালের চরিত্রহীন আর কামলা। কোনোদিন কাজ-কাম করেনি। এখানে এসেও সেই অভাবেই মানুষ আমি, যতদিন না অন্যায়ের পথে গেছি।

আমাকে স্কুলে পড়িয়েছিল জয়ের মা। হুমায়িরা ফুপু। কতদিন? শ্বশুরবাড়ি থেকে কতদিন চালাবে আমাদের সংসার, আমাকে? আমার যখন বয়স চৌদ্দ, সে-সময় তারও...
''রিমি স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে। হামজা হাসে, "আমার তখন ক্লাস নাইনের রেজিস্ট্রেশন। ফুপু নেই আর... বাড়িতে চাউল কেনার টাকা নেই, আমার স্কুলের ফি দেবে কোত্থেকে? পাটোয়ারী বংশের কেউ কাউকে দেখেনা। নিজেদের অর্জন নিজেদের করে নিতে হয়। আমিও একসময় ক্ষমতা অর্জন করে সবগুলোকে উপড়ে ফেলেছি। এখন দেখবে যেদিকে তাকাবে, সব আমার নামে। গোটা

পাটোয়ারী নামটা আমার, হামজার। আমার আসল নাম জানিনা আমি। দরকার নেই। শুধউ আরও ক্ষমতা চাই, আরও... তা ছাড়া আমি আজ আমি হতাম না, আমি হতাম না, রিমি।তখন দেশে নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থান চলছে। স্বৈচারার বিরোধী আন্দোলনে দেশ তোলপাড়। আমাকে বলা হলো, পড়ালেখা ছেড়ে দিতে। তা সম্ভব ছিল না। আমি ছোটলোকের ছেলে হলেও আমি ছোটলোক হয়ে জন্মাইনি। আমার জন্ম হয়েছে ক্ষমতা কামাতে, এই সমাজে নিজের বিশিষ্ট নামের ঝংকার তুলতে। ছোটলোক হয়ে মরার কথা তো ভাবতেও পারিনি কোনোদিন। আমি চলে

গেলাম পার্টিতে। মেট্রিক পরীক্ষার প্রবেশপত্রের টাকাটা নিজের ভালোমানুষি বিক্রি করে পাপের টাকায় যোগাড় করা ছেলেটা এত বড় ব্যবসা, এত বড় বাড়ি আর এত নাম কী করে কামিয়েছে, সেসব তোমাদের না জানলেও চলবে। কল্পনা করে নিও। শুধু জেনে রাখো, তুমি, তোমার পরিবার আমায় বাল দিয়েও নাড়তো না, যদি না সেইসব পেরিয়ে, সব ডিঙিয়ে আমি নিজেকে এই অবস্থানে দাঁড় করাতাম।’’হামজা থামে। খানিক দম নেয়, এরপর বলে, “বহুত কিছু পাড়ি দিয়েছি আমি আর জয়। তোমার মতো লাখখানেক রিমি, আর আরমিণের মতো

হাজারখানেক আরমিণ জয়-হামজার পথ রুখতে পারেনা, আর না ভাঙন ধরাতে। এ পথ একদিনের না। যখন তোমাদের জন্ম হয়নি, অথবা খালি গায়ে পুতুল খেলতে তোমরা, তখনকার ধরা হাত। না ছাড়বে, হয় মরবে।''

কেমন অপ্রকৃতস্থর মতো হাসে হামজা গা দুলিয়ে, "অনেক ক্ষমতা কামানোর আছে। অনেক অনেক অনেক.....যার অন্ত নেই, থাকবে কোনো সীমা। এই অবধি পৌঁছাতে যে পথ পাড়ি দিয়েছি, সামনের পথে আরও র-ক্ত, আরও চিৎকার আরও হাহাকার আছে। সে-সবে থামলে আজ আমি মানুষের প্রতিনিধি

হতাম না।আজ কত মানুষ আমার কাছে এসে ধর্না ধরে একটু সাহায্যের আশায়। আমার গর্ভধারিণী হয়ত এই লোকগুলোর মতো হাত পাতাওয়ালার কাতারেও ছিল না। অথচ আজ আমি তাদের হাতে সাহায্য তুলে দেয়া মানুষটা। আমি সেদিন অন্যায় দেখে থেমে গেলে হতো? আর না আজ থামলে হবে। তুমি বিরোধীতা করো, আরমিণ করুক। জয় আর আমার পথ একটা, সেখানে গিয়ে অর্জন দুটো দুজনের। দুজনেই অতৃপ্ত হয়ত চিরকাল, তবু তৃপ্ততা। আমার থামার নয়, আমার ক্ষমতা লাগবে, আরও উঠতে হবে। সিড়ি পড়ে আছে, অনেক সিড়ি। উপরে ওঠার সিড়ি। ক্লান্তিতে

জড়িয়ে আসা পা-দুটো ঝাড়া মেরে উঠে যেতে হবে। বুঝতে পারছো তুমি, বুঝতে পারছো....''

হামজা জয়কে ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে যায়, “ও জয়! শুয়োর, বেরোবি নাকি আসব আমি? দেরি হচ্ছে, জলদি আয়।''হামজা বের হবার সময় অন্তূ ড্রয়িং রুমে ছিল। আজ একটা জিনিস খেয়াল করল, হামজার ডান হাতের বৃদ্ধা আঙুলে ঠেলে ওঠা সেলাইয়ের দাগ। খুব বেশি। যেন আঙুল কেটে পড়ে যাবার থেকে রক্ষা করতে কোনো সময় তাতে সেলাই দেয়া হয়েছিল।

জয় বেরিয়ে গেলে অন্তূ রিমির ঘরে গেছিল। ওরা দুজন আজ রাতে ফিরবে বলে মনে হয়না।

রিমি তখন উদ্ভ্রান্তের মতো বসা। অন্তূকে পেতেই গরগর করে সব বলে বোধহয় নিজের ওপরে চাপা মারি বোঝাটা নামায়। অন্তূ অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল। পুরো বাড়ি নিস্তব্ধ। নিচ থেকে লোহার ধাতব শব্দ আসছে ভেসে। নীরবতা ভেঙে অন্তূ প্রথম যে কথাটা চট করে বলল, "তাহলে তুলি আপু কে?"রিমি আরেকবার হতবাক হয়ে তাকায়। ব্যাপারটা তার মাথাতেই আসেনি। সে হামজার মুখে কথাটা শুনে এতটাই হতবিহ্বল

হয়ে পড়েছিল, আর কিছু ভাবার ফুরসৎ পায়নি। অথচ আজকাল অন্তূকে বিশেষ অবাক হতে দেখা যায়না, সে যেন সে-সবের ঊর্ধ্বে চলে গেছে।

অন্তূ জিজ্ঞেস করে, "আপনি হামজা সাহেবকে ভালোবাসেন। কেন?"

রিমি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, "মাঝেমধ্যেই আমাদের বাড়িতে এই গোমড়ামুখো বিশালাকায় লোকটা যেত। দোতলার সিঁড়ি থেকে বসার ঘর দেখা যায়। কেন যে দাঁড়িয়ে দেখতাম লোকটাকে। একটা কথা বেশি বলেনা, এদিক-ওদিক তাকায় না। এত শান্ত মানুষ, রাগ হতো কেন জানি।

অথচ কোনো কারণ ছিল না, জানেন! আমি কী করে জানব যে, লোকটা বেশ জানে, তাকে এক পুঁচকে মেয়ে ভ্রু কুঁচকে দেখে। আবার এটাও জানে, কী করে চট করে চোখ তুলে একনজর দেখে সেই মেয়েকে কঠিন লজ্জায় ফেলে দেয়া যায়? দিলো। আমি কাচুমাচু হয়ে গেলাম। ভূত দেখলে যেমন পা ভারী হয়, ওরকম আঠার মতো লেগে রইল পা জোড়া। মাঝেমধ্যেই যেত। যখন ঝন্টুবাবাদের বাসায় যেত, আমি বাহানা করে যেতাম।

অথচ একদিন এই গভীর জলের মাছ লোকটা কী করল জানেন? কানাঘুষা শুনলাম, লোকটা

প্রস্তাব দিয়েছে। বাড়িশুদ্ধ কেউ রাজী না এতবড়, গম্ভীর লোকের সাথে আমার বিয়ে দিতে। ঝন্টুবাবা আর মাজহার ভাই দিয়ে দিলো। আমি ‘না’ করিনি। কেন করিনি, কে জানে!ছোট বয়সে বউ হয়ে আসার পর থেকে লোকটার স্পর্শ, কথা, চোখের চাহনি আর তার ঘরণীর কাজ করতে করতে কবে যে কঠিনভাবে আঁটকে গেলাম। জানেন? কোনোদিন বলেনি আমায় কিছু করতে। অথচ তখন বয়স ছোট ছিল। একটা তাগড়া পুরুষ, যে আমার স্বামী। তার তোয়ালেটা, লুঙ্গিটা এগিয়ে দেয়ার মাঝে যে শিহরণ আছে, তাতে বুক কাঁপতো। আমায় বলতো, খাইয়ে দিতে।

আমার ছোট্ট হাতের লোকমা লোকটার মুখে তুলে দেবার সময় শিরা-উপশিরার যে আন্দোলন, ও আপনি বুঝবেন না, আরমিণ। লোকটা বাইরে গেলে অপেক্ষা করা, মুরগীর বাচ্চার মতো তার বিশাল বুকের কোটরে গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকা, তার পছন্দের রান্নাটা করা, তার ছোট ছোট ধমক...''

রিমি হু হু করে কেঁদে ওঠে। অন্তূর খুব হাসফাস লাগছিল। অস্থির সে কতরকমই তো হয়েছে, এরকম অস্থিরতা নয় সেগুলো। বিষাক্ত অস্থিরতা। সে বুঝবে না এগুলো, রিমি বলল। ঠিকই তো। এসব সে কেন বুঝবে? জয় আর তার মাঝে হতে পারে বিয়ের

খোৎবা পড়ে শরীয়ত মতে বিয়ে তো হয়েছিল, জয়ের খিদে পেলে কাছেও টেনে নেয় জোর-জবরদস্তি করে। তবে এইসব তো নেই তাদের মাঝে!অন্তূ রিমিকে কান্নারত রেখে উঠে গিয়ে জানলার ধারে দাঁড়ায়। ইশার নামাজ পড়ে মুসল্লিরা বেরোচ্ছে মসজিদ থেকে। অন্তূ উদাস চোখে চেয়ে থাকে আলো-আঁধারির গোধূলিতে। জয়কে নিয়ে তার কেবল কৌতূহল আছে, আর আছে মহাবিশ্বের মতো বিস্তৃত এক বিশ্ব ঘেন্না। লোকটা ভালোবাসতে জানে কি-না, জানেনা অন্তূ। কারণ সে সুযোগ দেয়নি। তবুও জানে, জয় অন্তূর ওপর শুরু থেকেই উদার। নয়ত অন্তূর

গোটা বংশ নির্বংশ করতে বাঁধা কোথায় জয়ের।

সুযোগ দেয়া উচিত। একটু মায়ায় পড়া উচিত জয়ের, অনেকটা পড়লেও দোষ নেই।

একবার জয়ের বেঁচে থাকার, জগৎ সংসারে নিজেকে নিযুক্ত করার অথবা স্নেহ-ভালোবাসার হাহাকারে ভিজে ওঠা উচিত। সে জয়কে আবিষ্কার করতে চায়। তারপর বিচার করতে চায়।

তুলির ঘরে গিয়ে অন্তূ তুলিকে জিজ্ঞেস করে,"আপনার সাথে এ বাড়ির সম্পর্ক কী?"

তুলি হাসে, “বের করে দেবে আমায়?

”-“ইচ্ছে, অধিকার কোনোটাই নেই। জানতে চাই।”

-“জেনে কী?”

-“না জেনেও কিছু নয়। তবু জানা ভালো।”

-“আব্বুর অবৈধ মেয়ে।”

অন্তূ চোখ বোজে। এটা বাড়ি না ডাস্টবিন? সবার ভেতরে দোষ। আর সব এক বাড়িতে জোট বেঁধেছে। অন্তূর জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, আপনার নিজের মাকে চেনেন? তবু হামজা আপনাকে ভালোবাসে, উল্লেখযোগ্য ভালোবাসা না যদিও। এজন্যই কি আপনার এভাবে স্বামীর বাড়ি ছেড়ে আসা নিয়েও এ

বাড়ির কারও মাঝে কোনো হেলদোল ছিল না? এমনকি আপনার বাপেরও?
অন্তূর মনেহয়, সে নরকে এসে পড়েছে। যার অবস্থান সভ্য সমাজ থেকে অনেক দূর। সমাজে বা মানুষের ভেতর ভেতর বহুত দৃষ্টিকটু-শ্রুতিকটু ঘটনারা অবাধে ঘটে যায়, কানাকানি হলে বদনাম নয়ত ওটাই সভ্যতার নামে চালিয়ে দেয়া হয়, এই তো?বাড়িটাতে সবাই একসাথে বাস করে। অথচ মনেহয় এটা কোনো হোস্টেলের হল যেন। একসাথে থাকা ছাড়া আর পরস্পরের মাঝে তেমন কোনো মেলবন্ধন থাকার নয়। অন্তূ অবাক হতো, আজকাল সব কিছুর যোগসূত্র খুঁজে

পায়। তরু শাহানার বোনের মেয়ে, তুলির মা হুমায়ুন সাহেবের উপ-স্ত্রী, হামজা কোথাকার কে, আর জয়? একমাত্র জয় আর হুমায়ুন পাটোয়ারী এ বাড়ির কেউ না কেউ।

রাত এগারোটার পর ওয়ার্কশপ বন্ধ হয়ে যায়। অন্তূ বারান্দা থেকে দেখে সব আলো নিভিয়ে সশব্দে সাটার ডাউন করে যে যার মতো বিদায় নিচ্ছে কর্মচারীরা।

মাঝরাত হয়ে আসে। অন্তূ নামাজ পড়ে। এদিক-ওদিক পায়াচারী করে। রাত একটার দিকে চাবিটা বের করে নিয়ে রিমির কাছে যায়। রিমির মানসিকতা বিদ্ধস্ত। তা সত্ত্বেও অন্তূ বলে, "চলুন, ঘরটা দেখে আসি।"

-“খুব একটা ভালো লাগবে না আপনার ওখানে গিয়ে?”

-“খুব খারাপ কিছু?”

-“ভালোও না।”

-“তাহলে তো যাওয়াই যায়।”

-“বুঝবেন না কিছু। কৌতূহলবশে জিজ্ঞেস করবেন জয় ভাইয়াকে, এরপর হাঙ্গামা হবে আবার। আবার ঝামেলা হবে।”-“হবেনা। আমি আর নাক গলাবো না। শুধু দেখব। দরকার পড়লে আপনি বুঝিয়ে দেবেন।”

-“আমি নিজেও জানিনা কিছুই।”

তরু-তুলির ঘরের দরজা আঁটকানো। শুয়েছে ওরা। দুজন যায় চুপচাপ। রিমি লম্বা বারান্দার

শেষ প্রান্তে স্টোররুমের ডান পাশে দাঁড়ায়। উদাস স্বরে অন্তূকে বলে, “আপনি যান। আমার ভালো লাগেনা ওখানে যেতে। আপনারও লাগবে না।”

অন্তূর বুকে ধুকপুকানি ওঠে। হাতে শুধু একটা দিয়াশলাই। টর্চ আনেনি। কী বা দেখবে! খুব খারাপ কিছু? দেখে কী করবে? কী থাকতে পারে? কোনো অনৈতিক ব্যবসার জিনিস, বা অন্য কী? জয় বলে, ওখানে ইস্পাত, লোহা ইত্যাদি থাকে। গোডাউন ওটা। লোহা গলানোর কাজ হয়।এই সরু বারান্দাটা গা ছমছমে। ঠিক পুরোনো ভূত-বাংলোর নির্জন করিডোরের মতোন। লাইট

জ্বালাতেই অন্তূ চমকে উঠল। আজব! লাল টকটকে র-ক্তের মতো লাইট এই বারান্দায়। অন্তূ কোনোদিন জ্বালিয়ে দেখেনি। ভয়ও হচ্ছিল, সেখানে কোনো পাহারা নেই তো? না থাকার কী? হামজা-জয় ঝানু লোক। আঁধারে লাল আলো আরও রহস্যময়তা তৈরি করছিল। অকারণেই। অন্তূ সেই দরজার সামনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে কান পাতে। ওপাশে কারও আওয়াজ নেই। হয়ত পাহারা নেই। কেউ তো আসেনা এদিকে। এ বাড়ির দোতলাতেই কেউ আসেনা। বাড়ির লোকেরাও একেকটা অস্বাভাবিক মানুষ।তালাটা খোলার সাথে সাথে অন্তূর বুকটাও ধুপ করে ওঠে।

আস্তে আস্তে দরজা ঠেলে সে। চোখ ধাঁধিয়ে যায়। কবরের মতো অন্ধকার। আন্দাজ করা যায়না, সামনে আদৌ কী আছে। হাত বাড়ায়। টের পাবার চেষ্টা করে, তার সামনে কিছু আছে কিনা। আশ্চর্য, পেছনের লাল আলো এক রত্তিও এই দরজার ওপারের অন্ধকার কাটাতে সাহায্য করছে না। অন্তূর এত বুক কাঁপছে কেন, সে বোঝেনা। নিজেকে ধমক দেয় একটা। সামনে কালগর্ভের মতো অন্ধকার।

বদ্ধ বাতাসে কেমন এক গুমটে ভোঁতা আওয়াজ কানে বাজে, সেটা খুব বিশ্রী লাগছিল। কমপক্ষে তিন-চার মিনিট দাঁড়িয়ে

থাকে অন্তূ অন্ধকারটাকে চোখে সহনীয় করার উদ্দেশ্য। কিছু স্পষ্ট হলোনা, তবে অন্ধকার চোখে সয়ে গেল।

সামনে দু-কদম সমতল ভেবে পা রাখতেই পা ছিটকে যায়। চাপা এক আর্তনাদে আশপাশের কিছু চেপে ধরার চেষ্টা করে। ধরেও ফেলে কিছু একটা। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। বুক দ্রিমদ্রিম করে ঢোল বাজাচ্ছে যেন। বুকে হাত রেখে ওকে থামানো দরকার, নয়ত স্পন্দিত হতে হতে বেরিয়ে না আসে। যে তার গতি বেড়েছে!

পায়ের অনুভবে টের পায় সে কোনো সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে, এবং হাতে ধরে আছে

দুপাশের হাতল। অন্তূ অবাক হয়। এটা সে কোথায় নামছে? পাতালে? কবরখানা?তখনই মাথায় আসে, সে দোতলা থেকে আসছে। তাহলে এই সিঁড়ি নেমে কোথায় যায়? দোতলা থেকে নামলে নিশ্চয়ই নিচতলায় যায়? নিচতলায় ওয়ার্কশপ! সে তাহলে যাচ্ছে কোথায়? ওয়ার্কশপে? তার মানে অহেতুক সন্দেহ করে এত নাটক! অন্তূর রাগ হয় নিজের ওপর এক মুহুর্ত। দৌড়ে ফিরে যেতে পা টানে।

তখনই মনে হয়, তার মস্তিষ্ক তার সাথে খেলছে। সে ভয় পাচ্ছে, চরম ভয়। এবং মস্তিষ্ক তাকে সহজভাবে ভুলিয়ে দ্রুত

বিষয়টাকে কাটাতে চাইছে।গায়ে এক ধরণের শিরশিরে অনুভূতি হচ্ছিল। এটা অজানা ভয়ও হতে পারে। আসলেই সহজভাবে চিন্তা করলে, দোতলা থেকে এই সিঁড়ি যদি নিচে নেমে যায়, অর্থাৎ এটা গ্রাউন্ড ফ্লোরে গেছে। এটা নিচতলার গুপ্ত সিঁড়ি। বাড়ির সামনের যে সিঁড়ি দিয়ে উপর-তলায় আসা হয়, সেটা মূখ্য। এটা গৌণ একটা রাস্তা। বাগানের সেই লোহার গেইটের কথা মনে পড়ল। তাহলে ওটা কী? ওটার পেছনে কী আছে?

এক সিঁড়ি পিছিয়ে সে দুপাশের দেয়াল হাতিয়ে বাতির সুইচ পেল। ঢালাই সিঁড়ি। দুপাশে সিমেন্টের বস্তা থেকে শুরু করে

দালান বাড়ি তোলার সময় যেমন বাড়ির এখানে-ওখানে কত বাঁশ, ঢালাইয়ের যন্ত্রপাতি, চটের বস্তা ইত্যাদি ধুলো জড়ানো পড়ে থাকে, সেসব। অন্তূ তবু নেমে যায়। কোনো আগ্রহ পাচ্ছিল না। এখানেও সুইচ আছে। আলো জ্বালায়।কিন্তু সিঁড়ি পার করে অন্তূ বিস্ময়ে হাঁ হয়ে যায়। একটা বিশাল এপার্টমেন্ট ইউনিট! এটা ওয়ার্কশপ নয়! দোতলার মতো সেম পরিকল্পনায় গড়ে ওঠা গ্রাউন্ড ফ্লোর। তা কেবল ইটে গাঁথা। পুরো কাঠামো তৈরী, তবে প্লাস্টার-রঙ কিছু নেই। ফেলে রাখা হয়েছে। অন্তূর শরীরটা ঝাঁকি মেরে মেরে উঠছিল। লাইটে অল্প একটু আলোকিত হয়েছে।

বাকিটা সেইরকম কবরস্থানের মতো নিস্তব্ধ, অবরুদ্ধ। রাত বাড়ছে প্রকৃতিতে।

অন্তূ আচমকা বিদ্যুতে শক খাওয়ার মতো চমকে ছিটকে দেয়ালের সাথে মিশে দাঁড়ায় একদম। বাচ্চা কাঁদছে! একজন নয় অনেকে যেন! ভৌতিক সেই স্বর। এত করুণ! শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে ওর। এই অবরুদ্ধ ইটের গাঁথুনির গোপন এপার্টমেন্টে ছোট মানুষের কান্নার আওয়াজ! অন্তূ পাগলের মতো এগিয়ে যায়। গা ঘেমে ভিজে উঠেছে। চুলের খোঁপা খুলে কোঁকড়ানো লম্বা চুলগুলো পিঠে ছড়িয়ে যাওয়ায় আরও গরম লাগছিল। খটাং করে একটা আওয়াজ হয় তার পা কিছুতে বেঁধে।

কান্না থেমে যায়। অন্তূ থমকায়। আর আসছে না কান্নার আওয়াজ। একটা রুমে উঁকি দেয়। দিয়াশলাই জ্বালায়। রুমে কিছুই নেই। বালির মেঝে, ইটের দেয়াল। অবাক করা বিষয় হলো, জানালা নেই রুমের। অন্তূর মনে হচ্ছিল পেছনে বুঝি কেউ আছে। সে একা নয়। এত আঁধার! সে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে হাঁটছিল। সাহস সবটুকু কোথাও বিশ্রাম নিচ্ছে যেন। শরীরে জোর পাওয়া যাচ্ছিল না আর। মৃত্যুপুরীতে এসেছে সে, পুনরায় এই ভাবনা মানসিকতাকে পুরো সম্মোহনগ্রস্থ করে রেখেছে।

একেকটা রুম পেরিয়ে সে এগিয়ে যাচ্ছে কোথাও গভীরে। বিস্তৃত বিশাল এপার্টমেন্ট। পরের রুমটায় উঁকি দেয়। দিয়াশলাইয়ের আলোয় এ রুমের সুইচ পেল। আলো জ্বালাতেই দু-কদম পেছায়। বিশাল কক্ষ। কমপক্ষে বিশ হাত দৈর্ঘ্য ও পনেরো-ষোলো হাত প্রস্থবিশিষ্ট ঘরে বিশাল বিশাল লোহার খণ্ড, দণ্ড, কীসব মেশিন পাতি, বীম। সারি সারি সব সাজানো। যেন লোহার খনিতে চলে এসেছে সে।

আবার আসছিল সেই কান্নার আওয়াজ। অথচ কেউ নেই কোথাও। পশমগুলো অবাধ্যের মতো খাঁড়া হয়ে আছে, পা জড়িয়ে আসা

আড়ষ্টতা।অন্তূ তটস্থ হয়ে ওঠে। বাচ্চা কাঁদছে। আবার! বিশাল এই কক্ষটিতে পনেরো ওয়াটের একটি মাত্র হলদে বাতি জ্বলছে, একাংশ আলোকিত তাতে, তাও সামান্য। অন্তূর শরীরের লোমকূপে কাঁপ ওঠে। তবু সে গভীরে হারায়। এগিয়ে যায় সামনের দিকে। দুপাশের লৌহখণ্ডের মাঝ দিয়ে সরু রাস্তা। কক্ষের শেষটায় ফাঁকা। মোটা মোটা ইস্পাতের ধাতব খণ্ডের ভিড়ে এদিক-ওদিক তাকায় অন্তূ। এক কর্নারে একটা যেন কাটা হাত পড়ে আছে। অন্তূ বিশ্বাস হয়না, বোধহয় চোখে ভুল দেখল। ছিটকে পিছিয়ে যায়। মানুষের কাটা হাত।

কোনো ভুল নেই। অন্তূ এগিয়ে যায়। হাতটা হাতে তুলে নেবার সাহস হয়না। আজ তার সব সাহস তলানিতে জমেছে। কেটে নেবার স্থান থেকে চুইয়ে পড়া রক্ত, ছিঁড়ে আসা শিরা-উপশিরা, থকথকে কষানিগুলো শুকিয়ে গেছে। পুরুষের হাত। হাতের কব্জিতে ঘড়ি। আঙুলগুলো থেতলানো। তাতে রূপার আংটি এখনও আছেই। অন্তূর বমি আসে, চোখদুটো ঘোলা হয়ে ওঠে। সে কল্পনা করে, জীবন্ত অবস্থায় এই বিশালাকায় লোহার পাতের ওপর কারও হাত রেখে হাতুরি দিয়ে আঙুলের অস্থি-সন্ধিগুলো ছুটিয়ে দেয়া হয়েছে। এভাবে হাতটাকে থেতলানো হয়েছে। লোকটা কতটা

চিৎকার করেছিল? করেনি বোধহয়। কাপড় গুঁজে দেয়া যায় মুখে অথবা এই বদ্ধ ঘর ছেড়ে আওয়াজ দোতলায় কেন উঠবে? অন্তূ উঠে দাঁড়ানোর শক্তি পায়না। সে মার্ডার তো দেখেছে। হামজা সীমান্তকে মেরেছে, আগুন্তক হুমায়ুন পাটোয়ারীকে মেরেছে! তখন কষ্ট হয়নি। কারণ কী? ওই দুই ভিক্টিমের পাপ গাঢ় ছিল তাই? এই কাটা হাতের মালিকের পাপ থাকতে পারেনা?অন্তূ ওঠে কোনোমতো। কয়েক পা এগোতেই বিকট দূর্গন্ধে মাথাটা ঘুরে আসে। এত বিশ্রী গন্ধ কীসের? অন্তূ হতবাক হয়ে চেয়ে থাকে। লোহা গলানোর বিশাল বিশাল অনেকগুলি

চুল্লি। বাইরে থেকে ওয়ার্কশপকে এতটাও বড় লাগেনা, যতটা এখানকার যোগান। তা বড়, তবে এতটা না বোধহয়। আশপাশে বিভিন্ন ধরণের ফ্রেম ও যন্ত্রপাতি পড়ে আছে। ফ্রেমগুলো অস্ত্রের। ধাতব গলন ঢেলে লৌহ-অস্ত্র বানানো হয় সে-সবে।

তার পাশেই গলিত মাংসপিণ্ড। মানুষের দেহ। থকথকে জেলির মতো পড়ে আছে। মানব দেহের আকার নেই সে-সবে। অন্তূ শক্ত করে নাক চেপে ধরে ওড়নায়, তাতে শ্বাস আঁটকে আসে। তবু গলিত মাংস পঁচার গন্ধ নাকে মুখে ঢুকছে। মানুষের দেহ পুড়ে, ঝলসে,

কুঁকড়ে উঠেছে। তাতে ছত্রাক বাসা বেঁধেছে, আরও ক্ষয় হচ্ছে, দূর্গন্ধ হচ্ছে।

লোহা গলানো হয় প্রায় ১৬০০° সেন্ট্রিগেড তাপমাত্রায়। মানবদেহের সহনশীলতা কতই বা—কমবেশি ৪৫° সেন্ট্রিগেড!সেই চুল্লিতে মানুষের শরীর ঝলসানো হয়েছে। গলিত লোহার লাভা ঢালার জন্য হাতলবিশিষ্ট পাত্র। যা লোহার দণ্ডে চেপে ধরে গলিত ধাতু ঢালা হয় ধাঁচে। ঝলসানো মাংস পঁচেছে এখানে থেকে। আচ্ছ! এখানে কি কর্মচারীরা আসেনা? শুধু জয় আর হামজা আসে?

আন্দাজ করা যায় এখনও কক্ষের অর্ধেকটার বেশি বাকি। পুরোটা অন্ধকারে ছেঁয়ে আছে। অন্তূ সুইচ খোঁজে।

তার শরীর ঘেমে চুপচুপে হয়ে উঠেছে। হৃদযন্ত্রের ধরাস-ধরাস আওয়াজটা কঠিন অস্থিরতার জানান দিচ্ছে। অন্তূর দেয়াল ঘেঁষে বসতে চায়। পারেনা। পাশেই মানুষের ঝলসানো মাংস, হাড়, চুল, কাটা হাত, জাহান্নামের মতো আগুন জ্বলার চুল্লি পড়ে আছে, ফায়ার পাইপগুলো কালশিটে ধরা। মেটাল বার্নার মেশিন এখানে কেন, অন্তূ বুঝল না। বড় কোনো কারবারের গোডাউন হিসেবেও এটা ব্যবহৃত হয় হয়ত।অন্তূ চোখ

বুজে থাকে কিছুক্ষণ। নিস্তব্ধ চারপাশ, শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা নেই এই বদ্ধ ধাতব বেষ্টনীর মাঝে। দম ঘুটছিল খুব। আবারও আচমকাই অন্তূর মনে হলো, সে ছাড়াও আরও কেউ শ্বাস ফেলছে। কেউ নয়, কারা বুঝি। অনেকের শ্বাসের আওয়াজ। আঁটকে থাকা শ্বাসের আওয়াজ। কারা বোধহয় দেখছে ওকে। জ্বলজ্বলে চোখে। কিন্তু তাকে দেখে চুপটি করে আছে। শ্বাস আঁটকে তাকে লক্ষ্য করছে অনেক জোড়া চোখ। অন্তূর দেহটা নেতিয়ে পড়তে চায়।

আবার অস্ফূট স্বরে বাচ্চার কান্নার আওয়াজে অন্তূর শরীরটা ঝনঝন করে ওঠে। একবার

গলা চিড়ে আওয়াজ বেরিয়েই যেন থেমে গেল। কেউ বুঝি চুপ করালো! মুখ চেপে ধরে!

বিশাল এক গুমোট আলো-বাতাসহীন কক্ষ। টিমটিম করে হলদে আলো জ্বলছে। এই কান্নার আওয়াজ সে বহুবার শুনেছে হয়ত। রুমের বারান্দায় দাঁড়ালে মাঝেমধ্যে এই আওয়াজই কি কানে যেত? জয় তখনই ওকে ভেতরে ডেকেছে, যেকোনো বাহানায় থাকতে দেয়নি বারান্দায় আর।অন্তূ অন্ধকারে এগিয়ে যেতে যেতে প্রথমত একটা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা লোহার পেরেক পায়ের নগ্ন তালু ভেদ করে বিঁধল। কমপক্ষে এক ইঞ্চ। অন্তূর

মাথার চাঁদি ঘুরে ওঠে। তীক্ষ্ণ আর্তনাদে কুঁজো হয়ে পড়ে অন্তূ। দাঁতে দাঁত আঁটকে একটানে লোহাটা টেনে বের করে। গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসে। যেন ট্যাপের পানি ছাড়া হলো। আবার পা চালায়। বিভিন্ন সব যন্ত্রে অথবা কীসে পায়ের ত্বক ছিঁড়ে-ফেঁড়ে যায়। সে থামেনা। পুরো শরীরে বিঁষ ছড়ানো অস্থিরতা, যন্ত্রণা!অনেকটা এগিয়ে গিয়ে তিন-চারটা কাঠি একসাথে জ্বালায়। বেশ কিছুটা আগুনের বহরে সাদার সমরোহ চোখে ভেসে ওঠে। ঠিক বুঝে ওঠার আগেই কাঠির আগুন আঙুলে এসে লাগায় কাঠি ছেড়ে দেয় অন্তূ। এগিয়ে গিয়ে সুইচ দাবায়। আরেকটা হলদে

বাল্ব জ্বলে ওঠে। মৃদু আলো। সামান্য একাংশ আলোকিত হয় তাতে কেবল। সামনে এক সারি সাদা। অন্তূ চুপচাপ চেয়ে থাকে শুধু সামনের দিকে।

পালা ধরা মানুষ। তারা সব ছোট মানুষ। পাঁচ বছর থেকে শুরু করে বয়স সর্বোচ্চ বছর পনেরোর বেশি নয় একটারও বয়স। গায়ে সাদা পাঞ্জাবী সবগুলোর। মাথায় টুপি। পাঁচ-কলির, কওমি মাদ্রাসার টুপি পরা। জরা-জীর্ণ হয়ে আছে সবগুলো। অন্তূকে দেখেই তারা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠে আরও জড়িয়ে বসে। এখানেও বড়গুলো ছোট কয়েকজনের মুখ চেপে ধরে আছে। কাঁদতে দিচ্ছে না। চোখে-

মুখে কীসের ভয়। পিপাসা-ক্ষুধা, আতঙ্ক, কাতরতা। সে কী নিদারুণ অসহায়ত্ব। ছোট্ট ছোট্ট মানুষ ওরা। এই মৃত্যুপুরীতে কী করছে?তারা বিস্ফোরিত চোখে দেখে। রোজ যে নারীটি তাদের চব্বিশ ঘন্টায় একবার খাবার দিতে আসে, সে নয়। এ তো অন্যকেউ! কে এ? রাণী গোলাপি লম্বা কামিজের সাথে চওড়া একটা হালকা গোলাপি ওড়না জড়ানো শরীরে। হাতে দিয়াশলাই। ঘামে ভেজা মুখটা দেখে আন্দাজ করা যাচ্ছিল না ভেতরটা। অথচ চেহারাটা প্রথম দেখায় 'সুন্দরী, সুন্দরী' বলে ওঠার মতো। চোখদুটো গভীর, ঘন পাপড়ির অলস ঝাপটানিতে

আত্মবিশ্বাস, অল্প বিস্ময়, কিছুটা হতাশা! ওরা আরও জড়িয়ে বসে, আরও জড়োসরো হয়ে। ছোটগুলোর চোখের পানি শুকায়নি। অনবরতই কাঁদে ওরা। বড় যারা একটু, ছোটরা ওদের জাপটে ধরে বসে আছে। মুরগীর বাচ্চাগুলোর মতো ওদের পাখার নিচে আশ্রয় চায় বোধহয়।কবরখানার চেয়েও ভয়ানক এই অবরুদ্ধ কুটুরিতে, যে তিমির আঁধার, তাতে আঁটকে আছে এরা। কেউ কাউকে দেখেতেও পায়না বুঝি! দিনেও আলোও আসেনা সেখানে।

ছোট্ট এক পুঁচকে। মাথার এলোমেলো টুপিটা ঠিক করে কোনোমতো অন্তূকে বলে, “একটু

পানি দিবে? পানি...পিপাসা... আমি একটু পানি খাব...''

অন্তূর বুকের ভেতরটা এক মোচড়ে উলোট-পালোট হয়ে ওঠে। ধপ করে বসে পড়ে মেঝেতে। ওরা পানি চায়, ওরা পিপাসার্ত। ওরা ছোট্ট ছোট্ট মানুষ।পায়ের ব্যাণ্ডেজ দিকে তাকিয়ে থেকেও অন্তূ নিজের রুম, পা, ব্যাণ্ডেজ, আশপাশের কিছুই যেন দেখছিল না। চোখের সামনে পর্দা পড়েছে। আলো-আঁধারির ভিড়ে হলদে বাতির টিমটিমে আলোর পর্দা। রিমি জ্বর মেপে গেছে—১০৩° ফারেনহাইট। মাঝেমধ্যেই কাঁপুনি দিয়ে জ্বরের তোপ

বাড়ছে। চোখদুটোতে বিঁষের মতো জ্বালা ধরেছে।

সেসব গায়ে লাগছিল না অন্তূর। সে যেন অচেতন এখনও। কীভাবে রুমে এসেছে, তা ঠিকমতো মনে পড়ছে না। রিমি ধরে এনেছিল, এটুকু মনে আছে আবছা করে। ওরা পানি চাইছিল। অন্তূ তো পানি নিয়ে যায়নি! সে সামনে বসে পড়েছিল আস্তে করে। দেহটা থরথরিয়ে কাঁপছিল। ওদের চোখে-মুখের সেই কাতর-আতঙ্কিত চাহনি! অন্তূর শরীরটা নেতিয়ে পড়তে চায়। জিজ্ঞেস করতে জিহ্বা সরে না—তোমরা কারা? এখানে কেন?অনেকক্ষণ পর একটু ধাতস্থ

হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, “তোমরা কি মাদ্রাসায় পড়ো? হাফেজিয়া মাদ্রাসায়?”

একজন মাথা নাড়ে, সায় দেয়। অন্তূ আবার চুপ। সে এ বাড়িতে এসেছে মাস কয়েক হলো। প্রথমবার এদের কান্নার আওয়াজ পেয়েছিল বিয়ের পর জয় আমির যেদিন রাজধানী থেকে ফিরল, সেই শেষরাতে। এরপর বহুবার শুনেছে, এদিকে আসা-যাওয়াও দেখেছে ওদের। সেদিন এদের ধরে আনা হয়েছে। ঢাকা থেকে ফিরে। রাজধানী থেকে অর্ডার পেয়ে এসব করছে এরা?

-“তোমাদের কবে আনা হয়েছে এখানে?”

-"কয়েকদিন আগে।"অন্তূ ভাবে, তাহলে তখন কাদের কান্নার আওয়াজ অল্প-সল্প উপরতলায় যেত? এদের আগেও আরও আনা হয়েছিল? আজ প্রায় দু সপ্তাহ যাবৎ জয়-হামজার পায়ের সুঁতো ছিঁড়েছে। রাত-দিনের ঠিক নেই, ছুটছে ওরা। অন্তূ উঠে দাঁড়াতে চায়। পা টলছে, অসহ্য যন্ত্রণায় অসাড় হয়ে এসেছে পা-টা। শক্তি নেই চলার।

চুপচাপ বসে থাকে শ্বাস আঁটকে। বাচ্চাদের মুখে আতঙ্ক কমেছে। অন্তূ জিজ্ঞেস করে, "তোমরা কারা?"

বয়স পনেরোর মতো একটা ছেলে। দৃষ্টি অস্তমিত তবু দৃঢ় স্বরে জানায়, "শিবিরের

ছেলে আমরা।'' কথাটা বলতে পেরে যেন সে খুব গর্বিত।-“নাম কী তোমার?''

-“আব্দুল আহাদ।''

-“তুমি হাফেজ?''

-“হ্যাঁ।''

-“কয় পারার?''

-“কোরআন কয় পারা?''

অন্তূ চেয়ে দেখে আব্দুল আহাদের দিকে। প্রথম থেকে ওকে লক্ষ্য করছে অন্তূ। চোখে ভয় নেই আর সবার মতো। সে-ই যেন সবার জন্যই চিন্তিত। অন্তূ বলে, “ত্রিশ পারা।''

-“আমি সেই ত্রিশ পারা কোরআনের হাফেজ।''

-“তোমাদের কেন ধরে আনা হয়েছে, জানো?
”

-“জানব না কেন?”

-“কেন?”

-“ওরা ভয় পায় আমাদের।”

-“ওরা ভয় পায়? কীসের ভয়?” অন্তূ একটু অবাক হয়।-“আমরা বড় হলে একেকটা শিবিরের ছেলে হবো, ওদের বিরোধী দলের কর্মী ভারী হবে। কিন্তু আমাদের মারলে আমাদের আমিররা দূর্বল হয়ে পড়বে।”

-“তারা দূর্বল হচ্ছেনা?”

-“কারাগারে পুড়ে দেয়, ফাঁসি দিয়ে দেয়, গুম করে দেয়। ট্রাক ভরে তুলে নিয়ে যাইয়ে গুলি

করে মেরে র-ক্ত ধুয়ে ফেলে। দূর্বল হয়না আবার? এত কিছু করছে, কী-ই বা করতে পারছে?''

অন্তূ চুপ করে বসে থাকে। আব্দুল-আহাদের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে ভালো লাগছে তার। দাড়ি-গোফের রেখা দেখা দিয়েছে, তবু মুখটা কচি। সেই কচি মুখে এতসব ভারী কথা! ধর্মবিশ্বাসের শক্তি? সৃষ্টিকর্তার প্রণিত বাণী বুকে ধারণের শক্তি? অন্তূ ভাবে।সবাই তো ভালো হয়না। টুপি-দাড়ি পরা সবাই ভালো না, নামাজী সবাই ভালো না, হাফেজও সব ভালো না। কিন্তু বাকিগুলো? অন্যান্য দলের নেতাকর্মীদের মাঝে একশো-তে কয়টা

ভালো আছে? বর্বর, মূর্খ, অসভ্য, জানোয়ার একেকটা। কিন্তু এদের মাঝে যদি নব্বইজনকেও খারাপ ধরা হলো, বাকি দশটা? এরা কি দশজনও নৈতিকতা জানেনা? যত যুদ্ধাপরাধ, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ–সব এরা করে বেড়াচ্ছে? তার চেয়ে বড় কথা, যারা এখনও পাপ করেইনি, তাদের জান নিয়ে খেলাপাতি খেলার অধিকার কে দিলো স্বৈচারারদের? ওরা নাবালক শিশুরা কী পাপ করতে পারে? হাজারও মায়ের বুক খালি করে, ছোট ছোট মানুষগুলোর বুকের তাজা র-ক্ত মাটিতে মিশিয়ে দেশের অপরাধমুক্ত করে ফেলছে ওরা? তাহলে দেশে যা সব

ঘটছে তা এদের মরা-আত্মারা উঠে এসে করছে? বাকিরা বেহেশতের দূত! হবে তা-ই। পলাশরা কারা? রাজনরা কারা? এরাই যদি সব পাপের ভাগী এবং শাস্তির দাবীদার হয়? অন্তূ ভাবনা ছেড়ে উঠতে চায়। আব্দুল আহাদ চোখ নত করে রেখেছে। অন্তূ জিজ্ঞেস করে, "তুমি মরতে ভয় পাও না?"-"ভয় পেলে কি মরণ মাফ?"

অন্তূ এ কথার কী জবাব দেবে! জিজ্ঞেস করে, "এসব কে শিখিয়েছে তোমাদের?"

-"কে শেখায়? মাঝরাতে যখন অল্প সময়ের জন্য ঘুমাতে যাই, খবর আসে কারা যেন মাদ্রাসা ঘিরেছে, পালা পালা ধরে তুলে নিয়ে

যাচ্ছে। ওরাও তো মরবে। তার পরের পালা নাহয় আমাদের। ভয় করে লাভ কী?''

-"সবাইকে এখানেই আনা হয়েছিল?''

-"এরা ছাড়া আর কি লোক নাই? কতলোক ওদের।''

সহপাঠিদের চিৎকার আর অসহায়ত্ব এইটুকু মানুষগুলোর মাঝে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়েছে। এই আগুনে কি কোনো একদিন পুড়ে মরে যাবেনা দেশের ক্ষমতাধর স্বৈরাচার? মানুষের দীর্ঘশ্বাস, অবিচার, অধিকারহীনতা, রাহাজানি, হাহাকার— কতদিন?

অন্তূ উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পায়ের সমস্ত স্নায়ু যেন একসাথে তীব্র উদ্দীপনায় ফেটে পড়েছিল। এখনও চুইয়ে চুইয়ে রক্ত পড়ছে। আব্দুল আহাদ এগিয়ে আসে। অন্তূ চমকায়।-"দেখি, পা দেখি।"

অন্তূ তাকায় আব্দুল আহাদের মুখে দিকে। চোখের দৃষ্টি নত, মুখটা গম্ভীর। তার জুব্বার প্রান্ত ছেঁড়া, ঝুলছিল। তা টান দিয়ে ছিঁড়ে নিয়ে অন্তূর পায়ে বেঁধে দেয়। অন্তূ পায়ে হাত দেয়া থেকে বাঁধা দিলে বলে, "আমি তো ছোট আপনার। কিছু হবেনা। বেঁধে দিই। রক্ত পড়ছে।"

বাঁধা শেষ হলে বলল, "এই অসময়ে কেন এসেছেন জানিনা। আপনি কে তাও জানিনা। ও একটু পানি খেতে চাচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে। পানি আনেন নি?"

অন্তূর বুকে শূল বিঁধল বোধহয়। 'পানি আনেন নি?' বাক্যটা ফলার মতো বেঁধে বুকে। অন্তূ ঝারা মেরে উঠে পড়ে। আব্দুল আহাদ ওকে ধরতে হাত বাড়িয়েও গুটিয়ে নেয়। অন্তূ নিজে চেপে ধরে ওর হাতটা, ওর হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "ছোটভাই তো তুমি আমার। হাত ধরলে কী?"মলিন হেসে বেরিয়ে আসে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বড়ঘর পার হতেই

অন্তূর দম বেরিয়ে যাচ্ছিল। পা দুটো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

অন্তূ যখন দোতলায় ফিরে বড় বড় জগ ভরে পানি নিচ্ছিল, রিমি হায় হায় করতে এগিয়ে আসে, "কী করছেন, আরমিণ? পাগল হয়ে গেছেন? ওদের একবেলার বেশি পানি বা খাবার দেবার হুকুম নেই।"

-"কার হুকুম নেই? আপনার নরকের দেবতা, স্বামীদেবের? তা না-ই থাকতে পারে, আপনিও পতিভক্তা নেউটা মেয়ে হতে পারেন। কিন্তু জানেন তো, আমি খুব পাপীষ্ঠা, আর স্বামীর অবাধ্য, অভিশপ্তা একজন স্ত্রী। আমার এসব মানার কথা নয়।"

-“আপনি বুঝতে পারছেন না। প্লিজ...”-“এ বিষয়ে আর কিছু শুনতে চাই না। যদি আজ বাঁধা দেন, তো সুযোগ পেলে আপনাকেও ছাড়ব না। আর আমার বিশ্বাস, সুযোগ আমি পাবোই।”

অন্তূকে তখন ঠিক মন্ত্রমুগ্ধের মতো লাগছিল, যেন তাকে বশ করা হয়েছে। জয় একগাদা বিস্কুট, কেক ইত্যাদি খাবার-দাবার এনে রাখে ঘরে। অন্তূ সেইসব এবং পানি ও টর্চ নিয়ে খুঁড়িয়ে নিচতলায় পৌঁছায়।

ওরা খেতে চায়না, শুধু ওদের পানি চাই। বুক চৌচির পিপাসায়। অন্তূ খাওয়ায় ওদের। ওদের হাত বাঁধা নেই। তবু সম্ভব নয় ঘুটঘুটে

অন্ধকারে উঠে এসে সুইচ খুঁজে বাতি জ্বালায়। অন্তূ বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসে। পায়ের ব্যথায় মাথা ফাঁকা হয়ে আসছিল। বড়ঘরের বাইরে বিস্তৃত ফ্ল্যাট। নোনা ধরেছে ইটের গায়ে। কোথাও খানিক আলোর দিশা নেই। খসখসে ঢালাই মেঝে হল-গ্রাউন্ডটাতে। তাতে পায়ের চামড়া খসে আসছিল যেন। এক পা ফেলতে পারছিল না। যেদিকে তাকায়, অন্ধকারের সমুদ্র ঢেউ খেলছে। রাত শেষের দিকে। দুর্গের মতো দরজা-জানলাবিহীন কুটুরি। টর্চের আলো সামনের দিকে সরু হয়ে পড়ছিল, তাতে আরও গা ছমছম করা পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

কারও পায়ের শব্দ পায় অন্তূ। থমকে দাঁড়ায়। তার পেছনে কেউ হাঁটছে। তার সাথে পা মিলিয়ে। চোখ বুজে শরীরের শিরশিরানি অনুভব করল। পেছন ফিরে তাকানোর সাহস হয়না। কেউ খুব কাছে আসছে, এগিয়ে এসে দাঁড়াচ্ছে। এরপর ফিসফিস করে অন্তূকে বলে, "আপা। আমি, আব্দুল আহাদ। ভয় পাবেন না।"

অন্তূ আব্দুল আহাদের হাতটা চেপে ধরে শ্বাস ছাড়ে। বলে, "তোমাদের কোন পথ দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল?"-"তাতে কী?"

-"শুনি।"

-“চোখে পটি বাঁধা ছিল। মুখে কাপড় গোঁজা ছিল। গভীর রাতে আনা হয়েছিল এটুকু আন্দাজ আছে। আপনি এখানে কেন আসছেন আজ বারবার?”

-“তোমার খারাপ লাগছে?”

গম্ভীর হয়ে রইল আব্দুল আহাদ, জবাব দিলো না। দুজন মিলে ঘুরে ঘুরে দেখে পুরো ফ্লোরটা। এক কক্ষে সারি সারি মদের বোতল সাজানো কেসে ভরা। উটকো গন্ধে নিঃশ্বাস নেয়া দায়। একটুও পা দেবার জায়গা নেই মেঝের কোথাও। আব্দুল আহাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও ভৌতিক ঠেকছিল নিস্তব্ধ বদ্ধতায় অন্তূর কাছে।

এত মদ! এগুলো পলাশের হোটেলের মনোরঞ্জনের মাল, এখানে রাখা আছে। টর্চের আলো সরু হয়ে পড়ে। সেভাবেই অন্তূ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঘরটা দেখে ফিরে আসতে উদ্যত হয়ে আবার ঘুরে তাকায় চট করে। আব্দুল আহাদ শুধায়, “কী?”অন্তূ মেঝেতে রাস্তা খোঁজে। মদের বোতলের কেইসগুলো গিজগিজ করছে। ঘরের পশ্চিম কোণায় দরজা একটা। লোহার দরজা। অন্তূ নিঃশব্দে কেইস সরাতে চায়। ঠুকঠাক শব্দ তবু হচ্ছিল। অন্তূ আব্দুল আহাদকে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজে এগিয়ে যায়। লোহার ভারি দরজা চাপানো। অন্তূ তা খুলে ফেলে আস্তে করে।

ঠিক যেন বেকারীর কারখানার মতো। অস্তমিয সূর্যের মতো জ্বলজ্বল করছে ভেতরটা। কড়া পাওয়ারের হলদে লাইট। অন্ধকারে লাইটের আলোতে গুমটে মারা অবরুদ্ধ ঘরটাকে দেখে অন্তূর আনন্দই হলো। সে জীবিত চোখে নরক দেখে নিলো। বেকারী কারখানার তুন্দুরিগুলো যেমন আগ্নেয়গিরির লাভার মতো জ্বলে, ঠিক তেমন তিমির অন্ধকারে হলদে আলো সেরকম পরিবেশ তৈরি করেছে। সেখানে মহিলাদের এক ঝাঁক নজরে আসছে।তারা অবাক হয়ে অন্তূকে দেখে। শুয়ে, বসে, হেলান দিয়ে আছে তারা, একে অপরের গায়ে ঢলে পড়ে বসে আছে

তারা। তাদের সবার শরীরে এক টুকরো করে সাদা কাপড়। যেমনটা মেয়েরা গোসল করে তোয়ালে জড়ায় শরীরে, ঠিক সেভাবে দেহের উপরিভাগ ঢেকে রেখেছে যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও। এরাও পলাশের হোটেলের মাল সবগুলো।

অন্তূ শরীরটার ঝিনঝিন করে ঝাঁকি মেরে ওঠে। ভাগ্যিস আব্দুল আহাদ আসেনি, সে দেখতো এই নারকীয় পরিবেশ! অন্তূ বাকহারা হয়ে চেয়ে থাকে। সে টেরই পেয়েছিল না—ওই বাচ্চাগুলো ছাড়াও এই বদ্ধ কুটুরিতে আরও প্রাণের অস্তিত্ব আছে।অন্তূ বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবার চেষ্টা করে—এইসব

লেওয়াজের কারণেই কি পলাশ ও হামজা-জয় একে অপরের দলকে এত সমীহ করে চলে? গাঢ় কারবার-বন্ধন। এজন্য যত যা-ই হোক, যেমন আগুনই দপ দপ করে জ্বলে উঠুক, মোটেই তারা একে অপরের দলকে হিট করেনা! সন্ত্রাসবাদ, রাজনীতিবিদ, স্বৈচারার, নরহত্যাকারীরা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে চারদিকে। দাউদাউ করে জ্বলছে নরকের আগুন, সেই আগুনের আঁচ জনতাদের সবার গায়ে সবসময় না লাগলেও লেগে যায় কদাচিৎ।

অন্তূ জ্বরের ঘোরে বেশি ভাবতে পারেনা। অবচেতনায় লুপ্তপ্রায় হয়ে পড়ে থাকে।জয়

এলো রাত বারোটার দিকে। তার চোখ-মুখ ক্লান্ত হলেও কীসের এক খুশির রেখা ঝকমক করছে। পরনে সিলভার রঙা ডেনিম, হাইবুটের সাথে গটগট শব্দ তুলে রুমে ঢুকল। এত অভিজাত ভদ্রলোকের মতো লাগেনি কখনও। খোচা খোচা দাড়ি অল্প বেড়েছে, ফ্রেঞ্চকাট চুলে খুব অসভ্য-ভদ্রলোকের মতো দেখায় তাকে।

রুমে ঢুকে প্রথমে অন্তূর দিকে তাকায়। ভ্রু কুঁচকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলে, "আমার একদিনের বিরহ বইতে পারোনি? জ্বর বাঁধিয়ে বসে আছো? তোমার আমার প্রেম আমি আজও বুঝিনি..." সুর করে গাইল শেষটুকু।

কথা শেষ না করতেই যখন অন্তূর পায়ের দিকে চোখ গেল। এত জোরে ঘর কাঁপিয়ে হেসে ওঠে হো হো করে, অন্তূ চোখ খুলে তাকাল। হাসির তোরে নুইয়ে পড়তে চায় জয়। পুরুষ মানুষ হাসলে গলাটা দারাজ হয়ে ওঠে কেমন। প্যান্ট ছেড়ে লুঙ্গি পরতে পরতে বলে, "আমাকে কি তোমরা নিজের ওপর থেকে কনফিডেন্স কমাতে দেবে না, হ্যাঁ? শালা যা ভাববো তা হয়ে বসে থাকে, যা আন্দাজ করি, তা আলবাৎ ঘটে যায়, খালি ভাবার দরকার, মিস নাই।"

সাদা লুঙ্গিটা পরে জ্যাকেটটা খুলে ছুঁড়ে উড়িয়ে দিলো।প্রচুর গরম লাগছে। দরজাটা

লক করে এসি অন করে অন্তূর সামনে এসে মেঝেতে উবু হয়ে বসে হাঁটু ভাঁজ করে। কপালে ও গলায় হাত রেখে আস্তে করে বলে, “তোহ ঘরওয়ালি! অনুভূতি কেমন নিষিদ্ধ জায়গায় পা রেখে?”

অন্তূ চোখ খোলেনা। জয় মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, অগোছালো চুলগুলো হাতের ছোঁয়ায় গুছিয়ে দেয় আলগোছে। এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে নিচু আওয়াজে জিজ্ঞেস করে, “এত জ্বর বাঁধালে কী করে? ওষুধ খেয়েছ?”

অন্তূর চোখের কোণা দিয়ে পানি পড়ছিল। চোখ জ্বলছে, জ্বর এলে চোখ দিয়ে পানি

পড়ে। জয় তা আঙুলের ডগায় মুছে সেই পানিটুকু মনোযোগ সহকারে দেখতে দেখতে বলল, “পা কেটেছে কীসে? ইস্পাত খণ্ডে? কতখানি কেটেছে?”-“ওদের কেন ধরে এনেছেন?” তিরতির করে কাঁপছে অন্তূর কণ্ঠস্বর।

জয় উঠে বাথরুমে গিয়ে বালতি ভরা পানি ও মগ এনে মেঝেতে রাখে। অন্তূকে পাঁজাকোলে কোরে তুলে বিছানার একপাশ থেকে অপর পাশে নিয়ে যায়। হাঁটার সময় আবার নিজের বুকের দিকে তাকিয়ে দেখে অন্তূর মুখটা তার বুকে গোঁজা। মুচকি হাসে আনমনে। খুব সুখ সুখ লাগছে। হাজারো পাপের মাঝে কখনও-

সখনও পাপকে অবহেলা করতে সে গান গায়, গিটার বাজায় আরও কত কী করে! আজাকাল সেসব বাদ দিয়ে অন্তূকে জ্বালায়। আড়াআড়ি শুইয়ে দিয়ে মাথায় পানি ঢালতে ঢালতে জিজ্ঞেস করে, “ডাক্তার আনব?”

-“এসেছিল।”

-“কী বলেছে? ওষুধ দেয় নাই?”

-“দিয়েছে।”

-“খাওনি কেন?”অনেকক্ষণ ধরে পানি ঢালল জয়। জ্বর খানিক নামলো কিনা বোঝা গেল না। তবে কপাল ও মাথাটা ঠান্ডা হলো। জয় লুঙ্গির ওপর গলায় এক লাল টকটকে গামছা ঝুলিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। কী সব

হোটেলের খাবার কিনে আনে। অন্তূকে খাওয়াতে চায়। সেই রুচি বা মানসিকতা নেই অন্তূর। জোর করে ওষুধ খাওয়ায়। সাথে একটা ছোট্ট স্লিপিং ড্রাগও। সারারাত অচেতন ঘুমালো অন্তূ। তার হুশ নেই।

জয় চেয়ার টেনে নিয়ে বিছানার পাশে বসে চেয়ে থাকে অন্তূর দিকে ঘন্টার পর ঘন্টা। কিউব মেলায় আনমনে। বিশাল ট্রমায় পড়ে গেছে মেয়েটা। তেজী মুখখানা একদম কুঁচকে গেছে।শেষরাতের দিকে নিচতলার বড়ঘরে যায় একবার। সব ঠিকঠাক। খালি পানির জগ ভরে রেখে গেছে বাচ্চাগুলোর সামনে। জয় হাসল তা দেখে। বাচ্চারা ভয় পায় জয়কে

দেখে। সেখান থেকে বেরিয়ে যখন মদের ঘরে গেল, মাথাটা গরম হলো। সব এলোমেলো করে সাজানো। অন্তূ অতসব বোঝেনি। মদের কেস সাজানো হয়েছে এখানে ক্রম অনুসারে। সে তো চেনেনা। হুইস্কি, রাম, জিন, বিয়ার, ওয়াইন, ভোদকা ইত্যাদি মাফিক সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। মহিলাদের ঘরে ঢুকবার পথ পেছন দিকে। ওই রাস্তা দিয়ে বাগানের রাস্তা চলে গেছে লোহার ফটক পেরিয়ে। এদিক দিয়ে ঢুকেতে হয় ওই কক্ষে। অন্তূ জানেনা।

মহিলাদের কামরায় আওয়াজ যেতেই ওরা থরথর করে কেঁপে ওঠে। ঢালাই মেঝেতে

চামড়ার স্যান্ডেলের আওয়াজ, সাথে খোলা বেল্ট ঘেঁষে আসছে। এই আওয়াজ চেনে তারা। জয় আমির সাদা লুঙ্গির কুচি উঁচিয়ে ধরে এগিয়ে আসছে। লোকটা কিচ্ছু বলবেনা, তাকাবেও না। তবু জয়কে ওদের চরম ভয়। ঘেন্না করে ভীষণ, ঠিক ডাস্টবিনে, আবর্জনার মতো।মানুষ হয়ত ড্রেনের পানিকেও অতটা ঘেন্না করেনা, যতটা ঘেন্না জয় ওদের করে। ওরা সব একসাথে জড়োসরো হয়ে দাঁড়ায়। জয় নাক কুঁচকে দেখে চারদিকটা। একটাবারও ওদের অর্ধবস্ত্রে অনাবৃত দেহটার দিকে তাকাল না। তার রুচি ভালো। যারা শরীর ঢেকেঢুকে রাখে, সম্মানবোধ আছে,

তাদের প্রতি তার আগ্রহ আসে। যারা খুলেই রেখেছে, তাদের আবার দেখার কী আছে? সস্তা দেহ, সস্তা মেয়েলোক। এইসব ধারণায় বিশ্বাসী জয় আমির পলাশের কাছে দারুণ খাতিরের লোক।মাঝেমধ্যেই হোটেলরুমে জয়কে মেয়ে নিয়ে ঢুকতে দেখে অভ্যস্ত মেয়েরা। অথচ শখ মিটলেই কুকুরের মতো দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবার এই নোংরা স্বভাবের জন্য ওর কাছে কোনো মেয়ে যেতে চাইতো না। বিয়ের পর ধীরে ধীরে যাওয়া বন্ধ তার। তার রেস্ট্রিকশন বহুত। প্রথমত কড়া নিষেধ হলো, তাকে কোনোভাবেই চুমু খাওয়া যাবেনা। এছাড়াও জড়িয়ে ধরা যাবেনা,

গা ঘেঁষা যাবেনা, নির্লজ্জের মতো অঙ্গভঙ্গি দেখানো যাবেনা। মেয়েলোকের বেহায়াপনা আর ঢঙে জয়ের গা জ্বলুনি রোগ আছে। সে নিজে যা করবে, সেটুকুই।এই নিয়ে পলাশ খুব হাসিমজা করতো। একবার একটা মেয়ে জয়কে খুশি করার লক্ষ্যে অথবা টাকা হালাল করার উদ্দেশ্যে বোধহয় ওকে জাপটে ধরে চুমু খেয়েছিল। এক থাপ্পড়ে কান দিয়ে রক্ত বের করে রুম থেকে বের করে দেবার রেকর্ড আছে জয়ের। এসবে হোটেলে ভীষণ হাসাহাসিও লেগে যেত। মেয়েরা জয়কে ভীষণ ভয় পায়। যারা একটু লজ্জা পায়,

সংকোচ থাকে ভেতরে, নতুন আসে, তাদের দেয়া হতো জয়ের সাথে।

অন্যদিকে তাকিয়ে জয় জিজ্ঞেস করল, "কেউ এসেছিল তোদের কাছে?"

-"এক মাগী আইছিল কেডা জানি..... দেইখা গেল আমারে সকলরে.."

আর রেহাই হলো না। জয় ক্ষিপ্র গতিতে এগিয়ে গিয়ে কণ্ঠনালিটা চিপে ধরল দুই আঙুলে, "আমার বউ সে। তোদের মতো স্লাট না। বল কে ছিল, বল বল বল... আমার বউ ওটা। কথা বল, শালী খা-ন-কির চেংরী। বল কে ছিল যেন? স্পিক আপ—""আপনার পত্নী।

’ কথাটা উচ্চারণ করতে গিয়ে গালে রক্ত উঠে যাবার উপক্রম হলো মেয়েটার।

সেখান থেকে বেরিয়ে এসে মদের কেসগুলো ফের সাজালো। দুটো রামের বোতল নিলো নিজের জন্য। আগামীকাল মদ ও মহিলাগুলো পৌঁছে যাবে পলাশের বাপের হোটেলে, রাজধানীতে। বড়ঘর পেরিয়ে আসার সময় পানির জগগুলো নিয়ে এলো। হামজা দেখলে পাছে রেগে যাবে। জয়কে দূর্বল ভাববে, বউয়ের খাতিরে দূর্বলতা প্রকাশ করতে নেই। বউকে লাই দেয়া পুরুষের জন্য খুব একটা ভালো কথা না।

অন্তূ তখনও ঘুমাচ্ছে। খানিক বাদে ফজরের আজান হবে। খুব গরম লাগছিল বড়ঘর থেকে ফেরার পর। হাতমুখ ধুয়ে ডাইনিং টেবিলের কাছে যেতেই দেখল, তরু খাবার বাড়ছে। মেয়েটার অভ্যাস কাটেনি, অথচ কথা বলেনা। জয় নিঃশব্দে খাবারটা নিলো। ভাত একটু কমিয়ে রাখল। খিদে নেই খুব একটা। তরুকেও কিছু বলল না। তাকে সকলেই ঘেন্না করে, তরু খালি করতো না, এখন সেও করে। তাকে ঘেন্না করা এক প্রকার বিধান। মেয়েটা বিধান লঙ্ঘনে ছিল, এতদিনে লাইনে এসেছে। চুপচাপ চলে এলো ঘরে। আজ মনটা ভার লাগছে খুব।অল্প খাবারের মাঝেও

পুরোটা খেতে পারল না। বমি আসছে। ঘুম নেই চোখে। বোতল খুলে নিয়ে বসল। শরীরটা ঝিমিয়ে আসছে। লুঙ্গি গুটিয়ে চেয়ারের ওপর গা-হাত-পা ছড়িয়ে বসে তাকিয়ে থাকল অন্তূর ঘুমন্ত মুখটার দিকে। নেশা হয়, অথচ মাতাল হয়না সে। মদও ভালো লাগছে না। জীবনটা ঘনিয়ে আসছে, বেশিদিন নেই। তাতে খুশি খুশি লাগে আবার দুঃখ ঘিরে ধরে।আরমিণ যা করছে, তা ঠিক। অন্তূর চরিত্র এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনার সাথে খুব যায়। তবু সাবধানতার মার নেই। জেদ বেশি মেয়েটার। জয় তাকিয়েই রইল। চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করেনা। মুচকি হাসে সে। তার

বহুত বৃদ্ধা ভক্ত আছে। তারা থুতনি ধরে জয়কে কমবার বলেনি, “বউখান তোর সুন্দরী হইবো লো ছেঁড়া।”

মিথ্যা বলেনি। বউ তার চরম সুন্দরী, সাথে চরিত্রের বৈশিষ্ট্যও কাড়াক! ফর্সা মুখের নিচে থুতনি থেকে গলা ছড়িয়ে অন্তূর বুকের জায়গাতে মাতাল হাওয়া লাগল জয়ের গায়ে, যা সে মদে পাচ্ছিল না।ইচ্ছে করল বিছানায় গিয়ে কাছে টেনে নিয়ে শুয়ে পড়তে। গেল না। জাগ্রত থাকলে তো কাছে যাওয়া পছন্দ না তার বউয়ের। মাঝেমধ্যেই যখন রাতে ওকে কাছে পেতে ইচ্ছে করেছে, জোর করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত হার মানলেও তা

হতো ধর্মের দোহাই দিয়ে। স্বামী নারাজ হলেই লানত, এইসব দোহাই! অচেতন অবস্থায় কাছে যাওয়াটা সুযোগ নেয়া হয়। জয়ের সে অভ্যাস নেই। সে মানুষের সামনে ছিনিয়ে নেয় অথবা জিতে নেয়।সকাল নয়টার দিকে ঘুম ভাঙে অন্তূর। এ বাড়িতে অভিভাবক একমাত্র হামজা। বাড়ির বড়ও সে-ই। তার কত কাজ! সকালে উঠে কোথাও গেছে হালকা কিছু খেয়ে।

রিমি ও তরু রান্না-বান্না করে। অন্তূর জ্বর কম তখন। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। উঠে দাঁড়াতেই চারদিকটা ঘুরে উঠল। মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল বিছানায় বসে।

মেঝের ওপর পড়ে আছে জয়। হু হু করে এসির বাতাস ঘুরছে বন্ধ ঘরে। মদের বোতলটা পড়ে আছে জয়ের মাথার কাছে। তরল গড়িয়ে পড়েছে মেঝেতে।

সেদিন একবার রাতে খানিক সময়ের জন্য বেলকনিতে বসেছিল জয়। অন্তূর কাছে এক গ্লাস ঠান্ডা পানি চেয়েছিল। অন্তূ দেয়নি। তরুকে দিয়ে পাঠিয়ে পরে যখন রুমে এলো, তখন জয় বলল, "তোমার বাড়ির লোকেরা কোথায় গেছে?"-"জানিয়ে যায়নি।"

এ নিয়ে জয় আর কথা বাড়ায়নি অবশ্য। অন্তূ ঘরে দু একটা কাজ করে বেলকনির পর্দা ধরে দাঁড়ায়। জয় একমনে সিগারেটের ধোঁয়া

গিলছে বসে। অন্তূ জিজ্ঞেস করল,
“আপনাদের ও বাড়িতে কেউ থাকেনা?”
-“একজন কেয়ার-টেকার আর তার বউ থাকে।”
-“আপনি এখানে কেন থাকেন?”
-“অভ্যাস। ছোটবেলা থেকে আছি, আর যেতে চাইলেও হামজা ভাই ছাড়বে না।”
-“কবে এসেছেন এ বাড়িতে?”
-“আমি তখন ছোট, দশ-এগারো বছর বয়সী হবো। সেই থেকে আছি এখানে। এটাই আমার ঠিকানা। ও বাড়ির মালিকানাও পেয়েছি বড় হয়ে। কেন জিজ্ঞেস করছ?”

অন্তূ চুপ রইল। জয় চোখ তুলে তাকিয়েছিল, “কেন? যাবে তুমি?”-“না।”

-“যেতে চাইলে বলবে। নিয়ে যাব। তোমারও হক আছে শ্বশুরবাড়ি যাবার। এখানে থাকতে সমস্যা হচ্ছে কোনো?”

-“এমন ভাব করছেন কেন, যেন আমি বললেই সব কবুল?”

বদমাশের মতো হাসল জয়, “তা কিছু বিষয় তা-ই। যেতে ইচ্ছে করলে বোলো। ঘুরিয়ে আনব। শ্বশুরবাড়ি দেখলে না এখন অবধি।”

অন্তূ মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল। জয় বলল, “নামাজ পড়বে নাকি তুমি?”

-“কেন? খিদে পেয়েছে?” স্পষ্ট ঘৃণা আল তাচ্ছিল্য ফুটে ওঠে অন্তূর মুখে।
এতক্ষণের শান্ত জয় ধপ করে জ্বলে উঠল, “তোমার খোঁজ আমি শুধু খিদে পেলেই নিই? ”

-“তা নয়? তাই তো জানি আমি।”
জয় উঠে দাঁড়াল, “কথাটা কোন লাইনে যাচ্ছে বুঝতে পারছো? স্বামী আমি তোমার।” কথাটা বলতে বোধহয় একটু বাঁধল জয়ের। এইসব কথা ভদ্র পুরুষদের জন্য, সে তো তেমন না।-“তাই নাকি? আপনি তা মানেন?”
-“মানামানি পরে, আগে জানার কথা হোক। পুরা জেলা জানে, আমজাদ মাস্টারের

মেয়েকে বিয়ে করেছি আমি। জয় আমিরের বউ সে।”

-“আমিও কি তা-ই জানি?”

-“কথাটার লাইন ধর্ষণের দিকে নিতে চাচ্ছ, ঠিক বলেছি?”

-“ভুল বলার অভ্যাস নেই আপনার। ঠিক ধরেছেন।”

-“হ রে শালী। আমারই উচিত হয়নি তোকে এত ভালোভাবে বিয়ে করে ঘরে তোলা। বিয়ের আগে খালি বদনাম করেছি, বাস্তবে তো ভেতর ফাঁপা। ছুঁইওনি। কামডা ঠিক করি নাই। কোনো একদিন ধরে রেইপ-টেইপ করে তারপর বিয়ে করলে.....কিন্তু রেইপ

বিষয়টাতে এক প্রকার ফোবিয়া আছে আমার। নয়ত রোজ চাকরের মতো ট্রিট করলে তবে তোর আজকের কথা সহ্য হতো। বদনাম খারাপ লাগেনা আমার, কিন্তু অপবাদ ভালো লাগেনা। সর সামনে থেকে।''-“রেইপ বিষয়টাতে ফোবিয়া আছে?'' অন্তূ উপহাস করে।

গম্ভীর হলো জয়, “হু।'' লম্বা করে সিগারেটে টান দিয়ে হেসে ফেলল চট করে, “বিশ্বাস হচ্ছে না, না? খুব বেশি জবরদস্তি করি বলে মনে হয় তোমার তাই তো? সেটা রেইপ? বউকে? হাহহাআহ! তোমার আমাকে সহ্য হয়না, সেক্ষেত্রে আমার নরমাল টাচ-ও ব্যাড-

টাচ মনেহয়। এটাকে রিলেটিভিটি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।"

আজ এসব ভাবনায় আসতেই ইচ্ছে করল, বোতলটা তুলে জয়ের মাথায় আঘাত করতে। কিন্তু করা যাবেনা। প্রশ্ন অনেক, তা সব জয়ের কাছে। আবার ভাবে, সে এসবের মাঝে নিজেকে জড়াচ্ছে কেন? এসব ছেড়ে দূরে কোথাও চলে গেলে হয়না? পরক্ষণে মনে পড়ে, তার ভবিষ্যত পেশা এসব নিয়েই তো! সে একজন ভবিষ্যত আইনজীবী। ঝামেলাকে তার রক্তকণিকার মতো রন্ধ্রে বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে চিরকাল।

অন্তূ কীসের এক শক্তিতে যেন জ্বলে উঠল, উঠে দাঁড়াল। এতক্ষণ মনটা গুমটে মেরে ছিল, কারণ বোঝা যাচ্ছিল না। এবার স্পষ্ট হলো। তাকে তো বড়ঘরে যেতে হবে। বাচ্চারা কী করছে? সরিয়ে নেয়নি তো আবার? শরীরটা ছটফট করে উঠল উত্তেজনায়। বাচ্চারা খেয়েছে?লম্বা বারান্দার কাছে রিমি জাপটে ধরে, "আপনি যাবেন না। মেয়র সাহেব এখনও বাড়িতে। ওয়ার্কশপেই আছে। জয় ভাইয়া ঘরে। আমাকে বিশ্বাসঘাতক বানাবেন না। আমি আপনাকে গোপনে সাহায্য করতে চেয়েছি। সেই ওয়াদা ভুলে যাচ্ছেন আপনি, আরমিণ!"

অন্তূ ঘরে ফিরে চুপ করে বসে থাকে। সাড়ে নয়টার পর জয়ের ঘুম ভাঙল। বাইরে কাজ থাকলে তাকে ডাকতে হয়না কখনও, সময়মতো ঠিক ঘুম ভেঙে যায়। তাকে একবার কার্যালয়ে যেতে হবে। মিটিং আছে। অন্তূকে দেখে হাসল, "ফিলিং বেটার, ঘরওয়ালি?"

অন্তূ নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল শুধু। জয় হাত-মুখ ধুয়ে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পোশাক পরতে পরতে অন্তূকে বলে, "ভার্সিটিতে যাবে আজ আমার সাথে?"

অন্তূর মনটা নেচে উঠল। তা লুকিয়ে আস্তে করে বলল, "শর্ত কী?"-"শর্ত?" হো হো করে

হেসে ওঠে জয়, "যা চাই দেবে? তো দাও, একটা চুমুই দাও নাহয়। ঠোঁটে না দিলেও চলবে, প্রথমেই অভার-ডোজ হয়ে যাবে তোমার। গালেই দাও। নো চিন্তা। চুমুগতভাবে কিন্তু জয় আমিরের গোটা শরীরটাই ভার্জিন। ওয়ান্না কিস মি? গাল এগিয়ে দেব?"

অন্তূ কথা ঘোরায়, "সবসময় নিজের নাম জপার কী আছে? জয় আমির, জয় আমির!"

জয় হাসল, "আমার নাম জয়, উপাধি আমির। ইজ ইক্যুয়্যাল টু— জয় ইবনে জাভেদ আমির।"

-“‘আমির’ কিন্তু জামায়াতের প্রধান প্রতিনিধিদেরও বলা হয়! শুনেছি আপনি যুদ্ধাপরাধীর ছেলে! আপনার পরিবার শিবিরের কর্মী ছিল?’’জয়ের মুখটা দগ্ধ হয়ে উঠল। ঠিক যেমন খড়ের গাদায় জলন্ত মশাল পড়লে আগুন জ্বলে ওঠে, সেটাও ছাইচাপা, নীলচে আগুন। তা খেয়াল করল অন্তূ আয়নায়। জয়ের দৃষ্টিতে খু-ন চেপেছে। দাঁতের মাড়ি পিষে বলল, “আমির আমার বাপ-দাদাদের বংশ উপাধি। পদবীর হিসেব আসছে কেন? বেশি বোঝা শিখেছ? খুব বেশি, হ্যাঁ? জামায়াত শিবির?’’ পেছন ফিরল তো চোখে যেন ফুটন্ত আগুন, “আর একবার

তোকে বড়ঘরে যেতে দেখলে কেটে টুকরো করে ফেলব, শালীর মেয়ে। আর বাচ্চাগুলোকে লোহার চুল্লিতে গলিয়ে তোর দলাদলী বের করব। পরবর্তিতে মাফ পাবিনা, সে তুই যে-ই হ।''

অন্তূ কিচ্ছু বলল না। তার ভার্সিটি যাবার চান্স মিস করা যাবেনা, কোনোভাবেই না। থার্ড ইয়ারের ক্লাস শুরু হয়েছে সেই কবে! ভার্সিটিতে তারা দুজন পা রাখতেই বোধহয় উৎসব শুরু হয়ে গেল। কত কত দিন পরে যেন অন্তূ আবার চিরচেনা এই শিক্ষাপ্রাঙ্গনে পা রেখেছে। খুশি ও বিষাদ একসাথে চাপলে কেমন অদ্ভূত অনুভূতি হয়। সকলে হাঁ করে

দেখছে, হাসছে, ইশারায় বোঝাচ্ছে, খুব মানিয়েছে। আসলেই মানিয়েছে। জয়ের উচ্চতার সাথে অন্তূর কাধ মিলেছে। খানিক চাপা শ্যামলা জয় আমিরের ফর্সা বউ, ভালো মানায় বাহ্যিকভাবে দুজনকে।

কত শুভেচ্ছা যে পেল ওরা। অন্তূ খালি দেখল, বাঙালি তেল মারতে কত দক্ষ! জয় কোনো দেবদূত—সবার অভিব্যক্তি তা-ই বলছে। সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়ই এদের ডিএনএ-তে এক্সট্রা কিছু তেল জমা করে দেয়! যাতে সমাজের নোংরা লোকদের বিরুদ্ধাচারণ না করে বরং সেঁধে সেঁধে তেল মারতে পারে! অন্তূ তা পারলে আজ সে কিছুই হারাতো না।

আফশোস! সে পারেনা।সবাই এসে হাত মেলাচ্ছে জয়ের সাথে, জয়ের একটু হাতের ছোঁয়া পেতে কত উদগ্রীব তারা। অন্তূর মনে হলো, জয় যেন আরও ক্ষমতাসীন হয়ে উঠেছে দেশের এই হাঙ্গামায়। তা-ই তো হবার কথা! মজলুমরা যত এদের জুলুমের শিকার হয়ে দূর্বল হয়ে পড়বে, এরা অপেক্ষাকৃত তত দাপটে দেশ ঝলসাতে অগ্রসর হবে। এটাই তো আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার সূত্র! ল অফ রিলেটিভিটি! জয় এই সূত্রটায় চরম বিশ্বাসী।

অন্তূর এই দেশের কুকুরসম জনতার প্রতি আক্রোশ জন্মালো। এরা কুকুরের চেয়েও

ভালো লেজ নাড়ানো প্রজন্ম। যারা আরামপ্রিয়। পরিবার ও নিজেকে নিরাপদে রাখতে ড্রেনের পানিকেও পবিত্র বলে ঠোঁট এলিয়ে হাসে। এরা প্রতিবাদ-পরবর্তি পরিণাম চিন্তা করে হিংস্র হায়েনাকে গবাদি পশুর মতো উপকারী বলে স্বীকার করে নেয়।
জয় অন্তূর দিকে ঝুঁকে আস্তে করে বলে, "এত সম্মান আগে পেয়েছ কখনও? যত অপদার্থ তুমি ভাবো আমায়, আমি ঠিক ততটাই পদার্থ। তোমার দেখার দৃষ্টিকোণ খারাপ, ঘরওয়ালি!"-"সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা থাকবে, এই দৃষ্টিকোণ যেন আজীবনেও এক

ফোঁটা না বদলায়। চিরদিন এই দৃষ্টিতেই দুনিয়া দেখে মরতে চাই।"

জয় বিরবির করল, "শালীর মুখ তো মুখ না, এসএজির রাইফেল। মিঠা কথা জানো না, শালি? মিথ্যা হলেও চলবে! তোর মুখে নিজের প্রশংসা শুনে মরণ কবুল, বউ!"

-"তুমি মিঠা কথা শুনতে চাও কেন শালা, যখন জানো আমার মুখে তা বেরোবে না। তবে যদি মরণ কবুল হয়, তো শেষবার একবার বলব। কবে মরতে চান। আমি প্রস্তুত হই মিঠা কথা বলতে!"

জয় অবাক হয়ে তাকায়। গর্বিতভাবে বলে, "এজ হাসব্যান্ড, সো হিজ ওয়াইফ! সাব্বাস!

কোন সম্বন্ধির ছাওয়াল কয়, আমাদের জুটি ভালো না? তার মাকে..... আসসালামু আলাইকুম।’’

শহীদ মিনার চত্বরে এসে হু হা করে হেসে ওঠে জয়। ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি। এখানে কতবার অন্তূকে হেনস্থা করেছে! র‍্যাগ দিয়েছে। সেই মেয়ে আজ তার ঘরওয়ালী।ক্লাস শেষে সেদিন অন্তূ জয়ের সাথেই বাড়ি ফিরেছিল। ফেরার পথে নতুন বর্ষের বই কিনে নিয়ে এলো গাদাধরে। জয় কোম্পানি আইন–বইটা হাতে নাড়েচাড়ে আর বলে, ‘‘কী বাল পড়ে সব! এসব পড়ে কোনো লাভ আছে? এই বয়সে আমরা বিক্রিয়া করতে গিয়ে সাইন্স-

ল্যাবরেটরি ব্লাস্ট করে এসেছি, ওরা ব্যবসা আইন পড়ছে। দেশের কি অধঃপতন এমনি এমনি হলো? যাই হোক, জয় বাংলা। মামা, বইটা বউয়ের জন্য প্যাক করে দ্যান।''

তারা অনেকক্ষণ রোদের তেজে ঘর্মাক্ত দেহে দাঁড়িয়ে ছিল ব্রিজের ওপর। এরপর জয়ের কত সব আস্তানায় ঘুরেছে জয় অন্তূকে নিয়ে। জোর করেই। ব্রিজের নিচের ছোট খুপড়িগুলো, টোস্ট বিস্কুট খেতে টঙের দোকান, গরমের মধ্যে বাচ্চাদের সাথে মাঠে নেমে ক্রিকেট খেলে শার্ট ভিজিয়ে এলো। তা খুলে অন্তূর হাতে দিয়ে শুধু গেঞ্জি পরে বাকিপথ পার। একগাদা লাল আইসক্রিম

কিনে তা খেতে খেতে হেসে লুটিয়ে পড়ছিল বাচ্চাদের সাথে।

অন্তূ অবাক হয়। এরাও বাচ্চা, ওরাও। তবু এই বৈষম্য কেন? কীসের আক্রোশ! শহরের সব কুকুর, বিড়াল জয়কে চেনে যেন। দেখা হলেই লেজ নেড়ে পিছে হাঁটা শুরু করল। ওরা জয়ের হাতের বিস্কুট-রুটি-কেক সব খায়।আজও কোথাও বেরোনোর আছে বোধহয় দুই ভাইয়ের। তারা কোনও কিছুর খোঁজে যাবে। সফল হয়ে ফিরবে আজ। গোসল করে দুজন কীসের এক আলোচনায় বসেছিল। সেখানে কারও উপস্থিতি নট-

এলাউড। এরপর হামজা বেরিয়ে গেছে কোথাও। জয় ঘুমিয়ে পড়ল।

এই ফাঁকে অন্তূ যায় একবার নিচের তলার বড়ঘরে। বাকি সব ঠিক আছে। মেয়েগুলো আর নেই, মদের কেস অর্ধেকের বেশি চলে গেছে। যা আছে, তা সম্ভবত নিজেদের জন্য রাখা।বাচ্চাদের খোরাক হিসেবে যা পানি এবং খাবার-দাবার দেয়া হয়, সেটাও অমানুষিকভাবে। যাতে ওরা মরবেও না, বাঁচাও হবে কঠিন। অন্তূর নিজ বিচক্ষণতায় এতে একটা আন্দাজ করে, এদের যদি মারা হবেও, তবে সেটা পরে। এবং খুব একটা শাস্তি দেবার নয়। কারণ ওরা এখনও কিছু

করেনি। ছোট মানুষ। ওদের বড়জোর দুনিয়া থেকে মিটিয়ে দিতে মেরে ফেলা হবে। কিন্তু এই যে শাস্তিগুলো ওদের দেয়া হচ্ছে, এটা কোনো উদ্দেশ্যমাফিক। এরা কাউকে খুঁজছে, কাউকে কাবু করতে চাইছে। বরশির আগায় যে টোপ দেয়া হয় মাছ শিকার করতে, বাচ্চাগুলো আপাতত সেই টোপ হিসেবে কাজ করছে।দিনের আলো প্রবেশের ছোট্ট কোনো ছিদ্রও নেই সেখানে। সিঁড়ির ওপারের লম্বা বারান্দাও ঘুটঘুটে অন্ধকারচ্ছন্ন। সেখান থেকে আলো আসার জো নেই। অন্তূ তবু দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকে আব্দুল আহাদের শুকনো মুখখানার দিকে আধো-অন্ধকারে। সে

আছরের নামাজ আদায় করছে। তার পেছনে জামায়াত দাঁড়িয়েছে। পুঁচকে একটা সমাবেশ। তো স্বৈচারাররা ভয় পাবেনা কেন? এই সমাবেশকে এভাবে চলতে দিলে এই পুঁচকে সমাবেশ কি একদিন বিশালাকায় তাগড়া শিবির-যুবকের সমাবেশে পরিণত হবেনা? হবে তো! ভয় পাওয়া জায়েজ!

অন্তূ নির্নিমেষ চেয়ে থাকে। রুকু থেকে যখন সিনা চওড়া করে আব্দুল আহাদ সোজা হয়ে দাঁড়ায়, ঠিক যেন সিনাটা দশ মাইল প্রসস্থ পাহাড়ি ঢালের ন্যায় শক্ত, অটল। যে বুকে বুলেট লাগলে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসবে তাজা গরম রক্ত, তবু মাথা নোয়াবার নয়।

কেউ আসছে। হেঁটে আসছে এদিকেই। অন্তূর হৃদযন্ত্র অতি-সক্রিয় হয়ে উঠল। মেরুদণ্ড বেঁয়ে এক প্রকার আতঙ্কিত শিহরণ নিচে নামছে। হামজা আসছে! এরপর?

অন্তূ ফিরে তাকায় না। শরীরের সংবেদি পেশিগুলো অসাড় হয়ে আছে। পা থমকে দাঁড়িয়ে রইল।

কেউ হেঁটে এসে পেছনেই খুব কাছে দাঁড়ায় নির্লজ্জের মতো। শরীরের গন্ধটা অন্তূর চেনা। চোখদুটো শক্ত করে বুজে প্রস্তুত হয় সে পরিস্থিতি সামলাতে। বাচ্চারা তখনও নামাজ পড়ছে। ছোটগুলো ভয় পাচ্ছে, নামাজে হাত

বেঁধেই আড়চোখে ভয়ার্ত দৃষ্টি ফেলছে জয়ের দিকে।

জয় কিচ্ছু বলল না মুখে। অন্তূর হাতটা চেপে ধরল, তাতে মনে হলো অন্তূর হাতের রগগুলো মটমট করে ছিঁড়ে যাচ্ছে। পশুর মতো ভোঁতা রাগে গজরাতে গজরাতে টেনে ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা আঁটকায়। তখন মাগরিবের আজানের সময় হয়ে এসেছে প্রায়।আশ্চর্যজনক ব্যাপার এই—বড়ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির কাছে আসতেই আরও দুজন ছেলেকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল অন্তূ। জয় কেবল চোখের ইশারা করতেই ওরা দ্রুত সিঁড়ির দরজা আঁটকে দেয়। অর্থাৎ এখানে

অন্য লোকেরাও আসে। তবে বাগানের পথ দিয়ে।

জয় দেয়ালে কনুই ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আঙুল কপালে ঘঁষছিল। বারবার ঠোঁট ভেজাচ্ছে, নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে বেশ ভালোই শিখেছে আজকাল। আজ আর অশ্রাব্য ভাষায় বকে উঠল না।

অন্তূ সামনে এসে দাঁড়ায়, "ওদের কেন আঁটকে রেখেছেন?"-"তা জেনে তোমার কাজ নেই। এসব থেকে দূরে থাকো।"

-“আমি জানতে চাইছি, কেন ওদের আঁটকে রাখা হয়েছে? ওই পাঞ্জাবী পরা ছোট্ট ছেলেটা কে?”

-“মাদ্রাসার ছাত্র।” নির্বিকার জবাব দিচ্ছিল জয় একের পর এক।

-“ওর বুকে কোরআন ছিল।”

জয় ভ্রু কুঁচকে ঠোঁট বাঁকায়, “হু, হাফেজ ও।”

-“ওদের আঁটকে কেন রেখেছেন?” অন্তূ গর্জন করে উঠল।

-“নতুন তো না কিছু! এর আগে শোনোনি কখনও মাদ্রাসার ছাত্রদের আঁটক অথবা হ-ত্যা-র ঘটনা? আস্তে কথা বলো। থাপড়ে

কান-টান দিয়ে রক্ত বের করে দেব একদম। গলার সাউন্ড আস্তৃ হয়না, না?''-"কেন করা হয় এসব?''

-"জামায়াত শিবিরের ছেলে ওরা। দেশদ্রোহী, শালারা জঙ্গির দল। আর একটা প্রশ্নও করবে না।''

-"ওদেরকে আপনারা কেন আঁটকে রেখেছেন?''

-"উপরমহলের হুকুম।''

-"উপরমহল? কোন উপরমহল? আপনি কে? ''

-"জয় আমির!''

অন্তূর স্বর ধীরে ধীরে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল। বহুদিন পর তার এই রূপ। কিছুদিন বেশ শান্ত ছিল।

-"আপনার আব্বু জাভেদ আমির যুদ্ধাপরাধী ছিলেন?"

-"দাদু জলিল আমির মুক্তিযোদ্ধাও ছিলেন।"

-"আর?" অন্তূ অবাক হয়ে যায়।

জয় ঠোঁটে ঠোঁট গুঁজে কপাল কুঁচকায়, এরপর আলতো হাসে, "আচ্ছা। তো ফ্যামিলি হিস্ট্রি জানতে চাও? আগে বলবে না? তোমার হক আছে তো। কিছুই জানো না তেমন শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে।"-"মুক্তিযোদ্ধার ছেলে যুদ্ধাপরাধী?"

-“কোনো সংবিধান এমন নেই যে, মুক্তিযোদ্ধার ছেলে যুদ্ধাপরাধী হতে পারবে না। ছোটচাচা জয়নাল আমির রাজাকার ছিলেন। তো?...” ঘাঁড় বাঁকা করে তাকায় জয়।

-“সোজা ভাষায় বলুন, পুরো পরিবারটাই কসাই ছিল।”

দুপাশে মাথা নাড়ে জয়, “নাহ। তা আবার ছিল নাকি? আমার সাত-পুরুষের কেউ কোনোকালে মাংসের ব্যবসা করে নাই। আমার দাদুভাই ছিলেন মশলা ব্যবসায়ী। সেই আমলে বিদেশের সাথে মশলার কারবার-টারবার করতো। আমার বাপ-চাচার ছিল

কাঁচামালের ব্যবসা। আমি অবশ্য বেকার। তবে তুমি যদি কোনোদিন সংসার-টংসার করতে আন্তরিকভাবে রাজী হও, তাইলে একটা কাম-কাজ শুরু করতে পারি। মেয়েলোক আবার বেকার ব্যাটাছেলে পছন্দ করেনা।''-“কথা ঘোরানো শেখাবেন আমায়? খুব দক্ষ আপনি বিষয়টাতে।''

জয় গম্ভীর হলো, “তুমি এসব থেকে দূরে থাকো, আরমিণ। তোমার প্রতিবাদী চিন্তাভাবনা আজ তোমাকে এত দুর্ভোগে এনেছে। সহ্য করে যে, বেঁচে থাকে সে।''

-“চিরকাল?''

জয় তাকায়। অন্তূ তাচ্ছিল্য হাসে, “চিরকাল বেঁচে থাকে? যারা সহ্য করে তারা অমর হয়ে যায়? আর জীবনে মরে না?”

-“স্বাভাবিক মৃত্যু আর সংগ্রামীদের মৃত্যু একরকম হয়না। পঁচে মরার শখ কেন হয়েছে?”

-“সহ্য করে আজ বেঁচে থেকে আগামীতে যদি মৃত্যুর হাতে ধরা দিতেই হয়, তো আজ মরব। আজ মরব তো এখন মরব। কুকুরের মতো জিহ্বা বের করে শ্বাস নিয়ে বাঁচতে চাই না। সহ্য করে, চুপ থেকে, প্রতিবাদ না করে যদি গড় আয়ু হিসেবে বড়জোর ষাট বছরের বেশি না বাঁচা না যায়, তবে আমার বুকের

ভেতরে যে আগুন জ্বলছে সেই আগুনে আপনাদের ঝলসে মারতে শুধু ষাট সেকেন্ড বাঁচতে চাই। এর বেশি একটা শ্বাসও ফেলব না এই নারকীয় দুনিয়ায়। এই অপরাধের সাম্রাজ্যে কয়েকযুগ বেঁচে থেকে শোষিতদের হাতে শোষন হবার চেয়ে কবরের মাটি অসীম শান্তিদায়ক। রক্তমাখা শরীরে আমি ওই মাটিতে মিশতে চাই।''জয় অনেকক্ষণ চুপচাপ চেয়ে থাকে অন্তূর ক্ষিপ্ত মুখখানার দিকে। পরে বলে, "আর একবার ওই ঘরে যাওয়ার চেষ্টা করলে তোমার এই ইচ্ছেটা পূরণ করে দেব, ঘরওয়ালি। পা দুটো কেটে ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে এডমিট করে রেখে আসব।

বাঁচার ইচ্ছে না থাকলে কাউকে জোর করে বাঁচিয়ে রাখা ঠিক না।"

-"তার আগে আপনাকে আমি জাহান্নামের রাস্তা অবধি এগিয়ে দিয়ে আসব, জয় আমির। আপনাকে অনেক সুযোগ দিয়েছি। মানছি আপনাদের রাজত্ব চলছে। তবু মানুষই তো আপনারা! মেরে মরলে আর কী! আমার তো আর পিছুটান নেই কিছুর।"

জয় দেয়াল থেকে সরে এসে ঝাঁকি মেরে অন্তূকে দুহাতের বাঁধনে পুরে দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে ধরে। দাঁত চেপে চাপা গলায় বলে, "চুপ। এত কথা কস ক্যা তুই, শালী! চুপ থাক।"

-"কেন বাঁচাতে চান আমায়? আপনার মতো জানোয়ারের সহায়তায় বেঁচে থাকার কোনো লালসা তো আমার নেই।"জয় কথা বলেনা কিছুক্ষণ। তাকিয়ে থাকে চুপচাপ। টুপ করে অন্তূর গলায় একটা চুমু খেয়ে অযত্নে বেড়ে ওঠা দাড়ি ঘষে অন্তূর গলায়। ছিটকে যাবে তাই চেপে ধরে রাখে অন্তূকে। কিছুক্ষণ পর অন্তূর মুখের খুব কাছে মুখ নিয়ে আস্তে করে বলে, "যা হচ্ছে দেখে যা, আরমিণ। তোর কিছু করার নেই বিশেষ। বড়জোর আমাকে মেনে নিতে পারিস। আমি খুব একটা খারাপ না, অন্তত তোর জন্য।"

অন্তূ মুখটা শক্ত করে অন্যদিকে ফিরতে চায়,
“আবার একবার জন্মাই যদি; প্রার্থনা থাকবে, সেবারেও যেন এই আপনাকে না ভুলি। আর আমার ঘৃণায় যাতে একরত্তি পরিমাণ কমতি না আসে সেকালেও।”

জয় গা দুলিয়ে আওয়াজ কোরে হাসে,
“আমিন আমিন। তোমার আল্লাহ কবুল করুন এই ফরিয়াদ।”

-“আপনি নাস্তিক?”

-“না নাহ। ঠিক তা না। কিন্তু আমার মতোন পাপীদের তোমার আল্লাহ উপাসক হিসেবে মানেন কি-না তা তো জানা নেই...

”মাঝেমধ্যেই যখন ভদ্রলোকের মতো কথা

বলে জয়, তখন খুব নিখুঁত লাগে শিক্ষিত হিসেবে। অন্তূ রুষ্ট চোখে অবুঝের মতো চেয়ে থাকে।

দরজায় করাঘাত পড়ে। জয় শীতল পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অন্তূ তাকায়। তার অস্থির চোখদুটো একবার শান্ত জয়কে দেখে আবার দরজার দিকে চায়। দরজার ওপাশ থেকে হামজা এবার ডেকে ওঠে, "জয়!"হামজা ভেতরে এসে অন্তূর সামনে দাঁড়িয়ে নরম গলায় বলল, "চাবিটা দাও।"

-"ওদেরকে ছেড়ে দিন। ওদের সাথে কোনো শত্রুতা নেই আপনাদের। ওরা কষ্ট পাচ্ছে শুধু শুধু। ওদের খামোখা আঘাত করে

নিজেদেরকে জানোয়ার প্রমাণ করার মাঝে বাহাদুরি নেই, মেয়র সাহেব।”

-“ওরকম আঘাত আমরাও সঁয়েছি। বহুত সঁয়েছি। আরাম করে গড়িয়ে এতদূর আসিনি। জয়ের পিঠের দাগগুলো দেখেছ হয়ত। আমারগুলো দেখবে?”

-“তার জিম্মেদার ওই ছোট ছোট শিশুরা ছিল না। শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান মানুষ আপনি। যুক্তিহীন কথা আপনার মুখে খুব কটু শোনায়। ”-“চাবি দাও।”

-“ছেড়ে দিন ওদের। বাড়ি ফিরতে দিন। যে যার মায়ের কোলে ফিরে যাক।”

-“চাবি কোথায় রেখেছ?” ঘরটা দুলে উঠল বোধহয়। গমগম করে প্রতিধ্বনিত হলো হামজার গর্জনের মতো ভারী ধমকটা। চোখ বিস্ফোরিত হয়ে এসেছে। এতটা উত্তেজিত দেখা যায়নি তাকে আগে।

জয় পোশাক পরছিল তখন আয়নার সামনে। গুনগুন করে গান গাইছে,

আমি কখনও যোদ্ধা, কখনও বিদ্রোহী,

কখনও কবিতার কলি..গোটা ঘর শান্ত অথচ ক্ষুব্ধ হাতে উলোট-পালোট করে সেই চাবি পেল না হামজা। আর চাইলও না। ছেলেদের দিয়ে নতুন তিনটে বিশাল তালা আনালো। নিজের চাবি দিয়েও নয় বরং শাবলের

আঘাতে পুরোনো তালা টুকরো টুকরো করে ভেঙে নতুন দুটো তালা পরপর মারল সিঁড়ির দরজায়। বেড়িয়ে গেল দুই ভাই।

এরপর রাতটা কাটল অস্থির। আর খাবারও পেল না বাচ্চারা। রিমি খাবার নিয়ে যায় রাতে একবেলা। আজ নতুন তালার চাবি কারও কাছে নেই, হামজা সাথে নিয়ে গেছে। অন্তূ কয়েকবার চেষ্টা করেছিল তালা ভাঙার, পারেনি।

নামাজে সে-রাতে খুব কান্নাকাটি করেছিল। শেষরাতে অল্প একটু পানি খেয়ে রোজা রাখার নিয়ত করল। উপবাস মানুষকে পরিশ্রুত করে, ভেতরের গ্লানি মুছে দেয়।

এছাড়া অন্তূ টের পেতে চায়, ওই ছোট ছোট বাচ্চারা কী করে না খেয়ে বেলার পর বেলা ওই অন্ধ-কুটিরে কাটাচ্ছে।

এরপর থেকে অন্তূ বহুকাল যাবৎ একাধারে রোজা রাখতো দিনের বেলাটা। রাতে নামাজে কাটাতো। এরপর আর কখনও তেমন একটা জয় সঙ্গ পায়নি তার।রিমি জানালা দিয়ে ভাঙা চাঁদটা দেখতে দেখতে টের পায় তার গাল বেয়ে বৃষ্টি নেমেছে। এই দোটানায় জীবন কাটবে, কাটতে কাটতে যাবে কতদূর?

হামজা ধূর্ত। কেবল বাড়ির নিঃশব্দ পরিবেশের কাছ থেকেও সে পুরো ঘটনার বিবৃতি পেয়ে যেতে পারে। তার দক্ষতা অথবা

অভিজ্ঞতা! আজ যখন দুপুরের পর পৌরসভার অধিবেশন-বৈঠক শেষে হামজা বাড়ি ফিরল, তখন অন্তূ বড়ঘরে। একথা বুঝতে তার সমস্যা হলো না।জয় ঘুমাচ্ছিল। রিমি অন্তত হামজার সম্মুখে মুখের অভিব্যক্তি লুকোতে খুব কাঁচা। সে সামনে দাঁড়িয়ে চোরের মতো এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। হামজা রুমে এলো, পাঞ্জাবীটা খুলল। একটা ফতোয়া পরে জয়ের রুমে গেল। তখন জয় ঘুমোচ্ছে।

জয়কে ডেকে বলল, "আরমিণ রুমে নেই। "ব্যাস সংক্ষিপ্ত একটি তথ্য দিয়ে সে নিজের ঘরে চলে গেছে। জয়ের মাথায় স্ফূটন শুরু

হয়ে যায়। অথচ অন্তূর সামনে গেলে আজকাল আর আগের মতো ক্ষ্যাপাটে হতে পারেনা। যে মেয়ের চোখে ভয় নেই, তাকে ভয় দেখানোটাও সময়ের অপচয় ছাড়া কিছু না।

হামজা রুমে এলো। রিমি অস্থির হয়ে বিছানায় বসছে, উঠছে, একাজ-ওকাজ করতে চাইছে, অথচ হাতে কাজ উঠছিল না। হামজা এসে বসল বিছানায়। রিমি তাকাতে পারেনা ওই শান্ত চোখে। আয়নায় দেখে ভারী মুখটা। চাপদাড়িতে শ্যামলা চেহারাটা দারুণ মানায়। রিমির দাদি বলতো, "পাঠার মতো শরীর,

হেই দানবের লগে আমার কুট্টি রিমারে বিয়া দিসনা রে...''

অথচ সেই বিশালাকৃতির লোকটা কখনও কিছু চাপিয়ে দেয়নি রিমির ওপর। বরং ওর ছোট্ট বয়সের জেদগুলোকে একজন অসীম ধৈর্য্যশীল অভিভাবকের মতো মেনে চলেছে। একবার রিমির কলেজে দুটো ছেলে রিমিকে কটুক্তি করেছিল। 'হামজা পাটোয়ারীর বউ' কথাটা উল্লেখ করে নোংরা কথা বলেছিল। হামজা সেই ছেলেদুটোর কী করেছে, তা অজানা। একদিন রাতে রিমিকে নিজের কোলে বসিয়ে নরম করে বলেছিল, "পড়ালেখার কি খুব ইচ্ছে আপনার, ম্যাডাম?

''রিমি বলল, "না। আমার পড়তে একটুও ভালো লাগেনা। এক্সট্রা ঝামেলা।''

হামজা হেসেছিল, "তো কী করতে ভাল্লাগে?''

রিমি লজ্জায় লাল হয়ে হয়ে মাথা নত করে। মুখে বলতে পারেনি, আপনার সংসার করতে ভাল্লাগে। আমার বয়সটাই তো এমন। সংসারের কাজকাম করা, বউ-বউ সেজে থাকার শিহরণ, আপনার সেবা-যত্ন, স্পর্শ! এসব ছাড়া কিচ্ছু ভাল্লাগেনা।

হামজা বলেছিল, "তাহলে পড়ালেখা ছাড়িয়ে দিই? ইন্টার পরীক্ষাটা দিয়ে, আর পড়তে হবেনা। মন থেকে বলবে, তুমি রাজী?

''-"বিয়ের কবুল পড়াচ্ছেন?'' খিলখিল করে হেসে উঠেছিল রিমি।

এরপর পড়ালেখা করা হয়নি আর। যখন ক্ষমতার অগ্রগতি হচ্ছিল হামজার, রিমির আনন্দ লাগেনি আবার! খুব লেগেছে।

হামজার স্বপ্ন শুনতে শুনতে সেও চাইতো, হামজা সংসদ-নির্বাচনে অংশগ্রহন করুক। সে হবে মাননীয় সংসদ সদস্য, যাকে বলে ওই এমপির বউ।

কিন্তু মাজহারকে মারার পর তাদের মাঝে যে ভাঙনের সুর হবেজেছিল, তাও ঠিক মিটে যেত। কিন্তু তারপরই একদিন এলো রিমির ওপর এক জঘন্য প্রস্তাব। রিমিকে নিয়ে

হামজা গেল একদিন বড়ঘরে। ও-ঘরে প্রথমবার গিয়ে রিমির দম আঁটকে এসেছিল। মনে হচ্ছিল হামজার সাথে সে কোনো কবরে নামছে। জাপটে ধরে ছিল হামজাকে। হামজা আশ্বাস দিয়েছে, ‘কিচ্ছু হবেনা। তুমি ওদের খাবার দেবে একবেলা।’আরমিণ বিয়ে হয়ে আসার কিছুদিন আগে এক পালা বাচ্চাদের আনা হলো। তাদের কিছুদিন রাখা হয়েছিল, একরাতে তাদের নিয়ে যাওয়া হলো মালটানা ভ্যানগাড়িতে করে। কোথাও নিয়ে গিয়ে হত্যা করে ফেলা হয়েছিল। শুধু বাচ্চাদেরই নয়, যুবকদেরও আনা হতো। টর্চার করা হতো ওদের। কিছু জিজ্ঞেস করা হতো, কিছু

স্টেটমেন্ট চাওয়া হতো, না দিলে মৃত্যু অথবা কারাগার। আপত্তিকর স্টেটমেন্ট।

এসবের পর আজ অবধিও রিমি-হামজার মাঝে সেই পুরোনো সম্পর্ক ফিরে আসেনি। দোটানা, টানপোড়েনে কেটে গেছে বহুদিন। রিমি ঘেন্নায়, লজ্জায় দুটো বাচ্চা নষ্ট করেছে ভ্রূণ অথবা তারও আগের অবস্থায়, ওষুধ খেয়ে। তা হামজা জানেনা।রিমি চায়না, তার বাচ্চা পৃথিবীতে এসে এমন বাপ-চাচার সংস্পর্শ পাক। এমন একটা বাড়িতে সে পালিত হোক, যে বাড়িটা কলুষিত, অমানুষদের বাস। যেখানের প্রতিটা সদস্যের মাঝে নোংরামির বীজ আছে। হামজাকে দেয়া

তার সবচেয়ে বড় এবং নীরব শাস্তি বাবা হওয়া থেকে বঞ্চিত করা। কারণ যে লোক অন্যের সন্তানকে এভাবে অমানুষিক অত্যাচার করতে পারে, তার বাপ হওয়ার অধিকার নেই, কস্মিনকালেও নেই। অথচ হামজা মনে মনে একটা বাচ্চার জন্য মরিয়া। তবু কোনোদিন মুখ ফুটে রিমিকে কিছু বলেনা, হয়ত মেয়েটা নিজের অক্ষমতা নিয়ে কষ্ট পাবে। অথচ হামজা জানেনা রিমি সুস্থ। প্রথম দিকে তার বয়স কম থাকায় বাচ্চার কথা চিন্তা করা হয়নি, পরে হামজার ধারণা রিমি অসুস্থ হয়ত। অথবা নিতে চায়না।এসব ভাবলে রিমির বুক পুড়ে যায়। খানখান হয়ে

আসে ভেতরটা। সে মা ছিল সেই সকল অনাগত সন্তানদের। পাপ করেছে। পাপীদের আশপাশে থেকে সেও কঠোর পাপী হয়ে গেছে। তার বাবার বাড়িটাও রাজনীতির ছায়ায় ছিল, কিন্তু অন্দরে কখনও সেসবের দাগ লাগেনি। বাইরে বাপ-চাচারা কী করেছে, তা নিয়ে ভেতরবাড়ির কোনো সম্বন্ধ ছিলনা। হামজা বিছানায় বসে থাকে অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে। রিমি আয়নাতে দেখছিল ওকে। মাথার ঘন চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে। দুই ভাইয়েরই দাড়িটা অযত্নে বড় বেড়েছে। দেখতে অন্যরকম, সুন্দরই লাগে।

একসময় হামজা রিমিকে ডেকে পাশে বসায়। অল্প চুপ থেকে জিজ্ঞেস করে, “এত নারাজ তুমি আমার ওপর?”

রিমি কথা আঁটকে আসে। তবু বলে, “তা কেন বলছেন?”

-“আমার বিশ্বাসকে তুমি...”

-“আপনি কি আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলতে চাইছেন?”হামজা তাকায় চোখ তুলে। রিমি জমে গেল যেন। চোখ নামায় সঙ্গে সঙ্গে। হামজা জিজ্ঞেস করে, “আমার চাবি এখনও তোমার ড্রয়ারে, তোমার কাছে। আরমিণ চাবি কোথায় পেল, রিমি?”

রিমি কথা বলেনা। হামজা পা টান করে দিয়ে রিমির কোলে মাথা রাখে। থরথর করে কেঁপে উঠল রিমি। একদৃষ্টে চেয়ে থাকে হামজা কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে। ফের উঠে বসে। রিমিকে ঘুরিয়ে নিজের মুখোমুখি বসায়। মুখ হাতের আজলায় ধরে চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করে, "কী চাও, বলো? আরমিণের মতো ওদের ছেড়ে দেবার আরজি ছাড়া যেকোনো কিছু কবুল আজ। বলো, কী চাও?"
রিমির চোখ ভরে উঠেছিল চট করে। এই লোকের সামনে টিকে থাকা বড় মুশকিল তার জন্য। যার প্রসস্থ বুকে মুখ না লুকোলে একসময় একটুও চলতো না, সেই লোকটা

থেকে সে এত দূরে দূরে কেন আজ? পরিস্থিতির কাঠিন্য নিতে দম ফুরিয়ে যাবার জোগাড় যে! পানিটুকু চোখ বেঁয়ে গড়িয়ে পড়ার আগে রিমি বলে, "আপনি যা নিষেধ করছেন, আমি যদি সেটাই চাই?"হামজা শান্তভাবে মাথা দোলায়, "শর্তের খেলাপি হয়ে যাচ্ছে। অন্য যেকোনো কিছু চাও।"

-"তাহলে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন তাহলে। অনেক প্রশ্ন।"

রিমি হামজার হাতদুটো নিজের চোয়াল থেকে সরিয়ে দেয়। জিজ্ঞেস করে, "জয় ভাইয়ার মতোন আপনারও নারীদোষ আছে? আরমিণ

বড়ঘরের পাশে অনেক খারাপ মেয়েকে দেখেছে।''

হামজা হাসল, "অনেককিছুই দেখে ফেলেছে সে!''

-"উত্তর দিন। নারীদোষ আছে?''

-"ছিল।''বিস্ফোরিত, আহত চোখে তাকায় রিমি। হামজা ছটফটিয়ে ওঠে। বোধহয় প্রথমবার তার চোখে কাতরতা লক্ষ করা যাচ্ছিল। সাফাই গাওয়ার মতো করে বলে, "বহুবছর আগে ছিল। যখন আমি একদম যুবক। এরপর ধীরে ধীরে সোসাইটিতে যখন নামগাম বাড়ছিল, দায়িত্ব ও ব্যস্ততা বাড়ছিল, তখন সেসব কমে এলো। আবার তখনই

একদিন ঝন্টু কাকার বাড়িতে তোমাকে দেখলাম। বিশ্বাস করো, আর কোনোদিন কোনো মেয়েলোককে ছুঁইনি।''চট করে রিমি মুখে হাত ছোঁয়ায়, "তোমাচে ছুঁয়ে বলছি, আর কাউকে ছুঁইনি আজ পর্যন্ত। এরপর আর বেশিদিন অপেক্ষাও করিনি এইজন্য, তাড়াতাড়ি বিয়ে করে তুলে আনলাম। বিয়ের আগে ছেলেমানুষের দোষ ধরতে আছে? তখন তো তুমি ছিলে না! বিভিন্ন ক্লাবে-ম্লাবে যেতে হতো, তখন নিজেকে সামলাতো যায়নি। কিন্তু তোমাকে দেখার পর আর না। নয়ত তুমি তখন একেবারে ছোট। অত ছোট বয়সে বিয়ে করতাম না। একটু বড় হতে দিতাম। কিন্তু

আমি জানতাম, এই দিন একদিন আসবে। সেদিন জবাব দিতে গেলে লজ্জিত হতে হবে। কথা বলার সময় গাইগুই করা পছন্দ না আমার। যেকোনো পাপকে স্বীকার করব, সেটাও বুক ফুলিয়ে। নয়ত নিজেকে পাপীর চেয়ে বেশি ছোটলোক মনেহয়। এই স্বভাবটা জয় খুব পেয়েছে। এই দিনটাকে ফেস করতে চাইনি।''

রিমি বুঝতে পারছিল না, কী করবে, কী বলবে। অথচ বুকে একপ্রকার ব্যথা জড়িয়ে ধরছিল।-“ওদের কেন ধরে রেখেছেন?''

-“কাজ আছে।''

-“কী কাজ?''

-“সব কী বলা যায়? বললেই বুঝবে?”

-“তবু শুনি।”

-“না। শুনতে হবেনা।” কিছু কঠিন শোনায় হামজার স্বর।

দুজনেই চুপচাপ মুখ ফিরিয়ে বসেছিল অনেকক্ষণ। কারও কোনো কথা নেই। দুজনের ভেতরে জমাটবদ্ধ অপরাধবোধ নাকি তীব্র অনুযোগ—পালা দিয়ে উঠানামা করছিল। এক দুর্বোধ্য তিক্ত-আবেগানুভূতি নিঃশব্দ ঘরটাতে ঘুরপাক খাচ্ছিল বাতাসের দোলনে। তখনই জয়ের ঘর থেকে চাপা বাক-বিতণ্ডা কানে এলো। হামজা উঠে গেলে পিছে পিছে যেতে হলো রিমিকে।

এরপর লোকটা তালা মেরে শেষ একবার ঘরে এসেছিল, তবু কোনো কথা হয়নি। আজ আর রিমির কাছে ঘড়িটা পরিয়ে চাইলো না, রিমিও এগিয়ে গেল না। বেরিয়ে গেল দুই ভাই।

রিমি চুপচাপ বসে থাকে জানালার ধারে। এত ভাবনা আর দ্বিধাদ্বন্দ ভেতরে উথাল-পাতাল হচ্ছে, মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়বে। একাধারে অনেকক্ষণ কান্না করার ফলে মাথাটা স্বাভাবিকের তুলনায় শতগুণ ভারী মনে হচ্ছে। বুক পোড়ার ধোয়া যেন আকাশে মেঘ হয়ে উড়ছিল, তা নির্বাক চোখে দেখে গেল সে পুরো রাত।রাত দুটোর দিকে মুস্তাকিন

দিনাজপুরে পা রাখল। ঢাকায় একটা কাণ্ড ঘটেছে। তা হয়ত এসে পৌঁছেছে দিনাজপুর, অথবা পৌঁছায়নি। বাস টার্মিনাল ফাঁকা। রাস্তাঘাট শ্মশান হয়ে আছে। তারা কয়েকজন যারা বাস থেকে নামলো, তারাই কেবল মানুষ। গাড়ি তেমন নেই। হেঁটে যেতে হবে। ফ্ল্যাটটা এখনও ছাড়া হয়নি। তবু সেখানে যেতে ইচ্ছে করল না। অন্য কোথাও যাওয়া দরকার।কতমাস পরে সে দিনাজপুরে এলো আবার! মনে নেই তার। হাঁটতে হাঁটতে একসময় যখন অন্তূদের বাড়ির বেশ কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিল, তখন সেই অদ্ভুত দুঃসাহসী আর অল্প-সল্প বোকা নারীটির ভীষণ

সুশ্রী মুখ ভেসে উঠল চেহারায়। ভীষণ স্নিগ্ধ। মাথার ওড়না ছাড়া সে একবার দেখার সুযোগ পেয়েছিল। সেই রাতটার কথা মনে করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সে ছিল তখন পুলিশ অফিসার। পরিচয়টার মায়ায় পড়েছিল সে। তবু মেয়েটিকে অপমানের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি। আজ সেই পরিচয় নেই, পরিচয় রাখার দরকার নেই। নারীটির ওপর তার দূর্বলতা আজও মিথ্যা নয়। মনে পড়লেই বুকটা তিরতির করে জ্বলে ওঠে। তাতে কী! যে মেয়ের কপালে সুখ থাকেনা, কোথাও থাকেনা। তার কাছেও কি আরমিণ সুখী হতো! হাসল মনে মনে। সে এমনভাবে এসব

ভাবছে যেন, সব ঠিকঠাক হয়ে গেছিল! কখনও তো সেই মনের দৌর্বল্য প্রকাশই করা হয়নি! তার সুদর্শন চেহারার মায়ায় পড়ার মতো মেয়েও নয় হয়ত সেই নারী!দিনাজপুর ফেরা তার কিছু উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য। তা ফুরোলে আবার সে ফিরে যাবে এ জেলা ছেড়ে। সেই ক'টাদিন সেই অস্থায়ী পরিচয়ের পুরো ফ্ল্যাটেই থাকবে বলে ভেবে নিলো। কিছুদিনের সেই অবাস্তব পরিচয়টায় একটা মায়া পড়ে গেছিল কেমন!

হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর এসে গেছে। টেরই পায়নি। সামনে রাস্তার মোড় পেরোলেই বিশাল হোটেল। এখান থেকে ভবনটির মাথা

দেখা যায়। জ্বলজ্বলে ইংরেজি অক্ষরে নিজের নাম জানান দিচ্ছে। উদাস পায়ে হেঁটে এগিয়ে গেল সে সেদিকে।ক'দিন আগে হঠাৎ-ই তরুর কাছে কল এলো সেই লোকটার, যে শুধু তার জন্মদাতা হিসেবে বাপ, আর কিছু না। তরু বিশ্বাসই করতে পারেনি। যে মূর্খ লোকটা মেয়ে বলে পরিচয় দেয়নি কখনও, সে কেন কল করে মিষ্টি করে ডাকছে! তার অপরাধ, তার মায়ের গর্ভে একের পর এক শুধু মেয়ে জন্মেছে। আর মেয়েরা তো কামাই করে খাওয়ায় না, ওদেরকেই আরও বসিয়ে খাওয়াতে হয়। উপরন্তু বিয়ে শাদী দিতে গেলে কত ঝামেলা, খরচা!

কথায় কথায় সেই লোক বলল, “একখান ইঞ্জিয়ার পাত্র পাইছি রে মা। সুখে থাকবি তুই। তোর মাও রাজী। শুক্কুরবারে বাড়িত্ আয়। ওরা দেখবার চায় তোরে। তুই কইলে আমি যামুনে। আমার সাথে আসিস।”তরুর আত্মা কেঁপে ওঠে। একবার তরুর বয়স যখন চৌদ্দ বছর, সেবার একবার এই লোক এসে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বাড়ি নিয়ে গিয়ে অর্ধেক বিয়ে দিয়েই ফেলেছিল। জুয়া খেলে হটে যাবার পর অনেক টাকা ঋণ হয়ে গেছিল। এরপর এক বয়স্ক লোকের কাছে তরুকে বিয়ে দেবার বদলে সেই টাকা শোধ করতে তার সেই আয়োজন। বুড়ো পাত্র অনেক টাকা দিয়ে

চৌদ্দ বছরের তরুকে বউ হিসেবে কিনতে চায়। তরু হাতে-পায়ে ধরে কেঁদেছিল বাবার, মাতাল বাপ শোনেনি। ওর মাকে ওর সামনে মেরে নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বের করে দিলো। সেদিন জয় গিয়ে একটা হাঙ্গামা করে তরুকে নিয়ে এসেছিল। আর কোনোদিন তরুকে নিয়ে যাবার সাহস পায়নি ওই লোক। আজ আবার কল করেছে। তরু বড় হয়েছে এখন, তবু সেই আতঙ্ক মস্তিষ্কে সংরক্ষিত হয়ে আছে এখনও।ছটফটিয়ে উঠে দাঁড়ায় সে, এদিক-ওদিক পায়চারী করে। এ বাড়িতে তার ভরসার স্থল, যাকে নাকি সে আজকাল ঘৃণা করে বসেছে, সত্যি কি-না বোঝা যায়নি

কখনও। হামজাকে বললে জেলে দেবে বা অন্য পদক্ষেপ। তবু তার কোনো দাবি কখনও হামজার কাছে করার অভ্যাস নেই। ঘৃণ্য লোকটার কাছেই ছুটে যেতে হলো। আর কেউ নেই তরুর, কেউ না। ওই পুরুষটা আছে। তরুর দেবতা সে, তরুর অদ্ভুত রক্ষক।

জয় তখন খাচ্ছে। টেবিলের ওপর প্লেট রেখে পাশে দাঁড়িয়েই গপাগপ গিলছে। কোথাও বেরোবে। জয়ের সামনে আজকাল সে যায়না। বুকের ব্যথা সহ্য হয়না। লোকটাকে দেখলেই চিৎকার করে কান্না ছুটে আসে। যাকে তরু বিসর্জন দেবার নাম করে দিব্যি ঘুরে

বেড়াচ্ছে, তরু ছাড়া কেউ জানেনা তাকে সে মনের মন্দিরের কেন্দ্রে দেব হিসেবে অধিষ্ঠিত করে ফেলেছিল সেই কিশোরী বয়সেই। তাকে সরানো যায়না, বড়জোর সান্ত্বণা দেয়া যায় মিথ্যা ঘৃণার আড়ালে।তরুর চোখ টলমলে হয়ে উঠেছিল কেন, জানা নেই। দৌড়ে গিয়ে কাঁপতে কাঁপতে জয়ের হাতে ফোন ধরিয়ে দেয়। অস্থির হয়ে চেয়ে থাকে।

জয়কে কিচ্ছু বলতে হলো না। সে যেন সব জানে। ফোন কানে নিয়েই বকে উঠল, "খালি রাত জেগে জন্মালেই বাপ হওয়া যায়না, চাচা। ওরকম তো কার্তিক মাসে কুত্তাও বাচ্চা জন্মায়। তাই বলে বাপের ঠিকানা থাকে

ওদের? এতগুলা দিন যখন খাওয়া-পড়াসহ যাবতীয় ভরনপোষন দিয়ে মানুষ যখন করতে পেরেছি আমরা, ওর বিয়ের বালডাও দিয়েই দেব। আর আপনিও জানেন আমি বিয়ে দিলে কোনো ছোটখাটো রাজার ঘরেই যাবে, তরু। নিজের বিজনেস হিসেবে ব্যবহার করতে চান মেয়েকে, তা ভালো। তবে তা মনেই চেপে রাখুন। বারবার সে কথা কানে এলে কবে মাথার পোকাটা নড়েচড়ে ওঠে, দেখা যাবে বংশ-নির্বংশ করে রেখে আসব।''বাপ লোকটা কল কেটেছিল দিয়েছিল ভয়ে। ভীষণ জয় পায় জয়কে।

কিন্তু আজ সকালে তার মা কল দিয়ে কান্নাকাটি করেছে। তরু জানে, মা এটা নিজ থেকে করছে না। ওই লোক মারধর করেছে খুব। বাধ্য করেছে মাকে দিয়ে এসব বলাতে। জয় নেই। তরু কার কাছে যাবে? সে তো কারও কাছে দুঃখ প্রকাশ করতে শেখেনি। যার কাছে তার দুঃখ সঁপে এসেছে, তাকে তো মুখ ফুটে বলতেই হয়নি কখনও। মুখ-চোখ দেখলেই অন্তর্যামীর মতো সব বুঝে যেত। অনেকক্ষণ বসে রইল জয়ের কবুতরগুলোর সাথে। জয়কে বিসর্জন দেবার পর থেকে যখনই বুকে যন্ত্রণা উঠেছে, সে এসে জয়ের কবুতরগুলোর কাছে কষ্ট বলেছে। অবলা

প্রাণীরা বোঝে কিনা কে জানে। তবু বলে তরু।

তরুর ইচ্ছে করল, দৌড়ে জয়ের কাছে যাবে। কষে চেপে ধরবে জয়কে। জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে কাঁদবে, অনেকক্ষণ। তারপর বলবে, ‘আমি আপনাকে পেলাম না, সে ঠিক আছে। কিন্তু অন্য কাউকে গ্রহণ করতে পারব না। আমি কিন্তু মরে যাব জয় ভাইয়া। সত্যি বলছি। আপনারা আমাকে আপনি ছাড়া অন্য কারও হতে বাধ্য করলেই আমি মরে যাব, বলে দিলাম। ছোটবেলা থেকে যার সমস্ত কাজকাম করতে করতে নিজে, দেহ-মন সবখানে শুধু একজনকে জায়গা দিয়ে দিয়ে

এত বড় হয়েছি, হোক সে না হলো আমার, তবু সে ছাড়া আর কারও হবার নয়। বুঝেছেন, আপনি? বুঝেছেন?'কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই কখন যেন হু হু করে কেঁদে ফেলেছে, নিজেও টের পায়নি। সামলালো না, ঝরতে দিলো পানি। কল্পনা করল, জয় সামনে বসে বিরক্ত হয়ে চেয়ে আছে। কখন জানি একটা ধমক মারবে। তারপর বলবে, “কিছু খাবি? আচ্ছা, পাঠাই দিচ্ছি। আইসক্রিম পাঠাবো নাকি পেঁয়াজু? মুড়ি মাখাবি? আচ্ছা, আমি আনি। মুড়ি মাখা, খেয়েই বের হবো।” তরুর চোখ বাঁধ মানেনা। শব্দ করে কেঁদে ফেলল আবারও।পলাশের হুকুম অথবা

পারিবারিক রেওয়াজ, বাড়ির বউয়েরা শাড়ি পরে থাকবে। রুপকথা একটা নীলচে-সবুজ শাড়ি পরে রান্না করছিল। খুব ভালো রান্না জানে সে। পলাশ মদ-গাঁজা বাইরে খেলেও খাবারটা রূপকথার হাতের খায়, তিনবেলাই। সকাল তখন নয়টার মতো। গতরাতে কোনও কারণে স্বাভাবিকভাবেই ঘুমিয়েছিল পলাশ। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে চেঁচালো, "রূপ! ও রূপ?"

-"বেঁচে আছ, মরিনি। এত জোরে জোরে চেঁচানোর কী আছে? আশ্চর্য!"

রূপকথা শাড়ির আঁচলটা পিঠ ঘুরিয়ে এনে কোমড়ে গুঁজে রেখেছে। পলাশ এগিয়ে গিয়ে

অনাবৃত ফর্সা কোমড়টা চেপে ধরল। রূপকথা অবাক হয়, এরকম ভালোবাসা সে স্বামীর কাছে পাবার ভাগ্য নিয়ে জন্মায়নি। স্বাভাবিক ভালোবাসা সে পলাশের কাছে পেল আর কই! পেয়েছে শুধু শরীরের দাগগুলো।-"তোমার সাথে প্রেম মানায় না, পলাশ ভাইয়া। তুমি জানোয়ার রূপেই সুন্দর আমার কাছে।"

হো হো করে হাসল পলাশ, "তুই বউ হবার পরেও তোর মুখে 'পলাশ ভাইয়া' ডাকটা শুনতে এত ভাল্লাগে। মনেহয় সেই ছোট্ট রূপ আমার পিছু পিছু ঘুরছে একটা পাখির খাঁচা কিনে এনে দেবার জন্য।"

রূপকথা কথা বলেনা। সে কি জানতো, তার সুদর্শন পলাশ ভাইয়া সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষ নয়! সে একজন সাইকো সাথে কুখ্যাত সন্ত্রাসী ও কালোব্যবসায়ী। বাবাই যে শিখিয়েছে পলাশকে এসব। সেটাও তো জানতো না রূপকথা!

‘‘কী রান্না করছিস?’’

-‘‘চিংড়ি মাছ।’’

-‘‘নাশতা না বানিয়ে সকাল সকাল চিংড়ি? ’’পলাশ রূপকথাকে সরিয়ে দিয়ে নিজে দাঁড়ায় চুলোর সামনে। এইসব সময় রূপকথা আচমকাই আশা করে বসে, পলাশ যদি আসলেই সুস্থ হতো, ভালো হতো। সে একটা

সুন্দর সংসার পেত। তার স্বামী সুন্দর, বেশ সুন্দর! রূপকথা চেয়ে থাকে। তার আর পলাশের চেহারায় সূক্ষ্ম মিল আছে, আর তারা দুজনেই সুন্দর। পলাশকে দেখে অল্প সন্দেহ করার অবকাশও নেই যে সে এমন হিঃস্র টেরোরিস্ট। জিজ্ঞেস করে, "আজ হাবভাব এমন লাগছে কেন? কী হয়েছে তোমার?"

-"আজ মুড ভালো। ভাবছি তোকে নিয়ে কয়দিন কাকার কাছ থেকে ঘুরে আসব। বহুদিন ঢাকা যাওয়া হয়না। ওদিকের সব কী হাল, আল্লাই জানে।"

-"সেসব ছেঁড়েছুঁড়ে দিলে হয়না?" কঠিন করে বলল রূপকথা।-"তোরা মেয়েলোকেরা এই

কথা ছাড়া আর কথা জানিস না? কী ছেড়ে দেব? আমি একজন ব্যবসায়ী। ব্যবসা ছেড়ে দেব? খাবি কী? আমি আর কাকা ব্যবসায়ী। খারাপ কী?”

-“ওগুলো ব্যবসা? তুমি আর বাবা মিলে সন্ত্রাসদল পরিচালনা করো, তা জানিনা আমি? ”

-“জানলে কী? তুই জানবি না তো কে জানবে? কাকা সেইদিন বলল, একটা বাচ্চা কাচ্চা নিতে। এত বছরে একটা উত্তরাধিকারী আসলো না। এসব তো তোরই, আর তোর সন্তানদের।”রূপকথার কথা বলার রুচি থাকল না। আগে এসব কিছু মনে হতো না।

সেও ভাবতো, এসব তো ব্যবসাই। আসলেই তো, তার বাবা একজন বড় ব্যবসায়ী আর পলাশ ভাইয়া দেখাশোনা করে সব। পরে বুঝলেও কিছু মনে হতো না। এটা স্বাভাবিক। পরিবারের লোক যারা এসব ভোগ করে, তাদের কাছে কোনোকালেই এসব ভুল লাগেনা। কিন্তু যখন পলাশের অত্যাচারের শিকার হতে শুরু করল সে, তারপর থেকেই কালোবাজারী ব্যবসা, নোংরামি, চাঁদাবাজি, খুন, স্মাগলিং—এসবে ঘেন্না ছিটকে পড়তে শুরু করল।পলাশের ফোন বাজছে। বকতে বকতে ফোন আনতে গেল। এত সকালে কল আসা তার অপছন্দ।

ঢাকা থেকে কল এসেছে। রূপকথা শুধু এটুকু শুনতে পেল, পলাশ চেঁচিয়ে বলছে, “কাকার লাশ? কোথায়? কাকার এপার্টমেন্টে?”

রূপকথা থমকে যায়। বাবার লাশ? রাজধানীতে তার নিজের এপার্টমেন্টে?রাজন আজগর তার টাকার পাহাড়ের একাংশ দিয়ে বিশাল একটা ভবন তৈরি করেছে ঢাকা শহরে। ভবনটি একুশ তলা। প্রতিটা ফ্লোর ভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। আবাসিক একটা ফ্লোর ছিল আঠারো তলায়। সেখানেই তাকে মারা হয়েছে, খুব নৃশংসভাবে। পুরো সাত ঘন্টা পর তার লাশের হদিস পাওয়া গেছে।

সেটা পেয়েছে একজন সার্ভেন্ট। সে সকালের ড্রিংক দিতে এসেছিল।

পলাশ সোফাতে গেড়ে বসে থাকে। কাকার জন্য তার কষ্ট হচ্ছে। সে যখন ছোট, তখন তার বাপ ক্রশফায়ারে মারা গেল। মা-টা পাগল ছিল। পলাশকে অমানুষিক অত্যাচার করতো। যখন-তখন পশুর মতো মারা, খেতে না দেয়া, ভাঙচুর করতো মহিলা। পড়ালেখা থেকে শুরু করে সবটুকু ঠাঁয় সে কাকার কাছেই পেয়েছে। পলাশ জীবনে প্রথম খুনটা তার মাকে করেছিল।একদিন সকালে পলাশ ঘুমিয়ে আছে। তার মা তাকে ঘুম থেকে ডেকে জাগানোর বদলে অন্যভাবে জাগিয়ে

তুলল। চামচের দণ্ড গরম করে এনে পলাশের শরীরে ঠেকিয়ে দিলো। উপরের চামড়া পুড়ে শরীরের মাংস ঝলছে গেল। পলাশ খুব কাঁদছিল, যদিও সে জানতো তার মা কান্নার আওয়াজ পছন্দ করেনা। এরপর তার মা এলো বাথরুম পরিষ্কার করার দাহ্য-রাসায়নিক নিয়ে। সেদিন পলাশ তার পাগল মাকে মেরে ফেলেছিল। তখন সে স্কুল-ছাত্র তার চোখে নারী মানে অমানুষ, ঠিক তার মায়ের মতো। পরে জেনেছে তার মাকে পাগল বানিয়েছিল, তার বাপ-চাচা মিলে। কড়া ড্রাগ দিয়ে দু'ভাই ওর মাকে নিয়ে ফূর্তি করেছে বছরের পর বছর।

তবু কাকাকে সে কিছু বলেনি। মায়ের অত্যাচারগুলো ছাড়া আর কোনো কিছুই তার স্মৃতিতে ছিল না। তার মনে হয়েছে, তার মায়ের সাথে ওরকম আচরণ করা ভুল না। ততদিনে যে সেও স্যাডিস্ট হয়ে গেছে, তা বোঝেনি। পাগল বোঝেনা, সে পাগল। রূপকথার কান্না পাচ্ছিল। হাজার হোক বাবা। বিয়ের আগ অবধি বাবা তাকে, সেও বাবাকে ভালোবাসতো। পলাশের সাথে বিয়ে না হলে হয়ত আজও তেমনই থাকতো।

পলাশ যখন ঢাকার উদ্দেশ্যে বের হচ্ছিল, তখনই খবর এলো, হোটেল এবং সবগুলো ডেরায় আইনরক্ষাকারী বাহিনী গোটা ফোর্স

নিয়ে ঢুকেছে। পলাশ বুঝল না, একসাথে এতকিছু হচ্ছে কী করে? কে করছে? কিছুক্ষণের মাঝে যে ফোর্স বাড়িতে ঢুকে পড়বে তা নিয়ে মোটেও সন্দেহ নেই পলাশের। রূপকথার হাতটা ধরে দ্রুত রুমে নিয়ে যায়। তাড়া দেয়, "দ্রুত বের হ। বের হতে হবে এক্ষুনি।"

""আমি তোমার সাথে কোথাও যাব না। অপরাধ করো তুমি, তোমাকে ধরা হবে। আমি বাবার কাছে যাব। তুমি পালিয়ে বাঁচো। "পলাশের চোখের মণি লাল হয়ে উঠল। অথচ ভয় পেল না রূপকথা। বারবার কল আসছে ম্যানেজারের। দলছুট হয়েছে ওদিকে,

সেটা নিশ্চিত। দেশের বাইরে লিগ্যালি যাওয়া সম্ভব নয় এ অবস্থায়। কোথাও আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে ক'দিন পর বর্ডার পার হতে হবে। ওপারে বার্মা(মায়ানমার) পৌঁছাতে পারলেই হলো। সেখানে তার ব্যাকআপের অভাব নেই। পলাশের হোটেলে একটা ফ্লোর শুধু মদ আর অনৈতিক নেশাদ্রব্যে ভরা। সেটা পুলিশ জব্দ করল। ম্যানেজারকে বাড়িতে গিয়ে ধরা হয়েছে। হোটেলে সকাল সকাল মেয়েলোক নিয়ে কত কাস্টমার ঘুমাচ্ছিল। তারা সবাই পুলিশের জিম্মায়। কতগুলো থানায় পলাশের পেইড-এজেন্ট আছে, তার হিসেব পলাশ নিজেও রাখেনা। সেসব অন্যকেউ সামলাতো।

অথচ সেইসকল কিনে রাখা লোকদের পার করে এতবড় ফোর্স উদয় করতে পারে কারা, তা বুঝতে পলাশের খুব বেশি সময় লাগল না।

তার লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, সেটা পলাশ শেষরাতের দিকে জানতে পেরেছিল। কিন্তু কাকাকে কে মেরেছে? সে-ই? নাকি অন্যকেউ?অন্তূ এসব খবর পেল ওয়ার্কশপের ছেলেদের কাছে। রতন দোতলায় উঠে অন্তূকে ডেকে বলল, "ভাবী। আজ কোথাও বের হইয়েন না। অনুরোধ লাগে।"

-"কেন? বিশেষ কিছু হয়েছে?"

গাইগুই করছিল রতন। অন্তূ বলল,
“নিঃসংকোচে বলুন রতন ভাই।”
-“ভাই মানা করছে। আপনারে পাহাড়া দিতে কইছে।”
““আমাকে?”
-“হ। বিশেষ কইরা আপনারে। গোটা বাড়িডাও।”
-“কেন, তা কিছ বলেনি?”
রতন জয় আমিরের বউয়ের সম্মুখে একটু থতমত খেয়ে যায়। মেয়ে মানুষ, অথচ কথাবার্তার ভাঁজ কেমন জানি, কড়া।-“ভাবী। আপনে বাইর হইয়েন না। প্লিজ!”

অন্তূ অবাক হলো, “এমনভাবে বলছেন কেন? আমি কি খুব অবাধ্য, এমনটাই জানেন আপনারা?”

রতন কথা বলে না। কাচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। অন্তূ ভ্রু নাচায়। রতন মেকি হাসে, “না মানে, আমর জানি, ভাইয়ের কথা আপনে শোনেন না। ভাইরে মানেন না আপনে। সরি ভাবী। মানে...”

অন্তূ কপাল চেপে ধরে মুচকি হেসে ফেলল, “আপনারা ভয় পান, আমাকে?”

-“হ। না মানে, না। ভয় না...”

-“আমি কি খুব অসভ্য?”

-“ছিঃ কী কন? তা কইছি নাকি? আল্লাহ মাফ করুক। ওমন কথা কমু নাকি? ও ছিঃ। আপনে খুব ভালো।”

-“কী করে বুঝলেন?”-“এই লাইনে আছি বইলা কি অমানুষ হইয়া গেছি? মানুষ চেনার ক্ষ্যামতা আছে আমাগো। আমি খালি কইছি, ভাই আপনারে খুব মান্যি করে। মানে আগে কুনুদিন কাউর সামনে থামতে দেহি নাই জয় ভাইরে। আপনে...”

-“আচ্ছা আচ্ছা! সেসব যাক। আপনার ভাইয়ের নম্বরটা দেবেন তো।”

অন্তূর ফোন জয় নিয়ে নিয়েছে। তুলির ফোন এনে নম্বর তুলল। রতনকে বলল, “আজ

যেহেতু আমরা সব বন্দি। চলূন পিকনিক করি! আমি রান্না করব। দুপুরে সবাই খেতে চলে আসবেন, কেমন!”

অবাক এবং খুশিতে একাকার হয়ে চিৎকার করতে করতে নেমে যায় রতন। অন্তূ ভ্রু কুঁচকে চেয়ে থাকে। কয় বছর আগের কথা? অন্তূ কতই না ডানপিটে আর চঞ্চল ছিল। আজকাল মানুষ নাকি তাকে ভারী মনে করে। ভয় পায়! জয় নেই, আজ সে রোজা রাখেনি। প্রথম দুই তিনবার কল রিসিভই হলো না। পরে রিসিভ করেই জয় ঝারি মারল একটা, “বালডা আমার, এখন কল করেছিস ক্যান?

দাওয়াত খাইতে আসছি, আমি? কী দরকার তোর? ফোন রাখ।'' ধমক মারল একটা।

অন্তূ শান্ত স্বরে বলে, “আমি। আমি কথা বলছি।''

জয় বোধহয় অবাক হলো, “ঘরওয়ালি! আপনি কল করছেন আমায়?''

অন্তূ সেইসব আন্তরিক প্যাঁচালে সাঁয় না দিয়ে বলল,

“কোথায় আপনি?''

-“আপনার টেনশন হচ্ছে?''

-“কথা বাড়াবেন না। জবাব দিন।

''-“রাজধানীতে আছি। ফিরব আজই। চিন্তি কোরো না। ঠিক আছি আমি।''

-“আমি চিন্তা করিনা আপনার।”

জয় হাসল। অন্তূ বলল, “রাজন আজগর মারা গেছে, শুনলাম।”

অলস কণ্ঠে বলল জয়, “হ, আমিও শুনলাম।”

রতন এসে দাঁড়াল। অন্তূর কিছু লাগবে কিনা তা জানতে এসেছে সে।

-“আমি বের কেন হবো না? আজ বিশেষ কীসের রেস্ট্রিকশন রেখেছেন?”

-“পলাশের ব্যবসায় রেড মারছে বেয়াই বাড়ির লোকজন।”

-“তাতে আমাদের কী?”

-“আমাদের? আমি-তুমি মিলে আমাদের নাকি?”

-“আপনার রসিকতা বিরক্ত লাগছে।”
-“লাগেনা কখন? সেদিন পলাশ একটা দাবি করেছে।”
-“কী দাবি?”-“তোমাকে পলাশের লাগবে। এতকাল তো পাটোয়ারী বাড়ির ভীত ভেঙে তোমার গায়ে টোকা লাগাতে পারে নাই। তার ওপর পার্টনারশীপের একটা ধর্ম আছে না! কিন্তু পুরাতন মেলা হিসাব রয়ে গেছে। জানো মনেহয় সেসব। আমরা-পলাশরা ভুলিনা, কিছুদিন চুপ করে থাকি। তারপর খপ করে ধরি। ওরও কিছুদিন হয়ে গেছিল। তো সেদিন ফাইনালি বলল, তোমাকে লাগবেই।

এতদিন ভার্সিটি গেলে ধরে-টরে ফেলতো। যাও নাই, পারে নাই।”

অন্তূর নিঃশ্বাসের গতি বাড়ল, “এরপর?”

-“এরপর কী? আমার ওপর কৃতজ্ঞতা আসতেছে না?”

অন্তূ ইশারায় রতনকে চলে যেতে বলে। রতন বাধ্যর মতো আদেশ পালন করল অন্তূর। জয় বলল, “আমার মনে হলো, তোমাকে পলাশের কাছে দিতে চাইলে তুমি রাজী হতে না কোনোভাবেই। হতে?”

-“হতাম না।”“এই তো! আর কী? এজন্যই একটু লাড়াচাড়া দিছি। এইটা বুঝতে পলাশের দেরি লাগবে না, যে আমিই দিছি

বেয়াইবাড়িতে লাড়াচাড়া। ব্যবসা হারায়ে পাগল শালা আরও পাগল হবে এবার। ফেরোয়ার হয়ে ঘুরবে। বিপদ চারদিকে। বাড়ির আশপাশে তিন-চার রকমের শত্রু ঘুরছে। বের হবেনা বাড়ি থেকে, খবরদার। আমি আসি। বসে কথা বলবোনে। ব্যস্ত আছি, এত কথা বলার পরিস্থিতি নাই।"

অন্তূ কল রেখে থম মেরে দাঁড়িয়ে থাকে। পলাশ তাকে বলেছিল, তাকে পলাশ ছাড়বে না। অথচ এ বাড়িতে আসার পর বাইরের সবকিছু ভুলেই বসেছে। বাড়ির ভেতরেই একের পর এক যা ঘটে চলেছে! মুস্তাকিন মহান কোথায়?

আচ্ছা! সে কি স্বার্থপরের মতো ভাবছে? এই জয় আমির শুধু তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দু-একটা পদক্ষেপ নিয়েছে বলে সে কি আসলেই কৃতজ্ঞতা বোধ করছে লোকটার প্রতি? আর সব অপরাধ? অন্তূ গা ঝারা মারে। সে স্বার্থপর, তবে এমন স্বার্থপর নয়। এখনও বাচ্চাগুলো প্রায় দু'দিন না খাওয়া। অন্তূ অস্থিরতা ও ক্লান্তিতে সোফাতে বসে পড়ল। কী হচ্ছে চারদিকে। সংকট কি কাটবে না? ঝড় ঘনিয়ে আসছে। আম্মুকে কল দিয়ে অনেকক্ষণ কথা বলল, খোঁজখবর নিলো। তারা ভালো আছে ওখানে। অন্তূ জানতো, এই শহর ছাড়লে ভালো থাকবে ওরা।ঝন্টু

সাহেবের স্টোররুমটা কতটা নিরাপদ, তা জানা নেই পলাশের। তবু মানুষগুলো নিরাপদ। মাজহার সিগারেট ফুঁকছে একটা বস্তার ওপর বসে। সরু আলো অন্ধকার দূর করেনি ঘরের। পলাশ একটা কাঠের খণ্ডে তবলা বাজাচ্ছিল আঙুল দিয়ে। যেন সে খুব আরামে, নিশ্চিন্তে আছে।

ঝন্টু সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, “ও পলাশ! তোমার কথা মতোন এতকাল চুপ করে আছি। এইবার যখন নিজের পেছনে ঘা লাগছে, তখন ওই দুই শালার চেংরার পিছে লাগবার চাও? আগেই কইছিলাম ব্যবসা গুটাও, দুইডারে খতম করে দাও। আমি

আমার বাড়ির মেয়ে এক শুয়োরের কাছে বিয়ে দিছি। রাক্ষস, নটকির পো।''

পলাশ চোখদুটো বুজে রেখেই বলল, "মামা, কথা কম বলুন। মেজাজ গরম করবেন না।

''মাজহার সিগারেট ফেলে আরেকটা ধরালো। একের পর টেনে যাচ্ছে। রাগ নিয়ন্ত্রণ সহজ কাজ নয়। আপন মনেই বলল, "শালার হাসপাতালের সেই দিনগুলা ভুলছি আমি? নেহাত বোন জামাই না হইলে কবে বানচোতটারে পুঁতে ফেলতাম। রিমিরে ওই বেজন্মার কাছে বিয়ে দেয়া ভুল হইছিল সেইকালে। আমার একেকটা আঘাত আর ব্যথার শোধ না তুলে পলাশ ভাই তোমার

হাতি দিব না দুইডারে। তুমি দিনের পর দিন থামায়ে রাখছো। নয়ত কবে দুইটারে জবাই করে ফেলতাম। খালি তুমি....নয়ত...''-“নয়ত কী করতি?'' পলাশ চোখ খুলে তাকায়। জ্বলজ্বলে মণির দুপাশে শিরায় শিরায় রক্ত জমেছে।

মাজহার রাগে কাঁপতে কাঁপতে তাকায়, “আব্বা বসে আছে। কিছু বলতেও পারতেছি না। শোনো পলাশ ভাই! একবার ওই বাড়িত ঢুকলে সবগুলা মাগী-মিনসের পেছন মেরে তবেই ফিরব।''

পলাশ হাসল। সাধারণের চেয়ে বেশি ভয়ানক দেখালো তার ফ্যাসফ্যাসে হাসি। আধো-

অন্ধকারেও চোখদুটো জ্বলছে সাপের মতো। বলল, “জয়ের বউ মেইন ফ্যাক্ট রে, মাজু। ওই চেংরী যেদিন থেকে কাহিনিতে এন্টার করছে, শালার বাজিই পাল্টে গেছে। জয় আর জয় নাই। আমার সাথে কী কী না করছে, তবু কিচ্ছু কইনাই। ক্যান বল তো!” হেসে উঠল জোরে করে পলাশ।মাজহার অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। তার কালো চেহারা আরও কালো হয়ে উঠেছে। সে সহ্যই করতে পারেনা জয়-হামজার কথা। আজ ওই দুই শুয়োরের বাচ্চা রাস্তায় না এলে তারা থাকতো জেলার রাজনীতিতে জমজমাট। অথচ দশটা বছর ধরে তারা মন্দায় পড়ে আছে। বাপ-চাচার

নাম লুটপাট হয়ে গেছে। এক এক করে কাকা-বাপ সব গুটিয়ে নিয়েছে নিজেদের রাজনীতি থেকে।পলাশ বলল, “রাজনীতিবিদগুলারে আমার ঠিক ততটা দরকাল, যতটা মনে কর ঠিকমতো হাঁটতে গেলে শক্ত মাটি দরকার হয় পায়ের তলায়। ওরা ছাড়া তো গতি নাই। দেশের টেরোরিজমে ওরাই শক্তি-ওরাই মুক্তি। জেল থেকে বাঁচাবে, ব্যবসায় নিরাপত্তা দেবে, পুলিশ-প্রশাসনকে কুত্তার মতোন চালাবে, বর্ডার পার করবে....ওরা ছাড়া গতি আছে? হাতে রেখেছিলাম। কিন্তু আমার ইগোর চেয়ে বড় কিছু নাই। ওইডা চটকাইছে জয় প্রথম

ওর বউয়ের জন্য। অথচ আমি আজ পর্যন্ত চুপচাপ। কিচ্ছু করিনাই সেই মেয়ের। নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য ঠেকে।"

সিগারেটটা কেঁড়ে নিলো মাজহারের থেকে। দুটো লম্বা টান দিয়ে বলল, "একটা মাগীর কাছে হার মেনে গেল। সেই মাগীরে ছাড়ব? না ওই দুইটারে? ক। দিন খারাপ চলছে, চলতে চলতে নতুন দিন আসবে না? ওরা যাবে কোথায়?ভাবে না এসব?"মাজহারের খারাপ লাগল না পলাশের কথা শুনে। পলাশের মতো সন্ত্রাসরা রাজনীতিবিদদের টিস্যুর মতো হাতে রাখে, এই স্বীকারক্তিতেও খারাপ লাগল না। কারণ তারা তো আর

রাজনীতিতেই নেই। সব ডাউন। নাম-খ্যাতি-ক্ষমতা সব গেছে। মানুষের নীতি এটা। যা নিজের কাছে নেই, অথচ থাকলে লাভ ছিল। এরকম জিনিসের ক্ষতি সাধনে মানুষ সুখ পায়। ব্যাপারটা ওরকম—আমার নেই, তোর থাকবে কেন? অথবা হয় আমার হ, নয়ত ধ্বংস হ। মাজহারের মনে এখন তাই চলছে। যে ক্ষমতা তাদের নেই, সেই ক্ষমতার নামে বদনাম শুনতেই আরও সান্ত্বণা লাগছিল।

পলাশ চোখ বুজে দেয়ালে পিঠ হেলান দিয়ে বসে থাকে। পরিকল্পনা সাজায়। রূপকথাকে পুরোনো বাড়িতে রেখে এসেছে। পোস্ট-মর্টাম শেষে কাকার লাশ আসতে দু'দিন দেরি হবে।

শুধু জয়-হামজা না। তার নিজের লোক বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। যাকে সে আইন সামাল দিতে মিথ্যা পরিচয়ে বসিয়ে রেখেছিল। রক্ত ফুটছে ভেতরে। বাই এনি চান্স, সে ধরা পড়লে তার ফাঁসি অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবে। সে একটা প্রতিজ্ঞা করল, কারাবরণ অথবা ফাঁসির আগে সে সবগুলোকে অন্তত তার পাগলামী দেখাতে চায় একবার। এরপর সব শাস্তি মঞ্জুর। তবে তার আগে প্রতিশোধ। যারা তার এত সাধের ত্রাসের সাম্রাজ্যে ফাঁটল ধরিয়েছে, তারা বেঁচে থাকতে দেশ ছেড়ে পালাবে না সে।

হোটেল থেকে শুরু করে প্রতিটা ডেরায় সিল পড়েছে। সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্তও হয়ে গেছে বোধহয় এতক্ষণে। হন্য হয়ে পুলিশ খুঁজছে তাকে। তাকেই সন্দেহ করা হচ্ছে কাকার খুনের জন্য। জয়ের এই রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সে পঙ্গু না করে দেশের সীমান্তের ওপারে পা রাখবেনা।ঘড়ির কাটার টিকটিক শব্দ খুব কানে লাগে। নিঃশব্দ রাত।

রাত তিনটা বাজছে। অন্তূ জায়নামাজের ওপর ঘাঁড়ের নিচে মাথা রেখে শুয়ে থাকল অনেকক্ষণ। জয় উপুড় হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। খুব ক্লান্ত সে। ঘরে ঢোকার পর থেকে ঘরের ভেতরে একটা উৎকট গন্ধ বদ্ধ হয়ে

আছে। সে শুয়েছে মিনিট দশেক হবে। রুমে এসেছে তার অল্প কিছুক্ষণ আগে।

অন্তূর ধারণা, কাউকে টর্চার করে ঘরে ফিরছে সে। রাজধানী থেকে ফিরেছে রাত এগারোটার দিকে। অথচ বাড়ির ভেতরে ঢোকেনি একবারের জন্যও। মাঝরাতে গোসল করার অভ্যাস পুরোনো। ঝটপট গোসল করে এসে শুয়ে পড়ল। রাত বাড়ছে, সাথে অন্তূর ভাবনারাও।

আজ ওরা কাউকে জিম্মি করে নিয়ে ফিরেছে, এটা অন্তূর ধারণা। একজন নয়, একাধিক ছিল তারা। অন্তূ উঠে দাঁড়াল। তার মন টিকছে না। বাচ্চাগুলো না খেয়ে আছে হয়ত

এখনও। অন্তূর মুখে খাবার রোচে না, গলা দিয়ে নামেনা। খিদেও লাগেনা।সে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, জয় উপুড় হয়ে বালিশের ওপর মুখ গুঁজে জড়ানো কণ্ঠে বলল, “আরমিণ! বাইরে যাবি না।”

অন্তূ কয়েক মুহুর্ত দাঁড়িয়ে থাকল সে-কথা শুনে। তারপর তা অগ্রাহ্য করে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

এ সময় বাগানে যাওয়া সম্ভব নয়। লোহার গেইটটা দিয়েই ঢোকানো হয়েছে লোকগুলোকে।

লম্বা বারান্দার সিঁড়ির দরজায় তালা ঝুলছে। অন্তূ দু তিনবার টানল, ব্যর্থ চেষ্টা তালা

ভাঙার। আব্দুল আহাদ সাধারণত ভিতরে বসে কোরআন তেলওয়াত করে। কী যে সুন্দর শুনতে লাগে! অন্তূ এই দরজার বাহিরে দাঁড়িয়ে শুনতে পায়। খিদেতে হয়ত চুপ করে আছে বাচ্চাগুলো! অন্তূর বুক পুড়ছিল। সে নিজেও কিছু খায়নি। রান্না করেছে, সকলকে খাইয়েছে, কিন্তু নিজের পেটে খিদের অনুভূতি টের পায়না আজকাল বিশেষ।দরজায় হেলান দিয়ে বসল অন্তূ। রুমে যেতে ইচ্ছে করছেনা। ঘুম আসবে না কোনোভাবেই। চোখদুটো বুজতেই আব্বুর মুখটা ভেসে ওঠে। চমকে তাকায়। অন্তূর মনে হলো, আব্বুর গায়ের গন্ধ পেল খুব কাছে। কয়েকফোঁটা নোনাজল

টপটপ করে গড়িয়ে পড়ে। ক্লান্ত হয়ে উঠেছে রুহুটা। আর চলছে না। প্রগাঢ় অন্ধকারে বসে থাকে অন্তূ। ঝিঝি পোকার ডাক ছাড়া চারপাশ নিস্তব্ধ। কোথাও আলো নেই, নেই জনমানব। বাচ্চাগুলো কুটুরিতে বন্দি। আজ বুঝি আরও কিছু এসেছে!অন্তূ টের পায়, আমজাদ সাহেব এসে বসলেন পাশে। অন্তূ কাধটা হেলিয়ে দিয়ে কল্পনা করে, সে আব্বুর কাধে মাথা রেখেছে। আমজাদ সাহেব বললেন, “শক্ত হ, অন্তূ। বি স্ট্রং। তীর সম্মুখে। এ নৌকা ভিড়বে না। চলন্ত নৌকা থেকে ঝাঁপ দিবি। একটু গড়িয়ে গিয়ে আঘাত প্রাপ্ত হবি। পরক্ষণে গা ঝেরে উঠে তোকে

তীরের গভিরে দৌড়াতে হবে। তুই তৈরি।
অন্তূ?”
তখনই লৌহ কপাটের ওপারে, ভেতর থেকে এক পৌরুষ কণ্ঠস্বরে সুতীব্র সুর ভেসে আসে কিছু শব্দগুচ্ছ প্রতিধ্বনিত হয়ে,সেদিন আর রবে না হাহাকার, অন্যায়, জুলুম, অবিচার থাকবে না অনাচার, দূর্নীতি, কদাচার.. সকলেই শান্তিতে থাকবে।
সেদিন সবাই খোদায়ী বিধান পেয়ে দুঃখ-বেদনা ভুলবে....
অন্তূর গা'টা শিউরে ওঠে। সে ছটফটিয়ে উঠে দাঁড়ায়। দরজায় হাত রাখে। তার ভেতরে কাঁপুনি উঠেছে। উত্তেজনায় বুক টলছে! এ

কীসের সুর, নীরব যুদ্ধের দামামা! কোনো পুরুষের সাধারণ স্বরের গাওয়া এক সংগীতে এত বিদ্রোহ থাকতে পারে? এত সুকরুণ, তবু যেন রণ-ঝংকার বাজছে। কণ্ঠস্বরটা চেনার চেষ্টা করে অন্তূ। সেই অস্ত্রের মতো ঝনঝনে স্বর ফের সুর টানে,কোনো একদিন.....

এদেশের আকাশে....

কালিমার পতাকা দুলবে

সেই দিন আর নয় বেশি দূরে, কিছু পথ গেলে মিলবে...

অন্তূর শরীরটা ঝাঁকি মেরে ওঠে। মনেমনে বলে ওঠে, "ওরে টান! কে আপনি যুবক! এত বিরোধ-অগ্নি!'' কখনও আবার বলে ওঠে,

“মাশাল্লাহ!”অন্তূ চাতকের মতো পিপাসার্ত হয়ে চেয়ে থাকে অন্ধকারেই সেই দরজার পানে। মাথাটা ঠেকায় সেখানে। তার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে। কীসের অশ্রু! সাহসের? অথবা পথহারা পথিকের পথ পাবার আশংকা! অন্তূ চুপচাপ ঘরে ফিরে এসেছিল। ডাইনিং স্পেসের কমন বাথরুমটার দরজায় জোরে জোরে শব্দ করল। যেন মনে হলো, সে বাথরুম থেকে বের হলো অনেকক্ষণ পর। সাথে একগ্লাস পানি আর দুটো রুটি নিয়ে রুমে এলো। উদ্দেশ্য জয়কে বোঝানো, সে খাবার-পানি আনতে গেছিল। জয় চোখ বুজে শুয়ে ছিল, ঘুমন্ত কি’না বোঝা যাচ্ছিল না।

সকালটা খুব স্বাভাবিক কাটলো। অন্তূর চেহারাটা ভেঙে গেছে। চোখের নিচে কালি, ফর্সা মুখে বিভিন্ন প্রকার দুশ্চিন্তার ছাপ, কালচে ছোপ। রিমি এবং সে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রান্না করল, তবু বিশেষ কথা হলো না। সবার সব কথা বুঝি ফুরিয়ে গেছে এ বাড়ির! তরু আসছে, টুকটাক কাজকাম করছে, তুলির মেয়েটাকে দেখাশোনা করছে। হামজা বেরিয়ে গেল। অন্তূর ধারণা হামজা সামনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাগানের লোহার গেইট দিয়ে গ্রাউন্ড ফ্লোরের কুটুরিতে ঢুকেছে। অন্তূ পুরোটা বেলা নিজের ঘরে বসে পড়ল। অনেকদিন পর বইখাতাগুলো নেড়েচেড়ে

দেখল সে। একসময় পড়তে বসলে, আব্বু এসে চুপটি করে পাশে বসতো। অনেকক্ষণ চুপচাপ চেয়ে দেখতো পড়তে থাকা অন্তূকে। ঠিক যেন অন্তূ তখনও প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রী-ই। অন্তূ আমজাদ সাহেবের কাছে কোনোদিন বড় হয়েছিল না। তারপর ঝাপটা-টা এলো কবে?অন্তূ নিজের ভুলগুলো ভাবে একমনে বসে। সে কথা বেশি বলে। খুব বেশি কথা বলে। অথচ লোকে তাকে গম্ভীর ভাবতো। তারা জানেনা সে অজায়গায় চুপচাপ সহ্য করতে পারেনা। তার অনেক ভুল। তার কারণে গোটা পরিবারটা তছনছ হয়ে গেছে। সে প্রচণ্ড স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক মেয়ে।

মহানুভবতা নেই ভেতরে। অন্তূ টের পেল, আব্বু এসে পাশে বসেছে। জয় উল্টো দিক ফিরে শুয়ে ছিল। তখন সকাল নয়টা।

আব্বু জিজ্ঞেস করল, "এখন কী চাস, অন্তূ?"

-"ভুলগুলো শুধরাতে।"

-"কীভাবে?"

-"সেটা বুঝতে পারছি না।"

-"ভুলগুলো কী তা বুঝতে পারছিস?"

""সবই তো ভুল, আব্বু!"

-"সব কোনগুলো?"

"সেই তো আমার সবই ভুল। তোমাকে হারিয়ে ফেলা..." "তোর ছাড়া আর কারও বাপ মরেনা?তকারও জীবনে তোর চেয়ে বেশি

সংকট নেই, ভাই মরেনা? পরিবার ভাসে না? তারাও ভুল করে, তাই জীবন এমন? তাহলে তো সবই ভুলের দোষ, ভুলের ভুল। তোর দোষটা কোথায়? কারও কোথাও দোষ নেই... ”

বরাবরের মতো আব্বুর যুক্তির কাছে হারল। তবু তর্কে জড়ায়, “আমি অনেক পাপ করেছি আব্বু। তা ধরাতে দিচ্ছ না কেন?”
““শুনি পাপগুলো।”অন্তূ উপহাস করে হাসে, “জয় আমিরের সাথে পাঙ্গা নিতে গেছিলাম। তারপর আরও কত নাটক করলাম! সব তো নিজের ন্যাকামিতে। তাই না, আব্বু? তোমার ধিক্কার জানানোর নেই আমাকে? আমি কোনো

পদক্ষেপই শান্তভাবে নিতে পারিনি, পরিস্থিতি খুব ভালো ছিল। আমার জন্য সুখকর। তবু কেন যে চুপচাপ পেশাগত বুদ্ধিজীবীদের মতো ছক কষে কাজ সারতে পারলাম না? আমি পাগল হয়ে গেছি আব্বু, বদ্ধ পাগল, বে-তাল।
''

আমজাদ সাহেব গম্ভীর মুখে চেয়ে থাকেন। তারপর চট করে হাসেন, “নিজের ভেতরের সাথে খুব তর্ক হয় তোর তাই না? সে তোকে পছন্দ করেনা, সমর্থনও করেনা! তাকে জবাব দিচ্ছিস?''

অন্তূ মুখ নামায়, স্বগোতোক্তি করে, “আমি কী কী করেছি, জানো, আব্বু?

-“না। জানি না।”

-“শোনো, বলছি।” তবু অনেকক্ষণ চুপ রইল অন্তূ। কথা বলল না কোনো।

-“চুপ কেন?”-“মেলাতে পারছি না, আমি কী কী করেছি। অনেক পাপ আর ভুল তো, আব্বু! মেলাতে বেগ পাচ্ছি বড়।”

-“চেষ্টা কর দেখি!” অসন্তোষ প্রকাশ পেল আমজাদ সাহেবের অভিব্যক্তিতে।

অন্তূ মুখ তুলে চায়। আমজাদ সাহেব মাথা দোলান, “কিচ্ছু করিসনি। জীবন আমাদের নিয়ে খেলে, অথচ আমাদের সাহস নেই জীবনকে দোষ দেবার। আমরা জীবনকে ভয় পাই। তবু দোষারোপ তো করতে হবে। তখন

হয়ত নিজের কর্মগুলোকে দোষারোপ করে নিজেকে দোষী বানিয়ে মনোবল হারিয়ে বসি।
”

-“আমি কী করব, আব্বু? আমি পুরো ব্ল্যাঙ্ক। আমার মাথায় কিচ্ছু আসেনা। আমি দূরে কোথাও চলে যাব। আমি সব ছেড়েছুড়ে চলে যাব। কীসে জড়িয়েছি? আমার তো কিচ্ছু না। আমি নিজেই গলা সমান ডুবে আছি আগে এত ভালোমানুষি দেখাতে গিয়ে, আমি কার কী উপকার করব? কেন করব? যার যারটা সে বুঝে নিক। আমি খাবো, ঘুরব, ঘুমাবো। আর নাহয় পালাবো এই শহর ছেড়ে।
”-“তারপর?”

অন্তূ অল্প চুপ থেকে মলিন হেসে বলে, “কোথায় যাব? জায়গা বা ঠাঁই নেই তো, আব্বু। আমার যে আব্বু নেই। আমার একটা তুমি নেই, আব্বু। আমার কাছে আমার আম্মা নেই। আমার বাপটা বড় স্বার্থপর ছিল গো। সে আমায় বছরের পর বছর স্বপ্ন দেখিয়েছে। তারপর একদিন হুট করে রেখে পালিয়েছে। এমন এক জায়গায় রেখে, যেখানের চার দেয়াল বিষাক্ত কাঁটার বেষ্টনিতে ঘেরা। অল্প নড়লেও আঘাত অনিবার্য, অনস্বীকার্য।”

-“তো দমে যাবি?”

-“কী করতে বলো?” অন্তূ চড়ে উঠল।হেসে মাথা দোলালেন আমজাদ সাহেব, “তোকে

উকিল হতে হবে, অন্তূ। আরও স্বার্থপর হতে হবে। আমার আদেশ রইল, এর পেছনে যুক্তি খুঁজতে যাবিনা। লোকে তোকে সর্বোচ্চ পাপীর কাতারে দাঁড় করাক, তুই বাকি জীবনে তোরটা আদায় করতে যা করতে হয়, সব করবি। কী বললাম? সব। সেটা অযৌক্তিক হোক অথবা অল্প পাপ অথবা হোক খাঁটি স্বার্থবাদীত্ব।''

-''আমার কী করার আছে? আমি কেন জড়াচ্ছি নিজেকে? কোথা থেকে কী হচ্ছে আমার সাথে? চারপাশে কী চলছে? কেন? কবে থেকে? কীভাবে?'' অন্তূ বদ্ধ পাগলের মতো ছটফট করতে থাকে।

-“শান্ত হ। বল তোর ভুলগুলো কী কী? কী কী ভুলের জিম্মেদার ভাবিস নিজেকে?”

-“আমার ভুল?”

-“হ্যাঁ। তোর মতে তোরই তো। শুনি বল।

”-“সে-তো অনেক! জয় আমিরকে ঘেন্না না করে সেই ভার্সিটিতে দেখা হবার প্রথম দিন মেনে নিলে আর কিচ্ছু হতো না। এরপর যা সব হয়েছে, সেসব হতো না। খালি পলাশের সাথে একবার দেখা হতো অন্তিকের বদৌলতে।”

-“হু, আর?”

অন্তূ খুব উৎসাহিত হয়ে ওঠে, “আব্বু ব্যাপারটা অনেকটা টাইম প্যারাডক্সের মতো। ব্যাখ্যা করব?”

আমজাদ সাহেব চেয়ে রইলেন। অন্তূ বলল, “টাইম প্যারাডক্স হলো, ধরো—তুমি যেকোনোভাবে অতীতে গিয়ে তোমার দাদাকে তার ছোটবেলায় খুন করে এলে। এখন এখানে অনেক ‘কিন্তু’ রয়ে যায়। তোমার দাদা যদি তার ছোট বয়সেই খুন হয়ে যায়, তাহলে সে বড় হয়নি, বিয়ে করেনি অর্থাৎ তোমার বাবার জন্ম হয়নি। আর তোমার বাবার জন্ম না হলে তুমি জন্মালে কোত্থেকে? আর যদি তুমি জন্মেই না থাকো, তাহলে তোমার

দাদাকে খুনটা করল কে?''আমজাদ সাহেব মৃদু হাসলেন, "সমাজবিজ্ঞান ছেড়ে কীসে মন দিয়েছিস?''

মলিন হাসে অন্তূ, "সমাজবিজ্ঞান! যে সমাজের সিস্টেম এবং বসবাসরত একেকটা মানুষের দৃষ্টিকোণকে আমি মৃত্যুর মতো ঘেন্না করি, সেই সমাজবিজ্ঞান নিয়ে ভাবার রুচি কোথায় আব্বু? সে তুমি যা-ই বলো। বিষয়টা মিলল না?''

-"বুঝতে পারছি না।''

"আমি বুঝতে পারছি খুব। আমি যদি সেদিন জয় আমিরকে প্রতিহত না করতাম, তাহলে পরবর্তিতে আর এতসব তামাশা হতো না।

আর তামাশা যখন হয়েছে, একবার প্রতিহত করার ফলে। আর প্রতিহত যে একবার করতে পারে, সে কি আর পরের বার মেনে নেয়? আজীবনেও মেনে নেয়না। তুমি বলতে আব্বু।”-“এখনও বলছি।”

““তাহলে তো হলোই। এ তো চিরধার্য ছিল।”

-“তাহলে আর ভুল বলছিস কোনটাকে?”

-“ভুল?” অন্তূ হাসে, “সবই ভুল। জন্মানো ভুল, বেঁচে থাকা ভুল।”

-“কী চাস?”

-“দূরে যেতে। আমি আর নিতে পারছি না।”

““তাতে কী হবে?”

-“আমি ফুরিয়ে যাব।”

-“এটাই চেয়েছিলি?”

-“পারছি না আর নিজেকে টানতে। কী করতে বলো? মোকাবেলা করার শক্তি, বুদ্ধি অথবা দক্ষতা আমার নেই। আমি যা করি তা-ই ভুল হয়ে যায়। অথচ আমার ধারণা, সে-সব আমি না করলে ভুল হতো না। অর্থাৎ ব্যাপারটা এমন—যা আমি করব তা ভুল। যা ভুল তা আমি করব।”

-“আধ্যাত্মিকতা?”“হতে পারে। ওসবই মাথায় ঘুরছে আজকাল। এই ক্লান্তির শেষ দরকার বুঝলে? তাতে আমি ভিলেন হবো, অযৌক্তিক আর খারাপ হবো।”

-“হয়ে যা।”

-“কিন্তু কী করব?”

““কিচ্ছু করিসনা। সুযোগ বলবে।”

-“আর বাচ্চাগুলো?”

-“যেগুলোকে তুই ভুল বলিস, এই ভাবনাগুলোই সেগুলো, অন্তূ। তোকে এত প্রতিবাদী হতে হবেনা। স্বার্থপর হ, লোকের বাহবাসহ জীবনে সব পাবি।”

-“সত্যি নাকি?”

-“হতেও পারে, নাও হতে পারে।

-“দায়সারা কথা বলছো।”

““জীবনটাও তো দায়সারাই, অন্তূ। চলছে না তবু চালাও, পারছি না তবু পেরে ওঠো, কোনোমতো কেটে গেলেই মৃত্যু। দায়

সারতেই আমরা জীবনকে টানি। কোনোমতো শেষদ্বারে পৌঁছে দিয়ে দায় সারি।”

অন্তূ এবং আমজাদ সাহেব বসে থাকেন পাশাপাশি। কেউ অনেকক্ষণ কোনো কথা বলেনা। হঠাৎ-ই আমজাদ সাহেব বলেন,

“অন্তূ?” “হু, আব্বু?”

-“তুই কোনো ভুল করিসনি। আজ অবধি তুই যা করেছিস। তা একটাও ভুল ছিল না, আর না ছিল বোকামি। তুই যে কতটা শক্তিশালী তা তুই জানিস না। গভীর দৃষ্টিকোণ ছাড়া বোঝা যাবেনা। তোর প্রতিটা কাজের বহুল ব্যাখ্যা আর যুক্তি আছে। সেসব বোঝার দৃষ্টিকোণ সবার থাকবেনা। পরিস্থিতি মাফিক

সব ঠিক ছিল। সবশেষে হতে পারিস তুই ভুল অথবা ঠিক। তাতে যায় আসেনা। যা মন বলবে করবি। পিছুটান নেই কোথাও। সবাই পিছুটান রাখলে সবাই যে মায়ার গোলাম হয়ে পড়বে। মায়ার গোলামেরা অধম হয়। পরিবার-পরিজন, সুন্দর জীবনের আশায় ব্যক্তিত্ব ত্যাগ ভালো নয়। তারা একেকটা অদামী, অকর্মণ্য।''

-''আব্বু আমি ভুল করেছি। আর তার ফলেই এসব ঘটছে।''

-''কোনটা ভুল, অন্তূ? আর এসব থেকে বাঁচতে কী করার ছিল? তুই ওই কবিতা পড়িসনি? এক লোক রাস্তায় বের হতোনা,

গাড়ি চাপা পড়ার ভয়ে। নৌকা চরতো না, ডুবে মরার ভয়ে। ফ্যান চালাতো না, ফ্যান ভেঙে পড়ার ভয়ে..ওই জীবনযাপন করলে সব ঠিক থাকতো? জীবনে টানপোড়েন আসবেই। তার শর্ত—জন্মগ্রহণ করা। আর জন্মগ্রহণেল পর আর ধারাবাহিকতা থামানো যায়না। এসব ভাববি না।''-"আব্বু, গতকাল তুলি আপু বলছিল, জয় আমির আমার ঢাল।''
-"হু, ঢাল। আগুনের তৈরি জলন্ত ঢাল।''
অন্তূ অবাক হয়ে যায়। আমজাদ সাহেব বলেলেন, "যেটাকে হাতে চেপে ধরে রেখে তুই সামনের শত্রুর যাবতীয় আঘাত থেকে রক্ষা পাচ্ছিস।''

অন্তূ অদ্ভুতাভাবে হাসল, “এদিকে আমার হাত যে ঝলছে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত, আব্বু!”

আমজাদ সাহেব সাঁয় দেয়া মুচকি হাসলেন, “তাতে কী?

জয় আমিরের ক্ষয়—তোর জয়। এটাই নিয়ম। চেঙ্গিস খানও আজ মাটিতে মিশে গেছে। সবার ধ্বংস হতে হয়। আর একেক ধ্বংসের মাঝে বৈপরীত্যের নতুন সৃষ্টি থাকে। এটা সূত্র। এটা চক্র।”-“আব্বু, তুমি বদলেছ? শতভাগ কথা তোমার নয়। তোমার কথাতে আমার সংমিশ্রণ!”

-“আমি? আমি আজ কে?”

অন্তূ অবাক হয়ে তাকায়। আসলেই তো! কার সাথে কথা বলছে সে! কেউ তো নেই। তবে কে?

জয়কে কল করেছিল পলাশ সন্ধ্যার পর। হামজা তখন কিছু ফাইল দেখছে সোফাতে বসে। জয় লম্বা একচা সালাম দিলো, "স্লা-মা-লে-কুম, পলাশ ভাই।"

পলাশ হাসল, "সালাম, বস। ভালো?"

-"বলেছি, এই প্রশ্ন জয়কে করবেন না। সে সদাসর্বদা ভালো। মানুষটাও ভালো, থাকেও ভালো। ভালো থাকা একটা পেশা, একটা ব্যবসা।"

-"পুঁজি কী এই ব্যবসার?"

-"মানুষকে খারাপ রাখা। ইটস ল অফ রিলিটিভিটি পলাশ ভাই। মানুষ খারাপ থাকলে, তার তুলনায় আমি ভালো থাকব।"-"তোর বউকে আমার হাতে দিবি না, সেটার জন্য ডিসকাশনে আসা যেত। এইডা কী করলি বাপ?" চাপা হিঃস্রতা পলাশের হাসি হাসি রবে বলা কথাতেও লুকায় না হামজা বলল, "স্পিকার লাউড কর।"
তরু এসে দুইকাপ আদা চা দিয়ে গেল। সারাবছর জয়ের ঠাণ্ডা লেগে থাকে। তরুর ধারণা, কবে জানি এই লোকের নিউমোনিয়া বা অ্যাজমা ধরা পড়বে।

জয় মাথা নাড়ল, "বোকা সাজবেন না, পলাশ ভাই। আপনাকে বিশাল বেমানান লাগে। বউ তো আমি দেবই না। বউ হবার আগে দেইনাই। এখন কেমনে কী? কাহিনি অন্যডা। বউ রক্ষা করা কোনো বিষয় না, ভাই। ওটা আমি না চাইলেও হবে। আমার বউ যে-সে জিনিস না।"

-"কাহিনি? কী কাহিনি?"-"মাজহার মাজহার। আমি আপনারে কইছিলাম, ওর সাথে মিলে কোনোদিন আমাদের পেছনে লাগবেন না। তবু আপনি বরাবর তাই করে আসতেছেন। আমি আপনারে কোনোদিন বিশ্বাস করি নাই যদিও, তবু আপনি একটা বিশ্বাসঘাতকতা

টাইপের বিট্রে করছেন। যার ফকিরের সিরনি খান, সেই ফকির চেনেন না, নাআআ! হলো মিয়া? মাজহার তো বাদামের খোসা। আপনাকে ব্যাক-আপ দিই আমরা। তবু ছলচাতুরি?''

-‘‘আমি কিছু করিনি। মাজহার যা করতে চেয়েছিল আমি বাঁধা দিয়েছি।''

-‘‘বাচ্চা দুষ্টুমি করলে মা'দেরও ওরকম দু চারটে মিঠা ধমক দিতে দেখছি। ও ব্যাপার না। ওটাকে প্রশ্রয় বলে। আমার চেয়ে বেশি কেউ পায়নি ও জিনিস।''

-‘‘তুই ভুল বুঝে কাম ভালো করিসনি, বাপ। ''-‘‘এই একটা কথা বললেন? ইমেজ নষ্ট

করা কথা। আমি জীবনে ভালো কাম করিনি। এটা আমার পারমানেন্ট ইমেজ। অথচ আপনি এমন টোনে কথাটা বললেন, যেন রোজ ভালো কাম করি, আজ একটা খারাপ করছি। এইটা হইলো? নাহ। আমি মরব খুব তাড়াতাড়ি। তবু শুধরাবো না, নিজেকে কন্ট্রোল করব না। ছোট্ট জীবনে অত ভাবনাচিন্তা রাখিনা। যখন যা মনে চায় করি। কল রাখেন। কল করে ফ্যারফ্যার করার চেয়ে আমার পেছনে বাঁশ না কঞ্চি দেবেন, সেটা দেবেন কীভাবে, সেইসব পরিকল্পনা করেন। ইয়া হাবিবি। আল্লাহ হাফেজ।”

হামজা কপালে হাত চেপে হেসে ফেলল। জয় বলল, “ঘাপলা আছে ভাই। ওর মতোন মাতানষ্ট পাগল শালা এমন বাংলা সিনেমার মতো সরল ফোনালাপ করতে কল লাগাইছে। কাহিনিটা এডজাস্ট হচ্ছে না শরীরে। কিড়মিড় করতেছে।”হামজা শান্ত স্বরে বলল, “তোর ফোন ট্র্যাকডাউন করার জন্য হতে পারে।”

-“এত উন্নত ডিভাইস তো কোনো এসবি ডিপার্টমেন্টেও নাই।”

-“ওর কাছে থাকলে কী?”

-“তা মানে বুঝছো?”

-"দিনাজপুরে নেই ও। আই গ্যেস, ঢাকাতে কোথাও আছে। কঠিন প্লান-প্রোগ্রাম চলছে।"

কাগজপত্র ছুঁড়ে ফেলার মতো টেবিলে ফেলল হামজা। একটাতেও মনের মতো কিছু নেই। জয়কে বলল, এগুলো স্টেটমেন্ট? এসব রাজধানীতে পাঠালে উপরমহল মাজায় লাত্থি ছাড়া কিছু দেবেনা।

কল করে কাউকে ডেকে বসে রইল দুজন চুপচাপ। আদা-চা ঠান্ডা হয়ে এসেছে। শরবতের মতো সেই চা জয় শব্দ করে বাচ্চাদের মতো চুমুক দিয়ে খেতে লাগল। হামজার উপরমহল দেশের ক্ষমতাসীন দলের মহাকর্তারা। তারা অ-বিনিময়ে কিছু দেয়না।

বিরোধী দলের ছেলেদের আঁটক করা, অত্যাচার করা, মিথ্যা অপরাধ সাজিয়ে কারাগারে ঢোকানোর মতো কাজগুলো হামজার মতো উঠতি নেতাকর্মীদের ওপর ন্যস্ত করা হয়। তাদের প্রোফিট তারা কাজের স্কোর অনুযায়ী নিবার্চনের আগ আগ দিয়ে পেয়ে যাবে—নীরব চুক্তিটা এমন হয়।যে যতটা ভালো কাজ দেখাতে পারবে, ক্ষমতা পাবার ক্যান্ডিডেটদের মাঝে তারাই অবশ্যই অগ্রগামী থাকবে। হামজা যা করছে, যা করতে চাইছে; ২০১৮ এর সংসদ নির্বাচনে একটা মনোনয়ন পাবার সম্ভাবনা নেহাত কম নয়।

ডাউন পার্টি মাজহার। সে মানতে পারল না বিষয়টা। প্যাঁচ লাগালো। কঠিন প্যাঁচ। যে কাজ হামজা এবং জয় মাসখানেক আগে করে ফেলতে পারতো, তা গতরাতে সম্ভব হয়েছে। মাজহারকে পুরোটা সমর্থন ও সহায়তা দিয়েছে পলাশ। নয়ত পলাশের বাপ বেকার বসে আছে, দলছূট হয়ে গেছে। তারা এখন আম-জনতার চেয়ে বেশি কিছু না।

শত্রুর শত্রু নিজের বন্ধু। মাজহার নীতিটা পালন করেছে। পলাশের ব্যবসায়ীক পার্টনারশীপের জেরে হামজাদের অধিকাংশ কাজের খোঁজ পলাশের কাছে থাকে। পলাশ তা লিক করতো মাজহারের কাছে। মাজহার

নিজে ক্ষমতাসীন দলের চামচামী করলেও এবার হিংসাপরায়নতা তাকে বিরোধী দলকে গোপন তথ্য দেবার কাজে নিয়োজিত করেছিল। এলার্টেশন পেয়ে পেয়ে ওরা নিজেদের গুটিয়েছে। জয়-হামজার পেরেসানী চরমে পৌঁছেছিল। দিনের পর দিন দুই ভাই ছুটেছে।শেষ অবধি বাচ্চাগুলোর অসহায়ত্বের চিত্র, ভিডিও, বিবরণ তাদের সফল করেছে। অতগুলো বাচ্চার জীবন বাঁচাতে তাদের ধর্মের বড় ভাইয়েরি ছুটে আসবেনা, তা হয় নাকি? ধরা দিয়েছে। শর্ত ছিল, বাচ্চাদের ছেড়ে দেয়া। হামজা দেয়নি। ওরা জানের ভয় অল্পও

পায়না। বাচ্চাদের ছেড়ে দিলে ওরা মৃত্যু কবুল করবে, তবু কোনো জবানবন্দি দেবেনা। আজ বাচ্চারা পেট পুড়ে খেয়েছে। খেতে পায়নি তাদের আমিরেরা। খেয়েছে—মার। সেসব হজম করতে না পেরে লুটিয়ে পড়েছে কেউ কেউ জ্ঞান হারিয়ে।

হ্যাংলা পাতলা চেহারারার রন্টু এসে দাঁড়াল হামজার সামনে। কপালে হাত ঠেকিয়ে মাথা নুইয়ে সালাম ঠুকলো।।সে হাঁপাচ্ছে। হামজা জিজ্ঞেস করল, "কী অবস্থা?"

-"ভাই। পাথরের মতোন মার খাইতেছে। তবু কথা কয়না। আমার কাছে আবার ওযুর পানি চাইছে, ইশার নামার পড়ব।"জয় উঠল। এক

মগ পানি নিলো বাথরুম থেকে। হলরুম থেকে বেরিয়ে যাবার সময় হামজা ডাকে, “কোথায় যাচ্ছিস?”

জয় ফিরে তাকায়, “একটু সাক্ষাৎ করে আসি। আর ওযুর পানি দিয়ে আসি।”

-“আঘাত করিস না এখন আর।”

-“করব না।”

রন্টু ডাকে, “ভাই?”

আনমনে জবাব দেয় হামজা, “হু!”

-“ভাই, একটা কথা কই?”

-“বল।”-“আগে বহুত এমন কেস সাল্টাইছি। একটু মারলেই ওগোরে ধর্ম-টর্ম সব গোড়ের ভিত্রে পালায়। এইরকম শক্ত জান দেহি নাই।

ভাই, আমার কাছে আবার ওযুর পানি চায়। একটু টু শব্দ করেনা, ব্যথাও লাগেনা মনেঅয়। কেডা ভাই ওইডা? আগেও বহুত শিবিরের ছাওয়ালরে খালাস করছি। উরা মরার আগে বাঁচতে চাইছে। নামাজ কালাম পড়তে চায় নাই। আজকের বাকিগলাও ওই লোকটার মতোন না। অত শক্ত ছিল না। এইটা আলাদা...''

হামজা শান্ত চোখ তুলে তাকালে রন্টু ঢোক গিলল। ভয়ে আর কথা বলল না। চলে গেল দ্রুত হামজার সামনে থেকে।নিচতলার আঙিনা পার্টির ছেলেদের আনাগোনায় গমগম করে সারাক্ষণ। নিচে যেন বহুদিনব্যাপী

উৎসব চলে সারাবছর পাটোয়ারী বাড়িতে। সেটা আরও বেড়েছে হুমায়ুন পাটোয়ারীর মৃত্যুর পর। একগাদা সৈন্য মোতায়েন রেখে দুই ভাই বেরিয়ে গেল সন্ধ্যার আগে। চারদিকের ঝামেলা সামাল দিতে হচ্ছে একসাথে। অন্তূ বেশ কিছুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখল নিচের আঙিনায় ভেতরবাড়ির পাহারাগুলো। ক্লাবঘরে আগুন লাগার পর থেকে ওখানের আড্ডাটা তুলে এনে এখানে বসানো হয়েছে যেন। রাতের রান্না চড়িয়েছে তরু।অন্তূ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। কতরকম ভাবনা মনেমনে খেলা করে যায়। জয় আমিরের ওপর সে কৃতজ্ঞ। জয় আমির

তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কৃতজ্ঞ সে। ঠিক যেমন মানুষ কৃতজ্ঞ থাকে এন্টিবায়োটিক ওষুধের ওপর। যেটা রোগ সারানোর সাথে সাথে শরীরের ইমিউন সিস্টেম দূর্বল করে, শক্তিমত্তা হনন করে, মাস খানেকের জন্য অকেজো করে মানবদেহকে এবং বৃক্কে এক প্রকার স্থায়ি ক্ষতিসাধন করে যায় চলমান-হারে। জয় আমির দাহ্য রাসায়নিক দ্রব্যগুলোর মতোই ভালো। অন্তূ এসব ভেবে হাসে।

রিমি এসে কখন পেছনে দাঁড়িয়েছে, টের পায়নি। জিজ্ঞেস করল, "কিছু বলবেন?

''-"আপনার রুম বহুদূরে। কানে কিছুই আসেনা, না?''

-"হবে হয়ত। তাতে তো ভালো। কান ভালো আছে।''

-"আমার নেই।''

-"ঘর পরিবর্তন করুন।'' মুখ ফিরিয়ে অনীহার সাথে বলল অন্তূ।

-"আপনার কী হয়েছে, আরমিণ? অন্যরকম লাগছে।''

-"শুধরাতে চাই নিজেকে।''

-"মানে?''

-"কেন এসেছেন?''

-"চাবি এনেছি।''

“ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে রেখে দিন জায়গার চাবি জায়গায়।”

-“আপনি যাবেন এখন বড়ঘরে।”-“প্রশ্নই ওঠেনা। আমি নিজের আর বিপদ বাড়াবো না। এই বিপদে পড়ার ফলে কার কার ওপর যে কৃতজ্ঞতা রাখতে হচ্ছে, রিমি। ভাবতে পারেন? আমি বিপদে আছি, তা থেকে প্রোটেক্ট করছে আমায়। আর আমার তার ওপর কৃতজ্ঞতা রাখতে হচ্ছে। এর চেয়ে আর কী খারাপ খেসারত গুনলাম? এটাই সবচেয়ে কঠিন। তাই আর বিপদ নয়, আর না নতুন কৃতজ্ঞতা। ”

-“এত অহংকার আপনার?”

-"ভুলভাল শব্দ উচ্চারণ করছেন, রিমি। ওটা আত্মমর্যাদাবোধ। কোনো পাপীষ্ঠর ওপর কৃতজ্ঞতাবোধ একপ্রকার আত্মগ্লানি। এত আত্মগ্লানি বইতে পারছি না।"

"ওদের প্রতিটা আঘাতের আত্মচিৎকার আমাকে পাগল বানিয়ে দিচ্ছে। এতদিন এভাবে টর্চার করা হয়নি ওদের।"

-"হয়নি, এখন হবে। খারাপ কী? তাতে আমারই বা কী? আমি মানুষ, সাধারণ এক অসহায় মেয়ে। আমার ক্ষমতা নেই ওদের সহায়তা করার।"-"এমন কেন করছেন কেন? এত শক্ত হচ্ছেন কেন? প্লিজ, আরমিণ। আপনি সাহসী। আমি পারিনা ওসব দেখতে,

মোকাবেলা করতে। আপনি পারেন। আপনার সাহস আছে।”

অন্তূ শক্ত গলায় চিবিয়ে বলল, “সাহস? কীসের সাহস? হারানোর সাহস, তাই তো? বাপ-ভাই-ক্যারিয়ার-সুন্দর জীবন—সব হারিয়ে ফেলার বোকা সাহস আছে তাই তো? অথচ আপনারা চালাক। নিজেদের গা বাঁচিয়ে যা হয় করেন। আপনাদের কোনো শত্রু নেই, ক্ষয় নেই। ড্যাম অন মি। এই কথাগুলো বুঝতে এতগুলো দিন লেগেছে আমার।”রিমি কেমন কাতর হয়ে উঠল, “আমি মানছি। সব মানছি। কিন্তু ওদের শরীরের ব্যথার কাতরানির আওয়াজ সহ্য হচ্ছেনা আমার।

আপনি একটু দেখে আসুন। পায়ে পড়ি, আরমিণ। যান বড়ঘরে একবার। সমস্ত ভার আমার। ওরা এখনও ব্যথায় ছটফট করে চিৎকার করছে। আমার কানে সইছেনা।’’
সিঁড়ির দরজা খুলতে এইদিন অন্তূর খুব হাত কেঁপেছিল। সে জানে না ভেতরে কী দেখবে। সেই কণ্ঠস্বর, সেই বিদ্রোহী সংগীতের মালিক! বড়ঘরে পা রাখতে পা টলছিল খুব। হাত-পা জড়িয়ে আসছিল। পশ্চিম কোণের লোহার দরজার ওপাশে ছেলেদের আওয়াজ আসছে। ওরা যদি ভেতরে ঢুকে আসে, কী করে সামাল দেবে সে? খালি হাত তার।

সে কম্পিত পায়ে বড়ঘরের ভেতরে গিয়ে দাঁড়ায়। কড়া পাওয়ারের স্পটলাইট ঝুলছে মাথার ওপরে। দুজন কাত হয়ে শুয়ে আছে। আব্দুল আহাদকে দূর থেকে চিনতে পারল অন্তূ।

তার পা উঠছিল না। তবু হেঁটে এগিয়ে গেল। ওরা সবাই মিলে আহতদের সেবা করছে। অন্তূ মাঝে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। চারজন নতুন পুরুষ। দুজন পড়ে আছে। একজন পা ছড়িয়ে বসে পায়ের ক্ষততে হাত বুলাচ্ছে। রডের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে চামড়া, ত্বক বিদীর্ণ হয়ে মাংস থেতলে যাওয়া স্থানে হাত বুলাচ্ছে।

চতুর্থজন দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে। চোখ বুজে বসে আছে। হাতে ব্যান্ডেজ। কপালে শুকনো রক্ত। মুখটা ওপাশে কাত হয়ে থাকায় দেখতে পেল না অন্তূ। পায়ে শিকলের বেড়ি আঁটকানো। তা তালাবদ্ধ লোহার বীমের সাথে। অন্তূ কয়েক কদম এগিয়ে গেল। মাথার চওড়া ওড়নার প্রান্তটা আরেকটু টেনে দিলো। সকলেই ফিরে তাকায় ওর দিকে। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।চতুর্থজন বাহিরের মানুষের উপস্থিতি টের পেয়েও মুখ ফেরানোর তাড়াবোধ করছিল না যেন। অন্তূ আব্দুল আহাদকে বলল, “খেয়েছ কিছু?”

শুকনো মুখে মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানায় আব্দুল আহাদ। অন্তূ, কাছে মিথ্যা ঠেকল। নারীকণ্ঠের আওয়াজ পেয়ে সেই পুরুষ মুখ ফেরায়। অন্তূর রক্ত সঞ্চালন থামল। কাঠের আসবাবের মতো জমে দাঁড়িয়ে থাকল। সেই চোখ। রুমালে বাঁধা মুখোশের আড়ালে যে চোখদুটো তেজস্ক্রিয় রশ্মির মতো জ্বলজ্বল করে জ্বলেছিল সেদিন। সেই চোখজোড়াকে অন্তূ ভুলবে কোনোদিন? চাপদাড়িতে প্রসস্থ মুখখানা ম্লান সেই পুরুষের। পরনে খাদি কাপড়ের ফতোয়া। কালো প্যান্ট। তার কয়েক স্থানে ছেঁড়া। হাতের কালো বেল্টের ঘড়িটার কাঁচ ফেটে গেছে।অন্তূ খেয়াল করে পায়ের যে

স্থানে শিকলের বেড়ি, স্থানটায় রক্ত জমাট বেধে দগদগে ঘা তৈরি হয়েছে। পুরুষটি সোজা হয়ে বসল। নিজের দৃষ্টি সংযত করে অন্যদিকে তাকিয়ে অন্তূকে উদ্দেশ্য করে বলল, "এখানে এসেছেন কেন? ফিরে যান ভেতরবাড়িতে। নিজের ঝুঁকি বাড়াবেন না।" সেই সুতীব্র ভরাট কণ্ঠস্বর। সেদিন রাতের বিদ্রোহী স্বর! অন্তূ চোখ নামায়। শুধু এটুকু উচ্চারণ করতে পারে, "কে আপনি?

"-"আমি....সৈয়দ মুরসালিন মহান।"

অন্তূ দু কদম পেছায়। চোখের পলক ফেলেনা।অন্তূ নির্বাক হয়ে চেয়ে ছিল অনেকক্ষণ। অনেকক্ষণ পর জিজ্ঞেস

করেছিল, “মুমতাহিণার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কী?”

-“আমার ছোট বোন।” সংক্ষিপ্ত জবাব দিলো মরসালীন।

অন্তূ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে শান্ত হলো। এরপর জিজ্ঞেস করল, “মুমতাহিণার ভাইকে তো শুনেছি মেরে ফেলা হয়েছে!”

মুরসালীন নিশ্চুপ মেঝের দিকে চেয়ে থাকে। দৃঢ়, সু-স্থির চোখদুটোয় অবাধ অটলতা। অন্তূ শরীরের ভার ছেড়ে একটা লৌহখণ্ডের ওপর বসে। ওদের গোঙানির আওয়াজ অবরুদ্ধ কুটুরির দেয়ালে কাঁপন ধরাতে চাইছে। স্পটলাইটের তীব্র হলদে আলোতে মাথা ধরে

যাবার যোগাড়। এরা ঘন্টার পর ঘন্টা পার করছে। ঘুমানো অসম্ভব এই আলোর তলে।-“আপনি চিনতেন আমায় সেই রাতের আগে?”

-“না।”

-“তবু প্রথম দেখায় কোনো বিরূপ আচরণ করেননি।”

-“আপনি করেননি বিধায়। তাছাড়া পাটোয়ারী বাড়ির কোনো সদস্যের সঙ্গেই আপনার সম্পর্ক বিশেষ ভালো নয়। তাদের ওপর আপনার মায়া বা ভালোবাসা থাকবে এমনটা আশা করিনি আমি। আর দুঃখিত আমি, সেদিন কিছুটা ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলাম।

এবং সেক্ষেত্রে দু একবার ‘তুমি’ সম্বোধন করেছিলাম আপনাকে বিভ্রান্ত করার জন্য।’’

অন্তূ ভাবে, লোকটা কে? ভেতরের খবর জানে বেশ! অন্তূর চোখে মানুষ চেনার বিশেষ ক্ষমতা আছে তো অল্প-সল্প। সে চট করে মানুষ বিচার করে ফেলতে পারে। শুধু পারেনা অভিব্যক্তি লুকোতে। তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া দেখানোর নির্বোধ স্বভাবটা খুব দৃষ্টিকটুই বটে।

মানুষের অভিব্যক্তি ও চোখের দৃষ্টি কথা বলে। সেই কথা বোঝে সে। সেদিন তার হাতে অস্ত্র ছিল। তবু অজ্ঞাত পুরুষটিকে সে আঘাত করেনি। সেই নির্দেশ তার মস্তিষ্ক তাকে

দেয়নি। ভরসা অথবা এরকম দ্বিধা সে আজ অবধি তিনটে পুরুষে করতে পেরেছে সে। আব্বু, আগুন্তুক আর....তৃতীয়জনের কথা ভাবতে সংকোচে কুঁচকে এলো ভেতরটা—জয় আমির। অপ্রিয় এক অন্যতম ঘৃণ্য ব্যক্তিত্ব। তাকে সে ভরসা করে নাকি আশা রাখে, সেটা জানা নেই। প্রথম দুজন তার ভরসার মান পুরোদমে রেখেছে। তাদের দ্বারা এ অবধি ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি সে। অথচ তৃতীয়জনের পাপ-পূণ্যের তুল্যরাশি অসংজ্ঞায়িত। পরিমাপ করলে পাপ এবং ক্ষতির পরিমাণ বেশি হবে প্রথম চালেই।

-“আপনারা হামলা করেছিলেন বিয়ের গাড়িতে?”

জবাব দিলো না মুরসালীন। অন্তূ বুঝল, ঘটনা সত্যি। জয়ের সাথে সাথে অন্তূর ভেতরে সল্পভাষী এই পুরুষটাকে নিয়েও কিছু কৌতূহল জন্মে গেল।লোহার গেইটের ওদিক থেকে ধাতব আওয়াজ ভেসে আসছিল।

মুরসালীন সতর্ক করল, “আপনি ভেতরে যান। নিজেকে বিপদে ফেলবেন না এখানে আসার খাতিরে। আপনার কোনো সাহায্যের প্রয়োজন নেই আমাদের। আল্লাহ পাক সহায় হলে আমরা যেভাবেই হোক দিন কাটিয়ে নেব। আপনি আর আসবেন না এখানে।”

কথাগুলো মুরসালীন সম্পূর্ণটা ঢালাই মেঝের দিকে দৃষ্টি অবনত করে বলেছিল। একবারও অন্তূর দিকে ফিরে তাকায়নি। অথচ দৃঢ় কণ্ঠস্বরের একরাশ আত্মবিশ্বাস ঠিকরে পড়ছিল তার কণ্ঠস্বর থেকে। চেহারাটা মুরসালীনের আরবীয়দের মতো অনেকটা। সবুজাভ চোখের মণি। কালচে-বাদামি চাপদাড়িতে সুপুরুষ বটে।

আবারও বলল মুরসালীন, "ওরা ভেতরে আসবে এখনই। আপনি বেরিয়ে যান। থাকবেন না এখানে।"

অন্তূ খেয়াল করল, মুরসালীনের বাঁ হাতের কনুইয়ের কাছে টসটসে ক্ষত। পুরো শরীরটা

বিদ্ধস্ত। চোখে ক্লান্তি-কাতরতা আছে, তবে উদ্বেগ নেই।

মুরসালীন আব্দুল আহাদকে বলল, "তুমি এগিয়ে যাও উনার সঙ্গে। সিঁড়িঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবে। একা ফিরতে পারবে তো অন্ধকারে?"-"জি ভাই, পারব। আপা, আসেন আমার সাথে।"

অন্তূর কানে তখনও ওদের ভোঁতা গোঙানি লেগে ছিল। যন্ত্রণায় ছটফট করছে ওরা। তুলির ঘরের সামনে দিয়ে ফেরার সময় দেখতে পেল, তুলি কোয়েলের মাথায় পানি ঢালছে। অনেকক্ষণ সেখানে বসেছিল অন্তূ। জ্বরে গা পুড়ছে ছোট্ট মেয়েটার। তরুরও

জ্বর। অথচ মেয়েটা অতিরিক্ত চাপা স্বভাবের। অন্তূ শিয়রে বসে অনেকক্ষণ ধরে কপাল টিপে দিলো তরুর। মাথায় পানি দিতে চাইলে রাজী হলো না। অন্তূর নিজের রুম থেকে একটা ওষুধ নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দিয়ে এলো।

রাতে ফিরে খাবার খেয়ে হামজা বড়ঘরে এবং জয় রুমে এলো। অন্তূ তখন বিছানা ঝারছিল। জয় শরীরে ঠান্ডার প্রকোপ নিয়ে লম্বা একটা গোসলে গেল। গায়ে পানি ঢালছিল আর গান গাইছিল গলা ছেড়ে,

কেমন আছেন বেয়ান সাব,
বুকে বড় জ্বালা।
কীসের জ্বালা বেয়ান সাব,

নয়া প্রেমের জ্বালা।
এই জ্বালাতে মরে নাই কোন শালী-শালা...
গোসল করে এসে বলল, “ঘরওয়ালি, খাবার রুমে আনো।”
অন্তূ চুপচাপ আনলো। জয় বেহায়ার মতো আবদার করে, “খাইয়ে দাও।”
অন্তূ বেশ নরম সুরে বলল, “আপনি খেয়ে নিন। আমি পড়তে বসব।”
জয় আস্তে করে বলে, “হাত কাটা।”
অন্তূ দেখল, জয়েল হাতে ব্যাণ্ডেজ জড়ানো। আশ্চর্য লাগে তার। একটা মানুষ মাসে কয়বার আহত হয়? অন্তূ ধারণা করল, মুরসালীনের কপালটা বোধহয় জয়

ফাটিয়েছে। বিয়ের দিন আঘাত পেয়ে কপালের পাশে বিশাল জখম হয়েছিল, তার শোধ!অন্তূ খাওয়াতে বসল, প্রথমবার। জয় তাকিয়ে ছিল। এক পর্যায়ে বলল, "পাখির আহার করাচ্ছ, শালী? তোমার হাতের চার বারের খাবার আমি একবার মুখে ঢুকাই।" অন্তূ হেসে ফেলল। জয় অবাক হয়ে চেয়ে থাকে, "হাসছো, তুমি? তুমি?"

অন্তূ বড় এক লোকমা তুলে দিলো জয়ের গালে। তারপর কত শান্ত আর বয়স্ক মেয়ের মতো বলল, "আপনি আমায় হাসতে দেখেননি, না? দেখার কথাও নয়। সামনে এলেই পশুর মতো আচরণ নিয়ে এসেছেন।

তখন হাসি পাবার নয়। আমি মেজাজ খারাপ নিয়ে হাসতে পারার মতো ভারী বুদ্ধিমতি নই।''-“আজ কি ভালো আচরণ করতেছি?'' -“সঁয়ে গেছে।'' মনোযোগ পুরোটা তার ভাতের প্লেটে।

জয় অপলক অন্তূকে দেখল শুধু। প্রকাশ্যে ঠিক যেমন নিখুঁত অবহেলা, নীরবেও অন্তূর অবহেলা তেমনই নিখুঁত। টের পাওয়া যায় কিন্তু অভিযোগ করা যায়না। তবু আগে কখনও এত শান্তিপূর্ণ মুহূর্ত আসেনি তাদের মাঝে। অন্তূকে সে অন্তত প্রথমবার হাসতে দেখল আজ। মলিন হাসি তবু দেখতে

সুন্দর।-“আমার মনেহয় তুমি জন্মেছিলেই গোমরামুখো হয়ে।”

-“না তো।”

-“তাই নাকি?”

-“তা-ই।”

জয় মাথা দোলায় দু’দিকে, “উহু।”

অন্তূ মৃদু বিরোধ জানায়, “হাসতে ভুলেছি কিছুকাল হলো। তার আগে ক্ষেত্রবিশেষ খুব চঞ্চল আর সরল মেয়ে ছিলাম। এটা স্বীকার করছি, আমি বরাবরই একটু....”

-“মারাত্মক কড়া।”

অন্তূ হাসল মৃদু। দু’পাশে মাথা নাড়ল, “আমি মায়া করতে, প্রতিদান দিতে, সম্পর্ক রক্ষা

করতেও জানি, আমি অন্তর দিয়ে খুব তীব্র ভালোবাসতেও জানি। কলিজায় টান লাগলে খুব অসহায়ের মতো হাউমাউ করে কাঁদতে জানি, আবার আঘাতকারীকে এতটা জ্বালাতন দিতেও জানি, যে লোকে তখন আমাকেই স্বার্থপর ভেবে বসবে। এটা বুঝবেন হয়ত পরে। যারা যেমন আচরণের যোগ্য আমি তাদের সামনে কেবল তেমন। শুধু একটু বোকা। বোকামিটা কী জানেন?''

-“হু?'' জয় খুব মনোযোগী শ্রোতা, সে পলকও ফেলছে না। অন্তূ তাকায় না তার দিকে। নিচের দিকে তাকিয়ে প্লেটে হাত নাড়াচাড়া করতে করতে কথা

বলছে।-“নিজের ভেতরের আক্রোশগুলো লুকিয়ে বুদ্ধিমানদের মতো মিথ্যা তোষামোদ করতে পারিনা। তেল মেরে মন জয় করতে জানিনা। আমার ওপর আঘাত এলে তা সহ্য করে চুপ থাকতে পারিনা। তাতে করে শত্রুর সংখ্যা বয়সের তুলনায় কয় গুণ বেশি হয়ে গেছে। স্টুপিড!”

জয় শুধু চেয়ে রইল। তাদের বন্ধনটা রণতরীর ন্যায় ভাসমান, জলন্ত। আজ অন্তূকে অন্যরকম অদ্ভুত লাগল।এইদিন জয়ের প্রথমবার মনে হয়েছিল, এই মেয়েটার কাছে তার পাপ সীমা ছাড়িয়েছে। বুকে এক প্রকার অস্থিরতা ডানা ঝাপটেছিল প্রথমবার জয়ের।

অন্তূর সুকরুণ ভাষাগুলো তাকে উপলব্ধি করিয়েছিল, সে কারও আসামী। প্রথমবার এমনটা হলো।

-“সরল ছিলে না কোনোদিনই। প্রচুর অহংকার তোমার ভেতরে।”-“না। ওগুলো আমার নির্বুদ্ধিতা। আমি নিজের কষ্ট ও দূর্বলতাকে পুঁজি করে মানুষের সহানুভূতি কামাতে আগ্রহী নই কখনোই। ব্যক্তিগত দুঃখকে মুখে করে ঘুরে নিজেকে অসহায় দেখাতে পারিনা। তাই আমার মিছেমিছি কাঠিন্য আর অসভ্যতাই সবসময় নজরে আসে। আবেগ কখনও মুখোরিত হয়না।”

বিস্ময়ে জয়ের হৃদযন্ত্র থেমে রইল। অন্তূ যেন জয়কেই বর্ণনা করল এতক্ষণ। এত গাঢ় মিল আর বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্য নিয়েও তারা দুজন দুজনের থেকে কত দূরে! কত বিরোধ তাদের মাঝে! অথচ গঠনগত দিকটা এক সুঁতোয় গিঁট দেয়া! প্রতিটা বৈশিষ্ট্যে অন্তূ জয়ের মাফিক। শুধু মেয়েটার শক্তি নেই জয়ের মতো, তাই বুঝি এত দুর্ভোগ! জয়েরও তো ছিলনা এককালে! দুজনের মাঝে নিজেকে লুকোনোর পদ্ধতিতে কেবল অল্প ফারাক আছে। জয়ের হাতিয়ার রসিকতা, অন্তূর গাম্ভীর্য।

জয় খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল, তারপর মাথা নাড়ল, "মানছি।" জয় আরেক লোকমা খাবার চিবিয়ে শেষ করে বলল, "মেয়েদের এত গাম্ভীর্য ভালো না।"-"কী ভালো তবে? ফ্যাচফ্যাচ করে কাঁদা, শুধুই স্বামীর সেবা করা, স্বামী তার যেমনই হোক! আর কুকুর-বেড়ালের মতো বছরে বছরে শুধু বাচ্চা জন্ম দেয়া? স্বামী যা-ই করে বেড়াক, দুমুঠো ভাত পেলেই হলো! মারধরগুলো নীরবে সহ্য করে চিহ্ন লুকোতে শাড়ির আঁচল বাড়িয়ে পরা? জাহেলি যুগের মেয়ে না আমি।"

জয় সন্তুষ্ট হাসে। একসময় হাসিটা প্রসারিত হতে হতে সুবিশাল হয়ে ওঠে। আস্তে করে

উচ্চারণ করে, “অস্থির চিন্তাধারা, মাইরি! ড্যাম ড্যাম!” শব্দ করে হেসে ফেলল, “ঘরওয়ালি, তুমি মাল্টিপুল পার্সোনালিটিতে চলে গেছ। নিজের এক সত্ত্বা তোমাকে ধিক্কার দিলে আরেক সত্ত্বা তার প্রতিবাদ করে। নিজের সাথে খুব তর্ক হয়, তাইনা? এটা খারাপ না বটে।”

-“আপনারও আছে রোগটা।”

-“তুমি কী করে জানলে?” মুখ ফসকে বলে ফেলল জয় অবাক হয়ে।অন্তূ হাসল, “আপনার এক সত্ত্বা বলে, আপনি পাপ করেছেন, যা করছেন তা ঠিক নয়। আরেক সত্ত্বা তার বিরোধিতা করে পয়েন্ট কাটিয়ে

দেয়। যেটাকে আপনি বলেন, 'জয় আমির কখনোই নিজের কর্ম নিয়ে আফশোস করেনা।''

জয় বাকরুদ্ধ হয়ে চেয়ে রইল। অন্তূ নিজে থেকেই আলতো হাসে, "আমার নব্বই শতাংশ পড়া ও আত্মস্থ করা বই আপনি, জয় আমির। এতগুলো দিন শুধু বোকামিই করিনি, কিছু ন্যাকামিও করেছি। যেটাকে হিপোক্রাইসি বলা হয়।''চোখ মারল অন্তূ, "তার বদলে অবশ্য স্থায়ী বিনিময় শোধ করেছি কিছু।''

জয় আবোল-তাবোল বলল যেন, "আমার মনে হয় তুমি আমার প্রেমে পড়ে যাচ্ছ, ঘরওয়ালি। না বাসলেও, ভালো বাসবে, একটু

দিন গেলে।”অন্তূ গভীর চোখে চেয়ে মসৃণ, স্মিত হাসল, “সূর্য পশ্চিমে উদিত হয়ে পূর্বে অস্তমিত হতেই পারে।”

জয় হো হো করে হেসে ফেলল, “হতেই পারে।”

-“তা হলে তো হলোই। সূত্রানুযায়ী আমিও আপনাকে ভালো বাসতেই পারি।”

জয়ের হাসি ঠোঁটেই রইল, শুধু সেটার জ্যোতি নিভে অন্ধকার হয়ে এলো হাসিটা। অন্তূ খাবার এগিয়ে নিয়ে গেলে জয় মানা করল, “আর খাবো না।”

-“আর কিছুটা আছে। নিন।”

-“খেতে ইচ্ছে করছে না আর। জোর কোরো না, ঘরওয়ালি।”

সে উদাস পায়ে উঠে দাঁড়ায়। সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া গিলতে থাকে। অন্তূ প্লেট রেখে এক গ্লাস পানি এনে ধরিয়ে দেয়। জয় আনমনে ছিল, চমকে উঠে গ্লাস নেয়। জয় আচমকাই জিজ্ঞেস করে, “আমায় অনেকেই ঘৃণা করে। কোনোদিন কারণ জিজ্ঞেস করিনি। তোমায় করছি।”

মুখে কিছু না বলে শুধুই মুচকি হাসল। সেখানে কত জবাব শব্দহীন পড়ে আছে। সেসব চেপে বশল, “আমি কৃতজ্ঞ আপনার ওপর। ধন্যবাদ।”জয় বিভ্রান্ত হলো কিনা

বোঝা গেল না। নারীর ছলনায় জয় আমিরের মতো পুরুষেরা কেমন প্রভাবিত হয়, তা তার অভিব্যক্তিতে অন্তত ধরা গেল না।

অন্তূ বলল, “কাল সকালে একটু ওই বাড়িতে যেতে চাইছি। কয়েক ঘন্টা থাকব। একটা ছেলেকে সঙ্গে দেবেন। একা যেতে ভয় লাগে। চারদিকে যা চলছে।”

এবার জয় অবাক অথবা সন্তুষ্ট হয়ে তাকায়। তার ওপর অন্তূর এই ভরসা ভীষণ দুর্লভ! পরক্ষণেই নিজেকে বকে উঠল।সকাল হতে হতে তুলির মেয়ের শরীর একেবারে নেতিয়ে পড়ল জ্বরের তোপে। তরুকে নিয়ে যেতে চাওয়া হলো। অথচ চাপা স্বভাবের মেয়েটা

সকাল সকাল উঠে কাজবাজ করা শুরু করেছে। সে যাবেনা। প্যারাসিটামল খেয়ে সে নাকি খুব চাঙ্গাবোধ করছে।

তুলি রিমিকে সাথে নিয়ে মেয়েকে ডাক্তার দেখানোর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। হামজা সঙ্গে দুজন ছেলেকে পাঠালো। তারা দূরে দূরে থাকবে, লক্ষ্য রাখবে ওদের।

পৌরসভায় নতুন বাজেট বরাদ্দের কাজ চলছে। হামজা ওদিকেও বেশ ব্যস্ত। সকালে তাকে কার্যালয়ে চলে যেতে হলো। জয় তখনও ঘুমাচ্ছে। খানিক পর উঠে সেও কোথায় বেরিয়ে পড়বে। পলাশের খোঁজ পেয়েছে। পলাশ নাকি চেষ্টা করছে, জয়ের

নামে থানায় চাপা পড়ে থাকা পুরোনো অভিযোগের ফাইল তাজা করতে।

অন্তূ তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল। রোদের তেজে মুখটা ঘেমে লাল হয়ে ওঠে। অথচ ঠোঁটে স্মিত হাসি। জয় আমিরের চোখের বিভ্রান্তি এত শান্তিদায়ক!

□

ব্যবচ্ছেদ

অফ-হোয়াইট রঙা দেয়ালের ডানপাশে একটি বর্ষপঞ্জিকা ঝুলছে। পাতাটা আগের মাসের। আজ সবে মাস বদলেছে। পঞ্জিকার পাতা উল্টানো হয়নি। সালটা ঠিক আছে—২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ।

মাহেজাবিন স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে ধীর পায়ে উঠে গিয়ে পাতাটা উল্টে দিলো পঞ্জিকার। গতপরশু জুন মাসের ২৯ তারিখ, জয় আমিরের ৩১তম জন্মদিন ছিল। আজ জুলাইয়ের ০১ তারিখ যাচ্ছে।বিকেল হয়ে আসছে। জানালা বাইরে তাকিয়ে দেখলেন মিস ক্যাথারিন। মাহেজাবিন কাহিনির মাঝে চট করে থেমেছে, এরপর উঠে গেছে পঞ্জিকা ঠিক করতে। এই মেয়েটা এত অদ্ভুত চলনের! বুঝতে পারেন না তিনি। মাহেজাবিন ফিরে এসে সোফাতে বসল ফের। তিনি খুবই বিরক্ত হলেন। ভ্রু কুঁচকে

তাকালেন সম্মুখে বসে থাকা ছাব্বিশ বর্ষীয়া নারীটির পানে।

অতি-হালকা এক ধরণের নীল রঙ যেটাকে বলা হয় ক্যাডেট-ব্লু কালার। সেই রঙা খাদি কাপড়ের শাড়ি পরনে। বাঁ-হাতে জোড়া স্বর্ণের চুড়ি। গলায় চিকন সোনালী চেইন। কুঁকড়ানো লম্বা চুলগুলো ঘাঁড়ের ওপর হাতে খোঁপা করা। কোনো প্রসাধনী নেই, তবু যেন কোনো অভিজাত কুমারীকা! কাজের চাপে নিজের বিশেষ যত্ন ছাড়াও এত অলংকারহীন ঐতিহ্য আর গাম্ভীর্য! রোজ মুগ্ধ হলেও সেদিকে তাকিয়েও মিস ক্যাথারিন বিরক্ত হলেন আজ।

মাহেজাবিন চেয়ে আছে জানলার বাহিরে। শাড়ির বিশাল আঁচলটা বিছিয়ে আছে মেঝেতে। পা দুটো মেলে দেবার মতো বসে আছে। সোফার হাতলে হাত মেলে রেখেছে। রাজ্যের ভাবুকতা কাজলহীন চোখদুটোয়। উদাস-উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টিজোড়া প্রকৃতিতে বিছিয়ে আছে।চট করে কাহিনির মাঝে থেমেছে, আর শুরু করছে না। তিনি বৈকালিক প্রার্থনা ভুলে শুনছেন কাহিনি। তাতেও বেশ বিরক্তই হচ্ছিলেন বটে। আজ এই মেয়েকে দেখে কে বলবে, সে একসময় এত হুটমেজাজি ছিল? সমুদ্রের মতো গভীরতা, নিশ্চুপ চলন, বিনয়ী ভঙ্গিমা, শব্দহীন

পদক্ষেপ আজ তার। সেসব কি পূর্বের সেই হুটহাট ক্ষেপে ওঠা অভিজ্ঞতারই প্রাপ্তি? কিছু বলতে যাবেন, তার আগেই মাহেজাবিন হাত উঁচিয়ে ধরে মুচকি হেসে বলল, "ক্ষমা চাইছি, মাদাম। একটু বিরতি প্রয়োজন আমার। এক কাপ চায়ের তৃষ্ণা পেয়েছে। তা মিটিয়ে বরং আপনার প্রশ্নের উত্তর দেই!" তখনও দৃষ্টি জানালার বাহিরেই। ওভাবেই মাহেজাবিন ডাকল, "লতা? দু-কাপ চা করে দে!"

এরপর জানালা থেকে নজর ফেরালো, মুচকি হেসে বলল, "আপনার প্রশ্ন করুন এবার।

"-"অনেক প্রশ্ন করেছি এ যাবৎ।

কোনোটারই উত্তর না দিয়ে একরোখার মতো গল্প বলে গেছ।''

-"অসন্তুষ্ট হবেন না। এবার কিন্তু আমি নিজেই প্রশ্ন করতে বলছি।''

-"ঠিক আছে, সব পরে হবে। আগে এটা বলো, তুমি মাইন্ড-ট্যাঙ্গল ইন্টারঅ্যাক্ট প্লে করেছ ওদের সঙ্গে?'' ভ্রু জড়িয়ে ফেললেন মিস ক্যাথারিন।

-"তা বলছেন কেন?''

-"মনে হলো।''

-"না। সেসব পারিনা আমি।''

-“ইশ্বরের দোহাই, মিথ্যে বলবে না। জয় আমির এ পর্যায়ে তোমার প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠেছিল।”

-“তাতে কী প্রমাণিত হয়?”

-“তুমি তো এটাই চাইতে—তার জীবনের প্রতি মোহ জন্মাক।”

-“তার সাথে শুধুই লড়াই চলেছে আমার। সেটাও আমার খালি হাতের। এত গভীরভাবে ভাবছেন কেন?”

মিস ক্যাথারিন হাসলেন, “সংসারত্যাগ কি অ-ভাবুকেরা করে? তোমার রুক্ষ আচরণ জয় আমিরকে তোমার দিকে মনোযোগী করেছিল, আর সেই মনোযোগ তোমাকে নিয়ে তাকে

ভাবতে বাধ্য করেছে, আর তা থেকে তোমার প্রতি সে... কারণ তুমি ছিলে সবার থেকে ব্যতিক্রম তার দৃষ্টিকোণে... তার সম্মুখে তুমিই প্রথম কেউ, যে তাকে সমীহ না করে ধিক্কার জানিয়েছে বারবার। বিয়ের পরে কি এ কাজটা ইচ্ছাকৃত একবারও করোনি?"

মাহেজাবিন অদ্ভুতভাবে সূক্ষ্ম হাসল, "তা কেন মনে হলো?"-"বলো, সত্যি কিনা!"

-"কিছুটা।"

-"আই বিলিভ দ্যাট, তুমি জয় আমিরকে কখনও কখনও ইচ্ছাকৃত ক্ষেপিয়ে তুলেছ। এবং জেদ ধরে সেটাকে তামাশার পর্যায়ে নিয়ে গেছ।"

সোফাত হাতল থেকে হাত তুলে, “ভুল বলছেন, মাদাম। শুধু তাকে প্রশ্রয় দেইনি, ভয় পাইনি পরিণতি অথবা পরিস্থিতিকে বিশেষ। এটা কাজ করেছিল বেশ। সকলেই ভয় পেত, আমি চেষ্টা করেছি নিরুদ্বেগ থাকার। এটা ওদের জন্য চিন্তার ছিল। আর তাতে আমার বেশ সাময়িক ভোগান্তিও হয়েছিল।”

-“এটা কার্যকর ছিল। তাহলে স্বীকার করছো না কেন?”

মিস ক্যাথারিন থেমে গেলেন। মাহেজাবিন মুচকি হাসল। তিনি চট করে বললেন, “আচ্ছা! জয় আমির ভালোবেসেছে তোমায়?”

-“জিজ্ঞেস করিনি কখনও।”

-“তুমি কোনগুলোকে নিজের বোকামি বলো?”
““আজ কিছুকেই না। তখন মাঝেমধ্যে মনে হতো, হয়ত বোকামি করছি।”
-“তা কেন?”
অন্তূ শুধু হাসল মুচকি, কথা বলল না। মিস ক্যাথারিন বললেন, “তোমার বাবার মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী করো।”
-“প্রশ্নই ওঠেনা। মৃত্যু অবধারিত সত্য। তার জন্য দায়ী যদি কেউ থেকে থাকেন সেটা তো সৃষ্টিকর্তা! সেই মহান সত্ত্বাকে দায় দেওয়া?....আসতাগফিরুল্লাহ! আল্লাহ পাক মাফ করুন আমায়।”-“তখন কেন ভাবতে?”

-“তখন আমি অন্তূ ছিলাম, কারও কারও আরমিণ ছিলাম। আজ তা নই!”

-“প্রতীকী কথা ভীষণ বলো, তুমি। উফফ! বুঝতে বেগ পেতে হয়।” হেসে ফেললেন মিস ক্যাথারিন।

ফের গম্ভীর হলেন তিনি, “আর অন্তিকের মৃত্যু। সেটার জন্য কাকে দায়ী করো? নিজেকে মনেহয় না?”

-“কখনোই না। আপনার তা মনে হয়?”

-“তুমি হামজা-জয়ের প্রকাশ্য বিরোধিতা না করলে এমন হতো না। আমি মানি তা। এখানে স্টুপিডের মতো কাজ করেছ তুমি।”

-“এবার নিয়ে পুরো কাহিনিতে কথাটা শতবার বলেছেন। অথচ এটা ভুলে যান ওদের কাছে মানুষ খুন করার জন্য সবকিছুর প্রয়োজন হলেও। কারণের প্রয়োজন কখনোই ছিল না। এরকম হাজার অন্তিককে রোজ মেরে আসতো। তাদের সকলের কয়টা করে আমার মতো বোন ছিল?”মিস ক্যাথারিন ভ্রু কুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন।

অন্তূ রহস্য জড়িয়ে ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল, “আমি অ্যাডভোকেট মাহেজাবিন আমির। রোজ কতশত অপরাধীর বিরুদ্ধে কেইস লড়ে ফিরছি। তার পরিণাম কী হবে, তা ভেবে কি আদালতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে মনে মনে

ফন্দি আঁটবো যে, কীভাবে পরে লুকিয়ে প্লান-প্রোগ্রাম করে নিরপরাধকে মুক্তি এবং অপরাধীকে ছক এঁকে ফাঁসি দেয়া যায়? আদালতে চুপ থাকি, নয়ত আমার বাপ-ভাই মরে যাবে। আর চুপচাপ হজম করলে তারা চিরকাল বেঁচে থাকবে। অমর হয়ে যাবে ওরা! '' কথার মারপ্যাচে উপহাস করে উঠল মাহেজাবিন।

এরপর বলল, "ইন্টেলিজেন্ট সবাই পরিবার বাঁচাক, আমার পেশা এবং নেশা কেবল তা নয় এক জীবনে। স্বাধীনভাবে চলে যতদিন দুনিয়ায় টেকা যায়, যথেষ্ট।''মিস ক্যাথারিন একটু লজ্জা পেলেন। অন্তূ নরম হাসিমুখে

বলল, “আমাকে কথা বলে, শত লোকের সম্মুখে যুক্তি দিয়ে তর্ক করে কেইস ডিসমিস করতে হয়, মাদাম। আর সেটা অপরাধীর বিরুদ্ধে, ভরা আদালতে দাঁড়িয়ে উঁচু আওয়াজে করতে হয়। সেখানে অপরাধীদের পুরো গ্যাঙ উপস্থিত থাকে। আজ যেমন ক্ষতির ভয় না করেও দিব্যি অপরাধীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণের জন্য আওয়াজ তুলি, তখনও তুলেছি। এরপর যা হয়েছে, সেটা হয়েছে রং টাইমিংয়ের জন্য। তখন যা-ই করতাম, ধারাবাহিকভাবে হিতে বিপরীত অর্থাৎ আমার খারাপই হতো। আজ তেমন হয়না, অন্তত তেমন খারাপ হয়না। হিড়িক

বোঝেন? ক্ষতিগ্রস্ত হবারও একটা হিড়িক থাকে, যখন যার পালা, তখন শুধু তারই। একে তকদীরও বলা যায়!''

-"কৌশল খাটাতে পারতে। বুদ্ধিমানেরা নীরবে চাল চালে। তুমি বারবার ধরা পড়ে গেছ। কারণ তুমি সতর্ক ছিলেনা।মাহজাবিন শাড়ির আঁচল তুলে হাতের কব্জিতে রেখে শীতল হাসল, "আমি কি ঢাকঢোল পেটাতাম? ক্ষেত্রটাই এমন ছিল যে, সেখানে কোনো গোপনীয়তার সুযোগ ছিল না। ওরা ছিল মাত্রাতিরিক্ত চতুর। এখানে বসে যতটা সহজে সতর্কতার কথা বলছেন...আচ্ছা আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি এখন যে, আপনি

ওখানে থাকলে আমি যা করেছি সেইসব বোকামি না করে তার বদলে আপনি কী কী কৌশল খাটাতে পারতেন?''

মিস ক্যাথারিন জবাব দিতে পারলেন না। চুপচাপ চেয়ে রইলেন অন্তূর দিকে। অন্তূ সোফাতে হেলান দিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিলো। মিস ক্যাথারিনকে ইশারা করল কাপ তুলে নিতে।

কাপ নামিয়ে রেখে বলল, "কৌশল খাটানোরও বিশেষ জায়গা থাকে, মিস ক্যাথারিন।''মিস ক্যাথারিন তাকালেন।

মাহেজাবিন বলল, "ধরুন, আপনার সম্মুখে কাউকে খুন করা হচ্ছে। আপনি বাঁধা না

দিয়ে মনে মনে বুদ্ধি আঁটছেন, কারণ আপনি বুদ্ধিমান, ঠান্ডা মাথার খূনি। কারণ আপনার ভয়, এখন কথা বললে আমারও ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। ততক্ষণে লোকটাকে মারা শেষ —ওটা আপনার বুদ্ধির লাভ? বাচ্চাগুলো না খেয়ে ছটফট করতো, চাবি নেই আমার কাছে, আপনি কী কৌশল খাটাতেন?

আমি কোনো মাফিয়া চক্র নই, যে থাপ্পড়ের বদলা কঠিনভাবে নিতে সেখানে হেসে পরে তার প্রতিশোধ নিতে গভীর প্লান বানাবো। আমি চিরকাল সাধারণ মেয়ে। খুব নির্বোধ। আর সবসময় শান্ত থাকাটা মানব মস্তিষ্কও প্রেফার করেনা। সে উদ্দীপনার আধার।

আপনার মাঝে সেন্স থাকলে তা তখনই সেন্সিটিভিটিতে জ্বলে উঠবে, এটাকে সেন্স-রিফ্লেকশন বলে। যেমন আমার হতো। আমি চেয়েও জয়-হামজা-পলাশের সম্মুখে মিথ্যা তোষামোদ দেখাতে পারিনি। ভেতরের ঘৃণা ও সমগ্র পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি আমায় অত সুস্থভাবে ভাবার সুযোগ দেয়নি কখনও। ভেতরের আক্রোশ বেড়িয়ে আসতো ঝটপটিয়ে।''-"অন্তিকে মৃত্যু? ওটা কি তোমার কারণে হয়নি?''পুনরায় বললেন মিস ক্যাথারিন।

মাহেজাবিন আবারও হাসল শুধু, "শুধু জেনে রাখুন, 'না'। তাছাড়া আমি মনে করি, ওটা

কর্মফল এবং কাকতালীয় পরিণতি। অন্তিকের মতো অন্তিকেরা রোজ হাজারটা পিষে যাচ্ছে হামজা পাটোয়ারীর মতো রাজনৈতিককদের শুধু ইচ্ছাতে। তাদের সবার বোন আমি নই।''
লতা এসে পা ঝেরে দাড়াল, "দিদিমণি, আর কিছু চাইবা না কইলাম। আমি সিনেমা দেখতেছি। এই নেও বিস্কুট।''
মাহেজাবিন জবাব দিলো না কোনো। লতাও আশা করল না। সে তার ম্যাডামসাহেবার কাছে জবাব পেলেই অবাক হয়। তার ধারণা তার ম্যাডাম বাংলা জানেনা ঠিকমতো, তাই কথাও কয়না প্রয়োজন ছাড়া। কিন্তু আজ রাগ হলো। আজ তো বেশ কথা বলছে এই খ্রিষ্টান

মহিলার সাথে!মিস ক্যাথারিন বললেন, “সব স্থানে উকিলগিরি? নিজেকে খুব ডিফেন্স করতে জানো, দেখছি! দেখি এত যুক্তি শেষ অবধি তোমার জীবনকে কতটা যুক্তিযুক্ত অবস্থানে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে।

মাহেজাবিন মুচকি হাসল, “আত্মরক্ষা ফরজ। আর যুক্তি হলো মনের বুঝ। ভুললে চলবেনা —জীবন তার পরিকল্পনা মাফিক প্রবাহিত হয়। আমরা কেবল জীবনের দাস। তার পেছনে নিরুপায় এগিয়ে চলি। জীবনের পরিকল্পনার সামনে যুক্তি খাটেনা। শুধু কাযকর্ম ব্যাখ্যা করার মাধ্যম হলো যুক্তি।

’’-“সেদিন ছেলেটাকে সঙ্গে কেন নিয়েছিলে ইচ্ছাকৃত? মন থেকে নাওনি তা আমি জানি।’’ মাহেজাবিন কাপ নামিয়ে রেখে বলল, “মানুষকে বিভ্রান্ত করা খুব সহজ। সেদিন আমি নিজে থেকে লোক চেয়ে নিয়েছিলাম। তাতে কি আর আমার ওপর সন্দেহ আসবে, যে আমি অন্য কোনো কাজে যাচ্ছি। তাহলে তো লোক সঙ্গে নিতাম না। তাছাড়া...’’মিস ক্যাথারিন কথা কেড়ে নিলেন, “তাছাড়া জয় আমিরের মনে হয়েছিল যে, তুমি তাকে ভরসা করছো। কৃতজ্ঞতা আর ভয়ে তার সাহায্য গ্রহণ মানে তো সব মেনে নেয়াই।’’বাড়ির সামনে অযত্নে লতাপাতা জন্মেছে কত! অন্তূ

তালা খুলে দরজার সামনে ছেলেটার দিকে ফিরে তাকাল, “আপনি কতক্ষণ থাকবেন?”

-“আপনে যতক্ষণ আছেন, ভাই আশেপাশেই থাকতে বলেছে। সমস্যা নাই, আমি আশেপাশেই আছি।”

-“হ্যাঁ। দূরে যাবেন না যেন। বাড়ির আশেপাশেই থাকুন। আমি কয়েক ঘন্টা থাকব এখানে।”

অন্তূ ভেতরে ঢুকে দরজা আঁটকে ওভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে অবাক হবার মতো করে হাসল, “আরে! দাঁড়িয়েই আছেন দেখছি। যে রোদ বাইরে, ঘেমে যাচ্ছেন। এতক্ষণ তো আর এভাবে

বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা যায়না। চাইলে আপপাশের দোকান থেকে চা-টা খেয়ে আসতে পারেন।''লজ্জা পাচ্ছিল লোকটা। অন্তূ কিছু টাকা বের করে এগিয়ে দিয়ে সুন্দর করে হাসল, "নিন। আর অনেক ধন্যবাদ। বেশি দূরে যাবেন না যেন। আশেপাশেই দোকানপাটে বসুন। বাড়ির দিকেও খেয়াল রাখবেন।''

অন্তূ জানে এসব লোক নেহাত বড়ভাইদের মন জয় করতে এসব কাজ করে। মোটেও তার মনোযোগ থাকবে না বড়ভাইয়ের বউ বাপের বাড়িতে ঢুকে কী করছে না করছে, সেদিকে। আন্তরিকতা শূন্য তেলবাজী যাকে

বলে। যেটা সে পারেনা। এইসব পার্টির ছেলেরা খুব জানে।লোকটা চলে যাবার পর অনেকদিন পর অন্তূ নিজের পুরাতন বোরকাটা পরল। গায়ে চড়ানোর সময় বুক আঁটকে আসছিল। ধমকে নিজেকে সামলে ওড়না দিয়ে মুখটাও আবৃত করে নিলো। বহুদিন পর এই সম্মানিত পোশাক গায়ে চড়িয়ে নিজেকে খুব অপরাধী লাগছিল। টেনেটুনে খুলে ফেলে চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। সম্মান অবশিষ্ট নেই আর তার। তার সম্মানে আবৃত শরীরটাকে অনাবৃত করে লোকচোখের লোভী চাহনি ও মিথ্যা নাটকীয় অপবাদের আঘাতে ছিন্নভিন্ন করা

পুরুষটা আজ তার স্বামী। আর আজ সে-ও মন ও চলনের দিক থেকে সেই সরল-শুদ্ধ মেয়েটা নেই পুরোপুরি।জয়ের ছেলেটা আড্ডায় বসে গেছে মোড়ের টঙে। উল্টো পথ ধরে মুস্তাকিনের ফ্ল্যাটের দিকে হাঁটা ধরল। লোকটাকে তার সন্দেহের সাথে মিলিয়ে দেখার পালা এবার। ফ্ল্যাটে না পেলে কার্যালয়ে যাবে। যদিও এতেও সন্দেহ আছে, সে আসলেই চাকরিটা করে কিনা! না পেলে কী করবে, এটা ভেবে উত্তেজনায় ঘেমে ভিজে উঠল শরীরটা। তবু মন বলছিল পাবে, পাবেই!

তালা ছিলনা ফ্ল্যাটের দরজায়। অন্তূ খুশি হলো। দরজায় বেল টিপে অপেক্ষা করল। হাতের তালু ঘামলে খুব অস্বস্তি হয়। উত্তেজনায় হাত ভিজে উঠছে। কয়েকবার বেল চাপলো। খুলছে না কেউ। বারবার বেল চাপাটাও এক প্রকার অভদ্রতা। তবু আরও কয়েকবার করাঘাত করল।

দরজা খুলল মুস্তাকিন। দরজাটা অল্প একটু ফাঁক করে দেখল অন্তূকে। তার চোখ-মুখে বিস্ময় ছড়িয়ে পড়ল, যা সচরাচর দেখা যায়না। অন্তূ অবাক হলো, যখন দেখল, মুস্তাকিনের হাতে লোডেড পিস্তল ছিল, সেটা অন্তূকে দেখে চট করে লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা

করল।মুস্তাকিন মেকি হাসে, "উড-বি উকিল মহোদয়া! চমকে দিয়েছেন পুরো! আমি ভেবেছি পুলিশ!"

অন্তূ উপহাস করে ওঠে, "পিবিআই অফিসার সৈয়দ মুস্তাকিন মহান কোন সংস্থার পুলিশকে ভয় পেতে পারে? সেটা ভাবার বিষয়। পুলিশকে অপরাধীরা ভয় পায় বলেই জানতাম। কত ভুল যে জানি আমি!"

মুস্তাকিন বুঝল খোঁচাটা। তার ওপর গাঢ় সন্দেহের তীর তাক করেই এই নারীটি আজ তার দরজায় কড়া নেড়েছে। সে জানতো, আসবে। এবার দিনাজপুর ফিরলে এই রমনীর সম্মুখীন তাকে হতে হবে, এই প্রস্তুতি

ছিল তার। ঘাঁড় চুলকে হাসল, “ভেতরে আসুন, দরজায় দাঁড়িয়ে কেন? ভয়-টয় পাচ্ছেন নাকি? ওসব মানায় না আপনাকে। তার ওপর জয় আমিরের বিবাহিতা স্ত্রী আপনি। লোক কাঁপবে আপনাকে দেখে।”

-“ভয় তো পাচ্ছিই। আজকাল ভয়টা ঘামের মতো হয়ে গেছে। সাধারণ তাপমাত্রায়ও ঠিকরে বেরোয়।”

-“আমাকে ভয় পাবার কী?”

-“অনেককিছুই আছে, জনাব.—” বাকিটা বলল না। ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, “আপনি যেন কে? জনাব—”জয় ঘুম থেকে উঠে বড়ঘরে গিয়ে আধঘন্টার মতো কাটিয়ে

এরপর ফিরল বাড়ির ভেতরে। তরুর জ্বর। চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে। তবু ছুটে এসেছিল জয়কে খাবার দিতে। জয় ধমক মারল একটা, "বেশি গিন্নিগিরি দেখাবি না আমার সঙ্গে। আমার লম্বা দুটো হাত আছে। বেড়ে নিয়ে খাচ্ছি। তুই তৈরি হয়ে নে। চল তোকে ডাক্তার দেখিয়ে এরপর যাব কাজে।"

-"আমি সুস্থ আছি।"

-"থাপড়ে কান গরম করে দেব। চোখ উল্টে মুখ ভেঙচালো, আমি তুস্থ, আমাল কিতুই হয়নি। সিনেমা করো? ওইহ্ চেংরী! খাইছিস সকালে? বস।"

তরু হেসে ফেলল। জ্বরের তোপে শুকনো মুখের হাসি মেয়েটার মুখে অদ্ভুত দেখালো। জয় মায়াভরে চেয়ে থেকে নরম করে বলল, “বস। আয় একসাথে খাই। একা একা খাইতে ভাল্লাগেনা আমার।”

এই ডাক উপেক্ষা করার সাধ্যি নেই তরুর। বসে মনে মনে বলল, ‘জানি না কি তা আমি? একা খেতে পারেন না, আর তাই ছোটবেলা থেকে বসে বসে খাওয়া পাহারা দিতে গিয়ে আমার কত বড় সর্বনাশ হয়েছে, তার খোঁজ রাখলেন না, নিষ্ঠুর পুরুষ। তবু আপনি এত মায়াময় কেন বলুন তো?’তরু খেতে পারছিল না। জয় তুলে তুলে দিলো, সাথে ধমক ফ্রি।

চোখ দেবে গেছে কোটরের ভেতর। জয় দাঁত খিঁচে উঠল, “ইচ্ছা করতেছে, তোর চুলের ঝুঁটি ধরে ঘুরান্টি মারি চারটা। ওরা গেছে ডাক্তারের কাছে, তুই যাস নাই ক্যান? এখন যদি তোরে ধরে দুটো চড় মারি, ঠেকাবে কে? ”

তরুর হাসি পেল। একমাত্র মানুষ এটা, যার সামনে কারও গাম্ভীর্য চলে না, সে না চাইলে। ঠোঁট উল্টে একটু আহ্লাদ করে, “ধুর। আমার ডাক্তারের কাছে যেতে ভাল্লাগে না। ওষুধ দেয় একগাদা। ওষুধ ভাল্লাগেনা। তিতা...”

-“তো ওষুধ কি আবার চানাচুরের মতো টক-ঝাল-মিষ্টি স্বাদ লাগবে খেতে? এই জন্যই

কওয়া হয়—মেয়েলোকের নাই বারো হাত কাপড়ের কাছা।"-"আপনি আসার সময় জ্বর আর শরীর ব্যথার কথা বলে ওষুধ আনবেন নাহয়। আমি যেতে পারব না। হাঁটতে গেলে শরীর বেশি খারাপ লাগছে। এতদূর যাব আবার। আপনিই আনবেন নাহয়!"

তরুর আস্তে আস্তে অল্প আদুরে আহ্লাদ নিয়ে বলা কথাগুলোতে জয় হাসল। এই চাপা মেয়েটার কিঞ্চিৎ আহ্লাদটুকুর সবটাই একমাত্র জয়ের কাছে। হামজাকে তরু বড় ভয় পায় ছোট থেকেই। জয় মাথা নিচু করে আলতো হাসিমুখে খাবার গিলছে। চোখে-মুখে বিরক্তি দেখিয়ে ঠোঁটে হাসলে জয়ের মতো খিটখিটে

পুরুষদের বুঝি একটু বেশিই সুন্দর দেখায়, তরুর তাই মনে হলো।

জয় খাওয়া শেষে ডাকে, “এদিক আয়।”

তরু এলে কপালে হাত রেখে তাপমাত্রা দেখে বলল, “জ্বর মেপেছিস?”-“হ্যাঁ। একশো চার ছিল সকালে। এখন কম মনেহয়। ভালো লাগছে শরীরটা।”

জয় কড়া চোখে তাকায়, “বাটপার কেন তুই এত? নিজের সমস্যা না থাকলেও লোক বানিয়ে সমস্যা বলে সুবিধা নিয়ে বড়লোক হয়ে যাচ্ছে। তুই আর আমার বউ দুই মহিলা, যাদের নিজের জন্য কিছু চাওয়ার নাই।

অন্যের জন্য নিজে বাঁশ খেয়ে লক হয়ে থাকে।"

খেয়ে গোসল করে তৈরি হয়ে নিলো। পলাশ এখন জয়পুরহাটে আছে। জয় এটা ভেবে হাসে, তার নামের শুরুটা দিয়ে জেলার নামের শুরুতে পলাশের সাথে একটা মিটিং করলে খারাপ হবেনা। গুনগুন করে গান ধরল,

এই পদ্মা, এই মেঘনা, এই যমুনা সুরমা নদী তটে

আমার রাখাল মন গান গেয়ে যায়...

কী আমার দেশ, কী আমার প্রেম...কী আনন্দ, বেদনা, মিলনও বিরহ সংকটে..গান ছেড়ে আয়নায় নিজেকে দেখে সন্তুষ্ট হলো। দারুণ

বলিষ্ঠ আর হ্যান্ডসাম লাগছে দেখতে। বউটা গেছে বাপের বাড়ি। তা ভেবে দুঃখ হলো। এখন থাকলে একটু জ্বালাতন করা যেত। বদমায়েশের মতো মুচকি হাসল। ওর বউয়ের চোখদুটোকে ওর বড় ভয়। নিজের জন্য ওই চোখে ঘৃণা দেখলে খুব রাগ হয়, মন চায় থাপড়ে চোখের দৃষ্টিতে নিজের জন্য একটু ভয় আনতে। আর সবাই পায়, ঘরের বউ ভয় কেন পাবেনা? এই দুঃখে, হতাশায় জোরে করে স্লোগান দিয়ে উঠল, 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।'

পরে ভাবল, আহারে! বঙ্গবন্ধুর বউটা তার বউ হলেও পারতো। তার বউয়ের মতো এমন কড়া ছিল না হয়ত।

বের হবার সময় তরুকে ডাকল, "নিচে ছেলেরা আছে। কোনো দরকার পড়লে ডাকবি শুধু একবার।"

তরু ঘাঁড় নাড়ল।-"মাথায় পানি নিবি? চল, দুই বদনা হট-কুল পানি মাথায় ঢেলে যাই। জ্বর নেমে যাবে।"

-"না না। আপনি কোথাও যাবেন, যান। আমার শরীর ভালো আছে বললাম তো। দরকার হলে বাথরুমের ট্যাপকল ছেড়ে পানি মাথায় নেব আমি নিজেই।"

জয় গম্ভীর মুখে বেরিয়ে যাচ্ছিল, তরু হন্তদন্ত পেছন থেকে ডাকল, "দাঁড়ান দাঁড়ান।"

জয় পেছন ফিরল, "আবার কী?"

তরু টলমলে পা নিয়ে ফ্রিজের কাছে যায়। ছোট্ট কনটেইনার-বক্স নিয়ে এসে জয়ের সামনে ধরে বলল, "গতদিন সুজির হালুয়া বানিয়েছিলাম কোয়েলের জন্য, সেটা দিয়ে পরে বরফি বানিয়েছি। আপনার খুব পছন্দ। এই দুটো খেয়ে যান।"জয় দাঁত কিড়মিড় করে বিরবির করল, "থাপড়ে তোর.. ওই! তুই কি ধরেই নিয়েছিস আমি রাস্তায় মরে যাব, নাকি তুই-ই বাঁচবি না? রেখে দে। এসে

খাব আরামে বসে। ফিরলে মনে করে দিবি কিন্তু।"
তরু মুখটা ছোট করে দাঁড়িয়ে রইল। জয় বলল, "ভুলে যাস না। আসলেই দিবি। ফ্রিজে রাখ এখন। আমি কাউকে দিয়ে প্রাথমিক ওষুধ পাঠাচ্ছি। ফেরার পথে ডাক্তারের সাথে কথা বলে ওষুধ আনবো। সাবধানে থাকিস। বেহুশ হয়ে পড়ে-টে থাকার আগে গলা দিয়ে টুকটাক আওয়াজ বের করিস।"
জয় চলে গেলে তরু খাবারটা ফ্রিজে রেখে দিলো। জয় ফিরলে বের করে দিতে হবে। জ্বর শরীরে নিয়ে সে গতদিন বরফি বানিয়েছে, লোকটার খুব পছন্দ সুজির

বরফি।-“কবে ফিরেছেন দিনাজপুর?”
আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ল অন্তূ। ফ্ল্যাটের হাল দেখে বোঝা যাচ্ছে, বহুদিন লোক ছিল না এখানে। মুস্তাকিন বিভ্রান্ত হলো কি-না, বোঝা গেল না। মুচকি হেসে বলল, “নাশতা হিসেবে কী খেতে পছন্দ করবেন আমার হাতের?”
-“একগ্লাস পানি এনে রাখুন।”
-“শুধু পানি?”
অন্তূ আশপাশে চোখ ঘুরাতে ঘুরাতে শুধু মাথা নাড়ল মৃদু।
মুস্তাকিন পানির সঙ্গে ট্রে ভর্তি কিছু শুকনো খাবার ও দুই কাপ অদক্ষ হাতে বানানো চা

এনে রাখল। অন্তূ একদৃষ্টে তাকিয়ে চোখের মণি ঘুরিয়ে লক্ষ করছিল মুস্তাকিনকে। কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলছিল না। মুস্তাকিন আজ খুব হাঁসফাঁস করছিল। যেটা তার মাঝে আগে দেখা যায়নি। বলল, "কেন এলেন, কিছুই তো বলছেন না। কিছু নিচ্ছেনও না। আমাকে দেখতেই এসেছেন?"-"হ্যাঁ। দুনিয়াতে দেখা ছাড়া আর কাজ কী বিশেষ!"

-"হেঁয়ালি বুঝিনা, ম্যাডাম।"

-"আমিও বুঝতাম না।"

মুস্তাকিন তাকিয়ে রইল। অন্তূ নিজের দৃষ্টি তীরের মতো মুস্তাকিনের চোখের মণির ওপর স্থির রেখে জিজ্ঞেস করল, "কে আপনি?"

মুস্তাকিন চট করে হেসে ফেলল, "আমি? চেনেন আপনি আমায়। পিবিআই অফিসার সৈয়দ মুস্তাকিন মহান।"

-"আপনি কে, সেটা জিজ্ঞেস করেছি। কল্পকাহিনী খুব বেশি পছন্দ না আমার। আব্বু ছোটবেলা থেকে বাস্তব গল্প বেশি শোনাতো। রূপকথার গল্প বিরক্ত লাগে আমার।

"-"কল্পকাহিনী? তাহলে বাস্তবটা আপনিই বলুন।"

-“সেটা আপনার কাছে জানব। শুধু এটুকু জানি, আপনার আপাত-পরিচয়টা কল্পকাহিনির অংশ।”

-“তা কী করে বলছেন?”

-“কথার লাইন কাটছেন, আপনি। যেটুকু জিজ্ঞেস করেছি, তার জবাব দিন।”

অবাক হবার ভান করল মুস্তাকিন, “মাই গড! সবে আপনি অনার্স থার্ড ইয়ার। অথচ এক সেকেন্ডের জন্যও এতক্ষণে মনে হয়নি যে আমি কোনো উকিল মহোদয়ার সামনে বসে নেই। এমন জেরা করার দক্ষতা নিয়েই জন্মেছিলেন নাকি? তারপর উকিল হবার স্বপ্ন দেখেছন?”

অন্তূ কপট হাসল, “রসিকতা বিরক্ত লাগছে।”
-“আগে শুনি, আমার ওপর আপনার সন্দেহের শুরুটা কবে?”
-“অনেক আগে।”
-“অনেক আগে? তবু আপনি...”-“পাকাপোক্ত প্রমাণ একত্র না করে কাউকে অভিযুক্ত করা যায়না। বড়জোর সাসপেক্টিভ হিসেবে মার্ক করা যায়। যেটা আমি অনেক আগেই করেছি আপনাকে।”
মুস্তাকিন সামান্য ভ্রু কুঁচকে কেমন বিব্রত মুখে তাকিয়ে রইল। অন্তূ বলল, “প্রথমত আপনাকে আজ অবধি কোনোদিন পুলিশের ইউনিফর্মে দেখার সৌভাগ্য হয়নি আমার।

একবার কার্যালয়ে গেছিলাম, আপনি তখন সেখান থেকে বেরিয়ে আসছিলেন, ডেস্কে বসিয়েছিলেন ঠিকই, তবে সবার পরনে পোশাক থাকলেও আপনি কিন্তু তখনও অর্থাৎ কার্যালয়ের ভেতরেও সিভিল ড্রেসে ছিলেন।''

মুস্তাকিন চুপচাপ বসে রইল। অন্তূ বলে, "আপনি আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। আব্বুকে পরে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'উনি কি সৈয়দ পরিবারের ছেলে?' আব্বু হেসে বলেছিল, 'না। পুলিশের চাকরির সময় এটা নাকি ছদ্মনাম লাগিয়েছে।' এন্ড দেয়ার ওয়াজ মাই ব্ল্যাডি ফল্ট দ্যাট— সেদিন

আব্বুকে জিজ্ঞেস করা হয়নি, তাহলে আপনার আসল নামটা কী?''

-"তাতে কী প্রমাণ হয়?''অন্তূ মাথা নাড়ল, "বিশেষ কিছু না। কিন্তু এরপর? আমি যেদিন পলাশের ডেরায় গেলাম, আপনি আমায় জিম্মি করে পাঠিয়ে আপনারাই ব্যাক-আপে রইলেন। হাস্যকর না? পুলিশেরা সন্ত্রাসীর খোঁজ পেলে নিজেরা চার-পাঁচ ফোর্স মিলে একসাথে অফারেশন চালায়, পেছনে আরও লোকাল থানা ও কত রকমের সংস্থা এবং ব্যাটেলিয়ন ইত্যাদিরা ব্যাক-আপে থাকে। আর আপনি সেদিন আমার মতো একটা নিরীহ মেয়েকে পাঠালেন তো পাঠালেন, এক ঘন্টা সময়

দিলেন, এরপরও আমি না বেরোলে আপনি যাবেন! আপনার হাসি পাচ্ছেনা?”

মুস্তাকিন কিচ্ছু বলল অন্তূর এমন শক্ত ধিক্কারে। একগ্লাস পানি খেল ঢকঢক করে।

অন্তূ থেমে এবার চোখ তুলে তাকাল, “অথচ এক ঘন্টায় একটা মেয়েকে ছিঁড়ে-ফেঁড়ে রান্না করে খেয়ে ফেলা যায়। আপনি পলাশের ডেরা থেকে খুব দূরে ছিলেন না। তবু এত চিৎকার চেঁচামেচিতে উঠে আসেননি। তাছাড়া জয় আমিরের সঙ্গে আপনার কথাবার্তা বরাবর রহস্যজনক ছিল। যেন দুজন দুজনকে খুব চেনেন, জানেন।

আমার সঙ্গে যখন জয় আমির মজার খেলা খেলছিল, তখন আপনি নাকি জেলার বাইরে ছিলেন। আমার তথাকথিত বিয়ে হলো, আব্বুর ইন্তেকাল হলো, দান খয়রাত হলো সেই উপলক্ষে। এরপর আপনি একদিন চট করে ফিরলেন। আপনার পরিবারের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম, এড়িয়ে গেলেন।''অন্তূ থেমে কপাল চুলকালো, “ধুর! এত ফিরিস্তি দিতে ভালো লাগছে না। মোটকথা সাসপেকশন আপনার ওপর আমার বহুদিনের, কিন্তু আজকের আগে বিশেষ প্রয়োজনবোধ করিনি তা ক্লিয়ার, তাই জানতে আসিনি।''

মুস্তাকিন চুপচাপ বসে ছিল। এবার জিজ্ঞেস করল, "আজ এমন কী বিশেষ হয়েছে যে, জানতে এসেছেন?"

অন্তূ কোনো কথা না বলে কেবল সামান্য হাসল যেন।

সৈয়দ মুরসালীন মহানের বোন সৈয়দ মুমতাহিণা মহান। কিন্তু আরেকটা কথা থেকে যায়, সেটা হলো–মুমতাহিণার ভাইকে জয় আমির খুন করেছে। কিন্তু সেটা মুরসালীন নয়, কারণ মুরসালীন এখনও জীবিত। তাহলে মৃত ভাইটা কে? এটা ভাবতে গিয়ে অন্তূ খুঁজে পেয়েছিল, সৈয়দ মুস্তাকিন মহান নামটা। অথচ যখনই তার চেনা-জানা সৈয়দ মুস্তাকিন

মহানের মুখটা ভেসে উঠেছিল চোখের সামনে, বিষয়টা খাঁপে খাঁপ খায়নি।এই মুস্তাকিন মহানের জন্য অন্তূর মনে মনে যে সন্দেহ গেঁথে ছিল, তা ছিল—এই লোকটা একটা ছদ্মবেশী ভন্ড। জয় আমির ভন্ডদের দেখতে পারেনা, মুস্তাকিনকেও দেখতে পারতো না। অথচ মুরসালীনের চোখের আগুন বলেছিল, ওর ভাই ওর মতোই আগুনের দলা হবে। সৈয়দ পরিবারের রক্তে ভন্ডামি আর কলুষ থাকতে পারেনা, এটা যেন কেউ অন্তূকে ডেকে বলেছিল। যে মুরসালীন বোনের সম্মান ও প্রাণহানীর বদলায় হুমায়ুন পাটোয়ারীর মতো জানোয়ারটাকে কমবেশি সত্তরটা

ছুরিকাঘাত করে মারতে পারে, তার সাথে অন্তূর চেনা মুস্তাকিন মহান মেলেনি মুরসালীনের ভাই হিসেবে। মুমতাহিণার আরেক ভাই এই মুস্তাকিন মহান হতে পারেনা।

এই হিসেবটা অন্তূ সেদিন বড়ঘরে দাঁড়িয়ে মাত্র কয়েক সেকেন্ডে কষেছিল। এরপর বসে পড়েছিল লোহার বীমের ওপর।এইসব কিছুই চেপে শুধু জিজ্ঞেস করল, "আপনি কে?"

মুস্তাকিন এতক্ষণে হাসল মৃদু, "আমি?"

-"জি, আপনি। কে আপনি?"

-"আমি পরাগ আজগর। সরি—আমি জানিনা জারজ বাপের নামের সারনেম জারজ সন্তান

ব্যবহার করতে পারে কি-না! কারণ আমার নামটাকেই কখনও ব্যবহার করতে দেয়া হয়নি কোথাও, সারনেমের প্রশ্নই ওঠেনা। স্কুলে আমার নাম পারভেজ দেয়া হয়েছিল।''

অন্তূ ভ্রু কুঁচকাল, ''আপনি পলাশ আজগরের ভাই?''

পরাগ দুপাশে মাথা নাড়ে, ''আমি রূপকথা আজগরের সৎ ও জারজ ভাই।''

-''অর্থাৎ আপনার মা রূপকথার মা নয়?''

-''আমার মা সালমা বেগম। আপনাদের ভার্সিটির খন্ডকালীন আয়া। রূপকথার মা রূপকথাকে ছোট রেখে বাপের বাড়ি চলে গেছিল। পরে অন্য ঘরে বিয়ে হয়েছে।''অন্তূ

কপাল চেপে ধরে চুপ করে বসেছিল বেশ কিছুক্ষণ। পরাগ চা-য়ে চুমুক দিচ্ছিল শব্দ করে। অন্তূ জিজ্ঞেস করল, "সৈয়দ মুস্তাকিন মহানটা কে?"

-"আপনার পতি-পরমেশ্বরকে জিজ্ঞেস করবেন। সে ভালো বলতে পারবে।"

-"সে কি জীবিত?"

-"তাকে জয় আমির নিজহাতে খু-ন করেছে।
"

-"শুধুই কি রাজনৈতিক রেষারেষি?"

-"এছাড়াও অন্যকিছু আছে। যা শুধু জয় আমিরই জানে হয়ত। আমি যেটুকু জানি, শুধুই ধান্দা-পার্টনার হিসেবে। আপনার স্বামী

মালটা ব্যাপক চাপা আর ঘাউরা। সহজ জিনিস না।'' আজ চট করে মুস্তাকিনের চিরচেনা ভদ্রতায় পরাগের অসভ্যতা ফুটে উঠছিল একটু একটু করে।

-"আপনি সৈয়দ মুস্তাকিন মহানের নাম ধারণ কেন করেছিলেন?''-"সে আইনের কর্মকর্তা ছিল। আমারও সেরকমই একটা মিছেমিছি পদের দরকার ছিল।''

অন্তূ কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ থেকে আন্দাজ থেকে বাকিটা বলল, "তাকে খুন করার পর তার স্থল পলাশ আজগর আপনাকে দিয়েছিল আপনাদের অনৈতিক ব্যবসা ডিফেন্স করার জন্য?''

বাহ-বা দেবার মতো ঠোঁট ফুলিয়ে নাটকীয়তা নিয়ে পরাগ বলল, “আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা, ম্যাডাম!

-“শুধুই সাধারণ জ্ঞান।.... কিন্তু এমনও কি হয়? একজন মৃত আইন কর্মকর্তার জায়গা আপনি নিয়ে তার স্থলে তার নাম নিয়ে অন-ডিউটিতেও থেকেছেন।”

-“প্রতিটা থানা ও তদন্ত সংস্থায় যদি আমরা পেইড-এজেন্ট রাখতে পারি গাদা করে, এ আর এমন কী? তাছাড়া উপরমহলের আদেশে মুস্তাকিন মহানের উপরের টিকিট কাটা হয়ে গেছিল। আদেশ ছিল টুপ করে যেন ওকে কোনো কেইসে অভিযুক্ত করে ফাঁসিয়ে দেয়া

অথবা দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার। কিন্তু তার আগেই জয় আমির তাকে টপকে দিয়েছে।"-"এটা কতদিন আগের ঘটনা?"

-"২০১৩-এর মাঝামাঝি। তবে আমাকে এর ফায়দা দেয়া হয়েছিল মাসকয়েক আগে। আমি শুধু অফিসারের রোল প্লে করেছি লোকের সামনে। কার্যালয়ের ভেতরের কোনো কাজে আমার হস্তক্ষেপ ছিল না। সরকারী কার্যালয়ের ব্যাপার-স্যাপার অতিরিক্ত সহজও না। তবে মাল ছাড়লে আর পাওয়ার থাকলে কঠিনও না। সবাই টাকার বিনিময়ে আমাকে মুস্তাকিন মহানের পদের অফিসারের মতো ট্রিট করেছে।"

অন্তূ চুপচাপ বসে রইল মেঝের দিকে তাকিয়ে। মুস্তাকিন মহান নিশ্চয়ই আইনের কর্মকর্তা হয়েও ক্ষমতাসীন দলের বিপক্ষ আচরণ করেছিল প্রকটভাবে। তাই তাকে সরিয়ে দেবার অর্ডার এসেছিল! এমন কত জজ, ব্যারিস্টার, মেজর কত রকম কর্মী-ই তো বরখাস্ত হলো অথবা জীবন দিয়ে মূল্য শোধ করে গেল সেই ভয়ানক সময়টাতে! আব্বু এসব বলতো টুকটাক। শুধুই অন্যায়ের বিরুদ্ধে মৃদু আওয়াজ তোলার দায়ে নয় কি এসব? এবং নিজের কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালন করতে চাওয়ার অপরাধে!অন্তূ ভাবে, তাহলে সে আর এমন কী হারিয়েছে? সে তো

এখনও জীবিত! সে এমন চুনোপুটি হয়ে যা টুকটাক কথা বলেছে, হিসেবে তার সাথে কমই বিট্রে হয়েছে। অন্তূর ভেতরটা একপ্রকার নিদারুণ শক্তিতে গমগম করে উঠল। সে একা বেঁচে আছে, জয় আমিরের সুপ্ত-ইচ্ছার জোরে।জয় আমিরকে সেটুকুর কৃতজ্ঞতা, আর বাকিটা অথবা অনির্দিষ্ট হারে অগ্রহণযোগ্যতা।

পরাগের জীবনকাহিনির ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ এখনও বাকি। দুপুর সাড়ে এগারোটা বাজছে। গরম বাড়ছে প্রকৃতিতে।তরুকে ওষুধ দিয়ে গেল একটা ছেলে। দুটো ব্যথার, কয়েকটা প্যারাসিটামল এবং গ্যাসের ওষুধ। জয়

পাঠিয়েছে। হাতুরে ডাক্তারদের প্রাথমিক চিকিৎসা। খেল না সে-সব। ওষুধ তার জন্মের শত্রু।

ঘড়ির কাঁটায় তখন দুপুর বারোটা ছুঁইছুঁই। শরীর একেবারে আওলে গেছে তখন। কোনোমতো হুশ আছে যেন। মাথার ব্যথা ও সর্দিতে গোটা মুখমণ্ডলের সাইনাস ভেঙেচুড়ে আসছিল। অসহ্য ব্যথায় ছটফট করছিল বসার ঘরের সোফাতে আধশোয়া হয়ে বসে।

রিমি ও তুলি মেয়েকে প্রাইভেট এপোয়েনমেন্টে দেখাতে গেছে। অনেকক্ষণের ব্যাপার। সিরিয়াল দিয়ে বসে থাকতে হবে। কখন ফিরবে জানা নেই। এখন মনে হচ্ছিল,

সে সঙ্গে গেলেই পারতো। ঠান্ডার প্রকোপে শ্বাস-প্রশ্বাস আঁটকে আসছিল।

বেলা বারোটার পর দরজায় করাঘাত পড়ল। অন্তূ এসেছে নিশ্চিত সে। খুশি হলো। এই মেয়ে এখন জোর করে ওকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েই ছাড়বে। এখন আর না গেলেই নয়। অন্তূকে খুব প্রয়োজন ওর। ওই মেয়ে গম্ভীর মুখে দুটো ধমক মারবে এরপর জোর করে হাসপাতালে নিয়ে যাবে।তরু দরজা খুলতেই দেখল দুজন পুরুষ দাঁড়িয়ে। একজনকে সে চেনে—রিমি ভাবীর চাচাতো ভাই মাজহার আলমগীর। আরেকজনকে সে চিনলো না। ফর্সা, উঁচু লম্বা চেহারা। চোখদুটো

জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। বিড়ালচোখা।ঠোঁটের কোনে প্যাচপ্যাচে হাসি। তরু টলমলে পায়ে কয়েক কদম পিছিয়ে যায়। শরীরটা অজান্তেই ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। তলপেটে একটা আতঙ্কিত পাক জড়িয়ে এলো। শরীরের ওড়নাটা দূর্বল হাতে টানলো। কেউ নেই বাড়িতে। একবার কেন জানি ইচ্ছে করল চিৎকার করে নিচের ছেলেদের ডাকতে। বোকামি হবে। এরা তো কেন এসেছে সে-সব বলেইনি!

পলাশ মাজহারের দিকে মুখ এগিয়ে জিজ্ঞেস করে, "এইটা কে রে?"

-“কে জানি লাগে হামজা লোটির বাচ্চার। ”পলাশ ঠোঁট হেলিয়ে মাথা দুলিয়ে হাসল। ঠিক যেমন রক্তচোষা প্রাণীরা— রক্তের গন্ধে তাদের জিভ লকলক করে ওঠে ওমন উজ্জ্বল হয়ে উঠল পলাশের চোখ-মুখের ভাষা।

তরু কম্পমান গলায় জিজ্ঞেস করে, “আপনারা কে এসেছেন? কিছু দরকার? কেউ তো বাসায় নেই আমি ছাড়া।”

-“চলবে তো তাতেই। আর কাউকে আপাতত দরকার নেই। পলাশ ভেতরে ঢুকে পড়ল। মাজহার হেসে উঠল। পলাশের বুট জুতোর গটগট আওয়াজে তরুর শরীরটা ঝাঁকি মেরে ওঠে। পুরুষটা এগিয়ে আসছে। কেমন এক

ভঙ্গিমা। কাধদুটো হেলিয়ে-দুলিয়ে হাঁটছে। ঠোঁটের ওই হাসি নরকের দেবতার খেয়াল এনে দিচ্ছে। হৃদযন্ত্রের ধরাস-ধরাস আওয়াজে শরীরটা শেষ পর্যায়ের নিস্তেজ হয়ে এলো মেয়েটার। মাজহার সে-সময় দরজা আঁটকে দিলো।মাথা টলছিল তরুর। ওর ক্ষমতা নেই দাঁড়িয়ে থাকার। অন্তূর মুখটা ভাসছিল খুব তখন। তার স্থলে অন্তূ হলে এতক্ষণে নিশ্চিত দৌঁড়ে গিয়ে রান্নাঘর থেকে বটি নিয়ে এসে সামনে দাঁড়াতো। মাথাটা চক্কর মেরে উঠছে, চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। পা টাল খেয়ে আসছিল তরুর।

খানিক বাদে যোহরের আজান পড়বে। জয় কোথায়? সে এতক্ষণ রাস্তায় পলাশের খোঁজে।ক্লাবঘরে ফের আগুন জ্বলেছিল সেদিন। তখন দুপুর বারোটা। ওয়ার্কশপের দুজন ছেলে বাদে সবগুলো একচোটে দৌঁড়াল ক্লাবের দিকে। ওটা ওদের প্রাণের স্থল। রাতে শুধু ঘুমানো হয় বাড়িতে। সকাল থেকে রাত, ওখানেই কাত। আজ কিছুদিন পাটোয়ারী বাড়ির নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে ওদেরকে এ বাড়ির একতলা ভবনে থাকতে হচ্ছে। হন্য হয়ে লাঠি-ছুরি-দা নিয়ে ছুটল সবগুলো। কোনোদিকে খেয়াল নেই। যারা আগুন লাগিয়েছে, তাদের রক্ত দিয়ে আগুন নেভানো

হবে আজ। দুর্ভাগ্যবশত কাউকেই পেয়েছিল না ওরা। শুধু আগুন জ্বলছে, বহর বাড়ছে। ওয়ার্কশপের দুজন দেখল তার খানিক পর পলাশ ও মাজহার ঢুকছে। দুজন উঠে কপালে হাত ঠেকিয়ে সালাম দিয়েছিল তড়িঘড়ি। পলাশ এবার বেশ কিছুদিন পর আসলো, আগে প্রায় দিনই তাকে গোডাউনে আসতে দেখা যেত। কিন্তু মাজহার কেন সাথে এসেছে, তা জিজ্ঞেস করার সাহস পলাশের কাছে ওদের নেই। রাগ হলো মাজহারকে দেখে। তবু কিছু বলার নেই। পলাশ মানুষ নয়। তাছাড়া ওরা দুজন দুশ্চিন্তায়— জয় ও হামজা ফিরে এই ঘটনার জন্য কী করবে?

পৌরসভার জরুরী অধিবেশনে থাকলে হামজাকে কল বা কোনো প্রকার তলব সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। দুশ্চিন্তায় সিটিয়ে ছিল দুজন। পলাশ হেলে দুলে বাড়ির মেইন ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেছিল।

ক্লাবঘর এমনিতেই বিরোধী পক্ষের আগের হামলায় ভঙ্গুর হয়ে পড়েছিল। আজকের আগুন পেট্রোল ঢেলে জ্বালানো হয়েছে। দাউদাউ করে শুধু উপরে উঠছিল। অতগুলো ছেলে মিলেও হিশশিম খেয়ে যাচ্ছিল আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে। সাধারণ লোকজন এসব থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে সবসময়ই।

পলাশ গতরাতে জয়কে কল করে একটা প্রস্তাব রাখল, “বাপ, আয় একটা ডিসকাশনে যাই। আমার কাঁচামাল বর্ডারে আঁটকে আছে। দুজন গিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে আসি। এই ফাঁকে কথা হবে।”-“আপনি কোথায়?”

-“এখন জয়পুরহাট।”

-“বর্ডারে তো আপনার মাল আসেনা। জয়পুরহাট বর্ডারের কাছাকাছিও না তেমন। আর আপনার মাল আসে বন্দরে। তো জয়পুরহাট কী করছেন?”

-“একটা কাজে এসেছিলাম। আচ্ছা তুই আমায় বিশ্বাস করতে পারিস না ক্যান?”

-“আপনি বিশেষ কী? জয় আমির নিজেকেও বিশ্বাস করেনা, পলাশ ভাই।”

-“এত সতর্কতা দিয়ে কী হবে? তুই আমার যা ক্ষতি করেছিস, আমি ফুল-ড্যামেজ, জয়। চাইলেও কিছু করার নেই। অন্তত আপাতত।” হো হো করে হাসল পলাশ, “আয়, মালগুলো ছাড়িয়ে আনি। কাকার কেইসটা নিয়ে খুব ঝামেলায় আছি। তোকে দরকার।”

জয় চুপ ছিল। পলাশ জানে, জয় কচুর পাতা। হাজার টন পানি ঢাললেও ভিজবে না। চতুরতার ঊর্ধ্বে চলে সে। পলাশ বলল, “আমি যদি ক্ষমা করে দেই তোকে? আমি

তোর ক্ষতি করেছি, তুই আমার। কাটাকাটি। আমার তোকে দরকার। তোর আমাকে..''
জয় হাসল, ‘‘আপনাকে আমার কোনো দরকার নেই, তা জানেন আপনি। জয় আমির হ্যাজ রানস অন হিজ ওউন ডিস্টিনিক্ট স্ট্রেন্থ। আর না সে আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। এত নাটক করবেন না আমার সাথে। ঘুরতে যাই না বহুদিন। এই ফাঁকে ঘুরতে আসছি। এর বেশি কিছু না।''
জয় জানতো না, পরিস্থিতি এমন হবে। সে বাড়িতে যে কড়া পাহারা বসিয়েছে, তার ওপর হামজা ভাই তো জেলাতেই থাকছে।

হামজাও বলল, “গিয়ে, ঘুরে আয় একবার। বিট্রে হলেও আছি আমি সামলাতে।”

—

অন্তূ থাকলে পলাশ ও মাজহার হয়ত তার হাতে বলি হয়ে যেত আজ। পরিস্থিতি ঠিক তরুকে একলা করে ছেড়ে দিয়েছিল সেদিন দুজন রাক্ষসের হাতে। দূর্বল তরু, মানসিকভাবেও দূর্বল। পেরে ওঠেনি। তরুর ওড়না খুলে একপ্রান্ত ছিঁড়ে সেটা তরুর মুখে গুঁজে দিয়েছিল পলাশ। গোঙানির আওয়াজটুকুও বের হয়নি গলা থেকে। মাজহারকে তরুর দিকে ঠেলে দিয়ে সে সোফায় বসল, যেমনটা নাটকের দর্শকেরা

মঞ্চের সম্মুখে বসে। তরুর চোখের কাতরতায় পলাশ নিজের সবকিছু হারানোর যন্ত্রণার একটু একটু মূল্য ফেরত পেয়েছে। যা সে জয়ের বউয়ের সাথে করতে পারেনি, সেই অতৃপ্ততাটুকুও পূরণ করেছে। অন্তূকে জয় ছাড়িয়ে এনেছিল তাকে অপমান করে, সেই শোধটুকুও শোষন করে নিলো।

এরপর গেল সে তরুর শেষ সময়ে। বিশাল পাটোয়ারী বাড়ির মাঝ-মেঝেতে নরক নেমেছিল সেদিন। তরুর ছিন্নভিন্ন দেহটা বেহুশ পড়ে আছে তখন। প্যান্টের চেইন লাগিয়ে তৃপ্ত মুখে পলাশের পাশে এসে ধপ করে বসল মাজহার। পলাশ পিঠ চাপড়ে

হাসল, নীরবে সাব্বাসী জানালো মাজহারের পুরুষত্বকে।

অজ্ঞান তরুকে তোলা দরকার। এমনিতেই মুখে কাপড় গোঁজা থাকায় চিৎকার শোনা যাচ্ছিল না। পলাশ খুব অসন্তুষ্ট তাতে। আবার যদি বেহুশ থাকে, হলো? পানি ছেটালো মুখে। শরীরে হাত দেয়া যাচ্ছিল না। জ্বরে চিরচির করে পুড়ছে যেন ছোট্ট, নাজুক দেহটা।তরুর শ্বাসের গতি তখন খুব ধীর। চোখ খুলতে পারছিল না ঠিকমতো। চোখ বুজে খুব ধীরে শ্বাস টেনে নেবার চেষ্টা করেছিল। শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঁচড়-খামছিতে চামড়া খসে গেছে। চোখের কোণা দিয়ে টসটসে গরম

নোনাজল টুপ টুপ করে কয়েক ফোটা মেঝেতে পড়ল। তরু পলাশকে চোখের ইশারায় সাবধান করার চেষ্টা করল, ‘জয় আমির তোকে ছাড়বেনা রে। একটু চিন্তা কর। আমি তোর ভালোর জন্য বলছি। শোন, একটু সময় দে আমায়! ওই লোকটাকে কথা দিয়েছি আমি—ফিরলে সুজির হালুয়া বের করে দেব। এই শেষ কর্তব্যটুকু করতে দে। ওর আর কেউ নেই রে। আমি না দিলে কেউ দেবে না। খাবেও না আর...বড় বেপরোয়া, বেখেয়ালি লোক সে। একটু সময় দে....’
শেষ মুহুর্তে তরু হেসেছিল। জয় ঝুঁকে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। গলার শিকলের

মতো দেখতে চেইনটার লকেটে ঝুলন্ত লেটারটা তরুর শরীর ছুঁয়ে যাচ্ছে। তরু অনুভব করল। জয় কি কাঁদছে? তরুর যন্ত্রণায় বুঝি! ছিঃ! একটুও ভালো লাগছিল না দেখতে জয়কে। জয় আমিরকে হাস্যরত সুন্দর দেখায়। ওই কঠিন অবয়বের মুখে মলিনতা একটুও সাজে না। ঠোঁটের কোণে দুষ্টু-রসিক হাসি আর চটা ভ্রুর নিচে পড়া গভীর চোখদুটোয় জীবনের ক্লান্তির সংমিশ্রণ বড় মানায়।তরু শেষবার দেখল তার জয়কে। জয় চেয়ে আছে। আরেকজনের কথা তরুর মনে পড়ছিল। উকিল আরমিণকে দেখা হলো না তরুর। ও থাকলে কি এমন হতো ওর

সাথে? হামজা ভাইয়ের মুখটা ভেসে উঠেছিল। গম্ভীর, বিশালাকায় দাড়ি-গোফের মুখটায় একরাশ শ্যামলা মায়া।

তরু আস্তে করে চোখ বুজল। খুব শান্তি লাগছে। জীবনের অবসানে এত সুখ! হবে না? জীবন তো অতি নিষ্ঠুর। তার কাছ থেকে ছাড়া পাওয়া তো সুখেরই! তবু বুকে কলিজা ছেঁড়া যন্ত্রণা! মায়ার টান বলে না এটাকে? তাই তো! কিন্তু কীসের মায়া? দুনিয়ার? নাকি কয়েকটা পরিচিত মুখের। একটা আস্ত ছন্নছাড়া জয় আমিরের মায়া নয় এটা! এ তো এক চঞ্চল, অদ্ভুতুরে পুরুষের মায়া! যার পারফিউমের কৌটাটাও তরু এগিয়েছে! ধুর!

কালোজিরে বেটে খাওয়াবে কে জয় আমিরকে? আর কাজুবাদামের পাত্রটাই বা বেড-সাইড টেবিলের ওপর নিঃশব্দে রেখে আসবে কে?অন্তূ আর বাড়িতে গেছিল না। সোজা পাটোয়ারী বাড়ির দিকে রওনা হলো। তরুর জ্বর। এতক্ষণে জয় আমির বেরিয়ে গেছে। মেয়েটা নিশ্চয়ই একা। অসুখে মরবে তবু মুখ ফুটে বলবে না কিছু।

বাড়ির সামনে রিক্সা থামতেই ওয়ার্কশপের ছেলেদুটো দ্রুত এগিয়ে এসে সালাম দিলো, "আসসালামুআলাইকুম, ভাবী।ঠিক আছেন?" ভাড়া মিটিয়ে রিক্সা বিদায় করল দুজন। অন্তূ বলল, "ওয়ালাইকুমুসসালাম। কী ব্যাপার!

আর সব কোথায় গেছে? এভাবে বাড়ি ফাঁকা রেখে কোথায় গেছে ওরা?"

দুজন কাচুমাচু হয়ে গেল। অন্তূর এ পর্যবেক্ষক দৃষ্টিকে ওরা ভয় পায়, ঠিক জয়ের মতোই।

-"আসলে ভাবী..."

-"এত হেজিটেশনের কী আছে? বাড়ি ফাঁকা রেখে এভাবে বেরিয়ে গেছে। চারদিকের অবস্থা তো জানেন! কখন কী হয়! তাছাড়া আপনাদের বড়ভাইয়েরা জানলে বিপদ আপনাদের।"

-"আগুন লাগছে, ভাবী!" কোনোমতো বলল একজন।

ভ্রু কুঁচকে ফেলল অন্তূ, “কোথায়?”

-“ক্লাবঘরে। ওরা ওইখানেই...”অন্তূর গা শিউরে উঠল। মুহুর্ত দেরি না করে পা ঝারা মেরে মুহুর্তের মাঝে ফটক পেরিয়ে সিঁড়ির দিকে দৌঁড়াল।

দোতলার সদর দরজা খোলা দেখে সেদিন অন্তূর অন্তরাত্মা থরথরিয়ে উঠেছিল অজানা আশঙ্কাতে। অন্তূই প্রথম পেয়েছিল তরুর ছেঁড়া দেহটাকে। বিমূঢ় হয়ে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল দেয়াল চেপে ধরে।

তরুর দু-পায়ের মাঝ দিয়ে র^ক্তের ধারা নেমেছে, ঠিক যেমন গর্ভপাত হলে হয়। শরীরে র^ক্তের সাথে লেপ্টে থাকা খণ্ড খণ্ড

জামাটায় অসংখ্য ব্লেডের কাটা। ঠিক তেমনই শরীরটা ব্লেডের আঘাতে কাচাকাচা করা হয়েছে। অন্তূ কুড়িয়ে কুড়িয়ে সেদিন তিনটা গোটা ও দুই টুকরো ভাঙা র^ক্তমাখা ব্লেড পেয়েছিল। যেগুলো তরুকে নরকযন্ত্রণা দিতে ব্যবহৃত হয়েছে।তখনও পুরো বাড়িটা কবরের মতো অন্ধকার। প্রতিটা জানালা দরজা বন্ধ। এখানে মানুষকে হাজার টুকরো করলেও আওয়াজ বাইরে যাবার নয়। তরু শুয়ে আছে। এখন তার আর কোনো যন্ত্রণা নেই। শুকনো রক্ত ও যন্ত্রণাগুলো শুষে নিয়ে দেহটা পরম আরামে শায়িত এখন। অন্তূ নিজের দেহ থেকে ওড়নাটা খুলে আস্তে করে তরুর

নগ্ন দেহটার চাপা দিলো। হাতদুটো শক লাগা রোগীর মতো থরথর করে কাঁপছিল। অন্তূর কান্না আর আত্ম-চিৎকারগুলো আর বাইরে আসেনি। সে বহুআগেই শব্দ করে কাঁদতে না ভুললে সেদিন তার কান্নায় আকাশের ভিত বুঝি কেঁপেই উঠতো! মুমতাহিণার কথা মনে পড়ছিল। সেই ভার্সিটির মাঠ! শীতের সেই সকালে হামজা আর জয়ের বিশাল অবহেলা নিয়ে লোক দেখানো বসে থাকা। কালপ্রিট সেই পলাশই, ভিক্টিম সেই এক ধর্ষিতার ছিন্নভিন্ন লাশই! শুধু সময় বাজি পাল্টেছে। উপরওয়ালা বুঝি ভোলেন না কিছুই! এই বাড়িতেই ছোট্ট

মুমতাহিণার দেহটাকে হুমায়ুন ও পলাশ মিলে খুবলে খেয়েছিল। দিন ফেরে তো! তুলনামূলক ভয়ানক হয়েই ফেরে। শুধু সময়ের আবর্তন। কিন্তু সময়ের ফেরাটায় ইনসাফ থাকেনা। একটুও না। কার পাপ কার ওপর দিয়ে এমন ভয়ানক হয়ে বয়ে যায়! তরুর অপরাধ কি শুধুই পাপীদের আশ্রয়ে আশ্রিতা হওয়া ছিল? এই অপরাধের এত চমকপ্রদ মাশুল! এটা না-ইনসাফি নয়! অন্তূ ওপরের দিকে চেয়ে অভিযোগ করে ওঠে মালিকের কাছে।উঠে আস্তে আস্তে হেঁটে রুমে যায়। জয় আমিরের ছবিতে রুমের দেয়ার ভর্তি। সেদিকে তাকিয়ে একটা ওড়না গায়ে জড়িয়ে বাড়ির ফোন দিয়ে

প্রথমবার হামজাকে কল করল,
“মেয়রসাহেব! পাপ ফিরেছে, মেয়রসাহেব! তরুর ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। আসবেন একবার? আসুন বরং বাড়িতে একবার। পাপ দেখবেন।”
তুলির কান্নার আওয়াজে বাড়ির ইটগুলোতে কাঁপন ধরে যাচ্ছিল সেদিন। এই ছোট্ট তরুকে সে ছোটবেলায় চুল ধরে কত মেরেছে কথা না শুনতে চাইলে, আবার ওই পুঁচকে মেয়েটাকে ছাড়া একা শুতেই পারতো না ঘরে। আজ থেকে
কী করে একা থাকবে ওই ঘরে! মেয়েকে সামলাবে কে? চিৎকার করে কাঁদছিল তুলি।

রিমি পাগলের মতো ফুপাচ্ছিল মেঝের একেকোণে গুটিসুটি মেরে বসে। বারবার হেঁচকি উঠছিল। হামজা শক্ত করে ধরে রইল ওকে। হামজার বুকে মাথা লুকিয়ে চাপা কান্নায় গুঙরে উঠল মেয়েটা। পাগলের মতো গোঙাচ্ছিল। হামজা দু'হাতের বাহুবন্ধনে রিমিকে শক্ত করে নিজের বুকের মাঝে চেপে ধরে রইল। ভয় পাচ্ছে রিমি। চোখই খুলছে না ভয়ে। হামজা শান্ত চোখে চেয়ে রইল সদর দরজার দিকে। পুলিশ আসবে, এ নিয়ে তার ভাবনা নেই। ওই পাগল আসবে। তারপর কী হবে? তরুর মায়ার মানুষ ঢুকবে এখনই।জয় এলো। খুব ধীরে হেঁটে গিয়ে তরুর লাশের

পাশে দাঁড়াল। আরমিণের ওড়না দিয়ে ঢাকা তরুর দেহটা। ওড়নাটা রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে। রক্তের রঙটা বড় প্রিয় জয়ের। আজ ভালো লাগছিল না। চোখে শূলের মতো বিঁধছিল। অন্তূ চুপ করে তরুর গা ঘেঁষে, তরুর হাতটা হাতের মুঠোয় নিয়ে। জয় আস্তে করে হাঁটু মুড়ে মেঝেতে বসে। অনেকক্ষণ সময় ধরে চেয়ে থাকে তরুর বোজা চোখদুটোর দিকে। আলতো হাসে।

অন্তূ শিউরে ওঠে সেই হাসিতে। এত ভৌতিক সেই হাসি! জয় পারে! কঠোর এক ভৌতিক হাসির মালিক সে। সেই হাসিতে কী থাকে,

তা বলা মুশকিল। তবু আনমনে কীভাবে যেন হাসতে পারে এই লোক।

চোখের শিরা-উপশিরা রক্তিম লাল। সচ্ছ পানির দানা ভাসছিল। সেই চোখ মেলে চেয়ে জয় শুধুই হেসেছিল নিঃশব্দে। তরুর মুখের ওপর অল্প ঝুঁকে পড়ে বলেছিল, “তুই জয় আমিরকে ক্ষমা করিস না, তরু। তবু.... তবে সে মরেনি এখনও।”নিজের বাঁ হাতটা তুলে যখন তরুর তপ্ত কপালটা ছুঁলো, হাতের ধাতব রুপালি রিস্টলেটটা তরুর বন্ধ চোখের পাতায় বিছিয়ে পড়ে। জয় আরেকটু ঝুঁকে মুচকি হেসে ফিসিফিস করে বলেছিল, “আমি এখনও বেঁচে আছি। তোর কবরের ডানে-

বাঁয়ে মাজহার আর পলাশের ধড়হীন মাথা দুটো দাফন করব আমি।.....কথা দিলাম। তবু ক্ষমা করিস না আমায়। একটুও না কিন্তু, খবরদার!’’

সেদিন কেউ দেখতে পায়নি—জয় আমিরের বাম গাল বেয়ে নেমে যাওয়া একফোঁটা নোনাপানি ঠোঁটের বিভাজনে গিয়ে মিশেছে। ওভাবেই জয় আমির মেঝের দিকে ঝুঁকে বসা থেকে উঠে দাঁড়ায়। হেঁটে গিয়ে ফ্রিজ খুলে কনটেইনার-বক্সটা বের করে সুজির মিষ্টিদুটো একগালে ঢুকিয়ে খুব তৃপ্তিসহকারে চিবিয়ে গিলল। সে কম করে খেতে পারেনা। এই বড়

বড় লোকমায় খাবার খাওয়া তরু কত্ত আবেশ নিয়ে দেখতো!

ডাইনিং টেবিলের কাছে গিয়ে জগ উপুড় করে ধরে ঢকঢক করে লিটারখানেক পানি খেল জয়। সে খুব রিল্যাক্স! আরাম করে গামছা টেনে নিয়ে মুখ মুছল। এরপর পায়ের টাখনুর ওপর প্যান্ট গোটাতে গোটাতে ঝুঁকে হেঁটে বেরিয়ে গেল বাড়ির বাইরে। কত কাজ এখন! পুলিশ আসবে। ইন্টেরোগেট করবে।

লোকজনের ভিড় জমবে। খবর বেরোবে... অনেক কাজ!মিস ক্যাথারিন সংসারত্যাগী, ধর্মভীরু ও নরম মনের সরল নারী। এসব হিংস্রতাকে খুব সহজে নিতে পারছিলেন না।

একটু একটু করে বুঝতে পারছিলেন, তার সম্মুখে বসে থাকা নারীটি এমন শামুকি-খোলসে আবদ্ধ কেন? কী কী দেখে এই সময়ে এসেছে মাহেজাবিন, তা মেলাতে মেলাতে খেয়াল করলেন, মাহেজাবিন আনমনা হয়ে উঠেছে। জিজ্ঞেস করলেন, “কী ভাবছো?”

মাহেজাবিন চোখ তুলে তাকাল, “মাদাম, আপনি সেদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন না, আমার অনুশোচনা আছে কিনা? সেদিন হয়েছিল। আজ অবধি পিছু ছাড়েনি তা।”-“তরুর মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী করছো?”

-“দায়ী তো আমিই।”

-“নেভার, মাই চাইল্ড!”

মাহেজাবিন মলিন হাসে, “পলাশ আমার ক্ষোভটা ওই নিষ্পাপ, নিরীহ মেয়েটার ওপর ঝেরেছে। জয় আমির অনেকবার প্রোটেক্ট করেছে আমায়। তাই পলাশ আমার কাছে পৌঁছাতে পারেনি। আর তার সবটাই পরোক্ষভাবে তরু সঁয়েছে। সেদিন না আমি পলাশের ডেরায় যেতাম, না শেষ অবধি জয় আমিরের সাহায্য দরকার হতো, আর না তার জের ধরে এতগুলো দিন পর ওই নাজুক মেয়েটা..”-“ইটস ইওর মিস-কন্সেপশন, গার্ল! তুমি তরুর জন্য অতিরিক্ত ট্রমাটাইজ হয়েছ,

যে কারণে নিজেকে অপরাধী ভেবে খানিকটা বোঝা কমাতে চাইছো। আমি শুধু ভাবছি, জয় আমির কী করেছিল এর পেক্ষিতে!”

মাহেজাবিন ক্ষীণ হাসল, “তার কাছে আশা করছেন কিছু? আপনি কি অধর্ম করতে চান, মাদাম?”

মাদাম মুচকি হেসে ফেললেন, “আশা তো তুমিও করেছ! ওর ওপর আশা না করা যায় নাকি?”

মাহেজাবিন ভ্রু কুঁচকাল, “আপনি কি বশীভূত হয়ে পড়ছেন সেই খল-লোকটির দ্বারা, মাদাম?”

মিস ক্যাথারিন চুপচাপ চেয়ে থেকে কেবল মুচকি হেসে বললেন, "অধর্ম? না না, অধর্ম কেন বলছো? জয় আমিরকে এক শব্দে বর্ণনা করবার সাধ্যি আমার নেই। তথাপি সামথিং হ্যাজ ডিস্টিনিক্ট ফিচার ইন হিম, না? ক্যান ইউ ইগনোর দ্যাট? হি ইজ নট জাস্ট আ সিনার, বাট অলসো সামথিং মোর।"

-"ইউ ক্যান'নট এভোয়েড হিজ ওফেন্স অলসো, মাদাম।"

-"নন দ্য লেস!"

-"হোয়াট!"

মিস ক্যাথারিন তাকিয়ে রইলেন। মৃদুহাস্য চেহারা উনার। সরল-শুদ্ধ চাহনি।তরুর লাশ

নিয়ে যাবার পর অন্তূ সোফাতে বসেছিল। মাগরিবের আজান শেষ হয়েছে তখন। তরুর মা চিৎকার করে কাঁদছিলেন। অন্তূ চুপচাপ বসে রইল। তার চোখে পানি নেই। কিন্তু মস্তিষ্কের পীড়ায় নিঃশ্বাস গ্রহণও অসহ্য হয়ে উঠেছিল। চোখের স্মৃতি অন্তূকে কঠিন ভোগান্তিতে ফেলছিল।

পোস্ট-মর্টাম করতে দেয়নি জয়। যে যে পুলিশ বোঝাতে এসেছে, তাদের বাপ-মা একাকার করে বকে দিয়েছে। শেষে থানার ওসি এলেন। বললেন, "দেখো, আইনকে তাদের কাজ করতে দাও।"

জয় শান্ত স্বরে বলল, “আপনার আইনরে বহু আগে থাপায়ে রাখছি, স্যার। আমার কাছে আইনের কথা না বললেই না? আমরা যদি বিচার না চাই? আমাদের কোনো অভিযোগ নাই। ও ধোনের কেইস ফাইল হইছে, হইছে। আর হাজারটা ফাইলের মতো ওইটাও জমা রাখেনগা। থানার আলমারিগুলো কীসের জন্য?”এরপরের কথা কাটাকাটির কাজটা হামজা করেছে। নয়ত একটা তাণ্ডব শুরু হয়ে যেত। জয়ের ভাষায় দোষ আছে। সে পোস্ট-মর্টাম তো দূর, কোনও তদন্তই করতে চায়না। রিপোর্ট অবধি লেখাতে রাজী নয়। পুলিশ তো আর তা শুনবেনা। আর কিছু না

করুক, আনুষ্ঠানিকতা দেখাতে বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীর জুড়ি মেলা ভার। কবরে তরুর দেহ নামিয়ে যখন একমুঠো মাটি তুলে জয় তরুর ক্ষত-বিক্ষত মুখটার ওপর ফেলল, তা ঝরঝর করে পড়ল তরু বিচ্ছিন্ন দেহটার ওপর। জয়ের মনে হলো, এটা মাটি নয়, তরুর মায়ার মাঝে এক অন্তরায়, যা লাল ফুল, মাটি হয়ে ঝরছে। এই অন্তরালের পিছে তরু লুকিয়ে পড়ছে চির আরামে, স্বার্থপরের মতো। জয়ের রাগ হলো। সবাই স্বার্থপর! উফফ! কেন কেন? জয় কেন স্বার্থপর ছাড়া কাউকে পায়নি এই জনমে?

তার মায়ার মানুষ কেউ নেই কেন? কেউ কেন জয়কে কখনও মায়াভরে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেনি, ‘খা বাপ। এই খাবারটা তোর পছন্দ, তোর জন্য বানিয়েছি!’ তরু বলতো, সে আজ চলে যাচ্ছে। কেউ বলেনি, ‘ও জয়! এত আঘাত কোত্থেকে পেয়েছিস? আর বাইরে যাবিনা খবরদার! এবার থেকে মারপিট করতে গেলে ঠ্যাং নুলা করে ঘরে বসিয়ে রাখব।’অনেক রাতে বাড়ি ফিরলে, কারও ভয় ছিল না। যে কেউ হয়ত, গম্ভীর স্বরে বলবে, ‘জয়, কোথায় ছিলি এতক্ষণ? জয়ের মা, তোমার ছেলের চালচলন না

বদলালে বলে দিলাম, আমার বাড়িতে ওই জানোয়ারের জায়গা হবেনা।'
তরু বলতো, আস্তে আস্তে বলতো, 'এসব না করলেই না? কাল থেকে কোথাও বের হবেন না। এই আঘাত না শুকানো অবধি কোথাও গেলে..'
জয় জিজ্ঞেস করতো, 'গেলে কী? তুই পুঁচকে আমার কী করবি রে?'
তরু অভিমান আর ভয়ে চুপসে যেত। তবু চোখে কাতরতা। ওই চোখ বলতে চায়, 'প্লিজ যাবেন না। আমার কষ্ট হয়। আপনি জানেন না, এইসব ঘা দেখে গিয়ে সারারাত ফুপড়ে কাঁদি আমি। আমার সহ্য হয়না আপনার

ব্যথা! মারপিট করবেন না আর। এত শত্রু পয়দা করবেন না। ঠিকমতো নিজের খেয়াল রাখবেন।'

জয়ের গোসলের গামছাটা, খাবারের প্লেটটা, নোংরা শার্টটা ধুয়ে দেয়া, জ্বরে পোড়া কপালটা টিপে দেয়া, তাতে সযত্নে জলপট্টি দেবার মায়ার নারীটাকে শেষবার দেখল জয়। আরামে শুয়ে আছে মেয়েটা। আর কোনো কষ্ট নেই ওর। আর জয়ের বিরহ সইতে হবেনা তরুকে, সারাদিন অক্লান্ত কাজ করতে হবেনা। জয়ের ফরমায়েশ খাটার দিন বুঝি ফুরোলো তরুর! জয় আর ধমকে ডেকে বলবে না, "এই! প্যান্টটা ধুয়ে দিসনি কেন?

এখন কার বালডা পরে বাইরে যাব আমি?
''সবকিছুর অবসান ঘটিয়ে কত আরামে শুয়ে পড়ছে দেখো! জয়ের কপালের শিরা ফুলে উঠল ক্ষোভে! চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করল, "স্বার্থপর, বান্দির বাচ্চা! চলে যাচ্ছিস? এই! তাকা! ভয় ভয় চোখে তাকা একবার। আমার দেখ চোখ লাল হয়ে আসছে। গলায় কিছু দলা হয়ে আছে। সত্যি বলছি, মাল খেয়ে রাস্তায় পড়ে থাকব, আর বাড়ি ফিরব না কিন্তু। শেষবার বলছি, তাকাবি কিনা বল! আস্তে করে বল, মন খারাপ আপনার? বল বল বল। আমার সহ্য ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করিস না তরু। আমি কাঁচা। হেরে যাব এই

চ্যালেঞ্জে! তরু....আমার কেউ নেই। আমার ধমক শোনার কেউ নেই, বাড়িতে মাছ রান্না হলে আমায় আলাদা করে ডাবল ডিমের অমলেপ বানিয়ে এনে পাতে দেবার কেউ নেই তুই ছাড়া। আমি মাছ খেতে পারিনা। ডিমের অমলেট কে বানাবে আমার?''

কবরস্থান থেকে ফেরার পথে জয়ের মনে একটা খটকা লাগল। সে আজ তরুর মুখে মাটি ফেলতে গিয়ে যে আহাজারিটা করে এলো, এটা যেন আগেও কোথাও ঠিক একইভাবে হয়েছে। কেউ একজন এভাবেই করেছে! চোখের সামনে একটা মুখ ভেসে উঠল। কান্নারত এক নারীর মুখ।

হাসপাতালের মেঝেতে বসা। চোখদুটো ঝাপসা থাকায় টের পাচ্ছিল না প্রথমে। পরে স্পষ্ট হলো—আরমিণ কাঁদছে, আমজাদ সাহেব শুয়ে আছেন। জয় দূরে দাঁড়ানো ছিল সেদিন। দেখেছিল আরমিণকে কাঁদতে।ইশার আজানের সময় কবরস্থান থেকে ফিরল পুরুষেরা। হামজা এসে বসল অন্তূর পাশে, একটু দূরে। মেঝের দিকে ঝুঁকে বসে দু হাতে মুখ কপাল চেপে ধরে বসে রইল। তরুর মা বুক চাপড়ে কাঁদছিল তখন। অন্তূ ঠিক হামজার মতোই হাঁটুর ওপর ঝুঁকে বসল।

দুজন তখন পাশাপাশি বসা। একই ভঙ্গিতে। হামজা চিন্তিত, অন্তূ চাপা ক্ষোভ ও ঘৃণায় ভারাক্রান্ত।

অন্তূ খুব স্থির, শান্ত স্বরে বলতে শুরু করল, "পাপের আগুন সর্বপ্রথম তার জন্মদাতাকে ভষ্ম করে, মেয়র সাহেব। আপনাদের পাপ আপনাদেরকে জ্বালিয়ে কাঠকয়লার ছাইয়ে পরিণত করবে। মুমতাহিণাও ঠিক এভাবেই তরুর মতো ছটফট করেছিল, আপনারা এগিয়ে যাননি পলাশের হাত থেকে ওকে বাঁচাতে। প্রতিশোধ! কোনো কারণে ওর ভাইদের ওপর প্রতিশোধে এত নিচে নামা যায় যদি, যে ছোট্ট মেয়ে রেহাই না পায়।

তরুই বা কেন পাবে! সেও তো পাপ করেছে, আপনাদের আশ্রয়ে থেকে বড় পাপ করেছে মেয়েটা। শাহানা পাটোয়ারীর স্বামী যখন জানোয়ারের মতো খাবলে খেতে যেত মেয়েটাকে, তিনি হয়ত দ্বারে বসে পাহারা দিতেন স্বামীকে?''জয় এসে বসেছিল তখন সোফার অপর পাশে। চুপচাপ দুই ভাই শুনল শুধু অন্তূর ধিক্কার, "আমার সম্মান, বাপ, ভাই, আমার বিধবা ভাবি, তার জন্মের আগে হওয়া অনাথ অনাগত সন্তান...কার কার দীর্ঘশ্বাস থেকে বাঁচবেন আপনারা? যে জয় আমির আমার সম্মানকে মানুষের মুখের থুতুর ফেলার সমগ্রীতে পরিণত করেছিল, আজ

আপনার বাড়ির দুটো মেয়ে সত্যি সত্যি ভ্রষ্টা। আমি তো দূর্বল, যা-ই করেছি, তা বোকামি হয়েছে। অথচ উপরে যিনি খেলেন, সেই মহান সত্ত্বার ঘুটির চাল বড্ড নিখুঁত হয়। তিনি ছাড় দেন, ছেড়ে দেন না। আর তিনি ফিরিয়ে দিলে সীমাহীন দুর্ভোগ দেন।

কত মায়ের বুক খালি করা ধন আপনার কুটুরিতে খিদের জ্বালায়, পানির পিপাসায়, প্রাণের আকুতি নিয়ে ছটফট করে। তাদের যন্ত্রণা আর কাতরতার ভার বইতে পারবেন তো? সবে শুরু। এখনও সময় আছে, ফিরে আসুন। আপনার তো পরিবার নেই। তবু যে মানুষগুলোকে নিয়ে একটা পরিবারের মতো

গড়েছিলেন, তারা একে একে সব বিদায় হচ্ছে নৃসংশভাবে। তারা কোথায় এখন? নরকের আগুনে বসে আপনাদের অপেক্ষা করছে না? তৈরি হন সেই মহাক্ষণের জন্য। তবে আফশোস কী জানেন? আপনাদের পাপের দাম এক জনমদুখী নিষ্পাপ মেয়ে পরিশোধ করে গেল খানিকটা। রবের বিচার কেন যে এমন হয়, বুঝিনা তাঁর খেলার চাল। ''

অন্তূ কাঁদেনি। বুকের আগুনে কাঁপছিল শরীরটা, সেই সাথে কম্পিত ঝংকার তোলা গলার আওয়াজ! হামজা-জয় কেউ কোনো প্রতিবাদ করেনি। চুপচাপ বসে শুনেছিল দুই

ভাই।তরুর লাশ দাফন হয়েছিল বাদ মাগরিব। সকল আনুষ্ঠানিকতা, ইনভেস্টিগেটর, লোকাল পুলিশ, মানুষের ভিড় —ইত্যাদি সামলে পাটোয়ারী বাড়ি খালি হলো টানা আট-দশঘন্টা বাদে রাত দশটার দিকে। জয় রুমে এলো সাড়ে এগারোটার দিকে। অন্তূ তখন বিছানার সাথে হেলান দিয়ে মেঝেতে বসা। দৃষ্টি ছাদের দিকে। জয় ওয়্যারড্রোব, আলমারি, খাটের নিচ, বাথরুমের ফেইক-ছাদ তামাম ঘরে কিছু খুঁজে হন্য হলো। জয়কে দেখতে তখন মন্ত্রপুত পুতুলের মতো লাগছিল। যেন কেউ মন্ত্র দিয়ে বশ

করে অথবা চাবি ঘুরিয়ে ছেড়ি দিয়েছে, জয় সেই ঘোরে পাগলের মতো কিছু খুঁজছে। ঠুকঠাক আওয়াজ বাড়ছিল। জয় উদ্ভ্রান্তের মতো কিছু খুঁজে চলেছে। অন্তূ বলল, "কী খুঁজছেন? ঘর উলোট-পালোট না করে বলুন আমায়। কী হয়েছে?"জয় একবার ফিরে তাকিয়ে আবার খোঁজায় মনোযোগ দিয়ে বলল, "ঘরওয়ালি, আমার চাপ্পর পাচ্ছিনা। কোথাও সরাইছো নাকি? কই রাখছি, মনে পড়তেছে না।" খুব ক্লান্ত আর কঠিন তার কণ্ঠস্বর।

অন্তূ অবশ পায়ে উঠে দাঁড়ায়। জয় তখন ড্রয়ার খুলে দুটো ছোট-বড় ড্যাগার বের

করল। শার্টের প্রান্ত উচিয়ে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে কোমড়ে লুঙ্গির গিঁট শক্ত করল। ড্যাগারদুটোর চকচকে মাথা সাদা লুঙ্গির থানে ঘঁষে মুছে তা গুঁজল কোমড়ে। একটা ছোট্ট স্ক্রু ড্রাইভার, এক প্যাকেট ব্লেড, দুটো দিয়াশলাই ইত্যাদি শরীরের বিভিন্ন জায়গায় রাখল। অন্তূ এগিয়ে গিয়ে আলমারীর নিচের চেম্বার খুলে একটা কাপড়ের পুঁটলি বের করে। এটা অন্তূর সেই ওড়না। ওড়নাটা সে পেয়েছিল কয়েকদিন আগে। এর ভেতরে জয় নিজের একমাত্র বিশ্বস্ত সাথীটাকে যত্নে জড়িয়ে রেখে দিয়েছিল—নিজের ব্যবহৃত সেমি-অটোমেটিক নাইন এম-এম ক্যালিবারের পিস্তলটা। অন্তূ

সেটার ভেতরেই জয়ের ব্যবহৃত আরেক প্রিয় অস্ত্র–চাপ্পরটা রেখে দিয়েছে। যা দিয়ে সাধারণত পশুর মাংস ছড়ানো হয়। জয় এটাকে কী কাজে ব্যবহার করে, তা তখনও জানা হয়নি।সেটা বের করে অন্তূ নিজের ওড়না দিয়ে অস্ত্রটার ধারালো প্রান্তটা সযত্নে মুছতে মুছতে এনে জয়ের হাতে তুলে দিলো, "এই নিন।"

জয়ের মুখের অভিব্যক্তি দুর্বোধ্য। সেখানে কাঠিন্য আছে, সাথে আছে এক প্রকার ঘোর, পাগলাটে নেশা। অন্তূর দিকে তাকিয়ে রইল কেমন করে যেন। অন্তূ সেদিন অস্ত্রটা জয়ের হাতে যত্ন করে তুলে দিয়ে বলেছিল, "যান।

পাগলা জানোয়ার বধ করতে যাচ্ছেন, জয় আমির। জয়ী হয়ে ফিরুন। আমি অপেক্ষায় থাকব আপনার বিজয়ের।''

জয় চাপ্পরটা দুই ঠ্যাঙের মাঝে চেপে ধরে লাল গামছাটা তুলে গলায় পেঁচালো। এক হাতে চাপ্পর ধরে অপর হাতে অন্তূর চুলগুলো আলতো হাতে মুঠো করে ধরে কপালে একটা কঠিন-ভেজা চুমু খেল। লাল গামছাটা মুখে মুখোশের মতো করে পেঁচিয়ে শক্ত করে বাঁধতে বাঁধতে বেরিয়ে গেল চুপচাপ রুম থেকে।পরাগকে সেদিন অন্তূ জিজ্ঞেস করল, "আপনি তো রাজন আজগরের বাড়িতেই মানুষ হয়েছেন, তাই না?''

পরাগ ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল, “দাসীর ছেলের আর মানুষ হওয়া কী, ম্যাডাম? রাজন আজগরের বউ চলে গেছিল মুখে লাথি মেরে। রাজন আজগর শুদ্ধ পুরুষ নয়। তার দ্বিতীয় বিয়ের দরকার নেই। আর সেক্ষেত্রে জায়েজ একটা পুত্রসন্তান হবার সুযোগও ছিল না, যে তার উত্তরসূরী হতে পারে।”

অন্তূ বুঝল, তবু বলল, “আপনি তো ছিলেন। উত্তরসূরী আপনি হতে কেন পারেন না? তার ঔরসেই জন্ম আপনার। সে চরিত্রহীন তাই আপনার মাকে বিয়ে করেনি...”

-“আপনি এত অজ্ঞ তো নন, ম্যাডাম। শোনেননি, রাজারা দাসীর সাথে নষ্টামি তো

করতো ঠিকই, কিন্তু সেইসব সন্তানেরা দাস হয়েই রয়ে যেত। সিংহাসনের ভাগ কিন্তু বিয়ে করা রাণীর সন্তানদেরই। হাজার হোক পলাশ রাজনেরই ভাইয়ে ছেলে, ওরই রক্ত। আর আমি দাসীর গর্ভের জারজ সন্তান। আমি দাস হয়ে রয়ে গেলাম পলাশের।''

-“আব্বুর স্কুলে পড়তেন আপনি। পড়ালেখা কে করালো?''“এ কারবার সামলাতে অথবা সহকারী হিসেবে থাকতে পড়ালেখার মেলা দরকার ম্যাডাম। আমাকে পড়ালেখা করানো হলো। আমার মা রূপকথা আর পলাশকে মানুষ করল নিজের সন্তানের মতো, কিন্তু সেসবের ভিড়ে আমার জন্যই তার সময়

থাকতো না। আমি তার আশেপাশে ঘেঁষার সুযোগই পেতাম না। পলাশের গেলামকে পালা হচ্ছিল ওই বাড়িতে। পলাশ যখন কারবারে হাত দেবে, বড় হয়ে আমি তার দাসবৃত্তি খাটবো, এই তো।''

অন্তূ চুপচাপ শুনছিল। পরাগ মলিন হাসল, “অথচ জানেন ম্যাডাম, আমি রূপকথাকে বোনের মতোই ভালোবাসতাম। ছোট থেকেই। কিন্তু রাজকন্যা আর দাসীর ছেলে কি কখনও ভাই-বোন হতে পারে। যত বড় হতে থাকলাম, পদে পদে টের পেলাম— আমার মা একটা দাসী সাথে পতিতাও, আর আমি দাস। কলেজ পাশ করার পর

ভার্সিটিতে ভর্তি হবার আগে সুন্দর একটা ঘটনা ঘটল। পলাশ জীবনে খুন আর ধর্ষণ কত করেছে, সে হিসেবে আমার কাছে নেই। তবে সেইবার সে এক প্রভাবশালীর বউকে তুলে এনে ছিঁড়েছুটে খেয়েছিল। ওই কেইসটা আর লুকাতে পারা যাচ্ছিল না। তখন কী করল জানেন?''অন্তূ বলে উঠল, ''তার দায় আপনাকে দিয়ে জেলে পাঠিয়ে দেয়া হলো।'' পরাগ জোরে জোরে হাততালি মেরে পাগলের মতো হেসে উঠল, ''উফফফ! ম্যাডাম, আপনি যা ব্রিলিয়ান্ট না! আই লাইক ইউ সো মাচ।'' অন্তূ মুচকি হেসেছিল, ''ভার্সিটিতে আর ভর্তি হওয়া হলো না আপনার?''

-"আইনের খাতায় লাল দাগ পড়ে গেল আমার নামের। তারপর আর কী করে? অথচ আমার ইন্টারের রেজাল্ট কিন্তু ম্যাডাম সেই ভালো ছিল। ভালো পাবলিক ভার্সিটিতে চান্স হতে পারতো।"

-"কত বছর জেলে ছিলেন?"

-"আড়াই বছরের মতোন। তারপর জামিন করা হলো। ততদিনে আমার ক্যারিয়ার শেষ। ওপপস! শালা, গোলামের আবার ক্যারিয়ার। ধ্যাৎ!"অন্তূ কিছুক্ষণ চেয়ে দেখল পরাগের মিথ্যা হাসির আড়ালে থাকা মলিন মুখখানা। পরে বলল, "আপনাকে যখন একজন মৃত

মানুষের জায়গা নিতে বলা হলো, আপনি রাজী হয়ে গেলেন অভিনয় করতে?''

শব্দ করে হেসে উঠল পরাগ, "যেখানে পলাশের খুন আর ধর্ষণের দায়ে চুপচাপ জেল খাটতে পেরেছি, পড়ালেখা বরবাদ করতে পেরেছি, দেদারসে ওর হুকুমে মানূষ খুন করতে পেরেছি, এ আর কী? তাছাড়া আমি আর মা ওদের পারিবারিক দাস। কতকিছু করেছি ওদের জন্য, এই সামান্য অভিনয়টুকু কী এমন?''

অন্তূ মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, "তবে যাই বলুন, আপনার কথাবার্তা এবং চালচলনে কিন্তু আপনাকে মোটেও মাত্র ইন্টারপাশ

লাগেনা। বেশ উন্নত একটা ব্যক্তিত্ব আছে আপনার, কাজে লাগাতে পারেন। একজন ভালো মানুষ হতে পারেন।''-“প্রশংসা করলেন? উফফ, জীবন ধন্য এই পরাগের। ক্ষমা করতে পারেন আপনি আমায়?''

অন্তূ যেন শেষ কথাটা এড়িয়ে গেল। তাতেই বোঝা গেল, তার দৃঢ়তা। ক্ষমা! এই শব্দটাকেই অন্তূ এড়িয়ে চলে। সে নিজের আপন ভাইকে ক্ষমা করেনি আজ অবধি, পরাগকে কেন করবে? প্রশ্নই ওঠেনা। তা বুঝে পরাগ হাসল মাথা নিচু করে। সেদিন সে এগিয়ে যায়নি পলাশের হাত থেকে এক রমনীকে বাঁচাতে। জয় আমির দান মেরে

দিয়েছে। তার হাত-পা দাসত্বের বেড়িতে বাঁধা না থাকে কি সে যেত? আর এই চমৎকার বুদ্ধিমতি মেয়েটিকে জিতে নিতে পারতো? কে জানে!

অন্তূ সব এড়িয়ে কেবল বলল, "চলে যান এসব ছেঁড়েছুড়ে।

-"খেলা শেষ না করে না।

অন্তূ ভ্রু কুঁচকাল, "খেলা?"পরাগ কূটিল হাসল, "পলাশের দাসবৃত্তি আর নয়, ম্যাডাম। একে একে গুড়িয়ে চুরচুর করে দেব আজগর প্রোপার্টিজের কারবার। এরপর নিরুদ্দেশ হবো চিরকালের জন্য। শেষ দেখা হলো আজ ধরুন আপনার সাথে।"

অন্তূ একটু অবাক হয়েছিল, “আপনি কি জয় আমিরকে সহায়তা করেছেন?”

-“না করার কী আছে? আমি পলাশের ঘরের শত্রু বিভীষণ। আমি ম্যাডাম অত খারাপ নই। মা চিরকাল দাসীগিরি করে এসেছে, রক্তে তা ছিল আমার। তাই বহুবছর দাস খেটেছি। কিন্তু পড়ালেখা করতে গিয়ে, সমাজের সাধারণ স্তরের ভালো মানুষদের সাথে মিশতে গিয়ে বিবেকের ঢাকনা একটু একটু করে খুলে যেত। আমি দেখতে পারতাম না পলাশ আর ওর চাচার এসব কুকর্ম, ওর আদেশ মানতে গিয়ে যেসব করতে হতো, তা করতেও বিবেকের দংশনে পড়তাম। এজন্যই

তো দুবছরের জেলটা খাটালো আরও। আর না, ম্যাডাম। শেষ পাপটা করলাম এবার। বিশ্বাসঘাতকতা। মাফ না পাই। কিছু মানুষ বেঁচে যাচ পলাশের হাত থেকে। এতে যেটুকু পূণ্য হবে, চলবে।''অন্তূ বুঝেছিল, জয় আমির ও হামজাই নয় শুধু, আরও একজন পলাশের পেছনে লেগেছে এবার। কিন্তু জয় আমির শুধুই নিজেকে ধরা দিচ্ছে পলাশের কাছে। লোকটার কি জানের মায়া নেই? পরাগকে পলাশের সামনে সে আনেনি এই ঘটনায়, তা যেন অন্তূ নিশ্চিত। কারণ জয় আমির পাপের দায় নিতে খুব পছন্দ করে। পাগল-মাতাল লোক। কেউ একটু সহায়তা করলে তার জন্য

জান হাজির। এইসব লোক ধ্বংস হয় খুব খারাপ ভাবে। তা জয় নিজেও জানে, তবু কোনো সতর্কতা নেই?

অন্তূ শেষে আন্দাজে আরেকটা ঢিল ছুঁড়েছিল, “আপনাকে কেউ একজন সহায়তা করেছে, সে কে?”

পরাগ হেসেছিল শুধু। অন্তূ বলেছিল, “রূপকথা আজগর নামের কেউ নাকি?”

অন্তূর রসিকতায় পরাগের হাসি চওড়া হয়েছিল। অনেকক্ষণ অন্তূর দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থেকে বলেছিল, “আপনি আমার কোথাও একটা সুঁচালো ধাক্কা মেরেছিলেন ম্যাডাম। যেই ধাক্কা সামলে উঠতে চেয়েছি।

আজ এই মুহুর্তে আবার নড়বড়ে লাগছে নিজেকে।

তখনই অন্তূ উঠে দাঁড়িয়েছিল এই পর্যায়ে, “অথচ আমি বিবাহিতা, মি. পরাগ। এ ধরণের কথা বলাও অসঙ্গত আমার সঙ্গে।”-“জানি ম্যাডাম। আর আপনার এই ব্যক্তিত্বই পুরুষের মরণের কারণ। যে জয় আমিরকে এত কঠিন ঘেন্না আপনার। তবু তার অগোচরে নিজের চরিত্রের সঙ্গে আপোষ নয়। আপনি তাকে মানেন?”

অন্তূ গম্ভীর স্বরে শুধু বলেছিল, “আমি সেই বিয়ের খোৎবা ও তিন কবুলকে মানি কেবল। আর কিছু নয়। আসি আমি আজ।”

অন্তূ উঠে দরজার দিকে যায়। পরাগ তবু অপলক চেয়ে ছিল। বুকটা চিনচিন করছে। সে জানে এই নারী আর ফিরে তাকাবেনা। তবু চেহারাটা দেখার লোভ সংবরণ করা বড় দুঃসাধ্য। পরাগ জোর করে বসে রইল। সংযমের বাঁধটাকে শক্ত করে বসে রইল। এগিয়ে গেল না। নারীটিকে বেরিয়ে যেতে দিলো। বুক চিড়ে যাচ্ছ। এই ক্ষত ভরাট হয়ে যাবে। তবে এই মুহুর্তে বড় ভোগান্তিতে ফেলছে। এটা তো বিরহ নয়, প্রবাহ। পরাগ হেসেছিল। অন্তূ বেরিয়ে এলে জোরে জোরে শব্দ করে হেসেছিল।রাত সাড়ে চারটার দিকে জয় ফিরেছিল সে রাতে। ফজরের আজান

শোনা যাচ্ছে দূর মসজিদ থেকে। ঘোর অবরুদ্ধ রাত। আকাশে চাঁদ নেই। চাঁদটা মেঘের আড়ালে লুকিয়ে সে রাতে বোধহয় জয় আমিরকে সুযোগ দিয়েছিল লহু রঙে হাত রাঙাবার খেলায় মত্ত হতে। সেই ভোররাতে র^ক্তে শরীর ধুয়ে সদর দরজা পেরিয়ে ঢুকল জয় আমির। আলত আঁধারির সদরঘরটায় তার ছিপছিপে কঠিন অবয়বের পেটানো লুঙ্গি পরিহিত দেহটার লম্বা ছায়া পড়ল।

সদর দরজার এপারে এগিয়ে দেয়াল ঘেঁষে র^ক্তাক্ত চাপ্পরটা থপ করে ফেলল। ধাতব অস্ত্রের ঝনঝনানিতে চমক উঠল অন্তূ। চাপ্পরটা মেঝেতে পড়ার সাথে সাথে চাপ্পরের

গায়ে লেগে থাকা রক্ত ছিটিয়ে পড়ল মেঝের সাদা টাইলসের ওপর।অন্তূ শান্ত পায়ে বেরিয়ে এল রুম থেকে। জয় আমির ফিরেছে। শিকার না করে ফেরেনি, দৃঢ় বিশ্বাস অন্তূর। সে জানে জয় আমির শিকার করায় ওস্তাদ। ঠিক যেভাবে চায়, পরিস্থিতি সেভাবেই প্রবাহিত হয়, তার অনুকূলে। এটা জয় আমিরের সতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অথবা জৌলুস-অর্জন।

হামজা বসে আছে তখনও সোফাতেই। তার অপেক্ষার অবসান হলো। শান্ত নজর মেলে তাকিয়ে দেখল বিদ্ধস্ত জয়কে। মুখে একপ্রকার তৃপ্তি। খুঁটিয়ে দেখল, জয়ের

শরীরে আঘাত আছে কিনা! বোঝা যাচ্ছে না। তবু হামজা জানে, জয় শিকারে গেলে আঘাতপ্রাপ্ত হয়না। সে যতবার আঘআতপ্রাপ্ত হয়েছে, নিজে সারেন্ডার করে যেচে পড়ে মার খেয়েছে, তবু আইনের কর্মকর্তাদের কাছে নতি স্বীকার করেনি। যা মুখে এসেছে, বকে গেছে। উত্তর দেবার সময় একবারও চিন্তা করার অভ্যাস নেই, পরিণতি হবে। সামনে কে, কী হতে পারে তার সাথে। সেসবের ধার না ধারায় জীবনে আঘাতের কমতি অন্তত নেই দেহে।এই গুণটা জয়ের বউয়ের মাঝে আছে। সব হারাতে রাজী তবু ভিত নড়তে দেয়া যাবেনা।

হামজা আস্তে করে বলল, “গোসল করে আয় এখানে। চোট পেয়েছিস কোথাও?”

কথা বলল না জয়। কপালে মাটি। চোখদুটো শান্ত, স্থির। ঘড়ি দেখল সে চোখ তুলে। হাতের চটের বস্তাটা হাত থেকে ফেলে দিলো। এখনও বস্তার নিচ দিয়ে ঘন লাল তরল চুইয়ে চুইয়ে দু-এক বিন্দু মেঝেতে পড়ছে।

সাদা ধবধবে লুঙ্গিখানা র^ক্তে ধুয়ে উঠেছে। মুখে বাঁধা গামছাটা তখন মুখ থেকে নামানো, গলায় ঝুলছে। মুখ, গলা, হাতের কনুই অবধি র^ক্তের ছিঁটা। তার ওপর কাঁচা মাটির আস্তরণ। লুঙ্গিতে মাটি ভরা।গলার লাল

টকটকে গামছাতেও মাটি, ঘাম, র^ক্ত। হাতের কব্জি অবধি মাটিতে ঢাকা। নখের ভেতর মাটি। খুবলে মাটি খুঁড়েছে বোধহয়। রক্তের সাথে মাটি মিশে একাকার পুরো শরীরটা। চাপ্পরের ধারালো দিকটায় শুকনো রক্তের ওপর এখনও অল্প-সল্প আধজমাট বাঁধা রক্ত। পায়ের চামড়ার স্যান্ডেলটা বস্তাতে বোধহয়। খালি পায়ের গোড়ালির ওপর অবধি মাটি। সেই মাটিতেও তাজা র^ক্ত মিশে আছে।

সেই মাটি পায়ের তালু থেকে ঝরে মেঝেতে ছড়াতে ছড়াতে রুমে ঢুকল। গামছা দিয়ে আরেকবার ঘাম ও র-ক্তে একাকার মুখটা

মুছে গোসলে ঢুকল।গোসল করে কোমড়ে গামছা পেঁচিয়ে বের হলো জয়। পা থেকে হাঁটু অবধি পশমে আবৃত। খোলা বুকে পশমে ঢাকা। টপটপ করে পানি পড়ছে চুল থেকে। চুল মুছতে পারেনা ঠিকমতো জয়। পানি তার শরীরে লেগে থাকা মাটি ও রক্ত ধুয়ে নিয়ে চলে গেছে, নিতে পারেনি মুখের কাঠিন্য। তার ওপর বিভৎস সেই গায়ে কাঁটা দেয়া দাগগুলো। চোখদুটো লাল, তাতে বুঝি এখনও রক্তের নেশা!অন্তূর মনে প্রশ্ন জাগে, খুন করলে কি পুরুষদের গোসল করতে হয়? যতবার জয় মরপিট করে ফিরেছে, যত রাতই

হোক গোসল করতে দেখেছে। আজ নাহয় মাটি ছিল, আগেও দেখেছে গোসল করতে। তখনও শরীরটাও প্রায় ভেজা। কোনোমতো শুধু গামছা পেঁচিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। আচমকা এক অ-কাজ করল। অন্তূর বুক থেকে একটানে ওড়নাটা ছিনিয়ে নিয়ে গলায় পেঁচালো। গামছা ধরণের কিছু গলায় থাকলে সেটা বড় তৃপ্তিদায়ক লাগে তার। শরীর ঘামে প্রচুর। তার ওসর ছোটবেলার অভ্যাস—গলায় কিছু না রাখলে চলেনা যেন। সেই ওড়না দিয়ে ঘাঁড় এদিক-ওদিক কাত করে ভেজা শরীরটা মুছে লুঙ্গি পরলো।হামজা রুমে ঢুকল। রিমি শুয়ে আছে। শরীরটা ভেঙে

পড়েছে মেয়েটার। হামজা কপালে হাত রাখল। ঠোঁট, নাক লাল হয়ে আছে, মুখটা ফোলা ফোলা। অতিরিক্ত কান্না করেছে, ভয় পেয়েছে। জয় যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল হামজার সাথে দেখা করে, দৌড়ে হামজার কাছে গেছিল।

সোফাতে বসা হামজা তখন। রিমি দৌড়ে গিয়ে স্বামীর পায়ের কাছে লুটিয়ে বসল। হাঁটুদুটো দু'হাতের বাহুতে জড়িয়ে লাল চিকচিকে চোখ মেলে জিজ্ঞেস করেছিল, "জয় ভাইয়া কোথায় যাচ্ছে, মেয়র সাহেব? মাজহার ভাইকে মারতে?"কঠোর বলিষ্ঠ হাতের মুঠোয় হামজা রিমির থুতনিটা আলতো করে ধরে

আঙুল দিয়ে আদর করে বলেছিল, “তোমার আরাম করা দরকার। রুমে যাও। আমি আসছি।”

রিমি যায়নি। স্বামীর হাঁটুতে আস্তে করে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে আঁচল বিছিয়ে পা মেলে দিয়ে পড়ে ছিল। হামজা রিমির চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে গভীর ভাবনায় মত্ত হয়েছিল। থেকে থেকে তুলির মেয়ের কান্না ভেসে আসছিল। তরু ছাড়া কোয়েলকে কেউ চুপ করাতে পারেনা। রিমি আরও হাতরে ধরল হামজাকে। যেন সে আশ্রয় চায়। কঠিন দেবদূতের মতো চেহারার ওই শক্ত-সামর্থ্য পাষাণ্ড পুরুষটির খুব কাছে রিমির ছোট্ট দেহ

ও দূর্বল মনটা একটুখানি আশ্রয় চায়।হামজা তখন উঠে রিমিকে কোলে তুলে নিলো। রিমি হু হু করে কেঁদে উঠে মুখ লুকায় স্বামীর বুকে। হামজা আর বোঝার চেষ্টা করল না, কেন কাঁদছে তার বউ। নারীকে বোঝার চেষ্টা করার অপচেষ্টা সে কখনোই করেনি। হামজার বিশ্বাস, নারীজাতকে বুঝতে চেষ্টা করলে এ জনম ফুরোবে, পুরুষ জন্মটা পুরোটা বৃথা পড়ে যাবে। নারীদের নিয়ে হামজার কোনোকালে বিশেষ জ্ঞানধারা নেই। আস্তে করে এনে যখন রিমির কুঁকড়ে যাওয়া শরীরটাকে বিছানায় শুইয়ে দিলো, রিমি তখনও গলা ছাড়েনি হামজার। হামজার ভারী

পৌরুষ দেহটাকে অনেকক্ষণ ওভাবেই ফেলে রাখতে হয়েছিল রিমির শরীরটার ওপর। পরে একটু ঘুমিয়েছিল।এখন আবারও কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে যখন সরে যাচ্ছিল, রিমি ধরল, অর্থাৎ সে জেগে উঠেছে। আস্তে আস্তে উঠে বসল হামজার বাহু আঁকড়ে ধরে। হামজাকে বসালো সামনে। হাতদুটো গুটিয়ে কোলের ওপর রেখে হামজার কাঁধে কপাল ঠেকালো। হামজা আস্তে করে ভারিক্কি গলায় জিজ্ঞেস করে, "কী হয়েছে, বেগম?"

রিমি ডুকরে ওঠে, কণ্ঠ কাঁপে মেয়েটার, "জয় ভাইয়া ফিরে এসেছে?"

-“সাথে তোমার মাজহার ভাইয়ের দেহের বিভিন্ন খণ্ড এনেছে বোধহয়, দেখবে?”হামজার বরফশীতল কণ্ঠস্বর, তাতে রাজ্যের বর্বরতা যেন। রিমির কান্নারত দেহটা কেঁপে উঠল পুরুষটির নিঠুরতায়, তবু কেঁপে উঠে সেই পুরুষটিকেই আঁকড়ে চেপে ধরল খামছি দিয়ে। হামজা আবারও বিভ্রান্ত হয় নারীচরিত্রে। সে বোঝেনা এদের, কখনোই না, চেষ্টাও করেনা তাই। শুধু টের পেল, আজ মাজহারের ওপর পুরোনো স্মৃতির দমক আছে তার বউয়ের, তবু সাথে প্রশ্রয়ও আছে যে তারা মাজহারকে টুকরো টুকরো করে পশু দিয়ে খাওয়াতে পারে। রিমি তা কষ্ট ও সুখ

দুটো মিশিয়ে অদ্ভুত অনুভূতি সহকারে দেখবে। আপন লোকের অতি-পাপ মানুষকে অন্যরকম কষ্ট দেয়, তা ব্যাখ্যাতীত। সেখানে স্নেহের টান নয় বিশ্বাস ভাঙার যন্ত্রণা থাকে। হামজা অনেকক্ষণ জড়িয়ে-চেপে ধরে বসে রইল রিমিকে। ছোট্ট শরীরটা কাঁপছে। ছটফট করছে হামজার বুকের ভেতর পড়ে। হামজা জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে? কেমন লাগছে? "জড়িয়ে এলো রিমির কণ্ঠস্বর, "তরু..." বলেই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল হামজার অর্ধঘর্মাক্ত শক্ত শরীরটা। কয়েকটা খামছিও বসে গেল সেখানে। আরও আরও চেপে ধরতে চাইছে যেন, খামছিগুলো দিয়ে ক্ষোভ

ও যন্ত্রণা লাঘবের চেষ্টা করে চলল। হামজা বাঁধা দিলো না, চুপচাপ চুলের ওপর হাত রেখে চেপে ধরে রইল নিজের সাথে। ফজরের আজান শেষ হয়ে গেছে। এখন আকাশ ফর্সা হয়ে উঠবে। হামজার ইচ্ছে করল, জয়কে সঙ্গে নিয়ে নামাজটা আদায় করে আসতে। সুযোগ নেই। কাজ আছে তার। বলল,"ঘুমানোর চেষ্টা করো। সব ঠিক আছে, কিচ্ছু হয়নি। বড় বড় ঘটনার আগে এমন সব ছোট ছোট আভাস সইতে হয়। তাতে সহনশীলতা বাড়ে, রিমি। দেখো না, এডমেশন টেষ্টগুলো কত কঠিন মনে হয়! কেন কঠিন হয় বলো তো! কারণ, এডমিশন

টেস্টের পর যে লেভেলটা, সেটা আরও বহুগুণ কঠিন। সেই এডমিশনের কাঠিন্য পাড়ি দিয়ে যে ক্যান্ডিডেটগুলো এগিয়ে যেতে পারে, ধরে নেয়া হয় এরা পরের ধাপের কাঠিন্য সইতে পারবে। নয়ত তো দেখতে যাকে-তাকেই ভালো কোথাও এডমিট নেয়া হতো। তা হয়না। বড় কিছুতে যোগদান করতে সেই সহনশীলতা চাই। এটুকুতে আমাদের ভাঙলে চলেনা, রিমি। আমি শিখিইনি তা। বয়স পনেরোতে থামিনি, তখনও এমন বহুত কিছু দেখেছি, তাই আজ এখানে। এখানে না থামলে আরও ওপরে। বুঝলে না তুমি! দরকার কী? সকাল হয়ে

আসছে। ঘুমাও এখন। আমার কাজ আছে। জয় ডাকবে এখনই।”এত আদুরে গলায় এত হিংস্র সব কথা বলা যায়? এই প্রশ্নতেই আঁটকে থেকে রিমি দেখল তার স্বামী বেরিয়ে যাচ্ছে রুম থেকে। সে গুটিসুটি মেরে পড়ে রইল বিছনার সাথে। লোকটা কি তাকে অবহেলা করছে? এই ব্যস্ততা ফুরোবে কবে? এখন কি পারতো না রিমিকে জড়িয়ে নিতে একটু ঘুমিয়ে নিতে! আচ্ছা এই ব্যস্ততা কাটলেও কি রিমির পাশে শোবার জন্য ওই পাষাণ্ড পুরুষ থাকবে? রিমি আঁৎকে ওঠে। গলা শুকিয়ে আসে ওর। দৌড়ে গিয়ে জাপটে

ধরতে ইচ্ছে হয় লোকটাকে। কিন্তু হাত-পা আঁটকে আছে বিছানার সাথে।

জয়ের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, “ভাই? হামজা ভাই...”বড়ঘরে দিন-রাত নেই। ও জায়গা চিরকাল অন্ধকূপ। তৈরিটাই ওভাবে করে নিয়েছিল হামজা। তাতে কোনো জানালা নেই।

জয় হাতের চটের বস্তাটা মেঝেতে ঘঁষে ঘঁষে টেনে এনে রাখল। শরীর তখনও ভেজা। মুরসালীন বলল, “এখন গোসল করলি নাকি?”

জয় একবার তাকিয়ে দেখে আবার নিজের কাজে মনোযোগ দিয়ে বলল, "তোর ওযুর পানি চাই তো বল।"

মুরসালীন বেশ ক্লান্ত স্বরে বলল, "তা তো চাই। শুধু আমার নয়, সবারই চাই। হাতটা খুলে দে। বাথরুমেও যেতে হবে।"

জয় কঠিন মুখে উপহাস করে উঠল, "হ একটু ইবাদত বন্দেগী বেশি করে কর। টপকে যাবি যখন-তখন। পাপ-টাপের মাফ চেয়ে নে।"উপহাসের ম্লান হাসি হাসল মুরসালীন মহান, "হ্যাঁ। তা তো চেয়ে নিতেই হবে। তোদের এইদিক দিয়ে খুব সুবিধা, জয়। তোদের পাপ-টাপ নেই জীবনে,

সৃষ্টিকর্তার ইবাদত বা ক্ষমা চাওয়ার ঝামেলাও নেই...''

তীব্র খোঁচা মারা কথাটা শেষ হলোনা মুরসালীনের। জয় এক খণ্ড লোহা তীব্র বেগে ছুঁড়ে মারল মুরসালীনের দিকে। তা লাগলে নির্ঘাত মাথাটা ফেটে এখনই খারাপ কিছু হয়ে যেতে পারতো মুরসালীনের। কিন্তু আঘাতটা ফসকে গেল। আর সেটা জয়ের ইচ্ছেতেই বুঝি!

মুরসালীনের হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে এসে জয় ধাতু গলানোর চুল্লিতে গুঁড়ো চুনাপাথর ও কোক মেশালো। যখন চুল্লি জ্বললো, বড়ঘরের তাপমাত্রা প্রায় অসহনীয় পর্যায়ে চলে যাচ্ছিল।

ঘেমে আরেকবার গোসল করে উঠল জয় ও হামজা।জয় চুল্লি জ্বালিয়ে কিছু গুড়ো লৌহ মেশাতে থাকল চুল্লিতে। হামজা চটের বস্তা উপুড় করে ঢালল। ঝরে পড়ল তাজা দুটো কাটা পা ও দুটো হাত। থকথকে হয়ে আছে শিরা-উপশিরা থেকে ঝরা কষানি ও জমাট বাঁধা রক্ত।এককোপে কেটে নিয়েছে, দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। এখনও হাতের আঙুলে মাজহারের ব্যবহৃত মেটে রঙা পাথরের আংটিটা আছে। বাচ্চারা ভয় পাচ্ছিল। মুরসালীন থামালো ওদের।

হামজার কোনো বিশেষ খেয়াল নেই আজ ওদের দিকে। সে চাপ্পর দিয়ে মাজহারের

কাটা হাত-পা ছোট ছোট টুকরো করছে। হাড়গুলো ছড়ানোর সময় পাথর ব্যবহার করল। এরপর টুকরোগুলো ছুঁড়ে মারল এক এক করে জলন্ত চুল্লিতে।এমনিতেই গলিত লোহার গন্ধ অসহনীয় হয়। জয়-হামজা দুজন খুব অভ্যস্ত। কিন্তু বাচ্চাগুলো অস্থির হয়ে যাচ্ছিল। তার ওপর কাঁচা মানুষের মাংস, হাড় ইত্যাদি ঝলসে যেতে লাগল চুল্লিতে, অসহ্য দূর্গন্ধে বড়ঘরে থাকা মুশকিল হয়ে যাচ্ছিল। মুরসালীন দেখল, জয় কিছু ঢালছে চুল্লিতে। হয়তা পেট্রোলিয়াম-কয়লা হবে।

বড়ঘরের ডানপাশে একটা ক্রুসেবল মেটাল-মেল্টিং মেশিন আছে। ওটা বোধহয় অচল। হামজা জিজ্ঞেস করল, “মাথাটা কোথায়?”

-“পুঁতে রেখে এসেছি।”

-“কবরস্থানে খাদেম ছিল?

-“বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল।”

-“টাকা দিতে হয়েছে?”জয় কথা বলল না। তার পুরো শরীরে ঝর্না বয়ে যাচ্ছে ঘামের। মুরসালীন নামাজ শেষ করে বসে দেখল দুই ভাইয়ের বর্বরতা চুপচাপ। মাজহারের মাথাটা কবর দিয়ে রেখে এসেছে, হাত-পা চারটা এখানে গলিয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলছে। অর্থাৎ কোথাও শুধু কোমড় থেকে গলা অবধি

দেহখণ্ডটুকু ফেলে রেখে এসেছে। তা দেখে ওটা যে কার দেহখণ্ড তা শনাক্ত করাও মুশকিল।

মুরসালীনকে আবারও স্পটলাইটের নিচে বাঁধল জয়। মুরসালীন জিজ্ঞেস করল, "কাকে খণ্ড করে এলি? কী হয়েছে? কোনো পাপের পুরস্কার পেয়েছিপ নাকি আবার?"

জয় মুরসালীনের দিকে কোমড় ঝুকিয়ে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসল, "কলজেটা কচমচিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলব। কথাবার্তা মেপে বলবি। "মুরসালীন হাসল, "দাড়িপাল্লা কোথায়? আমার কথা মাপার আগে তোদের পাপ মাপতাম। কতটা পাপ জমা হলে বা তার

প্রতিদান আসতে শুরু করে! তোদেরটা শুরু হয়েছে বোধহয়। অবশ্য শুধুই আন্দাজ আমার।”

জয় ওর ডানহাত খোলা রেখে সামনে একটা মোড়া নিয়ে চেপে বসল। একটা কাগজ ও কলম এগিয়ে দিয়ে বলল, “একটা সুন্দর স্টেটমেন্ট দে তো, বাপ। বহুত জ্বালাচ্ছিস। এমনিতেই মন-মেজাজ ভালো না। যা বলছি, সেটা লেখ।”

-“মন মেজাজের কী হয়েছে? বলবি তো। ”-“যা বলছি, সেটা কর, মুরসালীন। কথা বলতে আগ্রহ পাচ্ছিনা।”

মুরসালীন অটল পর্বতের ন্যায় মাথা নাড়ল, “এতই যদি সহজ হতো, তাহলে কি এতকিছু করতে হতো তোদের? এতদিনে পারলি না, আজ এমন কী হলো যে, সহজ ভাবছিস? আর কী বলতে বলছিস তোরা, যা আমি করিইনি। করলেও তা শুধুই প্রতিক্রিয়া। ক্রিয়া তোরা দেখিয়েছিলি শুরু থেকে। হাজার হাজার প্রাণ নিয়েছিস। সেসব অবিচারের এক ফোঁটা প্রতিক্রিয়ায় এত জ্বলন ধরেছে কেন তোদের? কিছুই করিনি আমরা। শুধু আল্লাহর নামে সয়ে যাচ্ছি।”

-“করিসনি? শালা জঙ্গির দল। দেশদ্রোহী শালা তোরা। টুপি-দাড়ি গালে মাথায় ঝুলায়ে

দেশের সাথে বেইমানি করে যাচ্ছিস যুগের পর যুগ।”-“কীসের বেইমানি, জয়? দেশটার অধঃপতনে কত আনা দায় আমাদের দিয়ে মিছেমিছি পাপমুক্তর অভিনয় করতে চাস তোরা? তোদের বিবেচনাবোধ খুলুক, আমিন।
”

হামজা শান্ত স্বরে বলল, “বেশি ঝটপটাচ্ছ, মুরসালীন। শান্ত হও।”
-“নইলে কী করবেন?” শান্তস্বরে বলল মুরসালীন, এরপর জয়ের দিকে ফিরল “তোদের বোঝাপড়া আমার সাথে। ওই বাচ্চাগুলোকে ছেড়ে দে। ওরা কিচ্ছু করেনি। তোদের শক্তি ক্ষমতার, আমাদেরটা দিলের।

ভুলে যাসনা, প্রাণ নিয়ে যারা পালায় তাদের দৌড়ের গতি বেশি হয়। একবার ছেড়ে দিয়ে দেখ না! বেঁধে কেন রাখতে হয়, কারাগারে কেন দিতে হয়, রাতে আন্ধারে মেরে কেন ফেলতে হয়? রাজপথে সামনে আসার সৎ-সাহসটুকু বুকে নেই, তা জানিস তো তোরা। মিছেমিছি বাহাদুরী দেখাস না, ভাই। বিরক্ত লাগে।''জয় কিছুক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে থেকে কাগজটা এগিয়ে দিয়ে কেবল শীতল স্বরে বলল, "স্টেটমেন্ট।''

-"তুই শুধুই ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকে এসব করছিস, জয়। আর যেটা শুধুই ভুল বোঝাবুঝিতে সৃষ্টি হয়েছে তোর মাঝে।''

জয় রোবটের মতো স্থির স্বরে কেবল উচ্চারণ করল শক্তমুখে, "স্টেটমেন্ট।"

-"কীসের স্টেটমেন্ট?"

-"দেশের সাথে গাদ্দারি করে আসছিস তোরা সেই পূর্ব পাকিস্তানের আমল থেকে। এখন আবার সংখ্যাগরিষ্ঠতার চেষ্টা করছিস দেশের ক্ষমতাকে উপড়ে ফেলে নিজেরা ক্ষমতায় বসতে। এসব লিখবি। কাকে কাকে মেরেছিস, আর কারা জিম্মি আছে তোদের কাছে, সেসবের হিসেব দিবি, সব স্বীকারক্তিমূলক একটা স্টেটমেন্ট চাই।"

জয়ের কণ্ঠ ফুঁড়ে আগুনের হল্কা ছুটছিল।

আগুনটুকু গিলতে গিলতে যেন আবারও রিপিট করল কথাগুলো।''

মুরসালীন শান্ত, স্থির কণ্ঠে বলল, "যে কথাগুলো বললি তার কোনো যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা বা প্রমাণ আছে তোর কাছে?''হামজা চুপচাপ বসে ছিল। এবার তাকাল চোখ তুলে। জয় বলল, "একটা স্টেটমেন্ট দে।''

-"মিথ্যা স্বীকারক্তি দেব? কিন্তু কেন?''

-"ওদের বাঁচাতে। তুই তো আমির ওদের, না? তোর সামনে মরবে, দেখতে ভালো লাগবে না তোর।''

-"ওরা বাঁচবে না এতে।''

জয় দাঁত খিঁচে উঠল, "জয় আমিরের কথার নড়চড় হয়না।"
মূরসালীন মাছি তাড়ানোর মতো অবজ্ঞা করে বলল, "রাখ তোর জিকির। কথায় কথায় কী এত নিজের নাম জপিস মূর্খর মতো! নিজের ভেতরে কখনও ঝেঁকে দেখেছিস, কতবড় ফাঁপা ঢোল তুই? এক পর্বতসম হাহাকার নিয়ে শুধু দাপিয়ে বেড়াচ্ছিস ক্ষমতার দাপটে। আদতেও কি তোর বলতে কিছু আছে?
"সজোরে একটা ঘুষি মারল জয় মুরসালীনের ক্ষত-বিক্ষত মুখটার ওপর। রক্ত বেরিয়ে এলো। মুরসালীন মলিন মুখে হাসল, "তুই 'সত্যি' নিতে পারছিস না, জয়। তুই জানিস

আমি ঠিক, তুই ভুল। তবু এই ক্ষমতার দাপট, আর অপশক্তির দ্বিধান্বিত লড়াই। পিছু হটে যা। পাপ করিস না আর। হামজা ভাইয়ের ক্ষমতার খিদে আছে। তোর তো তা নেই। শুধুই ব্যক্তিগত আক্রোশ। ছেড়ে দে এসব।''

একটু থেমে মুরসালীন বলল, "খিদে বড় খারাপ জিনিস, জয়। জানিস তো ১৯৭২ এর আন্দেজ পর্বতে প্ল্যান ক্রাশের ঘটনায় ৭২ দিন যে যাত্রীগুলো বরফের পর্বতে আঁটকে ছিল, খিদে ওদের কী পর্যায়ে নিয়ে গেছিল? ওরা নিজেদের সহযাত্রীদের দেহের মাংস ছিঁড়ে খেয়ে বেঁচে ছিল। এ থেকে আন্দাজ করতে

পারবি, খিদে কতটা ভয়াবহ রিপু। শুধু পেটের খিদেই নয়, জয়। মানুষের ষড়রিপুর মাঝে একটি এই লোভনীয়-খিদে। সেটা যেকোনো কিছুর খিদে হতে পারে। হোক ক্ষমতার। যা মানুষকে সর্বোচ্চ নিচে অবধি নিতে পারে। হামজা ভাই থামবে না। তুই কেন তার সঙ্গী ও সাক্ষী হচ্ছিস? তোর এ কী হাল হয়েছে, জয়? ....''-"তোর নীতির বাণী পকেটে রাখ, মুরসালীন। ভালোই মাইন্ড কন্ট্রোল করার ট্রিক্স শিখেছিস দেখছি, বাপ! রাজনীতি আর শিবির থুক্কু জঙ্গিবাদ ছেড়ে কি সাইকোলজি নিয়ে গবেষণা করছিস? বালের প্যাঁচাল ছাড়। রাজধানীতে ছাত্রলীগের

কয়েকজন নেতা জিম্মি আছে তোদের কাছে। তাদের খোঁজ দে। বাচ্চাগুলোকে ছেড়ে দেব।'' মুরসালীন হতাশ নিঃশ্বাস ফেলল, ‘‘তাহলে চল একটা সওদা করি।''জয় তাকিয়ে রইল। মুরসালীন বলল, ‘‘আমাদেরও অসংখ্য লোক তোদের কাছে বন্দি। যারা ধুঁকে ধুঁকে মরছে, আবার কতজন কারাবাসে যাচ্ছে, তাদের ছাড়িয়ে আন। আজ যা রাজধানীতে। তোর উপরমহলের কর্তাদের বল, ওদের ছেড়ে দিতে। দেশটাকে ক্ষমতার ক্ষুধা নিবারণের সুস্বাদু খাবার না বানিয়ে অন্তত কিছুটা ন্যায়নীতিতে বহাল রাখতে বল। দেশটা জঙ্গল, দেশের জনগণ জঙলি জানোয়ারে

পরিণত হয়ে যাচ্ছে দিনদিন। ভালো লাগে এসব?''

জয়কে সরিয়ে দিলো হামজা। ঠেলে বড়ঘর থেকে বের করে উপরে পাঠাতে চাইল, "যা। ঘরে যা। একটু ঘুমা।''

জয় গেল না। চুপচাপ বসে রইল ইস্পাতের খণ্ডের ওপর। হামজা বসল মুরসালীনের সামনে।তিনদিনের পর একটা কুলখানীর আয়োজন করা হলো পাটোয়ারী বাড়িতে। পুরো এরিয়ার লোকের নিমন্ত্রণ। হাজার হাজার লোক খাবে।

সকাল সকাল বাজারে গেছিল জয়। ভ্যান ভরে ভরে বাজার এলো। জয় ফিরল

রিক্সাতে। তার বাইকের প্রতি কোনো মোহ ছিল না কখনও। যুবক বয়সেও কখনও বাইক নিয়ে অযথা ফুটেজ খেয়ে বেড়ানোর মতো কোনো প্রবণতা তার চরিত্রে দেখা যায়নি। একবার জয়কে এক নারী বলেছিল —'জয় আমির সাহেব, যে নদীর গভীরতা বেশি, তার বয়ে চলার আওয়াজ কম।' জয় মানে কথাটা। আর কখনও দেখা হয়নি নারীটির সঙ্গে তারপর। তবু জয় মানে, যার গভীরতা বেশি তার চলনে তর্জন-গর্জন থাকেনা। সেই নারী আরও বলেছিল—'রহস্য কোনটা জানেন? সেটা যে রহস্য, সেটাও এক প্রকার রহস্য, সেটাই রহস্য।'জয় বিরক্ত হয়ে

বলেছিল, 'বালের কথা কইয়েন না। বুঝায়ে কন।'

নারীটি ধারালো ঠোঁট কিঞ্চিৎ এলিয়ে হেসেছিল, 'রহস্যকে আপনি দেখবেন, নাড়বেন, অনুভব করবেন, খুব কাছে থাকবেন। অথচ বুঝতে পারবেন না, ওটা এক রহস্যের দ্বার। সেটা হলো রহস্য। অর্থাৎ যা রহস্য, তা দেখে বোঝা যাবেনা সেটা রহস্য। রহস্যের রহস্যটাও এক প্রকার রহস্য।'

এসব কেন মনে পড়ছিল আজ রিক্সায় চলাচলের সময়, জয় জানেনা। লোকের দিকে ওর খেয়াল নেই। তবু যে লোকে ঘটা করে

ওকে সালাম ঠুকে যাচ্ছে, তা বুঝল। মনে মনে বকেও উঠল, তেলবাজ বাঙাল সম্প্রদায়! জয় রিক্সাওয়ালাকে বলল, “একটা শাবনূরের গান শুনবি?”

উৎসাহে মাথা নাড়ে রিক্সাওয়ালা, হ ভাই, শুনি।জয় গেয়ে উঠল, “যেই ডালে বান্ধি বাসা, ভাঙে সেই ডাল, আমার এমনই কপাল..”

ফটকের সম্মুখে থেমে দেখল ছেলেরা বাজার নামিয়ে নিচ্ছে। সে রিক্সার ভাড়া মিটিয়ে পেছনের ভ্যান থেকে খাঁচা নামালো। চারটে বিদেশী মাংসাশী কুকুর। সরু সরু ধারালো দাঁত সবসময় বেরিয়েই থাকে। ওরা ক্ষুধার্ত,

দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। ছেলেরা চমকালো, "ভাই, এইডারে কী করবেন?"

জয় হাসল, "জবাই করে গরুর মাংসের সাথে মেশাবো। অত হালাল মাংস কেনার ট্যাকা নাই।"

সবাই তাকিতুকি করল। জয় আদেশে বিশাল খাঁচাটাকে নিয়ে গিয়ে ওয়ার্কশপের ওপারের ঘরে রাখা হলো। নির্দেশ রইল, কুকুরগুলোকে যেন এক ফোঁটা পানিও না দেয়া হয়।

রতন এগিয়ে এলো, "ভাই, একখান জরুরী কথা আছে।"

-“ওমা! তাই নাকি? বল বল।”জয়ের রসিকতায় সবাই হাসল, রতন একটু মিইয়ে গেল। জয় বলল, “কী বলবি?”

-“গতকাইল রাত্তিরে সাবেক মেয়র ঝন্টু সাহেবরে কেডা জানি খুব খারাপভাবে খু/ন করছে, ভাই।”

জয় চমকে উঠল, “ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ইশ! সকাল সকাল কী দুঃখের খবর শোনাইলি রে মফিজ! যাহোক, লোকটারে আল্লাহ বেহশতবাসী করুক। সবাই বলো, আমিন।”

সবাই সমস্বরে স্লোগানের মতো করে বলে ওঠে, ‘আমিন।’

শেষে আবার কেউ অভ্যসবশত মুখ ফসকে বলে ফেলল, “জয় বাংলা...”

জয় ফিরে তাকালো। তারপর চট করে হেসে ফেলল। তা দেখে ছেলেদের যে কী খুশি! ওরা পরিস্থিতি বোঝেনা, ওরা খালি জানে, ওদের জয় ভাই হাসলে ওদের মুখ বেজার থাকার নয়। জয় হাত মুঠো করে বিপ্লবীদের মতো করে উচিয়ে ধরে বলল, “জয় বাংলা।”সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় পা টলছিল। জ্বর চলে এলো কেন হঠাৎ-ই, বুঝতে পারছিল না জয়। গতরাতে বাড়ি ফিরেছে রাত তিনটায়। এরপর ঘুম হয়নি ঠিকমতো। গা টলছে। জয়ের চোখের সামনে তরুর জ্বরে কুঁকড়ে যাওয়া

মুখটা ভেসে ওঠে। বকে ওঠে মাথা ঝারা মেরে, “হের শালা! কীসব ধোন-বাল ভাবিস হে! রিল্যাক্স জয়। কিচ্ছু হয়নাই। অল টাইম, অল রাইট। কী বললাম বল তো?”জয় বিকেল অবধি পড়েছিল বিছানায় ওভাবেই। বেহুশের মতো লাগছিল দেখতে। অন্তূ কাজের ব্যস্ততার মাঝেও কয়েকবার ঘরে এলো। ওভাবে জয়কে পড়ে থাকতে দেখে বেশ লাগছিল। প্রতিবার আনমনে স্লান হাসল। নিঃশব্দে মনে মনে জয়কে ডেকে বলল, “নিজের ঘা সাড়ে ষোলো আনা, জয় আমির! পাপ সামনে এসে দাঁড়ানোতে নিজেকে খোদা দাবী করা ফেরাউনও সর্বশক্তিমান আল্লাহর

কাছে তওবা-ইস্তেগফার করেছিল। আপনারা তো নির্বোধ-মূর্খ মানব, যারা মিথ্যা দাপটে লুটেপুটে বেড়াচ্ছেন!''

বাচ্চাদের সকাল থেকে কিছু খেতে দেয়া হয়নি বোধহয়। অন্তূও জয়কেও বিকাল অবধি খেতে ডাকল না, সামান্য কিছু এনেও দিলো না। রিমি যখন হামজাকে খেতে দিচ্ছিল, অন্তূর ইচ্ছে হয়েছিল, খাবার প্লেটটা এক ঝটকায় কেড়ে নিয়ে সবটুকু খাবার কোনো পশুকে বিলিয়ে দিতে। পারেনি।সে নিজেও খায়নি সকাল থেকে। খিদে মরে গেছে আজকাল। পানির পিপাসাও সারাদিনে বিশেষ একটা টের পায়না। কোনোমতো একবেলা

সামান্য খেতে গেলেও গলায় খাবার আটকায় যেন।

মাগরিবের ওয়াক্তের খানিক আগে নিচে গিয়ে ছেলেদের দিয়ে দুধ আনালো। সন্ধ্যার দিকে একগ্লাস গরম দুধ নিয়ে এলো জয়ের জন্য। জয় চিৎ হয়ে শুয়ে কিউব মেলাচ্ছে আনমনেই। তা মিলছে কিনা সেদিকে খেয়াল নেই। খালি গায়ে এসির বাতাসে লোমকূপ শিউরে শিউরে উঠছে মাঝেমধ্যেই। জ্বরের তোপে চোখদুটো লাল। তা দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অন্তূ।অন্তূর আজকাল শুধু চোখের সামনে ভেসে ওঠে মুমতাহিণার ছিন্নভিন্ন ছোট্ট দেহটা। অথচ সেভাবেই যখন এ বাড়ির মেয়ে

তরু অত্যাচারিত হলো, তখন দুইভাইয়ের হত্যাযজ্ঞের আয়োজন অন্তূকে অবাক করে তুলছে ক্ষণে ক্ষণে। দুজনই মেয়ে, সমান তাদের শেষ-যন্ত্রণা। অথচ দুই ভাইয়ের প্রতিক্রিয়া কত ভিন্ন!

জয়ের শরীর টগবগ করে ফুটছে যেন। অন্তূ হাত ছুঁইয়ে চমকে উঠল। দুধের গ্লাস ধরল মুখের কাছে, জয় ছিটকে সরে গেল, "ধুর শালী। কী এইডা? তোরে আনতে বলছি এই জিনিস। এর চাইতে বিষ ভালো। সরা!"

অন্তূ টগবগে গরম দুধের গ্লাসে ঝাঁকি মেরে তা জয়ের হাতে ফেলল। জয় ছিটকে ওঠে। অন্তূ বলল, "আমার সঙ্গে মুখের ভাষা সংযত

রাখবেন। লোক যা-ই জানুক, আপনি তো জানেন, আমি রাস্তার মেয়ে না। এটুকু খেয়ে নিন। ভালো লাগবে।”জয় কিছুক্ষণ ভ্রু কুঁচকে চেয়ে থেকে আলতো করে প্রসন্নচিত্তে হাসল, “হ। বমিটা তোর গা ভরে করি। এরপর অবেলায় একটা গোসল দিয়ে আয়। সরা বাল, দুধ আমি খাইনা।”

অন্তূ বলল, “পছন্দ না?”

-“জীবনে খাই নাই। থুহ। সরাও।”

-“অল্প একটু নিন। আমি খাইয়ে দিচ্ছি।”

জয় ভ্রু কুঁচকে চেয়ে আছে দেখে অন্তূ বলল, “বিষ-টিস নেই। নিশ্চিন্তে খেতে পারেন। এভাবে মারার হলে শত রাত সুযোগ

পেয়েছি।''জয় হেসে মাথা নাড়ল, “আমি খাইনা, দুধ। তুমি খেয়ে ফেলো।''

অন্তূ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দুধটা ঠান্ডা করল। এরপর এগিয়ে এলো। জয়ের বাহুটা ধরে এগিয়ে আনতে গেলএ ইচ্ছাকৃত জয় এসে অন্তূর কাধের ওপর হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে পড়ে রইল। অন্তূ আপাতত কিছু বলল না।দুধের গ্লাসটা জোর করে মুখের কাছে ধরল, “খান এটুকু। জ্বরে তো গা পুড়ছে। খুব সুখ লাগছে তাতে?''

দুধটুকু খেয়ে মিনিট পনেরো বাদে জয় ঘুমিয়ে পড়ল। হামজা বাড়িতে ছিল না।

অন্তূ চাবি নিয়ে চলে যায় বড়ঘরের দিকে। পিপাসার্ত শিশুগুলো অন্তূকে বড্ড জ্বালায়। ওদের খাওয়া না হলে তার গলা দিয়ে পানি নামেনা। জয় ঘন্টাকয়েকের আগে উঠবে না। অন্তূর ভেতর থেকে কেউ ডেকে ওঠে, "তুই ধোঁকাবাজ হয়ে উঠেছিস! নয় কি?"

অন্তূ প্রতিবাদ করে, 'পাপের ত্রাসে পিষ্ট হয়ে মরা আত্মহত্যা হতো। এটা ধোঁকা নয়, হয়ত কৌশল। বেঁচে থাকার কৌশল, বাঁচিয়ে রাখার কৌশল।' একটু চুপ থেকে ফের বলল, 'হয়ত আমি খুব খারাপ হয়ে গেছি।' তাচ্ছিল্য করে হাসে, 'খারাপের রাজ্যে ভালোর প্রবেশ খারাপকে ভালো করেনি, ভালোকে খারাপ

করেছে। এরই দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত হলো। নয় কি?’রাত নয়টার দিকে ঘুম ছাড়ল জয়ের। বাইরে মহিলাদের কোলাহল। আগামীদিন একটা বিরাট আয়োজন পাটোয়ারী বাড়িতে। রসুন-পেয়াজ কাটাকুটো এবং বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা চলছে।

অন্তূ ঘরে ঢুকল। বাচ্চাদের পানি খাইয়েছে, টুকটাক শুকনো খাবার দিয়েছে। কিন্তু কীভাবে ওদের বের করা যায়? চতুর দুর্বৃত্তের মতো দুই ভাইয়ের চোখ। তা ফাঁকি দেবার উপায় খুঁজে পায়নি সে।

ঘড়ির কাঁটা রাত দশটার দিকে। জয় বরাবরের মতো উপুড় হয়ে শুয়েছিল। হাতে

মোটা চুরুট। ধোঁয়ার দুর্গন্ধে ঘরজুড়ে। জয় জিজ্ঞেস করল, “দুধে কী মাল মিশিয়েছিলে, ঘরওয়ালী? মাথা ঝিমিঝিম করতেছে এখনও।”-“ক্লোজেপাম ড্রাগস। অল্প পরিমাণে দিয়েছি। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকুন, রেশ কেটে যাবে।”

-“তোমার ভয় লাগল না কথাটা স্বীকার করতে?”

-“প্রশ্নই ওঠেনা। আমি নিজের কৃতকর্ম যেকোনো পরিস্থিতিতে স্বীকার করে নিতে অভ্যস্ত, হোক সেটা ভালো অথবা খারাপ। দ্বিমুখীতা আগে একদমই ছিল না আমার মাঝে।”

জয় সন্তুষ্ট হাসে। তাদের দুজনের মাঝে অসংখ্য বৈশিষ্ট্যগত মিল। তবু তারা পরস্পরের বিপরীতে রক্তপিপাসু একে-অপরের! এটা কি নিয়তি অথবা অন্যকিছু? অপ্রকৃতস্থর মতো জোরে করে হেসে উঠল জয়, "দুশমনী হো তো এইসি। তোমার-আমার এই ইকুয়েশন দুনিয়ার ইতিহাসে প্রথম না? যেখানে সব বুঝেশুনে...."

-"বলতে পারেন। আর এটাও অনস্বীকার্য, অতি মাত্রায় ঝানু আপনি। অথচ এতসব অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা কুপথে ব্যায় করে ফেললেন। সেক্ষেত্রে এখানে আমিও জানি আপনি জানেন, আপনিও জানেন তা আমি

জানি। সেটা আমরা দুজনই জানি, আমি আপনি সেটাও জানি।''-“কথাটা কার মতো জানি বললে।''

-“কার মতো?''

জয় চুপ থেকে বলল, বড়ঘরে ছিলে কতক্ষণ?

দরকার যতক্ষণ। আপনি শুয়ে থাকুন, বাইরে কাজ আছে।

জড়ানো কণ্ঠে জয় গান ধরল,

‘সোহাগের দিলাম বেড়া, ঘরের চারিপাশে
মায়ার লাগাইলাম আড়া নিন্দার বাতাসে গো,
নিন্দারও বাতাসে.....
সাধেরও পিরিতের ঘর, হয়না যেন নড়বড়,
তাই ধৈর্য্যের রাখলাম একটু ঢাল...

ও মন-ওরে..

সুখেতে রব চিরকাল, ও মনহ ওরে সুখেতে রব চিরকাল..'গতরাত একটার দিকে হামজা ও জয় বের হলো বাড়ি থেকে। রাস্তাঘাট নিস্তব্ধ প্রায়। লোকজন না থাকলে বের হওয়াটা ভালো। নয়ত ঘিরে ধরে সবাই। জয় চুপচাপ হাঁটছে, কথা বলছে না কোনো। হামজা পকেট থেকে ছোট্ট একটা হিপফ্ল্যাস্ক বের করে দুটো চুমুক দিলো। জয় বলল, "কী ব্যাপার, ভাউ? মাল খাচ্ছ কেন?"

-"রোজ রোজ তোর হাতে মানুষ তুলে দিতে পারিনা।"

-“আমি তোমার হাতে মানুষ তুলে দিতে পারি না। অভ্যাসের খেলাপ হবে। তুমি শুধু বাড়ির সামনে অবধি যাবে। ভেতরে যাব আমি।
”-“তুই বাইরে থাকবি।”

জয় ঘাড় নাড়ল, “উহু। খু-ন করার আগে যাদের মাল খেতে হয়, তাদের হাতে মানুষ তুলে দিতে পারিনা আমি। মানুষের রুহুর একটা ইজ্জত আছে, ও একটা মাতালের হাতে দেহ ছাড়বে কেন?”

জয়ের কথায় হামজা হেসে ফেলে কোমড়ে একটা লাথি মারল। তাতে পা ফসকায় জয়ের। হামজা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। তুলল না জয়কে। বলল, “ওঠ। উঠে দাঁড়া।”

এভাবেই গড়েছে হামজা জয়কে। পড়ে গেলে টেনে তোলেনি কখনও। ছেড়ে দিয়েছে। এরপর বলেছে, ‘নিজ শক্তিতে উঠে দাঁড়া তো, জয়। কাম-অন। গেট-আপ। বি স্ট্রং ইন ইওর অউন স্ট্রেন্থ! ইউ অনলি নিড ইওরসেল্ফ, ফাকিং নো ওয়ান ইলস! ইভেন ইনক্লুডেড মি।’

জয় রক্তাক্ত হাঁটু নিয়ে জেদে দাঁত চেপে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে বারবার পড়ে যেত, তবু শেষ অবধিও হামজা হাত বাড়ায়নি কখনও। জয় যখন নিজে উঠে দাঁড়িয়েছে, তখন জাপটে ধরেছে জয়কে, তার আগে নয়।

আজও তাই করল। অথচ আজ আর চেষ্টা একবারের বেশি নয়, এক ঝারাতে সোজা উঠে দাঁড়ায় জয় মেরুদণ্ড সোজা করে। পোলের লাইট কোথাও কোথাও নষ্ট। সেসব জায়গা অন্ধকার, ফাঁকা রাস্তা। কুকুরগুলো জোট পাকিয়েছে। জয়কে অন্ধকারে দেখেও চিনতে ভুল হয়না ওদের। পিছু নিলো। ঠিক যেন সৈন্যবাহিনী দুই ভাইয়ের পিছে পিছে নিরাপত্তা দিতে এগিয়ে চলেছে।

হামজা জিজ্ঞেস করল, "মাজহারের বডিটা কোথায় ফেলেছিস?"

-"পুরোনো গোরস্থানের ধারে পঁচা পুকুরের পানিতে।"

হামজা শান্ত চোখে চাইল, “অর্থাৎ আমার শ্বশুরবাড়ির লোক এখনও জানেই না যে, মাজহার উপরে পৌঁছে গেছে?”

হামজার মুঠোতে পেঁচানো গামছাটা নিয়ে জয় মুখে জড়াতে জড়াতে বলল, “আশা করা যায়, বডি পঁচে পানির সাথে মিশে যাবে, তবু খবর পাবেনা। বডিই পাবেনা, খবর কেমনে?”

-“তাছাড়া ওর বাপ জানে, তরুকে মেরে ও পলাশের সাথে আন্ডারগ্রাউন্ড হয়েছে। খোঁজও করছে না। কাউকে করতেও দিচ্ছে না।

”-“খোঁজ করতে বলার আগে সেও নিখোঁজ হয়ে যাবে, ভাউ। তোমার একটু দুঃখিত হওয়া উচিত। হাজার হোক, চাচা শ্বশুর।”

হামজা দুঃখিত গলায় বলল, “দুঃখিতই তো আমি, খুব দুঃখিত। নিজ হাতে খাতির করতে পারছি না। এর চেয়ে বড় বড় দুঃখ কী হতে পারে? হাজার হোক চাচাশ্বশুর। উনার ভাইয়ের মেয়ে আমার বউ। আমার হাতে উনার রক্ত লাগবে, এটা অধর্ম হয়ে যাবে। অধর্ম আমার স্বভাবে নেই।”

-“আমারও।” জয় কথাটা উচ্চারণ করতেই দুইভাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। উন্মাদের মতো হাস দুজন। গায়ে কাঁটা দেয়া সেই নির্জন রাস্তায় ওদের অপ্রকৃতস্থ হাসির ঝনঝনে আওয়াজ ভৌতিক লাগল শুনতে।

মাজহারদের বাড়ির প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে একদম রাস্তার সাথে। পাশেরটা হামজার শ্বশুরবাড়ি। ওরা দুইভাই বাড়ির পেছনে গেল। জয় লুঙ্গিতে কাছা মেরে প্রাচীর টপকালো। হামজা পেছনের আশপাশ দেখে বাড়ির সামনের রাস্তায় দাঁড়াল। মাজহারদের বাড়ির সামনে ছোট্ট একটা সিসিটিভি ক্যামেরা আছে। টের পেল না হামজা। দূরের পোল থেকে সামান্য আলো আসছে। সে ফাঁকা রাস্তায় পায়াচারী শুরু করল। চিন্তা হচ্ছে খুব জয়ের জন্য।

বাড়ির ভেতরে ঢোকার কোনো পথ খোলা নেই। জয় নিচে দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে প্রতিটা

জানালায় কয়েকটা করে ঢিল ছুঁড়ে মারল।ঝন্টু সাহেব মাল খেয়ে মাতাল। তবু বকবক করতে করতে বেরিয়ে এলেন। জয় তখন বাড়ির পেছনের দিকের জানালায় ঢিল মারল। ঝন্টু সাহেব সেদিক গেলে জয় সামনের খোলা পথ দিয়ে বসার ঘরে ঢুকে সোফাতে বসল আরাম করে। দোতলার সিড়ি প্যাঁচানো এ বাড়ির।

ঝন্টু সাহেব বকতে বকতে ফিরে এলেন কাউকে না পেয়ে। জয়কে দেখতেই পা ফসকে পড়ে যাবার মতো নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়লেন। জয় হাসল, "আরেহ কাকা! আস্তে-ধীরে আসেন। এই বয়সে দৌড়ঝাপ খারাপ।"

ঝন্টু ঢোক গিললেন, “জয়, তুমি এত রাত্তিরে? কী ব্যাপার, কী হইছে?”

-“রাতে ঘুম হয়না, কাকা। রোডে রোডে ঘুরি, আজ ঘুরতে ঘুরতে আপনার বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম আত্মীয় মানুষ আপনি, দেখা না করে গেলে রাগটাগ করবেন, মনে কষ্ট পাবেন। বসেন, দুটা দুক্কের কতা কই।”

জয় আলো জ্বালায়নি। আধো অন্ধকার বসার ঘরটা। চোখদুটো লাল উনার। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল মাথা টাল খাচ্ছে। তবু বসলেন। জয় সোফার ওপর থেকে ল্যাপটপ টেবিলে রেখে ঘুরিয়ে দিয়ে বলল, “আনলক করেন, কাকা।

মুভি-টুভি দেখি দুই চাচা-ভাতিজা বসে বসে। ভালো না আইডিয়াটা, কাকা?''ঝন্টু সাহেব বুঝতে পারছিলেন না কিছু, ভয়ে উনার দম পড়ছেনা ঠিকমতো। জয় একটা পেনডাইভ কানেক্ট করল ল্যাপটপে। এরপর একটা সুন্দর পজিশনে ল্যাপটপটা রেখে খুব আয়েশ করে বসল জয়। তার চোখে-মুখে যেন খুশি উপচে পড়ছে, ঠিক যেমন ছোট শিশুরা নতুন খেলনা পেলে উচ্ছ্বসিত হয়, তেমন!

ভিক্টিমের চোখে তীব্র ভয় না দেখলে জয় মারার জোশটা পায়না। ঝন্টু সাহেবের ঘেমে যাওয়া ছটফটে চেহারাটা দেখে যা শান্তি লাগছিল জয়ের, সেটুকু চোখ বুজে প্রসন্ন

হেসে শোষন করল নিজের মাঝে সে। স্ক্রিনে ভিডিও চালু হয়ে গেছে—মাটির ওপর একটা ইটের খণ্ড পড়ে ছিল। জয় সেটাকে তাকে রেখে মাজহারের মুখটা থুবরে ফেলল সেটার ওপর, যেমন বাস্কেটে বল ঢোকায় প্লেয়াররা। মুখ ফেটে রক্ত বেরিয়ে এলো মাজহারের। নির্জন একটা জঙলি জায়গা। দিনেও বোধহয় লোক যায়না। মাজহার রক্তাক্ত মুখ নিয়ে জয়ের দুটো পা আঁকড়ে ধরল, “মারিস না, আমায়। আমি কিছু করি নাই। পলাশ করছে যা করছে। আমি কিচ্ছু করি নাই।” দরদর করে রক্ত পড়ছে মুখ দিয়ে।

জয় আরাম করে বসল সামনে মাজহারের। মুচকি হেসে নরম করে বলল, “ধুর! করলেই বা কী? দোষের তো কিছু না। ওভাবে বলছিস কেন, পাগল? স্বাভাবিক হ।”

মাজহার বিস্ফোরিত চোখে চেয়ে রইল। জয় কাধ চাপড়ে জিজ্ঞেস করল,, “পলাশ কোথায় রে?”

-“আমি জানিনা, জয়। বিশ্বাস কর।

”-“করলাম। তবু আবার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করতেছে, করি? পলাশ কোথায় রে, মাজহার?”

শান্ত-শীতল মহান নমনীয়তা জয়ের মুখে। একটুও রাগ নেই ওখানে, আর না উগ্রতা,

মুচকি হাসছে ঠোঁটদুটো, চোখে কী যেন! মাজহারের মনে হচ্ছিল, জয়ের সামনে পছন্দের খাবার রাখা হয়েছে, সেটা খাওয়ার আগে মানুষ যেমন খুশি খুশি থাকে, জয়ের মুখভঙ্গিটা ওরকম। বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছিল, বলল, "তাহলে ছেড়ে দিবি আমায়?"

-"হ্যাঁ, ওর খোঁজ দেয়ামাত্র মুক্ত করে দেব।"

মাজহার পলাশের সম্ভাব্য ঠিকানাটা বলল কোনোমতো।

ভিডিওর এ পর্যায়ে জয় হাততালি দিয়ে উঠল, "চমৎকার ভিডিওগ্রাফি না কাকা? কবিরের করা। ছেলেটা এত ভালো ক্যামেরাম্যান? ওর এক বোতল ব্রান্ডি পাওনা রইল আমার কাছে।

আপনার ভালো লাগছে কাকা ভিডিওটা? হে হে! বাচ্চাদের মতো পা দুলিয়ে হাতে তালি দিলো জয়।''ঝন্টু সাহেব কখন জানি সোফা থেকে গড়িয়ে বসে জয়ের পা দুটো চেপে ধরবে। জয় তাড়া দিলো, "ধ্যাৎ, মনোযোগ দেন কাকা ভিডিওতে। আপনার জন্য আবার পেছাতে হবে ভিডিও।''

ঝন্টু সাহেব তাকাতে চাচ্ছিলেন না। ছেলেকে এক জ্যান্ত রক্তখেঁকো পিশাচের সামনে দেখতে বাবাদের ভালো লাগে না। জয় উঠে দাঁড়িয়ে জোর করে উনার কপালের দুপাশে ধরে ভিডিওর দিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখল। চোখ যাতে বুজতে না পারে, তাই দুই চোখের পাতা

টেনে আঙুল চেপে ধরে রাখল।কবির ক্যামেরা কোথাও রেখে মাজহারকে টান করে শুইয়ে পা দুটো চেপে ধরে আছে। জয় মাজহারের দু'হাতের ওপর দুই পা প্রসারিত করে চেপে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার একহাত ছেড়ে বসল। পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে সবটা মুখে গোজার সমি গালটা বোধহয় ফেঁড়ে গেল মাজহারের। এরপর খ্যাঁচ করে একটা শব্দ। বামহাতটা বাহু থেকে আলাদা হয়ে গেল। অথচ কোনো আওয়াজ হলো না। বামহাতটা কাটার পর কয়েকটা শিরা-উপশিরার সাথে ঝুলছিল, জয় পা দিয়ে চেপে ধরে হ্যাঁচকা একটা টান মারল। ছিঁড়ে এলো হাতটা।

বাঁধের ফুটো দিয়ে ছুটে আসা পানির মতো রক্তগুলো জয়ের সাদা লুঙ্গি ভেজাচ্ছিল। মাজহারের চোখে যেন রক্ত উঠে গেছে। মৃত্যুসম যন্ত্রণা, অথচ চিৎকার করার উপায় নেই। জয় সামান্য হাসল, “ক্ষমা করিস, মাজহার। তরুকে কথা দিয়েছি তো। নয়ত তোর সাথে আমার কোনও শত্রুতা নেই রে। তোকে কথা দিয়েছি মুক্ত করে দেব, কথা রাখছি। ”একটা কাঁচের শিশির মুখ খুলতে খুলতে আপনমনেই বিরবির করল, “জীবনে মেলা পাপ করছি, কিন্তু রেইপ করিনাই। করাটা বিষয়টা, কিন্তু আমার প্যানিক আছে, তাই এই পাপটা আমার হাত থেকে বেঁচে

গেছে। মামাকে মুরসালীন আর আমার ঘরের শালী মিলে মেরেছে, আমি কিছুই মনে করিনি। কিছু বলিওনি এর বদলে ওদের। বলব কেন? মামা তো আসলেই কাজটা ভালো করেছিল না! খারাপ কাজ একটা, তাইনা বল?''

মাজহারকে উলঙ্গ করে সবটুকু তরল ওর পুরুসাঙ্গের ওপর একটু একটু করে রয়েসয়ে ঢালল। আগুনের ছোঁয়ায় পলিথিন যেমন ঝলসে-গলে টপটপ করে পড়ে, ঠিক তেমন মাজহারের বিশেষ মাংসপিণ্ডটুকু গলে গলে পড়ে গেল। আন্দাজ করা যায় তরলটুকু গাঢ় কোনো এসিড অথবা সেরকমই কোনো

কেমিক্যালই হবে।এবং এরপর জয় খুব যত্নে দুই পা কাটল মাজহারের, খুব দক্ষ কসাইয়ের মতো। কবীরের বমি পেয়ে যাচ্ছিল। পেটে পাক গুলিয়ে আসছিল। কেমন মাথা ঝিমঝিমে অবস্থা।সে কখনও মর্গে মৃতদেহ কাটাও দেখেনি, আজ জীবিতদেহের ব্যবচ্ছেদ দেখতে হলো জয়ের বদৌলতে। মাজহারের দেহটা ততক্ষণে হয়ে এসেছে। রাত তিনটা পেরিয়ে গেছে।

মাথাটা কেটে নিয়ে দেহটা একটু দূরে পুকুরে ফেলে এসে করে বস্তায় ভরে নিলো জয়। আফশোসে মুখ ছোট হয়ে এসেছিল জয়ের। শুধু মনে হচ্ছিল, মাজহার বোধহয় সুখে মরে

গেছে। খুব তাড়াতাড়ি যেন। রাগ হচ্ছিল এখন জয়ের।

তবু আর কী করার? মানুষের জীবন একটাই? আর তো সম্ভব না মাজহারকে আবার তুলে মারা! যথাসম্ভব প্রমাণ লুকিয়ে মূল গোরস্থানের দিকে চলল।

ভিডিও শেষ।ঝন্টু সাহেবকে দাঁত চেপে সবটুকু দেখতে হয়েছে। চোখ দিয়ে পানি পড়ছে উনার। জয় পেনডাইভ খুলে পকেটে রেখে সুন্দর হাসল, "ভালো লেগেছে তো কাকা? স্পেশালি আপনার জন্য এত পরিশ্রম করে ভিডিওটা বানিয়েছি।"

ঝন্টুকে সাহেবকে মারতে খুব একটা খাটুনি করল না জয়। কেউ নেমে আসল না এতক্ষণেও। বাসায় লোক থাকেনা। মাজহারের মা শ্বাসকষ্টের রোগী। ইনহেলার টেনে ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়েন। আর কেউ নেই বাসায়।

জয় সোফার কুশন দিয়ে মুখটা চেপে ধরে ব্লেড দিয়ে আস্তে আস্তে গলাটা কাটলো। এভাবেই তরুর গলা কাটা হয়েছিল। জয়ের ধারণা কাজটা তরুর বেহুশির সময়ে করা। খুব নিখুঁত সরলরেখায় কাটা হয়েছিল। একটুও এদিক-ওদিক হয়েছিল না। জয় চেষ্টা করল পলাশকে ফলো করতে। কিন্তু হলো না,

ঝন্টু সাহেব খুব ছটফট করছিলেন। একেবেঁকে গেল। কোথাও কোথাও হাতের অনিয়ন্ত্রণে ব্লেড বেশি গেঁথে গিয়ে ভেতরের শ্বাসনালি অবধি কেটে ফেলল।

জয় বেরিয়ে এলো আস্তে করে। তখনও গলা কাটা মুরগীর মতো হাত পা আছড়াচ্ছেন ঝন্টু সাহেব। রুহু বের হতে একটু সময় লাগবে। দেহের র-ক্ত সবটুকু বের হওয়া অবধি ছটফট করবেন তিনি মৃ-ত্যুযন্ত্রণায়। জয়ের খুব ইচ্ছে করছিল দাঁড়িয়ে থেকে তৃপ্তিদায়ক দৃশ্যটা দেখার। কিন্তু ঝুঁকি নেয়া যাবেনা। বাড়ির পেছনের প্রাচীর টপকে বেরিয়ে এলো। লুঙ্গিতে চিরচিরে রক্তের ছিটা এসে লেগেছে।

লুঙ্গিতে ফের কাছা মেরে গলার গামছাটা দিয়ে লুঙ্গির মতো বাঁধল কোমড়ে। সাবধানতার মার নেই।পলাশ জেলাতেই আছে। ওকে কোনোভাবেই পুলিশের হাতে পড়তে দেয়া যাবেনা। পুলিশের কাছে অর্ডার আছে পলাশকে পাওয়ামাত্র ক্রসফায়ারে দেবার। তা হতে দেয়া যায়না। জ্বর একটু কমলেই পলাশকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচাতে বেরিয়ে যেতে হবে।

রাত দেড়টার দিকে অন্তূ ঘরে এলো। জয় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। ফিরে তাকাল না খাটের হেড-বোর্ডের ওপর রাখা মদের বোতলে নখ বাজাতে বাজাতে ষষ্ঠ

সিগারেটটায় টান দিলো। দরজা আটকানোর শব্দেও ফিরে তাকাল না।

অন্তূ আস্তে আস্তে হেঁটে গিয়ে বিছানায় বসল জয়ের পাশে। কিছুক্ষণ চুপচাপ উগ্র-উদাস পুরুষটিকে পরখ করে অদ্ভুত স্বরে বলল, "মায়ার মানুষ ফাঁকি দিয়ে খুব ভেতর পোড়ে, জয় আমির?"

জয় তাকাল, লাল হয়ে থাকা চোখের অদ্ভুত দৃষ্টি সে। চিৎ হয়ে পাশ ফিরল। অন্তূ বলল, "আমার বাপটাও তরুর মতো ফাঁকিবাজ ছিল, জানেন? সব আগুন নিজেরা শুষে আমাদের শীতলতা দিতেই জীবনে আসে এইসব ফাঁকিবাজেরা। আব্বু আমায় কতদিন অন্তূ

বলে ডাকেনা!''অন্তূ একদৃষ্টে জয়ের চোখে চোখ রেখে কথা বলছিল। জয় উঠে হেড-বোর্ডে বালিশ ঠেকিয়ে হেলান দিয়ে তাকিয়ে রইল। অন্তূ বলল, "অথচ তার অর্ধেক জীবন তার নিজের ছেলে নিয়েছে, বাকিটা আমি পূর্ণ করে দিয়েছি।''

জয় হাসল, "নোপ! দিস ইজ নট ফেয়ার, ঘরওয়ালি। তুমি আমার নাম নিতে ভুলে গেছ। ভাগে আমিও আছি।''

ম্লান হাসল অন্তূ, "ওহ, তাই নাকি?''

-"জি জি, ম্যাডাম!''-"আপনি কবে থেকে পাপ স্বীকার করতে শুরু করলেন?''

-"চিরকালই করি।" লম্বা টান দিলো। ধোঁয়ায় ভরে উঠল নাকমুখ।

-"সে তো ভাব হিসেবে। তাতে একফোঁটাও আফশোস থাকেনা, থাকে ভনিতা।"

জয় হাসল, "যথার্থই বলেছেন, উকিল ম্যাডাম।"

অন্তূর গলাটা অদ্ভুত দৃঢ় হলো, চোখে চোখ মিলিয়ে কেমন করে যেন বলল, "ফিরে আসুন।"

-"ঠাঁই নেই।"

-"ঠাঁই দরকার আপনার?"

-"হু, দরকার ছিল।"

-"ঠাঁই থাকলে খারাপ হতেন না?"

-“আমি বলেছি তোমায়, আমার খারাপ হবার কোনো কারণ নেই। আমি খারাপ, তাই আমি খারাপ।”

-“তাহলে ঠাঁইয়ের কথা বললেন কেন?”

জয় দুষ্টু-রসিক হাসল, তবু তা ম্লান, “আচ্ছা, ঠাঁই? তুমি হয়ে যাও?”

অন্তূ বিদ্রুপের হাসি হাসল, “আমি? আমি নিজেই তো এক নড়বড়ে এক খুঁটি। আপনাকে সামলাতে গিয়ে বড়জোর উপড়ে যাব, আর তারপর আপনাকে নিয়ে পড়ব।”

-“তুমি আমার ওপর, আর আমি তোমার ওপর ভর করলে তো দুজনই দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। কী বলো?” চোখ মারল জয়।অন্তূ

সামান্য চোখ বুজে দৃঢ়চিত্তে মাথা নাড়ে,
"পারিনা।"
জয় অন্তূর দিকে তাকিয়ে থেকেই বোতলটা তুলে নিলো। অন্তূ তা কেড়ে নিলো,
"খবরদার। আজ নয়।"
-"একটু গিলতে দাও।"
-"আজ অন্তত নয়। আমি কথা বলছি।"
-"সেজন্যই একটু দাও। অল্প খাব।"
-"সেজন্য?"
-"হু। তুমি আর আমার সাথে কথা বলো না সচরাচর। মানে আমার অভ্যাস নেই। আজ বলছো, অস্বাভাবিক লাগছে। একটু খেতে দাও আজ।"অন্তূ বোতলটা ঝেরে মেঝেতে ছুঁড়ে

মারল। কাঁচের বোতলটা আওয়াজ তুলে ঝনঝন করে ভেঙে খানখান হয়ে যায়। জয় চোখ বুজে তা অনুভব করে, তার মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে, "উফফ! শালা কাঁচ ভাঙার আওয়াজ এত সুন্দর হয় কেন? এত্ত ভাল্লাগে! ফাকিং লাভ দিস!"

অন্তূ তাচ্ছিল্য করে হাসে, "হৃদয় ভাঙার আওয়াজ এর চেয়েও ভালো লাগে আপনার। আর জানেন অধিকাংশ সময় হৃদয়কে কাঁচের সাথে তুলনা করা হয়।"

জয় কথা বলল না। মাঝেমধ্যেই কেমন ভদ্রলোকের মতো আচরণ করে। শুদ্ধ বাংলায় কথা বলা, মিষ্টি হাসা, নরম আচরণ!

অন্তূ যেন আনমনা স্বরে বলল, “আমি তো একসময় বেশ আদর্শবতী ছিলাম...”

জয় আড়চোখে চোখ তুলল, “হু, ছিলে।”

-“ছিলাম নাকি?”

-“ছিলে তো।”“ওহ, হ্যাঁ ছিলাম বোধহয়। সেসব সেই কবেকার কথা। ভুলেই গেছি!” অদ্ভুত হাসল অন্তূ, “মাঝেমধ্যে মনেহয় কী জানেন? যদি আমাদের বিয়েটা হুটহাট, তামাশাবিহীন হয়ে যেত, মানে অন্য কোনোভাবে হয়ে যেতও, আপনি যেমনই ছিলেন, ছিলেন। আমি হয়ত মাফ করে দিতাম। তারপর নিজের আদর্শ দিয়ে

আপনাকে হয়ত ভালো জয় আমির করে তুলতাম। খুব সিনেমাটিক চিন্তা তাই না?"

হেসে মাথা নাড়ল জয়, "খুব সিনেমাটিক।"

অন্তূ পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল। জয় বলল, "এরপর?
"

অন্তূ হেসে মাথায় নামায়, "অথচ আমি আপনাকে ক্ষমা তো দূর, শাস্তি না দিয়ে আমি মরেও শান্তি পাবো না। আসশোস! ইশ, যদি ওমন না হতো.."

জয় দুধারে মাথা নাড়ে, "পারতে না, ঘরওয়ালি?"

-"পারতাম না?"

"পারতে না।"

অন্তূ চুপচাপ তাকিয়ে রইল। জয় কিছু বলবে। এই লোক নিজের ব্যাপারে একটা কথা বলতে যা ফুটেজ খায়! অনেকটা সময় দিতে হয়, চুপচাপ তা শোনার জন্য অপেক্ষা করতে হয়, তবে সামান্য বলে। আর মাঝখানে একটা শব্দ উচ্চারণ করলে চোখের পলকে প্রসঙ্গ বদলানোয় যা চমকপ্রদ দক্ষতা!

জয় সিগারেট শেষ করল, একটু সোজা হয়ে বসল। এরপর বলল, "কুমোর কারা বলো তো?"

-"যারা মাটির জিনিসপত্র বানায়।

"-"ব্রিলিয়ান্ট। ওরা একদল ভালো কারিগর।

জানো ওরা মাটির জিনিসপত্র কীভাবে বানায়?
”

অন্তূ চুপ রইল। জয় বলল, “প্রথমে কাঁচা মাটি মাখানো হয়। কাঁচা, নরম মাটি কিন্তু। এরপর হাতের কারিগরিতে যেমন ইচ্ছা আকৃতি দেয়া হয়। হতে পারে সেটা ফুলদানী, থালা-বাটি অথবা রেনডম কিছু। এরপর শুকানো হয় সেগুলোকে। এখানেই শেষ হলে ঠিক ছিল।”

কেমন করে হাসল জয়, “মাগার এখানেই শেষ না। তারপর সেই শুকনো জিনিসগুলোকে আগুনে ফেলে দেয়া হয়। কাঁচা মাটির তৈরি ওই জিনিসগুলো আগুনে

পুড়তে পুড়তে পুড়তে পুড়তে একসময় লাল টকটকা, কঠিন মাটির পাত্র হিসেবে তৈরি হয়। তখন তুমি বড়জোর ওগুলোকে আছড়ে ভেঙে ফেলতে পারবে। ওতে আর হাজার পানি ঢাললেও তা আগের সেই কাঁচা নরম মাটিতে পরিণত হবে না, ঘরওয়ালি। যাকে তুমি আবার হাতে মাখিয়ে নতুন আকৃতি দিয়ে নতুন জিনিস বানাতে পারো।''অন্তূ ভ্রুটা সন্তর্পণে কুঁচকে ফেলল। জয় হাসল, "আমি যখন কাঁচামাটি ছিলাম, বালক জয় আমির, নরম, ভীতু এক ছোট্ট ছেলে। তখন আমাকে গড়া হয়েছে এই জয় আমিরের আকৃতিতে। এরপর আগুনে ফেলে দেয়া হয়েছে। আমি

বছরের পর বছর পুড়েছি। এরপর এই শক্ত, কঠিন লাল মাটির জয় আমির তৈরি হয়েছে। তাকে তুমি বড়জোর আঘাত করে ভেঙে টুকরো থেকে আরও ছোট টুকরোতে পরিণত করতে পারবে। কিন্তু হাজার তোমার আদর্শের পানি আমার ওপর পড়লেও আমি আর সেই আগের কাঁচা জয় আমিরে কনভার্ট হবোনা, যাকে তুমি ইচ্ছেমতো শেইপ দিয়ে সাজাতে পারো।''অন্তূ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। বুকের ওঠানামা দ্রুত হচ্ছিল। জয়ের ঠোঁটে সামান্য হাসি। সে সিগারেট ধরালো আরাম করে। খোলা প্যাকেটের শেষ সিগারেটটা ঠোঁটে গুঁজে লাইটার জ্বালিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল।

এরপর চট করে অন্তূর কোলের ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। গাটা তখনও গরম ভীষণ। পলাশের দলের সকলেই ছন্নছাড়া। যে যেমন পেরেছে আত্মগোপন করেছে, দেশে অথবা বাইরে। এমনটা একবার হয়েছিল যুগখানেক আগে।

২০০2-এ বিরোধী দলীয় নেত্রীর নেতৃত্বে গোটা দেশজুড়ে একটি সন্ত্রাস ও অপরাধীমুক্ত অপারেশন পরিচালিত হয়েছিল–যা'অপারেশন ক্লিনহার্ট' নামে পরিচিত। কয়েক মাসের এই দেশব্যাপী অভিযানে গোটা দেশের সন্ত্রাস ও অপরাধীরা সিংহভাগ আঁটকা পড়েছিল বিভিন্ন সংস্থার আইরক্ষাকারীদের থাবায়। তখন

দেশটা হয়ে গেল শান্ত। সকল সন্ত্রাসদের হয় দেশ ছাড়তে হলো, অথবা দল-ধ্বংস। তখনই একবার হামলা হয়েছিল রাজন আজগরের কারবারে। কিন্তু তখন তেমন একটা ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। পলাশ তখন বেশ ছোট।

কিন্তু এবার গোটা পরিস্থিতি অনুকূলে, আইনসংস্থা থেকে শুরু করে দালাল, নেতাগণ..তবু এক জয় আর নিজের ঘরে পালা এক মীরজাফর পলাশকে ধ্বংস করে ছেড়েছে।রিমি কাপড় আয়রন করছে ঘরে। রাত এগারোটা। হামজা সোফায় বসে ছিল। চোখদুটো বোজা। বহুকাল রাতে ঘুমানো হয়নি। এটা অবশ্য অল্প ভুল। রিমিকে জড়িয়ে

নিলে মেয়েটা যখন নিশ্চিন্তে ওর বুকে মাথা লুকাতো ছোট্ট কবুতর ছানার মতো, তখন দুনিয়াদারীর ঝঞ্ঝাট আপাত একরাত ভুলে সে ঘুমিয়েছে বারবার। তবে সেসব অনেকদিন আগের কথা। বহুদিন মেয়েটা তার কাছে তো আসে, কিন্তু সেই কাছে আসাতেই যেন যত দূরত্ব! তাতে সংশয়, ঘৃণা অথবা দ্বিধার সমন্বয় ছাড়া কিছু নেই। ভেতরটা প্রশ্ন করে ওঠে, "হামজা তুই কি ভুল করিসনি?"

-"করলেও ভুলটা কী?"

-"শত্রুকে ঘরে তোলা।"

-"ওইটুকু একটা পুঁচকে, নিঃসঙ্গ মেয়ে আমার শত্রু?"-"এটাও নতুন বোকামি তোর। যার

মনে তোদের জন্য সেই শুরু থেকে বে-হিসেবী ঘৃণা, সে কমজোর হোক, তবু মনে রাখতে হবে, সে তোর বিরুদ্ধে যেকোনো কিছু করতে পারে। আর অন্তত এ কারণে হলেও শত্রুকে ছোট করে দেখতে নেই। জেনেবুঝে কেন?''

-"আমার রেপুটেশন বজায় রেখে সবটা বদনাম আরমিণের ওপর বয়ে নিয়ে যেতে আমার ওকে জয়ের বউ হিসেবে মেনে নেয়ার বিকল্প ছিল না। আমি যখন জয়ের বউ হিসেবে ওকে মেনে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিনি, তখন মানুষ আমার ওপর সন্তুষ্টিতে গোটা পাপটাই আরমিণকে নিবেদন করেছে।

এটা ট্রিক্স অর পলিটিক্স, হোয়াটএভার! তাছাড়া ও এখন যা করছে, তার সবটাই আমার নাগালের ভেতর, এ বাড়ির বাইরে থাকলে আরও অনেক কিছুই করতে পারতো। চরম জেদি আর চতুর মেয়েলোক। ওর প্রতিটা বোকামির মতো দেখতে কর্মও ওর পরিকল্পিত।''

-“তাহলে ওকে সরিয়ে দে। ওর এত ক্ষতি করেও তো দমেনি, ওকে-ই সরাতে হবে। বঙ্গবন্ধু তার অসমাপ্ত আত্মজীবনী বইতে কী লিখেছিলেন জানিস?—মানুষের যখন পতন আসে, তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে।''

হামজা একটু সপ্রতিভ হলো, উত্তেজিত হলো, ক্ষেপে উঠল, আবার নিভে গেল। সে শান্ত মানুষ। আস্তে করে শুধু বলল, “জয় মানবে না।”-“তুই জয়ের পরোয়া করিস?”

হামজা নিজের দুহাতের তালু মেলে দেখে, এরপর মৃদু হাসে, “এ দুহাতে গড়েছি জয়কে। এই হাতে ওর ঘাম মুছে দেয়ার শক্তি থাকলেও ওকে মিটিয়ে দেবার শক্তি কি আছে?”

-“থাকতে হবে। দরকার পড়লে ওর শেষ নিশানটুকুও মিটিয়ে দেবার শক্তি চাই হাতে। পেতে হলে দিতে হয়। ক্ষমতায়নের পথে ও হোক তোর প্রথম বিসর্জন।”

হাঁপিয়ে ওঠে হামজা নিজের সাথেকার এই ভয়ানক আলোচনায়। জোরে জোরে শ্বাস ফেলে জয়কে ডাকে, -“জয়, ও জয়!”জয় বেরিয়ে এলো রুম থেকে। হামজা জয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে অস্থিরতা অনুভব করে। লোকে বলে জয়ের ওই শক্ত কাঠামোর মুখটা নিষ্ঠুর, হামজা তাতে শুধুই মায়া দেখেছে।

জয় খেঁকিয়ে উঠল, “কী সমস্যা? ঘরে বউ নাই, আমায় ডাকাডাকির কী আছে?”

গম্ভীর হয় হামজা, “বস।”

জয় বসল না, চিৎপটাং হয়ে শুয়ে পড়ল হামজার কোলে। হামজা কাধ এলিয়ে সোফায়

বসে, চোখ বুজে প্রশ্ন করে, “আমার যদি তোকে কোনোদিন বলি দিতে হয়?”
হো হো করে হেসে উঠল জয়, “কোন দেবীর নামে?”
-“কোন দেবীর নামে বলি হতে পছন্দ করবি তুই?”
জয় জবাব না দিয়ে উঠে নিচের দিকে ঝুঁকে বসে হামজার পাশে, “পেরেশান কোনোকিছু নিয়ে?”
হামজা তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ জয়ের দিকে, তারপর সামান্য হাসল। জয় গান ধরল, “জীবন মানেই তো যন্ত্রণা, বেঁচে থাকতে বোধহয় শেষ হবেনা।” সুর থামিয়ে বলল,

“অতএব বেঁচে থাকা ইজ ইক্যুয়েল টু বোকাচুদামি। যার নেশা আমার নাই। কবে দিচ্ছ বলি?”হামজা চুপচাপ বসে থাকে। তার আর জয়ের মাঝে কোনো দেয়াল নেই, যা সব সরাসরি। তাদের সম্পর্কের ঐতিহ্য একটাই— সেখানে কোনো লুকোচুরি নেই। সামনে কঠিন দিন। খুব কঠিন। হামজা জয়কে বলে, “তুই এখন বের হবি তো?”

জয় তখন একটা টেনিস বলে রেড-টেপ জড়াচ্ছে। হামজা উঠে গিয়ে জয়ের দুটো ওষুধ ও পানি আনল। গম্ভীর হয়ে বলল, “এদুটো খেয়ে নে। আমি রুমে যাব।”

-“যাও আমি খাচ্ছি।”

মাড়ি চাপে হামজা, "কানসারার পর মারব একটা, শুয়োর। আমার সামনে খাবি, শরীর এখনও একটু গরম। গলা বসে আছে। ধর, নে।"বাড়িটা গা ছমছমে। একসময় বেশ লোকজনে ভর্তি ছিল। আজ নেই। তারা কেউ চলে-টলে যায়নি, এক একে করে পরপারে পৌঁছে গেছে! কী ভয়ানক! তুলির জীবনের কী ব্যবস্থা হবে, কে জানে! হামজা এখন অন্য তালে বেসামাল।

জয় ঘরে যায়। অন্তূ ডান-কাত হয়ে শুয়ে আছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে থেকে ডাকে অন্তূকে। অন্তূ একডাকে উঠে বসে, জয় বলে, "চলো। ঘুরে আসি।"

-“কোথায়?”

-“শহর ঘুরে আসি। মধুচাঁদে তো গেলাম না, আজ চলো যাই।”

অন্তূ বোঝে, জয় অকারণে ঘুরতে যাচ্ছে না। বের হবার আগে জয় একটা চুড়ির বাক্স রাখল ড্রেসিং টেবিলের ওপর, “এ দুটো হাতে লাগাও।”

-“কেন?”জয় শুধু ঠান্ডা চোখে তাকাল একবার।কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। অন্তূ মুচকি হাসল গোপনে। ভয় ও গোলামি দুটোই আপেক্ষিক। ভয় পেলে মানুষ ভয় দেখাবে, গোলামি করলে কেউ কারও মালিক হতে পারবে। ভয় না পেলে লোকে ক্লান্ত হয়ে আর

চেষ্টা করবে না, গোলামি না খেটে যদি কেউ জান দেয়া কবুল করে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার জান নেয়া হয়না, গোলামি খাটানোরও প্রবনতা কমে আসে সেক্ষেত্রে। এই খেলায় অন্তূ জিতে গেছে এতদিনের প্রচেষ্টায়। জয় ও হামজা দুজনের বদ্ধ ধারণা জন্মেছে, অন্তূকে জোর করে থামানো অথবা রাজী করানো যায়না।

জয়ের এই বাপ্পারাজ টাইপ ভাব দেখে অন্তূর মুখ বিকৃত হয়ে এলো। চোখ উল্টে মাথা ঝাঁকাল। জয়ের ভালো ভাব দেখলে, অন্তূর শুধু একটাই কথা মাথায় আসে, 'পেছন মেরে বালুর সেঁক!'

চুড়িগুলো চোখ ধাঁধানো সুন্দর। চিকন স্বর্ণের দুটো চুড়ি। অন্তূর ফর্সা হাতে চোখ কাঁড়ছিল। জয় গম্ভীর মুখে দেখল তা।

বাথরুমের ফেইক-রুফ থেকে একটা সাদা ধবধবে কাপড়ে মোড়া কিছু একটা বের করল জয়। তাতে একটা হাতে ব্যবহারের মতো ছোট চকচকে কুড়াল।

অন্তূ জিজ্ঞেস করে, "এটা কী কাজে ব্যবহার করেন?"-"করিনি এর আগে।"

-"তাহলে রেখেছেন কেন?"

-"আমানত। আমানত না ঠিক, হাত বদল হয়ে আমার কাছে চলে এসেছিল মালটা।"

-"কার?"

-“কারও হবে।”

অন্তূর কৌতূহল হয়, “কে সে? দায়সারা জবাব দেবেন না আমার প্রশ্নের।”

জয় লুঙ্গি খুলে প্যান্ট পরতে পরতে জবাব দেয়, “এক নারী।” অস্পষ্ট শুনতে লাগে। কারণ শার্টের প্রান্ত তখন দাঁত দিয়ে চেপে ধরে ছিল।অন্তূ অবাক হয়। জয় কখনও কোনো মেয়েকে এমন সম্মান দিয়েছে, তা অন্তূর জানা নেই। সে জিজ্ঞেস করে, “নারীটা কে?” অন্তূ ভ্রু কুঁচকে মিষ্টি, “এই, আপনার আগেকার প্রেমিকা-টেমিকা হবে নাকি?”

জয় হাসল, “তার মধ্যে সেইসব সিস্টেমই নেই। তার সাথে যে-সময় দেখা হয়েছিল,

তখন আমার ভেতরেও প্রেম-পিরিতির সিস্টেম ছিল না।''

অন্তূ ভ্রু নাচিয়েঠোঁট উল্টায়, "তবু বিশেষ কেউ-ই হবে। নয়ত আপনার মতো লোক কাউকে এতখানি সম্মান তো দিতে পারেনা!''

-"তোমাকে দেইনি?''

অন্তূ শব্দ করে হেসে উঠল, তাতে অজস্র বিদ্রুপ ঝরে পড়ল, "তা দেননি আবার! দিয়েছেন তো।''জয়ের মুখটা চেক চেক প্রিন্টের লাল-সাদা গামছায় বাঁধা। জয় গাড়ি নিলো ক্লাবের ওখান থেকে। অন্তূ দেখল, সেই দুর্গের মতো ক্লাবঘর পুড়ে ধ্বংসপ্রায় হয়ে

গেছে। কবীর সাথে যেতে চায়, “ভাই, আমি যাই আপনার সাথে?”

-“তোর শ্বশুরের বিয়ে খাইতে যাচ্ছি, শালা? সাথে গিয়ে মুরগীর রানে কামড় বসাবা?”

-“ভাই, আমি ড্রাইভ করবো। আপনে আর ভাবী বসে থাকবেন। আপনার তো শরীল খারাপ....”

-“ন্যাকামি করিস না, বাপ। বাসায় যায়ে দুই প্যাগ মাল খেয়ে শুয়ে পড়, যা। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু!”

কবীর তবু পেছন ডাকে, “ভাই, আপনে ভাবীরে নিয়া একা একা যাবেন...”

-“পরেরবার তোর বউটারে দিস সাথে। আজ নিজেরটা নিয়ে ঘুরে আসি। গুড নাইট।”গাড়ি চলছে। যেন ঘোড়া ছুটেছে। অন্তূর পরাণ যায় যায়। মনে হচ্ছিল রকেট ছুটেছে। অন্তূর চুলগুলো পতাকার মতো উড়ছিল, অন্তূ চিৎকার করল, “এত জোরে কোনো মানুষ গাড়ি চালায়? আমি নিশ্চিত, এই গুণের জন্যও মাঝেমধ্যে আপনার শরীরের ফাল্লা উড়ে যায়। আস্তে চালান বলছি, অথবা এক্ষুনি এই মাঝ রাস্তায় নেমে যাব। পাগল লোক।”
জয় গা কাঁপিয়ে হো হো করে হেসে উঠল। গাড়ির বেগ আরও বাড়াল, অন্তূ বিতৃষ্ণায় আর কথা বলল না। জয় গাড়ির বেগের সাথে

মিলিয়ে গান ধরল, ‘ওই ঝলমলে রোদ আকাশে, তুমি-আমি উড়ি বাতাসে....’’

অন্তূ কপালে হাত চেপে বসে রইল। অন্ধকার আকাশ, যেখানে চাঁদ অবধি নেই। এইরকম এক মাঝরাতে এমন ঝলমলে সূর্যের গান কেউ ভাবতে পারে? তাও আবার কী এক উদ্ভট গান! গাড়ির স্টিয়ারিং ঘোরাচ্ছে আর শিষ দিচ্ছে। খানিক পর স্পীড কমল। অন্তূ একটা কথাও বলল না। ও কমাতে বলেছিল বলে আরও বাড়িয়েছিল স্পীড।

এবার স্পীড স্বাভাবিক রেখে গলা ছাড়ল জয়,এই ভাঙাচোরা বুক নিয়ে, অবাধ্য অসুখ নিয়ে

স্বপ্নে রাখা মুখ চলেছে খুঁজে.....
কুয়াশা-ধোঁয়াশা ভরা রাস্তাতে,
নেমেছে বাজপাখি খালিহাতে....
কানামাছি খেলে যায়, কার সাথে মুখ বুজে
দুই পৃথিবী.... কীসের চাহিদায় ঘরছাড়া...
দুই পৃথিবী-ইইই..কোন চাওয়া-পাওয়ায়
দিশেহারা...

গা শিউরে ওঠা জয়ের গলার সেই টান। শনশনে বাতাসের সাথে দিগ্বিদিক বাজিয়ে ছুটে চলল। গাড়ি চলছে। গরমের রাতে চলন্ত শীতল বাতাস বেশ লাগছিল গায়ে। অন্তূ চারপাশের ঘন অন্ধকারে হারিয়ে যেতে চায়। পাশে বসে আছে স্বয়ং এক প্রেহেলিকা-পাপ।

অনবরত শিষ দিচ্ছে আর গাড়ি চালাচ্ছে। কখনও কখনও স্টিয়ারিংয়ে আঙুল বাজিয়ে গুণগুণ করছে।একসময় একদম নির্জন গ্রামের দিকে চলে এলো। অন্ধকার রাস্তা, দূর-দূরান্ত অবধি আলো নেই। জয় গাড়ি থামাল, “নাঃ, বউ! আর পারছি না। স্যরি। রাত হলে আমার শরীরে সংগ্রামের আগুন জ্বলে। তাকে নেভাতে মাল ঢালতেই হবে পেটে।”

পেছনের সিট থেকে মদের বোতল তুলে শব্দ করে কর্ক খুলল। তারপর একহাতে যতটুকু চালানো যায়, ততটুকু গাড়ি চালিয়ে

আরেকহাতে বোতল মুখে ঠেকিয়ে গিলতে লাগল। উৎকট গন্ধ নাকে লাগছিল।

মদ খেয়ে গাড়ি চালাচ্ছে লোকটা, এই নির্জন রাত, তার ওপর গাড়ি চলছে ধীরে। যেকোনো বিপদ হতে পারে। অন্তূর ভয় লাগছিল খুব। নিজের বোকামির ওপর ধিক্কার আসছিল। সে কী ভেবে জয়ের সাথে আসতে রাজী হলো, সেটাই বুঝতে পারছিল না। এই লোক আসলেই অযথা ঘুরতে বেরিয়েছে, ফূর্তি করতে বেরিয়েছে।

অন্তূ খানিকক্ষণ চুপ থেকে আর পারল না, কড়া স্বরে বলল, "বোতলটা কেঁড়ে নিয়ে আপনার মাথায় ভাঙি, তার আগে গেলা বন্ধ

করুন। বেহেড হয়ে যাবেন যখন-তখন, সেই অবস্থায় একটা দুর্ঘটনা ঘটাতে চান?''-“আমার বেহেড হওয়া এত সস্তা না, ঘরওয়ালি।''
কেমন মাতাল মাতাল জড়ানো কণ্ঠে বলল, “আজ তোমাকে খুব আদর করতে মন চাচ্ছে, বুঝলে? ইভেন রাইট নাও। গাড়ির ভেতর বউয়ের আদর, আহঃ! ভাবা যায়?''
বলেই মদের বোতলটা সিটের ওপর রেখে অন্তূর দিকে হাত বাড়াল। বোতলের তরল গড়িয়ে পড়ে পুরো গাড়িতে বিশ্রী গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। অন্তূ ঝারা মেরে জয়ের হাত সরিয়ে দিয়ে চিবিয়ে বলে, “আপনি বেহেড হয়ে

যাচ্ছেন। আমি এই রাস্তায় অন্তত আপনার জুলুম মেনে নেব না।''

-“না নিলে। তাতে আমার কী?''আবার হাত বাড়াল। অন্তূর চোয়ালে আঙুল বোলালো। অন্তূ চুপ করে বসে থাকে। ওকে জ্বালানোই মূল উদ্দেশ্য জয়ের আপাতত। কাজ পাচ্ছে না কোনো।

রাত দুটো বাজল গন্তব্যে পৌঁছাতে। বিশাল গাঙ। চাঁদহীন আকাশের নিচে অত বড় গাঙ রহস্য ছড়াচ্ছিল। আশপাশ শ্মশান। তখনই জয় নামল, “পাশেই একটা শ্মশান আছে। যাবে?''

অন্তূ ভ্রু কুঁচকাল। একদম স্বাভাবিকভাবে নামল জয়। ওর মনের কথা বুঝল যেন, "কী ভাবছো? বললাম তো, আমি সহজে বেহেড হইনা। ওই শালা মালও জোচ্চর। ট্যাকা দিয়ে কিনে খাই, অথচ মাতাল করেনা আমায়। শ্মশানে যাবে তো চলো ঘুরে আসি।"

-"কেন যাব? আপনাকে দাফন করতে?"

জয় খুব কাছে এসে দাঁড়াল, ফিসফিস করে বলল, "শশ্মানে মরা পোড়ায়, দাফন করে কবরে। মদ খেলাম আমি, মাথা গুলিয়ে গেছে তোমার? সব ঠিকঠাক তো, ঘরওয়ালি?"বিশ্রী গন্ধ জয়ের শরীরে। শার্ট ভিজে গেছে মদে। অন্তূ ধাক্কা দিলো, "সরে দাঁড়ান। এই,

আপনার গাড়িতে ডিও নেই? থাকলে স্প্রে করে আসুন। আপনার মতো খাটাশের সাথে হাঁটতে পারব না। দুর্গন্ধ।''

এক চড়ে দাঁত ফেলে দেব, "শালি। তোমার বাপেরা আশেপাশেই লুকিয়ে আছে হয়ত। তুলে দিয়ে আসব?''

-"চলুন, তুলে দিয়ে আসুন। আপনিও যা ওরাও তাই। খালি পার্থক্য হলো, আপনার একটা তথাকথিত হালাল পরিচয় আছে, ওদের নেই।''জয় অন্তূর হাত মুচড়ে ধরে কাছে টেনে নিয়ে এলো। হাঁটতে খারাপ লাগছিল না। পরিবেশটা ভয়ানক সুন্দর। অন্ধকারে গাঙের পানি কালো দেখাচ্ছে,

গাছগুলো যেন কাঁচা রাস্তার দুধারে জীবিত সব, সারি ধরে দাঁড়িয়ে।

ওরা ক্ষেতের মাঝ দিয়ে হাঁটছিল। দুপাশে ধানের ক্ষেত। অনেকক্ষণ পর অল্প পকেট থেকে ছোট্ট একটা বডিস্প্রে বের করে শরীরে লাগালো জয়। তারপর আবার চলতি পথেই হিপফ্ল্যাস্কে চুমুক দিচ্ছিল।

অন্তূ একবারও জিজ্ঞেস করেনি, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে জয় ওকে। নিঃশব্দে হেসে জিজ্ঞেস করল, "ঘরওয়ালি, একবারও তো জানতে চাইলে না, কোথায় নিয়ে যাচ্ছি!"

অন্তূ হাসল, "এই জগতে আমার হারানোর মতো কিছু নেই, সুতরাং পিছুটান নেই। আছে

জানটা। অথচ পিছুটান না থাকলে জান হারানোর স্বাভাবিক ভয়টা থাকেনা মানুষের।”

জয়ের মনে হলো, সে আবারও নিজের গুণগুলো তার ঘরের বিরোধীর বৈশিষ্ট্যে খুঁজে পেল। বেসিক ফিচার সব জয়ের, আর মিলেও যায় সবগুলো।অন্তূ বলে চলে, “আর কী ক্ষতি করতে পারেন আপনি আমার?”

-“তোমার আমাকে ভয় লাগেনা?” গম্ভীর হলো জয়।

-“না। লাগেনা। আগে লাগতো, বিয়ের আগে। পরে আর লাগেনা।”

অন্তূ ভালোভাবে দেখল, সে কখনও কাঠের বাড়ি দেখেনি। দাঁড়িয়ে আছে, তেমন একটা

বাড়ির সামনে। একটা বাগান বাড়ি। অন্তূ মনে হলো, এটাই কি 'আমির নিবাস'? চারপাশে মাঠ। প্রাচীরের ভেতরের বাগানটা বড়। সেখানে শুধু গাছ আর গাছ। পেছনে অল্প কিছুটা মাঠ, তারপর বয়ে গেছে গাঙটা। অন্ধকারে অদ্ভুত লাগছিল গোটা পরিবেশটা। জয়কে জিজ্ঞেস করল, "এটা কি আপনাদের বাড়ি?"

-"না। আমার বাপ-দাদারে কি পাগলে থাপাইছিল যে এইরকম ঝোড়জাতার মধ্যে বাড়ি করতে আসছিল? এসো। প্রাচীর টপকাতে হবে।"-"আশ্চর্য! আমরা কি চুরি

করতে যাচ্ছি? যাব না আমি দরকা, পড়লে, তবউ প্রাচীর টপকাতে পারব না।''

-"থাপ্পর মারি একটা? সময় নষ্ট না করে যা বলতেছি সেইটা করো। আমি উঠায়ে দিচ্ছি।''

অন্তূ গাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, "আমি প্রাচীর টপকাতে পারব না। আমি এমন একটা প্রয়োজন দেখছি না যে এখানে ঢুকতেই হবে।
''

-"মাগী মানুষ এত ত্যাড়া! শালীর মেয়ে, সবসময় ধৈর্য্যের পরীক্ষা নিতে খাতা রেডিই রাখে।''

জয় এক লাফে প্রাচীর টপকে ফেলল। সেই শব্দেই পাহারাদার সতর্ক হলো। এরপর যেই

গেইট খুলতে গেল, ওমনি রাইফেল হাতে দাড়োয়ান উঠে দাঁড়াল, "এই শালা কেডা রে, থাম, শালা মাগীর চেংরা। বুক ঝাজরা কইরা দিমু একদম।"

হামজা লোক নিযুক্ত করেছে, তা জানতো জয়। তবে সেই লোক যে জয়কেও চেনেনা ঠিকমতো, এ তো মুশকিল! জয় বোঝানোর চেষ্টা করল, "বসির ভাই, আমি..."লোকটা বিনা নোটিশে চট করে গুলি চালালো। শর্টরেঞ্জের ডাবল-বুলেট রাইফেল, দূরত্ব বড়জোর এক গজও না, বুলেট একটু ছুঁয়ে গেলেও জয় আমিরের মৃত্যু নিশ্চিত। গুলি সে তাক করল জয় আমিরের বুকের বাঁ পাশটা।

লোকটা ভুল যেটা করল, গুলি ছোঁড়ার আগে রি-লোড করল একবার, এবং শব্দটা কানে যেতেই জয় নিচু হলো।
গুলিটা লাগেনি দেখে বসির আবার গুলি চালাতে প্রস্তুত, জয় বকে উঠল, “রাইফেলটা তোর শাউয়ার মধ্যে ভরে দিই, শালা খানকির বাচ্চা।”
কাউকে ভেতরে যেতে দেবার অনুমতি নেই। সে কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পআলন করে হামজার মনোযোগ আয় করতে চায়। দ্বিতীয় গুলিটা চালালো বসির। অন্ধকারে নিশানাচ্যুত হয়ে গেল। জয় প্লেস-ক্রস করে এগিয়ে এসে হাতটা চেপে ধরল বসিরের, “ভ্যাড়াচ্চুদা,

তোর মাইরে.....শালা গুলি চালাবা, দেখেশুনে চালাও সম্বন্ধির চেংরা। তোর আব্বা যে দাঁড়ায়ে আছি, হুশ করে ফায়ার করবি তো।

''রাইফেলটা কেঁড়ে নিয়ে লোকটাকে মাটিতে ফেলে মুখের ওপর পায়ের হাই-বুটটা চেপে ধরল। স্যাঁতস্যাঁতে মাটিতে বসিরের মুখটা গেঁড়ে যাচ্ছিল, গা ছমছমে ভোঁতা গোঙানির আওয়াজ করছে বসির, দম আঁটকে আসছে। জয় তবু পা তুলল না। অনেকক্ষণ মাটিতে মাথাটা চেপে ধরে রইল জুতো দিয়ে। আনুমানিক মরার অল্প আগে ছেড়ে দিলো। উবু হয়ে বসে বলল, "আমি, জয়। জয়

আমির। এরপর ফায়ার না শুনে তারপর করবি, শালা নোটকির পুত!”

লোকটা উঠে দাঁড়াতে পারল না, তবু এবার হাত উঁচিয়ে সালাম ঠুকতে চেষ্টা করল। জয় চাবিটা নিয়ে গেইটটা খুলে দিলো। অন্তূ দৌঁড়ে ভেতরে ঢোকে, “কী হয়েছে আবার ভেতরে? গুলি চলল যে। বেঁচে আছেন?”

জয় আলগোছে হাসে, “মরিনি এখনও।”অন্তূ বলল, “তাহলেই হলো। আমার আবার ফিরতে হবে এখান থেকে, একা তো যেতেও পারব না আপনি ছাড়া।”

জয় হো হো করে হেসে উঠল। অন্তূ হাত ধরে কাঁদা পার করিয়ে গেইট আঁটকে ভেতরে এগিয়ে গেল।

দরজায় কড়া নাড়ল। দরজা খুলল মিনিট দুয়েক পরে। অন্তূ অবাক হয়ে যায়। রূপকথা মিষ্টি হেসে অন্তূর হাত ধরে, "কেমন আছো, মিষ্টি মেয়ে।"

জয় বুট পরেই ভেতরে ঢুকছিল, রূপকথা চেঁচালো, "খবরদার কাঁদা পায়ে ঢুকবে না, জয়। জুতো খোলো।"

জয় সারেন্ডার করার মতো দু হাত উঁচু করে জুতো খুলল।বাড়ির ভেতরটা আলো-আঁধার। অন্তূ সেই আধারে দেখে কেউ সোফায় বসে

আছে। সেন্টার টেবিলের ওপর ল্যাপটপ। সে তাতেই কিছু কাজ করছে। এবং ল্যাপটপের আলোয় মুখটা অর্ধেক দেখা যাচ্ছিল। পরাগ আজগর না! হ্যাঁ তাই তো। সে আর রূপকথা এখানে কী করছে? জায়গাটাই বা কোথায়? বিছানায় শুয়ে অল্প একটু চোখ লেগে গেছিল হামজার। আচমকা জেগে উঠল। রিমি বিছানার এককোণে জানালার ধারে বসে আছে। হু হু করে এসির ঠান্ডা বাতাস আসছে, তবু জানালার কাঁচ খুলে রেখেছে। আন্দাজ করা যায়, রাত প্রায় শেষ। আজকাল রাতটা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়েছে। তবে কোনো ভাগেই ঘুমের সুযোগ নেই।

হামজা এদিক-ওদিক তাকাল। গলাটা ঘেমে ভিজে গেছে। ফতোয়াটা চিটচিট করছে। এসির হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে বাইরে। আনমনে বসে থাকা রিমিকে আঁধারে অদ্ভুত লাগছিল। হামজার কপালে চিরবির করে উঠল। ঘুমের প্রচণ্ড ঘাটতি পড়ে গেছে কিছুদিন। উঠে বসতেই প্রথমত জয়ের চিন্তা মাথায় এলো। পাগলটা কী করছে, কে জানে!

রিমি জানালা থেকে মুখ না ফিরিয়েই বলল, "উঠলেন কেন? কিছু চাই?"-"তুমি ঘুমাবে না?"

-"ঘুম আসছে না।"

-"এভাবে শরীর খারাপ করতে চাও?

রিমি কিছুটা সময় নিয়ে বলল, “গতকাল আব্বু কল করেছিল।”

-“তোমার চাচার লাশ তো এখনও মর্গে, বাড়িতে আনলে নিয়ে যাব, দেখে আসবে।”

-“যেতে চাইনি তো।”

-“তাতে কী? কাকা তো! দেখতে যাবেনা শেষবার?”

রিমি ম্লান হাসল, তা কেমন যেন দেখালো। উদাস স্বরে বলল, “আপনার মস্তিষ্ক এত ধারালো আর জটিল, হামজা!”

-“হঠাৎ একথা!”-“এখনকার কথাই চিন্তা করুন না! আমি শুধু বললাম, আব্বু কল করেছিল। ব্যাস, গোটা কাহিনিটা মুখস্ত পড়ার

মতো বুঝে তার উপস্থিত জবাব দিয়ে দিলেন। ঠিক যেন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স।”

হামজা হাসে, “বোকা বেগম! আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সটাও স্বয়ং মানুষের বুদ্ধিমত্তার সামান্য অংশ মাত্র।”

রিমি চমকালো। কিছুক্ষণ চুপ থেকে আনমনে বলল, “আপনাকে আমার আজকাল ভীষণ ভয় করে।”

-“বুঝি। তবে তার যুক্তি নেই।”

ফিরে তাকায় রিমি, “নেই?”

-“আমি তোমার জন্য ভয়ংকর না।....নারীদেরকে আমার ভয়ও নেই, ভরসাও নেই। আমি বিশ্বাস করি, নারী মমতময়ীর

জাত। ওদেরকে আদর ও মমতায় ভিজিয়ে থামাতে হয়, অথবা কৌশলে। যতক্ষণ না তারা নিজের গণ্ডি পেরিয়ে পুরুষের কাজে বাগড়া দিতে আসে। তবু যথাসম্ভব খোলাখুলি জখম করতে নেই।''-"করলে কী?''

-"ওরা কুচক্রী হয়ে ওঠে। আর একজন কুচক্রী নারী যদি কোনো ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে, সারা দুনিয়া একাকার হয়েও তার সমাধান দিতে পারে না।''

রিমির মনে হলো, তার নিখুঁত উদাহরণ যেন আরমিণ। এই লোক পারিপাশ্বিকতা সব বোঝে, তবু অনড়। অন্ধকারেই হামজার ভরাট, বলিষ্ঠ, বুদ্ধিদীপ্ত মুখটার দিকে চেয়ে

রইল। এরপর জিজ্ঞেস করল, “আমি বুঝিনা কেন আপনাকে একটুও? আপনি আসলে কোনদিকে এগোচ্ছেন?”

-“আমি দিক ঠিক করি চলতি পথে। যখন চলতে শুরু করেছিলাম তখন কোনো গন্তব্য বা পথ ঠিক করে রাখিনি। শুধু একটা পণ করেছিলাম, এ পথচলা মৃত্যুর রোধ ছাড়া থামাবো না। মাঝপথে যা পেয়েছি, সব কুড়িয়ে নিয়েছি। এখনও ঠিক সেইভাবেই চলছি। সামনে যা পাবো, তা হাতভরে কুড়িয়ে নেব। থামবো কোথায়, তা অজানা।”-“সামনে রাস্তা বন্ধও তো থাকতে পারে!”

তার বউ বুদ্ধিমতী হয়ে উঠছে। হামজা আওয়াজহীন হাসে, "কেউ একজন বলেছিলেন— যতদূর রাস্তা দেখা যায়, ততদূর অন্তত এগিয়ে যাও, পরের পথ সামনে পৌঁছাতে পৌঁছাতে পেয়ে যাবে। মানুষ অভিযোজনসম্পন্ন প্রাণী। পরিবেশ যা-ই হোক, তারা মানিয়ে নিয়ে বাঁচতে জানে।"

রিমোট তুলে এসিটা অফ করে দিলো। জানালা দিয়ে ঠান্ডা হাওয়া আসছে। শেষরাতে ঘর ঠান্ডা হয় এমনিই।

রিমি জানালার দিকে পিঠ করে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে। কেমন ভঙ্গুর স্বরে বলে, "হামজা, আপনি কি জানেন, আমি আপনার

এক অপূরণীয় রকমের ক্ষতি করেছি? এবং সেটা ছিল আপনার শাস্তি!''

হামজা ভ্রু জড়ায়, "শাস্তি?''-"বিশাল শাস্তি।''

হামজা দাড়িতে হাত বুলায়। রিমি অদ্ভুতভাবে হাসে, "আপনার দুটো নিষ্পাপ সন্তান খেয়েছি আমি। যদিও আমি জানিনা, পাপী বাপের সন্তানেরা নিষ্পাপ হয় কিনা!'' শেষের দিকে নারীকণ্ঠটা কেঁপে ওঠে রিমির।

হামজা নিথর হয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ। তাকে থমকাতে, চমকাতে দেয়া যায়না। আজ যেন বিমূঢ় হয়ে গেছে।

বেশ খানিক পর হামজা গা ঝারা মেরে রিমির কাছে এসে দুই বাহু চেপে ধরল, গলার স্বর

বর্বর হয়ে উঠল, “কী করেছ, তুমি?”রিমি ফুঁসে ওঠে, “আমি আপনাকে পুরুষত্বহীন করে দিয়েছি। একবার নয় দু’বার। শুনেছি, পুরুষ পরিপূর্ণ হয় তার শৌর্য-সন্তান দ্বারা! আমি আপনাকে তা থেকে বঞ্চিত করেছি। কারণ যে অন্যের সন্তানের প্রতি সামান্য মানুষিকতাবোধ রাখেনা, তার নিজের বাপ হবার অধিকার নেই। আমার তো এইটুকু ভরসাও নেই আজ আপনার ওপর, যে আপনি ক্ষমতার লড়াইয়ে আপনার নিজের সন্তানকেও কোথাও বাজি রেখে ঘরে ফেরেন....” কথা শেষ করতে পারেনা রিমি, হিঁচকি উঠে গেল গলার কাঁপুনিতে।হামজার নিঃশ্বাসের আওয়াজ

হিংস্র হয়ে উঠছিল। হতবাক হয়ে গেল সে। এ কাকে দেখছে সে? এটা তার রিমি নয়। কার আছড় লেগেছে তার নমনীয়, বোকা রিমির গায়ে! ক্ষিপ্র শ্বাসগুলো বিক্ষিপ্ত স্রোতের মতো আঁছড়ে পড়ছিল রিমির ওপর। বুকের ওঠানামা বেড়ে গিয়েছিল নিঠুর-মানবটার। রিমি ভেজা চোখেও তা দেখে এক প্রকার জিতে যাওয়ার সুখ ভেসে উঠেছিল। সে পেরেছে, সে একটু হলেও পেরেছে তার ঘরের দুর্যোধনের অশান্তির কারণ হতে। অথচ সে একসময় লোকটাকে পাগলের মতো ভালোবেসেছিল, আজকের কথা বলতে

পারেনা। আজ তার অনুভূতিরা হামজার ওপর আজব রঙে রঙচটা।

হামজা ঝাঁকি মারল রিমিকে ধরে, “দুটো সন্তান এসেছিল তোমার পেটে? আমার সন্তান....দুটো সন্তান!” হামজা দু হাতে মুখ ঢেকে অস্থির হয়ে বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে। রিমি চাপা ক্ষোপে ফুঁসে উঠল, “হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর তাদের আমি খুন করেছি।” এরপর ঝরঝর করে কেঁদে উঠল তার মাতৃচিত্ত, “এই দুই হাতে ধ্বংস করে দিয়েছি তাদের। তারা জানুক, আপনার মতো একটা নিষ্ঠুর বাপই নয় শুধু, একটা নিষ্ঠুর মা-ও আছে তাদের।”

হামজার সৌম্য-শ্যাম শরীরটা ভিজে উঠেছে। একটানে ফতোয়াটা খুলে ফেলল। সুস্থির পুরুষটির মাঝে অস্থিরতা বড্ড বেমানান। যে লোকটা নিকটাত্মীয়দের মৃত্যুতে অনড়, পাথুরে, সেই লোকটা যখন ছোট্ট রিমির এক বিমূর্ত নিষ্ঠুরতায় এমন পাগলপারা হয়ে ভঙ্গুর হলো, রিমির কাছে ভীষণ আজব লাগছিল। সে মুখে দু হাত চেপে হু হু করে কেঁদে উঠল। প্রতিটা ক্ষণে তার নারীহৃদয়ে ক্ষরণ চলে, প্রতি মুহুর্তে সে জলন্ত চিতায় দগ্ধ হয়! এত উৎপীড়ন, হুট করেই যেন নাজিল হয়েছে তার জীবনে, আর পথ দেখানোর জন্য আরমিণ। ভুল-সঠিক জানেনা, শুধু রিমি

জানে, আরমিণ বিশেষ-অ-বিশেষ এক চরিত্র, যাকে এড়ানো যায়না।আরমিণের প্রতি অদম্য ঝোঁক অনুভূত হচ্ছিল। ওই মেয়েটার প্রতিটা কথা অব্যর্থ তীর। আরমিণ বলেছিল, ‘রিমি! আপনি দেখবেন, এই সমাজের ক্ষমতাসীনেরা একই ঘটনার পেক্ষিতে নিজের ও সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে রাত ও দিনের মতো দুই রকম ধর্মের খেলা দেখাবে। রাজার ছেলে লাউ চুরি করলে হাত কাটার বিধান নেই, রিমি।’’

এই হামজা ও জয় প্রতিক্ষণে তা-ই তো দেখায়। রিমি অবাক হয়। সে রাজনৈতিক পরিবারে জন্মেও কখনও মানুষ ও সমাজের

গঠনগত দিক নিয়ে এমন ভাবনায় অবতীর্ণ হতে পারেনি, যেসব আরমিণ ভাবে ও করে। সতরাং ক্ষেত্র মানুষের জীবনধারা ঠিক করেনা, মানুষের নিজস্বতা বরং একেকটা ক্ষেত্রকে বেছে নেয়।জয় পরাগকে বলেছিল, “উনাকে নিয়ে বাইর হয়ে যান, আপনি।”

রূপকথা দৃঢ় স্বরে বলে উঠল, “আমি কোথাও যাব না, জয়। তুমি আমাকে ঠিক কতটা দূর্বল ভাবো?”

জয় জবাব দেবার প্রয়োজন মনে করল না। মহিলা মানুষকে লাই দেবারও নয় আবার তাদের সামনে বাহাদুরী দেখানোরও নয়। এমনিতেই ওরা পুরুষের অধীনস্থ, দূর্বল,

অবলা। তাদের ওপর বাহাদুরী দেখানো অথবা মূল্যায়ন করা, দুটোই ছোটলোকি ব্যাপার-স্যাপার জয়ের কাছে।অন্তূ অন্তত মুস্তাকিনের পরাগ হয়ে যাবার বিষয়টা নিয়ে প্রশ্ন করেনি, তাতে জয় অবাক হলো। রূপকথা জেদ ধরে বসে থাকে, "আমি কোথাও যাব না। কী করবে, তুমি?"

-"আসলে আপনি থাকলে আমি আমার কাজে সামান্য অপ্রস্তুতবোধ করতে পারি। মেয়েলোক, তার উপর.."

-"কী? বলো! মেয়েলোক...?" তাচ্ছিল্য হাসে রূপকথা, "নারী বিদ্বেষ বা অবমাননা যায়নি এখনও। অন্তূ, তুমি কী করলে এতগুলো

দিনে? ওর ভেতরে এখনও পৌরুষ অহংকার ভরপুর দেখছি।''

-"কথা না বাড়াই, কথা আপা। পরাগের সাথে চলে যান।''

-"যাব না আমি। বলেছি তো। আর কোথায় যেতে বলছো?''

জয়ের চোখেমুখে নিদারুণ গাম্ভীর্য। সোফাতে বসে টাখনুর কাছের প্যান্ট ঠিক করছে অকারণে।

ঢোকার পর মুচকি হেসে পরাগ একবার অন্তূকে জিজ্ঞেস করেছিল, "ভালো আছেন, ম্যাডাম?''

অন্তূ বিনিময়ে কেবল অতি-সামান্য হেসেছিল। সে বুঝছে, জয়ের মতো ধূর্ত শেয়াল অকারণে এমন একটা জায়গায় আসার লোক নয়।জয় খানিক বাদে আচমকাই হাসল, কেমন অপার্থিব ভয়ানক সেই হাসি রূপকথাকে বলল, "যান। দেখা করে আসুন একবার।"

কাঠের এই বিদেশী গড়নের বাড়িটা রাজন আজগর পলাশকে উপহার দিয়েছিলেন। বাগান বাড়ি অবসর কাটানোর জন্য ভালো। চমকপ্রদ সুন্দর বাড়ির ভেতর-বাহিরের পরিবেশ।

বেসমেন্টের দরজা ঠেলে রূপকথা ভেতরে ঢোকে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। কারও রুদ্ধশ্বাসের

ভোঁতা আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। আলো জ্বালায় রূপকথা।

মেঝেতে পড়ে আছে পলাশ। ডান পায়ে শিকল আঁটকানো। সেটা না থাকলেও ছোটার ক্ষমতা নেই। শরীরে ড্রাগের মাত্রা অত্যাধিক। দুটো দিন মেলাটোনিন পুশ করা হয়নি। অর্থাৎ পলাশ ঘুমায়ওনি দু'দিন। প্রায় মরণ সমান তা। তার একাধিক মানসিক রোগের মাঝে তীব্র ঘুমহীনতা একটা।ওকে দেখে মনে হচ্ছিল, মৃত্যুর পর একবার নরকবাস করে আবার পৃথিবীতে ফিরেছে।

ফর্সা দেহটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, যেন দেহের র/ক্ত সবটুকু বের করে নেয়া হয়েছে কোনো

চোষক দিয়ে। চোখের মণিতে রক্ত জমাট বেঁধেছে দানা হয়ে। শুধু হালকা আলোতে চোখের মণিটা জ্বলজ্বল করছিল। হাতের বিভিন্ন স্থানে ফুটো, এবরোথেবরো ইঞ্জেকশন পুশড হয়েছে। তবু যেন কৈ মাছের জান। এ অবধি যে সাঁজাটুকু পলাশ পেয়েছে, যে কারও সাধ্যি নেই তা সহ্য করে বেঁচে থাকার।দু'দিন আগে পলাশকে ধরে আনা হয়েছে এখানে। ক্রস ফায়ারের অর্ডার ছিল। পলাশসহ ওর দলের আঠারো জন অথবা বেশি এখনও দেশেই এবং তাদের মাঝে কমপক্ষে পনেরোজন সশস্ত্র দিনাজপুরে অবস্থান করছিল। সরাসরি র‍্যাপিড অ্যাকশন

ব্যাটেলিয়ন টিম রাজধানী থেকে নাজিল হয়েছিল পলাশের খাতির করতে।

বছরের পর বছর ধরে রাজন আজগর দেশের টেরোরিজমে বহুত অবদান রেখেছেন। তার রাখা অবদানে মানি-লন্ডারিং তার মাঝে অন্যতম।কঠিন এক অপরাধ। যদিও এটা গোটা বাংলার সর্বত্র ও সর্বোচ্চ প্রচলিত অপরাধ। তাই এটাকে অপরাধ না বলা ভালো। কারণ মানি-লন্ডারিং কার্যক্রমটা আম জনতার দ্বারা সাধারণত ঘটে না। এটা ঘটে দেশের উচ্চাসনে বসে থাকা তথাকথিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা অথবা তাদের সাপোর্টে থাকা ক্রিমিনালদের মদদে। যাদেরকে

রাজনীতিবিদ বলা হয়, জনসেবক ও উন্নয়নের কর্ণধারও বলা হয়। তারা কিছু করলে নিশ্চয়ই জনগণের ভালোর জন্যই করেন! দেশের অর্থ-সম্পদ চুষে নিয়ে গিয়ে বিদেশি ব্যাংকের লকার ভর্তি করাটা নিশ্চয়ই এক প্রকার দেশসেবাই! হোক সেটা নিজের দেশের পেছন মেরে অন্যদেশের অর্থব্যবস্থাকে সাপোর্ট করা।এই অর্থ চোরাচালানের কাজে রাজনীতিবিদ ও সন্ত্রাসগোষ্ঠী একে অপরের তালা-চাবি। একটা ছাড়া আরেকটা অচল। সন্ত্রাসরা সাধারণত পুঁজিবাদের নামে বিশাল ব্যবসার মতো দেখতে একটা ক্ষেত্রে তৈরি করে, তার মাধ্যমে দেশের বাইরে একদম

নিরাপদ উপায়ে অর্থ চালান করার সুগম সুযোগ করে দেন দেশের সম্মানিত উচ্চশ্রেণীর জনপ্রতিনিধিগণ। অথচ এই অর্থ আসছে কোত্থেকে এবং মূলখাত কোথায়, তা জানার উপায় থাকেনা হাত বদল হতে হতে। সর্বশেষে যে হাত থেকে অর্থ হস্তান্তর হয়, তা দেখে লাগে অর্থ পুরোটাই বৈধ, এক লিগ্যাল বিজনেস-ইন্টারেস্ট টাইপ কিছু। অপরাধ কোথায় এই অর্থে?

মূলত পলাশের মাধ্যমে চালান করা অর্থগুলোর অধিকাংশ ছিল দেশের জনপ্রতিনিধিদের দেশ শোষিত মাল। ভদ্র ভাষায়–রাজনৈতিক দুর্নীতির মুনাফা। সেটার

একটা দৃশ্যমান খাত ছিল রাজন আজগরের বিশাল কারবার— মাদক, পতিতাবৃত্তি, চাঁদাবাজি, সম্পত্তি নিলাম, পাচার, খু/ন, জুয়া ইত্যাদি।পলাশ দিনাজপুরে একজন টাটকা চাঁদাবাজ, সুদখোর। তাদের মূল কারবার রাজধানীতে। বিভিন্ন স্থানে আবাসিক হোটেল, ক্যাসিনো, জাল টাকা, নারীব্যবসা প্রভৃতির ধান্দা সব রাজধানীতে চলে।

প্রথমত ২০০২-এ দেশ থেকে প্রায় সন্ত্রাসবাদ নিপাত হয়েই গেছিল 'অপারেশন ক্লিনহার্টে'র বদৌলতে। এর কিছুকাল পর রাজধানীতে ঢাকার সর্দার ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক জুলফিকার

সর্দারের নাতির হাতে পলাশের বাবা খুন হলো। পলাশের কিছু করার থাকল না। মূলত তখনই পলাশ ভার্সিটির পড়া ছেড়ে পুরোদমে অন্ধকার রাজনীতি ও কাকার কারবারে মনোনিবেশ করে। কিন্তু সর্দারের নাতির কাছে ঘেঁষার মতো শক্তি হয়ে উঠল না তার। তারপর সবকিছু দমে গেছিল। এবং কী থেক কী হলো, সর্দারের নাতি— অ্যাসট্ররয়েডটা কোথাও গুম হয়ে গেল যেন। তার সন্ত্রাসীর ধারা ছিল কেমন যেন। নিজে এক মাফিয়া ও পুঁজিবাদী ব্যবসায়ী। অথচ তার হাতে অসংখ্যা পলাশেরা ঝলসে মাটি হয়ে গেছে। সেই এক মহাপ্রলয়ের নাম ছিল–রুদ্র ইয়াজিদ।এরপর

যখন ২০০৮-এর নবম সংসদ নির্বাচনে আওয়ামীলীগের মহাজোট দেশের ক্ষমতায় এলো, রাজন আজগর ও পলাশ নতুন উদ্যোগ ও উদ্যমে জেগে বসল। হামজা তখন উঠতি রাজনীতিবিদ। ভার্সিটি, যুবসমাজ ও ছাত্র সংগঠন তার অধীনস্থ প্রায়। তখন তার উঠাবসা শুরু হলত উচ্চশ্রেণীর রাজনীতিবিদদের সঙ্গে। পলাশ ও রাজন হামজাকে হাতে করল, হামজাও পলাশকে সঙ্গ দিলো নিজের স্বার্থে। জয় আমির তখন একুশ বছরের তরতরে যুবক, অনার্স প্রথম বর্ষের ছাত্র; তার কলেজ-জীবন শেষ হয়ে ত্রাসের পথের যাত্রা শুরু হয়েছে।এরপর

রাজন আজগর যেমন রাঝধানীতে নতুন নতুন রাজনীতিবিদদের সহচর্য পেতে শুরু করলেন, কারবারেও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার খুলে পড়ল।

পলাশকেও আর নিজের নামের ভীতি গড়তে বেগ পেতে হয়নি। গরীব কৃষক থেকে শুরু করে সর্বসাধারণ, মুদি ব্যবসায়ী থেকে বড় ব্যবসায়ী অথবা কেউ একটা একাধিকতলা বাড়ির পিলার গাড়লেও চাঁদার দায়ে জিম্মি হয়েছে, তার বদলে বউ থেকে শুরু করে ঘর-বাড়িসহ তাদের শেষ সম্বলটুকুও পলাশের হয়েছে।

বাংলাদেশে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন সংস্থা গঠিত হলো–২০১২-তে। সৈয়দ

মুস্তাকিন মহান তখন সেই সংস্থার নতুন পিবিআই অফিসার। তার পোস্টিং ছিল ঢাকাতে। ঢাকাতে রাজন আজগরের ব্যবসায় অপরাধের তদন্ত করতে গিয়ে খুঁড়তে খুঁড়তে সেই জাঁদরেল আইন-কর্মকর্তা এলো দিনাজপুর। পলাশের এখানকার কারবারে সেটাই আইনত প্রথম বাঁধা, এবং তা ছিল মুস্তাকিনের দ্বারা। কিন্তু মুস্তাকিন মহানের এই দুঃসাহসিক কর্ম-কেই তার কাল হতে হলো। কারণ এটাই বাংলার নীতি, মূলত রাজনীতি। মুস্তাকিন মহান কেঁচো ইতোমধ্যেই খুঁজে পেয়ে গেছিল, বহু প্রমাণ আর তথ্য একত্র করে ফেলেছিল। তাকে আর কিছুদিন খুঁড়তে দিলে

সরাসরি সাপের পুরো বংশধর টেনে বের করে আনতো। সেই সুযোগ তো দেয়া যায়না। এর মাঝে সে একবার গেল কারাগারে জামায়াত শিবিরের এক বন্দি কর্মীর সঙ্গে দেখা করতে। ব্যাস, জনসেবকদের কাজ সহজ হয়ে গেল।

পিবিআই অফিসার সৈয়দ মুস্তাকিন মহান একজন সরকারী কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও সে দেশোদ্রহী মনোভাব পোষন করে। এবং দেশবিরোধী ও জঙ্গিগোষ্ঠীর সাথে লেওয়াজ রয়েছে তার। সুতরাং তাকে বরখাস্ত করা হলো। বন্দিরা হলো যুদ্ধাপরাধী সব। তাদের সাথে দেখা করা অপরাধ, এবং সেই অপরাধে

বরখাস্ত কর্মকর্তা সৈয়দ মুস্তাকিন মহান কাজ থামিয়ে দিলে বোধহয় বেঁচে থাকতো কিনা বলা যায়না। কিন্তু তার কার্যক্রম চলছিলই। এতে করে গোপনে তাকে সরিয়ে দেবার অর্ডার এলো। যেটা কোনও পার্টির লোক অথবা পলাশ শখের সাথে করে দিতো। অথচ তাদের শিকারকে ছিনিয়ে নিলো একদিন জয় আমির। সালটা ২০১৩-এর মাঝামাঝি। জয় আমির মুস্তাকিন মহানকে খু/ন করে ফেলল। যখন মুমতাহিণার কেইসটাকে মিছেমিছি হ্যান্ডেল করছিল মুস্তাকিন নামধারী পরাগ আজগর, তখন তার কাছে একটা হুমকিসরূপ চিরকুট এসেছিল। ধারণা করা হয়, ওটা

পাঠিয়েছিল মুরসালীন মহান অথবা ওদেরই কেউ।দু'দিন আগে রাত দুটোর দিকে পলাশ ছিল তার দিনাজপুরের তিন নম্বর আবাসে। ওটা চেহেল গাজীর মাজারের অদূরে ঢাকা-দিনাজপুর মহাসড়কের পাশে। তিনতলা বাড়ি। ওর বাড়ির সীমানা থেকে চার ফুট দূরে পাশের দোতলা বিল্ডিংটা একটা এনজিওর অফিস। এই বাড়িতে কিছু অস্ত্র, চেইকবই, ক্যাশ টাকা নেবার উদ্দেশ্যে ওখানে যাওয়া তার। সেই রাতেই তার দক্ষিণ দিনাজপুর হয়ে হাকিমপুর দিয়ে হিলি বন্দরের ওপারে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত পেরিয়ে চলে যাবার কথা ছিল। হিলি বন্দরে পলাশের ভারতীয়

মাল আসে মাঝেমধ্যেই। বহু চেনাজানা লোক আছে।

কিন্তু ব্যাটেলিয়ন ফোর্স যে রেডি, এবং পলাশকে তাকে তাকে রেখেছে, তা পলাশ জানতো না তখনও। মাজহার মরার আগে জয়কে পলাশের সম্ভাব্য অবস্থান বলেছিল। কিন্তু হামজার কাছে খবর এলো, সে দেশ ছাড়ছে। বড় অঙ্কের একটা ক্যাশপাতি থাকে ওই বাড়িতে। দেশ ছাড়ার আগে ওই বাড়িতে যাওয়ার সম্ভাবনা নব্বই শতাংশ।

এটা কথায় কথায় পরাগ জেনে গেছিল। তথ্যটা সে-ই আইন-সংস্থার কাছে পৌঁছে দিয়ে সেরেছে লোক মারফতে। জয়ের মুখের

বাংলা গালিও শুনতে হয়েছে এর বদলে, "অকাম ঠাপানো সারা? একটা কাম করে রেখে দিলা? তোমার তর সয়না? এতকাল বাল চেটে খাইছো, এখন আর সইতেছিল না? তোমার শ্বশুরআব্বাদের যদি বলতেই হয়, তো কি আমি বলতে পারতাম না? এবার যদি কোনোভাবে পলাশ হাতছাড়া হয়ে যায়, পুলিশ যদি ওকে ধরে ফেলে, ওর বদলে তোমার কোরবানী হবে, বিনা চাঁদে। সম্বন্ধির চেংরা আমার।''পরাগ খিঁচে উঠল, "কথাবার্তা সাবধানে বলবে। পলাশকে তোমার অথবা পুলিশের হাতে দেওয়ার সাথে আমার সাধ নেই, আমি শুধু চাই, ও শেষ হয়ে যাক। তুমি

তোমার মতো ভাবছো, আমি আমার মতো ভেবেছি। একটু খেটে ধরো। ও এখনও ওই বাড়িতেই আছে। পারলে পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়ে নাও। মনে রেখো, ও কিন্তু একা না। ওর কাকার রেখে যাওয়া চেলা এসে দিনাজপুর জুটেছে ওকে সঙ্গ দিতে। বেস্ট অফ লাক।''পলাশ তখন মাতাল। সবকিছু গুছিয়ে রেখে সোফায় বসল। শরীরটা আওলে গেছে। কয়দিনের হয়রানীতে যাচ্ছেতাই হাল। পরাগকে না মেরে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না পলাশের। তার কানে সবই এসেছে, পরাগ কী কী করেছে। খাওয়া-পরা দিয়ে পালন করে তার সহায়তায় ধ্বংসের মুখ দেখা,

আবার তাকে জীবিত রেখে ফেরারি হওয়া পলাশের সঁইছিল না। তবু এই অবস্থায় দেশের মাটি তার কাল। তাই কিছুদিন দেশের বাইরে আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে পরে আবার ফেরাটাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। সব পরিকল্পনা পাক্কা তার। কিন্তু রূপকথা! সে বাগানবাড়িতে তখনও। দশ-বারোবার কল করেছে, রূপকথা রিসিভ করেনি। পলাশের মাথায় আগুন জ্বলছিল। ইচ্ছে করছিল, পরাগকে পরে মারলেও উচিত আগে বউটাকে অন্তত মেরে রেখে যাওয়া। ঘরের বউয়ের বিপদের সময়ে এমন জোচ্চুরি সওয়া যায় না।

তখন রাত বারোটা পার। ভাবাও যায়না, আইনের বিচ্ছুগুলো এই অসময়ে হানা দিতে পারে। ওর যাত্রা শেষরাতের দিকে। আজ বন্দর, আগামী রাতে বর্ডারের ওপার।কিন্তু তার আগেই বাড়ি ঘিরে পুলিশের সাইরেন বেজে উঠল। পলাশের বিশ্বাস হচ্ছিল না। সে ভাবল, বেশি মাল খাওয়ার কারণে এমনটা হচ্ছে।

ততক্ষণে লোহার গেইটে তাণ্ডব শুরু হয়েছে। প্রাচীরের ওপরে কাঁচের টুকরো থাকায় প্রাচীর টপকানো যাচ্ছিল না। দাড়োয়ান ছুটে এলো, "পলাশ ভাই, পুলিশ আইছে, ভাই।। সামনে-পিছনে চারদিক খালি পুলিশ।"

বাড়ির পেছনে ছোট্ট ডোবা। তার ওপারে একটা আমবাগান। সেই আমবাগানে পলাশ জুয়ার আসর বসাতো মাঝেমধ্যেই। ওখানেই রুদ্র ইয়াজিদ পলাশের বাপকে মেরে দাফন করে রেখে গিয়েছিল। হাতটা কবরের ওপর ফুলের তোড়ার মতো বিছিয়ে রেখে গিয়েছিল। সেটা দেখে টের পেয়েছিল, কবরে ওর বাপের দেহ শোয়ানো।

পলাশের বাড়ির মূল-ফটক ভেঙে কালো পোশাকের ফোর্স ঢুকলো ভেতরে। রাইফেল, পিস্তল রেডি। পলাশ অনেকটা বেহেড তখন। টলমলে পায়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে দরজাটা বাইরে থেকে আঁটকে দিলো।

প্রাচীরের সাথে বাড়ির ব্যাকসাইডে আসার যে রাস্তাটা সেটাও আঁটকানো। পিছনের দরজাটা না ভাঙা অবধি অন্তত সময় পাবে পলাশ। ছোট্ট পুলটা পেরিয়ে যাবার সময় ওপরতলা থেকে আলো পড়ল ওর ওপর। দ্রুত লুকিয়ে পড়ল ঝোপের আড়ালে। পেছনের দরজা অবধি আসতে একটু ঘুরতে হবে ওদের। বাড়ির নকশা জটিল।

কিন্তু ততক্ষণে বাহিনীর কয়েকজন সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে গেছে। সেখান থেকে গোটা বাড়ির বাইরে আশপাশ ও প্রাচীরের ভেতরটা চোখের আয়ত্তে। পলাশ আঁটকা পড়ে গেল প্রায়।

কম-বেশি দশ-পনেরোজন বাড়ির ভেতরেই

ঢুকে পড়েছে, বাইরে আরও আছে। পলাশ ঝোপ থেকে বেরোতেই তাকে উদ্দেশ্য করে ফায়ার করা হবে, এতে সন্দেহ নেই। ক্রস-ফায়ার জায়েজ হয়ে আছে ওর জন্য। ওর দলের গুলি করা লাগবেনা, শুধু পুলিশের একপাক্ষিক গুলি করে পলাশকে ঝাঝরা করেও ক্রস ফায়ারের নামে চালিয়ে দেবে। অথচ পলাশের বাহিনী কাছেকোলে ঘেঁষার সুযোগ পাচ্ছেনা আপাতত। পলাশের নিষেধ আছে।পরিকল্পনা নম্বর-দুই ওটা। পলাশ জানতো না ঠিক কবে বা কখন, তবে এটা ঠিকই জানতো, দেশ ছাড়ার আগে একবার জীবন-মরণ ঝুঁকি পাড়ি দিতে হবে; যেহেতু

তার প্রতিদ্বন্দিতা জয়-হামজার সাথে। সুতরাং পরিকল্পনা নং-২-তে আছে—যদি কোনোভাবে পলাশ গ্রেফতার হয়েও যায়; কারণ চট করে রাজন আজগরের ভাতিজা পলাশকে ক্রসে দেবে না আইনরক্ষাবাহিনী। তারা এতটা ন্যায়পরায়ন হলে তো পলাশরা জন্মাতেই পারতো না। তাই পলাশ যদি পাকে পড়ে যায়, সে কোনোভাবেই বাঁচতে চাইবেনা, বরং গ্রেফতার হতে চাইবে। জয়-হামজা যতদিন বাইরে আছে, তার জন্য কারাগারের চেয়ে নিরাপদ জায়গা নেই।আর বাংলাদেশের কারাগার হলো সবচেয়ে বড় কারবারের জায়গা। বিচারের পর পলাশের যদি ফাঁসির

আদেশও আসে, তবু সে কারাগারে নিরাপদে সময় পাবে। সুতরাং তখন বাইরে থাকা দলের লোক সরকার প্রধান অথবা বাহিনীর মূল হোতাদের মাঝে কারও সঙ্গে র‍্যাকেটিয়ারিং টাইপ কিছু মিছেমিছি তামাশা খাঁড়া করে, বিনিময়ে গোপনে পলাশের মুক্তি দাবী করবে। এতে পলাশ বরং আরও সরকারী কর্মকর্তাদের হেফাজতে কারামুক্তি ও আত্মগোপনের সুযোগ পাবে।

এই পরিকল্পনাকে মাথায় রেখে পলাশ বসে রইল ঝোপের মাঝে। দোতলার জানালা দিয়ে দুজন কর্মকর্তা মেশিগান তাক করে আছে। তবে গুলি চালাচ্ছেনা। চালায় অঁআ

সাধারণত। এরকম একটা সাংঘাতিক অপরাধী মবস্টার যদি হাতের মুঠোয় থাকে, তাকে গুলি করার মানেই হয়না।জিজ্ঞাসাবাদ ও বিচার এবং আইনত শাস্তি এদের জন্য অবধারিত।প্রায় মিনিট পাঁচেক পরে পলাশ যখন দু'হাত উঁচু করে আত্মসমর্পণ করে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে বাগানের খোলা পুলের পাশে দাঁড়াল, তখনই একদম গটগটিয়ে নেমে এলো অনেকজোড়া পা। দ্রুত দৌঁড়ে এলো পলাশকে ধরতে। পলাশ হাসছে। নির্লজ্জের মতো সেই তার চিরায়ত প্যাচপ্যাচে হাসিতে জ্বলজ্বলে চোখদুটো আরও ভয়ানকভাবে জ্বলছে। ওকে এসে চারজন

ঘিরে ধরলে পলাশ কেবল দু'হাত বাড়িয়ে দেয় হাতকড়া পরতে। তখনই বিকট আওয়াজে কানে তালা লেগে গেল। পলাশকে ঘিরে ধরা দুজন পুলিশ ধপ করে পড়ে গেল নিচে। সময় থেমে গেছে যেন। ভোঁতা হয়ে গেছে কান সকলের। তীক্ষ্ণ স্নাইপারের ফায়ারিং-সাউন্ডে। সাধারণত স্নাইপার ব্যবহার করা হয় চোরা খুনে। এমন পরিস্থিতিতে ক্রস ফায়ারিং প্রচলিত বেশি। তিনতলার ছাদের ওপর যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের মাঝে একজন শেষ। বাকি দুজন তার দিকে ছুটে যায়। গোটা বাহিনী লণ্ড-ভণ্ড হয়ে

গেল তিন অফিসারের এমন আকস্মিক মৃত্যুতে।

তাদের বসের নজরে ঠিকই পড়ল ফায়ারিং পাশের সেই এনজিওর বিল্ডিং থেকে হয়েছে। কিন্তু কোন জানালা বা ছাদ, কিছুই বোঝা গেল না। বাকি দু-তিনজন তখন পলাশকে সামলাতে এগিয়ে আসে, তখনই একাধারে পাঁ-ছয়টা আগুন লাগা ককটেলের বোতল এক যোগে ছুটে এলো প্রাচীরের ওপাশ থেকে। এমন আকস্মিক আততায়ী হামলায় গোলমাল বেঁধে গেল একটা। এরকম সশস্ত্র গোলাগুলি, সেটাও অদেখা কোনো আততায়ী দল অথবা কেউ।

পলাশের হাসি অল্প দ্বিধান্বিত হয়ে উঠল। তার দল এমন করবে না বোধহয়। তাহলে?

পলাশের হাসি পাচ্ছে। দুঃখে না আনন্দে বুঝতে পারছিল না। পায়ের কাছে দুজন অফিসাদের মরদেহ পড়ে আছে।তার একটুও ইচ্ছে নেই জয়-হামজার হাতে ধরা পড়ার। এত নিখুঁতভাবে স্নাইপার চালানোর দক্ষতা হামজার আছে। অর্থাৎ দুজন তাকে পুলিশের হাতে পড়তে না দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

হাতের হ্যান্ডকাফের দিকে তাকালো। এত বছরের পাপের জীবনে প্রথমবার এটা হাতে পড়েছে। বাইরে বোধহয় আততায়ীদের সাথে টুকটাক লুকোচুরিও চলছে পুলিশদের।

পাশের বিল্ডিংয়ে জানালা বা ছাদে কাউকে দেখা যাচ্ছেনা। অর্থাৎ হামজা নিচে নেমে গেছে। তাহলে জয় কোথায়? গণ্ডগোল বাঁধানো শেষ। ফোর্স লণ্ড-ভণ্ড হয়ে গেছে। পলাশ ভুলেও পালানোর চেষ্টা করল না। সে পুলিশের হাতছাড়া হতে চায়না।আগুন জ্বলছে চারদিকে। পেছনের ডোবার কাছের প্রাচীরের ওপার থেকে আরও কয়েকটা ককটেল এসে পড়ল বাগানে। জয়ের ছেলেরা আর পলাশের দলের চ্যালারা সব একাকার হয়ে গেছে। উদ্দ্যেশ্য আলাদা হলেও আপাতত কাজ একই দুই দলের। পলাশকে পুলিশের হাতে না পড়তে না দেয়া। ককটেল একটা পলাশকে

ঘেঁষে গেল, দ্রুত মাথা নামিয়ে বকে ওঠে পলাশ। রূপকথার জন্য বেশ টেনশন হচ্ছিল। ওকেও কি ধরা হবে? ও তো কোনো দোষ করেনি! তার নিজের বউকে আঘাত করার অধিকার শুধু তার আছে।

পাশের বিল্ডিংয়ে বাহিনীর তিনজন ঢুকে পড়ল, হামজা তখনও বিল্ডিংয়ের ভেতরেই। দোতলায় নেমে এসেছে ছাদ থেকে। দোতলায় প্রধান কার্যালয় এনজিওটির। একাধিক কেবিন আর ডেস্ক সাজানো এককে ইউনিটে। বাথরুমের দেয়ালের আড়ালে দাঁড়াল হামজা। বাহিনীর লোক প্রথমত ছাদে উঠবে। কারণ ওরা নিশ্চিত বুঝেছে ফায়ারিং ছাদের ওপর

থেকে হয়েছে।হাতের এম-টুয়েন্টি ফোর স্নাইপার রাইফেলটির ওজন কম-বেশি পনেরো-ষোলো পাউন্ড। সেটাকে ঠ্যাং-য়ে ঠেকিয়ে রুমাল দিয়ে মুখ-মাথা বেঁধে ফেলল। চোখদুটোও ঠিকমতো দেখা যাচ্ছিল না। এরপর গিয়ে দোতলার প্রবেশ দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল। ঘুটঘুটে অন্ধকার গোটা বিল্ডিং। ওদের হাতে টর্চ আছে অবশ্য। তবে সেটার আলো সরু সামনের দিকে। বাকিটা অন্ধকার। ওরা যখন দরজা পেরিয়ে সোজা হুরহুর করে দোতলার ইউনিটের ভেতরে ঢুকে পড়ল, হামজা পায়ের স্যান্ডেল খুলে হাতে ধরে আস্তে করে বেরিয়ে এলো

অন্ধকারে। নিঃশব্দে সিড়ি দিয়ে নেমে বাড়ির পেছনের ডোবার ধার এগিয়ি গিয়ে আমবাগানের ধারে ঝোপের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।জয় কারও অস্তিত্ব টের পেতেই পেছন না ঘুরেই পিস্তলের মুজেলটা হাত বাঁকিয়ে তার পেটে তাক করে। হামজা শান্ত স্বরে বলল, "এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকিস না। এই ঝোপটাকেও সার্চ করা হতে পারে। এগিয়ে যা।"

জয় খ্যাকখ্যাক করে উঠল, "ভাই, তুমি এইখানে কার বাল লাড়তে আইছো? ফোর্স ছড়ায়ে পড়ছে চারদিকে। কবীর দাঁড়ায়ে আছে মোড়ের ওপারে, বাড়ি যাও। আরমিণ, ভাবী,

তুলি বাড়িতে একা। কেউ নাই কিন্তু বাসায় ওরা ছাড়া।''

হামজা জয়কে ছোট্ট একটা পকেট চাকু ধরিয়ে দিয়ে বলল, “এটা রাখ।'' মুখের রুমালটা খুলে জয়ের হাতে পেচাতে পেচাতে বলল, “সাবধানে ব্যবহার করবি ওটা। হাতে লাগলে সর্বনাশ।''

জয় ঠেলে বের করে দেয় হামজাকে, “যাও তুমি। আমার কিছু হবেনা।''তখনও চারদিকে তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। আরও ব্যাক-আপ টিম এসে ভরে গেছে চারদিকে। সব ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। তিনজন অফিসার অজানা আততায়ীদের গুলিতে নিহত। তাতে ক্ষেপা

মৌমাছির মতো ছিটকে পড়েছে গোটা এলাকায় সবগুলো। বাহিনীর লোক ভাবেনি পলাশকে ধরতে এমন কাণ্ড হবে। হবার কথা তো নয় আসলেই, কিন্তু...।

হামজা স্পটটা পেরিয়ে বাকিটা পথ আরাম করে আম পাবলিকের মতো হেঁটে এসে মোড়ের এপারে কবীরকে বলল, “সিচুয়েশন হ্যান্ড-আউট হয়ে গেছে। জীপ নিয়ে তুই জয়ের কাছে যা। উল্টো পথ ধরে যাবি, তারপর পলাশের বাড়ির পেছনের আমবাগানের ভেতর থেকে ঢুকবি। জয় ওদিক দিয়ে বের হবে। অন্য উপায় নেই আর।”

-"আচ্ছা, ভাই।" কবীর কোনোমতো মাথা নেড়ে গাইগুই করা শুরু করল, "জয় ভাই বলছে আপনারে বাড়ি পৌঁছায়া দিতে।"হামজা নীরব চোখে তাকাল, "আর আমি কী বলছি?" কবীর আর একটা কথাও বলল না। চুপচাপ সোজা জীপে উঠে বসল। যাবার আগে শুধু আস্তে করে একবার বলল, "ভাই, আপনি কি আলাদা গাড়ি করে বাড়ি যাবেন?"

-"বাড়ি যাব না আপাতত। বাড়িতে কয়েকজনকে রেখে এসেছি। তুই দ্রুত যা।" কবীর চুপচাপ চলে যায়। হামজা জয়কে এমন অবস্থায় ফেলে বাসায় যাবে, এই ভাবনা ভাবার মতো কঠিন বোকামি করেছে সে,

বুঝল।পলাশ তখনও পুলের ধারে দাঁড়ানো। ওর হাতে হ্যান্ডকাফ পরানোর পর পুলিশদের ওর দিকে আর খেয়ালই নেই। পুরো মনোযোগটা তিন মরদেহ ও অজানা হামলাকারীদের ওপর পড়েছে। পলাশের কাছে তখন মাত্র দুজন রক্ষী। তবু বেশ দায়সারাভাবে দাঁড়িয়ে। কারণ পলাশের কোনো হেলদোল নেই, সে যেন হাতকড়া পরে বেশ সুখেই দাঁড়িয়ে আছে। হাত দিয়ে মাঝেমধ্যে পকেট হাতরানোর চেষ্টা করছে। একটু লেবুপানি পেলে ভালো হতো। মাথাটা ঝিমঝিম করছে তার।জয়ের মুখ বাঁধা। তবুও বোতলের কর্ক খুলতেই ঝাঁজালো এক শ্বাস

আটকানো ধোঁয়ার মতো গন্ধ এসে নাকে ঠেকল। হালকা কেশে উঠল। লোহার গেইটের ছিটকিনির ওপর অল্প-অল্প করে তরল ঢালছিল, তাঁতাল ছোঁয়ায় প্লাস্টিকের মতো ক্ষয় হয়ে হয়ে পড়ছিল ধাতুগুলো। মাটিতে পড়ার পর চিরচির করে শব্দ হচ্ছিল। এক সময় গোটা ছিটকিনির সিস্টেমটাই ক্ষয় হয়ে পুরো নিঃশেষ হয়ে গেল। জয় বোতলটার কর্ক কোনোমতে আঁটকে বোতলটা দূরে ছুঁড়ে মারল। হাতের রুমালের ওপর পড়েছে বোধহয় দু-এক ফোঁটা। রুমাল না পেঁচানো থাকলে হাতে লাগতো।

পিস্তলের ম্যাগাজিন খুলে কয়েকটা এম্মো রি-লোড করে সাইলেন্সর লাগিয়ে নিয়ে আস্তে করে গেইটটা খুলে ভেতরে ঢুকলো। শুকনো পড়ে গাদা হয়ে আছে। হাই-বুটের নিচে মরমর করছিল।পলাশ এদিক-ওদিক তাকিতুকি করছিল। জয়কে দেখে ভ্রু কুঁচকে ফেলল, তারপর কেমন একটা অস্থিরতা ঘিরে ধরল পলাশকে। হাজার হোক, এই জয়কে পলাশ ছোট থেকে দেখেছে, হোটেলে একসাথে বসে মদ খাওয়া, আড্ডা দেয়া...তার সামনে এমন নিকৃষ্ট অপরাধীর মতো দাঁড়াতে বেশ অপ্রস্তুত লাগছিল পলাশের। তারা দুজনই পাপীষ্ঠ, অথচ সেইসব পাপকে ছাপিয়ে

আজ এক পাপীর কাছে আরেক পাপী, পাপী হয়ে ধরা দিলো।

জয় ইশারায় সালাম দেয় পলাশকে। পলাশ ছাড়া আর কারও সাধ্যি নেই জয়কে চেনার, এমনভাবে প্যাকিং করেছে নিজের।

পুলিশদুটো জয়কে খেয়াল করে রাইফেল তাক করার আগেই লুটিয়ে পড়ল মাটিয়ে। জয়ের সেমি-অটোমেটিক পিস্তলের তিনটা বুলেট, দুটো প্রাণহীন দেহ।পলাশ দৌঁড়ে ভেতরের দিকে এগিয়ে যেতে চায়। ফোর্সের সবাই সামনের দিকে। এটাই বোকামি ওদের। দুজনকে রেখে ওরা নিশ্চিন্তে আততায়ী

খুঁজছে। অবশ্য কারণ আছে। এখনও খণ্ড যুদ্ধ চলছে সামনে।

পলাশ বাড়ির পেছন দরজা অবধি পৌঁছালো না, জয় নিখুঁত নিশানায় পলাশের ডান পায়ে গোড়ালি বরাবর শ্যুট করল। থুবরে পড়ে যায় পলাশ। তখনই ঢুকল কবীরের সাথে তিনজন। পলাশের মুখে খানিকটা কাপড় গুঁজে ওকে টেনে বাগারের ভেতরে নেবার পর পুলিশের কয়েকজন এপারে এলো।

গোটা ঘটনাটা পুলিশ বাহিনী পলাশের বাড়িতে ঢোকার পাঁচ মিনিটের মাঝে ঘটে গেল। একই সাথে বিভিন্নদিকে বিভিন্নভাবে সেট-আপ হয়ে শেষ অবধি জয় গাড়ি ভাগিয়ে

আমবাগান পেরিয়ে ঢুকে পড়ল এক গ্যারাজে। সেখানকার সাটার ডাউন হলো। পুলিশের বাহিনীর নাগালের ভেতরেই তারা তখন নাগাল ছাড়ানো ফেরারি।

পলাশের পায়ের গুলিটা কোনোমতো পা ছুঁয়ে গেছিল। নেহাত থামানোর উদ্দেশ্যে গুলি ছোঁড়া। কোনোমতো রক্ত বন্ধ করে ওকে সাডেটিভ ড্রাগ দেয়া হলো।শেষরাতের দিকে যখন গাঙের পাড়ের বাড়িতে পৌঁছানো ওরা। রূপকথা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে জানালার ধারে। কবীর অবাক হয়ে যায়। হামজা বসে আছে সোফায়।বাড়িতে না গিয়ে এখানে এসে জয়ের অপেক্ষা করছে। কী দৃঢ় বিশ্বাস, জয়

জয়ী হয়েই ফিরবে, সে জয়কে সেই ধাঁচেই গঠনগতভাবে কাঠামো দিয়েছে।

পলাশের বাড়ি, নির্জন জায়গা। কারও সন্দেহও হবার কথা নয়, যে পলাশ এভাবে পালিয়ে নিজের কোনো বাড়িতে যাবে। হলেও সে ব্যবস্থা আছে। পুলিশের ধারণা পলাশকে নিয়ে পালিয়েছে ওর দলের লোকেরা।রূপকথা স্বামীকে সেই রাতে একবার দেখেছিল অচেতন অবস্থায়। জয় ওকে ধরে নিয়ে এসে বেসমেন্টের এই কক্ষে শিকল পরিয়ে রেখে গেছে। তারপর যেসব অমানুষিক অত্যাচার করা হয়েছে, সেসব সময় রূপকথা দূরে থেকেছে। ওসব ভালো লাগেনা।

পলাশের গোঙানি কানে এলে নিজের সেইসব দিনের কথা মনে পড়ে যায়। বিশেষ করে বিয়ের সেই প্রথম রাত। তার ফর্সা, নমনীয়, অক্ষত চামড়ায় পলাশের পাগলাটে থাবা পড়েছিল। এরপর আর সব.... কত যন্ত্রণা, কত ছটফটানি, প্রতারণা, আর বাধ্যগত সেইসব পাপ! নিষ্পাপ এক চাঁদ মুমতাহিণা! রূপকথার নিজেকে নোংরা কীট মনে হয় সর্বক্ষণ!রূপকথা মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে বসে। জয় তাকে কতটুকু সময় দেবে পলাশের কাছে কাটানোর, জানা নেই। তার কেমন লাগছে? কে জানে কেমন লাগছে! এই লাগার নাম নেই, বর্ণনা নেই। সে কি শেষবার

মানুষের মতো দেখতে এই পশুকে দেখছে! বিয়ে আগ অবধি যে তার পলাশ ভাইয়া ছিল, এরপর হলো নরকের দ্বাররক্ষী!
আচ্ছা রূপকথার অস্থির লাগছে কেন? কীসব হিসেব-নিকাষের অংক ঘুরপাক খাচ্ছে জীবনের! অবর্ণনীয় সব অযাচিত অনুভূতিরা নৃত্যরত চারধারে।
অনেকক্ষণ বসে থাকে পলাশের মাথার কাছে। খুব ধীরে নিঃশ্বাস পড়ছে পলাশের। রূপকথার অবচেতনা ভাঙলো, হিংস্র এক লাত্থি পড়ল দরজায়। রূপকথা নড়ল না, উঠল না, শুধু বলল, শব্দ কোরো না, "জয়। নিশ্চুপ থাকো কিছুক্ষণ।"অন্তূ জানালার ধারে দাঁড়িয়ে

চুপচাপ। বাইরের পরিবেশটা ভীষণ সুন্দর! গাঙের পানি ছলছল রবে বয়ে যাচ্ছে, আকাশে চাঁদ নেই, গাঙেল কূলের আবহাওয়া একটু মঘলা বোধহয়!

রূপকথা যাবার পর পরাগ ল্যাপটপ ছেড়ে বসল, অন্তূর দিকে তাকিয়ে বলল, “পলাশ ভাইয়ের শুভাকাঙ্ক্ষীরা যখন-তখন হামলা করবেই। আর যদি তা না পারে, তো পুলিশ নিয়ে আসবে। পলাশের জন্যে এই মুহুর্তে জেলখানার চাইতে সুখকর জায়গা দুইটা নাই।”জয় বিশাল এক হাঁ করে হাই তুলল, “ব্যাপার না। তুমি আছো না? তুলে দেব ওদের হাতে। তুমিও তো একই কম্পানির

প্রোডাক্ট। আমি আমার বউটা নিয়ে ভাগতে পারলেই হলো।”

পরাগ কাঠের ভারী চেয়ারটা ঠেলে মারল জয়ের দিকে, জয় দ্রুত সরে গিয়ে বাঁচল, লাগলে নির্ঘাত হাসপাতাল। পরাগ শান্ত স্বরে বলল, “তোমার মতো বেইমানের ওপর ভরসা করাও শালার এক চরম ফাতরামি ছিল।”

জয় উঠে দাঁড়িয়ে মাছি তাড়ানোর মতো হাত নাড়ল, “আমি তো জন্মগত আর খানদানী বেইমান। আমি বেইমানী করি পুরো ইমানদারীর সাথে। আমার বেইমানীতে কোনও গাফলতি থাকেনা, খাঁটি বেইমানী।

কিন্তু ভয় হলো, তোমার মতো ইমানদারদের নিয়ে..পবিত্র গাদ্দার...''
পরাগ মুখ বাঁকিয়ে হাসল, “যেমনে তোর পেয়ারের পলাশ ভাই আজ শালা হয়ে গেছে, ওরকম কিছু ঠাপ আমিও খাইছি, বুঝলি না রে!''জয় অন্তূর দিকে তাকাল। তার খেয়াল নেই ওদের দিকে। পরাগ ল্যাপটপে কিছু দেখে চট করে উঠে দাঁড়াল, “আজ পলাশকে আমার হাত থেকে তুমি বাঁচাইতে পারবা না। তোমার নাটক আর নিতে পারতেছি না। মারবাই যখন, তখন ফিল্ডিং মারাইতেছ ক্যান এমনে?''

জয় তাড়াহুড়ো করে পরাগের পিছে যাবার আগে হাতের বোতলের মদ গিলে শেষ করে আগে। তারপর পরাগের পেছনে দৌঁড়ায়। আবার কী মনে পড়ে দৌড়ে ফিরে আসে, এরপর একটা ভরা বোতল নিয়ে আবার দৌড়।

পরাগ গিয়ে দরজায় দুটো সজোরে লাত্থি মারল। রূপকথার কথা শুনে রেগে উঠল, "জয় না, আমি। খোল, দরজা! আমার মা'র কিছু হইলে তোর চৌদ্দগুষ্ঠির অবস্থা আমি তোর ওই বেজন্মার মতো করে ছাড়ব, রূপ। দরজা খোল।"

রূপকথা অবাক হয়ে দরজা খোলে, "বুয়ার কী হয়েছে?"-"আমি কেন এসেছি এখানে?"

-"বলিসনি কিছুই। এসে থেকে ল্যাপটপে বসে আছিস।"

-"তোর ওই..বানচোত." বিশ্রী ভাষায় বকে ওঠে পরাগ, "আমার মাকে কোথায় পাঠিয়েছে সেটা শোন্, যতক্ষণে বলবে, ততক্ষণ ওর আয়ু আছে। চিরকাল তোদের ফরমায়েস খেটেছে, তার বদলে লাথি, মানহানি ছাড়া কিছু পায়নি। তোর বাপ মরেছে, এবার ওই শুয়োরের বাচ্চাও মরবে, বাকিটার ভোগ আমার আর মা'র। তোল ওকে।"

জয় এসে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল পরাগকে। পরাগ সমানতালে বকে যাচ্ছে। জয় একবার খামচে মুখটা চেপে ধরল। পরাগ ঝপাট করে এক ঘুষি মারে জয়ের নাকের ওপর। তখন ওরা গাঙের কূলে চলে এসেছে। অন্ধকার চারদিক, প্রায় সকাল হয়ে এসেছে, পাখি ডাকছে।জয়ের নাক দিয়ে রক্ত পড়ে প্রায়ই। ঘুষির আঘাতে কপকপ করে রক্ত বেরিয়ে এলো। আঙুলের ডগায় রক্ত মুছে পরাগকে দুটো ঘুষিসহ শেষ অবধি এক লাত্থিতে গাঙের পানিতে ফেলে দিলো। টাল সামলাতে না পেরে নিজেও গাঙের কূলের কাদায় পা পিছলে পড়ল। পরাগ পা ধরে টেনে পানিতে

নামানোর চেষ্টা করে। জয় শক্ত করে কীসের একটা শিকড় টেনে ধরে নিজেকে পানিতে পড়া থেকে বাঁচালো তো, অথচ পুরো শরীর ইতোমধ্যে ভিজে গেছে, কাদামাটিতে পরনের পোশাক শেষ। শেষ অবধি ঝারা মেরে পরাগকে পানিতে ফেলে রেখে বকতে বকতে উঠে এলো। পরাগ পড়ে রইল পানিতে, ফজরের আজানের আগে গাঙে গোসল করা ভালো।

গাঙের এধার ঘেঁষে অনেকটা দূর দেখে এলো জয়। তেমন কেউ ছিল না।

কাদামাটিসহ্ ভেজা শরীরে বেসমেন্টে এসে বসল। আরও কয়েক প্যাগ মারা দরকার। নয়ত ঘুম আসবে না।

রূপকথা পলাশের কপালে হাত রাখে। কপালটা গরম। তাকিয়ে রইল। নিজের শরীরের শুকনো ক্ষতগুলো চিরবির করে উঠছে যেন। পলাশের সামনে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত পড়ে থাকতে দেখেছে অজস্র বেলা, কিন্তু পলাশকে কখনও এভাবে দেখা হয়নি।রূপকথা আনমনে বলে ওঠে, “জানো, জয়! বিয়ের তিন বছরের মাথায় আমার গর্ভে একটা সন্তান এসেছিল।”

জয় হিপফ্ল্যাস্কে দুটো চুমুক দিয়ে বলল, “হু, শুনেছিলাম।”

রূপকথা বলে চলে, “তখন আমার গর্ভাবস্থার চার মাস। সেই সময় একরাতে পলাশের হাতে পড়লাম। পরদিন সকালে আমার গর্ভপাত হলো। দুই সপ্তাহ হাসপাতালে থেকে আমি খুব কেঁদেছিলাম.. জানো!”

জয় মাথা নাড়ল, “কাঁদা তো ভালো। চোখের জীবাণু, ব্যাকটেরিয়া, ময়লা সব চোখের পানির সাথে ধুয়ে-মুছে যায়। হোয়াট এভার, এক সিপ মারবেন? দুঃখের সময় এটা ভালো কাজ দেয়।”

রূপকথা তাকাল, একই সুরে বলতে লাগল, “তুমি জানো, পাপীর ঘর করা কারাবাসের চেয়েও কঠিন! পাপীষ্ঠর সাথে বাস করতে করতে বড়জোর পাপী হওয়া যায় ঠিকমতো, এর বেশি উপকার নেই!”

জয় ঘাঁড় ঝাঁকাল, “উঁহু! আপনি এইসব মেয়েলী দুঃখের কথা আমায় শুনিয়ে কোনো ফায়দা পাবেন না, একফোঁটা সান্ত্বণা অবধিও না। রাদার, আমার বউকে শোনান, সে নিজেও ভুক্তভোগী। তাই সে আপনার দুঃখ বুঝবেও, সহমত পোষনও করবে, আবার মাল-মশলা মেরে নিজের দুঃখের প্যাঁচালও শোনাবে। আলাপ জমবে ভালো। তার চেয়ে

বড় কথা, আমিও আপনার স্বামীর তরিকারই মুরীদ! আমার কাছে এসব কাহিনী শোনানোর ধান্দাটা লস প্রজেক্টে যাবে।''রূপকথা বসে রইল চুপচাপ কিছুক্ষণ। সে বিদেশ থেকে পড়ালেখা সেরে দেশে ফিরে কয়েদ খাটছিল এতগুলো বছর! পরিস্থিতিবিশেষ পারিপার্শ্বিক সকল অর্জন ফিকে পড়ে যায়! যার বাবা জঘন্য অপরাধী, স্বামীটা হিংস্র পশুকেও হার মানায়, রূপকথার কী করা উচিত ছিল সে অবস্থায়!

শেষরাতের দিকে পলাশ চোখ খুলে উঠে বসল আস্তে কোরে। রূপকথাকে বসে থাকতে

দেখে চমকে গেল, জড়ানো গলায় বলল, “রূপ!”

রূপকথা জবাব না দিয়ে তাকিয়ে আছে।

পলাশ বলল, “ওরা তোকে আঁটকে রেখেছে, রূপ?”

রূপকথা অপলক তাকিয়ে বলে, “নিজের বাড়িতে আঁটকে রাখা কেমন? আমি তো এখানেই ছিলাম।”

পলাশের হাত দুটোয় গভীর ক্ষত। পেরেক গাঁথা হয়েছে হাতে। দক্ষ এই কাজটা হামজার। কাঠের আসবাবে পেরেক গাঁথার মতো করে পলাশের হাতে পেরেক মারা হয়েছে।চাপটি ধরা রক্তের দানা হাতে

কাদামাটির মতো শুকিয়ে আছে। সেই হাত বাড়িয়ে পলাশ ছোঁয় রূপকথাকে। রূপকথা চোখ বোজে। বুকের মধ্যিখানটায় যেন ত্রিশূল বিঁধছে, বুকটা চিড়ছে ধীরে ধীরে, গেঁথে যাচ্ছে গভীরে। তার জীবনটা জীবন হলেও পারতো, তার স্বামীটা মানুষ হলেও পারতো, সে এক জোড়াতালি দেয়া ছিন্নভিন্ন শরীরের অধিকারিনী না হয়ে একজন সুন্দর পুরুষের সুশ্রী স্ত্রী হলেও পারতো, সে কোনো ঘৃণ্য রুচিসম্পন্ন পিতার সন্তান না হয়ে আমজাদ সাহেবের মতো বাবার মেয়ে হলেও পারতো। চোখ খোলে রূপকথা। কই! আমজাদ

সাহেবের মেয়েটাও যে ভালো নেই। মূলত ভালো থাকাটা জীবন নয়!

পলাশ হাসল। সে হাসলে চোখদুটো ছোট হয়ে যায়। ভয়ানক দেখায়। হেসে বলল, "তুইও বিশ্বাসঘাতকতা করলি, রূপ?"

রূপকথা মলিন হাসে, "বিশ্বাসের সম্পর্ক ছিল নাকি আমাদের? উত্তর যেহেতু 'না'। সেখানে বিশ্বাসের ঘাতক হবার সুযোগটা কোথায়, বলো?"পলাশ গলা টিপে ধরল রূপকথার। হাতের ক্ষত থেকে মরা রক্ত গড়িয়ে রূপকথার গলায় লাগে। পলাশ হাতটা আরও দৃঢ় করে। দম বন্ধ হয়ে আসছিল, তবু রূপকথা নির্লিপ্ত। পলাশ বলল, "শিকল খুলে

দিতে বল তোর, লাংকে। খানকিগিরি করতে রয়ে না গেছিস এখানে? ওদের স্পেশাল সেবাযত্ন করার জন্য রাখেছে ওরা তোরে? আমি মরলে ওই কাজই করে খাস...লোটির চেংরি। মারা খাইতে খাইতে জীবন যাবে তোর...তোর আমি...''

পলাশের হাতের থাবা শক্ত হলো। তাতে হাত থেকে রক্ত পড়ছিল। জয় এসে সেই ক্ষততে লবন লাগিয়েছে।

শরীরের জোর নেই নেই করেও অমানুষিক শক্তি যেন। চোখ উল্টে এলো, গোঙরাচ্ছিল রূপকথা। পলাশ ছাড়ল না। অকথ্য ভাষায় বকে গেল। পায়ে গুলি লাগা জায়গাটাতে

একটা নোংরা কাপড় বাঁধা। সেই কাপড়ের ময়লা-জীবাণুর জোরে ক'দিন ওভাবে থাকলে ক্ষততে ইনফ্যাকশন হয়েই ক্যান্সার ধরে যাবে যেন। না খাওয়া আজ দু'দিন।

খানিক পর ক্লান্ত হয়ে ছেড়ে দিলো রূপকথাকে। কিছুক্ষণ ঝিম ধরে বসে রইল। রূপকথা কিছুক্ষণ কাশতেও পারল না। শ্বাস ছাড়ল বেশ কিছুক্ষণ পর। তারপর বলল, "আর কোনো ইচ্ছা আছে তোমার মৃত্যুর আগে? আমাকে আর কোনোভাবে টর্চার করতে চাও? আমি জানি, তোমার শেষ ইচ্ছা হিসেবে তুমি আমার শরীরটাকেই বেছে নেবে ছেঁড়া-ফাঁড়ার জন্য।''পলাশ একবার তাকিয়ে

আবার মাথা নত করল। কয়েক সেকেন্ড পর টুপ করে এক ফোঁটা রক্ত পড়ে মেঝেতে। পলাশ দ্রুত মাথা তুলল। নাক দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। তার শরীরটাকে অচল করে ছেড়েছে ওরা। এ পর্যায়ে পলাশের ভেতরে একটা ভিক্ষুক জেগে উঠল, যে ভিক্ষুকটা মৃ/ত্যু ভিক্ষা করতে চায়। মেঝের ওপর টান হয়ে শুয়ে পড়ল। দুই হাতের প্রতিটা রগে রগে পেরেক গাঁথা হয়েছে। হাতুরি দিয়ে ধীরে ধীরে পেরেকগুলো গেঁথে আবার তোলার সময়ও বেশ সময় নিয়ে দুই আঙুলে পেরেক টেনে টেনে বের করেছে হামজা। কতটা রক্ত বেরিয়ে গেছে, মাপা গেলে ভালো হতো।

তাহলে একটা হিসেব পাওয়া যেত, শরীরে আর কতটুকু রক্ত বাকি আছে।শ্বাস ধীর হয়ে এলো পলাশের। চোখ বুজে খানিকক্ষণ শুয়ে থেকে আস্তে কোরে পানি চাইল।

জয়-হামজা ততক্ষণ মানুষকে অত্যাচার করে, যতক্ষণ সে সজ্ঞানে থাকে, জ্ঞান হারালে মাফ। আবার চিকিৎসা করে, সুস্থ করে, জ্ঞান ফিরলে নতুন মাত্রায় শুরু। পলাশ দুটো দিন আয়ুও পেয়েছে এই বদৌলতেই। আজ রাতটাও পেল। কারণ সে অজ্ঞান ছিল। ভিক্টিমের চোখে কাতরানি না দেখলে জয় টর্চার করে সুখ পায়না। এটা ওদের গোটা সোসাইটির উসুল। এই নীতির মূল হোতাটা

রুদ্র ইয়াজিদ। তারপর হামজা, জয়, পলাশ....!

রূপকথা পলাশকে উচু করে ধরে পানি খাওয়াতে গেলে পলাশ গা দুলিয়ে হাসে, আজব দেখতে লাগে তখন। দাঁতের ফাঁকে কালো রক্ত। হেসে জিজ্ঞেস করে, “তোর কি আমাকে এই অবস্থায় দেখে কষ্ট হচ্ছে, রূপ? ”-“হচ্ছে তো। তুমি জানোনা, আমার কতটা কষ্ট লাগছে, যখন ভাবছি আমার স্বামীকে এমন যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর মুখে দেখেও আমার তাকে বাঁচাতে ইচ্ছে করছে না, তাকে মুক্তি দেবার তাগিদ পাচ্ছি না ভেতরে, এটা ভাবলেই বুক ভেঙেচুড়ে কষ্ট আসছে, তখন

কষ্টে মরে যেতে ইচ্ছে করছে। অথচ তুমি না আমার পলাশ ভাইয়া, আমার স্বামী...! আমি ছাড়া এই দুনিয়ায় আপন বলতে তোমার কেউ নেই এই মুহুর্তে, আর আমিটাও তোমার খুব কাছের আপন কেউ। তোমার এই শেষ মুহুর্তে সেই আমি তোমার সামনে আছি, পাশে আছি, তোমাকে পানি খাওয়াচ্ছি, এমন সৌভাগ্য কয়জনের হয়? অথচ তোমার জন্য স্বাভাবিক মায়াটুকউ লাগছে না। এটা কতটা ব্যথাদায়ক, ভাবতে পারো? এটা ভেবে তোমার কষ্ট হবার কথা? হচ্ছে?''পলাশ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। আশ্চর্য! শরীরের মরণসম ব্যথাটা এখন ঝাপসা লাগছে, বুকে

কীসের যেন অস্থিরতা! পলাশ অবাকের চরম সীমায় পৌঁছে গেল। এই জীবনে সে কখনও আবেগবোধ করেনি। কসাইয়ের মতো মানুষ জবাই করা, নারীদেহ ছিঁড়ে খাওয়া, মানুষের শেষ সম্বলটুকু হস্তাগত করে নেয়া, কারও ব্যবসার গোটা পুঁজি, মুনাফা সবটা এক হানায় চাঁদা হিসেবে হাতিয়ে নেয়া। বাপের সামনে মেয়ে, মেয়ের সামনে বাপকে মারা....কী যে সুখ লাগতো এসবে! তার মস্তিষ্কের কোনো অংশে আবেগ, অনুভূতি নামক দুটো শব্দের অস্তিত্ব নেই, এটা চিরন্তন সত্যের মতো। অথচ আজ পলাশ বুকের ভেতরে হাতরে নতুন এক রকম কিছু অনুভব করল। এই

জীবনে এই রকম কিছুর সাথে তার পরিচয় ঘটেনি। এই রূপকথা তার পা দুটো দু'হাতের বাহুতে জড়িয়ে ধরে বাচ্চা মেয়ের মতো মিনতি করেছে, "ও পলাশ ভাইয়া, ছেড়ে দাও আমায়। ও পলাশ ভাইয়া, পলাশ ভাইয়া গো... " এই চিৎকার আর মিনতি করা কান্নাগুলো পলাশের কানে বাঁশির সুরের মতো সুখকর ঠেকতো। নিজেকে পুরুষ মনে হতো তখন। আজ পলাশ হতবিহ্বল হয়ে চেয়ে থাকল। তার এই দুনিয়ায় কেউ নেই আপন। রূপকথা আছে, সে খুব আপন তার। তার স্ত্রী, চাচার মেয়ে। অথচ সে তাকে বাঁচাবে না, রূপের নাকি ইচ্ছেই করছে না একটুও। কঠিন মৃত্যু

তার সামনে। এই একমাত্র আপনটার সাথে সে খুব অন্যায় করেছে, তাই একমাত্র আপনজন সামনে আছে, তবু তার এই নারকীয় হাল দেখেও মায়া লাগছে না!রূপকথা নিচু স্বরে কিন্তু কণ্ঠস্বরে অনুযোগের দৃঢ়তা মিশিয়ে বলল, "আর এই মায়া না লাগার পেছনের পেক্ষাপটগুলো খুব ভয়াবহ, বুঝতে পারছো তুমি?"

পলাশ ঝারা মেরে উঠতে চেয়ে পড়ে যায়। তার রূপকথা ভীষণ রুপবতী, ঠিক রূপকথার রাজকুমারীদের মতোন, শিক্ষিত, কথা বলে কী সুন্দর করে! আজ এসব মনে পড়ছে তার। উঠে বসে পলাশ। হাত বাড়িয়ে

রূপকথার ঠোঁট ছোঁয়, কিন্তু কিছু বলতে পারে না।

রূপকথা যান্ত্রিকভাবে উঠে দাঁড়ায়। পলাশের ক্ষতবিক্ষত দূর্বল হাতটা তখনপিছলে যায় রূপকথার জামদানী শাড়ি ঘেঁষে। রূপকথা আর পেছন ফিরে তাকায় না। আচমকা তার বুক জ্বলছে, পুরোনো দিনগুলো ভয়ঙ্কর ভাবে স্মৃতিপটে আক্রমণ করছে। এখন আর পলাশের সামনে থাকা চলবে না। সেও তো একা হয়ে যাবে। তার আর কেউ থাকবে না। হাসল রূপকথা, পলাশ থাকলে কেউ থাকা হতো?চোখ দুটো জ্বলছে অন্তূর। ঘুম নেই কত রাত! যাকে ভোলা হয়নি, তাকে মনে

পড়ার প্রশ্ন ওঠে না। তবু গতরাত থেকে আব্বুকে মনে পড়ছে, এ কেমন মনে পড়া, তার তো ব্যাখ্যা নেই! আছে কেবল খণ্ড খণ্ড ব্যথা। অন্তূর মনে হলো, এই তীব্র যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে তার উচিত এখন ওই গাঙের জলে মুখ চুবিয়ে দশ মিনিট ধরে রাখা, তাতে সব থেমে যাবে— তার হৃদঘড়িটা, সাথে সকল ব্যথাও।

বাগানের ঘাসগুলোও অযত্নে বেড়েছে। সকাল সকাল কবীর পুরো দলবল নিয়ে পলাশের এই বাড়িতে হাজির।জয় একটা কোরবানীর আয়োজন করবে, তরুর জানের ছদকা হিসেবে, ওদের দাওয়াত এখানে। অন্তূ

ঝোপের কিনারে পাকা ঢিলার ওপর বসে থাকে।জয় প্যান্ট, হাইবুট ছেড়েছে। কবীর সকালে সাদা লুঙ্গি ও চিরায়ত চামড়ার স্যান্ডেল এনে দিয়েছে।

রূপকথা এসে নিঃশব্দে বসে অন্তূর পাশে। অন্তূ স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করে, মুখে যেন দুঃখ ফুটে না ওঠে, তাই হাসার অভিনয় করে।

জয় চুলো জ্বালাচ্ছিল। ভাঙা ডাল কুড়িয়ে এনে এনে জড়ো করছে ছেলেরা। ধোঁয়া চোখে লেগে কেদেকেটে অস্থির অবস্থা তার, লুঙ্গিতে কালি ভরে গেছে। অনেক কষ্টে চুলো জ্বলেই উঠেছিল সবে, পরাগ কোত্থেকে এক বালতি

পানি এনে ঢেলে দিয়ে আরাম করে হেঁটে গিয়ে মুরগী জবাই করতে লাগল।

জয় চোখের মণি ঘুরিয়ে দেখল পুরো ব্যাপারটা। এরপর আস্তে করে বকলো দুটো, “শালার জাঙ্গিয়ার ভেতরে কাঁকড়া ঢুকাইতে পারলে শান্তি লাগত। ল্যাউড়ার বাল!

”জীবনেও কখনও ভালো সম্পর্ক ছিল না জয়ের সাথে পরাগের। তখন জয় ক্লাস এইটে। ঘুরতে গিয়ে দুজন বাজি ধরে এক দ্বীপে গেল পালিয়ে নৌকা নিয়ে। জয়কে দ্বীপে নামিয়ে নৌকা নিয়ে চলে যাবার সময় একটা পকেট ছুরি ছুঁড়ে দিয়ে পরাগ বলল, “নে, এটা দিয়ে মাছ শিকার করে খাস, আর মাছ

না পেয়ে বেশি খিদে লাগলে মরে যাস। আমার দোয়া থাকবে তোর সাথে। সালাম, বন্ধু।”

এরপর জয় কীভাবে দু’দিন পর সেখান থেকে ফিরেছিল, সে এক ইতিহাস। তারপর আর দুজনের জীবনে বনিবনা হয়নি।অন্তূ সেদিন রূপকথাকে জিজ্ঞেস করেছিল, “আপনি জয় আমিরকে বেশ জানেন, তাই না?”

রূপকথা কিছুটা সময় নিয়ে জবাব দেয়, “আমার বিয়ে হয়েছে ২০০৯-এ। তখন জয় অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে। সেই সময় হোটেলে রোজ ওর যাতায়াত ছিল। কখনও কখনও অতিরিক্ত মদ খেয়ে সাথে চুরুট টেনে কাশতে

কাশতে বমি করে ভাসিয়ে ফেলতো। জ্বরে গা পুড়ে যেত, তবু কোনো মেয়ের সাহস ছিল না ওর কাছে গিয়ে ওকে সেবা দেয়।"

রূপকথা সামান্য হাসল, "জানো তো, সে আবার কারও সেবা, আদর-যত্নের ভুক্তভোগী না। তখন আমাদের আগের ভিলার পাশেরটা বিল্ডিংটা হোটেল ছিল। কোনো কারণে গেলে দেখেছি, বেহুশের মতো পড়ে আছে, তবু কাউকে সেবা করতে দিচ্ছে না। আমি গিয়ে ধমকে-ধামকে জোর করে টেনে বাড়িতে নিয়ে যেতাম। প্রথমদিন এক থাপ্পরও খেয়েছিল আমার হাতের বেশি ভাব ধরায়।"

অন্তূ মুখ তুলল, “কখনও সরাসরি তাকে স্নেহের কাঙাল মনে হয়নি।”-“জয়ের যেটুকু যা দেখা যায়, সবটাই ওর নিজের স্ক্রিপ্টেড। তুমি তাকে খুব ভালো জানো, এবং আরও অনেকে জানবে হয়ত, কিন্তু তোমার মতো করে কেউ জানেনা। কত রাত জ্বরের ঘোরে কাতরেছে, মাথায় পানি দিতে গিয়ে শার্ট খুললে দেখেছি শরীরে অজস্র দাগ, কোনোটা তাজা-কোনোটা অনেক পুরোনো। অথচ এত এত রাত পড়ে থেকেছে বেহেড অবস্থায়, তবু কোনোদিন ওর অতীত বা ভেতর সম্পর্কে একটা কথা জানতে পারিনি।”

অন্তূ কথা ঘোরায়, “থাপ্পড় খেয়ে কী করল?”

দীর্ঘ এক শ্বাস টেনে উদাসীন স্বরে বলল রূপকথা, "বেক্কেলের মতো চেয়ে রইল। এরপর চুপচাপ যা বললাম, শুনল।" রূপকথা একটু চুপ থেকে বলল, "সেসব দিনে ঘুমের ঘোরে তরুকে ডাকতো–দুটো ঘুমের ওষুধ দেবার জন্য।"

অন্তূ ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল, "সকল যন্ত্রণার একটাই ওষুধ, ঘুমের ওষুধ আর নয়ত মদ গিলে ঘুমানো? চমৎকার তো!"

রূপকথা তাকাল অন্তূর দিকে, "তুমি জানো, তোমার আর ওর মাঝে অসংখ্য মিল আছে? "অন্তূ তীব্র প্রতিবাদ জানায়, "প্রশ্নই ওঠে না। "

রূপকথা শাড়ির আচলে ঘাম মুছে বলল, “অস্বীকার করে অনস্বীকার্যকে এড়াতে পারবে না। জয়ের আয়নায় দেখা যাওয়া প্রতিবিম্বটা হলে তুমি। একই তবে বিপরীত।”

দুজন একযোগে তাকাল জয়ের দিকে। সে এখন ঘাসের ওপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়েছে। ঘাঁড়ের নিচে হাত রেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। গাঙের পাশে সবসময় শনশনে বাতাস। কপালের কাছের চুলগুলো উড়ছে। অপর হাতটাও এবার ঘাঁড়ের নিচে গুঁজে গলা ছেড়ে এক ভারী টান ধরল,আমি চলতি পথে দু’দিন থামিলাম,

আরেহ ভালোবাসার মালাখানি গলে
পরিলাম....
আমার সাধের মালা যায় রে ছিঁড়ে....
রইব না আর বেশিদিন তোদের মাঝারে
ডাক দিয়াছেন দয়াল আমারে,
রইব না আর বেশিদিন তোদের মাঝারে...

রূপকথা একদৃষ্টে জয়ের দিকে চেয়ে থেকে বলল, "জয়কে আমার একটা মানচিত্রের মতোন লাগে। একেক দিকের দৃষ্টির কোণ থেকে তাকে একেকভাবে আবিষ্কার করা যায়।"-"পাপের কোনো দিক-কোণ নেই। যেদিক থেকেই দেখুন, ওটা পাপ এবং পাপ।"

রূপকথা হাসে, “ভুল বলোনি। পলাশের হাত থেকে এই জয় কতবার আমাকে ছাড়িয়েছে! এরপর একবার পলাশের সাথে ঝামেলা করে আমাকে ওদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখল, তখন...”

নিশ্চিত হতে শুধায় অন্তূ, “কোন বাড়িতে?”

-“আমির নিবাস।”

-“আপনি ওখানে ছিলেন?”-“ছিলাম। মজার কথা শুনবে? রেখে এলো আমায়, অথচ জীবনে দেখতে গেল না আর–বেঁচে আছি না মরেছি। আমি যে ওকে না জানিয়ে চলে গেছিলাম ও বাড়ি থেকে থেকে, সেটাও জেনেছে ও এক সপ্তাহ পর।”

অন্তূর হাসি পেল। এছাড়া এরা আর কী আশা রাখে জয় আমিরের কাছে? বলল, “বাড়িটা কেমন, বলতে পারেন?”

-“তোমার শ্বশুরবাড়ি তো। সেটার ব্যাপারে আমার কাছে জানা কেন? নিজে গিয়ে জানবে।”

-“আমি? সে হিসেব থাক আপাতত। আপনিই বলুন!”অল্প চুপ থেকে রূপকথা চোখ তুলে তাকাল অন্তূর দিকে, “তুমি আমাকে ঘৃণা করো, অন্তূ?”

অন্তূ প্রসঙ্গ বদলায়, “বাড়িটা কি পুরোনো আমলের?”

রূপকথা আর জবাব দিলো না। পদে পদে অন্তূর মাঝে জয় আমিরের ছাপ ফুটে ওঠে। যা মুখে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক নয়, সেই কথাটা ভীষণ সন্তর্পণে এড়িয়ে যায় এরা। রূপকথার বুক আরেকটু ভার হলো। অন্তূর সুপ্ত ঘৃণা রয়েই গেছে তার উপর আজও। সকালের রান্নাটা তুলি করল। বাড়িতে কোয়েলসহ ওরা চারজন। ওয়ার্কশপে আজ ছয়জন খাটছে। আর বড়ঘরে আছে সাতাশজন।

সকাল এগারোটায় রিমি রুম থেকে বের হলো। হামজা সোফাতে বসে বই পড়ছে। ভীষণ মনোযোগ বইয়ের পাতায় তার। জর্জ

অরওয়েলের লেখা ‘নাইনটিন এইটটি ফোর’ বইটি তার হাতে। ইংরেজ লেখকের লেখা এই বইটি চমৎকার এক রাজনৈতিক ও সরকারব্যবস্থার আখ্যান। আগের দিন হল রিমি রাগ করতো। ওকে ঘুম পাড়িয়ে টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে এসব ভারী ভারী বই পড়ার অভ্যেস আছে এই লোকের।

চোখে সাদা চশমা। চৌত্রিশ বছর বয়সী সৌম্য পুরুষটির দিকে কতক্ষণ চেয়ে রইল রিমি। পরনে সবসময়কার মতোন ফতোয়া। কালো কুচকুচে চাপ দাড়ি-গোফের ভিড়ে পুরু ঠোঁট। কোয়েল এসে হামজার কোলে ঝেপে পড়ে

বইটা কেড়ে নিলো, তখন রিমির মনোযোগ সরে।

হামজা রেগে গিয়ে আবার সামলায়। সে রাগে না। কোয়েলকে পাঁজা করে তুলে নাকে নাক ঘষে বলল, "তো আম্মাজান, আপনার খাওয়া হয়েছে?"-"জয় কোতায় গেতে, বলো। তাতাড়ি বলো।"

-"উমম..বেড়াতে গেছে। তুমি যাবে বেড়াতে, আম্মা?"

অভিমানে মুখ ফুলালো কোয়েল, "ওর বউতাকে ঠিকই সাথে নিয়ে গেল, আমায় নিলো না। আসুক এবার.."

হামজা হেসে ফেলল। অভিমানে মুখ ছোট করে মামার গলা জড়িয়ে ধরে বসে থাকে কোয়েল। একটু পর ফুঁপিয়ে ওঠে, "মামা!" হামজা চমকে ওঠে। নরম, আধভাঙা কণ্ঠের মামা ডাকটা কেমন যেন শোনালো কানে হামজার। "বাবা!" ঠিক যেন এমন।ঘন চোখের পাপড়ি ভিজে উঠেছে কোয়েলের। এত্ত সুন্দরী হয়েছে তুলির মেয়েটা! তুলির চেয়েও সুন্দরী! ত্বকের ওপর দিয়ে রক্তের বর্ণ ছুটে আসে, গোলাপী চামড়ার রঙ বাচ্চাটার। সেই ছোট্ট চোখের ছলছলে দৃষ্টি হামজাকে অস্থির করল, জড়িয়ে ধরল অজান্তেই সে, "কী হয়েছে, আম্মাজান! কাঁদছেন কেন?"

পানি গড়িয়ে পড়ল কোয়েলের চোখ বেয়ে,
“পাপা’তা আসেনা কেন? তরুতাও নেই। কার
থাতে খেলব বলো তো! পাপা বলেথিল,
চলকেট আর টয় আনবে আমাদ্দন্য। এলোই
না! আমি তাল ওপল লাগ কলেতি। শোনো,
মামা। তরুকে কোতায় পাথিয়েছ? আমার
খেলার লোকই তো নেই কেউ।”
বই রেখে কোয়েলকে কোলে তুলে বলল,
“আপনি কি মামার সাথে বেড়াতে যেতে চান,
আম্মাজান? মামা যদি আপনাকে নিয়ে যেতে
চায়?”কথাটা একটু সময় নিয়ে বুঝে হাসল
কোয়েল। ভেজা চোখ, ঠোঁটে হাসি! হামজা
আলতো হেসে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল

কোয়েলকে। সে বাচ্চাদের আদর দিতে পারেনা, কীভাবে কী করবে, তা-ই বুঝে পায়না।

রিমি বিছানা গোছাচ্ছিল। সারারাত কেঁদেছে। শেষরাতে যখন হামজা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে, তারপর একাধারে কেঁদেছে। হামজা দেখল ভারী মুখখানা রিমির। কিছু বলল না, চুপচাপ মানিব্যাগটা টাউজারের পকেটে পুরে কোয়লকে নিয়ে বের হলো।রাস্তায় এত মানুষের অভিবাদন, সালাম, সম্মান—সবটাই মুখের রোবটিক হাসি দিয়ে সামলে নিলো। ভেতরে নাম না জানা এক অস্থিরতা। অসহ্য লাগছে বিষয়টা। অপরিচিত যন্ত্রণা এ এক।

ভোররাতে সে রুম থেকে বেরিয়ে দুই জগ পানি ভরে নিয়ে সোজা বড়ঘরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। মেঝের ওপর ক্লান্ত দেহগুলো ছিটিয়ে পড়ে আছে। ক্লান্ত, অভুক্ত, ক্ষততে ভরা দেহগুলো ঘুমিয়ে আছে ওভাবেই। জেগে আছে তিনজন। কীসের যেন এক আলোচনা চলছিল, হামজার উপস্থিতিতে চুপ হলো সকলে।

জগদুটো রেখে হামজা বসল মোড়া টেনে নিয়ে। মুরসালীনকে বলল, "পানি খাবে?"

মুরসালীন জবাব দিলো না। চুপচাপ চেয়ে রইল। হামজা ক্লান্ত স্বরে বলল, "জেদ কমেছে?"

মুরসালীন হাসে, “জেদ? উহু! আগুন, হামজা ভাই, খড়ের গাদায় লাগা আগুন। যা শুধু ধিকধিক করে বাড়ে। সাতটা বছর ধরে জমছে ছাইগুলো, নেহাত কমার তো না, কী বলেন? ভাই হারিয়েছি, বোন হারিয়েছি...”

কথা কেড়ে নিলো হামজা, “ওরকম ছাই সবার ভেতরেই চাপা আছে। টুকটাক চাপা থাকা ছাই ভেতরে জমা ভালোই তো।”প্রতিটা গোয়েন্দা সংস্থা, লোকাল থানা, আইনি কার্যালয়—সবখানে, এমনকি রাস্তায় লোক নিযুক্ত করা। পুলিশ কোনোভাবে পলাশের এই বাড়ির দিকে ভিড়লেই খবর চলে আসবে।

সেদিন রাতে হামজা এসবিকে সুন্দর একটা তথ্য জানিয়ে রেখেছে কল করে। বলেছে, "পলাশ আজগর, দ্য মোস্ট ওয়ান্টেড ক্রিমিনাল আইনের হাত থেকে বেঁচে দেশের সীমান্তে অবস্থান করছে। সুযোগ বুঝে ওপারে পাড়ি দেবে। আপনারা সীমান্ত এলাকাগুলো কড়া নজরদারীতে রাখুন।"

আইন কর্মকর্তাদের ধারণা, তাদের তিনজন কর্মকর্তাকে

খু/ন করেছে পলাশ আজগরের লোক, এরপর তাদেরকে ঘোল খাইয়ে পালিয়েছে। এখন দেশ ছাড়ার মতলব। আর তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে ঝেপে পড়েছে তারা পলাশের পেছনে।

কোনোভাবেই সীমান্ত পার হতে দেয়া চলবে না। হামজা পলাশকে ইচ্ছেমতো খাতির করার সময় পেল এতে।সারাদিন রান্নাবাড়া করে, সকলকে খাইয়ে কাহিল অবস্থা জয়ের। সাদা লুঙ্গির ওপর কোমড়ে লাল গামছা বাঁধা, সাদা লুঙ্গি নোংরায় জর্জরিত। খাঁটি বাবুর্চি লাগছিল দেখতে। একটু পর পর গামছায় ঘাম মুছছে। সকলের খাওয়া হলো, সে তখনও অভুক্ত। প্রতিটা আয়োজনে তার সঙ্গে এটা হয়। এমনও হয়, সকলকে পেটপুড়ে খাইয়ে তার জন্য অবশিষ্ট কিছু বাঁচেনা। এটা তার রীতি। নিজের পেট ভেসে যাক, মেহমানদের কমতি রাখা যাবে না।

দুজনের গোসল-খাওয়া কোনোটাই হয়নি। রূপকথা সন্ধ্যার পর জয় ও পরাগকে খাইয়ে দিতে বসল। খাওয়া হলো না শুধু পলাশের। সবে পরাগ দুই লোকমা ও জয় এক লোকমা খাবার গালে পুড়েছে, তখনই গুলির শব্দ এলো। অর্থাৎ, দারোয়ান বসির শেষ! ভাতটুকু না চিবিয়ে বরং থুহ করে ফেলে দিলো জয়। সময় নেই খাওয়ার। দৌঁড়ে ভেতরে গিয়ে পিস্তল ও কুড়ালটা বের করে নিয়ে বাহির আঙিনার দিকে চলে গেল। ছেলেরা তখন সিগারেট ফুঁকতে গেছে কোথাও। পরাগ দৌঁড়াল জয়ের পেছনে।

ছয়জন মুখোশধারী আততায়ী। পলাশের শুভাকাঙ্ক্ষীর এক ঝলক। ছয়জন ছয়দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। জয়ের সঙ্গে প্রথমে যার দেখা হলো, কুড়ালের আঘাতে তার হাত কাধ থেকে নেমে গেল। চিৎকারটা মিলিয়ে গেল। এত নির্জন একটা জায়গা! বিশাল এরিয়াটার গোটাটাই পলাশদের দখলে। ভুলেও কেউ পা দেয়না দূর-দূরান্ত অবধি। গাঙটা লাশের স্তুপ, তা জানে লোকে।

পরাগ পেছনের দিকে গেল। নৌকা বয়ে গাঙের কিনারা ঘেঁষে উঠে এসেছে তার সামনে দুজন।

বাকি তিনজন তখন বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল। জয় দ্রুত ভেতরে ঢুকল। ওদের টার্গেট পলাশকে মুক্ত করা। এটা বুঝতে জয়ের যতটুকু দেরি লাগল, ততক্ষণে অন্তূর গলায় ড্যাগার ধরেছে ওরা। অন্তূকে জিজ্ঞেস করে, "পলাশ কই?"

অন্তূর মনে হচ্ছিল, এ যেন সিনেমা! বলল, "আমি জানিনা। আমি এসেছি গতকাল রাতে। আপনারা কি পলাশকে মারতে এসেছেন? "একজন অন্তূর গলা টিপে ধরে খেঁকিয়ে উঠল, "বেশি কথা কস? নাটক করবি না, বল পলাশ ভাই কই?"

অন্তূ দেখল, ওরা প্রচণ্ড উত্তেজিত। যখন-তখন ছুরি চালাবে সন্দেহ নেই। বলল, “উপরতলায় আছে। উপরতলার তিন নম্বর রুমে। দরজা খোলাই আছে, একটু আগে দেখে এসেছি আমি।” অন্তূ আদতেও জানেনা, উপরতলায় তিন নম্বর রুম বলতে কিছু আছে কিনা! সে উপরতলায় ওঠেইনি আসার পর থেকে। পলাশ মূলত বেসমেন্টে আঁটক।

দুজন উঠে যায় উপরতলায়। একজন অন্তূকে আঁটকে রাখল। রূপকথা আছে উপরতলায়। অন্তূ আড়চোখে তাকায় একবার। ড্যাগারের চোখা মাথাটা অন্তূর গলার চামড়া ছিড়ে ফেলেছে ইতোমধ্যেই। তীব্র জ্বলুনি হচ্ছে।

অন্তূর মাথা আর কাজ করছিল না। যেহেতু ওরা বাড়ি অবধি চলে এসেছে, অন্তূকে মেরে ফেললেও ওরা ঠিক পলাশকে ছাড়াতে পারবে।

তখন জয় ঢুকল। জয়কে দেখেই লোকটা খপাৎ করে অন্তূর চুল মুঠো করে ধরল। ড্যাগার আরও একটু শক্ত করে চাপলো কণ্ঠনালির ওপর, জয়কে বলল, “আর এক পা এগোবি তো...-“উহুম! মেরে ফেল্।” আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দু হাত উঁচু করে ধরল, ”বন্দুক থাকলে শ্যুট করে দে, ভাই। টপকে দে শালীকে। শালী চরম বেইমান। আমার খায়, আমার পড়ে, আমার পেছনেই বাঁশ নিয়ে

দৌঁড়ায়। ও বেঁচে থেকে লস ছাড়া লাভ নাই আমার। খুলি-টুলি উড়িয়ে দে একদম।”

লোকটা এক মুহুর্তের জন্য থমকালো এতে। তা যথেষ্ট। জয় অন্তূর দিকে কেবল একবার তাকাল এক মুহুর্তের জন্য। এরপর গুলি চালালো, ঠ্যাং বরাবর। লোকটা ব্যথায় ছিটকে ওঠার সময় ছুরির আঘাত লাগতো, লাগল না। অন্তূ জয়ের ট্রিগার লক্ষ করে মাথা পিছিয়ে নেয়। জয় এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে হাসল, “দুনিয়ায় গাছের চাইতে বিশ্বাসঘাতকের সংখ্যা বেড়ে গেছে রে মনসুর! এটা কি ঠিক? হামজা ভাই তোরে কত বছর পালছে। পলাশ

তোরে কোন তাবিজে কিনছে, বাপ?'' জয় লোকটার মুখ বাঁধা থাকার পরেও কণ্ঠ চিনল। কুড়ালের এক কোপে মাথাটা ঘাঁড় থেকে প্রায় আলাদা হয়ে গেল। এক ঝটকা রক্ত মুখে ছিটে এলো জয়ের। বুকের পশমের ফাঁকে রক্তের দানা আঁটকে রইল।পরাগ ভেতরে উঠে আসে। ক্ষ্যাপা দুটো নেমে এলো উপরতলা থেকে। অন্তূকে পেলে এবার বলি দেবে, এমন মনোভাব। কিন্তু পরাগকে দেখে থমকে গেল, ওরা পরাগকে এখানে আশা করেনি। জয়ের দিকে নজর যেতেই মুখ শুকিয়ে এলো। রূপকথা নেমে আসল, "পলাশ

এখানে নেই। ওপর থেকে শুনে এলে না আমার মুখে?"

ওরা আজ আর মালকিনকে পরোয়া করছে না। রূপকথাকে হাতের কাছে পেয়ে ওকেই জিম্মি বানালো। এটা পলাশের অর্ডার। পলাশের বউ পলাশের দুশমন। বউকে ছাড় দিয়ে লাভ নেই।

দুজন রূপকথাকে অস্ত্রের তলে ধরে পিছিয়ে গেল কয়েক কদম। জয় আঙুল ঢুকিয়ে দাঁত থেকে মাংসের টুকরো বের করছে। ওরা সতর্ক দূরত্ব বাড়িয়ে একটা ছুরি ছুঁড়ে মারল জয়ের দিকে। জয় তড়াক করে ছুরিয়ে দিকে পরাগকে ধাক্কা মেরে নিজেকে বাঁচায়।

পরাগের হাতে লাগল ছুরি। এরপর দুটো মোট তিনটা লাশ পড়ল মেঝেতে।
অন্তূর ওড়না টেনে নিয়ে দাঁতের রক্ত মুছল জয়, "বিশ্রী স্বাদ এই শালাদের র-ক্তেও, ঠিক বলিনি, পরাগ?"
পরাগ বদলে বকে উঠল, "তোর রক্তের চেয়ে অন্তত ভালো স্বাদ।"জয় ভাব নিয়ে ঠোঁট বাঁকায়, "রক্তটা আমার বলে কথা। কিন্তু কথা হইল, তুমি টেস্ট কবে করছো , ভাই ফ্রগ?"
ফ্রগ শব্দের অর্থ–ব্যাঙ। পরাগ থেকে ফ্রগ, জয়ের আবিষ্কার এসব। পরাগ হাসল, "তোমার পেছন যে মারব আমি, বাট দ্য

লেডিস ইন ফ্রন্ট অফ মি...'' রক্তে শার্ট ভিজে উঠেছে পরাগের।

অন্তূর ওড়না হাতের এক ছোট্ট ক্ষততে প্যাঁচাচ্ছিল জয়। তাতে অন্তূর গায়ের ওড়না সর আসছে। অন্তূ হেঁচকা এক টান মারল ওড়নায়, পড়তে পড়তে বাঁচে জয়। একটা থাপ্পড় তুলল অন্তূর দিকে, আবার মারল না। খানিক আগে অল্প খাবার খেয়ে বমি করেছিল অন্তূ। মুখটা শুকনো।

অন্তূকে বেসমেন্টের সামনে এনে বলল, "একটা মজার জিনিস দেখাই চলো। তারপর বাড়ি কেন, জাহান্নামে যেতে চাইলেও দুইজন

একসাথে পাড়ি দেব সেই পথ! আফটার অল তুমি আমার ঘরের শালী!''

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে আলো জ্বালায় জয়। অন্তূ সোজা হয়ে দাঁড়াল। কেউ উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। মেঝেতে ছোপ ছোপ রক্তের শুকনো দাগ। পায়ে তার শিকলের বেড়ি।জয় এগিয়ে গিয়ে লাত্থি মেরে দেহটা উল্টে চিৎ করল। অন্তূর শরীরটা ঝাঁকুনি দিয়ে শিউরে ওঠে। পলাশের ছেঁড়া-ফাঁড়া দেহ। ছ্যাঁচড়ার মতো হাসল পলাশ। প্যাচপ্যাচে হাসি। চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। সরু নাকের পাটার নিচে শুকনো রক্ত। হাত তুলে যখন অন্তূকে ঈশারা করল, অন্তূর গা-টা ঘিনঘিনিয়ে উঠল।

ওর পুরো হাত ঠেতলে গেছে। আধমরা হাল। এতটা বেহাল অবস্থায় কেউ জীবিত থাকতে পারে? শরীরের থকথকে ঘা-গুলো থেকে কষানি ও পুঁজ ঝরছে, কোথাও কোথাও জমে আছে। জীবন্ত মাংসে পোকা হলে যেমন গলে গলে পড়ে, কষানি জমে ক্ষতগুলো সেইরকম দেখাচ্ছিল।

অন্তূ নিজের অজান্তে দু-কদম পিছিয়ে গেল। আব্বুর সেই চেহারাটা মনে পড়ল। ছেঁড়া শার্ট, ঠেতলে যাওয়া মুখ, কানের কাছে সিগারেটের আগুনের পোড়া, শরীরে রক্ত জমাট বেঁধে কালশিটে পড়া অসংখ্য ক্ষত....অন্তূ চোখ বোজে। কী আশ্চর্য! অন্তূর

শরীরটা কাঁপছে, চোখ ভরে আসছে! আব্বুর কানে যখন সিগারেটের আগুন চেপে ধরা হয়েছিল, পুড়েছিল জায়গাটা, আব্বু কি চিৎকার করেছিল ব্যথায়!চোখ খোলে অন্তূ। সেই তো কতদিন আগের ব্যথা, আব্বু নেই, এর মাঝে অন্তূর সাথে কত কী হয়েছে, কত সহনশীলতা এসেছে অন্তূর মাঝে, তবু কেন সইছে না!

তরু! ব্লেডে ছিন্নভিন্ন শরীর, দু'পায়ের মাঝ দিয়ে গড়িয়ে মেঝে ভেজানো পাঁজা ধরা রক্তের স্রোত, নগ্ন শরীর। মুমতাহিণার খুবলে খাওয়া অর্ধপঁচা নষ্ট শরীর...

জয় আরাম করে একটা চুরুট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। মুখে রক্ত লেপ্টানো। কবীর পলাশকে তুলে চেয়ারে বসিয়ে বাঁধে। বেশ শক্তিশালীই লাগছিল তখন পলাশকে। হাসছে, দূর্বল চিত্তে ওমন বিশ্রী হাসি অদ্ভুত দেখায়।

অন্তূ তাকায় জয়ের দিকে। জয় স্থির চোখে ইশারা করে পলাশের দিকে, এগিয়ে যেতে বলে। তাতে কীসের যেন প্রশ্রয়, বহুদিনের পরিকল্পনা বোধহয়, অন্তূর জন্য এক উপহার নাকি? ঠিক যেমন বাচ্চার জন্মদিনে অভিভাবক দিয়ে থাকে, জয় সেভাবেই ইশারা করল উপহারের বাক্সের দিকে।

অন্তূ বিক্ষিপ্ত ভারী শ্বাস ফেলে। নাক শিউরে ওঠে তার, গলার ভেতরে দলা পাকায়। অন্তূ এগিয়ে যাবার সময় জয় একহাতে সিগারেট ঠোঁটের ভাজে ধরে অন্যহাত দিয়ে অন্তূকে সেই কুড়ালটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "জানটা আমার জন্য রেখো।"অন্তূ এগিয়ে গিয়ে পিছিয়ে এলো। শরীর কাঁপছে তার। হাতে বল নেই। তার হাত এখনও বুঝি মানুষ খুন করার মতো অথবা পৈশাচিক যন্ত্রণা দেবার মতো শক্ত হয়নি! অন্তূ হতাশ হয়, তার হাতে এখনও নমনীয়তা অবশিষ্ট। ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে পিছিয়ে এসে জয়ের হাতে কুড়াল ফিরিয়ে দেয়।

জয় হাসল। সে জানতো এমনটা হবে। নয়ত কেউ কুড়াল হাতে তুলে দিয়ে শিকারের জান রক্ষার আশা করতে পারে? শেষ একটান দিয়ে গোটা অর্ধেক চুরুটটাই ফেলে দিলো। চোখে-মুখে লেগে থাকা রক্ত তখন জমাট ধরেছে। কবীর একটা বাক্স নিয়ে এলো। তাতে হাতুর, বাটাল, ছেনি, র‍্যান্স, স্ক্রু ড্রাইভার ইত্যাদি সব যন্ত্র মজুত।

পলাশের দুই হাতের পেরেকের আঘাতের জায়গাগুলো পঁচে-গলে পড়ার মতো থকথকে। হাত দুটো যেন আগুনের আঁচে বেশ যত্ন করে ঝলসানো হয়েছে, অবর্ণনীয় সাঁজা।সেই হাতদুটোকে জয় ইস্পাতের বীমের ওপর

রাখে। মানুষের হাতের প্রতিটা আঙুলে তিনটা করে হাড়ের সন্ধি থাকে। জয়ের লোহা পেটানো হাত। হাতুর দিয়ে লোহা পিটিয়ে সোজা করার মতো পিটিয়ে পিটিয়ে পলাশের হাতের একেকটা গিড়া ছুটালো। কী যে আর্তনাদ আর চিৎকার সেসব। রূপকথা ছুটে এলো। দরজার কাছে দাঁড়াল। ওকে দেখে পলাশ কয়েক মুহুর্তের জন্য চুপ হয়ে যায়। জয় যখন আরেকটা আঙুলের সন্ধিতে আঘাত হানে, আবার সেই চিৎকার! রূপকথা এবার চলে গেল, একবার পেছন ফিরে তাকালো, আবার চলে গেল। পলাশ তাকিয়ে দেখল তা।

দুই হাতের ত্রিশটা অস্থি-সন্ধি, তালুর সাথেকার আঙুলের সন্ধি, শেষ অবধি কব্জিসন্ধিটা। খুব যত্ন করে সেগুলো ভাঙল জয়। হাতদুটো লুলা হলো পলাশের। শুধু চামড়ার সাথে ঝুলে রইল। কোথাও কোথাও ফেটে রক্ত বেরিয়ে এলো। জয়ের হাত ঢেকে গেল সেই নতুন তরল রক্তে। জয়ের মনে হলো, এই রক্তটুকু বোধহয় তরুর রক্তের ওপর পড়লে তরুর রক্তের স্রোত থামতো, ধুয়ে যেত সবটা।পলাশের চিৎকারে কবীর হাতে কান চাপে। ওমন পৈশাচিক যন্ত্রণাকাতর চিৎকার সহ্য করা যায়না। মনে হচ্ছে, নরকের দূত যেন কোনো পাপীকে তার

কর্মফল দিচ্ছে, এত্ত ভয়াবহ কাতর চিৎকারে মানসিক অবস্থা বিগড়ে যায় মানুষের। অন্তূর এলোমেলো শ্বাস উঠেছিল। পলাশ চিৎকার করছিল। অথচ অন্তূ শুনল, আমজাদ সাহেবকে পলাশ মারছে, সিগারেটের আগুন চেপে ধরে কান ঝলসাচ্ছে, আমজাদ সাহেব আর্তনাদ করছেন, কেউ নেই বাঁচানোর সেই আওয়াজগুলো অন্তূ শুনতে পাচ্ছিল।এক সময় মস্তিষ্কের উন্মদনা আর সইতে না পেরে জোরে করে চেঁচিয়ে উঠল অন্তূ কানে হাত চেপে। পাগলের মতো হাত-পা ছুঁড়ে ছটফট করল। জয় হাতুর ফেলে দৌড়ে উঠে আসে। আগলে ধরে অন্তূকে, শান্ত করার চেষ্টা করে। অন্তূ

চোখ-মুখ খিঁচে বুজে হাউমাউ করে কাঁদছে, ‘আব্বু আব্বু’ করে ডাকছে, যেমনটা বাচ্চারা ঘুম ভেঙে মাকে ডাকে। জয় অস্থির হয়ে উঠল, সামলানো যাচ্ছিল না অন্তূকে। পলাশ জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায়। কবীরের মনে হলো, পলাশের চিৎকার তার ভালোই লাগছিল এতক্ষণ, কিন্তু বুক ফাটা কান্নাটা অন্তূ কাঁদছে। কবীর টের পায় তার চোখ ভরে উঠেছে। এত করুণ শোনায় কোনো মেয়ের কণ্ঠে বাপের নাম ধরা কান্না!

জয় নিজের রক্তমাখা হাতদুটো অন্তূর গালে রেখে ছোট বাচ্চা বোঝানোর মতো বলে, “ঘরওয়ালি, তাকাও। শোনো, আমি আছি।

কিচ্ছু হয়নি। আমার বাপ-মা কোনোদিনই নাই। আমার কেউ নেই। মরে গেছি আমি? ওসব বালের ঝামেলা না থাকলেই ভালো, বিন্দাস লাইফ। চুপ করো। তোমার কাছে আমি আছি আপাতত। শোনো, আরমিণ! ঘরওয়ালি...''

অন্তূ আরও বেসামাল হয়ে ওঠে, পলাশের দিকে ইশারা করে, "ও আমার আব্বুকে মেরেছিল, আপনি সেদিন কিচ্ছু. ...

কথা শেষ হয়না, রক্তমাখা ঠোঁট এগিয়ে নিয়ে গিয়ে শক্ত করে একটা চুমু খায় জয় অন্তূর ঠোঁটে। ঠোঁট সরাতেই অন্তূ আবার ছটফটিয়ে ওঠে, "আপনি ছিলেন ওখানে, তবু কিচ্ছু

করেননি, আমার কেউ নেই, সুযোগ আসলে আমি আপনাকে....''জয় এবারও কথা শেষ করতে দেয়না। অন্তূর চোয়ালদুটো দু-হাতে চেপে ধরে আবার ঠোঁট দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে থামায়। এবার আরও গাঢ় ছিল সেটা। জয়ের ঠোঁটের জমাট রক্ত অন্তূর ঠোঁটে লাগে। অন্তূর ছটফটানিতে ওড়না পড়ে যাচ্ছিল কাঁধ থেকে। অন্তূ কাতরাতে কাতরাতে ডুকরে কেঁদে ওঠে পাগলের মতো, "আপনাকে আমি ক্ষমা করব না। সবাই যেভাবে শেষ হচ্ছে, আপনিও হবেন, ওদের থেকে আলাদা নন আপনি... ''জয় রক্তমাখা হাতে অন্তূর ওড়না তুলে কাধে জড়িয়ে দিয়ে আঁকড়ে ধরল অন্তূকে ঠোঁট

দিয়ে। জয়ের উন্মাদনায় অন্তূ পিছিয়ে যায় কয়েক কদম। উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে ছারখার দুজন তখন। অঝোরে কাঁদছে অন্তূর চোখদুটো। জয় ছাড়ল না আর তৃতীয়বার। তার চটা ভ্রুতে রক্ত, মুখের সিংহভাগ রক্তে জর্জরিত। সেই অবস্থায় অন্তূকে তৃতীয়বারে এতটা শক্ত করে চেপে ধরে চুমু খেল, অন্তূর দেহটা আড়াল হয়ে গেল জয়ের শরীরের বাঁধনে। চোখদুটো খিঁচে বুজে রইল। পানি খাওয়ার মতো অন্তূর দুঃখটুকু শোষন করল জয়। টপটপ করে পানিগুলো অন্তূর গাল বেয়ে পড়ছিল, জয় তার তোয়াক্কা না করে গিলল সবটা। বারবার দুইগালে হাত বুলায় জয়। অন্তূ থামছে না।

কান্নার তোড় বাঁধ ভাঙা, উপচে পড়া বিক্ষিপ্ত স্রোতের মতো। সেই উন্মাদ স্রোতের বাহ্যিক কঠিন, আর অভ্যন্তরীণ দুর্বোধ্য এক বাঁধ তখন জয় আমির।

কবীর মলিন হাসে। তার কাছে দৃশ্যটা সেদিন রোমান্টিক লাগেনি। মনে হয়েছে, এ এক মহাবিচ্ছেদের ক্ষণ বুঝি! কী আশ্চর্য! এটাকে কেউ মহাবিচ্ছেদ বলতে পারে বুঝি!যেখানে জয় আমিরের মতো এক জন্মগত ছিন্নভিন্ন প্রলয়ঙ্কর ঢেউ, তার নিজস্ব প্রবাহে ছুটে গিয়ে কোনো বিক্ষিপ্ত নদীকে আলিঙ্গন করছে, তার অতল গহ্বরে একবার ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে নিজের তলহীন তলদেশ দেখিয়ে বলছে,

‘আমি এক চির শূণ্যতর কৃষ্ণগহ্বর, তার গভীরতা অসীম, সেই অসীমতায় তোর দুঃখ কেন আরমিণ, গোটা বিশ্ববক্ষ্মাণ্ডকে তলিয়ে নিতে পারি।’

অন্তূ সেদিন এক সময় এলোমেলো হয়েছিল। শক্ত হাতে বাঁধা দেওয়া হাতদুটো নরম করে গুটিয়ে জয় আমিরের রক্ত মাখা শার্টটা আঁকড়ে ধরে হু হু করে কেঁদেছিল। বলেছিল, “আমি আপনাকে কোনোদিন ক্ষমা করব না, জয় আমির। যেমন ওরা পায়নি শেষ অবধি, আপনিও প্রকৃতির কাছে ক্ষমা পাবেন না অন্তত।”

জয় পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। কেউ কাউকে জড়িয়ে ধরেনি সেদিন। জড়িয়ে নেবার সম্পর্ক তো নয় তাদের। অন্তূ হিংস্র হাতে জয়ের শার্ট খামছে ধরে বুকের ওপর কপাল ঠেকিয়েছিল। রক্তমাখা জয় আমির তখন বেসমেন্টের নষ্ট ব্যাটারীহীন ঘড়ির দিকে চেয়ে ছিল অপলক।

পরাগ জয়কে মারতে এলো। দৃশ্যটা দেখে আলতো হাসল। কবীর তার দিকে তাকিয়ে হাসল, এরপর বেরিয়ে গেল বেসমেন্ট থেকে। জয়ের ফোন বাজছিল বিগত পাঁচ মিনিট ধরে। কবীর ফোন এনে দিলো। অন্তূর পাশে বসে একগ্লাস পানি দিয়ে বলল, "ভাবী, পানি

খান। অল্প একটু খান। আপনার শরীর তো ভালো না এমনিই।”

কল রিসিভ করতেই হামজার দারাজ গলা ভেসে এলো, “এই শুয়োরের বাচ্চা। কোথায় মদ গিলে পড়ে আছিস? হুশ থাকেনা?”জয় গম্ভীর হয়ে বলল, “এমনও তো হতে পারে, হানিমুন যাপন করছিলাম। জোয়ান ভাই বউ নিয়ে ঘুরতে এসেছে, আক্কেল নাই তোমার?”

হামজা এই রসিকতায় আরও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল, “জানোয়ারের বাচ্চা, তোর আব্বারা দেখ মনেহয় এতক্ষণে পৌঁছে গেছে গাঙের কূলে।”

শুধু রূপকথা থাকল সেখানে। সবাই বেরিয়ে পড়ল উল্টো পথ ধরে। পলাশকে পেছনের

ছিটে শুইয়ে দেয়া হলো। পরাগ অন্য পথে গেল। জয় অন্তূ, কবীর ও পলাশ এক গাড়িতে গেল।

গাঙের কূলের রাস্তায় কোথাও কোথাও হাঁটু পানি। শ্মশানের পাড় ঘেঁষে পরিত্যক্ত এলাকা। এরপর শুধু ইটের ভাটা, মেল-কারাখানা এসব। রাত দশটাকে মনে হচ্ছে মাঝরাত। জনশূন্য পথঘাট। ধীরেধীরে ওরা আরও ভয়বহ এলাকার দিকে পাড়ি দিচ্ছিল। কাঠের মিল অনেকগুলো এবার। আলোও কম সব ওদিকে। ঘন জঙ্গল, ও বিস্তর মাঠ। শনশনে মাঠ। অভিশপ্ত এক রাত। কবীরকে গাড়ি চালাতে দিয়ে পলাশকে জাগাতে চেষ্টা

করল জয়।গাড়ি এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে কোনো আশ্রয় খুঁজতে গেল জয়। এভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলে বড়জোর আধাঘন্টার মধ্যে পুলিশের হাতে পড়তে হবে নির্ঘাত। কোনো বসতিতে ঢুকে পড়ার চেয়ে ভালো কাজ নেই এই মুহুর্তে।

সব মিল মালিকেরা দূরবর্তী। চৌকিদাররা পাহারায় আছে। পাহারা বাদ দিয়ে ঝোপে-ঝাড়ে গাঁজা টানতে বসেছে সব। এখানে বসতি নেই। বহুদূর পর পর বসত বাড়ির মতো। জয় কয়েকটা বাড়িতে গেল, কিন্তু ডাকতে দ্বিধা হলো। তার ওপর তার পরনের শার্ট-লুঙ্গি, মুখ-গলা রক্তে মাখামাখি। পিস্তল

দেখিয়ে আশ্রয় আদায় করা ছাড়া উপায় নেই। পিস্তল বের করে তা মিছেমিছি লোড করল। বুলেট নেই কাছে। ম্যাগাজিনও খালি।কিছুটা প্রস্তুতি নিয়ে একটা ছোট্ট টিনের বাড়ির সামনে গিয়ে ডাকল। একজন মহিলা বেরিয়ে এলো। অন্ধকারে কেউ কারও মুখ চিনছিল না। মহিলা ভেতরে আলো আনতে গেল বোধহয়। জয় হাত পিছমোড়া করে দাঁড়িয়ে পিস্তলটা ডানহাতে রাখল। তার যা অবস্থা, তা দেখে যেকোনো মহিলা ভয়ে একটা কান ফাটানো চিৎকার পাড়বেই পাড়বে।মুরসালীন ও হামজা দুজনেই অনেকক্ষণ কথা বলেনি সেদিন। বাচ্চারা জেগে উঠেছিল। ভয়ে ভয়ে

এসে পানি খাচ্ছে কেউ কেউ। খুব পিপাসা তাদের। একটু মুক্তির পিপাসা, মায়ের কোলে ফেরার পিপাসা, দুনিয়ার আলো দেখার পিপাসা! এত পিপাসা থাকা ঠিক না। তবু ওরা পিপাসার্ত।

হামজা বলল, "দলের বহুত লোক জিম্মি তোমাদের কাছে। তাদের হদিশ দাও।"

মুরসালীন চুপ। হামজা নিজেকে দমন করল। যথাসম্ভব শান্ত স্বরে বলল, "একই কথা বলতে বলতে আমি ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছি, তুমি হচ্ছো না শুনে শুনে!"

-"ফজরের আজান পড়ছে। নামাজ পড়ব।"

হামজা বেরিয়ে এসেছিল।ওদের হাত-পা বাঁধা নয়। কিন্তু সবাই আঘাতপ্রাপ্ত, ক্ষত-বিক্ষত। না হলেও ওই অবরুদ্ধ কুঠুরি ছেড়ে বেরোবার উপায় নেই। ওযু করে মুরসালীনের ইমামতিতে এক বদ্ধ দেয়ালের বেষ্টনিতে ফজরের নামাজ আদায় করল সকলে। নামাজ শেষে অনেকক্ষণ মোনাজাতে হাতে তুলে বসে রইল মুরসালীন।

ওকে বোঝা যায়না। গায়ে পাঞ্জাবী বা জুব্বা চড়ায় না। পরে জিন্স প্যান্ট, গালে সুন্নতি দাড়ি নেই, নেই কোনো ইসলামী লেবাস। দেখতে উচু-লম্বা আর্মিদের মতো। শুধু নামাজটা পড়ে। কথাবার্তা স্পষ্ট। বংশ

পরম্পরায় এইটুকু ধর্মীয় আচার পেয়েছে বোধহয়, অথবা অন্যকিছু! জাতীয়তাবাদী দলের নেতাকর্মী আর জামায়াত একই জলীয় দ্রবণের মিশ্রণ তো!সেইরাতে মহিলা যখন হারিকেন নিয়ে এসে দাঁড়াল, জয় দ্রুত সতর্ক করল, "চিৎকার করবেন না। আমি সাহায্য চাইতে এসেছি।"

এরপর দুজনই চুপ। অবাক হয়ে দেখল দুজন দুজনকে। লতিফের স্ত্রী আসমা। মহিলা আতঙ্কে জড়িয়ে গেল। জয় ওদেরকে দেশের শেষ সীমান্তে চলে যেতে বলেছিল, নয়ত দেখা হলেই মেরে ফেলবে। ওরা জয়ের থেকে

আত্মগোপন করেছে, কিন্তু জেলা ছাড়েনি। আজ কি খোঁজ পেয়ে জয় এসেছে!

জয় হাসল, “কথা রাখেননি, ভাবী। ভেরি ব্যাড।”

আসমা কথা বলতে পারেনা। জয় বলল, “দরজা খোলা রাখুন।”সে গাড়িটাকে নিয়ে এসে টিনের ফটক খুলে উঠোনে ঢুকিয়ে রাখল। উঠোনটা ছোট। লতিফ ঘামছে। এখনও ক্রাচে ভর করেও ঠিকমতো হাঁটতে পারে না। সমস্ত সম্পত্তির প্রায়টাই পায়ের চিকিৎসায় খরচা হয়ে গেছে।

কবীর ও জয় মিলে পলাশকে নামিয়ে বারান্দায় রাখল। মাটির ঘর, পাঠখড়ির বেড়া। পাশে টিনের কাঠের মিল।

জয় জিজ্ঞেস করল, "লতিফ ভাই, উডমিল কি আপনার নাকি?"

লতিফের শরীরটা কাঁপছে। সে কোনোমতো ঘাঁড় নাড়ল। জয় বলল, "আপনার একটা ক্ষমার পথ আছে। মানে আমি কাউকে ফার্স্ট টাইম সেকেন্ড চান্স দেব।"

আসমা পলাশের অবস্থা দেখে বমি করে ফেলল। এত বিদঘুটে জীবিত লা/শ সে দেখেনি আগে। দ্রুত ঘরে চলে গেল। সঙ্গে

অন্তূকে নিয়ে গেল টেনে। জয় আমিরের স্ত্রী বলে কথা।

জয় বাড়ির সমস্ত আলো নিভিয়ে একদম স্বাভাবিক ও নীরব থাকার আদেশ দিলো সবাইকে। আপাতত আগামী তিন-চার ঘন্টা চুপ থাকতে হবে। পুলিশ রাস্তা দিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এই বিরান জায়গায় অথবা কোনো বসতিতেই সার্চ করে দেখবে না। প্রশ্নই ওঠেনা।আসমা কিচ্ছু শুনল না। সকলের জন্য রান্না করতে গেল। অন্তূ গিয়ে বসল তার পাশে। বিভিন্ন কথাবার্তা হচ্ছিল। রান্নাঘরটা ভেতরে। অন্তূ সাহায্য করছিল। তার আসমাকে ভালো লাগছে। আসমারও

তাকে চরম পছন্দ হয়েছে। অন্তূর ভেতরে শঙ্কা কাটছিল না, তবু সে স্বাভাবিক থাকতে চাইল। আজকাল এসব আর গায়ে লাগেনা। জয় রাত আড়াইটার দিকে গোসল করে লতিফের একটা লুঙ্গি পরল। কবীর রাস্তার পাশে পেশাব করার ভঙ্গি করে আশপাশ দেখে এলো। কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। জয়ের উপস্থিত বুদ্ধিতে তার বুক গর্বে ফুলে উঠলো। কারণ সে জয়ের মতো চতুর লোকের বিশ্বাসভাজন লোক। পুলিশ কল্পনাও করতে পারবে না, ওরা এত কাছে এমন এক বাড়িতে উঠে আরাম করছে। পুলিশ হোক বা

সাধারণ লোকও সবসময় এসব ক্ষেত্রে দূরবর্তী চিন্তা করে।

লতিফের মেয়ে জেগে উঠে জয়কে চিনতে সময় নিলো। সে হাসপাতালের সেই ক্ষণ ভোলেনি। জয়কে বলল, "এই তুমি আমাকে একটা মদার গেলা দেখাতে চাইছিলে না? এখন দেখাও?"জয় বলল, "তোমার আব্বু বোধহয় সেই খেলাটা পছন্দ করবে না, আম্মা।"

-"কেন করবে না? আব্বু আমাকে খেলতে দেয়। কিতু বলে না। দেখাও।"

জয় লতিফকে বলল, "ভাই, মেয়ে পিস্তলের খেলা দেখতে চায়। বাপ হিসেবে প্রাণটা

উৎসর্গ করতেই পারেন। বাচ্চা মানুষের আবদার ফেলা ঠিক না।''

তারপরই মনে পড়ল, তার কাছে এক্সট্রা বুলেট নেই, ম্যাগাজিন খালি। কিন্তু এই দূর্বলতা তো প্রকাশ করা যাবেনা। পিস্তল হতে পারে মানুষের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও কার্যকর সঙ্গী, হোক তার ভেতর ফাঁপা। দেখলেই লোক ডরায়।

রাত সাড়ে তিনটার পর পলাশকে কাঠের মিলে নেয়া হলো। পলাশের শ্বাস পড়ছে ধীরে ধীরে। লতিফ ঠকঠক করে কাঁপছে। তার চোখে-মুখে নিদারুণ আতঙ্ক। জয় যা করতে চাইছে, তা সুস্থ মানুষ দেখতে পারেনা।

সেদিন শেষরাতের দিকে লতিফের কাঠের মিলের উডওয়ার্কিং সারফেস মেশিন চালু করা হলো। যা দিয়ে শত শত বছরের হাতির মতো মোটা মোটা গাছ এক নিমেষে ফালা ফালা করে ফেলা হয়।

পলাশকে সেই মেশিনের ওপর শোয়ানো হলো। হাত-পা বাঁধা। জয় অপেক্ষা করল ওর চোখে-মুখে মৃ/ত্যু/র করুণ সেই অসহায় ভয়টা ফুটে ওঠার। পলাশ তো পাগল। তবু বোধহয় মৃত্যু বিষয়টাই এমন, যাকে-তাকে গ্রাস করে তার অন্ধকার গর্ভে।পলাশের চোখের সেই কাতরানি জয়কে খুব শান্তি দিচ্ছিল।পলাশের দেহটা আস্তে আস্তে এগিয়ে

যাচ্ছিল চলন্ত ব্লেডের দিকে। চিইচিইই শব্দ হচ্ছে। কবীর ও লতিফ বেরিয়ে গেল।

সারা মেঝেতে ত্রিপল বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। রক্ত আঁটকে থাকতে পারে এমন সব যন্ত্র সরিয়ে নেয়া হলো।

পলাশ সেই চলন্ত উডকাটার ব্লেডের দিকে চেয়ে দেখল। সাথ সাথে চোখটা বন্ধ করল। হাতদুটো থেতলানো কিমা। হাড়ের সন্ধি নেই। ঝুলছে। সেই যন্ত্রণা ভুলে গেল সে। তার বাঁচতে ইচ্ছে করছে না। তবে অদ্ভুত এক ভয় গ্রাস করেছে। তার এত ক্ষমতা, এত বড়াই! পলাশ নামে মানুষ থরথরিয়ে উঠেছে, এই তো ক'দিন আগের কথা।

সে মানুষের বসত জমি, ব্যবসার পয়সা, বউ, সন্তান, মেয়ে, দেশের সম্পদ কিছুই ছাড়েনি। মানুষ এভাবেই কাতরেছে। কত লোকই যে এই জীবনে তার নোংরা পা দুটো জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদেছে। কেউ প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছে। কেউ বা বলেছে, ‘আর মারবেন না। আর মারবেন না। ওরে আল্লাহ!’

পলাশ সেই সব আহাজারি শুনতে পাচ্ছিল। রূপকথার চিৎকারও কানে এলো। কী আশ্চর্য! কত মেয়ে হাতজোর করে সম্মান প্রার্থনা করেছে, তার খারাপ লাগেনি। মানুষ ভাতের চাল কেনার পয়সাটুকুও তার হাতে সঁপে দিয়েছে জানের ভয়ে। তারপর নিশ্চয়ই না

খেয়ে থেকেছে! সামান্য মুদির দোকানিকেও যে ছাড়েনি পলাশ! মৃত্যুর ভয় এত তাদের? বোকা ওর। ওরা কি জানে, ওদের চেয়ে পলাশেরা কত কঠিন শাস্তির ভোগ করে বিদায় হয়! তা জানলে ওরা ভয় পেত কি? সবচেয়ে বড় আশ্চর্য হলো পলাশ, সে সেইসব লোকের হাতে মরছে না। না, তারা তাকে শাস্তি দিচ্ছে না। আজব ব্যাপার! তার কাল আজ জয়। জয় আমির। যার নিজের পাপেরই অন্ত নেই। আর সে আবার শাস্তিকে ভয় পায়না।

প্রথমে পলাশের কোমড় সমান দুইভাগ হয়ে গেল। একভাগ দুটো পা ও কোমড়, অপর

ভাগ পেট থেকে মাথা। গোসল করে বিশেষ লাভ হলো না। ফোয়ার মতো রক্ত ছুটছে চারদিকে। জয়ের গোটা দেহ ভিজে উঠল পলাশের র-ক্তে।

উপরের ধড়টাকে ঘুরিয়ে মেশিনের ব্লেডের নিচে দিলো। ছোট ছোট টুকরো হলে বহন করতে সুবিধা হবে। তার শুধু মাথা চাই। বাকিটা অপ্রয়োজনীয়।

দুটো হাত ও মাথা সহ মোট চার টুকরো হলো। বাকি টুকরো গুলো বিশাল এক পলিথিনে ভরে তারপর ছালার বস্তায় ভরল। মাথাটা আলাদা করে আরেক বস্তায় ভরে লতিফকে ডাকল।

হামজাকে কল করল। লোক দরকার। এরকম ভয়ানক কাজ কারা করতে পারবে, তাদের যেন পাঠায়। চর্বি, রক্ত, মাংসের টুকরো, শরীরের কত রকমের কী রক্তের সাথে মিশে মেশিনে পড়ে আছে। মেশিনটা খুলে ফেলে দিতে হবে। ত্রিপল উঠিয়ে ফেলল, গোটা ঘর পরিস্কার। ত্রিপলটাও ভাঁটার পুকুরে ধুয়ে আনলো কবীর। অন্ধকার থাকতে থাকতে সব করলে ভালো।তা বোধহয় হবেনা। হামজা এখন লোক পাঠাবে না। সেটা ঝুঁকিপূর্ণ। পরদিন সকালে নিজেই বেরিয়ে গিয়ে কোত্থেকে যেন বড় বড় ইলিশ কিনে আনলো জয়। ইলিশ মাছে তার জন্মের দূর্বলতা। লেজ

ভর্তা, ইলিশ মাছ ভাজা, সেটাকে জ্বালিয়ে খাওয়া অথবা যেকোনো পদে তার ‘না’ নেই। ইলিশ মাছ খেতে খেতে তার নিজেকে খাঁটি বাঙালি মনে হয়।

খাওয়া দাওয়া করে অন্তু কবীরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল জয়। বাকিটা হামজা সামলাবে। কবীরকে দিয়ে একটা ভালো এমাউন্ট লতিফকে দিলেই সে খুশি। রাজনীতি ছেড়েছে দায়ে পড়ে, ভেতরের সেই ছোটলোকি তো যায়নি!

গাড়ি উল্টোদিক থেকে ঘুরিয়ে দ্রুত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করল। যখন-তখন পুলিশ বাড়িতে হানা দেবে তাদের। সন্দেহের

তালিকার সবচেয়ে আগে হামজা পাটোয়ারী ও জয় আমিরের নাম থাকবে। স্বাভাবিক। বাড়িতে এসে না পেলেই আইনের লোক দুই দুইয়ে চার মিলিয়ে নেবে।

ড্রাইভিং করতে করতে জয় গান ধরল,

আমি যত চাই আমার মনরে বোঝাইতে...

মন আমার চায় রঙের ঘোড়া দৌড়াইতে

ও পাগল মনরে, মন কেন এত কথা বলে.....

লতিফের লুঙ্গি প্রিন্টের। তার বিরক্ত লাগছিল। লুঙ্গি হবে সাদা। এসব প্রিন্ট কেন?কাস্টডিতে বসে রূপকথার ভীষণ গরম লাগছিল। মাথার ওপরে স্পটলাইট জ্বলছে। তাতে অস্বস্তি

বাড়ছিল। খানিক বাদে দুজন কর্মকর্তা এলো। পানির গ্লাস এগিয়ে দিলো।

রূপকথার পিপাসা নেই। সে কক্ষের চেয়ারের টেবিলের মতো নির্লিপ্ত। অফিসার জহিরুল আলমগীর জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার স্বামী এখন কোথায়?"

-"আমি জানিনা।"

-"খুব কমন একটা জবাব। কানে পঁচন ধরেছে এই শব্দ দুটো শুনে শুনে। নতুন কিছু বলুন।"

রূপকথা বলল, "'আমি জানিনা' কথাটিকে নতুন আর কীভাবে বলা যায়, সেটা জানা

নেই। জানা থাকলেও আপাতত মাথায় আসছে না।’’

-“খুব পেরেশানীর মধ্যে আছেন?’’

-“জি না। পেরেশানী কী? ভালোই তো লাগছে।’’

-“ভালোই লাগছে?’’

-“লাগছে।’’

-“লাগবে না বেশিক্ষণ। আর কিছুক্ষণ ‘জানিনা’ বলতে থাকলে খারাপ লাগার কাছে নিয়ে যাব।’’

রুপকথা চুপচাপ। জহিরুল বলল, “পানিটা খেয়ে নিন। ভালো লাগবে।’’

-“আমার খারাপ লাগছে না।”কিছুক্ষণ ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে রইল জহিরুল। খানিক বাদে কক্ষে আরও কয়েকজন কর্মকর্তা এলেন। সাথে একজন মহিলা কনস্টেবলও। রূপকথার নির্বিকার, দুর্বোধ্য মুখখানাও সুন্দর। শাড়ির আচলটা চেয়ার ছেড়ে মেঝেতে লুটোপুটি খাচ্ছে।

-“আমাদের কাছে খবর আছে, কুখ্যাত স-ন্ত্রা-সী পলাশ আজগর নিজের তৃতীয় আবাসে আমাদের দুটো অফিসারকে খু/ন করে পালিয়েছে, এরপর গাঙের পাড়ের বাড়িতে গিয়ে উঠেছিল। আর সেখানে আপনি আগে থেকেই ছিলেন।”

-“জি, খবরটা ঠিক।”

-“আর আপনি বলছেন, আপনি জানেন না? আমরা কি বোকামির ফাণ্ড খুলে বসে আছি? ভালো কথায় জীবনেও আপনারা মুখ খোলেন না। তখন ক্যালানি দিতে হয়, আর লোকে বদনাম করে ডিপার্টমেন্টের। আপনি ওখানে উপস্থিত ছিলেন, আর আপনি জানেন না? ”-“হ্যাঁ। যতক্ষণ সে ওই বাড়িতে ছিল, ততক্ষণ জানতাম। এরপর ও বাড়ি থেকে যখন পালালো, তখন তো আমাকে বলে যায়নি, সঙ্গে নিয়েও যায়নি। আপনারা আমাকে ওই বাড়িতে একা পেয়েছিলেন।”

-“একা পাইনি, ম্যাডাম। আশপাশ থেকে কয়েকটা ছোঁকরাদেরও সাসপেক্ট করা হয়েছে। তাদের পরেই ধরি। আগে আপনারা জন্মের বাটপারি করে নেন।”

-“বাড়িতে আমি ছিলাম। ছোঁকরাদের হিসেব আমার সাথে নেই, অফিসার।”

-“তা ছিলেন। তার মানে এই নয় যে, আপনাকে বলে যায়নি।ঘরের বউকে বলে যায়নি।”

রূপকথা হাসল। অবর্ণনীয় হাসির রেখা। উপস্থিত কর্মকর্তারা একে অপরের দিকে তাকাল রূপকথার সেই হাসিতে।

-"পলাশ আজগর এত বড় কুখ্যাত সন্ত্রাসী, তার মাথা খারাপ তো থাকার কথা না। সে এটুকু নিশ্চয়ই জানে, যত আপনই হোক, পুলিশের মার খেলে সবাই সত্যি কথা গড়গড় করে বলে দেয়। আমাকে বলার হলে আমাকে সঙ্গেও নিতো।"সকলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। জহিরুল খুব তীক্ষ্ণ সন্দেহীন চোখে চেয়ে বলল, "আপনি খুব শেয়ানা মহিলা। যুক্তির মারপ্যাচে পুলিশকে ঘোল খাওয়াতে চাচ্ছেন, অ্যা?"

খুব উগ্র হয়ে উঠল অফিসার। রূপকথা চুপচাপ। জহিরুল ছোট দুটো অফিসারকে আদেশ করল, "রিমুভ হার টু রিমান্ড।"

রূপকথা নির্দ্বিধায় চুপচাপ সাথে চলল। তার চলনে উদ্বেগ নেই, ভয় নেই, চিন্তা নেই। মুখে কঠোর নির্লিপ্ততা। চোখদুটো ভীষণ জ্বলছে। জীবনের গড়মিলে হিসেবগুলো সামনে আসছে, মাথাটা ফাঁকা ফাঁকা।

-"রূপ!"

রূপকথা তাকাল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

পরাগ হাসল সামান্য, "ভালো আছিস?"

পরাগের হাতে ব্যান্ডেজের ওপর হাতকড়ার পরানো হয়েছে। রূপকথাও হাসল, "ভালোই তো।"

দুজনকে দুইদিকে নিয়ে চলে গেল কর্মকর্তারা। পরাগ একবার পেছন ফিরে

রূপকথার নিঃশব্দ চলন দেখল। শাড়ির আঁচল মেঝের ওপর ছেঁচড়ে যাচ্ছে। ধীর পায়ে হাটিহাটি এগিয়ে যাচ্ছে রূপকথা। সে রাজন আজগরকে কত নিষেধ করেছিল, রূপকে পলাশের ঘরে বিয়ে না দিতে।জয়দের আসনের এমপি সাহেবের ভাগনি বাপ্পী মণ্ডল। বিরাট নেতা। সে এলো বড়ঘরে। হামজা বিরক্ত হয়ে গেছে। হামজার বিরক্তি মানে আস্তে করে খালাস করে দেয়া। কখন জানি মেরে-টেরে ফেলে। কিন্তু হুট করে মেরে ফেললে স্বীকারক্তি কে দেবে?

হামজা জিজ্ঞেস করে, “তুমি হেফাজতে ইসলামীর সমর্থক, মুরসালীন?

-“আমি কিছুতেই খাঁটি নই, ভাই। আমি শুধু আপনাদের সমর্থক নই। আর এটা খাঁটি।”

হামজা হাসল, “২০১৩ এর সেই রাজধানীর আন্দোলনে ছিলে না তুমি?”

-“আমি ছিলাম না, মুস্তাকিন ভাই ছিল। জানেন তো, মুস্তাকিন ভাই হাফেজে কোরআন, আর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল। আমি তো বেদুইন। আমি ওসব আন্দোলনে থাকব কেন?”

-“আজ যা করছো, সেটা কী?”

-“ওহ! এই বাচ্চাদের জন্য? কী করছি?”

-“অনেককিছুই তো করছো।” ক্লান্ত স্বরে বলল হামজা।

-"করলেও সেটা ওরা কওমী মাদ্রাসার ছাত্র অথবা জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত বলে নয়। ওদের জায়গায় যেকোনো বাচ্চারা থাকলেও আমার ব্যবহারে পরিবর্তন হতো না। তাছাড়া ওরা কোনো দলের সাথে সংযুক্ত নয়, অন্তত এই বয়সে। কেউ সাবালক নয় এখানকার। আপনারা জুলুম করছেন।"-"কী করছি?" মুরসালীন চুপ রইল। বাপ্পী মুখ খুলল, "জুলুম এখনও করিনি, মুরসালীন। করব। বিরোধী দলের একটিভ নেতাকর্মী তুমি।"

-"তাতে কী? রাজনীতিতে কি বিরোধী দল থাকবে না? নাকি আপনারা একচ্ছত্র অধিপতিত্ব চান?"

-“না, তা চাই না।”

-“তাহলে তো হলোই।”

-“তোমরা জঙ্গিবাদদের সাথে হাত মিলাইছো।
”

-“সে তো আপনারাও কত দলের সাথে মহাজোট করে ক্ষমতায় এসেছেন। আর এবার নির্বাচন ছাড়াই। এটাকে কীভাবে দেখেন?”

বাপ্পীর মুখ লাল হয়ে উঠল। কষে এক ঘুষি মারল মুরসালীনের মুখে। ফাঁটা ঠোঁটে শুকনো ক্ষত তাজা হয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো।

মুরসালীন আলতো হাসে, সত্যি কথা নিতে পারেন না, এটা আপনাদের দলের সবচেয়ে

বড় সংক্রামক ব্যাধি। সত্যি কথা কইতে গেলেই কারাবাস, খু/ন, গুম, মিথ্যা মামলায় ক্ষমতাচ্যুতি! খারাপই লাগে আপনাদের অবস্থা দেখলে।''আর কে ঠেকায়। বৃষ্টির মতো মার পড়ল মুরসালীনের গালে। তখন মুরসালীনের হাত-পা বাঁধা। রক্তাক্ত হয়ে উঠল গোটা মুখটা। দাঁত নড়ে গিয়ে মাড়ি থেকে রক্ত পড়ছে। হামজা থামালো, "পাগলামি করিস না, বাপ্পী। কিছুই হবেনা এতে। বড়জোর জ্ঞান হারাবে, সময় নষ্ট হবে। কথা বলতে থাক।''

বাপ্পী বকে উঠল, "খানকি মাগীর চেংরা। তোরা মারোস নাই আমাগোরে? আমাদের

ছেলেরা তোদের হাতে জখম হয়, খুন হয়। শুয়োরের বাচ্চা! সেসব হিসেব রাখোনা, মাগীর পুত।”

মুরসালীন রক্তাক্ত মুখে চমৎকার হাসে। দেখতে অদ্ভুত লাগে। বলে, “এক পীর আর তার মুরীদ একবার ডালিম খাচ্ছিল। দেখা গেল, মুরীদের সামনে ডালিমের অনেক বীজ জড়ো হয়েছে। পীর ঠাট্টা করে বলল, ‘ওহে, বৎস। এত ক্ষুধা তোমার? এতটা ডালিম খেয়েছ?’

মুরীদ তাকিয়ে দেখল, তার পীরের সামনে কোনো বীজ পড়ে নেই। মুরীদ হেসে বলল, ‘হুজুর, আমি ডালিম খেয়ে তাও বীজ

রেখেছি। আপনি তো বীজও ফেলেননি যে, গুণে দেখা যাবে, কতটা ডালিম খেলেন। ক্ষুধা কি হুজুর আমার বেশি?''মুরসালীন হাসল, "আপনি কি বুঝতে পারছেন আমার কথা? আমাদের ছেলেরা যখন অত্যাচারিত হয়ে মরে আপনাদের হাতে, তখন ওদের মরদেহর হদিশটুকুও পাওয়া যায়না যে গুণে দেখব, কতগুলো মরল। অথবা তা দেখিয়ে আইনের কাছে বিচার চাইব বা মানুষের কাছে সিমপ্যাথি। কিন্তু আমরা মারলে তার একেকটা খামছিও দেশবাসীকে দেখিয়ে সমর্থন কামাচ্ছেন...'' কথা শেষ না করে হাসল মুরসালীন।লুঙ্গির নিচে একটা আন্ডার-

প্যান্ট পরা দরকার। কিন্তু জয় আমির জীবনে আন্ডার প্যান্ট কেনেনি। হামজা থাকতে সে আন্ডার প্যান্ট কিনবে কেন?

রাত সাড়ে বারোটা মতো বাজে। হামজা কিছু কাগজপাতি দেখছিল। কোয়েল পাশে বসে এটা-ওটা নাড়ছে, আর ঝগড়া করছে হামজার সাথে। আজকাল হামজা তাকে বেশ সময় দেয়। হামজার সাথে কোয়েলের মিষ্টি সম্পর্ক ছিল। তেতো সম্পর্ক ছিল জয়ের সাথে। বলাই বাহুল্য জয়ের সাথে মিষ্টি সম্পর্ক গড়া যায়না।-"সাহেব!"

হামজা মাথা না তুলে বলল, "হু।"

-“আপনার জাইঙ্গাটা খোলেন তো ভাই, তাড়াতাড়ি করেন।”

হামজা গম্ভীর মুখে তাকালো, “মাল খেয়েছিস? তারতুর কেটে গেছে মাথার?”

-“তার কাটা, ঠিক। তবে মাল খাই নাই। ফিরে এসে খাবো। এখন খালি আপনার জাইঙ্গাটা দরকার। ধার দ্যান। ফিরে এসে ফেরৎ দিচ্ছি।”

হামজা ধুপ করে একটা লাথি মারল ঠ্যাংয়ের ওপর। ল্যাং খেয়ে পড়ে গিয়ে আবার উঠে জয় তাড়া দিলো, “খোলো, ভাই। জলদি খোলো। লুঙ্গির নিচে জাইঙ্গা না পরলে বেইজ্জতি হবার চান্স থাকে রাস্তাঘাটে।”

কোয়েল বলল, “তুমি কোথায় যাবে, জয়? সেদিন আমাকে নাওনি। আমি যাব।”-“কবরে যাব। চল যাই। মিড-নাইট ডেটিং সেরে আসি।”

-“কবরে কি দোলনা আছে? আমি দোলনায় উতবো।”

-“আছে। সেইসাথে তোর আব্বাও আছে। সকাল বিকাল দুলতেছে ওইখানে। চল বেইমান, সাক্ষাৎ করে চা-পানি খেয়ে আসি। মজ্জাই মজা ওইখানে।”

কোয়েল কান্না জুড়ে দিলো। সে কবরে যাবে। বাবার সাথে দেখা করতে যাবে।

তুলি এসে ঝারা মেরে মেয়েকে নিয়ে বলল, “বেলেহাজ কেন তুই এত? ধর্ম আর সৃষ্টিকর্তাকে একটু ভয় কর।”

জয় মুখ বিকৃত করল, “সৃষ্টিকর্তা? কীসের সৃষ্টিকর্তা? আমার তো কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই। দেয়ার ইজ নো গড, ফাকিং অনলি আই এম মাই ওউন গড অ্যান্ড ক্রিয়েটর। আদারওয়াইজ নো ওয়ান ইন দ্য স্কাই।”

তুলি গর্জে উঠল, “চুপ্প! নাস্তিক। বাজে কথা না বলে বের হ তো। তোর কথা শুনলে গা জ্বলে আমার। তোর মতো শয়তানের আবার সৃষ্টিকর্তা কী? তুই তো বহিষ্কৃত।”

জয় হো হো করে হাসল। তুলি দাঁত খিঁচে বলল, "তোর সৃষ্টিকর্তা নেই, না?"-"তোদের থাকলে থাকবে হয়ত। কিন্তু মূলত ওসব কিছুই থিউরেটিক্যালি অর প্রাকটিক্যালি কোনোভাবেই নেই। নয়ত মানুষ এত ডাকে এত ডাকে.....হা হা হা! নো হ্যাজ এনি রিলিজিয়ন অর ক্রিয়েটর ইন দ্য হোল ইউনিভার্স, সুইটহার্ট! ওসব আল্লাহ-বিল্লাহ কিছু হয়না।"

-"চুপ কর জয়। এই! যদি তোর সৃষ্টিকর্তা না থাকে, তোকে পয়দা কে করেছে? নিজে নিজেই এতবড় দামড়া শয়তান হয়েছিস? তুই নিজে নিজে জন্মেছিস?"

জয় হাসল, "উহু, বাপ! তুই তো রেগে যাচ্ছিস! আমাকে জন্মেছে আমার বাপ-মা। এ পর্যন্ত ওদের দায় শেষ। এরপর বাকিটা তোর ওই পয়দা বল আর এত বড় দামড়া হওয়া বল, ওটার ক্রেডিট আমার যায়, আমার আমার। জয় আমিরের।"-"তুই নাস্তিক হয়ে কী পেয়েছিস? কী আছে তোর? অন্তত ধর্মবিশ্বাসটুকু রাখতি জীবনে! ফাঁটা বাঁশ।"

-"তোরা আস্তিক হয়ে কার বাল লাড়ছিস? তোর কী আছে?"

-"তুই নাস্তিক হয়েও তো কিছু পাসনি!"

-"আমার বিশ্বাসও নাই, পাওনাও নাই। সিম্পল হিসেব বোঝো না, শালীর মেয়ে?

অথচ তোরা বিশ্বাস রেখেও পাসনা কিছু তোদের সেই আল্লাহর কাছে, এটা দুঃখজনক, উহ! আমি কারও উপাসনা করিনা, এবং কারও কাছে আবেদনও না। কোনোকিছুর জন্যই না। জয় আমির ইজ দ্য আলটিমেট।''

তুলি রাগে কিছু বলতে পারল না। জয় হাহল, "হি হ্যাজ নো ওউনার, হি ইজ দ্য ওউনার, ডিয়ার!''

তুলির মানসিক অবস্থা কেমন যেন হয়ে গেছে। দিনের পর দিন বোবার মতো চুপ থাকে। আর যদি কিছু বলেও, সেটাতে শুধু ক্ষিপ্ততা ছাড়া কিছু থাকেনা। মানসিক বিপর্যস্ত হয়ে গেছে পুরো। রিমি কতদিন ওকে

তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে কাঁদতে দেখেছে সেসবের পর!তুলি এবার চিৎকার করে কিছু বলতে যাচ্ছিল। হামজা দারাজ গলায় ধমকে উঠল। পুরো বাড়ি ঠিক ঝড়ের আগের নীরবতার মতো থমকে উঠল। রিমি দৌঁড়ে বেরিয়ে এলো। অন্তূ ঘরের দরজায় দাঁড়াল, সিঁড়িঘর থেকে কবীর ভেতরে এসে দাঁড়াল। তুলি পা ঝারা মেরে মেয়েকে নিয়ে রুমে চলে গেল।

জয় দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "ভাবী! একটা ফ্রেশ জাইঙ্গা এনে দ্যান তো। শালার জাইঙ্গার ধার করতে এসে কেলেঙ্কারী হয়ে গেল।"

লুঙ্গির নিচে আন্ডার প্যান্টটা পরল। এগিয়ে এসে অন্তূকে দেখে ভ্রু কুঁচকে মাথা থেকে পা দেখল। এরপর বলল, "হোয়াট হ্যাপেনিং, সিস্টার? এমনে তয়-তৈয়ার হয়ে খাড়ায়ে আছো ক্যা?"

-"আব্বুর কবর জিয়ারত করতে যাব।"

হামজা এসে দাঁড়াল, "জয়, তুই কবীরকে নিয়ে বেরিয়ে যাব।

অন্তূ গলায় জোর দিয়ে বলল, "আমি যাব।"

হামজা শান্তস্বরে জয়কে বলল, "যা যা। দেরি হচ্ছে তোদের।"

-“মেয়র সাহেব!”হামজা তাকাল। অন্তূ শান্তস্বরে বলল, “আমি আব্বুর কবর জিয়ারত করতে যাব।”

অন্তূ এক ভ্রু উচায়, ঘাড়টা কাত করে, “ওরা কবরস্থানে যাচ্ছে?”

-“হ্যাঁ, মেয়র সাহেব। ওরা কবরস্থানে যাচ্ছে।
”

গলাটা ভরাট হয়ে এলো হামজার, “তাতে কী?”

-“কিছু না তো। আমি সঙ্গে যেতে চাই।”

হামজা হাসল, “আমি চাই না।”

অন্তূ আগের চেয়ে নিচু গলায় বলল, “আর এজন্য হলেও আমি চাই, মেয়র সাহেব।

অন্তত পলাশ আজগরের ধড়হীন মাথাটা দাফন হবার সময়ে সেই স্থানের খুব কাছাকাছি থাকার জন্য হলেও যেতে চাই। ওর শেষকৃত্যের সহযাত্রী হতে চাই। আবদারটুকু পূরণ করুন, মেয়রসাহেব। আপনি তো জনদরদী, সেবক!"

দুজনের দুর্বোধ্য এক দৃষ্টি বিনিময় হলো। সেই দুই জোড়া চোখে আগুন জ্বলছে। ভিন্ন সেই আগুনের জ্বালানি। কারোটা কাঠখড়ি, কারোটা পেট্রোলিয়াম। কারোটা প্রজ্জ্বলন, কারোটা দহন। সেই আগুন চোখে চেয়ে হামজা যখন আলতো হেসে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করল, দেখতে ভয়াবহ লাগল।অন্তূ তা

অগ্রাহ্য করে মাথার চওড়া ওড়নাখানি কপাল অবধি টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল জয়ের পেছনে।

পলাশের মাথাটায় পঁচন ধরেছিল। গরমের কাল। তার ওপর বস্তায় বাঁধা ছিল একদিন। খাদেম দাঁড়িয়ে কাঁপছে। ছোট্ট একটা শাবল দিয়ে মাটি খুড়ছে জয় তরুর কবরের পাশে। কবীর বস্তা হাতে দাঁড়িয়ে।

অন্তূ ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে সেদিন আব্বুর জন্য দোয়া করেছিল, কিন্তু কাঁদেনি। আব্বুর সাথে কথা বলল, তবু কাঁদল না। আব্বুর কবরটা ডানপাশের সাড়িতে। তরুরটা অপর

পাশে। সেই কবরের ডানপাশে জয় পলাশের মাথাটা পুঁতলো।

অন্তূর আব্বুটা নেই। ডাক্তার বলেছিলেন, পলাশ যেভাবে থেতলে মেরেছিল আমজাদ সাহেবকে, তাতে করে পরে সেসব দুষিত রক্ত জমে টিউমার এবং তা থেকে ক্যান্সার হবার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। অন্তূ খেয়াল করল, তার যন্ত্রণা হচ্ছে না। কবরের ফটক ধরে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে দেখল জয়ের দক্ষ হাতের দাফনকার্য। অন্তূর মা কাছে নেই, ভাবী অন্তঃসত্ত্বা। সে পড়ে আছে এক কারাগারে। সে যতই গলাবাজি করুক, সে আছে খু-খার

অধিপতিদের হাতের থাবার নিচে। তবু অন্তূর কোনো দুঃখ নেই। একটুও কষ্ট লাগছে না। জয় সারা দেহে মাটি মেখে এসে দাঁড়াল। অন্তূ কাঁদছে না। তার মুখে একফোঁটা কাতরতা নেই। জ্বলজ্বল করছে মুখখানি। এখনও চেয়ে আছে পলাশের মাথার কবরের দিকে।

জয় ডাকল, "ঘরওয়ালি!"অন্তূ তাকাল, "হু! কাজ শেষ? যাব আমরা?"

-"থাকবে নাকি?"

-"বেশ তো লাগছে।"

জয় হাসল। অথচ তার খেয়াল অন্তূর নির্লিপ্ত মুখটার দিকে। তাতে সন্তর্পণে ফুটে আছে

অদ্ভুত হাসি। এই অন্তূ কেমন যেন। শুধু প্রতিবাদী অন্তূ বোধহয় সরল ছিল। সেই প্রতিবাদের সাথে এখন কী যুক্ত হয়েছে? আগেরবারও এখানে এসে অন্তূ পাগলের মতো কেঁদেছে।

ফটকের বাইরে বিশাল পুকুর। তরতরে পানি। আকাশে চাঁদ নেই। কালো হয়ে আছে। দুজন গিয়ে পুকুরপাড়ে বসল। কবীরকে জয় বলল, "বাড়ি গিয়ে কড়কড়া একখান ঘুম দে। যা।"

-"আপনাকে রেখে কেমনে?"

-"ওরে শালা! শোন কবীর, ইমানদাররা পেছন মারা খায়, মনে রাখিস।

কবীর হাসে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরিয়ে তাকিয়ে থাকে ওদের দিকে। অসীম দূরত্ব দুজনের মাঝে। এই দূরত্বের অস্তিত্ব অদৃশ্যে। আর এই যে দৃশ্যমান নৈকট্য, তা অস্তিত্বহীন।চেয়ারের সাথে মাথাটা হেলে পড়ে ছিল রূপকথার। মহিলা কনস্টেবল এসে থুতনি চিপকে ধরে সোজা করে দিলে আবারও পড়ে গেল। চুলের কয়েকগাছি উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। ডানহাতের তিনটে ও বাঁ হাতের দুটো নখ উপড়ে ফেলা হয়েছে। রড দিয়ে পেটানো হয়েছে। অকথ্য গালিগালাজও করা হয়েছে। সেসব শুনলে কোনো সুস্থ মানুষ

চুপ থাকতে পারেনা। রূপকথা আরাম করে শুনেছে সেসব।

মামলাটা যা-তা নয়। শীর্ষস/ন্ত্রা/স পলাশ আজগরের স্ত্রী। এত মার খেয়েও মুখ খোলার নাম নেই। পাথরের মূর্তির মতো চুপ থাকে।

পুলিশগুলো অবাক হয়ে গেল। মেয়ে মানুষ এমন হয়না।

প্রতিটা আঘাতে রূপকথা চোখ বুজে ফেলে। দেখে মনেহয় যেন কিছু অনুভব করছে, কিছু মেলাচ্ছে।

রূপকথা পলাশের করা আঘাতের সাথে পুলিশের আঘাতগুলোর তুলনা করেছে। এখনও অবশ্য বুঝতে পারছে না, কোনটা

যন্ত্রণাদায়ক বেশি। তার মনে হচ্ছে, পলাশেরটা। কারণ পলাশ আঘাত করলে সে চিৎকার করতো, কাঁদতো, পলাশের কাছে মুক্তি ভিক্ষা চাইতো। পুলিশ মারছে, তার চেঁচাতে বা কাঁদতে ইচ্ছে করছে না। অলস লাগছে খুব। আঘাতগুলো বিশেষ কিছু লাগছে না।অন্তূ একবার বলেছিল, আমজাদ সাহেব বলতেন, 'ব্যথার ওপর ব্যথা দিলে আর ব্যথা লাগেনা। ব্যথাহীন হবার শর্ত হলো, ক্রমাগত ব্যথা পেতে থাকা ততক্ষণ, যতক্ষণ না ব্যথাটা আর ব্যথার মতো অনুভূত না হয়।''

তার কি আবার তাই হলো? সে ব্যথাহীন হয়ে গেছে? আশ্চর্য আরেকটা বিষয় আছে। তার

মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে রাজন আজগরের কন্যা হওয়ার খাতিরে। কারণ বাংলাদেশের আইন সক্রিয় হয় পাপীর ধ্বংসের পর।

যতদিন পাপী পাপ করতে পারে, করুক না। দোষ কী! শুধু শুধু পাকরাও করে পরিশ্রম করা, আর শরীরের ক্যালরি খরচা। এটা বাংলার আইনের বিধান। যখন পাপী মরে যায়, অথবা দূর্বল হয়ে পড়ে, তখন তার পাপের মাল বাজেয়াপ্ত করা থেকে শুরু করে সব রকম আইনি পদক্ষেপ নেয়া শুরু। স হিসেবে রূপকথার এখন ফাঁসি হতে পারে। রাজন আজগরের সম্পত্তি ও কালোধান্দা

সবটা নিয়ে চরম তোলপাড় তদন্ত শুরু হয়েছে।

রূপকথার মৃত্যুকে ভয় লাগছেনা। সে শুধু সময় কাটাতে চাইছে, যাতে ততটা সময়ে জয় পলাশকে ফুরিয়ে সবটা কাটিয়ে উঠতে সুযোগ পায়।

চেয়ারের একদম ওপরে স্পটলাইট। অফিসার বারিক সামনে এসে বসলেন, সেখানে অন্ধকার। রূপকথার ব্লাউজের হাতাটা ফেঁড়ে গেছে। ফর্সা দেহে চামড়ার নিচে রক্ত জমাট বাঁধা কোথাও, তো কোথাও চামড়া ফেটে রক্ত বেরিয়ে শুকিয়েও গেছে।সেই রক্তাক্ত খোলা দেহের দিকে বারিক লালসার চোখে চেয়ে

রইল। মুখটা বিশ্রীভাবে আঘাতপ্রাপ্ত, তবু সুন্দরী তো রূপকথা। বারিকের ভেতরে তোলপাড় শুরু হলো। এটা পাপ নয়। রিমান্ডের থার্ড ডিগ্রি টর্চারে নারী কয়েদিদেরকে ধ-র্ষ-ণের নজিরও আছে। ওসব কোনো ব্যাপার না। সব জায়েজ। বারিকের আদেশে লোহার একটা রড গরম করে আনা হলো। বাহানা করে রূপকথার ছেঁড়া ব্লাউজটা আরেকটু ফেঁড়ে আচল নামিয়ে দিলো। লোহার রড গরম হয়ে আগুনের হল্কার মতো লাল টকটকে হয়ে গেছে। তা রূপকথার চামড়ায় ঠেকাতেই ছ্যাঁত করে শব্দ হয়ে নরম চামড়াটা গলে গেল। রূপকথা

একটু আর্তনাদ করে ওঠে দাঁতে দাঁত চাপে। এরপরের ছ্যাঁকাটা রূপকথার বুকের স্পর্শকাতর নরম অংশে ঠেকানো হলো। রূপকথা হাসল। লোকে শুধু পলাশদের দোষ দেয়। বোকা বাঙালি। কত পলাশ আইনরক্ষাকারীর ইউনিফর্ম পরে জীবন কাটাচ্ছে, তার খবর বোকা বাঙালি রাখবে? বারিক কি পলাশ নয়? উমমম, ভাবনায় পড়ল রূপকথা। বারিক বোধহয় পলাশের চেয়েও খারাপ! পলাশ তো পাগল, পলাশ তো খারাপ, খারাপই। কিন্তু বারিক?

রূপকথার বুকের মাংস অনেকখানি ঝলছে গলে গেল। হাতের বাহুতে গর্ত তৈরি হলো

মাংস ক্ষয়ে। জ্ঞান হারিয়ে চেয়ারে হেলে পড়ল। উচিত ছিল মেঝেতে লুটিয়ে পড়া। পড়ল না। হাত-পা কাঠের চেয়ারে বাঁধা। বারিক বিরক্ত হলো। এখন আবার হাসপাতালে সরাতে হবে। কাজের কাজ হলো না। কোনো তথ্য দিলো না।বিয়ের কমবেশি ছয়মাস পর অন্তূ প্রথমবার হামজার কাছে ভার্সিটি যাবার অনুমতি পেয়েছিল। একদিন জয় সঙ্গে নিয়ে কিছু বই কিনে দিয়েছিল, আর এরপর আবার।

অনুপস্থিতি ও বিস্তর পড়ালেখার ঘাটতি পড়ে গেছে। জয় কোথাও গেছে। তার কত কাজ থাকে চারদিকে!

কবীর ড্রাইভিং করতে করতে হঠাৎ-ই বলল, "ভাবী!"

-"হু।"

-"একটা কথা।"

-"বলুন।"

-"আপনে কি আমারেও ঘেন্না করেন?"

-"আর কাকে কাকে করি?"

কবীর থতমত খেলো একটু, পরে বলল, "জয় ভাইয়ের ওপর আপনার ঘেন্না আছে। আমি জানি।"

-"ভুল জানেন।"

কবীর চকিতে পেছন ফিরে তাকাল। অন্তূর অভিব্যক্তি নির্লিপ্ত।

-“আপনি খুব অদ্ভুত।”
-“তাই নাকি?”
কবীর আবার তাকাল একবার। অন্তূ বলল, “সামনে তাকিয়ে ড্রাইভিং করুন। নয়ত দুজনেই সোজা পরকালে পৌঁছে যাব।”কবীর একটু লজ্জিত হাসল, “আমি কত বেয়াদবী করছি আপনের সাথে।”
-“ও কিছু না। ক্ষমতার দাপটে কতকিছু করে লোকে। ওসব আমাদের ধরতে আছে নাকি? ধরে কত খেসারত গেল, দেখেছেন? আপনি কিছু করেন নি, করেছে আপনার ক্ষমতা। আর আপনার ক্ষমতা কী, কে জানেন তো!”

কবীর অবাক হয়ে যাচ্ছিল নতুন করে। এই নারীটির জন্য তার খারাপ লাগে, ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত, তবু সত্যি। যেদিন জয় নারীটির সম্মানকে মানুষের মাঝে হরির লুটের মতো বিলিয়ে দিচ্ছিল, সেদিনও কবীরের এক অদ্ভুত জ্বালা উঠেছিল বুকে। আবার এটাও সত্যি সে জয়কে অন্ধের মতো ভালোবাসে। কিন্তু জয় খারাপ কাজ করলে তার খারাপ লাগে, তবু বাঁধা দেয়না।

ভার্সিটির ফটকের সামনে গাড়ি থামিয়ে দ্রুত এলো কবীর গাড়ির দরজা খুলে দিতে। অন্তূ নিজে দরজা খুলে নেমে বলল, "এসব আনুষ্ঠানিকতা দেখাবেন না আমার সঙ্গে।

আমি বিশেষ কেউ নেই। আগে যেই ভার্সিটি পড়ুয়া এক সাধারণ মেয়ে ছিলাম, আজও তাই আছি। কোনো পাপীষ্ঠর ঘরের বউ হওয়াটা সম্মানের নয়।”

কবীর মাথা নিচু করে আস্তে করে বলল, “আমি ক্লাস শেষে নিতে আসব।”

-“আসবেন।”

অন্তূ ভেতরে চলে গেল। কবীরকে দেখে ছেলেরা এগিয়ে এলো, জয় আমিরের খোঁজ চাইল। কবীর তাকিয়ে দেখল অন্তূকে।

পরাগের সামনে চারজন কর্মকর্তা বসা। দুজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছে। আজিম মালিথা

জিজ্ঞেস করলেন, “আপনার ভাইয়ের প্ল্যান কী ছিল?”

-“আউটডোর।”

-“দেশের বাইরে আছে?”

-“না। প্লান তাই ছিল।”

-“তাহলে এখন?”

-“বেঁচে নেই হয়ত।”

একে অপরের দিকে তাকাল, “বেঁচে নেই মানে?”

-“মানে মরে গেছে।”

-“ইয়ার্কি মারছেন?”

পরাগ হাসল, “রিমান্ডে বসে কেউ ইয়ার্কি মারে না।”

-"ওকে মেরেছে কে?"

-"তা তো বলতে পারি না।"

-"পারেন না? পারবেন, পারবেন। কত না পারা-পারা হয়ে যায় এখানে।"

পরাগ চুপ রইল।

-"তাহলে এটা কীভাবে বলতে পারেন, বেঁচে নেই।"

-"না থাকারই কথা।"

-"আপনি সিওর?"

-"ওরকমই।"হাসল কর্মকর্তারা। আজিম অদ্ভুতভাবে মাথা দোলালেন, "মানুষ যেকোনো বিষয়ে দুই শর্তে নিশ্চিত থাকে। এক, সে

ঘটনাটা নিজে চোখে দেখলে। দুই, কাজটা সে নিজে করলে।"

পরাগ নির্বিকার বসে রইল। আজিম হাসল, "আপনার ক্ষেত্রে প্রথমটা হবার চান্স নেই। কারণ আপনি সেই রাত থেকেই আমাদের হেফাজতে। হাত থেকে রক্ত পড়া অবস্থায় আপনাকে আঁটক করা হয়েছে। এখন বাকি থাকে দ্বিতীয়টা।"

-"পলাশ আজগরকে আমি মেরেছি?"

-"সেটা তো আপনি বলবেন আমাদের।"

"না, তা বলব না।"

-"কেন?"

-“মিথ্যাচার হবে।”উঠে দাঁড়ালেন আজিম, “নাটক পছন্দ না আমাদের। হেঁয়ালি শোনার চাকরি করিনা আমরা।”

পরাগ হাসল, “এমন আরও কত কিছুই করেন, যেসবের চাকরি করেন না আপনারা। বরং সেসব চাকরির দায়িত্বের বিরোধ। এটাও শুনুন নাহয়, স্যার। ভালোই তো।”

পরাগের ঘাঁড় বরাবর একটা বুটের লাথি পড়ল। মনে হলো, গলার কোনো শিরা বুঝি ছিঁড়ে গেছে। চোখ অন্ধকার হয়ে এলো।

-“যা জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তার জবাব দে, বাইঞ্চোদ।”

পরাগ অল্প হাসল। দাঁত নড়ে গেছে কয়েকটা। মাড়ি ফেটে নোনতা রক্তে গাল ভরা। গিলতেও ঘেন্না লাগছে। তবু গিলে ফেলে হাসল, "ওকে মারার কারণ ছিল আমার কাছে, তবে আমার থেকেও জোরালো কারণ থাকা মানুষের তো অভাব নেই পলাশের। তাই আমার চান্সটা মিস গেল।"

-"ঘরের শত্রু বিভীষণ। তোর মতো ছোট ভাইয়েরা কি জন্মায়ই রাবনদের পেছনে আঙুল দেবার জন্য রে?" হাসল ওরা।পরাগ মাথা নিচু করে আলতো হাসল। তা দেখা গেল না। থুহ করে থুতু ফেলল। থুতুর সাথে র-ক্তের ভাগ বেশি। চুল মুঠো করে ধরে মুখ

তুলল অফিসার। ঘাঁড়টা মট করে উঠল পরাগের।

অফিসার বলল, “চান্স মিস যায়নি। হয়ত তুই হাতে মারিসনি, কিন্তু মার্ডারারকে সার্বিক সহায়তা তো করতে পারিস? কে মেরেছে, তার নাম বল। যে মেরেছে, সে-ই সেদিন পলাশকে উদ্ধার করেছে। এখন বুঝতে পারছি, সেদিন ওগুলো পলাশের লোক ছিল না। ওরই শিকারী ছিল। আমি নিশ্চিত, এমনই হয়েছে।”

পরাগ মনে মনে প্রশংসা করল কর্মকর্তার আন্দাজ ও বুদ্ধির। তবু আফসোস। এই রকম বুদ্ধি জায়গামতো প্রয়োগ করেনা।পরাগকে

চুপ থাকতে দেখে হতাশ শ্বাস ফেলে ক্লান্ত হয়ে বসল অফিসার। প্লাস তুলে নিয়ে পরাগের ডান হাতের তর্জনী আঙুলে ঠেকিয়ে বলল, “বলে দে। টর্চার করার বিশেষ শখ নেই আমাদের। সেদিন দুজন কর্মকর্তার স্পটে মৃত্যু হয়েছে। শুধু নামটা বল। ধরে গরম তেলে ভাজবো, ওই বাস্টার্ডের বডিটারে।”

পরাগ চুপ। নখের মাথায় প্লাস বাঁধিয়ে একটানে নখটা তুলে আনলো আঙুলের মাথা থেকে। আর্তনাদ করে উঠল পরাগ। শরীরটা বেঁকে এলো। এর চেয়ে মরণ ভালো। শরীরের যন্ত্রণায় মাথাটা ঝিমিয়ে আসছে।

তার মা-টাকে পলাশ কোথায় যেন লুকিয়েছে। ভয় ছিল, পুলিশের কাছে সব গটগটিয়ে বলে দেবে। পরাগের চোখের সামনে ভেসে উঠল সালমার মুখটা।সে মাকে ভালোবাসে খুব, এমন নয়। তবে মা তাকে ভালোবাসে। যখন পরাগ মুস্তাকিন বনেছিল, তখন রোজ কল করে খবর নিতো, ঢাকায় থাকতেও তাই। সে যখন পলাশের পাপের দায়ে জেল খেটেছে, সালমার অনুরোধে রাজন আজগর জামিন করেছিল পরাগের।

অফিসার বলল, “যাহ, তুই মনে মনেই তার নামটা নে। আমি শুনে নিচ্ছি। বল, উচ্চারণ

কর তো একবার। কর কর। দেখি তোর মনের কথা শুনতে পাই কিনা!”

পরাগ চোখ বুজে অল্প হাসে। মনে মনে বারবার উচ্চারণ করে, “জয় আমির, হামজা, জয় আমির, জয় আমির, হামজা, হামজা, হামজা...”

অফিসার এবার নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করল। আলপিন দিয়ে পরাগের নখের ভিতর এলোমেলো খোঁচা দিতে লাগল। নখের নিচের মাংসের সাথ থেকে আলাদা হয়ে উঠেছিল নখগুলো। রক্তে ভরে উঠল হাতটা পরাগের। এতে সে অজ্ঞান হবেনা বোধহয়, মরবে না, তবে প্রতি মুহুর্তে মরবে।

-“নাম বল।”পরাগ নিশ্চুপ। পরাগকে সেলের ছাদের হ্যাঙ্গারে উল্টো করে ঝুলিয়ে দেয়া হলো। এক মুহুর্তে সমস্ত দেহের রক্ত মাথা মুখে ভর করল। শ্বাস নিতে পারা যায়না এ অবস্থায়, হৃদযন্ত্রে র-ক্তের ঘাটতি, অক্সিজেনের ঘাটতি, পুরো শরীরে র-ক্ত চলাচলে বিঘ্ন, শরীরটা অসাড়, অবস। অফিসার আবার বলে, “নামটা বল। ছেড়ে দেব এখনকার মতো।”

পরাগ হাতদুটো মাটির দিকে ঝুলে পড়ায় মাংসপেশিতে কঠিন টান লাগছে। দেহের সমস্ত ভর জড়ো হচ্ছে নিচের দিকে। সহ্যের মাত্রা ছড়াচ্ছে।

পরাগ জানে, তার মৃত্যুদণ্ড হবে। তার জীবনে পাপ ও দৃশ্যমান পাপের মতো দেখতে ভুল বোঝাবুঝি কম নয়। জয়ের নাম বলায় কোনো সমস্যা ছিল না তার। কিন্তু জয়ের কাজ ফুরোয়নি এখনও। ও জয় কাজবাজ সেরে মরুক গে, পরাগের কী! জয় বাঁচতে চাইলে তাকে মারতে চাওয়া যেত। ও ব্যাটা কখন জানি নিজেই আত্মসমর্পণ করবে।

পরাগের নাম বলতে ইচ্ছে করছে না। সে বোধহয় জ্ঞান হারাচ্ছে। তাহলে তো সোনায়-সোহাগা। যন্ত্রণা থেকে সাময়িক মুক্তি। চোখটা বুজে এলো। আস্তে আস্তে চেতনা লোপ পাচ্ছে তার।অন্তূ রিক্সা থেকে নেমে দৌঁড়ে বাড়িতে

ঢুকল। এতটা অস্থির ও চঞ্চল তাকে দেখা যায়না। কবীর দৌড়ে গিয়ে ভাড়া পরিশোধ করল। এখনও সময় বাকি কত! ফিরে এসেছে অন্তূ।

রিমি ও তুলি ছুটে গেল। অন্তূ জয়ের মতো জগ উচিয়ে ধরে ঢকঢক করে ঠিক জগের অর্ধেকটা পানি খায়। এরপর ধপ করে বসে চেয়ারে।

তুলি ঝাঁকাল অন্তূকে, "এই মেয়ে! কী হয়েছে? ভয় পেয়েছ? কেউ কিছু বলেছে? রাস্তায় কিছু হয়েছে?"

রিমি বসে পড়ল অন্তূর কোল ধরে, "আরমিণ! কিছু বলছেন না কেন? কিছু হয়েছে?"

অন্তূ চট করে হাসল, তা অদ্ভুত দেখালো,
“আব্বুর কথা মনে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল,
বাড়ি ফিরলেই আব্বুকে পাব। তাই দৌঁড়ে
এসেছি।”

দুজনের কাছে খুবই বেমানান ও
অবিশ্বাসযোগ্য লাগল কথাগুলো।

অন্তূ অনেকক্ষণ ধরে গোসল করল সেদিন।
বাথরুমে জয়ের তিন-চারটা ভেজা লুঙ্গি পড়ে
আছে। এভাবে তিন-চারশো হয়ে গেলেও
নতুন কিনে এনে পরবে, তবু ধুয়ে দেবে না।
এই কাজটা তরু করতো। কখনও শাহানা।
বিয়ে হয়ে এসে বউভাতের দিন রিমিকে
জয়ের লুঙ্গি ধুতে হয়েছিল।ভিজে পড়ে থেকে

থেকে পিচ্ছিল হয়ে গেছে লুঙ্গিগুলো। অন্তূ ধুয়ে দিলো।

গোসল শেষ করে যোহরের নামাজ শেষে দীর্ঘ হলো তার মোনাজাত। মহান প্রতিপালকের কাছে হাত তুলে অনেকক্ষণ বসে রইল। কিন্তু কাঁদল না। ঠোঁট নড়ল না। তিনি অন্তর্যামী। তাঁর কাছে আহাজারী করার কী? বান্দার ভেতরের র-ক্তক্ষরণ তিনি দেখেন।

বড়ঘরে পাহারা নিযুক্ত করা হয়েছে। সবগুলো দরজা-পথে লোক মোতায়েন হয়েছে। অন্তূ ফিরে এলো। সেদিন দুপুরে খেলো না।

অন্তূর ভেতরে একটা সন্দেহ জেগে উঠেছে। হামজার তাকে হঠাৎ-ই ভার্সিটিতে যেতে দেবার অনুমতিটা ঠিকঠাক লাগছে না।

—

দু-ভাই ছাদে বসে অনেকরাত অবধি মদ খেল। হামজা জিজ্ঞেস করল, "রূপকথার সঙ্গে দেখা করতে গেছিলি?"

-"কথা আপা কারাগারে সেইফ না, ভাই।"

-"কারাগারে সেইফটির প্রশ্ন?"

দুজন হু হা করে হাসল। এক প্যাগ গিলে শান্ত হয়ে আকাশের দিকে তাকাল হামজা, "জয়!"

-"হু!"

-“কোনদিকে এগোচ্ছি রে আমরা?”

-“যদি একটু আধ্যাত্মিক শব্দের মাধ্যমে বলতে চাও তো, আমরা এগোচ্ছি কালগর্ভের দিকে।”

-“সময়ের গর্ভ?”

-“তাও যে-সে সময় না। মহাসময়।”

দুজন মাতালের মতো হেলেদুলে হাসল। হামজা সিগারেটে দুটো টান দিয়ে চোখ ফিরিয়ে বলল, “রাতে খেয়েছিস?”-“পেট ভরা ভরা লাগছে। মনে হচ্ছে ভকভক করে বমি হয়ে যাবে।”

-“গলায় আঙুল ঢুকিয়ে বমি কর। আজ আর গিলিস না।”

হামজাও শুয়ে পড়ল সটান হয়ে।
সেলের বাইরে রূপকথা জয়কে দেখে হেসেছিল। জয় জিজ্ঞেস করল, “দিনকাল ভালো তো?”
রূপকথা উঠে এসে সেলের শিক ধরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে বলল, “ভালোই তো। কেন এসেছিস? বেঁচে থাকতে ভালো লাগছে না?”
-“লাগবে না কেন? বেঁচে থাকার জন্যই তো বেঁচে থাকা।”
রূপকথাকে হাসপাতাল থেকে এনে সেলে রাখা হয়েছে। বাহুতে ব্যান্ডেজ জড়ানো। ছেঁড়া, নোংরা শাড়ির আচল মেঝেতে ঘেঁষছে।

সুন্দর মুখটা বিবর্ণ, অথচ ঠোঁট হাসছে। ভয়ানক রহস্যেঘেরা মলিন সেই হাসি।

সে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল জয়ের চোখের দিকে। জয় চোখ ফেরালো না। কিন্তু খানিকবাদে আচমকা যখন জয় হেসে উঠল একদৃষ্টে চেয়ে, রূপকথার বুকের ভেতরটা ছলকে উঠল সেই হাসিতে। শরীরটা শিরশির করে কেঁপে উঠল জয়ের চোখে তাকিয়ে। জয় তখন জোরে করে হেসে উঠল।

রূপকথা এগিয়ে এসে সেলের ভেতর থেকে হাত বাড়িয়ে হাত ধরল জয়ের, "কী করছিস তুই, জয়? কী চাস জীবনে?"

-"এত প্রশ্ন কেন?"-"জবাব দিলেই তো হয়।"

-“না দিলেও হয়। আসলে আমি কিছুই করতেছি না। লাইফ এনজয় করতেছি।”

-“কেন এসেছিস?”

-“এলাম ঘুরতে ঘুরতে। জেলখানা একটা ভালো পর্যটন কেন্দ্র হতে পারে। হামজা সাহেব সংসদে সিট পেলে দেখি এই ব্যবস্থা করা যায় কিনা!”

দুজন বসল। একজন সেলের ওপারে একজন এপারে। কিন্তু বসল কাধে কাধ মিলিয়ে। মাঝখানে লোহার শিকের ফারাক। রূপকথা আচমকাই বলে, “তোর কি আমাকে দেখে কষ্ট হচ্ছে, জয়?”

-“হচ্ছেই তো। কষ্টে বুক ফাটে, পাতিল হাড়ি কুত্তায় চাটে। এইরকম ধরণের কষ্ট হচ্ছে।” রূপকথা হাসল, “আমার স্বামীকে মেরে ফেলেছিস?”

-“তোমার স্বামীকে? ছিঃ। মেরে ফেলব কেন? ”

-“না মেরেই ভালো করেছিস।”জয় রূপকথার বাহুর থকথকে গলিত মাংসের দিকে চেয়ে রইল, ব্যান্ডেজ আলগা করে ফেলেছে রূপকথা। জয় হাসল, “আমার নাম জানতে চাইছিল ওরা!”

-“না। পলাশ কোথায়, তা জানতে চেয়েছিল।”

-“আমার কাছেই পলাশ ছিল। এ তথ্যটাই মূলত দরকার ছিল ওদের। বললেই ছেড়ে দিতো।”

-“কিন্তু বলতে ইচ্ছে করল না।”

জয় গা দুলিয়ে হাসল, “জয় আমিরের ওপর রক্তের ঋণ চাপিও না। ’

-“চাপালে কী?”

-“অনবরত রক্ত ঝরে তার শরীরে, বয়ে যাবে কোথাও।ঋণ পরিশোধ হবেনা।”

-“তোর কাছে আছে কী, কী দিবি আমায়। তুই তো কাঙাল। ”

-"তাও এক কথা। একটা চাকরি-বাকরি করা লাগবে। সামনের পর বেকার বলে বদনাম ঝারছো, মানবিকতার অভাব।"

খানিক চুপ থেকে রূপকথা বলল, "কয় খন্ড করছিস রে?"

-"মনে নেই এক্সাক্ট। কমবেশি চার-পাঁচ।"

জয় আর দাঁড়ায়নি। চলে এসেছিল।

টানটান হয়ে শুয়ে আকাশ দেখতে ভালোই লাগে। কিন্তু চোখ-মুখ ঘোলা হয়ে আসছে। হ্যাং-অভার ধরছে। মাথার নিচে হাত। আকাশের দিকে তাকিয়ে গান ধরল জয়,

ইট-গামলায় ইট বানায়া, চৌদিকে ভাটা সাজাইয়া

মাঝখানে আগুন জ্বালাইয়া দিলো গোওও ভেতরে পুড়িয়া সারা, মাটি হইয়া যায় অঙ্গারা এখন আমি কী করি উপায়...হামজা নিচে নেমে গেল। প্রেশার বেড়েছে বোধহয়। মদ্যপান নিষিদ্ধ তার জন্য। ঘরে ঢুকে দেখল রিমি শুয়ে আছে। তাকে দেখেও উঠল না, কথাও বলল না। মাথা ঝিমঝিম করছে। ঘরে শুতে ইচ্ছে করছে না। ইচ্ছে করছে দূরে কোথাও জঙ্গলে গিয়ে রাতটা কাটিয়ে আসতে। জয় ঘরে এলো দুটোর দিকে। অন্তূ বসে আছে মেঝেতে। জয় দেখেও না দেখার মতো গিয়ে ধুপ করে শুয়ে পড়ল। অন্তূ কিছুক্ষণ

পর ডাকল, “আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।
”

-“চুপ থাক। ঘুমাচ্ছি আমি। যা কথা পরে-টরে।”

-“এখন বলাটা দরকার।”

-“মুখ বন্ধ রাখ, শালী। মাথা ধরেছে খুব। ঘুমাবো আমি।”

অন্তূ বসে রইল। তখন দুটো বাজছিল রাত। জয় ঘন্টা দুয়েক মরার মতো ঘুমালো। চারটার দিকে উঠল। অন্তূ বসে আছে ওভাবেই। বিরক্ত হয়ে বলল, “কী কথা, কও।
”-“জয়নাল আমির আপনার চাচা, না!”

-“ছোট চাচা। বলেছিলাম আমি।”

-“জাভেদ আমির?”
-“থিউরেটিক্যালি আমার বাপ।”
-“বড় চাচার নাম কী?”
জয় ভ্রু কুঁচকে ফেলল, “ভার্সিটিতে গিয়েছিলে?”
-“গিয়েছিলাম।”অন্তূ জয়ের এমন অলৌকিক আন্দাজশক্তিতে একসময় ভীষণ অবাক হতো। এখন হয়না। মনে হতো জয় আধ্যাত্মিক ক্ষমতা জানে। মানুষের মন ও পারিপার্শ্বিক ঘটনা সব তার আয়ত্ত্বে।
জয় লাফিয়ে নামল খাট থেকে, “জিন্নাহ আমির নামের কারও কথা বলেছে ওরা?”

অন্তূ বিস্ময়ে ভ্রু জড়াল, “নিজস্ব জিন পোষেন নাকি?”

জয় মাথা নাড়ল দুপাশে, “অভিজ্ঞতা বেশি।”

-“ততটাও বোধহয় বেশি না, যতটা চতুর আপনি।”

-“আমার বাপের বড়ভাইয়ের ছেলে।”

-“জিন্নাহ আমির!”

জয় আচমকা শক্ত হলো, “হ। কারা আইছিল?
”

-“কয়েকজন।”

-“কী বলল?”

-“মুরসালীন মহানকে ছেড়ে দিতে বলেছে। তাহলে জিন্নাহ আমিরকে ফেরৎ দেবে ওরা।”

জয় খানিক চুপ থেকে থেকে মাথা ঝারা মেরে হাসল, “জিন্নাহকে গুম করেছে আজ আড়াইবছর। বেঁচে আছে কিনা, সন্দেহ। খানকির বাচ্চারা এখনও নাম ভাঙিয়ে খাইতে চায়। শুয়োরের বাচ্চাদের কে বোঝাবে, জয় আমির গু খায় না। তার নাম কয় নাই?
”-“আনসারী মোল্লা বোধহয়।”
-“সাথে আর কে কে ছিল?”
অন্তূ কথা বলল না। গভীর চোখদুটোয় জীবনের কাতরতা! বারান্দার অন্ধকারে চেয়ে রইল।
জয় বলল, “তোমাকে কী বলেছে?”

কাঠের পুতুলের মতো বলল অন্তূ "আপনাকে বুঝিয়ে বলতে বলেছে।"

-"নয়ত?"

-"আমার ভাবী আর আম্মু...ওহ সাথে আমাদের বাড়িও পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দেবার কথা জানালো।"

জয় হেসে উঠল, "তোহ ঘরওয়ালি! তোমার প্রাণপ্রিয় ধর্মীয় গোষ্ঠীর আগ্রাসী ব্যাপার-স্যাপার কেমন এনজয় করলে?"

-"বুঝতে পারিনা আমি এসব। দৃষ্টিকোণ বদলাতে থাকে একেকসময়। আমি রাজনীতিকে বুঝতে চেষ্টা করছি, অথচ পারছি না।"

জয় হো হো করে হাসল, “রাজনীতি বোঝার মতো বিষয় নয়, সিস্টার। ওটা একটা নীতি, দ্যাটস মিন পলিসি। ওটা মেনে চলতে হয়, ব্যাস। বুঝতে গেলে হারিয়ে যাবে, কূল পাবেনা।”

-“কেমন পলিসি?”

-“ব্ল্যাডি ডিপলোম্যাটিক পলিসি।”-“ওদের তিনজন প্রধান নেতাকর্মীর শাস্তির রায় কার্যকর হয়েছে।”

-“ওরা যুদ্ধাপরাধী। মানবাধিকার বিচারে সাঁজা পাচ্ছে। তাতে কী?”

-“ওরা ছাড়া আর কেউ নেই? ওরাই কেন? কারণ ওরা বিরোধী দলের সঙ্গে জোট করেছে

তাই? ওরা নিজেদের বক্তব্যে আপনাদের সরকার ও শাসনব্যবস্থার ভুলগুলো ধরিয়ে দেয়, মানুষের মাঝে সেসব কথা পৌঁছায়, তাই নাকি অন্যকারণ! মুরসালীনও কি তাই?"

-"মুরসালীনের বাপেরা ছিল মোল্লার বংশধর। ধর্মের প্রতি দুর্বল। কিন্তু ও মূলত বিরোধী দলের চামচা। আবার ধর্মীয় দলের ওপরও ব্যাপক টান।"

-"সে হিসেবে চামচা তো আপনিও।"

জয় তাকিয়ে রইল। অন্তূ হাসল, "ক্ষমতাসীনদের পেছনে লেজ নাড়ানো গাঢ় চামচামি। ওরা বরং হিম্মতদার, যারা ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও লড়ছে।"

-"লড়ছে? ২০14 তে যেটুকু লাফিয়েছে, আর ২০15 এর শুরুতে তিন-চার মাস যা আগুন জ্বালানো অবরোধ করেছে। এরপর তো ওরা ডাউন, ঘরওয়ালি। তুমি হিজড়াদের সঙ্গ দিচ্ছ। ওরা মরে ভূত সব।"

-"সঙ্গ আমি কারোই দিচ্ছি না। আমি শুধু চাইছি, ওদের মুক্তি দিন। ওরা অপরাধ করেনি। আর কিছু বলতে পারছি না। কারণ আমি রাজনীতি বুঝতে চেষ্টা করছি সবে, বুঝতে পারছি না মোটেই।"-"ওরা বরশীর আগায় ঝুলানো টোপ। মাছ ছিপে ওঠা না অবধি ছাড়তে পারি না।"

-"ওরা এমনিতেও দূর্বল। থেমে গেছে সেই কবে। তবু এখনও? ওদের দলের লোক দেদারসে কারাগারে যাচ্ছে, মামলা খাচ্ছে। আর কত? অন্তত বাচ্চাগুলোকে মুক্তি দিন।"
জয় মেঝের ওপর টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল। অন্তূ খাটের সাথে হেলান দিয়ে বসে বলল, "কেন করছেন এসব, বলুন তো!"
জয় কিছুক্ষণ চোখ বুজে শুয়ে রইল। ফজরের আজান শেষ হলো।
-"ওরা যুদ্ধাপরাধী, মানবাধিকার বিরোধী কর্মকাণ্ড করা জঙ্গি গোষ্ঠী। যারা মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে আর পাকিস্তানিদের পক্ষে কাজ

করেছে সেসময়। একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে ওদের ঘেন্না করাটা নিয়ম।''

-"আর তাতে ক্ষমতা হাসিলও হয় খুব সহজে, কী বলেন!''

জয় হাসল, "ওটা হামজা ভাইয়ের জন্য। আমার ওসব কিছু না।''

-"অথচ আপনি নিজেকে কতন পর্যায়ে নিয়ে দাঁড় করিয়েছেন! যেখান থেকে ফেরার পথ নেই।''

-"মেরে ফেলবে?''

-"মৃত্যু আপনার জন্য নয়, জয় আমির। মৃত্যু তাদের জন্য যারা মৃত্যুকে ভয় পায়। মৃত্যু

অন্তত আপনার ‘শাস্তি’ হতে পারে না।’’জয় নিঃশব্দে হাসল কেবল। কিচ্ছু বলল না।

-“আজ আমাকে ভার্সিটিতে যেতে দেয়া হয়েছিল। কোনো বিশেষ ব্যাপার নাকি? কী করেছেন ওদের সঙ্গে?’’

জয় দুপাশে মাথা এই ব্যাপারটাকে সাইড করে মাথা নেড়ে ভ্রু উঁচিয়ে গভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, “তোমার কী হয়েছে?’’

অন্তূ তাকাল জয়ের দিকে। তাদের দুজনের নীরব এই বোঝাবুঝির মাঝে যে অসীম বিরোধ, তার কোনো পরিণতি নেই।

-“ভাবীর বাচ্চা পেটের ভেতরেই অসুস্থ। আম্মু কল করেছিল।’’

-“ব্যাপারটা মঙ্গলকর। তোমার ভাই নাই। বাচ্চাটা থাকা মানে ভাবীর জীবন ক্ষয়।”

অন্তূ কঠোর চোখে তাকাল, “জানোয়ার, আপনি।”সকালবেলা জানা গেল, কবীরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। হামজা পাটোয়ারী পৌরসভার মেয়র। তাকে সরাসরি প্রথমেই আনা হলো না আইনি জিজ্ঞাসাবাদে। কিন্তু খুব শীঘ্রই যে আনা হবে, তা চিরন্তন সত্য।

জয় আমির খাঁড়া দুপুরে বড় ঘরে উপস্থিত হলো। পেছনে অন্তূ। জয় গলা চেপে ধরল অন্তূর, “তুই কোথায় যাচ্ছিস?”

অন্তূর তপ্ত শ্বাস জয়ের হাতে পড়ছিল। আরও শক্ত করে চেপে ধরল গলাটা জয়, “রুমে যা। কুপিয়ে কেটে ফেলব একদম।”

-“হয় কুপিয়ে কাটবেন, অথবা আমি আপনার সঙ্গে বড়ঘরে যাব।”জয়ের চোখে রক্ত ছুটে বেরোচ্ছে। ঘুম পুরো হয়নি। নেশার ঘোর কাটেনি, মাথা ঝিম মেরে আছে। ছেড়ে দিলো গলাটা। কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। ড্যাগ ভরে রান্না হয়েছে। খেতে দেবার জন্য বাড়ির মেয়েদের দরকার।

মুরসালীনের সামনে জয় সেদিন অবধিও সেভাবে বসেনি, ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করেনি। যা করার বাপ্পী, সোহাগ, আজাদ আর প্রধানত

হামজা করেছে। সেদিন প্রথমবার জয় আমির সৈয়দ মুরসালীন মহানের সম্মুখে বসল। চাটাই পেতে দেয়া হলো। সবাইকে একসঙ্গে খাওয়ানো হলো সেদিন অবরুদ্ধ কুঠুরিতে। জয় ওদের সাথে বসে পোগ্রাসে গিলল। খেতে খেতে মুরসালীন বলে, “জয়! মনে পড়ে তোর? এভাবে দিনের পর দিন দস্তরখান বিছিয়ে কলার পাতায় খাবার খেয়েছি একপাতে?”জয় তাকাল না। কথাও বলল না। অন্তূ ওদের পেটপুড়ে খাওয়ালো। যতটা সম্ভব যত্ন করে খাওয়ালো। তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অভুক্ত বাচ্চারা খাচ্ছে, নিদারুণ খিদে

আর পিপাসা ওদের। পরনের পাঞ্জাবী ছেঁড়া-ফাঁড়া, নোংরায় ঢাকা।প্রায় বিকেল হয়ে এসেছিল। কিন্তু বড়ঘরে সময়-কাল ও আলোর অস্তিত্ব নেই।

আব্দুল আহাদ কয়েক লোকমা খাবার মুখে দিয়েই গলগল করে বমি করে ফেলল। এবং শেষের দিকে বমির সঙ্গে রক্তের ছোপ উঠে এলো। অন্তূ বসলে আব্দুল আহাদ অন্তূর হাতখানা চেপে ধরে। আবারও বমি করতে চায়। পেটে খাবার পড়ে না কতদিন ঠিকমতো। লালা ঝরল শুধু, সাথে রক্ত। জয় গপাগপ আরামে খেয়ে উঠল।আব্দুল আহাদ মেঝের ওপরই টানটান হয়ে শুয়ে

পড়ে। অন্তূ জগ ভরে পানি এনে মাথায় দেয়। খাওয়ার পানি চাইল, কিন্তু খেতে পারল না। অন্তূ একদৃষ্টে চেয়ে থাকে আব্দুল আহাদের জীর্ণ মুখটার দিকে।

অন্তূ যতবার বড়ঘরে এসেছে, বাচ্চারা সস্তি পায়, সবাই অন্তূর দিকে চাতকের মতো চেয়ে থাকে। কিছু আশা করে। তারা জানেনা, অন্তূর হাত বাঁধা। এটাও জানে না, অন্তূ আজ ভীষণ নিঠুর, উদ্দেশ্যপ্রবণ, স্বার্থপর...!

অন্তূ কিছুই করল না। সে আজ একটুও তামাশা করতে চায় না, জয় আমিরের সঙ্গে আপাতত সে একটুও রেষারেষি চায় না। সে এখানে আজ ইনিয়ে-বিনিয়ে থাকতে চায়।

জয়ের সঙ্গ চাই তার, ততটা গভীর সঙ্গ, যাতে সে জয় আমির নামক অতল গহ্বরের অন্তত মুখটার আপাত হদিশ পায়। বাকিটা সে বোঝে, সে জয় আমিরকে আত্মস্থ করেছে। সে জয় আমিরকে বিভিন্নভাবে বিভ্রান্ত করে, কখনও ক্ষেপিয়ে তুলে, কখনও অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করার নামে খুলে পড়ে দেখে নিয়েছে। শুধু জানা বাকি কিছুটা। তা জানলেই যেকোনো একটা গূঢ় সিদ্ধান্ত!ওরা অনেকদিন পেটভরে খাবার পেয়ে কেউ-ই সইতে পারছিল না। চোখ-মুখ উল্টে আসছিল, অসুস্থতা বাড়ল সবার।

অন্তূ জয়ের খুব পাশে গিয়ে বসে, জয়ের এঁটো হাতে খুব ধীরে পানি ঢালতে ঢালতে বলে, "দেখতে ভালো লাগছে না ওদের দুর্ভোগ। হোক যে কারণেই, সেসব বিতর্কিত। আপাতত তা বুঝতে না যাই। শুধু জানা ভালো, ওরা নিষ্পাপ, নাবালক। ওদেরকে মেরে ফেলুন, অথবা বেঁচে থাকতে দিন।"

জয় হাতদুটো আরাম করে ধুয়ে চোখ তুলে তাকাল, এরপর বলল, "ওরা মরে গেছে না বেঁচে আছে, সেইটা আগে ক্লিয়ার করো।"-"ওরা বেঁচে থেকে থেকে রোজ মরছে। আপনি বোধহয় বোঝেন এই বেঁচে থাকাটা।"

জয় ভ্রু উঁচায়, "আমি বুঝি নাকি?"

-“বোঝেন। আপনি এভাবেই বেঁচে বেঁচে মরেছেন বহুকাল।”

-“তাই নাকি?” তাকাল জয়, “আন্দাজে ঢিল ছুঁড়লে আম পড়বে? দেখা গেল, ঢিল আমের গায়ে না লেগে গাছের ডালের মৌচাকে লাগল। এরপর?”

-“মৌমাছির কামড়ের ভয় পেতে বলছেন?” জয় হেলেদুলে হাসল। ক্ষেত্রবিশেষ চরম সল্পভাষী হিসেবে ধরা পড়েছে জয়। তার যত বাজে কথা, আবোল-তাবোল রসিকতা বাহার। কাজের কথা অথবা নিজের কথা ভুলেও বেরোয় না জবান দিয়ে। অতি রসিকতার জেরে মানুষ সুযোগ পায় না ওর সঙ্গে

আন্তরিক আলাপ পাড়ার। সেই সুযোগ কাড়তেই জয়ের রসিকতার আয়োজন, এত আন্তরিকতাহীন চলন। অন্তূর আবিষ্কার এসব।
-“তো আমি চরম মাপের খিলাড়ি তাইলে! তবু তুমি শালী কদর করলা না।”
জয়ের চোখের মেটে রঙা মণিতে চোখের নজর ফেলে অন্তূ, “আফসোস, আপনার বাঁচার লোভ নেই।”-“মরার শখও নেই। চাইলেই মেরে দিতে পারতে। কত রাত সুযোগ গেল।”
-“ভয় অথবা অনীহা নেই যে!”
-“না-ন না! তুমি আসলে আমার প্রেমে পড়ছো। খালি স্বীকার যাও না। তো একটা

চ্যালেঞ্জ জিতলাম। কী কও?'' চোখ মারল জয়।

অন্তূ বলে, "মৃত্যু কি আপনার শাস্তি হতে পারে? সত্যি বলুন। ভয় পান না আপনি মরণে। ব্যাপারটা জটিল হয়েছে এখানে।''

-"অপবাদ দিচ্ছ, ডিয়ার। ছেড়ে দাও। আমি খুব ভীতু। তুমি জানোনা, তাই বলছো।''

অন্তূর ওড়না টেনে নিয়ে ভেজা হাতটা মুছল জয়।

অন্তূ তির্যক হাসল, "দুনিয়ার প্রতি দায়বদ্ধতা না জন্মে যায়, পাপকে পাপ মনে হতে যেন শুরু না করে, লোক আপনার কুৎসিত ব্যক্তিত্ব ছাড়াও এক সর্বহারা দূর্বল কাঙালকে না দেখে

ফেলে, সেসব ব্যাপারে ভীষণ ভীতু আপনি। জানি তো। অস্বীকার করছি বুঝি!''অন্তূর বাক্যবিন্যাসে এক প্রকার অভিজাত নাটকীয়তা ছিল, যা শুনতে শ্রুতিমধুর ও অদ্ভুত শোনালো।

জয় শব্দ করে হাসল, "সর্বহারা আমি? আমার ব্যাপারে এসব ভুলভাল কথা কোন শালা শেখায় তোমাকে?''

অন্তূ নিঃশব্দে ঠোঁট বাঁকিয়ে সল্প হাসল, "আপনার সেই শালার নাম মোস্ট প্রোবাবলি– জয় আমির।''

চকিতে তাকায় জয়। ভ্রু কুঁচকে চেয়ে দেখে অন্তূকে কিছুক্ষণ। অন্তূর স্থির চোখের ঘন

পাপড়িতে যে বিরোধের আগুন! মসৃণ ঠোঁটে কত আওয়াজহীন প্রতিবাদ! কঠিন ঢোক গেলার মাঝে অসহ্যকে সহ্য করার অব্যর্থ চেষ্টারা। আর মাথায় টানা লম্বা ঘোমটায় জড়িয়ে থাকা জয় আমিরের নাম। জয় দেখে সেসব। অল্পক্ষণ দেখে। এরপরই চট করে অন্তূর কালচে পানির পুরনো গভীর কূপের মতো চোখের মণি থেকে চোখ সরায়। এক হাঁটু খাঁড়া করে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে দীর্ঘ এক টান দেয়। অন্তূ মেঝেতে ঠেসে বসে জয়ের পাশে। মাথার ওড়নাটা কপাল অবধি টানে। জয়কে দেখতে তখন পুরনো আমলের অহংকারী, অনৈতিক

জমিদারের মতোন দেখায়, আর অন্তূ তার বিরোধী পূণ্যবতী গিন্নি।

আজ ক'দিন যেন আচরণ বদলেছে অন্তূর। জয়ের ব্যাপারে জানতে আগ্রহী সে শুরু থেকেই, কিন্তু আজকাল তা অন্যরকম রূপ নিয়েছে।বসে থাকে দুজন অনেকক্ষণ। কেমন যেন পারিপার্শ্বিক হালটা। সাতাশটা ক্ষত-বিক্ষত, বন্দি দেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এক বিশাল আলো-বাতাসহীন ইস্পাতের গুদামে। তার একপাশে দুটো নর-নারী পাশাপাশি খুব কাছে বসে থাকে চুপচাপ। কেউ কারও দিকে একবারও তাকায় না। প্রগাঢ় শ্বাসের উঠানামা

চলে কতক্ষণ। নিগূঢ় রহস্যের পাক ঘোরে সেই শ্বাসের অদৃশ্য কুণ্ডলীর হাওয়ার মিলনে। জয় নিজের বাঁ হাতের তালু মেলে ধরে অপলক চেয়ে থাকে সেদিকে। ভাগ্য নাকি ভবিষ্যত দেখার প্রয়াস! জয়ের যে কত সব উদ্ভট খেয়াল জাগে ক্ষণে! পাশে বসে অন্তূ দেখে পরিশ্রান্ত দেহগুলো। আশাপাশটা ভয়ানক। কিন্তু অন্তূর ভয় লাগে না। বিশাল বিশাল লৌহচুল্লি, ছাই, কয়লা, রাসায়নিক পদার্থ, ছাঁচ, হাতল, নোংরা চটের বস্তা, মানুষের হাড়, লোহার খণ্ড, কার্বন কোক সংরক্ষণের পাত্র, লোহার তৈরি খাম্বার আকৃতির বিশাল বিশাল গোলক—কত কী

ছড়িয়ে আছে। টিমটিমে বাতি জ্বলছে। আধো অন্ধকারে ভ্যাঁপসা দুর্গন্ধ সব মিলিয়ে।

অন্তূ সেসবে চোখ নিবদ্ধ রেখে আস্তে কোরে ঠোঁট নাড়ায়, "আপনাকে আমি এর চেয়ে বেশি অসহায় হিসেবে দেখবো, জয় আমির। আমি জানি, দেখব। আপনার অসহায়ত্ব আর সবার মতো কাতর আর দৃশ্যমান হবেনা। আপনি হাসবেন, খুব হাসবেন সেদিন একবার। আমি আপনার সেই অসহায়ত্ব দেখব। সেদিন কেউ আপনাকে দেখলে আপনার পাপ ভুলে বরং আপনার জন্য মায়ায় কেঁদে উঠবে। আর আপনি ঠিক ততটাই হাসবেন। আমি আপনার সেই অসহায়ত্ব

দেখব।''জয় হাতের তালুতে আস্তে আস্তে পাঁচটা আঙুল গুটিয়ে মুঠ পাকিয়ে গা দুলিয়ে হাসে, "তোমার আল্লাহ তোমার ফরিয়াদ মিছেমিছি হলেও কবুল করুন। জয় আমিরকে তিনি অসহায় করুন। আমিন।''

-"অর্থাৎ আপনাকে অসহায় করা অসম্ভব? আপনাকে অসহায় করতে পারবেন না তিনি– বলছেন?''

-"সহায় করতে পারেননি। অসহায় করতে পারবেন– ভাবছো কেন, ঘরওয়ালি? শ্যুড নট বি ফরগোটেন, ঘর ভাঙতে সেই ঘরামির দরকার পড়ে, যে ঘরামি ঘর বানিয়েছিল।

অর্থাৎ, ভাঙতে পারেন কেবল তিনি, গড়েছেন যে।”

-“আর আপনার ধারণা—আপনাকে আপনি গড়েছেন! ভাঙলে কেবল আপনি ভাঙতে পারেন, আর কিছুই না! তাই?”

অন্তূ না তাকিয়েও টের পায় এতক্ষণে জয় তাকিয়েছে তার দিকে। সে তাকায় জয়ের চোখে। দুজনের চোখ জ্বলজ্বল করে জ্বলে ক্ষণকাল। কোনো এক মুহুর্তে দুজন একসাথে চোখ ফেরায় দু’দিকে। চোখের দিকে তাকিয়ে থাকার মতো ভয়াবহ সম্পর্ক নয় তো তাদের! চোখের ভাষায় কথা বলা সম্পর্করা হয় ভীষণ ভয়ানক। ওসব সম্পর্ক তাদের নয়। তাদের

সম্পর্ক আলাপ-আলোচনা সেরে, একত্রে বসে ছক-পরিকল্পনা এঁকে পরস্পরের বুকে ছুরি গাঁথার।

রিমি সবকিছু গোছগাছ করে আবারও এলো। তার মুখ ম্লান, চোখদুটো স্থির কিন্তু বিষণ্ন। সেদিন জয় ওদের সরালো না। বেখেয়ালী লাগছিল তাকে ভীষণ।হাঁটু খাঁড়া করে মেঝেতে বসল। মুরসালীন ঢালাই দেয়ালে পিঠ ঠেকায়। গোটা শরীরে ক্ষত। চিকিৎসা অথবা ওষুধ পড়েনি সেসব ক্ষততে। ওরা মোট সাতাশজন। তার মধ্যে বড় ছয়জন। মুরসালীন বাদে আরও আছে তারিক, আশরাফ, নাঈম, তওফীক, ইমদাদ।

এরা সব ২০১৪-১৫ এর শুরুর জ্বালাও-পোড়াও আন্দোলনের সহিংসতায় জড়িত ছিল। রাজধানীর বিরোধী দলীয় ছাত্র আন্দোলনে সরব সবগুলো। গাড়ি জ্বালিয়েছে, মানুষ পুড়িয়েছে, ইট-পাটকেল, ককটেল ছুঁড়েছে, রাস্তায় অবরোধ করেছে। কঠিন অপরাধ। পুলিশ পেলে ছাড়বে না।

হামজা এলো অন্ধ কুটিরে। সাথে বাপ্পী মণ্ডল, কামরুল, চয়ন, দোলন। এই সাতাশজনকে পিটিয়ে মেরে ফেললেও তাদের শান্তি। এখন আর স্টেটমেন্ট বা হদিশ দরকার নেই। তবে একদম আলোচনাহীনভাবে কারও গায়ে হাত লাগানো যায় না।জয় ও হামজা বসে রইল

চুপচাপ। তাদের কোনো কাজ নেই। অন্তূর ওড়নার একপ্রান্ত ধরে দাঁড়িয়ে রইল রিমি। মুরসালীন নিজেদের স্বপক্ষে কথা বললে কথাও বলা যায়না। কথা ও যুক্তিতে পটু। হওয়া উচিতও। সে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদের সরকার ও রাজনীতি অর্থাৎ পলিটিক্যাল সাইন্স বিভাগের ছাত্র ছিল। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ভরা।

মুরসালীনের চেহারার কাঠামো নিরেট। অযত্নে দাড়ি বেড়ে যাওয়ায় দেখতে আরও কেমন যেন লাগছিল দেখতে।

বদিউজ্জামান দোলন আপিল বিভাগের আইনজীবী হলেও তিনি রাজনীতিবিদদের ব্যক্তিগত আইনজীবী হিসেবেই খ্যাত কর্মী। শিক্ষিত মানুষ। রাজনীতির ভালো জ্ঞান ধারণা রাখেন।

তিনি মুরসালীনকে জিজ্ঞেস করলেন, "এই যে এইসব র-ক্তার-ক্তি কর্মকাণ্ড করে বেড়াও, লাভ কী হচ্ছে?"

মুরসালীন স্বভাবসুলভ হাসল, "একটা গল্প শুনবেন, স্যার?"

-"গল্প?"

-"জি, স্যার। গল্প।"দোলন সাহেব তাকিয়ে রইলেন। মুস্তাকিন মহানের মতোই দেখতে

অনেকটা। তবে মুরসালীনের চেহারাটা কিছু ধারালো। মুস্তাকিন খুব গম্ভীর ছিল, এবং সল্পভাষী, চুপচাপ, নিঃশব্দ চলন। ছোটটা হয়েছে চতুর, চঞ্চল।

মুরসালীন বলল, “পাশাপাশি দুই মহিলার বাড়ি ছিল। তাদের মধ্যে একটুও বনিবনা ছিল না। কিন্তু সারাদিন চেঁচাতে দেখা যেত এক মহিলাকে। সে সারাটাদিন অপর মহিলাকে খিস্তি করতো। লোক বিরক্ত ছিল সেই মহিলার ওপর। একদিন তার এক শুভাকাঙ্ক্ষী তাকে গিয়ে আস্তে কোরে জিজ্ঞেস করল, ‘আচ্ছা, ও তো একদম চুপ। অথচ তুমিই

খালি এমনে চেঁচাও, পাড়ায় নাম খারাপ হয় তোমার।'

মহিলা দুঃখের সাথে বলল, 'আপনারা খালি আমার চেঁচানোটা দেখেন, শোনেন। অথচ ও রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই দরজায় দাঁড়িয়ে বেড়ার ওপর দিয়ে আমাকে ঝাটা উঁচিয়ে পেটানোর ইশারা করে চুপ করে থাকে। আর আমি সেই দুঃখে সারাদিন চেঁচাই।''

দোলন সাহেব কপাল জড়ালেন। মুরসালীন হাসল, ''আপনি কি বুঝতে পারছেন আমার কথা, স্যার?''

দোলন সাহেবকে পেরিয়ে চয়ন এগিয়ে এলো, "শুয়োরের বাচ্চা, তোর ফ্যাঁদা প্যাঁচাল শুনতে আসি নাই আমরা এইখানে।"

দোলন সাহেব চয়নকে সরিয়ে দিলেন। বললেন, "তোমার অপরাধ কী জানো তুমি?"

-"বর্তমান সরকার ও সরকার বিরোধী আমি। এটা আপনাদের ধারণা।"-"আমাদের ধারণা? সত্যি নয়?"

-"আংশিক সত্যি।"

-"বাকিটা মিথ্যা কীভাবে?"

-"সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।"

-"আচ্ছা পরে শুনছি।" কিছুক্ষণ চুপ থেকে দোলন সাহেব বললেন, "শিক্ষিত ছেলে তুমি।

জানাশোনা নেহাত কম নয়। পথটা কি ঠিক তোমাদের?”

মুরসালীন জবাব দিলো না সাথে সাথে। চতুর লোকটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল। প্রশ্নের ধরণ ও গলার স্বরেই মানুষকে নিজের কাছে নিজেকে অপরাধী বানিয়ে ফেলার ক্ষমতা রাখেন দোলন সাহেব।

-“স্যার, আমি নিরপেক্ষ কেউ একজন।”

-“নিরপেক্ষ?” হাসলেন দোলন সাহেব।

-“জি, স্যার। আপনি বিশ্বাস করতে পারছেন না, বোধহয়।”

-“না পারারই তো কথা। তাই না?”

-“আমি কোনো দলের সমর্থক নই। আমি শুধু কার্যক্রমগুলোকে সহ্য করতে পারায় ব্যর্থ। আবার আপনাদের সমর্থন করা যায় না বলে যে বাকিদের করতে পারি, এটা আরও কঠিন ভুল।”

-“তাই নাকি? অথচ তুমি কোনো এক দলের প্রতি অনরাগী। তুমি যে দলের দিকে বেশি গড়িয়েছ, তারা খুব মানবিক?

-“অন্তত আপনাদের চেয়ে।”কামরুল দোলন সাহেবকে পার করে চপাৎ করে এক ঘুষি মারল মুরসালীনের মুখে। দাঁতের কোণা বেয়ে রক্ত বেরিয়ে মুখটা ভরে গেল। মুরসালীনের

হাত খোলা ছিল, তবু প্রতিক্রিয়া দেখাল না কোনো।

-"আমাদের চাইতে ওরা মানবিক? যারা যুদ্ধাপরাধীদের সমর্থন নিয়ে জোট করে আর দেদারসে মানুষ মারে, ওরা মানবিক?" বাপ্পী মন্ডল খেঁকিয়ে উঠল।

-"মানুষ মারার কথা বলছেন? কী আশ্চর্য! সাগর কেন নদীকে দোষারোপ করবে বুকে পানি ধারণ করায়?"

-"কী বলতে চাও, তুমি?" দোলন সাহেব বললেন।-"স্যার, কথা বললে অনেক হয়ে যাবে। বলব কি? আর শর্ত হলো, আমি যতক্ষণ কথা বলব, আপনারা শুধুই শুনবেন।

না কোনো জবাব, না প্রতিক্রিয়া। পরে দেখাবেন, যা জমে ততক্ষণে। আমি তো পালাচ্ছি না।"

অন্তূ দীর্ঘ করে শ্বাস টানলো। তার নিজের ওপর থেকে আত্মগ্লানির বোঝা নামছে। তার প্রতিবাদ তাকে তিলে তিলে ক্ষয় করেছে, সাথে সব কেড়েছে। এই গ্লানি টানা বড় কষ্টের। অথচ আজ সৈয়দ মুরসালীন মহানের মুখের আত্মগরিমা, একেকটা সূঁচালো বাণের মতো কথার তীর, আর যুক্তি তার ভয় কাটাচ্ছিল। মুরসালীনের শরীরে ব্যথা নেই, চোখে মৃত্যুর ভয় নেই, কথায় জড়তা নেই। তবে সে কেন এত জমে গেছে!

দোলন সাহেব বললেন, “বলো।”-“বলাটা ব্যাপার না। সমস্যা হলো, আপনারা নিতে পারবেন তো! না, আসলে স্বাধীন বাংলাদেশে আবার কথা বলা পাখিদের লোকে খাঁচায় পোষে তো!”

কটমট করছিল সবগুলো। মুরসালীনের কথাবার্তার সুর ভীষণ তীক্ষ্ণ, সরল উপহাস। কিন্তু দোলন সাহেব বিঁষ গিলে হাসলেন, “বলো।”

মুরসালীন বলল, “আমার আব্বা খু-ন হয়েছে ২০০২-এ। কে মেরেছে জানেন?”

-“আন্দাজ করতে পারি।”

মুরসালীন মৃদু হাসল, এরপর বলল, “আপনি জেনে থাকবেন হয়ত, সেই বছর বিরোধী দলীয় প্রধানের নির্দেশে ৮৫ দিনের একটি অপারেশন চলেছিল। সন্ত্রাসবাদ নিপাতমূলক ব্যবস্থা– অপারেশন ক্লিনহাট। যদি বলেন ওই দলকে সাপোর্ট করার একটা মাত্র কারণ বলো। সেই একটা কারণ এটা হতে পারে। ”দোলন সাহেব হেসে উঠলেন, “এই একটা কারণে ডুম হয়ে গেলে? কাঁচা বুদ্ধি তো না তোমার। বিবেচক তুমি।

মুরসালীন হাসল, “মিছেমিছি সুনাম করবেন না। আর আমি ডুম হইনি, স্যার। একটা মাপকাঠি পেয়েছি মাত্র।আপনাদের পক্ষ থেকে

বাংলাদেশ আজ অবধি কী পেয়েছে কী, স্যার? নাহ, বহুত কিছুই পেয়েছে অবশ্য, সেসব থাক। মূলত, তথাকথিত স্বাধীনতা যুদ্ধে জিতে পাওয়া এই তথাকথিত স্বাধীন বাংলাদেশ আজ অবধি বাংলাদেশের রাজনীতির দখলে থাকা কোনো পক্ষের কাছেই কিছু পায়নি, শুধু ক্ষয় ছাড়া। অবশ্য কী পেল সেটা বিষয় না, কিছু পেয়েছে, এ-ই অনেক।''

মুরসালীনের গা জ্বালানো কথাবার্তায় স্থির থাকা দায়। দোলন সাহেবের জন্য ওরা চুপ করে বসে আঙুলে মেঝে খুঁটতে লাগল।দোলন সাহেব কেমন করে যেন হাসলেন, "স্বাধীনতা

যুদ্ধের বিরোধিতার গন্ধ আসছে তোমার কথা থেকে।''

মুরসালীন হেসে ফেলল, "অর্থাৎ আমি সেইসকল রাজাকার, যু-দ্ধা-পরা-ধীদের অন্তর্ভুক্ত। দিয়ে দিন স্যার ফাঁ-সি। দেশের শত্রু দশের শত্রু নিপাত হোক নিপাত হোক।
''

এমদাদ সমস্বরে বলে উঠল, "নিপাত হোক...
'' একটা ঝংকার উঠে গেল এবার সবার স্বরে, "নিপাত হোক নিপাত হোক।'' সেইসব ক্লান্ত কণ্ঠে মলিন উপহাস!

মুরসালীন বলল, "স্যার, বর্তমান দেশে যে কয়টা দল শীর্ষে আছে, তাদের একটাও দেশ

পরিচালনাকারী নয় স্যার। চোষক, শোষক, মিশ্র, ভন্ড সব, স্যার। সবাই শুধু দেশটাকে হাতে রাখতে চায়। তবে এটাও ঠিক। চাইবে না-ই বা কেন? তাদের সবার কারও না কারও কৃতিত্ব আছে সেই মহান মুক্তিযুদ্ধে। তার একটা প্রতিদান তো সবার প্রাপ্য। সেই প্রতিদানটা হলো দেশের গদি। যা কেউ ছাড়তে রাজী নয়।''মুরসালীন হাসল, "ছাড়বেটা কেন? কারও বাপের দেশ, কারও স্বামীর দেশ। ছাড়ার মতো ব্যাপার নাকি? উত্তরাধিকারসূত্রে আইনতভাবে দেশ তাদের। কিন্তু সমস্যা হলো স্যার, ভাগী-শরীক অনেক, কিন্তু দেশ একটাই। আমরা যতই নিজেদের

দুঃখী বলি, সবচেয়ে বিপদে কিন্তু স্যার দেশই আছে, ভেবে দেখুন। একা সে কতজনের হবে? কতলোকে মিলে তাকে পাকিস্তানের শাসন থেকে মুক্ত করেছে! ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ যাবার পর সেখানেও এমনই হয়েছিল, জানেন তো! যেসব বিপ্লবীরা ইংরেজ তাড়িয়ে ভারত স্বাধীন করল, স্বাধীনতার পর দেশের গদি নিয়ে ওদের মধ্যেই কামড়াকামড়ি লেগে গেল। স্বাধীনতার পর নিজেদের এই দেশ ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে আরও ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। যা ইংরেজ সরকারের আমলের চেয়েও ভয়ানক। কারণ গৃহযুদ্ধের চেয়ে ভয়ঙ্কর কিছু নেই।''

অন্তূ নির্নিমেষ তাকিয়ে শুনছিল সেসব। তার বুকটা কাঁপল। ইচ্ছে করল মুরসালীনকে বাঁধা দিতে। মুরসালীনদের বাঁচতে হবে। ওরা ফুরিয়ে গেলে কেয়ামত হবে দুনিয়ায়। অন্তূ মনে হলো–মুরসালীনের ভাবনার মতো খাঁটি ভাবনা আর হয়না। দেশের সব দলই তো একমাত্র ক্ষমতাই চায়, নিজেদের অস্তিত্বের জোগান অর্থাৎ ক্ষমতা! কেউ তো ছাড়তে চায়না, কেউ ত্যাগ করতে রাজী নয়! কিন্তু মুরসালীনের কি ভয় পাওয়া উচিত নয়? ওকে মেরে ফেলবে এরা, তারপর এভাবে এসব ভাববে কে?দোলন সাহেব শক্ত হয়ে বসে

রইলেন। মুরসালীনের শর্ত অনুযায়ী কথা বলা যাবেনা।

মুরসালীন বলল, “আমার আব্বা ছিলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্যারা-কমান্ডো ব্যাটেলিয়ন। উনার প্রাক্তনেরা ছিলেন–শহীদ জিয়াউর রহমানের মতো কিংবদন্তিগণ। বলাই বাহুল্য আব্বা কোন দলের প্রতি সামান্য হলেও অনুরাগী ছিলেন। অপারেশন ক্লিনহার্টে পলাশ আজগরের বাবাকে দেশছাড়া এবং ওর দাদাকে বন্দি করেছিলেন তার জুনিয়রেরা। পলাশ আজগরের দাদা কারাবন্দী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। সেই শোধ নিতে গিয়ে পলাশ আজগর আমার খোঁজ না পেয়ে আমার

বোনকে ধ/র্ষ/ণ ও খু/ন করেছে। আমার ভাইকে জয় আমির আগেই মেরে ফেলেছে। স্যার, আমি রাজনীতিতে নয়, রাজনীতি আমাতে জড়িয়েছে। এতসবের পরও নিরপেক্ষ থাকি কী করে? ব্যক্তিজীবনকে এড়ানো দ্বায়, স্যার! তার ওপর বংশ পরম্পরায় পাওয়া এই রোগ।''ঘরে নিস্তব্ধতা নেমে এলো। জয় আঙুলের ভাঁজে চাবি ঘোরাচ্ছে বসে। হামজা লৌহখণ্ডের ওপর আঁকিবুকি করছে। অন্তূ খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল মুরসালীনের কথা। জয়ের দিকে তাকাল। এক ফোঁটা অনুশোচনা অথবা অভিব্যক্তিল পরিবর্তন নেই মুখে। বিরক্তিও

নেই এসব কথা শোনাতে, আগ্রহ তো নেই-ই।

দোলন সাহেব বললেন, “অনেক ভুল-বোঝাবুঝি আছে তোমার মাঝে।”

মুরসালীন হাসল, “মানুষ মাত্রই ভুল।”

চয়ন উঠে এসে মুরসালীনের সামনে দাঁড়াল। হ্যাংলা পাতলা চেহারা, হাতের আঙুল ছয়টা। কালো কুচুটে চেহারা। দাঁতের মাড়ি চেপে ধরে বলল, “সব কথার ওই এক কথা—দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তুমার ব্যথা আছে।” অশ্রাব্য এক গালি দিয়ে বলল, “তুই রাজাকারই তো শালা। যুদ্ধে তোর আমিরদের

ফাটছে একসময়। এহন তোরও ফাটে। আর কস তুই যুদ্ধা-পরাধী-গোরে সমর্থক না?'' মুরসালীন মাথা নাড়ল, ‘‘এখনও বলছি।''আর কে ঠেকায়! চয়ন একাধারে কয়েকটা কঠিন আঘাত করে গেল মুরসালীনের শরীরে। থেতলানোর ওপর থেতলে গেল মুখটা। রক্তে মুখ ভরে উঠল। পুরোনো চটা পড়া ক্ষত তাজা হয়ে উঠল সব। চয়ন বলল, ‘‘তুই আন্দোলন করিস, ওগোর সাহায্য করোস, আমাদের বিরুদ্ধে কথা তুলোস, পুরোপুরি এক্টিভ তুই, শালা। তবু বাটপারি? নটকি মাগীর পুত। তোরে জিন্দা কব্বরে গাইড়া রাখমু একদম।''

মুরসালীন কিছুটা সময় নিলো। হাত দিয়ে রক্ত মুছলো। কয়েকটা শ্বাস নিলো জোরে জোরে। এরপর বলল, “কোনো দলের জন্য নয় সেসব। ব্যক্তিগত সমস্যা আর মানুষের দুর্ভোগ দেখে টুকটাক হাত চুলকায়...”

-“তোমার ধারণা নয় খালি, গোড়া থেকে ভুল।
”

ভীষণ শান্ত মানুষ হিসেবে আবিষ্কৃত হলেন দোলন সাহেব। রাগছেন না, কাউকেই বাঁধা দিচ্ছেন না। সুন্দরভাবে মুরসালীনের মানসিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছেন। মুরসালীন একটু গুছিয়ে নিয়ে বলল, “তাহলে তো অনেক পেছনে যেতে হয়, স্যার।”

-“কতদূর?” দোলন সাহেব হাসলেন, “মোঘল আমলে?”

-“না। অতদূর না। ভারত বিভাগের কাছে গেলেই আপাতত চলবে।”

-“চললেই হলো।”

-“স্যার, এই পৃথিবীতে যতগুলো দেশ স্বাধীনতা আন্দোলনে লড়েছে, তারা সবাই ছিল একেক নম্বরের স্টুপিড। আপনার ওই জোয়ান শরীরের গরম রক্ত, ভীষণ এডভেঞ্চার চায় স্যার। শরীরের তেজে কোনো কিছুর বিরুদ্ধে যেতে রক্ত টগবগ করে তখন। আপনি জানেন, বেশির ভাগ বিপ্লবী যুবক ছিল!”

কামরুল বলে উঠল, “তাই নাকি? আমি তোমাকে এতটাও স্বাধীনতাবিরোধী ভেবেছিলাম না! বাপরে! ভয়ই লাগতেছে তোমারে এখন। পাকিস্তানের গোলামি করতে এত সৌখিন তুমি, অথচ এতগুলা দিন বাইরে ঘুরছো! এখন তো দেখছি, তোমাকে ফাঁসি দিয়েও শাস্তি পুরো করা যাবেনা।”

মুরসালীন হেসে উঠল। দাঁতের ফাঁকে জমাট রক্ত দেখা গেল। বলল, “শূলের ব্যবস্থা থাকলে ভালো হবে। পাঁচ খণ্ড করে দেশের একেকটা জাদুঘরে স্থাপনা হিসেবে রাখলে ভালো। নামফলকে লেখা থাকবে–’সেরা

দেশদ্রোহীদের মাঝে একজন সৈয়দ মুরসালীন মহানের দেহখণ্ড। কেউ হাত ছোঁয়াবেন না।” দোলন সাহেব বরাবরের মতো শান্ত স্বরে বললেন, “কেন এই বিরোধ! যুক্তিযুক্ত মানুষ তুমি, দু চারটে যুক্ত-ব্যাখ্যা দাও, শুনি। ”-“আমি যৌক্তিক মানুষ নই। পর্যবেক্ষক টুকটাক। আমার পর্যবেক্ষণ মতে–যুদ্ধ করে কী পেয়েছি আমরা? একটা স্বাধীন ভূখণ্ড? আর সেক্ষেত্রে স্বাধানীতার সংজ্ঞা হয় এমন— পরের দেশের শাসক পেছন মারবে কেন? পেছন মারবে মারুক, নিজের দেশের শাসক মারুক। আমরা এরকম একটা স্বাধীন ভূখণ্ড পেয়েছি। স্বাধীনতাপ্রবণ বাঙালি আজ অবধি

স্বাধীনতা মানে এটাকেই বুঝে ষোলোই ডিসেম্বরে বিজয় দিবস উদযাপন করে আসছে। অথচ আমি বলি—১৬ই ডিসেম্বরে পাক বাহিনী দেশ স্বাধীন করে দিয়ে যায়নি, নিজেদের হাত থেকে অন্য আরেক হানাদার বাহিনীর কাছে কেবল দেশটা হস্তান্তর করে রেখে গেছে। সেক্ষেত্রে পাকিস্তানের কাছে দেশ থাকলেই বা কী, অথবা দেশের হানাদারের কাছে! আমরা তো জন্মেছিই কেবল শোষিত হবার জন্যই। যার তার হাতে হলেই হলো!”

মুরসালীন একটু থেমে বলল, “স্বাধীনতার আগে আর পরের পার্থক্য শুধু–পরের দেশের

শাসক এবং নিজের দেশের শাসক। অনেকটা ওরকম—নিজের লোক চিবিয়ে খেলে সহ্য হয়, পর টোকা দিলেও না। বুঝতে পারছেন স্যার?"-"তুমি যা বোঝাতে চাচ্ছ, তা যারা বুঝবে তারা এখন ফাঁসির অপেক্ষায়। আমরা বুঝব না এসব।"

-"একটা গল্প শুনবেন স্যার?"

-"অনেক গল্প জানো তুমি।"

-"তা জানি টুকটাক। তবে এখন গল্প থাক। ব্যাপারটা হলো–অবুঝকে বোঝানো গেলেও যারা বুঝে বোঝেনা, তাদেরকে বোঝানো অসম্ভব। ঘুমন্ত মানুষকে ঘুম পাড়ানো যায় না, স্যার।"

মাথা দুলিয়ে হাসলেন দোলন সাহেব,
"তোমার নিজের স্বাধীনতা বিরোধি
মানসিকতার স্বপক্ষে আরও অনেক ধারণা
থাকবে। সেগুলোও শুনতে ইচ্ছে করছে।"
-"জি স্যার, জানা দরকার। নয়ত আমার
ফাঁসিটাকে জনগণের কাছে জায়েজ করতে
কষ্ট হবে। তা যেমন ধরুন, আগে বিদেশীরা
আমাদের দেশে এসে আমাদের জনগণ ও
সম্পদ শোষন করে নিজেদের দেশে নিয়ে
যেত। স্বাধীনতার পর বিদেশীদের এই
খাটুনিটা কমেছে। অর্থাৎ বিপ্লবীরা রক্ত ঝরিয়ে
দেশ স্বাধীন করে এখন নিজেরাই জনগণ ও
দেশের সম্পদ শুষে নিয়ে গিয়ে ইংরেজদের

দেশে দিয়ে আসছে। এটা ভালো, স্যার। ওরা এসে কেন নিয়ে যাবে, আমরা গিয়ে দিয়ে আসব। পরোপরকারী শাসকগোষ্ঠী।'' মুরসালীনের মুখটা কঠিন হলো, ‘‘স্যার, আমি শুধু দেখেছি ওরা নিজেদের অতীতের কৃতিত্ব তুলে ধরে নিজেদেরকে দেশের সর্বেসর্বা প্রমাণ করা ছাড়া বিশেষ কিছু করেনি। আর তা নিয়ে দলীয় বিবাদে ওরা চুল ছেঁড়াছিড়ি করছে, আমরা আম জনতা বলি হচ্ছি। স্যার, আমি কোনো দলেরই সমর্থক নই। কেবল মাঝেমধ্যে দোলাচলে গড়িয়ে পড়ি একেক পাশে, এই যা।''সব কথা রেখে দোলন সাহেব ভ্রু উচিয়ে সতর্ক কণ্ঠে বললেন, ‘‘আর

সবশেষে কথাটা কিন্তু এ-ই আসছে, ওরাও যুদ্ধের বিরোধী ছিল, তুমিও। ওরাও কওমী জামায়াতের সমর্থক ছিল, তুমিও।''

-“খুব ভুল বললেন। সেগুলো কি ব্যাখ্যা করব, স্যার।''

-“করো করো। আমি শুনতে চাই।''

-“ছোটবেলায় যখন যুদ্ধের গল্প অথবা উপন্যাস পড়তাম, পাকিস্তানিদের ওপর এত কঠিন ক্ষোভ জমতো, ইচ্ছে করতো এখন সুযোগ পেলে এখনই ঘাঁড়ে রাইফেল আর হাতের ওপর জানটা নিয়ে যু-দ্ধে চলে যাই, ওদের জাহান্নামে পাঠিয়ে দেশবাসীকে রক্ষা করি।''

মুরসালীন জোরে জোরে হাসল, “বাচ্চা ছিলাম, স্যার। বুঝতাম না। কিন্তু একটু একটু করে বড় হলাম–এরপর দেখলাম–পরের দেশের শাসকেরা এতটা ভয়নাক ছিলই না বাঙালি জাতির ওপর, তথাকথিত সেই স্বাধীনতার পর থেকে বাঙালির সাথে যা যা হয়ে আসছে! তো সেই একই পরাধীনতা যদি এখনও বাঙালিকে গ্রাস করে রাখে, তবে আপনার মনে হয় না স্যার, যুদ্ধটা কেবলই দেশপ্রেমিক বিপ্লবী শহীদদের র-ক্তের অপচয় ছিল? কারণ আমরা বাঙালি তো আজও স্বাধীনতা পাইনি। শুধু নাম পেয়েছি স্বাধীন জাতির। এই ফাঁপা নাম কামানোর জন্য এত

আয়োজন ছিল! এত র-ক্ত, এত ত্যাগ, এত সম্মানহানি, এত হাহাকার!''

একটু থেমে মুরসালীন বলল, "স্যার, এ কারণে হলেও সে-সময়ে যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ছিল, তাদেরকে আমার সচেতন মনে হয়। আর স্যার-''থামল মুরসালীন। দোলন সাহেব বললেন, "বলো বলো। থামলে চলবে না আজ। বলে যাও।''

মুরসালীন হাসল, "আপনারা যাদের যুদ্ধাপরাধী বলে শাস্তি দিচ্ছেন, তাদের বয়স হিসেব করলে আপনাদেরকে মূর্খ অথবা শয়তান ছাড়া কিছু বলা যায় না। নাবালক শিশু ছিল তারা বয়স হিসেবে, তাদের দিচ্ছেন

দেশদ্রোহীর শাস্তি একালে এসে। আবার আজও যারা শিশু, তারাও আপনাদের শিকার! স্যার মূলত, আপনাদের সমস্যাটা কোথায় বলুন তো! সমস্যা মূলত ইসলামে। কারণ ইসলামের জীবনবিধান আপনাদের একরত্তি কর্মকাণ্ডকেও সমর্থন করে না। সমস্যা আপনাদের মূলত, কথা বলা মুখে। যে মুখগুলো মূর্খ-বোকা বাঙালদের সম্মুখে আপনাদের স্বরূপ তুলে ধরে নিজেদের বয়ানের মাধ্যমে।সমস্যা মূলত, আপনাদের অ-নীতিতে। যে নীতি শিবিরের ছেলেরা গুড়িয়ে দিতে চায়। তাই যেন দেশে আর কোনো বিবেচক মুক্তিপ্রেমী গরম রক্তের যুবক

তৈরি না হয়, সেই ব্যবস্থা করছেন আপনারা। যারা তৈরি হচ্ছে বা হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাদের মিটিয়ে দিচ্ছেন। আপনাদের সমস্যা নেই জয়েদের থেকে। কারণ ওরা আপনাদের কাছে অনৈতিক সুবিধা আর সব রকম প্রশ্রয় পেয়ে অন্ধ, ওরা অবিবেচক, ওরা আপনাদের কাছে ঋণী, তাই বিরুদ্ধে বলার মানসিকতা হব না ওদের। অথচ আপনারা কোথাকার কোন মিছেমিছি যুদ্ধাপরাধ, কোথাকার কী টেনে এনে পথ সাফ করছেন! কৌশল ভালো, তবে সস্তা।''কবীরকে গ্রেফতার করা হয়েছিল সন্দেহভাজন হিসেবে। গোটা জিজ্ঞাসাবাদের

সবটাই ছিল—জয় ও হামজার গতিবিধির ব্যাপারে।

অফিসার বললেন, "যেদিন পলাশকে ধরতে যাওয়া হয়েছিল, সেদিন জয় ও হামজা কোথায় ছিল?"

কবীর জানে না এখন কেমন মিথ্যা বলা উচিত। কোথায় ছিল বললে জয়ের ক্ষতি হবে না! সে বলল, "স্যার, আমি ওই কয়টা দিন খুব অসুস্থ ছিলাম। জ্বর, সর্দি, কাশি। ক্লাবে যাইনি, যোগাযোগ ছিল না ভাইদের সাথে।"

অফিসার মাথা নাড়লেন, "খুবই অবিশ্বাস্য গল্প। আচ্ছা, জয় ও হামজার সাথে পলাশ আজগরের সম্পর্ক আসলে কেমন ছিল?

”-“খুব ভালো, স্যার। খুব বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।”

-“এজন্যই পলাশের কুকর্মের হদিশ জয়ের গোপন মারফতে এসবি ডিপার্টমেন্ট পেয়েছে? তোরা কী ভাবিস? আমরা কিছুই জানি না? পলাশদের মতো অপরাধীদের ছেঁদ ওদের আপন কেউ-ই করতে পারে কেবল।”

পানিভর্তি গামলায় কবীরের মুখ চুবিয়ে ধরে রাখা হলো। নাকে মুখে পানি উঠে চোখমুখ উল্টে এলো কবীরের। টর্চারের এক পর্যায়ে কান দিয়ে রক্ত উঠে এলো।

জ্ঞান হারাবার আগ দিয়ে পানি থেকে টেনে তুলে ফের সেই প্রশ্ন, “কী জানিস, বল! সব

জানিস তুই, শালা। তুই খুব ক্লোজ লোক ওদের।''কবীর কথা বলে না। সে অত চতুর নয়। তার ভয় হয়, মুখ খুললে ভুলভাল বেরিয়ে যেতে পারে। চুপচাপ থাকতে হবে। কিচ্ছু বলা যাবে না। হামজা, জয়ের সাথে গাদ্দারি সে করতেই পারবে না।

কবীরের বাবা হামজার ট্রাক ড্রাইভার ছিল। দুর্ঘটনায় চিরতরে পঙ্গু। তবু হামজা এখনও মাসে মাসে বেতন দেয়। চারটা বোন কবীরের। তিনটার বিয়ে পরপর হামজা নিজে দায়িত্ব নিয়ে দিয়েছে। জয়কে কবীর 'ভাই' মানে। সে ঠিক করে নিয়েছে–মরে গেলেও বলবে না ব্যাপারটা।

কবীরকে চামড়ার বেল্ট দিয়ে পেটানো হলো। পিঠের চামড়াগুলো বেল্টের সাথে ছিঁড়ে ছিঁড়ে উঠে পড়ছিল। কবীর বলল না কিছুই। তার মুখে কথা আসছে না। সে বলতে পারছে না– জয় পলাশকে কীভাবে মেরেছে। তার চোখের সামনে তরুর লা-শ ভেসে উঠছে। জয়ের রসিক মুখখানা হাসছে। সাদা লুঙ্গি উঁচিয়ে হেঁটে এসে জয় কবীরের সামনে দাঁড়িয়ে বলছে, "তুমি কি শালা হাফ লেডিস হে? এইটুকু আঘাতে কেউ এরম কাত হয়ে পড়ে? এনার্জি ড্রিংক এনে দেব? দুই চুমুক দিবি? "রূপকথাকে ওপর নরক নামলো কারাগারে। জিজ্ঞাসাবাদের নামে বিভিন্ন মানসিক ও যৌন

হয়রানির শিকার হতে হচ্ছিল। তাকে যে সকল নারী কয়েদীর মাঝে রাখা হয়েছিল, তারা আবার জঙলি পুরুষের চেয়েও বেশি ভয়ানক।

রূপকথা দেয়ালে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। এই দুনিয়ায় তার নিজস্ব কেউ নেই। পরাগ আছে, কিন্তু পরাগের সাথে এক প্রকার সৎ-ভাইগত বিরোধও ছিল, সেটা খুনশুটির মতোই লাগে এখন। রূপকথা জানে, পরাগ রূপকথাকে বোনের চেয়ে কম ভালোবাসেনি। তবে সেই ব্যাপারটা জটিল।রূপকথার আজ কয়দিন পরাগকে দেখতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে ওর ক্ষতগুলি দেখতে। নিশ্চয়ই ওকে

খুব মেরেছে! ওর অপরাধ অনেক, আর ভয়ানক! পলাশের জোরে বেঁচে ছিল এতদিন। এবার কি পরাগের ফাঁসি না হয়ে যায় আর? পলাশের কথা মনে পড়ে রূপকথার। কখনও কখনও রূপকথার ওই লোককে ভালোবাসতে ইচ্ছে করতো। স্বামী তো! পলাশ স্যাডিস্ট ছিল। পাগলামির সময় বাদে বাকিসময় খুব ভালো থাকতো। ঠিক চাচাতো ভাই পলাশের মতো। বাপের ওপর রূপকথার একসময় খুব ভালোবাসা ছিল, সেটা বিয়ের পর লজ্জা ও আতঙ্কে পরিণত হয়েছিল। রাজন আজগরকে সে প্রচণ্ড ভয় পেত তারপর। পলাশের চেয়েও বেশি।

যতদিন না সে পলাশের নিখোঁজ হবার ব্যাখ্যা দেবে, তাকে ছাড়া হবে না। এমনকি তার পরেও না বোধহয়। এই কাহিনি তো বহুদূর বিস্তৃত। তা গোটাটা আইন জানলে এই গল্পের প্রতিটা চরিত্রের জন্য শাস্তি বরাদ্দ।

রূপকথার মৃত্যুতে আগ্রহ বাড়ছে দিনদিন। শরীরের ব্যথাকে সে বহু আগে জয় করেছে। আর বর্তমান মানসিক যন্ত্রণা তাকে শুধু মরতে পরামর্শ দেয়।দুইদিন রূপকথা কিছু খায়নি। শেষবার সাত-আটঘন্টা আগে এক গ্লাস পানি খেয়েছিল। পিপাসা পাচ্ছে। কিন্তু রূপকথার বুকে ও গলায় প্রচণ্ড ব্যথা। পানি গিলতে আজাব হয়। হাতের ক্ষততে পঁচনের

মতো ধরেছে। শুকছে না, স্থানটা গলছে। তার ওপরও আবার মারা হয়েছে। সেসব শরীরের যন্ত্রণা বিশেষ কিছু মনে হয়নি রূপকথার। পলাশ তাকে এসব জয় করতে শিখিয়েছে গেছে সেই কবে!পলাশের মাথা দাফন করার পর জয় আর অন্তূ প্রায় শেষরাত অবধি গোরস্থানের প্রাচীরের পাড়ে বড়পুকুরের ধারে বসে ছিল।

কবীর কিছু পয়সা দিয়ে খাদেমকে খুশি করে একটা ইটের গাদার ওপর বসল।

অন্তূ বসে রইল চুপচাপ। তার ভেতরের প্রশ্নরা বড্ড উতলা! জয়ের শরীরে ও লুঙ্গিতে তখন মাটি ভরা। কবীরের কাছ থেকে একটা

সিগারেট চেয়ে নিলো। তাতে আগুন ধরিয়ে পাঁজা পাঁজা ধোঁয়া গিলতে লাগল।

-"আপনি খুব অস্থির!

সিগারেট ঠোঁটে গুজে অস্পষ্টভাবে বলল, "তাই নাকি?"-"অস্থির না হলে সচরাচর আপনাকে সিগারেট টানতে দেখা যায় না।"

-"বাপরে! আপনি খুব জানেন আমায়?"

-"আপনি নিজেও জানেন না নিজেকে। আমিও না।"

-"জেনে কী হবে? পুরষ্কার পাব?"

-"দায়সারা জবাব দেবেন না। বিরক্ত লাগে।"

জয় হো হো করে হেসে উঠল, "দায়সারা লাগছে?"

অন্তূ আচমকা সিগারেটটা জয়ের ঠোঁট থেকে কেঁড়ে নিয়ে ফেলে দিলো পুকুরের ঢালে। বাতাসের ঝাপটায় নাকেমুখে ধোঁয়া ঢুকছিল। জয় কেমন করে যেন হাসল, "ভয় লাগেনা আমারে? এত বিরোধিতা ক্যান আমার সাথে তোমার?"

-"আপনি শুরুটা করেছেন। স্মৃতিশক্তি দূর্বল হয়ে পড়েনি তো!"

নাটকীয় স্বরে বলল "আ? আমি? অপবাদ দিচ্ছ, ঘরওয়ালী! প্রথমদিন আমার সঙ্গে কে বিরোধিতা শুরু করেছে?-"কে করেছে?"

-"আমি জয় আমির। এণ্ড আই ক্যান ডু এনিথিং দ্য ফাক আই ওয়ান্ট! এইটুকু

এখতেয়ার অর্জন করেছি আমি। তাই বলে তুমি ওইরকম ভাব দেখাবে?''

-"ছিঃ! কী যে মারাত্মক পাপ ছিল ওটা। ভাবলে লজ্জাই লাগে এখন। আপনি কোথায় জয় আমির, আর আমি হলাম এক জলে ভাসা পানা। মাফ করেছেন তো আমাকে সেইসব অপরাধের জন্য? নাকি এখনও বাঁধিয়ে রেখেছেন? এখন ক্ষমা চাইব? পা দুটো দেখি আপনার, এগিয়ে দিন তো!''

-"উফহহ!আবার শুরু করলে সেই বাদ-প্রতিবাদ!''

-"খারাপ লাগছে?''

-“না। ভালোই লাগছে।”অন্তূ করল কী! আস্তে কোরে জয়ের কাঁধে মাথা ঠেকালো। জয়ের মেরুদণ্ড শক্ত হয়ে আসে। বুকের ভেতর কেমন যেন ছ্যাঁৎ করে উঠল। দাঁতে দাঁত আঁটকায়। খানিক ধাতস্ত হয়ে বলে, “দুশমনের কাধে মাথা রাখছো! ঘেন্না লাগছে না?”

-“এতগুলো দিন ঘর করার পরেও সেই সেন্সিটিভিটি থাকতে আছে?”

জয় একটু মুখ নামিয়ে ফিসিফিস করে অদ্ভুত গলায় বলে, “যার জন্য সীমাহীন ঘৃণা পুষছো ভেতরে, তার কাধে মাথা রেখে তাকে ধ্বংসের পরিকল্পনা-ছক কষছো। তোমরা এই

ছলনায় খুব দক্ষ, না!''-"হলে কী? তা তো আর আপনার গায়ে লাগবে না!''

-"ছলনা মৃত্যুর চেয়েও খারাপ। খুব ভয়াবহ ব্যাপার-স্যাপার এটা।''

-"আপনার সঙ্গে ছলনা করার কিছু নেই। আপনি সব জানা-বোঝা অবুঝ।''

-"ছলনা বুঝি না।''

-"সব বোঝেন আপনি।'' অন্তূ গাঢ় শ্বাসের সাথে কথাটা বলে।

আলতো করে মাথাটা ঠেকানো জয়ের কাধে। বুকের ভেতর পুড়ছে। ঘাঁড় ফেরালেই আব্বুর কবরটা চোখে পড়বে। আব্বু তাকে সেদিন বলেছিল– 'আমি তোকে মৃত্যুর চেয়েও নিকৃষ্ট

মৃত্যু দিচ্ছি, অন্তূ।’ ‘লোকেরা বলছে, ব্যবসা যারা করে, তারা বিয়ে করতে চায় না।’অন্তূ বিয়ে করে নিয়েছে। জয় আমিরকে বিয়ে করে নিয়েছে। চোখ বুজে জয়ের কাঁধের ওপর মাথাটা আরও শক্ত করে চেপে রাখে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে–লোকেরা অন্তূর ওড়নাটা খুলে ফেলল বুকের ওপর থেকে। সেদিন কেউ ছিল না অন্তূর সম্ভ্রম রক্ষা করার! তবে নষ্ট করার মূলে ছিল সেই পুরুষটি, যার নামের পরিচয়ে অন্তূকে বাঁচতে হচ্ছে। একদলা থুতু এসে জড়ো হয়েছিল অন্তূর মুখের ওপর। সেদিনের সেই লোক সমাগম, সেই সকল ধিক্কারবাণী...অন্তূকে নিয়ে আজও

ভার্সিটিতে কত রটনা! মাথায় জড়ানো গামছাটাও সেদিন ছিল না মাথায়। জয় তখন কী করছিল? চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখছিল। চোখে তৃপ্তি, মুখে বিরক্তি।

অন্তূর শ্বাস উঠল। এইসব ভাবলে কঠোর অন্তূটা কেমন এলোমেলো হয়ে যায়!

জয়ের কাধে গরম নিঃশ্বাস পড়ছিল। বাহুর স্নায়ুতে অন্তূর বুকের তোলপাড় অনুভূত হচ্ছিল। জয় হাসল, "ঘরওয়ালি! এবার মনে হচ্ছে আপনি খুব অস্থির। একটা সিগারেট দেব? ওয়ান্না ট্রাই এ লিটল?"

অন্তূ অনেকক্ষণ চুপ থেকে বলল, “পলাশকে মারলেন কেন?”-“তরুর কাছে ওয়াদা করেছিলাম।”

-“আপনি তো দায়বদ্ধ না কারও কাছে! তার ওপর আপনি যখন ওয়াদা করেছেন, তরু তখন জীবিত ছিল না। এক মৃতদেহের কানে কানে করা ওয়াদার খাতিরে জয় আমির এত ঝুঁকি ওঠাতে পারে?”

-“সেক্ষেত্রে তুমি কী ভাবতেছ?”

অন্তূ মাথা তুলে সোজা হলো, “কাঙাল আপনি। স্নেহের কাঙাল, মায়ার কাঙাল। কারও মায়ার দায়বদ্ধ আপনাকেও কয়েদ করে ফেলতে পারে।”

জয় হাসে, “এত ভুল ধারণা পুষো না আমার ব্যাপারে। আমার জীবনে, সমস্যা, ব্যথা, কষ্ট, আবেগ, অনুভূতি—ছাড়া সব আছে। তুমি জানো না আমায়।”-“জানতে চাই।

-“দরকার কী?”

-“জানি না। আর এমনও না যে আমি আপনাকে একটুও জানিনা।”

-“তাহলে তো হলোই! জানোই তো!”

-“আপনি আপনার অতীতকে ভয় পান?”

-“আমার কোনো অতীত বা ভবিষ্যত নেই। আছে একটা বর্তমান। যতক্ষণ শ্বাস চলবে, প্রতিটা চলমান মুহুর্তের বর্তমানকে মানি আমি শুধু। আমি তোমাকে আগেও বলেছি, আমি

খারাপ, তাই আমি খারাপ, কারণ আমি খারাপ। এর আর বিকল্প আর যুক্তি বা ব্যাখ্যা নেই।''

-"আপনি মুস্তাকিন মহানকে মেরেছেন কেন?''

-"ইচ্ছে।''

-"আপনার সম্পর্কে কোনো কথা বলতে আগ্রহী নন আপনি। তো এটাই তো আসে হিসেবে, আপনি নিজেকে লুকোতে চান।''

জয় অন্তূর কানের কাছে মুখ নিয়েছিস ফিসিফিস করে বলল, "ফিল্মি ডায়ালোগ মারছো, ঘরওয়ালি! কী লুকাতে চাই? মানে আমাকে আবার সেইসব হিরোর মতো ভাবতে চাইতেছ না তো–যারা নিজেদের ভালোকে

লুকিয়ে রেখে খারাপটা দেখায়, কিন্তু আসলে তারা ভালো। এমনটা ভাবছো?”

-“প্রশ্নই ওঠে না।”

-“উঠিও না কখনও। জয় আমির আগাগোড়া নষ্ট। তুমি কী যেন বলো না! হ্যাঁ, পাপীষ্ঠ। যদিও পাপ শব্দটাকে বুঝি না আমি।”

-“অতীতটা খুব দূর্বল ছিল আপনার?”-“তার মানে এখন আমি খুব শক্তিশালী?”

-“এত হেঁয়ালি করেন কেন? মানুষ জানে না, আপনি কতটা রহস্য করে কথার মারপ্যাচ খাটাতে পারেন।”

জয় হাসল, “সহজ ভাষায় কথা বলছি আমি। বলো, কী জানতে চাও?”

-"আপনি মাজহার, পলাশ, ঝন্টু সাহেব এদের কেন মেরেছেন? যেখানে আপনি নিজেও একই গাছের ফল! ওদের মারতে আপনার এত আয়োজন! পাপীর হাতে কেন পাপীরা মরবে? তা যদি হয়-ই! তবে আপনি আপনাকে কেন মারেন না?"

জয় হাসল, "আত্মহত্যা মহাপাপ।"

অন্তূ হেসে উঠল, "পাপ? ইশ, মহাপাপ? আপনি বলছেন?"

জয় নিজেও হেসে ফেলল গা দুলিয়ে। আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি মেরে দাও। কেউ একজন বলেছিল, বউয়ের হাতে

মরলে নেকি হয়। কোন সম্বন্ধির ছাওয়াল বলেছিল, কে জানে!''

-"আমার হাতে মরার খুব শখ? আজকাল কেমন নিজেকে সঁপে দেন। ব্যাপারটা যায় না আপনার সঙ্গে?''

-"যায় না?'' জয় হাসল, "কী যায় আমার সঙ্গে? তুমি কি আমায় অবজার্ভেশনে রেখেছ নাকি? প্রেমে-টেমে পড়ে যাওনি তো?''

অন্তূ হাসল, "অবজার্ভেশন! হ্যাঁ, অবজার্ভেশন। আমার প্রশ্নের উত্তর দেননি।''

-"তোমার মতে তোমার সঙ্গে অনেক অন্যায় করেছি আমি। তো তার শাস্তি হিসেবে মেরে

দাও, নাকি আরও কঠিন প্ল্যান-প্রোগ্রাম আছে? তাও যদি তৃপ্তি পাও।"

-"আমার মতে? অর্থাৎ আপনার মতে আপনি কোনো অন্যায় করেননি আমার সঙ্গে?"

-"না।"দুজন কেউ কারও দিকে তাকায় না। এটা জয় ও অন্তূর পারস্পারিক নিজস্বতা। কিন্তু অন্তূ তাকাল এবার, "কোনো অন্যায় করেননি?"

অকপটে বলল জয়, "না।"

-"মারলেও তবে আমি সেদিনের অপেক্ষা করব, যেদিন আপনার মনে হবে আপনি আমার সঙ্গে অন্যায় করেছেন।"

-“তাহলে আর তোমার হাতে মরার সাধ মিটলো না এ জনমে।”

-“অনুশোচনাকে ভয় পান?”

-“আজ আমার ভয়ের তালিকা তৈরি করতে বসেছ নাকি? কী কী বিষয়ে ভয় আমার?”

-“তালিকা প্রস্তুত।”

-“সর্বনাশ। শুনি দেখি, তালিকায় কী কী বিষয় অন্তর্ভূক্ত করলে!”হামজা যখন ভার্সিটির ছাত্রনেতা হয়ে উঠেছিল, সালটা ২০০২। জয় কেবল তখন দশম শ্রেণীতে, বয়স কমবেশি পনেরো। তখন সে জীবনের প্রথম খু-ন হিসেবে সৈয়দ মুরসালীন মহানের বাবা সৈয়দ ফরহাদ মুহাম্মাদ বারী সাহেবকে খু/ন করল।

বিরোধী দলের রাজত্ব চলছে তখন বাংলাদেশে।

পুলিশ ফেরত হবার পর জয়কে তারপর প্রায় তিন সপ্তাহের বেশি সময় পাওয়া গেল না। একটা কবরের মতো অন্ধকার বেসমেন্টে সপ্তাহখানেক আঁটকে রাখা হলো। এক গ্লাস করে পানি পেত সে চব্বিশ ঘন্টায় একবার, সাথে দুটো ছোট্ট ছোট বিস্কুট।আলোহীন কুঠুরি। জয় কখনোই সেই ঘরের বর্ণনা দিতে পারবে না। সে ঘরটাকে দেখেনি। শুধু জানে কোনো এক খসখসে মেঝেতে তাকে বসে থাকতে হতো। চোখের সামনে কবরখানার মতো নিকষ কালো অন্ধকার। জয় চোখ বুজে

থাকতো। চোখের সামনে একটা নির্দিষ্ট সময়ের বেশি অতি আলো অথবা অতি অন্ধকার মানব মস্তিষ্ক সইতে পারে না। জয় বুঝতে পারছিল, সে পাগল হয়ে যাবে। কিন্তু চোখ বুজলেও সেই অন্ধকারই! মস্তিষ্কে কত রকমের বিভ্রম তৈরি হয়। কতকিছু যে দেখে জয়, অনুভব করে নিস্তব্ধ আঁধারি আশাপাশটা! চারদিকে কোথাও আওয়াজ নেই। জন-মানবের শ্বাসের শব্দটুকুও নেই। নিজের বুকের শ্লথ হৃদস্পন্দন আর গাঢ় শ্বাসের আওয়াজ অদ্ভুত শোনায় কানে।

কেউ ছিল না তার কাছে তখন। কিন্তু কেবল মৃত্যুর সঙ্গ পেয়েছে বারবার সে এসব সময়

গুলোতে। মৃত্যু এসে বসে জয়ের সম্মুখে। গল্প করে জয়ের সঙ্গে। মৃত্যুর সঙ্গে যেতে চায় জয়, অনুরোধও করে। কিন্তু মৃত্যু বলে, ‘এত দ্রুত নয়। অপেক্ষা করতে হবে।’জয় অপেক্ষাকে ঘৃণা করে। সে মৃত্যুর প্রেমে পড়েছে খুব ছোটবেলায়। গভীর প্রেম। কিন্তু মৃত্যু বরাবর শেষ পর্যায়ে প্রত্যাখ্যান করেছে জয়কে। প্রতারণা করেছে জয়ের সাথে। ছোটবেলা থেকে করে আসছে। বারবার আসে, বহুদিন জয়ের সঙ্গে সময় কাটায়, জয়ের ভেতরে নিজের জন্য মায়া তৈরি করে। কিন্তু আলিঙ্গন করে না!

মানসিক অবস্থা যখন উলোট-পালোট হবার দিকে, সে-সময় দরজা খোলা হলো। লেপ-তোষক সেলাই করার সুঁচ, যাকে বাঁশসুঁই বলা হয়। জয়ের শরীরে গাঁথা হতো তা। কখনও এবরো-থেবরো ইটের টুকরো দিয়ে পেটানো হতো। শরীরের মাংসপেশী ছিঁড়ে আসতো। কিশোর বয়সের ছিপছিপে লম্বা শরীরটায় গভীর সহ্যক্ষমতা জন্মে যাচ্ছিল জয়ের। অতিরিক্ত ড্রাগ দেবার ফলে নাক-মুখ দিয়ে গবগবিয়ে রক্ত আসতো। প্রায় মাসখানেক অবিরাম ড্রাগ সেবন করানোর ফলে জয় আসক্ত হলো। দিনদিন ক্রমাগত কড়া হতো ড্রাগের ডোজ। অসীম যন্ত্রণায় জর্জরিত মৃত্যুর

মুখে দাঁড়িয়ে জয় মৃত্যুকে খুব ডেকেছে। মৃত্যু আসে, দূর থেকে চেয়ে দেখে জয়কে। কিন্তু বরাবরের মতো ছলনা করে চলে যায়।

জয়ের মাঝেমধ্যেই নিজেকে নির্লজ্জ মনে হয়েছে। মৃত্যু তার প্রেমকে এত্ত অবহেলা করেছে, এত ছলচাতুরি করেছে। তবু জয় বিমুখ হতে পারে না। তার প্রেম ফুরোয় না মৃত্যুর ওপর থেকে।

হামজা পাগলের মতো চারদিকে ঘুরেছে। দেশে কড়াকড়ি আইন চলছিল তখন। চারদিকে অপরাধী গ্রেফতার, আর দণ্ডের দিন চলছিল। হামজা প্রতিকূল এক পরিবেশে, তখনকার বিরোধী দলের পক্ষে খোলাখুলি

দলীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা কর্মী। কারণ তার বিশ্বাস ছিল—সামনে দিন বদলাবে। নতুন এক শাসনব্যবস্থা আসবে বাংলাদেশের সংসদে।একদিন পুলিশ এলো হামজার কাছে জয়ের খোঁজে। সৈয়দ মুজাহার মহানকে হ-ত্যার দায়ে প্রথম সাসপেক্ট জয় আমির। হামজাকে গ্রেফতার করা হলো জয়ের নিখোঁজ হবার সতেরো দিনের দিন।

প্রসাশনের দৃঢ় বিশ্বাস, সে জয়কে লুকিয়ে রেখেছে। হামজা বলল, “স্যার, আমি নিজেই ওকে খুঁজে হয়রান। আপনারা যেভাবে জয়কে সন্দেহ করছেন মুজাহার সাহেবের মৃত্যুর জন্য, মুজাহার সাহেবের দলীয় কর্মীরাও তাই

করছে, স্যার। ওরা জয়কে গুম করেছে। আপনারা ওকে খুঁজতে সাহায্য করুন আমায়।
”

হামজার সুচতুর কথাবার্তায় প্রসাশন কর্মকর্তারা ভিজলেন না। বললেন, “তাহলে আগে কেন রিপোর্ট করোনি? বেশি শেয়ানা ভাবো নিজেকে? যদি এটাই মনে হতো, তো আগে নিখোঁজ ডায়েরী করতে। নিজে লুকিয়ে রেখে তো আর ডায়েরী করা যায় না!”হামজা ওদের কোনোভাবেই বিশ্বাস করাতে পারেনি, সে জানে না জয় কোথায়! আবার এটাও ঠিক, জানলেও বলতো না, প্রশ্নই ওঠে না। আর এটাও ঠিক–জয় খু-নটা করেছে। কিশোর

অপরাধ। জয় তখন ধরা পড়লে তৎক্ষণাৎ ফাঁসি হতো না হয়ত। কিন্তু আইনের হেফাজতে থাকবে সাবালক হওয়া অবধি, এরপর দণ্ড। অথচ হামজার চিন্তা জয়ের ক্যারিয়ার নিয়ে। সামনে ওর এসএসসি পরীক্ষা।

হামজা বুঝতে পেরেছিল, খুব শীঘ্রই তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসবে। এই সরকারের পতন ঘটবে। এরপর দিন আসছে সামনে বোধহয় তাদের।হামজারকে কারেন্টের শক দেয়া হলো। একেকবারে শরীরটা রিকেটস রোগীর মতো বেঁকে উঠছিল। শরীর থেকে যেন একেকবারে এক লিটার করে রক্ত শুষে

নিচ্ছিল বিদ্যুৎ। অবশ হয়ে উঠল স্নায়ুকোষগুলো, থরথর করে কাঁপছিল শরীরটা। ঠোঁটের কোণ ও নাক দিয়ে র-ক্ত বেরিয়ে এলো।

তবু হামজা বোবা। তাগড়া-দূর্বল দেহখানা চেয়ারের পিঠে ঠেকিয়ে মাথা হেলিয়ে চোখ বুজে রইল। শ্বাস পড়ে না ঠিকমতো, দুই হাঁটু ঠকঠক করে কাঁপছে। শরীরের প্রতিটা রগ ঝিনঝিন করছিল। হামজার মুখ থেকে ব্যথার পেক্ষিতে আর্তনাদও বের হচ্ছিল না। জয়ের নামটাও মুখে আনলো না।এরপর হামজার হাতের আঙুলের উপরিভাগ কেটে ফেলা হলো। অল্প একটু চামড়ার সঙ্গে বেঁধে রইল

আঙুলের অংশটুকু। তখনও হামজা নিশ্চুপ। ওকে জিজ্ঞেস করা হলো, “শেষবার জিজ্ঞেস করছি, বল তোর জয় কোথায়?”

হামজা হাসল, “শেষবার নয়। আবার জিজ্ঞেস করবেন। এবং প্রতিবার আমার উত্তর থাকবে —আমি জানি না জয় কোথায়! শুধু জানি, মানে পাক্কা আন্দাজ করতে পারি জয়কে কারা ধরেছে। আমার ধারণা জয়কে তারা মারবে না। মারলে গোটা দলটাকে আগুন লাগিয়ে দেব। আর না মারলে এই দুনিয়ার যেকোন প্রান্ত থেকে আমি হামজা একা জয়কে খুঁজে বের করে আনব। আপনাদের সাহায্যের আর দরকার নেই আমার।”

হামজার হাতের আঙুল সেলাই করা হলো। দাগটা পরবর্তীতে মেলেনি আর।জয়কে উদ্ধার করলেন বাপ্পী মণ্ডলের চাচা গিয়াস মণ্ডল। দলের সেই সংকটের সময়ও উনি উল্লেখযোগ্য এক বিরোধীদলীয় নেতাকর্মী। জয় ও হামজার মতো দুটো বারুদকে দলে পেলে দলের ভর বাড়ে। এভাবেই দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা বৃদ্ধি করতে হচ্ছিল তখন। ছাত্রলীগ ও সন্ত্রাস এবং যে সকল অসাধু রাজনীতিবিদেরা অপারেশন ক্লিনহার্টে ধরা পড়েছিল, তারা এমনিতেই দল ছেড়ে এই দলের প্রতি ঝুঁকছিল। এবং বাপ্পী মণ্ডলেরাও তাদের সাদরে গ্রহণ করছিলেন।

জয়কে ছাড়িয়ে আনারও প্রায় তেরোদিন পর্যন্ত হামজা আইনের হেফাজতে রইল। সে তখন উঠতি ছাত্রনেতা। তার বিরুদ্ধে অভিযোগের কমতি নেই। বড় বড় নেতাকর্মীদের সুনজর হামজার ওপর তীব্র। রাজধানী থেকে রোজ ডাক আসছে।জয় ড্রাগের নেশায় পাগল তখন। তার বুক-পিঠের ক্ষতগুলো গর্তের রূপ নিয়েছে। হিতাহিত জ্ঞান অনেকটাই লোপ পেয়েছে। দরজা-জানালা খুলতে দিতো না রুমের। দিনের বেলা বাইরে যেত না। আলো সহ্য করা দায়। তার জন্য ড্রাগ জোগাড় করাটা ঝুঁকিপূর্ণ

ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। হামজা থামাতে পারতো না জয়কে।

তরু নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে জয়ের সেবা করেছে। সেই দিনগুলোতে স্কুলে অবধি যেত না মেয়েটা।

শরীরের ব্যথানাশক হিসেবেও কড়া সব ড্রাগের ব্যবহার করতে হয়েছে জয়ের শরীরে। জয়কে ঘরে আঁটকে রেখে চিকিৎসা করার ব্যবস্থা করা হলো। জয় ২০০২-এর এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিল। সে-বছর পরীক্ষাও দেয়া হলো না। ইয়ার-লস।মানসিক ও শারীরিক অবস্থা একেবারে বিগড়ানো। সে র-ক্ত ও মৃত্যুর

প্রেমে খুবই ছোটবেলায় পড়লেও প্রত্যক্ষভাবে নিজের হাতে প্রথম খুনটা সেবারই করেছিল। পলাশের হোটেলে তার নিয়মিত যাতায়াত শুরু হলো। পলাশের সঙ্গ তাকে অনেকটা চাঙ্গা করে তুলল। পলাশ জয়কে প্রচুর সঙ্গ দিয়েছে। পলাশের কত নারকীয় অপরাধের সাক্ষী জয়! অদ্ভুত এক সম্পর্ক তৈরি হলো ওদের। মদ, গাঁজাসহ বিভিন্ন ড্রাগ ও নারীনেশায় লেলিয়ে দিলো হামজা।

কলেজে ভর্তি হবার পর পড়ালেখার সাথে সমান্তরাল হারে দুই ভাইয়ের আগ্রাসী যাত্রা শুরু হলো। হামজার তখন অনার্স শেষের দিকে। সে ধীরে ধীরে ছাত্র সংগঠনের কর্ণধার

হয়ে উঠেছে। সমাজে পরিচিতি বাড়ছিল, সাথে বদনাম ও পুলিশের খাতায় অপরাধ-অভিযোগও!জয় জীবনে স্বীকার করে না সে কখনও পুলিশের হেফাজতে গেছে।
হামজা দিন যেতেই আরও গভীর পথিক হয়ে উঠছিল। তার নজর, চাহিদা ও গন্তব্যের বহর বাড়ছিল। অপরাধের সীমাবদ্ধতার সুঁতো ছিঁড়ে-ফেঁড়ে অসীম হয়ে যাচ্ছিল।
রাজধানীতে বড় বড় নেতাকর্মীদের সঙ্গে গভীর সখ্যতা গড়ে উঠল। বিশাল বিশাল পরিকল্পনার সঙ্গী হতে থাকল হামজা।গাড়িতে উঠতে গিয়ে হামজা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ড্রাইভিং

সিটে কবীর নেই। নিটু বসে আছে। বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে হালকা। সকাল দশটা বাজে। গাড়ি ছাড়ার সময় হলে অন্তূ ছুটে এসে পেছন থেকে ডাকল, "মেয়র সাহেব!"

হামজা ফিরে তাকালে অন্তূ বলল, "শুভ সকাল, মেয়র সাহেব!"

হামজা কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে মাথা নামায়, আলতো হেসে বলে, "শুভ সকাল!?"

-"কোথাও যাচ্ছেন, নিশ্চয়ই! আমাকে ভার্সিটিতে নামিয়ে দিয়ে যাবেন। বৃষ্টির ভেতরে রিক্সা পাওয়া ঝামেলা।"

হামজার ভ্রু কুঁচকে উঠল। অদম্য সাহস মেয়েটার। আড়ষ্ঠতা, সংকোচ কিচ্ছু নেই।

হামজার সঙ্গে কথা বলার সময় এমনকি রিমির কণ্ঠেও এক প্রকার জড়তা ও সমীহ থাকে। কতকাল হামজা নিজের চোখের দিকে তাকিয়ে কাউকে কথা বলতে শোনেনি, দেখেনি।হামজা জানায়, "আজ ভার্সিটিতে যাবে না, তুমি। আমার অনুমতি নেই।"
অন্তূ এগিয়ে এসে হামজার চোখের দিকে তাকিয়ে শান্তস্বরে বলল, "আপনার আদেশ-নিষেধের পরোয়া করি না আমি, মেয়র সাহেব। জানেন তো আপনি।"
অন্তূ হামজার পাশে উঠে বসে। গাড়ি চলতে শুরু করে। বসে থাকে দুজন পাশাপাশি। হামজার শরীর থেকে হ্যাভি বডি-স্প্রে-এর

গন্ধ উড়ছে। দুজনের মাঝে আধা-ফিট ফাঁক। কেউ কারও দিকে তাকায় না। রাস্তারা পিছনের দিকে পিছিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে গাড়ি এগিয়ে যায়। দুজনের এই নীরবতা এক ক্ষমতাধর ধূর্ত পুরুষের সঙ্গে এক আঘাতপ্রাপ্তা ঘায়েল নারীসত্ত্বার অঘোষিত যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে যায় নিঃশব্দে। অনেক পুরোনো এই বিরোধ! সাধারণ সম্পর্কে অন্তূর এই বিরোধ ভাসুরের সঙ্গে।এক সময় হামজা সিটের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে দিয়ে অল্প হাসে, “থাবা দিয়ে ধরলে আর পার পাবে না। অনেককিছু করেছ, করছো। কিন্তু জেনে রাখা

ভালো, আমাদের বিরোধীতা করে জেতা যায় না।''

-"আপনাদের নয়, মেয়র সাহেব। 'আপনাদের' বলছেন কেন? বিরোধীতা কবে আপনাদের সঙ্গে ছিল? বিরোধিতার সম্পর্ক আমার জয় আমিরের সঙ্গে। আগুন-পানির মতো। হয় আমি, নয় সে। আমি সক্রিয় হলে সে নিভে যাবে। সে সক্রিয় হলে আমি বাষ্প হয়ে নিঃশেষ হব।''

অন্তূ অল্প থেমে তাকাল হামজার দিকে, "আপনার সঙ্গে আমার যা, তা বিরোধিতা নয়, মেয়র সাহেব। ওটা কারবার, এক প্রকার

লেনদেন। তা শুধু আপনার সঙ্গে, শুরু থেকেই তা কেবলই আপনার সঙ্গে।”

হামজা হাসে, “কোন শুরু?”অন্তূও কেমন করে যেন হাসে, “আমার ইজ্জত, আমার জীবন, আমার আব্বুর অবসান! ভুললে চলবে?”

হামজা গা দুলিয়ে হেসে উঠল, “এসবের দায় আমার নাকি?”

অন্তূ প্রগাঢ় চোখে তাকাল, তার নিঃশ্বাস ভারী হয়ে উঠছিল। শ্বাসের ভারে বুকের উঠানামা বাড়ল, মুখটা কঠিন হয়ে উঠে আবার শান্ত হয়ে এলো।

-“আপনি সেদিন যখন বলেছিলেন—’লোকজন চাইলে আপনি আমাকে জয় আমিরের বউ করতে পারেন।’ তখনও বুঝিনি। কিন্তু বুঝেছি সেই কয়দিনে, যে কয়দিন আব্বুর শোক কাটাতে আমি ও বাড়িতে কাটিয়েছি।”
হাসি মুখে রেখে হামজা ভ্রু উঁচায়, “কী বুঝলে?”-“পলাশ আজগর নয়, আপনি আব্বুকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। এরপর পলাশের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এবং সেটা শুধুই আমাকে দমাতে। কয়দিন আপনার সামনে আমার খুব আলোচনা উঠছিল বারবার, তাই না?

সে সময় মুমতাহিণার মৃত্যু আর জয় আমিরের অসভ্যতা নিয়ে আমি খুব সোচ্চার হয়ে উঠেছিলাম। আপনার ভয় ছিল—কোথাও জয়ের রেপুটেশন আর আপনার ক্ষমতায় আঁচ না লেগে যায়। সেই যে ভার্সিটি পরিষদে আমার পক্ষ থেকে জয়ের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ। আর তাতে জয়ের ক্ষমতাচ্যুতির আশঙ্কা! তা সামলাতে বেগ পেতে হয়েছিল আপনাকে!''হামজা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আস্তে কোরে সিটে মাথা হেলিয়ে দিয়ে পকেট থেকে সিগারেট বের করে জ্বালিয়ে ঠোঁটে গোঁজে। চোখ বুজে ধোঁয়া ছেড়ে চোখ মেলে তাকিয়ে বলে, "আর?''

অন্তূ জানালার কাঁচ নামিয়ে দিলো। বৃষ্টির ঝাপটা কমেছে। সিগারেটের ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম।

গাড়ির ছাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "তারপর পাটোয়ারী বাড়িতে সেচ্ছায় পা রাখলাম। খুব আগ্রহের সাথে। তখনও জানতাম না মুমতাহিণার মরণক্ষেত্র এটাই। শুধু আন্দাজ ছিল। সেটা সত্যি মনে হতে থাকল ধীরে ধীরে। আমি তখন মাঝেমধ্যে ইচ্ছাকৃত আবার কখনও অনিয়ন্ত্রিত উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। বোকামির মতো দেখতে কিছু কাজ করেছি। শেষে সত্যি হলো আমার ধারণা। তখন বুঝলাম, আপনার আমাকে দমাতে চাওয়ার

এটাও আরেকটা আর প্রধান কারণ। আমি যেহেতু কার্যালয়ে ঘুরেছি, মুমতাহিণার ব্যাপারে খুব ভাবছি। আমার প্রচেষ্টায় এই জটিল প্যাঁচটা কোনোভাবে খুলে গেলে সবটা ক্ষতি মূলত আপনারই! শিকড় আপনি, মূল আপনি। এবং আশ্চর্যজনকভাবে এই কাহিনি গাছের কাঠামোটাও আপনি।আপনি জানলেন, আমার দূর্বলতা দুটো—আমার আব্বু, আমার সম্মান। আপনি পলাশের মাধ্যমে এক্সাক্ট সেই দুই জায়গাতেই হাত মারলেন। আপনি খুব বোঝেন–আমার মতো মেয়েকে কাবু করতে লম্পট নজরের বিকল্প নেই। সেদিন আব্বুর অবস্থা আর পলাশের আগ্রাসী হামলা আমাকে

যে পরিমাণ ভঙ্গুর করেছিল! আমি আপনার ফ্যান হয়ে গেছি সত্যি! এত্ত ধারালো আর হিসেবি বুদ্ধির মালিক আপনি। নিখুঁত, মেয়র সাহেব!

আমি বিষয়টা বুঝেছিলাম এটা ভাবতে গিয়ে—পলাশ চাইলেই অন্তিককে কেটে টুকরো করতে পারতো। কিন্তু সে অন্তিককে পালানোর সুযোগ দিয়ে আব্বুকে ধরলো! একবার অবশ্য মাথায় এসেছিল–পরিবারকে জিম্মি করাটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তার বদলে অন্তিককে টাকা নিয়ে নয় বরং পলাশের ডেরায় আমাকে ডাকা হলো ফোন করে। টাকার প্রসঙ্গ সাইডে রইল। মূখ্য হলো

আমার অসম্মান আর আব্বুর আঘাত।
আমাকে অসম্মান করতে চাওয়া, জয়ের নির্লিপ্ততা, আব্বুকে ওভাবে প্রায় অকারণে আঘাত করা।
সবকিছুর হিসেব কষতে গিয়ে একটাই সূত্র সামনে এলো—আমাকে ভেঙেচুড়ে গুড়িয়ে দেওয়া, আমাকে রুখতেই সব আয়োজন।
আর তাতে খুব সহায়ক হয়েছিল অন্তিকের জেদের বশে করা একটা ভুল। মেয়র সাহেব, আমি কি ঠিক বলেছি?''হামজা বাহবা দেবার মতো ভঙ্গি করে হাসল, "তুমি সুযোগ পেলে আসলেই খুব ভালো ইনভেস্টিগেটর অথবা লয়্যার হতে পারতে। কিন্তু আফসোস! সেই

সুযোগটা না পাবার ফলে তোমার এমন তীব্র মেধা বিফলে যাবে।”
অন্তূ হাসল, “আব্বু একটা কথা বলতো।”
ভ্রু উঁচায় হামজা, “আচ্ছা! কী বলতো?”
-“বলতো—শিক্ষা সুযোগের অপেক্ষা করে! কিন্তু অভিজ্ঞতা সুযোগকে কেড়ে নেয়।”
-“তোমার সেই অভিজ্ঞতা আছে বলে মনে করছো তুমি যে, আমার কাছ থেকে সুযোগ কেড়ে নেবে?”
অন্তূ গাড়ি থেকে নেমে ফিরে তাকাল, “আপনার পিঠ দেয়ালের কাছাকাছি। এটাকে সতর্কবার্তাই ধরে নিন, মেয়রসাহেব! খুব বেশি সময় পাবেন না নিজের ধারালো

মস্তিষ্ককে কাজে লাগাতে। চাল চালতেও অল্প সময় দরকার পড়ে।"

ততক্ষণে হামজাকে টের পেয়ে ভার্সিটির ছেলেরা গাড়ি ঘিরে ধরেছে। সেই ভিড়ের মাঝে মিশে গেল অন্তূ। হামজা শান্তভঙ্গিতে কেবল চেয়ে রইল সেই ভিড়ের কোলাহল ছাপিয়ে। তার মনে হচ্ছিল—অন্তূকে নিয়ে আরও সতর্ক হওয়ার ছিল। কিন্তু আর কত? নিজের ধারণ করা একটা কথা মনে পড়ল —'আঘাতপ্রাপ্ত কোনো নারী যদি কুচক্রী হয়ে ওঠে, সেই নারীর তৈরিকৃত ফিতনাকে মোকাবেলা করা অসাধ্য হয়ে পড়ে।'তুলি ঘর থেকে বেরোয় না। রিমিও নিশ্চুপ। গোটা

বাড়িটা যেন মৃত্যুপুরী হয়ে উঠেছে। সেখানে বসবাস ছয়জন মানুষের। কিন্তু তারা সকলে যেন মৃত। জয় বাড়িতে থাকে কদাচিৎ। যতক্ষণ থাকে হয় ঘুমায় নয়ত বেহেড থাকে। এখন আর সবাই একসাথে টেবিলে বসে খাওয়া হয় না এ বাড়িতে। তুলির রুমে খাবার দিতে গিয়ে অন্তূ দেখল, তুলি নামাজে বসেছে। অন্তূ ভাবে—কেউ কেউ বেশি কষ্টে ধর্ম বিমুখ হয়ে পড়ে, কেউ-বা ধর্মমুখী। তুলির কাছে বসে থেকে লাভ নেই। সে কথা বলে না। হাসলে দেখতে উন্মাদিনীর মতোন লাগে। অন্তূ রুমে ঢুকতেই জয় গোসল করে বের হলো। ক্ষত-বিক্ষত বুক-পিঠ। কী ভয়ানক সব

দাগ! গর্ত হয়ে হয়ে আছে। কোথাও বা সেলাইয়ের দাগ, কোথাও চামড়া ঠেলে মাংস বেরিয়ে আছে। গলায় লাল গামছা ঝুলছে। পরনে আরেকটা গামছা। সে তোয়ালে ব্যবহার করে না। তার পোশাক গামছা, লুঙ্গি, শার্ট প্যান্ট, হাফ-প্যান্ট। পাঞ্জাবী পরে হামজার ধমকে লোক দেখাতে। নামাজটাও কয়েকবার তেমনভাবে পড়তে হয়েছে।

লোকের সামনে পড়ে গেলে ভালোমানুষী দেখাতে নামাজে যাবার ভঙ্গি করেছে হামজার কথায়। এতে একটা আলাদা মজা আছে তার মতে। মানুষকে ধোঁকা দেওয়া দারুণ এক

মজার বিষয়! নয়ত তার কোনো ইচ্ছা নেই মানুষের কাছে ধার্মিক প্রমাণিত হবার। অন্তূকে জিজ্ঞেস করল, "লুঙ্গি কই আমার, ঘরওয়ালি!"-"ছাদে।"

-"এনে দাও।

-"দুঃখিত!"

জয় ঠোঁট উল্টে কাধ ঝাঁকালো, "ওকে! তাইলে গামছাটা খুলে শুয়ে পরতে হবে। ভেজা গামছা পরে তো আর শোয়া যায় না।" জয় গামছার গিট্টুতে হাত রাখে। আর দেখল না অন্তূ। বিদ্যুতের গতিতে পেছন ফিরল, দুই চোখ খিঁচে বন্ধ করে বলল, "বেহায়া, নির্লজ্জ ব্যাটাছেলে। আল্লাহ, মুক্তি দিন।"

পেছন থেকে উচ্চস্বরে হো হো করে হাসির শব্দ শোনা গেল জয়ের। সেই হাসিতে ঘর বাজছে। জয় বলল, “তাকাও তাকাও! পেছন ফিরে তাকাও, ঘরওয়ালি। সিনারি দেখাই।”
অন্তূ চিবিয়ে বলল, “আপনার মতো নোংরা লোকই কেন ছিল তকদিরে?”-“তোমাদের মতে যিনি তকদির লেখেন তাকে জিজ্ঞেস করা উচিত। আমি তো ওসব তকদির-ফকদির মানি না।”
অন্তূ দুই হাতে মুখ ঢেকে দাঁত খিঁচে বলল, “পশুর চেয়েও অধম পুরুষ মানুষ, আপনি! জাহান্নামে যান।”

তার ধারণা জয়ের দ্বারা সব সম্ভব। আসলেই যদি গামছা খুলে দাঁড়ায়! অন্তূর গা গুলিয়ে এলো। তখনই জয় সামনে এসে দাঁড়াল, "লুঙ্গি এনে দেবে নাকি হাতটা টেনে মুখ থেকে সরিয়ে দেব?"

অন্তূ হাতে মুখ ঢেকে দৌঁড়ে বেরিয়ে গেল রুম থেকে। জয় হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে। গামছা সে খোলেইনি। তার সভ্য বউ তাতেই বেকাবু।

লুঙ্গি এনে দেখল জয় আলমারী থেকে নতুন একটা লুঙ্গি পরে সিগারেট ধরিয়েছে। ক্ষুব্ধ হাতে লুঙ্গিটা জয়ের সজোরে মুখের ওপর ছুঁড়ে মারল অন্তূ। জয় লুঙ্গি সরিয়ে জোরে

জোরে হাসে। তারপর বলে, “একটু ভাত-টাত খাইয়ে দেবে?”-“বিষ দেব।”

-“তা দাও, সমস্যা নেই। কিন্তু তোমার হাতে খাইয়ে দাও।”

-“আপনার হাতে বোমা পড়েছে নাকি?”

-“তোর মুখে বোমা পড়ুক, শালী। ভাত আন। ”

জয়ের অশিষ্টতা আজও অন্তূর ভেতরে আগুন জ্বালায়। এতগুলো দিনেও সয় না নিজের এমন অসম্মান। দুটো দীর্ঘশ্বাস টেনে শান্তস্বরে বলল, “এভাবে নয়। যেভাবে বললে আনবো, সেভাবে বলুন। নয়ত জানেন এখানে না খেয়ে মরলেও ভাত পাবেন না।”

অন্তূকে টেনে কাছে দাঁড় করিয়ে চোখের দিকে তাকায় জয়। অস্তমিত স্বরে বলে, “আমি যা বলব, সেটার বিপরীত যা হয়, তাই। না?”
-“সম্পর্কটা তো তেমনই!”
জয়ের হাতটা নিজের হাত থেকে ছাড়িয়ে দেয় অন্তূ। জয় অল্প হাসে মাথা নত করে। কোমলভাবে, স্মিত নজরে অন্তূকে স্পর্শ করলে অথবা কথা বললে অন্তূ সেটা খুব কঠিনভাবে, আলগোছে এড়িয়ে যায়। অর্থাৎ সে তাদের মাঝে বিরোধকে খুব যত্ন করে ঠাঁই দিলেও কোমলতাকে ভুলেও ঠাঁই দেয় না।

মাথা তোলে জয়, “সম্পর্ক বুঝি না আমি।
”খানিক দূরত্ব রেখে বসে অন্তূ, “আমিও বুঝি না।”

জয় যখন নরম, স্বাভাবিকভাবে কথা বলছিল, তখন অন্তূ গিয়ে খাবার এনে দিলো। তার আগে নয়। জয় হাসে। কপালে আঙুল চেপে ঠোঁটে ঠোঁট গুঁজে হাসে। তার বৈশিষ্ট্যের প্রায় সবকিছু আছে অন্তূর মাঝে। কিন্তু সেসবের রূপটা বিপরীতের মতো। ঠিক যেমন বস্তু, ও সেটার আয়নায় দেখা যাওয়া প্রতিবিম্বের সরূপ! এজন্যই তাদের কোনো পরিণতি নেই। একই ধর্মী দুই পক্ষের কোনো পরিণতি থাকে না, শুধু বিরোধ ও বিকর্ষণ ছাড়া।

অন্তূ বা জয় কেউ কারও দিকে তাকায় না সচরাচর। অভ্যাস নেই তাদের। কিন্তু যখন তাকায় তখন দুজন একত্রে তাকায়। সেই দৃষ্টিতে কেবল দহন ছাড়া কিছু থাকে না। জয় খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল, “তুমি খাইছো?”অন্তূ জয়ের খাওয়া দেখছিল মুখ বিকৃত করে। বিশাল বিশাল যেমন হাতের তালু, সেরকম একেকটা বিরাট সাইজের লোকমা। বিকট লাগে অন্তূর চোখে। হাতদুটো কঠিন, হাতের মোটা মোটা রগ চামড়ার ওপর ঠেলে ওঠা। কালো পশমে ঢাকা কনুইয়ের নিচ থেকে শ্যামলা হাত। বিশাল বিশাল আঙুল।

-“আপনি এভাবে খান কেন? ভদ্রভাবে, মানুষের মতো খাবেন।”

এরপর জয় আরও বিশ্রীভাবে খাবার খেতে শুরু করল। অন্তূ দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ ফেরায়।

খাওয়া শেষে সফ্ট-ড্রিংকস হিসেবে দুই প্যাগ মদ খেলো।

রাত দেড়টা অবধি উপুড় হয়ে বিছানার ওপর পড়ে রইল। জয়ের রুমের বেলকনির দরজার পাশে একটা মরিচা ধরা রকিং চেয়ার আছে। অন্তূ সেই চেয়ারটায় বসে থাকে। কোলে বই। কিন্তূ অন্তূ পেছনের দিকে মাথা হেলিয়ে চেয়ারে বসে দুলতে থাকে। চোখ দুটো

বোজা।জয়ের রুমে একটা পেন্ডুলাম ঘড়িয়ে আছে। ঘন্টা পর পর ঢং ঢং করে বাজে। জয়ের খুব পছন্দের জিনিস এটা। হামজা কোথা থেকে কিনে এনেছিল, জয় কেড়ে নিয়েছে।

অন্তূ খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে জয়ের দিকে। মুখ এদিকে ফেরানো। চোখ বুজে আছে। চোখের পাতা কাঁপছে। অর্থাৎ ঘুমায়নি। জয়কে সে রাতে ঘুমাতে দেখেনি। রোজ পাশাপাশি শুয়ে দুজন টের পায়–কেউ ঘুমায়নি।

পেন্ডুলাম ঢং ঢং করে বেজে জানায় রাত একটা বাজল। অন্তূ উঠে গিয়ে অল্প একটু

জায়গা নিয়ে শোয়। চুপচাপ পাশ ফিরে শুয়ে থাকে। তার আর জয়ের মাঝে অসীম দূরত্ব। সেই দূরত্বকে সাথী করে দুজন রাতের পর রাত পাশাপাশি শুয়ে কাটিয়েছে। শেষরাতে কখনও কখনও জয়ের হাতটা এসে অন্তূর শরীরের ওপর পড়লে, অন্তূ তড়াক করে জেগে উঠেছে। সরিয়ে দিয়েছে জয়ের হাতখানা।অন্তূ চিৎ হয়ে শোয়। একটু চুপ থেকে বলে, “জয়!”

বেশ খানিকক্ষণ পর জবাব দেয় জয়, “হু!”

অন্তূ আর কথা বলে না। ভেতরের জমে আসা সংশয়, দ্বিধা ভেতরের দাফন করে। তার কেউ নেই। এই পাশে শুয়ে থাকা মানুষটা

কারও নয়, বা তারও কেউ নয়। ভাবীর খোঁজ জানে না সে। আম্মু কী হালতে আছে, জানা নেই। হামজা তার সঙ্গে কী করবে জানা নেই।

জয় উঠল। বাইরে তখন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমেছে। অন্তূ উঠে বসে বলল, "আমি যাব আপনার সঙ্গে?"

জয় জবাব দিলো না, তাকালও না। বেরিয়ে গেল। অন্তূ জগ ভরা পানি নিয়ে জয়ের পেছনে ছুটলো। জয় কোনোরকম প্রতিক্রিয়া দেখালো না।সিঁড়িঘরের দরজা খুলে হনহনিয়ে কয়েক সিঁড়ি এগিয়ে গেল জয়। তার হাঁটার ধাপ বড়, লম্বা শরীর। ঘুটঘুটে অন্ধকার। অন্তূ

অভ্যস্ত নয়। তার পা ভড়কে যায়। জগটা শব্দ করে পড়ে গেল, পানি ছিটিয়ে পড়ল চারদিকে। মুহুর্তের মাঝে হাত বাড়িয়ে পড়ন্ত অন্তূকে জাপটে ধরে জয়। পড়লে মৃত্যু অথবা সেরকম কিছু হতে পারতো।

অন্তূর বুকে অনেকক্ষণ ঢিপিঢিপ চলছিল। জয়ের থেকে নিজেকে ছড়াতে চায় অন্তূ। জয় আঁটকে ধরে, গম্ভীর স্বরে বলে, "আমার কাছে আসো কেন? যখন দূরত্বই সই, তখন প্রয়োজনেও বা আমাকে চাওয়া কেন? তোমরা ভালো মানুষেরা স্বার্থপর হও খুব।

অন্তূ স্থির হয়ে দাঁড়ায়, “সবটা ভুল নয় আপনার কথা। তবে আংশিক ভুল বুঝেছেন। ”

-“তাই নাকি?”

অন্তূর হাতটা চেপে ধরে জয়। অন্তূ বলে, “আমি নামতে পারব।”

জয় চাপা ধমক দেয়, “চুপ্প!”

বাকি সিঁড়িটা অন্তূর হাত চেপে ধরে নামায় জয়।

স্থির হয়ে দাঁড়ায় দুজন। এমন অন্ধকারে, নিজের শরীরটাও কিঞ্চিৎ দৃশ্যমান নয়। অন্তূ বলে, “আপনি যেচে পড়ে উপকার করে খোঁটা

দিচ্ছেন?''-"তো কি ফেলে দিয়ে মেরে ফেলার ছিল?''

-"বাঁচিয়ে রাখার মানুষ তো নন আপনি আমার, জয় আমির। এই যে বললেন, আমরা স্বার্থপর। আপনি বুঝি স্বার্থহীন? আর স্বার্থহীন মানুষেরা সমাজে বসবাস করে, এবং সাথে এমন সব কুকর্ম করে বেড়ায়?''

-"স্বার্থের জন্য খারাপ কাজ করি আমি?''

-"নিঃস্বার্থে? নিঃস্বার্থে আপনি মানুষ মারেন, চারদিকে এতসব করে বেড়ান? নিঃস্বার্থে মানুষ সন্ন্যাসী হয়, সংসারধর্ম ত্যাগ করে পাগলবেশে ঘুরে বেড়ায়। ক্ষমার সাগরে নিজেকে ভাসিয়ে মোহমুক্তির পথে চলে যায়।

নিঃস্বার্থ শব্দের অর্থ বোঝেন? নাকি শুধু মুখে রসিকতার খই ফুটিয়ে বেপরোয়া বাতাসে গা ভাসাচ্ছেন? যে মানুষ আত্মত্যাগী, উপরন্তু সর্বত্যাগী হয়, তাকে নিঃস্বার্থ বলে। আপনি প্রতিনিয়ত কিছু হাসিলের লক্ষ্যে, কিছু পূরণ করার উদ্দেশ্যে ছুটছেন। হয়ত কোনো পুরোনো ক্ষোভ অথবা জমে থাকা ঋণ। আর তা ফেরত চান আপনি, সেটা নিঃস্বার্থতা? নাকি আমার সঙ্গে সামান্য ব্যাপার থেকে আপনারা যা যা করেছেন এ অবধি, সেটা নিঃস্বার্থতা? যদিও সেসব অপরাধ নয়, তবু যদি ক্ষমা চরতেন তবু ভাবা যেত। বদলার আগুনে জ্বলে এতসবের পরেও নিঃস্বার্থতা?

মুখে রসিক রসিক কথা বলে ভীষণ কুল সাজা যায়! ভং ধরা যায়, আপনি খুব চাপা, খুব বেপরোয়া, লালসাহীন, বিশাল রহস্যময় মানুষ আপনি..শব্দের প্রয়োগ শিখবেন। আমি আপনার কাছে প্রয়োজন পুরাতে আসিনি। আপনারা সেই ব্যবস্থা করেছেন, যাতে আমি আপনাদের অধিনস্থ হই। এখন দায় উঠাবেন না? বউ হবার প্রস্তাব দিয়েছিলাম? নাকি আপনার কাছে র‍্যাগ খেতে গিয়েছিলাম? অথবা আপনাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করব বলে নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছিলাম যে, প্লিজ আমার সম্মুখে এসে অন্যায় করুন, আমি তা

রুখি! আমার সম্মুখে অকাজ হবে, আমি চুপ করে থাকব না, এটা আমার নিজস্বতা। আপনি কী, কেন আমি জানি না। কিন্তু আমি অন্তূ যা হারিয়েছি, তা অপরাধ না করার অপরাধে, সাধারণ একটা ক্ষমতাহীন মেয়ে হবার অপরাধে। তার একাংশ হারাননি আপনারা। আমি অজানাকে জানি বোধহয়, সেটুকু ভাবনার বিস্তৃতি আছে। সেই শক্তিতে আমি এটা বলতে পারি—আপনাদের সঙ্গে যদি কোনো অন্যায় হয়ে থাকে, তো সেটার কারণ আপনারাও! কারণ আপনারা বংশগত রাজনৈতিক মানুষ, আপনাদের সাথে খারাপ হবে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু আমি? সাধারণ

জনতা আমরা। আমি কেন এতকিছু সহ্য করছি? শুধু আপনাদের অন্যায়কে প্রশ্রয় না দেওয়ায় তার দায় মেটাবেন না? মিটিয়ে যেতে হবে। আমি অন্তূ, আমার হারানোর সবটুকু শোধ পুরিয়ে নিয়ে মরব বোধহয়। কারণ আমি আপনার মতো নিঃস্বার্থ নই। আমারা মা-ভাবী, আমার সম্মান, আমার ক্যারিয়ার রাস্তায় ভাসছে। সেসবের হাল ধরতে হবে।''জয় অন্তূর চুল মুঠো করে ধরলে অন্তূ হাসে, “ইশ! সত্যি কথা নিতে পারেন না, আপনারা!''

-“কী করবি তুই?''

-“কখন বললাম কী করব? কী করার আছে আমার? হাত তো বাঁধা আপনার নামের শিকলে।”

-“কথা ছলে ছলচাতুরী?”

-“শুনেছিলাম–চোরকে কাবু করতে চোরের মতো করে ভাবতে হয়।”

জয় অন্তূকে একদম নিজের কাছে নিয়ে এলো, ফিসফিস করে বলল, “আমি চোর না হে। খোলা বাজারে লোক ডেকে পাপ করে আসা পাপী আমি। চোর হবি তুই, পেছনে চাল চালিস।”-“তাহলে সেদিন পলাশের ছাদে যখন থুতু দিয়েছিলাম, তখনই ধরতেন। পরে অত ছক কষে, আয়োজন করে, নাটক

সাজাতেন না। সংজ্ঞা কি মিললো ছলচাতুরী আর চোরের? আমার মুখ খোলাবেন না। বেশ তো চুপ আছি। খোঁচা মেরে ঘা তাজা করা কেন? আপনি জানেন, আমি মুখ খুললে আর সামনের জন কথা বলতে পারে না।''রাত দুটো। বৃষ্টি হালকা কমেছে বাইরে। হামজা শুয়ে ছিল। তার অভ্যাস এক কাত হয়ে মাথার নিচে হাতের তালু রেখে ঘুমানো। সাদা চশমাটা বালিশের পাশে পড়ে আছে। চশমা সে সবসময় ব্যবহার করে না, কেবল বই পড়ার সময়।

পরনে একটা অফ-হোয়াইট রঙা ফতোয়া। সাদা পাজামাটা উঠে আছে ঠ্যাংয়ের কাছে।

কালো কুচকুচে পশমের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল রিমি। হাতে ছাদ থেকে তুলে আনা শুকনো কাপড়চোপড়। রিমি আগে একা অন্ধকার ড্রয়িং রুমে যেতেও ভয় পেত। এখন লাগে না। আরমিণ পারতো, এখন সেও পারে।

রিমি পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দরজার সামনে। তার কিচ্ছু ভালো লাগেনা আজকাল। সে কত খুশি ছিল সংসার জীবনে। ছোট্ট বয়সে কলেজের পড়ালেখা অবধি ছেড়েছিল এই লোকটার খাতিরে। আজ তার সঙ্গে এই দূরত্ব রিমির সহ্য হয় না।সে নিজেকে রোজ বলছে, লোকটাকে সে ঘৃণা করে। খুব ঘৃণা।

কিন্তু মনে হয় না কথাটা সত্যি। ঘৃণায় মায়া ও স্মৃতির দংশন থাকে কিনা জানা নেই রিমির। আবার রিমির আজও শুধু মনে হয়– হামজা শুধু একবার ফিরে আসুক এসব থেকে, সে হামজাকে কলিজা চেরা রক্ত দিয়ে ধুয়ে গ্রহণ করবে। ঘৃণায় এমন হয় কিনা তাও জানে না রিমি।

ঠান্ডা বাতাসে জানালার পর্দারা উড়ছে। সেই বাতাসে হামজার চুলগুলোও উড়ছে। রিমি অস্থির বুকটাকে নিয়ে মেঝেতে গেড়ে বসল হামজার সামনে। কান্নাটা থামানো যাচ্ছে না। এসব সময় কান্না ঠেকানো যায় না। খুব মুশকিল।

সে আসলেই ঘৃণা করে লোকটাকে। কিন্তু এটা ভাবলেও কষ্ট হয়। কোনো একসময় কাউকে প্রচণ্ড ভালোবেসে তারপর একবার তাকে যদি প্রচণ্ড ঘৃণা করতে হয়, সেটা করুণ এক যন্ত্রণার! এই যে রিমির ভেতরে যে প্রাচীর দাঁড়িয়েছে—লোকাটকে ভালোবাসার, ছোঁয়ার, অধিকার দেবার অথবা সমর্থন করার! এটা অসহ্য!রিমি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। গম্ভীর মুখখানা। নেতা নেতা ভাব ছড়ানো। কঠোর ভদ্রলোক লাগে হামজাকে দেখতে। সেই ভদ্রলোকির মাঝে সূক্ষ্ম এক ধূর্ততা, সাথে ভাবুকতাও। সময় পেলেই চোখে চশমা এঁটে ভারী ভারী সব বই খুলে বসতে

দেখা যায়! তবু কীসের নেশায় ছুটছে হামজা! বড় হবার, আরও আরও বড় হবার! মানুষের মাঝে প্রবৃত্তি না থাকলে দুনিয়াটা স্বর্গ হতো। চট করে এক লহমায় চোখ খুলে তাকায় হামজা। রিমি চমকে ওঠে। হামজা স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে বলে, "কাঁদছো কেন?"

রিমি জবাব দেয় না। দুজন তাকিয়ে থাকে দুজনের দিকে।-"কিছু বলবে? এভাবে তাকিয়ে আছো কেন?"

-"ঘৃণা মাপছি।"

হামজা হাসল, "পেলে কতখানি?"

-"মেপে শেষ করি!"

হামজা উঠে বসে। অন্ধকারে প্যাকেট হাতরে সিগারেট বের করে তা ধরায়। ধোঁয়া ছেড়ে বলে, “পাবে না। আমি যাদেরকে জীবনে ভালোবেসেছি, তারা আমার প্রতি বিমুখ তো হতে পারে, আর সেটাই তাদের সবচেয়ে বড় যন্ত্রণার কারণ হবে।”

রিমির গালে আলগোছে হাত রাখে হামজা। রিমি শুধায়, “আপনার কষ্ট হয় না?”-“কষ্ট কী, রিমি?”

-“বাঃ বাহ! সেটাও জানেন না! খুব সুখী লোক বুঝি, আপনি?”

-“অসুখী?”

-“বুঝি না আমি।”

রিমি শক্ত হাতে চোখের পানি মুছলো।
হামজার হাতদুটো সরিয়ে দিলো মুখ থেকে।
-“আমাকে খুব নিষ্ঠুর ভাবো?”
তাচ্ছিল্যের সাথে ম্লান হাসে রিমি, “না না।
এমন সব বড় বড় ভুল ভাবনা ভাবতে নেই।
তা ভাববো কেন?”
-“এরকম সব কথা কে শেখাচ্ছে? আরমিণ?”
-“আমার মুখ নেই?”
হামজা চট করে হাসে, হাসির সাথে তামাকের ধোঁয়া উড়িয়ে বলে, “মুখ তোমার। কথাগুলো নয়।”
-“আপনারা আরমিণকে ভয় পান?”

-“নারীর প্রতিশোধপরায়নতা ও জেদ খড়ের গাদায় লাগা আগুনের চেয়েও ভয়াবহ। তা শুধুই ধিকিধিকি জ্বলতে জ্বলতে উপরের দিকে ওঠে, সব নিঃশেষ না করে নেভে না।

”-“তাহলে আরমিণ সফল।”

হামজা গভীর চোখে তাকা, কণ্ঠস্বর শ্লথ করে আবদার করে, “একটু কাছে আসবে?”

রিমির মনে হলো—হামজা এক নিঠুর ও কৌশলগত শিকারী। যার মুখের বুলি বল্লম অথবা বর্ষার চেয়েও ধারালো। এভাবে একটা আহ্বানের মাঝে রিমির মতো দূর্বলপ্রাণ নারীকে মরণ দিতে শিকারী ছাড়া কে বা পারে?

রিমি ডুকরে কেঁদে উঠে হামজার বুকে হামলে পড়ল, “আপনি জানোয়ার। আপনি অমানুষ, আপনি আমাকে তিলে তিলে মেরে ফেলেছেন। একটুও দয় করেননি।” শিউরে উঠছিল রিমির শরীর।

হামজা রিমিকে দুহাতের বাহু দিয়ে আলিঙ্গন করে নিলো। রিমি ছটফট করছিল। হামজা শক্ত করে জড়িয়ে রেখে বলল, “তুমি আমার সহধর্মিনী হতে পারোনি, রিমি।”

-“পারতে কী করতে হতো?’

-“সহধর্মিনী শব্দটার একটা সাধারণ অর্থ আছে আমার কাছে।”

-"আর সেটা কী?"-"সহ-ধর্ম। অর্থাৎ স্বামীর ধর্মে নিজেকে সমর্পিতকারিনী হয় সহধর্মিনী। সহযাত্রী বলতে যেমন একই পথের যাত্রাসঙ্গী বোঝায়। সহধর্মিনীর ব্যাপারটাও তাই। অথচ তুমি দিনেশেষে আমায় অস্বীকার করেছ, আমার ধর্মে ধার্মিক হতে পারোনি, সঙ্গ ছেড়েছ। মানতে পারোনি।"

-"তার মানে আমি এখনও একটু হলেও মানুষ। মানুষেরা আপনাদের মানতে পারবে না।"

হামজা অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল কেমন করে যেন। শান্ত, স্থির দৃষ্টি, একটু বিস্ময়। তার চোখদুটো হিসাবমেশিন যেন। কিছু মাপছে,

হিসাব করছে। তা শেষে বলল, “শেখানো বুলি, রিমি। তোমাকে তৈরি করা হয়েছে।” রিমি চোখদুটো বুজে হিংস্র হাতে হামজার ফতোয়ার কলার খামছে ধরে, দাঁতে দাঁত চেপে ছটফট করতে করতে বলে, “কিচ্ছু শেখানো হয়নি। আমি ঘরের আসবাব নই, মানুষ। আপনি যে পর্দা আর খাঁচাটার সীমায় আমার বন্দি রেখেছিলেন, তা কোনো এক আঘাতে ভেঙে গেছে, এইতো! তবুও তো আপনার সব পাপকে প্রশ্রয় দিয়েছি তো। শুধু মনে মনে মানতে পারছি না। আর তো কিছু করার নেই আমার! নয়ত আজও পর্যন্ত পড়ে

আছি আপনার এই নরকে? আমিও তো সমান পাপী। এত ভাবছেন কেন?''

হামজা হাসে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বোজে, দুপাশে মাথা নেড়ে গাঢ় স্বরে বলে, “আরমিণ, আরমিণ! আমার খুব ক্ষতি করে ফেলেছে, রিমি।''-“কেমন ক্ষতি?''

-“অনেক বড় ক্ষতি! বিশাল ক্ষতি। অপূরণীয় ক্ষতি।''

কী যেন ছিল হামজার কণ্ঠে। শিউরে উঠে দ্রুত মুখ তুলল রিমি, “কী ভাবছেন আপনি?''

হামজা হাসল, “তুমি জানো রিমি–ও কখনও কখনও চেঁচায়, তামাশা করে। তখন মনেহয় ও প্রচুর বোকা, অশান্ত নির্বোধ। কিন্তু

সেইসবই যদি ওর পরিকল্পনামাফিক হয়? ও যদি এটাই চায় যে, আমরা ওকে ফাঁপা আর বোকা ভাবি? যেন ও কিছুই করতে পারছে না, শুধু তড়পাচ্ছে।''

-"মানে?''হামজা হতাশ গলায় বলল, "রিমি, ভাঙনের চেয়ে ফাটল ভয়ঙ্কর। এই সূত্রটা আরমিণ প্রয়োগ করেছে। আমার পরিবারটাকে সূক্ষ্মভাবে চিড়ে ফেলেছে। ও আমাদের সবাইকে ঘৃণা করতো। এরপর তরু জয়কে ঘৃণা করেছে, তুলি আমাদের সবাইকে ঘৃণা করেছে, তুমি আমাকে ঘৃণা করেছ, কখন না জানি জয় আমাকে......ও সফল, রিমি।

সবার চোখে সবার জন্য ঘৃণার পটি বেঁধে দিতে পেরেছে।''
রিমি মাথা নাড়ে, "আপনি ওর বিরুদ্ধে ভড়কাতে চাইছেন আমায়।''
হামজা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাসল, "আমার বোকা, বউ! খুব বেশি সময় কাটিয়েছ তুমি ওর সঙ্গে, হ্যাঁ?''
রিমি চেতে উঠল, "ও আমাকে কখনোই কিছু বলেনি। ও খুব কম কথা বলে। আমি নিজে চোখে আপনাদের অপরাধ দেখেছি। ওকে এসব ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেও বলতে চায়নি।''

-"আজ মনে হচ্ছে, তোমায় মূর্খ রেখে ভুল করেছি। তুমি জাননো রিমি, চিরকালই অনাগ্রহের প্রতি মানুষের প্রবল কৌতূহল। এজন্য ওর বেপরোয়া স্বভাব, ভীতিহীন চালে তুমি খুব ফেঁসেছ। জয়ের অবস্থাও খারাপ। পুরুষ মানুষ তো!"-"ফাঁসা কোনটাকে বলছেন?"

-"এই যে! আমার সাথে তর্কে আসছো!"

রিমি বলল, "আরমিণ বলেছিল, আপনি আমাকে আপনার অধীনে কয়েদ করে রেখেছেন। আপনার খারাপগুলো তাই দেখেও চোখে পড়েনা। আর আমি মেয়েও তো ভালো

পরিবারের না। আমি শুধু ওর কথাগুলো মেলাচ্ছি, আর মুগ্ধ হচ্ছি ওর ওপর!"

হামজা হেসে রিমিকে বুকে টেনে নিলো। শক্ত করে চেপে ধরে চোখ বুজল, "ওকে বন্দি রেখেছিলাম যাতে বাইরে বেরিয়ে কিছু পাকাতে না পারে। ও তখন ভেতরেই ছেঁদ শুরু করেছে। ইশ! বিশাল ক্ষতি, বিশাল ক্ষতি, রিমি! থেমে থাকেনি।"

হামজার বুকে এভাবে সে হাজারবার মাথা রেখে তলিয়ে গেছে স্বর্গসমুদ্রে। আজও সেই বুক, সেই রিমি। শুধু সেই স্বর্গসমুদ্রের পানি শুকিয়েছে, সেখানে আজ খরখরে মরুর উত্তাপ বিরাজমান।

রিমির শরীরটা কাঁপছিল। হামজা বলল, “কাঁদছো কেন? ঘৃণা ফুরিয়েছে না বাড়ছে? ”-“কোনোদিন ফুরোবে না।” গর্জে উঠল রিমি। কান্নার সাথে ক্ষোভ ও গর্জন মিশে কেমন যেন লাগল রিমিটাকে।
হামজা হাসল, “যে অবধি কেউ পৌঁছায়নি, সেখানে তুমি জায়গা পেয়েছিলে। আর তুমিও সেখানে একটা খুব গভীর ছিদ্র করেছ, রিমি। ”

-“আপনি আমাকে খুব সুখ দিয়েছেন?”
-“আশা রেখেছিলে কেন? আমি তো সুখের ব্যাপারী নই!”

রিমি মৃদু চেঁচিয়ে উঠল, “আপনি তবে কীসের ব্যাপারী? রক্তের? অন্ধকারের? চিৎকার আর যন্ত্রণার?”

হেসে জানালার দিকে তাকাল হামজা, “এগুলোই বা খারাপ কী? দুনিয়াতে শুধু সুখ থাকলে সুখের কদর থাকবে না। তাই কাউকে না কাউকে এসবের আমদানী করতেই হবে।”

-“চুপ্প। চুপ। চুপ করুন, মুখোশধারী পুরুষ!” হামজা আস্তে কোরে ঠোঁটে আঙুল রেখে স্থির চোখে বলল, “চুপ করলাম।”-“আপনি তো এমন না। তবু আমার সামনে এমন নাটক কেন করেন?”

-"আমি আসলে কেমন, রিমি? তোমাকে কী বোঝানো হয়েছে আমার ব্যাপারে?"

-"আপনি জানোয়ার।"

-"এখন কি মানুষদের মতো লাগছে?"

রিমি কত কিছু বলতে গিয়েও পারে না। চোখ বুজে এলোমেলো শ্বাস ফেলে শব্দ করে। এরপর আবার চট করে হামজার কলারটা চেপে ধরে, "আমার...আমার খুব কষ্ট হয়, বোঝেন আপনি? বোঝার কথা না। কসাইয়েরা পশু জবাই করার সময় পশুর চোখে তাকিয়েও গলায় ছুরি চালাতে পারে। পেশা তো। তারা পশুর ভেতরের আর্তনাদ বুঝবে কেন?"

-“তুমি বোঝো?”

-“আপনার তো কষ্টই নেই। বোঝার কী?”

-“এই বুঝেছ?”

-“তাছাড়া আর কী বুঝিয়েছেন?”হামজা হেসে ফেলল, কেমন যেন হাসিটা! হাসি ঠোঁটে রেখে বলল, “তোমার মতো কাঁদতে বলছো? আমার সন্তানদুটো কোরবানী করার দুঃখে , আমাকে তোমার কাছ থেকে বঞ্চিত করার দুঃখে, আমার বিরুদ্ধে কারও নিন্দাকে মেনে নেবার দুঃখে, আরও কত কত দুঃখে কাঁদতে বলছো?”

-“নিন্দা? আপনি নিজেও জানেন, একমাত্র আরমিণ আপনাকে সঠিক চেনে। যদি

আরমিণের কাজকর্মে আমি কিছু শিখেও থাকি, তো ভুল শুধরে এতদিনে সঠিকটা শিখেছি। আর দুঃখ, সেটা আছে আপনার? দুঃখ তো মানুষেরা পায়। কসাইদের দুঃখ থাকে না। কান্না পায় আপনার?''

-“তা পায় না ঠিকই। তবে…'' অস্পষ্ট স্বরে বলে, “তোমার প্রধান বিরোধী তবে আমি ছিলাম, আরমিণ! শ্যাহ! দূর্বল প্রতিদ্বন্দী ভেবে চোখের নাগালে রেখে যেন নিশ্চিন্ত ছিলাম। কী কী কেঁড়ে নিতে চাও?''রিমি ঠোঁট বাঁকিয়ে মলিন হাসে। হামজার সামনে মুখ উঁচিয়ে বাবু মেরে বসে। চোখে ছলছল করছে পানি। দাঁতে দাঁত শক্ত। ভ্রু-দুটো কাঁপছে। বুকের

ভেতরে বোধহয় কালবৈশাখীর বাতাস বইছে। নিঃশ্বাসের শব্দ সন্ধ্যার স্তব্ধতায় আলোড়ন তুলেছে। রিমিও এবার দৃষ্টি স্থির করল হামজার চোখে। বারবার ঢোক গিলছে, বুকের সাথে শরীরটাও নড়ে নড়ে উঠছে। চঞ্চল চোখে হামজার গোটা মুখে বারবার চোখ বোলাচ্ছিল।

হামজা আচমকা শব্দহীন হেসে উঠল, চোখের পাতা নেমে এলো হাসির সাথে। বলল, "এভাবে তাকিয়ে থেকো না। চোখদুটোকে সামলাও। হামজা ওরকম দুটো গভীর দুঃখের সাগরে তলিয়ে গেলে কারবার সামলাবে কে?"

-“কেন? তাকান আমার দিকে। আপনার তো কষ্ট নেই। অনুভূতির অভাবে ফেটে চৌচির জমির মতো আপনি। ”

হামজা অনড়, নির্বিকার মুখে ও অতল গহ্বরের মতো চোখদুটো মেলে তাকিয়ে রইল।

-“আরমিণ আর কী করেছে আমি জানি না। তবে আপনি এতটাই নির্লিপ্ত যে আমার দেয়া শাস্তিও আপনার নির্লিপ্ততায় প্রতিফলিত হয়ে আমার ওপরেই ফিরে এসেছে। আপনি এখনও অটল। একটু শেখাবেন আমায় এমন কঠোর প্রাণহীন হতে? আমার না ভেতরে খুব তীব্র অনুভূতি আর আবেগ। খুব জ্বালায়

আমাকে। আমি আপনার মতো উদ্দেশ্যপ্রবণ হতে চাই। যাকে টলানো অসম্ভব।''হামজা হেসে মাথা নাড়ে দুপাশে। নীরবে ব্যাপারটা অস্বীকার করে নিচু করে চোখ। রিমি জোর করে থুতনি ধরে হামজাকে নিজের দিকে তাকাতে বাধ্য করে। শক্ত কণ্ঠে বলে, "তাকাতে চাচ্ছেন না কেন? তাকান। তাকান আমার দিকে। আমি আপনার নিষ্ঠুরতা দেখতে চাই। আপনি আমার ওপরে ঠিক কতটা উদাসীন ছিলেন, আর কতটা দায়সারা ছিলেন তার হিসেব করতে হবে তো! কারণ আমি আপনার চোখের সেইসব মিথ্যা মুগ্ধতা আর কর্তব্যপরায়ন চাহনিকে ভালোবাসা ধরে

নিজেকে সঁপেছিলাম। তাকান... আমার চোখের দিকে।''
হামজার চোখের পাতা নড়ে উঠল। রিমি বলল, "বিয়ে তো সবাই করে, মেয়র সাহেব। সংসারও করে যায় দিব্যি। কিন্তু আমি যে বয়সে আপনার বউ হয়ে এসেছি, না ছিল বয়সের মিল, না অনুভূতির। কিশোরী বয়সে এক তরতাজা পুরুষের কর্তব্য আর হাতের বাঁধনের প্রেমে পড়ার অপরাধে কী কী শাস্তি আর দেবেন? দিন। আজ সামনে আছি আমি। আপনার হাতের নাগাল ছেড়ে বেরোবার পথ তো নেই। সবটুকু শাস্তি দিয়ে দিন। দিনে দিনে সইতে পারছি না।''হামজা মুখ খুলতে

চাইলেই রিমি হামজার ঠোঁটে আঙুল চাপে,
“চুপ।....চুপ চুপ।”
কেমন হাঁপানি রোগীর মতো নিঃশ্বাস ফেলল রিমি, “কেন ওভাবে ভালোবাসার ঢং করেছিলেন? আমার তো বয়স কম। আমি আপনার অত গভীর মারপ্যাচ বুঝিনা। আমার চারদিকে প্রেমে পড়ে বেড়ানোর বয়সে প্রায় জোর করে বিয়ে করে আনলেন। বিশাল এক নেতার ঘরের আদুরে, আহ্লাদী বউ হলাম। ও বাড়ি যেতে চাইলে যেতে দেননি। আপনার আশপাশেই পড়ে থাকতে বাধ্য করেছেন। আর তাতে আমার নারীমনের সবটুকু অনুভূতি আপনার ওপর আঁটকে রইল, অন্য কোথাও

মনোযোগ যাবার সুযোগ পেল না। বিয়ের পর হাতে গুণে আপনার গন্ধ মিশে থাকা এই রুম থেকে বাইরে বেরিয়েছি।”

রিমির স্বর থরথর করে কেঁপে উঠল, “আর কোথায় যাব আমি, হ্যাঁ? আমার গণ্ডি আপনি অবধি। এবার বলুন, সেই পুরুষটার কাছে এমন সব বিশ্বাস ভাঙা আঘাত পেতে আমার কেমন লেগেছে? আর কতটা শাস্তি বাকি আমার? পুতুল বানিয়ে রাখতে ওরকম ভালোবাসতেন? ঘরে আঁটকে দুনিয়ার থেকে আলাদা করে রেখে শুধু আপনার মাঝে বিলীন রাখতে এসব আয়োজন? ঠিক আছে, তা সফল হয়েছে। যে বয়সে মেয়েটা উশৃঙ্খল

হয়ে ওঠে, আমি আপনার ঘরণী হয়েছি। সারাদিন পাক্কা গিন্নির মতো সংসার সামলানো আর দিনশেষে স্বামীর ঘরে ফেরার অপেক্ষা। আমার মাথায় এ ছাড়া আর কিছু রইলনা আর। সবটা আপনি, আপনার ঘর-সংসার, আপনার পাঞ্জাবীটা, গামছা, লুঙ্গি, পছন্দের খাবার, পছন্দের সাজ–কী পেলাম? দিনশেষে এক অমানুষ ক্ষমতালোভী কুকুর স্বভাবের পুরুষের জন্য আমার এতকিছু?''হামজা শুধু চেয়ে রইল চুপচাপ। রিমি বলল, "আপনি ঠিক। যতদিন না আরমিণ এ বাড়িতে পা রেখেছে, এসব যে আমি কী করছি, তা-ই জানতাম না। ও আমাকে তুলনা শিখিয়েছে।

এসবের হিসেব কষার সূত্র শিখিয়েছে ওর ব্যবহার। কিন্তু ওর কোনো চেষ্টা ছিল না আমাকে শেখানোর। ওর চরিত্রটা আকর্ষণীয়। আমি নিজেই ওকে ফলো করতে লাগলাম। একটু একটু ধারণ করতে থাকলাম ওকে। ও গোলামিকে ঘৃণা করে, ও যা করে সবের পেছনে একটাই চিন্তা—দিনশেষে যেন অনুভূতির অপচয় না হয়ে যায়। কারও কাছে নত না হয়ে যেতে হয়। আর কেউ যেন এইসব দূর্বল অনুভূতির নাম ধরে ক্ষমা না পেয়ে যায়। আজ যেমন আমি পারছি না–আপনাকে পর্যাপ্ত ঘৃণা করতে! কারণ আমি এক দূর্বল অনুভূতির জালে বন্দি। ও আমাকে

স্বামীকে ভালোবাসতে নিষেধ করেনি, ও আমাকে কিছুই বলেনি কখনও। শুধু ওর চালচলনই আমাকে চিনিয়েছে কোন সীমাটা মানুষকে মানুষ আর অমানুষ হিসেবে ভাগ করে...''

হামজা হঠাৎ-ই রিমির ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরল। খানিক পর একটু আলগা করে বলল, "চুপ! আরমিণকে অথবা আরমিণের ধরণকে জয় সহ্য করতে পারে। আমি পারব না। ওর একফোঁটাও আমি তোমার মাঝে বরদাস্ত করতে পারি না। তুমি আমার বউ। আরমিণের সামান্য একটুও তোমার মাঝে থাকবে না।''

-"তো বলছেন চলে এসেছে? তাহলে সেটা কি আপনার জন্য কষ্টকর?"

হামজা দাঁতে দাঁত পিষল, "আমার জন্য যন্ত্রণাদায়ক। এই খেলায় ওকে জিততে দেয়ার ভুলটা আমি করব না, রিমি। আমার সবচেয়ে শক্তিশালী শত্রু ওই মেয়েটা। তুমি বুঝতে পারছো না, ও কী খেলা খেলছে!"

থম মেরে গেল হামজা। চুপ করে গেল আচমকা। দুই সেকেন্ড, থেমে রইল, কিছু ভাবলো। এরপর রিমির ঠোঁটে গাঢ় একটা চুমু খেলো। খুব হিংস্র চুমু। রিমির ওপর যেন কঠিন এক আক্রোশ প্রকাশ পেল।

খানিক বাদে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “একটা সত্যি কথা শুনবে রিমি?” পেছন ফিরে রিমির দিকে তাকিয়ে বলল, “তুমি যা করেছ আমার সঙ্গে, আর আমার থেকে তোমার এই মুখ ফিরিয়ে নেয়া আমাকে যে যন্ত্রণাটুকু দিচ্ছে, কসম তোমার জায়গায় অন্য যে কেউ থাকলে তার শরীরের প্রত্যেকটা হাড় ছড়িয়ে আলাদা আলাদা করে দাফন করতাম। কবর হতো ২০৬ টা। আফসোস, আমি জয়ের পর আরও একজনকে ধারণ করে বসেছি ভেতরে।”

রিমি একসময় শুধায়, “আপনি যে বললেন— কী খেলা খেলছে, আরমিণ?”

হামজা চুপচাপ জানালার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে অদ্ভুত স্বরে বলে, “কঠিন কিছু।”

-“কেমন কঠিন?”

-“ভয়ানক কঠিন। এর ফল আমি তাকে দিলে নিতে পারবে কিনা, তা নিয়ে বড় চিন্তা হচ্ছে আমার।”ওদের ওপর অত্যাচার বেড়েছে। রোজ তিনবেলা করে লোক আসছে বড়ঘরে। অন্তূ দেখল, “কিছু বড় বড় ইস্পাতের বীম ও লোহার খণ্ড সরানো হয়েছে।”

জয় অন্তূকে দাঁড় করিয়ে রেখে পাশের কক্ষে যায়। ফিরে আসে পিস্তল হাতে। এগিয়ে গিয়ে বসে মুরসালীনের সামনে। অন্তূর দিকে

মুরসালীন একবার তাকায়, তৎক্ষণাৎ চোখ সরায়।
জয় পিস্তলটা পাশে মেঝেতে রেখে মুরসালীনকে জিজ্ঞেস করে, "তোর চাচা কোথায়, মুরসালীন?"
মুরসালীন তাকাল জয়ের দিকে, হেসে ফেলল, "এতদিন পরে একথা জিজ্ঞেস করছিস! আমি অধীর অপেক্ষায় ছিলাম তোর এই প্রশ্নের।"
জয় বিনিময়ে একই হাসি হাসল, "তাড়া কীসের? এই যে কাতরানি, যন্ত্রণা, না খাওয়া, আঘাত...তোর ছোট্ট ছোট্ট আমানতগুলোর অসহায় আবদার, শুকনো মুখ, তৃষ্ণার্ত চাহনি! এসব দেখলি, মজা পেলি। এতে কোরে আর

দু-একবারের বেশি জিজ্ঞেস করতে হবে না। দ্রুত জবাব পাব।”

মুরসালীনের মুখ নরকের কূপের মতো জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠল, চোখের মণি লালচে হয়ে উঠল আচমকা। তাকে সচরাচর খুব শান্ত দেখা যায়। আজ আচমকা জয় ও মুরসালীনের সম্মুখীন দৃশ্যটা দেখতে দুই আগ্নেয়-স্ফূলিঙ্গর সংগর্ষের মতো লাগল। দাঁতের মাড়ি চেপে মুরসালীন বলল, “আমার বাপকে মেরেছিস তুই। কিচ্ছু বলিনি।

”-“বলিসনি?”

-“তোকে কারা কোথায় ঘায়েল করে ছেড়ে দেয়, তার জিম্মা অন্যের ঘাঁড়ে চাপিয়ে হালকা

হোস। তুই শালা ভুল বুঝেই শহীদ হয়ে যাবি।”

জয় খানিকক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে থাকে মুরসালীনের দিকে। তারপর বলে, “আমার নামে একটা শহীদ মিনার তৈরি হলে শহীদ হতে আমার কোনো সমস্যা নেই।”

-“আমার ভাইকে মেরেছিস তুই, জয়।”

জয় ঘাঁড় নত করে বাহবা নেবার মতো ভঙ্গি করে বলে, “ওহ! নিজের হাতে। গলা কেটে দুই ভাগ করেছি।”

মুরসালীনের চোখে রক্তের দানা বাঁধে, দু’পাশে মাথা ঝেড়ে প্রগাঢ় শ্বাস ফেলে, “কিন্তু আমাকে খুঁজতে আমার বোনকে যখন

অপহরণ করলি, আমি কেন জানি নিশ্চিন্ত ছিলাম রে, জয়!”

জয় ঠোঁট উল্টায়, “কী বাবদে?”মুরসালীন ম্লান হাসে জয়ের চোখে চেয়ে, “তুই বেঁচে থাকতে আমার মুমতাহিণার গায়ে আঘাত লাগবে না বোধহয়! এই ভাবনা বাবদে। তুই যখন চলে এলি, মনে আছে–মুমতাহিণা আম্মুর কোলে? ক্যাঁ ক্যাঁ কোরে কাঁদতো সারাদিন খালি...” মুরসালীনের কণ্ঠস্বর কেমন অস্তমিত হয়ে এলো, কেঁপে উঠল একটু, ঠোঁট উল্টে মলিন হাসল।

মুরসালীন ওপরের দিকে তাকায়। অন্তূ নিজের বুকের ভেতর এক কঠিন

অস্থিরতাবোধ করল। সাধারণ কথাগুলো এত নিষ্ঠুর শুনতে লাগবে কেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে শোয়ানো মুমতাহিণার লাশ চোখে ভাসছে। অন্তূ দীর্ঘ করে শ্বাস টানে। জয় নির্লিপ্ত মুখে মেঝের দিকে চেয়ে আছে। মুরসালীন নিজেকে এক মুহুর্তের মাঝে সামলায়, "ওর লাশও দেখতে পাইনি। বিশ্বাস কর জয়, মুস্তাকিন ভাই থাকলে তোকে কেটে চিড়িয়াখানার পশু দিয়ে খাওয়াতো নিজের হাতে।"

জয় মুখ তোলে, উপর-নিচ মাথা নাড়ে "আর তুই? তুই কিছু করবি না?"

কিন্তু বলে না—মুমতাহিণাকে এনে গোডাউনে রেখে চারঘন্টা পর সে রাজধানীতে চলে গেছে। ফেরার আগেই মুমতাহিণার দেহ পলাশের ডেরায় পৌঁছেছে।যেদিন মুমতাহিণার সঙ্গে মুরসালীনের শেষ দেখা হলো, মুরসালীন রাজধানীর উদ্দেশ্যে বেরোচ্ছিল। চুপিচুপি এসে মুরসালীনের পেছনে দাঁড়ায় মুমতাহিণা। বয়স ষোলোতেই রূপ ছিটকে এসেছে! পরনে লম্বা গোল জামা। ওড়না জড়ানো শরীরে, মাথায় ঘোমটা। ফর্সা টকটকে হাতে কালো লোম। ঘন পাপড়িওয়ালা চোখদুটো ঠিক বড় বড় মার্বেলের মতো। তিন ভাই-বোনের চেহারাই দেখতে লাগে ইরানি ইরানি।

মুরসালীন পেছন না ফিরে বলে, "কী?"
মুমতাহিণা ওর দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে ফেলে। মুরসালীন গম্ভীর হয়, "থাপ্পড় খাবি? আমার ঘরে কী?"
-"ভাইয়ু তুই ঢাকা যাচ্ছিস, ঠিক বলেছি?"
-"না।""মিথ্যা বলে বের হবি, রাস্তায় কুত্তার তাড়া খাবি, আবার ফিরে এই আমার কাছেই আসা লাগবে। মনে রাখিস, তোর তো বউ নেই, সেবার জন্য আমার কাছে ধর্না ধরতে হবে।
মাথায় একটা গাট্টা মারে মুরসালীন।
মুমতাহিণা চেঁচিয়ে ডাকে, "আম্মা?"

-“ছাগলের বাচ্চার মতো ম্যা ম্যা করিস ক্যান সবসময়?”

মুমতাহিণা আস্তে কোরে বসে বিছানায়, চঞ্চলতা ভুলে নিভু নিভু স্বরে বলে, “বড় ভাইয়ার খোঁজ পাসনি রে ভাইয়ু?”

সুন্দর পুতুলের মতো মুখটা মলিন হয়ে উঠেছে, তা জানে মুরসালীন। রাগ হয় মুরসালীনের। ওই মুখ দেখার সাহস নেই, মুরসালীন তাই তাকায় না। মুরসালীনের কাছে জবাব নেই, তাই কোনো কথাও বলে না। মুমতাহিণার বড় ভাইয়া আর নেই, তা বলার নয় মুমতাহিণাকে।

মুমতাহিণা চট করে হাসে, “এই শোন, ভাইয়ু!
”

মুরসালীন খেয়াল করে, মুমতাহিণা একদম মুস্তাকিনের মতো হয়েছে। আবেগ লুকোতে পেশাদার পটু। ভ্রু নাচায়, “কী?”মুমতাহিণা উঠে এসে ছোট ভাইয়ের পাশে দাঁড়ায়। ঠোঁট টিপে বলে, “আমার কী মনে হয় জানিস?”

-“ইচ্ছে নেই জানার। দূরে থাক।”

-“চুপ। বলছি শোন। খ্যাকখ্যাক করবি কেন আমার ওপর? আমি ছোট না?”

মুরসালীন হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। এসব বাচ্চামি এড়ানো দুঃসাধ্য। ইচ্ছে করে,

মুমতাহিণাকে বুকের সাথে মিশিয়ে ধরতে।
ধরে না সে। নিচু হয়ে হাসে।
মুমতাহিণা কাধে কাধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে আয়নায় মুরসালীনের চোখে তাকিয়ে বলে, "বড় ভাইয়া একটা মেয়ে ভাগিয়ে নিয়ে বিয়ে করে ফেলেছে। কিন্তু লাজুক লোক তো! আর আম্মার ভয়ে বাড়িতে আসতে পারছে না। বল, আমার আন্দাজ কেমন?"
মুরসালীন রেগে ওঠে। বাড়িতে থাকলে এই মেয়ে সারাদিন বড় ভাইয়া বড় ভাইয়া করে কান খায়। মুরসালীনের বুকে আগুন জ্বলে, তা টের পায়? ধমকে ওঠে মুরসালীন, "বের হ

আমার রুম থেকে। তোর প্যাঁচাল শুনতে ভাল্লাগছে না।"

মুমতাহিণা অভিমান করে সরে দাঁড়ায়, যায় না। যতক্ষণ না মুরসালীন মানিয়ে নেবে, যাবে না। মুরসালীন আচমকা জিজ্ঞেস করে, "জয় আমিরকে মনে আছে তোর, মুমতু?"-"মনে থাকার কথা? কে লোকটা?"

মুরসালীন প্রসঙ্গ এড়ায়, "কেন এসেছিস?"

মুমতাহিণা বিশাল বিশাল ভরাট দুটো অক্ষিপল্লব মেলে তাকায়। মুরসালীন টের পায় বুকের ভেতর এক তিরতিরে ব্যথা! ওই চোখদুটোকে বড় ভয় মুরসালীনের। এখন

আবার পানি জমছে। টলমল করছে। মুশকিল বড়।

মুমতাহিণা চোখের পানি ছাপিয়ে হাসে,
“কয়দিনের মনে যাচ্ছিস রে?”

-“তা জেনে কী?”

-“হিসেব করব, কয়দিন বাড়িয়ে শান্তিতে থাকতে পারব।”

মুরসালীন হাসে, “এবার আমিও তোর বড় ভাইয়ার মতো নিরুদ্দেশ হবো। কেমন হবে?”

এবার আর বাঁধ মানে না চোখ। টুপ করে গাল বেয়ে যায় মুমতাহিণার। মুরসালীন দেখে তা। বুক মুচড়ে আসে তার। বাপহীন পুঁচকেটাকে মুস্তাকিন কলিজার সবগুলো

ভালোবাসা দিয়ে ভরিয়ে রাখতো। মুরসালীন তুলনামূলক রুক্ষ। তার সাথে ভালোবাসার চেয়ে ঝগড়া বেশি।

মুমতাহিণা হামলে পড়ে ভাইয়ের বুকে, "আসিস না আর। তুই না থাকলে সারাদিন আমাকে কেউ ধমকায় না, খাটায় না, সন্ধ্যার পর বাদাম কিনে এনে দেয় না, ঝগড়া করার লোক থাকে না, স্কুলে একা যেতে হয়। কত আরাম। তুই থাকলেই যত ঝামেলা।

"মুরসালীন মাথায় হাত রাখলে তা ছিটকে সরিয়ে দেয়, "সরা হাত। হাত রাখছিস কেন আবার মাথায়?"

মুমতাহিণার চেয়ে কমপক্ষে দশ বছরের ছোট। অথচ মানামানি নেই সেসব। চুপ করে থাকে দুজন। মুমতাহিণার ফুঁপানির মৃদু আওয়াজ মন ভরে শোনে মুরসালীন। বাড়িতে শুধু আম্মার সাথে একা থাকে। রাজধানীতে মুরসালীনের ঘুম হয় না তা ভেবে।
মুমতাহিণা খানিক বাদে আস্তে কোরে বলে, “বড় ভাইয়ার খোঁজে যাচ্ছিস, ভাইয়ু। তাই না?”
মুরসালীন চোখ বোজে। গাঢ় শ্বাস নেয়। কণ্ঠনালি ঠেলে ডাহা মিথ্যা আশ্বাসটুকু বের করে, “হ্যাঁ। তোর ঘ্যানঘ্যানানি শুনতে শুনতে কানের পোকা মরে যাচ্ছে। এবার

ইনশাআল্লাহ তোর বড় ভাইয়াকে নিয়ে আসব, যা।'

-"তোকে দরকার নেই। শুধু বড় ভাইয়ার সঙ্গ চাই।"

বের হবার সময় মুরসালীনের আম্মা মরিয়ম বেগম দোয়া-দরুদ পড়ে ফুঁক দেন ছেলের শরীরে। রাস্তায় আয়াতুল কুরসী, দরুদ শরীফ পাঠ করতে বলেন মনে মনে।

মুমতাহিণা ধমক দেয়, "শোন বেদুইন। নামাজ পড়বি ঠিকমতো। তোকে ভার্সিটিত পড়িয়ে কাফের বানিয়েছে, আম্মা। পোশাকের কী ছিরি! সাহেব হয়েছে।"মুরসালীন গাট্টা মারে মাথায় একটা।

বাঁশের চ্যাগারে ঘেরা বাড়ির সামনের পথটুকু পেরিয়ে যায় মুরসালীন। পেছন থেকে মুমতাহিণা মাথায় ওড়না তুলতে তুলতে দৌঁড়ে যায়, “এই শোন, ভাইয়ু! শোন, শোন। ”

মুরসালীন পেছন ফেরে। মুমতাহিণা মুখ নামিয়ে দাঁড়ায়। মুরসালীন হাসে, “কিছু লাগবে না তোর, তাই তো?”
মুমতাহিণা চোখ তুলে হাসে। দুই ভাই-বোন একে অপরের চোখে তাকিয়ে সমানতালে হাসে। মুমতাহিণা মুরসালীনের হাতখানা শক্ত করে চেপে ধরে রাখে। ভারী শ্বাস ফেলে দুজনই। কত কিছু বলতে চায় দুজন, বলা

হয় না কারোরই। কেবল চুপচাপ চেয়ে থাকে।এক সময় মুমতাহিণা হাসি সামলে বলে, “ফেরার পথে একটা ঢাকাই শাড়ি আনিস তো।”

মরিয়ম বেগম পেছয থেকে শাসন করেন, “খবরদার! ওসব কিচ্ছু না। শাড়ি পরা লাগবে ক্যান, হ্যাঁ? বেশি স্পর্ধা?”

ধার্মিক পরিবার সৈয়দ পরিবার। সেখানে মেয়েদের বেলেহাজ হয়ে চলার চল নেই। মরিয়ম বেগম রাগ করেন।

মুরসালীন গম্ভীর হয়, “পারব না আনতে।”

মুমতাহিণা হাসে, “তোর ঘাঁড় পারবে। যা বিদায় হ তো এবার। আর আসিস না তাড়াতাড়ি।”

অন্তূ স্তব্ধ হয়ে শোনে সেসব। জয় ওভাবেই বসে আছে। কোনো হেলদোল নেই। না আছে মুখে অভিব্যক্তি। অন্তূর মনে হয়—জয় বুঝি লোহার খণ্ডগুলোরই এক টুকরো।মুরসালীন হাসে, “ঢাকাই শাড়িটা এখনও আমার ফ্ল্যাটে পড়ে আছে। পড়ার মেয়েটা পালিয়েছে আমাকে রেখে। প্রথমে ভাই গেল তারপর বোনটাও। আমি একা আছি। মেরে ফেল আমায়। ও, আমার পরিবারে আর আছে

আম্মা। তার খোঁজ চাই, জয়? সে ছাড়া আর কেউ নেই।’’

বাগানের রাস্তার পিছনের লোহার গেটে করাঘাতের হালকা আওয়াজ ভেসে আসছে। রাত বোধহয় দুটো পার। কেউ এসেছে! করাঘাতের আওয়াজটা কেমন যেন শোনাচ্ছে। গা ছমছম করে ওঠে। মৃদু হলদে আলোয় বিশাল ঘরটা গুমোট। কতগুলো দেহ ছড়িয়ে আছে। যেন জীর্ণ-শীর্ণ, ময়লা সাদা কাপড়ের স্তূপ।করাঘাত গাঢ় হচ্ছে। জয় উঠে যায়। পিস্তলটা পড়ে থাকে মেঝেতে। সেই ফাঁকে অন্তূ আব্দুল আহাদকে বলে, “কতদিন আগে আঁটক হয়েছ তোমরা, মনে আছে?’’

জবাবটা আব্দুল আহাদ দিতে পারে না। ওরা এতটাই দূর্বল ও অসুস্থ হয়ে পড়েছে! এছাড়া ওদের সেই হিসেব নেই-ও!

মুরসালীন জবাব দিলো, "এখানে সময় আবদ্ধ। আর এই অবস্থায় দিন মনে রাখা অসম্ভব। তবে আমার একটা হিসেব আছে। মাস দেড়-দুয়েকের মতো হবে। কম-বেশি হতে পারে।"

অন্তূ তাকায়। চোখাচোখি হলে দুজন চোখ নামায়। অন্তূ ঠোঁটে ঠোঁট গুজে নিয়ে আস্তে কোরে বলে, "মুরসালীন মহান! কয়েকদিন আগে ঘটনাক্রমে আমার আনসারী মোল্লার সঙ্গে কথা হয়েছে।"

মুরসালীন ভ্রু কুঁচকে ফেলল, "আপনার সঙ্গে?
"-"অবাক হচ্ছেন কেন?"
মুরসালীন চোখ নামায়, "কী বলেছেন উনি?"
-"জিন্নাহ আমির আপনাদের হাতে বন্দি।"
-"এটা আনসারী ভাইজান বলেছেন?"
-"আমি বলছি।"
পাশ থেকে এমদাদ বলল, "এত বিশ্বাসের সাথে কীভাবে বলছেন?"
অন্তূ আলতো হাসল, "আমার মনেহয় আমার আন্দাজশক্তি ভালো।"
মুরসালীন জিজ্ঞেস করল, "আনসারী ভাই কী বলেছেন আপনাকে? তার সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হলো কী করে?"

-“আপনার অনুমতি পেলে উনি জিন্নাহ আমিরকে ছেড়ে দেবেন। তার বদলে যদি এটা নিশ্চিত হয় যে আপনাদের মুক্ত করে এরা, তবে এই লেনদেনটা করবেন উনি।” মুরসালীন সন্দিহান হলো, “আপনি তো এখানে আসার সুযোগ পান না। আজ যদি না আসতে পারতেন, আমাকে খবরটা দিতেন কীভাবে?”-“দিতে হতোই যেকোনোভাবে! আর সেজন্য একটা তামাশা করে হলেও আসতে হতো।”

-“আমাদের ব্যবস্থা হবে ইনশাআল্লাহ। আর না হলেও দুঃখ নেই। আমি বেঁচে থাকা অথবা মৃত্যু কোনোটা নিয়েই আশাবাদী নই। আপনি

কেন করছেন, কী করছেন, সেটা আর জানতে চাইলাম না। কিন্তু আপনি আমাদের জন্য নিজেকে বিপদে ফেলবেন না।”

অন্তূ হাসল, “বিপদ আবার বিপদে পড়বে কী? বিপদ আমাকে এতই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে নিয়েছে, আমি নিজেই আজ স্বয়ং বিপদ হয়ে গেছি।”

মুরসালীন একবার তাকাল অন্তূর দিকে। অন্তূ সন্দেহীন গলায় জিজ্ঞেস করে, “জিন্নাহ আমির কি বেঁচে আছে আপনাদের হেফাজতে?”জবাবটা দেবার সময় পেল না মুরসালীন। জয়ের সঙ্গে চারজন ঢুকল। আজ চয়ন নেই। দোলন সাহেব, বাপ্পী, কামরুল।

সঙ্গে আছে রবিউল। পেশায় সে মেকার। আসলে দালাল, রাজনীতির দালাল। দোলন সাহেব অন্তূকে দেখে ভ্রু কুঁচকালেন। তা দেখল জয়। মেয়ে মানুষ কেন বারবার এইসব কারবারে থাকবে? আগের দিনও জয়ের বউকে এখানে উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে। জয়কে আস্তে কোরে বললেন,
“তোমার স্ত্রী এখানে কী করছে, জয়? দৃষ্টিকটু লাগে ব্যাপারটা, বুঝেছ? তাকে এখানে আনা কেন?”
জয় জবাব দিলো না।বাপ্পী মণ্ডল ঢুকেই গজরাতে গজরাতে মুরসালীনের দিকে এগিয়ে যায়। ঢাকায় এক সম্মেলন ও মিছিলে

ছাত্রদলের লাঠিঘাতে তার দুলাভাইয়ের মৃত্যু হয়। সে জানতে পেরেছে, সেই ছাত্রদলের লিডিংয়ে মুরসালীন ছিল। মুরসালীনকে বোঝা যায় না। সে যে আসলে কী চায়, কোন দলকে সমর্থন অথবা বিরুদ্ধাচারণ করে, অথবা করেই কিনা!

জয় এসে বসল আবার মুরসালীনের সামনে।

দোলন সাহেব বললেন, "শেষ একটা চেষ্টা করব মুরসালীন? একটা স্টেটমেন্ট দেবে? নয়ত দায়িত্বটা সরাসরি আইনের হাতে হস্তান্তর করাই শ্রেয় হবে।"

মুরসালীন হ্যাঁ-না কিচ্ছু বলল না। ওরা যে স্বীকারক্তি চাইছে, তা বেঁচে থাকতে দেবে না মুরসালীন।

দোলন সাহেব বললেন, “বাংলাদেশের রাজনীতিতে দল হিসেবে কোনটাকে সমর্থন করতে পছন্দ করবে তুমি?”অকপট জবাব দিলো মুরসালীন, “দলহীনতাকে। দল শব্দটাই বাংলাদেশের কাল, স্যার। কোনো দলই এই বাংলার জন্য শুধুই ধ্বংসাত্বক ছাড়া আর কিছু নয়। আর আমি তাই এমন এক দুর্যোগ চাই, যাতে করে বাংলাদেশের প্রধান, আলোচিত, বিশিষ্ট দলগুলো সমূলে উপড়ে যাক। তাদের কোনো চিহ্ন এই বাংলার মাটিতে না থাকুক।

শুধু আমরা সাধারণ মানুষ থাকব। আমাদের দেশে আমরা থাকব। সেখানে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হোক, অথবা কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা হবে, সাম্যবাদের জয়গান চলবে, সমাজতন্ত্রে ছায়ায় আমরা বাঙালি মানুষের মতো বেঁচে থাকতে পারব এক জীবন। আবার এতেও সেই একই হাল হবে কিনা বাংলার জানি না, তবু আশাবাদী আমি।"

দোলন সাহেব অবাক হবার মতো অভিব্যক্তি প্রকাশ করলেন, "তুমি কমিউনিস্ট, মুরসালীন?"-"না তো।"

দোলন সাহেব হাসলেন, "তুমি কি খেলছো, মুরসালীন?আমি তোমাকে বুঝতে পারি না।"

-“আমিও না, স্যার। শুধু এটুকু জানি, ক্ষমতার লোভে সাধারণ মানুষ, শিশু, নারী, নিরপরাধীদের ওপর অপবাদ এবং তার জের ধরে এই যে মৃত্যুদণ্ড, কারাবরণের হিড়িক চলছে, এটা আমি নিতে পারি না। আর তা অন্তত কমাতে আমি সব দলকে হাতের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। অথচ কারও প্রতিই আমার অনুরাগ নেই। কারণ আমি জানি, দেশের জন্য কেউ-ই উপকারী নয়।”

ধীরে মাথা নাড়লেন দোলন সাহেব, “বুঝলাম, বামপন্থী রাজনীতিকেও সাপোর্ট করো, তুমি। তোমাকে যদি ফাঁসি দেয়া হয়, তো আসলে

কোন অপরাধে দেয়া হবে? প্রত্যেকটা অপরাধে একটা করে ফাঁসির রায় শুনবে তুমি। কিন্তু জীবন তোমার একটা।''-"এই সৌভাগ্যকে আমি আমার জীবনে স্বাগত জানাই, স্যার। আমি নিজেকে এতদিন কিছুই মনে করতাম না। কিন্তু এখন যখন দেখছি আমার কার্যক্রম বর্তমান শাসক ও শোষকগোষ্ঠীর পীড়ার কারণ হয়েছে, এবং মৃত্যুদণ্ডের মতো বীরত্বপূর্ণ দণ্ডের শাস্তির দিকে এগোচ্ছি আমি, এবার মনে হচ্ছে আমি সত্যিই কিছু করতে পেরেছি। কারণ এই দুনিয়ায় অধিকাংশ মৃত্যুদণ্ড বীরদের এবং কারাবরণ কথা বলা পাখিদের হয়েছে।''

দোলন সাহেব কিছু বলতে নিলে জয় উনাকে থামালেন, “চুপ চুপ চুপ চুপ! চুপ থাকেন। ওই যে কিছু ফ্যান আছে না, সুইচ দিলেই ঘ্যারঘ্যারঘ্যার করতে করতে চালু হয়, আপনাদের এই ফ্যাকফ্যাকানি কানে ওইরকমভাবে ঢুকতেছে। এত রাতে আমি এইখানে আসতে বলিনাই আপনাদের।”

বাপ্পী এগিয়ে এসে মুরসালীনের মুখের ক্ষতর ওপর আঙুল চেপে ধরে মুখ উচিয়ে ধরে বলে, “শুয়োরের বাচ্চা। বল, বল আমার দুলাভাইরে তুই মারিস নাই?”-“বেশ কয়েকটা ক্ষ্যাপা শুয়োর বধ করেছি। কাউকেই

পার্সোনালি চিনি না। হতেই পারে তার মধ্যে আপনার দুলাভাই থাকতে পারে।''

-''তোর অত কথা শুনবার চাই নাই। যেটুকু জিগাইছি, জবাব দে।''

-''এরকম আপনার মতো আরও অনেকের চোখের বিষ আমি। স্বয়ং দলীয় নেতাদের অবধি। কত ক্ষ্যাপা শুয়োরদের বিরুদ্ধে বলেছি, কার্যক্রম চালিয়েছি, আর্টিক্যাল লিখেছি, ছাত্রদের উৎসাহিত করেছি, মিছিল, মিটিং কত কী! অত মনে নেই।''বাপ্পী পশুর মতো গর্জে উঠে এমদাদ ও তৌফিককে দুটো লাথি মারল। থেতলা হয়ে গেল তৌফিকের

মুখের চোয়াল। এমদাদের কান দিয়ে পুঁজ বা রক্তের মতো তরল বেরিয়ে এলো।

জয় চুপচাপ দেখে সেসব। পিস্তলটা তার বাম পাশে মেঝেতে পড়ে আছে। তার পাশে অন্তূ আব্দুল আহাদকে ধরে বসে আছে। তার নারীসুলভ দুটো দূর্বল হাতে ওদের রক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা।

বাপ্পী মুরসালীনের মাথাটা সজোরে দেয়ালের সাথে বাড়ি মারে। মাথার ওপরের চটা ফেটে রক্ত চুইয়ে পড়ল। মুরসালীন অজ্ঞান হলো না ঠিকই, কিন্তু অচেতনের মতো পড়ে রইল।

অন্তূর হাতটা নিষপিষ করে ওঠে। চোখ বুজে ফেলে সে। তার দেহে এক ধরণের শিহরণ

জাগছে। কীসব অদম্য ইচ্ছারা জাগছে।জয় একটা লোহার খণ্ডের ওপর বসা ছিল। কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা বাপ্পীর পা বরাবর একটা লাথি মারল। বাপ্পী ধুপ করে মেঝের ওপর উল্টে পড়ে যায়, নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো, কনুই ছিঁলে গেল।

জয় মুরসালীনকে জিজ্ঞেস করে, "জিন্নাহ কি বেঁচে আছে মুরসালীন?"

মুরসালীন জবাব দেয় না। বাপ্পী উঠে এসে আবারও মুরসালীনকে ধরে, জয়ের দিকে রক্তচোখে তাকিয়ে বলে, -"তুই কী করতেছিস? এইরকম মাগী মার্কা প্রশ্নে এই খানকির বাচ্চার মুখ খুলান যাইবো? লাগাইতে

অইবো না? কুত্তাচোদাডারে মাইরা ফেলিস নাই ক্যাই আইজ পন্তক? আর তোরে আমি পরে দেখুমনে।"

কামরুল টেনে হিঁচড়ে মুরসালীনের পাশ থেকে দুটো বাচ্চাকে উঠিয়ে নিলো। আদিম উল্লাসে মেতে উঠল ওরা জীবিত ছোট ছোট দেহগুলো নিয়ে। উদ্দেশ্য মুরসালীনকে উত্তেজিত এবং দূর্বল করা। মুরসালীন নিজের শরীরের ব্যথায় আরও শক্তিশালী হয়। কিন্তু বাচ্চদের আঘাতে ওকে অস্থির দেখা যায়।জয় জিজ্ঞেস করে, "জিন্নাহকে কোথায় রেখেছিস তোরা? তোদের সংগঠনের আর সব কোথায়? "

তার কণ্ঠস্বর শান্ত। কোনো তাড়া নেই, উত্তেজনা নেই। অন্তূর মনে হলো, সে নরকের কোনো এক বিভাগে বন্দিনী। মৃদু হলদেটে আলোয়, গুমটে গন্ধে এক নারকীয় অবস্থানে বসে থেকে অন্তূর ভেতরটা কেমন উল্টে-পাল্টে উঠছিল। তার মনে হচ্ছিল সে নিজের ভেতর থেকে হারাচ্ছে।

মুরসালীন বলে, "জিন্নাহকে ফেরত দেব, তার বদলে আমায় কী দিবি?"

-"আগে ফেরত পাই সহি-সালামত! তারপর যদি মনে কয়, তো কিছু প্রতিদান পাবি। না দিলেও ঋণ নাই। ঋণ আছে তোর আমার কাছে। পুরানা ঋণ। যা তোরে আশিবার খুন

করলেও পরিশোধ হবে না। কিন্তু খুন একবারই করতে পারব। অর্থাৎ তোর কাছে আমারই আরও ঊনআশিবার পাওনা থাকবে।
''

রক্তাক্ত মুখে হাসে মুরসালীন, "মঞ্জুর। যাইহোক, জিন্নাহকে ফেরত দিলে তুই ওদের ছেড়ে দিবি। এই কথায় একটা সওদা করতে পারি।-"এরম কোনো প্রস্তাব দিছি আমি তোরে?''

-"কেউ একটা দিলেই হয়। আমি দিলাম। আর তুই যা শোধের কথা বলছিস না? আমার ক্ষতির পরিমাপ করলে তোকে আশি দুই গুণো একশো ষাটবার খুন করলেও ঋণ

থেকে যাবে। অথচ তোর জান একটাই। আমি বলব, তুই হিসেবে কাঁচা, চোখে অন্ধ আর বোঝার ভুলে ডুবে মরা মৃতদেহ।"

-"ভুল বোঝার মধ্যে একটা আনন্দ আছে।"

-"রাখ তোর পাগলের প্রলাপ।"

-"জিন্নাহ কোথায় আছে?"

মুরসালীন জবাব দিলো না।জয় ধৈর্যহারা হয়ে উঠছিল। গাঢ় শ্বাস ফেলে বলল, "দুই-আড়াই বছর ধরে ধৈর্য ধরতেছি, মুরসালীন। আমার ধৈর্য ধরার রেকর্ডে এইটাই সবচাইতে দীর্ঘ। একটু কদর কর। খালি ক, জিন্নাহ কি বেঁচে আছে?"

-"বেঁচে যদি না থাকে, তাহলে কী?

জয় হাসল, “তয় আর সময় অপচয় করবাম ক্যালা? অপচয়কারী শয়তানের ভাই। আমি শয়তানের সম্বন্ধি। সময় কাজে লাগাই।”

মুরসালীনের অভিব্যক্তি নির্লিপ্ত, সে গম্ভীর মুখে বলে, “আর ও যদি বেঁচে থাকে এবং ওকে যদি ফেরত দেই। তুই ওদের মুক্ত করাতে পারবি হামজা ভাইয়ের হাত থেকে?”

মুরসালীনের পায়ের ক্ষততে ডান পা চেপে ধরল জয়। চামড়ার স্যান্ডেলের শক্ত নিচের তলার আঘাতে ক্ষত থেতলে উঠল। জয় অধৈর্য গলায় বলে, “যদি বেঁচে থাকে? না নাহ না! যদি না। ক, বাঁইচে আছে কি-নাই! এইটা আগে কনফার্ম হই! মরে গেলে এত নাটক

মারাবো কোন দুঃখে? গলির মাথায় চাইপা ধইরা পাগলে চোদে নাই আমারে। জীবিত আছে না মেরে দিছিস, ওইডাই জানতে চাইতেছি খালি।"

আবার জয় দ্রুত মাথা নাড়ল দু'দিকে, "তো চল। তোর কথাই রইল।" নিজেকে বলে জয়, "সেকরিফাইজ, জয় সেকরিফাইজ! তুই না ভালো লোক।"

মুরসালীনকে বলে, "জিন্নাহ বেঁচে থাকলে ওর বদলে তোর এই ছানাপোনাদের আজাদ করে দেব, যাহ! তোহ, জিন্নাহ বেঁচে আছে তো, না? "-"নেই।"

জয় বাচ্চাদের মতো ভ্রু কুঁচকে তাকাল, ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, “নেই? বলিস কী রে? পরিশ্রম করলাম যে এত্ত! যা৯, ভোদাই সেজে গেলাম রে আগেই না জিগাইয়া!”

হতাশ শ্বাস ফেলল সে। মুরসালীন আর কিচ্ছু বলার সুযোগ পেল না।

কামরুল ও রবিউল জয়ের কাছে দুজন পূর্ণ মনোনয়ন পেয়ে গেছে, যেন এবার।

এমদাদের অর্ধ-অচেতন দেহটাকে লাথিতে ভরিয়ে তুলল। জয় লৌহখণ্ডের ওপর বসে ঝুঁকে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে চুপচাপ। কামরুলের হাতে বাচ্চারা ছিল কয়েকটা। ওদের গাল চেপে ধরল। শব্দ করে কেঁদে

উঠল ছোট ছোট প্রাণগুলো। খালিপেট, পিপাসার্ত গলার কান্না গায়ে কাঁটা দেয় বড়। দোলন সাহেব একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন শুধু জয়ের দিকে। মুরসালীনের দাঁত ভেঙে গেছে। ঠোঁটের কিনারা দিয়ে মাড়ি থেকে বেরোনো রক্ত ভেসে আসছে।কামরুল এক বাচ্চাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলো মেঝের ওপর। বয়স সাত-আট বছর হবে বোধহয়! ওইটুকু বাচ্চার ওপর কামরুলের বড় ক্ষোভ। ওরা রাজাকারদের উত্তরসূরী। বড় হয়ে সরকারবিরোধী হবে। ধর্মের কথা বলে। কামরুলের শান্তি হতো–ওদের টেনে টেনে

ছিঁড়তে পারলে। তাতেও যদি মুরসালীন, এমদাদ, তৌফিক ওদের একটু যন্ত্রণা হয়! বাচ্চাটার পড়ে গিয়ে ঠোঁট কাটলো, মুখের চামড়া ছিঁলে গেল। হাঁটুতে আঘাত পাওয়ায় উঠতে পারছিল না। হাঁটু চেপে ধরে কেঁদে ফেলল। অথচ আশ্চর্য, সেই কান্নার আওয়াজ নেই। আওয়াজ করে কাঁদছে না ভয়ে সে। মুখে-চোখে কাতর যন্ত্রণা, কিন্তু কান্নায় আওয়াজ নেই।

অন্তূ চুপচাপ দেখে সেসব। চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে তাকায়। তার হাতের মুঠোয় আব্দুল আহাদের জীর্ণ হাত। হাতদুটো কাঁপছে, অন্তূ টের পায়।কামরুল হাতে বাচ্চাটিকে দুটো

কঠিন থাপ্পর মারল। কচি মুখের চামড়ার নিচে রক্ত জমে যায়। মুরসালীন চোখ বুজে মুখ ফেরায়। কামরুলের খুব আনন্দ হয় এবার।

কিন্তু কামরুল এবার বিশাল ভুল করে ফেলল একটা।ওদের মাথা থেকে সাদা পাঁচকলির টুপিগুলো খুলে ছুঁড়ে মারল দূরে। অন্তূ দেখল। দীর্ঘশ্বাস টেনে নিলো ভেতরে

পকেট থেকে ছোট্ট একটা ছুরি করে রবিউল কামরুলের হাতে দেয়। দাঁত বের করে হাসে। দাঁতগুলো লাল, কালশিটে ধরণের স্পট পড়ে গেছে।

কামরুল খুব মজা পাচ্ছ। বাজারে গেলে বাচ্চারা খেলনার আবদার করলে, মা যখন খেলনা কিনে হাতে দেয়, সেইসময় বাচ্চাদের মুখে খেলনা পাবার তৃপ্তিখানা কামরুলের মুখে। এতকিছুর পরেও মুরসালীনের চুপ থাকাটাকে নির্লিপ্ততা মনে হচ্ছে। যা খুবই হতাশাজনক। কামরুলের উচিত এমন কিছু করা, যাতে মুরসালীনের চোখে-মুখে কাকুতি ফুটে ওঠে।সে ছুরিখানা বাচ্চাটার গলায় ঠেকিয়ে চারদিকে সবার দিকে তাকিয়ে হাসল। উপস্থিত সব বাচ্চার মুখে এক করুণ আতঙ্ক দেখা দিলো। এটা খুবই মজার বিষয়। যেন তাকে অনুষ্ঠানে গান গাইতে বলা

হয়েছে। মাইক হাতে সে একটু লজ্জা পাচ্ছে, সবার আরেকটু উৎসাহ চাচ্ছে। সবার মুখে সেই সুখ, শুধু দোলন সাহেব তখনও জয় আর মুরসালীনকে দেখছেন।

মুরসালীনকে ডাকে কামরুল, "ওই চেংরা! দেখ তো রে, আয় বাঁচায়ে নিয়া যা। মাগীর পুত, এইরম বন্দি থাইকাও ব্যবসা কইরবার চাও? এই জঙ্গিগুলানরে ছাইড়া দিলে আমাগোরে লোক ছাড়বা? ল, মুক্ত কইরা দিই তোর পাখিগুলারে।"

এক ঝটকায় জয়ের পাশ থেকে পিস্তল তুলে নেয় অন্তূ। তাক করে ধরে কামরুলের দিকে। জয় চমকে তাকায়। সে অন্যমনস্ক ছিল।অন্তূর

চোখের মণি জ্বলছে। ধিকধিক করে জ্বলছে। বুকের ওঠানামা প্রবল। অন্তূ ট্রেগারে আঙুল রেখে কেমন মন্ত্রপুতের মতো গলায় বলে, "ছেড়ে দে। ছাড, ছাড়। তোর ছুরির চেয়ে পিস্তলের গুলি দ্রুত চলবে। আল্লাহর কসম এখানে চারটা লাশ ফেলব আমি। ছেড়ে দে ওকে।"

জয় অন্তূর সামনে দাড়ায়, "ঘরওয়ালি! মাথা ঠান্ডা করো। অল ইজ ওয়েল। রিল্যাক্স, কিচ্ছু হয় নাই। মজার খেলা হচ্ছে, দেখো, এনজয় করো। আবার এইসব ডেঞ্জারাস চিন্তাভাবনা ক্যান?"

অন্তূ জয়ের নাগাল পেরিয়ে কয়েক কদম পিছিয়ে যায়, পাগলের মতো দাঁতে দাঁত আঁটকে হিষ হিষ করে ওঠে, “জানোয়ারের বাচ্চা! তুই সরে যা সামনে থেকে। নয়ত আজ তোর বুকটা আগে ঝাঁজরা করে তারপর বাকি বুলেটগুলো ওদের জন্য খরচ করব।”অন্তূকে ক্ষ্যাপাটে বাঘিনীর মতো লাগছিল। অনেকটা মানসিক বিকারগ্রস্থ পাগলিনীর মতো। সাপের মতো হিষহিষ করে, বিক্ষিপ্ত নিঃশাসে বুক দুলছে।

জয় একটু থমকায়, ভ্রু কুঁচকায়, তবুও এই অবস্থায়ও হেসে ওঠে, “কিন্তু তোর তো হাত কাঁচা, শালির মেয়ে। গুলি জীবনেও নিশানায়

লাগবে না, বড়জোর অ-জায়গায় লেগে আমার সর্বনাশ হবার চান্স আছে। আর নয়ত গোডাউনের ক্ষতি হবে। পিস্তল দে। আমার হাতে পিস্তল। খালি খালি মানুষ মেরে কী লাভ? তার চেয়ে বড় কথা, পিস্তলে তো বুলেট নাই।''

অন্তূ কী করল! এক মুহুর্তের মাঝে পিস্তলের তাক ডানদিকে ঘুরিয়ে ঠিক দেয়াল বরাবর শ্যুট করল। পিচ্ছ্ করে একটা শব্দ হয়, সাইলেন্সরের বদৌলত। গুলি ছুটে গিয়ে ইটের গাঁথুনিতে ঠুকল। অন্তূ চরম এক ধাক্কা খায়। পিস্তলের পেছনের বেগের টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাবার মতো অবস্থা হয়। হাতটা

ঝিনঝিন করছে তখনও। রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে গেছে যেন।অন্তূ জয়ের দিকে তাকায়, "বুলেটহীন পিস্তল নিয়ে এখানে আসেননি আপনি।"

গোটা ঘর নিস্তব্ধ। কেউ নিঃশ্বাসও ফেলছে না। সবার চোখ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসার জো। অন্তূর বিদ্রোহী শ্বাসের আওয়াজ কেবল ঘুরপাক খাচ্ছে বদ্ধঘরে। কয়েক সেকেন্ডের মাঝে ঘটনাটা ঘটে গেল।

কামরুল ছুরিটা ভালোভাবে বাচ্চাটার গলায় ধরে সতর্ক করে অন্তূকে, "এই এই আপনে পিস্তল নামান। নইলে এক মুহুর্তের মইধ্যে গলাডা দুইভাগ কইরালামু, কইলাম। আর

লাভ অইবো না। পিস্তল নামান, ছাইড়া দিতাছি।''

-“প্রথমত তুই মরবি তো এমনিতেও, আর এই পিস্তলের গুলিতেই। দ্বিতীয়ত, তোর ছুরির চেয়ে আমার পিস্তলের গুলি দ্রুত চলবে। আর শুয়োরের বাচ্চা, তৃতীয়ত, যদি ওকে মারিসও, তার পরের মুহুর্তে হলেও তুইও মরবি। লাভ কী? ছেড়ে দে ওকে। ছাড়!''গোটা ঘরে প্রতিধ্বনিত হয় অন্তূর ‘ছাড়’ কথার গর্জনটা।জয় চুপচাপ তাকিয়ে দেখে এই অন্তূকে। মাথার ওড়না পড়ে গেছে, খেয়াল নেই। চুলের বড় খোঁপাটা অগোছালো। জয়ের যেন ভেতরে অস্বস্তি হয়। একসময় যে

মেয়েটার মুখ দেখেনি কেউ কখনও, তাকে সে কোথায় নামিয়ে এনেছে! অন্তূর শরীর ঘেমে গেছে, চোখদুটো লাল। নাকের পাটা শক্ত। জয় অপেক্ষা করে অঘটনের। এইটুকুই বাকি ছিল–অস্ত্র হাতে ওঠেনি আজকের আগে অন্তূর হাতে। আজ সেটুকুও হয়ে গেল। বাকিটা সে জানে অন্তূকে।আজ জয় ভাবে এক মুহুর্ত। সেদিন অন্তূ পলাশকে মারতে ছুরি হাতে নিতে পারেনি। পিছিয়ে এসে জয়কে ফিরিয়ে দিয়েছিল। কেন? সেদিন পেছনে এবং সাথে, পক্ষে দাঁড়ানো জয় ছিল, তাই? আপাতপক্ষে আজ জয় নেই তার সাথে। আজ সে একা। এই অবরুদ্ধ এক

নিশীথে বড়ঘরে তার পক্ষে কেউ নেই, তাই কি সে একাই মোকাবেলা করতে যথেষ্ট, সচেষ্ট? তাহলে হিসেবটা কী দাঁড়াল? হামজা কি ঠিকই বলে?

নারী কারও অবলম্বনে যেমন দূর্বল, তেমনই একবার কেবল সে সেই অবলম্বিত খুঁটিহীন হয়ে পড়লে একাই সর্বোচ্চ ধ্বংসাত্বক!

তাহলে কি নারীর তৈরি অনিষ্ট সঙ্গহীন নারী থেকেই সৃষ্টি হয়? নারী তার পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গ পেলে ভীষণ নারীসুলভ, একা হয়ে পড়লে অসীম সর্বনাশা!

কামরুলের মুখ শুকিয়ে যায়। বাচ্চাটাকে ছাড়তে চাইলেও ছাড়তে পারে না। কেউ

অন্তূকে গিয়ে ধরতেও পারে না।মাঝখানে জয় আমির দাঁড়িয়ে।কামরুলের মনে হয় ছেলেটাকে বাঁচানোর লক্ষ্যে জয় আমিরের বউ তাকে গুলি করবে না। এই আশায় কামরুল একটা ভুল করল— সে ছুরিটাকে শক্ত করে চাপল বাচ্চার গলায়। কচি চামড়ায় চিড় লাগে ছুরির ধারের। বাচ্চাটা কেমন করুণ সুরে মিনতি করে কেঁদে ওঠে হু হু করে।

আবারও ভোঁতা গুলি চলার আওয়াজ। গুলিটা লাগে না কামরুলের গায়ে। ডান হাতের বাহুর আড়াই ইঞ্চি ফাঁক গলিয়ে পেছনে এক লৌহখণ্ডে ঠেকে। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবারও। কামরুলের নসিব খারাপ। তার মস্তিষ্ক তাকে

সরে যাবার নির্দেশ দেবার আগেই পরের গুলিটা তার বক্ষপিঞ্জরের নিচে একদম কিনারায় লাগল। অন্তূর হাত খুবই কাঁচা। আর দুই ইঞ্চি হলেই এটাও মিস যেত। গেল না।কামরুল ধপ করে পড়ে গেল মেঝেতে। কিছুক্ষণ জ্ঞানও রইল। রক্তের ঝিরঝিরে স্রোত নামলো মেঝেতে। গলাকাটা মুরগীর মতো ছটফট করল কিছুক্ষণ দেহটা। আর বেশিক্ষণ চেতনা রাখতে পারল না কামরুলর দেহ।

পরের দেহটা রবিউলের। আলগোছে পড়ে গেল। বিকট আওয়াজ বের হলো মুখ দিয়ে। তারপর আরেকটা গুলি চলল। সেটা শূন্যে

লাগল। কিন্ত পরের গুলিটা বাপ্পী মণ্ডলের ঠ্যাঙ ফুঁড়ে চলে যায়। বাপ্পী গা শিউরে ওঠা স্বরে কোঁকিয়ে উঠে বসে পড়ে। ঠ্যাংয়ের হাড় ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট এপার-ওপার হয়ে। ফাঁক হয়ে গেছে হাড়ের জোড়াইতে। তার আর্তনাদ কঠিন হলো। কানে সহ্য করা যাচ্ছিল না।অন্তূর হাত অবশ হয়ে আসে। পিস্তলটা পড়ে যায় হাত থেকে। হাতে আর জোর নেই, হাত নাড়ানোর শক্তি নেই। স্নায়ু কাজ করছে না দুই হাতের। ঘরটা নিস্তব্ধ। তিনটা দেহ লুটিয়ে আছে মেঝেতে। বাপ্পী তখনও চেতনায় আছে, করুণ আর্তনাদে ঘরটা নরকের কক্ষ হয়ে উঠল। দোলন

সাহেব চুপচাপ বসে রইলেন। খুবই নাটকীয় দৃশ্য, ট্র্যাজেডি নাটক যেন। অথচ লোকে জানে না জীবনের চেয়ে বেশি নাটকীয়তা নাটকে থাকে না।

জয় আস্তে কোরে বসে আবার লোহার খণ্ডের ওপর। মুরসালীন চোখ বুজে হেলান দেয় দেয়ালের সাথে। তার শরীর ঝিমিয়ে আসছে। জয়কেও দেখতে ক্লান্ত লাগে। খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে ঝিম ধরে সে।চারদিন টানা বৃষ্টি। ঝুম ঝুম করে বৃষ্টি হচ্ছে। পথঘাট কাঁদায় মাখা। করতোয়া নদীর পানি উঠে এসে দিনাজপুরে বন্যা আসবে এবার বুঝি!

দেশের দুর্যোগের সাথে প্রকৃতির দুর্যোগ যোগ হলে জমে যাবে দুর্যোগের খেলাটা।

বৃষ্টির ছিটা আসছে। মুর্শিদা আটা মাখা হাতে জানালাটা আঁটকে দিলেন। জয়নব লাফিয়ে উঠল, "আম্মা এইরকম কইরো না তো। বইয়ের এমন এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আছি, এই সময়ই জানালা আটকাইতে হইলো তোমার?"

-"চুপ্প! থাপড়াইয়ে দাঁত ফেলে দেব। ধিঙি মেয়ে। এই তোর বুদ্ধিসুদ্ধি হবি না?"

-"বুদ্ধি তো আছেই আমার।"

-"বুদ্ধির চোটে আমার ঘরবাড়ি ভরে আছে। মুখে মুখে তর্ক? আটা হাতে করে জানালা

আটকাইতে আইছি, আর তুমি এইখানে বসে থাকার পরেও হুশ হয় না? বইয়ে কী পড়িস সারাদিন? দ্যাশ জাহান্নাম হয়ে গেছে, আর... তুই বইয়ে কি দেখিস?''জয়নব উঠে বসল। আর তর্ক করল না। মেঘের জন্য দুপুরটাকে বিকেলের মতো লাগছে। জানালা আটকে দেওয়ায় ঘর পুরো অন্ধকার হয়ে গেল।
তার শাড়িটা ছিঁড়ে গেছে। কিন্তু বাজারের সব দোকান ছাই হয়ে গেছে। মানুষের পেটে ভাত নেই, শাড়ি কী জিনিস!
আপাতত বইটা রেখে দিলো। আম্মা গেলে আবার নিয়ে বসা যাবে। কিন্তু মুর্শিদা গেলেন

না। উনি বসলেন জয়নবের পাশে। মেয়ের চুল খুলে এলিয়ে দিলেন পিঠে।

-“আম্মা তোমার হাতে আটা। আটা লাগাইয়ো না চুলে।”

-“শুকায়ে গেছে আটা। চুলে লাগবে নাকি?”বিলি কেটে দিতে লাগলেন চুলে। জয়নব ঘাঁড় পেছনে হেলিয়ে বসে রইল। বিশাল বিশাল চুল তার। নারকেলের তেল প্রায় আধপোয়া করে একেবারেই লাগে তার চুলে। জয়নবের বয়স এখন আঠারো। তার আকদ হয়ে আছে দুই বছর হলো। কিন্তু এই নারকীয় পরিস্থিতিতে জলিল আমির অনুষ্ঠান সারতে পারছিলেন না। আমির বাড়ির মেয়ের

বিয়ে পানসে ভাবে দেয়া যায় না। গাঁয়ের লোক ওই দুটো দিন আমির বাড়িতে পেট ভরে খাবার হকদার।

জাভেদ জয়নবের এক বছরের ছোট। জামিল আর জয়নাল জমজ। তাদের ছোট জেবা। তার বয়স তেরো। সব পিঠাপিঠি। জামিল ঘুমাচ্ছে এই অসময়। জেবাও গিয়ে মেজো ভাইয়ের পাশে শুয়ে পড়েছে। সারারাত চিন্তায় ঘুম আসার জো নেই।মুর্শিদা কেমন উদাস স্বরে বললেন, "আমাদের মনেহয় আমির নিবাস ছেড়ে দেওয়া লাগবে রে, জয়নব!"

জয়নব একবার তাকায় মায়ের দিকে। এরপর ঘরে বাঁধানো পঞ্জিকার দিকে তাকায়। আজ

বঙ্গাব্দ ১৩৭৮ এর বৈশাখের ১৩ তারিখ।
খ্রিস্টাব্দ ১৯৭১ এর ২৬-ই এপ্রিল।

-"জাভেদরে ক্যান পাঠাইলা, আম্মা? আব্বা তো বলছিল, সুযোগ পাইলে নিজেই আসবে দেখা করতে।"

ধুক করে উঠল মুর্শিদার বুকটা। তিনি ভুলে থাকতে চাইছেন সব। বললেন, "বলবি না তোর বাপের কথা। মরণের পথে ভাসায়ে রেখে উনি গেছেন যুদ্ধ করতে।"

সন্ধ্যার পর জয়নাল এলো ভিজতে ভিজতে, "আম্মা। কিছু খাবার-দাবার আছে নাকি?" তার সাথে তিনজন জোয়ান জোয়ান ব্যাটাছেলে। মুর্শিদা আৎকে উঠে শুধান, "এরা

কারা রে, জয়নাল? ক্যান আনছিস বাসায় তুলে? তুই কি পাগল হইছিস? ক্যান আসছে ওরা?''-"আম্মা, বিপ্লবী ওরা, বিপ্লবী। আমারে বলছে, বন্দুক চালাইতে দিবে, শেখাবে। কিন্তু ওরা কয়দিন কিছু খায় নাই। বন্দুক চালাইতে ম্যালা শক্তি লাগে, আম্মা। আগে সবাইরে কিছু খাইতে দ্যান।''

মুর্শিদা কান মলে ধরলেন জয়নালের, "জানোয়ার। বন্দুক চালানো শিখে কী করবি? তোর বাপ-চাচারা ওইসব জানে, আজ আমারে সবাইরে বাণের জলের ভাসায়ে গেছে মিলিটারি মারতে, তোর বড় ভাই গেছে, আবার তুই..''

-“আম্মা ছাড়েন ছাড়েন। ও আম্মা, শোনেন না!” উত্তেজনায় জয়নালের গলা ধরে এলো, “ওরা বলতেছে আব্বা আর ভাইরে নাকি আটকায়ে রাখছে শয়তানরা। এরা আমারে সাহায্য করবে দূইজনরে ছাড়ায়ে আনতে। আম্মা, আব্বারে ছাড়ায়ে আনতে আমারে বন্দুক চালানো শেখাই লাগবে। দ্যান খাইতে। জলদি দ্যান। উত্তেজনায় কথা জড়াচ্ছিল জয়নালের।”মুর্শিদার হাত-পা কাঁপতে লাগল। তিনি হায় হায় করা শুরু করলেন। তার শরীর অবশ লাগছে। যে ভয় তিনি পাচ্ছিলেন, তা ঘটে গেছে। বন্দি হয়ে গেছে তার স্বামী ছেলে।

জয়নব জেবাকে ডেকে তুলল। জেবা হুড়মুড়িয়ে উঠে বলে, “কী হইছে আপা? কী হইছে? মিলিটারি আসছে? আগুন দিছে বাড়িতে?”

“চুপ। চুপ কর। এই নে তোয়ালে। দৌড়ে গিয়ে তোর খালেদ ভাইরে ডেকে আনবি।”

ঠোঁট চেপে হেসে উঠল জেবা, “ক্যান আপা? খালেদ ভাইরে খুব দেখতে মন চাইতেছে নাকি?”

-“এক চড় মারব, বেয়াদব। যা বলছি কর।”

জেবা তোয়ালে মাথায় দিয়ে সদর দরজার বারান্দায় উঠল। হ্যারিকেনের আলো ধরল জয়নব, “জলদি যা না রে।”

-“যাচ্ছি যাচ্ছি। এত জলদি কী? না দেখে থাকতে পারো না?”
-“খুব পেকেছিস? এমন মারব না!”একবার পেছন ফিরে দুষ্টু হাসে জেবা বোনের দিকে চেয়ে। সন্ধ্যার আঁধারে বেরিয়ে যায় বৃষ্টির ভেতর হবু দুলাভাইকে ডাকতে। আংটি বদল হয়ে আছে জয়নব আপার খালেদ ভাইয়ের সাথে। খালেদ ভাইটা খুব ভালো।
মুর্শিদার হাত চলছে না। তিনি জয়নবকে বললেন, “তোর ছোট চাচি আর দাদিরে ডাক তো। আমার কেমন ভয় ভয় করতেছে। ওই লোকগুলারে খাইতে দিক ওরা এসে।”

লোকগুলোকে জয়নব খেতে দিলো। লজ্জায় হাত পা ভেঙে আসছে তার। ভয়ও করছে। জেবা নিশ্চয়ই গিয়ে গল্প জুড়েছে খালেদের বোনের সাথে। জয়নব ভেবে রাখল, ফিরলে পিঠের ওপর দুম দুম করে দুটো কিল বসাবে।

তিনজন খেলো। এরপর জয়নালকে নিয়ে চলে গেল জলিল আমির ও জাভেদের খোঁজে। বাপ-ভাইকে আটকে রাখা হয়েছে। নিশ্চয়ই অত্যাচার করা হচ্ছে! জয়নালের শরীরের রক্ত টগবগ করছে। জাভেদ ভাই আর আব্বার গায়ের সবটুকু যন্ত্রণা সে ওই জানোয়ার মিলিটারিদের দেবে। পণ করল

মনে মনে। ওদের হাড্ডি ভেঙে এনে আমির বাড়ির ফটকে ঝোলাবে সে।যাবার আগে একবার দৌড়ে জয়নবের কাছে এলো, “আপা, আমি যাচ্ছি। রামদা-টা বের করে দে তো। জলদি দে।”

জয়নব অসহায়ের মতো বলে, “তুই-ও যাচ্ছিস? বাড়িতে কে থাকবে রে?”

জয়নালের চোখে অগ্নিঝরা উত্তেজনা, সে বলল, “খালেদ ভাই আসতেছে তো। শোন আপা, পিছু পিছু আয়। ফটক আটকে যা। কণ্ঠ না চিনলে খুলবি না। বাড়িতে আগুন লাগানোর ভয় দেখাইলেও না, খবরদার। আব্বা, চাচারা বিপ্লব করছে। আমাদের বিপদ

কিন্তু বেশি। আব্বা, চাচার খোঁজে আসবে ওরা।''

জয়নব একবার পিছু ডাকে। জয়নাল বিরক্ত হয়, "সময় আছে নাকি? আবার ডাকিস ক্যান? ফিরে আসতেছিই তো আমি।''ঝারি মারল, অথচ পারল না যেতে। আবার ফিরে আসলো, "কী হইছে?''

জয়নব কিছু বলে না, শুধু তাকিয়ে থাকে জলন্ত চোখে, জয়নালের গালে হাত বোলায়, দৃঢ় স্বরে বলে, "আব্বা আর জাভেদরে না নিয়ে ফিরবি না। দরকার পড়লে ওই পশুগুলার বুক ঝাজরা করে ফেলবি। যা,

জলদি যা জয়নাল। যদি তোর শরীরে আঘাত লাগে, তার দ্বিগুন দিয়ে আসবি। জয় বাংলা।''

জয়নালের বুক ফুলে ওঠে, দৃঢ়তার হাসি হেসে বোনের দিকে চেয়ে হাত মুঠো করে ধরে মাথার ওপর তুলে বলে, ‘‘জয় বাংলা। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।''

মুর্শিদাকে বলে, ‘‘আম্মা চিন্তা কইরো না। কোন শুয়োরের বাচ্চা আব্বারে ধরছে, দেখব আমি। আমি আব্বা আর ভাইরে না নিয়ে ফিরব না। ইনশাআল্লাহ।''মুর্শিদা কপালে একটা চুমু খেয়ে বললেন, ‘‘আমার বুক খালি করিস না রে জয়নাল। আমি তোরে হাশরে বাঁধাবো বলে দিলাম। আমার জয়নালরে

ফিরায়ে নিয়ে আসবি আমার কাছে, কথা দিয়ে যা।”

লুঙ্গিতে কাছা মারতে মারতে অন্ধকারে বেরিয়ে যায় জয়নাল আমির অচেনা লোকগুলোর সাথে।

মাঝরাত হয়। খালেদ আসেনি। জেবাও ফেরেনি। জয়নাল অথবা জলিল আমির বা জাভেদ কেউ আসেনি। জয়নব নামাজ পড়ে আম্মার সাথে। দাদির ঘর থেকে কান্নার আওয়াজ আসছে। বাচ্চাকে ঘুম পাড়িয়ে ছোটচাচির এই ঘরে আসার কথা। জামিল শুধু পায়চারী করছে। মুর্শিদা জোর করে জামিলকে তিনটে রুটি খেতে দিলেন।

কোনোমতো ঠেকিয়ে রেখেছেন ওকে বাইরে যাওয়া থেকে। তারপর থেকে ফুঁসছে, ছটফট করছে ঘরের ভেতর।

গোটা পাড়া প্রায় খালি হয়ে গেছে। যে যার মতো নিরাপদের খোঁজে গেছে। খবর এসেছিল দিনাজপুরের এদিকে মিলিটারি হামলা হবে দু একদিনের মাঝেই।শুনশান চারদিক। শুধু বৃষ্টির শব্দ। অবরুদ্ধ এক দুর্যোগের রাত। পৃথিবীর কোথাও যেন প্রাণ নেই, আলো নেই, আছে শুধু বর্বরদের ভারী বুটের গটগট আওয়াজ আর হাতের অস্ত্র থেকে ছুটে যাওয়া বুলেটের ঝংকারধ্বনি। ঝরছে রক্তের বৃষ্টি, লাল টকটকে বৃষ্টির

পানির দানা ঝমঝম করে ঝরছে। সেই ঝমঝম রব ছাপিয়েও যেন কানে ছুটে আসে মানুষের হাহাকার, আর্তনাদ, গুলির আওয়াজ আর নিঃশব্দ নৃশংসতার ভোঁতা গোঙানি। আমির নিবাসের ফটকে বিকট আওয়াজ হলো। ফটকটা কি কেউ ভেঙে ফেলল? মুর্শিদা কাঁদছেন। কিন্তু মুখটা শক্ত। সময় যত যাচ্ছে, বুকের উত্তাপ বাড়ছে। তার ছেলেরা কেন বাড়ি ফেরেনি। স্বামী কেন এসে দরজা খটখটায়নি? বুকের ভেতর আগুন জ্বলছে। জয়নব নিঃশ্বাস আঁটকে থাকল ক্ষণকাল। এরপর দৌড়ে বড় বারান্দা গলি পেরিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল। দুটো বটি আর লোহার শিক

নিলো। ফিরতে গিয়ে আবার ঘুরে পাটার ওপর থেকে শিলটা নিয়ে ঘরে এলো। মায়ের হাতে ধরিয়ে দিলো শিলটা। নিজের হাতে রাখল বটি, অপর হাতে শিক।

শব্দ শুনে জামিল খাওয়া ছেড়ে উঠে গেছে। এক দৌড়ে দোতলার সিড়ি ভেঙে উঠোনের কোণ থেকে শাবল তুলে নিলো সে। ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছেকিন্তু কেউ তো নেই! অন্ধকারে চোখ ঘোলা। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে মাঝেমাঝে। জামিল ফটকের সামনের দিকে গেল। আমির নিবাসের লোহার ফটক গাছের গুড়ি দিয়ে ভাঙা হয়েছে। দু ভাগ হয়ে আছে দু'দিকে। জয়নব দোতলার বারান্দায় দাঁড়ায়। অস্থির

হাতে কোমড়ে শাড়ির আচল বাঁধে। জামিলকে দেখার চেষ্টা করে। খট করে আওয়াজ ভেসে এলো। জয়নব সতর্ক হয়। কিন্তু এরপর কিছুক্ষণ নিষ্ঠুর স্তব্ধতা। তা ভাঙল ছোটচাচির প্রকৃতি-চেড়া চিৎকার দিয়ে। জয়নবের শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে যায়। এক দৌড়ে নিচে নেমে সদরঘরের বাইরে পা বাড়ায়। মুর্শিদা পিছু নিলেন।

ছোটচাচির ঘর সদর ঘরের পরে পাকা উঠান পেরিয়ে ছোট বাংলোতে। তার দরজা আটকানো। ছোটচাচি পাগলের মতো মিনতি করছেন কারও কাছে। দুটো থাপ্পরও খেলেন বোধহয়।

জামিল তখন বিশাল শাবল নিয়ে এসে দাঁড়াল। শরীরে যেন কিছু ভর করেছে তার। শাবলের কয়েক আঘাতে শাল কাঠের দরজা ভেঙে খণ্ড-খণ্ড হয়ে গেল। গা কেঁপে ওঠা দৃশ্য।কিন্তু জয়নবের গা কাঁপল। পরমূহুর্তে পা তার পরপরই হাত চলল। ছোটচাচির শরীরের ওপর চেপে থাকা দুটো জানোয়ারকে জয়নব বটির দুই কোপ মারল। একজনের মাথা আলাদা হয়ে ঝুলে পড়ল ঘাঁড়ের সাথে, আরেকজনের কাধ থেকে ডান হাতটা আলাদা হয়ে গেল। ছোটচাচির নগ্ন শরীর। ব্লাউজের ছোট্ট এক টুকরো হাতার কাছে দেখা যাচ্ছে

কেবল। পেটিকোটটা ছিড়ে খণ্ড খণ্ড। শরীরে আর কিছু নেই।

জামিল মুখে হাত চেপে নগ্ন চাচির ওপর থেকে নজর ফিরিয়ে শাবল শক্ত করে ধরে। পশু দুটোর ওপর শাবল চালায় দক্ষ হাতে। মাঠে মাটি কুপিয়ে অভ্যস্ত হাত জামিল আমিরের। মাটির মতোই যত্ন করে কুপিয়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে দেহদুটো।মুর্শিদা ডুকরে উঠলেন। ছোটচাচির দুধের বাচ্চা মাসুমকে আঁছড়ে ফেলা হয়েছে। তখনই বোধহয় ছোটচাচি চিৎকারটা অত জোরে করেছেন, যে পুরো বাড়িতে আওয়াজ গেছে। মেঝেতে তার রক্তাক্ত দেহটা পড়ে আছে। জয়নব একটানে

বিছানার চাদর তুলে ছোটচাচির শরীরের ওপর বিছিয়ে দেয়। চাচি বোধহয় জ্ঞান হারালেন। কিন্তু দাদি কই?

আর্তনাদের সময় পাওয়া গেল না। দোতলায় সারি সারি পায়ের আওয়াজ। ব্যাপারটার পরিস্কার হলো এবার। ফটক ভেঙে ঢুকে একদল ছোটচাচির কাছে এসেছে। আর পেছনের রাস্তা দিয়ে আরেক দল দোতলায় উঠে অন্দরে ঢুকে পড়েছে। কাউকে দোতলার অন্দরে না পেয়ে নেমে আসছে।

জামিল চিৎকার করে বলে, “আপা, আগে আসিস না। ওখানেই থাক।”মুর্শিদা ছোট জা-

কে রেখে শাশুড়িকে খুঁজলেন। অন্ধকার। হারিকেনটা পড়ে ভেঙে গেছে।

ওরা মোট সাতজন। জামিল দুটোকে আঘাত করতে পারল। মরল না একটাও। এরপর তাকে ধরে ফেলা হলো। শাবলটা কেড়ে নেয়া হলো আগে। প্রথম ছুরির আঘাতটা জামিলের মেরুদণ্ডের ডান পাশে লাগল। জয়নব বটি নিয়ে এগিয়ে এসে কোপটা ঠিক ছুরিওয়ালার হাতের ওপর বসায়। হাতটা কেটে পড়ে গেল না। ঝুলে রইল চামড়ার সাথে।

এরপর! তিনজনের হাতে বন্দি হলো জয়নব। তার সামনে জামিলের দেহটাকে ছিন্নভিন্ন করা হলো। মুর্শিদার তলপেটে একটা লাথি মারা

হলে মুর্শিদা চিৎকার করে লুটিয়ে পড়লেন মেঝেতে।
জামিল শেষবার আম্মাকে ডাকল কয়েকবার। আম্মা হুশ হারিয়েছে। কাঁদার সুযোগটাও পেল না আম্মা জামিলের জন্য। জয়নব গলা চিড়ে কাঁদছিল। জামিল আর নড়ছে না। বৃষ্টির ছিটে আসা পানির সাথে ওর গরম রক্ত তিরতির করে ধুয়ে চলে যাচ্ছে। জামিল শুয়ে আছে। দুজন জয়নবকে চেপে ধরে রাখল। দুজন উঠে গেল আবারও দোতলায়। জয়নব নিচে দাঁড়িয়ে শুনতে পায়, লোহার বাক্স ভাঙা হচ্ছে। লুটপাট হচ্ছে আমির নিবাস।

জয়নব তখনও একবার ফটকের পানে চায়। আব্বা আসবে না? জাভেদ কোথায়? বাঘটা এখন থাকলে কী করতো এদের? খালিদ এলো না। জয়নবের অভিমান হয়। লোকটার সাথে দেখা হলো না জয়নবের। জয়নব কি আর ফিরবে আমির নিবাসে? ফেরার কথা তো নেই! লোকটার সাথে দেখাই হলো না! রাত বোধহয় তিনটা বাজছিল। বৃষ্টি থামেনি। ভিজতে ভিজতে এসে দাঁড়ালেন জলিল আমির ফটকের সামনে। ফটক ভাঙা। সঙ্গে সঙ্গে কোমড় থেকে রাইফেলটা বের করে রি-লোড করে নিয়ে শক্ত করে জাভেদের হাত

চেপে ধরে ভেতরে ঢুকলেন। কেউ কাঁদছে গুনগুন করে।

সেই রাতে তিনি বৃদ্ধা মা ও ছোট ভাইয়ের শিশু ছেলে ও স্ত্রীর লাশ পেলেন। বড় বারান্দায় সন্তানের লাশ পড়ে ছিল। জামিল আমিরের লাশ আগে আগে জাভেদ দেখেছিল।

তিনি জানতে পারলেন, বাড়িতে তাদের মিছেমিছি আঁটক হবার গল্প শুনিয়ে তার সন্তান ও স্ত্রীদেরকে ফাঁসানো হয়েছে একটি পরিকল্পিত চক্রে। তাঁরা দুজন ঘন্টাখানেক আগেও ফেরার পথে দুটো মিলিটারীর আস্তানায় কেরোসিন ঢেলে আগুন দিয়ে

এলেন।জয়নালকে ওরা নিয়ে গেছে। জয়নবকে তারপর। আমির নিবাসে লুটপাট হয়েছে। জেবাও আর খালেদকে নিয়ে ফেরেনি।

জাভেদের শরীরে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে বৃষ্টির পানি তার বুককে ঠান্ডা না করে বরং উত্তপ্ত করছে। দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। জামিলের রক্ত বৃষ্টির পানির সাথে নালির পানির মতো ভেসে ভেসে উঠোনের স্রোতে মিশছে। সেই রক্ত হাতে তুলে জাভেদ আমির বুকের শার্টে মাখালো। কান্নাটুকু বৃষ্টির পানির সাথে ধুয়ে গেল অন্ধকারে।

মাকে কেবল একবার জিজ্ঞেস করল, “খালেদ ভাই আসে নাই, আম্মা?”

মুর্শিদা দু’পাশে মাথা নাড়েন। হাঁটু গেঁড়ে বসে রইলেন জলিল আমিদ জামিলের লাশের সামনে।

-“আব্বা! ওঠো।”কী ছিল জাভেদের কণ্ঠে কে জানে! জলিল আমির রাইফেলটা কাধে করে উঠে দাঁড়ান। আশ্চর্য! তার পা টলছে। তিনি বুঝলেন, মুক্তিযোদ্ধা হবার আগে তিনি সন্তানের বাপ!

কিন্তু জাভেদের ভেতর তো সন্তানপ্রীতি নেই। ভাইকে চোখের সামনে রক্তাক্ত দেখা, বোনের অনিশ্চিত পরিণতি তার বুকের ভেতরে তুফান

তুলেছে। জাভেদ একবার চাচির ঘরে উঁকি দেয়। তাকে বলতে হয়নি, সে আন্দাজ করে নিয়েছে চাচির সাথে কী ঘটেছে। তার কলিজা মুচড়ে ওঠে। জয়নবের মুখটা মনে পড়ছে। মুর্শিদার পায়ে হাত রেখে বলে জাভেদ, “বিদায় দ্যান, আম্মা। ফিরব নয় মরব। এর বেশি কিছু না। জয় বাংলা।”

জলিল আমির আবার একবার পেছন ফিরে তাকান। মুর্শিদার কান্নার শব্দ বাড়ছে। মায়ের মৃতদেহটার আরেকবার তাকালেন তিনি। স্ত্রীর কান্নাকে উপেক্ষা করে বড় ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি।

খালেদদের বাড়ির ছাই আগুনে ভিজে পিন্ড হয়ে গেছে। জাভেদের শরীর কাঁপছে। ঠান্ডায় অথবা উত্তেজনায়। তার দুই বোন ও ভাই কোথায়? খালেদ ভাইও কি পুড়ে মরে গেছে? সে তো বাড়িতে থাকে না। তার খোঁজে শয়তানেরা রোজ আসে বাড়ি বয়ে।দিনাজপুর সেক্টর-৭ এর অন্তর্ভুক্ত। এই এপ্রিলেই সেক্টর-৭ এর কমান্ডার নিযুক্ত হয়েছেন নাজমুল হক। দিনাজপুর হিলি সীমান্তের কাছে। ভারতের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি অঞ্চল। এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকেই পাকিস্তানি বাহিনী উঠেপড়ে লেগেছিল

দিনাজপুর দখলের জন্য। একের পর অসংখ্য মানুষ হ-ত্যা করে ফিরছিল।

১৯-এপ্রিলের পর তাদের কঠিন এক হামলায় দিনাজপুরের মুক্তিযোদ্ধারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। তারা সীমান্তের দিকেই আশ্রয় নিতে শুরু করল। কিন্তু সকলে বাঁচতে পারেনি। বেশ কয়েকজনকে প্রাণ দিতে হলো। বাড়িতে জানানো হয়নি সেসব শহীদদের মাঝে জাভেদের চাচাও আছে। জাভেদের চাচি ও শিশু চাচাতো ভাই মরে যাওয়ায় সেই কৈফিয়ত দিতে হয়নি। গোটা পুরো পরিবার একেবারে মরার এই এক সুবিধা।চাচা মরেছে চাচির প্রায় সপ্তাহখানেক আগে। এর মাঝে

আর জাভেদ ও জলিল আমির বাড়ি ফেরেননি। চাচি প্রতীক্ষায় ছিল স্বামীর। স্বামীর মৃত্যুর খবর পাওয়ার আগেই ধ-র্ষিতা হয়ে জীবন দিলো।

২১-শে এপ্রিলের পর পর হিলি বন্দরসহ প্রায় দিনাজপুরটাই পাক হানাদার বাহিনীর দখলে এলো। লোকজন পালিয়ে যেতে থাকল। শুধু যেতে পারেনি আমির পরিবারের লোকেরা। গতরাতে ২৬-ই এপ্রিল তারা না পালানো ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার ফল পেয়ে গেছে। জয়নবকে ২৮-ই এপ্রিল রাতে পালাক্রমে চারজন সামরিক বাহিনীর সদস্যরা ধ-র্ষণ করল। সে তখন রক্তাক্ত। ব্লাউজের এক হাতা

তখনও ছিঁড়ে ডান বাহুতে আঁটকে আছে। পেটিকোটে র-ক্ত। শাড়িটা হাতের কাছে কোথাও নেই। এসবে তার কোনো দুঃখ লাগছে না। তার শুধু দুঃখ হলো চারদিকে তাকিয়ে। কোথাও একটু কিছু নেই, যা দিয়ে সে ছটফটে প্রাণপাখিকে খাঁচা থেকে মুক্ত করতে পারে। শাড়িটা কাছে থাকলেও হতো। শাড়ি নেই।

জয়নবের চুল বিশাল। গত পরশু আম্মা বেঁধে দিয়েছিলেন বেণী করে। বেণীর আগা থেকে ফিতে খসে গেছে। অর্ধেকটা বেণী আছে এখনও। রক্তাক্ত দূর্বল হাতদুটো দিয়ে জয়নব শক্ত করে বেণী পাকাতে শুরু করল। খোলা

চুলের চেয়ে বেণী পাকানো চুল গলায় বেশি শক্ত করে ফাঁস লাগাতে পারবে।

কিন্তু তার উদ্দেশ্য সফল হলো না। তার চুলগুলো কেটে দেয়া হলো। তাকে মরতে দেবে না হানাদার বাহিনী। বেঁচে থেকে গর্ভধারণ করতে হবে তাকে। পাকিস্তানীদের বীর্য থেকে জন্মানো এক খাঁটি সন্তানের মা হতে হবে তাকে।

জয়নবকে চিকিৎসাও করানো হবে।কিন্তু পরদিন সকালের পর এক লোক এলো জয়নবের কাছে। লোকটাকে সে চেনে। আনোয়ার খন্দকার। জামিলকে মেরে পরশু রাতে জয়নবকে যখন ধরে আনা হচ্ছিল,

লুটপাটকারীদের মধ্যে আনোয়ার নেতৃত্বে ছিল। সে পাশের পাড়ার মাতব্বরের চাচাতো ভাই। আমির পরিবারকে একটুও পছন্দ করে না। করা উচিতও না। একবার এক নতুন বউয়ের ঘরে ঢুকে পড়ার দায়ে জলিল আমির গাছের সাথে বেঁধে খুব পিটিয়েছিলেন আনোয়ার খন্দকারকে।

পঞ্চমবারের মতো ধ-র্ষিত জয়নব আনোয়ারের কাছে হলো।

কিন্তু এরপর আর জয়নব একটুও আত্মহত্যার চেষ্টা করল না। দরকার নেই। সে বুঝল, সে চেষ্টা করেও আর বেশিক্ষণ বাঁচবে না। খুব র-ক্তক্ষরণ হচ্ছে। ভেসে যাচ্ছে মেঝে। শরীরে

খামছির দাগ কত। সেসব জায়গাও জ্বলছে। জয়নব মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকল। তার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। আব্বা আর জাভেদকে দেখা হয়নি দুটো সপ্তাহ! কিন্ত এ অবস্থায় দেখা করার কোনো ইচ্ছে নেই জয়নবের। সে অপবিত্রা। এই অবস্থায় অন্তত আব্বা আর খালেদের সাথে সাক্ষাৎ করা যায় না! কী বিদঘুটে লাঞ্ছনার ব্যাপার!খানিক পর পাশের কক্ষ থেকে বিকট চিৎকারের আওয়াজ এলো। কাউকে মারা হচ্ছে। সপাং সপাং শব্দের সাথে আর্তনাদগুলো নারকীয় লাগছিল। কিন্তু জয়নবের মনে হচ্ছে

কণ্ঠস্বরটা তার চেনা। মৃদু স্বর। কণ্ঠে প্রাণ নেই।

জয়নব চমকে উঠল। খালেদের আর্তনাদ।

তার ধারণা সত্যি হলো। বিকেলের দিকে তার কক্ষে আরও কিছু নারী, খালেদসহ কিছু বন্দি ও লুটের মাল এনে রাখা হলো। হারিকেন, মোমবাতি ইত্যাদি জ্বালানো হলো। বৃষ্টির কারণে অথবা অন্য কোনো কারণে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন জায়গাটির।

সেই আগুনের আলোতে জয়নব অবাক হয়ে দেখল শেষবার–এটা কেমন জায়গা! সে কোথায়? তার বিশ্বাস হতে চাইল না যে সে আসলেই এই জায়গায়!খালেদের জ্ঞান নেই।

প্রিয়তমার অবস্থা সে দেখল না। জয়নব কিন্তু দেখল শেষবার হবু স্বামীকে। সে আশায় আশায় জেবাকে খুঁজল। খালেদকে এখানে আনা হয়েছে তাহলে জেবা কোথায়? জয়নব জানতে পারল না জেবার তেরো বছর বয়সী দেহটাকে সেই বর্ষণের রাতেই ছিঁড়ে-ছুটে খেয়ে ফেলেছে তারই মাতৃভূমি বাংলাদেশের কিছু ক্ষুধার্তরা। এরপর খালেদদের বাড়িতে আগুন দিয়ে খালেদকে ভাত খাওয়া অবস্থায় ডেকে এনে ক্যাম্পে জমা দিয়ে গেছে মিলিটারীদের হাতে। খালেদের অপরাধ ছিল কঠোর। সে মিলিটারীদের এক কমান্ডারকে কুপিয়ে মেরেছে। কিন্তু তার মূল অপরাধ

হলো, সে মুক্তিযোদ্ধাদের খবর আনা-নেওয়ার দূ। তার কাছে দিনাজপুরের সকল মুক্তিবাহিনীর খবরাখবর আছে। তিনটে দিন ধরে মেরেও খালেদের দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি প্রেমের ওপর কলঙ্ক লাগানো যায়নি। খালেদ বিশ্বাসঘাতকতার মতো সুবিধাজনক কাজটা করল না কোনোভাবেই। বোকা খালেদ মৃত্যুকে বেছে নিলো।

খালেদের কপাল বেয়ে তিরতির করে র-ক্ত পড়ছে। মেঝেতে পড়ে বাতাসে জমাট বেঁধে যাচ্ছে।

শেষ সময়ে জয়নবের খুব জয়নাল আর জাভেদের কথা মনে পড়ছিল। আব্বার মুখটা

ভেসে উঠছিল। ইশ! আব্বা কি জানে, জয়নব কোথায়? জয়নাল তো ক্ষ্যাপা! সে যখন এসব জানবে, কী করবে? পাগল হয়ে যাবে বোধহয়!চারদিন পর পয়লা মে তারিখের পর জলিল আমির জানতে পারলেন–জয়নালকে কারা বের করে নিয়ে গেছে আমির নিবাস থেকে। জয়নালকে উনারা পেলেন নদীর চরের এপারে জঙ্গলের ধারে অচেতন অবস্থায়। জয়নাল চারদিনের না খাওয়া অবস্থায় প্রায় অচেতন।

তাকে আমির নিবাস থেকে বের করে এনেছিল–কিছু দেশোদ্রোহী, সুবিধাভোগী বাঙালি। যুদ্ধটা যাদের কাছে বড়লোক হবার

একটা সূবর্ণ-সুযোগ মাত্র। এরাও কিন্তু একেকজন মুক্তিযোদ্ধা। ২৫-ই মার্চের পর বাঙালির ভেতরে যে আগুন জ্বললো, তারপর এপ্রিলের শুরুতে মুক্তিবাহিনী যে মুক্তিকামনা নিয়ে স্বাধীনতাযুদ্ধে নেমেছিল, তারা কিন্তু সেজন্য নামেনি। তাদের কেউ নেমেছিল লোভ-লালসায়, কেউ প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে, কেউ বা ক্ষমতা ও যশ, খ্যাতি লাভ করতে, আর কেউ যুবক বয়সের আবেগী রক্তের ছটফটানিতে।সে হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যোগদান করলেও ভেতরের মিরজাফরের সৈন্য-সত্ত্বাটা কিন্তু বহাল ছিল। এই যোদ্ধাদের সাথেই কাধে কাধ মিলিয়ে দুই সপ্তাহ আগে

জলিল আমির মিলিটারীদের বুক তাক করে গুলি ছুঁড়েছেন। তারা তার পরিবারের জন্য যম হলো।

জয়নালের সুস্থ হতে একদিন লাগল। তার ভেতরের জেদ তাকে অসুস্থ থাকতে দিলো না। তাকে কেন মেরে ফেলতে গিয়েও মারা হয়নি তা বোঝা গেল না।

রাতে তারা আনোয়ার খন্দকারসহ গোটা বংশের বাড়িতে আগুন দিলো। আনোয়ারকে জয়নাল আমির নিজ হাতে জবাই করেছিল। এটা তার প্রথম খু-ন। বাড়ির মহিলারা খুব চেঁচাচ্ছিল। জাভেদের ভেতরে তখন কীসের যে হিংস্রতা চাপল। জয়নবের মুখটা তাকে

তাড়া করছে। জয়নবকে সে শেষবার দেখেছে দুই সপ্তাহ আগে আব্বার সাথে যুদ্ধে বেরিয়ে যাবার সময়। জয়নব দৌড়ে এসে বাহুতে একটা তাবিজ বেঁধে দিয়েছিল।

জাভেদ আমির বাড়ির মহিলাদেরকে বাড়ি থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে দিয়ে আব্বাকে ইশারা করল বাড়িতে আগুন দিতে।মহিলারা গোটা অঞ্চলে ছড়িয়ে দিলো–আমির পরিবারের মানুষেরা রাজাকার। ওরা মুক্তিযোদ্ধার বেশ ধরে মিলিটারীদের কাজ করছে। ওরা মূলত মিলিটারী মারার নাম করে রাতের অন্ধকারে বাঙালিদের বাড়িঘর

জ্বালাচ্ছে, মানুষ হ-ত্যা করছে। তার প্রমাণ তারা নিজে।

তিন বাপ-ব্যাটাকে পালিয়ে বেড়াতে হলো। তারা আর কোনো মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগ দিতে পারল না। গোটা অঞ্চল জানে তারা আমির বংশীয়। আর অধিকাংশ জমিদারেরা পাকিস্তানিদের সঙ্গ দিয়েছে। সুতরাং আমির পরিবারের রাজাকার হবার ব্যাপারটি খুবই বিশ্বাসযোগ্য হলো সবার কাছে।এই হতাশা যেমন জাভেদ ও জলিল আমিরকে ব্যথিত করছিল, তেমনই উল্টো প্রভাব ফেলেছিল জয়নালের ওপর। জয়নালের ভেতরে পাগলাটে বিদ্রোহের জন্ম দিলো বরং।

ছোটবেলা থেকে একরোখা, জেদি জয়নাল সহ্য করতে পারল না এত বড় অপবাদের গ্লানি। তার শুধু মনে হলো–যে মুক্তিযুদ্ধের দায়ে চাচা, ভাই, দুটো বোন, দাদি, চাচি, শিশু চাচাতো ভাইকে এত নির্মমভাবে হারালো, তার প্রতিদানে সে নেহাত কম পায়নি। তার বুক ফুলে উঠতো এত ত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া এই কঠিন পরিচয়টিতে। জয়নাল সেটাকে গ্রহণ করল সাদরে। এত ত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া এই পরিচয়টি সে আর কখনও নিজের থেকে আলাদা হতে দেয়নি–সে রাজাকার।কোনোদিন আর জয়নাল নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা বা স্বাধীনতাকামী বলেনি।

এক শব্দে সে নিজের পরিচয় দিয়েছে, 'আমি রাজাকার।' কোনোদিন নিজের সাফাই না গাওয়া পরবর্তীকালের সন্ত্রাস জয়নাল আমির স্পষ্টভাবে জানল না, তার বংশে পরবর্তীতে আরেকটা জয়নাল আমির জন্মাবে।

জয়নালেরা বারবার জন্মায়। কেউ জানে না তাদের।

সে বাপ-ভাইয়ের সঙ্গ ছাড়ল। বাপ-ভাই বুকে কষ্ট চেপে লুকিয়ে মিলিটারী মারতে যায়। জয়নাল যায় না। সে আর মিলিটারী মারবে না। সে মারবে তাদের, যাদেরকে মারার ফলে সে-ও তাদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। ধীরে ধীরে তার হাত পাকাপোক্ত হলো। রাতের বেলা

দেশোদ্রোহীদের মারে, দিনে পালিয়ে থাকে। কেউ কেউ তাকে চিনেও ফেলে। সে দেশের মানুষদের মেরে মেরে বের হচ্ছে, পালিয়ে যাচ্ছে। তাতে একটা উপকার হলো। তার নামের শেষে রাজাকার শব্দটি খুবই শক্তপোক্তভাবে গেঁথে গেল।জাভেদ কিন্তু বছরের মাঝামাঝিতে এসে দোটানায় পড়ল। সে জয়নালের মতোন অত জেদি নয়। তার ভেতরে দেশের জন্য বড্ড ব্যথা। কিন্তু সে বিশ্লেষণধর্মী মানুষ। সবাই যখন উন্মত্তের মতোন মিলিটারী মারতে ব্যস্ত, তাদের একটাই লক্ষ দৃশ্যমান দুশমনদের পূর্ব পাকিস্তানের জমিন থেকে বিদায় করতে হবে।

এটা স্বাভাবিক। তৎকালীন পরিস্থিতি শুধুই মানুষের বর্তমান দেখার ওপর কাজ করে। কিন্তু পরিণতি, ফলাফল, গভীরতা সম্বন্ধে চিন্তা করতে মস্তিষ্ক সেই উত্তাল সময়ে কাউকেই নির্দেশ দেয় না।

গোটা বাঙালির হালও তাই। জলিল আমিরের হাল আরও তাই। তিনি এক দেবতার পুঁজো করেন। দেবতার নাম মুজিব। স্বাধীনতার ডাক দেওয়া দেবতার ভাষণ তিনি নিজকানে শুনেছেন রেসকোর্সে দাঁড়িয়ে। তিনি কেবল মুক্তি চান, তিনি বাঁচতে চান। এবারের এই সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।কিন্তু জাভেদ ভাবতে লাগল অন্যভাবে। ১৯৭০ সনের

নির্বাচনে যখন আওয়ামী লীগ জয়লাভ করল, জাভেদের নিঃশ্বাস আঁটকে এসেছিল খুশিতে। কিন্তু একদল মোল্লা শ্রেণী সেটার অন্যরকম ব্যাখ্যা তৈরি করেছিল। তারা বলল, এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে জেতাতে ভারত থেকে মানুষ এসে ভোট দিয়ে গেছে। এই সহায়তার মূল উদ্দেশ্য কী? এই সহায়তার মূল উদ্দেশ্য কি পাকিস্তানকে দেশ থেকে তাড়িয়ে নিজেরা বাংলাদেশকে শাসন করা নয়? পাকিস্তান যদি ওদের শত্রু না হতো, তাহলেও কি ওরা বাঙালিকে এভাবেই তথাকথিত সহায়তা করতো? পাকিস্তানের ওপর নিজেদের একটা প্রতিশোধ নেবার

সুযোগ হিসেবেই কি তারা এই সহায়তাটি পরিচালনা করছে না? এর বদলে তারা কী চায়?মানুষ ক্ষেপে গেল মোল্লাদের ওপর। জাভেদের ইচ্ছে হয়েছিল ওদেরকে গিয়ে কুপিয়ে আসতে। দিনাজপুর, হাকিমপুরের কওমী মাদ্রাসার পরিচালক ও ধর্মীয় নেতারা এসব কথা বলতে শুরু করেছিল। তারা বলল, স্বাধীনতা আসলে কী? এক দেশ থেকে মুক্তি লাভ করে অন্য দেশের হাতে নিজেকে গোলামির উদ্দেশ্যে সঁপে দেবার নাম স্বাধীনতা? তাহলে এই স্বাধীনতা আমাদের কাম্য নয়।

জাভেদ মন ভরে তাদের ঘেন্না করে আসছে একটা বছর যাবৎ প্রায়। তার ঘেন্না হয় এটা ভাবলে যে, এরা তারই ধর্মের মোল্লা সম্প্রদায়। ধর্মও এদের ভেতরে দেশপ্রেম জাগায়নি। তারা ধর্মের নামে পাকিস্তানকে সমর্থন করে। ছিঃ! তারা স্বাধীনতা চায় না। কিন্তু তাদের সাথে ঘটে যাওয়া এই ঘটনা জাভেদকে কেমন যেন গভীর থেকে ভাবাতে শুরু করল। আচ্ছা, দুনিয়ার চলমান পরিস্থিতি ঠিক কেমন? কোথায় এর শেষ আর কোথায় বা শুরু? এত জটিল কেন সব? তারা কী করছে? স্বাধীনতা আসলে কী? তারা কি আসলেও স্বাধীন হবে? মোল্লারা কী বলে?

ঠিক বলে না ভুল বলে? আবার যারা বলছে, স্বাধীনতা আসবে না পাকিস্তানিদের বিতারিত করলেও। তারা কারা? অধিকাংশ মুসলমান। যুদ্ধের ময়দানে জাভেদ তাদেরকে র-ক্তে জড়ানো ধুলোর ওপরে লুটিয়ে পড়ে এক সৃষ্টিকর্তার নামে সেজদা করতে দেখেছে। তাহলে এটা কী? এই মুসলমানেরাই বলছে তারা স্বাধীন হবে না পাকিস্তান গেলে। শুধু পাকিস্তানকে সরিয়ে লাভ নেই। আবার এরাই তো ঝাঁপিয়ে পড়ছে যুদ্ধে। তাহলে এরা আসলে জাতিকে বলতে চাইছেটা কী? কোনো অগ্রিম বার্তা দিতে চাইছে না তো? যা তারা এখন বুঝতে পারছে না, পরে বুঝবে কিন্তু

লাভ হবে না! আসলে দেশপ্রেমিক কারা, আর দেশোদ্রোহী কারা? পার্শ্বদেশ কেন সহায়তা করছে আমাদের? বিনা-স্বার্থে? তাই আবার হয়! মোল্লারা মূলত কেন ওদের সহায়তাকে ভালো চোখে দেখে না?এসব ভেবে শেষ করার ফুরসৎ জাভেদ আমির পেয়েছিল না। তার আগেই জয়নাল খবর দিলো জয়নব ও খালেদকে পাকিস্তানিরা যে ঘাটিতে তুলে নিয়ে গেছিল, তা হাকিমপুরের মাদ্রাসা। পাকিস্তানিরা ওখানে দিনাজপুরকে কবজা করার লক্ষ্যে বিশাল ঘাঁটি গেড়েছে। হাকিমপুর হিলি স্থলবন্দের কাছে। সহজ হিসেব। তারা যখন হিলি বন্দর দখল করেছে,

তখন মোল্লাদের মাদ্রাসা মোল্লারা ছেড়ে দিয়েছে পাকিস্তানিদের জন্য। ওই মাদ্রাসাতেই এখন বাঙালি হ-ত্যা, নারী ধ-র্ষণ, লু-টপাটের মাল ভাগাভাগির কাজ চলে।

জাভেদের পূর্বেকার সব ভাবনা চুড়মার হয়ে গেল এই লহমায়। সে আবারও সৈয়দ পরিবার-বিদ্বেষী হলো। সৈয়দ পরিবার চালায় ওই মাদ্রাসা।সৈয়দ পরিবারের নাম-চিহ্ন মিটিয়ে দিতে জয়নাল ও সে তৈরি হয়ে গেল। জয়নাল খুব শান্ত তখন। তাকে আর মোটেও মুক্তিযোদ্ধা লাগে না। তার ভেতরে মুক্তিযোদ্ধাদের মতো সেই তেজ, রক্ত টগবগ

করা আগুন, চোখে মুক্তির নেশা এসব কিচ্ছু নেই। আছে এক অদ্ভুত শীতলতা।

জাভেদ অবাক হয়ে গেল–জয়নাল এক দেশোদ্রোহী বাহিনীর সহায়তা নিয়েছে সৈয়দ পরিবারে হামলা করতে। সেই বাহিনী না এদেশের না ওদেশের। তারা কেবল বিশৃঙ্খলার, উন্মাদ রাহাজানি আর র-ক্তার-ক্তির।

যা করলে অঞ্চলজুড়ে অস্থির, অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি হয়, তা করতে সদা প্রস্তুত সেই বাহিনীকে নিয়ে গিয়ে জয়নাল সৈয়দ পরিবারের অসুস্থ কর্তা বৃদ্ধ সৈয়দ আব্দুল বাশার নিয়াজী সাহেবকে গলা টিপে হ-ত্যা

করল। সেই বাহিনী সৈয়দ পরিবারের কয়েকজন মহিলাকে নিয়ে আমোদেও মেতে উঠল। জয়নাল কিচ্ছু বলল না। সে এগিয়েও গেল না। জয়নবের সাথে যা হয়েছে, তা সৈয়দ পরিবারের মহিলাদের সাথেও হলো। জয়নাল এতে কোনো ভুল দেখল না।সেই বাহিনীর চাহিদা মেটাতে সে সৈয়দ পরিবারের শেষ সম্বলটুকু অবধি ছিনতাই করে নিয়ে এসে ওদের মাঝে বিলিয়ে দিলো। একটা পয়সা অথবা গহনাও রাখল না নিজের জন্য। তার বয়স সবে তখন আঠারো হবে। আফসোসে তার মুখ কালো তখন। সৈয়দ পরিবারের বিশাল গোষ্ঠীশুদ্ধ পুরুষ জনতা

তখন বাড়িতে নেই। জয়নাল মোল্লাদের পুরো বংশকে নির্বংশ করতে গেছিল। অসুস্থ বৃদ্ধ ও বাড়ির মহিলা ছাড়া কাউকে পেল না।

নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে দিনাজপুরের যোদ্ধারা বিশাল এক আগ্রাসনের মাধ্যমে বদ্ধ পরিকর হলো–মিলিটারীকে দিনাজপুরের মাটি থেকে উৎখাত করতে। তখন আর তারা কে রাজাকার, কে প্রকৃত যোদ্ধা তা হিসেব করেনি। সেক্ষেত্রে জলিল আমির সক্রিয় ছিলেন তাদের সাথেই। মুক্তাবাহিনী সেই উত্তাল সময়ে উনাকে তেমন গ্রাহ্য না করলেও ফেলে দিলেন না।স্বাধীনতাকামী জলিল আমির সেসব কিচ্ছুতে মনোযোগ না দিয়ে কেবল

শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ে গেলেন। দিনাজপুর হানাদারমুক্ত হলো ডিসেম্বরের মাঝামাঝি তারিখে। এর মাঝে জলিল আমির চিরতরে নিজের ডান পায়ের চলাচল ক্ষমতা হারালেন। তার চলার সঙ্গী হলো লাঠি অথবা স্ক্রাচ। কিন্তু এই চূড়ান্ত লড়াইয়ে দেখা গেল না তার দুই ছেলেকে। তিনি তাঁর পা হারানোর সুবাদে মুক্তিযোদ্ধার নাম পেলেও জাভেদ পেল দেশোদ্রোহী পরিচিতি। আর জয়নাল বলাবাহুল্যভাবেই একজন বিখ্যাত রাজাকার দিনাজপুরের।

আমির পরিবার ও সৈয়দ পরিবারের মাঝের এই দুশমনী তৈরির শুরুটা কোথাও একটা

আচমকাই অদ্ভুতভাবে হলো বটে, কিন্তু এর শেষ নেই বোধহয়!জয়নাল প্রকৃতপক্ষেই এক ত্রাসের সম্রাট হয়ে উঠল। তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন জাভেদ আমির। সে খুব খুশি খুশি বেরিয়ে গেল সুশীল সমাজ থেকে। তার খারাপ হতে একটুও কার্পণ্য নেই। জাভেদ আমির কেমন পাগল পাগল হয়ে গেল। সে শুধু ভাবে আর ভাবে।

তখন দেশে লুটপাট চলছে। ক্ষমতার লুটপাট। কে কার ওপর দিয়ে কোন পদে বহাল হতে পারে। সবাই তখন প্রমাণ দিতে ব্যস্ত–কে কতটুকু অবদান রেখেছে স্বাধীনতায়, তাকে সেইটুকু মেপে হিসেব করে ক্ষমতা দিয়ে দেয়া

হোক। কেউ তার প্রতিদান না নিয়ে ঘরে ফিরতে নারাজ।জাভেদ ভাবনায় পড়ল, এরা কি তাহলে যুদ্ধ করেছে স্বাধীনতার জন্য নাকি প্রতিদানের আশায়? সে দেখল, ভারতও চমৎকার সহজ উপায়ে বাংলাদেশকে গ্রাস করে ফেলেছে। মুজিব তাতে সম্মতির হাসি হাসছেন। জাভেদের মস্তিষ্কে দিনদিন অস্বাভাবিক রকমের সব দর্শন খেলে যেতে লাগল। মোল্লারা কী বলতো! গুণীজনেরা কী বলে গেছেন! বছর যত যায় দেশের নেতারা তত রঙের রূপ দেখাতে থাকে। জাভেদের চোখের অনিন্দ্য সুপারহিরোরা কেমন সুপারভিলেন হয়ে উঠছিল।জাভেদ খুব অল্প

সময়ে বুঝে ফেলল, স্বাধীনতা একটি কল্পিত তত্ত্ব মাত্র। এর বাস্তবতা নেই। স্বাধীনতা কল্পনাতেই সুন্দর। বাঙালি আজও করুণ সুরে কাদে, খিদেয় পেটে পাথর বাঁধতে যায়, আজও নারীর সম্মান যায় কিন্তু বিচার হয় না, ক্ষমতার লড়াইয়ে দেশে অরাজকতা স্পষ্ট দেখা যায়। অথচ হানাদার গেছে বছর তিনেক প্রায় আগে। ক্যালেন্ডারের পাতায় এটা ১৯৭৪। তাহলে স্বাধীনতা আসলে কী?

এখন পার্শ্বদেশ দেশের সম্পদে ঠিক সেভাবেই ভাগ বসায় যেমন ভাগ বাপের দুটো সন্তান বাপের সম্পত্তিতে পায়। বাংলাদেশের সম্পত্তি ও সার্বভৌমত্বে ভারতের সমান নয়

বরং বেশি অধিকার। এসব কথা মোল্লারা বেশি বলে। তাই তাদের কল্লাটা বেশি যায়। তারা দেশোদ্রোহী। তারা দেশের নেতাদের বিরুদ্ধে কথা বলে। এরা আগে যেমন দেশের স্বাধীনতায় নারাজ ছিল, এখনও আছে। এই যে এখন কত সুন্দর স্বাধীনতা আমাদের! আগে পাকিস্তানীরা ক্ষমতায় ছিল, এখন দেশের সন্তান। অথচ ওরা বোঝে না, এরা খুশি না।সব ঠিক লাগলেও জাভেদের ভেতর থেকে জয়নব ও খালেদের স্মরণ যায়নি। সে ঠিক মনে রেখেছে, মোল্লাদের মাদ্রাসায় এরা দুজন নৃশংসভাবে বলি হয়েছিল। জাভেদ দোটানায় দিশেহারা হয়ে উঠছিল দিনদিন। সে

চুল-দাড়ি কামায় না, হাসে না, বসে থাকে বাগানের শেষে একটা চেয়ার পেতে। ঘন্টার পর ঘন্টা কেবল চুরুট টেনে চলে যায় তার দিন, মাস, বছর।

জলিল আমির জোর-জবরদস্তি করেও ১৯৮৫ সনের আগে জাভেদের বিয়ে দিতে পারলেন না। পাটোয়ারী বাড়ির একমাত্র মেয়ে হুমায়িরা পাটোয়ারীর সঙ্গে জাভেদ আমিরের বিয়ে হলো। জাভেদ আমিরের বয়স তখন একত্রিশ।

জয়নাল আমির রাজধানীতে ত্রাস গড়েছে। দিনাজপুরে এলেও সে আমির নিবাসে পা রাখে না। সে থাকে নিজের তৈরি বাসভবনে।

১৯৮৭ সনের ২৯-জুন জাভেদ আমিরের ছেলের জন্ম হলো। আশ্চর্যজনকভাবে প্রায় যুগখানেক পর আমির নিবাসে পা রাখলেন জয়নাল আমির। সাথে এক গাড়ি উপঢৌকন। তার ভাতিজা জন্মেছে। লোকে বলল–দেখতে জয়নাল আমিরের মতো। জাভেদ আমিরের চেহারায় সেই ধার নেই, যা তার সন্তানের চেহারায় দেখা গেল। কিন্তু তা জয়নাল আমিরের চেহারায় আছে।

জয়নাল আমির নাম রাখলেন ভাতিজার–জুনিয়র জয়নাল। কঠোর জয়নাল আমিরের ভেতরে শিশু ভাতিজার জন্য কীসের এক পাগলাটে স্নেহ যে জন্মালো। জুনিয়র

জয়নালের নাম সংক্ষিপ্ত হলো। আমির পরিবারের পরবর্তী একমাত্র বংশধরের নাম হলো–জয় আমির। পুরোনো জমিদার বাড়ির শিশু উত্তরাধিকরীর আকিকাতে কতকগুলো গরু-মহিষ জবাই করলে জলিল আমির।জয় আমিরের জীবনের শুরুটা ঠিক ততটাই অভিজাত্য ও যত্নের সাথে হলো যতটা অগোছালো ও ছন্নছাড়া তার পরিণতি পরবর্তীকালে হয়েছিল।জয় আমির জন্মগ্রহণ করল দেশের এক উত্তাল রাজনৈতিক পরিবেশে। ১৯৮৭ সন। বাংলাদেশে সামরিক শাসন চলছে। উত্তাল দেশের অবস্থা। তখন সকল বিরোধী দল পারস্পারিক সংঘাত

একপাশে রেখে স্বৈরাচার পতনের লক্ষ্যে হাতে হাত রেখেছে।

জাভেদ আমির ধীরে ধীরে আবারও রাজনীতিতে ফিরলেন ঠিকই। কিন্তু এবার তার দৃষ্টিকোণ ও মনোভাব বোঝা বড় দায়।

১৯৯০ এর শেষে স্বৈরাচারের পতন হলো।

জয়কে স্কুলে ভর্তি করা হলো চার বছর বয়সে। তার জিদেই। সে দেখেছে সকলে স্কুলে যায়। তারও যাওয়া দরকার। বাড়িতে দুটো মহিলা রাখা আছে জয়ের যত্নের জন্য। তাদেরকে সহ্য করা যাচ্ছে না। একটার বয়স কম। বিশ-বাইশ বছর হবে। খুব নজরে, যত্নে রাখে। অত যত্ন-আত্তি বড়লোকপনায় বিরক্ত

সে। তার মাথায় ফুলদানী দিয়ে মেরে জখম করে দিয়েছে সে। তার ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে। তবু মেয়েটার লজ্জা নেই, আবার আসে জয়ের দেখাশোনা করতে। জয় তাই আরও বিতৃষ্ণ মেয়েটার ওপর।

জাভেদ আমিরের সাথে ঝামেলা তার। সে রোজ স্কুল থেকে বড়বাবা কাছে যায়। বাপের ছোটভাইকে সে ডাকে বড়বাবা। এটার কারণ আছে। বাবা শাসন করে। তার বাবাকে ভালো লাগে না। বাবার চেয়েও বেশি আপন ও বড় তার চাচা। তাই জয়নাল আমির তার বড়বাবা। এত চতুর সে কোত্থেকে হয়েছে তা নিয়ে উদ্বেগ আছে হুমায়িরার।

জয়নাল আমির নিতে আসেন স্কুলের গেইটে। চাকরেরা ভয়ে সরে আসে, বাঁধা দিতে পারে না জয়নাল আমিরকে। জাভেদ একবার জিজ্ঞেস করলেন, "এই বেয়াদব! জয়নালের সাথে গেছিলি?"-"হ্যাঁ।"

-"কেন?"

দৌড়ে গিয়ে দাদুর কোলে চড়ে বলল, "আমার ভালো লাগে। তুমি আর নিষেধ করবে না। আমি যাবই।"

তবু জাভেদ দুটো থাপ্পর মারলেন। খুব জোরে নয় তবে লাগল। কিন্তু জয়ের মুখ দেখে মনে হলো না, তার কিছু হয়েছে। পরেরদিন সে

সন্ধ্যার পর ফিরল চাচার কাছ থেকে। আগে বিকেলে ফিরতো।

বাবা থাকলে তার বন্ধুদের আড্ডা মিস যায়। আমির বাড়ির ফটকের সামনে এসে তাকে ডাকার সাহস কারও নেই। তা মনেহয় একমাত্র বাবার জন্যই। দারোয়ানটা চরম খিটখিটে। একবার তাকে অবশ্য কুকুরের দৌড়ানি খাইয়েছিল সে। পুকুরে গোসল করার উপায় নেই। তাছাড়া তার কিছু অবলা শাগরেদ আছে। গোয়ালের গরুগুলো, ফটকের বাইরে বসে ঝিমানো কুকুরেরা, বাড়ির ছাদের চিলেকোঠায় বাচ্চা তোলা বিড়াল, কবুতর। এগুলোর পরিচর্যা করতে পারা যায় না বাবার

জন্য। আরও আছে তার বাজিগর। বাজিগরগুলো দিয়েছে বড়বাবা। ছয়টা থেকে নয়টা হয়েছে ওরা। একটার জোড়া নেই। সে নাড়তে চাড়তে গিয়ে ডিম নষ্ট করে ফেলেছিল। সে কি কান্না! তার দোষ নাকি দাদুর। কারণ দাদু মাত্র চারবার ডিম নাড়তে নিষেধ করেছে। এর বেশি বলেনি। বাবার হাত থেকে ওগুলোকে বাঁচিয়ে রাখারও চাপ আছে। বাবা সুযোগ পেলেই বড়বাবার দেওয়া পাখিদের উড়িয়ে দেবে। কম চাপে থাকে না সে। বড় ব্যস্ত মানুষ।এমন বাবার সাথে ভালো সম্পর্ক রাখা জয়ের দ্বারা সম্ভব না।

হুমায়িরার কাছে একবার বিচার এলো, ক্লাসের চারটে ছেলেকে মেরে জখম করে দিয়ে এসেছে। কারণ, ওরা তাকে রাজাকারের ভাতিজা বলেছে। সে তখন টু-তে। সে ক্লাসে দল গঠন করেছে। একদল যারা জয়কে রাজাকারের ভাতিজা বলে না, দেশোদ্রোহীর ছেলে বলে না। আরেকদল যারা বলতে চায় কিন্তু এখন ভয়ে বলতে পারে না। তারা হলো জয়ের বিরোধী দল।

দাদুর সাথে খাতির তার ভালোই। কিন্তু রাগ হয় যখন দাদুর কাছে বন্দুক চালানো শিখতে চাইলে শেখায় না। দাদুর লাঠি লুকিয়ে সে সপ্তাখানেক ভুগিয়েছে দাদুকে। তাতে জলিল

আমির আরও ক্ষেপেছেন। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, জয়কে আর কোনোভাবেই তিনি ভালোবাসবেন না। কিন্তু জয়ের তো ভালোবাসা লাগে না।সে এমন সব কাজ করবে যাতে দাদুর পক্ষে তাকে ভালোবাসা সত্যিই কঠিন হয়। সে দাদুর সংবাদপত্র ছিঁড়ে কুটিকুটি করে রাখে। পান খায় দাদু। সে চুনের ভেতর পানি ঢেলে টলটলে বানিয়ে রাখে। নামাজে যাওয়ার সময় টুপি নিয়ে খেলতে চলে যায়। একবার দাদুর জন্য বেড়ে রাখা তরকারীতে মরিচের গুড়ো মিশিয়ে নেড়েচেড়ে রেখে দিয়েছিল। হুমায়িরা তাকে ঝাল খেতে দেন না। কিন্তু সে জানে মরিচের

গুড়ো ঝাল। তা খেয়ে দাদুর অবস্থা খারাপ। পানি খেয়ে শান্ত হলে সে আস্তে কোরে গিয়ে দাদুর সামনে গিয়ে হাত পেছমোড়া করে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি মিশিয়েছি তোমার খাবারে ঝাল। বলো, আর কোনোদিন ভালো বাসবে না বলে হুমকি দেবে? চুপচাপ ভালো না বাসবে। বুঝলে?"

এরকম বিরোধীতা চলল কিছুদিন। দাদু একদিন এসে খুব চোটপাট করলেন। জয় একটা কথাও অস্বীকার করেনি। সব স্বীকার করেছে। এমনকি যা অপরাধ করেনি তাও। বড়বাবা বলেন, "লোকের কাছে ভালো হবার চেষ্টা করার দরকার নেই। মানুষ ভালোদের

দোষ খুঁজে বের করার চেষ্টায় মত্ত থাকে কেবল। একই কাজ খারাপ হিসেবে পরিচিত লোকেরা করলে ঠিক আছে। কিন্তু ভালো মানুষ হিসেবে তা তুই করেছিস এটা প্রমাণ হলে তারা তোকে আর বাঁচতে দেবে না। খারাপ হিসেবে পরিচিতদের স্বাধীনতা বেশি। তারা যা খুশি করতে পারে। তুই যা খারাপ করছিস সেটাও তোর, আর নিজের কৃতকর্ম হোক ভালো বা খারাপ তা অস্বীকার করাটা ছোটলোকি। তুই খারাপ এটা তোর স্বীকার করার সাহস না থাকলে তুই কাপুরুষ। কারণ ওটা তোর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। তুই যখন কারও কাছে ভালো সাজতে নাটক করবি বা কারও

মনমতো চলবি, ব্যাপারটা অনেকটা এমন হলো না যে তুই তার কাছে দায়বদ্ধ! তোর কোনো নিজস্বতা নেই।
ভালো সাজতে চায় ভন্ডরা, ভীতুরা, খাতির পাওয়ার লোভীরা। আর এটাই দায়বদ্ধতা, দূর্বলতা, একপ্রকার বাধ্যতা। যেন কেউ তোকে খারাপ ভাবলে তোর যায় আসে। কখনও কারও কাছে ভালো হবার জন্য কোনোরকম সামান্য চেষ্টাও করবি না। কেউ তোর নিজস্বতাকে মেনে নিয়ে থাকলে আছে, নয়ত তোর কাউকে দরকার নেই নিজেকে ছাড়া!জয় মনোযোগ দিয়ে শোনে। কিছু কথা বোঝে, আর যা বোঝে না তাও মনে রাখার

চেষ্টা করে। সে টের পায়, চাচার চিন্তা-ধারার সবই তার ছোট্ট মস্তিষ্কের চিন্তাধারার সাথে প্রায়-ই মিলে যায়। বাবা তাকে হাজার মানা করলেও সে চাচার কাছে যাবেই।

দাদু গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এসব কেন করেছিস?"

সে মুখ গোমড়া করে বলল, "তুমি তো বললে ভালোবাসবে না। কিন্তু আমি তেমন কিছু করিইনি আগে। এখন করছি। যাতে ভালো না বাসার কারণ থাকে। অকারণে ভালোবাসবে না কেন?"

ক্লাস থ্রি-তে তার একটা গৃহশিক্ষক রাখা হলো। মাস্টার আসার আগে সে যায় ঢিল

ছুঁড়ে আম পাড়তে। হামজা এসে সেদিন এক ঝুড়ি আম দিয়ে গেছে। কিন্তু চুরি করা আমের স্বাদই আলাদা।জাভেদ ব্যবসার কাজে প্রায়-ই ঢাকা-চট্রগ্রাম থাকেন। তখন বিচার আসে জলিল আমিরের কাছে। হুমায়িরাকে ধরে মহিলারা বলে জয়ের কুকীর্তির কথা। সেদিন আম পাড়তে গেছে মন্ডলদের বাগানে। মন্ডল বাড়ির ছেলেরা এসে বাঁধা দিচ্ছিল। বড়দের ডেকে আনার হুমকি দিচ্ছিল।

আম না পড়ে যে ডাল-পাতা ভেঙে পড়েছে, তা-ই তুলে বেদম মেরেছে ওদের। ওদের অপরাধ, নিজেরা কোনো একশন না নিয়ে বড়দের ডাকার মতো এমন ছোটলোকি হুমকি

ওরা কেন দিলো? যা করবে ওরা করবে। কাপুরুষের মতো বড়দের ডাকতে চেয়ে ওরা জয়ের মারামারির মুডটাই নষ্ট করে দিয়েছে। যুদ্ধে-বিগ্রহ হবে সমান সমানে। তারপর দেখা যাবে কে জেতে।মাস্টার এসে বসে আছেন আধঘন্টা। জলিল আমির দু'বার খড়ি নিয়ে খুঁজে এসেছেন। পাননি খুঁজে ওকে। পাবার কথা নয়। সে বাগানের ওপারে ভাঙা গোয়ালের কোণায় সভায় ব্যস্ত। ও পাড়ার কয়েকটা পুঁচকে জয়ের নামে নালিশ করেছে। জাভেদ আমির এলে ওদের বাবা-মা আসবে বিচার নিয়ে। এটা হতে দেয়া যায় না। ওদেরকে শাসাতে হবে। যাতে বাবা-মাকে

গিয়ে বলে, জয় ভালো না। তবে ওদের কিছু করেনি। বিচার দেওয়া ক্যান্সেল।

শেষমেষ অধৈর্য হয়ে মাস্টার গেলেন খুঁজতে। খুব বিনয়ের সাথে বললেন, "জয়! বাবা। আসো পড়বে। পরে এসে খেলবে। আসো।" জয় বিরক্তিতে চোখে-মুখ খিঁচে তাকাল। উঠল না সভা ছেড়ে। মাস্টারকে বলল, "এখন ব্যস্ত আছি। বসেন ঘরে গিয়ে। পরে আসতেছি।" মাস্টার হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলেন।-"কী হলো? যান! জরুরী কাজে আছি। আপনে কি এখন দাঁড়িয়ে থেকে বাচ্চাদের আলাপ শুনবেন?"

মাস্টার রেগেমেগে একাকার। তবু চুপচাপ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে ভেতরবাড়িতে ঢুকে হুমায়িরাকে বললেন, "আপনার ছেলেকে আর পাড়ার ছেলেদের সাথে মিশতে দেবেন না। ওর মুখের ভাষার শুদ্ধতা হারিয়ে যাচ্ছে।"

হুমায়িরা রাতে শাসন করলেন। তারপর দিন মাস্টারকে আধঘন্টা বসিয়ে রেখে পরে এসে পড়তে বসল। পড়ার দশ মিনিট না-ই যেতে উঠে পড়ে বলল, "আর পড়ব না আজ। আপনে যান। আমার কাজ আছে।"

হনহন করে বেরিয়ে চলে গেল।সেই রাগটুকু মাস্টার চাপা রাখলেন। পরেরদিন পড়ার সময় মাস্টার পড়াচ্ছেন, সে কাগজ দিয়ে

নৌকা, বাঁশি, ব্যাঙ ইত্যাদি বানাচ্ছে।
মাস্টারের ধৈর্যচ্যুত হবার পর্যায়ে। তারপর তিন চারবার উঠে গিয়ে পানি খেয়ে এলো। টেবিলের ওপর মাথা রেখে ঝিমোতে লাগল। শেষমেষ মাস্টার স্কেল দিয়ে মারলেন দুটো ঠাস ঠাস করে।

জয় কাঁদতে কাঁদতে হুমায়িরার কাছে ছুটল। মাস্টারে কাছে সে আর পড়বে না। মাস্টার মারে। সে কি কান্না তার! সে সময় হামজা এলো। হুমায়িরা কান মলে ধরলেন, "এবার বল, মাস্টার কেন মেরেছে তোকে? বাদর ছেলে!"

-"মাস্টার ভালো না।"

জয় কাঁদছে। তার বানোয়াট কান্না দেখে হাসি পাচ্ছে হামজার।

-“তুই কিছু করিসনি?”

-“না।”জয় জীবনে কাঁদে। কাঁদলে তা সত্যি, এটা না মানার উপায় পেলেন না হুমায়িরা। জলিল আমির রাজপুত্রের মতোন পালছেন নাতিকে। তবু হুমায়িরা বললেন, “সেদিন মাস্টার নালিশ করেছিল বলে বাদ দেওয়ালি?
”

কিন্তু সে তো তারপরেও দু’দিন পড়েছে। কথাটা বিশ্বাসযোগ্য হলো। এবং এটা করার জন্যই সে তারপরেও দু’দিন পড়েছে মাস্টারের কাছে। কিন্তু মাস্টারকে বাদ

দেওয়ানোর একটা ছুঁতো দরকার বিধায় দুটো দিন খুব জ্বালাতন করে মার আদায় করেছে মাস্টারের কাছে।

হামজাকে দেখে শান্ত হলেন হুমায়িরা। সবার খোঁজ-খবর নিলেন। শাহানা ভাবী তেলের পিঠা বানিয়ে দিয়েছে হামজার কাছে।

হুমায়িরার শরীরটা ভালো না। গর্ভাবস্থার চারমাস চলছে। কাজের মেয়ে দুটো গেছে গ্রামে। জয় সারাদিন বাদরামি করে বেড়ায়, তাকে সামলানো চার মজুরের কাজের সমান।

বিকেল পর্যন্ত রইল হামজা। ফুপু যতক্ষণ রান্না করল, সে দাঁড়িয়ে রইল ফুপুর পাশে। হামজার ছিপছিপে শুকনো শরীর, পরনের

লুঙ্গি আর ফতোয়াটা ময়লা। মুখটা শুকনো। নরম চালচলন। মুখে স্মিত হাসি, তবে মলিন। বয়স চৌদ্দ। এই বয়সেই লম্বা হয়ে গেছে দেখার মতো।জয় হামজাকে পেলে সব ভুলে যায়। জয়ের স্বাস্থ্যচেহারা একদম আমির পরিবারের সবার মতোই অভিজাত হয়েছে। খালি স্বভাবটা দিনদিন বখাটের মতো হচ্ছে সঙ্গদোষে।

হুমায়িরা হামজাকে রেঁধে খাওয়ালেন, ও বাড়ির খবর শুনলেন। আজ ক'দিন হুমায়ুন পাটোয়ারী বাড়িতে নেই। সংসারের দায় তার নয়। হামজা, তুলি, শাহানা ভেসে গেলেও সে দায় তার নয়। সে দেশে-বিদেশে ঘুরছে,

মহিলাদের বিয়ের প্রলভন দিয়ে তাদের ভোগের অপরাধে কত এলাকা থেকে মার খেয়েও ফিরেছে।

হামজা ক্লাস এইটে। বাসায় চাল নেই। হামজার স্কুলের বেতন দেয়া হয় না আজ চারমাস। মাস্টার বেতন না নিয়ে স্কুলে যেতে মানা করে দিয়েছে।হুমায়িরা কিছু কাঁচা তরকারী, চাউল, পোশাক আর কিছু টাকা বের করে হামজার হাতে দিলেন। বাড়িতে লোক নেই। ছুটিতে গেছে কাজের লোকেরা। জয়কে সাথে নিয়ে হামজাকে এগিয়ে দিয়ে এলেন অনেকটা দূর। হামজা পায়ে পড়তে যায়, "ফুপু, তোর পায়ে লাগি। আমি একাই

চলে যাব। আমার কিচ্ছু হবে না। তোর পেটে আমার ছোট বোন। এই রাইতে বাইরে বাইর হইলে যদি বোনুর কিছু হয়, তোর খবর আছে। বাইর হস না ফুপু আম্মা।''

হুমায়িরা শুনলেন না, "অন্ধকারে একা ছাড়ব? কেউ যদি টাকাটা কেড়ে নেয়?''

-"তুই কি বাড়ি পর্যন্ত যাবি? তখনও তো নিতে পারে।

-"তবু আমার সান্ত্বণা থাকবে। চল।''

জলিল আমির লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ফটকের কাছে পুত্রবধুর অপেক্ষায়। হামজা ফুপুর ডান হাতখানা ছাড়ল না যতক্ষণ হাঁটল। জয় মায়ের হাত ছেড়ে ছুটে এসে

হামজার হাত চেপে ধরে তিড়িং-বিড়িং ছুটছে।
দু'দিন পর জাভেদ ফিরলেন। ক্লান্ত চেহারা।
হুমায়িরা দেখেই দেখে বুঝে ফেললেন, কিছু একটা হয়েছে। কিন্তু জাভেদ বড় চাপা মানুষ।
রাজধানী থেকে ফিরেছেন, তা কেবল বুঝলেন জলিল আমির।

আমির নিবাসে লোকজন কম। ফটকের দারোয়ান মনসুর মিয়া, বাগানের মালী মন্টু, আর দুজন আছে বাংলো ঘরে বিপদ-আপদের জন্য।

জলিল আমিরের অভ্যাস সদর ঘরে আরাম কেদারায় দুলতে দুলতে ঘুমানো। লাঠিটা কেদারার সাথে হেলান দিয়ে রাখা। বুকের

ওপর বই, চোখে চশমা আছেই। নাক ডেকে ঘুমোচ্ছেন।

মনসুর মিয়ার চাকরিটা সুখের। সারারাত সে ঘুমায় ফটকের ধারের চেয়ারটায় বসে। বাড়ির কর্তা জলিল সাহেব জানেন, ঝারিও মারেন, এমনকি কয়েকবার লাঠি নিয়ে তেড়েছেনও, কিন্তু চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেন না। মনসুর মিয়া নিশ্চিত ছাড়াবেনও না।

মাঝরাত। কয়টা, মনসুর জানে না। কেউ ডাকছে মনসুর মিয়াকে। খুব করুণ সুরে। তার খুব বিপদ। বাড়ির কর্তার কড়া হুকুম, "যত রাত হোক আর যা-ই হোক, কেউ সাহায্য চাইলে ফটক যদি না খুলিস, তোর

চাকরি কইলাম শ্যাষ রে, মনসুর।”মনসুর দ্বিধায় ভুগল, তার ভয় করছে। তবু খুলল। কোনো অসহায় লোক না তারা। একজনও না। আট-দশজন। মুখে কালো কাপড় বাঁধা। চোখটা খুব সামান্য দেখা যাচ্ছে। ঘন্টাখানেক আগে আমির বাড়ির দোতলার বাতি নিভেছে। একঘন্টা পর এরা কী করতে এসেছে? মনসুর মন্টু আর বাংলো ঘরের দুজনকে ডাকল। তারা উঠে এসে দাঁড়িয়ে রইল। মনসুরকে জবাই করা হলো। তারা খুব নরম মনের। তাই মুখ ফিরিয়ে রাখল। দেখল না দৃশ্যটা, বরং ফটকটা ভেতর থেকে ভালোভাবে আঁটকে এলো।

পথ দেখিয়ে দিলো। সদর দরজার নকল চাবিও তাদের কাছেই। দুর্বৃত্তদের হাতে চাবি তুলে দিয়ে তাদের কাজ শেষ। তারা বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল।জলিল আমির সেদিন খুঁড়াতে খুঁড়াতে গিয়ে নিজের বন্দুকটা তুলে নিয়েছিলেন ঠিকই, তবে গুলি চালাতে পারেননি। তাঁর বুকের ওপর চড়ে বসে তাকে যখন জবাই করা হচ্ছিল, কেবল উনার গলা দিয়ে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ আওয়াজ আসছিল। তিনি শেষবার কালিমা শাহাদত পড়লেন। শেষ করতে পারলেন না অবশ্য, জবান বন্ধ হয়ে গেল।

জাভেদ আমির আব্বার ডাকে নিচে নেমে আসার আগে যে বন্দুক নিতে গেলেন দোতলার বড় বারান্দার ওপারে, ততক্ষণে কিন্তু দুর্বৃত্তরা শোবার ঘরে ঢুকে পড়েছে। জাভেদ আমিরের গুলিতে চারজন পড়ে গেল। তখনও নয়জন আমির নিবাসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। জীবিত নয়জনের মাঝে কিন্তু জলিল আমিরের পালিত দুজনসহ মন্টুও আছে। জাভেদ আমির মনোবল হারিয়ে ফেললেন কেমন যেন। তবু বিশ্বাসঘাতকদের বুকে গুলি চালাতে তার হাত কাঁপতে শেখেনি একজনের ঠ্যাঙয়ে শেষ গুলিটা করতে পেরেছিলেন উনি। উনাকে চারজন মিলে ধরে ছেঁচড়ে নিয়ে

শোবার ঘরে হুমায়িরা আর জয়ের সামনে উপস্থিত করা হলো।ছোট্ট জয় আমির ছোট্ট হাতে তার ছোট্ট সঙ্গীদের খুব মারে। সেদিন তার ঠাঁয় হয়েছিল মায়ে পিঠপিছে। সে বাবার পেছনে ছুটে গিয়ে সদর ঘরে দাদুর মাথা ছাড়া দেহটা দেখেছে। মাথাটা দেহর সাথে নেই দাদুর। তার পা নড়ছিল না, তবু সে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসেছে ঠিকই মায়ের কাছে। অবশ্য সিঁড়ি বইতে গিয়ে কয়েকবার পড়ে গিয়ে চামড়া-মাঃস ছিলে গেছে শরীরের কয়েক জায়গার! রক্ত ঝরছে, জ্বলছেও। কিন্তু তার বুক ভেঙে কান্না আসছে। দাদুর মাথাটা কোথায়? দাদু কি তাকে কাল সকালে

বাগানের ভেতর লাঠি নিয়ে তাড়বে না? বলবে না, “শোন জয়! যতবড় বিপদই সামনে এসে দাঁড়াক, কেবল আল্লাহকে ডাকবি।”

জয়ের প্রশ্ন, “আল্লাহ কে?”-“আমাদেরকে যিনি বানিয়েছেন।”

-“সে আমাদের রক্ষা করবে?”

-“সব অবস্থায়। ধর, বারবার ডাকছিস তবু তোর বিপদ উদ্ধার হচ্ছে না, তবু বিশ্বাস হারাবি না। তাহলে কাফের হয়ে যাবি!”

-“কাফের কী?”

-“খারাপ।”

-“বড়বাবা বলেছে, খারাপ হওয়াটা খারাপ না। ”

-“চুপ। ওই কুলাঙ্গারের কথা বলবি না।”
হুমায়িরা নামাজ পড়লে সে গিয়ে জ্বালাতন করে। ঘাঁড়ে উঠে বসে, সামনে গিয়ে জায়নামাজের ওপর বাবু মেরে বসে মায়ের দিকে তাকিয়ে মুখ ভেটকিয়ে হাসে। তখন নামাজ শেষে হুমায়িরা বলতেন, “এমন করতে নেই, আব্বা। আল্লাহ নারাজ হয়।
”-“আল্লাহ নারাজ হলে কী?”
-“ছিঃ। এসব বলতে নেই। আল্লাহ আমাদের রক্ষাকর্তা আব্বা। তাকে সন্তুষ্ট রাখতে হয়।”
জয় আজ মায়ের পেছনে লুকিয়ে মনে মনে ডাকছে আল্লাহকে, “আল্লাহ! রক্ষা করেন আল্লাহ।”জাভেদ আমিরকে চেয়ারে বসানো

হলো। উনাকে ঘিরে ধরে রইল চারজন। জলিল আমিরের রাখা লোকেদের মাঝে একজনকে মেরে ফেলেছেন জাভেদ, আরেকজন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, চোখদুটো তার সুযোগসন্ধানী। জাভেদ আমির ঘৃণাভরে একবার দেখলেন। উনার শক্তিশালী দেহটাকে ধরে রাখা দরকার। ছটফট করছেন বড়।

দড়ি দরকার। একটা ভালো ব্যবস্থার কথা মাথায় এলো ওদের। হুমায়িরার বুকের আঁচলটা ভালো কাজে দেবে। শরীর থেকে শাড়ির আচলটা টান মারল। শাড়ি দেহে পেঁচানো থাকে। সেই টাল সামলাতে না পেরে

গর্ভবতী হুমায়িরা পড়ে গেলেন মেঝেতে, আর্তনাদ করে উঠলেন। সে অবস্থায় দুটো পুরুষালি লাথি মারতে কিন্তু ভুলল না ওরা। কোমড় বরাবর কষে মারল লাথিদুটো।জাভেদ আমির গর্জে উঠলেন, ওদের গায়ে হাত দিলে তোর বংশ নির্বংশ করে ছাড়ব, "শুয়োরের বাচ্চা। ওদেরকে ছুঁবি না।"

উনাকে তখন দুজন চেপে ধরে রেখেছে। শাড়িটা ছিঁড়ে নিয়ে ওরা তা দিয়ে চেয়ারের সাথে বাঁধল জাভেদ আমিরকে।

কেউ উপহাস করল, "ছোঁবো না! ঠিক আছে বস! ছুঁইলাম না। গুলি কইরা খুলিডা উড়াই দেই?"

জয় কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়ল মায়ের পাশে। তার কান্না খুবই বিরক্তিকর ঠেকল। তাই তাকে একটা বড়সড় লাত্থি মারা হলো। ঠোঁটটা থেতলে গেল। জয় বুঝল কাঁদা যাবে না। তার কান্নার শব্দ ওদেরকে বিরক্ত করছে।

হুমায়িরা অসহ্য যন্ত্রণায় মেঝেতে পড়ে রইলেন। জয় হামাগুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে মায়ের দিকে এগোয় আবার ওদের দিকে তাকায়, আবার যদি লাত্থি মারে! গুটিসুটি মেরে মায়ের কাছে মেঝেতে আধশোয়া হয়ে ঝুঁকে মায়ের হাতটা চেপে ধরে রাখে। বাবার কাছে যাবার উপায় নেই। তার অবশ্য ইচ্ছে

করছিল, আলমারি থেকে একটা শাড়ি এনে মাকে দিতে। মা বোধহয় লজ্জা পাচ্ছে পেটিকোট আর ব্লাউজ পরে। সবসময় যে শাড়ি পরে থাকে। বাইরের কেউ এলে আরও টেনেটুনে ঘোমটা দেয়। সে দেখেছে।কিন্তু তার কিছু করার নেই। সে মনে মনে রক্ষাকর্তাকে ডাকছে, 'আল্লাহ! রক্ষা করেন। এই শয়তানদেরকে মেরে ফেলেন। এরা খারাপ লোক।'

তার মাথায় এই চিন্তাও এলো, খারাপ হওয়া তো খারাপ না। কিন্তু এই রকম খারাপকে কী বলে? এই খারাপদেরকে জয়ের ভালো লাগছে

না। এখন আল্লাহ নামক রক্ষাকর্তার উচিত, এই খারাপদেরকে শাস্তি দেয়া।

ফাঁড়া খড়ি দিয়ে জাভেদকে মারতে লাগল ওরা। আর্তনাদটা আর নেয়া যাচ্ছে না। শাড়ির এক টুকরো জাভেদের মুখেও গুঁজে দেয়া হলো। একেকটা আঘাতে চামড়া ছিঁড়ে মাংস থেতলে উঠছিল জাভেদের শরীরের। কয়েকটা আঘাতে ঝিমিয়ে গেলেন জাভেদ। সাদা ফতোয়াটা রক্তের ছোপ দেখা যাচ্ছে। এবার মুখের কাপড় সরিয়ে নেয়া হলো।এবার উনার উচিত ওদের কাছে প্রাণভিক্ষা অথবা আক্রমণের কারণ বা তারা কে এসব জানতে চাওয়া। কিন্তো জাভেদ করলেন অন্যকিছু।

তিনি স্ত্রীর কাছে মিনতি করে উঠলেন, “চলে যাও হুমু। তোমার পায়ে পড়ি। জয়, চলে যা আব্বা। আমি আসব তোদের সাথে দেখা করতে। হুমায়িরা প্লিজ। দয়া করো। আমার সন্তানদেরকে নিয়ে চলে যাও তুমি। আমি আসব। খুব তাড়াতাড়ি।

এই তোরা ওদের যেতে দে। ওরা তো কিচ্ছু করেনি, তাই না? ওদেরকে বের হয়ে যেতে দে।”

হুমায়িরা বুকের ওপর দুটো হাত আড়াআড়িভাবে ধরে ইজ্জত ঢাকার বৃথা চেষ্টাটা করছেন। দেখতে উনাকে তখন বড় বোকা বোকা লাগছে। বোকা নারী কেবল

দু'পাশে মাথা নেড়ে বলেন, "এরা কারা গো জয়ের বাপ!" শুনতে বড় অদ্ভুত লাগে তা।
রক্তাক্ত গালে হাসলেন জাভেদ, "পুরোনো দুশমনী। চলে যাও হুমু। পরে বলব।"
কথাটা জয়ের মনে রইল। বড়বাবা বলে, তাদের পুরোনো দুশমন হলো সৈয়দ পরিবার। হুমায়িরা ভাবেন, পরে বলবে? এই লোক মিছে সান্ত্বণা দিতে বড় তৎপর!
তাদের পারিবারিক নাটক বেশিক্ষণ সহ্য করল না ওরা। একেকটা আঘাতের সাথে সাথে জাভেদ আমিরের দেহের মাংস খড়ির সাথে ছিঁড়ে ছিঁড়ে আসছিল। পরনের ফতোয়া ছিঁড়ে ফালাফালা হয়ে উঠেছে।

জয় মুখ গুঁজে আছে মায়ের বুকের ভেতরে। সে মায়ের বুক খোঁড়ার চেষ্টা করছে বোধহয়। ঢুকে যেতে পারলে ভালো হবে।ওদের লুটপাট শেষ হয়েছে। ভাগাভাগি পরে হবে। আলমারী খালি। আমির নিবাসের ঐতিহ্যবাহী কাসার তৈজসপত্রও ছাড়েনি। যুদ্ধের ডাকাতরা যত পেয়েছিল, এরা কিন্তু তত পেল না। এক প্রকার লোকসান হলো আগেরজনেদের তুলনায়। তবু কিছুই ছাড়া যাবে না। যা পাবে হাতে, তাই যাবে সাথে।

হুমায়িরার কানে মোটা স্বর্ণের ঝুমকা। তা খুলে নেবার মতো অত সময় বা ধৈর্য আছে তাদের? হেঁচকা টানে হুমায়িরার কানের ফুঁটো

ছিঁড়ে দু'ভাগ গেল, তা যাক, ঝুমকো জোড়াও বেরিয়ে এলো। গলার হাড়, বালা সব নিলো। মজার ব্যাপার হলো, লুটপাটে দুর্বৃত্তদের আগ্রহ নেই বিশেষ। বারো আনা আগ্রহই জলিল আমিরের রাখা লোকদুটোর মাঝে বেঁচে থাকা সেই একজনের। সে ওদের ডেকে বলল, কুড়াল দিয়ে আলমারির তালাটা ভেঙে দিতে। সে নিজে হাতে হুমায়িরার অর্ধনগ্ন দেহ থেকে অলংকার খুলল। এই বাড়িতে থাকার সময় এসব চোখে চোখে দেখে যে লোভ সংবরণ করা কত কঠিন ছিল, তা তারা দুজন ছাড়া কেউ জানে না। ভালো হয়েছে একজন মরেছে। ভাগ কমেছে।

তারা অসন্তুষ্ট। জাভেদকে আরও কষ্ট দিয়ে মারার ছিল। কিন্তু তা হচ্ছে না।জাভেদকে মেরেই তাদের কাজ শেষ না। তাদেরকে জয়নালের আবাসে যেতে হবে। জয়নাল দিনাজপুরে এখন।

জয় দেখল, বাবা আর কথা বলছেন না। মাথা ঝুঁলে পড়েছে। উনার কোলের ওপর কয়েক সেকেন্ড পর পর আঠালো রক্ত ও থুতুর মিশ্রণ টুপটুপ করে পড়ছে। ট্যাপের পানি পড়ার কথা মনে পড়ল জয়ের। এভাবেই ট্যাপ বন্ধ করার পরেও টুপটুপ করে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ে।

সে মনে মনে তখনও আল্লাহকে ডাকছে। রক্ষা পেতেই হবে আজ। সে আল্লাহকে ডেকে এ-ও বলেছে, বড়বাবাকে এখন পাঠিয়ে দিতে। হুমায়িরা বলতেন, আল্লাহ চাইলে সব পারেন। বড়বাবাকে পাঠিয়ে দিতেও পারেন নিশ্চয়ই!

এলো বড়বাবা। ওরা যখন জাভেদকে শেষবার শ্বাস নিতে বাধ্য করছে, তেমনই চরম মুহূর্তে পেছনে প্রাচীর টপকে বাগানের ভেতর দিয়ে কার্ণিশ বেয়ে উঠে এলেন জয়নাল আমির। তিনি একা। হাতে শুধু একটা রামদা, পরনে কাছা মারা লুঙ্গি। জাভেদ আমির অর্ধচেতনায় ছোট ভাইকে দেখলেন কিনা বোঝা গেল না।

তাঁর সারা শরীর ফাঁড়া মেহগনির খড়ির আঘাতে কাচা-কাচা।

দুর্বৃত্তরা একচোট একে অপরের দিকে তাকিয়ে মহানন্দের হাসি হাসল। জয়নাল আমির এখানেই চলে এসেছে অবশেষে। জয়নাল আমির কিন্তু ভাইকে বাঁচাতে গেলেন না। একদমই না। তিনি ভাবীকে ধরে উঠালেন। হুমায়িরা অসহ্য পেটের ব্যথায় কুঁকড়ে গেছেন। ছুটে যেতে চাইলেন স্বামীর কাছে। জয়নাল আমিরের কঠিন মুষ্ঠি থেকে মুক্ত হতে পারলেন না কেবল। কোমড়ের গামছাটা খুলে বড়ভাবীর শরীরে জড়িয়ে অপর

হাতে জয়ের হাতটা চেপে ধরলেন। রামদা তখন দুই হাঁটু দিয়ে চেপে ধরা।

ওরা একটু ধীর-স্থির হয়েছে। জয়নাল আমির নামটাতে এক আতঙ্ক আছে, তা দিনাজপুর জানে।

জয়নাল ভাবী ও ভাতিজাকে ধরে নিয়ে কক্ষের বারান্দায় বসালেন হেলান দিয়ে। জয় বড়বাবার হাত ছাড়ছে না। আস্তে কোরে জিজ্ঞেস করে, "বাবার কী হয়েছে, বড়বাবা?" বড়বাবা জবাব দিলেন না। বরং ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলেন জয়কে পেছনের দিকে মায়ের কাছে। জয়ের অভিমান হলো।জয়নাল আমির ডাকলেন ওদের, "আয়। কার কার মায়ের

বুকের দুধের জোর পরীক্ষা করবি, আগায়ে আয়। আজ দেখব তোদের মায়ের বুকে দুধের জোর বেশি নাকি আমার হাতের ধাতুর।"

একজনের অবশ্য হাত কাটা পড়েছিল। হাতটা তিনি কাটলেন বামহাত দিয়ে। তবু নিখুঁত আঘাত। জয় তখন বড়বাবার ডান কোলে। সেদিন প্রথমবার জয় আমির রক্তের সংস্পর্শ পেলো। ছলাৎ কোরে এসে এক খাবলা গরম তরল ছোট্ট জয়ের শরীরে লেগে গেল। গা'টা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠেছিল। ঘিনঘিনও করেছিল। বড়বাবার আধখোলা শার্টের প্রান্ত মুঠো করে ধরেছিল সে। বড়বাবার মুখ পাথরের মতো শক্ত তখন। বড়বাবার মুখেও রক্তের ছিটা।

হাত কাটার থমকাথমকির মাঝে কক্ষের দরজা দিয়ে ভাবী ও ভাতিজাকে বের করে দোতলার লম্বা বারান্দায় পৌঁছাতে পেরেছিলেন জয়নাল। কিন্তু সেখানেও দুজন, পেছনের গুলোও এগিয়ে এসেছে। একহাতে ভাবীকে ধরে জয়কে বুকের সাথে মিশিয়ে রামদাটা চেপে ধরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন।উনার হাতের রামদা চরকীর মতো ঘুরছে। কমপক্ষে দু'ফুটের মাঝে কেউ এসে দাঁড়ালে মাথা নেমে যাবে ঘাঁড় থেকে।

কিন্তু তার ভাবী জাভেদকে ছেড়ে যাবেন না। বারবার পিছু ফিরে চায়। জয় অস্ফূট স্বরে 'বাবা বাবা' বলে ডাকছে। নারীর আবেগে

ঘেন্না এলো জয়নালের। তিনি ভাইকে বাঁচাতে যাননি কেন, তা বুঝেও তো অবলা নারী চুপচাপ সাথে হাঁটতে পারে। ভাই তার বাঁচবে না। বড়জোর মিনিট কয়েক জান আসা-যাওয়া করবে আর! কিন্তু বাঁচাতে হবে জয় আমিরকে! আমির বংশের শেষ প্রদীপ। আর জয়ের লালন-পালনের জন্য জয়ের মাকে। জয়নাল আমির নরকের দেবতার মতোন নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে পিতার মাথাকাটা লাশও পেরিয়ে এগিয়ে গেলেন নির্বিকার চিত্তে। তখন কিন্তু জয় ডুকরে কেঁদে উঠেছিল। বাবার জন্য নাকি দাদুর জন্য, জানা নেই।

বড়বাবার বাম বাহুতে রক্তের ছড়াছড়ি। মাংস অবধি ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, এমন গভীর ক্ষত। অথচ বড়বাবার চোখদুটো জ্বলছে, দাউদাউ করে জ্বলছে। র-ক্তের মতো লাল, ছলছলে। বড়বাবা সেদিন জয়কে এক কঠিন ধমক দিয়েছিলেন, "কাদলে তুলে আঁছাড় মারব একটা। আমির বংশের রক্ত তুই। কাঁদবি তো জীবিত গেঁড়ে রাখব। কাঁদছিস কেন? হাসবি। হাস। হাস এখন।"জয় আশ্চর্যজনকভাবে দেখল, লোকগুলো দোতলায় থেমে গেছে। আর ওদেরকে ধরতে এগিয়ে আসছে না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। বাবা তো

পড়েই রইল শোবার ঘরে চেয়ারে। বাবা যাবে না ওদের সাথে?

জয়নালকে বাগানের মালি মন্টু খবর দিয়েছে। নিজের সাথে নিজের দাবা খেলার অভ্যাস আছে জয়নাল আমিরের। সেই দাবার গুটি ফেলে চলে এসেছেন মন্টুর ডাকে। মন্টু বলেনি কী হয়েছে, শুধু বলেছে, "ছোট ভাইজান একবার এক্ষুনি চলেন বাড়িত্।" শার্টের বোতাম তিনটা লাগিয়ে বেরিয়ে এসেছেন জয়নাল। দুটো এখনও খোলা।

আমির বাড়ির পেছনে ঝোপঝাড়। বিস্তর ভূমি পড়ে আছে। জঙলি এলাকা প্রায়। সেদিক দিয়ে হুমায়িরা আর জয়কে বের করে দিতে

পেছনের ফটকের কাছে গেলেন জয়নাল। ওরা কিন্তু তখন সবে সদর বাড়ির সামনের প্রাঙ্গনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তাদেরকে তাড়া করার কোনো তাগিদ নেই ওদের মাঝে।মন্টু কোত্থেকে যেন এসে দ্রুত চাবি দিলো, "ছোট ভাইজান, এই লন ছুড়ান (চাবি)। পিছনের দরজার ছুড়ান।"

একবার পেছনে তাকালেন জয়নাল, তারপর মন্টুর দিকে। জয়কে কোলে ধরা হাত দিয়ে ভাবীকে দাড় করিয়ে রাখার চেষ্টা করে শ্লথ হাতে জং ধরা তালাটা খুলতে খুলতে আবারও একবার পেছন মুখোশধারী ও মন্টুর দিকে একবার তাকালেন।

তালা খোলা হলো। ফটক খুলে গেল বিকট শব্দ কোরে। জয়নাল আমির অল্প হাসলেন এবার। ছয়জন মুখোশধারী একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে তাদের অপেক্ষা করছে। দূরত্ব চার-পাঁচ হাত। সেই দূরত্বের মাঝ দিয়ে সাপের মতো শরীর বেঁকিয়ে বেরিয়ে এসে ভাবীর হাত ছেড়ে জয়কে নামিয়ে তাড়া করলেন, "যান। চলে যান। আর পেছনে তাকাবেন না। সময় বেশি পাবেন না, ভাবী। খুব অল্প সময় পাবেন। যান যান যান।"জয় বড়বাবার হাত চেপে ধরে। খুতখুত কোরে কেঁদে কিছু বলতে যাবার আগে বড়বাবা এক বিশ্রী ধমক

মারলেন, “এক কোপে গলা কেটে ফেলব। চুপচাপ তোর মায়ের সাথে চলে যা। দৌঁড়া!” জয় অবিশ্বাসে বড়বাবার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। বড়বাবা কেন যাবে না তাদের সাথে? অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না বড়বাবার কঠিন মুখখানা। বড়বাবা হুংকার ছাড়লেন, “যা, শুয়োরের বাচ্চা। যাহ! চলে যা, জয়..”

সেই অন্ধকারের মাঝেই ওদের দিকে তাড়া করল দুজন। জাভেদের স্ত্রী-সন্তানকে ছাড়া যাবে না। কিন্তু একটা বাগড়া বাঁধল। জয়নাল আমির প্রাচীরের মতো মাঝে দাঁড়িয়ে পড়লেন। পেছন ফিরে অন্ধকারেই কঠোর

স্বরে হুমকি দিলেন, “জোরে হাঁটেন ভাবী। জয়কে চেপে ধরে জোরে হেঁটে জঙ্গল পেরিয়ে যান।”

ওদেরকে ঠেকাতে গিয়ে হাঁটুতে কোপ লাগল উনার। হাতের দুটো আঙুল ঝুলে রইল চামড়ার সঙ্গে। কে জানে ততক্ষণে মা-ছেলে কতদূর পৌঁছাল!হুমায়িরা ওই অবস্থায় বেশিদূর যেতে পারবেন না অন্ধকারে জঙলি পথ পেরিয়ে। জয়নাল আমির ওদেরকে ঠেকাতে গিয়ে গোটা শরীরে কতকগুলো গভীর জখম পেলেন। রক্তক্ষরণ ততক্ষণে শরীরটাকে দূর্বল করে ফেলেছে উনার। কিন্তু

তা বলে তিনি জয়ের জীবন ঝুঁকিতে ফেলতে পারেন না! জয় আমিরকে বাঁচতে হবে। অবশেষে লাভ হলো না বটে। তিনি বন্দি হবার আগে কেবল একটা মহাকর্মই করতে পেরেছিলেন। ওদের পথ ছেড়ে দিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে এগিয়ে এলেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। ওরা তখন ক্ষুধার্ত কুকুরের মতোন ছড়িয়ে পড়েছে জঙলি এলাকার ভেতরে মা-ছেলের খোঁজে।জয়নাল আমিরের ঠ্যাংয়ে মাংস ছিঁড়ে গিয়ে গর্ত হয়ে গেছে। কলকল করে রক্ত ঝরছে সেখান থেকে। কিন্তু উনাকে হত্যার চেষ্টা করা হচ্ছে না কোনোভাবেই। করা হবেও না, তা তিনি জানেন।

কোনোরকম এগিয়ে গেলেন। মন্টু তখনও ফটকের সাথে দাঁড়িয়ে। জয়নাল আমির কেবল একবার হাস্যজ্জ্বল মুখে ডাকলেন, “মন্টু মিয়াহ্!”

মন্টু বড় বিনয়ের সাথে জবাব দেয়, “জি, ছোটভাইজান।”

মন্টুর কথা ফুরোয় না। জয়নালের হাতের রামদা মন্টুর গর্দান স্পর্শ করে, এবং মুহুর্তের মাঝে তা নেমে ছিটকে পড়ে দেহ থেকে আলাদা হয়ে কোথাও।

বেইমানরা দুনিয়ায় থাকলে দুনিয়ার এত চমকপ্রদ সৌন্দর্যে দাগ দেখা দেয়। জয়নাল

আমির সৌন্দর্যের ওপর দাগ পছন্দ করেন না তেমন একটা।

দুর্বৃত্তদের চূড়ান্ত এক লাভ হয়েছিল। যে লাভটা মূলত তারা নিজেদের অজান্তেই চাইছিল। তা জয়নাল আমির আরেকটু সহজ করে দিলেন।

জয়নাল আমির গ্রেফতার হয়েছিলেন। নিজের ভাই, বাপ ও মন্টু মিয়াসহ আরও কয়েকজনকে আহত ও নিহত করার অপরাধে। নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ড।যখন ভোরের আলো ফুটছে। সে সময় জাভেদ আমিরকে হিঁচড়ে নামিয়ে আনা হলো বাগানের প্রাঙ্গনে। শুকনো পাতারা পড়ে আছে। হাঁটলে মরমর

শব্দ হয়। জয়নাল আমিরকে ধরে রেখে তার সম্মুখে জাভেদ আমিরের কণ্ঠনালি বরাবর চারবার ছুরিকাঘাত করা হলো। ছোট্ট ধারালো, বাঁকা হান্ট নাইফ। প্রথমভাগে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসে তারপর ধীরে ধীরে চুইয়ে পড়তে থাকল।

জয়নাল আমির আস্তে কোরে চোখদুটো বুজে ফেললেন। শরীরটা ঝিমিয়ে আসছে। ওরা মুখের মুখোশ খুলে ফেলছে আস্তে আস্তে। ভদ্রলোক হয়ে উঠছে। পুলিশ আসবে এবার। ওরা সাক্ষী দেবে কীভাবে জয়নাল আমির সঙ্গীদের সাথে নিয়ে নিজের বাড়িতে হামলা করেছে এবং বাপ-ভাই সহ আরও

কয়েকজনকে হত্যা করেছে। আর যে লোকগুলো গুলি খেয়ে মরেছে, তারা মূলত জয়নালেরই লোক। আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে জাভেদ আমির গুলি চালিয়েছেন তাদের ওপর ।আমির নিবাস দিনাজপুরের ঘোড়াহাট উপজেলায়। প্রসিদ্ধ এক অঞ্চল। মোঘল, নবাব, পর্যায়ক্রমে রাজা দ্বারা শাসিত করতোয়ার তীর ঘেঁষে অবস্থিত অভিজাত, পুরোনো অঞ্চল দিনাজপুরের ঘোড়াহাট। সেই অঞ্চলের অভিজাত পরিবারের বড়বধূ হুমায়িরা সে রাতে নেহাত এক অসুস্থ গর্ভবতী কাঙালিনী।

ঘোড়াহাটে আজ সেসব রাজা-সামন্ত নেই তেমন, তবু আছে। ঘোড়াহাট দুর্গ থেকে খুব বেশি দূর নয় আমির নিবাস। দিনাজপুরের প্রশাসনিক অঞ্চল। করতোয়ার কলতান যেন কলকল রবে কানে ধরা দিচ্ছিল হুমায়িরার। তিনি ভাবলেন, কোনোভাবে বাপের বাড়ি যাওয়া যায় কি? বাঁশেরহাট ঘোড়াহাট থেকে পায়ে হাঁটা পথে কমপক্ষে এক-আধদিন। কখনও বাঁশেরহাটে একা যাননি হুমায়িরা। জলিল আমির সঙ্গে কোরে নিয়ে গিয়ে আবার সঙ্গে নিয়ে আসতেন। বাড়ির বউদের একা চলতে নেই, বাপের বাড়িতেও রাত বাসী করতে নেই।

আর চলার ক্ষমতা নেই হুমায়িরার। জয়কে বুকের সাথে চেপে ধরে ঝোপের ওপর লুটিয়ে পড়লেন। উনার মনে হচ্ছে, রক্তক্ষরণ হচ্ছে। তলপেটের চিনচিনে ব্যথা ভালো আশঙ্কা জাগাচ্ছে না। জয় বারবার জিজ্ঞেস করে, "তোমার কী হইছে?"হুমায়িরা জয়ের কপালে একটা চুমু খেয়ে জড়িয়ে ধরে বললেন, "কিছু হয় নাই আব্বা। আল্লাহরে ডাক।"

জয় আল্লাহকে ডাকছে সেই তো তখন থেকেই। একবার ডেকে বড়বাবা এসেছিল। সুতরাং আল্লাহকে ডাকাটায় একটু ভরসার ব্যাপার আছে বটে। সে ডাকল। ডেকে বলল, মায়ের ব্যথা কমিয়ে দিতে। তাদের পেছনে

যারা তাদের ধরতে আসছে, তাদের শাস্তি দিতে।

জঙ্গলি এলাকাটা খুব বড় নয়। ওদের হাতে মশাল বা টর্চ ধরণের কিছু ছিল না। হতে পারে নেই।

রাতের কত বাজল জানা নেই। কিন্তু পাতার খচমচ, ঝোড়ঝোপ পেরিয়ে এগিয়ে আসার আওয়াজ এলো। তিক্ত যন্ত্রণাকে চেপে হুমায়িরা টানটান হয়ে শুয়ে পড়লেন জয়কে নিয়ে। নিঃশ্বাসের আওয়াজ খুব জোরে লাগছিল কানে। জয়ের মুখটাও চেপে ধরে ছিলেন।

সে রাতে ধরা পড়লেন না। সকালের আলো ফুটলে বেরিয়ে পড়েছিলেন জঙলি এলাকা ছেড়ে। হুমায়িরা জানেন না, তিনি কোন পথে এগোচ্ছেন। মানুষ বসবাসের এলাকা দিয়ে যাবার উপায় নেই দিনে। কেউ দেখবে গর্ভবতী হুমায়িরার খুঁড়িয়ে পথচলা, রক্তে জর্জরিত পেটিকোটের ওপর একটা লাল গামছা জড়ানো শরীর, ছিঁড়ে যাওয়া ব্লাউজ। দুটো রাত কাটলো নির্জন ঝোপে ঝাড়ে। রাত শেষ হবার আগেই হেঁটে যদি কোনো ঝোপ পাচ্ছিলেন, সেখানেই থেমে যাচ্ছিলেন। দিনের আলো ফুটতে ফুটতে যদি লোকালয় অবধি পৌঁছান, এই ভয়।

এই দু'দিনে ছোট্ট জয়কে দুবার গন্ধ, নোংরা পুকুরের পানি খাওয়ানো হয়েছে। জয় খিদেয় কাঁদতে চায়, কিন্তু মায়ের দিকে চেয়ে আর কাঁদে না, তার জেদ ওঠে, হাঁটতে চায় না। রাতে ঝোপ পেরিয়ে পথচলা, অনাহারী অবস্থা এবং নির্ঘুম হেঁটে চলার পরিশ্রম হুমায়িরার গর্ভাবস্থার অভিশাপকে বাড়িয়ে রক্তক্ষরণের মাত্রা বাড়াল। হামাগুড়ি দিয়ে পথচলারও উপায় আর নেই।

বড় আশ্চর্যের বিষয়, ওরকম অবস্থায় এত প্রতিকূলতার মাঝে অনাহারী গর্ভবতী হুমায়িরা কীসের জোরে যে পরের দুটো রাতও পথ চলেছেন একটু একটু কোরে! তিনি জানেন না

কোনদিকে এগোচ্ছেন।তিনদিনের রাত। হুমায়িরার মনে হলো, প্রাণরস ফুরিয়ে এসেছে অবশেষে, জীবনের দায় মেটানোর সময় এসেছে। গর্ভের সন্তানের কাছে মা হিসেবে ধিক্কার মেনে নিয়ে তখন তিনি পথ চলা বন্ধ করে দিলেন। জয় হাঁটতে চায় না, কিন্তু হুমায়িরার সাধ্যের বাইরে জয়কে কোলে তুলে নেয়া। নিষ্ঠুরের মতো হুমায়িরা জয়ের মুখের দিকে তাকান না। তাকালে উনার মা হয়ে বেঁচে থাকার স্বাদ ফুরোবে, এই ভয়। ঘোড়াহাট পেরিয়ে হুমায়িরা তখন হাকিমপুরে, হিলি সীমান্তের অঞ্চলের এক নির্জন ঝোপে পড়ে আছেন। তিনি জানেন না, তিনি

কোথায়! পাখির ডাকাডাকি জানান দিলো রাত তিনটা পেরিয়ে গেছে। সকাল হতে খুব দেরি নেই।

জয় মায়ের কাছে খাবার চাইল। জেদে কয়েকটা খামছিও মারল। মারা উচিতও। এক সময় হুমায়িরা খাবার নিয়ে সারা বাড়ি ছুটে বেড়াতেন জয়ের পেছনে। আজ সে খাবার চাইছে, কিন্তু হুমায়িরা দিচ্ছে না। জেদ হবে না কেন?

হুমায়িরা জয়কে বুকের ওপর নিয়ে গালে-মুখে হাত বুলিয়ে বললেন, "আল্লাহকে ডাক জয়। এই দুনিয়ায় এখন তোর আমার কেউ নেই। আমাদেরকে রক্ষা করার কেউ নেই তিনি

ছাড়া।''জয় বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝেই তবু মনে মনে ডাকছিল আল্লাহকে। কিন্তু তিনদিনের না খাওয়া, প্রাণের ঝুঁকি, মায়ের অবস্থা এবং সব মিলিয়ে ভেতরের জেদে শক্ত হয়ে বসে রইল। চোখের পাতা লেগে আসছে। হাঁটুতে ব্যথা। সেই অনাহারী অবস্থায় পেট পিঠের সাথে লেগে গেছে। ক্লান্তি ও ক্ষুধায় মাটির ওপর মায়ের বাহুতে আস্তে কোরে মাথাটা রেখে শুয়ে পড়ার পর কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল!

বিকট হাসির আওয়াজ ও হুমায়িরার বাহু নড়েচড়ে ওঠায় ঘুম ভাঙল। চারজন লোক তাদের খুঁজে পেয়ে খুব খুশি। সকাল হয়ে

গেছে! ওরা খুঁজে পেয়ে গেছে ওদেরকে, এবার?

হুমায়িরার বাহু চেপে ধরে ঝারা মেরে টেনে তোলা হলো। করুণ আর্তনাদ করে উঠলেন হুমায়িরা। জয়ের অভুক্ত ছোট্ট শরীরটা টেনে তুলে দাড় করানো দায়। কিন্তু সে গিয়ে এলোপাথারি কয়েকটা আঘাত করার চেষ্টা করল লোকটিকে। মুখভর্তি দাড়ি তার। আরেকজন এসে জয়কে ধরে ওর দুহাত পিছমোড়া করে ধরে চাপ দিলো। মনে হলো, কচি হাতের বাহুগুলো মটমট করে উঠল। সীমান্তের পার্শ্ববর্তী কোয়ার্টার এলাকা। সেসব কোয়ার্টার আজ পরিত্যক্ত ও নির্জন লাশকাটা

ঘরের মতো দেখতে। বাইরের লোহার জানালা-দরজা মাদকাসক্ত ও চোরেরা খুলে বিক্রি করে খেয়েছে। দেয়ালে শেওলা, প্লাস্টার খসে খসে পড়ছে।

চারপাশে ঘন জঙ্গল গজিয়ে গেছে। বন্দর সংলগ্ন এসব কোয়ার্টার মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদার বাহিনী হিলি সীমান্ত দখলের সময় পুড়িয়ে দিয়েছিল।

পোড়া বিল্ডিংগুলো এখন মদের আসর ও জুয়ার আড্ডাখানা হিসেবে খুব ভালো। এসব জায়গায় লোক দিনেও পা রাখে না। তাদের জানের ভয় আছে।ভেতরের বিল্ডিংয়ের এক দোতলায় জয়কে বাইরে রেখে হুমায়িরাকে

নগ্ন করার কাজে লেগে পড়ল ওরা। ভাঙা জানালার গ্রিল ধরে জয় চেঁচাচ্ছে। তার গলার আওয়াজ আঁটকে আসছে। সে দেখল, বড়বাবার জড়িয়ে দেয়া গামছাটা মায়ের শরীর থেকে খুলে মুখে ঢুকিয়ে দেয়া হলো। মা আর চিৎকার করতে পারছে না। চোখের পানি ভেসে ভেসে এসে গালে গোঁজা গামছায় ঠেকলে শুষে নিচ্ছে গামছা। মায়ের শরীরে একটুও জোর নেই।

জয় বন্ধ দরজায় এলোপাথারি ধাক্কাধাক্কি করে বড় ক্লান্ত হয়ে গেল। তিনদিনের না খাওয়া ছোট্ট দেহটা আর চলতে চায় না। সে আবারও জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মায়ের

দিকে তাকাতে খুব ভয় হচ্ছে তার। খুব ভয়াবহ দৃশ্য। বুকের ভেতরটা এত নিষ্ঠুরভাবে ঢিপঢিপ করছে। শ্বাসরোধ হয়ে আসছে। ওরা মাকে পুরো নগ্ন করে ফেলেছে। মায়ের পেটটা উঁচু হয়েছে একটু। পেটের ভেতরে তার বোন আছে। বোন কি কষ্ট পাবে না! ওরা খুব জোরাজুরি করছে মায়ের সাথে। একটা ব্যাপার খেয়াল করল জয়, মায়ের দুই উরুর মাঝ দিয়ে রক্ত শুকিয়ে আছে। আগে ঝরা রক্ত। পুরোনো সেই শুকনো রক্তের ওপর দিয়ে নতুন রক্তের প্রবাহ আসছে। ওরা মায়ের শরীরের ওপর চেপে শুয়ে পড়ছে। মা হাত-পা ছটফট করলে ওরা

খামছে চেপে ধরে রাখছে দুজন। ওরা যখন উলঙ্গ হলো লুঙ্গি খুলে, দৃশ্যটা খুবই খারাপ লাগল জয়ের কাছে। সে চোখের ওপর ছোট্ট দুই হাতের তালু চেপে ধরল।জয়ের তখনই হুট করে আল্লাহর কথা মনে পড়ল। রাতেও হুমায়িরা পিঠে হাত চাপড়াতে চাপড়াতে ক্ষীণ গলায় বলেছিলেন, "তোর আর আমার সাথে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই। আল্লাহকে ডাকবি যেকোনো বিপদে। ক্ষুধা পেলে, কষ্ট পেলে, আঘাত পেলে...সবসময়।"

সে সেদিন চিৎকার করে করে আল্লাহকে ডেকেছিল, "আল্লাহ আপনে আসেন। কোথায় আপনে, আল্লাহ? আমার আম্মুকে ওরা মেরে

ফেলবে আল্লাহ! ও আল্লাহ.....আপনে শুনছেন? রক্ষা করেন আমার আম্মুকে।''

মনে হয় আস্তে ডাকা হচ্ছে। জয় আরও জোরে জোরে ডাকল আল্লাহকে। আল্লাহ যদি রক্ষা করতে দেরি করে ফেলে, তাহলে মায়ের খুব কষ্ট হয়ে যাবে। সে বারান্দার গ্রিলে মাথা ঠেকিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়েও ডাকল। আকাশ থেকে কখন আসবে আল্লাহ! ঘরের ভেতরে খুব খারাপ কিছু হচ্ছে। কিন্তু কান্নার তোড়ে জয়ের গলা আঁটকে আসছে। ডাকতে ডাকতে হেঁচকি উঠে গেল, কাশতে কাশতে গলায় জ্বলুনি শুরু হলো। বুকটা লাফাচ্ছে।

তার এত চিৎকার বোধহয় খুব বিরক্তিকর ছিল। দরজার খুলে একজন লোক লুঙ্গির গিট্টু বাঁধতে বাঁধতে এগিয়ে এলো। জয় দৌড়ে যাবার চেষ্টা করেছিল ঘরের ভেতরে।কিন্তু লোকটা জয়কে ধরে ফেলল। মেঝেতে শুইয়ে ফেলে বুকের ওপর চড়ে বসল লোকটা। জয়ের দম বন্ধ হয়ে এলো। তাতে জয়ের আবার একবার আল্লাহর কথা মনে পড়েছিল অবশ্য। লোকটা তাকে জবাই করবে। আরেকটু সময় সে পেতে পারতো। কিন্তু এত চিৎকারের ফলে সময় এগিয়ে এলো।

সে লোকটার হাতে চাপাতির মতো দেখতে মৃত্যুকে দেখেছিল। তখন তার বয়স সাত।

তার আল্লাহর কথা মনে পড়লেও সে ডাকল না। একটুও ডাকতে ইচ্ছে করল না। খুব আগ্রহী নজরে নিভু নিভু চোখে তাকিয়ে রইল চাপাতির চকচকে ধারালো প্রান্তের দিকে। জয়ের গলার কচি ত্বক বিদীর্ণ হয়ে চিনচিন করে রক্ত বেরিয়ে এলো। কিন্তু কেন যে কণ্ঠনালিতে ছুরির বসার আগেই দ্বিতীয়জন এসে বাঁচিয়ে নিয়েছিল জয়কে! সেদিন জয় ফুরিয়ে যেত। তার জীবনটা সংক্ষিপ্ত। সে জানে। এবং অনিশ্চিতও। কিন্তু সেদিন জয় আমির ফুরিয়ে গেলে অতিরিক্ত সংক্ষিপ্ত হতো। কিন্তু তার জীবনটা অতিরিক্ত সংক্ষিপ্ত নয়, শুধু সংক্ষিপ্ত। সেই সংক্ষিপ্ত জীবনটায়

অভিজ্ঞতা ও ঘটনার কমতিটা থাকা যাবে না। তাই এরপর তার জীবনে অভিজ্ঞতা ও ঘটনার স্রোত-তরঙ্গ বিরামহীন তেড়ে এলো। আর শান্ত হলো না সেই স্রোত।

তখন জয় আচমকা মৃত্যুর ওপার থেকে জেগে উঠে খুবই অসন্তুষ্ট। তাকে বাঁচানোওয়ালা লোকটা সেই দাড়িওয়ালা। কোকড়ানো বাবরি চুল। গলায় তাবিজ। পরনে লুঙ্গি। মুখে তৃপ্তির হাসি।নিভু চোখে শেষবার লোকটাকে দেখেছিল জয়। কিন্তু তার ভেতরে এক প্রকার প্রেমের অনুভূতি ছড়িয়ে পড়েছে।অনুভূতিটা অদ্ভূত। প্রেমটা তার মৃত্যুর ওপর। একটা সুন্দর অন্ধকারত্ব। যেখানে জীবন নেই,

বিরোধ নেই, রাজনীতি নেই, ক্ষুধা নেই, ব্যথা নেই, চাহিদা অথবা ক্ষমতার লড়াই নেই।

মৃত্যুর এত এত সৌন্দর্য ছোট্ট জয়কে মুগ্ধ করেছিল, সেই মুগ্ধতা আর কাটেনি কখনও।

জয় মরে গেল। গলার চিনচিনে ব্যথাটা আর টের পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু অন্ধকার।

শরীরের ভর অনুভূত হচ্ছে না, শূন্যের ওপর ভাসমান হালকা দেহতে একটুও ক্ষুধা-ক্লান্তি আর লালসা নেই।

কতক্ষণ পর তার মৃত্যু ঘুম ভেঙেছিল!

আবারও মাথার ওপরে আকাশ। আকাশটাকে ঠিকমতো দেখার উপায় নেই। বিশাল বিশাল কড়ই গাছের ডালগুলো আকাশকে জমিনের

চোখের আড়াল করতে খুব তৎপর। চোখদুটো ঘোলা। প্রকৃতিও মেঘাচ্ছন্ন, আবার সাঁঝের বেলা।

জয় উঠে বসল। গলার ব্যথায় গা কেঁপে উঠল। শরীরের তাপে চামড়া ঝলসে যাবার উপক্রম। পরনের জামাটা ভেজা, প্রকৃতিও। অর্থাৎ বর্ষণ নেমেছিল প্রকৃতিতে। হুমায়িরার দেহটা পড়ে আছে। নগ্ন দেহ, রক্তাক্ত। পেটটা উঁচু তখনও। জয় দৌঁড়ে গিয়ে বসে পড়ল মায়ের পাশে। ডাকল কয়েকবার। তার খুব কান্না পাচ্ছে। কিন্তু কাঁদতে ইচ্ছে করছে না। সে জেনে গেছে দুটো কাজ খুবই অহেতুক। এক আল্লাহ নামক রক্ষাকর্তাকে ডাকা আর

দ্বিতীয়টা কাঁদা। বড়বাবা বলেছে হাসতে। সে হাসতে চেষ্টা করল। না! হাসিটা আসছে না। না আসুক, তবু কান্নাও করা যাবে না। কেঁদে কিছু হয় না। লোকে দেখলে বা শুনলে আরও বিরক্ত হয়ে জবাই করতে আসে।

সে মরেনি! কীভাবে সম্ভব! সে জ্ঞান হারিয়েছিল। ওরা এখানে ফেলে গেছে! জয়ের খুব ভয় লাগছে। এত অন্ধকার কেন? বিভিন্ন ধরণের আওয়াজ কানে আসছে। সেসব আওয়াজ ভোঁতা। একটাও স্পষ্ট-প্রকট নয়। তাতে ভেজা আঁধারে মোড়ানো প্রকৃতিটা গুমোট হয়ে উঠেছে।

সে কয়েকবার হুমায়িরাকে ডাকল, “আম্মু! আম্মু গো! ওঠো আম্মু! আম্মু, আমার একটু খিদে পাচ্ছে। চলো যাই আমরা। আম্মু!”তার রাগ হলো। হুমায়িরা কথা বলছেন না। মাঝরাত অবধি জয় থেমে থেমে অনেকবার হুমায়িরার ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা করেছে। হুমায়িরা ওঠেন না। শেষরাতে জয় কাঁদল। জঙ্গলের ভয়াবহতা, ক্ষুধার জ্বালা, মায়ের কথা না বলা তাকে কাঁদালো। কিন্তু শব্দ করে কাঁদল না। সে কাঁদল নিচু স্বরে। জোরে কাঁদলে ঝুঁকি আছে। তার ভেতরে আবারও মৃত্যু-প্রেম জেগেছিল। সেদিন সে বুঝতে পারেনি বটে, তার ভেতরে যে একটা নাম-

পরিচয়হীন কিছুর প্রতি নিগূঢ় টান কাজ করছে, তা আসলে মৃত্যু। যে মৃত্যু তার কাছে আসছে বারবার, দূর থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, জয় এগিয়েও যাচ্ছে। কিন্তু মৃত্যু তখনই জয়কে ছেড়ে দূরে চলে যাচ্ছে। এই লুকোচুরির জন্য জয়ের ভেতরে মৃত্যুর জন্য যেমন নেশা পয়দা হলো, তেমনই এক বিরহ-বিদ্রোহও।সকালের আলোয় গাছের পাতাগুলোকে দেখে তার খাবার মনে হলো। পাতা অনেক ওপরে। হাতের নাগালে জমিনের মাটি আছে। জয় আঙুলের নখ দিয়ে মাটি খামচে মুখে নিলো। চিবিয়ে চিবিয়ে গিলতে চেষ্টা করল। স্বাদটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে

না। জঙ্গলটা চোখের সামনে ঘুরছে। কিন্তু খাওয়াটা দরকার। সে পড়ে থাকা গাছের শুকনো ডাল দিয়ে মাটি আচড়ে তা তুলে খেলো। মা উঠলে তাকেও খাওয়াতো। মা শুয়ে আছে, তাই মায়ের খিদেও নেই। জয়েরও উচিত শুয়ে পড়া। তার মাথা ঘুরছে আসলেই। খুব বেশিক্ষণ জেগে থাকা চলবে না। নিঃশ্বাস নিতে পারা যাচ্ছে না।

জয়ের মাথায় এই বুদ্ধি এসেছিল, সে দৌড়ে জঙ্গল পেরিয়ে কারও বাড়িতে যাবে, সাহায্য চাইবে। কিন্তু উঠে দাঁড়ানো গেলে তা সম্ভব হতো। সে উঠে দাঁড়াতেই পারছে না। শুয়ে শুয়ে আরও কিছুটা মাটি সে গালে নিয়ে

চিবিয়েছিল। মাটিতে ক্ষুধা নিবারণ হচ্ছে না। রোদ উঠছে আস্তে আস্তে। নিভে যাচ্ছে সেই সাথে জয়ের চেতনা। জয় গিয়ে মায়ের নগ্ন বুকটার ওপর তার ভরশূন্য মাথাটা রেখে আস্তে কোরে শুয়ে পড়ল।সৈয়দ বাড়ির মসজিদে হুমায়িরার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। জয় তখন অন্দরে অচেতন পড়ে আছে।

সে শেষবার যখন হুমায়িরাকে দেখেছিল, তখন সে প্রায় জীবন্মৃত। জীবন ও মৃত্যুর সেতুর ওপরে সাত বছর বয়সী জয় টলমলে পায়ে একা দাঁড়ানো। তাছাড়া হুমায়িরার পরিণতিগত অবস্থা ছেলে হিসেবে স্মৃতিতে

ধারণ করতে নেই। মায়ের ওই চিত্র যুবক ছেলের স্মরণে আসতে নেই। জয় তা ধারণ করতে চায়নি। স্মৃতিতে রাখতে চায়নি। যা মানুষ স্মৃতিতে রাখতে অস্বীকৃতি জানায়, মস্তিষ্ক তা ধারণ করে না সচরাচর। এক্ষেত্রে মস্তিষ্ক মানুষের অনুগত।জয়ের মস্তিষ্কে বিকৃতি হয়েছিল। খুব ছোট বয়সের সেই বিকৃতি খুব নিখুঁত, সূক্ষ্ম আর জটিল। তা হামজা জানে। জয় জানে না, মানেও না। সে নারীসঙ্গকে নিজের মতো করে রীতিগত করে নিয়েছিল, অনেকটা অধিপত্যের মতো। কিন্তু আবার সম্মানের দায় ছিল না তার। নারীর অসম্মান তার কাছে বিশেষ কোনো সংবেদনশীল

ব্যাপার নয়। কিন্তু ধ-র্ষণে তার তীব্র বাতিক, এমনকি ধর্ষণের আশেপাশে থাকার জটিল ও অসীম অনীহা! কিন্তু জয় জানে ও মানে সে সব ভুলে গেছে। কড়া ড্রাগ ও একাধিকবার শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন তাকে উদ্দীপনাহীন করে তুলেছে। এটা তার ধারণা। মাঝেমধ্যে মনে এলে হামজা জয়কে ড্রাগ ধরিয়ে দিয়েছে। মনে আসাটা হুমায়িরার মুখ নয়। হুমায়িরার চেহারা জয়ের মনে পড়ে না, এটা তার ধারণা। কিন্তু কখনও যদি হুমায়িরার পরিণতিগত চিত্র মনে পড়ে আবছা হয়ে, তখন সে কড়া ড্রাগ সেবন করে।সৈয়দ বাড়িতে বেশ কয়েকটা তার বয়সী বাচ্চা

ছিল। সৈয়দ ফরহাদ মোহাম্মদ বারীর দুই সন্তান মুস্তাকিন ও মুরসালীন। আরও আছে রুবাইয়াত। সে মুস্তাকিনের চাচাতো বোন। ওরা বারবার এসে জয়কে দেখে যাচ্ছে। ওদের বয়সী একটা ছোট্ট ছেলে বিছানায় অচেতন পড়ে আছে। খুব অবাককর ঘটনা। দু'দিন আগে রুবাইয়াতের মামা অর্থাৎ মেজো চাচার শালা ছেলেটাকে সৈয়দ বাড়িতে এনেছে। তারা ছেলেটাকে চেনে না। মুস্তাকিনের বয়স নয় পেরিয়েছে। সে নাজেরা শেষ করে হিফজ্ বিভাগে গেছে। মুরসালীনের বয়স সাত। সে আরবী পড়তে চায় না, চরম ফাঁকিবাজ। নামাজের সময় তার পেট ব্যথা

হয়, মাথা ঘোরে। এখনও কায়দা, আমসিপাড়াই শেষ করেনি।সন্ধ্যা অবধি ওরা বারবার ঘুরে ঘুরে অচেতন বাচ্চাটাকে দেখে গেছে। সন্ধ্যার পর সবক থাকে, হুজুর মারবে খুব। এজন্য অগত্যা চলে যেতে হলো মাদ্রাসায়। মাগরিবের নামাজ না পড়লে আব্বা ফিরে শুনলে বেত দিয়ে পিটাবে।

মুস্তাকিনের মেজো চাচি হাজেরা। স্বামীর সাথে রাতে তার খুব বড়সড়ো একটা ঝগড়া হয়ে গেছে। আমির বাড়ির ছেলেকে সৈয়দ বাড়িতে আনার মতো কাজ কী করে করতে পারল তার স্বামী! উনার বড় বোনের স্বামী আজ উনার স্বামী। বড়বোনকে জয়নাল আমির

ছিঁড়ে খেয়ে ফেলেছে। এরপর মৃত বোনের সঙ্গে হাজেরাকে বিয়ে দেয়া হয়েছে। এ বাড়ির সকলে সেসব ভুলে গেলেও হাজেরা বোনের সাথে হওয়া অন্যায় ভোলেনি। সে জানিয়ে দিয়েছে স্বামীকে, আর থাকবে না এ বাড়িতে, অন্তত যতদিন ওই ইবলিশের বাচ্চা এই বাড়িতে আছে।কাজ হয়নি। বলাৎকার হওয়া আমির বাড়ির বউকে যখন এ বাড়িতে এনে দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা হলো, হাজেরার ইচ্ছা করেছে মৃতদেহটা কুচি কুচি করে কাটতে। এখন ছেলেটাকেও তাই করতে ইচ্ছে করছে তার।

ইবলিশের বাচ্চাকে রেঁধে খাওয়ানো, যত্ন করে বাঁচিয়ে তোলার পাপ তিনি করতে পারবে না। যার চাচার হাত এ বাড়ির রক্তে রঙিন, তার ভাতিজাকে হাজেরা যখন-তখন গলা টিপে মেরে ফেলতে পারে।

পরদিন সকালে জয়ের ঘুম ভাঙল। স্যালাইন চলছে তার শরীরে। সে চারদিকের কিছুই চেনে না। আতঙ্কে বুক খালি হয়ে এলো। আবার কোথায় আনা হয়েছে তার মা আর তাকে? সে টলমলে পায়ে এক দৌড়ে ঘরের বাইরে এলো। মনে হলো কিছু ছিঁড়ে এলো। হাতের ক্যানোলা। তা খুলে এসেছে, হাতের শিরাতে রক্ত জমেছে। আশপাশে লোক নেই।

মাকে খুঁজে বের করে তাকে নিয়ে পালাতে হবে।চারপাশে ঘর। একতলা বাড়ি। সব ঘরগুলো গোল হয়ে একের পর এক সজ্জিত হয়ে মাঝখানে গোলাকার উঠান তৈরি করেছে। সে বুঝতে পারল না কোন ঘরে তার মা আছে। ঘরের দরজাগুলো সবুজ রঙের। হাতটা জ্বলছে। তাকিয়ে দেখল, সুঁচ ফোটানো শিরাটা রক্ত জমে কালো-খয়েরি হয়ে গেছে। কেউ ঢুকছে। লোহার গেট খুলে আবার সিটকিনি লাগানোর শব্দ এলো। জয় তবু নড়ল না। সে কোথায় আছে, তা জানা দরকার। লোকটা ঢুকে কাঁধ থেকে হাজী রুমালটা খুলে দড়ির ওপর রাখল। চেঁচিয়ে

ডাকল, “হাজেরা বুবু! গামছাটা দে বুবু। গা ঘাইমা শ্যাষ।”জয়ের পা দুটো কাঁপছে। থামানো যাচ্ছে না। সে চাইছে দৌড়ে পালাতে, কিন্তু পা সরছে না। এটা সেই দাড়িওয়ালা, বাবরি চুলের লোকটা। তার মা কোথায়? লোকটা ঘেমেছে কেন? সেদিন মায়ের সাথে খারাপ কিছু করার পরেও লোকটা ঘেমেছিল খুব। জয়ের হাড্ডিসার বুকের পাজরটায় তুফান উঠল। টিপটিপ করছে।

লোকটা তাকিয়ে জয়কে দেখেই কেমন করে যেন হাসল, “কী খবর আমির সাহেব? আমি ভাবছিলাম আপনের ইন্তেকাল হয়ে যাবে। কৈ

মাছের জান, এহ? হা হা হা! খুব ভালো। আল্লাহ হায়াৎ দিছে। থাকেন বাইচা।”

জয় ছিটকে একদৌড়ে ঘরে যেতে গিয়ে ঢালাই করা উঠানের ওপর পড়ে ঠ্যাংয়ের চামড়া ছিলে গেল। উঠে হুড়মুড়িয়ে দৌড়ে সেই ঘরে গিয়ে দরজটা চাপিয়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মাথা ঘুরছে নাকি ঘরটা, বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু ঘুরছে। চারপাশটা চোখের সামনে স্থির হচ্ছে না। সে এই ঘরে, কিন্তু মা কোথায়? বুকটা এত নিষ্ঠুরভাবে কাঁপছে! সে লোকটাকে ছাড়বে না। কিন্তু সামনে যেতেই তো পারবে না। নিজের ওপর খুবই রাগ হলো। সে লোকাটাকে আঘাত করতে

চায়, কিন্তু লোকটার চেহারা মনে পড়লেই চোখ অন্ধকার হয়ে আসছে, বুকের ভেতরে লাফালাফি চলছে, শরীরটা ঘামছে।সে দরজা আটকানোর সময় খুব জোরে দরজার কপাট চাপিয়েছে। বিকট শব্দ। পুকর পাড় থেকে বাড়ির মহিলারা ছুটে এলো। জয়ের ছোট্ট দূর্বল দেহটা দরজা চাপিয়ে রাখতে ব্যর্থ হলো। একজন মহিলা এগিয়ে এলেন। আলতো হাতে জয়ের মাথায় হাত রেখে বললেন, “কী হইছে আব্বা তোর! ভয় পাইছো?”

মহিলাটিকে সে চেনে না। কিন্তু ভালো মনে হলো। পেছনের জনের দৃষ্টি কিন্তু জয়ের

ওপর ভালো না। সে জয়কে বড় ঘেন্নার নজরে দেখছে। জোহরের আজান হলো সৈয়দ বাড়ির মসজিদে। মনে হলো যেন ঘরের মধ্যে হচ্ছে আজান।

পেছনের মহিলা সেই বাবরিওয়ালাকে গামছা দিলো। তা জয় আড়চোখে দেখে চোখদুটো বুজে রাখল।

দুপুরের পর দুটো বাচ্চা আসে বাড়িতে। তাদের পরনে টুপি, সাদা পাঞ্জাবী, পাজামা। জয়কে বারবার দেখে। ভালো মহিলাটি ওদের মা, মরিয়ম। মরিয়ম জয়কে নিজের ছেলেদের সঙ্গে বসিয়ে খাওয়ান। জয় কথাবার্তা বলে না। লোকজন কম দেখলে ঘরে ঘরে মাকে

খোঁজার চেষ্টা করে।সৈয়দ বাড়ির পেছনের সীমানার একটু দূরে আরেকটা বাড়ি। বাড়ি নয় ঠিক, কোয়ার্টারের মতোন আবাসিক। সেখানে অনেক যুবকের বাস। ওরা এ বাড়ির অধীনেই থাকে, সেটা বুঝেছিল জয়। বাবরিওয়ালাও এই বাড়িতে নিয়মিত আসে। সে জানতে পেরেছে রুবাইয়াতের মা হাজেরার ভাই হলো বাবরিওয়ালা। বাবরিওয়ালার নাম সেলিম ফারুকী। বাবরিওয়ালার হাতে বিভিন্ন পাথরের মোট তেরোটা আংটি আছে। একেক আঙুলে দুটো-তিনটে কোরেও। গলায় তাবিজ আছে কয়েকটা।, মাঝেমধ্যে তসবীহ ঝুলতে দেখা

যায়। রাতে নাকি সে ধ্যান করে। চোখদুটো নেশা নেশা। ধ্যান করলে চোখ নেশা নেশা হয়। আল্লাহর ধ্যান। রুবাইয়াত তার মামার ব্যাপারে এসব জানিয়েছে জয়কে।

জয়ের আল্লাহর প্রতি বিরাগটা বাড়ছে দিনদিন। যে আল্লাহর ধ্যান সেলিম ফারুকী করে, সে কিনা তার মাকে রক্ষা করবে সেই আল্লাহকে কত বিশ্বাসের সাথে ডেকেছিল সে! নিজের বোকামিতে সে লজ্জিত। সেলিম যার ধ্যান করে সেই আল্লাহ অবশ্যই সেলিমের পক্ষেই থাকবে, তার মাকে বাঁচাতে আসবে কেন?

মাস দুয়েকের মাঝে তাকে বাড়ির বাইরে যেতে দেয়া হয়নি। বড়কর্তার হুকুম। জয় জানে না বড়কর্তা কে। গোল উঠান, একটা খোপের মতো ঘর, আর গোসল করার জন্য কলপাড়। সেই কলপাড়ের পাশে পুকুর, তার ওপারে কলার বাগান, ঝোপ-ঝাড়। এটুকুই জয়ের সীমানা। জয় ঘরের ভেতরেই থাকে। বাইরে বের হলে হাজেরা এবং সেলিমের সাথে দেখা হয়। তার ভয় লাগে।দুই মাস পর বাড়িতে একজন বিশেষ কেউ ঢুকলেন। ব্রিগেডিয়ার সৈয়দ ফরহাদ মহম্মদ বারী সাহেব। জয় বুঝল এই সেই বাড়ির কর্তা। মুস্তাকিনের আব্বা।

ফরহাদ সাহেব জয়কে সৈয়দদের কওমী মাদ্রাসায় পড়তে দিলেন। জয় বুঝতে পেরেছিল এই গোটা পরিবারের অর্থাৎ যে পরিবারকে ঘেন্না করতে শেখানো হয়েছে তাকে ছোটবেলা থেকে, তা অহেতুক নয়। বড়বাবা কেন সৈয়দ পরিবারকে এত ঘেন্না করতেন, তা সে বুঝল। এটাও বুঝল, এখন সৈয়দ বাড়ির সবকিছুর প্রতিনিধিত্ব করছেন সৈয়দ ফরহাদ মহম্মদ বারী।তিনি রোজ সকালে উঠে কোরআন তেলওয়াত করেন। জয়ের কানে খুবই বিরক্ত লাগে। যে আল্লাহই সেলিমের মতো মানুষের, তার বাণী যে এত যত্ন করে পাঠ করে তার প্রতিও জয়ের

বিদ্বেষ। আজ অবধি তার মায়ের ব্যাপারে কিছু জানা যায়নি। উনার নির্দেশে জয়কে বন্দি রাখা হয়েছে।

তিনি দুই মাসের ছুটিতে এসেছেন। ফরহাদ সাহেবের কাছে একবার খবর এলো, জয়কে পিটিয়ে শরীরের চামড়া ছিলে ফেললেও সে পড়ে না। জিহ্বা অবধি নড়ায় না। নামাজে যায় না। গেলেও চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। মোনাজাত করে না কখনও।এ নিয়ে জয়কে ওই ছোটবেলায় যে পরিমাণ মার খেতে হয়েছিল হুজুরদের হাতে, তার শরীরটা হয়ে উঠল ব্যথাহীন। দু চারটে চামড়া ছিলা বেতের

আঘাত তখন আরামদায়ক ব্যাপার তার কাছে।

জয় জেনে গেছে, এই কোরআন সেই আল্লাহর বাণী যাকে ডাকার পরেও তিনি তার মাকে বাঁচাতে আসেননি। সে এই দুই মাসেও ডেকেছিল আগের সব ভুলে। সে এখন আর মাকে চায় না, কিন্তু বড়বাবা তো পারে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে! এই রক্ষাটুকু সে আবারও বেহায়ার মতো চেয়েছিল আল্লাহর কাছে। আল্লাহ করেননি।

আলিফ–টা অবধি উচ্চারণ করানো গেল না জয়কে দিয়ে। বোবাও মুখ দিয়ে আওয়াজ করে, জয় দাঁতে দাঁত আটকে বসে থাকে

চুপচাপ। মুরসালীন তাকে খোঁচায়, “বল জয়। পড়। গুনাহ হয়। এমন করিস না। হুজুর তোকে আরও মারবে। ওরা তোকে কাফের ভাবে। তুই কি আসলেই তাই? পড় জয়। ”তাতে জেদ বাড়ে। জয় পড়ে না তো পড়েই না। মার খেয়ে হাতের তালু ফেটে যায়, কখনও মারের চোটে ছোট্ট শরীরটায় জ্বর আসতো। কিন্তু হিফজখানায় রাত তিনটের সময় তাহাজ্জুদের নামাজে ডেকে তোলা হয়। জ্বর নিয়ে উঠে বসতে হতো। না উঠলে ঘুমন্ত অবস্থাতেই বেতের সপাৎ সপাৎ বাড়ি। এছাড়া সবাই জেনে গেছে জয় কাফের। নেহাত ফরহাদ সাহেবের নির্দেশ না হলে

কবেই জয়কে বের করে দেয়া হতো মাদ্রাসা থেকে। তার ওপর নামাজে না দাঁড়ালে জ্বর আসা শরীরে মার পড়ে।তাদেরকে সুন্নতী তরিকায় এক খাঞ্চায় কয়েকজনকে খেতে দেয়া হয়। এতে মুসলমান ভাইদের মাঝে স্নেহপ্রীতি বাড়ে। জয় খাওয়ার আগে বিসমিল্লাহ পড়ে না। বিসমিল্লাহর শেষে আল্লাহ আছে। সে একবার মুস্তাকিনকে জিজ্ঞেস করল, বিসমিল্লাহ মানে কী? মুরসালীন খুব খুশি হলো। হয়ত জয়ের ভেতরের গোমরাহি দূর হচ্ছে। সে হেসে জানালো, "আল্লাহর নামে শুরু করা। আল্লাহর

নামে খাওয়া শুরু করলে বরকত হয়। খাওয়াটা ইবাদতের শামিল হয়।"

জয় মাথা নাড়ল, "আল্লাহ বলতে কিছু নেই। খাওয়া আল্লাহর নামে শুরু করারও কিছু নেই।"সেদিন আর খাওয়া হয়নি। হুজুর খুব মারলেন। মারার কারণ আছে। তাকে অনেক স্নেহের সাথে বোঝানোর চেষ্টা করতে গেলে সে আরও বেশি কটূক্তি করে, এমন সব কথাবার্তা বলে যা সহ্য করা যায় না। তাই হাল ছেড়ে দিয়ে মেরে বোঝানোর চেষ্টাটাই করা হয় এখন। তাছাড়া জয়ের ওপর রাগ তাদের কম না তার কর্মকাণ্ডে।

দু'দিন কিছু খাওয়া নেই, মুখে স্বাদ নেই, জ্বরে গা তিরতির করে পুড়ছে। এখানে মরিয়ম নেই, মা হারিয়ে যাবার পর মরিয়মের কাছে একমাত্র যা স্নেস সে পেয়েছে। তাকে সেবা করার কেউ নেই। সব ছাত্ররা জেনে গেছে, সে কাফের। তার যেকোনো কষ্ট ওদেরকে সুখ দেয়। মাদ্রাসায় একটা নাস্তিক আছে, এটা খুব কলঙ্কের বিষয়। মুরসালীন আর মুস্তাকিন ছাড়া কেউ তার পাশ অবধি মারায় না, পারলে বিভিন্নভাবে মার খাওয়ায়, জ্বালাতন করে, আঘাত করে, গালি দেয়।শেষ অবধি না পেরে সৈয়দ বাড়ির অন্দরে পাঠিয়ে দেয়া হলো জয়কে। মরিয়ম মাথায় পানি

ঢালেন। ওষুধ খাওয়ার আগে মরিয়ম জয়কে খেতে দিয়ে পানি আনতে গেলেন। হাজেরা এসে পা দিয়ে থালাটা উল্টে দিলো। কান মলে ধরে বলল, ইবলিসের বাচ্চা, "তোরে বলছি না বাড়ির ভেতরে আসবি না। তোরে আমি সহ্য করতে পারি না। বাইরেই মরবি। আসবি না অন্দরে। শয়তানের বাচ্চা।"

পরের ছুটিতে ফরহাদ সাহেব এসে জয়কে একদিন ডাকলেন, পড়িস না কেন আব্বা?

অবিশ্বাস কেন এত?

আমার মা কোথায়?

ফরহাদ সাহেব চুপ হয়ে গেলেন। খানিক পর বললেন, আল্লাহর আমানত আল্লাহ নিয়ে গেছে..

জয়ের ভেতরে আগুন জ্বলে উঠল। সে কটূক্তি করে বেজায় আপত্তিকর মন্তব্য করে বসল। যা সহ্য করা যায় না। কিন্তু ফরহাদ সাহেব অসীম ধৈর্যের সাথে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলেন। কিন্তু সেলিম পাশেই ছিল। সে জয়কে কখনোই ফরহাদ সাহেবের কাছে একা ছাড়ে না। সে এসে জয়ের গাল চিপকে ধরে চুল মুঠো করে ধরল।

ফরহাদ সাহেব বললেন, "ছেড়ে দাও সেলিম। ছোট মানুষ। বুঝবে ইনশাআল্লাহ। আমি মানা

করেছি ওকে আঘাত করতে।”-“জানেন না ভাইজান ও কতটা বাড় বাড়তেছে দিনদিন। মাদ্রাসায় ওর জন্যে ছাত্ররা অভিভাবকরা অতিষ্ট। ওরে এমনে শাস্তি না দিলে ও নিজের সাথে সবাইরে নষ্ট বানাই ফেলবে। আমি বলে রাখলাম আপনারে।”

ফরহাদ সাহেব জয়কে বোঝাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরিবেশটা ভেঙে গেল, উনার মেজাজটা থমকে গেল জয়ের আচরণে। জয়কে সেলিমের হাত থেকে ছাড়িয়ে দিয়ে উনি উঠে চলে গেলেন কোয়ার্টারের দিকে।

জয়ের শরীরটা কালো হয়ে গেছে। শরীরে বেতের আঘাত, হাতের মার, না খাওয়া, অনাথ-অসহায়ত্বের ছাপ খুব তীব্র। মুরসালীন ও মুস্তাকিন জয়ের সাথে মেশার চেষ্টা করতো। কিন্ত জয়কে বোঝা যায় না। তার ভেতরে খাওয়া, গোসল, আদর-যত্নের কোনো চাহিদা দেখা যায় না। মার খেলে কাঁদে না, হাসে। উন্মাদের মতো হাসে। তার হাসিটা তার ঠোঁটে সেভ করা। কিছুতেই তা মোছে না। বড়বাবা হাসতে বলেছে।বাড়ির লোকেদের অবশ্য পছন্দ ছিল না জয়ের সাথে দুই ভাইয়ের মিশতে চাওয়া। জয় একটা শয়তান, তার ঘাঁড়ে শয়তানের বাসা আছে,

সেখানে অনেকগুলো শয়তান বাস করে—
মাদ্রাসায় ছেলেরা সবাই এটা জানে।
চোখের সামনে রোজ সে সেলিমকে দেখে।
মাজার থেকে মাদ্রাসায় তসবীহ জপতে
জপতে আসে। বৈরাগী লোক। বিয়ে সাদীহীন
সংসারত্যাগী একজন সাধু গোছের লোক
সেলিম। খুব আল্লাহভীরু, ধার্মিক, মাজারপ্রেমী
মানুষ। জয় তাকে দেখলেই লুকিয়ে পড়ে।
ছোট্ট মস্তিষ্কে সুগভীরভাবে জড়ানো আতঙ্ক
কাটতে চায় না।
সে তিনবছর ছিল সৈয়দ বাড়িতে। সেই তিন
বছরের বন্দি জীবনে মাদ্রাসা থেকে বাইরে
বেরোবার সুযোগ হয়নি। তাকে আলাদা

পাহারায় রাখা হতো। বিকেল হলে ছেলেরা বাইরে হাঁটাহাঁটি ও খেলাধুলা করতে গেলেও তার সেই সুযোগ ছিল না। জয় বুঝতে পেরেছিল, মাদ্রাসায় একটা সংগঠন চলে। সেটার ঘোর বিরোধী ছিল বড়বাবা। তাকেও হতে হবে।হুমায়ুন পাটোয়ারী মাসে চার-পাঁচটা বিয়ে করে বেড়ান। খুবই দক্ষ মেয়েলোক পটাতে। কিন্তু ফাঁসলেন তুলির মায়ের কাছে। তুলির মা দেখতে তুলির চেয়েও সুন্দর ছিল। মহিলা গর্ভবতী হলো। হুমায়ুন পাটোয়ারী বারবার গর্ভপাত করতে বলেও লাভ হলো না। বরং মহিলা পুলিশে যাবার হুমকি দিচ্ছিল। হুমায়ুন আশ্বাস দিলেন, বাচ্চাটা হয়ে

গেলে বাড়িতে নিয়ে যাবেন। কিন্তু পাড়ার লোক মেরে তেড়ে দিয়েছিল দুজনকেই। শাহানার সন্তান নেই। হামজাকে মানুষ করছেন। এর পর একটা মেয়ে পেলে খারাপ হয় না। ফুটফুটে তুলির জন্মের পর তুলিকে রেখে দিলেন নিজের কাছে। এক রাতে হুমায়ুন তুলির মাকে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে মাঠের ডিপটি কলের নালিতে শুইয়ে জবাই করে ফেললেন। লাশটা গুম করে ফেললেন। শাহানা তাতে খুবই খুশি। নিজেরাই খেতে পান না, আবার সতীনকে কী খাওয়াবেন। বারবার জেল-জরিমানা দিতে আর সংসার চালাতে বিঘা বিঘা জমি বিক্রি করে সব শেষ

করে ফেলেছেন হুমায়ুন।হুমায়িরা তাদের সংসার চালাতেন, বিশেষত হামজার পড়ার খরচ। হুমায়ুন হামজাকে নিয়ে খুবই বিরক্ত এ ব্যাপারে। ছেলেটা পড়ালেখা ছাড়তে চায় না। শান্ত স্বরে শুধু বলে, “আমি পড়ব, আব্বা।” এরপর হুমায়ুন দু-তিন দিন ধরে অবিরাম চেঁচালেও আর কোনো জবাব দেবে না হামজা, এবং নিজের সিদ্ধান্ত থেকে পিছপা হবে এটা ভাবাও যায় না।

কতবার যে হুমায়ুন মেরে ধরে হামজাকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। ছেলে থাকতে তিনি কেন কাজ করবেন? কিন্তু হামজা পড়ালেখা ছাড়ে না। হুমায়িরা নিখোঁজ হবার পর

হামজার পড়ার খরচ বন্ধ হয়ে গেল, সংসার আর চলে না। হামজা না খেয়ে থাকতে পারে। তার নির্লিপ্ততা কঠিন। দু'দিন না খেয়ে থাকলেও ভাত চায় না। কারও সাথে বেশি কথা নেই, হাসি নেই। মলিন কাপড়, শীর্ণ দেহ কিন্তু চেহারাটা ভারী।হুমায়ুন পাটোয়ারী ঢাকায় সিকান্দার আলী সরদারের লোহার কারখানায় কাজে লাগিয়ে দিয়ে এলেন হামজাকে। অত বড় প্রতিষ্ঠান, অত বড় নাম, বড় প্রাসাদের মতোন সরদার বাড়ি, বিশাল ক্ষমতা হামজার চোখে লাগল। তার চেয়ে কত ছোট রুদ্র ইয়াজিদ সরদারের রাজকীয় লালন-পালন সব সে দেখতে লাগল।

রাজধানীর শীর্ষ ত্রাস পরিবার সরদার পরিবার। সেখানে থেকে হামজার ভেতরের সুপ্ত চাহিদার আসমান বাইরে আসার রাস্তা পেল। সে যে দুনিয়াকে জিততে জন্মেছে, তার খবর ও ঝলক বাইরে বেরিয়ে এলো রাজধানীর মাটিতে পা রেখে।

শাহানা বলে দিয়েছিলেন, তুই কী করবি জানি না। শুধু সংসারের খরচা চাই।

সে কী করবে তার পরোয়া নেই। শুধু তার কাছে সংসারের খরচ চায়। হামজা কী করবে? যা খুশি করতে পারে, কিন্তু সংসারের খরচ জোটাতে হবে, ব্যাস। সে ছিনতাই দিয়ে শুরু করল। এরপর তা থেকে ধরা পড়ার

মাঝ দিয়ে গেল এক সন্ত্রাসের কাছে। সরদার পরিবারের দুশমন, প্রতিপক্ষ। এই গাদ্দারির অপরাধে তখন তাকে সরদর পরিবার খুঁজছে। কিছুদিন প্রাণ বাঁচিয়ে লুকিয়ে থেকে তার এক বছর লস গেল। কিন্তু পড়লেখা চালাতে হবে তাকে। তার জন্য পয়সা দরকার, অনেক। এরপর সে বড়ভাইদেরকে পেলো। তৎকালীন সরকার-বিরোধী দলীয় বড় ভাই। যারা খুব সহজে শুধু মুখের সমর্থনের জন্য হামজার মতো পুঁচকে ছেলেদের পেছনে পয়সা খরচ করে। শুধু এটাই যে তখনকার সরকারী দলের প্রতি হামজার ক্ষোভের কারণ ছিল তাও না। জয়নাল কাকার কারাবাস, ফুপুর

মৃত্যু, জয়ের বন্দিদশা সবের পেছনে ওদের লোকই! সৈয়দ ফরহাদ মহম্মদ বারী ওই দলেরই সমর্থকগোষ্ঠীর একজন। এটার একটা ভিত্তি আছে। ফরহাদ মহম্মদ বারী সাহেব বিরোধী দলীয় প্রধানের জুনিয়র অফিসার। অনুরাগের সম্পর্ক। তাকে পেলে হামজা টুকরো টুকরো করে কেটে লোহার চুল্লিতে ঝলসাবে।

হামজা শান্ত-শিষ্ট ভাবনার ছেলে। সে বুঝে বুঝে কিছুদিনে এমন দু-একটা কিশোর বয়সের ঊর্ধ্বে যাওয়া কিছু কাজ করে ফেলল, যা বড়ভাইদের নজর কাড়তে যথেষ্ট ছিল। সে স্কুলে ভর্তি হলো আবার। বাড়িতে টুকটাক

খরচা দিতে গেলে পড়া বা বিলাসিতা হয় না। এখন আর রোজ নিয়ম করে বাড়ি ফেরাও হয় না। রাস্তায় থাকার প্রবণতা ও প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে। মানুষকে অমানুষ বানাতে রাস্তার অবদান অনেক। হামজার মানুষ সত্ত্বার বিদায়ক্ষণ চলছে।
একদিন শেষরাতে হামজা হাঁটতে হাঁটতে হাকিমপুর এলো। মাদ্রাসার চারধারে বাঁশের চ্যাগার। তা ডিঙিয়ে চড়তে গিয়ে বাঁশের ফাঁড়া অংশের আঘাতে ঠ্যাংয়ের মাংস ছিঁড়ে গেল। কলকল করে রক্ত বেরোচ্ছে। কপালের চামড়ি ছিলে গেছে।সে জানে না জয়কে কোন বিভাগে রাখা হয়েছে। পেছনের পথ দিয়ে

মাদ্রাসার সারি ধরা কক্ষগুলোর পেছনের দিকের জানালার দিকে পৌঁছাল। চৌকিদারের হাতে ধরা পড়ল হামজা। সংগঠনের ছেলেরা সব বেরিয়ে এলো। হামজার নিশ্চুপতা প্রমাণ করল, সে কোনো বদ উদ্দেশ্যে অথবা কারও নির্দেশে মাদ্রাসা আঙিনায় অনিষ্ট করার লক্ষ্যে প্রবেশ করেছে। তাকে প্রায় আধঘন্টা যাবৎ জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো, 'সে কেন এই শেষরাতে এভাবে মাদ্রাসায় ঢুকেছে?'

কতজনে কতরকম মধুর করে জিজ্ঞেস করল, তারা শুধু জানতে চায়, 'কে এসেছে সে?'

কোনো জবাব নেই। নিঃশ্বাসের শব্দও পাওয়া যায়নি হামজার কাছে। জয়কে ইশারায় বলে দিলো, “চুপ থাক। একদম চুপ। তুই চিনিস না আমাকে।”তার অনড়, অটল, স্থিরচিত্ত সবাইকে অবাক এবং ক্ষুব্ধ করল। কোনো ভালো উদ্দেশ্যেই যদি কিশোর ঢুকবে মাদ্রাসায় তাহলে বলতে বাঁধা থাকার কথা না। তাকে আঁটকে রাখা হলো। বেতের আঘাতে পরনের মলিন ফতোয়া ছিঁড়ে গেল। তবু কোনো কথা নেই। কিন্তু জয় সহ্য করতে পারছিল না। সে জানে বেতের আঘাত পিঠে সইতে কেমন লাগে। সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, ‘আমার ভাই। আমার সাথে দেখা করতে

আসছে। আমারে মারেন, হুজুর। ছাড়েন হামজা ভাইরে।সকলে অবাক হয়ে গেল। এবং এতে ক্ষোভটা বাড়ারই কথা, বাড়লও। মার এবং জিজ্ঞাসাবাদ কঠিন হয়ে উঠল। মাঠের প্রাঙ্গনে খাঁড়া গাছগুলোর মতোই অটল হামজা। চোখদুটো কথা বলে, ভয়ংকর তার নীরবতা। মাঝেমধ্যেই শীর্ণ পিঠটা বেঁকে আসছে। দেহের চামড়া ফেটে গেছে। ঝিমিয়ে এলো হামজার দেহটা। জয় বড় অবাক হয়েছিল। তার তো কেউ নেই। সে দুই বছরে খুব বুঝেছে এই জগৎটা তার কিন্তু সে জগতের কারও কেউ বা কিচ্ছু নয়। আজ হামজার এই নীরব আগ্রাসন অন্য বার্তা

দিলো। এই বার্তা জয় আর ভোলেনি কখনও। তার জীবনে মৃত্যু, আঘাত ও হামজার জন্য যে অশেষ অনুরাগ ও নেশা জন্মেছিল, তা কাটেনি আর। তিনটা তার জীবনে অবিচ্ছেদ্য হয়ে গেল। এই তিনটার যেকোনো একটার জন্য বাকি দুটো কবুল। হামজার জন্য মৃত্যু ও আঘাত, মৃত্যুর জন্য হামজা ও আঘাত, অথবা আঘাতের জন্য মৃত্যু ও হামজা সাদরে গ্রহণযোগ্য হলো জয়ের জন্য। এই তত্ত্বটা দিনদিন আরও তীব্র হয়েছিল। কারণ এখানেই শেষ হয়নি মৃত্যু, আঘাত ও হামজার উপস্থিতি তার জীবনে। যতদিন না মৃত্যু তাকে গ্রহণ করে সাথে নিচ্ছে ততদিন আঘাত ও

হামজার সাথে তার বিচ্ছেদ নেই।ফজরের নামাজের ওয়াক্তে সেলিম এলো মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে। সে খুবই অবাক এতটুকু কিশোরের এতখানি ধৃষ্টতা দেখে। সে খুবই হতাশ হয়ে বলল, “এইজন্যেই কইছিলাম আমিরের ব্যাটারে আমার হাতে তুলে দেয়া হোক। ফরহাদ ভাই ক্যান ওরে মানুষ বানাইবার বৃথা চেষ্টা করতেছে? আবার নিজেগোরে ধ্বংস করবার লাইগাই তো। একবার ওর চাচায় যা করছে তাতে দিল ভরে নাই। আল্লাহ কবে যে একটু সচেতন বানাইব ফরহাদ ভাইজানরে। হক মওলা, ইয়া খুদা তেরা ফরমান!

শয়তানের ওয়াস-ওয়াসা থেকে সবাইরে রক্ষা করেন মওলা!''

হামজা চুল চিমটি মেরে ধরে সন্দেহিন স্বরে বললেন, ''কার হুকুমে মাদ্রাসায় ঢুকছিস কইয়া ফেল তো, বাবা।'' সবার উদ্দেশ্যে বলল, ''ওর ছোটকাকা কারাগার থেইকা ফেরোয়ার। এখন কতকিছু হইব, দেইখো আমি কইয়া রাখলাম। দেখো এইডারে জয়নাল পাঠাইছে কিনা! এই চেংরা কাম না সারতে পারলে আবার কোন আক্রমন করবো, তার ঠিক আছে?''জয় পুলকিত হয়ে উঠে হামজার দিকে তাকাল। কিন্তু বাকিরা আৎকে

উঠল। আরও বেশি তৎপর হলো হামজাকে মেরে কথা বের করতে।
হামজা কথা বলল না। সেলিম কয়েকটা চড়-থাপ্পরও লাগালো। কিছু উস্কানিমূলক কথা বলে আরও দু একটা লাত্থি খাওয়ালো।
নামাজের পর আবার আলোচনায় বসা হবে।
জয় এই ফাঁকে দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "হামজা ভাই, এইখানে আইছো ক্যান? তুমি কেমনে জানলা আমি এইখানে?"
হামজা হাসল। ঠোঁট ফেটে গেছে। হাসিটা কেমন যেন দেখতে লাগল। হেসে বলল, "শুনছি শেষরাতে তোদেরকে উঠায়ে তাহাজ্জুদ পড়ানো হয়, তাই না? ভাবছিলাম কলপাড়ে

দাঁড়াব, তুই মখ ধুইতে আসলে দুইজন পালাবো। ব্যাড লাক।''জয়ও হাসল। হামজা অবাক হয়। এমন এক সময়ে জয়ের হাসিটা অস্বাভাবিক। কিন্তু সে হাসছে। সবে জয়ের বয়স মাত্র তখন কমবেশি নয়, দশ হয়নি। তাকে কে শিখিয়েছে এমন হাসি হাসতে? জয়কে জিজ্ঞেস করলে জয় বলতো, "বড়বাবা তত্ত্ব দিয়েছে, পরিস্থিতি সেটা প্রমাণ করে সূত্রে পরিণত করেছে।''

হামজা জিজ্ঞেস করল না। জয় হেসে বলল, "তো এই কথাটা বললেই তো কম মারতো ওরা।''

জয়ের ছোট্ট হাতটা চেপে ধরে হামজা উঠে বসে বলল, "সিক্রেট প্ল্যান বলে দিলে আবার নতুন প্লান বানাইতে হতো পরেরবার। আমি এই প্ল্যানেই তোকে আজাদ করব এইখান থেকে। জয় বাংলা!" চোখ মারল হামজা। জয় হেসে ফেলল, আস্তে করে বলল, "হু? জয় বাংলা? বলো, বলো জয় আমির।"কথা ফুরোয়নি। কিন্তু জয়কে টেনে মসজিদের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো। হামজার কী হবে জানা নেই। হামজা আবার শুয়ে পড়ল মাটির ওপর। গা থেতলে গেছে, শরীরে জোর নেই, যন্ত্রণায় ভেঙে আসছে। জয় পেছন ফিরে একবার তাকাল। হামজা তাকিয়ে আছে তারই

দিকে নিভু নিভু চোখে।হামজার শরীরের চামড়ার নিচে রক্ত জমাটবদ্ধ হয়ে গেছে। নিচের পাটির একটা দাঁত নড়ে গেছে। মাড়ি থেকে রক্ত বের হবার ফলে গাল নোনতা লাগছিল।

সকাল আটটায় বৈঠক বসল। হামজাকে বড়হুজুর জিজ্ঞেস করলেন, “যদি তুমি বলতে না পারো কেন এসেছ ওত রাতে মাদ্রাসার ভেতরে, কঠোর শাস্তি পাবে।”

হামজা ভীতু স্বরে বলল, “আমি বলব। কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করবেন না।”

-“মানে? বিশ্বাস কেন করব না?”

-“আমি সত্যি বললে বিশ্বাস হবে না আপনাদের।”

-“কেন?”হামজা চুপ করে রইল। এতে উপস্থিত জনতার ভেতরের কৌতূহল মাত্রা ছড়াল। উত্তেজিত হয়ে উঠল তারা। জয় ভ্রু কুঁচকে হামজাকে বোঝার চেষ্টা করে পারল না।

-“বলো দেখি। বলো। কেন ঢুকেছ ওত রাতে ওভাবে?”

হামজা আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সেলিমের দিকে ইশারা করে বলল, “উনি আমারে আসতে বলছিলেন।”

সেলিম আকাশ থেকে পড়ল। তেড়ে এসে গলা চেপে ধরল হামজার। হামজা মিছেমিছি কেশে উঠল করুণভাবে। সবাই জোরপূর্বক ছাড়িয়ে নিয়ে অবিশ্বাসী স্বরে বলল, “এই ছেলে, বুঝে বলতেছ তো কী বলতেছ? জানো ও কে?”

অবুঝের মতো বলল হামজা, “কে?”

-“ও মেজো সৈয়দ সাহেবের শালা। ধার্মিক মানুষ। তুমি তারে আজেবাজে কথা বললে আবার মার খাবা। বুঝে শুনে কও যা কইবা।”হামজা ভীতু নজরে দু’বার মাথা তুলে সেলিমকে দেখল। ভাবটা এমন যেন সে সেলিমকে ভীষণ ভয় পাচ্ছে, কথা বলতে

পারছে না ভয়ে। সেলিম ছটফট করছিল। বড়হুজুর অভয় দিলেন, “যাইহোক! বলু ক্যান আসতে কইছিল তোমারে? জয়ের সাথে দেখা করবার জন্য?”

-“হ্যাঁ।....না।”

-“কী বলতেছ?”

-“মানে হ্যাঁ। এইটাও একটা কারণ। কিন্তু আরেকটা কারণ আছে।”

-“সেটা কী?”

এবার আরও ভয় ফুটে উঠল হামজার মুখে। সে ভীতু নজর তুলে সেলিমকে দেখছিল বারবার, আর আতঙ্কিত হয়ে চোখ নত করছিল। সেলিম রাগে দিশেহারা হয়ে তেড়ে

এলো আবারও, “খচ্চরের বাচ্চা! ইবলিস। কী বলতে চাইতেছিস? মিথ্যা কথা কইলে জবান টাইনা ছিইড়া আনমু, হারামীর বাচ্চা। আল্লাহর গজব পড়বো তোর উপর।”

সবাই সেলিমের আচরণে ভ্রুকটি করল। তার আচরণ আর হামজার কথা ও অঙ্গভঙ্গি অনুযায়ী আসলেই তাকে সন্দেহজনক লাগছিল। হামজা ভয়ে আরও সিটিয়ে গেল। সবাই এবার তেঁড়ছা নজরে একবার সেলিম ফারুকীকে দেখে হামজাকে পুরোদমে অভয় দিলো। বড় হুজুর বললেন, “তুমি বলো, ছেলে। সেলিম খবরদার আর কোনো লাফালাফি করবা না। ওরে কথা কইতে দাও।

এ কী অসভ্য আচরণ। ওরে কথা বলতে দিচ্ছ না কেন?”

সেলিম দিশেহারা হয়ে উঠল,“বিশ্বাস করেন হুজুর, এই ইবলিসের বাচ্চা মিথ্যা কথা বলতেছে। আমি ওরে আজকের আগে খুদার কসম দেহিই নাই।”

-“সেলিম! ও এখনও কিছু বলেইনি। তুমি নিজেই বেশি বেশি করছো। তাইলে কি ধরেই নেব, ও সত্যি কথা বলতেছে? সত্য মিথ্যা যাচাই আপনা-আপনিই হবে। তার আগে তুমি শান্ত থাকো দেখি।”

সেলিম থমকে গেল। বড়হুজুর হামজাকে বললেন, “তুমি বলো।”হামজা আবারও ভয়ে

ভয়ে তাকাল সেলিমের দিকে। বড় হুজুর এবার একটা ধমক দিলেন, "বললাম না ও কিছু করবে না তোমার। ভয় নেই কোনো। যা সত্যি নির্ভয়ে বলো। আমি আছি না!"

হামজা ততক্ষণে সফল পুরো উপস্থিত জনতাকে কাবু করে ফেলতে। এবার সে বলল, "মাদ্রাসায় আগুন দেবার জন্য বলছিল আমায়। বলছিল রাতে যেন আসি আমি।"

এবার আর সেলিমকে ঠেকানো গেল না। উড়ে এসে এক ঘুষি মারল হামজার চোয়ালে। ব্যথা ঠিকই পেল হামজা, মাড়ি থেতলে গেল। কিন্তু তার কিশোর শরীরটা পড়ে যাবার কথা না। কিন্তু হামজা খুবই অসহায় ভঙ্গিতে

ইচ্ছাকৃতভাবে মাটিতে পড়ে মৃদু আর্তনাদ করে উঠল।উপস্থিত জনতা এবার পুরোদমে সেলিমের হাতছাড়া হলো। ক্ষুব্ধ চোখে বড় হুজুর সাহেব একবার সেলিমকে দেখে হামজাকে নিজে হাতে তুলে বসিয়ে দ্বিগুন উৎসাহ ও উত্তেজনার সাথে তাড়া দিলেন, বল তো আব্বা! কী বলতেছিলি? সেলিম মাদ্রাসায় আগুন দিতে চায়? কিন্তু কেন? মিথ্যা বলা মহাপাপ, গুনাহ। তুমি মিথ্যা কথা বলতেছ না তো! তোমারে কেমনে চেনে সেলিম? মানে বুঝায়ে বলো তো!

-"আমি সত্যি বললে আপনারা আমায় মারবেন না তো আবার?"

এমন করুণ করে বলল হামজা, সবাই অনুশোচনায় ফেটে পড়ল। একটা পনেরো বছরের কিশোরকে তারা কী নিষ্ঠুরভাবে মেরেছে সব না শুনে।

বড় হুজুর বললেন, "আমি তখন ছিলাম না। এখন আছি। তোমার কোনো ভয় নেই। যা সত্যি সব বলবে। সত্য বললে মারবে মানে? সেটা যত তিতাই হোক। আর মারব না। আমি থাকলে তখনও এই জাহিলগুলো তোমার গায়ে হাত তোলার সুযোগ পাইতো না। এদের মধ্যে ধর্মীয় কোনো চেতনাই নাই। সবগুলা জানোয়ার হয়ে গেছে। বলো তুমি।"

হামজা সুন্দর একটা গল্প বলল। প্রথম কথাটা একটু ইতস্তত করে বলল, “আমি বড়ভাইদের কাছে থাকি।”

সবাই বুঝল, বড়ভাই কারা। হামজা সেলিমকে নির্দেশ করে বলল, “তো উনি সেইখানে যাতায়াত করে।”

সবার চোখ বিস্ফরিত হয় সেলিমের বিশ্বাসঘাতকতায়। সেলিম এবার আর এসে হামজাকে আঘাত করাল সুযোগ পায় না। দুজন যুবক চেপে ধরল সেলিমকে।

হামজা বলল, “ওইখান থেকে আমি তার কাছে জানতে পারি জয় মানে আমার ফুপাতো ভাই এইখানে থাকে। আমি খালি উনার কাছে

জয়ের সাথে দেখা করানোর কথা বলছিলাম।
এরপরে উনি শর্ত দিছেন আমি যাতে উনারে
হেল্প করি।''সবাই বুঝেও আবার জিজ্ঞেস
করল, “কীসের হেল্প?''
হামজা খুব লজ্জিত ভঙ্গিতে, ইতস্তত করে
বলল, “মাদ্রাসায় আ'গুন দিতে...''
চারপাশ নীরব হয়ে উঠল। সেলিম চেঁচিয়ে
যাচ্ছে। হামজার চোখে-মুখে তীব্র ভয় ও
লজ্জা। সেলিমের চেঁচানো কাউকে স্পর্শ
করছে না। তাদের চোখের সামনে ভাসছে
একটু আগে হামজার সাথে করা সেলিমের
আচরণ। অবিশ্বাসের জায়গা রাখেনি হামজা।

সবাই যেন বুঝেও অবুঝ হলো। জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু কেন মাদ্রাসায় আ'গুন দিতে চায়?"

-"আমিও জিগাইছিলাম। কিন্তু বলে নাই আমারে। শুধু বলছে, দরকার।"সেলিম পাগল ষাঁড়ের মতো গর্জন করছিল। কিন্তু ততক্ষণে সবার সব হিসেব মিলে গেছে। সেলিমের সাথে মাদ্রাসার সবার এক প্রকার দ্বন্দ্ব অবশ্যই আছে। সে মাজার পূজারী, বাবার মুরীদ। তার সাথে প্রতিটা হুজুর ও সংগঠনের ছেলেদের তর্কা-তর্কী ও বিরোধের সম্পর্ক। সেলিম তাতে খুব উৎসাহী। যেচে পড়ে মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে গিয়ে তসবীহ জপতে জপতে

বাবার গুনগান এবং তর্কে জড়ানো তার স্বভাব। সবাই শুধু তাকে অনিচ্ছাকৃত সহ্য করে মেজো সৈয়দের শালা বলে। তার গলার তাবিজ, হাতের বালা, আংটি কারও চোখেই ভালো দেখায় না। সবাই এড়িয়ে চলতে চায়। কিন্তু সেলিমের সেসব গায়ে লাগে না। সে তিনবেলা ঘুরঘুর করে মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে। এবং হামজার বলা–বড়ভাইদের সাথে লেওয়াজের ব্যাপারটাও বিশ্বাসযোগ্য হলো। কারণ সেলিমের কাছে মাদ্রাসার কার্যক্রম বিরোধী কর্মকাণ্ড, এটা সবাই জানে। আজ আরও জানল হামজার বদৌলতে, সে জামায়াত বিরোধীদের দোসর।হামজার কাছে

ক্ষমা চাইলেন বড় হুজুর। সেলিমকে সংগঠনের ছেলেরা ধরে কী করতো জানা নেই, কিন্তু বড় হুজুর ঘৃণা ভরে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আঙুলের ইশারা করে তেড়ে দিলেন সেলিমকে। এক বিন্দু সাফাই গাইবার সুযোগ সেলিম পেলো না। সে সাফাই গাইবার জন্য ওখানে থাকলে বড় হুজুরকে টপকেই যুবকেরা সেলিমের হাল বেহাল করে ছাড়তো। তার প্রায় সপ্তাহখানেক পর দেশপ্রেমিকগোষ্ঠীর সাহায্য নিয়ে মাঝরাতে মাদ্রাসার একাংশে আগুন দিলো হামজা। তার এখানে সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। সে জয়কে উদ্ধার করতে এসেছে। কিছু ছাত্র আহতের

ঘটনাও এড়ালো না। যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি এভাবেই হওয়া উচিত বটে। হয়ও এভাবেই। সবাই যখন ছত্রভঙ্গ আকস্মিক হামলায়, তার মাঝে হামজা জয়কে নিয়ে জঙ্গল দিয়ে সীমানা পার। কিন্তু রাতের বেশিক্ষণ নেই। পায়ে হেঁটে হাকিমপুর পার হওয়া অসম্ভব অন্ধকার থাকতে থাকতে। হামজা নিজের ওপর অ'গ্নিকাণ্ডের দায় নেবে না। তা বড়ভাইদের বাহাদুরীর খাতায় উঠে থাক। জয় সেদিন নির্দ্বিধার প্রতিশ্রুতি করেছিল হামজার খাতিরে জীবনটা উৎসর্গ করতে।তিন বছরের অমানুষিক কারাবন্দি অবস্থা, এতিম-অসহায়ত্ব এবং আপনজনহীনতা থেকে মুক্তির অগ্রদূত

হামজা জয়ের ছোট্ট কঠোর বুকটার গোটাটা দখলে নিলো।

দু'দিন পলায়নরত অবস্থায় আড়ালে চলে চলে দুজন শেষমেষ ঘোড়াহাট আমির বাড়িতে পৌঁছাল। আমির বাড়ি ততদিনে মালিকানাহীন বেওয়ারিস সম্পত্তি। অঞ্চলের সবাই জানে গোটা আমির পরিবার মিটে গেছে। জয়নাল আমির ফেরোয়ার আসামি। তার আর ভিটেতে ফেরার প্রশ্ন ওঠে না।

জয়কে ঠেলেও আমির নিবাসের ভেতরে ঢোকাতে পেরেছিল না হামজা। হামজা বুঝেছিল, জয়ের মস্তিষ্কটা মারাত্মকভাবে আহত তিন বছর আগের এই বাড়ির সেই

অবরুদ্ধ নিশীথের প্রভাবে।ঘোড়াহাঁট থেকে বাঁশের হাঁট নেহাত কম পথ নয়। তাদের কাছে পয়সা নেই। হেঁটেই চলতে হবে। পথে খিদের জ্বালায় জয়ের হাঁটু ভেঙে আসতে চায়। হামজা এক কাজ করল। গায়ের মলিন ফতোয়াটা খুলে খালি গা হয়ে ফতোয়াটা মুখে বেঁধে লোকালয়ে গেল। বাজারের শেষে এক জীর্ণ হোটেলের দুটো পরোটা খাবলা ধরে নিয়ে ঝেরে দৌড়। বুড়ো হোটেল মালিক দুটো পরোটার জন্য রোদের ভেতর খুব বেশিদূর ছুটলো না দুই কিশোরের পেছনে। কয়েকটা গালি দিয়ে ফিরে চলে গেল

কিন্তু হুড়মুড়িয়ে দৌড়ে আসার সময় হাতের একটা পরোটা পড়ে গেল, কিন্তু তা তুলতে দাঁড়ানোর সময় নেই। বাকিটা জয়কে দিয়ে হামজা বলল, “খা।”

-“তুমিও। জয় অর্ধেক ছিঁড়ে দেয়।”

একটা ধমক মারল হামজা, “ভালোমানুষ সাজতে আসবি না, জয়। খা চুপচাপ। একটা পরোটাতে দু’দিনের খিদে মেটে না। আর তো অর্ধেক! পেট জ্বলবে। খা তুই।”

জয় ঘাড় ঘুরিয়ে গভীর চোখে তাকায়,“তুমিও তো না খাওয়া, হামজা ভাই!”

হামজা বলল, “আমি রোজা রাখছি।”জয়ের মনে পড়ল। মুস্তাকিন কয়দিন যাবৎ সারাদিন

কিচ্ছু খাচ্ছিল না। সন্ধ্যার পর খেতো। জয় একা সকাল, দুপুরে খাবার খেতে চাইতো বলে সবাই তাকে নিয়ে হাসাহাসিও করেছে। তবু সে খেয়েছে। ক্ষুধা পেলে খেতে হবে। জোর করে হলেও। চুপ থাকলে কেউ খেতে দেয় না। ছিনিয়ে নিলে সব পাওয়া যায়। আজও হামজা তা প্রমাণ করেছে। হাতের পরোটা সেই কথাই বলছে।কিন্তু জয় সেদিন না বুঝলেও পরে আরেকটা কথা বুঝেছিল, দু'দিন একভাবে না খেয়ে রোজা হয় না। সেহরি, ইফতার কিছুই নেই, তবু হামজা যে কেন সেদিন রোজা রেখেছিল! এই জটিল, রহস্যজনক হামজার এসব রহস্যজনক ঋণ

জয় চুকাবে কী দিয়ে? আছে একটা উপায়। নিজেকে দিয়ে। হামজা যা বলে, যা করে সবটা বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়ে।

হামজা জয়কে স্কুলে ভর্তি করল। জয় ক্লাস থ্রিতে পড়ার সময় তার জীবন ঘড়ি আবর্তনের দিক বদলেছে। হামজা জয়কে সিক্সে ভর্তি করল। জয়ের নাদুস-নুদুস অভিজাত চেহারাখানা আজ শীর্ণ, রোদে পোড়া, মার খেয়ে জখম হওয়া, অযত্নে ছাই। শাল কাঠের ডাইনিং টেবিলে বসে নবাবী খানাপিনা সারা জয় আজ দিব্যি শুকনো মরিচ মাখা ও লবণ দিয়ে স্টিলের থালায় গপাগপ এক থালা ভাত খেয়ে উঠতে পারে।হামজার সাধ্য অল্প।

চাঁদাবাজিতে ভাইদের সঙ্গ দিলে কিছু জোটে। কিন্তু রোজ যাওয়ার সৌভাগ্য মেলে না। তার মতো পুঁচকেকে বড়ভাইদের দরকার পড়ে না। হুমায়ুন জয়কে নিয়ে বড় তেতো-বিরক্ত। শাহানা পারলে জয়কে মেরে ফেলে কোনো এক রাতে। কিন্তু হামজা মাকে খুব কার্যকর একটা আগ্রহ দিলো।

জয় আমির বাড়ির সম্পত্তির একমাত্র হকদার। রক্ত মুছে যায় না। আজ না হোক, আগামীতে ওই সম্পত্তি জয়ের। সোজাভাবে না হোক, হামজা যে বাকাঁ পথে পা রেখেছে সেই পথে জমির দখলদারী পরিচিত ঘটনা। সম্পত্তি জয়ের, আর জয় ওদের। ইজ

ইক্যুয়েল– সম্পত্তি তাদের। শাহানার চোখ খুলে গেল। জয় খুব বেশি না হলেও তুলনামূলক কদর পেতে থাকল।কিন্তু অর্থাভাবে সোনার ডিম দেয়া হাসের যত্নও ঠিকমতো করার উপায় নেই। নিজেদের পেট চলে না!

জয় একবার জিজ্ঞেস করল, "তুমি অও রিস্ক নিয়ে আমারে বাচাইছিলা ক্যান?"

-"তোর মায়ের বহুত অবদান আছে আমার উপর।"

-"শুধু এই জন্যেই?"

-"আর কী শুনতে চাস?"

জয় কথা বলল না।

হামজা হাসল, “কী? শুনতে চাস যে আমি তোকে খুব ভালোবাসি, এইজন্য ওই নরক থেকে উদ্ধার করছি তোরে?”

জয় কথা বলল না।

-“শোন জয়! তোর কেউ নেই। আমিও না। কী বললাম বল তো।”

-“আমার কেউ নাই।”

-“তোর কোথাও কেউ নেই।”

-“হ, তুমিও নেই।”

-“হ্যাঁ। নিজেকে ভুললেও এটা ভুলবি না। তোর কেউ নেই। তুই একা। কিন্তু, কিন্তু তোকে বাঁচতে হবে। কীভাবে তা তুই ঠিক করবি। কী করে কী করবি, তা তুই ঠিক

করবি চলার পথে। শুধু জানিস তোকে বাঁচতেই হবে, এবং ভালোভাবে রাজার হালে বাঁচতে হবে। বাঁচার জন্য যা দরকার, তা হাসিল করতে যা লাগে তা ভিতরে সঞ্চয় করতে হবে।''-“সেটা কী?''

হামজা জয়ের কানের কাছে মুখ এনে বলল, “পাগলাটে জেদ, হৃদয়হীন হাসি আর ক্ষমতা অর্জনের নেশা।''

জয়ের মনে পড়ল, বড়বাবাও এসবই বলতো।

-“তোকে আরেকটা কারণে এনেছি।''

জয় আগ্রহ ভরে তাকাল। হামজা বলল, “আমার সঙ্গী দরকার ছিল। আমার তোকে দরকার ছিল, জয়।''

-“কীসের সঙ্গি? কেমন সঙ্গি, হামজা ভাই?”
হামজা কথা বলল না। জয়ের গায়ের গেঞ্জিটা খুলে নিয়ে বলল, “চল আজ তোকে সাতার শেখাবো।”
পুকুরে নেমে জয়কে গোসল করিয়ে দিলো হামজা। সাবান মাখিয়ে, গা পরিষ্কার করে গোসল করিয়ে ঘঁষে ঘঁষে মাথাটা মুছে দিলো। মাথা ভেজা থাকলে জ্বর আসবে।
দুপুরে বাসায় ভাত নেই। জয়কে নিয়ে এক জায়গায় গেল। পথে হাটতে হাঁটতে বলল, “খিদে পেয়েছে তোর?”-“খুব।”
-“চল। আজ যা খাবি, মনে থাকবে। তো রেডি?”

দুজন হো হো করে হেসে উঠল। হামজা আজকাল প্রায়ই এমন সব ব্যবস্থা করে। কী যেন করে হামজা, জয় বুঝেও বোঝে না। হামজার এক বড় ভাই। হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র ছাত্র পলাশ আজগর। জয়কে অনেকক্ষণ পরখ করে দেখেছিল পলাশ। সেদিন জয় প্রথম দেখল পলাশকে। পলাশ ওদেরকে দুপুরে ভুরিভোজ করালো। দু'দিন পর হিলি বন্দর দিয়ে পলাশের মাল আসছে বিদেশ থেকে। হামজাকে পলাশের লোকদের সাথে যেতে হবে। রাজন আজগরের বিশাল ব্যবসা।

হামজা জয়কে সাথে নিলো না। তার পরীক্ষা। ধমকে পড়তে বসিয়ে রেখে নিজে গেল। এবং সেবার ফেরার পর হামজা ব্যাগ ভরে বাজার করে এনেছিল। মাছ-মাংসও এসেছিল বাড়িতে। হামজা সফল হয়ে ফিরেছে। তাদেরকে পুলিশ ধরতে পারেনি।

জয়কে বেরোতে দেয় না হামজা বাড়ি থেকে খুব বেশি। সেলিম ক্ষ্যাপা ষাঁড়। হামজা তার সাথে যা করেছে, তাতে সে জয়কে কেটে খেতে খুব ক্ষুধার্ত। হামজা নিজেকে বাঁচিয়ে নিতে পারবে, জয়ের প্রশিক্ষণ বাকি। হামজা তা দিচ্ছে ধীরে ধীরে।একবার বাড়িতে একটা পুঁচকে এলো। তুলির চেয়ে তিন-চার বছরের

ছোট। জয়ের রাগে গা জ্বলে গেল। তাদের দুটো ঘর। একাটাতে মামা-মামি থাকে। আরেকটাতে ছোট্ট চৌকি। সেটায় তিনজন শোবার জায়গা হয় না। তাছাড়া হামজা দিনদিন আরও লম্বা ও তরতাজা হচ্ছের পূর্ণ যুবক হয়ে উঠছে। জয়ের কিশোর বয়স। তুলিও বড় হয়ে গেছে। এর মাঝে আরেকটা পুঁচকে মেয়ে এসে জুটল।

জয় বাড়ির পেছনে ডেকে নিয়ে গিয়ে ঝুঁটি করা চুল ধরে মোট গুণে গুণে পনেরোটা চিমটি মারল। হুমকি দিলো, যদি না চলে যায় তাহলে তুলে এক আঁছাড় মেরে পেটের নাড়ি বের করে আনবে।

মার খেয়ে পুঁচকে মেয়েটা ভ্যা ভ্যা করে কাঁদতে লাগল। বিপত্তি বাঁধল। মেয়েটা মামির বোনের মেয়ে। এত বিশ্রী করে গাল ফেঁড়ে কে কাঁদে? আবার কাদার শব্দ ধীরে ধীরে বাড়ছে। মুশকিলে পড়ল জয়। আবার একটু মায়াও লাগছে। নরম গায়ে চিমটির আঘাতে লাল টকটকে হয়ে নখ বসে আছে। তার কাছে কিছু টাকা আছে। দৌড়ে গিয়ে দুটো হজমি টেস্টির পাতা, বড়ইয়ের আচার আর দুটো ললিপপ এনে হাতে গুজে দিলো।

-"চুপ কর এই চেংরি চুপ। চিমটি তো মারছিই। এখন কাঁদলে কি চিমটির দাগ মিলে যাবে নাকি আমি আর পরে মারব না এমন

বলেছি? খা, চকলেট খা। তোর জন্যে আমার কত ট্যাকা গচ্চা গেল। এবার কাঁদলে পানিতে ডুবিয়ে মারব।"মেয়েটা ভয়ে কাঁদছে কিন্তু শব্দ করছে না। জয় ঠাস করে থাপ্পর মেরে চলে এলো চকলেট গুলো কেড়ে নিয়ে। উঠোনের এককোণে বসে সবগুলো খেলো চেটেপুটে। কিন্তু হামজা একটা অপ্রিয় কাজ করল। সেই পুচকেটাকেও স্কুলে ভর্তি করে দিলো। এবং তাকে আনা নেয়ার ভার জয়ের। সে জয়ের স্কুলেই পড়ে। সুতরাং জয়ের সাথে যাবে-আসবে। তুলি ঘাড়ত্যাড়া, খিটখিটে। তার বান্ধবী এক পাল। তাদের সাথে নাচতে নাচতে সে স্কুলে আসে যায়।

কিন্তু জয় পারলে পুঁচকেকে খেয়ে ফেলে। রাস্তায় চলার সময় এত পকপক করে কান খায়! জয় ঠুকঠাক লাগিয়েও দেয়, একটু কাঁদে আবার শুরু করে। মহা মুসিবত!
পুঁচকের নাম তরুনীধি। অত বড় নাম কেউ ডাকে না, সবাই ডাকে তরু।জয় জীবনে সপ্তাহে চারদিন স্কুলে যায় না, বড়জোর তিনদিন। রোজ রোজ এক জায়গায় যাওয়াটা কোনো ভালো কথা না। মাঝে একটু গ্যাপ দিয়ে গেলে আলাদা কথা।
স্কুল থেকে ফেরার পথে বেশি লাফালাফি করে রাস্তার মাঝখানে যাওয়া জয় পিঠের ওপর দুম দুম করে দুটো কিল মারল।

বকলোও কয়েকটা। পথে খৈ ওয়ালাকে পেল। তরু নাক টানছে আর বারবার তাকাচ্ছে খৈ-য়ের দিকে। জয় তা লক্ষ করে ভ্রু কুঁচকে। গম্ভীর মুখে গিয়ে খৈ কিনে এনে হাতে দিলো তরুর। তরু সব ভুলে গেছে, চোখ-টোখ হাতের পিঠে মুছে তাড়াহুড়ো করে খৈ খুলছে। তা দেখে হাসি পেল জয়ের। তরুর নাক টানতে টানতে খৈ খাওয়া আড়চোখে দেখল। পথটা সরু। পিচ উঠে উঠে গেছে। সেই রাস্তায় গাড়ির চলাচল নেই-ই প্রায়। সেই রাস্তায় আচমকা কোত্থেকে যেন একটা পটপটে আওয়াজ তোলা ইয়ামাহা বাইক এসে তাদের ছুয়ে যায়। জয় এক লহমা তরুর

হাতের কব্জি ধরে নিজের পেছনে আড়াল করে মাটির ওপর ছুঁড়ে মারল। কিন্তু বাইক জয়কে ছিটকে ফেলে দিয়ে চলে যায়। জয়ের পাতলা দেহটা গিয়ে মাটির রাস্তার ওপর পড়ে মাথার পেছনটা শক্ত ইটের খোয়াতে লাগায় ঘাড় বেয়ে তরতর করে রক্ত বেরিয়ে এলো। বাইকটা পাশ দিয়ে একাংশ ধাক্কা মারতে সক্ষম হয়েছে জয়ের তাৎক্ষণিক সচেতনতায়। নয়ত সেদিন বাইকওয়ালার উদ্দেশ্য সফল হয়ে যেত।

জয়ের আসল জখম ডাক্তার জানালেন। বাম পায়ের হাঁটুর অস্থি-সন্ধি খুলে গেছে। আর একটু হলে জোড়া লাগানোর উপায় থাকতো

না। অথচ জয়ের বর্ণনা মতে তার কিছুই হয়নি। সে অধচেতন পড়ে রইল নিভু চোখে। মৃত্যু এসেছিল। জয়কে পরম যত্নে ছুঁয়ে গেল। এই তো জয় ঝাপসা চোখে আবার মৃত্যুর স্পর্শ পেল। অথচ মৃত্যু সেদিনও জয়ের সাথে ছলনা করে ছুঁয়েই পালালো। সঙ্গে নিলো না। ব্যন্ডেজ করার আগে জয়ের পায়ের হাড্ডি সোজা করতে যখন চাপ দেয়া হলো জয় গা শিউরে ওঠা স্বরে 'মা গো' বলে একবার চিৎকার মেরে অজ্ঞান হয়ে গেল। সেদিন সেই পুঁচকে মেয়ে কী কান্নাটাই কেঁদেছিল! লুটিয়ে পড়া কান্না। তার নিজের হাঁটুর মাংস ছিলে গেছে, তার ব্যথা তরু টের পাচ্ছিল না।

চিৎকারটা জয়ের নয় তার নিজের। বড় ভয় পেয়েছে মেয়েটা।

কিশোর জয়ের শরীরটা প্রায় ব্যান্ডেজে মুড়ে গেল। রাত এলে অসহনীয় যন্ত্রণায় তার কাতর আর্তনাদে সবার ঘুম হারাম। তবু সবাই ঘুমায়। কিন্তু পুঁচকেটা জয়ের সাথে রাত জাগে। জয় ধমকায়, কখনও ঠুকঠাক মারেও। তবু বসে থাকে। ব্যথায় জয়ের শরীরে জ্বর আসে। তরু বিশাল টিনের বালতি ভরে একা পানি আনতে পারে না। ভয়ে ভয়ে গিয়ে হামজাকে ডাকে। হামজা পানির বালতি ভরে এনে দেয়। তরু সারারাত জয়ের মাথায় পানি ঢালে। হামজা বসে বসে দেখে।হামজা

আন্দাজ করেছিল, এরপর জয় একগাল হেসে জানালো, "বাবরি চুল দেখছি বাইকওয়ালার। বহুত খাস লোক সে আমার, হামজা ভাই। চিনতে ভুল হয় নাই। আল্লাহর বান্দা পরহেজগার সেলিম ফারুকী!"

হামজা হাসল, "ধরব ধরব। একদিন ধরব, সেদিন খুব ছটফটাবে পাখি।"

-"আজ ধরবা না?"

-"ধরি মাছ না ছুঁই পানি। বাংলা বইয়ে পাবি এই প্রবাদ।"

জয় তাকিয়ে রইল। হামজা বলল, "একটু শক্তিশালী না হয়ে ধরলে মনের খায়েশ মিটিয়ে নিতে পারা যাবে না। আমার ফুপুটা

অকারণে বলি হয়নি জয়। ওদেরকে ধরে একটু তৃপ্তি সহকারে গিলবো বলেই তো ফুপুর এতবড় বলিদান। কাউকে গিলে তৃপ্তি না পেলে মারাটা বৃথা। কারণ মারাটা বড় কথা না, মনের অপূর্ণ তৃপ্তি মেটানো হলো কথা।তুই অপেক্ষা কর জয়। এই যে তুই আরেকটু ব্যথা শুষলি, এতে ওর ব্যথার ভাগের সুদ আরেকটু বাড়ল।"

মন্ত্রপুতের মতো বলল জয়, "কবে? কবে খাবে?"

-"যেদিন সাপ মারব কিন্তু লাঠি ভাঙবে না। পরিস্থিতি আরেকটু নিয়ন্ত্রণে আসুক। সৈয়দ বাড়ির সাথে আমার দুশমনীর খবর সৈয়দ

বাড়ি এত তাড়াতাড়ি পাবে না। বহুত কিছু হারানোর পর আমাকে টের পাবে। তুই আরেকটু অপেক্ষা কর। আর একটু!"

জয়নাল আমির ফেরোয়ার হয়েছেন পাঁচ বছর খানেক। এর মাঝে জয় বহুবার বড়বাবাকে খোঁজার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পায়নি। কিন্তু কিছুদিন আগে সে জানতে পেরেছে বড়বাবার একটা সন্তান হয়েছে। ছেলে সন্তান। জয়ের খুব হিংসে হলো। এখন কি বড়বাবার ভালোবাসা ভাগ হয়ে গেছে? এত বছর পরও যদি বড়বাবার সাথে জয়ের দেখা হয়, বড়বাবা পনেরো বছরের কিশোর জয়কে চিনবে? আগের মতো বুকের সাথে জড়িয়ে

চেপে ধরবে? আচ্ছা বড়বাবা নিজের ছেলেকে কি জয়ের মতো করে ভালোবাসে?জয়ের ভেতরটা যে পুলক ও শিহরণে তিরতির করছে তা জয় বুঝল না। লোকে তাকে জারজ বলে, নির্বংশ, লেজকাটা বলে। জয় কবে বড়বাবাকে মুক্ত করে সবার সামনে দাঁড় করিয়ে বুকে হাত রেখে বলবে, আমির পরিবার নির্বংশ হয়নি, হবে না। দেখ জয়নাল আমিরকে। দেখ জয়নাল আমিরের পুত্র জিন্নাহ আমিরকে, দেখ আমি, আমাকে। আমি, আমি জাভেদ আমিরের পুত্র জয় আমির। এখনও জীবিত। আমির বংশের জ্বালতে থাকা

কয়টা বাতি চাস? দেখ এখনও তিনটে জীবিত!

এসব ভেবে জয়ের ভেতরে বড়বাবার সেই ছোট্ট সন্তান, আমিরদের বংশধর বাচ্চা জিন্নাহর জন্যও তার বুকের কোথাও আলোড়ন ওঠে।জয় পাগল হয়ে উঠল বড়বাবাকে খুঁজতে। কিন্তু খুব সাবধানভাবে। বড়বাবা ফেরোয়ার, মোস্ট ওয়ান্টেড ক্রিমিনাল। তাকে ক্রস ফায়ারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

কিন্তু জয় সুযোগ পেল। সেই সুযোগ রাজন আজগর করে দিলো। কারণ রাজন আজগরের দাদা বৃদ্ধ হবার পরেও তার নামে

মামলা, যুদ্ধের লুটপাট ইত্যাদিন মামলা অসংখ্য। বাংলাদেশ গঠনের পর ত্রাস গড়তে প্রথম প্রজন্মের সন্ত্রাস সে।২০০২ সন। অপারেশন ক্লিনহার্ট এক্টিভ পুরোদেশে। বাদ যাচ্ছে না সেনাবাহিনীর কবল থেকে একটি অপরাধীও। তাদের মারফতে জয়নাল আমির পলাশদের মদদে জয়ের সঙ্গে দেখা করবেন। জয় খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিলো। তার বড়বাবাকে সে কমবেশি আট বছর পর দেখবে।

কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম ঘটল। পলাশ আজগরের দাদা বন্দি হলো। আর জয়নাল আমির ক্রস ফায়ারড। সংবাদটা এমন

সাবলীলভাবেই জয়ের কানে এসেছিল। এবং আরেকটা সংবাদ খুবই চমকপ্রদ ছিল। সেনাবাহিনীর প্যারা-কমান্ডো ব্যাটেলিয়ন সৈয়দ ফরহাদ মহম্মদ বারীর নিক্ষেপিত গুলিতে প্রাণ গেছে মোস্ট ওয়ান্টেড ক্রিমিনাল জয়নাল আমিররে।জয়ের বয়স তখন পনেরো। সন ২০০2। জয়নাল আমিরের মৃত্যর ঠিক নয়দিন পর জয় নিজে হাতে সৈয়দ ফরহাদ মহম্মদ বারী সাহেবের খু-ন করে ফেলল। বুক চিড়ে হাত ঢুকিয়ে হৃদযন্ত্র টেনে ছিঁড়ে এনেছিল। সেটাকে ছুরি দিয়ে কেটে কয়েক টুকরো করে মৃতদেহের পাশে রেখে এসেছিল।ফজরের আজান পড়ছে

কোথাও বা। কিন্তু বড়ঘরে শব্দ, আলো, বাতাস প্রবেশ নিষেধ। দেয়াল পুরু, মেঝে সমতল থেকেও বেশ কয়েক ফুট নিচে। মুরসালীন শরীরের ব্যথায় ঝিমিয়ে বসল। জয় থেমে গেছে, তার গল্প বোধহয় শেষ! সে ক্লান্ত হলেও খুশি। তার একটা কারণ আছে। সে যতবার ফরহাদ মুহাম্মাদ বারীকে মারার বিষয়টা মনে করে, সে ভীষণ খুশি অনুভব করে। এইমাত্র সেই কথাটা বলার ফলে ভেতরে খুব খুশি অনুভূত হচ্ছে।

একবার রূপকথা বলেছিল, ‘অন্তূ! যতদিন তুমি জীবিত আছো, কোনো অভিজ্ঞতাকেই চূড়ান্ত ভাববে না। মৃত্যু মুহুর্তেও তোমার

চিরস্থায়ী একটি ধারণা ভেঙে যেতে পারে।' কথাটা ভুল নয়। অন্তূ আজ গল্প শুনতে শুনতে উপলব্ধি করেছে বিষয়টা। সে জানতো সে চিরতরে আবেগহীন হয়ে পড়ছে। কিন্তু আজ তার বিপরীতে একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটেছে।

জয় যতক্ষণ কথা বলেছে, জয়ের দৃষ্টি আঁটকে ছিল ঢালাই মেঝেতে। জয় আমির একটাবারও যদি অন্তূর দিকে তাকাতো, দেখে ফেলতো, অন্তূ আজও কাঁদে। অন্তূ যে হাতে ঘন্টা কয়েক আগে আগ্নেয়াস্ত্র চালিয়েছে, জয়েদের গল্প শোনার সময় আজ অন্তূর সেই হাতদুটোও শরীরের সাথে থরথরিয়ে কেঁপেছে,

চোখ লাল হয়ে তারপর ভিজেও উঠেছে!
এসব দেখে ফেললে কী বিশ্রী ব্যাপার হতো!
কিন্তু এখন অন্তূর কান্না পাচ্ছে না।
জয় আমির কখনোই এক বিন্দুতে স্থির থাকে না। সে প্রতিক্ষণে তার রেখা বদল করে। এক মুহুর্তে তাকে শিকার মনে হলে পরের মুহুর্তে শিকারী লাগে। এই দ্বিধাটা অসহ্য জয়ের চরিত্রে। এই দ্বিধা অন্তূ আগে কখনও কারও চরিত্রে টের পায়নি।
সে জয়কে জিজ্ঞেস করল, "আপনি মেরে ফেললেন ফরহাদ চাচাকে?"জয় মাথা নাড়ল, "মেরে ফেললাম।"
-"কেন মেরে ফেললেন?"

জয় চোখ চোখ তুলে তাকাল, “কেন? আসলেই তো! মারলাম কেন?”

-“তিনি আপনার চাচাকে মেরেছিলেন তাই।”

-“ওহ হ্যাঁ। সে আমার বড়বাবারে মারছিল তাই।”

-“তিনি আপনার বড়চাচাকে কেন মেরেছিলেন?”

জয় সায় দিলো, “আরেহ! সেটাই তো! কেন মেরেছিলেন?”

অন্তূ ধমকাল, “ইয়ার্কি নয়। ফরহাদ চাচা জয়নাল আমিরকে কেন মেরেছিলেন?”

জয় হাই তুলল একটা। সে বিশাল ক্লান্ত। অন্তূ বলল, “আমি বলব? আপনি নিতে

পারবেন তো? নাকি ক্ষমতা উগড়ে আসবে?
''-"আসবে না। আপনি বলুন, উকিল
মহোদয়া!''
-"কারণ আপনার চাচা একজন সন্ত্রাস
ছিলেন। পরে যখন আমির নিবাস থেকে
নিজের বাপ-ভাইকে মারার অপরাধে তাকে
গ্রেফতার করা হয়, সেটা অপবাদ হলেও উনি
আপনার নিষ্পাপ চাচা নন।''
জয় ছাদের দিকে তাকিয়ে হাসে, "শুরু করলে
উকালতি!''
-"জি না। এখনও ল তেই ভর্তি হইনি। অত
জ্ঞান বা দক্ষতা নেই আমার। সাধারণ জ্ঞান।
সেক্ষেত্রে আমি কি ভুল বলেছি?''

-“নাহ তো!”

-“আপনার হেঁয়ালি আমাকে অস্থির করে তুলছে। আপনি কথা বলুন, স্পষ্ট কথা।”

জয় বিজ্ঞের মতো মাথা দুলালো, “তুমি আমাকে অভিযোগ করতে বলতেছ?”

-“যদি বলি?”

-“পারি না।”

অন্তূ গর্জে উঠল, “আপনি নিজেকে আবদ্ধ করে রেখেছেন। মানুষকে আপনার ব্যাপারে কখনোই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে দেন না। আল্লাহর কসম, আপনি আজ হেঁয়ালি করলে আমি বিনা বিবেচনায় রুহ বের করে নেব আপনার।”

জয় সামান্য হাসল। অন্তূ মাথা নাড়ে, "হাসবেন না। এভাবে হাসবেন না আমার দিকে তাকিয়ে।"
জয় ঠোঁটে আঙুল রাখল, "ঠিকাছে। হাসব না। আমার একটা কনফিউশন আছে।"-"হু!"
জয় ফিসফিস করে বলল, "অর্থাৎ তুমি আমার সব জেনে তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে এতদিন কাটালে? 'মারবে না ছাড়বে! হ্যাঁহ? কেন মারবে? জয় আমির কেমন, কেন এমন? ' এত কৌতূহল কীসের আপনার, ঘরওয়ালি!"
অন্তূ কণ্ঠ নিচু হলো, "এমন জলজ্যন্ত এক ঢেউ, যা সবকিছু ভাসাতে সক্ষম, তার ভাসার গল্প জানতে একটু কৌতূহল জায়েজ!"

জয় হাসিমুখে একটা ঢোক গিলল। এতে তার পুরুষালি গলার উঁচু স্বরনালীর এপলসটা উঠানামা করে উঠল একবার। সেখানে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বড় মোহনীয়, সৌম্য, অভিজাত পুরুষ লাগে তাকে মাঝেমধ্যেই! জমিদারীর রক্ত রক্তের দায়ে ধুয়ে আলকাতরা হলেও তা ভুলেভালে রঙ চকচক করেই ওঠে বোধহয়! জয় আলগোছে অন্তূর হাতদুটো নিজের বাহু থেকে ছড়িয়ে নিজের দুই হাতের মাঝে নিয়ে খেলতে খেলতে বলল, "এত পেরেশান কেন হচ্ছ? হু!''অন্তূ জয়ের চোখে তাকাল। খুব খেয়াল করলে দেখা যায়, জয় আমিরের চোখের মণি অতিরিক্ত কালো, একদম

কৃষ্ণগহ্বরের মতো। যেখানে আলোও অস্তিত্বহীন।

অন্তূ নজর স্থির রেখে ধীর আওয়াজে বলে, “আমি প্রথমরাতে যখন আপনার কাছে নিজেকে সমর্পন করেছি, আপনার ভেতরে প্রবেশ করার উদ্দেশ্যে। পুরুষের উত্তেজনায় নারী তাকে পুরোদমে শোষণ করতে পারে। আমি সেদিন এক অসুস্থ জয় আমিরকে পেয়েছিলাম। যার ভেতরটা শূন্য, কিন্তু পুরু দেয়ালে ঘেরা! সেই দেয়ালের গণ্ডির সীমানায় প্রতিক্ষণে ফাঁপা হাহাকার ছিটকে বেড়ায়। কিন্তু সেই পুরু দেয়াল তা বাইরে আসতে বাঁধা দেয়!”

-“কে বলে তুমি উকিল হবে? আমি বদদোয়া দিলাম, তুমি দুনিয়ার সেরা, বিশাল, বিরাট, অনেক বড়, বৃহত্তম, মহান সাহিত্যিক, কবি, দার্শনিক হবে। এখন বলো বদদোয়া কেন দিলাম?’’

-“কারণ আপনার দোয়া কবুল হবার চান্স নেই।’’দুজন দুজনের চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। পর মুহুর্তেই চোখ নামাল, দুজনই। জয় ঝুঁকে পড়ে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করে, “আর অসুস্থ জয় আমিরের কাছে আপনার সেদিনের বলিদান আপনাকে কী জানালো?’’

-“আর সেদিনের আমার সেই বলিদান আমাকে শুধুই জানিয়েছে, ‘জয় আমিরকে জানতে হবে।’ গোড়া থেকে। আমি আপনার চঞ্চল পাপীষ্ঠ সত্ত্বার পেছনে আরেকটা জয় আমিরকে খুঁজেছি। অথবা আমি সেদিনই পারতাম আপনাকে কুচি কুচি করে কাটতে। কিন্তু আপনি জানেন, আমি আপনাকে কখনোই মারার চেষ্টা করিনি। উত্তেজিত করেছি, অতিষ্ঠ করেছি, ক্ষেপিয়ে তুলেছি কিন্তু চূড়ান্ত আঘাত করিনি। আজকের এই দিনটাকে নিয়ে আসতেই হয়ত এত আয়োজন।

অথচ আজ এই মুহূর্তেও আমার মনে হচ্ছে, আমি সেখানেই পড়ে রইলাম। দ্বিধা, জটিলতা, মারপ্যাচ, অস্থির সিদ্ধান্তরেখা... এখনও মনে হচ্ছে, আপনার বিচার করা যায় না, আপনাকে বিচার করা যায় না। বহুদূর হিসেব করে ফিরেও হঠাৎ চোখ মেললে দেখা যায় আমি সেই একই বিন্দুতে আঁটকে রয়েছি—কে জয় আমির? কেমন সে? কেন এমন সে? তার দায়ভার কীসের ওপর ন্যাস্ত করা যেতে পারে? এমনটা হবার ছিল না।কিন্তু আমি বিবেচনার বিন্দু হারিয়ে ফেলছি। আপনার এত এত পাপ, প্রাপ্ত আঘাত আর ক্রমিক ঘটনাবলী এক বিন্দুতে শান্ত হচ্ছে না। তার

ওপর আপনার আজব ব্যক্তিত্ব! যতটুকু খুলছি, ততটুকুই পেঁচিয়ে যাচ্ছে।

তবে একটা কথা উল্লেখযোগ্য, আজ এখন আমার ব্যক্তিগত দেনা-পাওনা আমি পাশে রেখেছি। তা আমার-আপনার একান্ত হিসেবের খাতায় জমা থাক আপাতত।''

জয় মাথা নাড়ল দু'পাশে, ''মেরে ফেলো। শ্যুট মি! গুলি দেব? লোডেড ম্যাগাজিন আছে মনেহয় একটা পকেটে। এইটা অটো-সেমি মাল। একবার ম্যাগাজিন লোড করবে, এরপর ব্যাস বুম বুম বুম! দেব, দেব, সিস্টার? জটিলতাকে জিইয়ে রাখা মানেই কসরত। উড়িয়ে দাও। বিদ্রোহ করো! ভেঙে

ফেলো আমার ভিত। চ্যাড়াব্যাড়া করে দাও একদম খুলি-টুলি!”অন্তূ তাকিয়ে রইল কেমন করে যেন জয়ের দিকে। একটু বিরক্তি, একটু কৌতূহল, হয়ত কিছু ঘৃণা অথবা বিরোধ কিংবা অনুরাগ হবে হয়ত! জয় মেঝের দিকে চেয়ে থেকে হাসল, “উহুহু! এভাবে তাকিয়ে থেকো না, ঘরওয়ালি!”

অন্তূর স্বর বিরক্তিতে মিশে কঠিন হলো, “হু? কেন?”

-“আমার মনে হবে তুমি আমার অতীত শোনার পর আমার দুঃখে দুঃখিত হয়ে আমার উকালতি করতে চাইতেছ। অবশ্যই তুমি অনেক বড় উকিল হতে পারো, কিন্তু জয়

আমির তোমার মক্কেল হতে পারে না, ডিয়ার! ’’ জয় চোখ তুলে চট করে একবার চোখ মারল।

অন্তূ হাসল। চোখ সরিয়ে বলল, “অবশ্যই আপনি অনেকবড় ক্ষিপ্র বাজ হতে পারেন, কিন্তু আপনার পোষ মানার ক্ষেত্রটার আমাকে ঘিরেই হতে পারে। আর বাজপাখি পোষ মানলে সে তার পোষকের আওতায় শিকার করে।’’

চট করে অন্তৃ কথাটা ধরাতে না দেবার লক্ষ্যে দ্রুত প্রসঙ্গ বদলালো, “সন্ন্যাস গ্রহণ করলেও পারতেন। কারও দয়া, উপদেশ, আদেশ,

অনুরাগ, ভালোবাসা...সবকিছু থেকে মুক্ত হয়ে লুঙ্গি ছেড়ে শালু গায়ে দিয়ে বেড়াতেন!”

জয় আচমকা মাথা ঝারা মেরে হেসে উঠল, কিছু একটা এড়িয়ে হাসল, “হু! করব! তোমার একটা ব্যবস্থা করে ডিরেক্ট বাম ভোলে! হক মওলা! ধরো কলকি মারো টান..”অন্তূ বিরক্ত হয়ে আলতো ঝারা মেরে নিজের হাত ছড়িয়ে নিয়ে দৃঢ় গলায় মুরসালীনকে জিজ্ঞেস করল, “সেলিম ফারুকী যা করেছিল, তা আপনার পিতা জানতেন?”

-“কখনোই জানতে পারেননি। আমি জেনেছি কথাটা সেলিম ফারুকীরও মৃত্যুর পর।”

-“অতদিনেও জানলেন না কেন? সন্দেহ হয়নি কেন কখনও?”

-“হামজা ভাই যা বলে এসেছিলেন, তারপর আর কখনও মাদ্রাসার ত্রি-সীমানায় প্রবেশ করতে পারেনি সেলিম।”

-“তার আগেও সন্দেহ হবার কথা। আর যতদিনে মেয়র সাহেব গিয়ে তামাশা করে এলেন ততদিনের জয় আমিরের ওখানে থাকার তিন বছর হয়ে গেছিল। হুমায়িরা মায়ের সঙ্গে যা হয়েছিল, তার কোনো তদন্ত তিন বছরের মাঝেও কেন করেননি আপনারা?”জয় মুখ ভেঙচালো মনে মনে, “শালির মেয়ে স্বামীকে স্বামী মানে না, অথচ

তার মাকে মা ডাকে। শালি ভন্ডর ঘরের ভন্ড! তোর পেছনে কুত্তা ছেড়ে দিয়ে দৌড়ানি দিলেও মনের দুক্কু মিটবে না।''

মুরসালীনের মেরুদন্ডে কঠিন ক্ষত। সে দেয়ালে হেলান দিলো তারপরও, চোখ বুজে বলল, "ঘরের শত্রু বিভীষণ হয়ে গেছিল। আব্বা কোনোদিন ভাবতেও পারেনি, সেলিমকে ধরে জিজ্ঞেস করলে সব জানা যেতে পারতো। ''

অন্তূ বলল, "যুক্তি দূর্বল লাগছে। তার সঙ্গে আপনাদের শত্রুতা ছিল, হোক সেটা ধর্মীয়ভাবেই। উনার পথ আলাদা ছিল। উনি ভন্ডদের অনুসারী ছিলেন। তবু আপনাদের

সন্দেহ হলো না! আর আমার ধারণা, উনিই এসে আপনাদেরকে খোঁজ দিয়েছিলেন জয় আমির ও আম্মার ব্যাপারে।''-“ঠিক।''

-“সেটাকে কীভাবে নিলেন আপনারা?''

-“সেলিম কোনোভাবে জানতে পেরেছিল, আমিরদের বউয়ের ওই অবস্থা–এমনটাই জানিয়েছিল সেলিম। আব্বা জানতো, ও-ই জয়কে উদ্ধারকারী। ওর দিকে সন্দেহটা না যাবার এটাই একটা কারণ।''

-“আরেকটা বিষয়, জয় আমিরকে সেদিন জবাই করার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু উনার আম্মা মরে গেলে অথবা মেরে ফেলা

হলেও পরে জয় আমিরকে কেন জীবিত অবস্থায় জঙ্গলে ফেলে রাখা হলো? কেন?

-“এটা আমি পরে জানতে পেরেছি। জয়নাল আমির গ্রেফতার হবার খবর পুরো দিনাজপুরে তোলপাড় হয়ে জানাজানি হলো। কিন্তু জয় ও ওর মাকে ধরার জন্য বেশ কয়েকটা দলের সাথে সাথে রক্ষার জন্য আবার রাজন আজগরের লোকজন জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়েছিল সেদিন। পায়নি ঠিকই। তবে ভয় পেয়ে ছেড়ে দিয়েছিল সেলিমরা। পরে জঙ্গলে ফেলে যায়। এবং বলাই বাহুল্য, সন্ত্রাস সংগঠনে জয়নাল আমির ও আজগরেরা দোসর ছিল। এবং এজন্যই সেই কৃতজ্ঞতায় এই মাতাল আজও

চাটে ওদেরকে।''জয় দুম করে লাথি মারল মুরসালীনকে, "টিনের চালে কাউয়া, তুমি আমার শাউয়া! বিটিরশালী, তোর মাকে কিন্তু যখন-তখন সালাম দিয়ে আসব। তোর ফ্যাদা প্যাচালে রাত গেল। কথা কম ক, আর আস্তে ক। আমি একটু ঘুমাই। গুড নাইট।'' সে লোহার সাথে মাথা ঠেকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। খুব ঘুম পাচ্ছে তার।

মুরসালীন ব্যথা পাওয়া স্থানে হাত চেপে ধরে বলল, "এবং একটা কথা বলে রাখা দরকার, এই পাগলা কিন্তু এখনও মানে সেলিমসহ ওর সঙ্গিদেরকে সৈয়দ বাড়ির নির্দেশে পাঠানো হয়েছিল সেদিন রাতে আমির বাড়িতে।''

জয় বলল, "হক কথা দিনে ছত্রিশবার স্মরণ করা যায়।"

মুরসালীন বলল, "তুই না মরে গেলি এই মাত্র!"

-"ধুর শালা। এত তাড়াতাড়ি তো মাইনষে মুতেও না। মরব মানে ঘুমাবো কেমনে?"

মুরসালীন অন্তূকে জানালো, "আব্বার খুব অনুগত ছিল সেলিম। আরেকটা বিষয় আছে।
"

অন্তূ জিজ্ঞেস করল, "কী বিষয়?"-"সেলিমের বড়বোনকে কিন্তু জয়নাল আমিরের সঙ্গীরা ইজ্জতহারা করে মেরেছিল যুদ্ধের সময়। সেজন্য সেলিম ফারুকীর পরিবারের কাছে

আব্বা বংশের বড় ছেলে হিসেবে একটা দায়বদ্ধতা ছিল। সেলিমের ছোট বোনকে আমার মেজো চাচা বিয়ে করেছিলেন দোষ ঢাকতে। নয়ত যেমন জয়নাল আমির ভাবতেন আমাদের মাদ্রাসা আমার দাদু মিলিটারীর জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন, ফারুকীরাও ওরমকম একটা ভুল বুঝতে খুব তৎপর ছিল। ওরা ভাবতো, আমার পরিবার নিজেদের কোনো পাপে এতগুলো প্রাণ হারিয়েছে জয়নাল আমিরের হাতে।"

আরেকটা ব্যাপার ছিল—জয়নাল আমিরের প্রিয় ভাতিজা জয়কে আব্বা আশ্রয় দিয়েছিল, এ নিয়েও ঘোর আপত্তি ছিল। সে বারবার

আব্বার কাছে মিনতি করেছে, জয়কে বের করে দিতে। কিন্তু আব্বা জয়কে কাছছাড়া করেননি কখনও। এ নিয়েও একটা সন্দেহ ছিল ওদের। ওদের ধারণা ছিল, সৈয়দ পরিবার বোধহয় জয়নাল আমিরকে দোষী মানে না। কোনোভাবে বাচাতে চাইছে। ক্ষমা-টমা করে দিয়েছে। এজন্য জয়ের পক্ষ হয়ে অথবা জয়ের মায়ের বিচারের জন্য ওদের সঙ্গে কোনো আলাপে আব্বা যেতে পারেননি খুব একটা।''অন্তূ মাথা নাড়ল, "কিন্তু ফরহাদ চাচা কেন জয় আমিরকে কাছছাড়া করতে চাননি?''

-“ওকে জীবিত রাখতে। সেই সময় ওকে ছাড়লে লোকজন মাংস আকারে কেটে পিস পিস করে বাড়ি নিয়ে যেত। ওকে মারার জন্য কতগুলো দল ওকে খুঁজছিল, ও আজও জানে না। ও যখন হামজা ভাইয়ের কাছে এলো, তখনও কতবার টপকে যেতে যেতে বেঁচেছে, সেই গল্প তো বলেনি এখনও।

কিন্তু সেলিম রোজ একবার করে মিনতি করতো আব্বার কাছে, জয়কে মাদ্রাসা থেকে মুক্ত করার জন্য। তখন জানতাম না– কেন? পরে জেনেছি, সে ভয় পেতো, জয় কখনও তার উপস্থিতি ছাড়া আব্বার কাছে পৌঁছে তার মায়ের ঘটনা বলে না দেয়। তার উদ্দেশ্য

ছিল, জয়কে একবার মাদ্রাসা থেকে বের করতে পারলে চিরতরে জয়ের মুখটা বন্ধ করে দেবে, আর আমির বংশের সমাপ্তিও। আব্বা বাড়ি এলে সেলিম আব্বার সাথে লেগে থাকতো। জয়কে জিজ্ঞেস করুন, সে কখনও সেলিমকে ছাড়া একা আব্বার কাছে যাবার সুযোগ পেয়েছে কিনা!''

অন্তূ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। পরে বলল, ''আপনার আব্বা জয়কে রক্ষা করতে চেয়েছেন সেলিমসহ বাকি শত্রুদের হাত থেকে, এটা বলতে চাইছেন?''

মুরসালীন জবাব দেবার আগেই জয় এক চোখ খুলে বলল, ''অ্যাঁহ? উকিল সিস্টার,

আপনে ওই শালার ছেলের কথা দিলে নিয়েন না। আসলে ওর বাপে আমারে জঙ্গি বানাইতে চাইছিল। কিন্তু আমি নেহাত ভালো লোক, তাই ফাঁদে পা দেইনি। ধন্যবাদ। গুড নাইট!"

মুরসালীন শান্ত চিত্তে হাসল, "ওইটা লীগ না, জয়! সংখ্যা বাড়াতে কুত্তা-বিলাইও জয় বাংলার সৈনিক হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তুই যাদের কথা বলছিস, তারা কারা তোর একটু হলেও ধারণা আছে। তোর মতো কাফেরকে ওরা সংগঠনে নেবে, এটা স্বপ্নও হতে পারে না।একটা মজার কথা শুনবি? এই যে তোরা আমাকে সংগঠনের ছেলে ভাবিস না! আমাকে ওরা গ্রহণই করেনি। মুস্তাকিন ছিল ধার্মিক।

কিন্তু আমি জন্মেইছিলাম গাফিল হয়ে। তুই চলে আসার দুই বছর পরেও আমার দ্বারা হিফজ্ হলো না। আব্বা রাগ করে আমার হাল ছেড়ে আমাকে জেনারেল স্কুলে ভর্তি করলেন। মুস্তাকিন যতটা ধার্মিক, ন্যায়পরায়ন, সভ্য ছিল; আমি ততটাই বিমুখ হলাম। মুস্তাকিন ভাই চলে যাবার পর আমাকে শুধু মাদ্রাসা কমিটির দায়িত্বে রাখা হয়েছে ঠেকায় পড়ে। কারণ সৈয়দদের মাঝে এক আমিই আছি। তুই আর কতটা মূর্খতা প্রকাশ করবি? যেখানে আমি চান্স পাইনি, সেখানে ওরা তোর মতো একটা অবিশ্বাসীকে দলে রাখতো? আব্বা তোকে শুধু মানুষ

বানাতে চেয়েছিলেন। ধর্মের প্রতি তোর যা ভয়ানক ধারণা জন্মেছিল, তা অপসারণ করতে চেয়েছিলেন। ছোট্ট বয়সে তোর ভেতরে যে বিষ ঢালা হয়েছিল, তা নিংড়ে নিতে চেয়ে আব্বা বড়ো মাশুল গুণেছে জয়। তুই ভালো প্রতিদান দিয়েছিস!"

জয় উঠে বসল। যেন খুব চেঁচামেচিতে তার ঘুমটাই ভেঙে গেছে। সে খুব অবাক হয়ে বলল, "আরেস্সালা! এত মহানুভবতার গল্প একসাথে শুনে বদহজম হয়ে যাবে তো! তুই আমার একটা কথা শুনবি, মুরসালীন?"

মুরসালীন সোজা হয়ে বসল, "আমার কান তোর নামে কোরবান!"

জয় বলল, “তুই কি জানিস–দোষ আর পাছা এক জিনিস। মানুষ নিজেরটা ছাড়া সবারটা দেখে।”-“যেমন তুই।”

-“চুপ থাক শালা!”

মুরসালীন কিছুক্ষণ চোখ বুজে থেকে মুচকি হাসল, “তুই কি জানিস, জয়! একজন প্রতিশোধপরায়ন মানুষ একটি কাচা মাটির স্তুপ। সুযোগ সন্ধানী মানুষ চাইলেই সেই মাটিকে দিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো হাতিয়ার বানিয়ে ব্যবহার করতে পারে নিজ স্বার্থে। মাছ ধরবে পানি ছুঁবে না। পানি ছুঁবে সেই হাতিয়ার। তুই জানিস জয়, হাতিয়ারের চোখ থাকে না। হাতিয়ার অন্ধ হয়। তাকে

চালনাকারীর চোখ দিয়ে সে শত্রুকে দেখে আঘাত করে।''-“তুই কি আমারে কইলি?''

-“নাঃ! তুই একটা জয় আমিরের গল্প শোনালি, আমি তাকে বলছি।''

-“দে আজ তুইও জ্ঞান দে। হাতি নদে পড়লে চামচিকায়ও পেছন মারে।''

-“তুই নদে পড়েছিস শুনে ভালো লাগল। কিন্তু তুই তো হাতি না, তুই হলি গাধা। যাহোক, তুই ঘোষ্ট-রাইডার সিনেমা দেখেছিস, জয়?''

-“হ।'' জয় মাথা নিচু করে হেসে ফেলল। তা দেখে মুরসালীনও হাসল। মুরসালীন যা বোঝাতে চাইছে, তা এক লহমায় বুঝে হেসে

ফেলেছে জয়। তাতে মুরসালীন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “আব্বা বলতো, আমি যে জয়কে ছাড়বো! আমার মনে চায় ওরে ভালো একটা তালিম দেই। দেশ-জাতির ভবিষ্যতে লাগাই ওর মাথাটারে। জাভেদ যা পয়দা করে রেখে গেছে, ও এক বারুদ! যে কামেই লাগাবি, তা ডিরেক্ট কামিয়াব। অথচ ওর এত চতুর আর চিতার মতোন দ্রুতগামী বুদ্ধি শকুনে খাবে।”

-“তোর বাপে খালি আমার চরকায় তেল ঘষতো ক্যান হামেশা? নিজের চরকা ভাঙা ছিল নাকি তেল বেশি কিনে ফেলেছিল? ”-“তুই বুঝে অবুঝ। আর বুঝে অবুঝেরা

তাদের সুবিধামতো বোঝে। ধর যেটা বুঝতে ইচ্ছে করছে, সেটা বুঝছে। যেটা ইচ্ছা করছে না, সেটা বুঝেও বুঝছে না।”

জয়ের হাসি বাড়ল সামান্য, “তাদের কোনো চিকিৎসা নাই। তুই তোর ডাক্তারি ফিরিয়ে নে। হাম নাহি শুধরেঙ্গে জি হাম নাহি শুধরেঙ্গে।”

মুরসালীন বলল, “ঘোষ্ট রাইডার সিনেমার নায়ক জনি। ওর বাপের ক্যান্সার হয়েছে। একদিন একজন এসে বলল, তুমি আমাকে তোমার আত্মা দেবে, এই শর্তে এই কাগজটাতে সাইন করো, তার বদলে তোমার বাপকে আমি সুস্থ করে দেব। তোমার সব

দুঃখ দূর হয়ে যাবে। জনি সাইন করে দিলো। কারণ তখন তার শুধুই তার বাপকে বাঁচাতে হবে। আগে-পরে বাদ। রাতারাতি তার বাপ সুস্থ হলো। কিছুদিন কাটলো। একদিন ওই লোক এলো। কাগজটা দেখালো। জনি তখন নিরুপায়। সে আগেই চুক্তিপত্রে সাইন করে ফেলেছে। তখন বিষয়টা খারাপ মনে হয়নি। কিন্তু এবার টের পেল, সেই লোকটা মূলত শয়তান। শয়তান তার কাছে তার আত্মা কিনে নিয়েছে। এবার তার আত্মাকে দিয়ে যা খুশি করাতে পারে, জনি তা করতে বাধ্য। এরপর শয়তান জনিকে দিয়ে দেদারসে মানুষ মারতে থাকল। জনিকে জাহান্নামের দেবতা

বানালো। সে যাকে ছোঁয় সে এক মুহুর্তে জ্বলে ভষ্ম হয়ে যায়।”

জয় হো হো করে হেসে উঠল, “সিনেমাও দেখিস তুই? এ তো কঠিন পাপ! থুহ থু!”

মুরসালীন মাথা নাড়ল, “আমি সৈয়দ বংশের কলঙ্ক! সব পাপাচারে ভাগ আছে আমার। তুই কি বুঝেছিস আমি কী বলেছি?”-“না।”

দোলন সাহেব হেসে উঠে নিজের উপস্থিতির জানান দিলেন, “আমি যদি বুঝে না বুঝি আমাকে বোঝায় কোন শালা? ঠিক না, জয়?”

জয় হাত তুলে সংগ্রামী ভঙ্গিমায় বলল, “ঠেক ঠেক! একমত, স্যার, একমত!”

মুরসালীন হাসল, “হামজা ভাইয়ের চোখ দিয়ে দেখা শত্রুদের ব্যাপারে যা বুঝলে তারা আর তোর শত্রু থাকবে না, তুই তা বুঝতেই চেষ্টা করিসনি। কারণ ছোটবেলায় যে অবস্থান তোর কাছে নারকীয় মনে হয়েছিল, হামজা ছিল তখন তোর মুক্তির দূত! আর তুই নিজের অজান্তেই অসীম কৃতজ্ঞতায় হামজা ভাইকে তোর রুহ্ সঁপেছিস। আজ চাইলেও তার কর্মে অভিযোগ অথবা আপত্তি আসে না। তুই করতে চাস না।”

জয় আনমনে স্বগোতক্তি করে, “হামজা ভাই আমারে একদিন কইলো, জয় রে! তোর-আমার গন্তব্য দুইটা, পথ এক। পথের শেষে

একই বিন্দুতে একই রকম দেখতে দুইটা গন্তব্য! চল হাঁটি।''মুরসালীন নিস্তেজ চিত্তে দু'পাশে মাথা নেড়ে বলল, "গন্তব্য মানুষকে মৃত্যু অবধি পৌঁছে দেয়!''

তার নরম দিলে জয়ের জন্য এক ঘা লাগল! পথভ্রষ্ট এই জয়কে মুস্তাকিন মহান ছোটবেলায় মাদ্রাসার দস্তরখানে বসিয়ে কত বুঝিয়েছে! ওই জয় পর্বতের মতো অটল চিত্তে কেবল চুপ থাকতো। ভেতরে কী জমাতো, কে জানে! আজ মনে হয় বিদ্বেষ। এই জগৎসংসার, সমাজ, দেশ, মানুষের প্রতি তার অসীম বিদ্বেষ একটু একটু কমে জমে এক

মহাসমুদ্রে রূপ নিয়েছে। তা ঢেউ থামানোর উপায় নেই।

জয় তীব্র-বেগে মাথা নেড়ে স্বীকার করে, “হ, হ! মৃত্যুউউ!”অন্তূ খেয়াল মেলে দেখল জয়ের সেই পাগলামিটুকু। জয় আমির সত্যিই মৃত্যুর ওপর বড়োই আকর্ষিত! সে বলল, “সেই গন্তব্যে আপনার জন্য নিশ্চিত মৃত্যু লেখা থাকলেও মেয়র সাহেবের জন্য গচ্ছিত আছে ক্ষমতার ডালি। পথটা হলো, বিরোধীদের ধরে কচুকাটা করা। তাতে আপনার ভেতরে ইনপুট করা প্রতিশোধের বিষাক্ত প্রবৃত্তি মিটবে, আর আপনার তৈরি করা রাস্তা মেয়র সাহেবকে তার উদ্দেশ্য হাসিলে এক পিচ্ছিল

পথ বানিয়ে দেবে। এই তো আপনাদের সেই এক পথ দুই গন্তব্য?”

-“ব্রিলিয়ান্ট! আপনি চাইলে ভালো উকিল হতে পারতেন, ঘরওয়ালি!”

অন্তূ গভীর স্বরে জিজ্ঞেস করল, “জেনেশুনে ক্ষয় হতে কেউ এত আগ্রহী হয়, জয় আমির? ”

জয় হাসল, “আমারে কেউ অক্ষত পায় নাই, ম্যাডাম! সুতরাং ক্ষয় হওয়ার মাল আরেকটু ক্ষয় হইলেই বরং প্রকৃতির নিয়ম বজায় থাকে। আমার উপরে মরিচা ধরছে সেই কোনকালে।”মুরসালীন গম্ভীর স্বরে শুধায়,

“আব্বাকে কেন মেরেছিস? তোর মুখে শুনি! বল, কী কারণে মেরেছিস?”

জয় লোহার খণ্ড থেকে আস্তে কোরে নেমে ঢালাই মেঝেটার ওপর টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল। মুরসালীন ঠিক ওর পাশে একইভাবে শুয়ে পড়ল। দুটো দেহ পাশাপাশি পড়ে রইল। একটা ক্ষত-বিক্ষত আরেকটা ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত!

-“আমার বড়বাবাকে আমি শেষবার কবে দেখছি জানিস? সেই রাত্তিরে। ওই যে ওই রাত্তিরে। বড়বাবা তার ভাবীকে বলেছিল, ‘জয়কে নিয়ে পালান, ভাবী। জলদি যান।”

-“তোর বড়বাবা বিশাল বড় হিরো ছিল রে, জয়?”

-“আমার বড়বাবা ছিল।”

-“আইন, রাষ্ট্র ও দেশের মানুষের কী ছিল?”

জয় হেসে ফেলল, “আইন, রাষ্ট্র, দেশের মানুষ?” ডেকে উঠল জোরে করে , “ও দোলন স্যার? আছেন না? আমার ঘরওয়ালির হাতের ইশপেশাল বুলেট নসিব হয় নাই তো? ”

এতক্ষণে সবাই যেন ভুলে গেছিল, তারা ছাড়াও আরও একজন আজ জয় আমিরের গল্পের শ্রোতা রয়েছেন বড় ঘরে। দোলন সাহেব বললেন, “নাহ। হয়নি।”-“ব্যাডলাক!

সেই দুঃখে আপনারে একখান গোপন কথা কই, স্যার?''
-"হু?''
জয় বাচ্চাদের মতো চেঁচিয়ে ঘোষণা করে, "আমি ছাড়া এই ঘরে আর কোনো দেশোদ্রোহী নাই, স্যার।''
অন্তূর শরীরটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। চোখ বুজল সে। জয় আমির মিথ্যা বলে না। অন্তূ জয়ের গল্পের মাঝে এটাই তো আবিষ্কার করেছে এতক্ষণে! দেশ, দেশের মানুষ, জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র...এই সবের দ্রোহ একা বহনকারী জয় আমির আজ এই জয় আমির। যার বেঁচে থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য বিশৃঙ্খলা, অশান্তি,

পাপাচার, মানুষের ভোগান্তি, দেশের-দশের ভাঙন, ধ্বংস!

মুরসালীন চট করে ঘাঁড় ঘোরায়। জয় দাঁত বের করে হাসল, "আমার বড়বাবা তা-ই ছিল। বুঝেছিস তুই মুরসালীন?"

-"জয়, তুই অকৃতজ্ঞ।"

জয় আপত্তি জানায়, "নাহ! আমি অকৃতজ্ঞ না।"

-"তুই আর সবার প্রতিদান চুকাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছিস, শুধু যে বা যারা তোকে জীবন দিয়েছে তাদের জীবন শুষে বলিয়ান হয়েছিস। উত্তম বিচার বটে!"-"তোর আব্বা! তোর আব্বা আমির পরিবারকে খেয়েছে।"

-"জবান সামলা।"

-"কোথায় সামলাবো? ঘরওয়ালি! তুমার ওড়নার আঁচলডা দেও তো।" তাড়াতাড়ি কোরে অন্তূর ওড়নার তলে জিহ্বা ঢাকল।

-"হামজা ভাই তোকে দিয়ে সার্কাসেও কাজ করিয়েছে নাকি? এমন জোকার জোকার হাল হয়েছে কেন তোর? আব্বা তোর অবস্থা এমনটাই আশংকা করতো তোর চলে আসার পর।"

-"মুরসালীন তোর কথা শেষ কর। আমি রুমে যাব। মাথা ব্যথা করতেছে।"

-"স্বাভাবিক! কথাবার্তা সেইদিকে যাচ্ছে, যা তুই আলোচনা করতে খুব অপছন্দ করিস।

কিন্তু করতে হবে। সময় নেই আমাদের হাতে।''জয় মাথার নিচে হাতের কনুই দিয়ে বলল, ‘‘হ! ঠিক কথা। সময় নাই আমাদের হাতে।''

মুরসালীন বড় হতাশার সাথে বলল, ‘‘জয়নাল কাকা সর্বশেষ যে পাপটা করেছিল, তা তোর সাথে।''

-‘‘পাপ? আমাকে ভালোবাসাটা?''

-‘‘মূর্খ! ভালোবাসা বুঝিস তুই?''

-‘‘তা বুঝি না অবশ্য!''

-‘‘তোর দুর্ভাগ্য। ভালোবাসা কাকে বলে বুঝিস না তুই, অথচ দাবী করিস কেউ কেউ তোকে ভালোবাসে। তুই একটা শক্তিশালী ঘুটি মাত্র।

যা সবার দাবার চাল হয়েছে। যে যেমন পেরেছে তোকে ভালোবাসার নামে বিষে চুবিয়েছে। আল্লাহ পাক তোকে যে পরিমাণ নেয়ামত, মেধা দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন, তা তুই কুকুরদের খোড়াক হিসেবে বিতরণ করে এক অধমে পরিণত হয়েছিস!
''-"পুরোনো আলাপ। সেসব থাক। বোঝা তো, ভালোবাসা কী? আজ নতুন কিছু বুঝি।''
-"যদি বলি, তোর স্ত্রী তোকে ভালোবাসে!''
জয় যেন হাসতে ভুলে গেল। সে অতিরিক্ত হাসি পাওয়ার ফলে হাসতে ভুলে গিয়ে নিঃশ্বাস আঁটকে পড়ে রইল।

মুরসালীন আস্তে আস্তে উঠে বসে বলল, “সে তোকে এই পথ ছাড়তে বলেছে কখনও?”

হাসি জোর করে চেপে মুখ ফুলিয়ে বলল, “হ।”

-“আর কেউ?”

-“না।”

-“মনে কর, কেউ তো বলেছে সে ছাড়া!?”

-“মনে নাই। ক্যান?”জয় চোখ খুলে তাকায়।

মুরসালীন বলল, “কেন বলেনি? কেন তোকে কেউ এই মরার খেলা খেলতে মানা করেনি? অন্য পথের কথা বলেনি? বল, তুই বল। আমি তোর মুখে শুনব।”

জয় কিছু বলল না। উঠে গিয়ে কামরুলের পকেট হাতরে সিগারেট বের করে এনে জ্বালালো।

মুরসালীন দৃঢ়স্বরে বলল, "কারণ কেউ তোরে কোনোদিন বাঁচাইবার চায় নাই। কেউ তোরে মানুষ মনে করে নাই। কেউ তোরে বোঝেই নাই! তুই যে মেধাবি, তুই অভিজাত বংশের রক্তে পয়দা, তোর ভিতরে মানুষ আছে, এটা তোকে ভুলিয়ে রাখতে এই দুনিয়ার যত আয়োজন! কিন্তু তোর স্ত্রী.."

জয় সিগারেট ঠোঁট থেকে নামিয়ে তীব্র বাঁধা দিলো, "চুপ! চুপ! কিছুই না। আমি ওর আসামী মাত্র, আসামী। এর বেশি কিছু না।

ভালোবাসা-বাসির মইদ্দে টানিস না।”-“তুই কোন ভালোবাসার কথা বলছিস, জানি না। কিন্তু ভালোবাসার বহুত প্রকারের মাঝে একটা এমনও আছে—

জয় চোখ বুজে লম্বা একটা টান সিগারেটে দিয়ে পুরো ধোঁয়াটুকু গিললো। তারপর নিঃশব্দে হাসল, এইটা যদি ভালোবাসা হয়, তাইলে তা সর্বজনীন! সবার জন্য প্রযোজ্য। ও এক আদর্শ মেয়ে, ভাই। আমার জায়গায় অন্য কোনো নষ্ট জয় থাইকলে তারেও ভালো হইতে বলতো। এইটাতে বিশেষত্ব খুঁজলে আমি তোরে দুই চামচ খাঁটি গু খাইতে সাজেশন দেব।”

মুরসালীন বলল, “তুই যে পথে নেমেছিস, তাতে আছে কী?”

-“তোরা যে পথে আছিস, তাতে আছে কী?”

-“কী চাস?”-“কী আছে, দে! আমার তো কিছুই নাই। যা দিবি হাতে, তাই যাবে সাথে। দে..” জয় হাত পাতলো।

-“চাস কী তুই? দেশের জন্য প্রেম আছে, মানুষের জন্য মমতা আছে, নারীর প্রতি সম্মান আছে, মনুষত্ব বোধ আছে। আমার দেশের মাটি আমি বেঁচে থাকতে আমার দ্বারা নোংরা হবে না, সেই দৃঢ় প্রত্যায় আছে বুকের ভেতরে। কী চাস তুই?”

জয় আমির উপহাস করে হাসল। ঝারা মেরে মাথা নাড়ল দু'পাশে,

-"আমি জয় আমির যেইদিন খালি একটা ছোট্ট বাচ্চা ছেলে ছিলাম, আমি আমার দাদুভাইয়ের কাটা মাথা দেখছি, বাপের মাংস ছিঁড়ে আসা শরীর দেখছি, সেই জন্মদাত্রীর লজ্জাস্থান হরণ হইতে দেখছি, যা চিরে দুনিয়ায় আসছি। আমি জয় আমির খিদের জ্বালায় তোর দ্যাশের জমিনের মাটি খুবলে খাইছি। একখান মজার কথা শুনবি? তোর দ্যাশের মাটি ক্ষুধার্ত জয় আমিরের খিদে মেটাইতে পারে নাই। তোর দ্যাশের মানুষ আমার মতোন জয় আমিররে ঘরে তুইলা

আশ্রয় দেয় নাই। তোর দ্যাশের মানুষ, তোরা নারীদেরকে ম্যালা সম্মান করিস। খালি আমার ফুপু জয়নব, আমার আম্মা হুমায়িরা আর আরমিণেরা যখন ইজ্জত হারায় তখন তোর দ্যাশের মানুষ এইগুলারে সম্মান করতে জানে না। আমি ভুল কইছি মনেহয়। তোর দ্যাশের মানুষ নারীরে সম্মান দেয়, এই তিনডা তো নারীই ছিল না। ঠিক কইছি না? ওই যে বইসা আছে শালির মেয়ে! ওইডারে জিগা! ওইডারে যেইদিন বেশ্যা মাগি বানাইছি আমি জয় আমির, তোর সমাজ-দ্যাশের মাইনষে ওরে একবার জিগায় নাই পর্যন্ত —'ওই ছেঁড়ি! আমিরের পোলায় তোরে সত্যি

ছুঁইছে নাকি?’ জিগা ওরে! দেখ ওই শালি আইজও কাঁন্দে খালি। কিছু কইবার পারে না, করবার পারে না। ওরে ওইদিন আমি আমার নাম না দিলে ওয় কবে বদনাম হইয়া খতম হই যাইতো! তোর দ্যাশের মাটি ওর বালডা ছিঁড়তো!? তোর দেশপ্রেম কারে কী দিছে? তোরে কার বালডা দিছে? আজ এইখানে পচতেছিস মাসের পর মাস! এই তো! হ, তোর দ্যাশ-সমাজ ম্যালা ভালো। মহান মহান।’’জয় আমির আবারও হেসে ফেলল কেমন করে যেন, “তোরা তো ভালো আছিসই, মুরসালীন! আমি এক জয় আমির খারাপ

হইলে তোর দ্যাশ-দুনিয়ার থেকে কিচ্ছু খসবে না বা জোড়া লাগবে না।”

জয় অন্তূর হাতখানা আবারও শক্ত করে চেপে ধরল। সেই হাতজোড়া থরথর করে কাঁপছে। জয় কিন্তু ভুলেও তাকাল না অন্তূর মুখের দিকে। আরমিণের কান্না সে দেখে না। ওই ছেঁড়ি কাঁদলে আড়ালে কাঁদবে। আজ সামনে কেঁদে ফেলেছে। সেই দোষ তো জয়ের না!

অন্তূ হাতখানা চেপে ধরে ওকে নিয়ে গা ঝেরে উঠে দাঁড়াল জয় আমির,

-“ছেড়ে দে আমায়, মুরসালীন। এক জনম আমি জয় আমির হবো, পরের বার মাটি হয়ে হুমায়িরার পেটে জন্মাবো। সেইবার তোরা

কেউ চাইলেও আমারে আর জয় আমির বানাইতে পারবি না কইলাম। এইবার খালি আমারে জয় আমির হইতে দে।''অন্তূকে তুলে নিয়ে নিস্তেজ দেহগুলো মাড়িয়ে চামড়ার স্যান্ডেলের খসখসে আওয়াজ তুলে অনেকটা এগিয়ে এলো জয়। পিঠ-পিছে অন্তূর ওড়না ঝুলছিল। তা একহাতে গায়ে জড়িয়ে অন্তূকে আগলে নিয়ে বড়ঘরের মাঝ বরাবর পেরিয়ে আসার সময় মুরসালীন আওয়াজ দিলো,

-"জিন্নাহ আমিরকে আমি মারিনি, জয়। তোর গল্প, আমার কথা আর তোর ভুল বোঝাবুঝি শেষ হতে এখনও অনেকটা বাকি।''রাত সোয়া দুটোর সময় হামজা আকস্মিক রিমিকে

ছেড়ে সাদা চশমাখানা টেবিলের ওপর রেখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। তার ভেতরে কিছু তৈরি হলো। জটিল কিছু। ততক্ষণ হামজার মস্তিষ্ক কাটার মেশিনের ব্লেডের মতো চলেছিল। সামনে যা আসবে, ফালা ফালা হয়ে যাবে।

রিমি কাঁদছে। কিন্তু হামজা থামানোর চেষ্টা করল না। তার আবার বুকও জ্বলছে। এই জ্বলন অবর্ণনীয়! ব্যক্তিগত দুঃখ। এটা নতুন তার জন্য। ব্যক্তিগত দুঃখ বলতে এক অপরিচিত ব্যাপারের সাথে সে কিছুদিন চলাফেরা করছে। হামজা কখনও কাউকে ভালোবাসেনি। কিন্তু রিমির ক্ষেত্রেও কি

কথাটা খাটে? এই প্রশ্নটাই সমস্যা তৈরি করছে মূলত।
রিমি তাকে শাস্তি দিতে যে পন্থা অবলম্বন করেছে, তার দায়ভার কার? জয়ের বউয়ের নয়? হামজা কি ছাড়বে সেই দুঃসাহসী নারীটিকে? ধরলে নারীটি সইতে পারবে হামজার থাবা?সে ফতোয়া বদলে একখানা নেভি-ব্লু পাঞ্জাবী পরল। এসির নিবিড় হাওয়ায় ঘুম জড়িয়ে আসছে চোখে। মস্তিষ্কের ভারে তার কঠিন শরীরটাও নুইয়ে আসা ভাব। ঘুমটা দরকার হামজার। তার আগে কিছুটা মদ খাওয়া দরকার। নয়ত এই অস্থিরতায়

ঘুম আসে না। তার জন্য জয়কে দরকার। কিন্তু জয় বড়ঘরে আজ।

জয়ের রুমখানা পেরোনোর সময় দেখল দরজার নব লক। জয়ের বউ ভেতরেই ঘুমাচ্ছে তো? ব্যক্তিত্বের চাপে রাত-দুপুরে নবটা ঘুরিয়ে জয়ের ঘরে উঁকি দিয়ে ওর ঘুমন্ত বউকে দেখার কাজটা করা হলো না। তবে একটা নিশ্চয়তা আছে বটে। জয়কে এখনও পুরোপুরি বশ করতে পারেনি ওর বউ! এটাই ধারণা হামজার। ঘরেই আছে আরমিণ।

আড়াইটার দিকে হামজা সংসদ সদস্যের বাসভবনে পৌঁছাল। দারোয়ান ঘুমে ঢুলছিল।

হামজা না হলে সে ফটক খোলা তো দূর, লাগলে একটা মার্ডার করতো। এমপি সাহেবের নিরাপত্তা প্রথমত। কিন্তু হামজাকে দেখে হুড়মুড়িয়ে উঠে এসে সালাম ঠুকে বলল, "স্যার আপনের জন্যে ম্যালাক্ষণ বসে ছিল। এখন মনে হয় শুইয়া পড়ছে!"
হামজা চুপচাপ নিশাচরের মতো ভেতরে ঢুকল। হাতে দুটো ফাইল। কেইস ফাইলের কপি— অভিযোগপত্র। আরেক হাতে একটা মাঝারি ঝোলা গাড়ি থেকে বের করল।
মাঝরাতে সংসদ সদস্যের বসার ঘরখানা হামজার শরীরের কড়া সুগন্ধির রহস্যে মেখে উঠল। নেমে এলেন ভুড়ি দুলিয়ে সংসদ

সদস্য সাহেব। বড় করে হাসলেন। হাসল না হামজা। তার ভরিক্কি সৌম্য চেহারা, আঁধার কূপের মতো চোখদুটো স্থির, শান্ত, ঠিক শিকারী পেঁচার মতোন। সে সালাম অবধি দিলো না।

এমপি সাহেব বললেন, "তোমার রাত বারোটায় আসার কথা ছিল।"

সোফায় বসে ফাইলগুলো এগিয়ে দিয়ে হামজা বলল, "ওদিকের ব্যবস্থা কতদূর করলেন?"

ফাইলগুলো দেখতে চাইলেন এমপি সাহেব, হামজা বাঁধা দিলো, "পরে দেখে নেবেন। আমি শেষরাতের গাড়িতে রাজধানী যাব। কথা শেষ করি।"

-"মাসুদ! চা-পানি দে রে!"
-"লাগবে না। আলোচনায় আসি।"
হামজা ঝোলা থেকে মোট তিনটা হ্যান্ডগান ও চারটা লোডেড ম্যাগাজিন বের করে সেন্টার-টেবিলের ওপর রেখে বলল, "এগুলোর লাইসেন্স নেই। লাইসেন্স শুধু আমার একটা পিস্তলের আছে। এগুলো এখন বাড়িতে রাখা যাচ্ছে না। আপনি রাখুন। পরে নেব।"রেগে উঠলেন এমপি সাহেব, "তার মানে যখন-তখন তল্লাশি হবার পর্যায়ে আছো, হ্যাঁ? মরতে বাকি রাখোনি?"
হামজা নির্লিপ্ত চোখে তাকিয়ে রইল। দুশ্চিন্তার ছাপ দেখা গেল এমপির মুখে। ঘনঘন মাথা

নাড়লেন, “তোমার জয় যা করছে, ভালো করেনি। ভালো করেনি।”

-“ওর সেই অভ্যাস নেই। সে যাহোক, পলাশ আজগর মার্ডার কেইসে পুলিশ এখনও ডেডবডি পায়ইনি, অথচ জয়কে সাসপেক্ট নম্বর ওয়ানে রেখেছে। মাজহার, ঝন্টু কাকাসহ আরও পুরোনো কেইসগুলো কেউ নতুন করে খুলেছে। গোড়া থেকে সব তদন্ত শুরু হয়েছে স্পেশাল ব্রাঞ্চগুলোতে। সেখানে আমার বাড়িটা গবেষণার বিষয়। বুঝতে পারছেন?”

অবাক হলেন এমপি, “কে খুলেছে সেইসব কেইস?”-“বলব সব। এখন কথা হলো,

কয়দিন যে চাপাটা দিয়েছিলাম, তা আলগা করেছে কেউ বা তারা। তাকে এবং তাদেরকে ধরে বলি দিলেও এখন আর তা ঢাকা যাচ্ছে না। চারদিকের অবস্থা ভালো না। অন্তত এটার কাজ দ্রুত এগোনো দরকার আপাতত। ঢাকা থেকে ফিরে আমি নিজেই একবার যাব পুলিশ কাস্টাডিতে। অন্তত একটা নো-ফল্ট স্টেটমেন্ট দিয়ে আসতে হবে, নিজেকে সাফ রাখতে হবে যথাসম্ভব। কিন্তু জয়কে আমি থানার বারান্দায়ও দেখতে চাই না।" গভীর বার্তা দিলো হামজা।

গলার স্বর চড়ল এমপির, "শোনো ইয়াং ম্যান! ঠান্ডা ঠান্ডা! তুমি নিশ্চিত মার্ডার আর তার

কালপ্রিটকে পবিত্র গোলাপ ফুল বানানোর প্রস্তাব করতে আসছো। নরকে যাওয়া কাম এইটা, সহজ নাকি?"

হামজা নির্বিকার বসে রইল। দুটো গ্লাসে এক শট অ্যালকোহল, দুটো করে পুদিনা পাতা, এক টুকরো আদা, একটু বিট লবন ও সোডা মিশিয়ে দুটো ড্রিংক তৈরি করলেন এমপি সাহেব। একটা গ্লাস হামজাকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "পুলিশ পলাশের বডিটা পেয়ে গেলে ব্যাপার হাতছাড়া হয়ে যাবে গো হামজা। ওইটার ভালো ব্যবস্থা করো।"-"বডি পাবে না।" হেলান দিয়ে বসে গ্লাসে দুটো চুমুক দিলো হামজা।

-"পাবে না?"

-"খাবার হিসেবে কুকুরের পেটে চলে গেছে। হজমও হয়ে গেছে। আপনি আপাতত ব্যবস্থা করুন যেন জয়কে ইন্টেরোগেশনে ডাকা না হয়। পুলিশ ফোর্সের প্রমাণের হিসেবে এত সহজে যাবার নয়। আমি বেঁচে আছি এখনও। "

এমপি সাহেব একটু দুঃখিত ও অবাক হয়ে বললেন, "এত খারাপভাবে মারলে পলাশ ছেলেটাকে?" সোজা হয়ে বসে ঘাড়ে হাত রাখলেন এমপি সাহেব। কিছুক্ষণ হা করে শ্বাস ফেলে বললেন, "ডুবো না হামজা, কোনোভাবেই ডুবো না! যেমনে ভাসতেছ,

একবার ডুবলে জাহাজের ভাঙা পাটাতনও পাওয়া যাবে না গো!’’

-‘‘দলের ছয়টা ছেলে পুলিশ হেফাজতে। রূপকথা আজগর, পরাগ ওরা নিজেদের শেষ সময় গুণছে শেলের পেছনে। আমার কবির বন্দি। আবার জঙ্গি শুয়োরের বাচ্চারা যখন-তখন হামলা করবে, আমি নিশ্চিত। আরেকটা কিছু চাল চালছে। ভেতরে ছিদ্র হওয়া ব্যাপার। আমার ব্যক্তিগত..’’এমপি সাহেব সতর্ক চোখে তাকিয়ে আছেন বুঝে সংযত হয়ে উঠল হামজা। সে ব্যক্তিগত আলাপ পেড়ে ফেলেছে ক্রোধে। এক সামান্য নারী

তাকে মুচড়ে রেখে দিয়েছে তা লোক জানার নয়।
সে বলল, “বাড়িতে নিরাপত্তার বাঁধ প্রায় ভেঙে গেছে। সেই সেদিন ভেঙেছে যেদিন মুরসালীন বাড়িতে দেদারসে ঢুকে পড়েছিল।”
সোজা হয়ে মনোযোগ এনে বসলেন এমপি, “একটা কথা বলবে হামজা?”
হামজা বুঝল কী বলবেন এমপি। সে চুপ রইল। এমপি বললেন, “তোমার বাড়িতে তোমাকে জড়িয়ে কোনো বিরোধী আগাছা বেড়ে উঠেছে বলে আমার ধারণা, সেটা কি জয় নয় তো আবার?”

ঝানু রাজনৈতিক লোকের সঠিক আন্দাজ হামজাকে ক্ষুব্ধ করে তুলল। কিন্তু সেই আগাছা জয় নয়। বরং জয় নিজেই সেই আগাছার শিকার হতে চলেছে। তাকে উদ্ধার করা দরকার। হামজার ভেতরে আবারও একটা ভয়ের উদ্রেক হলো, সে কেন এই মুহুর্তে রুমে ঢুকে আরমিণকে গলা টিপে মেরে এলো না?কিন্তু তার উত্তেজনা বাইরে আসে না বলে ভেতরে তা চেপে গিয়ে বলল, "আমার বাড়িতে এখন শুধু প্রতিবেলা পুলিশি তল্লাশি চলবে। থামাতে পারব না। সন্দেহ গাঢ় করা যাবে না। থামালেই আগ্রহ পেয়ে বসবে। সেক্ষেত্রে তল্লাশি পুরোদমে করতে

দেবার জন্য সহযোগিতা করতে হবে আমাকে।''

হামজা থামল। পূর্ণ মনোযোগী হলেন এমপি সাহেব। হামজা ঠোঁট কামড়ে বিরতি কাটিয়ে ইঙ্গিতবহ সুরে সূক্ষ্ম গলায় জানালো, "বড়ঘর পরিষ্কার করতে হবে।''

এমপি সাহেব থুতনিতে হাত চেপে বসলেন, "আমার বাড়িতে হ্যান্ড-অভার করবে ওদের? আমার বেসমেন্টে রাখতে পারো। আমার বাড়িতে পুলিশে তল্লাশি চলে না।'' হাসলেন এমপি।

-"সোজা ওপরে অথবা কারাগার। বড়ঘর থেকে আপনার বাড়িতে ওদেরকে অতিথি

করে পাঠাতে এই মাঝরাতের মিটিংয়ে আমি আসিনি।” অশিষ্ট শোনালো হামজার গলা।-“তো এখন কী চাও?”

-“মুরসালীন মহানকে মেরে হাত ময়লা করব না আমি। ওকে পচানোর শখ আমার। কারাগারের ব্যবস্থা করবেন আপনি। বাকি ছোটবড় যা আছে, আমি সামলে নেব। তার জন্য অন্তত ক'টা দিন চাই। আপনি সেই কয়টা দিন পুলিশকে আমার বাড়ি থেকে মাইলখানেক দূরে রাখুন। আপাতত এইটুকু মাস্ট বি।”

মাথা নাড়লেন এমপি, “মুরসালীন সাবেক বিগ্রেডিয়ারের ছেলে। সরকারী ক্ষমতা সামান্য

হলেও আছে বলা চলে। আর আমি আমার ক্ষমতার অপব্যবহার রয়েসয়ে করতে চাই। জানো–অতি ভজন মানুষের পাকস্থলীর হজমশক্তি কমিয়ে দেয়। ধীরে ধীরে খেলে অনেক খাওয়া যায়। ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পড়া শিক্ষিত ছেলে। ওকে ভেতরে দিতে হালকা হলেও একটা টোপ চাই। যেন আমার রেপুটেশন সাফ থাকে, এমনকি আমার পালিত প্রশাসনের কাছেও।''

-“আমি আপনাকে ভারী টোপ দিতে এসেছি।''

ভ্রু জড়ালেন এমপি সাহেব, “হু?''চট করে অভিব্যক্তি বদলালো হামজা, “কিন্তু কথা হলো, আপনি নিতে পারবেন তো আচমকা?''

এমপি সাহেব নড়েচড়ে বসলেন। হামজা ভণিতা করার ছেলে না। বারুদ সে। হাভজার ভণিতায় বিভ্রান্ত হয়ে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

হামজা বলল, "আমার ওপরে রাগ করতে পারবেন না। আমি আসলে...আমার নিজেরও কিছুটা স্বার্থ ছিল বটে!"

এই এক কথায় কাজ হয়ে গেল অবশ্য।

এমপি সাহেব পণ করে নিলেন নিজের অজান্তেই, হামজা এখন চিরন্তন সত্যি বলবে।

-"এই, হামজা! ধাঁধা বানাবা না। তোমার মুখে সরাসরি কথা শুনতে ভাল্লাগে।"

-"সীমান্তকে মুরসালীন খুন করেছে।"

এমপি সাহেব যেন দুম করে দমে গেলেন চমকে। একেবারে দেবে বসে গেলেন সোফায়। হামজার মিথ্যেটা সত্যির চেয়েও বড় সত্যির হয়ে ওঠে মানুষের কাছে। কারণ হামজা দক্ষ, নিখুঁত তার ধূর্ততার চাল।

-"তুমি আজকে এই এখন আজ আমারে এই কথা বলতেছ? আমি পাগলের মতোন মাসের পর মাস খুনীরে খুঁজছি।" ঝানু পলিটিশিয়ান হামজার সাথে টিকলেন না, দিশেহারা হতে দেখা গেল তাকে।

হামজা নির্বিকার চিত্তে বলল, "ওই যে বললাম স্বার্থ! আমি যদি তখনই বলে দিতাম, মুরসালীনই সীমান্তর খু^নী, আপনি ওকে

তখনই মেরে ফেলতেন অথবা জেলে দিতেন। কিন্তু জয়ের পুরোনো হিসেব আর আমার উদ্দেশ্য ছিল ওকে দিয়ে। কিন্তু আমি সঠিক সময়ের অপেক্ষায় ছিলাম—ওকে দিয়ে আমার কাজ ফুরোলে আপনার হাতে তুলে দেবার। আজ সেই দিন।''এমপি সাহেব কিছুক্ষণ থম মেরে বসে রইলেন। সীমান্ত এমপি সাহেবের স্ত্রীর বড়বোনের ছোটছেলে। হামজার বোনের সাথে ছেলেটার বিয়েতে এমপি সাহেবের হাত ছিল, তা হামজা জানে না। বিষয়টা আজও চেপে গেলেন। কেবল সীমান্তর মায়ের অবস্থাটা চোখে ভাসল। মহিলা ছেলের শোকে অন্ধ প্রায়। পুত্রবধুর নাম একবারও মুখে নেন

না, নাতনির নামও না। কিন্তু ছেলেকে হারিয়ে পাগলপ্রায়। রোজ কল করে বলেন, “তুমি এমপি হয়ে কী লাভ? কী লাভটা কী?”

এমপি সাহেবের ইগো খুব আঘাতপ্রাপ্ত হয়। উনার ইচ্ছে করল, এই মুহুর্তে সীমান্তর খু’নী মুরসালীনকে ধরে খণ্ড খণ্ড করে পুকুরে শখ করে পোষা কুমিরকে খেতে দিতে। হামজা বরশী ফেলে চুপচাপ সোফার ওপর বসে রইল। এমপি সাহেবের ভাবুক মুখটা দেখে তার হাসি পাচ্ছে।

-“প্রমাণ আছে তোমার কাছে?”

-“তা জোগাড় না করে খবর দেব আমি আপনাকে?”

রাগ ভুলে একটু সন্তুষ্টি এলো ছেলেটার ওপর এমপির মুখে, কী আছে?''-"অস্ত্র। চাপ্পর দিয়ে কুঁপিয়ে মেরেছিল সীমান্তকে। সেটা রক্তাক্ত অবস্থায় আমি উদ্ধার করতে পেরেছি। শুকনো রক্ত।''

এরপর ভীষণ দুঃখিত ভঙ্গিতে বলল, "আমি কীভাবে আমার বোনের বিধবা হবার এই শোক সহ্য করেছি, তা আর না বলি। শুধু বলব, মুরসালীনের ক্ষেত্রে আমি যতটা ধৈর্য ধরেছি, আর কেউ এতটা সুযোগ পায়নি আমার কাছে।''

-"তুমি এখান থেকেই ঢাকা চলে যাবে?''

হামজা জানালা দিয়ে অন্ধকার দেখতে দেখতে মাথা নেড়ে সায় দিলো। এমপি সাহেব জানালেন, “একটু আগে বড়ঘরে বাপ্পী কামরুল, দোলন সাহেব, রবিউল গেছে। জয় বাড়িতে না?”

-“ও বড়ঘরেই আজ। ওরা কেন গেছে?”

এমপি সাহেব চোখের শীতলতায় বোঝালেন, ওদেরকে ছিঁড়তে। একেকজন যদি দু-চারটে করেও মারে, “সেটুকুই বা আসে কোত্থেকে। মুখে বললেন, দোলনকে পাঠিয়েছি, শেষবার জিজ্ঞাসাবাদ করতে। ঘাটিটা কোথায় ওদের সংগঠনের? জানা দরকার। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে দরকার ছিল না। আমি আর্মির ব্যাটাকে

জিন্দা কবর দেব এবার। আর স্টেটমেন্টের চিন্তা করব না।''

ঢাকা যাবার পথে জয়কে একবার কল করে জানতে ইচ্ছে করেছিল হামজার, বড়ঘরের খবর! আরমিণ হামজার অনুপস্থিতিতে কী ঘটাচ্ছে, তা নিয়েও ভাবনা এলো। কিন্তু তাকে সকাল হতে হতে রাজধানীতে পৌঁছাতে হবে।

জয় ফিরে এসে আবার বসল সেই লোহার খণ্ডের ওপর। অন্তূর হাতটা ধরা তখনও। অন্তূ দাঁড়িয়েই রইল। শরীর ভালো লাগছে না। চোখের সামনে মাঝেমধ্যেই অন্ধকার হয়ে আসছে। অবরুদ্ধ বড়ঘরটা জুড়ে ভ্যাপসা গন্ধ। পেট গুলিয়ে বমি আসতে চাইছে।

মুরসালীন জয়কে বলল, “তুই তো আমার কাছে এত সময় দিস না। আজ তোর গুরু কোথায় রে জয়?”

-“তোদের নাম্বার লেগে যাচ্ছে তো! দোআ কালেমা পড়! ঢাকা গেছে।”

মুরসালীন ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল, “নয়ত আমার কাছে তোকে বেশিক্ষণ ছেড়ে রাখার রিস্ক সে নিতো না।”

জয় ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত দেহটা হাঁটুর ওপর একটু ঝুঁকিয়ে বসে বলল, “তুই মারিসনি তো কে মেরেছে জিন্নাহকে? সত্যিই মরে গেছে রে জিন্নাহ?”মুরসালীন বলল, “জয়নাল আমিরকে মারার জন্য তুই আমার আব্বার হৃৎপিণ্ড খণ্ড

করেছিলি, এবার যে জিন্নাহকে মেরেছে, তার কি করবি সেটা জেনেই আমি তোকে সব বলে দেব! বল।''

জয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঠোঁট উল্টে বলল, "আমি সেই ছোটবেলা থেকে শুনে আসতেছি, আমির বংশ নির্বংশ হবে। তারপর আসলেই সেইটার প্রক্রিয়া শুরু হইলো এক রাইতে, তখন আমার বয়স সাত। এটা বহুত লোকের আকাঙ্ক্ষা, কামনা–আমার বংশে কেউ থাকবে না। বড়বাবা এই কথাটাকে সহ্য করতে পারতো না। বড় হয়ে আমি টের পেলাম, আমিও পারি না। তুই জানিস মুরসালীন, আমার কেউ নাই? বাপ-দাদা-চাচা-ভাই...

আমার আগে-পিছে কেউ নাই! আমি এতগুলো দিন দিলের ভিতরে পুষলাম আমি ছাড়াও আরেকটা দেহ আছে, যার শরীরে আমিরদের রক্ত বইছে। আইজ তুই কস, সেও নাই। তাইলে আমি যে এমন বহুত লোকরে মারছি, যারা আমারে নির্বংশ, লেজকাটা বলছে, তাদের কাছে যাইয়া আমার কি এখন মাফ চাওয়া উচিত?''মুরসালীন চুপ করে কেবল জয়ের দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ! জয় ঢালাই মেঝে দেখছে। সে নিজের কথা বলার সময় মানুষের চোখ চোখ রাখে না। বড় ভয়, লোকে চোখের কথা না পড়ে ফেলে!

মুরসালীন বলল, “এমন অসংখ্য সত্ত্বার কাছে মাফ চাওয়ার আছে। কিন্তু আফসোস, তুই তাদেরকে পাবি না আর। তারা কেউ আর তোকে ক্ষমা করতে দুনিয়াতে নেই।”

জয় হেসে ফেলল, “তার মধ্যে প্রধান তোর বাপ আর ভাই। তাই তো?”

-“হতেও পারে। যদি বলি হ্যাঁ, খুব ভুল হবে না। কেন জানিস?”

-“হ জানি। কারণ তোর বাপ আমার দেবতা আছিল। কত আদর যত্নে আমারে বন্দি কইরা রাখছিল, কত সুন্দর দিন কাটাইলাম, সেলিমরে চোখের সামনে দেখতে দেখতে পাগল হইলাম!”

মুরসালীন বড় আফসোসের সাথে বলল, “তুই সেই মানুষটাকে কেবল নিজের নোংরা, পাগলাটে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ভুল বিচার করে খুব নৃশংস মৃত্যু দিয়েছিস, যে তোকে তিনটা বছর আগলে রেখেছিল!”

জয় কেশে উঠল, “আগলে রেখেছিল? কস কী বাপ? মাথা ঘুরতেছে। একগ্লাস নেবু পানি খাইতে পারলে জানডা শান্তি লাগতো।

”-“এটাও স্বাভাবিক। একজন অবিশ্বাসীর কাছে ধর্মীয় আচার শিক্ষাটা জুলুম মনে হওয়াই উচিত।”

জয় মাথা দুলালো, “নাহ! আমি অবিশ্বাসী কে বলে? আমি হইলাম একজন সচেতন লোক।

আমার বিশ্বাসের ম্যালা দাম। আবার আমার এই অবিশ্বাস বারবার ঠিক প্রমাণিত হইছে। কেমনে শুনবি?''

মুরসালীন তাকিয়ে রইল। জয় বলল, ‘‘আমি নিজে বহুত মাইনষের কাল হইছি, যারা বিশ্বাসী–ধর্মে, পালনকর্তায়। কিন্তু ওদের ধর্ম আর পালনকর্তা ওদেরকে আমার হাত থেকে রক্ষা করে নাই। যেমনটা আমারে করে নাই!''

কাধ ঝাঁকাল জয়।হতাশ সুরে চোখ ফিরিয়ে বলল মুরসালীন, ‘‘তুই জন্মেইছিস অবিশ্বাসী হয়ে, জয়। যে পঙ্গু কারণগুলো তুই তোর খোদাদ্রোহ অথবা দেশদ্রোহের দেখাস, তা শুধুই তোর স্বার্থপরতার বহিঃপ্রকাশ।''

জয় মুচকি হাসল, “এই অবিশ্বাস আমার খুঁটি, মুরসালীন। আমি বিশ্বাস করতে জানলে কবে কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাইতাম। আমি আমাকে মানি, শুধু আমাকে। কিন্তু যখন বিশ্বাসের কথা ওঠে, আমিও আমার কাছে বেকার। আমি শুধু মানি, জয় আমির নিজে নিজেকে বানিয়েছে অপরকে ভেঙে, সে হাসতে শিখেছে মানুষকে কাঁদিয়ে। মানুষ তারে নিজ থেকে কিছু দেয় নাই, মাঝেমধ্যে তো বাঁচার জায়গাটুকুও দিতে চায় নাই! তোর আল্লাহ কিছুই দেয় নাই তারে। একটা পরিবার, একটা ঠিকানা, একটু সঙ্গ, একটু স্নে......এই অ-ভরসা তোর ধর্মের হাতে কামানো। তোর ধর্ম তোরে কী দিছে?

এই বন্দিদশা?"-"বন্দি তো তুইও! তোর নফসের কাছে বন্দি, তোর অপ্রকৃতিতস্থ, বিকৃত চিন্তাধারার কাছে বন্দি। মদ ও পাপ সেই কারাগার, যা মানুষকে সাময়িক সস্তি দেয়, সাথে দেয় চিরস্থায়ী বন্দিত্ব। এই দুটোর মাঝে বিরতি এলেই পাপী ও নেশাগ্রস্থর ছটফটে মৃত্যু অনিবার্য! তোর রুহ্ সেই পাপের কাছে বন্দি।"

ঠোঁট বাঁকাল জয়, "আর তুই অন্ধবিশ্বাসের কাছে। দেখ ভাই, আমি বিশ্বাস করি না। আমার জীবনডা খারাপ। তুই একজন খাঁটি বিশ্বাসী, ভালো লোক। তোর জীবনডা আরও খারাপ। তাইলে বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসীর

পরিস্থিতি যদি একই হয়, আমি খালি খালি আমার বিশ্বাস খরচা করবডা ক্যান? বিশ্বাস বেচে একদিন বড়লোক হবো আমি।”

মুরসালীন দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল, “বিশ্বাস করতে শক্তি লাগে। অসীম শক্তি। তুই ভীষণ দূর্বল, জয়। বিশ্বাস হলো কাঁচ। যা ঠুনকো আর ততটাই ধারালো। যখন-তখন ভেঙে যাবে আর তা বিঁধলে সেই রক্তক্ষরণে তোর মৃত্যুও হতে পারে। কাচ ভীতুদের হাতিয়ার হতে পারে না। কাচ নিয়ে খেলতে সিনা চাই বিশাল। তুই ভীতু। তোকে সামান্য আঘাতেও ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলা

যায়। আর সেই ভাঙনটা ধরে ভেতরে। যেটা আরও ভয়ানক।''

জয় মাথাটা নত করে নিঃশব্দে হাসল, “তুই আমার অতখানি সহ্য করিস নাই।''

মুরসালীন হেসে উঠল, “তাই তো। আমি তোর অতখানি সহ্য করিনি, তোর চেয়ে বেশি হয়ে গেছে।''

জয় আলতো মাথা নাড়ে, “তাই নাকি?

''-“আমি-তুই শুধু পথের বৈপরিত্যে আলাদা, নয়ত আমার কাছে সবরকম সুযোগ ছিল তুই হয়ে যাবার!''

জয় দু'পাশে মাথা দুলিয়ে হাসল, “আমি হওয়া সহজ না।''

-"খুব সহজ। তুই হওয়া খুবই সহজ।"
-"বলিস কী? প্রসেসিংটা বল তো! আবার জন্মাইলে সহজ পদ্ধতিটা ট্রাই করব জয় আমির হবার। প্রসেসিং কী?"
-"পঙ্গু দৃষ্টিভঙ্গি, ঠুনকো বিশ্বাস, অপাত্রে কৃতজ্ঞতা, একপাক্ষিক বিচার, স্বার্থলোভী ধর্মভরসা...!"
-"আবার সেই ভরসা- বিশ্বাসের প্যাঁচাল! সম্বন্ধির ছাওয়াল আমি অবিশ্বাসী তাতে তোর আব্বার কী হে? তোরে তো আমি আমারে হেদায়েতের নসিহত করতে বলি নাই!"
-"ধর্ম ছাড়া যে কেউ তুই। আমিও হয়ে যেতাম। ওই যে বললাম সব সুযোগ ছিল।

শুধু পারিবারিক শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গিটা আলাদা হওয়ায় আজ আমি-তুই প্রধান বিরোধী!

''–"আমার তো পরিবার নাই!''

-"আমার কাছে যে পরিবার ও শিক্ষা ছিল তা অন্তত তোর কাছেও ছিল! কিন্তু সেটাকে তুই ভরসা করিসনি, উল্টো ঘেন্না করেছিস, সেই শিক্ষাগুলোকে শত্রু মেনে নিয়ে সেটার বিরুদ্ধে বরং লড়াই করেছিস।''

জয়ের নাক শিউরে উঠল, "তোর-আমার পরিস্থিতি কি এক ছিল?''

মুরসালীন জবাব দেয়, আংশিক না। পরে হ্যাঁ। তুই আমার আব্বাকে মেরেছিস, তখন আমরা তিন ভাইবোন অন্তত ততটুকু ছোট,

যখন আব্বাকে আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার ছিল। কিন্তু সেই বয়স থেকে দলীয় হামলায় যাযাবর জীবপ-যাপন করেছি আম্মাকে সাথে নিয়ে। শেষমেশ আব্বার বদৌলতে মুরসালীন একটা চাকরি পেল, কিন্তু তাকে সরিয়ে দেয়ার নির্দেশ এলো। এই আমি জেল খাটা, পুলিশের হয়রানী, তোদের দাবরানি খেতে খেতে অনার্স পাশ করলাম। তোর শরীরের আঘাতের চিহ্ন গুণে আমার সঙ্গে মিলিয়ে নিস, পূর্ণ আছে। তারপর আমার বোন...''মুরসালীন কেমন কোরে যেন হাসল এই পর্যায়ে, "পার্থক্য হলো এসব আমাকে আমার পথে আরও অটল করেছে, আর

তোকে ছিটকে বিপথে নিয়ে ফেলেছে। পার্থক্য ওই বিশ্বাস আর দৃষ্টিকোণের! আজ এতগুলো দিনে আমার রক্ত ছাড়া আর কিছু বের করতে পারেনি তোর গুরু। হয়ত এটা আমার বিশ্বাস, আমার ধর্মবিশ্বাস, আমার একত্ববাদ.. তুই স্বার্থে আল্লাহকে তোর রক্ষার হাতিয়ার কল্পনা করেছিস, কখনও তাকে বিশ্বাস, মনে-প্রাণে ভরসা অথবা পালন করিসনি। তোকে বলা হয়েছিল, আল্লাহ রক্ষাকর্তা। যখন তোর বিপদ এলো, তোর আল্লাহর কথা মনে পড়ল। কিন্তু বিপদ রক্ষা হলো না, তুই বিমুখ হয়ে গেলি! ধর্মবিশ্বাস তোর কাছে বিপদের হাতিয়ার হয়েছিল, জীবনটা তোর কাছে

এক্সপেরিমেন্টাল হয়েছিল। তুই তোর চাচার ধাচে গড়ে ওঠা এক অন্ধ, স্বার্থন্বেষী!''

-"ইনডাইইরেক্টলিও স্বার্থপর বলিস না আমাকে। আমার ভেতরে বেঁধে। ভায়োলেন্স হয়ে যাইতে পারি।''-"ঠিক আছে। ডাইরেক্টলি বললাম। তুই খুব নিম্নমানের স্বার্থবাদী, সুবিধাভোগী মানুষ।'(

জয় মাথা নাড়ল, "মেজাজ বদলাস না আমার। বড়বাবা আসবে না এখানে। আমাকে বল।''

দোলন সাহেব হেসে বলে উঠলেন, "মুরসালীন মহান, সেই একটা জয়নাল আমির তো তোমার ভেতরেও আছে!''

মুরসালীন ইঙ্গিত বুঝল। তার চোখদুটো দিয়াশলাইয়ের কাঠির মতো জ্বলে উঠল, সেই চোখ সামলে অদ্ভুত হেসে বলল, “আমি মুরসালীন পাঁচশোবার জন্মালে হাজার বার আমার বোনের ধর্ষককে বলি দিয়ে সেই রক্তে গোসল করব, স্যার। এখানে কোনো যুক্তি-তর্ক, ঠিক-বেঠিক, আইন-ধর্মের কোনো ঠাঁই নেই। এসবে কোনো আফসোস ও পাপের চিন্তা আমি রাখিনি ভেতরে। শুধু জানি, আমার বোনের ধর্ষকের রেহাই নেই, যতদিন আমার শ্বাস চলছে। হুমায়ুন পাটোয়ারীর মৃত্যু আমার হাতে লেখা ছিল, আরেকজনেরটা বাকি।

"দোলন সাহেব জানালেন, "তারটা তোমার হাতে লেখা ছিল না।"

মুরসালীন ভ্রু জড়াল, "পলাশ আজগর মরে গেছে, স্যার! কে মেরেছে?"

দোলন সাহেব চুপ রইলেন। অথচ মুরসালীন চট করে ধরে ফেলল ব্যাপারটা, "কেন? জয় তার দোসরকে মেরে ফেলেছে কেন? ও কি ওর কোনো শুভাকাঙ্ক্ষীকেই মৃত্যু ছাড়া অন্য প্রতিদান দেয় না? কী চলছে বাইরে?"

দোলন সাহেব প্রসঙ্গ ধরলেন, "জয়নাল আমিরের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা কেন, মুরসালীন? জয়নব ও জেবাও জয়নালের বোন ছিল, মুরসালীন।"

মুরসালীনের চোখ কি ভিজে উঠেছে! বিস্মিত হলো তাকে দেখা মানুষগুলো। এই মুরসালীন রক্তে গোসল করে উঠলেও পাথরের মতো অনড়, আজ তার কণ্ঠস্বর ভেঙে এসেছে। মুরসালীন তা লুকোতে আলগোছে হেসে উঠল, "এই দুনিয়ার প্রত্যেকটা ভাই একেকটা জয়নাল আমির হোক! আমিও জয়নাল আমির, স্যার! কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, আমার জয়নাল আমির'ত্বে নিজের বোনের ইজ্জতের বদলে অন্যের বোন-মায়ের ইজ্জতের নেশা নেই। যা আমির বংশে আছে।"-"আমার জানামতে জয় তখন দিনাজপুরে ছিল না।"

-“যায়-আসতো না, স্যার। ভাড়াটে লোক দিয়ে সৈয়দ বাড়ির নারীদের ইজ্জত ছিনতাই করা মানুষের ভাতিজা জয়। ইজ্জতের বদলে ওরা ইজ্জত নিতে জানে, স্যার। নিজের স্ত্রীকেও ছাড় দেয়নি। সেই ইতিহাসও পড়া আমার।”

অন্তূ আশ্চর্য হয়ে বসে পড়ল মেঝের ওপর। জয় এখনও সেই ঢালাই মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে। একটাবারও চোখ তুলে তাকায়নি, যতক্ষণ দোলন সাহেব ও মুরসালীন কথা বলেছে। অন্তূ অন্তত এবার আশা করেছিল জয় মুরসালীনকে কঠিন আঘাত করবে। জয় ঝুঁকে বসে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি কপালে ঘঁষছে। মুখটা শক্ত, নাকের পাটা

শিউরে উঠেছে, কিন্তু শান্ত! চাপা অস্থিরতা কপালের ভাঁজে দেখা গেল। একহাতে তখনও অন্তূর হাত।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে জয় কেবল জিজ্ঞেস করল, "জিন্নাহরে কে মারছে মুরসালীন?"

দোলন সাহেব কিছু বলতে গিয়েও থামলেন। আর লাভ নেই। মুরসালীন চোখ দুটো আলতো করে বুজে হাসল, "তোর গুরুকে জিজ্ঞেস করতে হবে।"জয় মুখ তুলে চাইল। অনিয়ন্ত্রিতই তার হাতের মুঠি শক্ত হয়ে অন্তূ হাত শক্ত করে চেপে ধরল আরেকটু।

মুরসালীন হাত নেড়ে বিদায় জানাল, "যাহ্ এখন। আর কথা বলতে ভালো লাগছে না।"

মুরসালীন আর তাকাল না জয়ের দিকে। সে তার ছেঁড়া শার্টের একপ্রান্ত ছিঁড়ে শরীরের ধুলোবালি ও শুকনো রক্ত মোছার চেষ্টা করল। তাজা ক্ষততে পানি লাগলে ভীষণ জ্বালা ধরে। আশেপাশে পানিও নেই। মুরসালীন তায়াম্মুম করে ফজরের নামাজে বসল।জয় আস্তে কোরে উঠে দাঁড়াল অন্তূকে নিয়ে। অনেকক্ষণ ওভাবেই দাঁড়িয়ে রইল স্থির হয়ে। তিনটে দেহ অচেতন হয়ে পড়ে আছে। হাসপাতালে পাঠানো দরকার। তার সেসব আর ইচ্ছে করছে না। এমপি সাহেব এদের অবস্থা জানার পর আরেকটা ঝড় আসবে।

আসতে পারে আরমিণের ওপরও! কিন্তু জয়ের মাথাটা ফাঁকা লাগছে।

মুরসালীন নামাজে সালাম ফিরিয়ে বসল, তখনও জয় দাঁড়িয়ে। তার আশপাশে অনেকগুলো ছোট ছোট দেহ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে শুয়ে আছে। দু একজন ঘুম ভেঙে আধো চোখ খুলছে আবার শরীরের ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ছে।

জয় খানিক পরে সব ওভাবেই ফেলে অন্তূকে নিয়ে দোতলায় উঠে এলো। অন্তূর শরীর চলছে না। কোনোরকম সে অযু করে এসে নামাজে বসল।কোনো কথা নেই। খানিকটা দূরে বসে জয় মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে বসে

মন ভরে খানিকটা মদ খেলো। এরপর শরীরে একটা সাডেটিভ ইঞ্জেকশন পুশ করে শুয়ে পড়ল।

সারাদিন একটানা ঘুমিয়ে ঘুমটা ছুটল মাগরিব আজানের পর। অন্তূ নামাজে বসেছে। জয় চোখ বুজে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। কিন্তু এর মাঝে অন্তূ আচমকা নামাজের মাঝে উঠে বাথরুমে দৌড়ায়। তার পায়ের আওয়াজে ঝিম ছেড়ে গেল জয়ের। এক দৌড়ে বাথরুমে পৌঁছে অন্তূকে ধরল, "কী হইছে? এই মেয়ে!
"

অন্তূ তাকাল। জয় আবার শুধায়, "কী? ওইভাবে দৌড়ায়ে আসলা ক্যান? শরীর খারাপ?"-"উহু!"

অন্তূ জয়কে ছাড়িয়ে চোখে-মুখে পানি দিলো। তখনও কপাল কুঁচকে তাকিয়ে আছে জয়। অন্তূ বলল, "আপনার বড়ঘরে গেলেই আমার শরীর খারাপ হয়। তার ওপর আপনার যা মন মাতানো জীবনের গল্প! মানসিক ভাবে খালি পাগল হওয়া বাকি। আর তো শরীর! আমি ঠিক আছি। আপনার খাবার বাড়া আছে। খেয়ে আসুন।"

জয় আচমকা অন্তূকে পাঁজাকোলে তুলে নিলো। অন্তূ ঘটনার আকস্মিকতায় মৃদু

চেঁচিয়ে উঠল, "এই এই! জয়। নামান আমাকে। নেশা চড়ে গেছে আপনার। নামান, নামান! পড়ে যাব আমি। এটা কী ধরণের কাজ? নামান! আল্লাহ!"

গম্ভীর মুখে বলল, "চুপ। আমার সাথে ছলনা করবে না। নেশা করে কেন, মরার পরও তোমার বোঝা ওঠানোর সাধ্যি আছে জয় আমিরের। ঘুমাইছো? নাকি সারাদিন সংসার সামলানোর নাটক করছো? কী হইছে তোমার? চেহারার এই হাল কেন?"-"আমার সত্যি কিছু হয়নি। আশ্চর্য! দিব্যি ভালো আছি আমি। আপনার মতো আনহাইজিনিক

পরিবেশে কমফোর্ট থাকার অভিজ্ঞতা নেই আমার।''

জয় অন্তূকে বিছানায় টানটান শুইয়ে দিয়ে ওভাবেই ঝুঁকে রইল। জয়ের চোখে চোখ পড়লে অন্তূ মুখ ফেরায়।

জয় আচমকা অন্তূর গালটা ধরে নিজের দিকে ফেরালো, ‘‘আমার দিকে তাকাও! কী হইছে? কেমন লাগতেছে? আমি তোমার জীবনে কাল হয়ে তো বহুকাল আগেই আসছি, কিন্তু শরীর-চেহারায় এইরকম দূর্বলতা নতুন। অসুস্থ তুমি? ঘুমাওনি?''অন্তূ অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। জয় কখনোই এভাবে নমনীয়তার সাথে, এমন হুটহাট তাকে ছোঁয় না। ইগোর

চোটে ছোঁয়-ই না বলা চলে। অন্তূ জয়ের হাত সরিয়ে দিয়ে বলল, “কিচ্ছু হয়নি। ঘুমেরই অভাব। এই যা!”

জয় সোজা হয়ে বসল বিছানায়, একটা বড় করে শ্বাস ফেলে আড়মোড়া ভাঙল। চট করে নিজের চিরায়ত রূপে ফিরল, “আমার ধারণা আমার এত দুক্কের গল্প শুনে আপনার উপরে তুমার একটা পিরিত পিরিত ভাব আইছে। নতুন প্রেমের আছড়। ঠিক না, ঘরওয়ালি?

”অন্তূ চোখ বুজে ঘাড় কাত করে শুয়ে বলল, “আপনি আমার সেরকম স্বামী নন। আপনি স্বামী হবার আগে আসামী আমার! আপনার

সামান্য একাংশের প্রেমে পড়াই যায়, অথচ বাকি অধিকাংশকে এড়ানোর উপায় কই!’’

জয় কিছুক্ষণ চুপচাপ দেখল অন্তূকে। অন্তূর সৌন্দর্যে একটা ম্লান ছায়া পড়েছে। উজ্জ্বলতা হারানো মৃত তারকার মতোন এক অন্ধকার নেমেছে। জয়কে কেউ ভেতর থেকঃ ডেকে শুধায়, ‘এর দায় তোর নয় তো, জয়!’

জয় অস্বীকৃতি জানায়, ‘আমার কেন?’

ভেতর থেকে উত্তর আসে, ‘তুই যে সৌন্দর্য খুঁজছিস তা আমজাদ আলী প্রামাণিকের মেয়ের, তুই যা দেখছিস তা তোর স্ত্রীর! তাহলে দায় কার?’‘স্ত্রীর!’ কথাটা বিঁধল ভেতরে। আজ এই কথাটাকে নিয়ে মুরসালীন

অপমানজনক ইঙ্গিত করেছে। জয়ের ভেতরে একটু আক্রোশ জেগে উঠল। তার স্ত্রী, অথচ সে-ই আসামী! এমনটাই তো বুঝিয়েছে মুরসালীন!

এখনও মেয়েটার শারীরিক সৌন্দর্য অক্ষত। চিকন স্বর্ণের চুড়ি পরা হাতদুটো বুকের ওপর ভাঁজ করে শুয়েছে। সেই হাতদুটো সুন্দর। জয়ের চোখে অন্তূর শরীরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ, অন্তূর গলার নিচটা। ফর্সা গলায় স্বর্ণের চেইন। বরাবর জয়ের চোখ লেগে যায় ওখানে।

জয় অন্তূকে ডিঙিয়ে ওপাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল। অন্তূ উঠে বসে। জয় চোখ বুজেই হাত

চেপে ধরল, “উঠো না, ঘরওয়ালি। শুয়ে থাকো আমার সাথে।”

-“নামাজ শেষ হয়নি আমার। খেয়ে আসুন আপনি।”জয় অন্তূর হাত আরেকটু চেপে ধরে বলল, “নামাজ কাজাও পড়া যায়। আমি একটু ঘুমাবো তোমাকে সাথে নিয়ে। শরীর-মেজাজ কোনোটাই ভালো না। আমার পাশে শুয়ে পড়ো।”

অন্তূ কপাল জড়িয়ে তাকাল জয়ের দিকে। নিশ্চিন্তে চোখ বুজে শুয়ে আছে। শক্ত করে চেপে ধরে আছে অন্তূর হাত। এই কাজটা আজ সারারাত থেকে এখন পর্যন্ত বেশ কয়েকবার করেছে।

অন্তূ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে হঠাৎ-ই জিজ্ঞেস করল, "জিন্নাহ আমিরকে যদি হামজা সাহেব মেরে থাকেন!'

জয় চোখ খুলে সোজা অন্তূর চোখের দিকে তাকায়। নির্ঘুম চোখদুটো লাল, সজাগ।সৈয়দ ফরহাদ মুহাম্মাদ বারীকে মেরে জয় পাগল হয়ে উঠল জিন্নাহ ও তার মাকে খুঁজতে। পেলো না। চারদিকে তোলপাড় উঠে গেল ব্রিগেডিয়ারের মৃত্যুর খবরে, যেখানে তখন বাংলায় তাদের অনুকূল সময় চলছে। সিনিয়র বিগ্রেডিয়ার বারী সাহেবকে প্রমাণহীনভাবে খুব সহজে মারতে পারার পেছনে অবশ্য একটা কারণ ছিল। জয় খুব

সহজে ফরহাদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেয়েছিল, সেটাও একান্তে, ফরহাদ সাহেবের রাজধানীর ফ্ল্যাটে। দিনের বেলা।জয় চলে আসার পর তিনি অধীর অপেক্ষা করেছেন, জয় দেখা করতে আসবে, একটাবার হলেও আসবে। জয় যায়নি। ফরহাদ সাহেব জানতেন জয় তাঁকে বড় ঘৃণা করে। কিন্তু তবু আশা রেখেছিলেন। বাঁকা জয়ের প্রতি একটা অঘোষিত স্নেহ তাঁর জমেছিল ভেতরে।

জয় অবশেষে উনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। মানুষটা ভীষণ খুশি হয়েছিলেন। আবার একটু লজ্জিতও। জয় নিশ্চয়ই জবাবদিহি চাইবে–

কেন তিনি জয়ের বড়বাবাকে মেরেছেন?
জেদি ছেলেটা কর্তব্যের মানে বুঝবে না।
যাকে ছোটবেলায় নৈতিকতা শেখাতে গিয়েই
নেতিবাচক চরিত্রে পরিণত হয়েছে তিনি।
জয় কেবল একটা কথা জিজ্ঞেস করেছিল,
“বড়বাবাকে মারলেন কেন, স্যার?”
ফরহাদ সাহেব একটু কথা গুছিয়ে নেবার
ফাঁকে জয় আবার বলে, “আপনি জানেন
আমার কেউ নাই। আমার খাতিরে ছেড়ে
দিলেন না কেন? সব তো কেড়ে নিছেন।
দেখেন, আপনারা সফল। আমার কাছে কেউ
নাই, কিচ্ছু নাই। আপনি আমার বড়বাবাকেও

নিয়ে নিলেন। কেন, স্যার? আমি তো আপনার কিছু ক্ষতি করি নাই! করছি, স্যার?'' বারী সাহেব সামান্য হেসে জয়কে হাত নেড়ে কাছে ডেকে বলেছিলেন, "তুই যে আইন মানতে নারাজ রে আমিরের ব্যাটা! নয়ত তোরে বুঝাইতাম!''

-"আইন সব আপনাদের কেন? আমরা কেন আইন পাই না? আইন তো আমাদেরও দরকার পড়তে পারে, স্যার! পাই না কেন? ''জয় আমির কাঁদতে পারবে না। তাই শুধু তার চোখের মণির শিরা লাল টকটকে হয়ে উঠল। নয়দিন আগেও সে তার বড়বাবার স-ঙ্গে দেখা করবে ভেবে উত্তেজনায় কাঁপছিল।

তার মনে পড়ে গেল, সেই বড়বাবাকে চিরতরে তার কাছ থেকে সরিয়ে নেবার হুকুমদাতা বিগ্রেডিয়ার তার সামনে। জয় প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা করার ধৈর্য পায়নি। শেষ মুহুর্তে ফরহাদ সাহেবের মুখে একটা জ্যোতিময় হাসি ফুটে উঠেছিল। সেই হাসিতে ব্যথা ছিল, ছিল মলিনতা! তার চোখদুটো গভীরভাবে শুধু জয়কেই দেখছিল। তিনি শুধু বলেছিলেন, "তুই এই পথে যাবি বলেই আশংকা করেছিলাম রে আমিরের ব্যাটা! দো'আ থাকল, আল্লাহ তোরে পথ দেখান! ধৈর্য দিন!"

তিনি অস্পষ্টভাবে কালেমা শাহাদত পড়লেন–'আশশহাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহ্...' জয় সেসব কিছুই দেখতে পায়নি। তখন তার চোখের সামনে এক অবরুদ্ধ নিশীথের আঁধার পর্দা। সেই পর্দায় বড়বাবার কঠিন মুখটা ভাসছে। জয় শেষবার সেই রাতে বড়বাবার কোলে চড়ে যে বড়বাবার চেহারাটা দেখেছিল–অভিজাত, কঠিন লাল, গম্ভীর মুখখানা! সে সেই মুখখানা দেখতে দেখতে বড় নৃশংসতার সাথে ফরহাদ সাহেবকে খু''ন করে ফেলল। বড়বাবা তাকে তখনও বলছে, 'হাসবি শুধু। হাসবি, জয়। হাস্!'জয় হাসল। ফরহাদ সাহেবের রক্তে মাখা হাত টিস্যুতে

মুছতে মুছতে জোরে জোরে হাসল। চোখদুটো জ্বলছে। তখন জয় আরও জোরে জোরে হাসতে হাসতে নির্জন সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো।

দিনাজজপুর ফেরার পর হামজা জয়কে আবার পাঠিয়ে দিলো রাজন আজগরের কাছে। তখন রাজন আজগর নিজেই দেশে ছিলেন না প্রাণ বাঁচাতে। কিন্তু তার লোকেদের সঙ্গে জয় রাজধানীতে থাকতে পারবে।

জয়কে পাওয়া গেল না বলে হামজাকে রিমান্ডে নেয়া হলো। উল্টো করে ঝুলিয়ে কাঁচা বাঁশ দিয়ে পেটানো হলো। ত্বকের নিচে রক্ত

জমাট বেঁধে কালশিটে ধরে গেল। পাথরের দেয়ালে আঘাতের প্রতিধ্বনি ওঠে, তবু হামজা বলে না, জয় কোথায়। জ্ঞান হারিয়ে ফেলার পর সামান্য চিকিৎসায় আবার চেতনা ফেরানো হলো তার।

একুশ বছরের এক যুবকের এই সহনশীলতায় কর্মকর্তারা হয়রান হলেন। হামজাকে আশ্বাস দিলেন, "আমরা শুধু জয়কে জিজ্ঞাসাবাদ করব। তুমি বলছো সে খু-ন করেনি। তাহলে সামনে আনতে সমস্যা কোথায় জয়কে?"

হামজা বলে, "আমি জানি না স্যার জয় কোথায়? আমি কিছুদিন যাবৎ হলে ছিলাম।

আমার সঙ্গে ওর দেখা হয় না। ও কোথায় আমার জানা নেই।"-"তুমি জয়ের বাপ-মা, তুমিই তার সব, সবাই জানে। অনেকে একই সাক্ষী দিয়েছে। বেশি শেয়ানাগিরি করলে একেবারে ভেতরে ঢুকিয়ে দেব। তখন এই শেয়ানাগিরি পেছন দিয়ে যাবে।"

-"তাই দিন। যেখানে আমি জানিই না জয় কোথায়, তাহলে ভেতরে রাখলেই কী বাইরে রাখলেই বা কী? জয় কিন্তু একদম বাচ্চা ছেলে না, স্যার। আপনারা সন্দেহ যখন করেছেন ওকে, ওর কি জানের মায়া নেই? আপনাদের মিথ্যা অভিযোগের হাত থেকে বাঁচতে পালিয়েছে হয়ত।"

বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন কর্মকর্তারা। হামজার কথায় উনারা নিজেরাই পেচিয়ে গেলেন এই সংশয়ে– আসলেই কি জয় আমির খুনটা করেছে নাকি করেনি!

কিন্তু হামজার ওপর টর্চারিংয়ের চতুর্থ দিন জয় এসে হাজির, সে আত্মসমর্পণ করল। কর্মকর্তারা দুই ভাইয়ের কার্যক্রমে হতবাক হয়ে গেলেন। জয় এসে বলল, "আপনারা নাকি আমারে খুঁজতেছেন?"-"খুন করে পালালে তো খুঁজবোই।

-"পালালে কেউ এসে ধরা দেয় না, স্যার! আর খুন করলেও না। আপনাদের সমস্যাটা হইলো—আসল খুনিকে খুঁজে না পাইলে

আমার মতো দূর্বল, নিষ্পাপদেরকে টার্গেট করেন কেইস ডিসমিস করার জন্য। দুঃখজনক।”

জয়ের কথায় সবাই যেমন বিভ্রান্ত হলো তেমনই ওর দুঃসাহসে হতবাক! জয় হামজার সাথে দেখা করার জন্য সামান্য একটু সুযোগ চাইল। যেহেতু সে নিজে এসে আত্মসমর্পণ করেছে, সে অনেকটা ছাড় পেল। তাকে জিজ্ঞাসাবাদে নেবার আগে হামজার সেলেই রাখা হলো।

হামজা আক্রমণাত্মক হয়ে তেড়ে এলো, “শুয়োরের বাচ্চা। এখানে এসেছিস কেন? মরার এত শখ হয়েছে তোর?”

-"নিজের শখ আমার উপরে চাপাইও না, বড়সাহেব। খুন তো করছিই! তা স্বীকার না করে মার খাচ্ছ তুমি। মরার শখ আমার হলো কীভাবে?"

হামজা গলা চেপে ধরল, "আমি মার খাচ্ছি তাতে তোর বাপের কী? তোকে বলেছিলাম না আন্ডারগ্রাউন্ড থাক। সময় ভালো না! ক্যান আসছিস এইখানে?"

জয় একগাল হাসল, "একা একা মার খাচ্ছ, ব্যাপারটা ভালো লাগতেছিল না। আমার ভাগ নিতে আসলাম। হক ছাড়া যাবে না।"হামজা দিশেহারা হয়ে পড়ল, "বাইঞ্চোদের বাচ্চা! একবার ধরা খাইলে আর ছাড়া পাবি না।

নিশ্চিত মার্ডার! শালার.. তোরে...আমি তোরে কী করব ক তো! এইজন্যে তোরে আন্ডারগ্রাউন্ড করছিলাম রে হারামির বাচ্চা?''

জয় আরাম করে নোংরা মেঝেতে টানটান হয়ে শুয়ে মাথার নিচে হাত দিয়ে চোখ বুজে শুয়ে পা দুলাতে দুলাতে বলে, "তুমি একবার আমারে কইছিলা, 'একসাথে বাঁচতে না পারলে একসাথে মরে যাব। একা একা বেঁচে থাকার দরকার নেই। বুঝলি, জয়?' আইজ তার পরীক্ষা দিবার আইছি। আমার তো কেউ নাই। তোমারে এরা এমনে শ্যাষ কইরা ফালাইলে আমি বাল বাইরে এমনেই মইরা যাইতাম!''

হামজা শক্ত করে জয়ের হাতটা চেপে ধরে ধরেই রাখে। অন্যদিকে তাকিয়ে বলে, “চুপ থাক। তোর কথা কানে ঢুকলে রক্ত গরম হচ্ছে।”জয় বেহায়ার মতো দাঁত বের করে একটু হাসল। এখন তার চোখে-মুখে একটুও ভয় নেই। হামজা মার খাবে আর সে পালিয়ে থাকবে এ আবার কোনদেশি কথা?

জয়কে যখন নিতে আসল ইন্টেরোগেশনে নেবার জন্য, কোনোভাবেই হামজার হাতের বাঁধন থেকে জয়কে ছাড়ানো গেল না। পুলিশ কাঠের লাঠি দিয়ে হামজার কব্জির ওপর মারল এক বাড়ি। খট করে শব্দ হয়ে কব্জিটা বোধহয় ছুটেই গেল! জয়ের হাত ছুটে

গেল। পুলিশেরা একটা পন্থা নীরবেই পেয়ে গেল। হামজার সামনে জয়কে মারতে শুরু করা হলো।

জয়কে প্রশ্ন করা হলে সে উত্তর না দিয়ে বরং উল্টো-পাল্টা প্রশ্ন করছিল। যেমন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, "খুনটা তুই কেন করেছিস, জয়?"

জয় জিজ্ঞেস করল, "খুন করা কি খারাপ?"

-"তোর মতে কি ভালো?"

সে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আমি যদি খুন করি, আমার কী শাস্তি হবে?"

-"প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর তোর ফাঁসি হতে পারে। করেছিস কি না খুন, তাই বল।"

-“খুন যে করবে তারই ফাঁসি হবে?”
-“ধরা পড়লে অবশ্যই শাস্তি হবে।”জয়ের ভেতরে এবার নিজের কৃতকর্মের ওপর দৃঢ়তা এলো। সে একটুও পাপ করেনি। তার গোটা পরিবার খুন হয়েছে। তার বদলে সেই খুনীদেরকে জয় তাদেরকে দিলেই বরং সেটা আইন। গোটা সৈয়দ পরিবারকে মরতে হবে। এজন্য তাকে বাঁচতে হবে। মরতে অবশ্য তার খারাপ লাগে না। কিন্তু শাস্তি না দিয়ে মরা যাবে না।

তাকে মারতে মারতে প্রায় জ্ঞানহারা করে ফেলা হলো। কিশোর বলে ছাড় পেল না সে। কিন্তু স্বীকার করল না কিছুই।

এক সময় কান ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসে জয়ের। মেঝেতে পড়ে নাকে আঘাত পাবার পরেও জয় নিজের সবটুকু চেষ্টা করে নিজেকে আর্তনাদ করা থেকে থামাতে। তার ভয় হয়–তার আঘাতে হামজা নির্ঘাত খুনের দায় নিজে স্বীকার করে বসবে।

হলো সেরকমই। হামজা পুলিশের পায়ের কাছে বসে পড়ল, "জয় কিছু করে নাই স্যার! ওরে মারবেন না।"

-"পুলিশ পৈশাচিক হাসল, তাইলে কি তুই করছিস?"

হামজা চট করে বলে, "হ!"

-“অ্যাহ্!’’“-জি স্যার। মানে খুন করি নাই। কিন্তু আমার অপরাধ আছে, স্যার। জানি কে খুন করছে।’’

জয় তখন শরীরের ভর ছেড়ে চামড়া ছেঁড়া শরীরে মেঝের ওপর পড়ে আছে। আগ্রহ পেয়ে বসল পুলিশ। হামজা সেলিমের নাম বলে দিলো। পুলিশ জিজ্ঞেস করলেন, “সে কেন মারবে বিগ্রেডিয়ারকে?’’

হামজা জানালো, “কারণ সেলিম বারী স্যারের মাদ্রাসায় কিছু বছর আগে আগুন দেবার সময়ও আমাকে কাজে লাগিয়ে কিছু বছর আগেও একবার সেই মাদ্রাসায় আগুন দিয়েছিল। তারপর মাদ্রাসা থেকে খুব মারধর

করে তেড়ে দেয়া হয় সেলিম কাকাকে। সেই রাগ...''-“তো তুই বলতে চাচ্ছিস, সে এবার বারী সাহেবকে মারতেও তোকেই ব্যবহার করেছে?''

-“হ্যাঁ, স্যার। জয়কে বারী সাহেব খুব ভালোবাসতো। আমাকে হুমকি দিয়ে সেলিম জয়ের মাধ্যমে বারী সাহেবের সাথে দেখা করার সুযোগ করে নিছিলো স্যার। আমি জয়কে পাঠাইছিলাম সেলিম কাকার সাথে। এই আমার অপরাধ। কিন্তু জয় খুন হওয়া দেখেনি। ওকে বের করে দিয়েছিল সেলিম কাকা। আর ওর সিড়ি বেয়ে নামাই দেখেছেন

আপনারা। তারপর আর সেলিম কাকার সাথে দেখাও হয় নাই আমাদের।”

প্রমাণের অভাবে আরও কিছুদিন টর্চার করে ফায়দা না পেয়ে দুই কিশোরকে ছেড়ে দেয়া হলো বটে। এবং হামজার কথা বেশ বিশ্বাসযোগ্য হলো, কারণ সেলিম আসলেই নিখোঁজ ছিল। এই কাজটা হামজার বড়ভাইয়েরা অন্তত করেছিল হামজাকে রক্ষা করতে। সেলিমকে সাময়িক গুম করা হয়েছিল।সেলিমের লুকিয়ে থাকার ব্যাপারটাতে মুস্তাকিনসহ সংগঠনের সবাইও হামজার স্টেটমেন্ট আরেকবার বিশ্বাস করল। কারণ সেলিমের দ্বারা এমন কিছু অসম্ভব

নয়। আবার সে খুনের পরপরইআ লাপাতা। আবার সে জয় চলে আসার পরপরও সত্যিআ অনেকবার মাদ্রাসা ও জয়-হামজাকে একাধিকবার ক্ষতিগ্রস্থ করার চেষ্টা করেছে। জয় ও হামজার ভালো চিকিৎসা হলো না। কারাগারের মারগুলো শরীরে বসে গেল। সদ্য যুবক বয়সে হামজার উচ্চ রক্তচাপসহ হৃদযন্ত্রে বিভিন্ন রোগশোক দেখা দিয়েছিল এতে। দিনদিন এসব ঘটনাবলী হামজার ভেতরে পৈশাচিকতার ভাণ্ডার গড়ে তুলছিল। তার কেবল ক্ষমতাই চাই, ক্ষমতা!

সেই মারের আঘাত কাচা থাকতে থাকতেই জয় নিখোঁজ হলো। সেলিম ফারুকী বড় সূক্ষ্ম

কৌশলের সঙ্গে জয়ের মস্তিষ্ক ও শরীরকে একসাথে ধ্বংস করার কৌশলে মজলেন। অন্ধকার কবরের মতো কোথাও একটা তাকে আটকে রাখা হলো মাসখানেকের মতোন। সেলিম ফারুকী জয়ের সাথে সেই দিনগুলোতে যা যা করেছিল, জয় সেই সময়টা মৃত্যুর সঙ্গ নিয়ে বেঁচে ছিল। কিন্তু মৃত্যু এবারও তার সঙ্গে প্রতারণা করল। সেলিম ফারুকীর কৌশলী টর্চার জয়ের মস্তিক ও শরীরের চিরস্থায়ী ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হলো। জয়ের মাংসপেশী ও রক্ততে বিভিন্ন আজব উপসর্গ দেখা দিয়েছিল এ সময়।

সেখান থেকে ফেরার পর থেকে জয়ের মাংসের ভেতরে কামড়াতো। নাক দিয়ে রক্ত পড়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন ভয়ানক উপসর্গ ও শরীরের যন্ত্রণা! ড্রাগে আচ্ছন্ন হয়ে উঠল সে। সেলিম ফারুকীর ইনজেক্ট করা অবিরাম ড্রাগ জয়কে ড্রাগের প্রতি নির্ভরশীল করে তুলল।নিয়মিত সেবনের জন্য যেসব মেডিসিন ডাক্তার দিলো, তা তাকে কোনোদিন গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। ডাক্তার একটা চমৎকার ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন, জয়ের লোহিত রক্তকণিকার গুণগত মান নষ্ট হবার পথে। এবং সে যে সকল ড্রাগে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, তা তার শরীরের নষ্ট কোষের বৃদ্ধিতে বেশ

ভালো সহায়তা করছে। এটা ভবিষ্যতে ব্লাড-ক্যান্সারের রূপ নিতে পারে। জয়ের শরীরের ব্লাড-করপাসলের মাদার-সেলগুলো সব মিলিয়ে খুব খারাপভাবে ক্ষতিগ্রস্থ।

তিনটে বছর মুস্তাকিন বিশ্বাস করেছিল–তার আব্বাকে সেলিম মেরেছে। সে সময়টা সে হন্য হয়ে সেলিমকে খুঁজেছে। কিন্তু সেলিম সন্দেহের দায়ে পলাতক। এতে আরও বিশ্বাসযোগ্য হয়েছিল সে অপরাধী।

কিন্তু ২০০৬ এর শুরুর দিকে মুরসালীন জানতে পারল সেলিম মারেনি, মেরেছে জয়। যে জিন্নাহকে জয় বছরের পর বছর খুঁজে পায়নি, সেই জিন্নাহ আমির মুরসালীন ও

তাদের সংগঠনের নেতাকর্মীদের হাতে বন্দি হলো জয়কে ধরার টোপ হিসেবে।সময়টা হামজা ও জয়ের জন্য অতিরিক্ত প্রতিকূল হয়ে উঠেছিল। তখন বিরোধী সরকারের সময়সীমা প্রায় শেষের দিকে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসার সময় হয়ে এসেছে প্রায়। হামজা ও জয় জানের মায়া ত্যাগ করে নিজেদের দলীয় প্রচারণায় নামলো। তাদের শেষ সুযোগ এটা! এবার দল ক্ষমতায় আসতেই হবে, অন্তত তাদের দুজনের অনেক পুরোনো হিসেব চুকানোর দায়ে হলেও। সে সময় জিন্নাহকে ছাড়িয়ে আনতে জয় পাগল হয়ে উঠেছিল। তার একূল-ওকুলে

কেউ নেই জিন্নাহ ছাড়া! এতে করে বর্তমানের দলীয় কর্মসূচিতে ব্যাঘাত ঘটছিল। যা হামজার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। তাদেরকে জিততে হবে। যেকোনোভাবে। জীবনের হিসেবের খাতাগুলো পড়ে আছে, শরীরের আঘাত, পেটে খিদে, প্রবৃত্তির নেশাগ্রস্থতা, বদলার আগুন....হামজা এগুলোকে এড়ানোর সাধ্যি রাখে না। তাকে জিততেই হবে।

জয় যতটা উতলা হয়ে উঠছিল জিন্নাহকে মুক্ত করতে, একবার ওকে দেখতে, হামজা ততটাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল জয়কে হারানোর আতঙ্কে। সবে তাদের যাত্রা শুরুই হয়নি, তার

মাঝে জিন্নাহ ঢুকে এলো। মুস্তাকিন জিন্নাহর মুক্তির বদলে জয়কে চায়। যেখানে জয়কে নিজের রাখতে হামজা দুনিয়ার সাথে একটা যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেই পারে। জয় তার রগে রগে মিশে যাওয়া সঙ্গদোষ, ডান হাতের মুঠিতে আঁকড়ে ধরার মতো হাত, বুকের সাথে মিশিয়ে পিঠে চাপড় মারার মতোন শক্ত সিনা, জয় তার এক জনমের পাপাচারের সঙ্গী! সে জয়কে ছোট্ট বয়সে জিতে এনেছে। তার রুহ্ না গেলে জয় যাবে না।জয়কে সে আশ্বাস দিলো, নির্বাচনে জিত তাদের হবে। তারপর দুনিয়া তাদের। এখন শুধু প্রচারণার কাজে মন লাগা।

দেশে মার্শাল ল জারী হলো। হামজা সেনাবাহিনীর হাতে মার খেলো। দেহে ছেপে যাওয়া দাগের সংখ্যা বাড়ল, গাঢ় হলো ক্ষতগুলো, ভেতরের আগুন নিভে, ব্যথা গলে তা লাভায় পরিণত হলো। যা জলন্ত কিন্তু শান্ত, গলিত। তা দাউদাউ করে জ্বলে না, কেবল নিঃশব্দে বয়ে যায় জমিন পুড়িয়ে ছাই করতে করতে।

নবম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০০৮ এর ডিসেম্বরের শেষ তারিখে। জিতে গেল হামজার দল। এবার হামজার অধিপত্য বিস্তারে আর বাঁধা এলে হামজা তা মানবে কেন? বাঁধা হয়ে যা আসবে, তা ছাই হবে।

মুস্তাকিনদের ভেসে বেড়ানোর দিন এলো। চারদিকে তাদের আটক, গুম-খুন বাড়ল। সেরকম ভাসমান এক সময় বন্দি জিন্নাহ আমির গায়েব হয়ে গেল তাদের আঁটকখানা থেকে। কেউ জানল না জিন্নাহ কোথায়!জিন্নাহ্ আমির হামজার হাতে বলী হয়ে গেল একরাতে। জয়ের শেষ পিছুটানকে মেরে হামজা হাত মুছে ফেলল কালো পাঞ্জাবীর নিচের পৃষ্ঠে। জয় জানেনি তা। দিন যত যাচ্ছিল, জয় উন্মাদ হয়ে উঠছিল জিন্নাহকে পেতে, আর তারল আগ্রাসন বাড়ছিল সৈয়দ পরিবারের প্রতি। যা হামজা চাইছিল ঠিক সেই মোতাবেকই সব এগোলো।

হামজার ওয়ার্কসপ উঠল। বাড়ির নকশায় বড়ঘর তৈরি হলো। নিজে নকশা তৈয়ার করেছিল পাটোয়ারী বাড়ির। বড়ঘরটা দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ৬৫-৩০ ফুট। বড়ঘর তৈরির খাতিরে হামজার বাড়ি মোট মিলিয়ে বিশাল হলো। দোতলার অর্ধেকের বেশি খালি পড়ে থাকে। সেখানটা পরিত্যক্ত।

বড়ঘরের গুদামের অংশে মেটাল-মেল্টিং মেশিন এলো! ২০১২-তে বড়ঘরে সেই ধাতু গলানোর চুল্লিতে সর্বপ্রথম সেলিম ফারুকী গলেছিল। তাকে পিস পিস করে কেটে কেটে গলানো হয়েছিল চুল্লিতে। হামজা কেটেছে,

জয় গলিয়েছে। সেলিমের বাঁ হাতের একাংশ পচে ক্ষয় হয়েছে বড়ঘরেই।

সেলিম ফারুকীর হাতে পাথরের আংটির কমতি ছিল না। অন্তূ প্রথমদিন বড়ঘরে ঢুকে সেই ক্ষয়িত হাতের আংটিগুলো দেখেছিল। মুস্তাকিন মহান পিবিআই ডিপার্টমেন্টে ইনভেস্টিগেটর নিযুক্ত হলো, তখন বাংলাদেশে পিবিআই ডিপার্টমেন্ট পুলিশের এক নতুন ব্রাঞ্চ। চাকরির এক বছরেরও কম সময়েই মুস্তাকিনের দল-বিরোধী তদন্ত কার্যক্রমের ফলে উপর মহল থেকে আদেশ এলো তাকে প্রথমে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে পরে দুনিয়া থেকে।

কিন্তু জয়ের বদৌলতে মুস্তাকিনের জায়গা হলো, হামজার বড়ঘর। সময় ২০১৩ এর শেষের দিকে।

মুস্তাকিনের চেহারার সাথে খুব বেশি মিল ছিল মুমতাহিণার। মিল-মহব্বতও বেশি দুই ভাই-বোনের। মুস্তাকিনের চেহারায় নমনীয়তার সাথে বীরত্বপূর্ণ তেজ বেশি লক্ষ করা যায়। এক গাল মাঝারি চাপদাড়ি। গায়ের রঙ পুরুষ হিসেবে ফর্সা। টাখনু অবধি গোটানো প্যান্ট। মাঝারি চুলগুলো বিন্যস্ত। কপালের মাঝখানে নামাজের কড়া পড়া কালো দাগ। বড় শোভনীয় এক পৌরুষ দীপ্তি চোখে-মুখে। জোরে হাসতে দেখা যায় না লোকটাকে।

মুচকিই হাসিই বেশি। চোখদুটো গভীর, বিচক্ষণ, বিনয়ী!

মুস্তাকিন বড়ঘরের চারদিকটা দেখে নিয়ে হা করে শ্বাস ফেলে মেঝেতে বসল। জয়কে দেখে একগাল মুচকি হাসল, “ভালো আছিস? ”জয় গিয়ে সামনে বসলে মুস্তাকিন বলল, “এখন কী করছিস?”

-“কী করতেছি বললে খুশি হবি? আজ তোর খুশির দিন।”

-“আমার খুশি হবার মতো কিছু করছিস না, তুই। সুতরাং যা বলবি, তাতেই সামান্য দুঃখ পাব। তবু বল।”

জয় দাঁত বের করে হাসল, “আমার অবস্থা মনে কর—’ও দয়াল জান নিবা নাও, দম ক্যা বাইর হইয়া যায়’ টাইপের। গরীব-ধরীব মানুষ, দুক্কের দিন একরকম কেটে যাচ্চে। কিন্তু তাই বলে তোর কোনো দুঃখ আমি রাখব না। তোর দুঃখ দূর করতেই এইখানে আনছি তোরে।”

একটু থেমে খুব জ্ঞানীর মতো করে জয় বলল, “বুঝলি মুস্তাকিন, মাইনষের কপাল আর লুঙ্গির গিট্টু কখন কীভাবে খুলে যায়, কেউ জানে না। আজ তোরটা খুলব।”

পলাশ চেয়ারে বসতে বসতে বলল, “লুঙ্গির না কপালের রে, জয়?”

-“লুঙ্গিরটা খুললে কপাল আপনা-আপনিই খুলে যায়, পলাশ ভাই। কপালের সব নেয়ামত তো লুঙ্গির তলেই!”

মুস্তাকিন জয়কে গভীর চোখে পর্যবেক্ষণ করতে করতে টের পেল কেউ আসছে। ধীর-স্থির পদক্ষেপে হামজা এসে দাঁড়িয়ে ঠান্ডা এক হাসি দিলো, “ভালো আছো?

”-“আলহামদুলিল্লাহ। আপনি ভালো?”

-“সবসময়। তোমার ভালো থাকারও একটা ব্যবস্থা করতে চাই। তোমার জন্য একটা সুযোগ আছে। সেটা জানানোর আলাপ করতেই এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা। তুমি আবার

খারাপভাবে নাওনি তো এভাবে তুলে আনার বিষয়টা?"

মুস্তাকিন হামজার ধূর্ত মুখখানির দিকে চেয়ে হাসিমুখে বলল, "না। আমাকে এখানে আসতে হবে, তা নিয়ে আশাবাদী ছিলাম। তবে আপনার সুযোগ বোধহয় আমি গ্রহণ না করে আপনাকে অসন্তুষ্ট করতে চলেছি, হামজা ভাই। এতে আপনি কিছু মনে না করলেই হলো।"

হামজা বড় উচ্ছ্বাসিত হয়ে হাসল, "তার ব্যবস্থাও আছে, চিন্তা কোরো না, ভাই। আমি আছি না!"

মুস্তাকিন বিরবির করল, “তা তো বটেই! সেই ব্যবস্থা শুরুর অপেক্ষায়।”

পলাশ উঠে এলো। তার হাসিতে বড়ঘর জুড়ে উঠল। সে হাসলে চোখ কুঁচকে ওঠে, তাতে চোখের মণির জ্বলজ্বলে ভাবটা বেশি ফুটে ওঠে। এসেই সে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল মুস্তাকিনকে দেখে।

হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, “গুড জব, ছোটভাই! অল্পদিনের চাকরিতে আমারে একদম নড়চড় করে রেখে দিচ্ছিলে! তোমার তদন্তের কাজে অত্যন্ত সন্তুষ্ট আমি। আরেকটু সুযোগ পাইলে একদম আমারেই খালাশ করে দিতা, কোনো সন্দেহ নাই। সাহসের ব্যাপার-

স্যাপার! গুড জব, গুড জব। আই এপ্রিশিয়েট! গুড।”

মুস্তাকিন একটা দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে বলল, “ধন্যবাদ।”

জয় জিজ্ঞেস করল, “জিন্নাহ কোথায় রে?”-“নেই।”

জয় ভ্রু উঁচায়, “উহ্? কীহ্? শুনি নাই। আবার ক।”

মুস্তাকিন শান্ত চোখে চেয়ে রইল। জয় আবার জিজ্ঞেস করে, “জিন্নাহ্কে ফিরিয়ে দে। তোর জান দেব।”

মুস্তাকিন হাসে, “চেয়েছি?”

জয় মুস্তাকিনের কাধে হাত রাখল, “চাইবি। সত্যি বলছি, বিশ্বাস কর। তুই জান চাইবি আমার কাছে।”

-“হ্যাঁ, আব্বারটা। দে ফিরিয়ে দে।”

জয়ের চোয়াল আটলো, “জিন্নাহ্কে এতদিন আঁটকে রেখে আমারে পাস নাই। নতুন আর কীসের আশায় বাচ্চা ছেলেটারে কষ্ট দিচ্ছিস? আমি শুরু করলে তোর পুরো সংগঠনের রুহুতে কাঁপন উঠাবো। জয় আমির ওয়াদায় পাক্কা।”

“জিন্নাহ্কে ফিরিয়ে দিলে তার বদলে তুই ফাঁসিতে ঝুলবি আব্বাকে খুন করার অপরাধে? দলের নয়জন যুবক তোদের হাতে

বলি হয়েছে, তার অপরাধে? কারাগার ভরে উঠছে দিনে দিনে আমাদের লোক দিয়ে, তার অপরাধে?”

-“অপরাধ? কোনটারে বা তোরা অপরাধ কস, আমি ওই বই থেকে অপরাধের সংজ্ঞা শিখি নাই।”

-“তুই যে বই থেকে অপরাধের সংজ্ঞা শিখেছিস, ওটা মূলত অপরাধ শেখার বই ছিল। ‘অপরাধ কী’ এই বিষয়টা আলাদা বইয়ে শেখানো হয়। ওটাকে নৈতিকতা বলে।

”-“নৈতিকতা আর চিংড়ি মাছ এক আমার কাছে। স্বাদ ভালো, কিন্তু গা চুলকায়।”

মুস্তাকিন জয়কে দেখল। ঠোঁটে ঠান্ডা হাসি, তাতে এক প্রকার হিংস্র উন্মাদনা।

-“জিন্নাহ্কে ফেরত দিবি, মুস্তাকিন? তোর শরীরের নৈতিক রক্ত আমার অনৈতিক হাতে লাগলে চামড়া জ্বলার সম্ভাবনা আছে। যা আমি চাইতেছি না আপাতত।”

-“সমস্যা নেই। শুরু কর। উর্দুতে একটা কথা আছে—কাল করবে তো আজ, আজ করবে তো এখন। করবি যখন, করে ফেল। দ্বিধা কেন? জিন্নাহ্ কোথায় আমি জানি না। মরলেও জানি না, বাঁচলেও জানি না।”

হামজা চুপচাপ মেশিনের খণ্ডের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে ভালো দর্শক। চুপচাপ দেখতে তার ভালো লাগে।

পলাশ মুস্তাকিনের মুখটা মাটিতে ফেলে নিচের চোয়ালটা জুতো দিয়ে চেপে ধরে ঢালাই মেঝেতে ঘষল। তাতে মুরসালীনের চোয়ালের চামড়া ছিঁড়ে যায়। পলাশের বড় শান্তি লাগল তা দেখতে।

পলাশ অমায়িক হেসে বলল, "আমার নামে কমপক্ষে ছাব্বিশটা কেইস খুলছো তুমি, মুস্তাকিন। আমি কি এতই খারাপ? তুমি ভাই মানুষ চেনো না, যারে তারে নিয়া খেলতে আসো। তোমার কাম অপরাধীদের নিয়ে,

আমার পেছনে লাগছো ক্যান? আমি কি অপরাধী? আমি একজন সফল ব্যবসায়ী। তোমার কোনো ধারণা আছে এই খানে আসতে আমার কত পরিশ্রম গেছে?''জুতোর বাঁট দিয়ে মুস্তাকিনের মুখের ওপর কষে এক লাথি মারল পলাশ। মুস্তাকিনের নিচের ঠোঁটটা থেতলে, ফেটে রক্ত ছিটকে এলো। নাক দিয়ে চিরচির করে রক্ত বেরিয়ে এলো। কপালের ত্বক ছিলে গেল, চোখে আঘাত লেগে ঝাপসা হলো চোখ, জ্বলুনি উঠল খুব। মুস্তাকিনের ঠোঁটের রক্তটুকু পলাশ আঙুলের ডগায় তুলে নিয়ে একটু পিছিয়ে দাঁড়াল।

মুস্তাকিন আবার উঠে বসে। ক্ষত-বিক্ষত মুখে তাচ্ছিল্য ফুটিয়ে বলে, “কাপুরুষ গায়ে লেখা থাকে না, পলাশ আজগর। আমি তদন্ত ভরা ময়দানে করে তোর গেইম অভার করছিলাম, আর তুই আমার এক ফোঁটা রক্ত নিতে দেখ কত আয়োজন করেছিস! একজনের জন্য এই ঘরে তিনজন, বাইরে শ খানেক দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছিস। এইটাকেই বরং বীরত্ব ধরে মরি যে এক আমিকে দমন করতে তোদের গোটা ফৌজ দাঁড়িয়ে যেতে হয়। খোলা ময়দানে আমার একার জন্য তুই একা আসতি নাহয়! হারলেও অন্তত এইটুকু আনন্দ তো নিয়ে মরতাম যে জীবনের শেষ মোকাবেলাটা

কোনো পুরুষের সাথে হয়েছিল! এখন তো মরার পরেও এই আফসোস থাকবে যে কতকগুলো কুকুরের দলীয় দংশনে প্রাণ হারিয়েছি আমি সৈয়দ মুস্তাকিন মহান।''পলাশ দুঃখিত ভঙ্গিতে হাসল, "আমি তোর আফসোসের চিন্তা করছি না, ইনভেস্টিগেটর! আমি আমার সৌভাগ্যের কথা ভাবছি যে তোর মতো একজন সৎ, বীর, আইনের কর্মকর্তার মহান শরীরে আমি আমার কুত্তা মার্কা দাঁত বসাতে পারব। এই দুঃখে আমি তোকে জীবিত রাখব, ইনভেস্টিগেটর। পরাগের মাঝে আমি তোর পরিচয় জীবিত রাখব।

ওকে লোক চেনে না, তোর বীরত্বপূর্ণ নামে চিনবে।"

পলাশ অলস পায়ে হেঁটে গিয়ে একটা বস্তা টেনে এনে জয়ের সামনে রাখে। তাতে হকিস্টিক, মেহগনির কাঁচা খড়ি, রড, ছুরি, দা, চাপ্পর, বড় বড় কয়েকটা স্ক্রু-ড্রাইভার, হাতুরি, ছোট্ট কুড়াল, কয়েকটা শাবল ইত্যাদি। বেশ ভার বস্তাটা। পলাশের জোয়ান, বলবান শরীরও ঘেমে উঠল এই খাটুনিতে।

জয় শরীরের শার্ট ও গেঞ্জি খুলে শার্টটা ফেলে দিলো মেঝেতে, গেঞ্জিটা মুস্তাকিনের মুখে গুজে দিয়ে তখন রড দিয়ে পিটাতে শুরু করল, হামজা আস্তে কোরে সেখান থেকে

চলে যায়। সে নতুন বিয়ে করেছে। রিমি জিজ্ঞেস করলে বলবে, সিগারেট টানতে গেছিল। বেশি দেরি করলে কথাটা অবিশ্বাসযোগ্য হতে পারে, কারণ সিগারেট খেতে খুব বেশি দেরি লাগে না।মুস্তাকিনের ডান হাতের কনুইয়ের অস্থি-সন্ধিটা খটাং করে ছুটে হাতটা ঝুলে গেল মোটা ইস্পাত রডের আঘাতে। শরীরের চামড়া উঠে মাংসপেশিগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে উঠে এলো কোনো কোনো আঘাতে। মুস্তাকিন প্রথমবার জ্ঞান হারানোর আগে মুখে গুজে থাকা গেঞ্জির ওপরই একবার বমি করে ফেলল।

জয় ক্লান্ত হয়ে রড ফেলে দেয়। গেঞ্জিটা বের করে আনে। মুস্তাকিন অচেতনের মতো পড়ে রইল। সেদিন জিজ্ঞাসাবাদ আর হলো না। ডাক্তার দু'দিন ধরে চিকিৎসা দিলো মুস্তাকিনকে বড়ঘরেই। ডাক্তার তার জীবনের শেষ চিকিৎসাটা বেশ যত্নের সাথে, ব্যথিত হৃদয়েই করল।

মুস্তাকিনের জ্ঞান ফেরার পর ডাক্তারের দেহটা ধাতু-গলানোর মেশিনের জ্বালানি হয়ে গেল। হামজা ডাক্তারকে বড়ঘর থেকে বাইরে পাঠানোর ঝুঁকি নেবে কেন?

সেই একই প্রশ্ন জয়ের, "জিন্নাহকে ফিরিয়ে দে। তোকে খুন করার খুব একটা ইচ্ছে নেই

আমার।''মুস্তাকিন বুঝেছিল, জয়ের ভেতরের উন্মাদনা। সে যদি বলে জিন্নাহ্ নিখোঁজ, জয় বিশ্বাস করবে না। সে জন্মগত অবিশ্বাসী। সে ধরে নেবে জিন্নাহ্কে ওরা মেরে ফেলেছে। মুস্তাকিনের চোখের সামনে আম্মা, মুমতাহিণা, মুরসালীন আর মাদ্রাসার ছোট ছোট এতিমগুলোর মুখ ভেসে উঠল। জয় ওদেরকে মশার ঠ্যাংয়ের মতো ছিঁড়ে ফেলবে। মুস্তাকিন শেষ মুহূর্তেও স্বীকার করেনি জিন্নাহ্ হারিয়ে গেছে। সে বছর ধরে জিন্নাহর খোঁজ করেছে। কিন্তু না খুঁজে পেয়েছে, না কে তাকে অপহরণ করতে পারে তার কোনো প্রমাণ বা হদিশ মিলেছে। তার ধারণা ছিল,

কেউ জিন্নাহ্কে সরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু সে জয়ের ভেতরে এই খেয়াল কোনোভাবেই আসতে দিতে পারে না যে জিন্নাহ্ বেঁচে নেই। জয় উন্মাদ ও অন্ধ। তাকে বিশ্বাস করানো যাবে না জিন্নাহ্কে মুরসালীন মারেনি।

মুস্তাকিন জয়ের ভেতরে এই ভয়টুকু রাখল যে সৈয়দ পরিবারে হামলা হলে জিন্নাহর জান যেতে পারে। যাতে মুস্তাকিনের পরিবার আপাতত সুরক্ষিত থাকে জয়ের কাছ থেকে। মুস্তাকিন শেষ মুহূর্তে একবার মুরসালীনের সাথে দু-চারটে কথা বলার জন্য আর আম্মা ও মুমতাহিণাকে দেখার জন্য বড় ছটফট করেছিল।

জয়ের কাছে সেসব বেকার। সে কবে এইসব মায়ার সম্পর্কের বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে এসবের ঊর্ধ্বে চলে গিয়ে এক পিশাচ হয়ে বেঁচে আছে। যে জীবন্মৃত। তাকে মৃত্যু দেয়া সম্ভব নয়। কারণ সে জীবিতই নেই। জয়ের অতৃপ্ত রুহ্ মৃত্যুকে প্রদক্ষিণ করে কিছুদিনের সময় চেয়ে নিয়ে পিশাচ হিসেবে রক্তের নেশায় ফিরে আসা চলন্ত ধ্বংস।

ছেঁড়া-ছুটো মুরসালীনকেই জয় সারারাত ধরে পিটালো। ফাঁড়া খড়ির ধার কাঁটাযুক্ত চাবুকের চেয়ে ক্ষয়কারী। মুরসালীনের দেহের মাংস খড়ির সাথে ছিঁড়ে ছিঁড়ে এলো। বেশ কয়েকবার রক্তবমি করে ফেলল। নাক ও

কান দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো। ফজরের আজানের আগে জয় টের পায়, মুস্তাকিন শুধুই একটা ছেঁড়া দেহ। জয়ের কোনো কাজে সে লাগবে না। মুস্তাকিনকে চিৎ করে শুইয়ে প্রসস্থ শাবলের এক কোপে মুস্তাকিনের গলাটা আলাদা করে ফেলল দেহ থেকে। ঠিক আলাদা নয়, সামান্য একটু ঘাঁড়ের কাছে চামড়ার সাথে বেঁধে রইল। এক দলা রক্ত ফিনকি দিয়ে ছুটে এসে জয়ের বুক, মুখ, হার ভরিয়ে দেয়।জয় সেই রক্তে ডুবে ধপ করে বসে মেঝেতে। চোখ দুটো বুজে বসে থাকে ওভাবেই মিনিট পাঁচেক।

শেষরাতে দোতলায় উঠে এসে গোসল করে বেশ কয়েকটা ড্রাগ শরীরে ইনজেক্ট করে লম্বা একটা ঘুম দিয়ে সে সাজায় মুরসালীনকে ধরার প্লান। মুরসালীনের পদক্ষেপ বড় বিচক্ষণ। জয় উপায় খুঁজে পায়, মুরসালীনকে ধরতে মুমতাহিণা একটা ভালো টোপ। মুস্তাকিনদের মাদ্রাসায় যেসব রাজাকার ও জঙ্গি পয়দা হচ্ছে, তাদেরকে নিপাত ডাক এলো হামজার কাছে। জয়ের কাছে বিষয়টা খারাপ লাগল না। বাচ্চাদের জীবন খারাপ কাটাটাই নিয়ম। জয়ের অভিজ্ঞতা তা-ই বলে। আর জিন্নাহও তো পচে মরছে! সেও তো কিশোর।

○

অন্তূর শরীরটা প্রতি মুহূর্তে আরও বেশি দূর্বল হয়ে পড়ছে। সে বেশ কিছুক্ষণ পর শুধু জয়কে এইটুকু জিজ্ঞেস করতে পারল, "আপনি মুস্তাকিন মহানকেও মেরে ফেললেন?
"

জয় মাথা নাড়ল, "মেরে ফেললাম।"
অন্তূ কত কিছু বলতে চায়, কিন্তু একটা ঢোকের সাথে সবটা গিলে নিয়ে শুধু আস্তে কোরে বলে, "তার কাছে তো জিন্নাহ নাও থাকতে পারে!"

-“ছিল। কিন্তু পরে আর পাইনি। সামলে ফেলেছিল আমারে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুমানোর জন্যে।”

-“আর তারপর?”

-“তারপর মুরসালীনকে খুঁজতে শুরু করলাম।
”

-“পলাশ কেন সাহায্য করেছিল এতে?”

-“মুস্তাকিনকে মারার পর পলাশের গুদামে আগুন দিয়েছিল মুরসালীন।”অন্তূ কিছুক্ষণ চুপচাপ চোখ বুজে বসে রইল। তার এই প্রতিক্রিয়াটা অদ্ভুত। সে এ নিয়ে আর কিছু বলল না। তার শরীরটা দূর্বল হয়ে পড়েছে।

আজকাল নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থা শরীরের। যখন-তখন সুস্থ-অসুস্থতার চক্র ঘুরতে থাকে।

জয় তার নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা ও জানা গল্পটুকু অন্তূকে বলে একটা মোটা চুরুট ধরালো। অশান্ত জয়কে খুব বেশি দেখা যায় না। সিগার টানা জয়টাই মূলত অশান্ত, অস্থির, বুকে ব্যথা চাপা জয়। অন্তূ টের পায় জয়ের ভেতরে এখন তোলপাড় চলছে। এই তোলপাড়ের নাম–হামজা। তোলপাড়ের নাম হিসেবে নামটা নতুন।

জয় সিগারের ধোয়া ছাড়ল নাক-মুখ ভরে। তাতেই অন্তূর নিস্তব্ধতা ভাঙে। ধোয়া নাকে যেতেই এক লাফে ছিটকে খাটের কিনারায়

বসে বমি করে ফেলল। বমিতে শুধু পিচ্ছিল থুতু। অর্থাৎ সারাদিন কিচ্ছু খায়নি।
ওড়নাটাকে মুড়ে মোটা করে নাকে চেপে ধরল অন্তূ। জয় প্রথমে বুঝল না, যখন বুঝল এক লাফে উঠে গিয়ে সিগার ফেলে এসে অন্তূকে চেপে ধরে, "ঘরওয়ালি! এইহ্! ঘরওয়ালি, আরমেইণ! ঠিক আছো তুমি? কী হইছে? এই মেয়ে! কী সমস্যা কী?"
অন্তূ নাক-চোখ-মুখ চেপে ধরে বসে রইল। ইশারায় বোঝালো তার মাথা ঘুরছে, তেমন কিছু না।
জয়ের মুখটা শক্ত হলো, "শালির মেয়ে মার খাবি আমার হাতে? তোর কী হইছে? জণ্ডিস?

খাস না, বমি করিস, চেহারার হাল বেহাল।
আবার জিগাইলে কস কিছু হয় নাই। মরবি?
আমারে না মাইরাই মরবি?"
অন্তূ চোখ-মুখ ওড়নায় চেপে কাত হয়ে শুয়ে
রইল চুপচাপ। জয় ঝুকে পড়ে আলতো হাতে
ঝাকায়,"আরমিণ! ..ওই.."
-"হু!"
-"আমি সিগার ফেলে আসছি। আর নাই
ধোঁয়া। তাকাও আমার দিকে। শোনো।"
অন্তূ তাকায়। জয় দ্রুত গিয়ে রুমের দরজা-
জানালার পর্দা সরিয়ে দিলো। এসি অফ করে
ফ্যান দিলো। ড্রেসিং টেবিলের ওপর সাজানো
তার এক সারি পারফিউম থেকে একটা তুলে

ঘরে স্প্রে করল। অন্তূ তবু নাক ছাড়ে না। তার যেকোনো গন্ধই অসহ্য লাগে।

জয় আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। পরনের শার্টের দুটো বোতাম খুলে গম্ভীর স্বরে বলল, "চলো!"

-"কোথায়?"

-"অসুস্থ তুমি। ডাক্তার দেখিয়ে আনি।"

-"প্রশ্নই ওঠে না।"

-"জোর করলে আবার বোলো না, আমার দোষ!"

-"আপনার কোনো দোষ নেই। দোষ তো... "আচমকা কঠিন হয়ে উঠল জয়ের কণ্ঠস্বর,

হাত ধরে চাপ দিয়ে বলল, “অসুস্থ দেখাচ্ছে, আরমিণ! ওঠ্!”

অন্তূ ছিটকে হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, “ছুঁবেন না আমাকে। বললাম না, কিছুই হয়নি আমার! আপনার সাথে কোথাও যাব না আমি।”

কথাটা বলে অন্তূ চোখ অর্ধ খুলে জয়ের ভাবমূর্তি লক্ষ করে। কিন্তু জয় আশ্চর্যজনকভাবে কোনো আশানুরূপ প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে অন্তূকে ভাবনায় ফেলে চুপচাপ রুম থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরল ভাতের থালা নিয়ে। খাবার দেখে অন্তূর নাড়ি-ভূড়ি বোধহয় গলার কাছে উঠে এলো।

জয় খাবার মুখের কাছে আনতেই বালিশ তুলে মুখের ওপর রাখে অন্তূ। উঠে বসতে চায়। জয় অন্তূর হাত থেকে বালিশটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারল একদিকে। বাহু চেপে ধরে উঠিয়ে বসিয়ে পিঠের পেছনে বালিশ খাড়া করে দিয়ে অন্তূকে হেলান দিয়ে বসায়।

অন্তূ মুখ ফিরিয়ে বলে, "আমি খাব না। জোর করলে কিন্তু এই মুহূর্তে বের হয়ে যাব বাড়ি থেকে।"

জয় শুধু ঠান্ডা গলায় বলল, "আমার নষ্ট হাতদুটো যথেষ্ট শক্ত, আরমিণ। তোমার গায়ে তুলতে বাধ্য কোরো না। তোমার নরম শরীরে সইবে না।"-"মারবেন? মেরে ফেলুন না!

আমার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কেন? কেউ সামান্য বিরোধিতা করলেও রেহাই নেই। শিখেছেন তো তা-ই।''

জয় খাবার তুলে অন্তূর মুখের সামনে ধরে বলল, "তখন আসোনি কেন অন্যকিছু শেখাতে?''

অন্তূ মুখটা সরিয়ে নিয়ে বলল, "সেই দায় আমার ছিল না।''

-"এখন আর তাহলে নতুন করে সেই দায় টানার দরকার নাই। যা শেখার তো শিখেই গেছি। এখন আর কী করার! ধরো, হা করো।''

-"এখন দায় দেখাই কারণ এখন আমি..."
অন্তূ থেমে জয়ের খাবারের হাতটা ঠেলে সরিয়ে দেয়।
জয় জিজ্ঞেস করে, "কী এখন তুমি? আমার ঘরওয়ালি?"
-"এখন আপনি যা করছেন তা আমার উপস্থিতিতে। আমার আশপাশে। আবার যা করেছেন তাও আমাকে শুনতে হচ্ছে।"
-"শুনতেছো ক্যান? কান বন্ধ রাখো। আমি তো শোনাইতে চাই নাই। তুমিই শোনার জন্য পেছনে পড়েছিলে!"
-"সেটা কারণবশত!"জয় হাসল, "লাভ নেই। তুমি যদি ভেবে থাকো আমার গল্প শোনার

পর আমাকে নতুন করে বিচার করার সুযোগ পাবে, তাহলে আমি বলব—তুমি আমাকে যত জানবে চক্রবৃদ্ধি হারে শুধু পাপ পাবে। আমার জান নিতে অধৈর্য হবে আরও।''

অন্তূ তাচ্ছিল্য করে হাসল, "আপনি কি আমাকে আপনার জান নিতে উৎসাহিত করছেন?''

-"তোমার হাতদুটো সুন্দর। কোন এক বুজুর্গ বলেছিলেন, সুন্দর হাতের আঘাতে মরলে বেহেশত নসীব হবার সুযোগ থাকে। কোন শালির ছাওয়াল বলেছিল, জানি না।''

-"রসিকতা করছেন?''

জয় জিজ্ঞেস করল, "খাবে না?''

-“খাব না। বমি পাচ্ছে। জুলুম করছেন আমার ওপর।”জয় হাত ধুয়ে ফেলল কেন যেন। অন্তূর মুখে উচ্চারিত ‘জুলুম’ কথাটার আছড় লাগল যেন।

অন্তূ বড় শান্ত কণ্ঠে বলল, “পাপ যথেষ্ট করেছেন। এবার ছাড়লেও পারেন। আমি আর কখনও বলব না আপনাকে একথা। আমি এবার চূড়ান্ত ক্লান্ত, জয় আমির।”

জয় মাথা নাড়ল, “তুমি আইছো আমার অন্ধকার অ-জীবনে। পাপ আর পূণ্যের মাঝে যেই সীমানা-প্রাচীরখানা থাকে, তার ওইপাশে আলো এইপাশে আন্ধার। আলোর ভিতরে বসবাস করা মানুষদের এইপাশে প্রবেশের

অনুমতি নাই। তুমি সেই নিষেধ অমান্য করে, সীমা লঙ্ঘন করে এইপাশে পা রাখছো। দোষ কার?”

-“সেই প্রাচীরখানা ভেঙে ফেলুন না! সেটাই তো বলছি। ওই প্রাচীরটার নাম- অনুতাপহীনতা। আত্মসমর্পণ করুন।তাহলেই তো এপাশের আলো ওপাশের অন্ধকারকে সরিয়ে আলোকিত করে তোলে। আলো গতি রুখে দেয়া যায় না। তা সামান্য পথ পেলেও অন্ধকারকে ধ্বংস করে।” অন্তূ চোখ বুজে মাথাটা হেডবোর্ডে ঠেকায়।জয় কেমন করে যেন হাসল, “এই প্রাচীর আমার মতোন পাপীরা নিজেদের বহুদিনের পাপ-সাধনার

মাধ্যমে নিজ হাতে গড়ে তোলে, ঘরওয়ালি! তা চাইলেই ভাঙা সম্ভব হয় না। এই অন্ধকারের সাথে আমার রুহ্ অবধি জড়ানো। হয় রুহটা বের করে নাও, নয়ত আমাকে ছেড়ে দাও আমার পথে।''

-“এখনও পথ ফুরায়নি? মানুষের ব্যথার অভিশাপ আর কত কামালে আপনি তৃপ্ত হবেন? আমি জানতে চাই।''

জয় হেসে উঠল, “কেউ আমায় ‘পাপী’ বলে ডাকলে আমার শান্তি লাগে। আমার রক্ত আর অনুপ্রেরণা খারাপ, ঘরওয়ালি। বড়বাবা বলতো, ‘পাপ যখন করবি, লোকে পাপী বললে দোষের কী? তবে পাপের চেয়ে বেশি

বললে সেই পাপটুকু করে পূরণ করে দিবি। এই যা!’ বড়সাহেব বলে, ‘পাপীদেরকে পাপের পথে থামতে নেই। পরিণতি ভয়াবহ হয়।’ ”

অন্তূ কিছু বলতে যাচ্ছিল, জয় চট করে অন্তূর ঠোঁটে ডানহাতের তর্জনী চেপে ধরল, “গোসলও করো নাই। কী করছো সারাদিন? ”অন্তূকে আবারও কোলে তুলে নিলো জয়। বাথরুমের দিকে যেতে যেতে বলল, “কী ছলনা পাকাচ্ছ, বলো তো ছলনাময়ী? আমি কি বুঝতে ভুল করছি আজকাল আমার ঘরের দুশমনকে?”

অন্তূ চোখ কুঁচকে জয়ের শার্ট আঁকড়ে ধরে একটু। জয় থেমে গেল। ধুক ধুক করে উঠল তার হৃদযন্ত্রখানি। তাও টের পেল অন্তূ। অন্তূকে বাথরুমের মেঝেতে বসিয়ে ঝরনা ছাড়ে জয়। রাত নয়টার এই গোসলে অন্তূর শরীরে পানি ঝরে পড়তেই দূর্বল শরীরটা থরথর করে কেঁপে উঠল। অন্তূ মস্তিষ্কে প্যানিক চড়ল। সেই মহা-গোসলের ক্ষণ তার মাথায় হামলা করল। অন্তূ সেদিন বাড়িতে গোসল করেছিল, এই জয় আমির তখন তাদেরই বাড়িতে ঢুকে ঘাপটি মেরে বসা অন্তূকে খুন করতে। অন্তূ কি ভুলেছে তা?

জয় অন্তূর ওড়নাটা খুলে নেয়। পানিতে ভিজে অন্তূর দেহে কাপড় লেপ্টে গেছে। জয় তা এড়াতে চায়। তার চোখ যায় অন্তূর মুখে। অন্তূর চোখ বেয়ে যে নোনাজল ঝরছে তা ঝরনার পানি ধুয়ে নিয়ে বেয়ে যাচ্ছে অন্তূর শরীর বেয়ে। জয় ঢোকল গিলল।অন্তূর সালোয়ার কামিজটা কম্পিত হাতে খুলতে যায় জয়। আবার থেমে আগে নিজের আধভেজা সাদা শার্টখানা খোলে। অন্তূর শরীরটা কাঁপছে। চোখদুটো বন্ধ। কাঁদছে অন্তূ। জয় অন্তূর শরীর থেকে কাপড় খুলে নিয়ে নিজের শার্টটা পেঁচিয়ে দিলো অন্তূর দেহে।

অন্তূর ভেজা থুতনিতে আঙুল নেড়ে জয় বলে, “তোমাকে হাসতে বা কাঁদতে তেমন দেখিনি আমি। হাসবে না জানি। কান্নাও চলবে। কাঁদো.”

জয়কে কেউ ডেকে বলল, ‘আজকের পর তোর বউয়ের সৌন্দর্যের মামলা উঠলে বলে দিস, তোর বউয়ের সৌন্দর্যকে ম্লান করার সাধ্যি কান্নারও নেই। বরং কান্না সৌন্দর্য পায় তার চোখে এসে।’

জয় মলিন হাসে। অন্তূকে গায়ে পানি ঢালে। অন্তূর শরীর ছুঁতে গেলে অন্তূ যেন এই জগতে ফেরে। আতঙ্কে আর্তনাদ করে ওঠে,

“আপনার ছোঁয়াকে বিষাক্তভাবে অনুভব করছি আমি।”

জয় অন্তূর গলায় বডিওয়াশ মাখাতে মাখাতে ধীর আওয়াজে বলে, “তাহলে নিশ্চিত থাকো, তুমি জয় আমিরের ছোঁয়াই পাচ্ছ।”

অন্তূ চোখদুটো আরও শক্ত করে বুজে বলল, “আমি কি আপনাকে বাঁধা দিতে পারি না এই মুহুর্তে?”-“পারো না।”

-“আপনার মতো পাপী কেন আমাকে ছোঁয়ার বৈধতা পেলো জয় আমির?”

-“প্রশ্নটা ঘুরিয়ে আমি তোমাকে করতে পারি—তোমার মতো নিষ্পাপ কেন আমার মতো পাপীর জন্য বৈধ হলো?”

-“আমি নিষ্পাপ নই।”

-“সে তো আমার ছোঁয়া লাগার পর।”

অন্তূর শরীরটা জয় মুছিয়ে দিলো তোয়ালেতে। বুকের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে তোয়ালেতে অন্তূর শরীরটা মুড়িয়ে আবারও পাঁজাকোলে তুলে নিলো।বিছানায় এনে শুইয়ে দিয়ে ওভাবেই ঝুঁকে রইল অন্তূর দিকে। অন্তূ নাক ও চোখ লাল। চোখদুটো বোজা। জয়ের ভেতরে পুরোনো একটা হিংসা জাগলো, তার তুলনায় অন্তূ অতিরিক্ত ফর্সা। জয় আরেকটু ঝুঁকে অন্তূর কানের ভেজা লতিতে একটা চুমু খেয়ে ফিসফিস করে বলে, “আজ তোমার আসামীর নামের অভিযোগের

খাতায় আরেকটা অভিযোগ লিখে নাও। সে তোমার অসুস্থতার ফায়দা লুটবে আজ। কিন্তু তুমি বাঁধা দিতে পারবে না। তুমি ঘেন্নায় কাঁদবে, কিন্তু সে তা গ্রাহ্য করবে না।''সেদিন রাত দেড়টার দিকে কামরুল মরে গেল।

দোলন সাহেব ওদেরকে একটা প্রাইভেট হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছিলেন। এমপির কানে তিনজনের অবস্থার খবর দেননি।

জয় ঘুমে অচেতন। তার ফোন বাজছে। অন্তূ দ্রুত ফোনটা সাইলেন্ট করল যাতে ঘুম না ভাঙে। আস্তে আস্তে জয়ের পাশ থেকে উঠে বারান্দায় গিয়ে কল রিসিভ করে চুপ করে রইল।

দোলন সাহেব ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন,
হারামজাদা! তোর বউ এবার তোর জানের কাল হবে। মরবি তুই। নিশ্চিত জেনে রাখ, ব্যাটা। আর তুই মরলে তোর খয়রাতে আমি চরাম চরাম করে ঢোল বাজাবো।
অন্তূ দোলন সাহেবের কণ্ঠ চিনে ধীর আওয়াজে সালাম দিলো,
"আসসালামুআলাইকুম, স্যার।"-"ওও! মুসিবতের বেডি, তুমিই ধরছো কল! তোমার পতি কই?"
-"কী হয়েছে, স্যার?"
দোলন সাহেব দীর্ঘশ্বাস টেনে খুব রিল্যাক্সে বললেন, "কী হয়নি, তা জিজ্ঞেস করো। যা

হয়েছে অত বলার এনার্জি নেই। সকালে কোর্ট আছে। এনার্জি লস করতে পারব না।"

-"আমার আন্দাজ বলছে, ওদের তিনজনের কেউ একজন জাহান্নামে পৌঁছে গেছে।"

দোলন সাহেব অন্তূর বিচক্ষণতার প্রশংসা ছেড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, "এবার একটু ভয় পাও, মেয়ে! পথ সহজ না। তুমি ওদের কাল হতে গিয়ে তোমার নিজের কাল হবে। তোমাকে বাচাবে কে?"

-"আমি তো বলিনি সহজ, স্যার। শিকার করতে গেলে জঙ্গলের ডাল-পালায় চামড়া ছিলার ভয় পেলে চলে না। কখনও বা

শিকারের বিষদাঁতও সহ্য করতে হয়। কিন্তু তা বলে তীরের তাক নড়চড় করতে নেই।”

দোলন সাহেব বললেন, “তুমি কি দক্ষ শিকারী?”-“না স্যার। আমি শিকারী নই। আমি হলাম শিকার, পরে সুযোগসন্ধানী।”

-“তোমার বলির পাঠা কই?”

-“ঘুমাচ্ছে। আপনার কাছে দুটো কথা জানার ছিল।”

-“আমার হাতে এখন একটা সিগারেট। যেটা শেষের দিকে। যতক্ষণ ওটা টানবো, ততক্ষণ তোমার কথা বলার সুযোগ পাবে। আর আমি তোমার কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী নই। মনে রেখো।

”

অন্তূ মলিন হাসল। মাথা ঘুরে উঠল। বারান্দার মেঝেতে হেলান দিয়ে বসে অন্তূ বলে, "আপনি শুধু ওই বাচ্চাগুলোকে মুক্ত করতে আমায় একটু সহায়তা করবেন তো, স্যার?"

-"ওই শুধু ওইটুকুই। বেশি আশা রেখো না যেন। জয় আমির অথবা হামজাকে আঘাত করতে তুমি আমার কাছে একটুও সাহায্য পাবে না। উল্টো বলি হতে পারো। কারণ আমি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী না।-"মুরসালীনের মহানের সঙ্গে কথা হয়েছে তো আপনার?"

-"জয় আজকাল ভুল বেশি করছে। আগে করতো না। সেদিন আমাকে মুরসালীনের

কাছে একা ফেলে চলে এলো। আমি কি ওকে সতর্ক করব, তোমার থেকে দূরে থাকতে?''

অন্তূ হাসল, "করতে পারেন। মানলে ওর ভালো। না মানলে কী আর করার! সেটার সম্ভাবনাই বেশি।''

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন দোলন সাহেব, "হুউ! যা করবে তাড়াতাড়ি। তোমার মরণের ঘন্টা বাজবে, আমি সেই অপেক্ষায়। যুবতী বয়সেই মরে যাবে তুমি, খুব আফসোসের ব্যাপার। যতদিন হামজা না ফিরছে মিথ্যা আমি বলব এমপির কাছে। তারপর?''

জয় ঘুমের মাঝে কেশে উঠল। অন্তূ সজাগ হলো। কল কেটে ভাবীর নম্বর তুলে কল

করল। কলটা রিসিভ করলেন রাবেয়া, নাক পরিষ্কার করে সালাম দিয়ে বললেন, "কে? "-"ঘুমাওনি?"

-"অন্তূ?"

-"ভালো আছো, আম্মু?"

রাবেয়ার ভারী নিশ্বাস শোনা গেল। বেশ ক'টা মাস অন্তূকে দেখেননি। উপচে আসা কান্নাটা লুকিয়ে নিতে খুব বেগ পেতে হলো উনার। অন্তূ জানে, রাবেয়া জায়নামাজে বসা। তাহাজ্জুদের সালাম ফিরিয়ে চোখ মুছে কল রিসিভ করেছেন।

রাবেয়া কেমন করে যেন জিজ্ঞেস করলেন, "বেঁচে আছিস তো, অন্তূ?"

অন্তূ হাসে। চোখজোড়া জ্বলে উঠল তার। জানালার গ্রিল ভেদ করে আকাশের দিকে তাকায়। অন্তূরা কাঁদে না। আমজাদ সাহেবের নিষেধ আছে। তাই অন্তূ নিজেকে সামলে জানায়, "আমি মরব না, আম্মু। আমি মরব না।"

রাবেয়া কথা বলতে পারছিলেন না। কাঁদলে অন্তূ রেগে যেতে পারে। তাই কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ফুঁপিয়ে বললেন, "জয়ের কাছে ফোনটা ধরায়ে দে তো, অন্তূ। একটু কথা বলব।"-"কী কথা বলবে?"

-"ওর সাথে আমার বোঝাপড়া আছে। ওর সাহস কত হইছে রে? ওর না মা নাই! ওর

কি কলজেও নাই? তোরে কেমন রাখছে, ওরে জিগাইতাম। ওরে বলতাম, তেইশ বছর আগে একটা মেয়ে জন্মাইছিলাম আমি। ওরে বলতাম, আমি একটা ছেলেও জন্মাইছিলাম। ওই দুইটার খোঁজ আছে ওর কাছে। একটু দে ওর কাছে।''

অন্তূ ডাকে, ‘‘আম্মু?''

রাবেয়া কথা বলতে পারলেন না। অন্তূও কিছু বলতে চেয়ে জিহ্বার আগা থেকে গিলে ফেলে। কথাটা আম্মুকে জানাতে তার ছটফটানি লেগে আসে। কিন্তু বলা হলো না। অন্তূ শক্ত করে ঢোক গিলে নিজেকে সামলায়,

প্রসঙ্গ বদলায়, "ভাবীর এখন কী অবস্থা, আম্মু?"

-"সামনের মাসের শেষের দিকে তারিখ দিছে ডাক্তার। তুই আসবি না, অন্তূ? দেখতে আসবি না?"

অন্তূ নিশ্চুপ। আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না। টুপটুপ করে কয়েক ফোঁটা পানি পড়ল কোলের ওপর। আস্তে কোরে বলল, "আসব, আম্মু। ভাবীর ডেলিভারী ডেইটের আগেই অসব। আমি না আসলে হয়?" শেষে বিরবির করে অন্তূ, "বেঁচে থাকলে আসব আমি, আম্মু। বেঁচে থাকলে আসব।"

রাবেয়া ডাকলেন, “অন্তূ!”অন্তূর বুকের ভেতর ধুক করে উঠল। এই ডাকটা সাধারণ ডাক ছিল না। মাতৃত্বের ডাক। এই ডাকে মায়েরা ছেলেদের কাছে নিজেকে তুলে ধরেন। রাবেয়ার তো ছেলেটা নেই। অন্তূ রাবেয়ার হাতদুটো ধরে বলেছিল শেষবার, ‘অন্তূ তাদেরকে সব ফিরিয়ে দেবে। ভবিষ্যতটা কাধে নেবে।’ সেই দাবীতেই রাবেয়া ডাকলেন আজ অন্তূকে।

-“তোর ভাবীর বাড়ির লোকজন আমার আর তোর ভাবীরে আর বইতে পারতেছে না, অন্তূ। আমি বাড়ি যাইতে চাইলে নিয়ে যাবি, অন্তূ? আমি আর এইখানে থাকব না। চোখ বুজলেই

তোর আব্বু আসে। আমারে বাড়ি যাইতে বলে। তুই আমাকে নিয়ে যা, অন্তূ।’’

বড় অবুঝ আবদার রাবেয়ার! অন্তূ চোখের সামনে দেখল বেয়ান বাড়িতে সরল রাবেয়ার অবহেলিত জীবন‘‘টা। ছেলে নেই, স্বামী নেই, ঘরদোর পরের। রাবেয়া মাসের পর দিন কাটাচ্ছে। এর দায় কার?

বাকি রাতটা বারান্দায় বসে আব্বুর সাথে কথা বলে কাটলো অন্তূর। ভোরের আলো আধো আধো ফোটার সময় রুমে ফিরল। তুলনামূলক ভালো লাগছে শরীর। গরমের ভোর।জয় অভ্যাস হলো উপুড় হয়ে শোয়া। খালি পিঠটা দেখা যায়। তাতে ট্যাটুর মতো

ছেপে আছে অসংখ্য এবরো-থেবরো দাগ। লুঙ্গিটা উঠে আছে হাঁটুরও অনেকটা ওপরে। কালো কুচকুচে পশমে ভরা ঠ্যাঙের ওপর এক দলা ধরা মাংস নেই। গর্তের মতো দেবে আছে লম্বা ক্ষত। বাহুতে দাগ। কোথাও বা মাংস ঠেলে উঠেছে ক্ষত ভরাট হয়ে। কোথাও কালশিটে পড়া খাবলা ধরা মারের ছাপ। দেখে মনে হয় এখনও রক্ত জমাটবদ্ধ হয়ে চামড়ার নিচে জমে আছে। যখন-তখন টিউমার ও ক্যান্সার হওয়াটাই স্বাভাবিক। গোসল দিয়ে এসে অন্তূ নামাজে বসল। মোনাজাতে মালিকের কাছে হাত তুলতেই হু হু করে কেঁদে ফেলল আজ সে। সে বহুদিন

রবের কাছে কাঁদেনি। নিজের কলঙ্কিত হাতদুটো রবের কাছে তুলে ধরতে অন্তূর বড় লজ্জা লাগছিল। এই হাতে সে প্রাণ নিয়েছে, যে হাতে সে আইনের কলম ধরতে চেয়েছিল। অপরাধীর শাস্তি দেবার হক কি অন্তূর আছে? সেটা কি খু"'ন নয়? খুন কুফরী! আর কুফরীর গুনাহ্ কি আল্লাহ পাক ক্ষমা করবেন? তার আর জয়-হামজার মাঝে পার্থক্য রইল কি! জীবন তাকে কোন পথে পরিচালনা করছে!?

তুলি নামাজে বসেছিল। তরুর মৃত্যুর পর সে নিথর হয়ে গেছে। কোয়েলের সাথে আচরণ খারাপ হয়ে গেছে। রুম থেকে বের হয় না।

অন্তূ প্রতিবেলা খাবার না দিয়ে গেলে না খেয়েই চলে। কোয়েলের যাবতীয় যত্ন রিমিই করে। রিমি কোয়েলের মা হয়ে গেছে।

অন্তূ গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ বসে রইল। তুলি সালাম ফিরিয়ে বলল, "তুমি গিয়ে আরাম করো'গে। রান্না আমি করে নেব আজ।"অন্তূ কিছুক্ষণ তুলির সুশ্রী মুখখানা দেখে বলল, "এভাবে কতদিন?"

-"কীভাবে, আরমিণ? যার জীবনে আচমকা দুঃখ আসে, সে নাহয় আবার দুঃখ কাটিয়ে সুখ পাবার আশা রাখতে পারে। কিন্তু যার জন্মই দুঃখের খাতিরে সে কেন বৃথা আশা রাখবে সুখের? এটা আমার অবৈধ বাপের

বাড়ি বলে তোমরা কি তাড়িয়ে দেবে, আমায়?
”

অন্তূ বিছানা ছেড়ে তুলির গা ঘেঁষে মেঝেতে বসে পড়ল। তুলির একখানা হাত নিজের হাতের মুঠোয় ধরে বলল, “আপনার অবৈধ বাপের বাড়ি। আমি কে এ বাড়ির? আমার কী পরিচয় আছে?”

-“হিসেবে তুমি এ বাড়ির বউ। এটাই জয়ের বাড়ি। ও কথা বলবে না।”

অন্তূ হাসল, “আপনার-আমার নিজেদের একটা করে সংসার হলেও পারতো। কিন্তু নারী হিসেবে আল্লাহর বোধহয় আমাদেরকে পছন্দ হয়নি।”

তুলি অন্তূর মুখে দিকে তাকায়, “তুমি জয়কে ছেড়ে দেবে, আরমিণ?”
-“আপনার কথা শুনি। কোয়েলকে কীভাবে মানুষ করবেন ভেবেছেন?”
-“তুমি নিয়ে নাও।”অন্তূ তাকাল। তুলি বলল, “আমি সত্যি বলছি আরমিণ। ওকে আমার আর ভালো লাগে না। আমার আর এই দুনিয়ার কিছুই ভালো লাগে না। আমি কে, আমি কেন, আমি কী?—এই প্রশ্ন আমাকে পাগল করে তোলে। তোমার কাছে আছে এই প্রশ্নের উত্তর?”

-“আপনি একজন নারী। আপনি একজন মা। এত বড় দুটো শক্তিশালী পরিচয় থাকতেও এই সংকোচ কেন?”

তুলি তাচ্ছিল্য করে হাসে, “আমি অবৈধ সন্তান, আমি ধর্ষিতা, আমি বিধবা, আমি আশ্রিতা। আরও নাও বড় বড় পরিচয়। এগুলো বললে না কেন?”

-“আমি যে দুটো বলেছি, সেগুলো এক পাল্লায় রাখুন আর এগুলো এক পাল্লায় রাখুন, দেখবেন ওই পাল্লার ভার অসীম ছাড়িয়েছে।”

-“তুমি মেয়ে রোজ রোজ আমায় মিছে সান্ত্বণা দিও না। নিজের কথা ভাবো একটুও?”

-“আপনি কোয়েল ও নিজের একটা ব্যবস্থা ভাবুন। এখানের দিন ফুরিয়ে এসেছে আপনার।”

তুলি যেন চমকে উঠল, “কেন? তোমরা কি সত্যিই আমায় বের করে দেবে?”

অন্তূ শক্ত করে তুলির হাতখানা নিজের মুঠোয় আঁটলো, “কেউ আপনাকে বের করবে না, বরং কেউ থাকবে না আপনাকে এখানে আশ্রয় দেবার জন্য।”-“কোথায় যাবে? কী বলছো তুমি? কী করছো তোমরা?”

-“আমরা কারা? জানি না। কিন্তু ধরুন এই বাড়িটা ভাঙার জন্য একজন দিনমজুর দরকার, আমি সেই দিনমজুর।”

তুলি একটু আৎকে উঠল। বিস্ময় ও হতবিহ্বলতায় কিছু উচ্চারণ করতে পারল না। অন্তূ বলল, “আমি আপনার কাছে আজ এমন কিছু চাইতে এসেছি যা আপনার মন ভাঙতে পারে, মায়ার বাঁধতে পারে। কিন্তু আজ আপনি আমায় ফিরিয়ে দিতে পারবেন না।”

-“কী চাইতে এসেছ, আরমিণ?”

-“ভয় পাবেন না। আবেগ আপনাকে ভয় পেতে বলবে, কিন্তু বাস্তবতার কাছে আবেগ এক মুঠো ছাই। আপনি যে মুখে হামজাকে ছোট থেকে ভাই ডেকে এসেছেন, সেই মুখে আপনি তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবেন।”

তুলি যেন গেড়ে বসল, “কী বলছো তুমি? ”-“বড় বড় কাজে এমন দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নিতে হয়। আপনার সন্তানের পিতাকে সে ভাই হিসেবে মেরে হয়ত ভালোই করেছে, কিন্তু সে আরও এমন অনেক সন্তানের জন্য নরকের দেবতা। যার জন্য আপনার স্বামীর মৃত্যু হবে তার হাটু ভেঙে পড়ার প্রথম ধাপ। বোনের মুখে ভাইয়ের বিরুদ্ধে নিজের স্বামীর হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী বড় কার্যকর।”

তুলি ভাষাহীন চোখে চেয়ে রইল। অন্তূ বাম হাতের মুঠোয় রাখা চাবি নিয়ে তুলিকে নিয়ে একবার বড়ঘরে গেল। তুলির বমি ঠেলে আসে, চোখ ফুঁড়ে আসে সেখানকার দৃশ্য

দেখে। বস্তার মতো নিথর পড়ে আছে একেকেটা ছোট ছোট দেহ। তার মাঝে রক্তাক্ত কয়েকটি যুবক ফজরের নামাজ আদায় করছে।

সেখান থেকে বেরিয়ে অন্তূ শুধু একটাই কথা বলল, "ওদের মায়ের কোল ভরিয়ে দিতে আপনার একটা সাক্ষী আমার চাই। এরপর আমি এই লড়াইয়ে আমি বাঁচতে পারি, তো আপনার ভারটুকুও আমার।"

অন্তূ রিমির ঘরে আর গেল না। সে জানে রিমি এখন নিস্তেজ শরীরে বিছানায় পড়ে নীরবে কাঁদছে। অন্তূর চোখে বড় বেঁধে এই দৃশ্য। রিমি তার এই বয়সের একজন সরল-

বিশ্বস্ত বান্ধবী কিনা!বাথরুমে যদি দশটা লুঙ্গিও জমা হয়, তা কখনও নিজের হাতে ধুয়ে দেয় না জয়। দরকার পড়লে নতুন কিনে এনে পরে। চারটা লুঙ্গি জমে ছিল। অন্তূ সেগুলো ধুয়ে ছাদে গিয়ে মেলে দিয়ে এলো। একটু ভালোমতোন দেখল বাড়ির গোটা আশপাশটা। পাহারা নেহাত কম বসায়নি হামজা।

বেলা একটু বাড়লে একসাথে দুটো বমির ওষুধ খেয়ে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল। এককাপ সুন্দর চা বানিয়ে নিয়ে গিয়ে জয়কে ডাকল, বেলা নয়টা বাজে। উঠবেন নাকি পানিটানি ঢেলে দেব গায়ে?

জয় গালি ঝারার জন্যই বোধহয় আধো চোখ খুলেছিল। কিন্তু গালি এলো না মুখে। অন্তূ চুল আঁচড়াচ্ছে। কোমড় সমান চুল। খুব সামান্য কুঁকড়ানো। দেখতে আরও বেশি সুন্দর লাগে। অন্তূ এক পর্যায়ে চুলটা পিঠ থেকে তুলে সামনে আগলে নিয়ে আচড়াতে লাগল। হাতের চিকন চুরিখানা চিকচিক করে উঠল অন্তূর। বেরিয়ে এলো গলার চেইন। জয় চোখ বুজে ফেলে এ পর্যায়ে।জয়ের কাছে মনে হলো এটাকে অপার্থিব এক সকাল বলে। এই সকালের মায়ায় যদি জয় আমির পড়ে, দোষটা একটুও জয় আমিরের নয়। কিন্তু ধ্বংসাত্বক ক্ষতিটা জয় আমিরেরই। এই

মায়ার প্রশ্নও তার জন্য সর্বোচ্চ ক্ষতিকর। দূর্বলতার ঠাঁইকেই সাধারণ ভাষায় মায়া বলে। জয়ের চোখের পর্দায় ভেসে উঠল–অন্তূ যে অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, স্বামী হিসেবে তার এখন কর্তব্য অন্তূর ওই চুল সরানো খোলা কাধে একটা চুমু খাওয়া। কিন্তু সে যে স্বামী হবার আগে আসামী!

জয় উঠে দাঁড়িয়ে লুঙ্গি বাঁধে। ঘড়িতে সবে সাড়ে সাতটা। তার বউ একটা বাটপারী করেছে। এর শাস্তি কীভাবে দেয়া যায়?

অন্তূ সে সময় বলে উঠল, "কী খাবেন?"-"তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করতেছ?"

-“আমি বুঝতে পারছিলাম না কী রান্না করা যায়। আপনি যা খাবেন তা শুনলে একটা আইডিয়া পাওয়া যেত।”

জয় এমন ভাব করে হেঁটে এসে অন্তূকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে গা ঘেঁষে আয়নার সামনে দাঁড়াল, যেন সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে আয়নার সামনে এলোমেলো চুল ঠিক করতে খুব ব্যস্ত।

ঘন ফেঞ্চকাট ঝাকড়া চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, “বিরিয়ানী রাঁধো।” আড়চোখে অন্তূকে দেখল আয়নার ভেতরে।

অন্তূ আয়নায় জয়কে লক্ষ করে বলে, “পছন্দ?”

জয় এবার অন্তূর দিকে ঘাঁড় কাত করে,
"হলে কী?"
-"আমারও পছন্দ।"জয় যেন একটুখানি থমকায়। আরেকটু গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। তাকিয়ে থাকে। কিছু সময় পর হেসে ফেলে অন্তূর কানের কাছে ঝুঁকে ফিসফিস করে বলে,
"পছন্দ চেঞ্জ করে ফেলো, ঘরওয়ালি। নয়ত ভালো মানুষদের সমাজে বদনাম হয়ে যাবে জয় আমিরের পছন্দমতো একটা নিজের পছন্দ রাখার দায়ে। তোমার জয় আমির ভালো না।"

অন্তূ ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসে, “তার নামে বদনাম হয়েই এই নাম পেয়েছি। বদনামের ওপর বদনাম দৃশ্যমান হয় না।”

জয় মাথা নিচু করে হেসে বিরবির করে, “আমার নামটাই এক জলন্ত বদনাম! কী বলেন, উকিল মহোদয়া!”

-“আমি তো বিরিয়ানী রান্না তেমন পারি না। মানে আম্মু করতো, আমি...”

অন্তূ সরে দাঁড়ায়। এই সকল মুহুর্তে জয়কে আপাত বিরহ দিয়ে তার চাপা আহত মুখখানা বড় প্রশান্তি দেয়।

-“রান্না-বান্না, স্বামীর যত্ন, সংসার সামলানো শেখার বয়সে উকালতি আর তদন্ত শিখলে

তোমার সুয়ামীর কপাল এরমই হবে, সিস্টার! তোমার সুয়ামীর জন্য দুক্কু পেলুম।’’অন্তূ হেসে ফেলল। জয়ের মনে হলো দেয়ালে মাথা ঠুকে হাসপাতালে চলে যেতে। এরকম একখানা অভাবনীয় সকাল পাবার কথা সে অজ্ঞান হয়েও ভাবে না। আজ তার সাথে উল্টাপাল্টা ব্যাপার ঘটছে।

অন্তূ জয়কে চারবার মুদির দোকানে পাঠালো বিভিন্ন মশলা-পাতি ইত্যাদি আনতে। তার কুকুরগুলোকে রুটি খাওয়াতে একটু দেরি হলো শেষবার। বকতে বকতে দোতলায় উঠল। আটবার উঠানামা করতে হয়েছে সিঁড়ি দিয়ে।

অন্তূ বলল, “কোয়েলের দুধ ফুরিয়ে গেছে।”
-“মাথার ওপর তুলে এক আছাড় মারব এইবার কোয়েলরেও, তোমারেও!”
-“তো আমি যাই? দুধ নিয়ে আসি?”
-“বের হয়ে দেখ্!”
-“আজ হবো।”
-“কীয়েহ্! আবার কন, শুনি নাই!”অন্তূ সরল নজরে তাকায়। জয় এক মুহুর্তের জন্য ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে উঠল। অন্তূর এই মারপ্যাচটা খাটছিল খুব জয়ের ওপর। কখনও নমনীয়তা না দেখানো অন্তূ হঠাৎ-ই এই চূড়ান্ত সময়ে কোমলতা প্রদর্শন করায় জয়ের চাতুর্যও হতবিহ্বল হয়ে পড়ছিল।

-"আমি আজ ভার্সিটি যেতে চাই। আপনার অনুমতি আছে?"

জয় যেন ভুল শুনল। কিছুক্ষণ অনড় দাঁড়িয়ে থেকে চোখ ফেরালো, "আমার অনুমতি চাই, তোমার?"

-"আপনার অনুমতি থাকলে আমি আজ ভার্সিটিতে যাব। সেমিস্টার শেষের দিকে। এটেন্ডেন্স থাকা চাই।"

জয় ঢোক গিলে একটু সময় নিয়ে বলল, "আমি নামিয়ে দেব।"

অন্তূ একটুও আপত্তি করল না, "আপনি কোথায় যাবেন?"

-“জেলখানায়।”অন্তূ মশলা কষানোর চামচ নাড়া দিতে দিতে কষা মশলা ছুটে এসে অন্তূর বাম গালে লাগল। মুখের নরম ত্বক জ্বলে উঠতেই অন্তূ ছিটকে দাঁড়ায়। জয় যেন উড়ে এসে অন্তূর মুখটা অধিকারে নেয়, ট্যাপ ছেড়ে হাতের মুঠোয় পানি নিয়ে ক্ষততে দেয়। কিন্তু মুখের সংবেদনশীল ত্বকে ঠিক ফোসকা পড়া কালো দাগ উঠে এলো। ততক্ষণে মশলা পুড়ে ধোঁয়া উঠে গেছে। সেই গন্ধে অন্তূর চোখ-মুখ উল্টে এলো। জয় দ্রুত অন্তূর মুখ ও মাথাটা অনিয়ন্ত্রিত হাতেই যেন নিজের চওড়া বুকটার সাথে চেপে ধরে। ধরে রাখে ওভাবেই। জয়ের লম্বা কাষ্ঠল শরীরটার

তুলনায় অন্তূ মেয়ে হিসেবে লম্বা হয়েও খাটো।একহাতে গ্যাস অফ করে অন্তূর চুলে হাত রাখে জয়, আলতো চাপে বুকের কাছে অন্তূর মুখটা চেপে নিয়ে ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকে। অন্তূর অস্থির, অসুস্থ নিঃশ্বাস জয়ের বুকে ছুটে পড়ে। আলতো হাতে বারবার অন্তূর চুলে হাত বোলায়। এই জয়কে চেনা যায় না। জয় নিজেও চিনতে ভুল করে এই জয়টাকে। এই জয় জয় আমিরের ধ্বংসের প্রতিনিধি।
অন্তূ টের পায় জয়ের হৃৎপিণ্ডে আন্দোলন চলছে। দ্রিম দ্রিম করে হৃদকপাটিকা খুলছে, রক্ত বইয়ে দিয়ে আবার তার চেয়ে দ্রুত ও জোরে আঁটকে যাচ্ছে। অন্তূ একপেশে হাসে

আলতো। এরকম বুকের কাঁপুনি অন্তূও টের পেয়েছিল। হাত-পা থরথর করে কেঁপেছিল। যেদিন তার ঘরে জয়ের অবৈধ বিচরণ প্রমাণিত হচ্ছিল ভরা সমাজে। হৃদযন্ত্রের এই উত্তাল তান্ডব একই রকম, শুধু শর্ত আলাদা।
জয় আস্তে কোরে জিজ্ঞেস করে, "বমি করবে? বাথরুমে নিয়ে যাব?"
-"না। এখন আর বমি পাচ্ছে না।"অন্তূ এক প্রকার সূক্ষ্ণ অবহেলায় জয়কে সরিয়ে দিয়ে সরে আসে। তারপর জয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সূক্ষ্ণ একটা আহত ভাব লক্ষ করে। জয় অন্তূর মুখের ছোট্ট ক্ষততে গভীরভাবে একটা চুমু খায়। বেশ কিছুক্ষণ ঠোঁট সরায়

না। সামান্য একটু জিহ্বার আগাও ছুঁয়ে যায় অন্তূর মসৃণ গালটা। জয় যেন শুষে নিশ্চিহ্ন করতে চায় অন্তূর গালের দাগটিকে।
মুখ তুলে আঙুল নেড়ে ঘষে সেখানে, শব্দহীন হেসে বলে, "এই গালে আমার ঠোঁট ততটা সময় স্থায়ি হবে না, যতটা সময় এই দাগ। পোড়ার দাগ ওঠে না। আমার কি এই দাগের ওপর হিংসা করা উচিত, ঘরওয়ালি?"
অন্তূ মাথা নাড়ে, "আপনি কি পোড়ার দাগ নন আমার জীবনে? আপনি জলন্ত অগ্নিকুন্ড, আমি সেই আগুনে পুড়ে কালো-কয়লা হওয়া জ্বালানি-খড়ি।"জয় অন্তূর বাহুটা এতক্ষণ চেপে ধরে নিজের শরীরটাকে অবলম্বনের

খুঁটি হিসেবে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। দূর্বল শরীর। এবার অন্তূকে রান্নাঘরের মেঝেতে বসালো।

জয় নিজেও মেঝের ওপর ঠেসে বসে আস্তে কোরে দেয়ালের সাথে হেলান দিলো। মাথাটা এলিয়ে দিয়ে অন্তূর দিকে ঘাঁড় কাত করে বলল,

-“আমাকে তুমি অগ্নিকুন্ড বলো। অথচ আমি উত্তাল সমুদ্র। এবং পানিকে শাসন করা যায় না, ঘরওয়ালি। আর না যায় তার গতিবিধি পরিবর্তন করা। বড়জোর তুমিই উল্টো তার প্রবাহে ভেসে যাবে। সব হারিয়ে ধ্বংস হয়ে

যাবে। তোমার ধ্বংসাবশেষটুকুও ভেসে যাবে নিরুদ্দেশ পানির উন্মত্ত প্রবাহের সাথে।''

অন্তূ স্লান হেসে সামান্য কাধ ঝাঁকাল, “মানছি।''জয় যেন অবাক হয়ে তাকায়। তার চোখে প্রশ্ন, ‘তুমি! আমার কথা মানছো?'

অন্তূর হাসি কমে আসে, ভাবুক চোখে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে বলে, “ধ্বংস হয়ে যাব, বলছেন? তার মানে ধ্বংস হবার এখনও বাকি অনেকটাই, হ্যাঁ!?''

জয় এবার আর অন্তূর অসুস্থতা মানল না। আরেকটু সরে গিয়ে বসল। একটা চুরুট ধরিয়ে তাতে লম্বা টান দিয়ে মুখ-চোখ ভরে এক পাঁজা ধোঁয়া ছেড়ে হাসল, “আমি হেরে

যাব একবার তোমার কাছে। তাতে পস্তাবে তুমি।''

-‘‘আপনি হেরে গেলে পস্তাব?''

জয় ধোঁয়া গিলে দু'পাশে মাথা নাড়ল, ‘‘সেদিন আমার মতো ওভাবে হেরে যেতে না পেরে পস্তাবে।'' অন্তূর চোখে চেয়ে চোখ মারল, ‘‘হার-জিত আপেক্ষিক, ঘরওয়ালি। তুমি তো আর্টসের স্টুডেন্ট! আপেক্ষিকতা বোঝো?''-‘‘বুঝি।''

জয় একপেশে ঠোঁটে হাসে, ‘‘দৃশ্যমান পরাজয় কখনও চূড়ান্ত বিজয় কারও জন্য। এবং জিতে যাওয়াটা হেরে যাওয়া পথের প্রবেশদ্বার মাত্র।''

-“কখনও কখনও জেনেবুঝে হেরে যায় মানুষ। কখন জানেন?”

-“হু?”

-“যখন মানুষের সামনে একটাই পথ থাকে—বেঁচে থাকলে হেরে যাও নয়ত তুমি মরে যাও! মৃত্যু আপনার মতো দায়বদ্ধতাহীন মানুষের জন্য। আমার কিছু দায় আছে।”

-“আমি দায়বদ্ধ হলে মেরে ফেলবে?”

অন্তূ শুধু হাসল। মনে মনে বলে উঠল, ‘আমি বলছি, আপনি দায়বদ্ধ হবার পরেও মরণই হবে আপনার একমাত্র মুক্তির পথ। আমি আপনাকে দায়বদ্ধ করে তুলব, এবং যেকোনো শর্তে বাঁচিয়ে রাখব। প্রতিক্ষণে

জীবিত করে আবার মেরে ফেলব।’জয় অন্তূকে আর রাঁধতেই দিলো না। মেঝেতে বসিয়ে রেখে নতুন করে মশলা কষিয়ে রান্না শুরু করল। পিকনিকে বিরিয়ানী রেঁধে অভিজ্ঞ হাত তার। অন্তূ মেঝেতে বসে বসে দেখল গলায় গামছা ঝুলিয়ে, লুঙ্গি পরে একদম পেশাগত বাবুর্চির মতো রান্না করছে জয়। বিরিয়ানীর গন্ধে সকাল সকাল দোতলা মেখে উঠল। রাধতে রাধতে আবার গলা ছেড়ে গান ধরল,

মাইয়ার পেছন ছাইড়া দিয়া মন্টু হইয়াছি
পাপের জন্য গঙ্গা জলে ডুব দিয়াছি
সবকিছু ছাইড়া আমি সাধু হইয়াছি....

প্রেমে আগুন লাগাইছি ও প্রেমের বিদায়
জানাইছি.... প্রেমের গুষ্টি মেরেছি...
বাংলা মাল ছাইড়া হাতে শরবত নিয়াছি
বৈরাগ দিয়া কপালেতে তিলক লাগাইছি...
অন্তূ রিমির কাছে গিয়ে বলল, "আপনার
বোরকাটা দিন, রিমি!"
রিমি অবাক হলো, "আপনি বোরকা পরবেন,
আরমিণ?"
-"পরব।"জয় তৈরি হয়ে ওয়ার্কশপে নেমে
গিয়েছিল। অনেকগুলো দিন পর গায়ে বোরকা
চড়াতে গিয়ে অন্তূর ভেতরে পাগলাটে বিভ্রম
তৈরি হলো। সে দেখল, আব্বু গেটের বাইরে
দাঁড়িয়ে আছে। অন্তূর হুড়মুড় করে বোরকা

পরে দৌড়ে গিয়ে আব্বুর হাতখানা চেপে ধরবে, রাস্তা পার হবে, ভার্সিটির গেটে নেমে বলবে, "ছাতা খোলো। খুব রোদ আব্বু। প্রেশার বাড়বে কিন্তু।"

আমজাদ সাহেব গম্ভীর মুখে বলবেন, "রোদে ভিটামিন ডি থাকে। প্রেশার বাড়ে কে বলেছে তোকে? একা যাবার চেষ্টা করিস না। আমি আসব নিতে।"আজ বাইরে জয় আমির দাঁড়িয়ে আছে। সেদিন প্রথমবার অন্তূ জয় আমিরের জন্য বোরকা পরে তৈরি হলো। জয়ের নজর পড়তেই তার চঞ্চল চোখদুটো থমকে স্থির হলো। জয় দেখতে পায় এক জুনিয়র বোকা-বাঘিনীকে। যে কালো

বোরকায় আবৃত, সুন্দর চোখদুটোয় তেজ, ধীর-স্থির বেপাত্তা চলন। জয়কে এড়িয়ে চলে যাচ্ছে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের দিকে। জয়ের ভেতরে জেদ উঠল, জয় কূটিল হাসে, মেয়েটাকে রোজ ডাকে, জ্বালাতন করার চেষ্টা করে। মিছেমিছি চ্যালেঞ্জ ছোঁড়ে। এটা তো সেই আরমিণ! তার ঘরওয়ালির আসার কথা ছিল না! জয়ের বুকের ভেতর কেমন একটা লাগে। মস্তিষ্কে যে চাপ সে বইছে আজ তিনটা দিন, তা একত্র হয়ে জয়কে গলা টিপে ধরে। একটাবারও জিজ্ঞেস করে না, বোরকা কেন পরেছ হঠাৎ-ই? জিহ্বা সরে না জয়ের।দুজন অনেকটা পথ হাঁটে আজ। রাস্তায় লোকে

আলোচনায় বসে যায়। নোংরামি করে ধরা খেয়ে বিয়ে করা বউ সাবেক ভিপি জয় আমিরের। মেয়েটার লজ্জা শরম নেই। আবার পর্দা করে! এসব হলো ভন্ড।

জয় চুপচাপ হেঁটে যায়। দেহটাকে শূন্য লাগে তার। হামজা কেন আসছে না? বোঝাপড়া বাকি। এত হিসেব জয় এই সীমিত জীবনে কীভাবে মেলাবে জয়? পরিণতিহীন এক অনিশ্চিত পরিণতির পথটা এমন এলোমেলো লাগে কেন আজকাল?

রিক্সাওয়ালা জয়কে দেখে দাঁত বের করে হাসে, "তুমার কাছে কইলাম কম ভাড়া নিতাম না, মামা। বেশি ভাড়া দেওন লাগব

আমারে।”-“বেশি ভাড়া তুমার শ্যাটার ভিতর ভরে দেব, মামা। আমি একজন বেকার লোক। না জানি তুমি কইবা ভাড়া লাগতো না, ওঠেন, এক্কেরে জাহান্নাম পর্যন্ত নামায়ে দিয়ে আসি।”

-“না। তুমি বড়লোকের ব্যাটা। বেশি ভাড়া না দিলে আমি রিক্সা টান দিমু না মানে দিমু না।
”

–“এই শালা, ট্যাকা কি গাছের ছাল না ভ্যাড়ার বাল? দে তোর রিক্সা দে। আমি চালায়ে যাই বিনামূল্যে। দেহ্।”

-“লন। আপনেই যান গা। ন্যায্য ভাড়া না পাইলে আমি চালাইতাম না রিক্সা।”

জয় রিক্সায় চড়ে বসল। আবার নেমে পড়ল, “নাহ্, মান ইজ্জত এমনিই নাই, তারপর আবার... তুই চালা। সাড়ে দুই ট্যাকা বেশি দেবোনি। চল যাই গা। ওঠো, ঘরওয়ালি!” অন্তূ ভার্সিটির গেইট দিয়ে ঢোকার পর থেকে যতক্ষণ দেখা গেল জয় একদৃষ্টে দেখল অন্তূ শহীদ মিনার চত্বর পেরিয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এরকম এক সকালে এই মেয়েটিকে এই রূপেই প্রথমবার দেখেছিল সে।জয়ের রিক্সা ঘিরে ধরল ছাত্র-ছাত্রী, জুনিয়ররেরা। চোখ ফেরাতে হলো জয়ের।

অন্তূ সমাজবিজ্ঞান বিভাগে ঢুকে প্রফেসর মনোয়ারা রেহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে ভার্সিটির পেছনের পথ দিয়ে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। গাড়ি আসবে, তাকে তুলে নিতে।মিনিট পনেরো চলার পর গাড়ি এসে থামল এক পুরোনো একতলা বাড়ির সম্মুখে। গাড়ির ভোঁতা আওয়াজে পেট গুলিয়ে আসছিল। বসার ঘরে ঢুকে আদব-কায়দাকে ছুটি দিয়ে সে দ্রুত বসে পড়ল সোফার ওপরে।

ঘরে মোট চারজন পুরুষ। অন্তূ এক সোফায় আলাদা বসা হেলান দিয়ে। একজন নারী

পর্দার আড়াল থেকে একটি ছোট্ট মেয়েকে দিয়ে চা-নাশতা পাঠাল।

আনসারী মোল্লা সাহেব অন্তূকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি অসুস্থ, মা?"

-"না, চাচা। আল্লাহর রহমতে ঠিক আছি। আপনি ভালো তো?"

-"আল্লাহ রেখেছেন। চোখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি অসুস্থ। মুরসালীনের খবর কী? কিছু বলেছে তোমাকে?"

-"সে আর মুক্তির আশা করে না। শুধু আপনারা বাচ্চাদের মুক্ত করুন, এই চাওয়া তার। আমি যেটুকু বুঝেছি।"

-“একটা কথা জিজ্ঞেস করব, যদি কিছু মনে না করো?”

-“বলুন, চাচা।”

-“তোমারে আগে যেইবার দেখছি, বোরকা পরো নাই। আজ কি নিরাপত্তার জন্য? আমাদের সাহায্য করতে গিয়ে তোমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো?”অন্তূর ভেতরে এক তিক্ত অনুভূতি জন্মালো। সে তা গিলে প্রসঙ্গ বদলে ফেলল, “বাচ্চাদেরকে ওই জাহান্নাম থেকে মুক্ত করতে আর একজন সাহায্য করবেন বলেছেন। ঠিক সাহায্য নয়, বরং তিনি আমার উদ্দেশ্য ধরে ফেলেছিলেন। কিন্তু

তিনিও চান বাচ্চিগুলো মায়ের কোলে ফিরুক।''

"কে সে?''

-"একজন উকিল। ওদেরই লোক। কিন্তু..''

আৎকে উঠল সবাই। অন্তূ আশ্বাস দিলো, চিন্তা করবেন না। আপনাদের ব্যাপারে উনাকে কিছুই বলিনি। বলবও না। উনি শুধু জানেন আমি বাচ্চাদের মুক্তি চাই। কিন্তু কী করছি, সে সম্বন্ধে তেমন জানানো হয়নি। উনি চান মুরসালীন নিজেও ওদের কাছে হার স্বীকার করে মুক্ত হোক। মুরসালীন মহানের সঙ্গে কেমন অন্যরকম বোঝাপড়া রয়েছে উনার।''

-“মুরসালীন কী বলে এ ব্যাপারে।”
-“আপনারা আমার চেয়ে মুরসালীন মহানকে ভালো চেনেন।”
-“এতদিনে বেঁচে আছে আল্লাহ, শুকরিয়া। কী হালে রাখছে ওরে কে জানে? হতে পারে আঘাত তাকে কাবু করেছে।”
-“পারেনি। তাছাড়া হামজা কখনোই, কোনো শর্তেই মুরসালীনকে জীবিত ছাড়বে না। হামজা ঝুঁকি জিইয়ে রাখে না। মুরসালীন মহান আবার মুক্ত হয়ে তার পেছনে লাগবে, তার সাধের তৈরি জাহান্নাম ভেঙে ফেলতে চাইবে, এরকম সুযোগ হামজা কাউকে দেবে না।”

কিছুক্ষণ নীরবতার পর আনসারী সাহেব বললেন, "তোমার উকিল ওদের লোক, তবু তোমাকে সাহায্য করছে কেন? এর পেছনে কোনো অন্য ব্যাপার নেই তো!"-"থাকলই বা। ততদিনে আমি সবকিছু অন্যরকম করে ফেলতে চাই।"

-"তা কেমনে করবা? কত বলি, কত কুরবানী হয়ে যাচ্ছে। তোমার মতোন মেয়ে আমাদের সাহায্য করতে এসে বিপদে পড়লে আমি খুব অপরাধী হয়ে যাব রে মা মালিকের কাছে। সাবধানে থাইকো।"

অন্তূ মনে মনে বলল, 'উল্টো আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, চাচা। আমি বরং আপনাদেরকে

ব্যবহার করছি। এই খেলার শেষ দেখা আমার একার পক্ষে সম্ভব না। আমি আপনার মতো এমন ওদের যেকোনো বিরোধীকে যানবাহন হিসেবে ব্যবহার করতে পারি ওদের ধ্বংসের পথে।'

অন্তূ স্থির বসে থাকা জোয়ান লোকটির দিকে ফিরল, "আমার আন্দাজ সঠিক হলে আপনিই পুলিশ অফিসার!"

লোকটা মাথা নাড়ল, "আপনার আন্দাজ সঠিক। এবং আমি ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি) থেকে, রউফ কায়সার।"-"আপনি কেন সাহায্য করতে চান আমাকে? আপনারাও জয় আমির ও

হামজাদেরই সহযোদ্ধা, আমার জানামতে।”
সূক্ষ্ম একটা খোঁচা মারল অন্তূ।
-“বর্তমান সরকার যতদিন পুরো এই আমলের প্রশাসনকে কিনে ফেলতে সময় নেবে, সেই পর্যন্ত আমার মতো কিছু বিরোধী থাকবে।”
অন্তূ বুঝল, বিরোধী দলীয় সমর্থক। তাতে অন্তূর যায় আসে না। রাজনৈতিক দলাদলীর সঙ্গে তার সম্পৃক্ততা নেই। কেবল তার একটি উদ্দেশ্য আছে। একটি ধ্বংসযজ্ঞের আয়োজন সে করবে। এবং এই ধ্বংযজ্ঞে সে যে কাউকে উপাদান বানাতে পারে, যেকোনোভাবে। তার কোনো ভয় নেই।

পিছুটান আছে বেশ কয়েকটা যেগুলোকে দায়ভার বললে ভালো শোনাবে, এছাড়া আর কিছু নেই।

অন্তূ এক গ্লাস পানি খেলো বেশ কিছুটা সময় নিয়ে। এরপর বলল, "আমি আপনাকে আজ জয় ও হামজার অপরাধ জীবনের বিশেষ একাংশের ফিরিস্তি দেব। কিন্তু তার আগে আমার একটা শর্ত রয়েছে।"

-"কী শর্ত?"-"উহু! এভাবে নয়। এই শর্ত পূরণে আপনার বেঁকে বসার চান্স রয়েছে সিংহভাগ। কিন্তু তা হলে আমার চলবে না। বরং আপনি আমার শর্ত মেনে নেবেন, এই

শর্তে আমি আপনাকে সেই ফিরিস্তি শোনাবো।
”

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল রউফ। উচু-লম্বা কালো চেহারা। গায়ের রঙ কালো হলেও চেহারার গড়ন ভালো। চোখদুটো গভীর, মুখের ভঙ্গিমা একটু কূটিল। সে অন্তূকে দেখল পর্যবেক্ষণের সাথে। অন্তূ এতে আশ্বস্ত হলো। এই খেলায় একটু চতুর লোক তার চাই। সরলদের কোনো কাজ নেই এখানে।
-“বলুন আপনার শর্ত। শোনা যাক!”
অন্তূ বলল, “জয় আমিরের যেকোনো একটা পাপের শাস্তিও মৃত্যুদন্ড হতে পারে। কিন্তু আপনি তার পাপাচারের গোটা অধ্যায় জেনেও

তাকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করতে পারবেন না।
''তাচ্ছিল্য করে হেসে ফেলল রউফ, "কী আশ্চর্য, ম্যাডাম! আমি আইনের কাছে দায়বদ্ধ। অথচ আপনি তো আমাকে কথায় কথায় আমাকে কাস্টমাইজ করে ফেলছেন। আপনি আমাকে যে তথ্য দেবেন তার জন্য অবশ্যই ধন্যবাদ কিন্তু আইনকে কাস্টমাইজ করার বিষয়টা হাস্যকর। তার আগে আমি কারণ জানতে চাইব।''

অন্তূ চোখদুটো মুদে হেলান দিলো আরেকটু, "কোনো প্রেমিককে তার প্রেমিকার সঙ্গে মিলিয়ে দেবার পিয়ন হিসেবে আমি-আপনি এই চুক্তি করতে বসিনি এখানে। এবং আমি

অপ্রয়োজনে, অযৌক্তিক কথা বলার জন্যও এতদূর বয়ে আসিনি, অফিসার!"

রউফ কপাল জড়িয়ে বলল, "কে প্রেমিক?"

-"জয় আমির। এবং তার পুরোনো প্রেমিকা হলো মৃত্যু। সে নির্দিষ্ট একটা সময় অবধি বাঁচতে চায়। কেননা তার কিছু কাজ পুরো করার আছে। তা ফুরোলে সে সেই পথে এগিয়ে যাবে, যেখানে তার মৃত্যু অবধারিত।"

-"তা কেমন?"

-"হতে পারে সে তার কোনো শিকারের সামনে বুক পেতে দেবে। কিংবা আইন সামনে পড়ে গেলে আইনের সামনে।"

-"তার কারণ?"

-“বেশ কয়েকটা কারণ রয়েছে।”
-“কী কারণ?”-“প্রথমত সে জীবনকে ভয় পায়। মৃত্যু তার জীবনের একমাত্র মুগ্ধতা। দ্বিতীয়ত সে তার কোনো শিকারের হাতে প্রাণ দিতে চায় যেন সে এটা প্রমাণ করার মাধ্যেমে হাসতে হাসতে মরতে পারে যে যেকোনো শিকারই তার মতো একেকটা প্রতিশোধপরায়ন, হিংস্র, পাপী জয় আমির হয়ে ওঠে, যেমনটা সে হয়েছিল। তৃতীয়ত সে বন্দিত্বকে ঘেন্না করে। আইনের হাতে আত্মসমর্পণ করে বন্দি হবার বদলে সে অবশ্যই শখের সঙ্গে বুলেটের সামনে বুক মেলে ধরবে। যেটা কোনো মূল্যেই হতে দেয়া

যাবে না।''-"ওয়েট ওয়েট! সেকেন্ড টাইম হোয়াট ইউ সেইড, আই ওয়াননা বি গট দ্যাট এগেইন, হোয়াট ডু ইউ মিন?''

অন্তূ গভীর করে শ্বাস টানল, "সে নিজেকে তুলে ধরতে চায়। সে প্রমাণ করতে চায়—যেকোনো শিকার একবার সুযোগ ও প্রাণ ফিরে পেলে শিকারী হয়ে ওঠে। ঠিক তার মতো। আর এটা পাপ নয়, এটা হলো প্রতিক্রিয়া।''

রউফ চায়ের কাপটা হাতে ধরে অনেকটা সময় চুপ করে বসে রইল। অন্তূর চোখের সামনে সিনেমার পর্দার মতোন ভেসে উঠল—অন্তূকে অপদস্ত করার পর যেদিন জয় তাদের

বাড়িতে এসেছিল রাবেয়া ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। জয় তখন হেসে বলেছিল, ‘সবাই স্বার্থপর, দেখেছেন? আগেরবার এসেছিলাম, আমি এতিম বলে আপনি নিজেকে আম্মা ডাকতে বলেছিলেন। এবার যেই একটু ক্ষতি করেছি, আর কথাই বলছেন না। অথচ এখনও কিন্তু আমি জয় আমির সেই এতিমই আছি। নাকি এখন বাপ-মা বেঁচে উঠেছে আমার?’

অন্তূ সেদিনই বুঝে গেছিল জয়ের চিন্তাধারাকে। এরপর সে শুধু তার আন্দাজ প্রমাণ করেছে। এবং জয়কে জানতে জয়কে জমিনের মতোন খুঁড়ে গেছে।-“আপনার কাছে

ওদের অপরাধের কেমন তথ্য রয়েছে? শুধু তথ্য নাকি প্রমাণও?''

-"প্রমাণে পরে আসছি। সাক্ষ্য দিয়ে শুরু করি। মাস কয়েক আগে মেয়র হামজা পাটোয়ারী তার বোনের স্বামী সীমান্তকে খুন করেছে। আমার সামনে।''

রউফ নড়েচড়ে বসল, "আপনার সামনে?''

-"আপনি যে সোফায় বসে আছেন, ধরুন সেখানে আপনি কাউকে কুপিয়ে মারছেন, আমি ওই যে ওই দরজার কাছে দাঁড়ানো।''

-"এরপর?''-"পলাশ আজগর। তাকে মারা হয়েছে কাঠের মেশিনে টুকরো করে। সেই মেশিন ও কাঠের মিলের মালিকের হদিশ

আমি আপনাকে দেব। তাকে ধরে নিয়ে আসবেন। এবং সে সাক্ষী দিতে অবশ্য রাজী হবে না। তার জন্য তাকে টর্চার সেলেও রাখা লাগতে পারে দু-একদন। তাছাড়া তার একটা ছোট্ট মেয়েও আছে। যদি একটু অন্যায় উপায় অবলম্বন করতে চান তো তাকে জিম্মি করেও স্বীকারক্তি নিতে পারেন। এবং তার এক পা পঙ্গু। সেটা করেছে জয় আমির। বিষয়টা প্রমাণ করতে এখন পুলিশ হেফাজতে থাকা কবির আপনার ভালো ইনফর্মার হতে পারে। সে উপস্থিত ছিল সেসময়।”

রউফ কায়সার পর্যবেক্ষকের মতো চেয়ে থেকে মনোযোগ দিয়ে শুনছিল কথাগুলো।

অন্তূ বলল, “সাবেক মেয়র, ঝন্টু সাহেবের ছেলে মাজহার, তাকে জয় আমির জবাই করে মেরেছে।”

-“আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন?”

-“না। আমার হাত থেকে চাপ্পর নিয়ে গেছিল। এবং আমি খুব ভুল না হলে তার মাথাটা কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। এবং সেই কবরটাও শনাক্ত করে দিতে পারি। এবং সেখানে আপনি পলাশের মাথার খুলিটাও পাবেন।”

-“আচ্ছা।” রউফ কিছু লিখল।

অন্তূ বলল, “এবং ঝন্টু সাহেবকে দুই ভাই মিলে মেরেছে বলেই আমার ধারণা। যদি

একজনও মারে, সেদিন বেরিয়েছিল দুজন। এবং এটার প্রমাণ..''-"আছে আমার কাছে। রউফ হাসল, "তদন্তের সময়ই একটি সিসিটিভি ফুটেজ আমরা উদ্ধার করেছিলাম। এবং সেখানে হামজা পাটোয়ারীকে ঝন্টু সাহেবের বাড়ির রাস্তায় দেখা গেছে। কিন্তু উনাকে তেমন একটা জিজ্ঞাসাবাদের সুযোগ তখন পাইনি কেননা উনি ক্ষমতাসীন দলের কর্মী। যেহেতু ওটা উনার শ্বশুরবাড়িও, সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা কিছুটা চাপা পড়ে গেছিল। এবার আর এই দ্বিধাটা রইল না।''

অন্তূ যাবতীয় অপরাধের বিবরণ দেবার পর আনসারী সাহেবকে বলল, মেয়র এখন

ঢাকাতে। সে ফিরলে সব শেষ ধরুন! সুতরাং সে ফেরার আগে যা করতে পারবেন। এবং স্বাভাবিকভাবে সে আজকাল ফিরে আসবে। এখন আপনাদের কাজ হলো সে যাতে এত দ্রুত ফিরতেই না পারে, এমন কিছু করা।

-"কী করতে বলছো?'

-"গাড়ি এক্সিডেন্ট করিয়ে দিন।"

-"অ্যাহ?"

-"দু চারদিন হাসপাতাল ঘুরে আসুক। বাড়ি আর ঢাকা করতে করতে পেরেশান হয়ে গেছে ভীষণ।"

সবাই কিছুক্ষণ চুপচাপ অন্তূকে দেখল। অন্তূ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনারা পাটোয়ারী

বাড়িতে ঢোকার জন্য কালকের দিনটা পাবেন। কাল জয় আমিরকে নিয়ে বের হবো আমি। সেইটুকু সময় আপনারা পাবেন।
''হামজা বড়মহলের সঙ্গে একটি মিটিং শেষ করে হোটেলে ফিরল বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে। হোটেলটা যে মন্ত্রীর, তার সঙ্গেই মিটিং শেষ করে ফিরল সে। পাঞ্জাবীখানা খুলে খালি গায়ে শুয়ে পড়ল বিছানার ওপর। ঘুমের অভাবে শরীরে অসহ্য অস্থিরতা টের পাচ্ছিল। জয়কে গত দু'দিনে বহুবার কল করেছে সে, কোনো সারা পাওয়া যায়নি।
হামজা ওভাবেই উঠে গিয়ে বেলকনির গ্রিল ধরে দাঁড়াল। রাজধানীর এক অভিজাত

হোটেলের বেলকনি থেকে ব্যস্ত এই মহানগরী বড় রহস্যময় লাগল হামজার কাছে। এই ব্যস্ত নগরী কাউকে কিচ্ছু দেয় না। হাসিল করতে হয়, সেই হাসিলের সিংহভাগই অনৈতিক হাতে আদায়কৃত। হামজাকেও কিছু দেয়নি। দেয়নি বলাটা অকৃতজ্ঞতা হবে। ব্যথা দিয়েছে। কখনও শরীরের, কখনও খিদের, কখনও বা পরিচয়হীনতার, কখনও অনুভূতিহীনতার, কখনও বা এত লড়াই করে জেতা এইটুকু ক্ষমতা হারিয়ে ফেলার ভয়ের ব্যথ।ক্ষমতার লড়াই যারা লড়ে তারা জানে তারা কতটা অসহায়! তারা চাইলেও একজন ভালো মানুষ হতে পারে না। নেশার চেয়ে বড়

প্রবৃত্তি নেই। ক্ষমতার নেশার চেয়ে বড় নেশা নেই।

রিমির মুখটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। যারা রোজ ব্যথা পায়, তাদের সয়ে যায়। যার একদমই অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা নেই, তারা কীভাবে সইবে? হামজার জানা নেই। হামজা কখনও কিছু ধরে রাখতে চায়নি ক্ষমতা ও জয়কে ছাড়া। কিন্তু এরপর মনে হলো সে আরেকটা জিনিস ধরে রাখতে চেয়েছে– রিমিকে। সরল রিমিকে। সেই রিমি এখনও সরল কিন্তু তিক্ততার বশে বশীভূত। হামজা আন্দাজ করে, রিমি যখন-তখন মুখে চেয়ে বসবে, আমাকে তালাক দিন।

হামজা শক্ত করে চেপে ধরল গ্রিলটা। তার বলবান হাতের মুঠোর ওপর মোটা মোটা রগগুলো খাড়া হয়ে উঠল। বুকের ভেতরে এক চাপা সূঁচালো ব্যথা টের পাওয়া যাচ্ছে। রিমির মুখে উচ্চারিত এই কথায় হামজার যে হেরে যাওয়া, হারিয়ে ফেলা ও ব্যর্থতা আছে, তা হামজা সামাল দেবে কী করে?

এরপরের ভয়টা হামজাকে বিষের মতো গ্রাস করে। সে সব সহ্য করতে পারবে, সে পারে। কিন্তু...জয়ের চোখে তার জন্য অভিযোগ.... ঘৃণা!মস্তিষ্কের মধ্যভাগটা দপদপ করে উঠল। মাথা ঝারা মারল হামজা। দ্রুত রুমে এসে প্রেশারের ওষুধ ও দুটো ঘুমের ওষুধ খেলো।

তার ইচ্ছে করছে রুমটাকে ভেঙে আছড়ে গুড়ো গুড়ো করে ফেলতে। হামজা অস্থিরতা ও ভয়কে ঘেন্না করে। ক্ষমতা ও জয় তার। সে একটা আফসোসে আজ বহুদিন যাবৎ ঘুমায় না।

অন্তূ মেয়েটাকে ক্লাবঘরে তুলে নিয়ে যাবার কথা ছিল। এরকম বাড়ন্ত কাউকে পথে রাখতে নেই। অন্তূকে সে সুযোগ দিলে সে মুস্তাকিন মহানের মতোন কেঁচোর বদলে খুঁড়তে খুঁড়তে অজগর সাপ বের করে আনতো। এ কথা পলাশ জানতে পেরে বলেছিল, 'হামজা তুমি আমার হক নষ্ট কোরো না এভাবে। তুমি কি জানো, কাকতালীয় ওই

ছোটপাখির ভাই আমার কাছে ঋণী! ক্লাবঘর ছাড়ো, তুমি আমার ঘরে আনো। আমার ওপরে তোমার ভরসা নাই?''

হামজা সম্মতি দিলো। অন্তূর প্রধান দূর্বলতা তার আব্বু। দ্বিতীয়টা সম্মান। দুটো লুট করতেই পলাশ সিদ্ধহস্ত, তার হাত পাকা। কিন্তু বাজির চাল পাল্টে দিয়েছে সেই সন্ধ্যার শেষক্ষণে জয় আমির। অন্তূ বেঁচে গেল সেদিন, আমজাদ সাহেবও।এরপর অন্তূকে ঢাকায় তুলে নেবার কথা ছিল। কিন্তু তার মাঝে অন্তূ জয়কে থুতু নিক্ষেপ করে যে আরও একবার চাল পাল্টে দেবে হামজা তা ভাবতেও পারেনি। বিষয়টা সে জেনে বরং

খুশিই হয়েছিল। সেদিন জয় পলাশের রুফটপ থেকে অন্তূকে বাঁচালেও, এই থুতুর বদলা নিতে হলেও জয় এবার অন্তূকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে।

কিন্তু জয় তার আগেই হামজাকে না জানিয়ে এক অঘটন ঘটিয়ে বসল। থুতুর বদলে থুতুর আয়োজন করল। হামজা সেদিন অত অল্প সময়ে আর কিছু ভাবতে পারেনি। নির্বাচনের ক'দিন পর, রেপুটেশন রক্ষার চেয়ে বড় কর্ম নেই একজন রাজনৈতিকের জন্য। নতুন অবস্থায় মানুষের মন ভাঙা চলবে না, মহান হতে হবে। সেই মুহুর্তে অন্তূকে হাতের মুঠোয় রাখার একমাত্র উপায় তার মাথায় জয়ের

সাথে বিয়ে দেয়াই এসেছিল।হামজা বেড-সাইড টেবিলের ওপরের ল্যাম্পটা তুলে এক আঁছাড় মারল। চুরমার হয়ে গেল তা বিকট শব্দ তুলে। এতবড় ভুল হামজা কী করে করেছিল সেদিন? আরও কয়েকটা ভুল হামজা করেছে এই কয়টা মাসে। সে মেয়েটাকে দূর্বল করতে অন্তিককে ট্রাকের চাকার নিচে পিষে ফেলেছে। পরিবারকে উচ্ছেদ করে ছেড়েছে। কিন্তু জেদি মেয়েটাকে জবাই করার সঠিক কাজটা সে করেনি। এবং সবচেয়ে বড় ভুল সে করেছে সে জয়কে মেয়েটার কাছে ছেড়ে রেখেছে।

এর পেছনেও অন্তূর একটা চাল বোধহয় খেটেছিল। অন্তূর সাথে জয়ের সম্পর্ক এতই বিশ্রী ও বিরোধী ছিল যে হামজার কখনও খেয়ালই আসেনি ওই মেয়েটার ওপর জয় নিজেকে হারাতেই পারে কোনো একদিন! রোজ মারধর, চেঁচামেচি, বৈপাক্ষিক বাক-বিতন্ডা, বোকা বোকা উত্তেজনা! হামজা যেন বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছিল!

হামজা বিছানার চাদর চেপে ধরে মেঝেতে হাঁটু গেঁড়ে বসল। ইচ্ছে করছে হাতুরি দিয়ে মাথার ওপর এক বাড়ি মেরে সবটা থামিয়ে দিতে।

দরজায় নক পড়ল। একজন সার্ভিসবয় এসেছে। সাথে একটি মেয়ে। মুখে সাজগোজ, শাড়ি পড়ার ধরণ ও ব্লাউজ দেখে বুঝে ফেলল হামজা মেয়েটা কী!

সার্ভিসবয় খুব বিনয়ের সাথে বলল, “স্যার, আপনার ড্রিংক। ভেতরে রাখব?”

হামজা হেঁটে এসে বিছানায় বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, “রাখো।”

সার্ভিস বয় মদের বোতল রেখেও দাঁড়িয়ে আছে দেখে বলল, “কিছু বলবে?”

স্যার! একটু লাজুক হাসল ছেলেটা, “ম্যানেজার, মানে ম্যানেজার স্যার ওকে পাঠাইছে আপনার সেবার জন্য! একা আছেন।

একটু সঙ্গ দরকার হতে পারে। আমাদেরকে আপনার স্পেশাল সেবার জন্য বলে দেয়া হইছে উপর থেকে।”

হামজা অবহেলার দৃষ্টি মেলে একবার দেখল মেয়েটার দিকে। আসল চেহারা বোঝার উপায় নেই, এত গাঢ় সাজ সেজেছে। হামজা মনে মনে বকে উঠল, ‘খানকি সাজছে কত? হোগা ভরা সাজের মাইরে চুদি! শালি স্লাট!’

এই কাজে সেজে আসার কোনো কারণ খুঁজে পেল না সে। বিয়ের পর আর কখনও অন্য নারীকে ছোঁয়া হয়নি। আজ বিরহ, মনের অস্থির যন্ত্রণা অথবা অনেকদিন রিমির সঙ্গছাড়া থাকার ফলে পৌরুষ উত্তেজনায়ই

হোক হামজার ভেতরে এক প্রকার আবেশ জাগল। মদ ও নারীসঙ্গ এই মুহুর্তে খুবই দরকার। ছেলেটাকে চলে যেতে ইশারা করে মেয়েটাকে কাছে ডাকল। মেয়েটা দরজা আঁটকে এসে নিজেকে লুটিয়ে হামজার পায়ের কাছে বসল।হামজা হাঁটুর ওপর কব্জি রেখে ঝুকে বসে। এক আঙুলে থুতনিটা তুলে ধরে চেহারাটা দেখে। খারাপ না তবে মেকাপের ওপর দিয়েও দু চারটে ব্রণ দেখা যাচ্ছে। মেয়েটা একদৃষ্টে হামজার ফুলে থাকা বুক, শক্ত পেট ও বাহুর পেশী দেখছিল। শেষ অবধি আচমকা শ্যামলা বলিষ্ঠ বুকে কালো কুচকুচে পশমের ওপর হাত রাখল।

হামজা তাচ্ছিল্য হাসে। তার ভেতর থেকে আগ্রহ কমে আসছে। সে বেহায়া মেয়েলোক পছন্দ করে না। মেয়ে মানুষ হবে লাজুক, পুরুষের সংস্পর্শে কুঁচকে উঠবে, এমন নারীকে ছুঁতে পুরুষদেহ ব্যকুল হয়। নড়াচড়ার মাঝে ইচ্ছাকৃত বুকের কাপড় ফেলে দিলো মেয়েটা। হামজা দেখল। কয়েকবার মুখে আঙুল নাড়ল। রাগ মাথাচাড়া উঠছে। যতবারে মেয়েটার দিকে চাইছে, তার ভেতরটা আবেদন করছে যেন চোখদুটো রিমির লজ্জায় লাল নত মুখখানা পায়!তা না পেয়ে ভেতরের রাগ ও যন্ত্রণা বেড়ে অসহ্য পর্যায়ে চলে গেল। তার এই চৌত্রিশ বছরের

জীবনে এই শূন্যতার বোঝা সে বয়নি আগে। তার বাপ হবার ছিল, তার একজন স্বামী হবার ছিল। সে নিজের একটা পরিবার চেয়েছে, যা তার কোনোদিন নেই। হামজার মনে পড়ল, সে পরিচয়হীন হয়েই মরতে চলেছে। তারও জয়ের মতোন আগেপিছে কেউ নেই। রিমি থাকতে দেয়নি।

বুকটা কেমন মুচড়ে এলো। হৃৎপেশীতে টান অনুভব হলো। সে কি সব হারাতে চলেছে? জয়, রিমি, সন্তান, ক্ষমতা! চোখ বুজে নিজের বুক থেকে মেয়েটার হাত সরিয়ে শান্ত-হিংস্র গলায় বলল, "আউট!"

মেয়েটা বুঝতে পারল না যেন। হামজা চোখ খুলল, মেয়েটা আৎকে উঠল। লাল টকটক করছে হামজার দুই চোখের শিরা। গম্ভীর দাড়ি-গোফওয়ালা মুখ, রক্তলাল চোখে চেয়ে হাত সরিয়ে নিলো মেয়েটা।

হামজা বলল, “যাবার সময় দরজার নব লক করে যাবে।”

মেয়েটার চোখে হতাশা। সে যেন শুধু পয়সার জন্যই নয়, হামজার মতো পুরুষের সঙ্গ পেতেই চেয়েছে আজ হামজাকে দেখার পর। ভয় পেয়ে মেয়েটার চলে যাবার পর হামজা মদের বোতল খুলে বসল। সে বহুদিন এত মদ একবারে বসে পান করেনি। তার মাথায়

একটা চিন্তা এলো, সে যেমন নিজের সন্তান ও স্ত্রীর বিরহে এমন জঘন্যভাবে কাতর হয়ে পড়েছে! সে হামজা, তার মতো পাথরের ভেতরে প্রাণ টের পাওয়া যায় আজকাল। সেখানে জয় কী করে সামলাবে নিজেকে। ছটফট করে উঠল হামজা। অসম্ভব! এদিকের কাজ অতি শীঘ্রই সেরে তাকে দিনাজপুর ফিরতে হবে। জয়ের জীবনে কোনো পিছুটান থাকতে পারে না। হামজা রাখবে না। জয়কে সে ধ্বংস হতে দেবে না। তার কলিজার এক টুকরো জয়। চোখের সামনে জয়কে হেরে যেতে দেখা হামজার কাছে মৃত্যুসম।

কল বেজে উঠল। এমপি মন্ডল সাহেবের কল। তিনি জানালেন কামরুল তার বড়ঘরে খুন হয়েছে। বাপ্পী আর রবিউল গুরুত্বর আহত বুলেটের আঘাতে।হামজার মস্তিষ্ক এমন সময় এমন সংবাদ গ্রহণ করতে পারছিল না যেন। অনেকক্ষণ মদের বোতলটা হাতে চেপে নির্বিকার বসে রইল হামজা।

বড়ঘরে কী হয়েছে তার উ অনুপস্থিতিতে? তার একটা সম্ভাব্য দৃশ্য ফুটে উঠল হামজার চোখের সামনে। একটা গভীর করে শ্বাস টেনে চোখ বুজে বসে রইল মিনিট খানেক, দম ছেড়ে তাকাল।

এরপর জয়কে কল করল। তিনবারেও কল রিসিভ করল না জয়।জয় অন্তূকে ভার্সিটিতে নামিয়ে দিয়ে আর কারাগারে গেল না। ক্লাবে গিয়ে কয়েকজনকে বলল, "ভার্সিটির আশেপাশেই থাকবি। তোদের ভাবী বের হলে রিক্সা ধরে দিয়ে পেছন পেছন এসে বাড়িতে ঢুকিয়ে দিবি।"

এরপর ছয় সাতজনকে সাথে নিয়ে কুষ্টিয়াগামী বাসে উঠল। দিনাজপুর থেকে কুষ্টিয়া কমবেশি আট ঘন্টার পথ। রাত আটটা বাজবে সেখানে পৌঁছাতে। গাড়ি যখন গ্রাম্য সড়ক দিয়ে চলছিল, রাস্তার দু ধারে

ফসলি জমি, বাসের জানালা দিয়ে আসা শনশনে বাতাস।

জয় সেই চলমান প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে গেয়ে উঠল,

কাগজের ফুলে কভু ভ্রমর আসে না

মরা গাছে কখনও ফুল ফোটে না..

কলমের কালি যদি যায় শুকিয়ে,

জীবনের খাতা শূন্য থেকে যায়, আমি লিখব কোথায়...তার ফোন বাজছে। তিনবার বেজে গেল। হামজার কল। তার ধরতে ইচ্ছে করল না। এটা এক ধরণের ব্যথা। এই ব্যথার নাম জানে না জয়। এই যে সব রকমের ব্যথাকে ছাড়িয়ে ওঠা এই ব্যথাটা, এটার উৎপত্তি

মুরসালীনের একটা বাক্য! সে তার একমাত্র অবলম্বণের প্রতি সন্দেহিন। এই দ্বিধা তার ও হামজার মাঝে আসার ছিল না। ব্যথাটা রিংয়ের আওয়াজের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছিল।

চতুর্থবার রিসিভ করে চুপ রইল। হামজা বলল, "কামরুলকে কে মেরেছে জয়?"

-"কে মারবে আমি ছাড়া?"

-"তুই মেরেছিস?"

-"আর কে মারার আছে?"

-"কেন?"

-"বাড়াবাড়ি করছিল। মারার উদ্দেশ্যে গুলি করিনি। কিন্তু জায়গামতোন লাগছে, টপকে গেছে। আমার দোষ নাই কোনো।"

-"বাপ্পী আর রবিউল...."কথাটা পুরো হবার আগেই জয় কল কেটে ফোন বন্ধ করে দিলো। এখন জিজ্ঞেস করবে, কোথায় তুই। জয়ের কাছে জবাব নেই। সে হামজার সাথে এভাবে কথা বলতে চায় না।

রাত সাড়ে আটটার দিকে মার্জিয়ার বাপের বাড়িতে সাতজন অজ্ঞাত যুবক ঢুকল। বাড়ির লোকজনদের হাতে কেজি পাঁচেক মিষ্টি ধরিয়ে দিলো।

জয় চারদিকটা দেখল একবার। দুটো ঘর দালান, ওপরে চিনের চাল। দুটো ছাপড়া টিনের বেড়াওয়ালা ঘর। তার মধ্যে একটা রান্নাঘর বোধহয়। মার্জিয়া বারান্দায় হাঁটছিল উচু পেটটা নিয়ে। জয়কে দেখে তার ভেতরটা কেঁপে উঠল, ঘেন্নায় ভরে এলো বুকটা।

জয়কে সবাই প্রশ্ন করল, "কে তুমি?"

জয় বেহায়ার মতোন হেসে মার্জিয়ার দিকে ইশারা করে তুড়ি বাজালো, "এই তো, ভাবী! কী যেন নাম! ধ্যাৎ শালার! বয়স হচ্ছে তো, স্মৃতিশক্তি দূর্বল হয়ে যাচ্ছে। উমম! মার্জিয়া ভাবীইই! উনার ননদের একমাত্র স্বামী আমি–জয় আমির। শাশুড়ি আর ভাবীর সাথে দেখা

করতে আসলাম। আপনারা খুশি হননি তো? খবরদার হবেন না। আমি একটু কুফা মানে অশুভ আছি। হিহি, ভালো আছেন ভাবী?"

মার্জিয়া আতঙ্কিত চোখে চেয়ে রইল। এমন ধরণেরই এক তান্ডব বছর পাঁচেক আগে একবার হয়েছিল বাড়িতে, তারপর তার জীবন বদলে গেছে।-"ভাবী! আরমিণের আম্মা কই? কোন ঘরে থাকেন উনি?"

রাবেয়া হলদে লাইটের আলোয় চশমা চোখে দিয়ে নিচু জলচৌকির ওপর বসে কাঁথা সেলাই করছিলেন। জয় জুতো পায়ে ঘরে উঠে গিয়ে উনার সামনে বিছিয়ে রাখা কাঁথার ওপর বসল। রাবেয়া চমকে উঠলেন জয়কে

দেখে। ওর এই বাড়ি চিনে আসার কথা তো না! জয়ের মুখে সেই চঞ্চল হাসি।অন্তূ যখন উঠে চলে আসছিল তখন পেছন থেকে রউফ রসিক সুরে জিজ্ঞেস করে ওঠে, "জয় আমিরকে মৃত্যুদন্ড দিতে পারব না। তার বদলে কী শাস্তি দেবার অনুমতি দেবেন আপনি?"

অন্তূ দরজা চেপে ধরে পেছন ফিরে তাকায়, "যাবজ্জীবন কারাদন্ড! কারাগারের সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীর কালকুঠুরীখানা যেন তার বসবাসের জায়গা হয়। এবং সেখানে থাকবে না কোনো পরিচিতদের সঙ্গে সাক্ষাতের

সুযোগ! সে বন্দিত্বের অন্ধকারকে ভয় পায়, সে আইনকে বড্ড ভয় পায়।''

“এটা জয় আমিরের হিসেব গেল। আর হামজা পাটোয়ারী সাহেবেরটা?''

অন্তূ হেসে বলল, “এটা সময় বলবে।''

বেরিয়ে আসতে আসতে অন্তূ মনে মনে বলল, ‘নেশাগ্রস্থ এক অন্ধ-পঙ্গু তার হাতের লাঠি হারিয়ে কতটা দিশেহারা হয়ে পড়ে আপনি জানেন না, রউফ সাহেব; আর যদি সেই লাঠি হয় তার বড় ভালোবাসার ধন! সেই দিশেহারা বুড়ো শেয়ালকে আমি আইনের হাতে তুলে দিয়ে হাতছাড়া করব না। তার সঙ্গে কত হিসেব বাকি আমার! সুযোগ পেলে তার জন্য

কারাগার আমি তৈরি করব আমার হাতে।
'জয়কে দেখে রাবেয়ার চোখে-মুখে আক্রোশের মতো একটা ব্যথা ফুটে উঠল, "এইখানে আইছো ক্যান? হুমকি দিতে, আমারে ভয় দেখাইতে?"
"আরে শাশুড়ি, আপনি তো ভুল বুঝতেছেন! আমি কি খারাপ ছেলে নাকি?"
-"ক্যান আসছো তাইলে আমার কাছে, জয়? আর কী আছে আমার? কী দেব তোমারে? কিচ্ছু নাই আমার। অন্তূ কিছু করছে?"
রাবেয়ার কথাগুলো একদৃষ্টে চেয়ে থেকে শুনল জয় তারপর একটু হেসে বলল, "ওর কী করার কথা? ওরেস্সালা! আমারে যাতে

গলাটলা টিপে জয় বাংলা করে দেয়, এই বুদ্ধিসুদ্ধি দিছেন নাকি গতরাতে?''

রাবেয়া ভঙ্গুর গলায় বলেন, "তার দরকার পড়বে না। আল্লাহ বিচারক। আমার আল্লাহ আছে। উনি সব জানেন, সব দেখেন।''

জয় জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, "হু হু, থাকলে নিশ্চয়ই দেখেন। উনি দেখেন বলেই তো আপনার এই অবস্থা!''

-"দিন সবার আসে, জয়। আইজ তুমি ভালো অবস্থায় আছো, কে বলতে পারে কালকেও এই অবস্থায় থাকবা। এইরকম ভালো একদিন স্বামী-সন্তান নিয়ে আমিও ছিলাম। আইজ নাই।''

জয় মাথা নুইয়ে হেসে ফেলল, “আমি স্বয়ং জীবিত এক বদদোয়া। আমার ওপর আপনার বদদোয়া কাজ করবে না।”-“তুমি কি এইখানে আমারে ভয় দেখাইতে আসছো, যাতে অন্তূরে দূর্বল করতে পারো! এক আমিই তো আছি যারে জিম্মি করবা আর অন্তূ ভয় পাবে। মারবা আমারে? মারো জয়, মারো! কিচ্ছু নাই এই মায়ের কাছে। মেরে ফেলো আমারে। আমি সেই হতাভাগি দূর্বল মা, যে তার দুই ব্যাটা-বেটিরে তোমাদের মতোন রাক্ষসের হাত থেকে বাঁচাইতে পারে নাই। এখন আবার জিন্দা আছি অন্তূর দূর্বলতা হবার জন্যে, তুমি তারচে মেরে ফেলো

আমারে। অন্তূর আর কোনো দূর্বলতা না থাক্। মারো..” টসটসে গরম নোনাজলে গাল ভিজে উঠল রাবেয়ার।

জয়ের ডান হাতখানা নিজের দিকে টেনে নিয়ে আঘাত করতে করতে কেঁদে ফেলল রাবেয়া,“মারো! মারো না! অনেক শক্তি না তোমার? কত ক্ষমতা দিছে আল্লাহ্ তোমারে! যা খুশি করো, বিচার নাই, সাজা নাই। তোমরাই তো মানুষ। যে মহিলার ছেলে নাই, মেয়ে কাছে নাই, স্বামী নাই, ঘর নাই, তারে বাঁচাইয়া আর কত সাঁজা দিবা? আমার মতোন অভাগীর বাঁচার হক নাই আল্লাহর জমিনে। অন্তূরে আমি বলতাম, এত তেজি হস না।

মেয়ে মানুষের এমন হইতে নাই। শোনেনি আমার কথা। ওর বাপের মতোন বেপরোয়া হইলো। আইজ মনেহয় ও ঠিক ছিল। তুমি মারো আমারে। আমি অন্তূর দূর্বলতা হবো না। তুমি আমারে মাইরে ফেলো। ওর কেউ নাই। আমি থাকলে আরও মুসিবত। তুমি ওরে আমার দোহাই দিয়ে হুমকি দিলে আমার অন্তূ উকিল হতে পারবে না। ওর আব্বা ওরে উকিল বানাইতে চাইছিল। আমার সেই সাধ্যি নাই। আমি খালি ওর ঘাঁড়ের বোঝা হয়ে বেঁচে আছি। আমার মেয়ের কত স্বপ্ন জানো, জয়? আমি মা ওরে জন্ম দিছি দুনিয়ায় খালি শাস্তি-সাজা পাবার জন্যে। আমার অন্তূ কিচ্ছু

পায় নাই কোনোদিন। কিছু চাইতোই না। ওর বয়সী মেয়েদের কত আবদার থাকে। আমার অন্তূ ওর বাপের মা ছিল। তারে জাহান্নামে দিছি আমি। আমার হাত বান্ধা। কিচ্ছু বলবার সাধ্যি নেই আমার তোমারে।''“কী বলতে চান? শুনি! আঘাত করতে চান?''

জয় পকেট থেকে ধারালো এক ড্যাগার বের করে ধরে হাসে, “এই নেন...আপনার অন্তিককে ট্রাক চাপা দিয়ে মেরেছি আমি। ধরুন, জানের বদলে জান।''

রাবেয়া চোখ দুটো বুজে ছিটকে উঠল, “খবরদার ওই জিনিস আমআর কাছে আনবা না। দূরে সরাও।''

-"কেন? মারবেন না আমায়? সুযোগ পেয়েছেন, কাজে লাগান। এটা হলো একটা সচেতন নাগরিকের বৈশিষ্ট্য। আমি চলে গেলে কিন্তু আফসোস হবে ছেলের খুনিকে ছেড়ে দেবার।"

রাবেয়া কান্নাভেজা চোখে মলেন হাসেন, তার কণ্ঠস্বরটা থরথর করে কাঁপে, "আমি কে গো আমার ছেলের খুনের বদলা নেবার? আমার আল্লাহ কি দেখে না? তুমি আমার ছেলেরে মারছো, আমিও যদি সেই একই পাপ করি, আমার-তুমার মধ্যে তফাত কী থাকলো? আমি কি বিচারক? বিচারক তো এক মালিক। ওই জিনিস তুমার হাতেই ভালো মানায়। তুমার

তো দরদের লোক নাই, তাই তুমিই পারবা কারও দরদের জিনিস ছিনাইয়া নিতে। আমার হাত দূর্বল গো, জয়।''জয় নিজের বাম হাত দিয়ে রাবেয়ার হাতখানা ধরে থামিয়ে বলল, "আপনার মেয়ে কিন্তু আপনার মতোন ভাবে না। সি ওয়ান্ট জাসটিস! সে বিচার চায়, বিচার করতে চায়। আপনার মহান নীতি সে মানে না, এটা জেনে কি আপনার কষ্ট পাওয়া উচিত না?''

-"তুমি ছুঁইও না তোমার হাত দিয়ে আমারে। তোমার হাতে অন্তিকের রক্ত লেগে আছে...''

জয় একদৃষ্টে তাকিয়ে বলে, "আপনি আগে ছুঁয়েছেন আগে আমাকে।''

-“এখন ছাড়ো। তুমি ছুঁইও না আর। ছেলের রক্তে মাখা হাত মা সহ্য করতে পারে না। তুমি ছাড়ো!”

জয় জিজ্ঞেস করে, “সব মায়েরাই কি আপনার মতো হয়?”

রাবেয়া আঁচল তুলে চোখের পানি মোছেন।

জয় জিজ্ঞেস করে, “হু? সব মায়েদের জন্যই কি ছেলের রক্ত কষ্টদায়ক?-“তুমি বুঝবা না মা’র দরদ।”

জয় গম্ভীর হয়ে বলে, “বোঝার কথা না। আমার রক্ত দেখে কোনোদিন আমার মা কাঁদে নাই।”

-“তোমার কি মায়ের দরকার আছে, জয়?যে মা’র দরদ বোঝে সে কোনো মা’র বুক খালি করে না।”
জয় বাচ্চাদের মতো জিজ্ঞেস করে, “আমি যেভাবে অন্তিককে মেরেছি, আপনার অন্তূও যদি আমাকে ওভাবে মেরে ফেলে, আপনি আমার জন্য কাঁদবেন এভাবে?”
রাবেয়া একটু থমকালেন। জয় রাবেয়ার সেই কম্পমান হাতখানা টেনে নিয়ে নিজের মাথায় রেখে জিজ্ঞেস করে, “কাঁদবেন আমার জন্য? আমার মা নেই। আমি অন্তিকের মতোন ওরম রক্তাক্ত হয়ে পথে-প্রান্তরে পরে থাকব ঠিকই,

কিন্তু আপনার মতো করে কাদার কেউ নেই আমার। কাঁদবেন আপনি আমার জন্য?''

রাবেয়া হাত সরাতে চান জয়ের মাথা থেকে, জয় সরাতে দিলো না। রাবেয়া জয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে কান্না ভেজা অথচ রুষ্ট গলায় বললেন, ''সন্তানের খুনির জন্য কাঁদতে নেই।''

জয় হাসে, ''আপনি একদিন আপনাকে 'মা' ডাকতে বলেছিলেন আমাকে। ওসব কথার কথা ছিল তাই না? নিজের মা ছাড়া অন্যের সন্তানের জন্য কেউ কাঁদে না, হু? আমি আমার রক্ত দেখে বিলাপকারী সেই একমাত্র কাঁদুনির রক্তও ছুঁয়ে দেখেছি। আমার হাত

শুধু আপনার ছেলের না, জয় আমির নামক ছেলের মায়ের রক্তেও ধোয়া, সে ছিল একমাত্র নারী, যে জয় আমিরের রক্ত দেখে হয়ত আপনার মতোই কাঁদতো। আপনি বুঝবেন না আমার হাতের কেরামতি!''রাবেয়া কিছুক্ষণ জয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হু হু করে কেঁদে ফেললেন গা কাঁপিয়ে। জয় নিজের মাথার ওপর থেকে রাবেয়ার হাত ছেড়ে দিলেও রাবেয়া হাত নামিয়ে নিলেন না। জয় ডানহাত দিয়ে পকেট এক থেকে বান্ডিল টাকা বের করে আলগোছে রাবেয়ার কাঁথার তলে রাখে।

অপর হাতে রাবেয়ার মাথায় আলতো হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে, “শোনো হতভাগী, তোমার আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম যাও, তোমার অন্তিকের একটা মেয়ে হবে, ঠিক তোমার মেয়ের মতো। কিন্তু তোমার বদদোয়া যেন না থামে আমার জন্য, খবরদার! আজ আসি। আবার দেখা নাও হতে পারে।”

রাবেয়া চট করে চোখ তুলে তাকাতেই জয় হেসে উঠল হো হো করে, “তোমার মেয়ের হাতে যদি শহীদ হয়ে যাই!”

চোখ মেরে গা ঝেরে উঠে দাঁড়ায় জয়। আর তাকায় না পেছনে। বেরিয়ে আসে দলবলসহ। আসার সময় মার্জিয়ার দিকে তাকিয়ে একবার

হাসে, “ভাবী, আপনার মেয়ে হলে নাম রাইখেন, হুমায়িরা! একটা সতর্কবার্তা দেই আগেই। এই নামডা সুন্দর কিন্তু জীবন না। ওকে আবার বলবেন না যে ওর বাপের খুনী ওর নাম দিয়েছে। নাম বদলে ফেলবে আবার। আমার ইজ্জত যাবে।”

জয় সকাল সাড়ে পাঁচটায় দিনাজপুর পৌঁছাল। বাড়িতে ঢুকে দরজায় দুম দুম করে দুটো লাত্থি মেরে চেঁচিয়ে ডাকল, “তরুউউ! তরুউউউউউ! তর...”থেমে গেল জয় আমির। কেউ হেঁটে আসছে। জয়ের বুকের ভেতর আঁটকে এলো। দম বন্ধ হয়ে একটা ভয়াবহ ব্যথা শক্ত হয়ে উঠল সেখানে। যে পা হেঁটে

আসছে, তা কি তরুর হতে পারে? তরু আসছে জয়ের জন্য দরজা খুলতে? জয় এই ভোর সকালে ভেতরে ঢুকে দেখবে নির্ঘুম লাল চোখ নিয়ে তরু দুই প্লেট খাবার বেড়ে নিয়ে বসেছিল রাতভর। এখন জয়কে বিরবির করে দু-চার কথা শোনাবে।

দরজা খুলেই অন্তূ জিজ্ঞেস করে, "কোথায় ছিলেন সারারাত? কোথায় গিয়েছিলেন?"

জয়ের ঘোর ভাঙে। বুকের ব্যথাটা ছড়াচ্ছে এপাশ-ওপাশে। চোখ পরিষ্কার হচ্ছে। কণ্ঠস্বরটা তরুর মতো মিনমিনে, জড়ানো না। একটু তেজস্বী, স্পষ্ট! জয় একটা মাথা ঝারা মারে, মুহূর্তের মাঝে নিজে চিরচেনা রূপে

হেসে ওঠে, “হোয়াট’স আপ, ঘরওয়ালি? আপনি কি চিন্তিত? সব ঠিকঠাক?”

অন্তূ ঘরে হাঁটা ধরল। জয় হাইবুট জোড়া নিজের রুম পর্যন্ত আসতে আসতে খুলল। তারপর দুটো দু’দিকে ছুঁড়ে মারল। রুমে ঢোকার আগে পেছন ফিরে ডাইনিং টেবিলগুলো আবার একবার দেখে।

অন্তূ গিয়ে বারান্দায় দাঁড়ায়। শরীর ভালো লাগছে না। দূর্বলতায় হাত-পা পড়ে আসছে।

গোসলে ঢুকলে জয়ের খুব গান আসে। গলা ছেড়ে গান না গাইলে গোসল শুদ্ধ হয় না। সে গলা ছেড়ে গান ধরল,

ভালোবেসে এইবার আয় কাছে তুই

সব ভুলে একবার আয় তোকে ছুঁই...

গোসল শেষে বেরিয়ে দেখল অন্তূ খাবার এনে ঢেকে রেখেছে। জয় লুঙ্গি বাঁধতে বাঁধতে আবদার করে, "খাইয়ে দাও।"-"আমি?"

-"যাহ শালা! বিয়ে মোটে একটাই করছি। চাইলেও আরেক বউকে হুকুম করার ক্যাপাসিটি আপাতত নাই। তুমিই দাও!"

অন্তূ জয়কে খাওয়াতে খাওয়াতে বলল,

"লোক এসেছিল।"

-"এমপির লোক?"

অন্তূ লোকমা তুলে ধরল। তাদের দুজনের কথাবার্তা মুখে খুব বেশি বলার দরকার পড়েই না বলা চলে। অঙ্গভঙ্গি ও মুখভঙ্গিতেই

আধো আধো কথায়ই সব জানা-বোঝা হয়ে যায়।
জয় সপ্রতিভ হয়ে উঠল, "কী বলছে? কিছু বলছে? উপরে আসছিল?"
-"না। আমি নেমে গিয়েছিলাম?"
জয়ের মুখ লাল হয়ে উঠল, "কী বাবদে? নিচে নামছিস ক্যান?"
-"নইলে ওপরে উঠে আসতো। বাড়িতে আপনি বা মেয়র সাহেব কেউ নেই। চুপচাপ চলে যেতে আসেনি ওরা। পরে আমি এবং আপনার ছেলেরা কথা বলে বিদায় করেছি।"

জয় আনমনে নাক শিউরে মেঝের দিকে চোখ কুঁচকে চেয়ে রইল। অন্তূ জিজ্ঞেস করে, "কুষ্টিয়া গেছিলেন আপনি?"
জয় চট করে তাকায়, "অন্তূকে দেখে একটুক্ষণ। তারপর হেসে ফেলে, বাবার মুরিদ টুরিদ হইছো নাকি? দাওয়ায় বসে কাবার কুত্তা খেদাও!"অন্তূ হাসে, "সাধারণ জ্ঞান। আপনার মতো ধূর্ত লোকের ফোন দিয়ে, আপনারই ঘরের বারান্দায় কথা বললাম শুনলেন না আপনি?" অন্তূ কথা বের করার জন্য বলে, "দোলন সাহেবের সাথে কথাও তো শুনেছেন! সেটা বলছেন না কেন?"

জয় মাথা নাড়ল, “না তখন আসলেই ঘুমাইছি।”

সেদিন খেয়ে-দেয়ে জয় দুপুর অবধি ঘুমিয়ে ঘটনাক্রমে প্রথমত জয় একবার অন্তূকে নিয়ে বড়ঘরে গেছিল। এবং মুরসালীনের কাছে কিছু প্রশ্ন ও উত্তর পেয়েছিল! যা চমকপ্রদ, যা জয়ের চিন্তাধারায় বড় গভীরভাবে শেষ তৃতীয় আঘাতটা হেনেছিল।

তারপর পুরো বেলাটা সে মদ পান করল। সারারাত মরার মতো ঘুমালো। যেন সে পালাতে চাইছে, মুরসালীনের কথাগুলো থেকে, নিজের থেকে, অতীত থেকে। সেই কথাগুলোর দায় মেটাবার সাধ্যি তার নেই।

তা বদলাবার পথ নেই। অতীতকে শুধু স্মৃতিতে ধরা যায়। তা বদলানোর জন্য যে সময়-যন্ত্রের তত্ত্ব মানুষ দিয়েছে তা কেবল একটি কল্পতত্ত্ব!

পরদিন সকালে রিমি বের হলো রুম থেকে। রান্নাঘরে অন্তূকে জিজ্ঞেস করে, "কী হয়েছে আপনার?"-"আমার? কী হয়েছে?"

বলতে চান না যখন, "আমি আর জিজ্ঞেস করলাম না। আমার বাঁ চোখটা আজ কয়দিন খুব লাফাচ্ছে, লোকে বলে এটা অশুভ লক্ষণ। আপনি বিশ্বাস করেন?"

অন্তূ হাসল, “করতে ইচ্ছে করছে এখন আপাততো। তবে আমার মনেহয় বেশি কাঁদার কারণে এমন হচ্ছে।”

জয় দশটার দিকে ঘুম থেকে জাগলে অন্তূ বলল,

“আপনার আজ এমপির কাছে যাবার কথা।

-“তুমি এত ইন্টারেস্ট নিচ্ছ কেন?”

অন্তূ কেমন উদাসীন হয়ে পড়ল, “কারণ কামরুলের মার্ডার আমার হাতেই হয়েছে।” কথাটা বলে নিজের হাতের তালুদুটো দেখে অন্তূ তাকিয়ে। জয় বলল, “কে বলেছে? দোলন স্যার?”

-“আমাকে ধরিয়ে দিচ্ছেন না কেন?”

জয় হেসে উঠল। ঘাঁড় এপাশ-ওপাশ মুচড়ে বলল, “আমার হাতে এবার একটা এমপি খুন করাতে চাও?”

-“আপনি এর আগে কাকে খুন করেছেন? ”জয় গামছাটা গলায় ঝুলিয়ে গোসলে ঢুকে পড়ল।

অন্তূ বসে রইল ওভাবেই। সে শুধু এটুকু বুঝল জয়য় আমিরের কাছে তার কিছু ঋণ জমে যাচ্ছে। লোকটা নিজের ইচ্ছাকৃতাভাবে নিজেকে তার কাছে পাওনাদার করছে নাকি আসলেই সে অন্তূকে বাঁচাতে চায়, ভেবে পেল না!

জয় বের হলে অন্তূ বলল, "আপনাদের আমির নিবাস কি বিশাল বড়?"

জয় ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়, "তুমি যাবে?"

-"আপনি তো এখন এমপির কাছে যাবেন!

"জয় মুচকি হাসে, "জয় আমিরের মন বড়, সিস্টার! কোনোদিন একবার তা জিতে কিছু চেয়ে দেখতে..."

অন্তূ মনে মনে বলল, 'এটাই তো ভয়, জয় আমির! তার দিল জিতে কেউ তার রুহের ওপর অবধি কব্জা পেয়ে যায়, তারপর আপনাকে দিয়ে সব করানো যায়, সব! এত বড় কাঙাল আপনি! অথচ আমার কাছে এই শেষক্ষণে কিছুই নেই আপনাকে দেবার

মতোন শুধু যন্ত্রণা ছাড়া।'দোলন সাহেবের সঙ্গে অন্তূর প্রথম দেখা হয়েছিল তরুর মৃ'ত্যু'র দিন। তরুকে যখন শেষ গোসল করানোর শামিয়ানার নিচ দিয়ে গড়িয়ে আসা পানির সাথে রক্তের ধারা তিরতির করে গড়িয়ে আসছে।

অন্তূ ডাইনিং টেবিলের একটা চেয়ারের পায়ার কাছে স্তব্ধ বসা। কিন্তু দোলন সাহেবের মনে হলো অন্তূর স্থির, ব্যথিত চোখে শুধু ব্যথা নেই। আছে এক জলন্ত অগ্নিকূপ, যার গভীরতায় জমা আছে ধ্বংসের ছাই! এই ধ্বংসের ভাগ মেয়েটির নিজেরও আছে! তবু

তা কবুল, যখন শর্ত অপরপক্ষের ধ্বংসাত্বক পরিণতি!

তিনি গিয়ে অন্তূকে বললেন, “এক গ্লাস পানি খাওয়াও তো! নাহ্ ‘খাওয়াও’টা ঠিক হলো না, পান করাও! পানি খাওয়া যায় না।”অন্তূ উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলেছিল, “বসুন। আমি পানি আনছি।”

পানি নেই জগে। জয় সবটুকু পান করে বেরিয়ে গেছে। অন্তূ সসম্মানে পানি এনে দিলো। অন্তূর এই আদব-বিনয়টুকু তার চোখের আগুনের সাথে বেমানান। দোলন সাহেব অন্তূকে পরখ করে দেখতে দেখতে অল্প একটু পানি পান করলেন। বাঁকা হেসে

খোঁচা মেরে বললেন, “তুমি সেই জয়ের সাথে অকাজে ধরা পড়া মেয়েটা না?”

অন্তূ অসীম ধৈর্যের সাথে স্বাভাবিকভাবে বলেছিল, “জি, ই সেই মেয়ে।”

দোলন সাহেব খুবই অবাক হয়েছিলেন অন্তূর প্রতিক্রিয়ায়। অগোচরে সামান্য হেসেছিলেন সেদিন।

এরপর পলাশের মৃত্যুর দিন দুয়েক পর ভার্সিটিতে আনসারি মোল্লা সাহেব এলেন। অন্তূকে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন, “তুমি জয় আমিরের বউ?”অন্তূ হ্যাঁ-না কিচ্ছু বলেনি। আবার জিজ্ঞেস করলেন উনি, “জবাব দেও না কেন? ভুল ধরিনি তো?”

অন্তূ জিজ্ঞেস করে, “আপনাদের পরিচয়?” আনসারি মোল্লার সাথে আরও তিনজন পুরুষ। কপালে তাদের নামাজের কড়া পড়া দাগ। প্যান্ট টাখনু অবধি গুটানো। অথচ দাড়ি ছাটা, পরনের পোশাক শার্ট-প্যান্ট। অন্তূর বিচক্ষণ মস্তিষ্ক সঙ্গে সঙ্গে একটা হিসেব কষে ফেলেছিল। সে কত শুনেছে, অমুকের ছেলে দাড়ি কেটে ফেলেছে, তমুকের ছেলে মাদ্রাসা থেকে জান নিয়ে পালিয়েছে....টুপি-দাড়ি থাকলেই কারাগারে পুড়ে দিয়ে রাস্তাঘাটের লোক কমাচ্ছে সরকার।

সেই জোয়ান পুরুষদের মাঝে একজন বলল, "গাড়িতে ওঠেন চুপচাপ। এটা আপনার জন্য মঙ্গলজনক হবে।"

অন্তূকে সেদিনও সেই পুরোনো চটা ওঠা দেয়ালের বাড়িটাতে নেয়া হয়েছিল। বাড়িটা কার সে জানে না।

অন্তূ বুঝেছিল ওদের পরিকল্পনাটা। হামজা যেমন কিশোর ও মুরসালীনকে আটক রেখে এদেরকি শিকার করছে, ওরাও জয় আমিরের বউকে ধরে রেখে জয় আমিরের কাছে শর্ত রাখতে চেয়েছিল।

তা বুঝে অন্তূ বলল, "যদি আমার ধারণা সঠিক হয় তো আপনারা মুরসালীন মহানের

শুভাকাঙ্ক্ষী? আপনারা কি আমাকে জিম্মি করতে চান?''অন্তূকে বলা হলো, "জিম্মি করব না, যদি তোমার স্বামী আর ভাসুরকে বাচ্চারা আর মুরসালীন মহানের মুক্তির জন্য মানাতে পারো। একটা নির্দিষ্ট সময় দিতে পারি তোমাকে। আর যদি কাজ না হয়, তাইলে তোমার পরিবার শেষ।''

অন্তূ আলতো হেসে উঠেছিল, "ওরা যে আপনাদেরকে জঙ্গি বলে, এটা কি তাহলে ঠিক?''

কেমন একটু থতমত খেলো ওরা। নিজেদের জাতের ওপর দাগ উঠে আসার উপক্রমে ওরা

একটু লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হয়ে উঠল। অন্তূর চালটা চট করে খেটে গেল।

আনসারি মোল্লা হাসলেন, "ওদের মনে হয়, তোমার তা মনে হয় না?"

-"আমি পুরোটা না জেনে কাউকে বিচার করি না, না বুঝে কাউকে পাপী মানি না, না দেখে কোনো ধারণা রাখি না। তবে আমার আন্দাজশক্তি টুকটাক ভালো।"-"তাই নাকি?"

-"আমি এবং আপনাদের পথটা অনেকটা এক দিকে যায়।"

-"একদিকে যায়? তোমার পথ কোনদিকে যায়?"

-“জয় আমির বলে, ‘তার এবং হামজার পথ এক, গন্তব্য আলাদা।’ চাইলে আপনাদের সঙ্গে আমি একটা সেরকম চুক্তিতে আসতে পারি।”

আনসারী মোল্লা ভ্রু জড়িয়ে তাকালেন। খুব সতর্ক চোখে পরখ করলেন অন্তূকে। হাঁটুর বয়সী মেয়ে, নমনীয় অতি-সুশ্রী চেহারাখানা! অথচ কথার ধারে ছুরির ডগা ক্ষয়ে যাবার জো। ভাষা ও অর্থবোধক গভীরতায় ডুবে গেলে চলে।

সতর্ক কণ্ঠে বললেন, “কেমন চুক্তির কথা বলছো তুমি?”-“এই যে আপনারা বললেন আমার পরিবারের ক্ষতি করবেন আমি

মানাতে না পারলে, নিশ্চিত জেনে রাখুন আমি মানাতে পারব না। তা বলে আপনারা কি আমার পরিবারের ক্ষতি করবেন? এটা তো আপনাদের উদ্দেশ্য নয়! বরং আপনারা মুক্তি চান। যেটা আমিও চাই। আর সাথে আরও কিছু। তো সেই চেষ্টা ও উদ্দেশ্যেই কিছু করা যাক!”

বেশ কয়েকটি পুরুষ মুক্ত উৎসুক হয়ে চেয়ে রইল। অন্তূ বলল, “হামজা ও জয় আমিরের শেষটা আমি চাই। সেজন্য আপনারা চাইলে আমাকে সাহায্য করতে পারেন। আর আমি আপনাদেরকে। আজ এই যে কথা হলো,

এরপর আর কথা হবে না। পথ নেই।
''-“তাহলে কীভাবে যোগাযোগ করব?''
অন্তূ সব বুঝিয়ে দিলো, “ওদের ওয়ার্কশপে একটা লোহার আসবাব বানাতে দিন। যেমন ধরুন কোনো স্টিলের দরজা বা গ্রিল। স্বর্ণকার বা ওয়ার্কশপওয়ালারা পেশাগতভাবে ছ্যাঁচড়া হয়। রোজ তাগাদা করেও মাল পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে যখন কোনো বার্তা আমাকে দেবার থাকবে, সেদিন যাবেন তাগাদায়। একটু ঘ্যানঘ্যান করে আসবেন, খুব বেশি না। খুব বেশি করলে আবার দ্রুত বানিয়ে ফেলবে জিনিস। সেটা করলে চলবে না। হালকা একটু ঘ্যানঘ্যান করে কোনো এক ফাঁকে

বার্তা লেখা কাগজ মুড়িয়ে দোতলার পূর্ব দিকের বেলকনিতে ছুঁড়ে মারবেন। সাবধানে। তার ডানপাশেল একতলায় কিন্তু একপাল পার্টির ছেলের বাস আছে। থার একটু নিশানা ভালো, দেখতে সাধারণ, এমন কেউ যাবেন। দেখতে যেন মোল্লা মোল্লা না লাগে। আর একটু চতুর হলে ভালো হয়। এছাড়া রাত তো রয়েছে!''

সেখান থেকে সেদিন অন্তূ ভীষণ অস্থির হয়ে বাড়ি ফিরেছিল। উত্তেজনা, ভয় ও বুকের ব্যথা একাকার হয়ে শরীরের প্রতিটা লোম শিরশির করছিল। সে কী থেকে কী করবে, না ভেবে পাওয়ার অস্থির মুহুর্তগুলোতে

আনসারি মোল্লা যেন দূত হয়ে এসেছিলেন! অন্তূ এক বন্দিনী নারী, যার মস্তিষ্কে গিজগিজ করে পাটোয়ারী বাড়ির ধ্বংসের আঁকিবুকি, অথচ প্রয়োগক্ষেত্র ও সুযোগের অভাবে সেসব বোকামি ও ব্যর্থতা হিসেবে নিস্ফল হয়ে পড়ছিল। আনসারি মোল্লা সেই সুযোগটা পেশ করলেন অন্তূর সামনে।অন্তূ বুঝেছিল, তার ও মুরসালীনের মনোভাব খুব মেলে। তারা দুজনই নির্দিষ্ট কোনো দলের প্রতি আকৃষ্ট নয়, শুধু তারা সমাজে চলমান অশান্ত পরিস্থিতির বদল দেখতে চায়।

পথ তৈরি হবার পর অন্তূর হাতে একমাত্র বাকি কাজ–জয় আমিরকে পুরোটা খুঁড়ে দেখা,

দুনিয়ার প্রতি দাসত্ব নিয়ে আসা–যেটার নাম মায়া! অন্তূ জয় নামক কিতাবের সবটা না পড়ে কেবল শেষ পৃষ্ঠা পড়ে কোনো সিদ্ধান্তে এসে নিজেকে অবিবেচকের তালিকায় স্থান দিতে পারে না।

সেদিন অন্তূ গোসল করে ভীষণ কেঁদেছিল আল্লাহর কাছে, শুকরিয়া জ্ঞাপন ও আগামীর পথ সহজ করতে প্রার্থনা করেছিল।তার পরদিনই আবারও একটা মোক্ষম দিন এলো। মুরসালীন মহানের মুখে তার নামের মতোই রাজনীতির মহান বিশ্লেষণ শোনা, আর দোলন সাহেবের সাথে পুনরায় সাক্ষাৎ!

অন্তূ সেদিন দোলন সাহেবকে আবিষ্কার করে ফেলেছিল মুরসালীন ও তাঁর কথপোকথনের মাঝেই। বড় দ্বিধান্বিত এক চরিত্র! তার কথাবার্তার ভেতরে লুকানো মনোভাব, আরামপ্রিয় শীতল-শান্ত চিত্ত, একেকটা প্রশ্ন, জবাব, মুখের জটিল ভঙ্গিমা, কথার মর্ম, শব্দহীন অর্থপূর্ণ হাসি... সব মিলিয়ে অন্তূ দোলন সাহেবের চোখেমুখে যে মুরসালীন মহানের জন্য যে সুপ্ত প্রশয় দেখেছিল, তা অন্তূর পথকে আরেকটু সুগম করল।

কিছু মানুষ থাকে যারা ভীষণ ছন্নছাড়া গোছের হন, এদেরকে দেখে কখনও কখনও মনে হয়, এরা বোধহয় নিজেকেও ভালোমতো

বুঝতে পারে না। এরা সব বুঝে, জেনে, দেখেও বড় গা-ছাড়া! এদের ভেতরের সুপ্ত ইতিবাচক প্রশ্রয় খুঁজে বের করতে একটু টানাটানি করতে হয় বটে, তবে তা বের করতে পারলে এরা উপকারী, কিন্তু তা নিজের মুখে স্বীকার করতে নারাজ! দোলন সাহেব সেই গোছের মানুষ।সেদিন বড়ঘরে ভালো ভোজ হয়েছিল। বাড়িতেও ভালো রান্না। দুপুর গড়িয়ে যাওয়া সময়। অটল মুরসালীনের সঙ্গে কথা বলে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবার সময় অন্তূ সবিনয়ে দাওয়াত করল দোলন সাহেবকে।

দোলন সাহেব ঝারি মারলেন একটা, "তোমার হাতে খাবার খাওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই আমার। জয়কে বলেছিলাম বিয়ে করিস না। মেয়েলোক ভালো না। কী খাওয়ানোর জন্য এত তোষামুদ্ ডাকাডাকি?"

বলতে বলতে উপরে উঠে এসে টেবিলে বসে পড়লেন। অন্তূ হাসল। সেদিন নিজে হাতে বসিয়ে খাইয়েছিল অন্তূ দোলন সাহেবকে। একমনে খাচ্ছিলেন দোলন সাহেব। অন্তূ আরও পরখ করে দেখছিল উনাকে।

দোলন সাহেব খেতে খেতেই বলে উঠলেন, "তোমার মতো জোচ্চর মেয়েরের চোখ ভয়ঙ্কর। বড় বড় সভ্যতা গিলে হজম করে

ফেলতে পারে। আমি ভোলাভালা মানুষ। ওই চোখ দিয়ে আমাকে দেখো না।''-"সেই সভ্যতা যদি পাপের হয়, এখানে আপনার রায় কেমন, স্যার?''

-"আমি উকিল, জজ না। রায় দেয়া আমার কাজ না।''

-"প্রতিটা মানুষের ভেতরে নিজের জন্য একেকটি জজ থাকে। যার নাম বিবেক। আমি সেই জজের কাছে রায় চেয়েছি, স্যার!''

-"আচ্ছা, আমি কি ব্যাটাছেলে মুরসালীনের উজবুক কথার দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে আবার তার মহিলা রূপের কাছে এসে ফাঁসলাম? আরাম করে খেতে দাও, নয়ত বলে দাও

আমি খাচ্ছি এটা তোমার সহ্য হচ্ছে না, হাত ধুয়ে উঠে পড়ি।’’

অন্তূ হেসে ফেলল, “আমারও স্বপ্ন আপনার মতোন আইনজীবী হবার।’’

-“কথা এত জটিলভাবে বলবে না। তোমার বাক্য অপূর্ণ, তাতে বহুমুখী অর্থ প্রকাশ পায়। পরিষ্কার করে বলো, ছিল নাকি আছে?’’অন্তূ প্রসঙ্গ বদলাতে আরেকটু ভাত জোর করে তুলে দিলো দোলন সাহেবের প্লেটে। সরল গলায় বলল, “স্যার আমি তো আপনার ছাত্রী-বয়সী হবো। স্যার, আপনার আইনে কি ওই নিষ্পাপ বাচ্চারা কোনোভাবে দোষী? এবং

সেই দোষের শাস্তি ওই অবরুদ্ধ কুঠুরি হতে পারে?''

-"কী বলতে চাচ্ছ কী তুমি?''

অন্তূ বিনয়ের সাথে বলল, "স্যার, আমি প্রশ্ন করেছি মানে জবাব চাইছি। কিছু বলছি না। জবাব দিলে খুব খুশি হতাম।''

দোলন সাহেব মাংসের হাড় চিবোতে চিবোতে অনেকক্ষণ ধরে অন্তূকে এ পর্যায়ে দেখেছিলেন সেদিন। তারপর বলেছিলেন, "তোমার উদ্দেশ্য আমি জানি না। কিন্তু মেয়ে তুমি জানো খুব কম। তুমি যে বিষয়াদি নিয়ে ভাবছো, তার সূত্রপাত শতাব্দী প্রাচীন। আজ-কালের দু একটা ঘটনা দিয়ে ইতিহাসকে

প্রভাবিত করার চেষ্টা কোরো না। তুমি কিছুই জানো না, চারপাশ বোঝো না।"

-"আমি জানি, স্যার। আমার সীমা আমি জানি। এবং আমি আপনাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি, আমার নারীমন শুধুই ওই ছোট বাচ্চাগুলোর জানের মুক্তি চায়। আমি আর কিছুই জানি না, নাদান এক অবলা মেয়ে, স্যার। আর না এর বেশি জানতে চাই। কিন্তু ওই বাচ্চাগুলোর তো কোনো ইতিহাস নেই, ওরা তো শুধু নিষ্পাপ নির্যাতিত প্রাণ। এইটুকু জানা তো আমার সঠিক স্যার? আমি আর কিছু জানতে বা বুঝতে চাই না। জেনে করবোই বা কী?"

এত অসহায়ত্ব বোধহয় অন্তূর কণ্ঠে কোনোদিনও ফুটে ওঠেনি। সেদিন সে এই চালে নিজের নারীকণ্ঠে যতটা অবলি, নিরীহপনা তুলে ধরেছিল। তা বোধহয় কাজও করেছিল দোলন সাহেবের গা-ছাড়া মেধাবী নরম মনের ওপর।

-"তুমি এসব আমাকে বলছো কেন? তোমার হাতে এত মজার খানা খেয়ে কি ঋণী হলাম? এখন তার বদলা চাইবে।"-"অনুরোধ, স্যার। এভাবে আমাকে ছোট করবেন না। আপনি আমার গুরুজন। আপনাকে খাওয়ানো আমার জন্য খুশির বিষয়। এতে কোনো উদ্দেশ্যপ্রবণতা নেই। আমি শুধু জানতে

চাইছি, আপনার কি খারাপ লাগে না ওই বাচ্চাগুলোর জন্য? ওরা তো এই দলীয় দাঙ্গার অংশ নয়! পাপ না করা অবধি তো সৃষ্টিকর্তাও পাপ লেখেন না। ওরা কেন কষ্ট পাচ্ছে?''

জয় গোসল সেরে হাউমাউ করে এসে খেতে বসার আগ অবধি এই কথাটুকুই হয়েছিল। অন্তূর জন্য এ ছিল এক শেষ প্রচেষ্টা। হয় দোলন সাহেব মেনে নিয়ে চেপে যাবেন, নয়ত সব বলে দিয়ে অন্তূর রাস্তা চিরকালের মতো ওখানেই বন্ধ করে দেবেন। কিন্তু বড় বড় কাজে এমন দুঃসাহসিক পদক্ষেপ হুটহাটই নিয়ে ফেলতে হয়। অন্তূ তা-ই করেছিল।

আশ্চর্যজনকভাবে দোলন সাহেব তার ক'দিন পর মাঝরাতে ওইদিন বড়ঘরে আবার আসা অবধিও এসব কথা কাউকে বলেননি। অন্তূ নিজের দৃষ্টি ও আন্দাজশক্তির ওপর আরেকটু আশ্বস্ত হয়েছিল এতে। সে যে দোলন সাহেবের চোখে মুরসালীনের জন্যও প্রশ্রয় ও সহমর্মিতা দেখেছে, তাও বোধহয় দ্বিমুখী-চাপা আইনজীবী বদিউজ্জামান দোলন বুঝতে পারেননি।আগেরদিন দুপুরে জয় বড়ঘরে যাবার সময় অন্তূ পিছু নিলো।

জয় কপাল জড়ায়, "আমার পেছনে কী? এপাড়ের মানুষদের ওপাড়ে কাজ নেই।"

অন্তূ আবদার করে ওঠে, “আমাকেও ওপাড়ের মানুষই ধরে নিন। এতগুলো দিন ওপাড়ের মানুষের সাথে ঘর করে আর বিভেদ থাকতে আছে? এতিমগুলোকে দেখে আসি এই সাথে। ”

জয় একপেশে হাসে, “কখনও আমাকে দেখার জন্য তো এমন ব্যাকুল হওনি! এতিম তো আমিও!”

জয়ের হাসিতে তাল মিলিয়ে অন্তূও এক গভীর হাসি হাসে, সরল গলায় বলে, “আপনাকে আমি এতিম হিসেবে পাইনি, জয় আমির। আসামী হিসেবে পেয়েছিলাম। আসামী এতিম হলে সে দায় কেন আমার?”

জয় হেসে মাথা দুলায়, “ঠিক!”-“কেন যাবেন এখন ওখানে?”

-“কথা শেষ হয় নাই জঙ্গি মুরসালীনের সাথে। ওর আরও কিছু বলার আছে।”

রসিকতা ছেড়ে স্বল্প-সহজ জবাব দেয়া জয়কে অন্তূর নতুন লাগে। সে জয়কে গভীর চোখে দেখে কয়েক দণ্ড। জয় এখনও হাসে, কিন্তু সেই হাসি শুধু জয়ের ধারাবাহিতা বজায় রাখতে যেন! প্রাণখুলে হাসতে জয় বাঁধা পায় কোথাও। কিছু একটা তাড়া করছে আজ তিনটে দিন। এই হাসিতে চিরচেনা জয় নেই। অন্তূ গিয়েই আব্দুল আহাদের কাছে হাঁটু গেঁড়ে বসে ওর মাথাটা কোলে তুলে নেয়। জ্বরে

শরীর পুড়ে যাচ্ছে। চেতনা নেই বললেই চলে।

জয়কে দেখে মুরসালীন উঠে বসার চেষ্টা করল। কেশে উঠল কয়েকবার। কাশির চাপে নাক দিয়ে রক্ত উঠে এলো। তার সেই সুদর্শন পৌরুষ রূপ আর নেই, বিদ্রোহের ছাপও অসুস্থ, ক্ষত-বিক্ষত মুখের মলিনতায় ঢাকা পড়ে গেছে।

তবু মুরসালীন হাসল, “কী খবর রে?”জয় একটা মেশিনের সাথে এক হাঁটু খাড়া করে হেলান দিয়ে বসে। চুপচাপ কিছুক্ষণ দেখে মুরসালীনকে।

-“তোর বাপের অর্ডারে সেদিন আমির বাড়িতে হামলা হয় নাই, তাই তো? এ-ই তো বলতে চাস?”

-“এছাড়া কিছু বলতে চাইলে বানাতে হবে। সত্যি বলতে এটাই।”

জয় ঠোঁট উল্টে মাথা নাড়ে, “মোল্লারা কত নিষ্পাপ হয়!”

-“মোল্লা কী? মানুষ জন্মালে কোনো না ধর্মের হয়েই জন্মায়। পরবর্তি জীবনে সেই ধর্ম পালন তার কর্তব্য! এতে কোনো দ্বিমত নেই। আর তা করলে যদি কেউ মোল্লা হয়, তো খারাপ কী? তুই বারবার ভুলে যাস আমি সৈয়দ বংশের হলে তুইও আমির বংশের

বংশধর। তোর কি মনেহয় তোর পূর্বপুরুষেরা তোর আর তোর চাচার মতোন বেদুইন, নাস্তিক ছিল?''

-“নাহ্! নাহ্ তো!''-“শুনেছি তোর দাদুভাই একজন মহৎ ধর্মপ্রাণ মাতব্বর ও সাহসী মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। মোল্লা মোল্লা করছিস কেন? ধর্ম মানুষকে সরল পথ দেখায়। এজন্য মানবজীবনে ধর্ম বারবার উঠে এলেও তা কখনও মানুষে-মানুষে বিভেদ করে না। আমি মোল্লা, তুই কী? মোল্লাটাই বা কী? আর কে বলেছে তোকে আমি মোল্লা? পারিবারিকভাবে আমাকে ধর্মশিক্ষা দেয়া হয়েছিল, কিন্তু আমি তা পালনই করতে পারিনি ঠিকমতো, তবু

কিছু আছে, অন্তত তোর মতো বিপথে বোধহয় যাইনি। আমি কোনো দল বা সংগঠনের নই, জয়। আমি মুক্তিকামী। তাতে শতভাগ ধর্ম নেই।"

জয় তাচ্ছিল্য করে বলে, "তো বলতেছিস, তোর পরিবার স্বাধীনতা বিরোধী ছিল না?"
-"এ কথা আগেও হয়ে গেছে। বারবার একই প্রশ্ন করতে আসবি না।"-"আর আসব না। আজ বল।"

মুরসালীন জয়ের দিকে তাকিয়ে কেমন অদ্ভূত হাসি হাসে। তারপর বলে, "আমার ধারণা, তারা স্বাধীনতা বিরোধী ছিল না, তারা মূলত এই তথাকথিত স্বাধীনতাবিরোধী ছিল। এক

দেশের পরাধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে আরেক দেশের গোলামি খাটা এই স্বাধীনতার বিরোধী ছিল। যে স্বাধীনতা অন্য দেশের শাসকদের থেকে মুক্ত করে নিজের দেশের শোষকদের হাতে দেশ সমর্পন করে, সেই স্বাধীনতার বিরোধী ছিল। এবং তোরা যেটাকে স্বাধীনতা বলিস, ওরা আসলেই সেই স্বাধীনতার বিরোধী ছিল। এটা অন্যায় হলে তারা অপরাধী, রাজাকার। এ কথা আমি রোজ স্বীকার করি।
''

জয় জিজ্ঞেস করে, "সেদিন যদি তোর বাপ আমির বাড়িতে আক্রমণ না করে, তাহলে কারা করেছিল?"-"না বললে মেরে ফেলবি?"

-“কথা পেচাস না, মুরসালীন।”
-“যে প্রশ্নটা তোর কমপক্ষে বিশ বছর আগে আমার আব্বাকে করা উচিত ছিল, তা এতকিছুর পর আজ এই শেষ বেলায় সব ধ্বংসের মহাক্ষণে দাঁড়িয়ে আমাকে করছিস, তার জবাব দেবার ইচ্ছে আমি কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না, জয়। কী করি বলতো?”
জয় অনেকক্ষণ মুরসালীনের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে রইল। পরে নজর ঝুঁকিয়ে বলল, “এতদিন ভিতরে প্রশ্নটা আসে নাই। কারণ উত্তরটা আমি নিশ্চিত জানতাম। আজ সেই নিশ্চিত জানা উত্তরে একটু অনিশ্চয়তা আসছে, তা দূর করতে আসছি। ভণিতা

করিস না। বল। আর কোনোদিন জিজ্ঞেস করব না।''মুরসালীন আস্তে আস্তে উঠে বসার চেষ্টা করে, হাত-পা যেন ব্যথায় মুরসালীনের সঙ্গ ছাড়তে চাইছে। কোনোরকম হেলান দিয়ে বসে কাশতে কাশতে বলে, "তোর সেই নিশ্চিত জানা অবাস্তব উত্তরের ওপর এই সামান্য অনিশ্চয়তাটুকু আনতে আমার পরিবারসহ আরও অনেকের বহুত কঠিন মূল্য চুকাতে হয়েছে। তোর ভুলভাল বিশ্বাসেরও কত দাম, জয়! তা টলাতে কত রক্ত, কত চোখের পানি, কত হাহাকার ঢালতে হয়েছে! সেই সাথে তোর ধ্বংস তো আছেই! বড় লোকদের ব্যাপারই আলাদা, বল!?''

জয় হাতের তালু দিয়ে মুখ থেকে মাথার চুল অবধি সাপটে নিয়ে ঘাঁড়ে ঠেকায়। ক্লান্ত গলায় জিজ্ঞেস করে, "কেন মারা হলো আমির পরিবারকে?"

মুরসালীন একটু তীব্র গলায় জানায়, "তোর বাপ জনাব জাভেদ আমির সাহেব বামপন্থী রাজনীতিকে সমর্থন করতেন।"জয় যেন কথা বলতে ভুলে যায়। বেশ কিছুক্ষণ পর আস্তে কোরে শুধু উচ্চারণ করে সে, "কমিউনিস্ট!?"

মুরসালীন মাথা নেড়ে সায় দেয়, "কমিউনিস্ট! যুদ্ধের পর তোর বাপ-চাচা দুই ভাই দুই পথে পা বাড়িয়েছে। তোর চাচা গেছিল ত্রাসে, আর কলেজ জীবন থেকেই তোর বাপ কমিউনিস্ট

পার্টির সাথে জড়িত হয়ে পড়েছিল। যখন তোর বাপ মরেছে, একজন সক্রিয় ‘কমরেড’ হিসেবে মরেছে। এরপর আশা করি বাকিটা তোকে আর ‘অ আ’ এর মতো ধরে ধরে বোঝাতে হবে না!’’জয়ের মাথাটা একটুখানি চক্কর মেরে উঠেছিল বোধহয় সেসময়! চোখদুটো বুজল সে। আমির নিবাসে ঘটে যাওয়া সেই মৃত্যু-অনুষ্ঠানের পর থেকে বিশটা বছর ধরে সে যা পুষেছে ভেতরে, তার প্রেক্ষিতে যা যা তার সঙ্গে হয়েছের সে যা যা করেছে, জীবনের এ পর্যায়ে যেই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে —সবটা একবার বৃত্তের মতো ঘুরে এক বিন্দুতে স্থির হলো; জয় আমিরের

এই জীবনটা ভুল ও বৃথা। মুরসালীন বহুবার বলেছে।কখনও কখনও কিছু কাঠামো যে প্রেক্ষাপট, ভিত্তি ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, তা পরবর্তিতে পর্যায়ক্রমে বাস্তব প্রয়োগে অকার্যকর ও হিতে বিপরীত হয়। সুবিধার জন্য গড়ে উঠে ক্রমে তা অসুবিধার জনক হয়ে ওঠে। সেই কাঠামোর ওপর দ্বিধা জটিলতার প্রলেপ লেগে যায়।

কমিউনিজম কাঠামোটি তেমন কিছুই হয়ত! তা গড়ে উঠেছিল শোষিত মানুষদের কাতরতা রোধে। একই সমাজে কেউ গরীব কেউ ধনী। গরীবেরা ধনীর গোলাম, নেই তাদের ন্যায্য প্রাপ্তি, পরিশ্রমের মূল্য; খাটছে কেবল খাটছে।

ডিম দেয় হাস, খায় দারোগা বারো মাস– ধরণের ব্যাপার।

কিন্তু কেউ জমিদার, কেউ তার জমির হালচাষী–এই সমাজকে বদলাতে একবার সাম্যবাদী সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হলো। এটা সেই সমাজের কল্পতত্ত্ব –যেখানে কেউ রাজা নয়। আর কেউ রাজা না হলে বাকিরা প্রজা হয় না। সুতরাং সেখানে সবাই রাজা, তারাই প্রজা!

পরিশ্রম যে-ই করুক, তার ফল কেউ বেশি বা কম পাবে না। কেননা তার মালিকানা পরিশ্রমকারীর নয়, সমাজের। কোরবানীর মাংস ভাগের মতো। সবার নিজস্ব কোরবানীর

পশুর একাংশ সমাজের হাতে যাবে। সমাজ সেখান থেকে জনপ্রতি সবার জন্য সমান ভাগে ভাগ করে সবার চাহিদা মেটাবে। কিন্তু কোরবানী একটি উৎসর্গ। পরিশ্রম করে ফলানো ফসল তা নয়।সবাই সমান পাবে। এটা হলো সমবণ্টনতত্ত্ব। তবে এটা ন্যায্য প্রাপ্তি কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে বটে! যে পরিশ্রম করছে সে পাচ্ছে, এটা তার অর্জন। কিন্তু কেউ পরিশ্রম না করেও সেই সমান পাচ্ছে, এটাও বোধহয় সেই অসমবণ্টনের পর্যায়েই পড়ে। যদিও সাম্যবাদের ভিত্তি অনেকটা এরকমই।

তবু কখনও কখনও কোনো অঞ্চলের সামাজিক পরিস্থিতি যখন ধানমন্ডি অভিজাত এলাকা ও তারই পাশে গড়ে ওঠা মোহাম্মদপুর বস্তির মতো হয়ে ওঠে, তখন সমাজে সমাজতন্ত্রের বড় প্রয়োজন পড়ে যায়। ধানমন্ডিতে বাংলাদেশের শীর্ষ নেতাগোষ্ঠী, শিল্পজীবী ব্যবসায়ীদের বাস। যেখানে টাকা পকেটে থাকা ওয়ালেট টিস্যুর মতোন। নাকে সর্দি এলে একটা নোট বের করে নাক মুছে ডাস্টবিনে ফেলা ব্যাপার। তারই পাশে মোহাম্মদপুর বস্তির অভুক্ত পেটের চোঁ চোঁ আওয়াজের রোল, মাটিতে গড়াগড়ি খাওয়া নোংরা হাড্ডিসার শরীরগুলো, গ্রামের ক্ষেতে

দিন দুই লিটার ঘাম ঝরিয়ে ফসল ফলানো কৃষক পায় না ন্যায্য মূল্য, কিন্তু ধানমন্ডিওয়ালাদের সিন্ডিকেটে বাজার গরম, খেটে খাওয়া আরেক শ্রেণীর মানুষের জন্য আধা কিলো আলু এক টুকরো রৌপ্য! ধানমন্ডিওয়ালাদের কারখানায় পুড়ে কয়লা হওয়া শ্রমিকের পরিবার পায় না শ্রমিকের জানের মূল্য অথবা শ্রমিজীবীরা বেঁচে থাকতেও পায়নি ন্যায্য পারিশ্রমিক...এ সময় সাম্যবাদের জয়গান গাইতে ইচ্ছে করে চট করেই। যেভাবে গেয়ে উঠতেন কাজী নজরুল ইসলাম,

দেখিনু সেদিন রেলে,

কুলি বলে এক বাবুসাব তারে নিচে ফেলে দিলে ঠেলে!
চোখ ফেটে এলো জল,
এমনি করিয়া কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দূর্বল?
যেকোনো অঞ্চলের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরবর্তি অবস্থা যুদ্ধরত অবস্থার চেয়ে বেশি ভয়াবহ হয়। বাংলাদেশ গঠনে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তি পরিস্থিতিও এই নীতি এড়াতে পারেনি।
যুদ্ধবিদ্ধস্ত এই দেশটির পুনঃসংস্করণ প্রায় অসম্ভবের মতোন হয়ে উঠেছিল। রাষ্ট্রীয় সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি, তার ওপর ভারতে

থাকা শরণার্থীরা ফিরলে আরও সংকট বাড়ল।
আওয়ামী সরকারের দূর্বল নেতৃত্ব, অধিপত্য বিস্তারের নেশা, অদক্ষতা আর খুবই ভালো পর্যায়ের দূর্নীতি আকাশ ফুঁড়ে ওঠার জোগাড় হয়েছিল। চারদিকে হাহাকার ও দূর্নীতি সমানুপাতিক হলো। হাসাকার যত বাড়ছে, আরেক শ্রেণীর মানুষের দূর্নীতিও সমান বা অধিক হারে।এসব দেখতে দেখতে জাভেদ আমির কেমন ক্লান্ত হয়ে উঠলেন। সেসময় ঘটনাক্রমে কমিউনিস্ট পার্টি বঙ্গবন্ধুর বাকশালে যোগদান করলেও একসময় তারা বাকশাল ছেড়ে দিলো। হতে পারে তারা টের

পেয়েছিল যে বঙ্গবন্ধু তার অদক্ষ, অনৈতিক শ্রেণীগত অধিপত্য বিরাজমান রাখতে বাকশাল গঠন করেছে। যা গরীবকে কবরে নিচ্ছিলও সুযোগসন্ধানী দুর্নীতিবাজদেরকে আকাশে তুলছিল।
এই শ্রেণী-শোষন কমিউনিজম মানে না। স্বভাবতই তারা আবারও নিজেদের বামপন্থী চেতনায় ফিরে গেল। বিরোধ তৈরি হলো তৎকালীন সরকারব্যবস্থা ও গণতন্ত্রের সাথে। জাভেদ আমির কলেজ ছাত্র থাকাকালীন দেশে দুর্ভিক্ষ এলো। সাল ১৯৭৪ এর মার্চ। সরকার বলেছিল, এই দুর্ভিক্ষের কারণ তখনকারল এলাকাগত বন্যা ও জনসংখ্যা

বৃদ্ধি। কিন্তু বিশ্লেষকেরা এটা মানতে নারাজ। অবশ্য এর পেছনে তাদের একটা যুক্তি আছে–

তারা দেখেছে, সে বছর দেশে এলাকাভিত্তিক যথেষ্ট ফসল ফলেছিল। কিন্তু তা মজুতকরণে যে ব্যবস্থাগ্রহণ দরকার, তা করা হয়নি। বরং তখন সরকার নিজেকে গদির সাথে শক্ত করে আটতে ব্যস্ত। যেমন ভারতের সাথে ভালো সম্পর্ক স্থাপন করতে দেশের সম্পদের ভাগ-বাটোয়ারা, চোরাচালান, বাজার দুর্নীতির কারবার জেনেও পদক্ষেপ না নিয়ে প্রশ্রয় দিয়ে দল ভারী করা।আবার যা মজুত ছিল, তাও দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ হাতে পাচ্ছিল না।

এর একটা কারণ আছে। বাজার তখন বড় শ্রেণীর হাতে। খাটে গরীব, তার অধিপতি উপরমহল শ্রেণী। আম জনতার হাত খালি। বড় শ্রেণীর মানুষ হতে গেলে দুর্নীতির বিকল্প নেই বললেই চলে। সুতরাং যাদের হাতে বাজারপণ্য, তারা একটু দুর্নীতি করবেই। এক্ষেত্রেও করল। গরীবের ক্ষুধার্ত পেট ও এক মঠো চাল-ভাতের আশায় হাতে ধরে রাখা খালি টিনের থালাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তারা শস্য ও পণ্য কালো বাজারে বেচাকেনা করল।

এসব সময় কমিউনিজমকে বড় মনে পড়ে। কেননা কমিউনিজম এই সমাজ ও রাষ্ট্রের এই

রোগের ওষুধ হিসেবেই তো গঠিত হয়েছে! জাভেদ আমির আর পরিণতি ভাববার সময় পেল কোথায়? এই দুর্ভিক্ষ, মানুষের হাহাকার, নতুন তথাকথিত স্বাধীন দেশের নাটকীয় মঞ্চ তাকে বামে ঠেলে দিলো। এই বামে সে সমাজতন্ত্র দেখেছিল। যে দিকের নীতি অন্তত শ্রেণীকে এক করে। বড় শ্রেণী, ছোট শ্রেণীর নীতির কবরের নাম সাম্যবাদ। যেখানে গরীবের পেটেও সেই খাবার এবং ততটুকু খাবার পড়ার কথা যা বড়লোকের পেটে পড়ে।

জাভেদ আমির যুদ্ধ শেষে একটু নিস্তেজ হয়ে পড়লেও সেটা ক'দিন পর পরিবর্তিত

দৃষ্টিকোণ হিসেবে আবার ফিরল। গণতন্ত্রের সরকার ব্যবস্থাকে ঘেন্না করার রোগে ধরল তাকে। সমাজতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য অপকারিতাকে একপাশে সে বহুবছর ছুটেছে সাম্যবাদের পেছনে।পরিশ্রমী শ্রমিকদের ঘাম ও গরীবের পেটের ক্ষুধার মূল্য চাইতে চাইতে সংসারজীবনে আসতে তার বয়স হয়েছিল একত্রিশ! জয়নাল আমিরের সাথে তার সম্পর্ক এক জটিল রূপ নিয়েছিল। দুজনই দুজনের কর্মকাণ্ডকে বাঁধা দেবার চেষ্টা করেনি। দুটোই সঠিক তাদের কাছে। জয়নাল মানুষ মারে, তাদেরকে মারে যাদের ওপর জাভেদের ক্ষোভ রয়েছে। কারণ তারা শোষক

শ্রেণী, যার বিরুদ্ধে জাভেদের আক্রোশযাত্রা। কিন্তু দুই ভাই-ই চাইতো অপরকে নিজের নীতিতে আনতে। দুজনের উদ্দেশ্য এক, রাস্তা আলাদা।

জাভেদ চেয়েছিলেন জয়নাল কমিউনিস্ট করুক, জয়নালেরর ধারণা ছিল ওসব আন্দোলন-ফান্দোলনে কিছু হবে না। যে বেলাইনে হাঁটবে প্রথমত তার দু পা, পরে মাথাটা কেটে নিলেই ঝামেলা খতম।

এই দ্বন্দ্বে দুজন কোনোদিন কাছাকাছি আসতে পারেনি। অথচ উদ্দেশ্য এক বলে তাদের শত্রু একই!

বহুবার হুমকি পাবার পরেও জাভেদ রাস্তা ছাড়লেন না। গণতন্ত্রের প্রতি তার ঘেন্না ফুরোবার নয়। গরীব তখনও না খেয়ে ফুটপাতের এককোণে নোংরা চাদরের নিচে জড়োসরো হয়ে রাত কাটায়। কৃষক-শ্রমিক তখনও শ্রমের মূল্য পেয়ে ওঠেনি। জাভেদ কেন রাস্তা ছাড়বেন?জয়কে তুলে নেবার আশঙ্কা কতবার দেখা দিয়েছে! কিন্তু জয়নাল আমিরের জন্য সম্ভব হচ্ছিল না। তবে গনতন্ত্রের পূজারীরা এভাবে বেশিদিন চলতে দেবে কেন? যখন স্বৈরাচার হুসাইন মহম্মদ এরশাদের রাজ কায়েম হলো, তখন বাংলাদেশের গনতন্ত্রের দুই প্রধান দল

আওয়ামী ও জাতীয়তাবাদী দল অল্পদিনের জন্য হলেও একজোট হয়েছিল। এছাড়া দু-দলই যখন গনতান্ত্রিক, তখন গনতন্ত্রের বিরোধীরা যেকোনো সময়েই তাদের দুজনেরই শত্রু! কেননা কমিউনিজম সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র মানে।

১৯৯৪ এর এক রাতে কয়েকদিন পর জাভেদ আমিরের রাজধানী থেকে ঢাকা ফেরাই দুই দলের সম্মিলিত হামলার মোক্ষম দিন হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির যে আওয়ামী বিদ্বেষের রোগ, তা ছড়িয়ে পড়িয়েছিল। তারা ক্রমান্বয়ে একেক কর্মসূচি দেখিয়েছে

আওয়ামীর বিরুদ্ধে! তাহলে আর ছাড়াছাড়ি কেন?
দুই দলের মিলিত বিদ্বেষ ও হামলায় আমির পরিবার নিঃশেষ হলো এক অবরুদ্ধ নিশীথে। জানা নেই সমাজতন্ত্রের অসুবিধা ও সুবিধার অনুপাত কত! কিন্তু জাভেদ আমির একটি এমন সমাজের জন্য লড়াই করেছেন, যা হয়ত সকল কমরেডই স্বপ্ন দেখেন, কিন্তু বাস্তবায়ন অসম্ভব প্রায়! অপকারিতাগুলো প্রকট হয়, উপকারিতা তলিয়ে যায়। তবু জাভেদ আমির এক জীবন সাম্যবাদের পেছনে দিলেন। যেই তত্ত্বে শ্রেণী-গোত্র, শ্রমিক-মালিক

নির্বিশেষে সবাই সমান।মুস্তাকিন একটু হাসে, "কক্ষনোও ভাবিসনি এমন করে, না?"

জয় কিছুক্ষণ আনমনে হাত দিয়ে ঠ্যাংয়ের ওপর ঢোল বাজালো, তারপর ঠোঁট কামড়ে হেসে বলল, "অত ভাবাভাবি ভালো না রে পাগলা। ভাবলে ক্যালরি অপচয় হয়। অপচয়কারী শয়তানের ভাই। কিন্তু আমি একজন ভালো লোক।"

-"ঠিকই তো! খুব সহজে আপাত দূর্বল যাকে- তাকে শত্রু বানিয়ে নিয়ে তাদের ধ্বংসের পেছনে লেগে যাওয়াটা অনেক সহজ এত ভাবাভাবির চেয়ে। তুই আসলেই একজন সচেতন নাগরিক।"

জয় দু পাশে দুই হাত প্রসারিত করে প্রশংসা নেবার ভঙ্গিতে মাথা নোয়ায়।

এরপর চুপ সব। অন্তূ কপালে আঙুল চেপে বসে ছিল। তার আবারও মনে হলো, এই জীবনে জানা ও অভিজ্ঞতার শেষ নেই। রূপকথা আজগর একদিন অমূল্য একখানা কথা তাকে বলেছিল। দিন যত যাচ্ছে, অন্তূর মনে হচ্ছে সে এক অমীমাংসিত প্যারাডক্সে কয়েদ হয়ে যাচ্ছে। যেখানে শুরু বা শেষ নেই। এখানে শেষ থেকে শুরু হয় এবং সেই শুরু থেকে আবার শেষের দিকে ধাবিত এক প্রবাহে ভেসে যেতে হয়! কেন এখানে কোনো সিদ্ধান্তে স্থির থাকা যায় না, ভাঙন ধরে যায়।

কেন যা-ই করতে মনস্থির করা যায়, তা-ই কোনো এক পর্যায়ে অসমাচিন মনে হয়! অন্তূ ভাবতে লেগে যায়।মুরসালীন জীবনের এ পর্যায়ে বোধহয় বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। নিজের শরীরের ব্যথার চেয়ে বড়ঘরে লাশের মতো পড়ে থাকা ছোট ছোট দেহের কাতর আর্তনাদ তার বিদ্রোহ ও জেদকে পরিশ্রান্ত করে তুলেছিল। তারা যখন ডেকে ওঠে 'মুরসালীন ভাই!' বলে, মুরসালীনের লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করে। ওদের জন্য মুরসালীন কী করতে পেরেছে? ওদের নিস্তেজ অসুস্থ, ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত শরীরগুলো মৃত্যুর প্রহর গুনছে। আর সেই প্রহর খুব কাছে।

মুরসালীন আন্দাজ করল, হামজা এখনও ফেরেনি। ফেরার পর ঘটনাচক্র পাল্টি খাবে, সবকিছুতে একটা ধাক্কা লাগবে, সেই ধাক্কার প্রস্তুতিই চলছে যেন চারদিকে! হামজা বুঝবে মুরসালীনকে দিয়ে তার স্বার্থ হাসিল হবে না। সব বিগড়ে গেছে, সাথে মুরসালীন অটল। এবং মুরসালীনের দিনের শেষ সেখানেই!সেই প্রেক্ষিতেই মুরসালীন এইদিন প্রথমবারের মতোন জয়কে কাতর কণ্ঠে বলেছিল, শোন জয়, তোরা যে ভয় পাস এরা বড় হয়ে জঙ্গি-সন্ত্রাস, তোদের বিরোধী হয়ে উঠবে, মাদ্রাসাগুলো এসব তৈরির কারিগর.....তোদের কথাই রইল। ওদেরকে ওদের বাড়ি পৌঁছে

দে। ওরা আর মাদ্রাসায় যাবে না। আমাকে একটা কাগজ আর কলম দে, আনসারী চাচার কাছে চিঠি লিখে দিই, মাদ্রাসার স্থগিত কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হোক।''

জয় উঠে দাঁড়ায়। অন্তূ ছটফট করে উঠল, সে কিছু বলতে চায় এই মুহুর্তে। যা বলাটা অনিবার্য দরকার। তার আগেই মুরসালীনকে এমন সিদ্ধান্ত নিতে দেয়া যাবে না।

কিন্তু জয় বেরিয়ে আসার জন্য পা বাড়ালে মুরসালীন ডেকে বলে, "দুই টুকরো কাগজ আর কলম দে আমাকে। শেষমেষ একটু আঁকিবুকি করি!''অন্তূ জয়কে সেদিন মদ খেতে দিলো চুপচাপ। সে খুব ভাবলো।

জয়কে দেখল–ওই জটিল চেহারায় অনুশোচনা আছে কিনা! ঠিক বোঝা যায় না! কিছু ঝাল পকোড়া, কাঁচা আদা মচমচ করে চিবিয়ে খাচ্ছে।

আরাম করে বসে মনোযোগ সহকারে ড্রিংক তৈরি করছে যেন সে সেই মদের তরলে ডুবতে চায়, কিছু খুঁজতে চায়। এক বোতল রাম খুলে কয়েক ঢোক ঢকঢক করে গিলল। আবার কী মনে করে একটা ড্রিংক বানাতে বসল।

এক শট রাম-লিক্যুইড, বিট লবন, চিনি, সোডা ওয়াটার, লেবুর রস, আইস কিউব...

তার চোখেমুখে চিন্তার ভাব নেই। অন্তূ হিসেব কষে–জয় বারবার বলে তার জীবনে অভিজ্ঞতা বেশি। অন্তূ টের পায়, আসলেই অতিরিক্ত বেশি। সেক্ষেত্রে জয় আজ আর চমকায় না, থমকায় না, চিন্তা-ভাবনা ও পথ বদলায় না, এবং যেন সে জানে কী হবে, কী হচ্ছে, কী হতে পারে...সব জেনে সে সেদিকে বড় আরাম করে এক কদম দু'কদম করে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রেম-পূর্ণতা সেটা জয়ের ক্ষেত্রে। জয় তার প্রেমকে আলিঙ্গন করতে এগোচ্ছে!পরদিন দুপুরে কামরুলকে মারার দায়ে এমপির কাছে অন্তূকে ধরিয়ে দেবার

প্রসঙ্গ উঠলে জয় বলেছিল, “আমার হাতে এবার একটা এমপি খুন করাতে চাও?” অন্তূ জিজ্ঞেস করেও জবাব পায়নি, এর আগে অন্তূকে কারও হাতে তুলে দেবার প্রশ্নে জয় আমির কার প্রাণ নিয়েছে। জয় গোসল শেষে বের হলেও অন্তূ একবার জিজ্ঞেস করেছিল, জয় গ্রাহ্যই করেনি। অন্তূ বসল বিছানার ওপর।

সেদিকে একবার, দু'বার তাকায় জয়, নজর সরিয়ে শার্টের বোতাম লাগাতে লাগতে আয়নায় নিজেকে দেখে স্মিত হেসে মাথা নাড়ে, “ডোন্ট লিসেন টু ইওর হার্ট, মাই বয়! কজ ইট'স অন ইওর লেফ্ট সাইড! অ্যান্ড দ্য

লেফ্ট সাইড ইজ দ্য ডিরেকশন অফ ডেস্ট্রয়িং এনিথিং, এভরিথিং.... দেন ইউ হ্যাভ টু ফাকড-আপ অ্যান্ড গেট টার্ন-অভার অন ইওর ওয়ে!''সেদিন জয় চারদিকের এত্ত বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন কর্মসূচি ফেলে সে অন্তূকে নিয়ে রওনা হলো ঘোড়াহাঁটের দিকে। এমপির সাথে দেখা করা ফরজ ছিল। কারাগারে যাবার ছিল। শরীর ও মনের ভেতরটায় কেয়ামতের তান্ডব অগ্রাহ্য করে অন্তূর হাতটা ধরে বাসে চেপে বসল বাঁশের হাঁট থেকে ঘোড়ারহাঁটের উদ্দেশ্যে।

বাসের ভেতরে এক মহিলা, বয়স পয়তাল্লিশের ওপাড়ে। কিন্তু সাজসজ্জায়

কিশোরী হবার প্রয়াস। এটা খারাপ না, কিন্তু জয়ের গা চুলকানি আছে এসবে।

তার ওপর মহিলাটি বিশাল এক পর্বতের অত বড় ব্যাগ দেখিয়ে জয়কে বলল, "ভাইয়া, এটা একটু উপরে তুলে দেবেন, প্লিজ?"

জয় দু'পাশে মাথা নাড়ে, "না, খালা। প্রশ্নই ওঠে না!"

মহিলা চিকন সুরে চিটমিট করে উঠল, "মানে? খালা মানে কী?"

-"খালা মানে হলো সম্বন্ধির চেংরি।"

-"হোয়াট ননসেন্স! আমি খালা? খালা মনে হয় আমাকে?.."

জয় একটু নিচু স্বরে চিবিয়ে বলে, “না। তোর মতোন দামড়া মহিলাকে খালা মনে হবে, এত ভালো না আমার রুচি।”মহিলা কথা ভুলে গেল, “সম্বন্ধির কী? খালা... ? বেয়াদব লোক? অসভ্য, জানোয়ার। এক্ষুনি শিক্ষা দিচ্ছি। কত বড় সাহস! এসব জঙ্গল থেকে উঠে আসে, রাবিশ। কন্টাক্টর?”

কন্টাক্টর ফুল একশন মুডে এসে দাঁড়াল। জয় শুধু সেদিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হি হি করে হাসল একবার। কন্টাক্টর পড়িমরি করে সালাম ঠুকে আবার চলে যায়।

জয় মহিলাকে সবিনয়ে বলল, “যাইহোক আমি দিনদিন ভালো হয়ে যাচ্ছি তাই

আপনাকে প্রাণপ্রিয় বাংলা ভাষায় বলতে পারলাম না যে 'এই শালি, খাসি শালি নাম বাস থেকে। নয়ত আধ মনে ওজনবিশিষ্ট কোমড়ের ওপর দুম করে এক লাত্থি মারব, জানালা ভেঙে বাসের বাইরে গিয়ে পড়বি।' যান নিজের সিটে যাইয়ে বসেন। ব্যাগটার ওপর এখন আমি পা রাখব।''

জয় ব্যাগটা বাসে মেঝেতে পায়ের কাছে এগিয়ে নিয়ে পাদানি বানিয়ে আরাম করে বসে। অন্তূ লজ্জায় কুঁকড়ে উঠল। এত অসভ্য, জঙলি একটা লোকের সাথে সে যাচ্ছে, ইচ্ছে করল বাস থেকে নেমে যেতে। মুখে দু'হাত চেপে বসে রইল।

মহিলা কাচুমাচু হয়ে নিজের সিটে বসে। অন্তূ বলে, এত জাহিল কেন আপনি? নারীকে ইজ্জত দিতে কোথায় ব্যথা পান?জয় খুব বিজ্ঞের মতো বোঝালো অন্তূকে, “ব্যথা না, ঘরওয়ালি! এটা একটা চিন্তা–কেউ একজন বলেছিল, ‘যদি সবাইকে ইজ্জত দেইর তো বেইজ্জত করব কার?’ বিষয়টা কিন্তু আসলে ভাবার মতো। ঠিক না?”

অন্তূ কপালে একটা চামড় মারে। জয় সাবধান করল, “নিজে চাপড়ে কপাল ফাটিয়ে আমার দোষ দেবে। সরল পাইছো তো, লুটে খাচ্ছ। নট ফেয়ার।”

ঘোড়াহাঁটের গ্রাম্য ঐতিহ্যের রূপ বদলেছে। আমির নিবাস এ অঞ্চলে ভৌতিক বাড়ির লোককাহিনিতে পরিণত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকারদের হামলা হওয়া বাড়ি ওটা। এছাড়া এ বাড়িতে জলিল আমিরের মাথা কাটা অতৃপ্ত আত্মা ঘুরে বেড়ায়, জাভেদ আমিরকে দেখেছে লোকে! সরকার দ্বারা বাজেয়াপ্ত হওয়া বাড়িটা ২০১০ এ জয় হাইকোর্টে রিট করে, কত কী করে তা ফেরত এনেছিল। কিন্তু কখনোই তাকে এ বাড়িতে আসতে দেখা যায় না তেমন।ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ কী যেন দেখল জয়। লোহার ফটকে মরিচা ধরে খসে

পড়ছে। বাড়িটা হান্টিং-হাউজের খেতাব না পেলে এটুকু অক্ষত থাকতো না নিশ্চিত। ভৌতিক অতীতের গল্প প্রচলিত থাকায় লোকে আশপাশে আসে না। কিন্তু চোরের কাছে ভূত কাবু। রাত পেরোলেই বাগানের দামী দামী গাছ উধাও হওয়া ঠেকাতে জাভেদ আমির ও জলিল আমিরের মাথাকাটা ভূতও পারেনি। অন্তূ অবাক হয়ে দেখে আমির নিবাসের সীমানার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা চিলেকোঠা বিশিষ্ট দোতলা বাড়িটিকে। চারধারে বিশাল প্রাচীর লতানো উদ্ভিদ ও শেওলায় ঢাকা পড়েছে। প্রাচীর ঘেরা সীমানার পরিমাণ বিঘাখানেকের কম হবে না।

অন্তূর মনে হলো–পরিত্যক্ত প্রাসাদ বটে! বিশাল এক বহরে বুক উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বিস্তৃত এক পতিত ভূমির মাঝখানে। উত্তর দিকে প্রাচীর ঘেঁষে শান বাঁধানো মৃত পুকুর। পাকা পাতা, শেওলা ও নোংরায় জল আরকাতরার মতো দেখা যায়।

বাড়িটা জলিল আমিরের অভিজাত রুচিবোধের পরিচয় বহন করছে এখনও। আমির নিবাস জানান দেয়–ঐতিহ্যের মাঝেও আধুনিকতাকে ঠেসে ঠেসে ভরে রাখা যায়।

ফটকে চাপ দিতেই মরিচা ধরা ধাতব আওয়াজ উঠল। জয় আলগোছে অন্তূর হাতখানা চেপে ধরে বলে, "ঘরওয়ালি!

আপনার পছন্দ হয়েছে শ্বশুরবাড়ি?''অন্তূ পুরোনো দ্বিতল বাড়িটির দিকে দৃষ্টি রেখেই জিজ্ঞেস করে, "আপনাদের পারিবারিক পেশা কী ছিল?''

জয় হাসে, অন্তূর কানের কাছে মুখ এগিয়ে নিয়ে ফিসফিস করে বলে, "আমার পারিবারিক ব্যবসা যেহেতু, ইললিগ্যাল কিছুই হবে! এই যেমন ধরো, মুরগীর দুধ, পাঠার ডিম, মাছের লেগপিসের স্মাগলিং, এরকম টাইপের অনৈতিক ব্যবসা ছিল।''

অন্তূ কটমট করে তাকিয়েও হেসে ফেলল অনিয়ন্ত্রিতভাবে। জয় তা দেখে নাক কুচকায়, বাড়ির আশপাশে নজর ঘুরিয়ে দেখতে

দেখতে বলে, “মসলা, কয়লা, পেট্রোলিয়াম টাইপ কাঁচামালের ব্যবসা ছিল।”

অন্তূ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এক মুহুর্তের জন্য তার মস্তিষ্কে একটা অযাচিত বাচ্চা বাচ্চা খেয়াল এলো–ঘটনাক্রমে সে ঐতিহ্যবাহী বিশাল এক ব্যবসায়ী, বনেদি বাড়ির বউ হয়ে গেছে। মানব মস্তিষ্ক এমনই জটিল। হুটহাট পরিস্থিতি ভুলে সুখের চিন্তায় মত্ত হতে তার পরিস্থিতির কাছে অনুমতির দরকার পড়ে না।

বাড়ির সীমানায় পা ফেলার পর জয়ের শরীরটা আচমকা ঝাঁকুনি খেয়ে উঠল সামান্য। অন্তূ তা টের পায়। আড়চোখে একবার দেখে। কেউ তাকে ডেকে বলে–জয় আমির জীবন্ত

পাথর। সে পাথর তবে জীবন যেহেতু আছে তাই আজও সে শিউরে ওঠে ভূতকালের ঘটনাগত আতঙ্কে।অন্তূকে নিয়ে ভেতরে এগিয়ে যায় জয়। দু-চারজন ওদেরকে পেছন থেকে ঘুরে দেখে যায়। কৌতূহল ও সমীহে ভরপুর তাদের চেহারা। এই আমিরদের নুন খেয়ে তাদের দিন চলেছে, আজ আমিরেরা ঘোড়াহাঁটের অতিথি! জয়কে সবাই একনজর দেখতে দাঁড়িয়ে থাকে টাকফাটা রোদে। জয় পেছন ফেরে না। সোজা গিয়ে প্রবেশ দরজায় দাড়ায়।

শালকাঠের দরজার হুড়কোখানা ভারী লোহার। তার সাথে কত পুরোনো এক জং

ধরা তালা ঝুলছে। মাকড়সার জাল ও নোংরায় হাঁচি উঠে এলো। অন্তূ দরজাটা দেখে। তার উচ্চতার তিনগুণ কমপক্ষে। কালো হয়ে উঠেছে রঙটা।

চাবি ঢুকতে চাইছিল না। অন্তূ খেয়াল করে শুধু তালার ঝং দায়ী নয় এর জন্য, বরং জয়ের হাত ঘেমেছে, হাতের মৃদু কাঁপুনি বোধহয় চোখে ধরা পড়ল।

চাবি ভেতরে ঘুরলেও তালা আঁটকে রইল। অন্তূকে নিজের পেছনে সরিয়ে হাই বুট দিয়ে দুম দুম করে দটো লাত্থি মারল তালার ওপর। ছিটকে খুলে এলো তালা।জয় দরজা ঠেলে না। দরজা ঠেললেই চোখের সামনে

বিছিয়ে যাবে সদরঘর। সেখানে আছে জলিল আমিরের আরাম কেদারাখানা। শেষবার জয় যখন এই সদরঘর দেখেছে, সেই আরাম কেদারার পায়ার কাছে দাদুভাইয়ের মাথাকাটা লাশটা পড়ে ছিল। জয়নাল আমির হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে গেছিলেন তাকে কোলে নিয়ে। জয়ের ভয় হয় ওই সদর দরজা খুলতেই এক্ষুনি সে দেখতে পাবে দাদুর মাথাকাটা দেহটা পড়ে আছে মেঝের ওপর, এক দলা রক্ত জমাট বেঁধে আছে মেঝের ওপর। জয় বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ওঠে। সে নিজেকে জানিয়েছে, সে সব ভুলে গেছে। তার কিচ্ছু

মনে নেই। সে তার মা, বাবা, দাদু কারও চেহারা মনে করতে পারে না।

জয়ের চেতনা ফেরে দরজার ক্যাচক্যাচ আওয়াজে। অন্তূ দরজা খুলে জয়কে বলে, “অসুস্থ লাগছে?”

জয় হাসে, “নাহ্। একদম ফিট আছি।”সে বলতে পারে না, সে তার নিজ ঠিকানায় আজ একুশটা বছর পর পা রেখেছে। সেই রাতের পর আর কখনও জয় আমির নিবাসে পা রাখেনি। ষোলো বছর পর ২০১০ এ সরকারের কাছ থেকে নৈতিক-অনৈতিকতাকে এক করে সে বাজেয়াপ্ত এই সম্পত্তি উদ্ধার করেছিল। তার এই নিজ ঠিকানায় একবার

ভাঙাচোরা দেহটা নিয়ে উপস্থিত হবার জন্য সে ব্যাকুল হয়েছে, কিন্তু আসার জন্য মানাতে পারেনি নিজেকে। অন্তূকে সঙ্গে নিয়ে নিজ ঠিকানায় পা রাখবার লোভে সে বারবার অন্তূকে নিয়ে আসতে চেয়েছে এখানে। অন্তূটা একমাত্র তার নিজের। আর কেউ ছিল না কখনও তার হাতের কাছে, যাকে নিজের বলা যায়, যাকে নিয়ে নিজেদের পরিচয়ের কাছে ফেরা যায়।

এই সম্পত্তি উদ্ধারের পর সে জিন্নাহকে খুঁজতে আরও বেশি পাগল হয়েছিল। জিন্নাহকে সাথে নিয়ে দুই ভাই আমির নিবাসে ফিরবে। সে জিন্নাহকে পায়নি। তারপর এক

অন্তূ তার স্ত্রী। যার সমান হক আছে আমির নিবাসের ওপর, যাকে সাথে নিয়ে সে আমির নিবাসে বসবাস করতে পারে বাকি এই জনমটা।

অন্তূর হাত ধরে সদরঘরে পা রাখে জয়। কোথাও একটু পরিবর্তন নেই। শুধু আসবাবগুলো দুই যুগের ব্যবধানে পুরোনো হয়েছে। ধুলোর স্তর পুরু হয়েছে সেসবের গায়ে। মাকড়সারা নিজেদের রাজত্ব গড়ে তুলেছে ঘরের আনাচে-কানাচে।জয় স্তব্ধ পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে। চোখদুটো আলতো কোরে বুজে নেয়। শিকারী এই বাড়িতে তার শৈশব, কৈশোরের হক ছিল। সে বঞ্চিত হয়েছে। এই

অভিজাত্যে, এই বনেদি আবাসস্থলে তার ঠাঁই মেলেনি। অথচ এর সবটাই তার অধিকার ছিল।

অন্তূ চারদিকটা চোখে গিলে নিতে চায়। বিশাল হলরুমটা ধুলোয় স্নান করেও এক টুকরো আভিজাত্য হারায়নি। জানালা খুলে দিলো অন্তূ। পশ্চিমে ঢলতে থাকা সূর্যের চকচকে আলো আছড়ে পড়ল ঘরটার ভেতরে, বহুবছরের অবরুদ্ধ নিশীথের আঁধার কেটে আলো পড়ল সেখানে। ঘরটা কি চমকে উঠল এতে?

ধুলোয় ভারী হয়ে ওঠা মখমলের পর্দা ঝুলছে জানালায়। অন্তূ এই দিনক্ষণে এক অদ্ভুত ও

অচেনা অনুভূতি প্রবণতার শিকার হয়েছিল। যা নারীসুলভ, আবেগপ্রবণ। যা এড়ানোর সাধ্যি নারীর থাকে না। অন্তূর ভেতরে কেউ খোঁচায়–এটা তার শ্বশুরবাড়ি! এই আসবাব, ঘরসংসার, গোটানো বাড়িখানায় তার নারীত্বের অংশীদারিত্ব রয়েছে। সে এ বাড়ির বউ!অন্তূ বিস্ময়ে থমকে ওঠে। ভেতরের যে অংশ তাকে এসব কথা বলছে, তা কি জানে আজ অন্তূ কেন এসেছে এখানে? অন্তূ কী বলতে চায় তার স্বামী নামক আসামীকে! তাহলে এই দ্বিধা কীসের? অন্তূর ভেতরটা চিড়ে যাচ্ছে কি! বিভক্ত হয়ে উঠছে তার চিত্ত। দোটানা বড় যন্ত্রণাদায়ক। সেই দোটানা

অন্তূকে হতবিহ্বল করে তুলল। ভেতরে কোথাও একটা নারীসুলভ দাবীর সাথে তার সিদ্ধান্তের তুমুল লড়াই শুরু হয়েছে।

অন্তূ অবাক হয় এই ভেবে–আজও কোথাও একটা তার ভেতরে নারীত্ব আছে। সেই নারীত্ব, যা তার ভেতরে মৃত ঘোষিত হয়েছে সেই কবে!

অন্তূ ছটফটিয়ে ওঠে। ফিরে আসে হলঘরের মাঝখানটায়। জয় সেই আরামকেদারায় বসা। মৃদু দুলছে জলিল আমিরের চেয়ারখানা। এই চেয়ারে জলিল আমির বসে ছিলেন সেই রাতেও! দাদু যাতে বসতে না পারে বা বসলেও হেনস্থা হয় এজন্য জয় মুঠো ভরে

ধুলোমাটি এনে চেয়ারে মেখে রাখতো।একটা সিগার জ্বালায় জয়। চোখ দুটো বুজে সিগারে টান দেয়। এক পাঁজা ধোঁয়া বিশাল হলরুমের নিস্তব্ধ ছাদে গিয়ে মেশে। অন্তূর কাছে আমির বাড়ির বিশালাকায় এই হলরুম স্বপ্নের রাজদরবারের মতো লাগছে! পুরোনো এসব আসবাব কমপক্ষে অর্ধশত বছর পুরোনো। সেরকম এক শালকাঠের দোল-কেদারায় সাহেবদের মতো পোশাক ও হাইবুট পরা জয় আমিরকে দু'হাত দুই-হাতলে মেলে বসে দোল খেতে দেখে অদ্ভুত লাগে! জয় কোথাও ডুবে যাচ্ছে। তার দেহটা দুলছে, সে এই

সময়-ধারায় নেই। এক দুলুনিতে কেদারার শব্দটুকু বদ্ধ হলরুমে অদ্ভুত শোনায়। অন্তূর মনে হয় জয়কে সে আজ প্রথম তার নিজস্ব জায়গায়, নিজস্ব রূপে দেখছে। জয়ের দুষ্টু-বখাটে, জটিল রসিক চেহারায় যে অভিজাত্য ফুটে ওঠে, তা হামজার বদৌলতে নষ্ট হতে হতে নিঃশেষ প্রায়। অথচ তার জন্ম এরকমই এক বনেদি আবাসে!অন্তূ উদাস চিত্তে পা দুটো গুটিয়ে দোল-কেদারার পায়ার কাছে নোংরা মেঝেতে বসে। তখন বিকেলের নরম পরিবেশে নিস্তব্ধ, শিকারী আমির নিবাসের হলরুম রহস্যে মাখোমাখো হয়ে উঠছিল যেন। জয়ের আঙুলের মাঝে চেপে

ধরা সিগারের ধোঁয়ায় বমি ঠেলে আসে অন্তূর। আজ দুটো দিন শরীর তুলনামূলক ভালো।

-"আপনার বাড়ন্ত বয়সটা ভালো কাটেনি।"

অন্তূর গলার আওয়াজে জয় আচমকা একটু নড়ে ওঠে, চোখ মেলে তাকায়। শরীরটা সামান্য ঝাঁকুনি দিয়ে সিগার ঠোঁটে গুজে চিরচেনা ভঙ্গিতে হেসে মাথা নাড়ে, "তা আমার খারাপ হওয়াকে তরান্বিতও করেনি। আমি খারাপ, তাই আমি খারাপ, কারণ আমি খারাপ।"

-“নাটক করবেন না। খুব অপছন্দের আমার। ”জয় হাসল, “নাটক কে না করে, ঘরওয়ালি? ”

-“আমিও করি। প্রয়োজনের তাগিদে। কিন্তু আপনি এটাকে নিজের পুঁজি বানিয়ে নিয়েছেন।”

-“আমার খারাপ হবার পেছনে আমার পেছনের ঘটনার প্রভাব নেই। মেনে নাও।”

-“আছে–এটা বরং আপনি মুখে স্বীকার করে নিন।”

জয় ঝুঁকে বসে, ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে হেসে বলে, “তো তাহলে কি সব মাফ?”

-“কিন্তু তা পুরোটা নয়, তা আংশিক।”

জয় হাসল, “আংশিক?”
-“হ্যাঁ। আংশিক। কারণ অতীত মানুষকে দ্রোহীতার আশ্রয়ে আনে কিন্তু তাকে জানোয়ার বানায় না। আপনি জানোয়ার। কিন্তু আবার পুরোপুরি তাও নন। অতীত আপনাকে না মানুষ থাকতে দিয়েছে, আর না কিছু ক্ষেত্রে পুরোপুরি জানোয়ার হতে দিয়েছে। মানুষ-অমানুষের ঝুলন্ত সেতুতে আপনার অবস্থান।”
-“বাপরে! মাইরি কী পর্যবেক্ষণ। বিষয়টা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো তো।”
-“ব্যাখা ছাড়ুন। উদাহরণ–আপনি সরাসরি ধ'র্ষ'ণকে ভয় পান। কারণ...অতীতের একটি

ঘটনা! কিন্তু আপনি অন্য যেকোনোভাবে যেকোনো নারীর সম্মানহানিকে উপভোগ করেন। এক্ষেত্রে আপনার আসল প্রকৃতি কাজ করে, যা জানান দেয় আপনি নোংরা। কিন্তু অতীতের একটি ঘটনা আপনাকে সরাসরি নিকৃষ্ট কাজটিতে লিপ্ত হতে দেয় না। এভাবেই কখনও অতীত আপনাকে সর্বোচ্চ খারাপ বানিয়েছে, যা আপনি ছিলেন না। আবার কখনও আপেক্ষিক ভালো বানিয়েছে যা আপনি নন।''-"শালার! কয় কী রে! তুমি কি আমাকে নিয়ে গবেষণা করার জন্য কি কোনো গবেষণা কেন্দ্র-টেন্দ্র খুলেছ নাকি?''

-"প্রয়োজন পড়ে না।''

-“বাহ! তো তোমার ধারণা তুমি আমাকে খুব বোঝো?”

-“যেটুকু বাকি ছিল, তাও পূর্ণ হয়ে গেছে। এখন হিসেবে তা-ই।”

জয় সিগারে টোকা মেরে ছাই ফেলে বলে, “এইটা অন্তত ব্যাখ্যা করো তো, শুনি। প্রথমবার কারও মুখে আমার ব্যাখ্যা শুনতেছি। ই-ন্টা-রেশটিং, ইন্টারেস্টিং। বলো বল শুনি।”

-“তার আগে আপনি আজ হেয়ালি থেকে বেরিয়ে আসুন। নিজে মুখে স্বীকার করুন আপনার অতীত আপনার বর্তমানকে একটু হলেও সার্কুলেট করেছে।”

জয় ঝুঁকে এলো অন্তূর মুখের ওপর, “কখনও করিনি। এজন্য জেদ করছো?”

অন্তূ মুখ পিছিয়ে নেয়, “আজ করবেন।”জয় ভ্রু নাচায়, “জোরপূর্বক করাবে নাকি?”

-“না। আপনিই করবেন।”

-“বিশ্বাস?”

-“যা-ই ভাবুন।”

-“তাতে ফায়দা?”

অন্তূ হাসল, “আপনি একদিন বলেছিলেন, সবকিছুর ফায়দা এবং ফজিলত খুঁজতে নেই। তাহলে নিজেকে হারিয়ে ফেলার চান্স থাকে। এবং কথাটা সত্যি ছিল আমার ক্ষেত্রে।”

জয় নাটকীয় স্বরে বলল, “কবে যেন বলেছিলাম এই কথা, আরমিণ?”

-“যেদিন প্রথম আপনার সম্মুখীন হয়েছিলাম। সেই আধখাওয়া সিগারেটটা আলমারীতে এখনও তোলা আছে। সেটার ফজিলতও জানার ইচ্ছে ছিল একসময়।”

-“জানতে চাও নাই কেন?”-“ওই যে- সবকিছুর ফজিলত খুঁজতে নেই।”

জয় মাথা নত করে হাসল। খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলল,

“খারাপ-ভালো মুদ্রার দুই পিঠ। তার মানে বোঝো? দেহখন্ড কিন্তু একটাই, শুধু পৃষ্ঠ বিপরীত। মানুষ জন্মের সময় সেই মুদ্রার

মাঝের ব্যবধানটুকুর মাঝখানে নিরপেক্ষ অবস্থায় জন্মায়। তারপর মানুষ ধীরে ধীরে যেকোনো এক পিঠে বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু অপর পিঠ কিন্তু তখনও বিপরীত। তার মানে পিঠ বদলালে ভালোর খারাপ আর খারাপের ভালো হবার সুযোগ থাকে। আমার সেই সুযোগ ছিল না।''

অন্তূ আফসোসের হাসি হাসে, "এত বোঝেন, তবু ফিরলেন না!''

জয় ধোঁয়া ছেড়ে হাসে, "সহজ হতো না।''

-"আপনার এই জীবনটাও সহজ না।''

-"আপন লাগে।''-"পাপকে আপন লাগে?''

-“উমম। নিজের নিজের লাগে। ভালোটাকে অপরিচিত লাগে, মনে করো দুঃসম্পর্কের অচেনা কিছু একটা। পাপটা আমার, আমার কাছের, পাশের, সাথের। কেউ কেউ দুনিয়ার পাপের থলে ভারী করতেই জন্মায়, ম্যাডাম! আপনারা আছেন তো তার বিপরীত।”

-“অসুস্থ ধারণা।”

-“সুস্থটা কী?”

অন্তূ কিছুক্ষণ পলক না ঝাপটে চেয়ে থাকল জয়ের চোখ বরাবর। ঘন পাপড়ির মায়াবী-তীক্ষ্ণ চোখদুটো জয়কে একটু অবশ করল। কথা বলা চোখের এই এক দোষ। চোখের

ভাষা মারাত্মক ধ্বংসাত্বক হয়। জয় চট করে চোখ ফেরালো।

অন্তূ খুব আন্তরিক স্বরে বলল, "আজ আপনার সাথে আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলাপে বসেছি, জয় আমির। আপনার মনোযোগ পেতে পারি?"

-"পাচ্ছ না?"

-"আরেকটু।"

-"এত মনোযোগ দিয়ে কী হবে?"

-"ভয় পাচ্ছেন?"

-"পেতে হয় একটু।"

-"কেন?"জয় হেসে ফেলল অন্তূর চোখে তাকিয়ে, "কোথাও মনোযোগ দেয়া আমার

স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো না। বিশেষ করে তা যদি আপনার মতো বিপরীত মেরুর মানুষের আইনি তত্ত্ব হয়।”

অন্তূ জিজ্ঞেস করে, “আইনে খুব ভয় আপনার?”

-“নিয়ম-নীতি, আইন-শাসন...পোষায় না আমার।”

-“মনোযোগ কেন অস্বাস্থ্যকর আপনার জন্য?”

-“মনোযোগে কিছু গড়ে উঠার সম্ভাবনা প্রবল থাকে। তুমি ততদিন মজবুত যতদিন তুমি গড়ে ওঠোনি। কারণ ভেঙে পড়ার একমাত্র পূর্বশর্ত গড়ে ওঠা। যা কখনও গঠিত হয়নি

তার ভেঙে পড়ার সুযোগ নেই। আমি কখনও আমায় ঘিরে কিছু গড়ে উঠতে দেই না।''

অন্তূ হাসল, "বিশেষ করে পিছুটান আর সম্পর্ক-সমীকরণ!''

জয় মাথা দুলিয়ে হাসে, "আমার সাথে যায় না ওসব।''

-"আপনার জানা উচিত ছিল–অসম্পর্কও এক প্রকার সম্পর্ক–সবচেয়ে জটিল সম্পর্ক। তা-ই আপনি আমার সাথে গড়েছেন। এর দায় পরিশোধ করবেন না?''

জয় একটু মনোযোগী হয়, বোঝার চেষ্টা করে যেন কিছু অন্তূর চোখে চেয়ে, অন্তূ কী বলছে! সে শুধায়, "অসম্পর্ক?''-"আমার-আপনারটা।''

-“এর দায় কী?”

অন্তূ দম ফেলল গভীর করে। চূড়ান্ত একটা প্রস্তুতি নিলো চূড়ান্ত কিছু বয়ান করার। জয়ের মুখোমুখি বসল বেশ কাছে। ধীর-স্থির আওয়াজে বলতে শুরু করল,

-“জয় আমির! জীবন আপনাকে অনেক ব্যথা-যন্ত্রণার সমাহার দিয়েছে। আর সেটাকে পুঁজি করে আপনি পাপের মহাসমুদ্রে ডুব দিয়েছেন। আপনার দ্রোহীতা মাত্রা ছাড়িয়ে রক্তপিপাসায় পরিণত হয়েছে। যা আপনাকে ভুক্তভোগী থেকে বের করে এনে এক রাক্ষস ও হুমকিতে পরিণত করেছে।

এখন আপনি বলবেন, আমি তো ভিক্টিম প্রমাণিত হতে চাইনি। চেয়েছেন, জয় আমির। আপনি চেয়েছেন। কিন্তু ততদিন, যতদিন আপনি বিচার পাননি। আর তারপর একসময় আপনি নিজেই বিচারক হয়ে গেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো আপনার তাণ্ডব শুধু আপনার আসামীদের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকেনি। কারণ ঝড় নির্দিষ্ট একটি খুপরিকে উপড়ে ফেলে থামে না, ঝড়ের সেই সীমারেখা-নীতি নেই, সে গোটা অঞ্চলকে বিধ্বস্ত করে। মানুষকে আপনি ঘেন্না করেন। তাই মানুষ আপনার কাছে একটুও ছাড় পাবার যোগ্য নয়, যে ছাড় ও দরদ একটা পশুপাখিও পায়

আপনার কাছে। এতে বড়জোর আপনি মানুষের কাছে নেতিবাচক একটি প্রতিচ্ছবি তৈরি করতে পেরেছেন। এর বেশি কী পেয়েছেন? কী আছে আপনার, বলুন!''জয় চোখদুটো ডানে ফিরিয়ে কেমন করে যেন হাসল, দুনিয়ায় জন্মালে পেতে হবে, এমন কথা আছে? কে দিয়েছে এই কথা? নারী-পুরুষ মিললে তাদের অনুরূপ আরেকটা প্রাণী জন্মায়। এটা একটা জৈবিক ব্যাপার। এখন সেই প্রাণী কিছু পেল না পেল সেটার দায় কারও নয়। আমি পেতে তো আসিনি।

অন্তূ দীর্ঘশ্বাস টানে। জয়ের মানসিক চিন্তাধারা অস্বাভাবিক রকমের অ-ভরসা ও

মেকানিক পর্যায়ে চলে গেছে। সে তকদীর, ভালো, আইন, ভরসা, প্রাপ্তি, জীবন, প্রেম, স্নেহ কিছুই মানে না। অন্তূ জয়ের এই কথায় জলন্ত এক ঘা দেখে, যে ঘা শুকিয়ে ক্ষতস্থানটি অনুভূতির ঊর্ধ্বে চলে গেছে। আর না সেখানে ব্যথা লাগে, আর না আরাম পাবার প্রয়াস জাগে! জয় এই বিশ্বাসটুকু অবধি হারিয়েছে, জীবনে আদতেও পাবার মতোন কিছু আছে!

জয় বলল, "মানুষ? ঘরওয়ালি তুমিও সমাজের প্রাণীদের মানুষ বলো? আজও? যারা তোমার অসম্মানে একবারও তোমার কাছে তোমার সত্যতা যাচাই করতে চায় নাই, চোখ

বুজে তোমার অনিশ্চিত অপরাধ নিশ্চিত করে শাস্তি দিয়েছে। তাদেরকে তুমিও মানুষ বলো!
''

-"এক্স্যাক্টলি! দ্যাটস দ্য পয়েন্ট, জয়। সমাজের অধিকাংশই মানুষের মতো দেখতে অমানুষ। কিন্তু সেই অমানুষদের মাঝে আপনিও যদি একটা হোন, আপনার অমানুষিকতার তোপে আমিও যদি প্রতিশোধপরায়ন হয়ে আরেকটা অমানুষে পরিণত হয়, আমার তোপে আরেকটা কেউ অমানুষে পরিণত হয়—বাকি মানুষেরা অমানুষ হতে খুব বেশি দেরি লাগবে কি?''-"কী বোঝাতে চাচ্ছ?''
-"আপনি তা বুঝতে চান?''

জয় সিগারটা আঙুলের ভাজ থেকে ছুঁড়ে মারল কোথাও, “শুনতে চাই আপাতত।” অন্তূ চোখের মণি এতক্ষণ চিকচিক করছিল, এবার পানি জমে। দুজনের নজর এক বিন্দুতে মিলিত হয়। অন্তূ সজল চোখে নিজের দু’হাতের তালুতে চোখ রাখে। হাতদুটো থরথর করে কাঁপছে। অন্তূ তা দেখিয়ে জয়কে বলে,

“এই দেখুন, আপনি দেখছেন আমার হাতদুটো? আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমার রক্তাক্ত হাতের তালুদুটো? আজ আমার এই দুই হাত আগ্নেয়াস্ত্র চালানো দুটো হাত। আমার হাত চার-চারজন মানুষের রক্তে লাল।

আপনি বলুন তো এটা কি হবার ছিল? এটা কি আমার আব্বুর আদর্শ ছিল, জয় আমির?''

জয় কেমন ছটফট করে ওঠে যেন। চেপে ধরে অন্তূর কম্পমান হাতদুটো। সে অন্তূর কান্না দেখে অভ্যস্ত, দেখতেও চায় না। অথচ আজ সে চোখ ফেরাতে পারে না। সে দেখে অন্তূ কান্নায় সে কী নিদারুণ হাহাকার!

অন্তূর থুতনি কাঁপে, অন্তূ বলে, "ছোটবেলা থেকে আমার মুখের ভাষা ক্ষেত্রবেশেষ কর্কশ। কিন্তু হাতদুটো ছিল নরম। আজ তা মানুষের রক্তে রাঙা। আব্বু আমাকে প্রতিবাদ শিখিয়েছিল। কিন্তু কখনও আঘাত করতে শেখায়নি, জানেন! আমার প্রতিবাদ ছিল

হিংস্রতা, অমানুষিকতার বিরুদ্ধে, আজ আমি নিজেই হিংস্র, মুখোশধারী, অমানুষিক জয় আমির। আজ আমি মাহেজাবিণ আরমিণ অন্তূ সেই সকল রক্তপিপাসু অমানুষদেরই একজন, যাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার জের ধরে আজ আমি এই অবধি।আমি উকিল হতে চাই। কীসের উকিল? অন্যায়কারীকে আইনত শাস্তি দিয়ে নিরপরাধকে মুক্তি দেবার উকিল! তা-ই যদি হয়, তাহলে আমার জীবনের প্রথম কেইস আমাকে আমার বিরুদ্ধে লড়তে হবে। আমাকে আমার নিজের বিরুদ্ধে প্রসিকিউশনে দাঁড়াতে হবে আমার অপরাধের শাস্তি কার্যকর করতে। নিজেকে দুটো খুন ও দুটো মানুষকে

আহত করবার দায়ে ফাঁসিতে ঝুলানোর রায় চেয়ে বিচারকের কাছে আরজি জানাতে হবে। এটা ছিল আমার লক্ষ্য? এই লক্ষ্যে আমজাদ আলী প্রামাণিক আমাকে ছোট থেকে আদর্শ ও সত্যের পথে অবিচল করতে সচেষ্ট ছিলেন? ''অন্তূ গলা কাঁপে, থুতনিও। চোখ বেয়ে টুপটুপ করে পানি পড়ে। জয় চোখদুটো পাথরে খোদাইকৃত মূর্তির চোখের মতো স্থির রইল অন্তূর মুখে। তার কাছে জবাব নেই। অন্তূ কী বোঝাচ্ছে? অন্তূ কেন রাবেয়ার মতো কথাবার্তা বলছে? অন্তূ কেন জয়ের মতোন প্রতিশোধের পক্ষপাতিত্ব করছে না? জয় অস্থির হয়।

অন্তূ নাক টেনে সোজা হয়ে বসে। সে নিজের অজান্তেই বোধহয় এবার নখ দিয়ে আঁকড়ে ধরে জয়ের হাত। বলে,

“আজ আমি প্রতিশোধের নেশায় তা-ই হয়ে গেছি, যা-র বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ-যাত্রা আমার। আপনি প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে মনুষত্ব হারিয়ে পাপকে জায়েজ করে তুলেছিলেন। সেই মতো আমার সাথে যা করেছেন, তার শিকার হয়ে আমিও এক জয় আমিরে পরিণত হয়েছি। যার লক্ষ্য কেবল ধ্বংস, রক্ত, অন্ধকার! কিন্তু এটা তো আমার পথ নয়! এটা বুঝতে আমার কিছুটা সময় লেগেছে। আমাকে এই বাড়ির সেই রাতে আসতে হয়েছে। আপনার গল্পে

যেদিন আমি আমির বাড়িতে নিজেকে রেখেছি, তারপর টের পেয়েছি আপনার ভেতরটায় কোনো জানোয়ারেরা একটা জানোয়ারের চাষ করেছে। আপনি সেই জানোয়ার ঘটনাক্রমে আমার ভেতরে সেই একই জানোয়ারের চাষ করতে সফল হবার পথে।আপনি বলেন, আপনি জলতরঙ্গ। আপনার গতিপথ রুখার উপায় নেই। সেই চলে নিজেকেই ভেসে যেতে হয়। আমি ভেসে গেছি, ভেসে গেছে আমার আদর্শ, আমার গন্তব্যের পথ, আমার চিন্তা-ধারা ও নিজস্বতা। আপনি কখনোই মিথ্যা বলেন না জয় আমির। কেন? এক-দু'বার মিথ্যা বললেও পারেন!"

জয় আস্তে কোরে বলে, “আমার অভিজ্ঞতা বেশি...”

অন্তূ ভেজা চোখে হেসে দিলো, “আপনার সেই অভিজ্ঞতাকে টেক্কা দিতে গিয়ে আমি আজ আপনার পথে পরিচালিত। এই অধঃপতনের দায় আমার। আপনি পাপ করলেনই বা, তার শিকার হয়ে আমিও কেন? আপনি অমানুষ হলেন বা, আমি মানুষ হতে পারতাম...কয়লার সংস্পর্শে গিয়ে আমি নিজেকে কালি থেকে বাঁচাতে পারিনি। জলন্ত কয়লা আমাকে যেমন পুড়িয়েছে, আমার চরিত্রকে ঠিক সমানভাবে কলঙ্কিত করেছে। আপনি যে বিমুখতার শিকার হয়েছিলেন আমি

তার একটুও ব্যতিক্রমে যাইনি। আপনি যেদিন আমায় শত মানুষের সামনে ইজ্জতহীনা প্রমাণ করলেন, তারপর আমি সত্যিই নিজের ইজ্জত বিকিয়ে দিয়েছি। আপনার মতোই সেই রবের ওপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে নিজে নিজের বিচাকর হয়ে গেছি। আমি আমার পর্দা, মানসিকতা, শিক্ষা সব লুটিয়ে দিয়েছি।

আব্বুর মৃত্যুর সাথে সাথে আমি তার সকল চিহ্ন মিটিয়ে দিয়েছি নিজের ভেতর থেকে। অথচ আমি ভাবছিলাম আব্বু আমাকে দূর করছে, যেখানে দূর আমি তাকে করেছি।আমি প্রথম প্রথম তাঁর অস্তিত্ব টের পেতাম। ধীরে

ধীরে তাঁর অস্তিত্ব তার নিজস্বতা হারালো। আমি বুঝতে পারলাম, আব্বুর জবান থেকে আজাকাল আমার ভেতরে নতুন জন্মানো সংকীর্ণ চিন্তাধারামূলক কথা বের হয়। এরপর ধীরে ধীরে আব্বুর উপস্থিতি বিলীন হয়ে গেল আমার ভেতর থেকে। আব্বু আর আসেনি। আসলে তার অস্বিত্ব ছিল তার আমাকে দেয়া শিক্ষাগুলো। সেগুলোকে দাফন করে ফেলেছিলাম আমি নিজের ভেতর থেকে। তার অস্তিত্ব টের পাবার প্রশ্ন ওঠে না। মানুষ তার কর্ম ও শিক্ষার মাধ্যমে তার পরিবর্তি আত্মীয়র মাঝে বেঁচে থাকে। আমি তাকে আমার ভেতরে ঠাঁই না দিয়ে ঠাঁই দিলাম আপনাকে,

হামজাকে, পলাশকে। কুকুরের কামড় খেয়ে হয়ে গেলাম কুকুর। কামড়াতে গেলাম কুকুরের পায়ে। এ কি মানুষে শোভা পায়? জয়নাল কাকা আপনাকে কী শিখিয়েছেন, জানি না। কিন্তু আমার আব্বু আমাকে তা শেখায়নি, তা বানাতে চায়নি, আজ আমি যা। আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ আমি, আপনারা উনাকে মেরে না ফেললে উনি উনার অন্তূকে আজ এই পথে দেখে সহ্য করতে পারতেন না। উনি অন্তূকে অন্তূ থাকা অবস্থায় রেখে ছুটিতে গেছেন। এই কৃতজ্ঞতা জানবেন আপনারা আমার পক্ষ থেকে।''অন্তূ ঝরঝর করে কাঁদে, অথচ তার ঠোঁট নিজের ওপর

তাচ্ছিল্যে হাসছে। সেই হাসি মিলিয়ে যায়। অন্তূ চোখ মুছল, মুখে হাত বুলিয়ে নিজেকে শান্ত করে। জয়ের হাতদুটো ছেড়ে দেয়। জয় বোবা হয়ে বসে আছে। তার ভেতরে কেমন কেমন যেন লাগছে! এটা হেরে যাবার অনুভূতির মতোন! জয় বকে উঠল নিজেকে। আবার দিশেহারার মতোন অন্তূর কান্নায় লাল হওয়া স্নিগ্ধ মুখখানায় কিছু খোঁজে।

অন্তূ নিজেকে সামলে এক টুকরো মুচকি হাসল, "আমার আব্বুকে মারা হয়েছে, আমার পরিবারকে ধ্বংস করা হয়েছে,আমার কাছ থেকে আমার ইজ্জত ও আমাকে কেড়ে নেয়া হয়েছে। আমার ভাইকে মারা হয়েছে। এছাড়া

যেখানে যা হয়েছে.....এই সবের দায় আজ আমি আপনাদের ওপর থেকে তুলে নিলাম। আমি সজ্ঞানে, সেচ্ছায় আজ ক্ষমা করে দিলাম আপনাকে, জয় আমির।''

জয় একটা ঝাঁকুনি খেলো, তা তার অনিয়ন্ত্রিত। শরীরের পশমগুলো কেঁপে উঠল। থরথর করে শিউরে উঠল জয়ের দেহখানা।

অন্তূ বলল, ''আপনি যখন অনাচারের শিকার হয়েছেন, তা হয়ত ছিল রাজনৈতিক, হয়তবা পারিবারিক অথবা পশুদের জঙলি উল্লাস। তা আপনার ভেতরের মানুষটাকে জাগ্রত থাকতে দেয়নি, তাকে ঘুম পাড়িয়ে এই জয় আমিরের উদ্ভব ঘটিয়েছে। আপনি নিজেকে নিজের

পালনকর্তা ও বিচারকর্তা মেনে নিয়েছেন। কারণ আপনার বিশ্বাস অনুযায়ী কোনো মালিক নেই।কিন্তু আমি? আমি আট বছর বয়স থেকে আমার রবকে সেজদা করে আসছি। তাতে বিশ্বাস, ভরসা ও ভক্তির তো কমতি ছিল না! আমার পালনকর্তা মহাবিচারক, মহান শাস্তিদাতা, মহাপরাক্রমশালী। আমি তো তার প্রতি বিমুখ নই। তাহলে আমি কেন আমার সাথে হওয়া অন্যায়ের বিচার নিজে করব? আমি বরং তা ছেড়ে দেব আমার একমাত্র পালনকর্তার ওপর। আমি দেখতে চাই, আমার পালনকর্তার বিচার কেমন। তিনি সকলের

প্রাপ্য ন্যায্য হাতে বুঝে দিতে অদ্বিতীয়।
আমার পাপের ফল আমি পাব, আপনারটা আপনি। আমি তো বিচারকর্তা নই। আমি গোলাম। আমি সেই মালিকের গোলাম, যার হিসাবে ভুল হয় না, যা বিচারে না-ইনসাফি হয় না।

আর আপনি তো আমায় মেরে ফেলেননি। আপনি আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, সব রকম দৈহিক আঘাত থেকে বাঁচিয়ে আপনি আমার রুহুটাকে তড়পে তড়পে মেরেছেন। আমি আপনাকে মারব কেন? যেখানে মৃত্যু আপনার প্রেমিকা, আপনার একমাত্র গন্তব, আপনার প্রত্যাশা। যে প্রেম আপনি প্রায় দুই যুগ ধরে

নিজের ভেতরে লালন করছেন, তা আপনাকে ধরিয়ে দেবার রাস্তার সহযোগী আমি হব না। মৃত্যু আপনার শাস্তি হতে পারে না।আপনাকে আমি আজ মাফ করে দিলাম, সবকিছু থেকে। তুলে নিলাম আমার সকল অভিযোগ। আপনি মুক্ত আজ থেকে। আজ আমার সমস্ত অভিযোগ ও অনাচারের দায় থেকে মুক্ত করে দিলাম। ক্ষমা করে দিলাম আপনাকে....

কথা ফুরোয় না অন্তূর। থাবা দিয়ে অন্তূর গলা চেপে ধরল জয়, "এই শুয়োরের বাচ্চা, তুই আমাকে ক্ষমা করার কে? তোর কাছে ক্ষমা চেয়েছি আমি? আমি চেয়েছি ক্ষমা? ক্ষমা করলে মানুষ তাকে ভুলে যায় রে! তুই

আমাকে আজ ক্ষমা করে ভুলে যাবি? মহান হয়ে যাবি তুই? তা হবে না! আমি তোর কাছে ক্ষমা তো চাইনি! ক্ষমা করবি কেন? কীসের ভিত্তিতে তোর এই মহানুভবতা?...''ফোন বাজল জয়ের। ঘেমে উঠেছে তার শরীর। শার্টের ফাঁক দিয়ে লোমাবৃত বুকটা দেখা যায়, তান্ডব উঠেছে সেখানে। উঠানামা করছে বিক্ষিপ্ত শ্বাসের দমকায়। অন্তূ শুনতে পায় জয়ের হৃদযন্ত্রের কপাটিকার লাফালাফি! সে হাসে। আলতো করে হাসে। জিতে যাওয়ার হাসি। যে জিতটা জয় জিততে চেয়েছিল বোধহয়! জয় ছেড়ে দেয় তার গলা।

কল রিসিভ করে। কলটা রাজধানী থেকে এসেছে। কেউ জানায়, রাজধানী থেকে দিনাজপুর ফিরবার পথে দুপুর তিনটায় হামজার গাড়িখানা একটি বাইকের সাথে ক্র্যাশ হয়েছে...মিস ক্যাথারিন ঝিম ধরে বসে বেশ কিছুক্ষণ মাহেজাবিণকে দেখার পর এক টুকরো ক্লান্ত হাসি হেসে বললেন, "আই ওয়ান্না বি এফরেইড অফ ইউ, মাহ্জাবিণ!"
মাহেজাবিণ চোখদুটো বুজে ম্লান হাসে, "কেন?"
-"এই সৌন্দর্য ও স্নিগ্ধতার আড়ালে এমন ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার জায়গা দিয়েছ! এটা তো

নীতিবিরুদ্ধ! সৌন্দর্য ও নারীর ওপর মানুষ আস্থা হারাবে যে!”

মাহেজাবিণ বলল, “আপনি আমার ক্ষমাকে নিষ্ঠুরতা বলছেন, এটা কি নীতিবিরুদ্ধ নয়? তবে কি আমি জয় আমিরকে খুন করলে সেটা নীতিগত হতো?”-“পলিসি ইজ ডেড হেয়ার। কিন্তু ওটা হতো ক্ষমা, তা জেনে রাখো!”

মাহেজাবিণ একটু অবাক হবার মতো করে বলে, “এটা তো অধর্ম, মাদাম!”

-“তুমি যে বারবার বলেছ সবচেয়ে কঠোর সাজার কথা, সেটাই তুমি সাজা মওকুফের নামে দিলে ওকে। আমি তোমাকে বুঝতে

ভীষণ চাপ অনুভব করছি, মাহেজাবিণ! তুমি যা বলেছ, তাই করেছ। শুধু দৃষ্টিকোণ ঘুরিয়ে নিয়েছ। তুমি বলেছ কখনোই ক্ষমা করবে না। কিন্তু ক্ষমা করে দিয়েছ। অথচ এখানে আমি জয় আমিরকে তোমার দেয়া সবচেয়ে কঠোরতম শাস্তির ঘোষনা শুনছি।''

-“এটা কোন ভিত্তিতে বলছেন, মাদাম?''

-“মাহেজাবিণ তুমি জানো, কাঠখড়ি ও কেরোসিনের চেয়ে দিয়াশলাইয়ের দুর্বল-ছোট্ট কাঠিটি বেশি ভয়াবহ হয়?''

-“জানতাম না।''-“কেননা দিয়াশলাইয়ের কাঠি কেরোসিন ও কাঠখড়িকে পোড়ানোর উদ্দেশ্যে নিজের সর্বস্বকে পুড়িয়ে ছাই

করতেও দ্বিধাহীন। বরং নিজের ধ্বংস মেনে নিয়েই সে কেরোসিন ও কাঠখড়িকে জ্বালাবার জন্য নিজে জ্বলে ওঠে। তুমি হলে সেই দূর্বল, ছোট্ট এক কাঠখড়ি! এজন্যই তুমি ভয়াবহ!''
শীতল-শান্ত মিস ক্যাথারিনকে একটু হতবিহ্বল দেখালো। তিনি দু-তিনটে বিক্ষিপ্ত শ্বাস ফেলে বললেন, "তুমি একবারও নিজের কথা ভাবলে না? নিজেকে বলি দেবার বদলে এই ধ্বংসযাত্রায় আমি তোমাকে ভাবুক হতে দেখিনি কেন? সবচেয়ে বড় হারটা তো তোমার! এই জীবন বইবে কী করে? এই ভাবনায় চিন্তিত হওনি কেন, তুমি?''

মাহেজাবিণ ঘড়ির কাটার দিকে তাকিয়ে বলে, “ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা জীবিতদের থাকে। মৃতরা এসব নিয়ে ভাববে কেন? আমি জয় আমিরকে গ্রহণ করার সাথে সাথে নিজেকে দাফন করেছি। দাফনকৃত লাশের ভবিষ্যত থাকে না।”

-“আর তাই তোমাকে আজ আমি এই প্রশ্ন করতে পারছি না–এত কঠিন সাজা কোন অপরাধের বদলে দিলে তুমি জয় আমিরকে? নয়ত আজ আমার কাছে জবাবদিহি করতে হতো তোমাকে।”মাহেজাবিণ হেসে ওঠে, “আপনাকেও লোকটা পথভ্রষ্ট করে ফেলেছে, কেবল গল্পের মাঝেই! সত্যিই আমি এক

ভয়ানক পুরুষের সংসার করেছি! যে যেকোনো কাউকে নিজের বশীভূত করে ফেলায় অলৌকিক শক্তিধর।”

-“অথচ সেই ভয়ানক পুরুষকে আমি বলতে চাইব, সে তার চেয়েও ভয়ানক এক নারীকে নিজের ভেতরে স্থান দিয়েছে।”

মাহেজাবিণ চোখদুটো বুজে সোফায় পিঠ এলিয়ে বসে বলল, “কারও রুহ্ জ্বালিয়ে কয়লা করে সেই কয়লাকে ভেতরে স্থান দিলে কেউ কতটা লাভবান হতে পারে, মাদাম? সেও ঠিক ততটাই পেয়েছে আমার কাছে। আমি বিচারক নই। প্রধান বিচারক ওই সৃষ্টিকর্তা আর দ্বিতীয়টা দুনিয়ার আইনত-

আদালত! আমি জয় আমিরকে তাদের হাতেই সোপর্দ করলাম। ভুল করলাম?"

মিস ক্যাথারিন মিনিট দুয়েক নিঃশব্দে দেখলেন মাহেজাবিণকে। আচমকা শ্লথ কণ্ঠে বললেন, "তুমি গর্ভবতী ছিলে, মাহেজাবিণ! "মাহেজাবিণ জবাব দেয় না। মিস ক্যাথারিন দুটো হাত জড়ো করে হাঁটুর ওপর রেখে মেরুদন্ড বাঁকা করে বসেন। তার জয় আমিরকে একবার দেখতে বড় ইচ্ছে করে। একবার দেখা করা দরকার ছিল।

সেই মুহুর্তে উনার কল্পনায় একটি দৃশ্যপট ছুটে আসে– কেন্দ্রিয় কারাগারের গভীরতম এক কাল-কুঠুরী সেলের সাথে হেলান দিয়ে

বসা জয় আমির। তার মুখে সেই চিরায়ত হাসি। সেসময় কেউ তাকে খবর দেয়, তার ঘরওয়ালির গর্ভে একটি সন্তান জন্মেছে। আমির বংশের শেষ বংশধর! জয় আমিরের রক্ত-বীর্যে পয়দা... ঔরসজাত....আমিরদের উত্তরসূরী!

জয়ের ছটফটানিটুকু যেন ব্রতী মিস ক্যাথারিনকে ভয়াবহ হিংস্রতার সাথে তেড়ে এলো। তিনি হাঁপিয়ে উঠলেন। কেঁপে উঠলেন। শরীরটা একটু ঘেমে উঠল। দু-চারটে এলোমেলো শ্বাস ফেলে মাহেজাবিণের দিকে তাকালেন। এইরকম শাস্তি বুঝি জয় আমিরদের হতে আছে? যে এক জীবন

নিজের পরিচয়ের পেছনে ছুটেছে, তার সন্তানকে চোখে ও হাতে ছুঁয়ে না দেখতে পাবার শাস্তি মাহেজাবিণ জয়কে দিলো! মুরসালীন সেদিন শেষরাতে দু-খানা চিঠি লিখেছিল। রক্তাক্ত-কাটাছেঁড়া-অবশ হাতে এক টুকরো কাগজ তুলে নিয়ে প্রথম চিঠিখানা লিখতে বসল—

আনসারী চাচা,

সালাম নেবেন আমার। আমি ভালো আছি। খারাপ থাকা অনেক হলো। এখন একটু ভালো থাকার ব্যাপারে ভাবা উচিত। আমি ভালো থাকার দ্বারপ্রান্তে। আপনার কাছে অনুরোধ থাকবে এ কথা জেনে উত্তেজিত

হয়ে কোনো পদক্ষেপ নিয়ে নিজেদের বিপদ ডেকে আনবেন না। আমি যে শান্তির জগতের কাছাকাছি, সেখান থেকে আমাকে জুলুমের দুনিয়ায় ফেরানোর চেষ্টা না করার হাতজোড় অনুরোধ থাকবে।

অনেক দৌড়েছি আমরা। পা দুটো ক্লান্ত হলেও চলে যেত। কিন্তু মামলা আমাদের পা অবধি থেমে নেই। ওদিকের অবস্থা জানি না। এখানে থাকার সুবিধা অনেক– শব্দ, আলো, বাতাস, পানির মতো ব্যাপারগুলোর জ্বালাতন নেই। বাইরের খবর এখানে পৌঁছে না। এখানকার খবর বাইরে যায় না।এসবে আমি-আপনি অভ্যস্ত হতে পারি। কিন্তু যারা অভ্যস্ত

না বা যাদের এখনই অভ্যস্ত হবার সময় আসেনি, তারাও রয়ে গেছে এখানে। এর দায় কে নেবে? আমার কাঁধ ভেঙে গেছে, যে কাঁধে আমি ওদের শুকনো- ক্ষুধার্ত মুখের দায়ের ভার তুলতে পারি। ওদের মুখের দিকে তাকানোর সাহস হারিয়ে ফেলেছি আমি। এতদিনে যখন কিছু করতে পারেননি, এবার ওদেরকে সঙ্গে নিয়ে মরণের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথটাই বাকি আছে শুধু, আর কিছু হবার নেই।

আমি যতটুকু বুঝতে পারছি, ওদিকে কিছু একটা চলছে। জয় আমিরের স্ত্রী-ঘটিত এখানে একটা বিপজ্জনক ঘটনা ঘটে গেছে।

এটা কতদূর গড়িয়েছে জানি না। কিন্তু সব মিলিয়ে যা হবে, তা ভালো না।চাচা, ওদের জান ও মালের হিফাজত করব এই ওয়াদায় ওদেরকে আমানত নিয়েছিলাম ওদের অভিভাবকদের কাছে। আমি বোধহয় আর সেই আমানত রক্ষা করার অবস্থায় নেই। ওদের জীবনকে বাজি ধরে আমি এই মুখ তুলে রবের সামনে দাঁড়াতে পারব না। হামজা পাটোয়ারী আমাকে ছাড়ার ভুল করবে না। তাই আপনি শুধু ছাত্রদের মুক্তির শর্তে তার কাছে একটা বার্তা ও আত্মসমর্পণপত্র পাঠান। এবং সে ছাড়তে চাইবে না। তার জন্য আগে

মাদ্রাসার কার্যক্রম স্থগিত করে দিন। এবং এটা নিশ্চিত করে জানান ওদেরকে।
এই চিঠি আপনার হাতে পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে পড়বেন। সময় এখানে ও বাইরে যথাক্রমে পৃথিবী ও মহাকাশের মতো। বাইরে এক ঘন্টা কাটলে এখানে থাকা প্রাণের আয়ু থেকে এক যুগ কোরে চলে যাচ্ছে। আর আমার সাধ্যি নেই ওদেরকে ঠেকিয়ে রাখার। এমদাদের পায়ে ইনফ্রাকশন ধরে গেছে। বাকিরা জড় বস্তুর মতো মিথ্যা নিঃশ্বাস ফেলছে। ওর যথাদ্রুত চিকিৎসার প্রয়োজন।

এসব উল্লেখ করলাম, যাতে মাদ্রাসার কার্যক্রম বন্ধ করার প্রক্রিয়া শুরু করতে আপনার হাত না কাঁপে।

আপনার স্নেহভাজন,সৈয়দ মুরসালীন মহান

হাতের আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে ছিঁড়ে গেছে, সেসব স্থানে গলিত পুঁজ-রক্ত বেরিয়ে এলো দীর্ঘক্ষণ কলম ধরে রাখার ফলে। মুরসালীন দ্বিতীয় চিঠিখানা বাঁ হাতে লেখার চেষ্টা করে। মাংসপেশি ও শারীরিক দূর্বলতায় থরথর করে হাত কাঁপতে লাগল। কয়েকবার কেশে উঠল সে। নাকের কিনারা দিয়ে ঝিরঝির করে রক্ত এলো। মুরসালীন এবরো-থেবরো হাতে লেখে

—

আমার প্রাণপ্রিয় আম্মা,

আসসালামুআলাইকুম। চিঠির শুরুতেই আপনার অবাধ্য ছেলের অফুরন্ত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানবেন। এ-কথা আজ প্রথমবার বলছি, অবাক হয়েছেন? আজ না বললে আর বলার সুযোগ পাবার নিশ্চয়তা নেই। আমি আপনাকে আজ মূর্খের মতো জিজ্ঞেস করব না, আপনি কেমন আছেন। কিন্তু আপনার এখন নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে, আপনার বদমাশ ছেলে কেমন আছে, কী অবস্থায় আছে। তা আমি আপনাকে শেষে বলব। এখন তার আগে দুটো কথা বলি।

আম্মা,ছোটবেলায় আমি যখন পড়তে চাইতাম না, জেদ করতাম ‘এত কষ্ট করব না’, আপনি বলতেন–’কষ্ট তোকে খোদার নৈকট্য দেবে। ঈমানদারেরা পৃথিবীতে সুখ পেতে আসে না। দুনিয়া তাদের জন্য নরক। এর বিনিময়ে তুই পাবি আখিরাতের অন্তত সুখ। বিশ্বাস রাখ। কষ্ট আর সুখ চাক্রিক। এখন তুই কষ্টে আছিস মানে সুখ সামনে আসছে।’ আমি সেই সান্ত্বণায় বড় হয়ে গেলাম। কিন্তু তারও অনেকদিন কাটার পরেও টের পেয়েছি, সুখ আসলেই কল্পিত এক তত্ত্ব। মানুষ ওই কল্পিত দিনের আশায় সারাটা জীবন দুঃখকে মেনে নেয় যে এই তো আর কয়েক কদম

পেরোলেই সুখ! শেষ অবধি সে যখন অভিযোগ করবে, কই সুখ তো পেলাম না, দুঃখ থেকে মুক্তি তো মিললো না; এই অভিযোগ করার আগেই আল্লাহ্ পাক মানুষের জীবন-আয়ু কেড়ে নেন।আজ আমি আপনাকে সেই অনিশ্চিত ধৈর্যই ধরতে বলব। আপনি বলতেন, 'যার কিছু বা কেউ নেই, তার আল্লাহ আছে।' আজ আপনাকে আমি সেই আল্লাহর কাছে সঁপে দিয়ে যাচ্ছি, আম্মা। যেদিন আমি শেষবার আপনার কাছ থেকে এসেছি, আপনাকে জানাইনি। জানালে আপনি আপনি বের হতে দিতেন না। কিন্তু আমাকে তো বের হতেই হতো! আমি আপনাকে

নামাজে কান্নারত অবস্থায় রেখে বের হয়ে এসেছি।

এবার আর আপনার কাছে ফেরা না হলে সেটা তকদীর। যখন আব্বা মরল, আমি জয় আমিরকে খুন করতে চেয়েছিলাম। আপনি বলেছিলেন, ‘খবরদার মুরসালীন। এই অকূলে আমাদের চারজনকে ভাসিয়ে তোর আব্বা চলে যাবেন, এটা তকদীর। তকদীরের ফয়সালার ওপর হাত ঘুরিয়ে কাফের হবি?’আজ আমি আপনাকে সেই তকদীরের ফয়সালায় কাঁদতে নিষেধ করব। আহাজারি না করতে অনুরোধ করব। আপনি দুটোর পর তৃতীয়জনের দাবী ছেড়ে দিয়েও ধৈর্য ধরবেন,

এরকম কথাই আজ আমি আপনাকে বলব, আম্মা।

আমি আপনাকে দেখিনি আজ বেশ কয়েকমাস। আজ খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। আপনার সরল-সহজ মায়াবী মুখটার ওপর মুমতাহিণা আর আপনাকে প্রাণভরে আজ একবার দেখতে না পাওয়া আমার তকদীর। আপনার হাতখানা আমার মাথা ছোঁয় না কতদিন! চুল টেনে ধরে বলে না, 'জাহিলদের মতো চুল রাখবি বলে ভার্সিটি পড়াইছি তোরে? চুল যদি সুন্নতি কায়দায় ছেটে না আসিস, আমার সামনে আসবি না। কাফের হচ্ছিস ঢাকা থেকে থেকে। কাফেরের জায়গা

নেই আমার ঘরে।'আমার চুল বেড়েছে অনেক। বাবরি হয়ে গেছে অনিচ্ছাকৃত ভাবেই। আপনার খুব ইচ্ছে ছিল, আমি বাবরি রাখব। আজ হয়েছে আম্মা। আমার দাড়ি এক মুষ্ঠিখানেক হয়ে গেছে। আপনি দেখলে খুশি হতেন খুব। আবার অখুশি হবার মতোনও অনেক চিহ্ন গায়ে পড়েছে। না দেখাই ভালো রইল।

আজ মনে পড়ল, অনেকগুলো বেলা আমার খাবারের প্লেটে অর্ধেক মাছের মাথাটা তুলে দিয়ে আপনি বলেন না, 'বাকি অর্ধেক মুমতাহিণার। ওর থেকে কেড়ে নিলে মার

খাবি, মুরসালীন। আপনার হাতের মাছের ঝোলের ভাত খাবার ইচ্ছে করছে আজ।'

আজ অনেকগুলো দিন আমি নোংরা প্লেটে, দু-তিনদিন পর বেঁচে থাকার তাগিদে অন্ধকারে বসে দুই-এক লোকমা খাবার খাই। আপনি পাখা তুলে বাতাস করতে করতে বাতির সলতে বাড়িয়ে দেন না। এসবের আফসোস ঘুচে যেত, যদি একবার আপনাকে চোখের সামনে দেখতে পেতাম।আম্মা দেখেছেন! আপনার ব্যর্থ ছেলে আজ শেষবার আরও একবার কাপুরুষতা দেখিয়ে দিলো এই চিঠিতে। মুস্তাকিন ভাই হলে এসব আবেগী কথাবার্তা কখনোই তুলতো না। আমি লিখে

ফেলেছি। যখন চিঠি লিখতে কলম হাতে নিয়েছি, জানতাম না আমি এসব লিখে ফেলব। হাত থেতলানো আমার। এই চিঠি নষ্ট করে আবার লেখার শক্তি নেই। কলম ধরতে পারছি না শক্ত করে। তাই কাটলাম না। আবার আপনাকে কাঁদিয়ে ফেললাম! আজ কেন আমি এসব লিখে ফেলছি আপনার উদ্দেশ্যে, বুঝতে পারছি না। আপনার কাছে এসব লিখতে নেই...মুরসালীনকে ক্ষমা করবেন, আপনার মুরসালীন আপনাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভেঙে ফেলেছে–সে আপনার সঙ্গে থাকল না। অথচ আব্বা, মুস্তাকিন ও মুমতাহিণার পর তার থাকার ছিল আপনার

কাছে।আম্মা! আপনার অবাধ্য ছেলে আজ আপনাকে না দেখতে পাবার আকুলতা নিয়েই এই তথাকথিত স্বাধীন দেশ থেকে বিদায় নিয়ে আসল স্বাধীন জগতে যাবে। আমার মতো ব্যর্থ মুরসালীনদের একের পর এক মৃত্যুর মধ্য দিয়েই একদিন অব্যর্থ মুরসালীনেরা জন্ম নেবে, গর্জে উঠবে। তাদের রক্তে ধুয়ে এ দেশ একবার স্বাধীন হলেই আমি আবার ফিরে আসব আপনার পদতলে। সেদিন চোখ ভরে দেখব আপনাকে। মুমতাহিণারা আর যেদিন আমার মতো পঙ্গু ভাইয়ের বুক খালি করবে না, আপনার মতো মায়েরা যেদিন মুস্তাকিন মহানদের মতো

আইনশৃঙ্খলার কর্মকর্তা ছেলেদের হারিয়ে কাঁদবে না, ওই দেশে আমি আবার ফিরে আসব আপনার কাছে।

আপনার মুরসালীন বেঁচে থাকবে, আম্মা। মুরসালীনদের মৃত্যু নেই। আপনি শুধু লাখোদের মাঝে খুঁজে নিতে পারলেই কতশত মুরসালীনকে পাবেন। আমি বেঁচে রইলাম।

আজ আর কিছু লিখব না। আজ শুধু ভাবব। মৃত্যু কি শেষ না শুরু! এই শহরে মৃত্যু কি আসক্তি নাকি অনীহা!মুরসালীনের হাত থেকে কলম পড়ে গেল। ক্ষত থেকে পুঁজ পড়ছে। জীবনীশক্তি নিঃশেষ হবার পথে। মুরসালীনের গায়ে কাঁপুনি উঠল। সে জড়সরো হয়ে

মেঝের ওপর শুয়ে পড়ল লম্বা শরীরখানা গুটিয়ে নিয়ে।দুপুরের দিকে জয় ও আরমিণ বেরিয়ে যাবার পর খবর এলো আজ হামজা দিনাজপুর ফিরছে। পুরোনো দিন হলে রিমির উৎসব লেগে যেত। কমপক্ষে দশ পদের রান্না করতে তাকে রান্নাঘরে কাটাতে হতো ঘন্টা পাঁচেক। কক্ষটা গোছগাছ করার পর হামজার পোশাক ধুয়ে শুকিয়ে ইস্ত্রি কোরে রাখা শেষ হলে নিজেকে গোছানোর কাজ। গোসল করে একটা নেভি-ব্লু কালারের শাড়ি পরতে হতো তাকে। কালারটা হামজার পছন্দ।
দরজা খুলেই হামজার গায়ে চাদর, কোর্ট কিছু গায়ে থাকলে তা খুলে নিতে হয় রিমির।

এরপর ওয়ালেট, চশমা, ঘড়ি অথবা বাজারের থলে বা কিছু থাকলে তা রিমির ওপর তুলে দিতে দিতে রুমে ঢুকেই পাঞ্জাবীখানা খুলে ছুঁড়ে মারার অভ্যাস হামজার।ঘামের সাথে মিশে কড়া সুগন্ধির গন্ধখানা হামজা হামজা হয়ে ওঠে। ওই গন্ধে রিমির প্রাণ আছে, ওই গন্ধে রিমির একটা হামজা আছে। নাক কুঁচকে গোপনে সে গন্ধটা টেনে নিয়ে একখানা প্রাণোচ্ছল শ্বাস ফেলে আড়চোখে তার কঠোর পুরুষকে দেখে।

হামজার একখানা অভ্যাস আছে। বাইরে থেকে এসে সে সর্বপ্রথম গোসলে ঢোকে। রিমিকে বাথরুমের দরজাটা ধরে সেই

সারাটাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় লুঙ্গি-তোয়ালে হাতে নিয়ে। বাথরুমের হ্যাঙ্গারের কোনো কাজ নেই।

গোসল সেরে এসে একখানা সিগার ধরিয়ে দোল কেদারায় গা মেলে বসে হামজা। তখন রিমির কাজ তার ভেজা মাথাটা মুছে দিয়ে ক্লান্ত শরীরটা একটু টিপে দেয়া, চুল টানা....এ সময় মতিভ্রম হলে রিমির আর নিস্তার নেই সে-বেলা।এসব আজ স্বপ্নের মতোন, যেন আগের জন্মের স্মৃতি সেসব। রিমির নতুন এক জন্ম হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে ভয়ানক ব্যাপার হলো–এই জন্মেও রিমির দূর্বল নারীত্ব ওই নিঠুর পুরুষটিকে কামনা করে। সেই

লোক কি জানে সেই যে রাতে রিমিকে কান্নারত রেখে রাজধানীর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেছে লোকটা, তারপর আর রিমি ঘুমায়নি। রাতে বিছানায় পিঠ ঠেকায়নি! রিমি পারে না। তার নগ্ন-নরম বুকটার ওপর লোকটা দাড়ি-গোফওয়ালা শক্ত মুখটার ভার না ছেড়ে দিলে রিমি একটুও ঘুমোতে পারে না।রিমি তো ছোট ছিল। তার উচ্চতাও হামজার বিশাল দেহটার চেয়ে নেহাত ছোট। প্রথম প্রথম যখন অভ্যাস হচ্ছিল—হামজা রিমিকে বিছানায় চেপে ধরে রিমির আলগা বুকে চুল-দাড়িতে আবৃত মাথাটাসহ গোটা শরীরের ভার ফেলে ঘুমাতো। রিমি ঝগড়াও করেছে এ নিয়ে।

তার দম বন্ধ হয়ে আসে। অতবড় মানুষের ভার তার ছোট্ট শরীরে সয়?

তাকে এ সময় হামজার থামানোর কৌশলটা কী শিকারী জাতীয় ছিল! পোড়া-কালো ঠোঁট রিমির কচি ঠোঁট আকড়ে ধরলেই রিমির শরীর আওলে যেত। নারীদেহ পুরুষের এমন ছোঁয়ার কাছে কত বাজেভাবে শিকার হয়ে যায়, সেসব জানে লোকটা?আজ সেই দম বন্ধকর পরিবেশ না তৈরি হলে রিমির ঘুম আসে না। সে বিছানায়-ই টিকতে পারে না। রিমিকে এসে খবরটা দিয়ে গেল একটা ছেলে, “ভাবী! ভাই ঢাকা থেকে ফিরতেছে।”

রিমির জিজ্ঞেস করতে জিহ্বা নড়ে, ‘সেটা তোমার ভাই আমাকে জানাতে বলেছে?’

কিন্তু বলা হয় না। ওরা কেউ রিমির দিকে চোখ তুলে সরাসরি তাকায় না। আবার বেশিক্ষণ সামনেও থাকে না। হামজার আদেশ অথবা নিষেধ বোধহয় এমনই!

কথাখানা শোনার পর রিমির ভেতরে যে যাতনা শুরু হলো, তা বেসামাল হয়ে উঠল। এই সময় রিমির কী করার অভ্যাস, রিমি করছে কী! তরু কোথায়, শাহানা কই! বাড়িতে হামজার ফেরার খবরে তোড়জোড় শুরু হচ্ছে না কেন?

এ কথা ভাবতেই আবার বিষাক্ত সেই অনুভূতি রিমির গলা চেপে ধরল। এসবের জন্য দায়ী ওই লোকটা। বাড়িটা শ্মশান হয়ে গেছে। যেখানে শুধু নেই নেই আর নেই! প্রাণ নেই।রিমি ছুটে যায় বারান্দায়। সে আর এক মুহুর্ত এখানে থাকবে না। সে চলে যাবে বাপের বাড়ি। হামজা ফিরে তাকে এই অবস্থায় দেখবে! আবার লোকটার সম্মুখীন সে হবে! তাও এই পরিস্থিতিতে এই অবস্থায়! কিন্তু উপায় কী! কারও সাহস নেই হামজার অনুমতি না নিয়ে রিমিকে ওই বাড়িতে দিয়ে আসার, অথবা ওই বাড়ি থেকে এসে কেউ তাকে নিয়ে যাবার। হামজা বাপের বাড়ি

যাওয়া পছন্দ করে না। রিমি হামজার ঘরের আসবাবের মতো হয়ে গেছে, যেদিন তাকে বউ করে তুলে এনে এই ঘরে রেখেছে হামজা। সে বোধহয় একা বাপের বাড়ি যাবার পথটাও ভুলে গেছে!

রিমির মনের আগুন যেন শরীর পুড়াতে লাগল। সে গিয়ে টেনে-হিঁচড়ে পরনের মুচড়ে যাওয়া শাড়িখানা গা-ছাড়া করে ঝরনার নিচে বসে পড়ল। একে একে শরীরের সমস্ত বস্ত্র খুলে ফেলল। তবু শরীরের জ্বলুনি কমে না। রিমি হাত-পা গুটিয়ে নিয়ে বসে থাকে ঝরনার তলে। হু হু করে কেঁদে ওঠে। তার সুখের সংসারে কার নজর লেগেছে! পাপের নজর

এত ভয়বহ হবে কেন? রিমির বেহায়া মন তার বিরুদ্ধে গিয়ে জানায়–এই মুহূর্তে বোধহয় ওই পাপী পুরুষটা একটাবার এসে ব্যকুলচিত্তে রিমির দেহখানা নিজের সাথে লেপ্টে নিলে রিমির এই জ্বলুনি কমে যেত। রিমির হাতের নখে নিশপিশ অনুভূতি জাগছে লোকটার পশমী বুকে গাঢ় খামচির আঁচড় ফেলতে।

রিমির কাছে এই সত্য ভাবনাখানা অসহ্য ঠেকে। তার ভেতরে নিষ্ঠুর লোকটার জন্য জমাটবদ্ধ এই ভালোবাসাকে রিমি ঘৃণা করে। এভাবে রিমির সত্ত্বায় যেন চিড় ধরল, দ্বি-বিভক্ত হলো তা।রিমি একখানা তোয়ালে

পেঁচিয়ে রুমে আসে। আয়নায় নিজেকে দেখে। সারা দেহে শুধু হামজা, ফোলা-লাল চোখদুটোতেও হামজার প্রভাব! এই হামজাময় নিজেটাকে রিমি কীভাবে গুটিয়ে নেবে তা ভাবতে গেলে রিমির শরীর অসাড় হয়। সে কেন আরমিণের মতো না? সে কেন এই ঘর-সংসারের মাঝে নিজেকে বিলীন করে ফেলেছে!

সে কেন যে সেদিন ছটফটানি থেকে নিজেকে আড়াল করতে দূর্বল শরীরখানা টেনে নিয়ে রান্নাঘরে যায়। দিনকয়েক পর ফিরবে লোকটা ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে। রিমি কি আজও পারবে লোকটার ক্লান্তির উপশমক

হতে?জয় ধপ করে বসে আবার চেয়ারখানায়। অস্ফূট স্বরে একবার উচ্চারণ করে, ‘বড়সাহেব!’

তার এই নিরবতার মাঝে অন্তূ চৌপায়ার সাথে পিঠ ঠেকিয়ে চোখ বোজে। বদ্ধ আমির নিবাসের সদরঘর যেন প্রতিধ্বনিতে কোলাহলপূর্ণ হয়ে উঠল। ঘুরপাক খেলো চারপাশে—

জয় আমির!

আপনি দায়হীন, বাঁধনহারা।

বাঁধনহারা বুঝি পাপের দায়ে হারে?

আপনি এক মৃত্যুঞ্জয়ী।

মৃত্যু কখনও আপনার শাস্তি হতে পারে?

তাই আপনাকে জীবন দিলাম,
আপনার চির-পাওনাদার হলাম।
পাওনা মিটিয়ে ফিরবেন একবার,
বিরোধ মেটাবার কথা ভাববো সেইবার।
ফিরলেন হয়ত, সাথে থাকল অতীত,
একবার আবার রচিত হবে অবরুদ্ধ নিশীথ!
জয় আরেকটা সিগার ধরিয়ে নিঃশব্দে বসে
সিগারের ধোঁয়া গিলল অনেকটা সময়।
হিসাব-নিকাশের সময় ধোঁয়ার সঙ্গ ভালো
কাজে দেয়। অনেকটা সময় পর সিগারটা
পায়ের তলে ফেলে জুতো দিয়ে পিষে হাসে।
ঝুঁকে বসে অন্তূকে নিজের খুব কাছে এনে

থুতনি উচিয়ে মুখটা তুলে ধরে চোখের সামনে।

-"আমারে ক্ষমা করে দিলেন, উকিল ম্যাডাম! কীসের ভিত্তিতে....হু? আইজ কয়ডাদিন আমারে খুব আবেগপ্রবণ রূপে দেখছেন, তাই মনে হইছে আমি অতীতের দুক্কে ডুব মেরে ধুয়ে-মুছে ফর্সা হয়ে গেছি?! তাই আমারে ক্ষমা করাই যায়! চ্যাহ্, শালার! এই চিনলেন আমারে?"

কূটিল হয়ে উঠল জয়ের মুখটা, "আপনাদের সমাজের মানুষ তাদের ফেলে আসা কালকে কুকুরের মতো চাটে, যা তাদেরকে চিরকাল

অতীতের গোলাম করে রাখে। জয় আমির তাদের মধ্যকার কেউ না।''

অন্তূ বলে, "মিথ্যা কথা। আপনি ভেঙে গুড়ো-গুড়ো হয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু মচাকাতে নারাজ। সে যাহোক, ক্ষমাটা শুধুই আমার পক্ষ থেকে। মনে রাখতে হবে।''অন্তূর সমস্যা হচ্ছিল বলে জয় সিগারটা পায়ের তলে ফেলে জুতো দিয়ে পিষে দু'পাশে মাথা নাড়ল, "টিকবে না। আমি সেই অনিবার্য, যার পাপকে পাশ কাটানো যায় না। টিকবে না আপনার এই ক্ষমার মহত্ত্ব! আমার পাপের স্রোতে দূরে ভেসে চলে যাবে আপনার আদর্শের কুড়কুড়ানি!''

-"এটাই কি আপনার একমাত্র লক্ষ্য?''

জয় ঠোঁট উল্টালো, “ক্ষমা করার কারণ খুঁজতে গেলে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার বিগত কয়দিনের ফুন মারা খাওয়া ঢ্যামনাচোদা চেহারা!”-“ইগোতে লেগেছে?”
-“আপনার কাছে ক্ষমা আশা করি নাই। কারণ তখন বুঝিই নাই বিষয়টা!”
জয় নিজস্ব ভঙ্গিতে গা দুলিয়ে হেসে উঠল এ পর্যায়ে। অন্তূর থুতনিটা আরেকটু নিজের দিকে এগিয়ে নিয়ে চোখের মণি বরাবর তাকিয়ে বলে, “তোমার মতে আমার আন্দাজশক্তি ভালো। ঠিক না?”
অন্তূ সতর্ক হয়ে উঠল। জয় অন্তূর গাল চিপে ধরে আলতো হাতে, “আমার ঘরের

ছলনাময়ী! কী খেললে মাইরি আমায়। নিয়ে! ”অন্তূ একটুও ভীত হয় না, বরং এবার মৃদু হেসে ফেলল, “এই খেলার পদ্ধতি তো আপনারই কাছে শেখা। কাউকে জমজমাট মৃত্যু দিতে হলে তাকে আগে ঘটা করে বাচিয়ে নিতে হয়।”

জয় ভ্রু উচায়। কিছুক্ষণ অন্তূর সুশ্রী চেহারাখানা মন ভরে দেখে নিচু গলায় বলে, “এই মুহূর্তে আমি যদি খানিকক্ষণের জন্যও যদি জিন্নাহকে হারানোর শোক ভুলে যাই, তুমি কতক্ষণ টিকবে আমাদের বিরুদ্ধে?”

অন্তূ ঠিক ততটাই চাপা দৃঢ়তার সাথে বলে, “নিজের রক্তের সাথে বেইমানী করা জয়

আমির, আমি ভয় পাই না আপনাকে। জানেন তো আপনি।''

জয় আচমকা অন্তূর ঠোঁট চেপে ধরে প্রগাঢ় একখানা চুমু খায়। অন্তূকে যেন শুষতে চায় সে। চুমুটা ধীরে ধীরে উগ্র হয়ে ওঠার সাথে সাথে অন্তূর গালে তার হাতও ঠিক ততটাই শক্ত হতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ পর অন্তূর ঠোঁট থেকে ঠোঁটটা সামান্য সরায়। তখন তার চোখদুটো টকটকে লাল।সেই মুখভঙ্গিমার কথিত বর্ণনা নেই। তা দুর্বোধ্য! চাপা আক্রোশ জয়ের পৌরুষ কণ্ঠনালিতে কাঠিন্য পেয়ে বেরিয়ে আসে চাপা ধীর আওয়াজে, "বেইমানী তোর দক্ষতা, আরমিণ।''অন্তূর

নাক শিউরে ওঠে, "সত্যকে অস্বীকার করার মাধ্যমে তা মিথ্যা করার ব্যর্থ চেষ্টা ছাড়ুন। আপনার ভেতরে শিকারীকে এখনও পুঁজো করার সাধ যদি অবশিষ্ট থাকে আপনার ভেতরে তাহলে আমি বলব আপনি এই হতভাগা-উত্তরাধিকারের যোগ্যই না।"

জয় নিষ্প্রভ বাঁকা হেসে মাথা দোলালো, "এই উত্তরাধিকার আমার সবচেয়ে বড় শিকারী। আমাকে রক্তে চুবিয়ে তুলে স্থির দাড়ায়ে আছে এখনও। মাগার আমারে আর আমার রাখে নাই। তুমি আবার আমায় ভড়কাচ্ছ, ডিয়ার!"

অন্তূ এক চিলতে হাসে, "ভড়কানোই তো কাজ আমার। তবে জেনে রাখুন আপনি

যতক্ষণ আপনার দেবতার বিপক্ষে ততক্ষণ আপনি সঠিক পথে।''

জয় হেসে চোখ মারে, "কিন্তু আমি তো ভুল রাস্তার লোক!''

কথা শেষ করেই পেছনের হোলস্টার থেকে পিস্তল খুলে অন্তূর কোলের ওপর ছুঁড়ে মারতে মারতে উঠে দাঁড়িয়ে দু'পাশে হাত প্রসারিত করে নিজের বুকটা মেলে ধরে জয় অন্তূর সামনে। এক কদম করে পেছায়। অন্তূ চোখে জিজ্ঞাসা, পিস্তল কেন দেয়া হলো তাকে। জয় জানায়, "ওটা এখনই প্রয়োজন পড়বে আপনার, উকিল ম্যাডাম! কাজের চিজ কিন্তু। সামলে...''অন্তূ বিভ্রান্ত চোখে দেখে

জয়ের হাস্যজ্জোল ভয়াবহ রূপ। অন্তূ জয়ের সবরকম হাসি চেনে। এই হাসিতে জয়ের সবচেয়ে নিষ্ঠুর হিংস্রতার বহিঃপ্রকাশ ছিটকে আসে।

জয় বলে, "এখন আমার প্রথম কাজ হলো বড়ঘর সাফ করা। বড়সাহেবেরর রক্তের দাম না তুলে আমি তো ঢাকা যেতে পারি না। আফসোস আজ যা হবে আপনার আড়ালে হবে। আপনার সাজা মওকুফেরই সমান এটা।"

অন্তূর সারা শরীরটা ঝাঁকুনি দিয়ে শিউরে ওঠে। আব্দুর আহাদের রক্তশূন্য মুখটা অন্তূর বুকের ভেতরটায় এক ধাক্কা

মারে। অন্তূ উঠে দাঁড়ায়।জয় পুরো হলরুম কাঁপিয়ে হেসে উঠল। হাসির দমকে বদ্ধ চার দেয়ালে প্রতিধ্বনি উঠল। অন্তূকে সে হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করে, “সাব্বাস, ঘরওয়ালি! প্রেস দ্য ট্রিগার। নো টেনশন, মাল লোডেড। জাস্ট শ্যুট!”

নিজের বুকে একদম হৃদযন্ত্রের ওপরে আঙুল নির্দেশ করে, “এই যে এইখান বরাবর। শ্যুট, শ্যুট! নয়ত বড়ঘর কইলাম আজ খালাস! আমাকে ঠেকাতেই হবে আপনার। ইনসাফের পক্ষে দু চারটে খুন জায়েজ, ম্যাডাম! চালান গুলি। জয় আমির আজ তীর্থে যাবে। চালা, আরমিণ। গুলি চালা।”

অন্তূর বুক হাপড়ের মতোন ওঠে-নামে। তার চোখ জ্বলছে। সে জয় আমিরের কাছে শুধায়, আপনি আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছেন?
''-"নাহ্! ছিঃ। আমি শুধু বলছি–আমি অনিবার্য পাপ, যা এড়ানো যায় না। ক্ষমা করা যায় না তা। আমার সামনে মহানুভবতার জায়গা নেই।''
অন্তূ পিস্তল তাক করে ধরে জয়ের কপাল বরাবর। লম্বাদেহী জয়ের কপাল বরাবর পিস্তল তুলে ধরতে অন্তূর হাত অনেকটা উঁচুতে মেলতে হয়। অন্তূ দেখতে পায় জয়ের মুখের উল্লাস! অন্তূ মাথাটা ঝিনঝিন করে ওঠে–কেউ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে এত

উৎসাহিত হতে পারে? কারও চেহারা মৃত্যুকে সামনে রেখে এত বেপরোয়া হাসিতে মেতে উঠতে পারে? আর সে নিকৃষ্টতম পাপী হয়, তাকে কি অন্তত মৃত্যুর সাজা দিতে আছে? অন্তূর বিলম্ব জয়কে বিরক্ত করে। তার ঠোঁট থেকে হাসি কমে আসে। তার চোখ কথক হয়ে ওঠে। সেই চোখে চোখ রেখে অন্তূর বুকের ভেতর ঝড় উঠে আসে। শ্বাস-প্রশ্বাস গতি হারায়। অন্তূর গলার মাংসপেশী অস্বাভাবিক হারে থরথর করে কেঁপে ওঠে। তার চোখদুটো জ্বলে।

জয় চোখে চোখ মিলিয়ে শুধায়, “আপনার চোখে একখানা পটি বেঁধে দেব? জয়

আমিরের চোখে তাকিয়ে তার বুকে গুলি চালানো সহজ না, ম্যাডাম!''তার এক মুহুর্তের মাঝে অন্তূকে এসে থাবা মেরে ধরে জয়, "তাহলে সেই বুকে ছলনার ছুরি চালানো এত সহজ কেন? হ্যা? কী চাই তোর, আরমিণ? আমার ধ্বংস? চেয়ে নিতি। তোর দুই হাতের তালুতে এনে ফেলতাম জয় আমিরের ধ্বংসের এক মুষ্ঠি ছাই!''

দৃঢ়চিত্তে জয় আমিরের চেহারার দিকে চেয়ে থাকা অন্তূর চোখ বেয়ে টুপ করে এক ফোটা নোনতা পানি গাল বেয়ে পড়ে। জয় বলে, "কিন্তু তোরা কেন ছলনার পথ বেছে নিস

আমার বেলায়? আমার সাথে ছলনা করা খুব সহজ তাই? আমি কাঙাল, তাই?”

অন্তূ মলিন হাসে, “একসময় মনে হতো, আপনি কাঙাল। একটু স্নেহ, ভালোবাসা অথবা সঙ্গ-এর কাঙাল। না, তা আপনি নন। আপনি শুধুই একজন পাপীষ্ঠ পুরুষ।”জয় হাত শিথিল করে হাসে, “স্নেহ আমি চাইছি এই আমি'র জন্য। কিন্তু আপনাদের সমাজে এই জয়কে ভালোবাসার নিয়ম নাই। আমাকে ভালোবাসার কথা আইলে শর্ত উঠছে আমার বদলে যাবার। তহন বুঝছি, ওই ভালোবাসা নিঃস্বার্থ, নিঃশর্ত না অথবা এই জয় আমিরের জন্যে না। তার মানে ভালোবাসা পাইলে পাবে

ওই বদলে যাওয়া শালা। এই আমি খালি শাস্তি পাবার যোগ্য। ....শ্যুট মি!”
জয় অন্তূকে ছেড়ে আবার একটু দূরত্ব বাড়িয়ে পিছিয়ে যায়। অন্তূকে উৎসাহ দেয়, “আইজ হয়ত তুই আমার রক্ত ছুয়ে দেখবি অথবা ওদের রক্তে তোকে গোসল করাবো আমি।”
অন্তূ পিস্তলের তাক নামিয়ে জয়ের হাই বুটের ওপরে গোড়ালির দিকে তাক করে। জয় শব্দ করে হাসে। হো হো করে হাসে অন্তূর নীরব আগ্রাসন দেখে। কিন্তু অন্তূ গুলি চালায় না। জয় পেছাতে পেছাতে সদর-দরজায় ঠেকে। তা খুলে অন্তূকে বলে, “তোর কসম আরমিণ, একবার চৌকাঠের ওপাড়ে না রাখলে আমার

ঠেকাইতে পারবি না! রক্তের একটা ছোটখাটো পুকুর কাটবো আজ আমি। গুলি চালা! পিঠ বরাবরই চালা।''জয় পা উচু করে চৌকাঠের ওপাড়ে না তুলে ধরে বাচ্চাদের মতোন হাসতে হাসতে পেছন ফিরে চায়, "শেষ সুযোগ, ঘরওয়ালি! আমি ওপাড়ে পা রাখলে আর ফিরাইতে পারবা না আজ। থামাও এখুনি, সময় আছে।''

অন্তূ ক্লান্ত চোখে দেখে, জয়ের উচ্ছ্বাসিত চেহারাটা! এই খেলায় সে খুব আনন্দ পাচ্ছে। হয় অন্তূ আজ তার রক্ত নেবে অথবা সে অন্তূর দোসরদের প্রাণ! ভীষণ মজার খেলা। জয় অপেক্ষা করে অন্তূর ট্রিগার দাবানোর।

দাবাচ্ছে না দেখে সে চৌকাঠের ওপাড়ে পা ফেলতে উদ্যত হবার ভান করে।

পিচ্ছ্ করে একটা শব্দ হয়। জয় আমির চোখদুটো আরাম কোরে বুজে নেয়। কিন্তু শাল কাঠের চৌকাঠের একাংশ বিধ্বস্ত জাহাজের পাটতনের মতো চুড়মার হয়ে কোথাও ছড়িয়ে পড়ে। অন্তূর কাঁচা হাতে ছোঁড়া গুলিটা গিয়ে দেয়াল ভেদ করে আঁটকে যায়।বুলেট শরীর ভেদ করেনি বলে জয়কে এক মুহুর্ত হতাশ দেখায়। একখানা দীর্ঘশ্বাস চেপে সে সশব্দে গা দুলিয়ে হেসে অন্তূর দিকে তাকায়, "যাহ্ শালা! টার্গেট মিস? শীট ম্যান, শীট শীট! চর্চার ঘাটতি। ব্যাপার না। সুযোগ

পেলে হাতে ধরে শিখিয়ে দেব। জয় আমিরের ঘরওয়ালি পিস্তল চালাতে জানে না এই খবর সমাজ জানলে ইজ্জত যাবে তো!”

অন্তূ হতবিহ্বল চোখে জয়ের চৌকাঠ মাড়িয়ে ওপাড়ে পা রাখা দেখে। তার কিছুই করার নেই আর। কোনো অলৌকিক কিছু না ঘটলে কি আজ বড়ঘর জয় আমিরের তান্ডবের হাত থেকে রক্ষা পাবে? সে দরজার দিকে পা বাড়ালে জয় দরজার পাল্লাদুটো এটে দিলো —-“আপনি এখানেই থাকছেন। এখানেই কবর হবে আপনার। ওই বাড়িতে আর আপনার আদর্শের ছায়া পড়বে না। আসি। আমির নিবাস উপভোগ করুন। বড়সাহেব

আমার অপেক্ষায়।"হামজার গাড়ি পুরান ঢাকার বাবু বাজার ব্রিজের ওপর একটি বালু টানা ট্রাকের সাথে ধাক্কা খেয়ে মুচড়ে গেল একপাশ। ট্রাকের গতি স্বাভাবিকের চেয়ে যথেষ্ট কম ছিল। গাড়িটা তাই অনেক চেষ্টা করেও ব্রিজের নিচে পড়তে পারেনি। এতে উপস্থিত মৃত্যুও মন খারাপ করে ফিরে গেল হামজার কাছ থেকে।

কপালের ওপরে আড়াই ইঞ্চির মতো করোটি ফেটে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এলো। আর শরীরের কোথায় কী লেগেছে তা অনুভব করার আগেই অন্ধকারে তলিয়ে গেল হামজার চেতনা। অস্ফূট স্বরে সে একবার উচ্চারণ

করে–জয়!মানুষ মৃত্যুর আগে তার আপনজনদেরকে ডাকে। হামজার কোনো আপনজন নেই। সে তার জন্মদাতা বা গর্ভধারিনীকে চেনে না। তার কোনো পরিচয় নেই। তার শুধু একটা জয় আছে। সে জয়কে ডেকে উঠল শেষবার। রিমির কাছে ক্ষমা চাওয়ার কথা খেয়াল আসার আগে তার চেতনা নিভে এলো।

ড্রাইভারের দুটো আঙুলের অর্ধেকটা কেটে পড়ে গেল। বাম পায়ের নিচের অংশের হাড় ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে। ওভাবেই মিনিট পনেরো মানুষের কল্পনা-জল্পনা, আতঙ্ক ও

সমবেদনার মাঝে পড়ে রইল দুটো দেহ রাস্তার ওপর।

ধানমন্ডিতে হামজার লোকেরা খবর পেয়ে বাবুবাজার পৌঁছাতে ঘন্টাখানেক লাগল। ততক্ষণে হামজার কন্ডিশন ডাক্তারদের ভাষায়–ক্রিটিকেল। তাকে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরী বিভাগের বেডে নেবার পর শরীর থেকে চুইয়ে পড়া রক্তে বেডসিট লাল হয়ে উঠল। হাতের মুঠোয় ছিল দুটোয় রজনীগন্ধার গাজরা। হামজা ফুলের গাজরাদুটো কিনেছে আহসান মঞ্জিলের সামনে থেকে। সেগুলো মুচড়ে নেতিয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে হাতের মুঠোয়

ধরা ছিল। হামজার দাড়ি-গোফের মুখটা চাপটি ধরা রক্তে জর্জরিত।ঘন্টা দুয়েক পর প্রাথমিক ড্রেসিং ও কিছুটা পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ডাক্তারেরা একটু চিন্তিত কণ্ঠে জানাতে চাইলেন, রোগীর শরীরে যা দেখা যাচ্ছে না আপাতত, তা ঘটিয়ে ফেলেছে বোধহয় এই এক্সিডেন্ট। আমরা আশা করব তা না হোক, তবে হবার সম্ভাবনা প্রবল থেকে গেল।

হামজার পান্টারেরা বুঝল না অত। জয়কে কল করে এই কথা বলবে কে, তা নিয়ে একটু আপত্তি সবার। জয় সহ্য করতে পারবে না। এরকম খবর দেয়াটা লজ্জারও। রাজত্ব

তাদের, তবু কেন এ ধরণের অরাজকীয় ঘটনা ঘটবে? লজ্জাজনক বটে। এর ফল ভুগতে হবে অপরপক্ষকে।বাঁশেরহাট ফেরার পথে জয়ের বুকের মাঝখানটায় একটা ছিদ্রক ব্যথার উদ্রেক হলো। চোখদুটো মুদে বাসের সিটের সাথে হেলান দিয়ে রইল। বোজা চোখের দৃষ্টির সামনে নিকশ অন্ধকার। সেই অন্ধকার জয়কে ডাকছে। বলছে, তার মাঝে বিলীন হয়ে যেতে। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে সে কতক্ষণ ওভাবে দম আঁটকে বাসের সিটের ওপর পড়ে ছিল জানা নেই।

যখন সে চলমান জগতে ফিরল, হৃদযন্ত্রের স্পন্দন স্বাভাবিক মাত্রা পেল তখন বাসের

কন্টাক্টর তাকে এক নাগাড়ে ডাকছে। অর্থাৎ তাকে বেশ অনেকক্ষণ যাবৎ ডাকা হচ্ছিল। বাস থেকে নেমে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতেও সে একবার দম আঁটকে বসে পড়ল রাস্তার কিনারে মাটির ওপর। হামজাকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে যাবার পথে তার পায়ের গতি শ্লথ হচ্ছে। আবার একটা দ্বিধার টান। আরমিণের সেই ধিক্কার কানে বিছার মতোন দংশন করলে জয়ের চিত্ত দুই ভাগে বিভক্ত হলো, চিড়ে গেল।-'নিজের রক্তের সাথে বেইমানি করা জয় আমির, আমি আপনাকে ভয় পাই না।'

জয় রাস্তার ওপর পাগলের মতো মাথার দু'পাশ চেপে ধরে গলাকাটা মুরগীর মতোন ছটফট করতে লাগল। আজ সে পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে হামজার কাছে যেতে পারছে না নাকি? কেন? দ্বিধার শিকলে পা বন্দি? কোন দ্বিধা? জিন্নাহকে যদি হামজা মেরে থাকে! জয়ের মনে হলো তার দেহটাকেও দুই ভাগ করে ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। জান্তব আর্তনাদে গুঙরে উঠল ফুটপাতের ওপর পড়ে।

বাসের ভেতরে তো সে অজ্ঞান হয়নি, তাহলে এতদূর যাত্রা করল, গন্তব্যে এসে বাস থামল, তাকে ডাকা হলো, সে টের পেল না কেন?

সে কোথায় ছিল? মৃত্যু এসেছিল? সে সবসময় দুটো সিট ভাড়া করে বাসে ওঠে। তার পাশের সিট খালি ছিল। মৃত্যু কি এসে আজ সেখানে বসেছিল তার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে? তাহলে সঙ্গে নিলো না কেন? আর কত ছলনা করবে সে জয়ের সঙ্গে?বাড়ির সীমানায় ঢোকার আগেই সে অভ্যস্ত রূপে ফিরল। জয়কে দেখে ছেলেরা ওকে ঘিরে ধরে হুটোপাটা লাগিয়ে দিলো, 'ভাই ভাই ভাই...ভাই' রব উঠে গেল। হামজা ভাই হাসপাতালে। কী ভয়াবহ খবর! তাদের রক্তে আগুন লেগে গেছে। কার এমন দুঃসাহস! রাজত্ব তাদের, সেখানে থোরাই তারা আর

কারও সামান্য নাচাকুদাও করবে! আর তো স্বয়ং হামজা ভাইয়ের ওপর হামলা। রক্তের ওপর সেতু তৈরি করা হবে, সেতু।

জয় হাসল, "এত ক্ষেপছিস কেন তোরা? কঞ্চির খোঁচা খাইলে পরে চাপ্পরের কোপ লাগানো কমবেশি জায়েজ মনে হয়। ম্যালাদিন সব চুপচাপ ছিল, আমি ঠিক এনার্জি পাচ্ছিলাম না হাত গরম করার। আক্রমণ পাপ, প্রতিক্রিয়া বৈধ। ড্যাগ নামায়ে আন্। পিকনিক হবে আজ। ডিজে লাগা পাড়ার লোক যাতে ঘুমাইতে না পারে আর মিউজিক ছাড়া অন্য কোনো আওয়াজও না শোনে।

শেষরাতে রওনা দেব ইলা-রাজধানী। জয় বাংলা!"

ইশারায় রতনকে একটু একান্তে ডেকে বলল, "আমার ভাই বিরাদাররা লাস্ট কবে মাংস খাইছে রে!"-"ওই কুত্তাগুলা, ভাই?"

-"কুত্তা কী রে শালা? মেহমান ক মেহমান।"

জয় এক একে বোতাম আলগা করে গায়ের শার্টটা খুলে ফেলল। গরম লাগছে। খালি গায়ে শুধু তার লকেটওয়ালা চেইনটা বুকের ওপর পড়ে রইল। রতন খুব উৎসাহের সাথে জানায়, "আপনের কথামতোন ওগোরে দুই-তিনদিন পর খাওন দেই। আইজ চাইরদিন

ভুখা শালারা! সামনে আস্ত হাতির বাচ্চা পাইলেও খাইয়ালাইবো।”

-“সো স্যাড, রতন। হাতির বাচ্চা না, আস্ত একটা হাতি খাইয়ালাইবো–এই আশা ছিল আমার। তুই হতাশ করলি রে আমায়! এইজন্য পরের জন্মে তুই বান্দর হয়ে জন্মাবি। তোর পাছা হবে জবা ফুলের মতোন লাল টকটকে। ফুউউ!”

রতন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। জয়ের ফুঁক কতটুকু কাজে লাগার মতো তা রতন জানে না। কিন্তু টেনশন হচ্ছে খুব। জয় ওয়ার্কশপের অফিসরুমে ঢুকল। দুটো ছেলেকে ডেকে নিয়ে হাজার পাঁচেক টাকা ধরিয়ে দিয়ে বলল,

“প্যাকেট কয়েক মোমবাতি, চার্জার লাইট আর খাবার কিনে নিয়ে আমার বাপের গেরে যা।”

রতন জিজ্ঞেস করে, “ভাবীরে রাইখা আইচেন, ভাই?”

-“আম্মা ডাকবি, আম্মা। ভাবী শব্দডা ভালো না।”রতন আপত্তি করল, “ভাই ভাবী কেমনে আম্মা হয়? আপনে আমাগোর ভাই, ভাইয়ের বউ ভাবী লাগে ভাই।”

জয় চোখ তুলে তাকায়, “তাইলে আমায় অহন থ্যাইক্কা আব্বা ডাকবি।”

রতন শুকনো মুখে ঘাঁড় চুলকালো। জয় বলে দিলো, “বাড়ির বাইরেই থাকবি দুইজন। দুই

চাইরডা শাবল, ছোরা হাতের কাছে রাখিস। ভেতরে ঢোকার কথা ভাবিস না। হারাম, বুঝেছিস?''

জয় দ্রুত ওদেরকে বিদায় দেয়। বড়ঘরে যেতে হবে তাকে। বহুত কাজ এখন। ক্লান্ত শরীরে সিঁড়ি দিয়ে উপড়ে উঠতে উঠতে একটা গান ধরল সে—

এক মুঠো স্বপ্ন চেয়ে হাত বাড়িয়েছিলাম
জীবন ছিল বড় বেরঙ, শুধু হারিয়েছিলাম,
আলোর দিশা হয়ে তুমি এলে, আমি.........
....কত রাত জাগা-কত দিন গোনা,
সেই নতুন ভোরের আশায়..দরজা খুলে গেল হুড়মুড়িয়ে। একখানা নেভিব্লু রঙা শাড়ি পরে

দাঁড়িয়ে আছে রিমি। জয় দেখল খুঁটে খুঁটে রিমিকে। চোখদুটো গর্তের ভেতরে ঢুকে গেছে। কালো হয়ে দেবে গেছে অক্ষিকোটর। অথচ আজ রিমির যেন আগের সেই স্নিগ্ধ-সুন্দরী কমবয়সী রিমি হবার প্রচেষ্টা! এই মেয়েটার সাথে জয়ের সম্পর্ক জটিল। ইঁদুর-বিড়ালের মতো বা আরও কিছুটা অন্যরকম। জয় কি ম্লান হাসবে আজ রিমিকে দেখে? না, তা জয়ের ঠোঁটে অতিরিক্ত বেমানান। রিমিকে সে যে খবর শোনাবে, তার আগে সে রিমিকে একটু চাঞ্চল্যপূর্ণ-জ্বালাতন করবে। তাই সে খোলা শার্টখানা ঘাঁড়ে বাঁধিয়ে দাঁত বের করে বেহায়ার মতো হেসে গান গাইল,

ভাবী আমার জানেরই জান, পরাণের পরাণ
ভাবীর মাইরে...কিইন্না দিমু সুপারী আর পান..
ভাবী স্কুলে যাইবো... থুক্কু থুক্কু। সরি।
একশট্রিমলি সরি ভাবী।

রিমি কিন্তু একটুও হাসল না। নিস্তেজ গলায় বলল, "প্যান্ট টেনে তুলুন।"জয় চমকে উঠার ভান করে। দেখে তার প্যান্ট বিপদসীমার নিচে নেমে যাবার পথে। কিন্তু কোনো ব্যাপার না। জাঙ্গিয়া তো আছে। রিমি কী বোঝাতে চাইছে? তার স্বামীর জাঙ্গিয়া জয়ের পরনে, এটার খোঁটা দিলো?

জয় এর প্রতিবাদে কিছু বলার আগেই রিমি সেই একই রকম স্বরে বলল, "এমপি সাহেব

এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে। যদিও আপনি জঙলি, অসভ্যতাকেও ছাড়িয়ে গেছেন, তবু জানালাম। সম্মানিত মানুষ, এভাবে উনার সামনে গিয়ে না দাঁড়ালেই পারেন।"

জয় ভ্রু কুঁচকে দুই সেকেন্ড রিমিকে দেখে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে এনে ম্যাগাজিন খুলতে খুলতে রিমির কানের কাছে একটু ঝুঁকে বলল, "হাগতে গেলে কি অযু করে টয়লেটে ঢোকেন?"

রিমি অসন্তুষ্টিতে চোখ বুজল। জয় ম্যাগাজিনে বুলেট ভরতে ভরতে ফিসফিস করে বলে, "শক্ত হয়ে দাঁড়ান। ভেতরে ঢোকার আগে আপনাকে একটা ক্যাঙ্গারু নিউজ দেব। যেটা

শোনার পর আপনি ক্যাঙ্গারুর মতোন লাফাবেন। রেডি?''রিমি নিষ্প্রভ গলায় বলল, “আপনার ভাই আজকে দিনাজপুর ফিরছে না, তাই তো?''

জয় স্থির চোখে তাকিয়ে শুকনো হাসে, “না আসতাছে তো না-ই। উল্টা হাসপাতালে শুয়ে আমার-আপনার অপেক্ষা করতাছে। তৈরি হন। মিটিং শেষে রওনা দেব। আপনার স্বামী খুব সেলফিশ লোক। আপনি বলে সংসার করতেছেন। আমি হলে জীবনেও করতাম না।
''

রিমি শরীরের ভর হারালো যেন। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। জয় শিস বাজাতে বাজাতে

পিস্তল ফের হোলস্টারে গুঁজে ভেতরে ঢুকে উচ্ছ্বাসিত স্বরে বলল, “আরেহ মামা! শান্তি বর্ষিত হোক আপনের উপরে-নিচে সবখানে। আপনার সাথে সাক্ষাৎ করব বলে আইজ কয়ডা দিন ঘুম হয় না। তাই রাতে ঘুমাই।” এমপি সাহেবসহ নয়জন লোক বসে আছে বসার ঘরে সোফায়। বিভিন্ন রকম নাশতা, শরবত ইত্যাদি পরিবেশন করা হয়েছে। জয় গিয়ে একটা সোফায় বসে পড়ল ধুপ করে। খালি গা। চেইনটা ঝুলছে বুকের ওপর। রূপোর তৈরি J অক্ষরটি জ্বলজ্বল করছে লকেট হিসেবে।রিমি নড়বড়ে পায়ে এসে

দাঁড়াল। জয় শীতল চোখে তাকিয়ে আদেশের স্বরে বলল, “ভেতরে যান।”

রিমি সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিয়ে চলে যায় দ্রুত। শব্দ এখনও তার সাহস হয়নি জয় ও হামজার এই নজরকে অগ্রাহ্য করার। শব্দ করে দরজা আটকানোর শব্দ আসে রিমির কক্ষ থেকে।

জয় কানে আঙুল দিয়ে গা মেলে বসে হাসল, “সব ঠিকঠাক, মামা?”

সেই মুহূর্তে কোয়েল কোত্থেকে যেন দৌড়ে এসে খামচে ধরল জয়কে, ফুঁপিয়ে উঠল, “কোতায় থাকো? কোতায় থাকো তুমি? আমি দিখি না কেনু তুমাকে? আমার চলকেত কে

এনে দেবে? বাবা তো আতে না চলকেত নিয়ে। এবার আছলে আমি দেখাই কলবো না। মামাও আসসে না কয়দিন। আমি কী খাব? কাছছাথে খেলবো? এখানে কিন্তু আমি আল থাকব না। হুহুহ্!''জয় খামচি খেয়েও হাসছিল বলে কামড় দিলো হাতের ওপর কয়েকটা। তবু বেয়াদব জয়ের হাসি থামছে না দেখে বড় হাতিয়ার ব্যবহার করল। থুতু ছিটালো জয়ের গায়ে, "তুপ। হাসবি না, থয়তান জয়। ছুপ করে সোনো আমার কতা। "

দু এক ফোঁটা থুতু পড়ল জয়ের গায়ে। জয় গাল চিপে ধরে দাঁত কিড়মিড় করে টেনে

তুলে উরুর ওপর বসালো। হেসে দুই হাতের বাঁধনে জড়িয়ে নিলো। তখনও কোয়েলের দূর্বল আক্রমণ চলছে তার শরীরে। একসময় কোয়েল ক্লান্ত হয়ে কোলের ওপর ঘুরে বসে গলা জড়িয়ে চেপে ধরে জয়কে। ঘাড়ে দু-একটা ছোট ছোট কামড় বসায়। জয় পিঠে হাত বোলায়, আবার ঝুঁটি নেড়ে জ্বালাতন করে।

এমপি সাহেব প্রসঙ্গে এলেন। নিখুঁত চতুরতার সঙ্গে বললেন, "কামরুলকে মেরে দিলা। ওর বউ-বাচ্চা দুই বেলা এসে কেঁদেকেটে যাচ্ছে আমার কাছে। কী করলা কও তো!"জয় শুধুই হাসল মেঝের দিকে

চেয়ে। এমপি শুনতে চাইছেন–জয় তার স্ত্রীকে বাঁচাতে তাঁর সামনেও নিজে খুনের দায় নেবে। তখন তিনি বলবেন, বাপ্পী ও রবিউল কিন্তু এখনও জীবিত... কী হয়েছে সব জানেন তিনি।

জয় সেই সুযোগ দেবার লোক নয়। সে কিচ্ছু বলল না, শুধু হাসল। এমপি জিজ্ঞেস করলেন, “কী হয়েছিল এমন? একটা তাজা প্রাণ। এমনে পার্টি চলে? কামরুলরে মাইরচিস ক্যান, তুই?”

-“বাপ্পী আর রবিউল কয় নাই? ওদেরকে ছাড়লামই যাতে সবটা আপনাকে কইতে পারে ভালোমতোন।”

এমপি সাহেব জয়ের জাঁদরেলপনায় ক্রূর নজরে দেখলেন একবার ওকে। নাটকীয়তা থেকে বেরিয়ে চারপাশে নজর বুলাতে বুলাতে ঠোঁটে একটু অন্যরকম হাসি টেনে বললেন, "তোর ঘরওয়ালির অনেক প্রশংসা করছে ওরা। তারেই দেখতে বাড়ি বয়ে আসা। কই সে? খুব দুঃসাহসী, শুনছি।"

জয় কোয়েলের কচি হাতদুটোর সাথে খেলতে খেলতে নিঃশব্দে হাসে, "বাড়ির বউকে এভাবে দেখতে চাওয়া ঠিক না, মামা। ব্যাপারটা ভালো না।"এমপি সাহেব ঝুঁকে বসে নিচু আওয়াজে বললেন, "খারাপ কিছু কি করছি এখনও? একবার দেখতে

চাইতাছি। মামা বইল্যা ডাকোস, মামারে বউ দেহাবি না?”

-“না, মামা। আর বইলেন না কথাডা। এইসব কথা বারবার উচ্চারণ করা ঠিক না।”

এমপি সাহেব হো হো করে হেসে উঠলেন, “দেহো কী কয়। এই চ্যাংরা! তুই বুজস না আমি তোরে কত্ত ভালোবাসি? নইলে এমনে আইসে ছোট চ্যাংরাগো মতো আবদার করতাম? আর আমি জানি তুইও আমারে ভালোবাসিস। ভালোবাসায় মানুষ জান কুরবানী দেয় রে জয়।”

-“ভালোবাসায় জান কোরবানী নেয়ও, মামা।”

-তুই কার কুরবানী নিবি? জান কুরবানী দেয়ার নিয়ম ভালোবাসায়। আর তো বউ!''
-“ভালোবাসায় জান কোরবানী দেয়, বউ দেয় না।''-“ওরে ওরেএ, রাজনীতি জুয়া রে জয়, জুয়া। সব কিছু বাজী ধরতে হয়। আইজ তর বউরে দিবি না, আমি আমার চ্যাংরাগোরে গোর কী বুজাবো? ওরা তর বউরে চায়।''
জয় বসা থেকে একটু উবু হয়ে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে শব্দ করে মুজেল চেপে ধরে রি-লোড করে বলে, “কোন ভ্যাড়াচ্চু_দায় চায়? কার মরণের চুলকানি উঠছে, মামাহ্?''
-“কয়জনরে মারবি তুই?''

-“বউ চায় কয়জন?”

হেসে মাথা দোলান এমপি, “জয় রাজনীতির সবচাইতে বড় নীতি হইলো গিয়া–দুনিয়ার সব জাহান্নামে যাক তবু দলের সাথে বেইমানী করা চলবো না।”

-“রাজনীতির সবচাইতে বড় নীতি হইলো–নীতির খেলাপি।”

-“জয়, দলের এক চ্যাংরা মরছে, তুই জয় না হইলে কী হইতো ক তো, আব্বা? তোর এই বাড়ি এতক্ষণ খাঁড়া থাকতো এমনে? তুই জিন্দা থাকতি? অথচ আমি তোর সাথে দেখা করতে আইচি। আলাপ-আলোচনা করে কী হয় করা যাবে।”জয় ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসে,

“আমাকে আপানার দরকার, মামা। আপনি জানেন আমি কী। কিন্তু আমার আপনাকে দরকার নাই। অবশ্য কথা আলাদা–যদি কামরুল আমার চাইতে বেশি....”

-“না না না। ও কথা মুখেও আনিস না, আব্বা.... তুই আমার...”

-“আপনিও আর মুখে আইনেন না আপনার ওই কথা।”

এমপি সাহেব মুচকি হাসলেন। তিনি কি জানতেন না জয়ের সাথে আলাপ করে কী হবে? সব জানা তার। তিনি মাথা দুলিয়ে হেসে জয়ের কাধ চাপড়ে সাব্বাসি জানিয়ে বললেন, “আমার বাঘের বাচ্চা, তুই জয়।

আমার ছেলে তুই। তোর কথাই রইল, যাহ্। তুই যখন চাস না, আমি বউমারে কোনোদিন দেখতেও চাইব না। কিন্তু এখন যা বলব, তা যে তোরে করতে হইবো, আব্বা।''

জয় হ্যাঁ-না কিচ্ছু বলল না। কোয়েল বোধহয় ঘুমিয়ে পড়বে অল্পক্ষণের মধ্যে। সে পরম স্নেহে কোয়েলের পিঠে হাত বুলাতে লাগল। দুটো চুমু খেল।

এমপি সাহেব শুধান, "কই থেকে আসতেছিস?''-"এক কাস্টমারের বাড়ি গেছিলাম মাল পৌঁছাইতে।''

-"কোনদিক দিয়ে বাড়িত্ ঢুকলি?''

-"ডানদিক।''

এমপি সাহেব হাসলেন, “বামে তোর শশুড়বাড়ির লোক খাঁড়ায়ে আছে।”
জয় চোখ তুলে তাকায়, হেসে ফেলে নিঃশব্দে।
-“ওদের সাথে যাইতে হবে তোর।”
জয় সামান্য শব্দ করে হেসে উঠল। এমপি সাহেব একটু সিরিয়াস হলেন, “না, জয়। যাওয়া লাগবে। রেপুটেশন ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট।”-“এক খুনে পুলিশ চলে আসছে? দিনকাল এত ভালো চলে আসছে? এক রাইতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা পাই গেছে দ্যাশে? এইবার আমার মতো পাপীর কি তাইলে রোজ গোয়ামারা যাবে, মামা?”

-“তোর বিশ্বাস আমি তোরে এক কামরুলের খুনে জেলে যাইতে দেব? তাও তো খুন তুই করিস নাই।”

জয় ভ্রু জড়ায়। এমপি বললেন, “তোর নামে এফআইআর হইছে। গ্রেফতারি পরওয়ানা জারী হইছে। ওরা অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট নিয়ে এসেছে।”

-“তাইলে দূরে দাঁড় করায়ে রাখছেন ক্যান? ছিঃ! আমার আত্মীয় তারা। আমার বাড়ির কাছে এসে এভাবে বিনা আপ্যায়নে ফিরে যাবে না। এএএ রতন, কাওছার.... আমার মেহমান আসছে, ভিতরে ডাক...”

-“ওরা আজ ফিরে যাবে না, জয়। তোকে সাথে নিয়েই যাবে। শোন আমার কথা একটু ঠান্ডা মাথায়।”

জয় শান্তচিত্তে মাথা দোলায়, “ওদেরকে আসতে বলেন ভেতরে। চা-নাশতা করুক। পাটোয়ারী বাড়ি ওদের নিজেরই বাড়ি।

”দু’পাশে মাথা নাড়েন এমপি, “এক রাত হইলেও সেলের ভেতরে থাকা লাগবে তোর। তোর মনে হয় আমি তোরে বেশিদিন ভেতরে থাকতে দেব? অন্তত একটা ফটো তোলা অবধি ভেতরে যাওয়া লাগবে।”

-“এক সেকেন্ডও না। আমি রাজধানী যাব। বড়সাহেব হাসপাতালে। অলরেডি ঘন্টা ছয়েক অভার।”

এমপি একটু হাসলেন, “আমি অপেক্ষা করতেছিলাম সংবাদটা তুই কখন দিবি আমারে। দিবিই কি না!”

জয় সেসব অগ্রাহ্য করে রিমিকে ডাকল, “ভাবেইই? আপনে রেডি? মামা, আমি বড়ঘরে যাব। গেলে চলেন। মিনিট বিশেকের কাজ আছে।”

-“এখন না, জয়। আগে ঘুরে আয়। তারপর সেসব তো তোরই করা লাগবে। এখন আর পাপের বোঝায় নতুন ভার চাপাস না।”জয়

উঠে দাঁড়াল। এমপি সাহেব হাত চেপে ধরে বসান, "শোন, তোর রেপুটেশন নষ্ট হলে তুই শেষ। জোর করে তুই পাবলিককে হাতের আন্ডারে রাখতে পারবি ঠিকই, তবে বেশিদিন না। জনগণের ভেতরে বিদ্রোহের পোকা বেশি থাকে। রেপুটেশন ইজ দ্য পিলার অফ পলিটিক্স।"

-"আমার রেপুটেশন নষ্ট হবার চান্স নাই, মামা। কারণ জয় আমিরের রেপুটেশন কোনোদিন ক্লিন ছিলই না। আপনে কইতে চাইতাছেন আমি সেলের পেছনে দাঁড়াব, শালা-সম্বন্ধিরা দাঁত বাইর করে আমার ফটো তুলবে। তা কাইল সকালে নিউজ-ফ্রন্টলাইন

হবে– দিনাজপুরের একজন বিশিষ্ট ছাত্র সভাপতি হোগা মারা খাইছে। মামা পাগল হওয়া যাবে না, পাগল হলেই সমস্যা।"

-"কার এত সাহস? আমি না চাইলে কেউ তোর ছবি ছাপাবে না। কোনো টিভি চ্যানেলে দেখানো তো দূর।"

-"চলেন বড়ঘরে যাই। ঘুরে আসি একবার। ওসব প্যাঁচাল বাদ। খুব বেশি দরকার পড়লে সরাসরি ক্রস ফায়ার করতে বইলেন। বন্দিত্ব আমার পোষায় না। হোক সে এক রাত অথবা এক সেকেন্ড।"

-"তুই জানিস কী হইছে? তুই যতটা সহজভাবে নিচ্ছিস ততখানি সহজ নাই

ব্যাপার। বিরোধী দলের একজন সিআইডি অফিসার তুমার পেছনে পড়ে আছে। ভাব এবার। এবার ত্যাড়ামি করলে থাপ্পর মারব একটা কান বরাবর।''-“সে কে? একবার দেখা হলো না তো! একটা কোলাকুলি তো অন্তত করা দরকার। বাহাদুর অফিসার।''
-“আমার হেফাজতে আছে। আমি কতক্ষণ ঠেকাবো তাকে? তুই রিসেন্ট নয়ডা মার্ডার কেইসের সাসপেক্ট আর কয়েকটার প্রমাণ সিআইডির হাতে। পাগলামি তুই করতেছিস।
''

-“আচ্ছা, জেলে যাওয়াটা খারাপ কিছু না। বড়সাহেবকে নিয়ে দিনাজপুর ফিরি, তারপর

দুইদিন বনভজন করে আসব শশুরবাড়ি। কোনো সমস্যা নাই।”
-“জয়, কথা বেশি বলা ভালো না। তোর দলের এক চ্যাংরা, কী জানি নাম? ওইডা তো পুলিশ কাস্টডিত্।”
-“কবির।”
-“আইজ রাইত্রে যাবি, কাল সন্ধ্যা হইতে না হইতে, চব্বিশ ঘন্টার আগে তুইসহ সেও খালাস। তারপর বড়ঘর সাফ করাও লাগবে। তোরে জেলে রাখলে আমার চলবে?”
জয় চুপচাপ কোয়েলকে নিয়ে উঠে গিয়ে তুলির রুমের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে এলো। রিমির দরজায় নক করলে রিমি দরজা খুলতে

দেরি করে।সে অপেক্ষা না করে নিজের রুমে ঢোকে। আলমারী খুলল। তার ও হামজার রুমের দুটো আলমারী দুটো কাস্টমাইজ সিস্টেমের। নিচের দিকে লকারের নিচে আলাদা আরেকটা সেকশন আছে। সেখানে অস্ত্র রাখার হোল্ডার ছাড়াও আরেকটা ইন্টেরিয়র আছে। সেখানে তার বেশ কিছু প্রিয় ছোট-বড় অস্ত্র রাখা থাকে। সেখান খুব আশ্চর্যজনকভাবে একদম অন্যরকম একটা জিনিস রাখা আছে। একটা সাদা-গোলাপি রঙা ওড়না। সে সেটাই আগে বের করে কাঁধে ঝুলিয়ে নিলো। এরপর লকার খুলে তিন বান্ডেল টাকা বের করল। লাখ দেড়েক হবে।

তার রুমে এতটুকুই আছে। এরপর নতুন একটা সিগারের প্যাকেট, দুটো ছোট ছোট ছোরা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিলো। শেষে একটা নতুন শার্ট গায়ে দিয়ে রিমির কাছে গেল। রিমির চোখমুখ বদলে গেছে। এমনিতেই প্রাণ ছিল, এখন প্রেতাত্মার মতো নিথর লাগছে। জয় এক টুকরো শুকনো হেসে বলল, "ঘরে মাল আছে কত?"

রিমি আলমারী খুলে দিয়ে সরে দাঁড়ায়। জয় আরও কয়েক বান্ডেল নিলো সেখান থেকে। রিমিকে বলল, "তুলিকে সাথে নিয়ে যাবেন আপনি।"রিমি আঁৎকে ওঠে, "আপনি সাথে যাবেন না?"

জয় হেসে ফেলল, “বাপরে! এমন ভাব করছেন যেন আমার সঙ্গ আপনার জন খুব নিরাপদ, আরামদায়ক? ভুলবেন না, ভাবী-দেবর হিসেবে আমি-আপনি দুঃসম্পর্কের লোক। আমদের বনিবনা ভালো না।”

রিমি ব্যাকুল স্বরে বলে, “রসিকতা করবেন না। গা জ্বলে আমার। আপনি সাথেই যাবেন। কী বানিজ্য পড়ে গেছে এমন? আপনি এখনই যাবেন। আমি...”

-“না। আমি পরে আসব। আপনারা যাবেন... আমি ব্যবস্থা করে দিয়েই মরব। এইটাই তো ডিউটি জয়ের।”

রিমির কি গলা ভেঙে এলো? সে কেমন যেন জয়ের কাছে নিজেকে ঢেলে দিলো আজ, “আপনার কতটা দেরি হবে? বেশি দেরি না হলে আমি অপেক্ষা করব। কার সাথে যাব আমরা আপনি ছাড়া?”-“আমি চিরকাল থাকব না আপনাদের সবাইকে টেনে নিয়ে বেড়ানোর জন্য। আমি ছাড়া চলতে শেখেন। উপকার আপনাদের। কোনো সমস্যা হবে না। বিশ্বস্ত লোক নিয়ে যাবে।”

আকুতির মতো শোনায় রিমির স্বর, তা গলা থরথর করে কাঁপে, “আপনার ভাই আপনাকে না দেখলে আরও অসুস্থ হবে।”জয় অদ্ভুত হেসে বেরিয়ে যায়। রিমির কেমন একটা

অস্থির লাগল। রিমি হু হু করে কেঁদে উঠল আবার। জয়কে তার চিৎকার করে ডাকতে ইচ্ছে করে। বিয়ের পর সবচেয়ে বেশি লড়াই সে যে লোকটার সাথে করেছে, সেই লোকটা তার দ্বিতীয় ভরসাস্থল। তার স্বামী হাসপাতালে, জানা নেই কী হাল! রিমি এই চলতিপথে কী করে নিজেকে সামলাবে, যদি জয় আমির সাথে না থাকে, ধমকে চুপ না করায়!

কিন্তু জয়ের হাতে সময় নেই। তাকে প্রস্তুত দেখে এমপি সাহেব বড় প্রসন্ন হলেন। তার এক ইশারায় মিনিট কয়েকের মধ্যে বৃষ্টির

মতো ঝমঝমিয়ে আইন কর্মকর্তারা এসে ভরে গেল পাটোয়ারী বাড়ির ড্রয়িং রুম।
এরা কোথায় ছিল এরকম জটলা বেঁধে? সে এতটাই আনমনে, ভাঙা চিত্তে ঘোড়াহাঁট থেকে ফিরেছে, তার চতুর চোখদুটো নিমজ্জিত ছিল তখন অন্য জগতে। এমনকি তার ছেলেরাও কিছু টের পায়নি। জয় কিছু বোঝে, একটু দ্বিধায় পড়ে, তারপর মাথা ঝুঁকিয়ে হাসে।
একজন হাতে হাতকড়া পরাতে লাগল, আরেকজন তল্লাশি শুরু করল। পিস্তল, ছোরাসহ বেশ কিছু অস্ত্র এক নিমেষে বেরিয়ে এলো। জয় সিগারেরে প্যাকেটটা নিতে দিলো না।এমপি সাহেব কপাল টিপলেন। একটুও

ভয়ডর নেই কোথাও! জয় তার কাছে এক রত্ন বৈকি! তবু...

টাকা গুলো কর্মকর্তাদেরকে অবাক করল। জয় বলল, "ওইগুলা সাথে নেন। আপনাদের জন্যেই। তোহফা, তোহফা। পকেট গরম তো মন নরম। ঠিক না, স্যার?''ইন্সপেক্টর কটমট করে তাকায় এমপির দিকে। এমপি চোখের ইশারায় থামান। রিমি ও তুলি হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রিমি অন্তত কখনও এ বাড়ির কাউকে পুলিশের হাতে যেতে দেখেনি। সে বুঝতে পারে না এসব কী হচ্ছে। তার স্বামী কি দূর্বল হয়ে পড়েছে? কী থেকে কী হচ্ছে, চলছে? রহস্যময় লাগে তার, সাথে ভয়াবহও।

ছেলেরা বাকহীন হয়ে চেয়ে রইল। হাত কিড়মিড় করছে কেউ কেউ। জয় ওদের পিঠ চাপড়ে বলল, “বড়ভাবী আম্মা আর আপাকে পুরান ঢাকা নিয়ে যা। আমি আসছি। মামা, একটা গাড়ি দ্যান ওদেরকে।”

এমপি বাধ্য ছেলের মতোন তীব্র বেগে মাথা নাড়ে, “ওসব চিন্তা তোর ক্যান? ওসব আমার জিম্মা।”হাতকড়ার দিকে তাকিয়ে জয়ের হাসি পেল। তার হাতে বন্দিত্বের শিকল খুবই বেমামান। সে মুক্ত বাজ, দক্ষ শিকারী, তাকে শিকার করা দুঃসাধ্য।

সে চারদিকে তাকাতে তাকাতে সে বেশ কয়েকবার জোরে ডেকে উঠল, তরুউউওহ্! তরু...''

কিন্তু তরু ছুটে বেরিয়ে এসে জয়ের সামনে দাঁড়াল না। তবু জয় আরও কয়েকবার গলা ফেঁড়ে ডাকল, যেন তরু শুনতে পায়নি, এবার শুনতে পেয়ে আসবেই আসবে।

তুলির কিন্তু বুক মোচড় দিয়ে উঠল। সে রুখে গিয়ে জয়ের হাতখানা চেপে ধরে বলল, "ওভাবে ডাকছিস কেন, জয়? শুনতে কেমন যেন লাগছে। যা তুই, যাহ্ তো। তুই পাপী, তোর পথে তুই যা। এসব তোদের জন্য না।''

জয় দুই হাতের বাহু ফাঁক দিয়ে তুলির গলায় মালার মতো হাত ঢুকিয়ে ঝুঁকে বলল, “এইবার ফিরে আগে তোরে বিদায় করব বাড়ি থেকে। তোকে সহ্য করা যাচ্ছে না।”জয় বেরিয়ে যাবার সময় আবার একবার পেছন ফিরে বেহায়ার মতো হাসল। আজ তাকে কারাবরণ করতেই হতো। এর কারণ অনেকগুলো। কবীর আজ ক’টা দিন আঁটক। এটা সহ্য করা জয়ের জন্য সহজ নয়। দ্বিতীয়ত এমপির ছেলেরা কামরুলের খুনী–জয় আমিরের স্ত্রীকে চায়। তৃতীয়ত পুলিশ বাহিনী যখন তাকে গ্রেফতারের ওয়ারেন্ট হাতে পাটোয়ারী বাড়ির দোরগোড়ায় এসে

পৌঁছে গেছে, মানে নিস্তারের পথ সংকীর্ণ হয়ে এসেছে।

জয়কে নিয়ে যেতেই ছেলেরা পাগলপারা হয়ে উঠল। কিন্তু হামজা ভাই হাসপাতালে। তাদের জন্য এখন সেখানে পৌঁছানো অতি জরুরী। এমপি সাহেব একটা নিজের ব্যবহার্য টয়োটা দিলেন। তুলি ঘুমন্ত কোয়েল ও রিমিকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে উঠল। রিমির অবস্থা ক্রমে খারাপ হচ্ছে। তাকে তুলিরই সামলাতে হবে। কিন্তু তুলি নিজেই অস্থির। আরমিণ কোথায়? আরমিণের সুশ্রী মুখটা মনে পড়তেই তার গা শিরশির করে উঠল। আরমিণের সৌন্দর্য ভয়ংকর! আরমিণ বলেছিল তাকে হামজার

বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে। সেটা কবে, কোন পরিস্থিতিতে? সেই পরিস্থিতিই কি এগিয়ে আসছে? আরও বলেছিল, এ বাড়িতে কেউ থাকবে না। ঘটনাপ্রবাহ সেদিকেই মোড় নিচ্ছে না কি!?জয় তাকে শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে এমন অন্ধকারে রেখে গেছে কিনা অন্তূর জানা নেই। কিন্তু আমির নিবাসের এই অবরুদ্ধ নিশীথ দুঃসাহসী অন্তূকেও নাড়িয়ে দিলো। অন্তূর খেয়াল হলো, এই ইট-পাথরের বাড়িটা আস্ত এক রক্তখেকো রাক্ষসের অন্তঃগহ্বর।

কোথাও এক রত্তি আলো বা দূর অবধি জনমানবের বিচরণ নেই। অবরুদ্ধ হলরুম

অন্তূকে গিলে নেবার আনন্দে নীরবে গর্জন করছে। যা শুধু অন্তূর কানে বাজে। পেছনের জঙলি বাগান থেকে শেয়ালের সরু ডাক ভেসে আসছে, আরও কত রকম জঙলি ছোট-বড় প্রাণীর নিশীথ-চিৎকার অন্তূর শরীরের লোমকূপ অবধি কুঁকড়ে তুলল। নিজের শরীরটা অবধি দৃশ্যমান নয় এখানে। জানালা দিয়ে মাঝেমধ্যেই বাতাসের ঝাপটা আসছে। তার সাথে ভেসে এসে নাকে ঠেকছে বহুদিনের অবরুদ্ধ হলরুম ঝেঁটিয়ে আসা ভ্যাপসা গন্ধ। অন্তূর পা চলে না জানালা আটকে দিতে যাবার জন্য। সে সদরদরজার সাথে লেপ্টে বসে রইল। এই ভয়টা অন্তূকে

বড়ঘরে প্রবেশের দিন কাবু করেনি, সেদিন কেবল এক প্রবল উত্তেজনার বাজনা বেজেছিল বুকে।বেশিক্ষণ কিন্তু এভাবে চলল না। ভয়, অস্বস্তি, মানসিক চাপ ও দূর্বলতা অন্তূর গর্ভাবস্থার ওপর ভারী পড়ল। মাথাটা চক্কর মেরে উঠে পেট গুলিয়ে আসার সাথে সাথে গলগল করে বমি করে ফেলল। কোথায় ছিটে পড়ল বমি, তা দেখারও উপায় নেই। জয়ের এই নিষ্ঠুরতার নাম কী দেবে অন্তূ? আচ্ছা, জয় আমির যদি জানতো সে আজ আমির নিবাসের শেষ উত্তরসূরীকে আমির নিবাসে তার মায়ের পেটে রেখে মা-সন্তান

দুজনকেই অবরুদ্ধ করে যাচ্ছে, সে কি এই কাজ করতো? সে কী করতো তখন?

অন্তূ ঘন্টা দুয়েকও ওভাবে থাকতে পারল না অসুস্থ শরীরে। বমি করার পর গলা আঁটকে এসেছিল। তার মিনিট দশেকের মধ্যে দেহটা ধুপ করে লুটিয়ে পড়ল আমির নিবাসের ধুলোর স্তর জমা মোজাইক করা মেঝের ওপর। পড়ে যাবার আগে অন্তূর কানে কেউ ফিসফিস করে–'তুই কোন সাহসে গর্ভাবস্থায় এই শিকারী বাংলোয় পা রেখেছিস, মেয়ে? হুমায়িরা পাটোয়ারীকে জানিস তো তুই? এই বাড়ির ভয়াবহতা সম্বন্ধে কি বেখবর তুই?'

অন্তূর শরীরটা থরথর করে কেঁপে উঠল। অন্তূ এতবড় ভুল কী কোরে করে ফেলল! এটা খুব মূল্যবান দুঃসাহস! এই দুঃসাহসের মূল্য এই বাড়ি অন্তূর কাছ থেকে কোন উপায়ে আদায় করবে? এই বাড়িতে সে কি দ্বিতীয় হুমায়িরা হতে পারে না?

বিগত দিনগুলো সে নিজের ওপর যে জুলুম করে নিজেকে চালিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। এই বাড়ি তার সেই জেদ ও জীবনীশক্তি ঘন্টা কয়েকের মাঝে শুষে নিলো।এমপির বাড়িতে রউফের জায়গা হয়েছে ঘন্টা সাতেক আগে। আজ তাদের মিশন ছিল পাটোয়ারী বাড়ি। জয় আমিরকে গ্রেফতারের পরোয়ানা পাবার

জন্য তার কাছে জয় আমিরের সব অপরাধের প্রমাণ না থাকলেও যে কয়েকটা ইতোমধ্যে সংগ্রহ করতে পেরেছিল সে, সেগুলো যথেষ্ট হয়েছিল।

অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট সে থানা পুলিশের হাতে দিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সেই সময়–দুপুর সাড়ে তিনটার দিকে এমপির কাছে তার ডাক পড়ল আলোচনার জন্য। এমপি জিজ্ঞেস করেছিলেন, "জয় আমিরকে অ্যারেস্ট করার জন্য কী কী প্রমাণ আছে আপনার কাছে? "রউফ হেসে বলেছিল, "আমি আপনার কাছে সেই জবাবদিহি করতে বাধ্য নই, এমপি সাহেব। ইভেন আমি তো আপনার ডাকে

এখানে আসতেও বাধ্য নই, নেহাত আমি ভদ্রলোক বলে আপনার সম্মানে এসেছি। কিন্তু অবশ্যই আমি আমার কাজ সম্বন্ধে সামান্য আলোচনাও করব না আপনার সঙ্গে।''

এই অপমান এমপি সাহেব গায়ে না মেখে বরং হাসলেন, "বেশ বেশ! আপনার মতো সাহসী ও নিষ্ঠাবান অফিসার আজকাল বিরল। খুব পছন্দ হয়েছে আমার। কিন্তু আমি শুধু জানতে চাইছি ওর অপরাধ কী? আমাকে মামা বলে ডাকে, আমার খুবই খারাপ লাগছে ছেলেটার জন্য।''

-"অপরাধীর জন্য খারাপ লাগাই আপনাদের নীতি-রাজনীতি। তবে তাকে আমি গ্রেফতার

আপাতত একজন সাসপেক্ট হিসেবে করলেও সে মূলত একজন দাগী ক্রিমিনাল। তা শীঘ্রই প্রামাণিত হবে আদালতে।''-“তো কি একেবারে ফাঁসি?''

-“ফাঁসি না হলেও দীর্ঘস্থায়ী কারাবাস তো হতে পারে!''

-“পারবেন তো?''

-“কে ঠেকাবে? আপনি?''

এমপি সাহেব হাসলেন, “হামজা পাটোয়ারীকে চেনো, অফিসার?''

-“যায়-আসে না।''

-“আসে আসে। খুব আসে। মন্ত্রীদের সাথে হ্যান্ডশেইক করা স্নেহের জুনিয়র হামজা।

আমার মতো এমপির কথা না হোক, মন্ত্রীদের কথা মানতে হতেই পারে!”

রউফের মুখে কোনো হেলদোল না এলেও ভেতরে ভেতরে সে একটু চিন্তিত হয়ে গেল, এবং নিজের জীবন ও চাকরি নিয়ে তো অবশ্যই সংশয় রয়েছে।এমপি প্রস্তাব দিলেন, “আপনার বাহিনীর আগ্রাসন স্থগিত রাখুন। আমার একটু আলাপ আছে ওর সাথে। না না, ভয় পাবেন না। আমি নিজে তুলে দেব ওকে আপনাদের হাতে। বরং আমি ছাড়া ওকে আপনারা কনভেন্স করতে পারবেন বলে মনে হয় না। এক হতো যে সে শুধু জয় হতো। ও হচ্ছে হামজার কইলজার টুকরা। ওর গায়ে

হাত মারলে আপনি হামজার কইলজায় খোঁচা মারবেন। এরপর কিছুই নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। কিন্তু আমি পারব।''

এবং এখন রউফ মোটামুটি সন্তুষ্ট। জয় আমির ধরা পড়েছে। ধরাটা কঠিন ছিল না অবশ্য, কিন্তু ধরে রাখাটা কঠিন। যেটার ঝুঁকি এখনও কাটেনি। জয় আমিরকে ধরে রেখে তার শাস্তি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া অবধি সব ঠিক থাকলে তবে হয়।জয়কে হেফাজতে নেয়া হয়েছে রাত নয়টার দিকে। রউফ কায়সার ঘড়ির দিকে তাকাল– এখন রাত ১১: ২৩ মিনিট।

এমপি সাহেব এখন পর্যন্ত দুটো পাইপ শেষ করেছেন। পাইপ সেজে দিচ্ছে তার কাজের লোক। তিনি ধোঁয়া টানছেন।

দ্বিতীয়বার পাইপ শেষ করে এমপি সাহেব বললেন, ‘‘আপনি এবার যেতে পারেন, নিশ্চিন্তে যেতে পারেন। জয়কে কেউ বাঁচাতে পারবে না।’’

-‘‘আপনি এখন এই নিশ্চয়তা কীভাবে দিচ্ছেন?’’

-‘‘এতসব প্রমাণ আপনার কাছে, তাও আপনি ভাবছেন ও খালাস হয়ে যাবে? আপনি নিজেই নিজের ওপর ভরসা রাখতে পারতেছেন না?’’

খোঁচা মারা কথা। রউফ এটা টের পেল, কিন্তু টের পেল না এমপির গভীর চাল। সে বিভ্রান্ত হয়েই বেরিয়ে গেল এমপির বাড়ি থেকে। এমপি চোখ বুজে নিজের আসনে বসে রইলেন।এমপি প্রায় দু'দিন পর্যন্ত জানতেই পারেননি ওঁর তিনজন লোকের কী হাল হয়েছে হামজার বড়ঘরে। তিনি তার সেক্রেটারিকে দিয়ে হামজাকে কল করিয়ে বললেন, 'এই কাজ কে করেছে?' হামজা খানিকক্ষণ পর কল ব্যাক করে বলল, 'জয় মেরেছে। বাদ দিন। এসব হতে থাকে। হয়ত মেজাজ খারাপ ছিল, কিছু ঝামেলা হয়েছে, মেরে দিয়েছে। আমি ওকে বুঝিয়ে বলব।'

ডাহা মিথ্যা কথা। কামরুলকে মেরেছে জয়ের বউ। কিন্তু দুই ভাই বাটপারি করল এমপির সাথে। কিন্তু এমপি সাহেব জানেন না–হামজা নিজেই জয়ের বাটপারির শিকার হয়েছে। জানা নেই জয় এর আগে কখনও হামজাকে মিথ্যা বলেছিল কিনা।এমপি সাহেব তো বহুক্ষণ বিশ্বাসই করতে পারেননি ব্যাপারটা। ওঁর মাথায় শুধু একটাই কথা এলো–ওটা মেয়েলোক না ঘাতকিনী? বাপ্পী আবদার করেছে ওই ঘাতকিনীকে তার চাই। ভাতিজার আবদার এমপি ফেলতে পারেন না।

কিন্তু এটা তো ব্যাপারই না। আসল ব্যাপার পরদিন এমপির গোয়ালে পোষা এক পুলিশ

জানিয়ে গেল–রউফ কায়সার হামজার বিরুদ্ধে আসা অভিযোগের নথি সরিয়ে রেখেছে। সেখানে সীমান্তর খুনী হিসেবে হামজা ছিল, এবং তার সাক্ষী ও প্রমাণও। এমপি সাহেব বিস্ময়ে হা করে ছিলেন অনেকক্ষণ। অনেকটা বাতাস গালে ঢোকার পর তিনি হুশ ফিরে পেলেন। হামজাকে তিনি আগে-পরেই ভয় পান। হামজা একটা বিচ্ছু।এই তো সপ্তাহ কয়েক আগে তিনি জানতে পারলেন, ওই বিচ্ছু সামনের সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হবে এই আসনেরই। সেদিনের বিস্ময়ের কাছে এসব কিছুই না। সেদিনের পর তিনি সাতদিন হা করে ছিলেন একাধারে। এই আসনে হামজার

প্রার্থী হওয়া মানে উনি ফিনিশ। হামজার জন্য মরণভয় জেগেছে সেদিন থেকে। তিনি শুধু অপেক্ষা করছিলেন সুযোগ বুঝে হামজার জানাজার নামাজে শরীক হবার। কিন্তু এরই মাঝে দুই ভাই উনাকে আবার হাঁ করিয়ে দিয়েছে।

সেক্ষেত্রে একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে তিনি কোনোভাবেই আর বেশিদিন ওই দুই বিচ্ছুকে দুনিয়ায় রাখতে পারেন না। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো উনার বিশেষ পরিশ্রমই হচ্ছে না। দৈববলে সব পথ তৈরিই হয়ে আছে দুই ভাইয়ের মরার, তিনি শুধু সামান্য আঙুল ঘুরাবেন।

হামজা এমনিতেই আধমরা হয়ে গেছে, এবং সেটা কাকতালীয়ভাবে আজই। সব তৈরি, তিনি শুধু দশ মিনিটে একটা ছক এঁকেছেন; তিনি উপরমহলে অনুরোধ করেছেন–কিছু বন্দি আছে হামজার হেফাজতে। তাদেরকে মারতে জয় আমিরকে এক রাতের জন্য কারাগার থেকে ছাড়তে হবে। বন্দিদেরকে খালাস করেই আবার সহি সালামতে কারাগারে চলে যাবে জয় আমির।

এমপি সাহেব আরেকটা পাইপ সেজে দিতে বললেন কাজের লোককে। জয় আবার কারাগারে ফিরবে নাকি খোদার কাছে, সেটা তিনি ঠিক করবেন।হামজা চেতনা ফিরে পেল

ভোর চারটার দিকে। শরীরে এক ধরণের অসাড়তা— চাইলেই সে তার অঙ্গগুলোকে নাড়াতে পারছে না। তার নিস্তেজ চোখদুটো কিছু খুঁজল। রুমটা অন্ধকার। সে কি পাটোয়ারী বাড়িতে নিজের বিছানায় শুয়ে আছে? রিমি কি এই অবস্থায়ও তার কাছে আসেনি?

কিন্তু টের পেল সে আসলে তার মাথার কাছে ঝুঁকে বসে ঝিমুতে থাকা জয়ের মুখটাকে খুঁজছে। হামজার প্রখর অনুভবশক্তি গন্ধে অনুমান করল সে হাসপাতালে শুয়ে আছে। আপাতত কেবিনে কেউ নেই, সে একা শুয়ে। হাতে ক্যানোলার সুঁচ ফুটানো জায়গায় এবার

টনটন করে উঠল। কিন্তু যেকোনো অঙ্গেই মস্তিষ্কের নির্দেশ দেরীতে পৌঁছাচ্ছে।ধীরে ধীরে চেতনা আসার সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে তার জীবন এসে দাঁড়াল। অন্ধকারে জীবনকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু অনুভূতিটা হামজার বুকে চাপ ফেলল। এই অন্ধকার কীসের? শেষরাতের? নাকি তার শেষ জীবনের? প্রতিকী অর্থে তো দুটোরই শেষ! তবু পার্থক্য আছে। রাত শেষ হলে আলো ফোটে, মানুষের জীবন শেষ হলে অসীম অন্ধকার।

সে জীবনের শুরুতে না খেয়ে চুপ থাকতে শিখেছিল, খাতার অভাবে কার্টুন বক্সের খাপে

লেখা চর্চা করেছে, আঘাত হজম করে কূটবুদ্ধি পাকাতে পটু হয়ে জন্মেছে। বারো বছর বয়সে জানতে পেরেছে তার কোনো পরিচয় নেই। না, আছে। সে সম্ভবত বস্তির কোনো নোংরা কুঠরিতে বড় অবহেলার সাথে জন্মানো এক অপ্রয়োজনীয় জীবন। নবজাতকের কদর বড়লোকদের থাকে, গরীবদের কাছে নবজাতক সবজির খোসা। হামজার মনে পড়ল–তার ঔরসে জন্মানো দুটো শিশু কিনা তার চেয়েও বড় অভাগা ও অবহেলিত ছিল। যাদের মা তাদেরকে ভ্রুণ থেকে মানবশিশুতে অবধি পরিণত হতে দেয়নি, বাথরুমের কমোডের নিচে ফ্ল্যাশ হয়ে

গেছে তারা।কী আশ্চর্য! হামজার শরীরটা থরথরিয়ে উঠল। তার খুব ভয় করছে, অন্ধকারটা ভালো না। জয় কোথায়? হামজা কী করে পারে জয়কে দৃষ্টির বাইরে রেখে সে এভাবে পড়ে থাকতে? তার কিছু ছিল না। পরে সে দুটো জিনিস কামিয়েছে। জয় ও ক্ষমতা। একটাকেও সে হেলায় ফেলতে পারে না।

সে চেঁচিয়ে ছেলেদেরকে ডাকতে চাইল। সে জানে বাইরে তারা অপেক্ষা করছে। দিনাজপুর থেকে কি কেউ আসেনি? তার কেউ নেই কোথাও। এজন্যই কি কেউ আসনি? কিন্তু তার ক্ষমতা আছে। সেটা

কোথায়? টুট টুট শব্দ হতে হচ্ছে, খুব দ্রুত। শেষরাতের নিস্তব্ধতায় অন্ধকার কেবিনে এই টুটটুট শব্দটা হামজাকে অস্থির করল। কীসের শব্দ এটা? কয়েক মিনিটের মাথায় কয়েকটা ছেলে নার্স নিয়ে দৌড়ে এলো। নার্স খুব বিরক্ত। শেষরাতে রোগীর সমস্যা হওয়া উচিত না। এসময় তারা একটু জিরিয়ে নেয়। হামজার হার্টবিট ১২০-২২ পর্যন্ত উঠছে। সেটা খুব তাড়াতাড়ি ১৪০ ছাড়িয়ে গেল। কিছুক্ষণ থতমত খেয়ে নার্সের হুশ এলো দ্রুত এখন অ্যাডেনোসিন পুশ না করলে খারাপ কিছু হতে পারে। অ্যাডেনোসিন পুশ করার পর হামজার মনে হলো সে মরে যাচ্ছে। তার দম

বন্ধ হয়ে এলো, বুকে ভয়ানক ব্যথা উঠে গেল। সে হাত তুলে বুকে রাখতে চেয়েও পারল না। বাঁ হাতে ক্যানোলা, ডান হাতের মধ্যমা আঙুলিতে অক্সিমিটার সেন্সর ক্লিপ লাগানো। তার জয় কোথায়? রিমি কি আসবে না?

হামজার চেনা মুখগুলোর ঢাকা পৌঁছাতে সকাল আটটা বাজল। তখন রিমি ভীষণ রকম কাহিল। মানসিক অস্বস্তি তার শরীরকেও দূর্বল করেছে। ছেলেরা গিয়ে হামজার কেবিনের সামনে নিয়ে এলো ওদেরকে। কিন্তু রিমির হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। সে কীভাবে ওই মানুষটার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে?

শেষবার যখন দেখা হয়েছিল, রিমির ভেতরে যে ঘেন্নাটা ছিল, তা এখনও আছে? থাকলে সেটার ধরণ কেমন?লোকটা ঘুমিয়ে আছে। হার্ট মনিটরিং ডিভাইসের টুট টট শব্দ ছাড়া কেবিনটা নিঃশব্দ, শীতল। রিমি দেখল লোকটার হার্টবিট ৮৮ থেকে হুট করে বেড়ে ৯৪ হচ্ছে, আবার কমে ৮৫ তে আসছে। মাথার ওপর বিশাল ব্যান্ডেজ, হাতের বাহুতেও। শরীরের বিভিন্ন স্থানের ত্বক ও মাংস ছেঁড়া, সেসব স্থানে ওষুধের প্রলেপ। প্রসস্থ লোমশ বুকের ওপর ছোট ছোট ইসিজি প্যাচ লাগানো। বিশাল দেহটা পড়ে আছে বেডের ওপর। রিমির বুকের ভেতর মুচড়ে

উঠল। এমন বিশ্রী-ভয়ংকর কোনো দৃশ্য রিমি আগে কখনোই এমন খুঁটিয়ে দেখেনি।

রিমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। কোয়েল মামার এই অবস্থায় খুবই চিন্তিত। সে বুঝতে পারছে না মামার কী হয়েছে? গায়ে এসব লাগিয়ে শুয়ে থাকার মানেটা কী? সে গিয়ে মামার কানে কানে ফিসফিস করে ডাকল, "বলোমামা, এই মামা? কী হইতে তোমাল? ওথো, আমলা আসছি। মাম্মাম আসছে, মামণি আসছে। উথবে না?"

খুব পরিশ্রমসাধ্য এক চেষ্টার পর সে উঠে বসল বেডের ওপর। প্রায় হামজার গায়ের ওপর চড়ে বসে ডাকল, "বাবাকে খুঁজতে

হবে, বুজলে? ওথো। তুমাল কি খুব বেশি অসুক হইসে? আমি তো বুঝতেছি না।”

হামজা উঠছে না দেখে পেছন ফিরে মামণির দিকে তাকায় সে। মামণির কেন চোখ চিকচিক করছে? মামণির উচিত ভেতরে এসে তার সঙ্গে মিলে মামাকে ডাকা।কিন্তু তার ডাকেই হামজার হাত নড়ে উঠল। সকালের ওষুধ দেবার জন্য নার্স এসে দাঁড়ায়। হামজা কোয়েলকে দেখে, বুড়ির মতো বেডের এক টুকরো জায়গায় বসে আছে তার মুখের দিকে ঝুঁকে। হামজার বুকের ভেতর চিনচিন করে উঠল। মৃদু হাসি দেখা গেল ঠোঁটে। অস্ফূট উচ্চারণ করল, “আমার আম্মা!”

অক্সিমিটার ক্লিপ লাগানো হাতটা দিয়ে জড়িয়ে নিলো নিজের সাথে কোয়েলকে। নার্স বাঁধা দিতে আসে। হামজা চোখের ইশারায় শুধু তাকাল একবার, ইশারায় চলে যেতে বলল। নার্স ভীত পায়ে দ্রুত বেরিয়ে যায়।তখনও হামজার চোখ কিছু খুঁজছে। একটি চিন্তিত গম্ভীর মুখ, যে এখন নার্সের সাথে গায়ে পড়ে ঝগড়া করবে, ডাক্তারকে ধমকাবে, হুমকি দেবে হামজাকে এক্ষুনি ঠিক করার জন্য, নয়ত ডাক্তারের বউ-বাচ্চা শেষ। হামজার হৃদস্পন্দন ধাই ধাই করে ১০২ উঠে গেল। সে এতক্ষণে টের পেল তার পিঠ শরীরের অন্যান্য অংশের চেয়ে অবশ।

দরজার কাছে ছিপছিপে দেহের একটি শাড়ি পরিহিতা নারী দাঁড়িয়ে। হামজা চোখ ভরে দেখে নারীটিকে, একটু শান্ত হয় ভেতরটা। হাসে অল্প, বিরবির করে বলে, “কাছে আসবে না? এখনও ঘেন্না লাগছে?”

রিমির চোখের পানি মেঝেতে পড়ে, তা দেখেও হাসে হামজা। রিমি ধীরে ধীরে এসে চেয়ারটায় বসে। রিমির শরীরের চেনা গন্ধটা হামজার নাকে প্রবেশ করে। তার রিমিকে খুব গভীরভাবে ছোঁয়ার আবেশ জাগে আচমকা।-“জয় কই?”

রিমির মুখে ক্ষোভ ফুটে ওঠে, “তার খোঁজ কেন?”

হামজার ভালো লাগল এবার একটু। রিমির জয়কে সতিন বলার যৌক্তিক কারণ আছে।
-"আমি ভেবেছিলাম তোমরা আসবে না, তার আগেই আমি..."
-"না আসাই তো উচিত ছিল। কেন এসেছি জানি না।" রিমির গলা ধরে এলো, এক চিমটে পানি জমাট রইল চোখের কোলে। হামজা হেসে ফেলল, "তুমি কেঁদে ফেললেই কিন্তু আমি বুঝে যাব কেন এসেছ।"
রিমি যেন সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে ব্যস্ত হয় কান্না লুকোতে। হামজার হাত নাড়ায়, তার স্নায়ু দূর্বল, শরীরের অঙ্গে মস্তিষ্কের নির্দেশ দেরিতে পৌঁছাচ্ছে, তার কী অসুখ হয়ে গেছে

কে জানে! তবু লোকটার সর্বোচ্চ শক্তচিত্ত নিজেকে একদম সুস্থভাবে উপস্থাপন করতে তৎপর। রিমির হাতদুটো হামজার কপাল ছুঁয়ে দেয়। এই ছোঁয়া রিমিকে কাঁপিয়ে তোলে।-"আপনি ফিরে আসুন।"

-"কোথায়?"

-"যেখানে এবং যেভাবে আমি আপনাকে পেয়েছিলাম।"

-"বোকা নারী! তুমি খুবই সুন্দরী একজন নারী। কিন্তু ধরো কখনোই আয়নার নিজের সৌন্দর্য দেখোনি আগে। হঠাৎ-ই একদিন দেখলে। তা বলে কি তুমি সেদিনই সুন্দরী হলে, আগে ছিলে না?"

রিমি হামজার হাত খামছে ধরে। হাতটা মৃদু কাঁপছে, সেই মতো রিমির বুকটাও কাঁপে। কী হয়েছে লোকটার?

-"আমি আগেও এ-ই আমিই ছিলাম, শুধু তোমার চোখে ধরা পড়েছি হঠাৎ। তার মানে তুমি আমার এই আমিকেই ভালোবেসেছ, গিন্নি।"

-"কে বলেছে আমি ভালোবাসি আপনাকে?"

-"তোমার চোখের পানিকে জিজ্ঞেস করলে তা-ই বলবে।"রিমি ছটফট করে উঠে ঠোঁট কামড়ে ধরে, "আমার সামনে আপনার এই বিশ্রী রূপ না আসলেও তো পারতো!"

-“অর্ধাঙ্গিনী মানেই তো সবকিছুর অর্ধেক অর্ধেক। পাপেরও। পালাতে চাইছ কেন?”

-“আমি আপনার পাপের ভাগ চাই না। ভালোবাসায় পাপ থাকে না।”

-“তুমি জানো না তাহলে। ভালোবাসাই তো পাপের বাপ। যেকোনো কিছুকে ভালোবাসলেই সেখান থেকে পাপের জন্ম হয়। ভালোবাসাকে পেতে মানুষ সমস্থ সীমা অতিক্রম করে। সীমার ওপারেই তো পাপ, রিমি।”

-“যেমন কোরে আপনি ক্ষমতাকে ভালোবেসেছেন।”

-“আমি তোমাকেও ভালোবেসেছি।”

রিমি তীব্র প্রতিবাদ কোরে ওঠে, “মিথ্যা কথা।
”

-“সত্যি কথা, রিমি। কিন্তু সেই ভালোবাসায় আমার অতীত ও ভবিষ্যতের চাহিদাকে কোরবানী করার শর্ত নেই।”

-“তাহলে এটা কেমন ভালোবাসা?”

-“আমি জানি না, রিমি। কিন্তু তুমি আমায় ঘেন্না কোরো না। আমার প্রয়োজন তোমাকে।
”-“আমি আপনার প্রয়োজন হয়ে থাকতে চাই না।”

-“তাহলে কী চাও?”

-“চাইলে পাব?”

-“দেবার মতো হলে যেকোনো কিছু পাবে। চেয়ে দেখো।”

কথাটা রিমি জিদে অথবা আবেশে উচ্চারণ করে বসল, “তালাক চাই আমার। তালাক দিন।”

হামজা চোখদুটো বুজে ফেলল। কিছুটা সময় তার বুকের ওঠানামা থেমে রইল, এরপর আস্তে আস্তে হাসি ছড়ালো ঠোঁটে, “তোমার অন্তরে আমার পাপের যে কালি লেগেছে, তা তালাকের কাগজ দিয়ে ঘঁষলে উঠবে না, রিমি। বৃথা চেষ্টা করে কী লাভ? মেনে নাও।”

-“অসম্ভব।”-“আরমিণের মতো কথা বোলো না। সে আর তুমি এক নও।”

-“তাকে ভয় পান? সে তাহলে সত্যিই সফল। তার মতো হতে আমায় কী করতে হবে, বলুন?”

-“আমি তার সঙ্গে যা যা করেছি এবং করব, তোমার সাথে তা হয়নি।”

-“কী করবেন? কী করবেন আপনি তার সঙ্গে?”

-“ভাবতেও পারবে না, এমন কিছুই করব। জয় কোথায়?”

রিমি চুপ করে তাকিয়ে রইল হামজার দিকে। ভীষণ সুদর্শন শক্তপোক্ত বলিষ্ঠ পুরুষ, কিন্তু চেহারায় এক ঘাতক-নীরবতা আছে। এখন দেখতে তা ম্লান লাগছে। এই অবস্থায় জয়ের

গ্রেফতারের খবর দিয়ে পরিস্থিতি বেসামাল করার সাহস হয় না রিমির।তুলি ঢোকে কেবিনে। হামজার সাথে তার সম্পর্ক ছিল অদ্ভুত। হামজার ভালোবাসা দুর্বোধ্য। সেটা কেউ পেলেও টের পায়নি। ক্ষোভও ছিল হামজার ওপর তুলির। কিন্তু এই মহাক্ষণে এসে হামজার দিকে তাকিয়ে তুলির বুক কেঁপে উঠল। তার মনে হলো যা হয়েছে তা না হলেই হতো। তুলির শুধু মনে হলো– আরমিণ কেন বলেছিল–পাটোয়ারী বাড়িতে কেউ থাকবে না? তার ধ্বংসের কতটুকু নিকটে অথবা দূরত্বে দাঁড়িয়ে?রাতটা পুলিশফাঁড়ি কাটানোর পর পরদিন সকালে

জয়কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। পরাগকেও আনা হয়েছিল সেখানে। এরপর পুলিশ ফাঁড়ির আলাদা একটি ডিটেনশন সেলে জয়কে স্থানান্তরিত করা হলো। দেশের আইনের অবস্থা জয়কে হাসালো। তাকে আজ রাতে খালাশ করা হবে, তারই প্রস্তুতি চলছে আলাদা ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে। নয়ত সে যা স্বীকারক্তি দিয়েছে এতক্ষণে আদালতে নেবার অর্ডার আসার কথা। কিন্তু সন্ধ্যার দিকে কবীরকেও পুলিশফাঁড়িতে হাজির করা হলো। জয়ের দেয়া টাকাগুলো পুলিশদের মন নরম করে দিয়েছে।

জয় বসে ছিল ডিটেনশন সেলের দেয়াল ঘেষে। তাকে দেখে কবীরের চোখদুটো গোল্লা গোল্লা হলো, অশান্ত গলায় বলল, "আপনে এইখানে কী করতেছেন, ভাই?"-"ছেহ্! ভাবলাম, তোর বিয়েডা দিয়ে মরব। তোর ওপর একটা দায়িত্ব আছে না? কিন্তু চেহারার যে হুলিয়া বানাইছিস, কোনো হিজড়াও বিয়া বইতো না তোর লগে। অবশ্য তুই চাইলে আমি একটা লেডি মানকি ধরে আনতে পারি তোর জন্য। বানর হলো মানুষের অরিজিনাল। আমি তোর জন্য কোনো বিবর্তিত প্রোডাক্ট প্রেফার করব না। মেয়েলোকের অরিজিনাল হলো মেয়ে বান্দর। বুঝলি?"

কবীর জয়ের পাশে মেঝের ওপর ঠেসে বসে অস্থির হয়ে বলল, “আপনি এইখানে ক্যান?”

জয় হাসে, “এইখানেই তো থাকার কথা আমার! পাপীকে কারাগারে দেখলেই মানুষ অবাক হবার দিন যাবে কবে রে কইবরা?

”কবীরের চোখে ভয় ও কাতরতা, সে জয়কে এখানে মানতে পারছে না। সে বলল, “বাজে কথা ছাড়েন, ভাই। আপনেরে এইখানে আনলো কেমনে শালারা?”

জয় তাকায় কবীরের দিকে, শান্ত গলায় বলে “জয় আমির তোদের সবার মহানুভবতার সামনে এক ঋণী কুত্তা? এই যে এতগুলা দিন পুলিশ হাজতে চামচিকার মতোন গড়াগড়ি

খাইলি, অথচ আমি একবার দেখতে পর্যন্ত যাই নাই, তোর ভেতরে বিদ্রোহ জাগে নাই আমার বিরুদ্ধে?''

কবীর গম্ভীর গলায় বলল, "আপনেই যদি না থাকেন, এই কবীরের বাইরে কী কাম?''

জয় বুকের বাম পাশ চেপে ধরল, "উফফ, সেন্টিমারা ডায়লোগ দিস না, বাপ। আমার বমি আসে। ওয়াক্..''

কবীর রাগান্বিত চোখে তাকায়। জয় শুকনো হাসে।

-"ভাবী ভালো আছে, ভাই?''

-"ওরে শালা বেইমান! আমি জেলে আইছি, এতক্ষণে আমারে একবার জিগাইলি না, আর

ওই শালির খবর করতাছো? কবিরাজের গাছ খাওয়াইছে তরে?''-"আমার মাফ চাওয়া বাকি এহনও।''

-"অ্যাঁহ্! কী বাবদে?''

-"কত বেয়াদবী করছি, কত অসম্মান করছি।
''

-"তখন আমার বউ ছিল না।''

-"কিন্তু সেই মেয়েটাই ছিল, এখন যে মেয়ে।''

জয় হো হো করে হাসে, "সত্যিই জাদুটোনা করছে নাকি তোরে? সর্বনাশ! ভালো মানুষের পোকা কুড়কুড় করতে দেখতেছি ক্যান আমি তোর ভেতরে, কইবরা? পুলিশের ঘা পড়লে সাপ-ও সোজা হয়ে চলে, এই নীতি কাম

কইরচে তোর ওপর? বহিষ্কার, আমার দরবার থেকে বহিষ্কার করা হলো তোকে। তুই আমার অযোগ্য শাগরেদ প্রমাণিত হইছিস।''

-"হামজা ভাই কই, ভাই? কিছু তো কন। আপনে এইখানে...''

-"তোর কী মনে হইছিল, এক তুই মুখ না খুললে জয় আমির অমর হয়ে যাবে?''

-"এইসব কথা আসতেছেন ক্যান, ভাই? আপনারে আনছে কেমনে ওরা? সাহস কি বেশি হইছে গু চাটা কুত্তাগোরে?''-"হামজা ভাই মিটফোর্ডের বেডে পড়ে আছে। তোর পেয়ারের ভাবী তার শশুড়বাড়ি। আমি আমার শশুড়বাড়ি। আর কিছু জানতে চাইলে দ্রুত

প্রশ্ন কর। আগামী আড়াই মিনিটের মধ্যে আমি ঘুমাই যাব।''

কবীরের গলা শুকিয়ে এলো। জয় হেলান দিয়ে বসে থাকে দেয়ালের সাথে। চোখ বুজে হেলান দিয়েই বলে, "তোর কাইল ছুটি, কইবরা। তোর ভাবীর একটু খেয়াল-মেয়াল রাখিস। শালীর আবার কেউ নাই, এতিম।''

-"ভাই, এইবার কিন্তু বাড়াবাড়ি হচ্ছে। বাইর হইলে আমি আপনে একসাথে বাইর হবো।''

-"তাই নাকি? আমার পাপের দশ শতাংশও তোর আছে? তোর মা কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আর তুমি নিমোকহারাম শালা

পরের চ্যাংরার জানের গ্যারান্টি হয়ে বসে আছো এইখানে?”

কবীর এতক্ষণে খেয়াল করে জয় আমিরের গলায় গামছার মতোন একখানা ওড়না ঝুলছে। কবীর লুকিয়ে মুচকি হেসে বলে, “আপনি গেছিলেন মা'র কাছে?”জয় আচমকা চোখ খুলে তাকাল কবীরের দিকে, কাধে হাত রেখে বলল, “যার পরিবার আছে, তার জন্য পরিবারের উপরে কিচ্ছু নাই, কবীর। তোর বাপ পঙ্গু, তোর মা'র একমাত্র ভরসা তুই। আমি তোর ধ্বংসকারী, মূর্খের মতোন আমার পিছনে জীবন ক্ষয় করতেছিস, তোর সৃষ্টিকর্তা

দুইজন তোর প্রতীক্ষায় বসে আছে দরজা খুলে।''

-“আপনের প্রতীক্ষায় কেউ নাই?

জয় অবাক হবার ভান করে হেসে ফেলল, “আছে নাকি? বলিস কী রে?'

-“আছে।''

-“ভুয়া কথা। আমার কোনো মা নাই।''

-“ভাই খালি মা-ই অপেক্ষা করে না।''

-“আর কেউ করে না। আমি যখন খেলতে যাইতাম, এর ওর নাক ফাটায়ে আসব, কেউ আমারে ধাক্কা দিয়ে ফেলে আমার হাঁটুর চামড়া ছিলে দেবে, এই চিন্তায় আমির বাড়ির ব্যাটার বউ আমির নিবাসের ফটকের কাছে

লাঠি নিয়ে দাঁড়াই থাকতো, কোনোদিন মারতো না। আমি আমির বংশের চ্যাংরা, আমারে মারে সাহস কার? তারপর আর কেউ করে নাই আমার অপেক্ষা।''

-''আপনে এখন আর সেই বাচ্চা নাই। এখন যার করার কথা, এই অবস্থায় মা'র চাইতেও বেশি, সে আপনারে ঘেন্না করে। এইডা তো আপনেরই দোষ, ভাই।''জয় মাথা দুলিয়ে হাসে, ''দুই চাইরডা দোষ থাকাই তো ভালো রে।''

-''আর একজন আছে। আপনে হামজা ভাইরে চিনেন? দুনিয়া উলোট-পালোট করে ছাড়বে।''

জয় চোখ বুজে হাসে, “আমার জন্য এই দুনিয়া? নাকি আমার দুনিয়া?”

কবীর অস্থির হয়ে বলল, “কী বলতেছেন?”

জয় ডাকে,“কবীর?”

-“হু, ভাই?”

-“ধর, জিন্নাহকে বড় সাহেব খুন করছে..”

কবীর ছিটকে উঠল, “অসম্ভব। হইতেই পারে না...”

মুখ চেপে ধরল জয়, “চুপ, শালা। আমি যতটা বিশ্বাস করি তাকে, তুই তার চাইতেও বেশি?”

-“হামজা ভাইয়ের জান আপনে। এইসব কথা মুখে আনতে নেই ভাই। ভুল বুঝছেন। ওই

মুরসালীন মহান জঙ্গী কিছু ভুলভাল বুঝাইছে আপনারে?''-“সঠিক কী?''

কবীরের কাছে এর উত্তর নেই। সে শুধু এই জীবনে হামজা ও জয়ের ভাঙন দেখতে পারবে না। তার আগে তার চোখ উপড়ে ফেলা হোক। জয়কে সে চিনতে পারছে না বলেই মনে হলো তার। তার শরীরের অত্যাচারের ব্যথাগুলো আর অনুভূত হচ্ছে না। এখন শুধু তার খুব বুক জ্বলছে।

-“ভাই? ভাবীরে ওই বাড়ি রাখছেন। ওইখানে ভাবীরে নিয়া থাকার প্ল্যান আছে?''

-“তুই খুব খুশি মনে হচ্ছে?''

-“খুশিই তো, ভাই। এই জীবনে আপনের একটা সংসার দেখার চাইতে খুশির আর কী হইতে পারে?”

জয় ছাদের দিকে মুখ তুলে এক চোট হাসে, “হু হু!? কার সংসার?”

-“আপনের আর ভাবীর। ভাই আপনে চাইলেই পারবেন।”

-“চাওয়া অন্যায়।”-“এত জটিল ক্যান লাগতেছে সবকিছু? ধুর!”

-“সহজ ছিল কবে, সেই তারিখটা বল।”

-“এইখান থেকে খালাশ হওয়া শুধু সময়ের ব্যাপার। তারপর যাচ্ছেন তো নিজের বাড়ি, ভাবীও ওইখানে। সব সহজ হয়ে যাবে।”

-“এইখান থেকে খালাশ হয়ে আমি ওইখানে যাব, তুই শিওর?”

কবীর উপর-নিচ মাথা দুলায়। জয় হাসল, “আমার তীর্থে যাবার সময় হয়ে গেছে রে পাগলা। বাঁচতে চাইলে আন্ডারগ্রাউন্ড হওয়া লাগবে। আর আমার সাথে যাইতে ও জীবনেও রাজী হবে না। আমাদের পথ আলাদা।”

-“তাইলে বিয়ে ক্যান করলেন?”

-“আমি করি নাই। হয়ে গেছে। বিয়ে করলে কসম ওরে করতাম না।”

কবীর ক্ষেপে উঠল, “কারে করতেন, শুনি?
”-“অন্তত ওরে না। ও সুপুরুষ ডিজার্ভ করে, কইবরা। আমি ওর জন্য না।”
-“কিন্তু ও তো আপনার জন্য।”
জয় তাকায়। কবীর মাথা দুলায়, “হ, ভাই। আপনে জীবনেও এমন কোনো চেংরিরে বিয়ে করতেন না যে কুপুরুষ ডিজার্ভ করে। আমি চিনি না আপনারে?”
জয় কথা বলে না। কবীর আবার বলে, “আন্ডারগ্রাউন্ড হওয়া লাগে, ভাবীরে নিয়া হন। জোর করে হইলেও। আমার আবদার এইটা আপনের কাছে।”

জয় হেসে ফেলল, “জোর করে? কীসের ঠেকা আমার?”

-“আছে। আমার সাথে মিথ্যা বইলেন না, ভাই। আপনে এইখান থেকে বের হয়ে ভাবীর কাছে যাবেন। আমি জানি। আমিও চাই এইডাই। আমিও যাব আপনের সাথে। তারপর ভাবীরে নিয়া হিলি বন্দর পার কইরে ভারতে। দরকার পড়লে নেপাল চলে যাবেন একদম। যদ্দিন না হামজা ভাই সব কেইস সল্টে দেয় ততদিন দ্যাশে ফেরা নাই। বেশিদিন লাগবে না। তারপর ফিরে আমির নিবাসে চিরকাল.. বাড়ির ছেলে বউ নিয়া বাড়ি ফিরবে না?...”

জয় হ্যাঁ-না কিচ্ছু বলল না। আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে আছে কবীরের মুখ। তার ক্লান্ত, ক্ষত-বিক্ষত মুখে শান্তির রেখা ফুটে উঠেছে। উপরহলের নির্দেশে জয় আমির ও কবীরকে মাঝরাতের অন্ধকারে মুক্ত করে দেয়া হলো পুলিশফাঁড়ি থেকে। জয় আমিরের শুকনো হাতে কিছুটা লাল তরল মাখানোর আছে। এসব কাজ উপরমহল করে না। জয় আমিরেদেরকে দিয়ে করানো হয়ে থাকে। জয় আমির ও কবীর বড়ঘরের কাজ সেরে বের হলো, তখন প্রকৃতিতে রাত তিনটা। জয় আমিরের সাদা ধবধবে লুঙ্গিতে রক্ত, হাতের কব্জিতেও, কপালের ওপরেও। গলায় তখনও

ওড়নাখানা ঝুলছিল। জয় সেই ওড়নায় রক্তগুলো মুছতে মুছতে রাস্তায় নেমে এলো। রাস্তায় একটা কুকুরও নেই। ঝি ঝি পোকারাও ভয়ে ডাকা বন্ধ করে দিয়েছে বোধহয়।

কবীরের মেজাজটা থমকে ছিল, যা ঘটল বড়ঘরে, তা কবীরকে খুব একটা সুখী করেতে পারেনি বোধহয়। তবু কিছু একটা তাকে সপ্রতিভ করে, সে জয়ের কানে ফিসফিস করে বলে, "এইভাবে ওড়নার মালিকের সাথে নিজেকে ঘষে পাপগুলা মুছে ফেললেও পারেন।"

জয় নিঃশব্দে হাসে, “ওড়নার মালিক আমাকে এ অবস্থায় দেখে বড়জোর ঘেন্নায় একদলা থুতু ছুঁড়ে দিতে পারে, নিজেকে এগিয়ে দেবে না পাপের ভাগ নিতে। আর তুই আমাকে থুতু খাওয়াইতেই নিয়ে যাচ্ছিস, কবীর। আমার এই মুহূর্তে একবার শুধু রাজধানী যাওয়া জরুরী। ওই শালী আত্মহত্যা করে নেবে তবু এখন আর আমার সাথে যাবে না।”-“আপনি রাইখে যাইতে পারবেন তারে এইখানে? সকালের আলো ফুটতেই যদি আপনার এনকাউন্টার করতে বাইর হয় পুলিশ শালারা? ওগোরে মনে কহন কী চাপে কওয়া

যায়? আবার চিরুণী তল্লাশীর নাটক শুরু হইবো। তারে কার কাছে রাইখা যাচ্ছেন?”

কবীর জানে জয় আমির। রাজধানী হয়ে যদি জয় আমির আন্ডারগ্রাউন্ড হবার পথে পাড়ি দেয়, তার ঘরওয়ালিকে কোনো শর্তেই এখানে রেখে যাবে না। কিন্তু সত্যিই কি এই অবস্থায় সেই নারীটি এই পিশাচকে গ্রহণ করবে?

একটা সিএনজি পেলে ভালো হতো। কিচ্ছু নেই রাস্তায়। দুজন হেঁটে হেঁটে বাঁশেরহাট বাজারের ওপর পৌঁছালো। আরেকটু হেঁটে এগিয়ে যাবার পথে সোঁ করে একটা দ্রুতগামী কিছু কবীরের কানের গোড় দিয়ে ছুটে গিয়ে

সামনের চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বিঁধল বোধহয়। দূর থেকে পোলের সামান্য আলো অন্ধকারকে একটুও দূর করেনি। জয় এক মুহুর্তের মাঝে কবীরকে এক ধাক্কায় ছিটকে নিজের থেকে দূরে ফেলে দিলো।

পরের মুহুর্তেই বিকট শব্দ করে পর পর দুটো বুলেট এসে জয় আমিরের শরীরে বিঁধল। একটা মাংসপেশী ছিঁড়ে-ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল। জয় কুজো হয়ে পড়ল। মুখ থেকে ছিটকে একটা ভোঁতা আর্তনাদ বেরিয়ে এলো। তার পরক্ষণেই হেসে ফেলল সে। চোখ জ্বলছে, পানি ভরে উঠেছে চোখদুটোয়। দম ফুরিয়ে এলো, বুকের মাঝখানে দলা হয়ে চাপ

ধরে এলো। গলগল করে রক্ত বেরিয়ে মাটিতে পড়ায় অনেকটা ধুলো আটার মতো দলা পাকিয়ে মেখে উঠল জয় আমিরের রক্তে।জয় গা কাঁপিয়ে হাসে। সেই হাসিতে শব্দ নেই। হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়ায় চোখ থেকে টুপ টুপ করে কয়েক ফোঁটা পানি ধুলোর ওপর পড়ে। কারা যেন পেছন থেকে দৌড়ে পালিয়ে যায়। জয় দম নেবার চেষ্টা না করলেও তার অবাধ্য শরীরটা নিস্তেজ হয়ে লুটিয়ে পড়তে চাইল না। দম নেবার চেষ্টা করল।
কবীর এত্ত জোরে ডেকে উঠল, "ভাইইইই! ভাই, ভাই, জয় ভাই....''

সাঁতরে উঠে আসে কবীর। জয়ের ঢলে পড়তে চাওয়া শরীরটা জড়িয়ে ধরে। জয় আমিরের গা কাঁপছে, জয় হাসছে, প্রাণখোলা হাসি হাসছে। বারবার দম আঁটকে এসে আবার নিঃশ্বাস টেনে নেবার ফোঁস ফোঁস শব্দ হয়ে কবীরের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে জয় আমিরের শরীরটা ঢলে পড়ল ধুলোর ওপর। কবীরের শরীরের নিচের দিকে জয়ের রক্তে ভরে উঠল।জয় দেখতে পায় মৃত্যু চপল পায়ে এগিয়ে এসে তার শিয়রে হাঁটু গেঁড়ে বসল। সে একবার শেষবার দম টানার চেষ্টা করে, অস্ফূট স্বরে ডাকে, “হামজা ভাই, বড়সাহেব

হাস..পাতালে... কবীর। আমি তারে দেখতে যাব...''

মৃত্যু বড় যত্নে জয় আমিরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো। শরীরে কী অসহ্য ব্যথা! শিরা-উপশিরা ঝেঁটিয়ে রক্ত ছুটে যাচ্ছে ক্ষতর দিকে, সেই কলকল ধ্বনি শুনতে শুনতে জয় আমির আরামে চোখ বোজে। ব্যথা নেই আর কোথাও, রক্ত ঝরছে তাতে আর যায়-আসে না জয়ের।একটি বিস্তৃত জনমানবহীন মরু প্রান্তর। হঠাৎ-ই তা নিশীথের অন্ধকারে অবরুদ্ধ হয়ে উঠল। জয় সেখানে একা দাঁড়িয়ে। অনেকটা দূরে আবছা দেখা যায়– ছোট্ট জয় আমির তার দিকে চেয়ে তাচ্ছিল্য

করে হাসছে। তখনই একটি শুকনো-লম্বা হাত জয়ের হাতটা শক্ত করে ধরে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে লাগল। নিশীথের অন্ধকার তখনও বেহায়ার মতো তাদের পিছু পিছু ভেসে আসছে। চলতে চলতে কিছুদূর পেরিয়ে সেই হাতের মালিক বলিষ্ঠ, শ্যামরঙা এক দানব-মানব হয়ে উঠল। জয় আরও অনেকটা পথ নিশ্চিন্তে হাঁটে সেই পুরুষটির হাত ধরে।কিন্তু হঠাৎ-ই আকাশ ফুঁড়ে এক টুকরো বিদ্যুতের ঝলকানি জমিনের ওপর পড়লে সামান্য একটু আলোকিত হলো অন্ধকার মরুপ্রান্তর। চিরসঙ্গীর হাত ছেড়ে জয় বড় আগ্রহে এগিয়ে যায় নিভু নিভু আগুনের টুকরোর দিকে।

নিভু আগুন জয়কে ইষৎ হেসে শুধায়, “আপনাকে ফেরানোর দায় আমার ছিল না। তবু দু-একবার চেষ্টা করিনি বললে মিথ্যা হবে। কিন্তু আপনি রাজী নন। আপনার পথ রুখার সাধ্যি তো আমার নেই, আমি তাই আপনার পায়েই শিকল পরাবো, আজ যারা শিকলে বন্দি, তাদেরকে আমি মুক্ত আকাশের নিচে দাঁড় করাবো।”

জয় হাসল, “এতে আপনি জিতে যাবেন, উকিল ম্যাডাম?”-“আবার হার-জিতের প্রশ্ন কেন, জয় আমির? আপনি সমাজের জন্য দাবানলের মতো বিপজ্জনক। আপনার তান্ডব চলতে দিলে বনের পর বন ছারখার হয়ে

আমার মতো অন্তূরা জন্মাবে। তা আর না হতে হলে আপনাদেরকে এখানেই থামতে হবে।''

-''আমরা থেমে গেলে তোমাদের সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে তো?''

-''মানুষ চিরকাল বাঁচবে না জেনেও চায় অন্তত আর ক'টাদিন বাঁচতে। সমাজের সকল কীট-পতঙ্গ নাশের সাধ্যি আমার কই, হাতের নাগালে যা আছে তারাই অন্তত সই? এটাকে নিজের পরাজয় ধরলে ধরুন, বাঁধা দেবার ইচ্ছে নেই।''

জয় হেসে বিরবির করে আওড়ায়,-'পরাজয় আমার হলো বৈকি, জেনেবুঝে সব ছাড়ি,

বিজয়ের কৌশল রপ্ত আমার, তোমার তরে হারি!’

নিভু আগুন আপত্তি কোরে মৃদু হেসে মাথা দোলায়,

-‘জেনেবুঝে ছাড়ে, কারও তরে হারে, যে বা যেই জন,

পরাজয় ছিল একক পরিণাম—জেনেছে আগে তার মন।’

জয় ভ্রু কুঁচকায়। সে নিজের পরাজয় সুনিশ্চিত জানার পর হার মেনেছে? এ কেমন কথা? সে চাইল, বড়ঘরের বন্দিদেরকে রক্তে চুবিয়ে এলো। আবার এখন চাইলেই আরমিণের পরিবারসহ আরমিণকে জীবিত

দাফন করে ফেলতে পারে...তারপর ক্ষমতার চূড়ায় দাঁড়িয়ে মুক্ত পাপী রাজা হিসেবে নিজেকে ঘোষনা করতে পারে, অতঃপর বিজয় উল্লাসের নামে আরও শ খানেক নরবলী সে দিতেই পারে। তাহলে পরাজয় কোনটা?

নিভু আগুন তার কানে ফিসফিস করে যায়, "আপনি চাইলেই জিততে পারেন–কিন্তু আপনি চেয়েও চাইছেন না; এই না চাওয়াটার চাইতে বড় পরাজয় আর কই?"জয়ের মস্তিষ্ক এ পর্যায়ে শরীরে মরণ-যন্ত্রণা টের পেল। এই ব্যথা তার পরিচিত। দেহে বিঁধে থাকা বুলেট বের করার ব্যথা এটা। মরুপ্রান্তরের

অন্ধকারটা গাঢ় হলো, বলিষ্ঠ হাতখানা এখন বহুদূর পেছনে দাঁড়িয়ে, নিভু আগুনে রক্তের ছিটা পড়ছে, তাই তা আরও নিভু নিভু হচ্ছে। জয় খুব অস্থির হয়ে উঠল–তার পরাজয়টা কী?

মরুপ্রান্তরে ধ্বনি উঠল, “বরং তুই বল দেখি বিজয় কোনটা? সীমাহীন পাপ করার ক্ষমতা থাকাটা যদি বিজয় হয়... তুই বিজয়ী এক পাপের সম্রাট। কিন্তু একখানা সংসার, একটা জীবন–মানুষের মতো জীবন, নিজের ঠিকানা-পরিচয়, তোর আকাঙ্ক্ষিত সঙ্গিনী, নিজের বংশধর....কিছুই তোর হবার নয়। .....তবু তুই দাবী করিস জিতে যাবার! বিজয়ের মর্ম না

বোঝা নির্বোধ পাপীষ্ঠ! তোর পরাজয় রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে তোর অপেক্ষায়।''

জয় দেখে, নিভু নিভু আগুন নিভে যাবার শেষক্ষণেও হাসছে। অন্ধকার জয়কে পরম যত্নে আগলে নিচ্ছে ধীরে ধীরে। ব্যথার অনুভূতি ফুরিয়ে আসছে। বিজ্ঞানকে শুধালে বিজ্ঞান এটাকে মানব মস্তিষ্কের চেতনাহীনতা বলবে। ভদ্রলোকেরা বলবে, মস্তিষ্কের মৃত্যু। সকালে কাস্টডি রুমে বসে থেকে জয়ের খুব খিদে পাচ্ছিল। তার খিদে পেলে অমানুষিক সব হিংস্রতা ও ভাবনা আসে। যেমন কাস্টডি রুমের চেয়ার-টেবিলগুলো দেখে তার মনে

হলো, এগুলোকে ডুবোতেলে মচমচে করে ভেজে খেলে খুবই টেস্টি লাগবে।

খানিকবাদে দুজন কনস্টেবল ধরাধরি করে পরাগকে নিয়ে এলো সেখানে। চেনা যাচ্ছে না চেহারাখানা। নিজে দাঁড়ানো অথবা হাঁটার শক্তি নেই। যেন অনেকদিন পর কবর থেকে একটি মরদেহ তুলে আনা হয়েছে, অর্ধেকের বেশি মাংস ঝরে গেছে শরীর থেকে, সামান্য কিছু কঙ্কালের সাথে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ঝুলছে।

জয় পরাগকে দেখেই নাক চেপে ধরল, “সকাল সকাল মুড নষ্ট! দরকার পড়লে আমার নামে আরও পনেরো-বিশটা মামলা ঠুকে দ্যান, তবু এই ধরণের চামবাদুরের

মুখোমুখি বসায়ে রাখবেন না, স্যার। আমার খুবই বমি আসতাছে।''

পরাগ টেবিলের ওপর মাথা রেখে নিস্তেজ গলায় আলতো হেসে বলল, "তাইলে তুই মনেহয় পোয়াতি, জয়। এতে আমার দোষ নাই।''আজ পলাশ ও রাজন বেঁচে থাকলে পুলিশদের সাহস হতো না পরাগকে এভাবে টর্চার করার। থাকলে এতক্ষণে পুলিশদের পরিবারের কমপক্ষে চার-পাঁচটা মেয়েলোক পলাশের জন্য ডিলেশিয়্যাস ডিনার হতো...

রউফ কায়সারকে দেখে জয় কপালে হাত তুলে সালাম ঠুকল। পরাগের কানে কানে বলল, " দেখতে তো একদম ঝিংকু হয়েছিস

রে, ফ্রগ! যাকগে, তো শ্বশুরবাড়ির মেহমানদারি কেমন উপভোগ করলে, দোস্তো?
''

পরাগ হাসল, "তুই টেস্ট করারই পথে, নিজেই টেস্ট করে বুঝে নিবি।''
-"আমার এত সৌভাগ্য কই রে পাগলা?''
পরাগ হাসে, "তোর ভাগ্য খুলে দিয়েছি আমি।
''

-"হু?''
-"পলাশ আজগরকে তুই মেরেছিস।''
-"তাই নাকি? কই আমার তো মনে নেই! কিন্তু স্বীকার যখন করবিই, এতদিন ভাউ খাইলি ক্যান? দে শালা মাওরাচো%দা, আমার

কৃতজ্ঞতা ফিরায়ে দে।''-"কৃতজ্ঞ হয়ে তুমি আমার বালডা ফালাইছো, হুমুন্দির পুত! তোর জন্য জান তো দিতে পারি না।''

তার সঙ্গে জয়ের সম্পর্ক আগে-পরেই প্যাঁচ খাওয়া। তবু সে কেন শুরুতেই জয়ের নাম নেয়নি, এটা ভাবনার বিষয়।পরাগকে জিজ্ঞেস করলে সে বলবে, সে জানে না। কিন্তু কারণ একটা আছে, অদ্ভুত কারণ।

পরাগ তখন ছদ্মবেশী প্রশাসন কর্মকর্তা। একদিন তার মিছেমিছি কার্যালয়ে এক নারী এলো। তার চোখে চিকচিক করছিল ন্যায়ের তেজ, আচরণে বিচক্ষণতা। পরাগের বুকে ধাক্কা লাগল—তার মনে হলো, নারীটির বিশ্বাস

অনুযায়ী সে আজ কেন সত্যিই মুস্তাকিন মহান নয়? সে কেন পারছে না নারীটির চাহিদামতোন ধর্ষিতা মেয়েটিকে ইনসাফ দিতে? আবার কিনা সে সেই পলাশের অনুগত জারজ ভাই, যে এসবের পেছনে কাঠি নাড়ছে।এ পর্যন্ত পরাগ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল কষে। কিন্তু যেদিন সেই নারীটিকেই আবার আরেকজন মুমতাহিণা হবার জন্য পলাশের ডেরায় পাঠাতে হলো, সেই বিশ্বাসঘাতকতার অনুশোচনা কি আজও গেছে পরাগের ভেতর থেকে? সে কেন সেদিন নারীটির সরল বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে পারেনি? কোন সুঁতোয় তার হাত বাঁধা ছিল?

সেই সুঁতোর নাম যদি পাপ হয় তো সেদিন কী করে সেই সুতো ছিঁড়ে তার সম্মুখে জিতে গেল জয় আমির? যেখানে জয় আমিরের পাপের সুঁতো যে তার চেয়ে হাজারগুণ শক্ত, পরিপোক্ত!? এমন তো কথা ছিল না! নারীটির কাছে জয় আমির মৃত্যুর মতো ঘৃণ্য, জয় আমিরের কাছে নারীটি কেবল একটি শিকার– অথচ সেইরাতে সম্মান বাঁচিয়ে এনে নারীটিকে জয় আমির বিশ্বাসঘাতক পরাগের হাতে তুলে দিয়ে এক টুকরো বিদ্রুপমাখা হাসি হেসে চলে গেছিল। এই স্ব-ধিক্কার কি পরাগ ভুলতে পেরেছে আজও?সে জয় আমিরের কাছে বিশ্বাস ও ভরসার মামলায়

হেরে যাওয়া আনাড়ি। পরাগের বুকে নারীটির জন্য অগাধ টান। সেই টানে পাপ নেই, এটুকু নিরেট। তবে সেই টান অদ্ভুত, একজন কাপুরুষ বিশ্বাসঘাতকের কলিজার টান কিনা! তাই ততদিন সেই নারীর ভরসাস্থল–জয় আমিরকে কেঁড়ে নিতে পরাগের সাহস হয়নি যতদিন না রূপকথার মামলা এসেছে। পলাশ আজগরের খুনী হিসেবে সন্দেহের তীর রূপকথার ওপর স্থির হয়ে যাচ্ছিল। তদন্তে উঠে এসেছিল—রূপকথা ছিল পলাশের কাছে অমানুষিক অত্যাচারের শিকার। রূপকথার কাছে যথেষ্টর চেয়েও বেশি কারণ ছিল অসুস্থ পলাশকে খুন করে নিজেকে বাঁচিয়ে নেবার।

পরাগের সাথে রূপকথার সম্পর্ক আরও জটিল। সৎ ভাই-বোন, প্রতিদ্বন্দী। কিন্তু পরাগের না বলা আরও একখানা কথা আছে —পরাগ রূপকথাকে বোনের চেয়েও বেশি ভালোবেসেছে সেই ল্যাংটা-কাল থেকে। সেই নারীটির জয় আমির আছে! রূপকথার আজ এক পরাগ ছাড়া কেউ নেই। পরাগ বলে দিয়েছে পলাশের খুনীর নাম।

জয় বলল, "তুই এমনিতেও বাঁচবি না। তোর খয়রাতে আমি বোয়াল মাছ দিয়ে আলু ঘাটার অনুষ্ঠান করব।"

পরাগ মাথা নাড়ল, “ওইজন্যই বলে দিছি। তোর মরার ব্যবস্থা না করে মরলে নরকবাস হবে।”

-“নয়ত তুই কি জান্নাতুল ফেরদাউসে যাইতি? তোর মতো শাউয়ার নাতিরে নরকে দিলেও তোর জায়গা হবে নরকের হাগাখানায়।”

পরাগ টেবিলের নিচ দিয়ে জয়ের পায়ের ওপর দুম করে একটা লাত্থি মারল। রউফ এসে বসল দুজনের সামনে। জয় বলল, “স্যার, এই উগ্রবাদী পাঠাটার এখনও ফাঁসি হয় নাই ক্যান? আমি আপনাকে খুব ন্যায়পরায়ণ অফিসার বলেই জানি।”-“আজই আমার সঙ্গে আপনার প্রথম দেখা।”

-“দেখা তো আমাদের আজরাইলের সাথেও জীবনে প্রথমবার আর একবারই হয়, তাই বলে কি মরার আগে আমরা জানি না তাকে?
”

-“আমাকে আপনি নিজের আজরাইল বলছেন?”

জয় মুচকি হাসল, “হতেই পারেন! সুযোগ দিয়েছি তো!”

-“না, জয় আমির। আপনি নিজেকে খুব বেশি শক্তিধর ভাবলে আমি তার প্রতিবাদ করব।”

জয় ঠোঁট বাঁকাল, “কোচের ছুরি কোচ কাটলে স্যার, আপনার মতো প্রতিবাদীরা একটু-আধটু

প্রতিবাদ করলেও মেনে নিতে হয়। ও সঁয়ে যাবে।’’

খুব গভীর চোখে এবার দেখল রউফ জয় আমিরকে। রসিক-গম্ভীর চেহারা। ক্লান্ত-পরিশ্রান্ততায় কাতর, কিন্তু উদ্বেগ নেই একটুও। সেও কি জানে তার স্ত্রী তাকে ধ্বংসের কত কঠোর ফর্দ তৈরি করেছে? জানে বৈকি! ওই গভীর বাজ পাখির মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গভীর সতর্কতা আর বিচক্ষণতা।-“যখন কামরুজ্জামান ঝন্টু সাহেবের মার্ডার হয়, তখন আপনি কোথায় ছিলেন?’’

-“সামনেই।’’

রউস হেসে উপর-নিচ মাথা নাড়ল, “যাহোক, পেছনে থেকেও খুন করা যায়।”
-“পেছন থেকে কুত্তা দাবরায়, স্যার। আমি ধরলে সামনে থেকেই...বাই দ্য ওয়ে আপনি দু চারটে করেছেন নাকি খুন...পেছন থেকে?”
একটু অবাক অবশ্যই হলো রউফ কায়সার জয়ের অকপট স্বীকারক্তিতে। খানিক চুপ থেকে আচমকা জিজ্ঞেস করল, -“রাজন আজগরকে কেন মেরেছেন?”
রউফের উদ্দেশ্য ছিল হঠাৎ-ই এমন প্রশ্নে ভড়কে যাবে জয়, কাচুমাচু হবে। কিন্তু অবাক হয়ে তড়াক করে মাথা তুলল পরাগ। জয় শুধু সামান্য ঠোঁট উল্টায়, “একটুও ইচ্ছে ছিল না।

কিন্তু জানেন দুনিয়া কক্ষনোই চায় নাই আমি পাপ কম করি।’’আরমিণ যেদিন প্রথমবার বড়ঘরে পা রাখল তখন জয় রাজধানীতে। সেখানকার একটি চেম্বারে রাজন আজগরের ব্যবসার মাল–মদ, অস্ত্র ও মেয়েলোক দেখে ফেলেছিল আরমিণ। খবরটা জয় জেনে যখন আশপাশে পাহারা বাড়িয়ে দিলো, সেই পাহারাদারদের মাঝে বেশ কয়েকটা পলাশের ছেলে ছিল অবশ্যই। তারা রাজন আজগরকে কল করে জয় আমিরের স্ত্রীর স্পর্ধার কথা বলে দিলো।

সেবার দিয়ে রাজন আজগর তিনবার শুনলেন জয় আমিরের স্ত্রীর দুঃসাহসিকতার গল্প।

আগেও বহুবার হাতে চেয়েও পাননি, কিন্তু এবার আর না দেখলে চলছিলই না সেই মেয়েটিকে। জয়কে সেই সকালেই তিনি কল করে আবদার করলেন—

-“তোর বউডারে তো লাগতো, আব্বা। পাঠায়ে দে। পলাশের কাছে বহুত শুনছি তার ব্যাপারে। সচক্ষে দেখতে না পাইলে কলজে তড়পাচ্ছে।”আরমিণ তখন বড়ঘরের লোহায় পা কেটে, জ্বর এসে অসুস্থ অবস্থায় বিছানায় শুয়ে। জয় একবার আরমিণকে দেখে হেসে বলল, “কলজে তড়পানো কোনো বিশেষ ঘটনা না, কাকা। কলিজা তড়পাচ্ছে মানে

হইলো আপনি জিন্দা আছেন। নয়ত এতক্ষণে হরি বোল..''

-“না না, জয়। নাহ্। এই তড়পানি অন্যরকম রে। নিয়ে চলে আয়। ও জিনিস তো কবেই আমাগোর সম্পত্তি হইছে, তুই খালি বারবার কাইড়া নিছোস। আমি তরে স্নেহ করি, আমি আবার উল্টা কাইড়া নিলে কেমন দেখায় না? তুই নিয়ে চলে আয় আমার ফ্ল্যাটে। বুঝলি?''

জয় দীর্ঘ এক শ্বাস টেনে বলল, “আচ্ছাহ্! অপেক্ষা করেন তাইলে। আসতেছি। আজই আসি, নাকি কাকা? পলাশ ভাইরে আগেই কিছু জানায়েন না। কাউরেই জানায়েন না। পলাশ ভাইয়ের জন্য খুব ডিমান্ডেবল ব্যাপার

আমার বউ, বুঝলেন? তারে সারপ্রাইজ দেব। আপনে কইলাম বইলেন না আগেই।''

জয় আবার সেদিনই দুপুরে রওনা দিলো রাজধানীর উদ্দেশ্যে। হামজাকেও জানালো না। রাত এগারোটায় ঢাকা পৌঁছে একটু ড্রিংক করে, শহর ঘুরে রাজন আজগরের ফ্ল্যাটে ঢুকল রাত দেড়টার পর। একুশ তলা ভবন। রাজন আজগর থাকেন চৌদ্দ তলার লেফ্ট-ইউনিটে।

রাজন বললেন, ‘‘কই রে? সেই মহিয়সী কই? বাপরে, দম বন্ধ করে দেয় মাঝেমধ্যে। কোত্থেকে পাইলি বাপ এরম কড়া মাল? কই সে?''জয় ঠোঁট গোল করে খুব ধৈর্যশীলের

মতো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “আনিনি, কাকা।
”

রাজন আজগর রসিকতা ভেবে হাসতে চাইলেন, কিন্তু তিনি জানেন জয়কে। বিভ্রান্ত হলেন, ধীরে ধীরে হিংস্রতা চাপতে লাগল ভেতরে।

জয় খুব হতাশ কণ্ঠে বলল, “যখন একটা সাধারণ মেয়ে ছিল, আমার চোখের বিষ ছিল, তখনই দেই নাই আমি। আইজ তো সে আমির পরিবারের বউ–কোয়েশ্চেন অফ ফ্যামিলি অউনার, কাকা। আপনি কি ঠিক করছেন আমির পরিবারের বউকে এইরকম সস্তাভাবে চেয়ে বসে?

যেইগুলারে আপনি বেচাকেনা করেন, সে কি সেইরকম কিছু? শ্যাহ্! আপনি ওরে চাইলেন সেইটা সমস্যা না, সমস্যা হইলো আপনে আমার পরিচয়ের ওপর হাত মারছেন।”

জয় উঠে দাঁড়ায় এ পর্যায়ে, “আমি কে?”

রাজন আজগর বুঝতে পারছিলেন না পরিস্থিতি। জয় কী চায়?জয় রাজন আজগরকে খুব একটা শাস্তি দিয়ে মারল না। ভুলবশত বয়স্ক একজন মানুষ একটু বেয়াদবী করে বসেছে, এই আর কী! রাজন আজগরের বুকের ওপর উঠে বসে চোয়ালের একপাশ দিয়ে একটি মাঝারি আকৃতির ড্যাগার গেঁথে

দিলো। একপাশ দিয়ে ঢুকে অপরপাশের চোয়াল ভেদ করে বেরিয়ে গেল তা।

জয় বলল, "আমি, জয় আমির। সি'জ মাই লেডি, মাই বেটার হাফ, নাও দ্য হেরিটেজ অফ মাহ্ ফ্যামিলি! কারবারের খাতিরে সব মাফ, কিন্তু ঘরের সম্মানে নজর রাখা মহাপাপ। কোনো লোটির বাচ্চা তোর মতো এমন সাহস করলেই একদম জবাই করে ফেলব। আমি এখনও বেঁচে আছি।"

জয় করলও তাই। ড্যাগার দিয়েই রাজন আজগরের গলাটা ঘষে ঘষে কেটে ফেলল। ভোঁতভোঁত আওয়াজ হয়ে কণ্ঠনালি দু'ভাগ হলো, ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসে জয়ের

মুখ-বুক, শার্ট ও হাতে ভরে গেল। ঘাঁড়ের কাছে অল্প একটু চামড়ার সঙ্গে বাঁধিয়ে রাখল মাথাটা। যাতে তদন্ত ও দাফনের কাজে একটু সুবিধা হয়।পরাগ মাথাটা চেপে ধরে বসে ছিল। তার কষ্ট লাগছে এমন নয়, কিন্তু অস্বস্তি হচ্ছে এক প্রকার, আবার সাথে অদ্ভুত এক প্রশান্তি। তার মনে হলো এটাই কি পার্থক্য নয় তার আর জয়ের মাঝে? জয় তার ঘাতকিনীকে নিজে লাঞ্ছনা ও যন্ত্রণা দিয়ে আবার পদে পদে নিজের ঐতিহ্যে লালন-পালন করেছে বরাবর। কিন্তু সে সেই নারীটির ওপর দূর্বলতা অনুভব করার পর জয় আমিরের মতো এই পাগলাটে দুষ্কৃতির

আশপাশেও যেতে পারেনি। এটাই কি কারণ নয় যে জয় আমির সেই নারীটিকে লাভ করেছে আর পরাগ কেবল নীরব এক প্রতারক!

রউফ কায়সার কিছুক্ষণ চুপচাপ দেখল জয় আমিরকে। তবু এই লোকের স্ত্রীর এত নিরাসক্তি এই লোকের ওপর? কেন? গল্পটা কি কোনোদিন শোনা দরকার না সেই নারীটির কাছে?পরাগ দূর্বল গলায় আস্তে কোরে জিজ্ঞেস করল, “তোর প্রতিদ্বন্দীর খাতিরে বারবার এতকিছু করেছিস, তুই!?”

জয় হাসল, “এক হেলেনের জন্য গ্রিকরা দশ বছর যুদ্ধ করেছিল, ফ্রগ! সেই হেলেন কিন্তু

চরিত্রহীনা এক ঘাতকিনী নারী ছিল। যার জন্য গ্রীক বীরদের রক্তে ধুয়ে উঠেছিল ট্রয় নগরী। কারণ সে ছিল রাণী, গ্রীকদের সম্মান।”

পরাগ হেসে উঠল, “তোর অবাধ্য রাণী!”

জয় ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে হাসল, “রাণী কখনোই রাজার প্রতি ততটা অনুগত হয় না যতটা রাজ্যের প্রজারা। তবেই সে রাণী। আর রাণী ছাড়া রাজ্য ও রাজা দুটোই চাবিহীন তালার মতো। হয় অবরুদ্ধ নয় চূর্ণ-বিচূর্ণ, অথবা অকেজো-অসম্পূর্ণ!”

পরাগ অদ্ভুতভাবে হেস মাথা দোলায়, “সব রাখ। তবে হেলেনের খাতিরে তুই যদি

অ্যাকিলিস হতে যাস, তোর তাহলে মৃত্যু সুনিশ্চিত, তোর সাম্রাজ্যের ধ্বংসও–জেনে রাখ।''

-"কোন শালা চিরকাল বাঁচতে জন্মাইছে রে? ''একটা বুলেট জয়ের ডান হাঁটু থেকে বেশ কিছুটা উপরে বিঁধে ছিল, আরেকটা অন্ধকারের বদৌলতে বুকে না লেগে হাতের বাহু ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে।

কবীরের দেহের বিভিন্ন স্থানে তখনও থকথকে ঘা। তার ওপর জয়ের রক্ত শুকিয়ে লেপ্টে আছে। দূর্ঘটনার সময়টা অসময় ছিল। সেই অসময়ে বাঁশেরহাট মোড় থেকে আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজে জয়ের দেহ

পৌঁছানো কবীরের জন্য দুঃসাধ্যই হয়ে উঠেছিল বটে। কবীরের হঠাৎ-ই মনে হলো– বড়ঘরে জয় যা করেছে, ঠিক করেছে। এই জয়ের আছে কে এবং কী হামজা ছাড়া? আজ হামজা থাকলে দিনাজপুর সদর এলাকায় কাঁপন ধরে যেত এই শেষরাতে। সেই হামজার ওপর হামলা করা লোকদের সাথে জয়ের ওই ব্যবহার একদম ঠিক।

কবীরের শরীরটা থরথর করে কাঁপছিল। জয়ের রক্তের দানা এত ভারী কেন? হাসপাতালে গিয়েও কবীর হামজার দাপটের কমতি অনুভব করল। তার কথায় কেউ তোড়জোর করে জয়কে এই অসময়ে

অপারেশন রুমে শিফ্ট করছে না। হামজা এসে দাঁড়ালে হাসপাতালের জড় বেডগুলোও সচল হয়ে উঠতো।

ডাক্তার বললেন, "রক্তক্ষরণের মাত্রা অতিরিক্ত। এ অবস্থায় অপারেশন ঝুঁকিপূর্ণ। অপারেশন শেষে সেন্স না ফিরলে আমাদের কিছু করার থাকবে না।"কবীর হাতের কব্জি এগিয়ে দিলো, "ওই ডাক্তাল কী মনে হয় আপনার, আমার শরীলে কি রক্ত নাই? নেন নেন। এই যে রক্ত, নেন। কতখানি লাগবে, কয় ব্যাগ কয় ব্যাগ?"

কবীরের পাগলামিকে অগ্রাহ্য করে ডাক্তার বললেন, "রোগীর রক্তের গ্রুপ ও-নেগেটিভ।

রেয়ার এনিহোয়ার। দ্রুত জোগাড় না করতে পারলে রোগীর কোমায় যাবার সম্ভাবনা রয়েছে, সেন্স ফেরার নিশ্চয়তা দিতে পারছি না। যা করার দ্রুত করুন।''

কবীর কী করবে এবার? সে অনেকক্ষণ হাপাতালের মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে রইল। ও-নেগেটিভ রক্ত দুনিয়ায় বিরল। এই রক্ত নেই দুনিয়ার মানুষের। পরে তার মনে পড়ল জয়ও তো নেই দুনিয়ায় অহরহ! আরও মজার ব্যাপার হলো ও-নেগেটিভ রক্তওয়ালা সবাইকে রক্ত দিতে পারলেও সে নিজে শুধু ও-নেগেটিভ রক্ত নিতে পারবে, আর কারওটা না। এটাও কি জয়ের ভালোবাসার মতো?

কিন্তু জয়কে হামজা ভালোবেসেছে, ভালোবাসতে পেরেছে, পাগলের মতো। তার রক্তের গ্রুপও ও-নেগেটিভ– কারণটা বোধহয় এটাই!

ছেলেদেরকে বিকেল পর্যন্ত থামিয়ে রাখল কবীর এই খবর হামজাকে দেয়া থেকে। হামজা উন্মাদ হয়ে উঠবে এই খবরে, যেখানে সে নিজেও জখম। কিন্তু বুলেট অপসারণ করে জয়কে বেড়ে দেবার কয়েক ঘন্টা পরেও সে চোখ খুলে তাকিয়ে হেসে উঠল না।

দিনাজপুরের পুলহাট পুলিশ ফাঁড়ি থেকে রাত একটায় দুজন বেরোলো। জয়ের ডানহাতে

হ্যান্ডকাফ ঝুলছে তখনও। কেবল বাম হাতটাকে মুক্ত হয়ে দেয়া হয়েছে। পাশের চায়ে দোকানে ঢুকে দোকানির কাছে এক প্যাকেট সিগারেট চাইল। দোকানি সিগারেট দিলে হুরহুর করে বেরিয়ে আসছিল। খুপরি থেকে। পেছন থেকে ডাকে দোকানি, "আমার ট্যাহা দিবা না?"

-"বাকি খাইলাম। পরে-টরে দেব। ট্যাহা নাই আমার কাছে। ওহ্, মনেই নাই। শ'দুয়েক টাকা ধার দেন তো। গাড়ির ভাড়া নাই আমার কাছে।"

দোকানি চোখ গোল্লা করে বলল, “অ্যাহ্!” সে বুঝল না, এই ছ্যাঁড়া কী কয়! একে তো বাকি সিগারেট, তার উপর টাকা ধার!

জয় এগিয়ে গিয়ে দোকানির কানের কাছে বলল, “আপনের দুকানে কোনোদিন চাঁদা তুলতে আইছে আমার চ্যাংরারা?”দোকানি নিজের ভালো বোঝে। এসেছে বললে বিপদ হতে পারে বুঝে ঘাঁড় নাড়ল, “নাহ্, আহে নাই।” সে মূলত জানে না জয়ের ছেলেরা তার কাছে চাদা খেয়েছে কিনা।

জয় বলল, “ব্যাস, শোধ-বোধ। যদি ধরেন টপকে-মপকে যাই, এই ট্যাকার দায় আবার বাঁধায়ে রাইখেন না। মাফ করে দিয়েন।”

রাস্তায় চলার সময় সিগারেট টানতে টানতে গান ধরল,

আই অম এ ডিস্কো ড্যান্সার
বিড়ি খাইলে হয় ক্যান্সার...পথে ডাবে ভরপুর নারকেল গাছের দেখা মিলল। মাস ছয়েক কোনো নারকেল গাছে হামলা দেয়া হয় না। শুধু চেহেলগাজী ইউনিয়ন না, দিনাজপুর সদরের প্রায় সব গাছের নারকেল তাদের পেটে যায়। গাছওয়ালা সন্ধ্যায় নারকেল গুণে রাখে, সকালে গাছ পরিস্কার। পেঁপে, পেয়ারা, আমের ক্ষেত্রেও ঘটনা এক।

পরস্পরের সাথে চোখাচোখি করে হাসে দুজন। হুট করে জীবনটা গম্ভীর হয়ে গেছে।

আগে জটিল ছিল, কিন্তু ছিল ছন্নছাড়া। এখন ভারী হয়ে গেছে।বাড়ির রাস্তা তুলনামূলক বেশি গুমোট লাগল। যেন কিছু ঘটেছে ঘটেছে বা ঘটবে নিশ্চয়ই। সে যে আশঙ্কা করে বাড়িতে ঢুকল, তার সূক্ষ্ম চিহ্ন ছিটে আছে স্থানে স্থানে। গতরাতে তাকে নিয়ে যাবার পর পরই উন্মত্ত দল রাজধানীর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেছে। বাড়ির পাহারায় যে দু'একজন রয়ে গেছিল, তাদেরকে পেল বাহির বাড়ির খোলা বারান্দার এক কোণে। ভয়ানক জখম তারা। হামজার নির্দেশে সবসময় পরিপাটি পাটোয়ারী বাড়ির আঙিনায় লন্ডভন্ড হাল জয় অন্ধকারেও

টের পেল–অনেকগুলো পায়ের বিক্ষিপ্ত পদচারণা চলেছে বারবার।

এমপির দুটো ছেলে দৌড়ে এলো কোত্থেকে যেন জয়কে দেখে। জয়কে ঘুরে ঘুরে সব দেখাল। বড়ঘরের বাইরের লোহার দরজা হাতরালো। পুরোনো বিশাল তালাখানা ভেঙে নিচে পড়ে আছে, আর শাবলটাও।

সিটকিনিতে নতুন তালা লাগানো। জয় হাসল একচোট। অসুস্থ কবীর বোঝার চেষ্টা করছিল সবকিছু।-"ভাই, এইসব কারা করতে পারে?"

-"মুরসালীনের শুভাকাঙ্ক্ষীরা।"

-"জঙ্গির দল?"

জয়ের আন্দাজ বাস্তবের চেয়ে শক্তিশালী। সে মাথা নেড়ে হাসল বলল, “হ, আনসারী মোল্লা মনেহয়, কবীর। মজার ব্যাপার কী জানিস? আমার ঘরওয়ালির আয়োজন এইসব।”

কবীর চমকে উঠল, “ভাবী?”

জয় সেই শাবল দিয়েই দোতলার সদর দরজা খুলে বাড়িতে ঢুকল। রিমি চাবি কোথায় রেখে গেছে, জানা নেই। রুমে ঢুকে লুঙ্গি পরতে পরতে কবীরকে বলল, “বড়সাহেবের রুমে যা। বেডসাইড টেবিলের ড্রয়ারে চাবি আছে। দেখ আবার সেখানে আছে নাকি মুরসুর শুভাকাঙ্ক্ষীরা সঙ্গে নিয়ে গেছে।”

-“আমি?” ইতস্তত করে কবীর

-“যা, শালা। ভাবী নাই এখন, যা।”সে তো সেই আমির নিবাসেই আন্দাজ করেছিল অন্তূ ভয়ানক কিছু ঘটিয়েছে, কিন্তু সেটা এতকিছু, তা ভাবার ফুরসত পায়নি। হেসে ফেলল সে। ঘরে সে আসলেই এক ঘাতকিনীকে পালছে। এত নিখুঁত পরিকল্পনাকারী তার স্ত্রী, এটা ভেবে গর্বে বুক ফুলাতে গিয়ে আবারও হেসে ফেলল। যোগ্য স্বামী থুক্কু যোগ্য আসামীর যোগ্য বউ। নাহ্ আইনজীবী।

বড়ঘরে ঢুকল জয় তিন চারখানা মদের বোতল সঙ্গে নিয়ে। তার গ্লাসে ঢেলে পানি অথবা মদ কোনটাই পান করার অভ্যাস নেই। পানি জগ ধরে, মদ বোতল ধরে। সিঁড়ির

তালা বাইরে থেকে ঠিকঠাকই বন্ধ। সিঁড়ি পেরিয়ে প্রথম ইউনিটে পা রাখতেই খচ করে পায়ে কিছু গেঁথে গেল।জয় কবীরকে ধাক্কা দিয়ে সামনে সরিয়ে বলল, "সাবধান। শালারা মনে হয় কালাজাদুটাদু করে রেখে গেছে। লাইট-মাইট সব ভেঙে অন্ধকার করে কালাজাদু করছে, বুঝলি?"

আন্দাজমতো বড়ঘরের স্পট লাইটখানাও ভাঙা পেয়ে ভেতরে আরও আত্মবিশ্বাস টের পেল জয়। বহুদিন পর অসুস্থ শরীরে বড়ঘরে ঢুকে কবীর অস্বস্তিতে গুটিয়ে যাচ্ছিল। আচমকা দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠলে চমকে উঠল।

জয় মদের বোতলের মুখে দিয়াশলাই মেরেছে। নীল আগুন জ্বলে ওঠার সাথে সাথে মুখে "হু হুউউ হুহ্!" রকমের আওয়াজ করে ছুঁড়ে মারল সামনের দিকে। উন্মাদের মতো কাজ। সামান্য আলোয় দৃশ্যমান মেঝেতে লুটিয়ে থাকা কয়েকটি দেগুলোর পশম ছুঁয়ে ছুটে গেল বোধহয় বোতলটা, বিকট আওয়াজে ভেঙে কাচগুলো ছিটিয়ে গেল চারদিকে। জয় খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল। সবগুলো হাতছাড়া হলে সে নিজেকে সামলাতে পারতো না। আজ তার রক্ত চাই-ই-চাই।দ্রুত চার্জার লাইট জ্বালায় কবীর। জয় খুঁড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে মুরসালীনের সামনে বসে। কবীর

আঁৎকে উঠল। পায়ের তালুতে তিন ইঞ্চিমতো ফেঁড়ে গেছে, এক টুকরো কাচ বিঁধে আছে। জয় এক টানে তা তুলে ফেলল, রক্ত ছিটে এলো খানিকটা। সেই ক্ষততে গবগব করে খানিকটা মদ ঢাললো। অ্যালকোহল ভালো জীবাণুনাশকের কাজ করে।

মুরসালীনসহ চারজন যুবক ও আব্দুল আহাদ এবং তার সমবয়সী তিনজন কিশোর এখন বড়ঘরের বাসিন্দা। তারা বিগত দু'দিন পানি ও খাবারবিহীন। এ বাড়িতে তাদের একজন মমতাময়ী ছিল, সে আমির নিবাসে বন্দিনী। পিপাসায় কাতর প্রাণগুলোর শক্তি নেই সামান্য মাছিকেও প্রতিহত করে হাত নেড়ে।

যুবক চারজন অচেতন। ওদের শরীরের ক্ষততে ইনফ্রাকশন ধরে গেছে, সেখানে মাছি উড়ে বদরক্ত ও পুঁজের গন্ধ শুঁকছে। জয়ের সামনেই মুরসালীন বমি করে ফেলল আবার। শুধু পিচ্ছিল মিউকাসের থকথকে রক্ত উঠে এলো।জয় জিজ্ঞেস করে, “তুই যাসনি ক্যা, মুরসালীন? আমার টানে রয়ে গেছিস?”

মুরসালীন কথা বলতে পারল না। জয় বোতল খুলে বসল। একেবারে ঢকঢক করে এক বোতল শেষ করে ছেলে দুটোকে ডেকে বলল, “এই চারটাকে পাশের ঘরে নিয়ে যা।”

জয় পিছে পিছে গিয়ে কুকুরগুলোর সামনে পরিবেশন করে এলো দেহগুলো। কুকুরগুলো

মাংস খেয়ে অভ্যস্ত–পিট বুল। নামকরা মাংসাশী জাত। তারা জয়ের কাছে আসার পর থেকে প্রায় সময়ই ক্ষুধার্ত থেকেছে। আজ চারটে রক্তাক্ত আধমরা মানবদেহ পেয়ে খুবই সন্তুষ্ট হলো জয়ের ওপর। ছেলেদুটো কক্ষের দরজা বাইরে থেকে আঁটকে দিলো। কবীর দাঁতের মাড়ি শক্ত করে চোখ বুজে রইল। জয়ের অনেক কর্মকান্ড আছে যা তাকে ভীত ও অপ্রস্তুত করে তোলে।পাশের ঘর থেকে রক্ত ঠান্ডা করা আওয়াজ আসছিল। তাজা রক্ত-মাংস ছিঁড়েছুটে আসাও চারটে ক্ষুধার্ত কুকুরদের মাঝে টানা-হেঁচড়ার আওয়াজ মিশে একটা অসুস্থ পরিবেশ তৈরি হলো। মুরসালীন

তবু অনড় বসে রইল দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে। সে শুধু আন্দাজ করার চেষ্টা করল– আজ আনসারীর কথায় সেও যদি যেত ওদের সঙ্গে, জয় ঠিক খুঁজে বের করতো ওদেরকে, তাহলে জয়ের ব্যবহার কেমন হতো?

একসময় ওপাশের ঘরের আওয়াজ কমে এলো। জয় আর দেখলও না কুকুরগুলো তৃপ্তি পেয়েছে কিনা, তাদের ক্ষুধা মিটেছে কিনা অথবা শিকারগুলোর শরীরে আর কী পরিমাণ মাংস অবশিষ্ট আছে, আর কয় বেলা তারা নিজেদের ক্ষুধা নিবারণ করতে পারবে দেহগুলো থেকে।

সে আরাম করে বসে আরও খানিকটা মদ পান করল।এরপর মুরসালীনকে জিজ্ঞেস করল, “মরার আগে একটা প্রশ্নের জবাব দে, জিন্নাহর সাথে কী হয়েছিল? হামজা ভাইয়ের কাছে জিজ্ঞেস করার সুযোগ এখনও হয়নি, তুই বল।”

মুরসালীন কাশল বেশ কয়েকবার। হাতদুটো মাথার নিচে দিয়ে আস্তে কোরে শুয়ে পড়ল মেঝের ওপর কাত হয়ে। নাক দিয়ে রক্ত আসছে। শরীরটা, বিশেষত হাতদুটো থরথর করে কাঁপছে তার। সেই হাতে সে নিঃশব্দে জয়ের দিকে এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিয়ে বলল, “আম্মাকে দিবি এটা।”

জয় উত্তর পেল না। মুরসালীন আরাম করে পড়ে রইল নিজের বিদ্ধস্ত দেহখানা নিয়ে। চোখ বুজলে একটা সুন্দর মৃত্যু তাকে ডাকছে। সেখানে হাহাকার নেই, বন্দিত্ব নেই, নেই রক্ত, শরীরের চিৎকার, নেই নিপীড়ন, ক্ষমতার তুলনা...

মুরসালীনের কানে এখন আর এমদাদ, তৌফিক, নাঈমদের আর্তনাদ ও কুকুরদের ভোজের আওয়াজ বাজছে না। ওরা এখন মুরসালীনের চেয়ে সুখী। মুরসালীনের দুর্ভাগ্যের ওপর নিশ্চয়ই হাসছে!কেননা মুরসালীন এখন চোখের সামনে তিন কিশোরের মৃত্যু দেখার সম্ভাবনা নিয়ে বসে।

এই ভার থেকে তারা মুক্ত হয়েছে। তওফীক, আব্দুল আহাদ ও হাবিবুল্লাহ্কে কোনোক্রমেই নিয়ে যাওয়া যায়নি। তারা মুরসালীন ভাইকে রেখে যাবে না। ওদের বোকামির ওপর মুরসালীন হাসল। ওরা কি জানে না মুরসালীন ভাইয়ের সাধ্যি নেই ওদেরকে রক্ষা করার! মুরসালীন একটা পাপ করল। সে নিজের মৃত্যু আগে চাইল। এটা মহাপাপ কিনা জানে না মুরসালীন। কিন্তু চোখের সামনে ছোট ছোট কিশোর প্রাণগুলোর ঝরে যাওয়া দেখার সাহস মুরসালীনের নেই। কিন্তু দেখতে হলো।

জয় চারটে গুলি খরচা করল তওফিক ও হাবিবুল্লাহর খাতিরে।আব্দুল আহাদের চোখদুটো জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল তখনও। কিন্তু কখন যে তা জলে টসটসে হয়ে উঠল। তার আব্বা নেই। মায়ের আরেক ঘরে বিয়ে হয়েছে। নানীর বড় সাধ ছিল আব্দুল আহাদ হাফেজ হবে। বিশাল বড় ধার্মিক হবে। নানীর হাঁপানি আছে। সে শেষবার নানীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মাদ্রাসায় আসার পথে নানীকে বলেছিল, 'এবার আসার রমজানের ছুটিতে বাড়ি আসার সময় মুরসালীন ভাইয়ের কাছ থেকে শ'তিনেক টাকা নিয়ে তোর জন্য একখানা নতুন ইনহেলার কিনে আনব।

সারাদিন হুক্কুর হুক্কুর করে কাশিস।’কেনা হলো না। নানীকে তার দেখা হয় না কতগুলো মাস। আচ্ছা, নানী কি আর তাকে... মরা আহাদকেই, দেখতে পাবে কী? সে মুরসালীনের সামনে গিয়ে বসে বুক পেতে দেবার মতো করে তাকিয়ে রইল। তার একবার ওই আপাটির কথা মনে পড়ল। তার মনে হলো ওই আপাটি এখন থাকলে নিশ্চয়ই এই জয়কেই গুলি করে মেরে ফেলতো, তবু আব্দুল আহাদ আর মুরসালীন ভাইয়ের কিছু হতে দিতো না।

জয় খুব আন্তরিক ভঙ্গিতে হেসে আব্দুল আহাদকে টেনে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরল।

তার লম্বা দেহের তুলনায় আব্দুল আহাদ জয়ের বুক পর্যন্ত লেপ্টে রইল। এক হাত দিয়ে বুকের সাথে চেপে ধরে রেখে পিঠের ঠিক বামভাগে, যেখানটায় সামনের দিকে হৃদযন্ত্র থাকে সেইখানে মুজেল ঠেকিয়ে ট্রিগার চাপল।আব্দুল আহাদের হৃদপিন্ড ফুঁড়ে এসে সবটুকু রক্তই জয়ের বুক, লুঙ্গি, মুখ, হাতে ভরে গেল। জয় চোখদুটো বুজে তার অটোসেমি বেরেট-92FS পিস্তলের আরও চারখানা গুলি বড় তৃপ্তির সাথে আব্দুল আহাদের দেহকে সামান্য আলগা করে বুকে বিঁধাল। তার ঘরওয়ালি তার সাথে যে বিরোধিতার আয়োজন করেছে, তাতে আব্দুল

আহ্লাদের ওপর ঘরওয়ালির স্নেহের ভাগ অনেকটা। এদেরকে মুক্ত করার জন্যই এত আয়োজন। তাই জয় সেই আব্দুল আহাদের দেহটাকে তৃপ্তিমতো ঝাঝরা করল।

অন্তূ জানলে নিশ্চয়ই বলতো, জয় আমির মানসিক ভাবে অসুস্থ। পলাশকে পাগল বলা জয় আমির নিজেও স্যাডিস্ট।আব্দুল আহাদের দেহটাকে জয় ছেড়ে দেবার পরেও পড়ল কয়েক মুহূর্ত বাদে। কে জানে মৃত্যুর আগে কেন আব্দুল আহাদ আরমিণের ওড়নাখানা মুঠোয় চেপে ধরেছিল। হয়ত সব নারীতে মা লুকিয়ে থাকে তাই, আর তাদের আবরণের আঁচলে মমতার গন্ধ! এতিম আব্দুল আহাদ

শেষবার সেই মমতাটুকুই অন্তূর ওড়নার প্রান্তে খুঁজেছিল, যে ওড়না জয় আমির বুক ছুঁয়ে ঝুলছিল তখন।
জয় মুরসালীনকে মারল না। মুরসালীনকে অতগুলো ছোট ছোট প্রাণহারা দেহের মাঝে নরকের মেঝেতে শুইয়ে রেখে লুঙ্গির নিচ পৃষ্ঠে হাতের রক্ত মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলো বড়ঘর ছেড়ে। আরমিণকে নিয়ে তাকে দেশ ছাড়তে হবে আজ রাতেই। তার কাছে এমপির কাজ ছিল বড়ঘরে লাশ বিছানো। তা সম্পন্ন হবার পর এমপি আর কেন ছাড় দেবে তাকে অথবা আরমিণকে?হঠাৎ জয় ফিরে এলো। এক হাঁটু গেঁড়ে বসে দায়সারা হাতে

মুরসালীনের মাথাখানা উরুতে ঠেকিয়ে ঠোঁটের কাছে পানির গ্লাস ধরে বলল, "হা কর।"

তিনদিন পর সামান্য একটু পানি খাদ্যনালি পেরোতেই গলগল করে রক্তবমি উঠে এলো। জয়ের লুঙ্গিতেও লাগল। তাতে একটুও হেলদোল হলো না জয়ের। সে আরও খানিকটা পানি মুরসালীনকে পান করালো। উঠে যাবার সময় বিরবির করে বলল, "আত্মত্যাগের কুড়কুড়ানি যাদের থাকে, তাদের তোর মতো দড়ি ছিঁড়ে গোয়ামারা খাওয়া ছাড়া আর কী? কাল পালাসনি কেন?

আমি কি মহান? এখন তোকে নিজ হাতে ছেড়ে দেব?''

মুরসালীন বুঝল, সে খুব শীঘ্রই চেতনা হারাবে। তার মস্তিষ্কে অতিরিক্ত চাপ ও যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। দম আঁটকে আসছে। তবু সান্ত্বণা পায়–বাকি শিশুরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে মায়ের আঁচল ছুঁয়েছে! বন্দি মুরসালীনকে সত্যি জানাবে কে?গতরাতটা শেষ সুযোগ ছিল আনসারী সাহেবের জন্য। হামজা হাসপাতালে, জয়কে অ্যারেস্ট করবে রউফ কায়সার, সেই ফাঁকে কিছু না করতে পারলে জান যাবে সবার। বাড়ি পাহারায় তখনও বেশ কয়েকটা ছেলে থাকার পরেও এলেন তিনি। হাতাহাতি

হলো, ধাতব-অস্ত্র চলল টুকটাক। বিশাল প্রাচীর ঘেরা হামজার নগরী ওটা। তার একপাশে সচ্ছ পুকুর, ওপরপাশে বাসভবন, সামনে ওয়ার্কশপ, পেছনে পঁচা পুকুর, যেখানে হামজার মেশিনের বর্জ্য পদার্থ যায়। আশপাশে কেউ নেই ভেতরের আওয়াজ শোনার। রাত দশটা বাজতেই হামজার বাড়ির কয়েক গজ দূরত্বে লোক চলাচল কমে আসে। এসব বাড়ির শব্দরাও জানের শিকারী। এসব বাড়ির সামনে দিয়ে হাঁটতে হয় বোবা ও কালাদের। যে লোক কানে শোনে ও কথা বলতে পারে তার উচিত না রাতে বাড়ির আশেপাশে ঘেষা। কতরকমের শব্দ হতে

পারে, সেসব শুনে ফেলার পর আর কোনোদিন দুনিয়ার কোনো আওয়াজ না শুনতে পাবার সম্ভাবনা সিংহভাগ। কারণ প্রাণ না থাকলে কান আর জবান কাজ করে না। ছেলেরা কয়েকজন ধরাশায়ী ও আহত হলো। কোনোরকমে বাচ্চাগুলোকে বের করে এনে ছোট্ট একখানা মালগাড়িতে তোলা হলো। তখন আনসারীর হৃদযন্ত্রে কেউ হাতুর ঠুকছে। আনসারী সাহেব অতি দুঃখে বোকা বনেছেন কিনা জানা নেই। কিন্তু তিনি ভাবলেন মালগাড়িতে যখন তোলা হয়ে গেছে, ওরা ওদের বাড়ি বোধহয় এবার পৌঁছাবে।

কিন্তু মুরসালীন যাবে না। তিনি কেঁদে ফেললেন। দাড়ি ভিজে উঠল। মুরসালীন উনার হাতদুটো জড়িয়ে ধরে কপাল ঠেকায়, "চাচা, আজ আমি ওদের সাথে গেলে ওরা বাড়ি ফিরেও স্থায়ী হবে না। আমার খোঁজে খোঁজে ঠিক আবার ওদের জায়গা এরকম কোনো কালকুঠুরী হবে। হামজারা আমাকে বন্দি অথবা মৃত না দেখা অবধি সামান্য শান্তও হবে না। আপনি ওদের জীবন ঝুঁকিতে ফেলবেন না আমায় বাঁচাতে চেয়ে। এই তো বেঁচে আছি আমি। এই চিঠিটা নিয়ে গিয়ে বড় হুজুরসাহেবের কাছে দেবেন, উনি যেন মাদ্রাসাসহ সকল কার্যক্রম বন্ধ করে দেন।

আর একটা প্রাণের ভারও বইবার সাধ্যি আমার এই ভঙ্গুর কাধে নেই। আমি আমার রবের কাছে কী জবাব দেব? ওরা অনেক কোরআন শিখেছে। এবার বেঁচে থাকুক। নারায়ে তকবীর।''

বাকিরা উচ্চস্বরে বলে উঠল, ''আল্লাহু আকবর!''সবাই উঠল আনসারী সাহেবের সাথে। কেবল গেল না চার আধমরা যুবক ও তিন পাগল কিশোর। মুরসালীন ভাইয়ের সাথে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে তবু ভাইকে না নিয়ে ফিরে যাবে না।

আনসারী সাহেব চোখ মুছে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর সেদিন রাতের সরলতার ওপর ধিক্কার

দেয়াই যায়–তাঁর মালগাড়ি আটক হলো এমপির কাছে চারমাথার মোড়ের অদূরে। সকাল সকাল পুলিশ এসে তাঁকে এমপির ডেরা থেকে দেশোদ্রোহী হিসেবে ও তাঁর সাথে আসা জোয়ানদেরকে লাল-কমলা ইয়াবা বড়ি পাচারকারী হিসেবে ধরে নিয়ে গেল। মালগাড়ি থেকে বাচ্চাগুলোকে নামিয়ে নতুন নরক এমপির বাড়ির বেসমেন্টে জায়গা দেয়া হলো। মালগাড়িটা থানার হেফাজতে গেল স্মাগলিং-ভেহিকলস হিসেবে। সেদিন রাতের গল্প শেষ।পরদিন রাতে এমপির সাহেবের মনমতো ঘটনা ঘটতে গিয়েও ঘটেনি। রোজ পরিকল্পনা একমতো কাজ দেয় না, এ এক

সমস্যা বটে। আগের রাতে যেভাবে চমৎকারভাবে কতকগুলো জঙ্গি উনি শিকার করেছেন, পরদিন রাতে সেরকম নিখুঁতাভাবে তার লোক জয় আমিরকে আজরাইলের হাতে তুলে দিতে পারেনি। জারজটা এখনও হাসপাতালে পড়ে আছে। সমস্যা হলো, ছোকরারা ঘিরে আছে কেবিন। নয়ত ওখানে গিয়েই শেষ আশাটুকু রদ করে আসলে নিশ্চিন্ত হতে পারতেন তিনি। এখন জয়ের মরা-বাঁচা গলার কাঁটার মতোন বিঁধে আছে গলায়। এমপি সাহেব তাই খুবই খুশি হতে চেয়েও পারছেন না।সমস্যাটা হলো–কবীর যখন কলে রিমিকে বলছে, "বড়ভাবী সর্বনাশ

হয়ে গেছে, ভাবী। জয় ভাইয়ের গুলি লাগছে।
”

কবীরের ভেজা কণ্ঠ ও খবরখানা রিমির তরল মনকে ছলকে দিলো। সে ভুলে গেল সে বসে আছে হামজার চোখের সামনে। তার ওপর তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, “জয়ের...”
ব্যাস! ছোঁ মেরে ফোনটা কেঁড়ে নিয়ে হাতের সেন্সর ক্লিপ খুলে উঠে বসে পড়ল হামজা, “কী হইছে রে, কবীর? জয় কই? কই ও? কী বলছিলি তুই? বল বল!”
ওপাশে কবীরের দম আঁটকে গেল। হামজা গর্জে উঠল, “বল হারামজাদা! নয়ত একদম সামনে পেলে জিহ্বাটা একটান মেরে ছিঁড়ে

আনব।’’কথাটা সত্য। হামজা সত্যিই তা-ই করবে। থরথর করে কাঁপা গলায়, “জয় ভাইরে কারা জানি গুলি করছে ভাই। কিছু হয় নাই তেমন...’’

-“চুপ, খানকির বাচ্চা।’’

কবীর থরথরিয়ে উঠল।-“একদম সত্যিটা বল। যেন ধর আমি এখানে বসে লাইভ দেখতেছি। তোর কি মনেহয় হামজা পুঁটিমাছের জান নিয়ে দুনিয়ায় এসেছিল? একটু হাওয়া দিলেই মরমর কোরে ওঠা ছনের ঘরের মতো ভিতরে আমার কইলজার? ’’

কবীরের কিন্তু এবার একটুও ভয় লাগল না। হামজার এই কথা শুনে যে কেউ ভাববে এ তো বড় শক্ত কথা, কবীর জানে হামজার কলিজা এখন ইতোমধ্যে গুড়িয়ে পড়া ছনের ঘরের মতো অবস্থা। জয় যে খুঁটি সেই ঘরের।

কবীর কেঁদে ফেলল, “ভাই, জয় ভাইয়ের রক্ত লাগবে। রক্ত নাই কুত্থাও। কোনোহানে পাই নাই। আর্জেন্ট রক্ত দরকার।”

হামজা কল কাটার আগে শুধু বলল, “যদি আমাকে দেরিতে জানানোর কারণে জয়ের অসুস্থতার এক ফোঁটাও বাড়ে রে কবীর, তোর বংশ আমি দুনিয়া থেকে মুছে তুলব–

বলে দিলাম। আর কেউ জন্মাবে না সেইখানে, যারা জন্মেছিল থাকবে না। বাস্টার্ড!''
ততক্ষণে সে ক্যানোলা টান মেরে খুলে ফেলায় হাতের পিঠে এক পাঁজা রক্ত, হাতের শিরা ফুলে টসটসে হয়ে উঠেছে। রিমি জাপটে ধরল, ''শুনুন আমার কথা, এই!''
-''জীবনে আমার হাতে মার খাওনি, রিমি,না? আজ প্রথমদিন হতে পারে। আমার ফতোয়া-পাঞ্জাবী অর এনি আউটফিট কিছু এনেছ? ''রিমি ছলছল চোখে হামজার বুকের সামনে পথ আগলে কাছে এসে দাঁড়ায়, ''মারুন। তাই মারুন। তবু এই শরীরে ছুটতে ছুটতে যেতে পারবেন না। আমরাও যাব। কাল

সকালে রওনা দেব। আপনার ইঞ্জেকশন চলছে। আমি থেরাপির এপয়েনমেন্ট নিয়েছি। অন্তত আর একটা সপ্তাহ থাকতেই হবে এখানে। আপনি বুঝতে পারছেন না।

-"এক সপ্তায় ওদিকে আমার দাফন হয়ে যাবে। তুমি কি মনে করো আমি আমার এই এক দেহের মধ্যে বেঁচে আছি? আমার কর্ষিকাগুলো দিনাজপুর পড়ে আছে, রিমি।"

হামজার ইশারায় এগিয়ে এসে দুটো ছেলে হামজাকে শার্ট পরিয়ে দিলো। হামজা রিমিকে থুতনি ধরে চুষে একখানা শক্ত চুমু খেলো ঠোঁটে। এরপর আচমকা তার মনে হলো সে যেন হাজার বছর দাঁড়িয়ে। মেরুদণ্ড অবশ

তার, ধুপ করে কোমড় ভেঙে বসে পড়ল বেডের ওপর। নিচু হয়ে হেসে মাথা তুলে বলল, “আমার কী হয়েছে, রিমি? ডাক্তার কিছু বলেছে তোমায়? আমায় তো বলবে না শালারা। কী হয়ে গেছে আমার?”রিমির সবচেয়ে প্রচলিত ভাষা কান্না। বিশেষ কোরে এই পুরুষটির সম্মুখে। কয়েকটা টিস্যু ছিঁড়ে হাতে চেপে ধরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে যায় হামজা। পিছু নেয় রিমি। তুলি গিয়ে হামজার আরেক বাহু চেপে ধরল। কোয়েল সবার আগে হাঁটছে। হামজা বোন ও স্ত্রীর কাঁধের ওপর বিশাল শরীরের প্রায় সম্পূর্ণটুকু ভর ছেড়ে দিলো। উপায় নেই। তার শরীরে

স্নায়ু অকার্যকর লাগছে। পেছনে হামজার ছেলেরা, দুজন ওয়ার্ডবয়। তারা হুইল চেয়াল এনেছিল। হামজা বসল না। ওটা অসম্মানজনক, তার আগে হামজা মরে যাবে তবু পঙ্গুত্ব বরণ তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে মেরুদণ্ড ভেঙে বসে থাকবে পঙ্গুর মতো আর আরেকজন মেরুদণ্ড সোজা কোরে তাকে নিজ শক্তিতে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাবে, এর আগে হামজা মরে যাবে। তবু এই ধরণের সেবা গ্রহণ করা সম্ভব নয় তার দ্বারা। একজন প্রাইভেট ডাক্তার সাথে চলল ভ্রাম্যমান অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য।

নিজস্ব গাড়ির অবস্থা বেহাল। ভাড়া গাড়িতে রিমির কাধ ও বুকের মাঝ বরাবর মাথা রেখে চোখ বুজে পড়ে রইল হামজা। রিমি কিন্তু টের পাচ্ছে হামজার বুকের ধুকপুকানি। সে অবাক হয় সাথে ঈর্ষান্বিত–জয়ের জন্য এই লোকের বুকে এত তোলপাড় চলবে কেন? বাইরে থেকে মুখটা দেখলে মনে হবে দুনিয়ার সকল নিষ্ঠুরতা ওখানে আশ্রয় পেয়ে খুব আরামে আছে। কিন্তু অসুস্থ হামজার বুকের কাঁপুনি রিমিকে অবধি কাঁপিয়ে তুলল। এখন কি রিমির বলা উচিত লোকটার নিজের শরীরের অবস্থা কী? যে অবস্থা রিমির ঘেন্নায় ভাঙন ধরিয়ে দেবার জোগাড় কোরেছে!আজ

দুপুরের পর ডাক্তার আলাদাভাবে রিমিকে ডেকে নিয়ে বললেন, হামজা মেরুদন্ডে ভয়ানক আঘাত পেয়েছে সেদিন। অর্থাৎ স্পায়নাল কর্ড, যা সরাসরি প্রধান স্নায়ুর সাথে যুক্ত। এবং আঘাতের ফলে মেরুদন্ডে ব্লাড-সার্কুলেশন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। এতে ধীরে ধীরে মেরুদন্ডের কোষগুলো মরে যাবে।

ইমফ্লেমেশন তৈরি হবে। ইমফ্লেমেশনের ভয়াবহতাই হলো–প্রথমদিকে সাধারণ মনে হয়, ধীরে ধীরে.... অনলি অ্যা হিউম্যান হ্যাজ টু বিকাম সেন্সরিয়ালি-ডেড!

প্রথমবার চেতনা ফিরে পাবার পর থেকেই হামজা পিঠে অনুভূতি টের পাচ্ছিল না ও

মেরুদন্ডের আশেপাশের দৈহিক অংশ অবশ অনুভূত হচ্ছিল। এটা কয়েক সপ্তাহ বা কয়েকদিনের ব্যবধানে পারমানেন্ট-প্যারালাইজেশনে রূপ নিতে পারে। হামজার কন্ডিশন সেদিকেই এগোচ্ছে। তারওপর সে সবসময় ভীষণ মানসিক চাপে থাকে, চিকিৎসা নিতেও খুব অনাগ্রহী। এই অসময়ে চিকিৎসা ছেড়ে যাওয়াটা তার জন্য অপূরণীয় ক্ষতিকর হতে পারে।

শেষে ডাক্তার সাহেব ব্যক্তিগতভাবে বড় আফসোসের সঙ্গে মাথা নেড়ে বললেন, মেরুদণ্ড (স্পায়নাল কর্ড) মানুষের দ্বিতীয় প্রধান স্নায়ুতন্ত্র। যেকোনো ধরণের

নিউরোলজিক্যাল, সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম অর প্যারালাইজেশনে স্থায়ীভাবে ভুগতে হতে পারে। খুব তাড়াতাড়ি বড় একটা সার্জারি অথবা থেরাপির ডোজ শুরু না করলে পরে চেয়েও আর কিছু করার থাকবে না।

কিন্তু হামজা যেন পারলে যখন-তখন পালাবে হাসপাতাল ছেড়ে। সে জানে তার অনুপস্থিতিতে সব ভেসে যাচ্ছে ওদিকে। অথচ সে বুঝল না–ধ্বংস ও মৃত্যু অনিবার্য সত্য। এ দুটো থেকে পালিয়ে উল্টোপথে ভাগার পথেই এ দুটোর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে যায়। এটা প্রকৃতি।জয় নিঃশ্বাসের গতি স্বাভাবিক হলো সন্ধ্যার দিকে। চোখ খুলল

না। তবে ডাক্তার বললেন, সে ঘুমন্ত, চেতনা আসছে। হামজার পৌঁছাতে মাঝরাত হবে কমপক্ষে। কবীরের যে আরও একখানা গুরুদায়িত্ব আছে।

সে বেরিয়ে গেল ঘোড়াহাঁটের উদ্দেশ্যে।

আমির নিবাসে ঢুকতে গিয়ে গা ছমছম করে উঠল। তখন বেশ রাত অনেক হয়ে গেছে। পা দুটো কেউ পেছন থেকে টানছে যেন ফিরে যাবার তরে। জয়ের পাঠানো দুজনকে কোথাও দেখল না। তাহলে কি অন্ধকারে আরমিণ এত দীর্ঘসময় পার করেছে! আৎকে উঠে জোরে ধাক্কা ও লাত্থি মারতে লাগল সদর দরজায়।

অনেকক্ষণ পর ক্ষীণ স্বর ভেসে এলো, “কে? জয় আমির?”

কবীর হাসে, “ভাবী, আমি। আমি কবীর। একটু বিশ্বাস কোরে দরজা খোলেন তো। আমি আইছি।”

দশ মিনিট পেরিয়ে গেলেও দরজা খুলল না। কবীর ধাক্কায় আবার। ভেতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসে শাল কাঠের ভারী দরজার লোহার বিশাল হুড়কোটা খুলতে আরমিণের শরীরের শেষ শক্তিটুকুও যেন নিঃশেষ হলো। হুড়মুড় কোরে পড়ে যাচ্ছিল মেঝেতে। কবীর জাপটে ধরল, পরক্ষণে দ্রুত ছেড়ে দিয়ে ক্ষমা চাইবার মতো কোরে মাথা নত করল।টর্চের

আলোয় অন্তূকে দেখে বুক কেঁপে উঠল কবীরের। মনে হচ্ছে যেন কোনো দীর্ঘদিনের সাজাপ্রাপ্তা রাজবন্দিনী। মেঝের ওপর থোকা থোকা বমি শুকিয়ে লেপ্টে আছে। দু এক ফোটা রক্তও ভেসে আছে তাতে। কবীরের গা কেপে উঠল ভেতরের নির্জন ও অন্ধকারচ্ছন্নতা দেখে। কীভাবে সম্ভব একলা দিন-রাত কাটানো এই মৃত্যুপুরীতে?

-"ওরা আইছিল, দরজা খোলেন নাই?"

অন্তূ জবাব দিতে পারল না। কিন্তু বোঝা গেল সে খোলেনি। দরজা খোলাটা অন্তূর জীবনে সুখকর ঘটনা নয়, এছাড়াও এই নির্জন শিকারী বাড়ি, অপরিচিত নোংরা চরিত্রের

পুরুষ ও অন্তূর সচেতন নারীচিন্তা...ওরা বোধহয় ডেকে ডেকে গলা ব্যথা কোরে ফিরে গেছে।হঠাৎ-ই কবীরের কী হলো কে জানে, সে একটু ভাবনায় পড়ল। অন্তূকে পর্যবেক্ষক নজরে দেখতে দেখতে বুক নিংরে আসা এক চিলতে ছলকানো হাসি তার মুখে ফুটে উঠল। তার আন্দাজ; না না আন্দাজ নয়, সে নিশ্চিত যেন!

সে সদরঘরের বিভিন্ন কোণে দশটা-বারোটা মোমবাতি জ্বালালো। দ্বিধা, লজ্জা, ভয়ের কাঁপা হাতে খাবার তুলে অন্তূর সামনে তুলে বলল, “আমারে ক্ষমা করতে পারেন, আপা?’’

অন্তূ নিভু নিভু চোখে চায়। কবীর বুঝি কেঁদে ফেলবে। সে আবার বলে, "আমার বোন নাই। আমার মতোন পাপীরা আপনাগো মতোন মেয়েলোকের মর্যাদা কী বুঝবো? শিখি নাই তো কুনুদিন। আইজ মাপ করবেন?"

অন্তূ হাসে, "আমি কারও কোনো অপরাধ রাখিনি, ভাই। এভাবে বলবেন না। মাফ করার মালিক আমার খোদা তায়ালা। আমি এক নগন্য বান্দি।"

-"আমি শুনছি যার সাথে অন্যায় হয়, ওয় মাপ না করলে খুদাও মাপ করে না। আজ আপনে আমার হাতে একটু খাবার খাইলে

আমি ধরে নেব আপনে আমারে মাপ করছেন।”

অন্তূ খাবার নিলো। দু-একবার। আবার বমি আসছিল। কবীর নিজ হাতে পানি পান করায় অন্তূকে। তাকে ফিরতে হবে। অন্তূ এই বাড়ির সিঁড়ি পেরিয়ে উপরে উঠবে না, সেই শক্তি নেই তার শরীরে। কবীরেরও সাহস নেই তাকে পাটোয়ারী বাড়িতে নিয়ে আয়। ওদিকে মরণ।

সে বেরিয়ে যাবার আগে অদ্ভুতভাবে হেসে জানায়, -“আপনের দুশমন কইলাম হাসপাতালে, ভাবী। তাই আমি আইছি।”অন্তূ চোখের পাতা কাঁপল।

-“গুলি লাগছে কাল শেষ রাইতে। আমি যাই। সে না আইলে দরজা খুইলেন না। এমপির লোক আপনারে খুঁজতেছে। আমি আবার আসব।”

অন্তূর শরীরে কাঁপুনি উঠল। এটা হতে পারে না। জয় আমির এভাবে মরতে পারে না। এটা সময় নয়। অন্তূর থুতনি ভেঙে এলো, থরথর কোরে কাঁপল। আচ্ছা, বড়ঘরেরই বা কী অবস্থা? কেমন আছে ওরা? আছে তো? জয় আমির কী করেছে ওদের সঙ্গে? অন্তূর মনে হলো, সে এখানেই মরে যাবে। বাকি থাকা দায়ভার ও জীবনের পিছুটান তাকে বাঁধতে পারবে না। এত কঠিন হতে নেই

জীবন।হামজা পৌঁছাল শেষরাতে। কেবিনে ঢুকে হুড়মুড় কোরে ঝুঁকে পড়ল জয়ের বুকের ওপর। জয় শুয়ে আছে। বাহুতে ব্যান্ডেজ, উরুতে ব্যান্ডেজ। শরীরের ওপর পাতলা চাদর। অনেকক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে রইল চেহারার দিকে। এই মুখটা তার জয়ের। জয় তার ভাই কম, সন্তান। সে জয়ের বাপ, পয়দাকর্তা। কয়দিন পর জয়কে দেখে তার মনে হলো সে বুঝি কতকাল এই মুখখানায় নিজের নাম শোনে না। হাসির ঝংকার শোনে না।

-“জয়! ও জয়! তাকা, তাকা। ....তাকা জয়। আমার কিন্তু রাগ হচ্ছে। জয় রে?

''জয়ের মুখে হাত নেড়ে দেয়, মাথায় পরম স্নেহে হাত বুলায়। রিমির অবাক লাগে। জয়ের সামনে যে হামজাকে দেখা যায়, ওই হামজা আরেকজন। তার হাতদুটো থরথর কোরে কাপছে, মস্তিষ্কের নির্দেশ যেন হাতের পেশিতে পৌঁছাতে বিলম্ব হচ্ছে। হামজার সাথে কী হচ্ছে? জয়ের সুস্থ হতে হবে। দুই ভাইয়ের একবার খুব শীঘ্রই বিদেশ চলে যাওয়া জরুরী। চারদিকের অবস্থা ভালো না। এই সুযোগে দুজনের একচোট জম্পেশ চিকিৎসা সেরে নেয়া যাবে।

ডাক্তার ঢুকতেই থাবা মেরে ধরল, "রক্ত নিন। খবরদার যেন উচ্চারণ করবেন না,

আমি অসুস্থ, এ অবস্থায় রক্ত দিতে পারা যাবে না। আমার রক্ত ও নেগেটিভ। নার্স? নার্স কই? ডাকেন!”

তখনও শরীরের বিভিন্ন স্থানে দগদগে ঘা, ব্লাড-প্রেশার ও হার্টবিট হাই। কিন্তু হামজার কথার খেলাপি করতে নেই। ডাইরেক্ট ব্লাড ট্রান্সফিউশন ব্যবস্থা কোরে ফেলা হলো। বারবার একজন আরেকজনের রক্ত ভাগাভাগি করতে করতে এখন দুজনের রক্ত গুলে গেছে। কতবার এরকম লক্ত দেয়াদেয়ী হয়েছে হিসেব নেই। হামজা কী করে নিজের রক্তকে অস্বীকার করতে পারে। জয় এখন তার রক্ত। সে-ই জয়ের পরিবার, বংশপরিচয়,

আত্মীয়, মা-বাপ, ভাই, অভিভাবক। আর কারও স্থান নেই এখানে।রক্ত দেবার পর জয় অবজার্ভেশনে রইল। দু-একদিনের মাঝে তার শরীর ঠিক হয়ে উঠবে। তার শরীরে এসব মশা কামড় মারা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে আজ। এসবে কাবু হবার মতো ক্যাপাসিটি শরীর বহুকাল আগেই হারিয়ে ফেলেছে। হামজাও বাকি রাতটাসহ গোটা দিনটা হাসপাতালেই আরেকটু চিকিৎসার অধীনে রইল। এ অবস্থায় রক্ত দেবার ফলে তার শরীর আরও ভেঙে এলো। দুজন পাশাপাশি বেডে পড়ে রইল।

কবীর খুশির সংবাদখানা কাকে দেবে কাকে দেবে কোরে উত্তেজনা সামলাতে পারছিল না। কিন্তু সে অন্তত জয়কে দিলো না। একজনকে দেবার সাথে সাথে হাসপাতাল ভেঙে দিনাজপুর এসেছে, এই খবর শুনলে জয় এই মুহুর্তে দুনিয়াদারী ভুলে ছুটতে চাইবে ঘোড়াহাঁট। উন্মাদ হয়ে যাবে। কিন্তু কবীরের ভেতরে চেপে রাখা কঠিন।

রিমি, তুমি ও কোয়েল জয় ও হামজার বেডের মাঝখানে বসা। হামজা-জয় দুজনেই ঘুমোচ্ছে তখন। রাত শেষ হবার পথে। ফজরের আজান হবে। চারদিকে নিশ্চল নীরবতা।কবীর রিমির কানের কাছে ফিসফিস

করে বলল, “বড়ভাবী! জয় ভাই বাপ হইলে কেমন হবে, কন তো?”

রিমি বিস্ময়ে তাকায়। চোখদুটো চিকিচিক করে উঠল, চোখে জিজ্ঞেস করে, “হবে নাকি?”

কবীর ইঙ্গিতে যে ব্যাপারটা বোঝাতে পেরে খুবই গর্বিতবোধ করে নিজের ওপর। রিমির কি কান্না পাচ্ছে। একবার আরমিণকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদতে ইচ্ছে করছে। খুব।

হামজা পরদিন সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে আরেকটু রেস্ট কোরে রাতের ওষুধ খেয়ে কয়েকটা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বড়ঘরে গেল। জয় অনেকগুলো লাশ বিছিয়ে রেখে গেছে।

শুধু একটা পতঙ্গের জান এখনও সামান্য ফরফর করছে। পতঙ্গটার নাম মুরসালীন। এটা বিরক্তিকর।

সে মুরসালীনের আধমরা দেহটাকে গলা চেপে ধরে বসিয়ে বলল, "তুমি আমার খুব বড় বড় ক্ষতি করেছ, মুরসালীন। তোমরা নীতির কথা বলে বেড়াও, আমার মতো পাপীর ক্ষতি করো। তোমাদের নীতি কী বলে? পাপীর ক্ষতি করা নীতিবিরুদ্ধ নয়?"দুটো ছেলে বড় চাপাতিখানা ও শাণ এনে রাখল হামজার কাছে। হামজার হাতের পেশি অবশ প্রায়। ওরাই শাণে চাপাতি ঘঁষতে লাগল। ধাতব শব্দ উঠল অবরুদ্ধ ঘরখানায়। আর তিনজন

গিয়ে পাশের ঘর থেকে কুকুরের খেয়ে অবশিষ্ট রাখা হাড্ডিসার দেহ-কঙ্কালগুলো এনে ফেলল মেঝের ওপর।

আজ আবার চুল্লি চলবে বড়ঘরে। ভালো আয়োজন হবে আজ। হামজা চাপাতি একহাতে তুলে ধরল, একটু জোর ও জেদ বেশি দিতে হলো শরীরের ওপর।

মুরসালীনকে বলল, "আমি আগে আলাদাভাবে তুমি জীবিত থাকতেই তোমার হাত দু-খানা চাই, বুঝলে! তোমার এই হাতদুটো আমাদের বিরুদ্ধে খুব আপত্তিকর কথাবার্তা লিখেছে। আমার পালক বাপকে মেরেছে। আর অনেককিছু।"এক কোপে মুরসালীনের

ডানহাতখানা কেটে ফেলল হামজা। চামড়ার সাথে ঝুলছিল হাতখানা, হামজা টান মেরে ছিঁড়ে নিলো। মুরসালীনের চিৎকার বড় শ্রুতিমধুর লাগছে, এটা শুনবে বলে সে মুখে কিছু গুঁজে দেয়নি। মুরসালীনের চোখে তখনও অভয়। একটুও আঁকুতি নেই। সে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া হাতখানার দিকে তাকিয়ে হাসল।

ওই হাতদুটো শেষবার তার মায়ের কাছে চিঠি লিখেছে। ওই হাতদুটো ধরে মা কতবার বলেছে, শোন মুরসালীন, ভার্সিটিতে পড়তে দিছি বলে জাহিল হবি, তা কিন্তু না। ইকদম ত্যায্য করব। তোর এই হাত যেন কারও

কষ্টের কারণ না হয়। তোর হাতেখানা যেন কখনও মিথ্যা ও মজলুমের বিপক্ষে না লেখে। আল্লাহ পাক হাশরে প্রতিটা অঙ্গের হিসাব চাইবেন। অঙ্গরা নিজেরা নিজেদের কৃতকর্মের সাক্ষী দেবে।বলতে বলতে মরিয়ম কেঁদে ফেলতেন। মুরসালীন হেসে জড়িয়ে ধরতো আম্মাকে ওই হাতখানা দিয়েই। আজ এই অবস্থায় তিনি দেখলে নিশ্চয়ই মুরসালীনের বুকে জায়গা নিতেন, কিন্তু মুরসালীনের হাতখানা নেই উনাকে জড়িয়ে নেবার জন্য। মুরসালীন তাই হাসল। তার খুব পিপাসা পাচ্ছে। এক গ্লাস ঠান্ডা পানির জন্য বুক চিড়ে আসার মতো অনুভূত হলো। সে অবাক হলো,

মৃত্যু পূর্ববর্তী প্রভাব তাকেও ঘিরে ধরতে সক্ষম হয়েছে। মৃত্যুর তো আসলেই অনেক শক্তি। মানুষ কেবল সান্ত্বণা পেতে বলে মৃত্যুকে আমি ডরি না। মৃত্যুর আগ মুহুর্ত মৃত্যু মুহুর্তের চেয়ে কঠিন বুঝি!

বাম হাতখানাও কেটে নিলো হামজা।

মুরসালীনকে দেখতে অদ্ভুত লাগল। জীর্ণ হয়ে আসা লম্বা শরীরে লম্বা লম্বা সাহসী হাত দু-খানা নেই আর। টপটপ করে রক্ত পড়ে যাচ্ছিল মেঝেতে। হামজা একটা ছেলের ওপর ভর দিয়ে অনেকটা সময় নিয়ে মেরুদন্ড সোজা কোরে উঠে দাঁড়ায়। উঠতে গিয়ে চারবার মতোন মেরুদণ্ড মুড়ে এলো, ঝুঁকে

পড়ল অর্ধঙ্গ রোগীর মতো।পিস্তলখানা বুক বরাবর তাক করল মুরসালীনের, “কোনো শেষ ইচ্ছা আছে তোমার, মুরসালীন? আছে? বলো।”

মুরসালীন পাঠ করে—’আশশাহাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, ওয়াশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসুলূহ্! আশশাহাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়া....’

ভোঁতা চারটে আওয়াজ উঠল। পরপর চারটে গুলি মুরসালীনের বুকের প্রায় একই জায়গা ফুঁড়ে পেছনের দেয়ালে গেঁথে রইল। একটা গুলি বিঁধে রইল মুরসালীনের বিদ্রোহী বুকের হৃদযন্ত্রের পেশীতে।চুল্লিতে কয়লা ও কোক

অল্প ঢালা হলো। অনেকগুলো তাজা দেহ আছে আজ। কোক অত না হলেও চুল্লি জ্বলল। মুরসালীনের শরীরখানা গলে লাল টকটকে লাভা হয়ে উঠল। তার বিদ্রোহ, বিপ্লবের পিপাসা, টগবগে রক্তের স্ফূলিঙ্গ, এক অসহায় মায়ের শেষ প্রতীক্ষা এক মেটাল-মেল্টিং চুল্লিতে কিছু সময়ের কারবারে গলে গেল।

ফুরিয়ে গেল মুরসালীনও। মুরসালীনের মায়ের অপেক্ষা যদিও ফুরোয়নি। তিনি যে আনসারী মোল্লার কাছে কথা নিয়েছেন মুরসালীনকে নিয়ে আসবেন।

হামজার কাজ ফুরোলো বড়ঘরে। তাকে এখন একবার ঘোড়াহাঁটে যেতে হবে।রাতের বেলা ঘরে ফিরে ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়ল হামজা। ঘুম আসার সম্ভাবনা নেই। রিমি কোনোভাবেই জয়কে আবার দেখতে যেতে দেয়নি। পা দুটো ঝিমঝিম করছিল, যেন রক্ত ও স্নায়ু নেই।

রিমি পা টিপতে টিপতে লাগল। হামজা রিমিকে চোখ ভরে দেখতে লাগল। শাড়ির আঁচলটা প্রায় নেমে আছে বুক থেকে। চুলগুলো এলোমেলো হয়ে খোঁপা থেকে বেরিয়ে ছড়িয়ে আছে মুখ, কপাল ও গলার দিকে। সে কি দিনদিন পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে কিনা

জানা নেই। তার বয়সটাও রিমির চেয়ে অনেকটাই বেশি। এই ছোট্ট মেয়েটা আজকাল অবাধ্য হতে লেগেছে। এসব কার করা ক্ষতি? হামজার ভেতরের চাহিদায় অসুস্থতার চাপ পড়ল।

কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি ও দৃষ্টিতে ওঠা কথা রিমি বোঝে। হামজাকে দমাতেই নাকি জানা নেই, রিমি বলে উঠল, "জয় ভাইয়া আর দু'দিনের মধ্যেই বাড়ি ফিরে আসবে। কোনোরকম উঠে দাঁড়াতে পারলেই তাকে বেঁধেও আর হাসপাতালে রাখা যাবে না। সেই ফাঁকে তাকে এদিকের দেখভালে রেখে আপনি যাবেন ট্রিটমেন্টের জন্য। নিজের ভালো

পাগলও বোঝে।”হামজা বড় বাধ্যের মতো মাথা নাড়ল। কিছুক্ষণ চুপচাপ নিষ্পলক রিমিকে দেখে জিজ্ঞেস করল, “আরমিণ কোথায়? বাড়িতে নেই কেন?”

রিমির শরীরটা ঝাঁকি খেল একটা। কিন্তু কী যে তার হলো, সে চট কোরে বলে ফেলল, “সেটা নিয়েই তো হয়রান আমি। সারাদিন ভাবছি সে কোথায় গেছে? আমরা যেদিন আপনার কাছে গেলাম, ওকে তো বাড়িতে রেখে গেছিলাম।”

হামজা একটু চুপ থেকে বলল, “সে বাড়িতেই ছিল, যখন তোমরা যাও?”

হামজার সামনে মিথ্যা বলা দুঃসাধ্য। রিমির গলা কাঁপছিল, তবু সে বলল, “হ্যাঁ। আর কোথায় থাকবে? কিন্তু আমার মনে হয় আপনি তো এমনিতে ও বাড়িতে যাবার অনুমতি দেন না, ফাঁকা পেয়ে ওখানেই গেছে।”হামজা বিশ্বাস করেছে কিনা তা দেখার জন্য তাকাতেও সংকোচ হলো রিমির। কিন্তু সে কোনভাবেই বলবে না আরমিণ কোথায়। সে হামজাকে দূর্ভাগ্যবশত ভালোবাসতে পারে, কিন্তু বিশ্বাস করে না। সারাটাদিন তার যে কলিজা পুড়ছে, সেটাও সে এই পুরুষটাকে বুঝতে দেয়নি। সেই জ্বলুনিতে এক পশলা ঠান্ডা পানির মতো

সংবাদ—আরমিণ গর্ভবতী। রিমি গোসলে গিয়ে পাগলের মতো কেঁদেছে। সে তার দুটো সন্তানের ভ্রূণকে নিজ হাতে হত্যা করেছে। আরমিণ কেন সামলে রেখেছে তাহলে? সন্দেহ তো রিমির আগেই হয়েছিল। সেদিনও রান্নাঘরে এই কথাটা বড় ধূর্ততার সাথে এড়িয়ে গেছে আরমিণ। রিমি আরমিণের মতো চালাক হলে সেদিনই ধরে ফেলতো। কিন্তু জেনেশুনে আরমিণ জয় আমির সন্তান গর্ভে ধারণ করেছে কেন? কী উদ্দেশ্যে? সকালটা হামজার চরম ব্যস্ত কাটল। অসুস্থতা পাত্তাই পেল না। সে সকাল সকাল দল নিয়ে পুলিশফাঁড়ি, ক্লাব ও পার্টিঅফিস ঘুরল। এই

কদিনের সব তথ্য পকেটে ভরলো।
আরমিণের বাপের বাড়ি থেকে খোঁজ এলো, সেখানে আরমিণ নেই। রিমি বলতেও পারছিল না, এত খোঁজ করছেন কেন? বাড়ির বউ নিখোঁজ, খোঁজ তো করতেই হবে।
হামজা হেসে জিজ্ঞেস করল, "তুমি যখন ঢাকার উদ্দেশ্যে বেরোলে, তখন আরমিণ সত্যিই বাড়িতে ছিল?"
-"কেন জিজ্ঞেস করছেন বারবার একই কথা?
"

রিমির দুই গালে পরম আবেশে দুই হাত রেখে ঠান্ডা গলায় বলল হামজা, "রিমি, আমার আর জয়ের মাঝে যে-ই আসুক, যা-ই

আসুক তাকে আমার তোপে ছাই হতে হবে। মুরসালীন বড়ঘরে থেকে আমার অনেক ক্ষতিই করেছে। তার মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ক্ষতি– জয়কে ভুলভাল অনেককিছু বুঝিয়েছে। জয়ের আমার প্রতি দ্বিধাভরা আচরণের কারণ ছিল সে। আমি কীভাবে সহ্য করেছি কয়টাদিন, আন্দাজ করতে পারো? আমার আন্দাজ সঠিক হলে সে জয়কে এটাও বলে দিয়েছে আমি জিন্নাহকে মেরে ফেলেছি।''রিমি আঁৎকে উঠল। এই জিন্নাহর খোঁজে বছরের পর বছর পাগল হয়ে ছুটতে দেখেছে সে জয়কে।

-“কেন মেরেছি জানো? জিন্নাহ্ থাকলে জয় আমার দেয়া ঠিকানা ও পরিচয় ভুলে যেত। একসময় হয়ত আমার সঙ্গও ছেড়ে দিতো। আমি সহ্য করতে পারতাম না, রিমি। তাই জিন্নাহ্টাকেই সরিয়ে নিয়েছি জগৎ থেকে। জয় শুধু খুঁজবে, আমি সঙ্গ দেব তাকে খুঁজতে, কিন্তু তাতে পাবার সম্ভাবনা থাকবে না। একথা জয় জানলে যদি আমায় ঘেন্না করে আমি ওর পা ধরে ক্ষমা চাইব। ওকে বলব, তুই মেরে ফেল আমায়। তবু তোর চোখ দিয়ে আমায় ঘৃণার নজরে দেখিস না। আমার সয় না। পাগল হয়ে যাব আমি। ওকে আমি এই দেখো, আমার এই দুই হাতে, এই

হাতের ওপর মানুষ করেছি। ও আমার জান, আমার ছেলে। আমার এই হাত ও ছাড়তে পারে না কোনো শর্তেই। সেই শর্তকেই আমি দুনিয়ায় রাখব না।''রিমির ভেতরে এক নিগূঢ় ভয় কাজ করতে লাগল হামজার জন্য। হামজার কঠিন স্বভাবের মুখখানায় এখন নিদারুণ আবেগ খেলছে। কিন্তু রিমি দেখল এই আবেগ যেন ধারালো শূলের চাইতেও বর্বর আর ভয়াবহ।

-“সেই একই কাজ আরও সূক্ষ্ম আর গভীরভাবে আরমিণ করেছে। আমি বলেছিলাম না তোমায় ও আমার বিশাল ক্ষতি করছে! তুমি জানো না রিমি, ও জয়কে

চিরতরে নিজের সীমানায় বন্দি করার বন্দোবস্ত করে ফেলেছে। কী ভয়ানক, রিমি। ভাবতে পারো? ওকে আমি ভয় পাই। হ্যাঁ, ঠিক ছিলে তুমি। খুব ভয় পাই আমি। কারণ ও ভয় পায় না। না হারাতে না মরতে।”

রিমি দম আঁটকে আসছিল এতক্ষণ, এবার সে কেমন অপ্রকৃতস্থর মতোন প্রতিবাদ কোরে উঠল, “আমি থাকতে আপনি ওর কোনো ক্ষতি করতে পারবেন না। তার আগে আমাকে মারতে হবে।”

হামজা হেসে ফেলল, “খুব নিম্নমানের ভাবনা তোমার, গিন্নি। তুমি আমার সঙ্গে বিরোধ রচনা করছো। তুমি আজও ফেইল। পারলে

না আমার অর্ধাঙ্গিনী হতে।''-“এ আমার সৌভাগ্য, গর্বের কথা।''

-“খুব বাজে কথা, রিমি।''

-“আপনি এত নোংরা কেন? নিজের ভেতরে যে এত এত পাপ পুষছেন, তারা কখনও ধিক্কার দিয়ে ওঠে না আপনাকে?''

-“মানবজীবনে ক্ষুধা, চাহিদা, প্রবৃত্তি জলন্ত নক্ষত্রের মতো। নক্ষত্র বেশি সক্রিয় হলে তা মারা যায়। আর নক্ষত্রের মৃত্যু মানে বোঝো তো, রিমি? কালগহ্বরের সৃষ্টি। যা এতটাই অসীম যে তার ভেতর আলোকরশ্মি প্রবেশ করলে তাও আর মুক্তি পায় না, বিলীন হয়ে যায়। তাতে তুমি কত কী দেবে? কত ক্ষমতা,

কত ঐশ্বর্য, কত শক্তি! সব তলিয়ে যাবে অসীম বিবরে।
আমি সেরকম এক মৃত নক্ষত্র। ন্যায়-নীতিও সব তলিয়ে যায় আমার গর্ভে। পুস্তকগত জ্ঞানে আমি মানুষের সংজ্ঞা জানি। সে হিসেবে আমি মানুষ নই, রিমি। আমি হলাম ধাঙর। আমি এতটাই ক্ষুধার্ত যে দুনিয়ার সমস্ত আবর্জনাসহ পাপ-পূণ্যকেও গ্রাস করে বসে আছি। মেনে নাও, সুখে থাকবে।''-"এটা সুখ নয়, নরকবাস।''
-"নারী কোথায় সুখী তা আমার জানা নেই, তাই বলতে পারছি না। তবে যদি এটা নরকবাস হয়, হলো। তবু আমার সঙ্গ ছাড়ার

সুযোগ নেই তোমার কাছে। তুমি আমার অর্ধাঙ্গিনী, রিমি।"

রিমির চোখদুটো লাল হয়ে ছলছল করতে লাগল। হামজা বলল, "আরমিণ কি আমির নিবাসে, রিমি?"

রিমি জবাব দেয় না, কেবল চোখেই ভষ্ম করে দিতে চাইল যেন।

-"আমার বিরোধিতা কোরো না, রিমি। আমি বিরোধীকে জিইয়ে রাখি না। আজ তোমার আচরণে যদি একবারের জন্যও আমার মনে হয় তুমি আমার কাজে বাঁধা হতে চাও, আমি তোমাকে মেরে ফেলব। কেননা এবার আমি যা করব, তা আমার অস্তিত্বের প্রশ্ন।"রিমি তবু

ঠিক হামজার পথ আঁটকে দাঁড়িয়ে বলল, “এতদিন যা করেছেন, আমি কোনোদিন সরাসরি বাঁধা দিতে পারিনি আপনাকে। কিন্তু আজ এমন হবে না যে আমি এখানে বসে থাকব চুপচাপ, আপনি ওদিকে যা নয় তাই করবেন।”

হামজা খুব সাবলীলভাবে রিমিকে সরাতে চাইল, কিন্তু সে অবাক হয়ে গেল, রিমি পাথরের মতো দাঁড়িয়ে, “আজ সব সীমা, সম্মান, মনুষত্বের ঊর্ধ্বে চলে গেছেন, আপনি। আমাকেও যেতে দিন।”হামজার চোখদুটো জ্বলে উঠল যেন। রিমি এরকম হামজার সম্মুখীন হলো প্রথমবার। সত্যিই হামজা

রিমির চুলগুলো মুঠো কোরে চেপে ধরে কোনো এক বিড়ালছানার মতো ছুঁড়ে ফেলল মেঝের ওপর রিমিকে। মরমর করে উঠল রিমির হাড়গুলো। কপাল ও থুতনি ফাটল। তবু রিমি উঠে এসে হামজাকে কষে এক ধাক্কা মারে। হামজা টাল সামলে রিমির গলা চেপে ধরে ছেচড়ে রুমের ভেতরে নিয়ে গিয়ে ধপাস করে ফেলে দিলো বিছানার ওপর। প্রায় বুকের চড়ে গলাটা চেপে ধরে রাখল কতক্ষণ। রিমির চোখে রক্ত উঠে এলো, তখন ছেড়ে দিয়ে বলল—

-“তুই নিজে আমার সন্তানের খুন করে ওই খানকি মাগীর বাচ্চা নিয়ে পূণ্যবতীর পরিচয়

দিতে চাচ্ছিস? তোর কথা অনুযায়ী আমার মতো পাপীর সন্তান থাকতে নেই, তো জয় কি ফেরেশতা রে? আমার আর জয়ের পথ এখনও অনেক লম্বা। তোদের মতো দুই চারি শ খানেক বেইমান মাগী খুন হতে পারে যদি বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। জয়ের জীবনে আমি কোনো পিছুটান রাখব না। তুই তা বদলাতে পারবি না।''তুলি এসে হামজাকে ধাক্কা মেরে সরালো, "পাগল হয়ে গেছিস তুই? মানুষ মারতে মারতে হাত এত লম্বা হয়ে গেছে, ঘরে যে আদর্শের মুখোশ পড়ে থাকতি, সেটাও খসে গেছে? সরে যা জানোয়ার!''

হামজা বেরিয়ে গেল। কাশতে কাশতে দম আঁটকে এলো রিমির। তবু সে কাঁকুতি করে ওঠে তুলির কাছে, “আপু, ওকে থামান। ও আজ সর্বনাশ করতে যাচ্ছে।”

হামজা তুলিকে টেনে বের করে দিয়ে রিমিকে বিছানার ওপর ফেলে রেখে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে রেখে বেরোলো। বলে গেল এ বাড়ির সীমানা একটা পাখিও যেন না পেরোতে পারে।জয় আমির গুলিবিদ্ধ হবার শেষরাত থেকে হাসপাতালের বাইরে মোতায়েন ছিল আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। সেদিন দুপুরের পর পরই রউফ কায়সারের পক্ষ থেকে জয়ের কেবিনের সামনে জড়ো হয়ে

পড়ল। ওয়ান্টেড ক্রিমিনাল জয় আমির আইনের নজরদারীতে বন্দি হয়ে পড়ল। আইনের পক্ষ থেকে তার জন্য এখন কেবল জীবন বাঁচিয়ে নেবার মতো চিকিৎসা গ্রহণের অনুমতি রয়েছে। সামান্য সুস্থ হলেই কারাগারে স্থানান্তর করা হবে, এরপর আদালত।

হাসপাতালে যাবার পর হামজা অবাক হলো পুলিশদের আগ্রাসী ভূমিকা দেখে। সে সকালে উপরমহলে কথা বলে এসেছে, লাখ কয়েক টাকা প্রাথমিক পর্যায়ে গুণে ছড়িয়ে দিয়ে এসেছে। দুজনের আউটডোর ভিসা রি-নিউ হচ্ছে ওদিকে। এর মধ্যে এত দুঃসাহস

দেখানোর কারণ কী! থানা পুলিশ হামজাকে দেখে একটু নড়েচড়ে উঠল বটে। একটু গাইগুই করল। কেউ বা বলল, ‘পুলিশফাঁড়ি থেকে ভেগে এসে ঠিক করেনি জয় আমির। নয়ত আমরা সামান্য কনসিডার করতে পারতাম হামজা সাহেব। এখন আর সেই জায়গা নেই।’তাহলে কি এমপিও তাই চেয়েছিল? যে যদি তার প্রচেষ্টায় জয় আমিরের কৈ মাছের জান না-ও বেরোয়, তো ভয়ানক এক মামলায় তাকে দীর্ঘভাবে ফাঁসতে তো হবেই।

জয় হামজাকে দেখে কেবল তাকিয়ে রইল। তার ভেতরে অতিরিক্ত প্রশ্ন জমে সে বোবা

হয়ে গেছে যেন। এখনও রিজার্ভ ব্যাগের খানিকটা রক্ত খুব ধীরে শরীরে যাচ্ছে তার। সাডেটিভের প্রভাবে চোখ বুজে এলো। হামজা হাত ধরে বসে রইল। দুপুর পেরিয়ে গেল। তখন দুপুরের ইঞ্জেকশন দেবার পর জয় আবার ঘুমিয়েছে। হামজার ওঠার সময় হলো। সে জয়ের মাথায় হাত নেড়ে উঠে এলো। জয়ের দিকে একবার কোরে তাকালেই সে টের পাচ্ছে আরমিণের কাছে যাওয়া তার জন্য ফরজ হয়ে গেছে। তার এখন আরও অনেক ধ্বংসতান্ডব চালানোর ছিল। কিন্তু তা এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বোকামি হবে। দিন তো ফুরিয়ে গেল না।

এখন আপাতত কোনোরকম জয়কে বর্তমানের বিষাক্ত পিছুটানটুকু ছাড়িয়ে দেশের বাইরে পা রাখতে পারলেই ব্যাস।রাত হলো হামজার আমির নিবাসে পৌঁছাতে। অনেকদিন পর এলো এখানে, বহুদিন পর। তার বুকে একটা ব্যথা কাজ করে এই বাড়ির কথা খেয়ালে এলেও। হুমায়িরা ফুপুর মুখখানা আবছাভাবে মনে পড়লে হামজার মন চায় আরেকবার মৃত্যুর খেলা খেলতে। আজও মনে পড়ল–শীর্ণদেহী লম্বাটে হামজা চাল-সবজি, পকেটে হুমায়িরার দেয়া ক'টা টাকা নিয়ে আমির নিবাসের ফটক পেরিয়ে বেরোচ্ছে। দারোয়ার পিঠ চাপড়ে বলছে, "ফুবুডারে

ভালো পাইয়া চুইষা খাইতাছো, মিয়া? বড়লোক দেইখা বিয়া দিয়ার এই তো ফায়দা, অ্যাহ্!''হামজার যে কী লজ্জা করতো! ইচ্ছে করতো দাফন হয়ে যেতে। তবু সে মাথাটা নত কোরে বেরিয়ে যেত। শাহানা বসে আছে, রান্না হবে সে বাজারগুলো নিয়ে গেলে। আজ হামজার বাড়িতে বাজার আসে ভ্যান ভরে। সেই বাজার টেনে দোতলায় তুলতে দুজন লোক হাঁপিয়ে ওঠে। কিন্তু হুমায়িরা ফুপু আর নেই ঋণ ফিরিয়ে নেবার জন্য, অথবা সমাজের বিশিষ্ট মানুষ হয়ে ওঠা হামজাকে দেখার জন্য।

সদরদরজায় ধাক্কাধাক্কি করে ভেঙে ফেলার জোগাড় হলো, তবু ভেতর থেকে দরজা খুলল না আরমিণ। গালি দিলো হামজা, "শেয়ানা মাগী!"হামজা কথা না বললে দরজা খুলবে না, আর হামজার কণ্ঠ শুনলে তো মোটেই না। যে চালাক চেংরি! জঙ্গলের পার্শ্বে পিছন দিকের আধভাঙা জানালা-দরজা পাওয়া গেল। এত বছর পড়ে আছে বাড়ি, চোর ও নেশাখোরদের কাছে ভূতের কোনো কদর নেই। এ বাড়ির দামি সরঞ্জামগুলো খুলে নিয়ে বিক্রির চেষ্টা থেকে জয়নাল আমিরের ভূতও ঠেকাতে পারেনি তাদেরকে।

তা হামজার কাজে লাগল বাংলা ঘরের পেছনের লোহার দরজা খুলে নিয়ে গিয়ে কে কোথায় বিক্রি কোরে খেয়েছে। সামনের কাঠের দুয়ার ঘুণে ধরা। কয়েকজন জোয়ানের আঘাতে তা ভেঙে পথ তৈরি হলো। সেদিক দিয়ে ঢুকলেই উঠান, তারপর বড় বারান্দা পেরোলেই অন্দরমহল। খুব সহজে সে এসে অন্তূর পেছনে হলরুমের মাঝখানে দাঁড়াল। অন্তূ তখন ভীত-সতন্ত্র চোখে দরজায় কান বাঁধিয়ে বসা।

-"আর শব্দ আসছে না, আরমিণ? লোকগুলো বোধহয় চলে গেছে। জানে তুমি সতর্ক মেয়েলোক, খুলবে না কখনোই।"অন্তূর

শরীরটা থরথর কোরে কেঁপে উঠল। হামজা মদের বোতলে চুমুক দিতে দিতে টলতে টলতে এসে দাঁড়াল অন্তূর খুব কাছে।

ভয়ংকর দৃশ্য।

অন্তূকে পরখ করে দেখে হামজা চোখ বুজে হাসল। সপ্তাহখানেক আগে দেখেও বোঝার একরত্তি উপায় ছিল না, সে গর্ভবতী। এত শেয়ানা মেয়েলোকের দেখা আগে পায়নি হামজা। কিন্তু আজ এই অন্ধ কুঠিরে একাকি না খাওয়াসহ বিভিন্ন চাপ ঠিক সেই মেয়েলি অসুস্থতা টেনে বের কোরে এনেছে। তবু সুন্দরী! যদিও হামজার কোনো আগ্রহ নেই অন্তূর মেয়েলি শরীরে। জয় আজ অন্তূকে

দেখলে এক মুহুর্তে ধরে ফেলতো, তার বীর্য তার ঘরওয়ালির শরীরে বাড়ন্ত।হামজা অন্তূর কাছ ঘেষে বসে পড়ল। হা কোরে শ্বাস ফেলল কয়েকটা। দুজন বিরোধীতার চূড়ান্ত ঘোষনা জানাল যেন পাশাপাশি বসে। উৎকট গন্ধ হলরুম জুড়ে। শব্দ কোরে মদের বোতল খুলে একটি ছোট্ট শিশি থেকে কী একটা তরল ঢালল তাতে হামজা। ঝাঁঝালো গন্ধ সেই তরলের। অন্তূ জানে না ওটা ফরমালডিহাইড লিক্যুইড। অ্যালকোহলের সাথে মিশলে ফরমালিন জাতীয় বিষ তৈরি হয়। এ অবস্থায় তা অন্তূর জন্য মরণসম ও ভ্রূণের জন্য অবধারিত মরণ।

হামজা অন্তূর মুখের খুব কাছে মুখ নিয়ে ঘাঁড় কাত করে বলল, “তুমি আমার এত ক্ষতি কেন করলে, আরমিণ?”

অন্তূ শক্ত ঢোক গিলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এটা উপযুক্ত সময় নয় জবাব দেবার। শান্তভাবে মোকাবেলা করার চেষ্টা করা উচিত।-“তুমি আমার জয়কে ঠিক কীভাবে ধ্বংস করতে চাও? আর কত ক্ষতি করে থামবে?”

অন্তূ হেসেই ফেলল, “জয় আমিরের ক্ষতি? সেটা চাইলেও কেউ আপনার চেয়ে বেশি করতে পারবে? সম্ভব?”

-“আমি? আমি ক্ষতি করব জয়ের?”

-“আর করার জায়গা নেই। সে ইতোমধ্যে আপনার সহচর্যে পুরোপুরি ধ্বংসপ্রাপ্ত।”

হামজা অন্তূর মুখের ওপর শ্বাস ফেলে অবাক হবার মতো বলল, “আজও এই পরিস্থিতিতেও তুমি এভাবে কথা বলবে আমার সঙ্গে?”

অন্তূ জবাব দেবার প্রয়োজন মনে করল না।

হামজা খুব সুন্দর কোরে হাসল, “আমাকে ধ্বংস করা তোমার স্বপ্ন। তোমার স্বপ্ন দেখার অধিকার তো আমি কেড়ে নিতে পারি না। কিন্তু এছাড়াও আরও অনেক কিছুই রয়েছে যা আমি কেড়ে নিতে পারি। যা তোমার মতো

ছলনাময়ী, কুচক্রী সর্পিনীর কাছ থেকে তার বিষদাঁত ভেঙে নেবে।''

-“আর নেই কিছু আমার।''গলা আরও শ্লথ করল হামজা, অন্তূর মুখে দৃষ্টি চালিয়ে বলল, “উহুউম! এই ছলনা জয়ের ওপর খাটে। আমি তোমার কাছে তেমন কিছু পাইনি যা আমাকে আচ্ছন্ন করে তুলবে আর তোমার এই খেলায় গুটি হবো আমি।''

নোংরা ইঙ্গিতে অন্তূর শরীর ভার হয়ে এলো। খুবই কাছে বসে আছে হামজা। হামজা এবার অন্তূর চুল মুঠো কোরে নরম ঠোঁটের ওপর গ্লাস চেপে ধরল অদ্ভুতভাবে, “নাও পান করো এটা।''

অন্তূ মুখ সরিয়ে নিলো। তাকে সর্বোচ্চ ভয় যে তার সম্মান হরণ ও তাকে স্পর্শের মাধ্যমে পাইয়ে দেয়া যায় একথা যেন সবার জানা। অন্তূর মনে হলো–এই দূর্বলতার কাছে সে বারবার হেরেছে। আজও বুক কাঁপছে। শরীর অবশ হচ্ছে।

চুল মুঠ করে ধরে অন্তূ ওপরভাগে চড়ে বসার মতো করে অন্তূর মুখের ওপর মুখ রেখে হামজা বলল, "তুমি গর্ভবতী, হুহ্?"

অন্তূ শারীরিক উদ্দীপনা থমকে রইল। বুকে ঢিপঢিপ শব্দ উঠে গেল। তার নীরবতা যেন হামজাকে জবাব দিয়ে দিলো।-"জয় জানে না! " হাসল হামজা।

মাসখানেক আগে অন্তূ টের পেল তার শরীরে গর্ভাবস্থার লক্ষণ স্পষ্ট। ঘৃণ্য পাপী, ও তার এক জীবনের আসামীর রক্ত-বীর্য নিজের শরীরে; তার কেমন লেগেছিল সে নিজেও বোঝেনি। সেই অদ্ভুত অনুভূতি কেবল অদ্ভুত, বর্ণনা করা যায় না, তা ছিল মিশ্র।কিন্তু অন্তূর কাছে বিবাহিত জীবন বলতে একটা সংসার ও এক পুরুষই বোঝায়। যে পাপী হলেও অন্তূ তার ছোঁয়ায় সিক্ত। তা মোছার উপায় নেই। অন্তূর একটা ভবিষ্যত অবলম্বণ চাই, যা পেচিয়ে ধরে সে তার অনিশ্চিত ভবিষ্যত পাড়ি দিতে পারে। একটা সন্তান, নিজের গর্ভজাত আপন। এটা কতটা মূখ্য ছিল জানা

নেই। মূখ্য বিষয়টা ভয়াবহ বটে। জয় আমিরের একটা পরিবারের নেশা রয়েছে, আমির পরিবারের উত্তধাধিকারী পাবার পাগলামি আছে।এর চেয়ে বড় শাস্তি তার জন্য হতে পারে না যে সে জানল তার সন্তান রয়েছে, কিন্তু তাকে চোখে দেখার বা ছোঁয়ার সাধ্যি ও অধিকার তার রইল না। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্ত আসামীর এক জীবন ফুরিয়ে যায় বন্দিত্বেই। যে নিজের পরিবারকে হারিয়ে আরও অসংখ্য পরিবার একইভাবে উজাড় করেছে, তার নতুন করে পরিবার ও সন্তান হতে নেই। অন্তূর সন্তানের ওপর কেবল অন্তূর অধিকার থাকবে। অন্তূর জীবনের খুঁটি।

তাতে জয় আমিরের ভাগ নেই। শেষ জীবনে জয় আমির মুক্ত হবে মৃত হয়ে। ওই বেঁচে থাকা মৃত্যুর ঊর্ধ্বে।
সে এই খবর ততদিন পর্যন্ত দুনিয়া থেকে গোপন রাখতে চেয়েছিল যতদিন না জয় ও হামজার পাপে কারাবদ্ধতা আসছে। হয়নি তা।
হামজা অন্তূর শরীরের ওপর উবু হয়ে ঝুঁকে তরল ভর্তি গ্লাসটা এগিয়ে দিলো, "নাও, ড্রিংক ইট।"-"আমি অ্যালকোহলে অভ্যস্ত নই।"
-"কোনো ব্যাপার না। ট্রাই করে দেখো।"

তীব্র ঝাঁঝাল ও বিষাক্ত গন্ধে অন্তূর বুক অবধি জ্বলে উঠল।

-“কী মিশিয়ে পান করতে দিচ্ছেন আমায়?”

-“টেস্ট করে দেখো।”

-“মরে গেলেও না।”

হামজা মাথা দোলায়, “মরবে না তুমি। মারব না আমি তোমায়। আমি সহজে মারি না কাউকে।”

-“আপনি কী চাইছেন বুঝতে পারছি না।”

-“বুঝতে পারছো। তুমি বোকা নও। তুমি কুচক্রী, ঘাতকিনী।”

-“আমার বাচ্চা আপনার কোনো ক্ষতি করেনি।”

-“করবে। জয়কে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে, ওকে পথভ্রষ্ট করবে, মায়ায় বাঁধবে, পিছুটান তৈরি হবে। তা হতে দিতে নেই। ”খানিক চুপ থেকে তাচ্ছিল্যে স্বগোতোক্তি করল, “যেভাবে তুমি ছোট্ট এক দানা বালুকণা থেকে আমার জন্য মহাদেশ হয়ে উঠেছ!”

অন্তূ দেখল ঘৃণাভরে হামজাকে। হামজা কিছু বলবে, গুরুত্বর কিছু। জানা নেই আর কী শোনার আছে—

২০১১ এর মাঝামাঝিতে একদিন হামজার কাছে কুষ্টিয়া থেকে বার্তা এলো ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এক জঙ্গির অনুসারী পাওয়া

গেছে। সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হলো সে হামজার অঞ্চলের ছেলে। অন্তিক প্রামাণিক। স্কুল মাস্টার আমজাদ আলী প্রামাণিকের ছেলে।সমস্যাটা অন্তিকের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শুরু থেকেই। সে যখন হলে উঠবে, লীগের বড় ভাইয়েরা বলল, গণরুমে থাকবি। কিন্তু গণরুমে থাকার একটা সুবিধা হলো— বড়ভাইয়েরা যখন-তখন মিছিলসহ রাজনৈতিক কর্মে যোগদান, দলে নাম দেয়া, মদ পান, আড্ডা, নারীবাজি, চাঁদাবাজি ইত্যাদির ডাক দেন। তার ফলে পড়ালেখা ছেড়ে উঠে যাবার সুযোগ রয়েছে, পড়ার খাটুনি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

কিন্তু অন্তিক এসবে আগ্রহী না। সে আপত্তি জানিয়েছে বেশ কয়েকবার। তারপর তাকে নজরে রাখা হচ্ছিল, সে জানেই না। ২০১১ এর শেষের দিকে দেশের পরিস্থিতি গরম। মুক্তিযুদ্ধে কে বিরুদ্ধাচারণ করেছে, কে পাকিস্তানের চর ছিল এই নিয়ে দুই প্রধান দল কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করছে। বছরের শেষের দিকে একটা অভ্যুত্থান হতে হতে হলো না। অভ্যুত্থানটা ছিল ইসলামপন্থি কিছু সংগঠনের পক্ষ থেকে। ভারত এর পুতুল হয়ে থাকা চলবে না, এই উদ্দেশ্যে। কিছু গ্রেফতার-ট্রেফতার চলার পর তা থামল।এর মাঝে অন্তিক একজন মোটামুটি পর্যায়ের সভ্য

পুরুষ। সে ইসলামী অনুষদের দাওয়াহ্ বিভাগে অনার্স করছিল। সর্বনাশের মূল-অংশ এখান থেকেই এলো বোধহয়। দাওয়াহ্কে ইসলামি অনুশাসনমূলক রাজনৈতিক ক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

পরে অন্তিক আসন পেয়েছিল বঙ্গবন্ধু হলে। একদিন রাতে সে পড়ছে। হঠাৎ-ই তার ডাক পড়ল। সে বের হতেই একদল তাড়া করল তাকে। তাদের হাতে চাপাতি, ছুরি, স্টিক। অন্তিক না বুঝেই দৌঁড়াতে শুরু করল। হল চত্বর পেরিয়ে রাস্তায় প্রাণপনে অনেকটা ছুটে সে মণ্ডলপাড়া মসজিদ অবধি পেরিয়ে এলো। তখনও পেছনে কমপক্ষে আট-দশজন ধাওয়া

করছে তাকে। সে মসজিদের অদূরে ভাঙা টিনের এক গেইট প্রায় আরেকটু চ্যাপ্টা করে ভেঙে মাঝরাতে ঢুকে পড়ল অচেনা কারও বাড়িতে।

শব্দে বাড়ির কর্তার আগে টিনের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো যুবতী মেয়ে। অন্তিক অনুরোধ করে, "আমাকে একটু লুকোনোর জায়গা দিন।"ঝাঁঝাল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে যুবতী, "কে আপনি? কেন লুকানোর জায়গা দেব?"

-"আমি অন্তিক। ভার্সিটির ছাত্র।"

গলা শুকিয়ে কাঠ, শরীর থরথর কাঁপছে তখন অন্তিকের। আর কিছু বলতে পারল না সে। মেয়েটা অন্তিককে ঘরের ভেতর দিয়ে নিয়ে

গিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে আমবাগানের ওদিকে বের করে দিলো। বলল, "ওই ঝোঁপের ওদিকে যদ্দূর পারেন পালান।" কণ্ঠটা তখনও ঝাঁঝাল। মেয়েটার নাম মার্জিয়া। বয়স কত হবে? ঊনিশ-বিশ? তার বিশ মিনিটের মাঝে মার্জিয়াদের বাড়ির টিনের প্রাচীরে ঘেরা উঠোন ভরে গেল ছাত্র দ্বারা। ওরা কাউকে খুঁজতে এসেছে। এদিকেই পালিয়েছে কোথাও। এ বাড়িতেই বোধহয় ঢুকেছে। এবার বাড়ির সবাই বেরোলো। তারা কেউ কিচ্ছু জানে না–কে এসেছে, পালিয়েছে। পুরো বাড়িতে ঘূর্ণিঝড়ের তান্ডব চলল। ঘরের একেকটা কাপড়চোপড় রাখার র‍্যাক অবধি

ছাড় পেল না। যেন অন্তিক কাপড়ের ভাজে বসে আছে মার্জিয়াদের ঘরে। মার্জিয়ার মা কাঁদতে লাগলেন।পুরো পাড়াই কমবেশি জেগে উঠল। কিন্তু কেউ বাড়ির ভেতরে এলো না, যতক্ষণ না ওরা বেরিয়ে গেল। এদের সামনে আসতে নেই। তারা সচেতন জনগণ। কিন্তু ওরা দেখেছে অন্তিক এদিকেই ঢুকেছে। তবু না পেয়ে ক্ষিপ্রতা বাড়াই তো স্বাভাবিক। মার্জিয়ার দাদির ঘরের দরজা দুই লাথিতে চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ল। মাঝরাতে বাড়িটা এক টুকরো পাগলা ঝড়ো হাওয়ায় বাড়ি খেলো। মার্জিয়ার আব্বা মাঝবয়সী মানুষ। তাতে কী? তিনি মার খেলেন। হুমকিও

পেলেন, যদি ওই ছেলেকে লুকিয়েছে বলে জানা যায় জ^বাই করে রেখে যাওয়া হবে। কিন্তু ঘটনার মূল কালপ্রিট মার্জিয়া যথাসম্ভব চুপচাপ আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল। যুবতী মেয়েদের এদের সামনে আসতে নেই। সেদিন সারারাত বাড়ির সামনে একগাদা ভারী পায়ের বিচরণ শোনা গেল। অথচ মার্জিয়া সকালে বাড়ির পেছনের ডোবার ধারে ঝোঁপে অন্তিককে খুঁজতে গেল। কাহিনি শোনার চেষ্টা করল। বাড়ির সাথে বাড়ি লাগানো। পাশের বাড়ির মহিলারা না দেখবে কেন?মার্জিয়ার বদনাম হলো। বাড়িতে মার্জিয়া মার খেল। ছোটচাচা ও মা মিলে মারল মার্জিয়াকে।

আব্বা ঘেন্নায় কথা বন্ধ করে দিলো। বাড়িতে মার্জিয়া ভুল বোঝাবুঝিতে ঘৃণিত হয়ে উঠল। সবাই নিশ্চিত অন্তিকের সাথে বহুদিনের সম্পর্ক। তাই তো তাড়া খেয়ে এসে প্রেমিকাকে জাগিয়ে আশ্রয় নিয়েছে ছ্যাঁড়া। আবার এতকিছু হলো তবু লাংয়ের খোঁজ দিলো না মেয়ে।দু'দিন ওভাবেই পলাতক থাকার পর অন্তিক জানতে পারল সে মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত। বঙ্গমাতা হলের এক ছাত্রীর সাথে কয়জন কী করেছে, সেটার দায় অন্তিকের। এবার ছাত্র উপষদসহ হলের প্রধানরাও অন্তিকের বিরুদ্ধে। এবং এটার কারণ হিসেবে বলা যায়–অন্তিক কোন সাহসে

বড়ভাইদের আহ্বান ঠুকরায়। তার পথ কোনটা? অন্তিকের এই পরিণতি জুনিয়রদের জন্য শিক্ষা হয়ে থাকবে। পরে জানা গেল, এটার চেয়ে বড় কারণ অন্তিক যে গোপনে টুকটুক করে ইসলামী সংগঠন ও দাওয়াহ্ সম্বলিত কার্যক্রমে সমর্থন ও অনুসরণ রাখে, এটা জানাজানি হয়েছে।

অন্তিক বুঝল–তার ভার্সিটি জীবনের অবসান এখানেই। সকল স্বপ্ন, ক্যারিয়ার, আব্বুর সম্মান সব গেছে। ভার্সিটিতে পড়তে গেলে মেধা ও সুযোগ নয় লাগে বড়ভাইদের অনুমোদন, তা অন্তিক হারিয়ে ফেলেছে। এবার কোনো একদিন টুকুস করে তাকে

মেরে ফেলা হতেই পারে। অন্তিক একরাতে এক জীবন বদলকারী সিদ্ধান্ত নিলো। মার্জিয়ার বাবার কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা ও মার্জিয়ার হাত চাইল। দিলেন উনারা। বদনাম যার নামে হয়েছে, তার কাছেই দিয়ে দিলেন। অন্তিকের বাবার খোঁজ করলে অন্তিক বলল, আব্বু এসব জানলে হার্ট ফেইলিউর হয়ে যাবে উনার। আমি কুষ্টিয়া আর থাকতে পারব না। আমার জানের ঝুঁকি রয়েছে। মার্জিয়ার বাড়ির লোক অদ্ভুতভাবে এই এক রাতে মুসিবত হয়ে আসা অন্তিকের জন্য একের পর খুব বেশিই ত্যাগ তারা করেছেন। এই এক ত্যাগ, যা আজব। তারপর অন্তিকের

ব্যবসার জন্য একগাদা গহনা মার্জিয়ার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তারপর সেই অন্তিক যখন মরল, মার্জিয়াসহ অন্তিকের সন্তান ও জন্মদাত্রীর পালনটাও তাদেরই করতে হলো। কিন্তু এসব দুই গোঁয়ার কোনোদিন কারও কাছে বলেনি।

অন্তিক একটু পাগল হয়ে গেছিল। সে এত কঠিন এক মানসিক আঘাতের পর দিনাজপুর ফিরে আব্বুর কাছে ভুল বোঝার শিকার হলো। যেখানে তার নিজেরই বেশি পাগলামি ছিল আব্বুর আদর্শ ধরে রাখার। মার্জিয়া ও অন্তিক তারপর বোধহয় দুজন একসাথে পাগল হলো। এই এত বড় ঘটনাটা দুজন

রোজ গিলতে গিলতে বাড়ির বাকি তিনটে মানুষ থেকে তারা আলোকবর্ষ দূরে চলে গেল। মার্জিয়া অন্তিককে পাগলের মতো ভালোবেসে ফেলেছে হঠাৎ-ই, এটা সত্যি। কিন্তু অন্তিক মানসিকভাবে বিপর্যস্ত।কিন্তু সে কখনও জানেনি কুষ্টিয়া থেকে ফিরে সে নজরমুক্ত হয়নি। হামজার লোক তার অবস্থা বহুদিন ধরে পর্যবেক্ষণ ও জানাশোনায় রেখে লোক মারফতে তাকে নিয়ে ফেলল পলাশের ডেরায়। এটাকে বলে ধান্দা ও এক ঢিলে দুই পাখি। অন্তিককে দমন ও পলাশের ধান্দায় বাড়তি মুনাফার ব্যবস্থা হয়ে গেল।

২০১২ তে অন্তূ হাজি মোহাম্মদ দানেশ বিশ্ববিদ্যালয়ে এডমিশন নিলো সমাজবিজ্ঞান বিভাগে। সেও জানল না ভার্সিটির ছাত্র পরিষদ তাকে খুব চেনে, অন্তিকের বোন হিসেবে চেনে। জয় তখন ঢাকাতে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মাস্টার্স করছে। সে ফিরল বছর দুই কাটিয়ে ২০১৪ তে, হামজার নির্বাচনের আগ আগ দিয়ে। এছাড়া তখন মুমতাহিণাকে অপহরণ করা হয়েছে, মুরসালীন হাতের মুঠোয় আসবে আসবে ভাব।

সেরকম একদিন অন্তিকের বোনের সামনে হাজির হবার শখ জাগল জয়ের। সে কখনও

দেখেছিল না। কিন্তু সে দেখল অন্তিকের বোন অন্তিকের মতো মনোবল খুব সহজে হারায় না। সিগারেটের সাথে সাথে গোটা জয়কেই পায়ে পিষে চলে যাবার দূর্বার সাহস জয়কে খুব ডিস্টার্বড করে তুলল।এরপর মুমতাহিণাকে নিয়ে কৌতূহলবশে সে গভীরে হাঁটাহাঁটি শুরু করল। পরাগও এক প্রকার দূর্বল হলো মেয়েটার জন্য। কথা ছিল অন্তূর মতো একটা সামান্য মেয়েকে দমাতে একরাত ক্লাব অথবা কোনো হলের রুমে একটু খাতির করলেই ব্যাস। কিন্তু এর মাঝে জয় একটা অঘটন ঘটালো। সেটাও ভালোই। কমের ওপর দিয়ে বেইজ্জত ঠিকঠাকই হয়েছিল

অন্তূর। কিন্তু শেষক্ষণে সেই অন্তূটা যে বাড়ির বউ হয়ে যাবে, এটা সব ঘেঁটে দিলো। যদিও ঘাঁটার কথা ছিল না, যদি না মেয়েটা অন্তূর মতো বিচক্ষণ, জেদি আর কূশলী আগুন হতো।

অন্তূ দম আঁটকে হামজার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। তার জীবনে কোনো ঘটনাই তাহলে কাঁকতালীয় ঘটেনি। আর না ঘটেছে সেদিন সিগারেট পায়ে পিষার ফলে। এসবের সূত্রপাত তখন যখন অন্তূ কলেজ পড়ুয়া বেখবর কিশোরী। এসব হবার ছিল বলেই হয়েছে। অন্তূর চোখ দিয়ে টসটস করে কয়েক দানা জল নিথর মুখখানা বেয়ে

পড়ল। অন্তিক আজ নেই। জয় আমির ও হামজারা অবশেষে তাকে গাড়ির তলে থেতলে ঠিকই মেরে দিয়েছে।

-“নাও এটা পান করো।”অন্তূ অদ্ভুত স্বরে বলে, “বিশ্বাস করুন, জয় আমির আপনাকে জীবিত দাফন করবে....ও জানলে...”

হামজা হতবাক হবে নাকি ক্ষুব্ধ; সে ভুলে গেল। তার জয়ের ওপর ঘাতকিনী এই নারীর এতটা অধিকারবোধ ও ভরসা জেগেছে! হামজার পাগল পাগল লাগল নিজেকে। কিন্তু পরমুহূর্তে সে হেসে ফেলল অসীম শীতলতার সাথে। অন্তূর গলার কাছে থুতনি ঘেষে বলল

—

-"কে বলবে জয়কে? তুমি? উহু। তুমি তো আর থাকবে না জয়ের সামনে উপস্থিত হবার জন্য! তাহলে কে বলবে? এই দেয়াল, আসবাবপত্র?"

অন্তূ একবার দেখল এই নিথর দেয়াল ও আসবাবপত্র। শিকারী একেকটা ইট এই বাড়ির! অবরুদ্ধ নিশীথ আবারও নেমেছে প্রকৃতিতে। আজ কি অন্তূর গ্রাস হবার পালা? অন্তূর পেটের ওপর হাইবুট দিয়ে এক লাথি মারল হামজা, চেপে ধরে রইল পা'টা। অন্তূ নিদারুণ আর্তনাদ করে ওঠে, "আব্বু!" ঠোঁট কামড়ে ধরে কেঁদে উঠল মেয়েটা।

হামজা আরেক পা দিয়ে অন্তূর বাঁ পায়ের উরু চেপে ধরে হাত দিয়ে অন্তূর হাতজোড়া বন্দি করে প্রায় গোটা শরীরটা নিয়েই ঝুঁকে পড়ল অন্তূর ওপর। ঠোঁটে চেপে ধরল তরল, "ড্রিংক ইট, মাই ডেভিয়াস লেডি ! আই ওন্ট সাজেস্ট এনিমোর।"অন্তূ ছলছল চোখে অসহায় বদনে চায় হামজার দিকে। হামজা চোখ বুজে প্রশান্তির শ্বাস ফেলল। এই কাতরতা এই নারীটির চোখে দেখবার জন্য হামজা অস্থির হয়ে পড়েছিল। কিন্তু হতাশা একটু রইল, তবু অন্তূর চোখে দ্রোহের আগুন ছলকাচ্ছে, "আপনাকে আজ শত্রু হিসেবে একটা পরামর্শ দেই–যা করতে চাইছেন না

করুন। আমও যাবে ছালাও যাবে। যে আফসোসে পড়বেন আপনি তার কোনো অন্ত থাকবে না ইহকালে।''

হামজা এক টুকরো হাসল, “এভাবে হামজা ভড়কে না।''অন্তূ কাতর স্বরে কেমন পাগলের মতো করে বলে, “আমায় ছেড়ে দিন। আমার কিচ্ছু নেই। আমার বাপ নেই, মা থেকেও কাছে নেই। সব নিয়েছেন। এইটুকু আমার থাকুক। এইটুকু আমার দাবী, আমার নিজের। আমার সন্তান...আমি ওকে নিয়ে বহুদূর চলে যাব। কোনোদিন আর আসব না এ পথে। আপনার জয়কে আমার কখনোই চাই না। আপনি রাখুন তাকে। সে আমার কাম্য নয়।

না পেল কখনোই সে তার সন্তানের ভাগ। আমার থাকুক এটুকু। সে আমায় এইটুকু দিয়ে দেবে আমি চাইলে অনায়াসে। আপনি তাকে বলবেন, তার প্রাণভোমরা নিয়ে আমি চলে গেছি। এটা তার জানা দরকার। আমি দূরে গেলেই তার জানা দরকার।''হামজা অবাক হবার ভান করে, “হু? সন্তানটা কার? তোমার? নাহ। মেয়েলোকের কোনো সন্তান থাকে না। ও তো কেবল পুরুষের দান। আচ্ছা! এটা কার সন্তান? জয়ের? তো ব্যাস এতে আমার ষোলো আনা হক আছে। আমার চাওয়া মোতাবেক তার ভাগ্য নির্ধারণ হবে। তবে যদি এটা জয়ের সন্তান না হয় তো

বলো, ছেড়ে দেব। জয়কে বলে দেব, ও এমনিতেও আর তাকাবে না। কিন্তু ওর হলে ছাড়া যাচ্ছে না যে!''

অন্তূ চোখ বুজে ফেলল। বুকটা থরথর করে কাঁপছে। তলপেটে মরণের ব্যথা। বুকের ব্যথা নেই। অন্তূর ব্যথারা অসাড় আজ।তবু অন্তূ আকুতি করে, "আমাকে যেতে দিন। আজ আমি আমার ঘাড়ে নিলাম সমস্ত দায়। আপনাদের বিরুদ্ধাচারণ, অন্তিকের বোন হওয়া, এক অসহায় স্কুল মাস্টারের মেয়ে হওয়া, সমাজের সাধারণ শক্তিহীন মানুষ হবার এই সব পাপ আমার। এর বিনিময়ে আমি আজ পথান্তরী হবো। তার শাস্তি এক

নিষ্প্রাণ শিশুর পেতে আছে, বলুন তো? ও আমায় কত ভরসা করে। ও জানে আমার গর্ভ ওর জন্য নিরাপদ। বাইরে যা-ই হোক, আমি ওর গায়ে তার এক টুকরো আঁচড় লাগতে দেব না। এমনটাই চুক্তি আমার ওর সাথে, যেদিন ও আমার কাছে এসেছে। ওর কাছে আমি দোষী হয়ে যাব আজ। এই লাঞ্ছনা মা হয়ে সওয়া যায় না। আপনি বুঝতে পারছেন? ও আমার আমানত। আমার নারীত্বে দাগ পড়ে যাবে। আপনার দেয়া সব কলঙ্ক কবুল, কিন্তু মাতৃত্বের কলঙ্ক....আমি পায়ে পড়ছি আপনার..জয় আমির...ও... ওর বাপ... সে..ওকে মারবেন না। আর জায়গা নেই

আমার ভেতরে। আমি আর পারব না। মেয়ে হয়ে বাপ হারিয়েছি, সয়েছি। ভাই ও পরিবার হারিয়েও মেনে নিয়েছি। ইজ্জতের দাবী ছেড়েছি। মাতৃত্বে সেই সুযোগ নেই বোধহয়। আমি পারবোই না, আমি বুঝেছি...আমায় যেতে দিন।''অন্তূর কান্নায় ভিজে ছিটকে আসা আকুতি অবরুদ্ধ হলরুমের প্রতিটি দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হলো। কিন্তু এই হলরুম এ ধরণের আর্তনাদে বরাবর অভ্যস্ত। এখানে একটুও অস্বাভাবিক নয় এই অসহায়ত্ব ও আঁকুতির স্বর।

হামজা বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হলো। নারীত্ব ও মাতৃত্ব যে নারীটির মাঝে এত তীব্র সে কী

করে এতটা ধ্বংসাত্বক হতে পারে? অন্তূ তাকে হতবিহ্বল করে তুলল। হামজা ভাবতে পারছিল না, বুঝতে পারছিল না নারীটিকে। এত রূপ ও অনুভূতির স্বত্ত্বাধিকারিণী! রিমি পারেনি। তার ভেতরে অন্তূর তুলনায় একরত্তি বিদ্রোহ না থাকার পরেও সে কী করেছে! হামজার মনে হলো আরমিণের ওপর জয়ের পতন জায়েজ।

সে শুধু বলল, "কোথায় যেতে দেব? জয় যে প্রশ্ন করবে আমায়! কী জবাব দেব, কোথায় গেছে তার সর্পিনী? মাথা নাড়ল হামজা, লাশ দেখিয়ে বলতে হবে এমপির ছেলেটা ঘ্যাচাং করে দিয়েছে।"

হামজা ক্ষান্তি দিলো। গ্লাস সরিয়ে নিয়ে বোতল ধরে নিজে পান করতে করতে ডাকল, “ওরে আছিস রে তোরা? সিস্টারদেরকে পাঠা রে!”চারজন সহকারী নার্স ও ডাক্তার এলো, হাতে কীসব সরঞ্জামের বাক্স। অন্তূ মেঝের ওপর ছেচড়ে কিছুটা পিছিয়ে যায়। অনবরত মাথা নাড়ে, “নাহ্, না না না। হামজা, হামজা সাহেব, না।”

হামজা বলল, “কাজ শুরু করুন। রাত অনেক হলো।”

রোগীকে দেখে ডাক্তারের নারী ও মানবীমনে দোলা দেয়া স্বাভাবিক। ইতস্তত করে তারা ডাকে, “স্যার!”

হামজা জবাব দেয়, “উঁহ্! কী? আবেগে টান পড়ছে?”
পিস্তল বের করে হাতে ঘুরালো দু-চারবার। এভাবেই নিয়েও আসা হয়েছে তাদেরকে। একজন গর্ভবতীর এবোর্শন করাতে হবে। তার শরীরের কন্ডিশন খারাপ। আনা হলো এখানে। শুকনো ফুলের মতো বিদ্ধস্ত সুন্দরী, চোখের দিকে তাকালে আর অস্ত্র চালানো সম্ভব হতে চাইবে না। কী করবে তারা?অন্তূ উঠে দাঁড়িয়ে কয়েক পা দ্রুত সরে যেতে নেয়। হামজা বলল, “ছেলেদেরকে ডাকব তোমায় ধরার জন্য? তোমার পর্দার খেলাপি

হবে না তো? ওরা ছোঁবেও, দেখবেও। তোমার আপত্তি না থাকলে ডাকব।''

অন্তূর শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। মাটিতে বসে পড়ল মেয়েটা। হামজার সামনে হাটু গেড়ে বসে হু হু করে কেঁদে উঠল। জীবন তাকে কোথায় এনে ফেলেছে! সে আজ প্রথমবার জীবনকে জিজ্ঞেস করল, 'আমার অপরাধ কী? বল আমার অপরাধ কী? আমি কেন এত অসহায়, একা? এত দূর্গতি কোন পাপের বিনিময় হিসেবে দেয়া হলো আমায়? 'অন্তূ টের পায় পাশে আব্বু বসে অন্তূর কান্না দেখছে। অন্তূ আত্মহারা স্বরে ডাকে, "আব্বু? কোথায় তুমি?''

-“সামনে রেখে কেউ এই প্রশ্ন করে, অন্তূ?”
-“আজ আমায় রক্ষা করতে পারো, আব্বু?”
-“না, অন্তূ। সেদিনই পারিনি যেদিন তোকে এই জীবন দিয়েছি আমি, আজ কেন আশা করছিস বোকার মতো?”

চট কোরে অন্তূর বিচক্ষণ মস্তিষ্কে হিসেব খেলে যায়। আব্বু কি সেদিন চলতি পথে অতটা সময় অন্তিকের সাথে কাটিয়ে এই ঘটনাগুলো শুনেছিল? সেজন্যই কি জেনেবুঝে চুপচাপ অন্তূকে বিয়ে দিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে? নয়ত কেন সেদিন কোনো প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মানুষটা কেবল অন্তূকে মেনে নিতে বলেছিলেন? কেন সেদিন বলেছিলেন,

অন্তূকে তিনি মেরে ফেললেন? আর তারপর ব্রেইন স্ট্রোক। এসব কতটা চাপে হয়েছিল? অন্তূ দেখে আব্বু আর নেই। সে ছটফটিয়ে ওঠে। হামজা হলরুমের কেন্দ্রিয় আসনটিতে বসেছে পায়ে পা তুলে। অন্তূর চোখের সামনে জয় আমির ভেসে ওঠে। কোথায় সেই লোক? তার সন্তানকে রক্ষা করার কর্তব্য নেই তার? আসবে না সে? অন্তূর জন্য না, নিজের সন্তানের জন্য আসা দরকার তার। অন্তূ এদিক-সেদিক তাকায়। কোথাও নেই জয় আমির। কোথাও কেউ নেই অন্তূর। সে এতিম, সে একেলা।

অন্তূর চার হাত-পা বাঁধা হলো মোটা নাইলনের দড়ি দিয়ে। আজ আকাশে চাঁদ নেই। অমাবস্যার নিশীথ। আমির নিবাসের অভিশপ্ত অবরুদ্ধতা। হামজার নির্দেশ সম্পূর্ণ চেতন অবস্থায় অস্ত্রপচারের মাধ্যমে গর্ভপাত হবে আরমিণের। যদি অসহনীয় ব্যথা ও রক্তপাতে এখানেই মরে যায় তো গেল, নয়ত মানুষ মারা কঠিন ঘটনা নয়।

অন্তূর গর্ভাবস্থা তিন মাসের। সুতরাং তার স্যাকশন অ্যাসপিরেশন করা হলো। সহকারী তিনজন ও যে নারী ডাক্তারটি এসেছেন, উনারা অবধি কেঁপে উঠলেন। একবার তাদের মনে হলো হামজার গুলিতে মরে যাওয়াই

ভালো তবু এমন নৃশংস ধরণের পাপ ও পাগলামি তারা করতে পারে না।অন্তূর দেহের নিম্নাংশ যখন অনাবৃত করা হচ্ছিল, হামজা এক সময় চোখ ফিরিয়ে নিলো। সে শুদ্ধ পুরুষ নয়। কিন্তু তার মোটেই আগ্রহ নেই এই নারীটির শরীরের ওপর। সে সুন্দরী হলেও কেবল ঘৃণ্য। চাইলে সে আজ অনেককিছুই করতে পারতো। কিন্তু রুচি নেই। অথবা কীসের এক দ্বিধা ও আড়ষ্ঠতা! ভাইয়ের স্ত্রী যে!

প্রকৃতিতে মাঝরাত। চারদিকে পাথরের প্রাচীর, তার মাঝে দাঁড়ানো আমির নিবাসের অন্তঃপুরীতে অভিশাপ রচিত হলো সে রাতে।

অন্তূর হৃদৎবিদারী চিৎকার ও নারীত্বের হাহাকারে আমির নিবাসের দেয়ালেও বুঝি থরথরিয়েছিল। অন্তূর যোনীদ্বার ফুঁড়ে ধাতব-ডাইলেটর প্রবেশ করল গর্ভাশয় অবধি। আমির নিবাসেই আমির নিবাসের শেষ ভ্রূণ-পিণ্ডটুকু গর্ভথলি থেকে অপসারিত হলো। পনেরো মিনিটের ব্যবধানে অন্তূর শরীর ও মেঝে রক্তে স্নাত হলো। অন্তূ লুটিয়ে পড়ল অন্ধকারের কোলে। রক্তপিণ্ডের মতো দেখতে রক্তে ভেজা এক দলা ভ্রূণ পড়ে রইল মেঝের ওপর। জয় আমিরের রক্ত ও বীর্য শরীর থেকে বয়ে যাবার পর অন্তূর শরীরটা হালকা হয়ে এলো। কোথাও একটুও ব্যথা নেই, মায়া

নেই। শুধু কলকল ধ্বনি তুলে অন্তূর নারীত্ব রক্তের সাথে বয়ে যাচ্ছে নিম্নদেশ বেয়ে। তা একটু একটু গড়িয়ে গিয়ে হামজার পায়ের তলায়ও তো ঠেকল।হামজা বুকটা মুচড়ে ওঠে। জয়ের রক্ত মিশে আছে এতে? হামজা রক্ত তুলে হাতে মাখে। লাল টকটকে গরম তরল, একটু গন্ধ। হামজার ভেতরে ঘৃণার উদ্রেক হলো। এটা জয়ের রক্ত নয়। এটা নোংরা নারীটির বদ-দেহরস।অন্তূর একটু গা গরম। আমজাদ সাহেব সারারাত বাড়ি মাথায় করে রাখেন। রাবেয়া বিরক্ত হয়ে বলেন, "উফফ, অন্তিকের আব্বা, রাতভর চেঁচাবা না।

কানের গোড়ে বসে চেঁচালে শরীর আরও খারাপ লাগে। তুমি ঘরে যাও, আমি দেখি।' কিন্তু আমজাদ সাহেব রাবেয়াকে এসব কাজে একটুও ভরসা করেন না। অন্তূ এক নম্বরের বোবা, জ্বরে ফিট খেয়ে গেলেও বলবে না, আর রাবেয়া ঘুমিয়ে পড়বেন। সুতরাং তিনি রাবেয়ার ধমক খেয়েও সারারাত মাথার কাছে বসে অজিফা পাঠ করেন, আর একটু পর পর কপালে হাত রাখেন। অন্তূ বিরক্ত হয়ে বলে, 'আব্বু, আমি কিন্তু সুস্থ, এবং ঘুমাচ্ছি। কিন্তু তোমার এই একটু পর পর কপালে হাত রাখায় আমার ঘুম ভাঙছে। যাও তো, রুমে যাও।'

আজ অন্তূ আছে। না, অন্তূও নেই। অন্তূ ফুরিয়ে গেছে, আর আমজাদ সাহেব নেই। আজ রক্তাক্ত অন্তূ দুর্গন্ধে ভরপুর, এক ধুলোমাখা মেঝেতে পড়ে রইল। অন্তূর মাতৃত্ব ধুয়ে কলকল করে রক্ত ছুটে যাচ্ছে দেহ ছেড়ে। তার ব্যথায় ছটফট করার মতো আপন কেউ নেই কোথাও। এ সময় অন্তূর মাকে খুব দরকার। রাবেয়া জানেন না তার গর্ভের ধন গর্ভ হারিয়ে মৃত্যুপথে।রক্তপাত থামানো মুশকিল হয়ে যাচ্ছিল। অ্যানেস্থেসিয়া ব্যবহার না করে সম্পূর্ণ অনুভূতিসম্পন্ন অবস্থায় অন্তূর গর্ভজাত বস্তু ছিঁড়ে আনা হয়েছে গর্ভাশয় থেকে। সুতরাং জরায়ুপথে

ডায়ালেটর ও ভ্যাকুয়াম যখন ব্যবহার করা হয়েছে, অন্তূর শরীর অসহ্য ব্যথায় নিদারুণ কাতরেছে, এ অবস্থায় অস্ত্র চালনায় ক্ষত তৈরি হয়েছে। অন্তূর সাথে যা হলো তা জীবিত কোনো নারীর সাথে হতে নেই। অন্তূ এরপর মানসিকভাবে ভারসাম্য হারাতে পারে, গর্ভধারণ ক্ষমতা আর থাকবে না, ক্যান্সার হলে অবাক হবার কিছু নেই, এছাড়া যে অস্বাভাবিক পরিবেশে এই সংবেদনশীল কাজটি সম্পন্ন হলো যেকোনো ধরণের ইনফ্রাকশন না হলে সেটা অবাককর বিষয় হবে। কিন্তু ডাক্তারের কিছু করার নেই। গোপনে দুটো ন্যাপকিন অন্তূর নিম্নদেশে

পরিয়ে ওভাবেই ফেলে তাদের চলে যেতে হলো, হামজার নির্দেশ। যদি অন্তূ না মরে তবে আবার নাহয় আসবে তারা। তবে এখন আর কোনো তদবীর নয়। ডাক্তার ও নার্সগুলো এক প্রকার মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অবস্থায় ফিরে গেল।অন্তূর দেহটা নাড়িছেঁড়া ভ্রূণের পাশে পড়ে রইল অবরুদ্ধ হলরুমে। সেখানে অন্তূর পিঠের নিচে একখানা বিছানা নেই, নেই মাথার নিচে বালিশ, নেই পরিচ্ছন্নতা, ওষুধ বা দেখার মানুষ, স্নেহের হাত, খাবার-পানি, যত্ন, আলো...। নিশুতি রাতে একটি ছিন্নভিন্ন, অচেতন, নাপাক রক্তে গড়াগড়ি খাওয়া নারীদেহ আমির নিবাসের

মেঝেতে ফেলে কতকগুলো মানুষ বহুদূর চলে গেল নিজেদের গন্তব্যে। হয়ত আমজাদ সাহেব এসে বসলেন অন্তূর শিয়রে। অন্তূ চোখ মেলে দেখল না। হয়ত রাবেয়া সুদূর কুষ্টিয়ার এক কুঠুরির মেঝেতে জায়নামাজ বিছিয়ে বসে তাহাজ্জুদে কাঁদলেন অঝোরে, অন্তূর কানে পৌঁছাল না সেই সুর। অন্তূ আরামে শুয়ে রইল। তার শরীর থেকে সদ্য বিচ্ছিন্ন ভ্রুণটা কি চেয়ে দেখল তার অভাগিনী মাকে? একটু ব্যথা পেল ভ্রুণটা? পেল না। তিনমাস বয়স তার, সে সবে জয় আমিরের শৌর্য-রক্তপিণ্ড থেকে মায়ের রক্তের ভাগ পেয়ে সেজে উঠতে শুরু করেছিল। সে

নিজেই বোধহয় অভিমান করেছে—তাকে পরিণত হতে বাঁধা দেয়ায়; মায়ের ওপর, বাপের ওপরে একটু বেশি।রউফ কায়সারের একটি তিন বছরের ছেলে আছে ও স্ত্রীকে নিয়ে পরিবার তার। এটা একটা ভালো খবর হামজার জন্য। এরকম কিছু সে ভাবতে চায়নি, সে একজন সমাজসেবক। প্রথমে রউফকে ভালো অঙ্কের পয়সা দিয়ে ব্যাংক-ব্যালেন্সে উন্নতি করতে চেয়েছিল সে। কিন্তু রউফ নিজের অবস্থার উন্নতি চায় না। হামজার কিছু করার নেই।

কবীরকে কোনোভাবেই এর মাঝে ঘোড়াহাঁট যাবার সুযোগ দেয়া হবে না। সে কবীরকে

বলবে সে অন্য ছেলেদেরকে সব ব্যবস্থা করিয়ে দিয়েছে, সে যেন শুধু জয়ের সাথে থাকে।হামজা ঠিক করেছে আরমিণকে সে মারবে না। তুলে দেবে এমপির হাতে। জয়ের কাছে নিজেকে সাফ রাখার এর চেয়ে ভালো উপায় নেই। সে খুব দুঃখের সাথে জয়কে বলবে, ‘আমি আরমিণকে বাঁচাতে পারিনি। এবং সেটাও তোর জন্যই। তুই যদি সেদিন বউকে আমির নিবাসে না রেখে আসতি... এতদিন ও আমার সীমানায় ছিল, কেউ ওকে ছুঁতে পর্যন্ত পারেনি। আর তোর কী মনে হয়েছিল এমপির লোকেরা খোঁজ পাবে না তোর বউ কোথায়?’

এতে আরেকটা চমৎকার কাজ হবে। সে এর মাধ্যমে এমপির কাছে নিজেকে নিয়ে সাময়িক একটা ভরসা তৈরি করবে। এবং এটাও বলবে, ‘সে ইলেকশন করবে না। সিনিয়র এমপি সাহেবই এই আসনের এমপি হবার একমাত্র যোগ্যব্যক্তি।’এমপি খুশি হয়ে হামজাকে বুকে জড়াবে। হামজা তারপর এমপিকে খুন করবে। এমনভাবে খুন করবে যেন সাধারণ মানুষ লাশ দেখার সাহস না পায়। টিভি চ্যানেল এবং নিউজপেপারে লাশের ছবি ঝাপসা করে ছাপতেও সংকোচ হবে। জয়কে মারতে চাওয়া মানুষকে খুব বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখা হামজার পক্ষে সম্ভব

না। এবং রউফ কায়সারের বাচ্চা ছেলেটাকে কয়টাদিন বড়ঘরে ঘুরতে আনা হবে।

বিকেলের দিকে দোলন সাহেব এলেন। সুস্থির, দায়সারা গোছের সুখী সুখী মানুষটা আজ একটু অস্থির বোধহয়। উড়ো খবর পেয়েছেন তিনি। হামজার বড়ঘরে কিছু ঘটেছে। তিনি ভাবটা এমন করলেন যেন তিনি হামজাকে দেখতে এসেছেন। এক ঝুরি ফল ও মিষ্টি এনেছেন। হামজা বৈঠক-কক্ষের সোফায় বসা। চোখে সাদা চশমা। হাতে মোটা একখানা দর্শন ও রাজনীতির বই। যেমন শরীর ও চেহারাখানা শৌর্যে ভরপুর, তেমন তার শোভন ভঙ্গিমা। গভীর মনোযোগ

বইয়ে।-"কেমন আছো, তুমি? শরীরের কী হাল হয়েছে?"

হামজা বই বন্ধ করে হাসল, "আপনি ভালো আছেন? কী খবর? তুলি, নাশতা-পানি নিয়ে আয়।"

-"ওসব লাগবে না। তোমাকে দেখতে এলাম। কী করেছ শরীরের?"

-"ওদিকের কী হাল?"

-"এদিকের হাল বলো। জয়ের এসব কী করে হলো?"

-"জানি না, স্যার। শত্রুরা পাখা লাগিয়েছে পিঠে। পাখা কাটাকাটিতে দিন ব্যস্ত যাচ্ছে, তার ওপর দুজনেরই দেহ জখম।"

দোলন সাহেব কথা বের করার জন্য নিজের উকালতির মার খাটালেন, “সব শত্রু তো বন্দি তোমার খাঁচায়, আবার নতুন জুটিয়েছ?” হামজা হাসল, “পাখিগুলো উড়িয়ে দিয়ে খাঁচা খালি করে ফেলেছি। এগুলো বাইরেরই।” দোলন সাহেব এক ধাক্কা খেলেন, আন্দাজ সত্যি তাঁর।অস্থিরতা এবার বাইরে বেরিয়ে আসার পর্যায়ে। তবু তিনি হাসলেন, “কাউকে বাঁচিয়ে রাখোনি? মানে সওয়াল-জওয়াবের জন্য আর আমাকে লাগবে না, সেই জনকেও উড়িয়ে দিয়েছ?”হামজা সম্মতিসূচক হাসল। দোলন সাহেব ঘেমে উঠলেন। মুরসালীনের মুখটা সামনে এসে বড্ড জ্বালাতন করছে।

হাতের আঙুলের ডগা শিরশির করতে লাগল উনার। তিনি হাসপাতালে জয়কে দেখতে গিয়ে অন্তূকে ওখানে পাননি।

জোর করে হাসলেন, "সব কই? বাড়ি এত শ্মশান। ও আচ্ছা, জয়ের কাছে কে রয়েছে, ওর বউ নাকি?"

হামজা বলল, "না।"ব্যাস এটুকুই। আর কিছু না বলে হামজা তুলিকে তাড়া দিলো নাশতা আনতে। দোলন সাহেব টের পেলেন হামজা ব্যাপারটা গিলে খাচ্ছে। উনার বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। বড্ড অবাক হলেন।

মুরসালীনের নীতি ও মতাদর্শে তিনি কি একমত? না নাকি হ্যাঁ তাঁর জানা নেই।

অন্তূকে তিনি স্বল্প পরিচিতা এক মেয়ের বয়সী মেয়ে হিসেবে চেনেন মাত্র। তাহলে এই দুটো সত্ত্বার জন্য উনার মতো দায়সারা মানুষের ভেতরে এ ধরণের উদ্বেগের কী কারণ!?
তুলি চা দেবার সময় কেমন করে একবার দোলন সাহেবের দিকে তাকাল। তিনি হামজার সামনে বসে চা পান করতে করতে পণ করলেন হামজার বিরুদ্ধে কেইসটা তিনি নিজে লড়বেন। রউফ কায়সারের উনাকে প্রয়োজন এখন, তিনি যাবেন রউফের কাছে।
রিমি গোসল-খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। বিছানার সাথে মিশে শুয়ে ছিল। রাত তখন বারোটা

পার। কয়েক প্যাগ মদ পান করে রুমে যায় হামজা। ওষুধ খাওয়া হয়নি রাতের।

হামজা ডাকল, "রিমি! ওঠো, গোসল করোনি। খাওনি। আমাকে শাস্তি দিচ্ছ দাও, আমি নাহয় পাপ করেছি। তুমি করোনি। তাহলে নিজের ওপর এই অবহেলা কেন? ওঠো, বলো আর কী শাস্তি বাকি আছে আমাকে দেবার!"

রিমি নড়লও না।

-"তুমি কি চাও আমি জবরদস্তি করি? মেজাজ ভালো থাকে না আজকাল। আর কত ধৈর্যের পরীক্ষা নেবে, যেখানে এখন তোমাকে আমার অনিবার্য প্রয়োজন।"রিমিকে ধরে পাশ ফিরিয়ে মুখটা দেখল হামজা, চেনা যাচ্ছে না।

সেখানে আজ অভিমান নেই। পাথরের মতো নিষ্প্রাণ, আবেগহীন। উশকো-খুশকো চুল। ঠোঁটদুটো শুকনো। রিমির চোখের এই অভিমানহীনতা হামজাকে দিশেহারা করে তুলতে চাইল। তার কি একাধারে সবার কাছে ঘৃণিত হবার পর্যায় চলছে? হামজার ভেতরটা দমে এলো। সে তো খুব বেশি কিছু চাইছে না। সে শুধু তার আগের সেই পরিবার, ক্ষমতা আর তার পিছুটানহীন জয়কে চাইছে। এসব তো তারই। নিজের জিনিস হারিয়ে যাবার পথে থাকলে সেসব রক্ষা চেষ্টা করাটা কি অপরাধ? এরা বুঝছে না কেন? রিমিকে বসিয়ে মুখটা আজলায় ধরল, "আমার

দিকে তাকাও। কী করেছি আমি? যখন ঘেন্নাই করবে তো ভালোবেসেছিলে কেন? তখন আর এখনকার আমি তো একই, তাহলে তোমার অনুভূতি কেন দু'রকম হবে রিমি?''

রিমি চোখ বেয়ে পানি পড়ল। মনে হলো কোনো পাথরের মাথায় পানি ঢালা হয়েছে, সেই নিথর পাথরের গা বেয়ে পানি চুইয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। তাতে পাথরের কোনো যায় আসে না।

অনেকক্ষণ পর রিমি শুধু জিজ্ঞেস করল, "কী করেছেন আপনি আরমিণের সাথে?''

-“কী করেছি? কী করতে পারি আমি? কী বোঝাতে চাইছ?”
-“কোনোকিছুই অসম্ভব নয়। তাই আন্দাজে সব ধরণের নোংরামিই রেখেছি, যাতে জানার পর অবাক না হতে হয়।”
হামজা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল রিমির দিকে।-“আমি কী করেছি সেটা শুধু দেখবে, ও আমার সাথে কী কী করেছে তাতে যায় আসে না তোমার? আমাকে ফাঁসির দড়ির সামনে নিয়ে দাঁড় করিয়েছে। তুমি সেটাতে সম্মত, খুশি? আমি সব ছেড়েছুড়ে কয়েদী হিসেবে পৌঁছে যাই আইনের দণ্ডের সামনে? চাও সেটাই?”

-“আমি আজ কিছুই চাই না। তবু একটা কিছু চাই আপনার কাছে, যা শুধু আপনিই দিতে পারেন।”

হামজার চোখ লাল হয়ে উঠল। রিমির শরীর ধরে থাকা হাত দানবের মতো কঠোর হলো, “মুখে উচ্চারণ কোরো না। সহ্য করতে পারব না, উল্টাপাল্টা কিছু করে বসব। আরও ব্যথা পাবে।”

রিমি তাতে আরও দ্বিগুন উৎসাহ পেয়ে বলল, “আমাকে তালাক দিন। আপনার উল্টাপাল্টা কিছু করা হিসেবেও আমি আমার মুক্তিই চাই।”হামজার যেন অবাক হবার কাল চলছে। রিমির স্বর বলে মনে হলো না এটা। চোখ

বুজে ভারী শ্বাস ফেলে নিজেকে সামলে হামজা রিমির শাড়ি খুলল। শাড়ি খোলার সময় নগ্ন পেটে বেশ কয়েকটা চুমু খেলো। কোমড়টা জড়িয়ে ধরে রিমির হাঁটুর কাছে বসল।

-“সত্যি বলবে, তুমি চাও আমি আইনের কাছে নিজেকে সমর্পন করি?”

-“এটা ঠিক করার আমি কে? আমার সাথে আর কী এমন করেছেন আপনি? অন্যায় যাদের সাথে হয়েছে তারা ঠিক করবে আপনার কী হবে।”

হামজা সহ্য করতে পারল না। ডানহাত এগিয়ে ল্যাম্পটা তুলে দাঁত আটকে এক

আঁছাড় মারল। এত শক্তি প্রয়োগের ফলে ক্ষতগুলো জেগে উঠল যেন। জোরে জোরে শ্বাস ফেলল হামজা। রিমি নির্লিপ্ত বসে রইল নিরুদ্দেশ দৃষ্টি মেলে।

-"তোমাকে কীভাবে বোঝালে বুঝবে আমার তোমাকে প্রয়োজন, হ্যাঁহ্? মানসিক, শারীরিক এবং সার্বক্ষণিক সঙ্গী হিসেবে তোমাকে প্রয়োজন আমার। এই কঠিন সময়টায় এমন করছো কেন আমার সঙ্গে?"

-"প্রয়োজন ব্যাপারটা কঠিন কিছু নয়, মেয়র সাহেব। বিকল্প দিয়ে দিব্যি মিটিয়ে নেয়া যায়।
"

-“চ্যাহ্! আমার রিমি, এমন সব কথা কে শিখিয়েছে তোমাকে? তোমার মনেহয় না এবার তুমি বাড়াবাড়ি করছো?”-“কী জানি! কেন আগে করতে পারিনি এই বাড়াবাড়ি?” রিমি তো! কতক্ষণ? তার মুখ নির্লিপ্ত থাকে, কিন্তু চোখের ওপর রিমির নিয়ন্ত্রণ নেই। ঝুপঝুপ করে আষাঢ়ে বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ল নোনাজল। গলা ধরে এলো।

দাঁত কিড়মিড় করল হামজা, “এই এই এই, তোমরা মেরে ফেলবে আমায়? হ্যাঁহ্? সবাই মিলে পরিকল্পনা করে পেছনে লেগেছ? সব হারানোর পথে আমি। এত দিনে তিলে তিলে

কামানো একেকটা খুঁটি আমার নড়বড়ে হয়ে উঠেছে।”

রিমির হাতটা টেনে নিজের বুকে রাখে হামজা, “দেখো তো! টের পাও এখানকার অশান্তি?”

-“বাহ্ রে! আপনার ভেতরে হৃদপিণ্ডও আছে নাকি? ওটার কাজ তো রক্তপাম্প করা। তার মানে আপনার শরীরে রক্তও আছে? রঙটা কী? মানুষের মতোই লাল?”

হামজা হাসল, “পশুর রক্তও লালই হয়, রিমি। এত কথা আর এরকম কথা কবে শিখলে? কে শিখিয়েছে?”

-“আপনার আন্দাজ সঠিক।”

হামজা মাথা নাড়ে, “হু! এত ক্ষতি করল সে আমার!”রিমির বুক জ্বলে উঠল অজানা এক ঘেন্নার ব্যথায়। আচ্ছা এই লোক আরমিণকে ভয় পায়, সেই আরমিণকে কি নোংরাভাবে ছুঁয়ে এসেছে? রিমির পেট গুলিয়ে গলা অবধি এলো। হতেই পারে। অসম্ভব না।

যন্ত্রের মতো সে হাত বাড়িয়ে হামজার হাতটা নিজের খোলা পেট থেকে সরিয়ে দিতে চায় ঠেলে, যেন ছুটে এসে এক দলা ময়লা শরীরে লেগেছে। হামজা শক্ত করে হাত, হাতগুলো রিমির শরীরে গেঁথে দিতে পারলে হতো।

রিমি আবদার করে, “আপনি তালাক দিন আমায়। না না, আমি ছেড়ে যাব না কোথাও।

রক্ষিতা হয়ে থাকব আপনার। ওটার ভার কম। রক্ষিতার আবার ধর্মজ্ঞান কী? মালিক যেমনই হোক দায় তার নয়। কিন্তু আপনার মতো পুরুষের স্ত্রীর পরিচয় খুব জঘন্য আর ভারী।''

হামজা কীভাবে সহ্য করল কে জানে। শুধু বলল, "তোমার এসব কথা আরমিণের জন্য বিপজ্জনক হবে, রিমি। সত্যি বলছি। আমি তোমায় কিচ্ছু বলব না। এর প্রতিটা জবাব আরমিণ দেবে। তাই চাও?''

রিমির শরীর শিউরে উঠল। এক লহমায় কঠিন, নির্বিকার মুখে নিদারুণ অসহায়ত্ব ও

করুণা দেখা দিলো। হামজা খুশি হলো।-“সে বেঁচে আছে?”

হামজা মোটা একখানা সিগার ধরায়। পাঁজা পাঁজা ধোয়া তার, রিমির খোলা দেহ স্নান করে উঠল তাতে। হামজা সিগার ঠোঁটে চেপে রিমির ব্লাউজ খোলে। রিমি চোখ বুজে যেন মৃত্যুর অপেক্ষা করে। কিন্তু যখন অন্তর্বাস খুলতে যাবে, রিমি হামজার বাহুর দগদগে ঘা'তে নখের আচড় মেরে আর্তনাদ করে ওঠে —

-“ছুঁবেন না। ছুঁবেন না। মরে যাব আমি। আমার ঘেন্না লাগছে। প্লিজ, মেরে ফেলুন। এত লাঞ্ছিত হয়ে বেঁচে থাকতে নেই নারীর।

''হামজা সিগারের মোটা জলন্ত প্রান্তটি রিমির বুকের বিভাজনের মাঝে চেপে ধরে কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, "এই কথাটাও আরমিণ বলেছে। আরেকটা প্রাপ্তি বাড়ালে তুমি ওর।''

রিমি কেঁদে উঠল চাপা শব্দে। তখনও জায়গাটি পুড়ছে চিরচির করে। রিমির কান্নার আওয়াজ থামাল হামজা—ঠোঁট চেপে ধরল, কামড়াল মূলত, ক্ষোভ ঝারা বললে সঠিক হয়। সাথে সিগারটা কোথাও ছুঁড়ে ফেলল। এরপর ঠোঁট ছেড়ে বুকের পোড়া ক্ষততে গাঢ় চুমু খেয়ে বলল—

“আমার বিরোধিতা করলে তোমার ভেতরটাও এভাবে পোড়াবো। তুমি জানো রিমি, পেট্রোলিয়ামকে কাছ থেকে পোড়াতে নেই। পোড়ানোর ইচ্ছে থাকলে দূর থেকে আগুন ছুঁড়তে হয়। এত কাছে এসে আমায় পোড়াবে, তুমি পুড়বে না, তা হতে নেই। আমার তো ধর্মই পোড়া, কিন্তু তোমার অদৃষ্ট। এখন আমায় খুশি করো, আই ওন্ট সাজেস্ট মোর। ”অন্তূর সম্পূর্ণ চেতনা ফিরল দু’দিন পর। তখন তরতর করে রক্ত ছুটছে শরীর থেকে। নাকে এসে ঠেকে বিশ্রী দুর্গন্ধ। দুজন নার্সকে পেল অন্তূ চোখ খুলে। শরীরে অসহনীয় ব্যথা। তার অচেতন থাকা জরুরী, কিন্তু শরীর জেগে

উঠেছে, কারণ অন্তূদেরকে ব্যথাহীন থাকতে নেই।

অন্তূর কিছুটা সময় লাগল মনে পড়তে যে তার কী হয়েছে। তারপর মনে হলো নার্স কেন এসেছে আবার? তার বাচ্চা তো পড়ে গেছে, এদের আর কী কাজ? আরও কিছু কি আছে অন্তূর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার মতো? নাহ্ অসম্ভব। আর কিচ্ছু নেই। এই জগতে তার হারানোর মতো শেষ সম্পত্তিটুকুও অন্তূ বিসর্জন দেবার মাধ্যমে সে হলো সর্বোচ্চ শক্তিশালী ও দূর্বলতাহীন মানুষ।নার্সরা কাছে আসতেই একটা ভাঙা মাটির ফুলদানি ছুঁড়ে মারল অন্তূ, "আমার

কাছে আসবেন না। আপনাদের ভালোর জন্য বলছি। চলে যান, চলে যান। কী চাই আমার কাছে? প্রাণ নেবেন? না, এখন মরব না আমি। জয় আমিরের সাথে দেখা করা দরকার আমার। সে কোথায়? আসেনি? সে কি বেঁচে আছে? মরলে তার নিস্তার নেই। হাশরে একদম চেপে ধরব। কী পেয়েছে আমাকে? যা ইচ্ছে তাই না?”

অন্তূর মনে পড়ল সে এখন আমির নিবাসে। এখানেই তার সাথে একটা চমৎকার ব্যাপার ঘটে গেছে। কিন্তু ভেতরের এই ব্যথাটা সহ্য করা যাচ্ছে না। নার্সদেরকে আগেই বিদায় করা যাবে না। একটা উপকার নার্সরা তার

করতে পারে।-“ঘুমের ওষুধ আছে? আছে, আছে? থাকলে দিন। তাহলে চিকিৎসা করতে দেব। সত্যি দেব। এনেছেন সাথে? আমি ঘুমাবো। ততক্ষণে যেন জয় আমির চলে আসে কেমন?”

অন্তূর পরিকল্পনা হলো ভুলিয়ে-ভালিয়ে ওষুধ নিয়ে তারপর কাছে আসলে আক্রমণ করে তাড়িয়ে দেয়া। তার তো চিকিৎসার দরকার নেই। সে কিছুক্ষণ উন্মাদের মতোন দলা পাকানো ভ্রুণের দিকে তাকিয়ে থাকল। জোরে হাসল কয়েকবার। তার খুবই আনন্দ লাগছে। অবশেষে সে পুরোপুরি নিঃস্ব হতে পেরেছে। এটাই তো উচিত। যার কাছে প্রায়

কিছুই নেই, তার সামান্য কিছুও থাকা উচিত নয়। থাকবে না মানে কিছুই থাকবে না। কিন্তু সে তারপরেই যে স্বরে কেঁদে ফেলল চেহারা ভেঙে, তা সহ্য করা দায়। সেই কান্নার সুর ও মুখের কাঁকুতি অপার্থিব লাগে কেমন!

জননদ্বার মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ, হাত কাঁপে, চোখ জাপসা হয় দেখলে। কী বিভৎস!

নার্সদের নারীমন অস্থির হয়। জোরপূর্বক ধরে ড্রেসিং করা হলো। গলগল করে রক্ত আসছে। এই মুহুর্তে ভালো চিকিৎসার দরকার। কীভাবে বেঁচে থাকবে এই মেয়ে, আছেই বা কী করে, কী সহ্য করে এমন নির্লিপ্ত উন্মাদের মতো আচরণ করছে

মেয়েটা? এত সুন্দর দেখতে, তার কণ্ঠস্বর কী মধুর লাগে শুনতে, তার সঙ্গে এসব কী ঘটছে?নার্স দুজন একটা রিস্কি কাজ করেছে। অন্তূর জন্য স্বাস্থ্যপযোগী খাবার তৈরি করে এনেছে। কিছু প্রয়োজনীয় ওষুধ নিজেরা কিনে এনেছে। হামজা তাদেরকে পাঠিয়েছে কেবল বাঁচিয়ে রাখার জন্য। অন্তূকে ধরে জোর করে সামান্য খাবার খাওয়ার পর গলগল করে বমি করে ফেলল। বমির সাথে পিত্তি উঠে এলো, আঠালো মিউকাস এলো। বমির চাপে নিম্নদেশে টান পড়ায় কেমন অমানুষিক আর্তনাদ করে অন্তূ। শোনা যায় না সেসব। বুকের মাঝখানটায় আঙুল চেপে ধরে

পাগলের মতো শ্বাস ফেলে, কয়েকটা ঘুষিও মারল বুকের ওপর। বোধহয় হুমকি দিলো, আর ব্যথা পাবি না। খবরদার। আমার সহ্য ক্ষমতার অনেক উপর দিয়ে যাচ্ছে তোর তাণ্ডব।আবারও ধরে কিছুটা গরম দুধ, ও স্যুপ খাইয়ে ওষুধ খাওয়ানো হলো। সেফট্রিয়াক্সোন, ডাইক্লোফেনাক, এবং অবশেষে ক্লোজিপাম দেয়া হলো। অন্তূ হামাগুড়ির মতো এগিয়ে গিয়ে তার বাচ্চার সামনে বসে। থুতনি ভেঙে হু হু করে কেঁদে ওঠে। এত অবহেলিত? কেমন ধুলোয় জড়ানো মেঝেতে পড়ে আছে, যে মেঝে তার অধিকার। অন্তূ চাতকের মতোন হাত বাড়ায়,

অথচ সাহস হয় না ছোঁয়ার। থরথর করে কাঁপছে হাত। সে পেছায় কয়েক কদম। সে শুনতে পায় তাকে ডাকছে।

‘মা’ম্মা’ মা’ মা’ ‘আম্মা’...অন্তূর বুকের ওঠানামা অনিয়ন্ত্রিত হারে বাড়ল। নার্স দটো ভয় পেয়ে দ্রুত প্রেশার মাপে অন্তূর। দমদম করে বাড়ছে তা। হৃদস্পন্দন অস্বাভাবিক। তাকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করা হলো, ভ্রুণে হাত দিতে গেলে ক্ষুব্ধ বাঘিনীর মতো আক্রমণ করে উঠল অন্তূ, “খবরদার ছুঁলে জান নিয়ে নেব। ওর বাপ এখনও দেখেনি ওকে, ছোঁয়নি ওকে। না না না, খবরদার না।

আমাকে ডাকছে ও। ওর কাছে যাওয়া আমার দরকার। আমাকে কবে মারা হবে?”
খানিক পর অন্তূ নিস্তেজ মতো কাত হয়ে শুয়ে পড়ল। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল রক্তপিণ্ডের দিকে। চোখের পানি মেঝের ধুলোয় মিশে কাদা হয়ে উঠল। অন্তূ নির্বিকার। চোখে দৃষ্টি নেই, কোথাও হারিয়ে যাচ্ছে। অন্তূ দেখতেই থাকে তার নাড়িছেঁড়া ধনকে। লাল টকটকে, থকথকে এক দলা।গুলি খাওয়ার পাঁচদিন পর ছয়দিনের রাতে মনে হলো তার পিঠ বোধহয় অর্ধেক ক্ষয় হয়ে গেছে, কারণ বিগত কয়েক বছর যাবৎ সে শুয়ে আছে এই বেডে। এখন

তার ওঠা দরকার। সে উঠতে গেলে নার্স তাড়া দিলো,

-"না না, উঠবেন না। শুয়ে থাকতে হবে আপনাকে। প্লিজ উঠবেন না।"

-"সর শালি। দূরে যা, হাওয়া আসতে দে। কইবরা! তোল আমারে। সুস্থ-সবল মাইনষেরে পঙ্গু বানাইতে সমিতি খুলে রাখছে এইখানে। তোল।"

কবীর ওকে তুলে হেলান দিয়ে বসালো।

-"সিগারেট দে।"ছেলেদের খুশি কে দেখে? বাইরে পুলিশ বসা, সেটা বড় কথা নয়। ওরা থেকে থেকে 'জয় বাংলা' স্লোগান দিচ্ছে। পাশের ওয়ার্ড ও কক্ষের রোগীর লোকজন

ভয়ে ভয়ে এসে নিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে তারা রাস্তা ভুল করে হাসপাতাল ভেবে কোনো রাজনৈতিক সম্মেলন অফিসে ঢুকে পড়েছে কিনা।

জয়ের সিগারেট জ্বালিয়ে দেয়া হলো। একহাত আর্ম স্লিংয়ে ঝুলছে, সে বসে যে উরুতে গুলি লেগেছে, সেই পা দুলাচ্ছে আর সিগারেট টানছে। এটা মূলত একটা এক্সপেরিমেন্ট। প্রথমত পা দুলানোর ফলে পায়ে ব্যথা সয়ে যাবে, দ্বিতীয়ত বোঝা যাবে কতটা ব্যথা এখনও রয়েছে, চলাফেলা কতটুকু করা যাবে।ছয়দিনে মানুষ কথা বলতে পারে না ঠিকমতো। চারদিন আগেও

লোকটা রক্তশূণ্যতায় কোমায় যাবার পথে। নার্স রাগে গজগজ করতে করতে ডাক্তার ডাকতে গেল। কবীর জয়কে ভুলেও খুশির সংবাদটা দিলো না। এই মুহুর্তে পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটবে। সে নিজেও যায় না, সে যথেষ্ট পরিমাণ খাবার, আলোর ব্যবস্থা করে দিয়ে এসেছে।

সে শুধু সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিটা বলল জয়কে। জয় সুস্থ হলে সে একবারে নিয়ে যাবে ওখানে জয়কে। জয় দুজন পুলিশকে ডেকে নিয়ে দাঁত বের করে হেসে সালাম দিলো। ব্যথায় শরীর ভেঙে আসার জো, এসব তার জন্য নতুন না। বাড়িতে থাকলে এতক্ষণ কয়েকটা

মরফিন বা হিরোইন গিলে একচোট ঘুম দিলে ব্যথা গায়েব।

সিনিয়র নার্সকে ডেকে নিয়ে বলল, “দু-চারটে মাল-মশলা দেন। এসব ব্যতা-বেদনা এক যুগ ধরে শুয়ে থেকে মোকাবেলা করার অভ্যাস আমার নাই। আসলে আমি ক্রিমিনাল তো। দ্রুত সুস্থ হয়ে আইনের হাতে নিজেকে সোপর্দ করতে হবে। ঠিক না, দুলাভাই? একশটিরিমলি সরি—স্যার।”নার্স বলল, “ওগুলো নিষিদ্ধ, অবৈধ। এ অবস্থায় আমরা আপনাকে ওগুলো সেবন করতে দিতে পারি না। আপনার চিকিৎসা চলছে, খুব শীঘ্রই

রিকোভার করবেন বলে আশা করা যায়! ওসবের প্রয়োজন হবে না।”

-“কী কয় শালীর মেয়ে? নীতিকথা আমার শরীরের চারপাশে দুই কিলোমিটার পর্যন্ত জায়গার মধ্যে আসে না, কারণ নীতিকথা হলো জীবাণু, আর আমি ডেটল সাবান গিয়ে গোসল করি। কবীর, সিস্টারকে একটু সাঁতার শিখিয়ে আন তো।”

পুলিশ দুজনকে পাশে বসিয়ে হেসে বলল, “আপনারা কি দিনাজপুরের স্থানীয়?”-“হু।”

-“আগে দেখিনি। নতুন বদলী হয়েছেন নাকি? ”

-“হ্যাঁ, মাসখানেকের মতো।”

-“শালা সরকারী চাকরি খুব খারাপ। কিন্তু আপনারা ভাগ্যবান পুরুষ। নিজের জেলায় বদলি হওয়া কম কথা না। আমাদের এরিয়াতেই নাকি?”

সে হাসতে হাসতে চা-নাশতা করিয়ে পুলিশদের জন্ম-মৃত্যুর তথ্য এক কোরে ফেলল। কবীর কাগজে মুড়ে বেশ কিছুটা হিরোইন গুড়ো ও কয়েকটা মরফিন ক্যাপসুল নিয়ে এসেছিল। তাপ দেবার ব্যবস্থা নেই সুতরাং ধোঁয়া হিসেবে ব্যবহার করা গেল না, এছাড়া এখন নেশা করা নয়, ব্যথা কমানো জরুরী। পানিতে মিশিয়ে ইঞ্জেক্ট করল, কিছুটা নাকে টেনে নিলো, এরপর মরফিন ক্যাপসুল

জিহ্বার নিচে নিয়ে শুয়ে রইল। এবার নিশ্চিন্ত লাগছে। সাধারণ ওষুধে তার পোষায় না। মাঝে চারটা দিন হামজার শরীর আচমকাই যেন একেবারে শিথিল হয়ে উঠেছিল। দুটো ডাক্তার তার পেছনে চারটাদিন খুব খেটেছে। এর ফলে তার যে সমস্যা হলো, সে জয়কে দেখতে যেতে পারেনি, আর আরমিণের কোনো ব্যবস্থা করা যায়নি। এর মাঝে থানা থেকে বেশ কয়েকবার লোক এসেছে তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য। এখনও যেটুকু ক্ষমতা বাকি আছে তা দিয়ে ভাগানো হয়েছে। এর মাঝে সে একটা সিদ্ধান্ত পাল্টেছে। সে আরমিণকে দেবে না এমপির কাছে।

আরমিণের করা ক্ষতির পরিমাণ অনেক। সুতরাং শাস্তি পুরো হয়নি। এত দ্রুত ওরকম পর্যায়ের ভয়াবহ মহিলাকে ছেড়ে দিলে হামজার ইমেজ নষ্ট হবে। সে আরমিণকে বহুদিন ধরে নিজের কাছে বন্দিনী করে রাখবে, রোজ খুন করবে একটু কোরে। এই দুনিয়া সে খবর জানবে না। জয়কে হাসপাতালে থাকতে হবে এখনও বেশ কিছুদিন। ততদিনে সে সব ব্যবস্থা করবে।

পরদিন সে প্রথমত এমপিকে কল করে বলল, 'মামা, আসছি আমি। কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। তার ওপর জয়ের এই অবস্থা, আবার যতকিছু ঘটল। একটা

আলোচনা দরকার। জয়ের বউ যা করেছে, তা আমি মেনেই নিতে পারছি না। আপনি ভালো মানুষ জন্য ধৈর্য ধরছেন। সেই মেয়েলোকের সাথে কী করা হবে তারই আলোচনা করব আজ।'

এমপি যে কী খুশি হলেন! নিজের প্রাইভেট সময়েই ডেকে নিলেন হামজাকে। সে গেল রাত একটায়। এমপি তখন নিজের বিনোদন ফ্ল্যাটে বিনোদনে রাত কাটাতে যান। নতুন নতুন দুটো মেয়ে থাকে সেবা দেবার জন্য আর মদের যথেষ্ট পরিমাণ মদের বোতল। স্বর্গীয় অনুভূতি!হামজা মেয়েদুটোকে বলল, 'তোমরা একটু রুমে যাও।' ওরা এমপিকে

ড্রয়িং রুমে রেখে রুমে গেল। হামজা গিয়ে বাইরে থেকে রুমের দরজা আঁটকে দিয়ে এলো। বিষয়টা বোঝার খুব একটা সময় এমপি পেলেন না। হামজা সময় নষ্ট করল না। সেটা ঝুঁকিপূর্ণ। একজন এমপির ব্যাপার-স্যাপার।

সে এমপিকে এসিড পান করালো। সালফিউরিক এসিড। বড়ঘরে লোহা ইলেক্ট্রোপ্লেটিংয়ের কাজে ব্যবহৃত হয় এ পদার্থ। এমপি সাহেবের ঠোঁটে কিছুটা ঢেলে পড়ার সাথে সাথে ঠোঁটদুটো ফুরিয়ে গেল। মাংসের দলা হয়ে পরে আবার সেটুকুও ক্ষয় হয়ে গেল। ঠোঁট ও মুখে মাংস নেই, হাড়

বেরিয়ে গেল, তখনও এমপি হামজার পা দুটো জড়িয়ে ধরে আছেন। মুখ নেই জন্য আর্তনাদ করে প্রাণভিক্ষা চাওয়ার সুযোগ নেই।হামজা তাকে বলল, "মামা আমি আপনার মুখটা ঝলসালাম একটাই কারণে— এই মুখ দিয়েই আপনি জয়কে গুলি করার অর্ডার দিয়েছিলেন। একটাবার তো ভাবতেন জয়ের পেছনে হামজা দাঁড়িয়ে আছে। জয় তো একা না, মামা। ওর গায়ের রক্ত ঝরানো মানে আমার বুকে লাত্থি মারা। তাই আমি আপনার পা দুটোও কেটে নেব।"

হামজা কেটে নিলো। অবশ্য আটকে রইল হাড়ের সাথে। তাতে সে এসিড ঢালল। ধোঁয়া

উঠে গলে এড়িয়ে গেল শরীরের অঙ্গ। শেষে একটা ছোরা শুধু কণ্ঠনালির মাঝ বরাবর গেঁথে দিলো। অর্ধেকটার মতো এসিড তখনও বাকি। এটুকু ফিরিয়ে নিয়ে যাবার মানে নেই। এমপির পুরো শরীরে ফুল ছিটানোর মতো কোরে ছিটিয়ে ঢেলে দিলো সেটুকু। ব্যাস, একটা সুন্দর এমপি কাবাব তৈরি হয়ে গেল। মাংস ঝলসানোর বিশ্রী গন্ধে রুমটা ভরে উঠল।

কিন্তু হামজা কোনোকিছু হাতে ধরে রাখতে চাইলে তাকে এখন অতিরিক্ত জোর প্রয়োগ করতে হয়, স্বাভাবিক শক্তিতে হাত শিথিল, বস্তু থাকে না। এসিডের রেজিস্ট্যান্ট গ্লাস

বোতলটি পড়ে গিয়ে চুরমার হয়ে গেল। তা তোলা হামজার পক্ষে সম্ভব নয়। তার হাত কাঁপে, স্নায়ু নিয়ন্ত্রণহীন প্রায়।মেয়ে দুটোকে সে সঙ্গে নিয়ে এলো, বলল, 'তার কাছে থাকলে প্রতি রাতের জন্য লাখ টাকা পেতে পারে তারা। কারণ সে নারীকে খুবই সম্মান করে। কমদামে সে কিনবে না তাদের।' তবে এটা মিথ্যা কথা। হামজা ওদেরকে বড়ঘরে চুল্লির জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করবে। কোনোরকম ঝুঁকি রাখা যাবে না। একমাত্র সাক্ষী ওরা। বাকি প্রমাণ সে নষ্ট করে এসেছে যথাসাধ্য।এ ঘটনার পরদিন যখন গোটা অঞ্চল তোলপাড় এমপির এমন

মৃত্যুতে, হামজা তখন এমপির বাড়ির সোফায় মুখটা শুকনো করে বসে বিলাপ করছে। রাত দশটা বাজে। লাশ দেখার মতো অবস্থায় নেই।

জয় খবর শুনে হাসল সামান্য। বড়সাহেব ভয়াবহ কাজটা করে ফেলেছে। ব্যাপার না, সে এখান থেকে সটকে পড়ে একেবারে সামনে গিয়েই দাঁড়াবে। অনেকগুলো দিন হামজার ডাক শোনা হয়নি। সে পুলিশ দুটোকে ডেকে বলল, "আপনারা এখন মোট কয়জন আছেন?"

-"ছয়জন। আর আশপাশে কিছু মোতায়েন আছে অবশ্যই। কেন জিজ্ঞেস করছো?"

-“বসুন। আরামে আলাপ করি।”

সে তাদেরকে বলল, “আপনাদের কাছ থেকে গত পরশু আমি আপনাদের ঠিকানা-পরিচয় জানলাম না? তারপর আমার ছেলেরা খোঁজ করে আপনাদের বাড়িতে পৌঁছে গেছে। কী বিচ্ছু ভাবুন। আসলে ওরা গেছে আপনাদের বাড়ির অবস্থা দেখতে। যদি ধরুন কোনো কমতি বা অভাব থাকে সেটা আপনারা চাইলে পূরণ করে দেয়া হবে মামা দিয়ে। ওহ্ মামা মানে হলো টাকা। আমার ভাষা এটা।

”পুলিশেরা অবাক। টাকা মানে মামা? কিন্তু তারা জানে না জয়ের এরকম আরও কিছু নিজস্ব ভাষা রয়েছে। থানা হলো শ্বশুরবাড়ি।

কর্মকর্তারা তার শালা-সম্বন্ধি, কেউ দুলাভাইও। তার ভাষায় স্যান্ডেল হলো চশমা। মেয়েদের কামিজ হলো পাঞ্জাবী। এরকম বহুতকিছু।

সে বলল, "আর যদি ধরেন এটাতে রাজী না হন, তাহলে আপনাদের বাড়ির জনসংখ্যা কমানোর ফলে বাংলাদেশের পরবর্তী আদমশুমারিতে একটা অবদান রাখা হবে। আর যদি না চান বাংলাদেশের এই উপকার করতে, তাহলে আমি আজ রাতে কাল্টি খাব এখান থেকে, আপনারা পেছনে থাকবেন। চাইলে বাকিদের সাথে আলাপ করে নিতে পারেন।"শরীর তার অনুভূতিহীন প্রায়, খোঁচা

মারলেও ব্যথা লাগছে না, চোখের পাতা তখনও কিছু ভারী। শরীরে দুটো দিন ভালো পরিমাণ ড্রাগ গেছে। রাত একটা বাজল। উঠে লুঙ্গি পাল্টে নিলো। গলার চেইন, হাতের রিস্টলেট, বালা, ঘড়ি, ব্ল্যাক টাংস্টেনের কালো আংটিখানা—সব খুলে নেয়া হয়েছিল, সেসব পরল।

তার নাকি পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা উঠল, টাকা খাওয়া দুটো নার্স ও ওয়ার্ডবয় এসে তাড়াহুড়ো লাগিয়ে দিলো এখনই একবার ব্যান্ডেজ খুলে দেখতে হবে, এক্সরে করতে হবে। হাসপাতালের সরকারী এক্স-রে নিম্নমানের। বাইরের ডায়াগনস্টিক সেন্টারে

নিতে হবে উন্নতমানের এক্স-রে করাতে। জয় সেই পুলিশদুটোকে সঙ্গে নিলো। তারা পাহারা দেবে যাতে জয় ভেগে না যেতে পারে।
বাকিরা তখন ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে। যে লোক ব্যথায় আধমরা, এক্স-রে করতে যাচ্ছে, হাটার ক্ষমতা নেই সে কোথায় পালাবে? পালানোর উপায়ও নেই, চিকিৎসাও দরকার। তাছাড়া রাত আসে ঘুমানোর জন্য, জয়ের মতো ক্রিমিনালকে পাহারা দিতে হবে তা ঘুম বোঝে না।
ডায়াগনস্টিক সেন্টারের পেছনে জিপ অপেক্ষা করছিল, ছিনতাই করা জিপ। পুলিশদুটো জয়কে তুলে দিলো জিপে। জয় ছেলেদেরকে

বলল, "পরিবারগুলোকে ছেড়ে দে, ওদের দুটোর জন্য ভালো একজন গোরখোদক দেখে কবর খুড়িস।"কবীর অবাক হয়ে ডাকে, "ভাই!"

জয় অন্তূর সেই রক্তমাখা ওড়নাটা মুখ পেচাতে পেচাতে বলল, "ওরা দেশের শত্রু, কবীর। আমার টাকা আছে বলে আমার মতো ক্রিমিনাল পার পেয়ে যাবে, আরেকজনের না থাকলে সে মারা খাবে, এটা তো হলো না! তাছাড়া আমার কাছে ওদের স্যাটা ভরানোর মতোন এখন টাকা নাই। তো কী হলো? বেইমান কমলো দুটো আর আমার টাকাও

অপচয় হলো না। অপচয়কারী শয়তানের ভাই কবীর। শয়তান আমার সম্বন্ধি।”

কবীরের পিঠ চাপড়ে বলল, “যেখানেই থাকিস, সাবধানে থাকিস, চট্টগ্রামের পাহাড়ে-টাহারে ঘুরে আয় কিছু দিন। আবার দেখা হবে। জয় বাংলা।”

কবীর জয়ের হাতে চাবি ধরিয়ে দিয়ে কেমন আপ্লুত কণ্ঠে বলে, “জয় বাংলা, ভাই! আপনার সুখের দিন সামনে। সত্যি বলতেছি। যান না যান, আমার কথা মিলিয়ে নিয়েন। এখন কিছু বলব না। ভাবীরে আমার সালাম জানাইয়েন।কবীর আস্তে কোরে ছেড়ে দেয় জয়ের হাতটা। যতক্ষণ জয়ের জিপখানা দেখা

গেল, কবীর দাঁড়িয়ে রইল। তার চিন্তা হলো জয় এখনও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে, একহাত আর্ম স্লিংয়ে বাঁধানো। এই সময় তাকে জয়ের প্রয়োজন, কিন্তু জয় কবীরের জীবন ঝুঁকিতে ফেলবে না। তাদেরকে এখন যার যার মতো লুকাতে হবে কিছুদিন।

রাত শেষের দিকে। জয়ের বুক কাঁপে বাড়ির সীমানায় পা রেখে। অন্তূ বাচ্চাদের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে কী জবাব দেবে সে? কিন্তু অনুশোচনা মুখে রাখলে তো তার চলে না! সে গলা ফেঁড়ে ডাকতে ডাকতে তালা খুলল, “আরমেইণ! আরমেইণ!”

অন্তূ তড়িঘড়ি উঠে বসে। এসেছে জয় আমির সত্যিই? এই নয়দিনে সে অসংখ্যবার আব্বু ও জয় আমিরের ডাক শুনেছে, দেখেছে পালাক্রমে দুজন এসে তার শিয়রে বসে, সেসব ছিল ধোঁকা। কিন্তু এবার শব্দ করে খুলে গেল শাল কাঠের কপাটদুটো।পুরো হলরুমে সাতটা মোমবাতি জ্বলছে। হলদে আলো। আরমিণ পড়ে আছে মেঝের ওপর। পরনে একাখান ওড়না মাত্র। সারা মেঝেতে রক্ত, অন্তূ শুয়ে আছে শুকনো রক্তের ওপর। জয়ের হাত ও হাঁটু জুড়ে শিরশির করে একটা কাঁপুনি নিচে নেমে গেল। তারপর বুক থরথর করে উঠে নিঃশ্বাসের গতি বাড়ল,

একসময় তা প্রচণ্ড হলে আটকে এলো। কেবল অস্ফূট স্বরে ডাকে সে, "আরমেণ!"

-"জয় আমির! জয়?"ঢোক গিলতে পারলেও জয় পা চালাতে পারে না। ওটা কী পড়ে আছে আরমিণের পায়ের দিকে? জয়ের মাথাটা চিড়ে উঠল, ওটা কি করাত? জয়ের মস্তিষ্ককে দুইভাগ করে ফেলল চিড়ে? বুকের ভেতরে কী হচ্ছে? ওটা কী পড়ে আছে? এই রক্ত কীসের? আরমিণের কী হয়েছে?

জয় থরথর করে কাঁপা খোঁড়া হাঁটু টেনে নিয়ে গিয়ে আরমিণের সামনে ছেড়ে দেয়। ধপ করে মেঝেতে বসে। বসতে দেরি হলো, অন্তূর দেহটা এসে পাগল স্রোত-তরঙ্গের

মতো তার বুকের ওপর আছড়ে পড়তে সময় নিলো না। জয় একটু দুলে ওঠে। চোখটা শক্ত করে চেপে বুজে নেয়। আরমিণ হেরে গেল আজ। জয় আমির বলেছিল এই জনমেই আরমিণ তাকে ভালোবাসবে। ব্যাস, হেরে গেছে চ্যালেঞ্জে আরমিণ। এই যে আছড়ে পড়া, শার্টটা খামচে ধরে হুহু করে কেঁদে ফেলা, জয়ের বুকের ভেতর ঢুকে যেতে চাইবার যে উন্মাদ প্রচেষ্টা, কান্নার তরে জয়ের শরীরটাও অন্তূর সাথে সমান হারে দুলে ওঠা, বুকের ভিজে ওঠা পশম—জয়ের কি এই সংক্ষিপ্ত জীবনে আর কিছু পাবার আছে? না, এই তো প্রাপ্তির খাতা পূর্ণ আজ!অন্তূর কান্না

ধীরে ধীরে চিৎকারে রূপ নিলো। সরু আর্তনাদে শিউরে উঠল আমির নিবাসের ভীত। জয়ের বা ভেতরে কী হলো! সে একটানে অন্তূর গায়ে আলতো কোরে জড়ানো ওড়নাটা একটানে খুলে ফেলল। সম্পূর্ণ অনাবৃত অন্তূ। জয় অন্তূর যোনীদ্বারে হাত ছুঁয়ে চুইয়ে আসা রক্ত হাতে মাখে। চলন্ত কোনো ইঞ্জিনের মতোন থরথর করে কাঁপে জয়ের হাত। রক্ত থেকে দূর্গন্ধ আসছে। জয় প্রাণভরে সেই গন্ধ টেনে নেয় ভেতরে। তার দম পড়ে না। কিন্তু সেই দুর্গন্ধযুক্ত রক্তের ওপর টুপ করে দুই ফোঁটা জল পড়ে গুলিয়ে যায় রক্তের সাথে। জয় কাঁদে না। সে কাঁদতে

পারে না। এখনও কাঁদছে না, মাড়ির দাঁত আটকানো, শক্ত চোয়াল দেখে বোঝা যায়। কিন্তু চোখে পানি কেন?

সে একদৃষ্টে সেই রক্ত দেখে আর বলে, "আমা..র র..রক্ত! আরমেইণ! আ..মার র...ক্ত, হ্যাঁ? আমিরদের রক্ত এটা?"

আরও তিনফোটা পানি হাতের রক্তের প্রলেপে পড়ে রক্তের ঘনত্ব কমিয়ে আনে। জয় ডাকে, "এই, এইহ্! এ..টা ক..কী?"

অন্তূ শুধু কাঁদে। জয়ের গোটা দেহ মৃগী রোগীর মতো কেঁপে কেঁপে ওঠে। জয় মেঝেতে পড়ে থাকা চাপড়া ধরা রক্ত তুলে হাতে মাখে, পাগলের মতো গায়ে মাখে। এই

রক্ত তার, আরমিণের গর্ভে স্থান পাবার পর আবার পরিত্যক্ত নাপাক রক্ত তার!সে হাঁ করে বিশাল বড় বড় শ্বাস ফেলে। তার দম ফুরিয়ে আসে। সে ভ্রূণের টুকরো তুলে হাতের তালুতে নেয়। নাহ্ সে বাপ হিসেবে কোলে নিতে পারবে না এটাকে, ততবড় হতেই দেয়া হয়নি! গর্ভ ছিঁড়ে বের করে এনে এই নোংরা মেঝেতে ফেলে রাখা হয়েছে। এত কেন অবহেলিত তার রক্তরা আগে পরেই? একটুও কদর পেল না আমিরদের রক্ত কখনও। তার নিজের রক্তও সেই ছোটবেলা থেকে রাস্তায় রাস্তায় মিশে গেছে, মানুষ পায়ে মাড়িয়ে চলে গেছে।

এই রক্তপিণ্ডের চোখ, নাক, কান কি বোঝা যাচ্ছে? এটা তার সন্তান? জয় আমিরের সন্তান এটা? সন্তান কেমন হয়? জয় তো জানে না। কবে হলো এসব? তার ঘরওয়ালি কী করে ফেলেছে তার সাথে? জয়ের তো কখনও সাহসই হয়নি এই আসমানসম আকাঙ্ক্ষাটুকু প্রকাশ করার! সেও কি সন্তানের বাপ হতে পারে? আরমিণের গর্ভে তার রক্ত স্থান পেতে পারে? শালির মেয়ে বলেছিল এ জন্মে ভালোবাসবে না। ভালোবাসা কী? এই তো! আরমিণের ভেতরে সে স্থান পেয়েছে! এটা ছাড়া আর কী চাই জয় আমিরের?কিন্তু এভাবে তাকে গর্ভছাড়া

কে করেছে? জয়ের চোখ অন্ধকার লাগে। হৃদস্পন্দন অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে। শরীর ঘেমে শার্ট ভিজে উঠেছে। সে কেমন অন্ধের মতো হাতরে বুকে টেনে নেয় অন্তূকে। বুকের সাথে এত জোরে চেপে ধরল যেন যতক্ষণ আরমিণ তার কলিজা ফুঁড়ে ভেতরে না ঢুকবে সে কিছুতেই এই আরমিণকে বুক থেকে আলগা হতে দেবে না।

-"আমি বলেছিলাম না আপনাকে? আমার রবের লাঠি আওয়াজহীন হয়। তিনি বিচার করলে এই জগতের কোনো শক্তি তা এড়াতে পারে না! আমি বলেছিলাম আপনাকে, তিনি মহাবিচারক। তার বিচারে একটুও না-ইনসাফ

থাকে না। কী করেছেন আপনি? মেরে ফেলেছেন বাচ্চাগুলোকে?''আরমিণকে চুপ করানো দরকার। জয়ের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। আমির নিবাসের ছাদ উপেক্ষা করে একুশটা বছর পর সে সৃষ্টিকর্তার তরে আকাশের পানে তাকায়। কেউ আছেন ওখানে? সত্যিই আছেন নাকি? কে আছেন? তিনি ডাক শোনেন? তিনি বিচারও করেন? কেমন বিচার করেন সেই সত্ত্বা।

-"মহা বিচারক তিনি। কিন্তু আজ কি তার বিচারে একটু ভুল হয়নি, জয় আমির? কিন্তু তিনি তো ভুল করেন না! ভুলের ঊর্ধ্বে। তবু আজ একটা গড়মিল কেন হলো, বলুন না?

বলুন বলুন, আমাকে বলুন। আমি আপনার স্ত্রী বলে? যাকে কখনও স্বামী হিসেবে মনকে মানাতেই পারলাম না, সেই পুরুষের স্ত্রী হওয়ার মাশুল কেন দেব আমি? কেন দেবোওওও?''অন্তূ চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। জয় ঢোক গেলে দুটো। অন্তূকে একদম মিশিয়ে ধরল বুকের মাঝে। যেন ছেড়ে দিলেই হারাবে, আর তা হতে দেয়া সূর্যকে রাতে দেখার মতোই অসম্ভব জয়ের জন্য! অন্তূকে আরও একটু বাহুডোরে আঁকড়ে নিয়ে বুকের মাঝখানটায় চেপে ধরে ফিসফিস করে বলল, "সেদিন কাজী সাহেব তোর খোদার নামের কালাম পাঠ করে তোকে আমার সাথে

জুড়েছিলেন, মনে আছে? আজ আমার সবকিছুর অর্ধেকটা তোরও, আরমিণ। আমার পাপ, তাপ, অভিশাপ সবেতে তোর ভাগ লেখা হয়ে গেছে। তোর ভেতরের সবটুকু ঘেন্না শুধু আমার, আমার পাপের অর্ধেক তোর।''মিস ক্যাথারিন খানিক আগে দম আঁটকে ফেলেছিলেন কান্নার চোটে, কেননা তিনি দেখাতে চাইছিলেন না তাঁর ভেঙেচুড়ে কান্না আসছে। মাহেজাবিণ হাসল এতে। তার একটুও কান্না পাচ্ছে না! পাবার কারণ নেই। তার সন্তান তার পাশেই আছে, তার নামের সাথেই আছে। সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে সে হয়েছে মাহেজাবিণ আমির।

আমজাদ সাহেব এক আওলিয়ার গল্প বলতেন। তাঁর নাম মনসুর হল্লাজ। লোকটা পাগল ছিল–এমনটা লোকে বলতো। তিনি নাকি ছিলেন মূলত আল্লাহর পাগল। ঘর, সংসার, দুনিয়াবী আয়েশ সব ছেড়ে রাস্তায় বেরোলেন নিঃস্ব এক পাগল হয়ে–আল্লাহকে সম্বল করে। আর কিছু নেই তখন তার। এ অবস্থায় একদিন গাছের নিচে অবচেতন হয়ে পড়ে থাকার কালে এক আলোর দ্যুতি সামনে এসে দাঁড়াল, এক ঝলক। দ্যুতি থেকে কেবল একটি শব্দ ভেসে এলো-"আনাল হক!" (নাউযুবিল্লাহ) অর্থ হলো–'আমি সত্য, আমি রব।'

আলোর দ্যুতি ফুরিয়ে যেতেই মনসুর উঠে বসলেন। কোথাও নেই সেই আলোর দ্যুতি, কোথাও নেই আল্লাহর নূর। এই বিরহ সইবার মতো নয়, তখন কেবল মনসুরের কাছে রয়ে গেল আলো থেকে ছুটে আসা দুটো শব্দ–'আনাল হক।' প্রেমিকের কাছ থেকে প্রমিকা হারিয়ে গেলে সচরাচর দেখা যায় প্রেমিক পাগল হয়েছে, তার কাছে আজ প্রেমিকা নেই, আছে বুকপকেটে লুকানো প্রেমিকার একখানা রঙচটা ফটো, অথবা একাখানা হাতে কাজ করা রুমাল। এই তার সম্বল, শেষ স্মৃতিচিহ্ন। মানুষ প্রেমের বিরহ সইতে প্রেমের স্মৃতিকে আপন করে।

মনসুর হল্লাজের কাছে আল্লাহর প্রেমের একমাত্র শেষ সম্বল বা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে ছিল আল্লাহর নূর হতে নিসৃত বাণী— আনাল হক। তিনি সেটুকুকে মৃত্যুর পর অবধি জবানে জপেছেন। লোকে এসব জানল না। শিরকের অপরাধে তাকে বন্দি করা হলো। শূলে চড়িয়ে পাঁচখণ্ড করা হলো, খণ্ডগুলো জ্বালিয়ে ভষ্ম করা হলো, তবু সেই ছাইয়ের ভেতর থেকে ধ্বনি আসে–'আনাল হক।'অন্তূর গর্ভে বাচ্চা এসেছিল, অন্তূ জানতে পারেনি। জয় আমির এক দানব পুরুষ। তার সেসবের হিসেব থাকেনি —টগবগে নারী পুরুষ আরেকটি প্রাণের উদ্ভাবক হতে পারে খুব সহজে। সে

অন্তূকে কখনও জোর করে কাছে পেলে সকালে খুব জিতে যাবার খুশিতে পৌরুষ তেজে বুক ফুলিয়ে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু অন্তূর গর্ভ তা মানবে কেন? অন্তূ একদিন টের পেল তার ঋতুস্রাব চলছে না। সে রিমি হতে পারে না। নিজের সন্তানের খুনী অন্তূ হতে পারে না। এই সন্তান তার জীবনের শেষ অবলম্বন হতে পারে যেখানে সে বাপ, ভাই, পরিবারসহ সকল আশ্রয়হীনা। এই সন্তান জয় আমিরের সবচেয়ে বড় শাস্তি হতে পারে যখন এই সন্তানের ভাগ কেবল অন্তূর থাকবে।

কিন্তু অন্তূর সন্তানকে হারাতে হলো। কিন্তু সে মানতে পারল না। তার সন্তান পরিণত

হয়েছিল না বলে নাম পায়নি, বংশের রক্ত তো পেয়েছিল! রক্তের নাম 'আমির'। শেষ আমির। অন্তূ নিজের 'অন্তূ' ও 'আরমিণকে' ত্যাগ করে মাহেজাবিণ হবার কালে সেই ছোট্ট আমিরকে নিজের সাথে নিয়েছে; সন্তানকে মা কখনও আলাদা রাখতে পারে না। তার সন্তান নেই, সন্তানের রক্তের নামটুকু রয়ে গেছে কাছে। যতদিন অন্তূর শ্বাস চলবে, এই নাম তার নামের সাথে থাকবে।মিস ক্যাথারিন খেয়াল করলেন, এখন গভীর রাত। এরকম অনেকগুলো সমন্বিত-নিশীথের গল্পই তিনি শুনতে শুনতে চলমান সময়কে ভুলে

বসেছেন। তিনি অনেকক্ষণ পর নিজেকে সামলে শুধু জিজ্ঞেস করলেন—

-“মাহজাবিণ, তুমি ভালো কেন বাসলে না জয় আমিরকে?”

মাহেজাবিণ মৃদু হাসল, ম্লান-আনমনা হাসি, “তার সন্তান গর্ভে ধারণ করেছি, তাকে আমি কতবার ভরসা করে বসেছি–এর অপরাধ কি কম লাগছে আপনার কাছে যে ভালোবাসার কথা বলছেন?”

মাদাম কেমন করে যেন ডাকলেন,

“মাহজাবিণ!”

-“হু!”

-"তার কোনো ফটো আছে? দেখতে সে কেমন বলতে পারো? কীভাবে তাকে বর্ণনা করলে আমার কাছে, আমি কেন ছটফটিয়ে যাচ্ছি এক পাপীষ্ঠ পুরুষকে দেখার জন্য?"

মাহেজাবিণ হাসে, "চলুন দিনাজপুর। পাটোয়ারী বাড়িতে তার জন্য বরাদ্দ কামরার দেয়ালজুড়ে অনেকগুলো ফটো লাগানো ছিল। আজও আছে বোধহয়!"হাতের বাহু খসে পড়ার মতো যন্ত্রণা উঠল, রক্তও বোধহয় বেরিয়ে এলো ব্যান্ডেজের ভেতরে, উরুতে ভর সইছিল না একদম। তবু অন্তূর শরীরটা পাঁজাকোলে কোরে তুলে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওঠে সে। একুশ বছর আগে উল্টো ঘুরে

নেমে গিয়েছিল এই সিঁড়ি ভেঙে। সেদিন সে ছিল জয়নাল আমিরের কোলে, আজ তারই কোলে তার অদৃষ্টের তুলে দেয়া আমানত। গলা শুকনো খটখটে, পানি পান করতে পারলে হতো। বারবার ঢোক গিলতে চেয়েও লালা পায় না মুখ। সে সব ভুলে যাওয়া জয় আমির, তবু কোন সাহসে ভেতরটা আজ এই বাড়ির ওপর চরম অধিকারবোধ আর আকাঙ্ক্ষায় ভরে উঠছে? তার পরিচয়, তার রক্ত, ভিটেমাটি যা তাকে দুই যুগ আগে পর করেছে খুব নির্মমভাবে। এছাড়া তাকে খুব তাড়াতাড়ি এই আমানতকে সঙ্গে নিয়ে হোক অথবা ফের একেলা ফেরারি হতে হবে এসব

ছেড়ে। এই টান ভালো না।সে জাভেদ ও হুমায়িরার মাঝখানের সদস্য ছিল, তার জন্য বরাদ্দ আলাদা কক্ষ হয়েছিল না, দাদু বলতো, ‘তুই আর কিছুটা বড় হলে সম্পত্তি থেকে বহিষ্কার করব তোকে। তোর মতো শয়তান আমার সম্পত্তির ভাগ পাবে না। তাই কোনো ঘরও দেয়া হবে না তোকে।’

তাহলে আজ বউ নিয়ে কোন কক্ষে উঠবে সে? তার একটা কক্ষ আছে অবশ্য, সেখানে মাস্টার সাহেব তাকে পড়াতে এসে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতেন।

বিছানায় চটা চটা ধুলো, ভ্যাপসা গন্ধ, ঘন মাকড়শার জাল। আলো বলতে আধখানা

মোমবাতি। অভিজাত্যে রমরমা সেগুন কাঠের আসবাবের রঙ ময়লা হয়ে গেছে। একটানে চাদরটা তুলে ফেলে দিয়ে একহাতে ওড়নাটা বিছিয়ে অন্তূকে শোয়ালো তার ওপর। তার গলার ওড়না শুকনো রক্তে শক্ত হয়ে আছে। শার্টটা খুলে অন্তূর শরীর ঢেকে দিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। জিজ্ঞেস করল না কীভাবে এসব হয়েছে। তা শোনার জন্য যে শক্তি ভেতরে প্রয়োজন তার এক আনাও নেই।ফজরের আজান হবে খুব শিগগির। শরীরটা তো ভালো না। উরুতে রক্ত ঝরছে। আর্ম স্লিং সে জিপেই খুলে ফেলে দিয়েছে কোথায়! অন্তূর পাশে একটু জায়গা নিয়ে শুয়ে

পড়ল। খোলা শরীরে বাহুর ব্যান্ডেজের নিচে জমে ওঠা রক্ত দেখা যাচ্ছিল স্পষ্ট। শ্বাস পড়ছে হাঁপানি রোগীদের মতো। আজকের আগে জয়ের এই অস্থিরতা কেউ দেখেনি কখনও। অন্তূ উঠতে চায়।

-“উঠো না। শুয়ে থাকো।”

অন্তূ শার্ট ছেড়ে দিয়ে ওড়নাটা টেনে তুলে শরীরে পেচিয়ে খুব কষ্টে উঠে বসে।

-“উঠতে মানা করলাম না? আমার অবাধ্য হয়ে সুখ পাও?”

-“আর কোথায় গুলি লেগেছে?”

-“লাগেনি। শুতে বলছি আমি।”

-“পুলিশের গুলি খেয়েছেন?”

জয় চোখ বুজে হাসল, “তোমার পুলিশেরাই পৌঁছে দিয়ে গেল এখানে।”

-“খুব শক্তিধর আপনি?”

-“না। কে বলে?”বিশাল লম্বা শরীর। পরনে শুধু সাদা লুঙ্গি। টানটান হয়ে শুয়ে আছে, খাটের এধার-ওধার অবধি। লুঙ্গির ওপরে রক্তের ছোপ ভেসে উঠেছে। অন্তূ আস্তে আস্তে লুঙ্গিটা উরুর কিছুটা উপরে তুলল। কালো কুচকুচে লোমে ভর্তি পা। রক্তে ব্যান্ডেজ ভিজে উঠেছে। আশ্চর্য মানুষ! এ অবস্থায় তার ভর বয়ে কীভাবে দোতলায় তুলে এনেছে ভাবার বিষয়।

চুপচাপ শুয়ে আছে, শুধু শ্বাসের উঠানামা ভয়াবহ অস্বাভাবিক, কী ভাবছে কে জানে! কিছু ভাবছে এটা নিশ্চিত।

অন্তূ ব্যান্ডেজের ওপর আঙুল চালায়। জয় সেই আঙুলগুলো আলগোছে ধরে ফেলল।

-"আমাকে নরকে পাঠিয়ে আমার সন্তান নিয়ে বাঁচতে চাওয়া এই ছলনার ব্যাখ্যা দাও। সকাল হবার আগেই।"

অন্তূ একবার তাকায়। আবার জয়ের ক্ষত দেখে বলে, "তিনটা মাস পেটে করে ঘুরলাম আমি, আজ ঘন্টাখানেকের মাঝে ও আপনার সন্তান হয়ে গেল?"

জয় হাসে, “তুমি কে? ওর বাপের দাসী।
”সঙ্গে সঙ্গে অন্তূর মলিন মুখটাতেই
আত্মমর্যাদার ক্ষোভ ফুটে ওঠে, মুখ শক্ত, নাক
শিউরায়, ফিরিয়ে নেয় জয়ের দিকে থেকে।
সেই শক্ত অবয়ব বেয়ে এক ফোটা শীতল
তরল থুতনিতে ঠেকে। জয় আলতো হাসে।
আজও এত আত্ম- অহংকার! এখানেই কি
মরণ হয়নি জয় আমিরের?
জয় লুঙ্গির পেছনে গোজা পিস্তলটা খুলে এনে
ধীরে ধীরে গুজে দেয় অন্তূর হাতের মুঠোয়,
“নাও! এত পাপ করলাম তোমার কাছে।
বদলা নিলে না তো? আজ মেরে দাও, দেরি
কোরো না। দেরি করলে গুলি চালাতে পারবে

না। শুট..."একটুও মিথ্যা নয় আবদার। অন্তূ স্পষ্প দেখে জয় আমিরের চোখে অসহনীয় যন্ত্রণা ও মৃত্যুর পিপাসা। পিপাসার্ত কারও পিপাসা মিটিয়ে দেয়া কখনও শাস্তি হতে পারে? অন্তূ জয় আমিরকে সর্বোচ্চ শাস্তিপ্রাপ্ত অবস্থায় চোখ ভরে দেখার আকাঙ্ক্ষা রাখে।

-"সারেন্ডার করবেন আপনি পুলিশের কাছে।"

-"নাহ্!" ঢোক গিলে মাথা নাড়ে জয়, "আইন না। বেআইনের পূজারী আমি। আইনে বন্দি করতে তুমি পারবে না, ঘরওয়ালি। মেরে দাও! নাহলে সঙ্গে চলো, কসম নয়ত আমি মেরে দেব তোমায়।"

-"আমি কোত্থাও যাচ্ছি না।"

অন্তূর নিষ্ঠুর জবাবেও কীসের এক সুপ্ত উৎসাহ হই হই করে ওঠে জয়ের কণ্ঠে, "তো কী? থাকবে এখানে? ব্যবস্থা করব? মেরামত করাবো বাড়ি?"

-"কোথায় নিয়ে যাবেন আমায়? কারাগারে?"

জয় অন্তূকে টেনে এনে বুকের ওপর ফেলল। কিছুক্ষণ অন্তূর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "কারাগারে কে যাচ্ছে? আমির পরিবারের ছেলে কারাবন্দি হয় না। এটা জেদ করার সময় না। আমি ছাড়া গতি কী তোমার?"

-"মিছে অহংকার।"

-"তোমারটা সত্যি?"

-“পাপ করতে যার ভয় নেই সে বন্দিত্বকে এত ডরায় কেন?”অন্তূকে জোর করে নিজের সাথে লেপ্টে ধরে রেখে বলল, “চুপ। চুপচাপ শুয়ে থাকো কিছুক্ষণ, একটু ঘুমাতে দাও। নয়ত এখানেই মরে যাব। সত্যি বলছি। শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা, আর এখানেও।” বুকে ইশারা করে জয়।

দুজনের কি কাঁদা উচিত? হাউমাউ করে? জীবনের এ পর্যায়ে এসে কোথাও কি দুজন মিশে গেছে এক দিগন্তে? দুজনের অসহায়ত্ব, অনিশ্চিত ভবিষ্যত, সম্পর্কের পরিধি, হারানো সম্পদ... আজ জয়ের চাওয়ামতো দুজন

দুজনের ওপর হেলান দিয়ে দাঁড়ানো কাঠি।

কিন্তু আর কতক্ষণ?

অন্তূর শরীর এতটাই খারাপ, সে জয়ের বুকের ওপর ঘুমিয়ে পড়ল, প্রতিবাদ অথবা প্রতিরোধের সাধ্যি ও মানসিকতা সে হারিয়েছে। নিস্তেজ মুখটা পড়ে ছিল ঠিক জয়ের বুকে থাকা রূপোলি লকেটটার ওপর। জয় অন্তূকে বিছানায় শুইয়ে অন্তূর শরীরের ওপর অর্ধেকটা শরীর তুলে ঘাঁড়ের নিচে হাত ঠেকিয়ে মুখ উচিয়ে শোয়। একটুও যেন ছোঁয়া না লাগে শরীরের সেই খেয়াল রাখল, পাছে ঘুম ভেঙে যায়। কিন্তু চেইনটা গিয়ে পড়ে রইল অন্তূর বুকের ওপর।

একখানা ওড়নার তলে অন্তূর নমনীয়, চোখ মাতানো সুন্দর দেহখানা। জয় বেহায়ার মতো দেখে নজর বুলিয়ে। একটু অস্বস্তি হয়। এটা আরমিণ। তাকে এভাবে দেখতে নেই।

পরক্ষণেই মনে পড়ে, তার বউ। বিয়ে করা বউ। জয়ের মনে পড়ে কবুল বলার মুহূর্তটা। সে তো রবে ভরসা রাখে না, কাজী 'আলহামদুলিল্লাহ কবুল' বললেও সে বলেছিল 'কবুল' ।আজ আরও কিছুক্ষণ চোখ দুটো ভরে বউকে দেখে সে অস্ফূট স্বরে উচ্চারণ করে, 'আলহামদুলিল্লাহ!'

বুকের ব্যথা কীসের? তার হাত নিশপিশ করে উঠল—অন্তূকে তুলে এক্ষুনি কিছুক্ষণ বুকের

সাথে মিশিয়ে রাখা দরকার। সূর্যের আলো আজ নিশীথের অন্ধকার দূর করার পর যে দিনটার আলো ফুটবে, সেই দিন কী হবে? দুজন কে কোথায় থাকবে? সময় কি থামতে পারে না? সময়ের উচিত ক্লান্ত হয়ে এখানেই থেমে যাওয়া, আর কতকাল চলবে আর গ্রাস করবে নিজের গহ্বরে অসংখ্য মুহুর্তের চাহিদাকে?

তার নিজের বলতে কেউ নেই যে তার সাথে সম্পর্কে বাঁধা। একজন এই মেয়েটা, বিয়ের সম্পর্কে বাঁধা। সঙ্গে সঙ্গে অন্তূর ঘাঁড়ের ওপর মুখ ডুবিয়ে দিয়ে চোখ বুজল। শক্ত করে জড়িয়ে নিলো। উরুতে রক্ত তখনও চুইয়ে

যাচ্ছে বোধহয়, তীরের ফলার মতোন সরু ব্যথা। তবু সে ঘুমিয়ে পড়ল। প্রথমবার, শেষবার, একবার সে অন্তূকে বুকের সাথে মিশিয়ে নিয়ে শেষ নিশীথ প্রহরে বুকের ভেতর মরণসম হাহাকার নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। দুজনের শরীর সেদিন রক্তাক্ত, বুকে সন্তান হারানোর ক্ষত, অনিশ্চয়তায় মোড়ানো এক শেষরাত্রির প্রহর, মাঝখানের এক জীবনের বিরোধীতার প্রাচীর উপেক্ষা করে ঘুমানো দুই মানব-মানবীকে দেখল শেষরাতে উড়ে এসে বেলকনির কার্নিশে বসা দোয়েল পাখিটা। দুটো শিষ দিলো সে। তাতে কেমন ঘোর বিষণ্নতা!দোলন সাহেব জানেন এমপিকে খুন

হামজা করেছে। এমপির লাশ মাটি হলো ফজরের সময়। জানাজায় উপস্থিত হয়নি হামজা। এমপির ওখান থেকে মাঝরাতে বাড়ি ফিরে তার মানসিক ও শারিরীক দুই অসুস্থতাই বেড়েছে। জয় হাসপাতাল থেকে পালিয়েছে এটা সে জানল সকাল আটটায়। কিন্তু সে যে দু-দণ্ড বসে চিন্তায় মাথা খারাপ করবে যে জয় পালিয়ে সোজা আমির নিবাসে চলে গেছে নাকি– সেই সুযোগ তাকে দেয়া হলো না।

থানা পুলিশ এসে বসল, হাতে তাদের কয়েক টুকরো কাঁচ। হামজার ইচ্ছে করল নিজেকে টেনে ছিঁড়ে দুই টুকরো করতে। তার শরীরের

পক্ষাঘাতগ্রস্থ অবস্থা এতটা মারাত্মক পর্যায়ে চলে গেছে—সেদিন হাত অবশ হয়ে আসায় এসিডের বোতল ভেঙে পড়ে ছিল ভিক্টিম বডির পাশে। সেটা অপসারণ করার সময় হামজা পায়নি, পেলেও তার প্রায় প্যারালাইজড হাতের পেশী সঙ্গ দিতো না। কাঁচ খুটে তুলতে সূক্ষ্ম স্নায়ু উদ্দীপনার প্রয়োজন পড়ে।

পুলিশ জিজ্ঞেস করল, ‘‘কাচের টুকরোগুলো চিনতে পারছেন?’’-‘‘কাচের টুকরোর বিশেষত্ব কী যে তা চেনা থাকা উচিত আমার?’’

-“বিশেষত্ব আছে বলেই তা আমাদের হাতে বয়ে আপনার বাড়ি অবধি এসেছে, মেয়র সাহেব।”

-“বাহ্, কথার আকার-আকৃতি মজবুত লাগছে দেখি।”

-“এই ক’দিনে যা মারপ্যাচ আপনি ও জয় আমির মেরেছেন, তা আমাদের মুখের শক্তি বাড়িয়েছে বৈকি।”

হামজা গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তার অস্থিরতা বাইরে এসে যাওয়ার উপক্রম। প্রেশার বাড়ছে, খুব বাড়া বাড়ছে। হামজার মনে হচ্ছে চারপাশে চারটে চিনের মহাপ্রাচীর, তার পিঠ ঠেকে গেছে।

-“আপনার বাড়ি সার্চ করতে চাই।”
-“ওয়ারেন্ট আনেননি।”-“ঠিকাছে, খুব বেশি সময় হয়নি যে এমপি সাহেবের মরার। এত তাড়াতাড়ি ওয়ারেন্ট আনা যায় নাকি? তবে আনা যেতে যতক্ষণ, ততক্ষণ সময় আপনি পেলেন ধরুন।”
হামজা গেড়ে বসে রইল। মার্ডারটা এমপির। হামজার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা এখানে। সে বুঝল, ওই কাচের টুকরোর কোনো এক টুকরোতে নিশ্চিত তার ওয়ার্কশপ-গোডাউনের লেভেল লাগানো আছে। আঠার ফলে কাচের ওই টুকরোটুকু অক্ষতভাবে ভেঙেছে। রউফ কায়সারের হাতে পড়লে এক মুহুর্তে বের

করে আনবে সব। বড়ঘর সার্চ করা হবে। ঠেকানোর উপায় নেই।তাকে নজরে রাখা হবে অবশ্যই, তার সীমানা থেকে একটা ছেলেও এদিক-সেদিন বেরোলে তার পিছু নেবে পুলিশ। অনুসরণ করে পৌঁছে যাবে আমির নিবাসে, জিতে যাবে আরমিণ, সে ফুরিয়ে যাবে এক মুহুর্তে। তাহলে এবার কী হবে? জয় ফেরারি আসামি, গতরাত থেকে মিসিং। এতক্ষণে ক্রস ফায়ারের হুকুম জারি হয়নি কি?

হামজার অবস্থা দুপুর হতে হতে এত খারাপ হলো, ডাক্তার বাড়িতে এনে বাড়িতেই হার্ট-মনিটরিংসহ গোটা শরীর অবজারভেশনে রাখা

হলো। ডাক্তার জানালেন, "পুরোপুরি প্যারালাইজেশনে যেতে হামজা সাহেব যদিওবা কিছুটা সময় পেতেন, কিন্তু উনি যা ট্রমা ও মানসিক চাপের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, খুব বেশিদিন আর এইটুকু সক্ষমতাও থাকবে না। খুব দ্রুত পক্ষাঘাতে চলে যাচ্ছে প্রতিটা অঙ্গ।"

তুলি শুধু ভাবে, কতটা অপরাধের সাজা হিসেবে তরতাজা, বলবান হামজার দেহ নিথর হয়ে উঠছে? এ কী ধরণের শাস্তি? মৃত্যু সেসবের তুলনায় সত্যিই নগন্য, এমনও কিছু অবস্থা রয়েছে—এই যে হামজার শ্বাস চলবে,

এর চেয়ে ভয়াবহ শাস্তি এখন আর কিছু নেই তার জন্য।
ডাক্তার আজ হামজাকেও জানিয়ে দিলেন, “তুমি সম্পূর্ণ অকেজো হতে চলেছ। নো মুভমেন্ট, অনলি ব্রেথ।”
হুইল চেয়ার, অন্যের সহায়তায় জীবনধারণ, মেরুদণ্ডহীন পড়ে থাকা....হামজার চোখে তখনও অবিশ্বাস, মনে দুনিয়া ধ্বংসের আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু শরীরে অক্ষমতা। আরমিণ তার সঙ্গে কী করে ফেলেছে!বিকেল হয়ে গেছিল, জয়ের ঘুম ভাঙল না। নেশার প্রভাব ও রক্তপাতে শরীর অবসন্ন। শীতের দিনেও এসি চালিয়ে ঘুমানো জয় আমির একুশ

বছরের অবরুদ্ধ বাপের ভিটায় ঘামে ভিজেও কীসের ঘুম যে সেদিন ঘুমালো!

অন্তূ সেদিন লম্বা সময় ধরে জয় আমিরকে দেখল। সে কখনোই এত খেয়াল করে জয়কে দেখেনি আগে, কখনও তাকাতে রুচি হয়নি। অন্তূর মনে হলো এই যে অভিজাত্যে মুড়ানো বাড়িখানা, এর সাথে লোকটার চেহারার মিল গভীর। ভ্রু-তে আভিজাত্য, কালো ঠোঁটে, গভীর চোখে, মুখের গড়নে, ঘন চুলে। কঠোর সুদর্শন চেহারা। কিন্তু সেই আভিজাত্য ঢাকা পড়েছে নোংরা ব্যক্তিত্বের আবরণে।

বিকেলের পর জাগল জয়। চোখ কচলে জড়ানো কণ্ঠে বলল, "ডাকোনি কেন?

-“ডেকে কী? ঘুমাচ্ছিলেন আপনি।”

অন্তূর দুটো ওড়নাতেই রক্ত মাখা। সে মুখ খুলেই ঘোড়াহাঁটের মোড় থেকে খাবার কিনে আনলো। পুলিশ চারদিকে ছড়িয়ে গেছে, এখানে আসতে খুব বেশি সময় নেবে না।-“এভাবেই আপনি বাইরে গেছিলেন?”

-“পুলিশের চোখে পড়ি নাই বলে খারাপ লাগছে?”

-“লাগছে।”

জয় ঠোঁট বাঁকিয়ে মৃদু হাসে। ঘুম থেকে ওঠার পর শরীরে দ্বিগুণ ব্যথা। লুঙ্গির ভাজে গুজে রাখা মোড়ানো কাগজটা বের করে কিছুটা

পাউডার হাতের ওপর নিয়ে উন্মত্তের মতো নাক দিয়ে শুষলো।

ব্যথায় কাতর অন্তূ চেয়ে বসল, “আমি নেব। আমাকেও দিন।”

জয় মাথা নাড়ে, “হিরোইন! পাক দেহে নাপাক শুষতে নাই।”

-“সেটা আপনি হলে?”

-“আমি? বৈধ। তাই তুমি এখনও পাক। আমি না, ধর্ম বলে।”

-“ওটাই সবচেয়ে বড় অধর্ম।”

-“হলো! আমি ধর্ম-অধর্ম খুব একটা বুঝি না। হাঁ করো।”-“খাব না।”

-“আজ অবাধ্য হবে না। ভেতরে আর জায়গা নাই কারও অভিযোগ রাখার।”

-“ওটা তো আপনার প্রিয় ছিল।”

-“তখন জায়গা খালি ছিল।”

-“আজ ভয় পান?”

-“ভয় না, ব্যথা!”

-“ব্যথাকেই তো ভয় তাহলে।”

-“পেলে কী? ব্যথা পাওয়া না-জায়েজ আমার জন্য?”

-“যার জন্য মানুষকে ব্যথা দেয়া সহজ, সে ব্যথা পাবে কেন?”

-“যতদিন ব্যথা দেয়া সহজ ছিল, ততদিন ব্যথা লাগতো না।”

-“এখন কঠিন মনে হয়?”

-“এত প্রশ্ন না কোরো না। খাবারটুকু খাও। ওষুধ কে দিয়ে গেছে?”

-“দুটো নার্স আসে।”

-“কার হুকুমে?”অন্তূ জবাব দেবার আগেই জয় কেমন অদ্ভুতভাবে ছটফট করে উঠে ঠোঁটে আঙুল চেপে মাথা নাড়ল। সে জবাব শুনতে চায় না। অন্তূ বলতে চাইছিল, ‘ওরা নিজেরাই আসে। অন্তূর ওপর দয়া করে।’ আজ জয়ের মুখের কোথাও একরত্তি রসিকতা নেই, অসহনীয় ব্যথা গম্ভীরতা রূপে মুখটায় ছেপে আছে।

-“ওরা দুজনই কাজটা করেছে?”

-“চারজন।”

-“কখন আসে ওরা? আজও আসবে?”

-“আসলে সন্ধ্যার পর আসবে।”

জয় আর প্রশ্ন করে না। অন্তূ সামান্য খায়। জয় তার চেয়েও কম। খেলে বমি পাচ্ছে, মাথায় একটা ঝিমুনি ধরে গেছে। জয় আমির নামটা জানতে চায়নি একবারও যে কে তার প্রাণভোমড়া কেঁড়েছে।

-“আপনি জিজ্ঞেস করলেন না, কে এসেছিল আমির নিবাসে?”

-“জিজ্ঞেস করিনি যখন, বলতে চাইছ কেন?”

-“সহ্য করতে পারবেন কিনা এই ভয় পাচ্ছেন?”

-“আমার সহ্যক্ষমতাকে আন্ডারস্টিমেট কোরো না।”

-“আপনি কাঁপছেন, জয় আমির।”

জয় অপ্রস্তুত হয়। শক্তমুখে তাকায় ঠিকই, কিন্তু কাতর এক ঢোক গিলে। একটু পর কেমন করে যেন জিজ্ঞেস করে, কে এসেছিল?অন্তূ কিচ্ছু বলে না। দুজন শুধু কয়েক মুহূর্ত দুজনের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। অন্তূর শক্ত মুখটা বেয়ে টুপটুপ করে জল গড়ায়, জয় চোখ-নাক খিঁচে মুখ ফেরায়। সে বিশ্বাস করবে না, একটুও না। আরমিণ সবসময় চেয়েছে হামজার ব্যাপারে জয়কে ভড়কাতে, আজও চাইছে। জয় বোকা নয়।

সে বিরবির করল, ‘অপবাদ দিস না, আরমিণ। অপবাদ না।’

অন্তূ সুখে চোখ বোজে। কৃতজ্ঞতায় অন্ধ, কাঙাল জয় আমিরের চোখে তার দেবতার জন্য এই ঘৃণার দ্বিধা অন্তূর ভেতর থেকে এক মুহুর্তের জন্য সমস্ত ব্যথা লাঘব করে দেয়।

জয় পাথরের মতো নিথর বসে রইল।

নার্সদুটো এসেছে। জয় তাদেরকে ওপরে নিয়ে আসে। তারা ভয় পাচ্ছিল। ওভাবেই আরমিণকে সেদিনের সেবাটুকু দিলো। জয় বলল, “আরও দুজন ছিল আপনাদের সাথে। আমি তাদের সঙ্গে দেখা করতে চাই। চলুন।”

অন্তূ শুধায়, “কোথায় যাচ্ছেন?”

জবাবে অন্তূর কপালে একটা গাঢ় চুমু খেয়ে জয় বেরিয়ে যায়। অন্তূকে বলার সুযোগ দেয় না, 'আপনার দোহাই লাগে মেয়র সাহেবের কিছু করবেন না। মেরে ফেলবেন না উনাকে, অনুরোধ আমার। আপনি শুধু সারেন্ডার করুন। বাকিটা আমার...'নার্সগুলো চেনে কারা হামজার সাথে এসেছিল সেদিন। জয় পাটোয়ারী বাড়িতে ঢুকল, তখন বারোটা ছুঁইছুঁই। সে মূল ফটক দিয়েই ঢুকল। তখন পুলিশ আশপাশে নেই বোধহয়। ফটক আটকে দেবার পর পাটোয়ারী বাড়ি একখানা সংরক্ষিত দুর্গের মতোই। জয় সোজা উঠে যায় দোতলায়। দরজা খুলে তুলি জয়কে

দেখে আপ্লুত হয়। জয়ের সাথে চারজন নার্স। তুলির ধারণা এদেরকে হামজার দেখভালের জন্য এনেছে জয়।

হামজা বসার ঘরের সোফায় বসা। তাকে হাঁটাচলার ওপর রাখা হয়েছে। ডাক্তার প্রেশার মাপছেন। আশপাশে বসে আছে ছয়টা ছেলে। জয় নার্সদের থেকে জেনে নেয় কে কে গেছিল হামজার সাথে।

হামজা জয়কে যতটা অস্থির হয়ে দেখল, জয়ের দৃষ্টি হামজার ওপরে ঠিক ততটাই স্থির, অটল। নার্সগুলো কী করে জয়ের সাথে এসেছে। হামজার রক্তচাপ হুরহুর করে বাড়তে লাগল। কেমন কোরে ঢোক গিলল

সে, “জয়! কোথা থেকে আসছিস রে? কোথায় ছিলি?”জয়ের জবাবের অপেক্ষা না করে স্ফিগম্যানোমিটারের আর্মব্যাগটা বাহু থেকে ঝেরে খুলে ফেলে উঠতে চায়।

মেরুদণ্ডে উদ্দীপনা নেই, ধরে উঠিয়ে দিলে সে এসে জয়ের সামনে দাঁড়ায় ব্যাকুল হয়ে, শরীরটা থরথর করে কাঁপে।

বিক্ষিপ্ত শ্বাস ছেড়ে বলে, “আগে এখানে আয়।” শক্ত করে চেপে ধরে জয়কে বুকের সাথে।

কিছুক্ষণ পর বলে, “তোর হাতের আর্ম-স্লিং কই? কোথায় ছিলি রে সারারাত? কিছু খেয়েছিস? দেখি, পায়ের হাল দেখি?”

জয় কাঠের আসবাবের মতো দাঁড়িয়ে রইল। বুকের ব্যথা হৃদস্পন্দন হয়ে ছুটছে।

-"কথা বলছিস না কেন? কী হয়েছে? কী বলতে চাস? কী বলবি তুই হামজাকে? হ্যাঁহ্? ওমন করে দেখছিস কেন?"

জয় শুধুই অপলক হামজাকে দেখে যায়। হামজার কলিজাটা কাটা মুরগীর মতো ছটফট করে উঠল। জয় একটাবারও ভাই বলে ডাকেনি। অথচ সে বাড়িতে ঢোকার সময় ফটকের সামনে থেকে গলা ফাঁড়তে ফাঁড়তে ঢোকে।

হামজা বিস্ময়ে কয়েক কদম পেছায়। শরীর থরথর করে কাঁপে তার। তার কি মরে যাওয়া

উচিত? জয়ের চোখের ভাষা কী বলছে? ওটা কি ঘেন্না?জয় হাঁটু মুড়ে বসে ওড়নায় মোড়ানো মৃত ভ্রুণটা মেঝের ওপর মেলে রেখে উঠে দাড়ায়। রিমিটা যে কোত্থেকে দৌড়ে এসে পাগলের মতো ওটার ওপর পড়ে কেঁদে উঠল!

হামজা আরেকটু পেছায়, ঠিক যেমনটা সাপ দেখলে মানুষ পেছায়। জয় তখনও নজর সরায়নি, ওটাই ভয়। হামজার ভয় হয় জয়ের চোখে চোখ রাখতে। ভ্রুণটার দিকে তাকিয়ে হাঁটু শিথিল হয়, ধুপ করে বসে পড়ে সোফার ওপর।

তুলি রিমির পাশে বসে একবার ভ্রুণটা দেখল আবার ভাইকে। তার চোখ ভরে ওঠে। আরমিণের হয়ে সে এবার সাক্ষ্য দেবে, হামজার বিরুদ্ধে দেবে, কিন্তু সাক্ষ্য চাওয়াওয়ালী সেই হতভাগী কোথায়? নার্স ও মহিলা ডাক্তারটার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে এলো। কাঁপতে লাগল তারা। জয় দুটো ছেলেকে বলল, 'বড়ঘর থেকে পিটবুলগুলোকে নিয়ে আয় তো!'সে নিজের রুমে গিয়ে সেই কুড়ালটা আনলো। পিটবুল চারটে প্রায় আজ সপ্তাহখানেক না খাওয়া। গলার দড়ি ওদের যেন ধরে রাখতে পারছিল না। তাদের মালিক তাদেরকে ছোট থেকে মাংস খাইয়ে পালন

করেছে, শুকনো ভ্রূণের দলাটা উপাদেয় খাবারের মতো লাগছিল। একটি বুল হাত থেকে ছুটে দৌড়ে আসে ভ্রূণটার দিকে। জয় মুহুর্তের মাঝে কুড়াল তুলে এক কোপ মারল বুলটার ঠিক ঘাঁড় বরাবর। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটে গায়ে পড়ে, মাথাটা আলাদা হয়ে জয়ের পায়ের কাছে পড়ে, সেটার ওপর পাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে জয় নার্সদের দিকে দেখিয়ে ছেলেদেরকে বলল, "ওদেরকে মামার ঘরে নিয়ে যাবি। তার আগে কাপড়-চোপড় মুক্ত কর। আমি চাই না ওদেরকে খেতে বুলগুলোর কোনো সমস্যা হোক। এমনিতেই

একটা সঙ্গি হারিয়েছে ওরা, তার জন্য আমি দুঃখিত!''

নার্স তিনটে কাঁপছিল, একজন এর মধ্যে দৌড়ে পেছনের দিকে ছুটতেই জয় থাবা মেরে পেছন থেকে চুলের মুঠি ধরে টেনে এনে মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলল ছেলেদের দিকে।

-''কাপড়-চোপড় খুলে নে রে। দেরি করিস না।''ছেলেরা নিজেদের পরিণতি নিয়ে চিন্তিত, তারা বুঝতে পারছিল না কী করা উচিত। জয় পশুর মতোন গর্জে উঠল, ''যা বললাম, করো হে ভ্যাড়াচ্চুদারা। সারারাত নাই আমার হাতে।''

তুলি উঠে এসে জয়ের সামনে দাঁড়ায়, “পাগল হয়েছিস তুই? কী সব হচ্ছে বলতো? তোরা এমন কেন…”

জয় আলগোছে তুলিকে বুকের সাথে চেপে ধরল। নোংরা দৃশ্য দেখা থেকে বাঁচাল নাকি সান্ত্বণা দিলো জানা নেই। ওদের কান্নাকাটিতে ভরে উঠল ড্রয়িং স্পেস। হামজা নীরব দর্শক। সে ঘটমান পরিস্থিতি নয়, সে দেখছে জয়কে। জয় তুলির মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। রিমি ভ্রূণটাকে চোখ ভরে দেখল, পাশে যা হচ্ছে তাতে তার অবাক হবার নেই।

একটা মেয়ে এসে জয়ের পা দুটো আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরল, “আমায় ছেড়ে দিন। আমার

বাচ্চা আছে ঘরে। সেদিন ওই কাজ না করলে উনি মেরে ফেলতেন আমাদেরকে।''

-“তো মরে যেতি। আজও তো মরতেই হচ্ছে। তবু কাজটা করার ছিল না।''মেয়েটার মুখের ওপর কষে এক লাত্থি মেরে এগিয়ে দিলো ছেলেদের দিকে। মেয়ে তিনটিকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে হুমায়ুন পাটোয়ারীর শোবার ঘরে ঢুকিয়ে দেয়া হলো। জয় পিটবুলগুলোর দিকে তাকিয়ে সামান্য মাথা নেড়ে শুধু ইশারা করতেই ওরা ঢুকে পড়ল। বাইরে থেকে দরজা লাগিয়ে দেয়া হলো। মাংস ছিঁড়ে খাওয়া, টানা-হেঁচড়া, চিৎকার, ছুটতে চাওয়ার প্রয়াস, ঘর এলোমেলো হওয়া,

কাচের আসবাব ভাঙা, নারী কণ্ঠের আর্তনাদ —সকল আওয়াজ একত্র হয়ে গা ছমছমে পরিবেশ তৈরি হলো। সবাই নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে, নিশ্বাস বন্ধ সবার। মহিলা ডাক্তারটা ঠকঠক করে কাঁপছে তখন।

জয় কুড়ালের কোপে তার হাতদুটো কেটে নিয়ে রেখে দিলো হামজার সামনে, সেন্টার-টেবিলের ওপর। রক্তে কাচটা ঘোলা হয়ে গেল। হামজা দেখল—শরীর থেকে আলাদা হয়েও নড়ছে হাতদুটো, গলগল হয়ে রক্ত ঝরছে। শুধু হাত দিয়ে গর্ভপাত করানোতে হাত কাটল জয়, সহায়তা করায় কুকুরের খাবার হলো নার্স, সে যে নির্দেশদাতা,

আয়োজক। জয় তার সঙ্গে কী করবে?খুব চিৎকার করছিল মহিলা, জয় তার চুল ধরে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে দেয়ালের সাথে কষে এক বাড়ি মারল মাথাটা, মাথার করোটি বোধহয় গুড়ো যদি নাও হয় তো থেতলে গেল, চিৎকার বন্ধ, পরিবেশ ঠান্ডা। ওদিকের চিৎকার ও বুলের গর্জন ও দাঁতের ঘর্ষণের শব্দ তখনও আসছে।

আরমিণ কখনও মুখটাও দেখায়নি কাউকে। গর্ভবতী আরমিণকে অনাবৃত করে গর্ভপাত করিয়েছে নার্সগুলো। জয়ের চোখে আবছা হয়ে ভেসে ওঠে বহুবছর আগের একটা দৃশ্য। একটি গর্ভবতী নারী, কয়েকটি পুরুষ।

হামজার সাথে যাওয়া ছেলেদেরকে ওপর সেই পুরুষগুলোই ভেসে উঠল কিনা! জয় পাগলের মতো খুবলে ধরে এনে পায়ের নিচে করল একজনকে। গলার ওপর পাড়া দিয়ে বলল, আমার জন্য নাকি জান দিতে পারিস রে তোরা? সবাই কেন মিথ্যা আশ্বাস দিস বল তো আমায়?

কাচা গাছের খড়ির মতো কুড়াল তুলে কুপালো ছেলেটাকে। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল মানবদেহটি। মাংস-রক্ত ছিটে-ছুটে একাকার হলো। জয় জোরে শ্বাস ফেলে তখনও জিজ্ঞেস করছে, "থামালি না কেন তোরা সেদিন মেয়রকে? বললি না কেন জয়

আমিরের ছেলে ওটা? তোরা জানিস না কেউ নাই জয়ের। বাপ নাই, চাচা নাই, মা নাই, ভাই...একটা ভাই নাই রে জয় আমিরের। ওরা তোদের সামনে মেরেছে না আমাকে? কত কী নিয়েছিস আমার কাছে! দেইনি তোদের? আমায় কী দিলি?''চারজনকে ঘরের মেঝেতে কুপিয়ে কয়েক খণ্ড করে ফেলে রাখলো। কারও হাত ঝুলে রইল, কারও বুক ফেঁড়ে যাওয়ায় হৃদপিণ্ড দেখা যাচ্ছিল। কান কেটে আলাদা হয়ে পড়ে রইল একটা। তুলি বমি করে ভাসিয়ে দিলো। জয়ের শরীর রক্তে জুবজুবে। দাঁত টকটকে লাল, পেটে রক্ত গেছে অবশ্যই। পেট মুচড়ে এলো রিমির।

সবশেষে হামজার ডাক্তার যে ডাক্তার মানুষ, সেও বমি করে ফেলল অসুস্থ দৃশ্যে। তুলি দৌড়ে গিয়ে কোয়েলের রুমটা বাইরে থেকে আঁটকে দিয়ে এলো।

জয়ের হাতের ব্যান্ডেজ থেকে গলগলিয়ে রক্ত পড়ছে তখন। সে কুড়ালটা ছুঁড়ে মারে, মেঝের টাইলস ভেঙে যায়।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে হামজার সামনে এসে দাঁড়ায় জয়, "জিন্নাহ্ কোথায়?"

হামজা জবাবহীন। রক্তে ভেজা জয়কে সে বহুবার দেখেছে, আজ হামজার বিরুদ্ধাচারণের রক্ত গায়ে মেখে এসে দাঁড়িয়েছে জয়। তবু জয়ের কণ্ঠস্বর ভঙ্গুর,

স্থির। মানুষ বিশ্বাস ও ভরসার কাছে হেরে গেলে সমস্ত শক্তি অর্থহীন হয়ে পড়ে। জয় এত তাণ্ডব হামজার কথামতো কাজ করা সামান্য পেয়াদাদের ওপর করল, কিন্তু রাজার সামনে এসে সে শুধু নিস্তেজ কণ্ঠে হিসেব চায়!আবার শুধায়, কোথায় জিন্নাহ? কবে সরিয়েছ ওকে? আমার তো জানা দরকার কতদিন যাবৎ তোমার পালিত কুকুরের কাজ করে আসতেছি।

-"জয়!" শাসিয়ে উঠল হামজা, "স্পর্ধা বেশি হবে না তোর আমার সামনে।"

জয় অনড় দাঁড়িয়ে রইল।

হামজা উঠে গিয়ে জয়ের সামনে দাঁড়ায়, "মেরে ফেলবি আমায়? মার না, মার! তোর মনেহয় আমি ধোঁকা দিয়েছি তোকে? তুই আমায় ধোকা দিয়েছিস, তুই আমায়। তুই নিমোকহারাম জয়। তুই তোর পথ ভুলে গেছিস।"

জয়ের কাষ্ঠল বুকে সজোরে হাত মারল হামজা, "তুই ভুলে গেছিস আমরা কে, আমরা কী? আমাদের গন্তব্য ও জীবনরেখা কেমন? আমরা কোথা থেকে উঠে এসেছি, সব ভুলে গেছিস। এই কথা ছিল না তোর-আমার। কে জিন্নাহ্, তুই কে? তোর পরিচয় কী? আজ তোর বউয়ের সাথে দুটো দিন বাপের ভিটায়

উঠে বাপের ব্যাটা হয়ে গেছিস, জয়? আমিরের ব্যাটা হয়ে গেছিস তুই? মার, আরও লোক মার। ওদের মারলি আমাকে মারবি না? কেটে নে, আমার হাতদুটোও কেটে নে। এই হাতেই মেরেছি জিন্নাহ্কে, মার কোপ। কত জোর তোর হাতে, দেখি জয়? এক কোপে হামজার হাত কেটে পড়ে যাওয়া চাই।''

রিমি বিস্ময়ে কেঁপে উঠল। হামজার চোখের তারায় টলমলে মতোন ওটা কী? অশ্রু? নিজের সন্তান হারানোতেও এই অশ্রু স্থান পায়নি লোকটার চোখে।হামজা জয়ের সামনে নিজের হাতদুটো মেলে ধরে, "এই দেখ, দেখ! এই দুই হাতে তোর ছোট্ট হাতের মুঠো

চেপে ধরে আমি তোকে দুনিয়ায় চলতে শিখিয়েছি। আজ তোর হাত খুব শক্ত, খুব অস্ত্র চালাতে শিখেছে, শত্রু দমন করে নিজের জন্য জায়গা বানাতে শিখেছে। আমি...আমি তোকে হাতে ধরে সেই শক্তি দিয়েছি। নয়ত শালা তোর মতো এতিমকে কবে এই ভুখা দুনিয়া গিলে খেয়ে বমি করে ফেলতো। তুই জানিস না দুনিয়াকে? যে মারতে জানে না তাকে মরে যেতে হয়। যার পিছুটান থাকে সে ধ্বংস হয়। তোকে টিকিয়ে রাখার দায়টা আমার এই দুই হাতের ছিল সেদিন, আজ নেই? তাকিয়ে দেখ নিজেকে। এক টুকরো জীবনের নেশা তোকে কোথায় নিয়ে এসেছে।

জয় তোর-আমার মতো মানুষদের পিছুটান থাকতে নেই। বলিনি তোকে আমি?আজ তুই বড় ন্যায়-অন্যায়, বিশ্বাস-ভরসার গুণগান গাইতে জানিস, দেখি! সেদিন আমি আমার এই দুই হাতে তোর পেট ভরানোর জন্য রক্তমাখা পয়সায় দু-মুঠো চাল কিনে এনেছি, সেদিন এই অ-ভরসা জাগেনি তোর এই হাতের ওপর? খুব বড় হয়ে গেছিস তুই? নিজের সংসার গোছাতে, আমার সঙ্গ ছাড়তে তোর খুব বেশি দ্বিধা বাকি নেই ভেতরে! অথচ আমায় দেখছিস? আমি আজও মোহহীন, সঙ্গহীন, সংসারহীন, পরিচয় ও নামহীন। আমার একটা পরিচয় আছে আমি

তোর হামজা ভাই। আজও তোকে নিয়ে আর কিছুদূর চলতে লড়াই করছি। যেখান থেকে উঠে এসে, যা যা সহ্য করে তুই-আমি আজ এখানে এসেছি না, সেখানে তোর বংশপরিচয় না, হামজার বুকটা পেতে দেয়া ছিল তোকে আড়াল করে দুনিয়ার উপযুক্ত করতে।"

হামজা দম টেনে নিয়ে চিৎকার করে উঠল, "আমি তোকে না হারাতে এই দুনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করতে পারি। তোর বউ, সন্তান, ভাই এমন আর কী? বুঝেছিস তুই? আমাদের পথে পরিবার আসতে নেই। আমি তোকে ছোটবেলা থেকে বুঝিয়ে আসছি, পাপীরা পাপে বিরতি দিলে তারা ধ্বংস হয়ে

যায়। বিবেক তাদের মৃত্যু। দেখ আজ কোথায় দাঁড়িয়ে তুই-আমি? আর কত ক্ষয় করে থামবি? একটাবার বুকে হাত দিয়ে দেখলি না তোর জন্য কতখানি জায়গা এখানে রেখে দিয়েছি। আমার কেউ নেই কোনো কূলে। তোকে হারাবো কোন সাহসে? বলে দে। দুজনের মাথার ওপরে ফাঁসির দড়ি দেখছিস? চল ঝুলে পড়ি। চল আমার সাথে।
''হামজাকে টানে জয়। জয় পর্বতের মতোন অটল। চোখদুটো রক্তের মতোন টগবগে লাল। থুতনি ও বুক তিরতির করে কাঁপছে। চোখদুটো শুধু বিক্ষুব্ধ হামজাকে দেখছে।

-"তুই পরিবার চাস, জয়? পরিবার তোর আছে? পরিবার থাকলে কেউ তোর মতো জয় হয়? একুশ বছর আগে পরিবার হারানো এতিম পরিবারের ওপর দায়বদ্ধতায় হামজাকে মারতে এসেছে! শ্যাহ্! হামজাকে তোর বউ না চিনুক, তুই চিনিস না? হ্যাঁহ্? তুই তোর বউকে বলিসনি হামজা তোর বাপ? তোর পরিবার তোকে ধুকে ধুকে মরার জন্য এই ক্ষুধার্ত দুনিয়ায় একলা ফেলে সেই কবে চলে গেছে? বলিসনি তুই তোকে?"

জয় উপর-নিচ মাথা নাড়ে। ক্ষণকাল পর বলে, "তুমি বুঝবে না আমার রক্তের কদর। এটাই তো স্বাভাবিক। তুমি আমার রক্তের

কেউ না।''হামজা নিস্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে। চোখে অবিশ্বাস, বুকে কাঁপছে ঠকঠক করে।
-"আমি তোমার ভালোবাসার হিসেব বুঝতে পারি নাই আজও। তুমি আমায় আপন করলে আমার পরিবার আর রক্ত থেকে আমারে ছিঁড়ে নিয়ে? এভাবে রক্ত না জন্ম মোছা যায় না, বোঝো না?''
-"নাহ্! না রে জয়। কী করে বুঝব বল তো, আমার তো রক্ত আর জন্মপরিচয় নাই। তোদের মতোন জমিদারি পরিচয় আর বড়লোকি রক্তের নাম তো আমার নাই!''
জয়কে যেন একটুও স্পর্শ করল না হামজার হৃদয়বিদারক বাক্যদুটো। সে নিষ্ঠুর কসাইয়ের

মতো হামজার কলারটা ধরে এক ঝাঁকুনি মেরে দাঁত পিষে গর্জে ওঠে, “তুমি জয়কে খুঁজলে, জয়ের ভেতরটা বুঝলে না! তুমি যেই হাতে জয়কে বাঁচিয়ে রাখলে, সেই হাতে কী করে মেরেও ফেললে?”জয় বুকের মাঝখানটায় আঙুল রেখে খোঁচায়, “তুমি কখনও এখানটায় হাত রেখে টের পাবার চেষ্টা করছো, এখানে কী চলে? তুমি তোমার পরিবারকে চেনো না অবধি, চিনলে জানলে তুমি পরিচয় ছেড়ে দিতে? যেখানে এই পালিত পরিবারের পরিচয় নিজের নামের সাথে লাগিয়ে আজ চৌত্রিশটা বছর বেঁচে ফিরতেছো। হামজা পাটোয়ারী, হামজা

পাটোয়ারী। আর আমি আমার পরিবাররে চোখের সামনে রক্তে ডুবে যাইতে দেখা জয় আমির। তুমি আমায় শেখাবে না আজ। আজ তুমি আমার রক্তের কেউ হলে তোমার হাতের সাধ্যি হতো না আমার রক্তকে এতটা অবহেলা করার। তুমি বললে না আমি জিন্নাহ্কে কেন খুঁজেছি চিরকাল? আজ জিন্নাহ্ হলে আরমিণের গর্ভ থেকে ওর চাচাতো ভাইয়ের রক্তের দলা ওভাবে ছিঁড়ে এনে মাটিতে ফেলে আসতে পারতো না, বিশ্বাস করো। ওই দেখো পড়ে আছে তোমার জয় আমির। দেখো, দেখো! এই যে এটা দেখছো না বিশাল লম্বা দাঁড়িয়ে আছে না? এই

খোসার ভেতরে জয় আমির নেই। থাকে না। পুরুষ নিজের বীর্যের সাথে বয়ে যায়। এবার রক্তদলাটুকু দেখো, আর ভাবো জয় আমির তোমার বদৌলতে কোথায়?দেখাবো হ্যাঁ? দেখবে? কলিজাটা চিড়ে দেখাই এইখানে কী চলতেছে জয়ের? একটা মজার কথা শুনবে? জয় পুরোপুরি অমানুষ হতে পারেনি, আজও কখনও কখনও হৃদপিণ্ডটা লাফায়, ঠিক মানুষের মতোন। টের পাও?

হামজার শরীররটা কেমন ভর ছেড়ে দিলো। জয়ের মুখে-চোখে হাত ছোঁয়ায় হামজা। হাতে পিস্তল গুজে দিতে দিতে জয়ের সামনে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে, পিস্তলের মুজেল টেনে

বুকের সাথে তাক করে বলে, “গুলি চালা। তোর চোখের ঘৃণা আমার দেখতে নেই। একদম এখানটায় চালা গুলি। খুব ছটফট করছে এখানে, চালা তো জয়, থামিয়ে দে ছটফটানিটা। খুব অসহ্য, বুঝলি? চালা না রে! ”

জয় পিস্তলটা এক আঁছাড় মারল মেঝের ওপর। নিজের বুকের ওপর তর্জনী আঙুল রেখে বলল, এই যে এখানকার হিসেবটা আছে না? এটা খুব একপেশে। হয় এখানে চেপে জড়িয়ে ধরতে হয়, নয় আঘাত হানতে হয়। তুমি পারো দুটোই। আমার জন্য একটাই সই?জয় এক কদম কোরে পেছায়,

আমি যখন আঘাত পেলাম, শেষবারও তোমার কাছে এসে উৎসব করে গেলাম। কিন্তু তোমার বেলায় তুমি আমায় পাবে না।

হামজার মেরুদণ্ড ভেঙে আসে, সে মেঝের ওপর উপুড় হয়ে জোরে জোরে শ্বাস নেয়। শরীর অবসন্ন হয়ে গেল নাকি? কেমন কোরে যেন ডাকে, "জয়! শোন ভাই, জয়.."

রিমি ছুটে আসে জয়ের দিকে, "এইহ্, কোথায় যাচ্ছেন আপনি? আরমিণ কোথায়? কোথায়, কেমন আছে?

জয় হাসে, আমার কবুতরগুলো দেখবেন। ওরা দিনে চারবার দানা খায়। দু সপ্তাহ পর পর ওদের বাসাটা পরিষ্কার করতে হয়।

তুলিকে বলল, তোর একটা বিয়ে দেয়া দরকার ছিল। পাখির ডিম ঘুমাচ্ছে নাকি রে? জেগে উঠে আমায় খুঁজলে বলিস জয় আমির তীর্থে গেছে। খুব তাড়াতাড়ি ফিরবে।তুলি ডুকরে উঠল। বাইরে তখন বাঁশির আওয়াজ, অনেকগুলো পায়ের চলাচল, ফটকে ধাক্কাধাক্কি, মাইকে পরিচিত কিছু বাক্য আসছে —জয় আমির, আমরা জানি আপনি ভেতরের আছেন। সারেন্ডার করুন। পালানোর চেষ্টা করলে গুলি চালাতে বাধ্য হবো। পালাতে পারবেন না, চারদিক থেকে ঘেরাও করা হয়েছে আপনাকে।

জয় এক টুকরো হাসে। তরু তো এলো না দেখা করতে? রাগ করেছে নাকি? একটু এসে ফ্যাচফ্যাচ করে না কাঁদলে জয় যেতে পারছে না তো! জয় চারপাশে খোঁজে তরুকে। তরুর ঘরটার দিকে তাকায়। ওখান থেকেই বেরিয়ে আসার কথা। চোখ ছলছল করবে বলে মাথাটা নিচু করে বেরোবে। ঘরটা বাইরে থেকে আঁটকানো। কোয়েল খুব কাদছে আর দরজা ধাক্কাচ্ছে ভেতর থেকে। কিন্তু তরুর কোনো সাড়াশব্দ নেই। মেয়েটার অভিমান তীব্র। আজ যে চলে যাচ্ছে বাড়ি ছেড়ে, তবু অভিমান ছেড়ে একটাবার এসে হু হু করে কেঁদে উঠল না।

রক্তে মাখামাখি লুঙ্গি দেখল একবার। খুলে যাবার উপক্রম, তাই মুড়ে আবার শক্ত করে গিট্টু দিলো। হামজা উঠে কীভাবে যে উন্মাদের মতোন দৌড়ে রুমে যায়, ফিরে আসে পাসপোর্ট ও ভিসা নিয়ে।

জয়ের হাত চেপে ধরে, "জয়! চল, চল আমার সাথে। তাড়াতাড়ি।"জয় শান্ত, স্থির দাঁড়িয়ে বলে, "কোথায়?"

-"মেরে ফেলব একদম, শুয়োরের বাচ্চা। চুপচাপ যা বলি কর। এখন আর কীভাবে তোকে এয়ারপোর্টে পৌছে দেব? হিলি বন্দর দিয়ে ভারতে ঢুকবি। আয় আমার সাথে, আয়।"

-“রিমি, একটা প্যান্ট নিয়ে এসো।” পশুর মতো গর্জে উঠল, “যাও।”

লুঙ্গি খুলে প্যান্ট পরে জয়। লোহার ফটক ভাঙতে একটু সময় লাগবে। প্রাচীর অতিরিক্ত উঁচু, তার ওপর কাঁচের টুকরোর সুরক্ষা। কিন্তু বেশিক্ষণ এভাবে ঠেকানো যাবে না তো!

হামজা জয়ের হাতটা মুঠছাড়া করে না। ধাক্কায় জয়কে, “বেরিয়ে যা। যাহ্ যা। পেছন ফিরে তাকাবি না। জোপের কোল দিয়ে একদম গিয়ে উঠবি উপজেলার বাইরে। খবরদার মেইন রোডে উঠবি না।”জয় চুপচাপ দেখে হামজাকে। হামজা অধৈর্য হয়ে তাড়া দিলো, “যা শুয়োরের বাচ্চা, যাহ্।”

হাত ধরে টেনে হিচড়ে লম্বা বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়িঘরের কাছে যায়। জয় উদ্ভ্রান্তের মতো পিছু চলে। চাবি দিয়ে তালা খোলার সাধ্যি হামজার আর নেই, তার হাতে সেই উদ্দীপনাবাহী স্নায়ু অচলপ্রায়।

জয় অন্ধকারেই হামজার মুখের দিকে তাকিয়ে তালা খোলে। হামজার মুখটায় নিদারুণ কাতরতা, জয়ের বুকে বোধহয় চাপ অনুভব হয়। তবু সে একবার হামজাকে কষে জড়িয়ে ধরে না। তার রক্তে টান পড়ল বোধহয়। কিন্তু জড়িয়ে ধরতে না পারার ব্যথায় জয়ের চোখ জ্বলে উঠল ঠিকই।

বড়ঘর পেরিয়ে নিচতলার পেছনের দরজার ওপারে প্রাচীরের সীমানা। সেই গেইট খুললেই পেছনে বিশাল ডোবা। সেখানে বড়ঘরের জ্বালানি বর্জ্য নিষ্কাশিত হয়। সেদিকে জয়কে ছেড়ে দিয়ে বলল, “যাহ্, চলে যা। দেখা হবে আবার।”

জয় দাঁড়িয়ে থাকে। কিচ্ছু বলার নেই কি তার? তবু কেন দাঁড়িয়ে?-“দ্রুত যা, জয়। ওরা এক্ষুনি ভেতরে ঢুকে পড়বে।”

জয় ধীরে ধীরে কয়েক কদম এগোয়। হামজা তক্ষুনি ডেকে ওঠে, “শোন!”

পা থামে জয়ের। হামজা দৌঁড়ে যায়,একখানা কাপড় দুই ভাগ করে ছিঁড়ে এক টুকরো

বাহুতে বেঁধে দেয়। রক্ত পড়ছিল সেখানে। বাহিনী বোধহয় বাড়ির সীমানায় ঢুকে পড়েছে, দুটো গুলি ফুটলো। হামজা একবার কষে জয়কে চেপে ধরে বুকের সাথে। কিচ্ছু বলার নেই কারও। হামজা দুই সেকেন্ড অপেক্ষা ঠিকই করল জয় একটাবার তাকে চেপে ধরবে। ধরল না জয়। হামজা ছেড়ে দিলো। বসে পড়ল ওখানেই। নিজের অতবড় শরীরের ভাড় রাখা দায় হলো হামজার পক্ষে। তার স্নায়ুতে সেই জোর নেই। কিন্তু কীসের জোরে যে সে উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত ফটক আটকায়, তালা লাগায়। বড়ঘর বন্ধ করে দোতলায় উঠে যায়। নয়ত পুলিশ সন্দেহ

করবে এদিক দিয়ে জয়কে বের করে দেয়া হয়েছে। পিছু নেবে জয়ের।জয় চলতি পথে নিজের ওপর খুব হাসে। উন্মাদের মতোন হাসে। রাত একটা বাজছে। তার গন্তব্য কোথায় এখন? সে কোথায় যাবে? কতক্ষণ পুলিশ তাকে ধরতে পারবে না? সে পেছনে কোথাও পাসপোর্ট আর ভিসাটা ফেলে দিয়েছে।

এরকম এক চমৎকার মাঝরাতে তার একটা গান গাইতে ইচ্ছে করছে। সে গলা ছেড়ে গান ধরল,

আমি কতজনে কত কী দিলাম

আরেহ্ যাইবার কালে একজনারও দেখা না পাইলাম
আমার সঙ্গের সাথী কেউ হইল না রে...
রইব না আর বেশিদিন তোদের মাঝারে...
ডাক দিয়াছেন দয়াল আমারে...হামজা ছেলে দুটোকে হুকুম দেয় ফটক খুলে দিতে। বিশাল শরীরটা ভর ছেড়ে দেয়ায় তুলির পক্ষে সম্ভব হলো না হামজাকে বহন করা। হামজা মেঝেতে পড়ে আধবোজা চোখে রিমিকে দেখে হাসে। রিমির কোনো খেয়াল নেই, সে আরমিণের সন্তানকে বুকের সাথে মিশিয়ে আদর করছে একমনে, এ মুহূর্তে এ জগতে তার আর কিছু করার নেই এছাড়া।

এই মহাক্ষণে হামজার মনে হলো সে ছাড়া আর কেউ আরমিণকে ঘেন্না করেনি। সে সবদিকেই একা আজ, তার দল লোকশূণ্য, কোথাও কেউ নেই তার সামান্য সমর্থনেও। এত অক্লান্ত ছুটে চলা কি ব্যর্থ গেল? এসবের কদর কেউ যে করল না, তা বলে আজ সেও কেন ভেতরে কদর খুঁজে পাচ্ছে না! হাতের মুষ্ঠি থেকে আমিরের ব্যাটার হাত ছুটে গেছে বলে?সেই হাতে হামজা আমিরের ব্যাটার ফেলে যাওয়া কুড়ালটা তুলে নিলো। চাপ ধরা রক্তের স্তর সরিয়ে তরল রক্ত এলোপাথারি গায়ে মাখল। কুড়ালটার হাতল ফতোয়ার পেছনে মুছে জয়ের হাতে ছাপ দূর করল।

পাঁচটা মরদেহ ও তিনটা ছিন্নভিন্ন আহতকে উদ্ধার করা হলো। একজন নার্স মাংসাশী কুকুরের হামলায় প্রাণ হারিয়েছে, দুজনের শ্বাস চলছে, দেহে মাংস নেই অধিকাংশ স্থানের। একজনের একটি স্তন ছিড়ে নিয়েছে পিটবুল। কতক্ষণ বাঁচানো যাবে জানা নেই। একটি নারী ডাক্তার দুটো হাত হারিয়ে অচেতন, তার মাথার করোটি ভেঙে গেছে। তবে এখনও বেঁচে আছে হয়ত। একজন ডাক্তারকে কম্পিত অবস্থায় ঘরের কোণে পাওয়া গেল। এত নৃশংসতা যে খবরে প্রকাশ করাও মুশকিল হবে, সেটা কালপ্রিট ভাবেনি! কালপ্রিটটা কে? হামজা?

রউফ কায়সার না এলে থানা পুলিশ হয়ত তা মানতো। কিন্তু রউফ কায়সার হামজার সামনে উবু হয়ে বসে জিজ্ঞেস করল, “জয় আমির কোথায়, হামজা সাহেব?”

মেয়রের পদ হারিয়েছে হামজা? হারানোরই কথা, সে এখন নিশ্চিত ফাঁসির আসামী, তার আর পৌরসভা দপ্তরে কাজ নেই। সে ফুরিয়ে গেছে।-“জয়ের এখানে থাকার কথা? সে হাসপাতাল থেকে ফেরারি হয়েছে। এখন আমি আছি, আমায় অ্যারেস্ট করুন। ওকে যখন পাবেন, তখন ধরবেন নাহয়। আপাতত ও নেই হাতের নাগালে।”

-"এই অবস্থায়ও এত ধূর্ততা? এত চতুরতা কী দিলো আপনাকে?
হামজা কেমন কোরে যেন হাসে সামান্য, "যা আপনারা কোনোদিন পাবেন না, আজ তা পেয়েছি আমি।"
রউফ কায়সার জিজ্ঞেস করল না, কী পেয়েছেন? করলে হয়ত হামজা বলতো, 'সন্তান হারানোর সুখ পেয়েছি আমি আজ। দেখুন আজ হাত দুটো খালি আমার। যে হাতের মুঠোয় জয়ের হাতখানা চেপে ধরে দেড় যুগ আগে হাকিমপুর থেকে দৌড় শুরু করেছিলাম, আজ আঠারো বছর পর সেই দৌড় ফুরিয়েছে। আজকের পর আমি আর

ক্লান্ত হবো না, কারণ জয় এসে হাসতে হাসতে পাশে বসে বলবে না–’আর কতদূর, বড়সাহেব? খুব ভারী লাগে তো। চলো, দুই প্যাগ মাল খাই।’

আরমিণ থাকলে নিশ্চয়ই জলন্ত চোখে তাকিয়ে ধিক্কার দিয়ে উঠতো, ‘কেমন অনুভব করছেন সন্তান হারিয়ে? শত্রু হিসেবে যে পরামর্শ আমি দিয়েছিলাম, তা মানলেই পারতেন। আমি সেদিন অন্তত আপনার খারাপ চাইনি, হামজা সাহেব।’রউফ উঠে চুপচাপ বেরিয়ে গেল, যাবার সময় কী এক ইশারা করে গেল। হামজা খুব আগ্রহে হাতদুটো এগিয়ে দেয় হ্যান্ডকাফের দিকে।

থরথর করে কাঁপছে হাত, খুব বেশি দেরি বোধহয় নেই সম্পূর্ণ অচল হতে। হামজাকে নিয়ে যাবার সময় রিমি এসে দাঁড়ায় রউফের সামনে, "আমায় সঙ্গে নিন, অফিসার। নিজের দেখভাল করবার সাধ্যি উনার নেই। আমি উনার খাস দাসী। আমাকে প্রয়োজন হবে।" হামজা চোখদুটো বুজে নেয়, কিন্তু শ্বাস পড়ে না। সে এইদিনের আশায় এত দৌড়ায়নি একজীবন। এত অপদস্থ, এত অসহায়, এত একাকী তার হবার ছিল কি? রিমিকে নেয়া হলো না, রিমি তাতে অখুশি হলো না খুব একটা। আরমিণের বাচ্চার তাকে খুব প্রয়োজন যে! সে আরেকটু মিশিয়ে নিলো

ভ্রূণটাকে বুকের সাথে। ওটা কি একটু দুধ পান করতে চায়? চাইলে রিমি দেবে। মা রিমি হলো না এ জনমে, দুজন হতভাগা-হতভাগীর সন্তানের দুধমা হতে তা বলে রিমির একটুও আপত্তি নেই।তুলির কান্না থেমে গেল একসময়। সে সোফার সাথে হেলান দিয়ে মেঝের ওপর ঠাঁই বসে রইল। আরমিণটা কি জ্যোতিষবিদ্যা জানে? এই তো ক'দিন আগে মেয়েটা বলল, এ বাড়িতে কেউ থাকবে না। তুলির ঠাই হবে কী করে? ওই তো একদল বড়ঘরের তালা ভাঙছে। ধাতব শব্দ আসছে। দু-ভাইয়ের অপরাধ অশেষ, সেই অশেষে রউফ কায়সার আরেকটা যোগ

করতে বড়ঘর তল্লাশির হুকুম না দিলেও হামজা ও জয়ের রক্ষার উপায় তো ছিল না। তবু আর এত আয়োজন কেন? সেটার প্রতিনিধিত্ব করলেন দোলন সাহেব। রিমি আর কিছুতে অবাক হবে না বলে হলো না, কিন্তু তুলি হলো। তুলি জানে না মুরসালীনের মৃত্যু দায়সারা আইনজীবীটার বুকে কী যে এক জ্বালা ধরিয়েছে! তিনি শেষ দেখতে চান, শেষ।রূপকথার জামিন ধরার কেউ নেই। পরাগের বোধহয় জামিন হবে না। তার হাতে কিছু খুনের রক্ত লেগে আছে। সালমাকে পলাশ মেরে ফেলেছে। কেন মেরেছে জানা নেই, মানুষ মারার জন্য পলাশের কোনো

কারণ প্রয়োজন হতো না। তবে সালমাকে মারার একটা কারণ আছে। সালমা রাজনের স্থায়ি রক্ষিতা ছিল। রাজনের একটি সন্তান পরাগকে গর্ভে ধারণ করেছে। সুতরাং তার কিছু পাওনা রাজনের সম্পত্তিতে থাকবেই তো! সালমা খুব কৌশলি মহিলা ছিল, আবার রাজন আজগরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও গভীর ছিল, সুতরাং সে পলাশের সাথে চোটপাট করার সাহস রাখতো।পলাশের মুডের নেই ঠিক। কখন কেমন মাথা কাজ করে! কখন বা সালমা কেমন কথা কাটাকাটির পর্যায়ে চলে গেছে—পলাশ নারীর গলার উঁচু আওয়াজ পছন্দ করে না। সে নারীর কান্না ও আর্তনাদ

পছন্দ করে। সালমার প্রাণটা এ কারণেই গেছিল। পলাশের সহকারী লাশটাকে গুম করে দিয়েছিল। এটা জানার পর পরাগ সহকারীকে মেরে ফেলেছে। পলাশকে কিছু করা যায় না। পলাশও কিচ্ছু বলেনি তাকে। মায়ের লাশ যে গুম করেছে, তাকে খুন করা কোনো অপরাধ না। পরাগের কোনো অপরাধ নেই।

পরাগের চারটা খুন প্রমাণিত। তার ফাঁসি আটকানোর মতো কেউ নেই। দলছুট, সম্পদ বাজেয়াপ্ত, দলের সদস্য বেশ কিছু বন্দি। পরাগের রায় কার্যকর হবার পথে। তাহলে রূপকথার কী হবে?রূপকথা অনেকদিন

আকাশ দেখে না। দেখলেও তার উড়ার উপায় কেড়ে নেয়া হয়েছিল খুব জঘন্যভাবে। সে শেষবার যখন অস্ট্রেলিয়া থেকে বাংলাদেশে এলো, ওটাকে সে শেষ আকাশে উড়া হিসেবে ধরে নিয়েছে। সে কারাগারে থাকা অবস্থায় আজ পর্যন্ত চার-পাঁচবার অর্ধেক ধর্ষণের শিকার। এটার জন্য দায়ী তার সৌন্দর্য। রূপকথার হাসি আসে খুব। যে সৌন্দর্য পলাশকে মুগ্ধ করে তাকে কখনও সুখের দাম্পত্য দিতে পারেনি, সেই সৌন্দর্য প্রশাসন কর্মকর্তাদের ঠিক মুগ্ধ ও মনোরঞ্জিত করছে। এটা ভেবে রূপকথার খুশি হওয়াই

উচিত–তার সৌন্দর্য কোনো কাজে তো দিয়েছে!

রূপকথা আজকাল পলাশের কথা খুব ভাবে। অবসর সময়, চোখদুটো বুঝলে নারকীয় দিনগুলোই সবার প্রথমে ভেসে ওঠে। পলাশ ডাকতে ডাকতে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে, ‘রূপ, ও রূপ!’সারাজীবন রূপ বলে ডেকেও পলাশ কেন তার রূপে মজল না এই প্রশ্নের উত্তর জানা দরকার। রূপকথা সেই ডাকে থরথর করে কেঁপে উঠতো। পলাশ আসলেই বাড়ির সকল চাকর-বাকর বাড়ির অন্দর ছেড়ে বেরিয়ে যেত। রূপকথা একখানা পাতলা কালো শাড়ি পরে আয়নায় নিজেকে দেখলে

নিজেরই হিংসায় বুক জ্বলতো, এই সৌন্দর্যে কেন একজন সুস্থ পুরুষের হক নেই? পলাশ এসে প্রথমেই গলাটা চেপে ধরে বিছানার হেডবোর্ডের সাথে হাতদুটো বেঁধে ফেলতো। কিন্তু মুখে কিচ্ছু লাগাতো না। রূপকথার আর্তনাদ বড় প্রিয় তার।

রূপকথা বুক ভরে শ্বাস টানে। আজ পলাশ নেই। সে কেন আছে? পরাগের ফাঁসিটা তাকে দিলে কী সমস্যা? আছে একটা সমস্যা। সে মুক্তি পেয়ে যেত, এটাই দুনিয়ার সমস্যা। রূপকথার খুব অন্তূর কথা মনে পড়ে। মেয়েটার কাছে বসে কথা বলতে খুব মন চায়। রূপকথার অভিমানও আছে এ নিয়ে—

রূপকথা ঘৃণ্যই হলো বা, ঘৃণা করেও কি একবার দেখতে আসা যায় না? আসে না অন্তূ।রাত্রির চতুর্থ প্রহর। আকাশে মেঘ। বৃষ্টি হবে বোধহয়। পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ যেন গম্ভীর রূপ ধারণ করেছে। সাথে অন্তূর ভেতরে কীসের এক ভয় পেয়ে বসেছে। জয় আমির গেছে কমবেশি নয় ঘণ্টা হবে। ওদিকে কী হচ্ছে! জয় যদি হামজাকে মেরে ফেলে? অন্তূ জানে মারবে না। ব্যথা রুহ্কে ছুঁয়ে দিলে মানুষ প্রতিশোধের স্পৃহা হারায়। জয়েরা কখনোই হামজাদেরকে মারে না। এটুকু স্বস্তি। হামজা এভাবে মরতে পারে না। অন্তূর যে হিসেবের গড়মিল মিলানোর আছে।

কোথাও একটা লার্ক ডাকছে। অন্তূ ক্লাস নাইনে থাকতে শেক্সপিয়রের রোমিও-জুলিয়েট পড়েছিল। টাইবল্টকে মারার পর রাতে নির্বাসিত রোমিওর সঙ্গে জুলিয়েটের শেষ দেখার প্রহরে একটা লার্ক খুব করুণ স্বরে গান গাইছিল বলে উল্লিখ করেছিলেন শেক্সপিয়র। অন্তূর মনে হলো জয় আমির ধরা পড়েছে। তাদের শেষ দেখা হয়ে গেছে। তারা তো রোমিও-জুলিয়েট নয়, তাহলে ভোরের পাখিটা গাইছে কী সাধে?

মুরসালীন মহান গাইতো, এমন কয়েকটা লাইন অন্তূও গেয়ে উঠল–

মনটা যদি হইতো প্রবাল হাওয়া

হইতো যদি শুভ্র কবুতর....
মেঘের ডানায় পাঠিয়ে দিতাম, মদিনারই পথে...
যেখায় আমার প্রিয় নবী—অন্তূ কখনোই যাবে না কারাগারে জয় আমিরের সঙ্গে দেখা করতে। যেদিন জয় আমিরের শাস্তি ফুরোবে, তা কত বছর পরে? তখন দুজন কেমন হবে? বুড়ো হয়ে যাবে তারা। তখন দেখা হলে হবে একবার, অন্তূ একবার কারাগারের বাইরে গিয়ে দাঁড়াবে শীর্ণ-জীর্ণ বৃদ্ধ, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভুগে বের হওয়া আসামী জয় আমিরকে দেখতে।

অন্তূ সেই নোংরা সালোয়ার ও কামিজটাই পড়েছে। কক্ষে থাকা সম্ভব নয়, দম ফুরিয়ে আসছে, বুকের অস্থিরতা মাত্রা ছাড়াচ্ছে। সে কোনোরকম দেহটাকে তুলে বিছানায় বসে বেলকনি দিয়ে বাইরে দেখে। আশপাশে বহুদূর অবধি প্রাণ নেই। একটি পরিত্যক্ত নিবাসের অবরুদ্ধ কক্ষে, এই শেষ নিশীথ প্রহরে লার্কের করুণ স্বর অন্তূর শরীর কাঁপিয়ে তুলল। মনে হলো পৃথিবীর সব আলো গ্রাস করেছে কোনো এক হিংসুটে কালগর্ভ, সূর্য সেই হুমকিতে নিজেকে লুকিয়েছে সমুদ্রের অতলে। আজ ভোর হবে না। ভোর হবার সময় পেরিয়ে যাবার পরেও

এই নিশীথ ঘুঁচবে না। খুব বর্ষণ হবে, তবু ভোর হবে না।এরকম এক প্রহরে আমজাদ সাহেবের শরীরটা শিথিল হয়ে এলো। অন্তূর যে কী কান্না পাচ্ছিল, আব্বুর সামনে কাঁদার অনুমতি নেই বলে সে কাঁদতে পারেনি। কোথাও গাড়ি নেই আমজাদ সাহেবকে হাসপাতালে নেবার জন্য। অন্তূ ভাবলই না যে আমজাদ সাহেব অন্তূকে বিয়ে দিয়ে স্ট্রোক করেছেন। সেই রাতটাও এমন ছিল। তারপর আর ভোর হয়নি অন্তূর জীবনে। আব্বু রাতের খাবারে টেবিল বসে ধমকে ডাকেনি বলে অন্তূ কতকাল রাতে খাবার খায় না। আব্বু এসে পাশে বসে অন্তূর লেখা দেখে বলে না, লেখা

এত ছোট করবি না। দ্রুত লিখতে শিখবে হবে। লাইন বাঁকা কেন? অন্তূ পড়তে বসে না কতদিন সন্ধ্যার পর! খুব কি দরকার ছিল আব্বুটার চলে যাবার? তাদের ছোট্ট পরিবারটা কীভাবে যেন বিদ্ধস্ত হলো! অন্তূর মনে হয় এই তো সেদিন অন্তূর জন্য পৃষ্ঠা কিনে এনে বারান্দার রোদে বসে খাতা সেলাই করছেন আমজাদ সাহেব! ক্যালেন্ডার হিসেব করলে সাতমাস হয় আমজাদ সাহেব পালিয়েছেন! অন্তূর হাত শিরশির করে উঠল। তার ভেতরে রক্তের নেশা জাগল। তার সন্তানের খুনী, তার আব্বুর খুনীদের রক্তের নেশা।-"আরমেইণ!"

অন্তূ থরথর করে কেঁপে উঠল। এই পৌরুষ কণ্ঠস্বর অন্তূকে ভার্সিটির সেসব অভিশপ্ত দিন মনে করায়। সে পেছন ফিরল না। রক্তের নেশা সত্যিই যদি পেয়ে বসে লোকটার মুখ দেখলে? অন্তূ কখনও জয় আমির হতে পারে না। জয় আমিরের হাতে ঝুলছে হ্যান্ডকাফ, শরীর রক্তে ঢাকা। দাড়ি বেড়েছে লোকটার, চুলগুলোও। শেষবার শরীরের যত্ন নেবার মাস পেরিয়েছে যে! মদ কোথায় পেয়েছে কে জানে! কয়েক চুমুক ঢকঢক করে গিলে বোতলটা ছুঁড়ে মারল মেঝের ওপর। কাচ ভেঙে তরল ছড়িয়ে পড়ল দরজার সামনে।

অন্তূকে কি জয় আমিরের ক্ষত-বিক্ষত, ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহাবয়ব একটুও প্রভাবিত করল না? না। সে বরং জিজ্ঞেস করল, "আবার কেন এসেছেন এখানে? মরতে?

জয় আমির হেসে ফেলল, "বাইরেও মরণ।"

-"বেশ! আমার পাপের বোঝা না বাড়ুক। বাইরে গিয়েই মরুন।"

-"তোর হাতে মরব বলে এতদূর এলাম, এই দেখ রক্ত ঝরতেছে পায়ে। ফিরায়ে দিস না, আরমিণ। চলার শক্তি নাই আর।"-"এসেছেন কেন? কোনো প্রয়োজন ছিল না। কী কোরে এলেন? কোথায় গেছিলেন?"

জয় একটা শেষ সিগারেট ধরালো, ‘‘চ্যাহ্! এত প্রশ্ন কেন? অস্ত্র নাই তোমার কাছে। অস্ত্র দিতে এলাম।’’

অন্তূর সুখ লাগে। তার ক্ষমা জয় আমির আজও মানতে পারেনি, সে মরতে মরিয়া।

-‘‘আমি আপনাকে শাস্তি দেবার কেউ নই। আইনের হাতে মরুন। ওটা বরাদ্দ আপনার জন্য।’’

জয় মাথা নাড়ে, ‘‘উহু। পাপ তো আইনের কাছে করি নাই। পাপ করব একজনের কাছে, আর শাস্তি দেবে আইন, এ নীতি মানলে তো আজ খুনী হতাম না, উকিল ম্যাডাম। যার কাছে পাপ, পাপীর সাজা হবে শুধু তারই

অভিশাপ। কলজেটা বাইর করে নেন। কবুল।
''

-“সত্যি মেরে ফেলব আজ। বেরিয়ে যান, সারেন্ডার করুন।''জয় হো হো করে হাসে, “সেই তো ভয় পাচ্ছ আমায় মেরে ফেলার। জয় আমিরের ময়লা জনম ধন্য!''

প্যান্টের নিচ বেয়ে সরু রক্তের ধারা তালু অবধি পৌঁছেছে, এতদূর কীভাবে এসেছে এ অবস্থায়? জয় মেঝের ওপর ঠেসে বসে বেলকনির দরজার পাশে দেয়াল ঘেষে। আর্তনাদের মতো শব্দ করল বসার সময়। শরীরে বিষব্যথা। বুকে বোধহয় ব্যথা নেই। ফুরফুরে লাগছে। এই তো সামনেই পথের

শেষ। ক্লান্ত জয় আমির পিঠ হেলান দিয়ে বসে পরিশ্রান্ত কণ্ঠে আরমিণকে ডাকে, "পাশে এসে বসো তো একটু, ঘরওয়ালি!"

অসুস্থ অন্তূ বসে। জয়ের কাধে মাথা রাখে। জয় চোখদুটো আবেশে বুজে নেয়, তার হৃদকপাটিকাগুলো অস্থিরচিত্তে লাফায়। অন্তূ কি একটাবার জড়িয়ে ধরতে পারে না জয়কে? না। অন্তূ তো টের পাবার ইচ্ছাই রাখে না জয়ের বুকের ভেতরের রক্তক্ষরণের! বরং অন্তূ খোঁজ করে জয়ের কারাবন্দি হবার।-"পুলিশ এসেছে পেছনে?"

-"আসতে অল্প দেরি হবে। ততটুকুই সময় পাবে তুমি। আর কিন্তু ধরতে পারবে না,

উড়ে যাব আমি। সত্যি বলতেছি। তোমার কসম।’’

-“কসম কাটবেন না।’’

জয় তাকায় অন্তূর দিকে, “কাটলে কী?’’

-“মিথ্যাকে সত্য করার হাতিয়ার হিসেবে মানুষ কসম কাটে।’’

বেশ কয়েকটা টান একসাথে দিয়ে সিগারেটটা কোথাও ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে, “তাইলে আরেকটা কাটি!’’

জয় আমির বোধহয় একটা আবদার করল সেদিন, “বদনাম তো হলেই, বদনামের দাগ ওঠে না। সঙ্গে চলো, এই জীবনটা বদনামের

নামে যাক...কসম পরের জন্মে আর বদনাম করব না।”

অন্তূ এই জয়কে কিছুক্ষণ দেখে। অন্তূর দৃষ্টিতে জয় কেমন ছটফট করে ওঠে, “নাহ্! এভাবে না। মরার ভয় পেয়ে বসলে ইজ্জত থাকবে না জয় আমিরের। চোখে ঘেন্নাটুকু বহাল রাখো। ওটুকু আমার।”-“অস্ত্র দেবেন বললেন।”

জয় হাসে, নির্দিধায় পিস্তলটা বের করে অন্তূর কোলের ওপর রাখে, “সত্যিই মেরে ফেলবে?”

-“বহুদিনের সাধ।”

জয় চোখ বুজল এবার, “মুখ দেখে মনে হচ্ছে কাধে মাথা রেখে কত সুখ পাচ্ছ। আসলে তা ছলনা, এই মিথ্যা ভঙ্গি কেন? ভালোবাসো?”

-“মানুষ হয়ে পশুকে কী করে?”

-“বাসা যায় তো। কুকুর, বিড়াল এমনকি জঙলি হিংস্রদেরকেও ভালোবাসে মানুষ।”

-“ওটা স্নেহ। সেটাও সেই সকল পশুকে, যেগুলো হিংস্রতা ভুলে মালিকের স্নেহের যোগ্য হয়ে ওঠে। মানুষখেঁকোকে ভালোবাসতে দেখেছেন?”জয় এবার গা দুলিয়ে হেসে ফেলল। কিন্তু তা অদ্ভুত ঠেকল। এটা হাসি নয়।

-“আমি পলাতক হলে কিন্তু আর বাংলায় ফেরা হবে না। সঙ্গে চলো, যাই।”
-“আমার-আপনার পথ আলাদা।”
জয় জিজ্ঞেস করে, “হু? তাই? তো আমার পথ কোনটা এখন? কারাবাস?” সে দু’পাশে মাথা নাড়ে, ”কারাগারে আমি যাব না। বহুত খাটছি জেল।”
জয় টেনে-টুনে গায়ের রক্তমাখা শার্টটা খুলে ফেলল, “দেখ তো, দাগগুলো কী বলে? কম হয়ে গেছে জেলের মার? আর তো জায়গাও নাই! কোথায় মারবে, কীভাবে আঘাত করলে আঘাত লাগবে আর জয় আমিরের?”

-"আমি যেভাবে করছি, সেভাবে আঘাত পাচ্ছেন আপনি, জয় আমির। তাই আপনি মুক্তি হিসেবে মৃত্যু চাইছেন বারবার।"
ব্যাকুল হাতে অন্তূর ঠোঁটে আঙুল রাখে জয়, "তার চেয়ে বিষ খাইয়ে দে, আরমিণ! শর্ত হলো–এরপর ঠোঁটে একটা চুমু খাবি। চল একসঙ্গে মরে যাই। দ্বিতীয় রোমিও-জুলিয়েট রচিত হোক। বিশ্বাস কর, কারাগারে মানাবে না আমাকে।"-"গোটা কাহিনি যখন ভিন্ন, পরিণতি এক করতে চাওয়া বোকামি, জয় আমির। আর আমি বিশ্বাস করি কারাগারে আপনাকে ভীষণ মানাবে—"

জয়ই চুমু খেলো। সঙ্গে সঙ্গে অন্তূকে চেপে ধরে ঠোঁটের গভীরে খুব প্রগাঢ় এক চুমু খেলো। ঘাম ও জমাট রক্তের গন্ধে মাখা জয়ের শরীর। সেদিন আবারও রক্তাক্ত জয় আমির অন্তূকে শোষন করল একদফা নিজের ভেতরে। আরও একবার, আরও একবার, আরও কয়েকবার। অন্তূ কেঁদে ফেলল, ছাড়াতে পারল না জয়কে। জয় তবু আরও একটাবার খুব শক্ত করে আঁকড়ে ধরে চুমু খেল অন্তূর ঠোঁটের কিনারায়। সে চুমু খেলে ঠোঁটের এক কিনারা বেছে নেয়। অদ্ভুত হয় তার আগ্রাসন, সেখানে পৌরুষ কম, দহন বেশি মেলে।

জয় খানিক বাদে আস্তে কোরে নিজেকে শিথিল করে সরিয়ে আনল, সামান্য ঠোঁট আলগা করে বলল, “কাঁদছো কেন? আমি ছুঁলে খুব খারাপ লাগে?”-“আমি আপনাকে ক্ষমা করতে পারলাম না।”

জয় নিশব্দে মুচকি হাসে, তারপর একটু গা দুলে ওঠে, “কোন শালীর ছাওয়াল কয় রে জয় আমির দূর্ভাগা? সেই শালার মাকে সালাম। দুনিয়ার সবচাইতে সৌভাগ্যবান আসামী জয় আমির। যার বেলায় বাদীপক্ষ কাঁদছে তারে ক্ষমা না করতে পারার আফসোসে।”

অন্তূ কিচ্ছু বলল না। হাসতে হাসতে জয় অন্তূর আগের সেই কথার জবাব দেয়, পতনের কালে দু-চারটে বোকামি করা খারাপ না।''

-"এই পতন আপনার হাতে কামানো।''

জয় হাত এগিয়ে দেয় অন্তূর কাছে, "তাইলে হাতদুইটা ধ্বংস করে ফেলো।''

-"পাপগুলো হাতে লেগে নেই। মানুষের হাহকারের সাথে মিশে গেছে বাতাসে।''-"সেই বাতাসে শ্বাস নিচ্ছি বলেই কি বুকে এত শান্তি লাগতেছে? তাইলে তো উচিত এই শান্তি শান্তি বুকে ঠাস করে এক বুলেট গেঁথে দেয়া।

কিন্তু তুমি তো শালী আমার দুশমন, উপকার তো করবে না।"

-"পতন দৃশ্যমান হবার পরের অনুশোচনা ট্রেন চলে যাবার পর স্টেশনে পৌছানোর মতো।"

জয় আগ্রহ পাবার ভান করে, "পরের স্টেশনের জন্য অপেক্ষা করা যায়। কখন আসবে সেটা?"

অন্তূ তাড়া দেয়, "আপনি মৃত্যুর যোগ্য নন। মানুষের বন্দিত্বের হাহাকার যাদের কানে শ্রুতিমধুর লাগে, সেই উন্মাদদেরও উচিত একটু বন্দিত্বের সাধ গ্রহণ করা। বেরিয়ে

যান, জয় আমির।”-“সাথে যেতেই তো রাজী হচ্ছ না!”

-“রাজী হবো সেই সেই মিছে অপেক্ষা না করার পরামর্শ থাকবে আমার।”

-“আমি ছাড়া কী গতি হবে তোমার?”

-“চমৎকার একটা জীবন আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনি জানেন না, জয় আমির। সামনে আমার সুখের দিন। আমার কাঁধে কতকগুলো গুরুভার আমার বেইমান বাপ আর ভাই সঁপে রেখে পালিয়ে গেছে। তার পেছনে এই

এক জীবন যাবে। আপনার জায়গা কোথায় সেই ব্যস্ত পথে?আপনার জন্য জন্ম হয়নি আমার।"

জয় অন্তূকে কিছুক্ষণ চোখ ভরে দেখে, খুব তো দেখা যাচ্ছে না টিমটিমে মোমবাতির আলোয়, তবু দেখে। এই মেয়েটার সাথে সে কি সত্যিই খারাপ করেছে? বুকের ব্যথায় রুহুটা ঝিমিয়ে আসে। হেলান দিয়ে বসে।-"কাকে মেরে এলেন?"

-"মারিনি। তুমি কি চাইছিলে মেরে আসি?"

-"এত রক্ত কীসের?"

জয় সেই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বড় উচ্ছ্বাসের সাথে জানায়, "আমি বাপ হচ্ছিলাম, জানো? হিংসা হয়?"

-"আল্লাহ্ পাকের বিচার সম্বন্ধে ধারণা রাখেন না। শত শত বাচ্চা বলি দিয়ে বাচ্চার বাপ হতে আসা নরপশু জন্য হিংসা? ওর ভাগ আপনাকে দেয়া হতো না।"

আচমকা জয় অন্তূকে চেপে ধরে, গালের দুপাশে হাত রেখে একটু অপ্রকৃতস্থের মতো বলে, "ভাগ চাইছে কে? তুই তো পরের মেয়ে, আরমিণ। ও আমার রক্ত, আমার আমার, এইযে এই জয় আমিরের। নয়ত তুই বাঁচিয়ে নিতি সেদিন। আমার কেউ নেই বলে

আমার শেষটুকু কেউ ছিনিয়ে নিলো, কেউ দিলো। চেষ্টা করিসনি পালানোর! শাস্তি শাস্তি! শাস্তি দেবার জন্য বাঁচাসনি না? কীসের শাস্তি?''অন্তূ সজোরে এক ধাক্কা মারল জয়ের বুকে, "চুপ! অসুস্থ লোক! রক্তের বড়াই করছেন! ওরকম কামের বশে পতিতালয়ের খরিদ্দাররাও রক্ত ঢেলে আসে বেগানা নারীর জরায়ুতে। বাপ শব্দটার মর্যাদা রক্ষার জন্য হলেও খবরদার আপনার নাপাক জবানে বুক ফুলিয়ে বাপ হবার ঘোষনা করবেন না। সেই যোগ্যতা সবার থাকে না। বাপ হতে সন্তান জন্ম দেবার চেয়েও বাপের কর্তব্য পালন করতে জানা জরুরী। আর সেই কর্তব্য শুধু

নিজের সন্তানের ক্ষেত্রে নয়। আগে মনে মনে বাপ হতে হয়। একজন বাপ কখনও অন্যের সন্তানের জন্য ক্ষতিকর হয় না। আমার বাপকে দেখেছেন না?

বাপ তো আমার বাপও ছিল, তাকে কী দিয়ে দুনিয়াছাড়া করেছেন? বাপ তো মুরসালীনের বাপও, বাপ তো বন্দি বাচ্চাগুলোর বাপও... দুনিয়া সহজ নয়। দুনিয়া ঋণ রাখে না, জয় আমির। মিটিয়ে দেয়। আপনাকেও দিয়েছে। এত হয়রান হচ্ছেন কেন?''জয় টলে না। বরং অন্তূকে আরও চেপে ধরে, "তোর বাপ মরেছে, আমার মরে নাই? তুই এতিম, আমি কী?''

অন্তূ ভঙ্গূর হয়ে আসে, "তার জন্য তো আব্বু দায়ী ছিল না, অন্তিক দায়ী ছিল না, আর না ছিল অন্তূ। তাদেরকে কেন খুন করা হয়েছে? এই অসহায়ত্ব কোথায় ছিল সেদিন আপনার? সেদিন আপনাকে কেন আমির বাড়ির সর্বকনিষ্ঠ, এতিম বংশধর হিসেবে পাইনি? আপনি অভিশাপ রূপে এসেছেন আমার কাছে। আমি চিনি না আপনাকে, চিনি না আপনার এই স্বার্থপরতায় জড়ানো উন্মাদ কাপুরুষটাকে।" শেষে অন্তূ চেঁচিয়ে ওঠে। জয় আস্তে করে নিজেকে ছেড়ে দিলো অন্তূর ওপর, "তাই পালাসনি সেদিন? জয় আমিরের সন্তান বলে অবহেলা করেছিস, আরমিণ!"অন্তূ

ডুকরে উঠল। উন্মাদ এক বাপের সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছিল সে। যে লোক নিজের ভাবনাছাড়া কিছুই বোঝে না। অকপটে মিথ্যা দোষারোপ করে যাচ্ছে! থেমে যাওয়া কান্না আর ঠেলে ওঠা প্রতিবাদে এবার মাতৃত্বের ধাক্কা পড়ল। সে নিজের সন্তানকে সেচ্ছায় মারতে দিয়েছে? অপ্রকৃতস্থ লোক! হু হু করে কেঁদে উঠল মেয়েটা। কোথাও হারিয়ে গেল অন্তূ, কেঁদে উঠল আরমিণটা–যে জয় আমিরের অকালমৃত সন্তানের মা।

-“আপনি যান। আমি সহ্য করতে পারছি না আপনাকে। খুব কঠিন ধাক্কা খেয়েছেন দেবতার কাছে, মাথা নষ্ট হয়ে গেছে

আপনার। আপনার উন্মাদনা সামলানোর দায় আমার নেই। আমাকে যেতে হবে।''

জয় সঙ্গে সঙ্গে হাতরে বুকে টেনে নেয় অন্তূকে। সন্তানের প্রতিশোধের রক্তের ওপর সন্তানের মায়ের কান্নার পানি জয়ের বুক ভেজায়। সে দুইহাতে কঠিন করে জড়িয়ে নিতে বারবার হাত দিয়ে আঁকড়ে নেয় অন্তূকে। অন্তূর মাথার ওপর চোয়াল ঠেকিয়ে চোখ বোজে। চুলের ওপর চুমু খায় কয়েকটা। বুকটা যে কী জ্বলছে তার! ইশ! এই আমির নিবাস তাকে আধারে ফেলে দিয়েছিল একুশ বছর আগে। সেদিন নিষ্পাপ এক কিশোর বেরিয়ে গিয়ে এক পাপীষ্ঠ, খুনী হয়ে ঢুকেছে।

অন্তূ ছটফট করে, “ছেড়ে দিন আমায়–জয় বিরবির করে, ‘সেই পদ্ধতিটাই তো ভুলে গেছি!’ অন্তূর মাথায় হাত দিয়ে বুকের সাথে চেপে ধরে বলল, “আমার হাতে সময় নাই, ঘরওয়ালি। সঙ্গে চলো। এভাবে ধরে কাঁদার জন্য আসামীর বুকটা লাগবে তোমার। নাকি বুকটা কেটে রেখে বাকিটা কারাগারে দেবে?”

-“আজকের পর আর কাঁদব না।”

অন্তূ নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ওড়নাটা ঠিক করে গায়ে পেচালো যেন কোনো বেগানা এসে উপস্থিত হয়েছে হঠাৎ-ই!

জয় শার্ট পরে, খুব জোরে জোরে শ্বাস ফেলে বাচ্চাদের মতো খাবারের আবদার করে উঠল,

“খিদে লাগছে খুব। কিছু নাই খাওয়ার মতোন?”

অন্তূ মাথা নাড়ে, “নাহ্।”-“পানিও নাই? গলা শুকায়ে আসতেছে খুব। একটু পানি খাব আমি। নাই পানি?”

-“খুব খিদে পেয়েছে?”

-“কিছুই খাই নাই। পেট খালি, ভীষণ খিদে পাচ্ছে। শরীর খারাপ লাগতেছে খুব। একটু পানি থাকলে দাও, পানি খাব। আছে পানি? বুক ফেটে মরব মরে হচ্ছে।” হেসে ফেলল জয়।

দুজনের এই কয়েকটি বাক্য বিনিময়ে কয়েকটা সেকেন্ড কাটল, তার পরক্ষণে অন্তূ

ওঠে কোনোরকম। সামান্য কিছুটা পানি বোধহয় আছে বোতলে। অন্তূ মোমবাতিটা আনতে এগিয়ে যায় একটু, কিন্তু পথিমধ্যে তাকে থামতে হলো। জয়ও টের পায় সিঁড়িতে পদচারণার আওয়াজ।

একলাফে উঠে দাঁড়ায় সে, অন্তূর দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, "এজন্য কেঁদে আমার সময় নিচ্ছিলে এতক্ষণ?"

-"আপনার প্রাপ্য বুঝিয়ে দেবার জন্য জরুরী ছিল। আমি দুঃখিত, জয় আমির।"

-"আবার ছলনা! বলেছিলাম, চাইলে তোর হাতে ধ্বংসের একমুঠো ছাই হবো—"-"যা মানুষ সদিচ্ছায় দেয় তা তার শাস্তি হতে পারে

না। আমি আপনার তথাকথিত উদারতা বা নাটকীয় আত্মত্যাগ নয় শাস্তি দেখতে চাই। বৈধ শাস্তি। যা প্রাপ্য আপনার। কথা বাড়াবেন না, সারেন্ডার করুন।''

-“কাঁদলে কেন, সত্যি করে বলো। জানে মেরে ফেলব কিন্তু একদম।''

-“দোষ তো আপনার, জয় আমির। আসামী আপনি, গর্ভের সন্তানের বাপ কেন? তা হলেন, তার আগে আসামী কেন? সন্তানের জন্য তার বাপের কাছে কেঁদেছি, একজন পাপীষ্ঠকে তার প্রতিদান দিতে সময় পার করিয়েছি।''

পিস্তলটা অন্তূ হাতে নিয়ে উঠেছে। জয় আর কথা বলতে পারে না। এই মুহুর্তে অন্তূকে দেখে মনে হলো এতগুলো দিন সংসার করেছে, জয় আমিরের সন্তানের মা হয়েছে অথচ আজও সে সে-ই আমজাদ আলী প্রামাণিকের মেয়ে! সেই তেজ, নির্মম নিষ্ঠুরতা, পণ! 'অন্তূ এক বাপের মেয়ে।' শর্তে হারেনি একরত্তিও!

সেই মুহুর্তে হুড়মুড় করে দরজা লাথি মেরে ঢোকে দুজন। সিভিল ড্রেস, অথচ ভঙ্গীমা বলে দিচ্ছে স্পেশাল ফোর্সের অফিসার দুজন।-"হ্যান্ডস-আপ, জয় আমির। ইউ'আর

ডান। ডোন্ট ট্রাই টু মুভ, অর ইউ উইল বি শ্যুট।''

জয় অন্তূকে দেখছিল, হঠাৎ খেয়াল করে হো হো করে হেসে উঠল, "হু? আরেহ্ আরে! রিল্যাক্স, স্যার। জানটা বউয়ের হাতে দেব বলে পণ না করলে গুলি খেয়ে নিতাম, কসম। পেটটা খালি, গুলি খাওয়া খুবই দরকার ছিল। তাছাড়া আপনাদের হাতে গুলি খেয়ে মরা বংশ পরম্পরায় পাওয়া জেনেটিক ডেসটিনি আমার। প্লিজ কুল। আই'ল নট মুভ, আই একনোলেজ। পুট দ্যা গান ডাউন।''

সে অন্তূর কাছে আবার পানি চায়, "পানি খাব। পানি...''

অন্তূ পানির বোতল এগিয়ে ধরল। জয় পানি নিতে হাত বাড়াতেই বিদ্যুতের বেগে ছুটে এসে একটা গুলি লাগল জয়ের হাতের কব্জির নিচে। ছিটকে পড়ে গেল পানির বোতল। জয় বলে ওঠে, "যাহ্সসালা!"অন্তূ চেঁচিয়ে উঠল, "খরবদার। ডোন্ট শ্যুট এট-অল! পুট দ্য গান ডাউন, অফিসার। অর আইল শ্যুট ইউ!"

ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটে গিয়ে অন্তূর হাতে লাগে। বুলেট জয় আমিরের হাতের এপাশ-ওপাশ পেরিয়ে বেরিয়ে গেছে। জয় আমিরের গরম-ছুটন্ত গাঢ় খয়েরী-লাল রক্তের ছোঁয়ায় অন্তূ কেঁপে উঠল। ছুটে এসে ওড়না দিয়ে

চেপে ধরল হাতটা। জয় অন্তূকে বুকের সাথে বাহুডোরে জড়িয়ে নিয়ে দাঁড়ায়। সুতোর ওড়না জয়ের রক্তে ভিজে জুবজুবে হয়ে ওঠে।
-“সারেন্ডার করুন। ওরা আবার গুলি চালাবে। প্লিজ, জয়।”
-“তুমি তো চালালে না, ওদেরকে অন্তত আমার শেষ উপকারটা করতে দাও। এত হিংসুটে মেয়েলোক বিয়ে করেছিলাম!”
-“খবরদার, বাজে ভাবনা না। আত্মসমর্পণ করুন। ওরা কিচ্ছু করবে না।”
জয় পুলিশ দুটোকে বলে, “স্যার এক মিনিট, প্লিজ।”

জয় অন্তূর হাতের পিস্তল তুলে ঠিক হৃদপিণ্ড বরাবর মুজেল চেপে ধরে বলে, “করলাম আত্মসমর্পণ। মারো। এবার তো মারো!”

-“পাগলামি করবেন না। আপনি আমার হাতে নিজেকে খুন করাতে চাইছেন!”

-“না। খুন হবে না এটা। ভেতরে কিছু একটা খুব ছটফট করতেছে, তুমি গুলি চালাইলে তবেই, আমি নিশ্চিত ওই শালা থামবে। থামাও ওরে।”

অন্তূর ক্ষমতা নেই দু-পা হাঁটে। তার শরীরের নিচের অংশ অচল প্রায়। রক্তে সালোয়ার অনেক আগেই ভিজে উঠেছ, আর জয়ের রক্তে হাত।-“রক্তপাত থামবে না এভাবে।

এমনিই অসুস্থ আপনি। এখন আর অহংকার করবেন না প্লিজ।''

-“তুমি তো করতেছো!''

-“আমি?''

“সাফ সাফ দেখা যাচ্ছে চেহারায়। অত্মগরিমা, না?'' জয় হাসে। তারপর অসহ্য ব্যথায় মুখটা কুঁচকে ধরে, হা করে শ্বাস নেয়। গলগল করে রক্ত পড়ছে। অন্তূ ওড়না ভিজে গেছে, আর রক্ত শুষবে না ওটা।

অস্ত্র ফেলে দাও, “জয়। নয়ত এবার আর গুলি অজায়গায় তাক করা হবে না।''-“ধ্যাৎ মিয়া! আলগা ভাব চুদায়েন না তো! মেরে দিলে নাহয় মেনে নিতাম যে ঘরওয়ালি তো

মারল না, সে যখন চায় তো আইনের হাতেই গেল এই জনম! না মেরে প্যানপ্যান ঠাপাইলে তো সমস্যা। এইবার আমিই কিছু করি!”

আচমকা কোথা থেকে যেন লাইটার জ্বালিয়ে ছুঁড়ে মারল মেঝের ওপর। দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল অ্যালকোহলে। সেই মুহুর্তে বেশ কয়েকটা গুলি ঠাসঠাসা চলল। কিন্তু তার মধ্যে জয়ের পিস্তল থেকে বেরোনো তিনটা গুলিতে একজন নিহত ও একজন গুলিবিদ্ধ আগুনের ওপর পড়ল। তখন শোনা যায় ধুপধাপ বুটের আওয়াজ। বাইরে থেকে এবার সব ভেতরে ঢুকে পড়ছে। জয়ের

ম্যাগাজিন খালি। একটা ছুরি অবধি নেই কাছে।

সিড়ির কাছে আসতে আসতে দুজনই বসে পড়ল। জয়ের মাথা ঘুরছে, পা অবশ হয়ে এলো, বাহুতেও ক্ষত। সেই হাতেরই কব্জিতে আবার গুলি লেগেছে। অন্তূর পক্ষে হাঁটা সম্ভব নয়। তিরতির করে বদরক্ত যাচ্ছে গর্ভ ধুয়ে।

জয় অন্তূর হাত সরাতে চায়। অন্তূ ছাড়ল না।-"বসে থাকুন। ওরা আসলেই দুই হাত তুলে সমর্পণ করবেন নিজেকে।"

জয় অন্তূর নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। একটাবার তাকায় পেছন দিকে। একুশ বছর আগে যেদিন এই সিঁড়িটা দিয়ে নেমে গেছিল,

সেদিন সে বড়বাবার কোলে। সেদিন বড়বাবা ছিল রক্তক্তা। এই নিবাসটা তার জন্য নয় কখনোই।

দুজন নামতে নামতে আবার থামে, ফোর্স সদরঘরে ঢুকে পড়ার আগেই দুজন কোনোরকম বেরিয়ে গেল নিচতলার পেছনের বড়বারান্দা দিয়ে। অন্তূকে জোর করে টেনে নিয়ে যায় সে। অন্তূ অবাক হয় জয়ের এই শরীরেও সে জয়ের সাথে পারছে না।

অন্তূ নিজেকে ছড়াতে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠল এবার, "আমি যাব না আপনার সাথে।"-"সঙ্গে যেতে হবে না। আমি যেখানে যাব তোমার সময় হয় নাই এখনও যাবার। এইখান থেকে

অন্তত বের করি। আমার বাপের বাড়িটা ভালো না।”

-“আপনি দাঁড়ান এখানে। রক্ত থামছে না। কী করতে চাচ্ছেন আপনি?”

সেই পেছনের লোহার ফটকের কাছে পৌঁছায় দুজন। এই পথ দিয়ে জয়নাল আমির হুমায়িরা ও জয়কে বের করে দিতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। জয় হেসে ফেলল। সে অন্তূকে বের করে দিতে গিয়ে ধরা পড়বে? কিন্তু একটা ব্যাপার মিসিং। হুমায়িরার গর্ভে সন্তানটা ছিল, আরমিণের নেই কেন? পরক্ষণেই তার মনে হয় না। তারপর হুমায়িরার সঙ্গে যা হয়েছে তা আরমিণের সাথে হবার নয়।

মরচে ধরে ক্ষয়ে যাওয়া ছোট্ট একটা তালা। কারা মেরেছে জানা নেই। জয় ডান পা দিয়ে দুটো কষে লাথি মারল। আর তখন সামনে দিয়ে গোটা নিবাসের ভেতরটা খুঁজে ফোর্স তাদের পিছনে এসে পৌঁছেছে। ঝুপ ঝুপ করে জড়ো হলো জয়ের পেছনে। জয় হাসে। হাসতে হাসতে মাথা উচু করে সটান দাঁড়িয়ে থাকা আমির নিবাসকে একটাবার দেখে, মনে মনে হেসে বলে—'তোর সাথে আমার এই জনমের শত্রুতা রহস্য রইল। পরের জনমে শালা তোর রহস্যও জানবো, আর প্রতিশোধও তুলব। রেডি থাকিস, শালা নিমোকহারাম।' অন্তূ বসে পড়ল। রক্তপাত বাড়ছে।

ফোর্সের ভেতরে রউফ কায়সারকে দেখে হেসে উঠল জয় আমির। কোন ব্রাঞ্চের লোক কোন ব্রাঞ্চে যুক্ত হয়েছে এক জয় আমিররের তুচ্ছ জীবন কাড়তে! জয় উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে অভিনন্দন জানায় তাকে, "শান্তি বর্ষিত হোক, স্যার। দেখুন না আপনার লোকেরা কী করেছে হাতটার? একটু পানি খাব, স্যার। খুব পিপাসা পাচ্ছে, পানি আছে?"

-"সেটা কাস্টডিতে বেহিসেব পাবেন। তার আগে মিসেস আরমিণকে পাস করুন, জয় আমির। নিজেকে সারেন্ডার করুন। আমি বারবার বলব না। পালানোর চেষ্টা করলে কোনোরকম কনসিডার করা হবে না। এটা

হুমকি নয় সতর্কতা। উনাকে ছেড়ে দিন। যদি ভেবে থাকেন উনাকে জিম্মি করে কিছু করতে চান, তো সামনের ফোর্স মেম্বার আছে। ব্যাকাপ ছাড়া আসেনি ফোর্স। আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী আমি। তাই সতর্ক করছি।''-“না স্যার। মিসেস আমার কাছে সবচেয়ে বেশি সুরক্ষিত আজ। আমি আজ দৌড়াব পরাণ খুলে। থামাতে পারবেন না। ওঠো ঘরওয়ালি! ''

-“আপনার দোহাই জয়, মিছে পালানোর চেষ্টা করে বিপদ ডাকবেন না। আপনি দৌড়ালে ওরা গুলি চালাতে বাধ্য হবে।''

-“তাই নাকি? তাহলে তো একটা রিস্ক নেয়াই যায়! কাম অন, উকিল ম্যাডাম। হুহ্ হুউউউ!” জয় আমিরের সেকি উল্লাস! অন্তূকে নিজের সামনে বাড়িয়ে দিয়ে সে চপল পায়ে সামনে এগিয়ে যায়। এই সেই জঙলি এলাকা। আজও জঙ্গলে পরিণত বাগানটায় জলিল আমিরের লাগানো বিশাল বিশাল আম, মেহগনি, কড়ইগাছগুলো দাঁড়িয়ে, নেই শুধু আমির নিবাসের সদস্যরা। এই পথেই একদিন গর্ভবতী হুমায়িরা খোঁড়াতে খোঁড়াতে জয়টাকে নিয়ে পালিয়েছিল আমির নিবাস ছেড়ে। আজ হুমায়িরার ছেলের পালা। কে জানে তার ছেলের পালানোর ইচ্ছে কতটুকু?

ক্রস ফায়ারের হুকুম জারি হবার পর বাহিনী খেলাটাই এমন খেলে। তারা আসামীকে আদলতে নেবার চেষ্টাটাই করে না। সরাসরি গুলি চালিয়ে খাটুনি কমিয়ে আনে। সেই সুবাদে

নিশীথের শেষ প্রহরের নির্মম নিরবতাকে কাঁপিয়ে তুলে একে-47 রাইফেল থেকে একটি বুলেট ছুটল। সাঁ করে গিয়ে লাগল হুমায়িরার ছেলের পিঠ বরাবর। বক্ষপিঞ্জরের পর্শুকার কোনো এক ফাঁকে ওটা আঁটকে রইল।

জয় কুজো হয়ে পড়ে, জোরে করে হেসে ওঠে। অন্তূ থমকে দাঁড়ায়। হাতটা তার জয়

আমির আরও শক্ত করে চেপে ধরেছে এই মুহূর্তে। হাসছে লোকটা। পৌরুষ হাসির ঝংকারে অন্তূর শরীরের লোমকূপ শিরশির করে উঠল। জয় আমিরের হাসি থামছে না। তবু পা ঝেরে টান করে অন্তূর হাত ধরে টেনে নিয়ে সামনে এগোতে চায়। আজ সে ঠিক বুঝতে পারে না মৃত্যুকে সে বেশি ভালোবেসেছে নাকি সেই অসীম ভালোবাসার ঊর্ধ্বে জয় আমির মৃত্যুর সাথে বেইমানি করে আরও কিছু চেয়ে বসেছে।তা কি তার হাতের মুঠোয়? ওটা কি কিছুকাল বাঁচার আকাঙ্ক্ষা জয়ের হাতের মুঠোয়? মৃত্যু কি অভিমান করল না? করাই তো উচিত। এতগুলো বছর

মৃত্যু বারবার হাতছানি দিয়েছে, জয়কে গ্রহণ করেনি। আজ করছে, আর আজ কিনা জয় আমিরের চোখে মৃদু অনীহা? ওটুকুও মৃত্যুর বরদাস্ত নয়।

জয় মৃত্যুকে দেখে প্রাণখুলে হাসতে লাগল, আর সামনে এগোনোর চেষ্টা করতে লাগল। সেই মুহুর্তে পর পর আরও দুটো, তারপর আরও একটা বুলেট এসে লাগল জয় আমিরের পিঠের শিরদাড়ার মাঝ বরাবর। এটা কেন যে ফুঁড়ে জয় আমিরের প্রসস্থ বুকটা চিড়ে ছুটে গিয়ে বিঁধল জলিল আমিরের রোপনকৃত একটি গাছের গায়ে। জলিল আমির নিশ্চয়ই গাছটা লাগানোর সময়

ভাবেননি এই গাছে একটা বুলেট বিঁধবে, তার নাতির বুক ফুঁড়ে রক্তে ধুয়ে এসে। বাকি দুটো বুলেট একটা পেটে আরেকটা ঠিক জয় আমিরের এক জনমের সাধ মিটিয়ে বুলেটটা হৃদপিণ্ড বরাবর বিঁধে গেল।জয় ক্ষণকাল কুঁজো হয়ে হাসে। সে দেখে সে উবু হবার ফলে তার বুকের রক্ত নোংরা ঘাস-মাটির ওপর টপটপ করে ঝরছে। জয়ের হাসি বাড়ল। গা দুলিয়ে হাসতে লাগল সে। নিয়মভঙ্গ হয়নি। জয় আমিরের রক্ত একুশটা বছর ধরে মাটি শোষন করে আসছে। যে পথে মানুষ বড় অবহেলায় পা মাড়িয়ে হাঁটে, সেসবখানে জয় আমিরের অদামি রক্ত

গলগলিয়ে ঝরে গেছে।জয় বসে পড়ল। তখন অন্তূর হাতটা হাতের মুঠোয় ছিল। কিন্তু বসে পড়ার পর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে কয়েক ফোঁটা পানি মাটিতে পড়ার পরপরই জয় আমির লুটিয়ে পড়ল ঘাসের ওপর। আকাশটা কেঁদে ফেলল। খুব অবাককর ব্যাপার। আকাশের কী হয়েছে? তার কি খুব দুঃখ? এই শেষরাতে তার কান্না পাবার কারণ কী? অন্তূ টের পায় তার হাতটা কেউ ধীরে ধীরে ছেড়ে দিয়ে ধুপ করে লুটিয়ে পড়ল ওই তো মাটির ওপর। অন্তূর শরীরটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল জয়ের দেহের পাশে। তার ওই হাতটা মৃগী

রোগীর মতো কাঁপছে। সে হাতটা টান করে ধরে। তার ওপর ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ল, আর জয় আমিরের রক্তরা পানির সাথে মিশে ধুয়ে ধুয়ে জমিনে পড়তে লাগল। অন্তূ অস্ফূট ডেকে ওঠে, 'জয়!'জয় তৃপ্ত হেসে উঠে মাটিটা খামচে ধরে দূর্বল হাতে। মাটি নাকি মা? জয় আমির হুমায়িরার আঁচলটা চেপে ধরল। লোকে বলবে জয় আমির ঘাস চেপে ধরেছে, রক্তে ভেজা ঘাস। লোকেরা জানে না কিছু। হুমায়িরা কি একটু পানি আনেননি জয় আমিরের জন্য? আনেননি। তিনি জানেন না বোধহয় জয় আমির ভীষণ তৃষ্ণার্ত। হুমায়িরা কাঁদছেন না। হুমায়িরা কিছু বুঝতে পারছেন

না বোধহয়। তিনি কি ভাবছেন জয় আমির আজ একুশ বছর পর ঘুমালো? নিশ্চিন্ত ঘুম! হুমায়িরা সঠিক ভাবছেন। তার ছেলে আজ ঘুমালো যুগ পর। এই ঘুমে ব্যথা নেই, রক্ত অথবা হাহাকার নেই, বুকের দহন নেই। পিপাসাও নেই। এই যে কিছুক্ষণ আগে কী ছটফট করছিল একটু পানি পান করার জন্য, এখন অবশ্য আরও কেমনভাবে যেন বুকটা আঁটকে আসছে। জীবনের সবটা স্মৃতির পটে জড়ো হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠল। তার সংক্ষিপ্ত ঘটনাবহুল জীবনটার একেকটা নিশীথ! অবরুদ্ধ নিশীথ! খুব পিপাসা পাচ্ছে, বুকে শ্বাস নেই। একটু পানির জন্য রূহটা

ছটফট করে উঠল। পাত্তাই দিলো না জয়। তবু মনে হলো এক চুমুক পানি পান করতে বুকে বড় তৃষ্ণা! বৃষ্টিটা এলো তার পিপাসা নিভে যাবার মুহুর্তে।ততক্ষণে মৃত্যুকে জয় আমির জড়িয়ে ধরেছে আষ্টেপৃষ্টে। আর সে এবার ছাড়বে না, বহু প্রতারণা মৃত্যু করেছে তার সঙ্গে। এবার আর নয়। তার একুশ বছরের সাধনা! তার ছোট্ট বয়সের প্রেম। বৃষ্টির ঠান্ডা ফোঁটা জয়ের ভেতরের সব আগুন নিভিয়ে জয়কে ঘুম পাড়িয়ে দিলো। এই ঘুম ভাঙবে না।

ওই তো দূর মসজিদের মিনারে ফজরের আজান শোনা যাচ্ছে। একটু পরই সকাল

হবে। তবু জয় উঠবে না। অবশ্য জয়ের সকালে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস কি আছে নাকি? সে ওঠে দুপুর অথবা বিকেলে। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা ভিন্ন। জয় আমির আজ বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হবে, রাত হবে, সেই রাত শেষ হয়ে আরেকটা সকাল হলেও জয় আমির কিছুতেই উঠে গিয়ে গলা ফেঁড়ে ডাকবে না, তরুউও! আমার শার্টের বালডা কয়দিন পর পর ধুস? খাউজানি হয়ে গেল যে ময়লা শার্ট পরে! আজ কী রাঁধছে রে? মাছ হইলে হোটেলে যাইগা। ওই বালডা ছাড়া তো কিছু পাস না।জয় আমিরের আরেকটা বিষয় জানা দরকার ছিল। কুষ্টিয়াতে একটা কাণ্ড

ঘটে গেছে। শেষরাতে মার্জিয়ার প্রসববেদনা উঠেছিল। ফজরের আজানের সাথে মার্জিয়ার গর্ভ ছিঁড়ে একটা হুমায়িরা এসেছে। হুমায়িরা অন্তিক। জয় জানলে কী করতো বলা যাচ্ছে না। তাকে জিজ্ঞেস করলে এখন আর বলবে না। কিন্তু বিজ্ঞান বলে মানুষ মরার পরে সাত মিনিট মস্তিষ্ক সচল থাকে, কানও। এখন খরবটা দিলে জয় আমির শুনবে কি? কিন্তু বলবে কে? অন্তূটাও জানে না।অন্তূ বসে পড়ল আলগোছে জয়ের কাছে। তার কেন মনে হলো দুনিয়ায় আজ সে একা হলো। শেষ হাতটাও এই তো এইক্ষণে তার হাত

ছেড়ে পালালো। অন্তূ জয় আমিরকে ঝাকাল, ‘জয়! এই? জয়!’

জয় উঠলই না! অবাধ্য, বেয়াদবের মতো শুয়েই রইল চুপচাপ। চোখটা সামান্য খুলল না অবধি। অন্তূ রক্তে মাখা হাতটা মুঠোয় পুড়ে ঝাঁকায়, মৃদু স্বরে ডাকে। জয় চুপ করে শুয়ে আছে। অন্তূর বিশ্বাস হচ্ছে না। সে বোকা না। এটা হয় নাকি? জয় আমির আর নেই, এটা বিশ্বাস করা যায়? সে আর ডাকবে না? হাসবে না বেহায়ার মতোন? অন্যদিন হলে এক্ষুনি উঠে দু চারটে গালিয়ে দিয়ে স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে হেসে উঠতো। হাসবে না নাকি আর? চেইনের লকেটটা বুকের ওপর

পড়ে আছে। জোরে বৃষ্টি আসছে। জয়ের রক্ত ধুয়ে চুইয়ে যাচ্ছে। সে উঠে হাসছে না, বুলেট গেথে থাকায় যে ব্যথা সেই ব্যথাকে দুটো গালিও দিচ্ছে না। লোকটার ধৈর্য বেড়েছে। ভেতরের আগুন যে নিভে গেছে, তাই!সেই তারিখটা ১৭-ই জুলাই, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ। তারিখটা আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার দিবস। সেদিন জয় আমির ন্যায়বিচার পেল, নাকি দুনিয়াকে দিয়ে গেল বলা মুশকিল।মাহেজাবিণ উঠে শাড়ির ওপর একটি সাদা সুতির ওড়না জড়িয়ে নিয়ে অযু করে এসে নামাজে দাঁড়াল। ততটুকু সময় ক্যাথারিন পেলেন নিজেকে সামলানোর। আটচল্লিশ বছর বর্ষীয়া নারী

তিনি। ঘর-সংসার ত্যাগ করেছেন যুগ কয়েক আগে। মানবসেবায় নিয়জিত করেছেন তুচ্ছ জীবনখানা। বিলাসিতা, রং তার জীবনে নেই। রোজ তিনি বাইবেল পাঠ করবার সময় অহিংসাকে পালন করেন ভেতরে। অথচ আজ এক হিংস্র পাপীষ্ঠের জন্য তাঁর চোখে পানি, এ কি ইশ্বরের কাছে পাপ বলে বিবেচিত হবে? তিনি মাহেজাবিণকে দেখলেন। মেয়েটি তাকে 'মাদাম' সম্বোধন করে। উচিত নয়। তাকে ডাকতে হবে 'সিস্টার' বলে। কিন্তু তিনি কিছু বলেননি। এক অদৃশ্য টান তার তৈরি হয়েছে মেয়েটির ওপর। তার ইচ্ছে

তৈরি হয়েছে বাকিটা জীবন মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় রাখার। ভেতরে অসংখ্য প্রশ্ন জমেছে। মাহেজাবিণ কেন মরে গেল না? তার তো জীবনের প্রতি তৃষ্ণা নেই। কিন্তু প্রতিশ্রুতির ওপর ভক্তি আছে অসীম। নয়ত একটি অসহায় নারীর মিছিল কাধে বয়ে নিতে নিজের নষ্ট জীবন কেউ বহাল রাখে না। মাহেজাবিণ মার্জিয়াকে কথা দিয়েছিল–মার্জিয়া ও তার বাচ্চার এই জীবনের দায় সে বয়ে দেবে। সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে মাহেজাবিণ এক জীবন উৎসর্গ করেছে। কিন্তু শুধু তা হলে মানা যেত, নিজের ভাবী, ভাইয়ের সন্তানকে পালন করলোই বা! সে যে তার

জীবনকে নরক করা তিন প্রধান পাপীষ্ঠদের ঘরের নারীদেরকে অবধি বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে! এটা কি মহত্ব নাকি পাগলামি? যেখানে তার নিজের বেঁচে থাকার হেতু নেই, সংসার নেই, স্বামী-সন্তান, শারীরিক সুস্থতা, মা-বাবা কেউ তো নেই। শুধুই এই বেঁচে থাকা পরের জীবন টেনে দেবার দায়ে। ক্যাথারিন অবাক হলেন। মাহেজাবিণ কি তারই মতো এক ব্রতী নয়? যে কেবল মানুষের সেবায় এক জীবন উৎসর্গ করেছে! যার নিজের জীবনে কিছু নেই, নিজের বলতে কিছু নেই। আছে কেবল এক কাধ ভর্তি দায়বদ্ধতা, স্বার্থহীনতা! সেই দায় টানতে মাহেজাবিণ নিজের এই অসহনীয়

জীবনটা বয়ে চলেছে! জেনেবুঝে হেরে গেছে শুধু একটি ওয়াদার কাছে, একটি পাপের কাছে।জয় আমির যেমন আত্মহত্যা করল বন্দিত্ব ও জীবন থেকে, মাহেজাবিণ পারেনি। আত্মহত্যা মহাপাপ, মাহেজাবিণ এখানে কাবু। কিন্তু জয় আমির পাপের ঊর্ধ্বে। যে কেউ বলবে জয় আমিরকে ক্রস ফায়ারে মারা হয়েছে। ক্যাথারিন তাদের কাউকে কখনও বোঝাতে যাবেন না অবশ্য–জয় আমিরের সেই রাতের গোটা আয়োজনটাই ছিল এমন এক আত্মহত্যার, যা আপাত দৃষ্টিতে আত্মহত্যা বলে বিবেচিত হবে না। কারণ কেউ মাহেজাবিণের মুখে সেই বর্ণনা শুনবে না–

জয় আমির কী প্রচেষ্টা ও উন্মাদনার সাথে বাধ্য করেছিল তার ওপর গুলি চালাতে, পালিয়ে গেছিল সে জীবনের থেকে।ক্যাথারিন একবার মাহেজাবিণের মতোই কৃতজ্ঞ হয়েছিলেন জয় আমিরের ওপর। যখন তিনি শুনছিলেন পলাশের ছাদ থেকে মাহেজাবিণের সম্মান রক্ষার গল্প। তখন তাঁর মনে হয়েছিল জয় আমিরকে থুতু দিয়ে ঠিক করেনি মাহেজাবিণ। কিন্তু এখন তা মনে হচ্ছে না। মাহেজাবিণ সেদিন অজান্তেই একটা সঠিক কাজ করেছিল, থুতুটুকু প্রাপ্য ছিল জয়ের। কিন্তু তার বদলে জয় যা করেছে সেটা 'আগুন থেকে বাঁচিয়ে পানিতে ডুবিয়ে শ্বাস আটকে

মারার মতো'। আর তা কতটুকু কৃতজ্ঞতার দাবীদার জানা নেই ক্যাথারিনের।পলাশকে অন্তূর পরিবারটা চিনিয়েছে হামজা। এরপর পলাশ কেবল নিজের কাজ করেছে, যেটা তার কাজের পদ্ধতি সেভাবেই যা করার করেছে। কিন্তু এরপর জয় পলাশের সাথে যা যা করেছে তা ছিল 'গাছে তুলে দিয়ে মই টান দেয়া'। আবার পলাশ অন্তূকে বারবার চেয়েছিল ধর্ষণ করার জন্য। যেটা অন্তূ বিয়ের পর জয়ের কাছে বৈধভাবে হয়েছে বারবার। ইচ্ছে, সম্মতি না থাকার পরেও বাঁধা না দেবার অপারগতায় মেনে নেয়া আর মনকে মিথ্যা সান্ত্বণা দেয়া একটি নারীর জন্য ধর্ষণের

সংজ্ঞার সাথে মিলে যায়। যাকে বলে ম্যারিটাল রেইপ। লাইসেন্স করা পিস্তল দিয়ে কাউকে খুন করা আর কী! পলাশের সেই লাইসেন্সটা ছিল না, জয়ের কাছে তিন কবুলের লাইসেন্স ছিল। কিন্তু জয় শেষ অবধি মাহেজাবিণকে ভেতর থেকে আকাঙ্ক্ষা করে বসায় যা অঘটন ঘটল।

এই গোটাটার পেছনে একটি মূল ঘটনা দায়ী—বড়ভাইদের ওপর অন্তিকের অবাধ্যতা, এবং তার জের ধরে আবার অন্তূর অন্যায় মেনে না নেবার প্রবণতা! মিস ক্যাথারিন ভেবে ক্লান্ত হয়ে উঠলেন। মাহেজাবিণকে দেখলেন।

মাহেজাবিণ শান্তচিত্তে তার রবের সামনে নিজেকে সমর্পন করছে। একেকটি সেজদা লম্বা তার। স্নিগ্ধ, গম্ভীর, চাপা বিষাদে মাখা মুখখানা! ওযুর পানি ছিটকে লেগে আছে মুখটায়। নারীর সহ্যক্ষমতার মাত্রা কতটুকু? পাশের ঘর থেকে শিশুকন্যার কান্নার আওয়াজ এলো সামান্য, মার্জিয়া দুটো চাপা ধমকে চুপ করালো মেয়েটিকে। মাহেজাবিণ নামাজ শেষ করে উঠলে ক্যাথারিনের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন মনে পড়ল।-"মাহেজাবিণ, অন্তিকের মেয়ের নাম কি হুমায়িরা রাখা হয়েছে?"

-"অরিবা। অরিবা মুমতাহিণা।" বলতে বলতে মাহেজাবিণ সোফায় বসল আবার, "আমি রেখেছি।"

মিস ক্যাথারিন বললেন, "খুব সুন্দর নাম।" এরপর তিনি আনমনা হলেন। জিজ্ঞেস করার সাহস পেলেন না, 'জয় আমিরের কাঙ্ক্ষিত নামটি রাখোনি?' পিতার খুনী সন্তানের নাম ঠিক করতে পারে না। মার্জিয়া তা বরদাস্ত করবে না। যে সন্তানকে গর্ভে নিয়ে সে বিধবা হয়েছে সেই সন্তানের নাম তার স্বামীর খুনী রাখবে, প্রশ্ন ওঠে না তো! নামটা জয় আমির উচ্চারণ করেছিল বলে মার্জিয়া চার অক্ষরের সেই নামটিকেও ঘৃণা করে।

-“জানো, মাহেজাবিণ! আমাদের ক্যাথেলিক খ্রিষ্ট শাখার ভিত্তি হলো ট্রিনিটি অর্থাৎ ত্রিত্ববাদ–ফাদার, সন অ্যান্ড হোলি স্পিরিট! আমি কি প্রতিকী অর্থে তোমার অবরুদ্ধ নিশীথকে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার প্রবাহ ধরে নিতে পারি?”

মাহেজাবিণ মাথা নাড়ে, “পবিত্র আত্মা কে, মাদাম? যদি আপনি আমাকে নির্দেশ করেন তো আমি পানাহ্ চাইছি। আপনি যা বললেন তা আমার ধর্মমতে শিরক। কিন্তু আপনি যখন প্রতিকী অর্থ ধরেছেন সেক্ষেত্রে জয় আমির ও তার সন্তান যদি পিতা ও পুত্র হয়, পবিত্র

আত্মার স্থানটি আমার জন্য ফাঁকা থাকে। অথচ আমি পাপীষ্ঠা!''-"কী পাপ করেছ?'' -"আমি এই হাতে মানুষ খুন করেছি, অথচ কারাবরণ করিনি। আমি অ্যাডভোকেট হতে যাচ্ছি, অথচ নিজের বিরুদ্ধে প্রসিকিউশনে যাবার পরিকল্পনা রাখিনি। সবাই শাস্তি পেয়েছে, শুধু আমি বাদে।''

'অথচ আমি দেখছি তুমি ছাড়া আর কেউ শাস্তিই পায়নি। এন ইটারনাল পানিশমেন্ট হ্যাজ বিন গিভেন টু ইউ' কথাটুকু মনে মনে বলে ক্যাথারিন আলতো হাসলেন, "একটা প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রাণীহত্যা পাপ হবার পরেও কীভাবে প্রাণীহত্যা বৈধ হতে পারে?''

-“হিংস্র, ক্ষতিকর প্রাণী হত্যা বৈধ।”-“আমি তো ভাবছিলাম, এটা তুমি জানোই না, মূর্খ মেয়ে। কোন ধর্মের কাছে যাবে তুমি? সকল ধর্মই তোমাকে বলবে– ঠিক যেমন অহেতুক হত্যা পাপ, তেমনই আত্মরক্ষার জন্য হিংস্র পশুবধ বৈধ। কেননা তুমি যদি তখন সেই প্রাণীটাকে হত্যা না করো, উল্টো তুমি অথবা কোনো নিরীহ নিহত হবে। তুমি বলছো মানুষ খুন করেছ। শিক্ষিত মেয়ে হয়ে এতবড় ভুল কথা কেন? মানুষের সংজ্ঞা জানো না তুমি? যে মানুষ অপর একটি মানুষের জন্য ক্ষতিকর, সে মানুষিকতাহীন প্রাণী, যাকে সাধারণ ভাষায় জানোয়ার বা পশু বলা হয়।

তুমি যে অবস্থানে দাঁড়িয়ে খুন করেছ, তা না করলে বরং তুমি পাপী হতে পারতে।''

-"কিন্তু খুন তো খুন, মাদাম। আমি আগামীতে যখন কোনো খুনী আসামীর বিরুদ্ধে আদালতে দাঁড়াবো, আমার মনে পড়বে তারই মতো একটি পাপী আমার ভেতরেও আছে। আমি কেন আজ কাঠগড়ায় না দাঁড়িয়ে আইনজীবীর স্থানে?'মিস ক্যাথারিন একটু হাসলেন। জয় আমির আর মাহেজাবিণের মধ্যে প্রধান ফারাকটা কোথায়? এখানেই! জয় আমির পাপ স্বীকার করেছে কিন্তু অনুশোচনার ধারে কাছেও ঘেঁষেনি। সক্রেটিস বলেছেন–অন্যায় করে অনুতপ্ত না হওয়াটা আরেক অন্যায়।

মাহেজাবিণ এমন একটি খুনের অনুতাপে ডুবে আছে আজও, যা নৈতিকতার গভীর দৃষ্টি থেকে দেখলে খুনই নয়। অথচ জয় আমির সামান্য অনুতাপ করেনি মরার আগ অবধি, শুধু পাপের স্বীকৃতি যথেষ্ট নয় পাপমোচনের জন্য, অনুতাপ ও শাস্তিগ্রহণ ছাড়া পাপমুক্তি নেই। এখানেই দুজনের পথ আলাদা হয়েছে। যে পাপী সে কখনও রোজ সেই পাপ নিয়ে অনুশোচনা করে না। আর যে করে সে পাপ পাপের উদ্দেশ্যে করেনি।

তিনি বললেন, "আমি বাইবেল, কোরআন, গীতা, ত্রিপিটক পড়েছি। সে হিসেবে এবং এ অবধি তোমার বলা ঘটনাপ্রবাহমতে বলব–

তুমি পাপ না করে সীমাহীন শাস্তির অধাকারী হয়েছ। অভিনন্দন তোমাকে।”-“জেল হলো না, না জরিমানা, না মৃত্যু। আপনি কোনটাকে শাস্তি বলছেন? আমি তো জিতে গেছি!”

-“মিছে সান্ত্বণায় বাঁচতে চাইলে আমি তোমায় মানা করব না। কিন্তু জিতেছে জয় আমির। জিততে পারোনি তুমি আর হামজা। প্রধান প্রতিদ্বন্দী দুজন রয়ে গেছ নরকে। জয় খুব জানতো, শাস্তি জীবনের অপর নাম। সে সেই জীবনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পালিয়েছে চরম চতুরতার সাথে। তুমি বোকা ফেঁসে গেছ দায়ভারের কাছে। তুমি জিততে পারতে যদি এই যে কতকগুলো প্রাণের দায়ভার তুমি

কাধে তুলে নিয়েছ, স্বার্থপরের মতো তা ঝেরে কারাবরণ অথবা মৃত্যু বেছে নিলে। পালাতে যখন পারোনি, এবার এই জীবনের দড়ি টানতে টানতে হাত ব্যথা হলেও থেমো না, মাহেজাবিণ।'-"আপনি কি তিরস্কার করছেন আমায়?"

-"করছি। এতবড় বোকাকে তিরস্কার করাই যায়! একটি নরকবাস তুমি বেছে নিয়েছ জীবনে।"

মাহেজাবিণ আলতো হেসে হেলান দিলো সোফায়, "আব্বু এমনটাই বলেছিল জীবন সম্বন্ধে। নরক তো জীবনবাসই।"

সে ওড়নাটা একটু আলগা করে নিলো। বাইরে সকালের আভা ফুটছে। এভাবেই সেদিন সকাল হলো একটু একটু করে, কিন্তু বৃষ্টি থামল না, বরং তোড়জোর বাড়ল। আলো ফোটার সাথে সাথে ঝুমঝুম করে ঝেপে এলো।

মিস ক্যাথারিন জিজ্ঞেস করলেন, "সেই দিনটা কি পুরোটাই বৃষ্টিমুখর ছিল, মাহেজাবিণ?

"সকাল নয়টা বাজল। তখনও ঝরছে আষাঢ়ে বৃষ্টি। অন্তূ থরথর করে কাঁপতে লাগল। লোকটা শুয়ে আছে। হাত থেকে রক্ত পড়া থেমে গেছে। বৃষ্টির পানিতে তাজা রক্ত ধুয়ে সবুজ ঘাসে লাল মিশে যাচ্ছে।

আমির নিবাসের ফ্রন্টইয়ার্ডের ছাউনি পোর্টিকোর নিচে অবস্থান নিয়ে পুলিশবাহিনী তখন এফআইআর লিখতে ব্যস্ত। তারা সরকারের কাছে জবাবদিহি লিখছে। তারা লিখল, 'জয় আমিরের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে তাদের ফোর্সের একজন সদস্য নিহত হয়েছে ও আরেকজন মৃত্যুমুখে। এবং শেষ অবধি তারা নিজেদের আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ভয়াবহ ক্রিমিনাল জয় আমিরের ওপর গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছে।এটা লিখতে গেলে বেগ পেতে হতো, যদি না হামজার দিন ফুরোতো। জয় আমিরের শরীরে তাজা চারটে গুলি বিঁধেছে। আত্মরক্ষার জন্য ক্রিমিনালকে একটি গুলিবিদ্ধ

করে কাবু করাই যথেষ্ট, মারার হলেও এতগুলো গুলি একটি মানুষকে থামাতে চালানোর নয়। সুতরাং বাহিনীর সবগুলোর এ নিয়ে রাজনৈতিক উপরমহলের কাছে জবাবদিহি করতে কলিজা ফেটে যেত। কিন্তু সেই লিংকটা দূর্বল হয়ে গেছিল দুই-ভাইয়ের। এই সুবিধাটুকু পেয়ে পুলিশফোর্স নিশ্চিন্ত। ময়নাতদন্তেও নেয়া হবে না লাশ। চিহ্নিত অপরাধী জয় আমির, নিশ্চিত ফাঁসির আসামী ছিল। বিবেচনার ওপর কম করে হলেও যাবজ্জীবন দণ্ড শোনানো হতো।

মৃত আসামী জয়ের পরিবারে কে কে আছে? স্ত্রী বসে আছেন মৃতদেহের পাশে। আর কে

আছে? রিমি ও তুলি প্রথমবার সেদিন আমির নিবাসে এলো। থমকে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ নারীদুটো। এতবড় নিবাস, এত আভিজাত্য! এই বাড়ির উত্তরসূরী জয় আমির! যে লোকটা একটা জীবন এই পরিচয়কে এড়িয়ে কাটালো, তার শেষ শ্বাসটুকু ঠিক তার পরিচয়ের জমিনে পড়ল! পাপ কি ধুয়েছে তাতে?ঘটনাটা রিমির বিশ্বাস হলো না। জীবনে লুঙ্গি, প্যান্ট ধোয় না লোকটা। দরজাটাও আটকে ঘুমায় না। রিমি বা তরুর সকাল সকাল যেতে হয় যে তার রুম পরিষ্কার করতে অথবা নোংরা পোশাক নিতে। সে এরকম কত সকাল লোকটাকে চিৎপটাং

হয়ে বিছানায় পড়ে থাকতে দেখেছে। আজ নাহয় বিছানা নয়, নোংরা ঘাসের ওপর পড়ে আছে, তাই বলে লোকটা একটু পর উঠে চিৎকার করে ভাত চাইবে না? তার কাছে হামজা ভাইয়ের খোঁজ করবে না? রিমির শ্বাস আটকে গেল।তুলি শিয়রে হাঁটু ভেঙে বসে, ঝাঁকায় জয়কে, কর্কশ স্বরে বলল, “এই বাটপার, এই! বলেছিলি যে আমায় বিয়ে দিবি। আমি অসহায় বলে মিছে সান্ত্বণা দিয়েছিস? বিয়ে তো দিলি না? ওমন চুপচাপ শুয়ে থেকে খালাশ, না রে? আমি জীবন কাটাবো কী করে? তোরা একেকজন পূণ্যের কাজ করে করে একেটা একেকদিকে পাড়ি

জমাচ্ছিস, আমাকে কে দেখবে? আমার মেয়েকে কে দেখবে? কোয়েলর দুধ নেই দু'দিন। ভাত চটকে দিলে বমি করে, কাঁদে। দুধ আনতে যাবে কে? দেখ দাঁড়িয়ে আছে, তোকে দেখছে। ও কাঁদলেও উঠবি না? জয়! ওঠ বলছি। আমার মেয়ে না খেয়ে আছে। আমার ভরা জীবন পড়ে আছে। আমাকে খেতে দেবার লোক নেই, দেখার কেউ নেই, বাপ নেই-মা নেই। কার আশায় রেখে গেলি? আপন ভাই নেই আমার, ফুফাতো ভাই হিসেবে কোন দায়িত্বটা পালন করে গেলি রে নিমোকহারাম? জয় ওঠ....''কোত্থেকে যেন হুড়মুড় করে একটা পাগল ছুটে এলো।

পাগলটা হলো কবীর। হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল জয়ের বুকের ওপর ঝুঁকে। হাতে-বুকে রক্ত মেখে গেল। কতলোক আজ ভূত নিবাসে জড়ো হয়েছে। বৃদ্ধরা হায় হায় করে উঠছে থেকে থেকে–'আমির পরিবারডারে ক্যান যে এমনে চিল-শকুইন্নাই ছিঁইড়া খাইল। এই চ্যাংরা এদ্দিন পর ক্যা আইছেলো এই শাপের বাড়িডাত? অর কি ডর নাই? বাপ গ্যাছে, চাচা, দাদা, মায়...ব্যাহায়ার মতোন আইছে ওয়ও জীবনডি দিতো।'

খুবই অবাককর দৃশ্য দেখা গেল। একজন ক্রিমিনাল, দাগী আসামীর আইনের হাতে মৃত্যু এত মানুষের হাহাকারের কারণ হতে পারে

না। কিন্তু করছে, কারণ এরা জানে না জয়ের জীবনের নারকীয় অপরাধগুলো।

-“ভাই? ভাবী, ভাইয়ের কী হইছে? জয় ভাই? ”

কবীরের ডাকে অন্তূ চোখ তোলে। তার খুব অবাক লাগে চারিপাশটা। সব কেমন গুলিয়ে গেছে। জয় আমির সত্যিই শাস্তি পেল না। এত পাপ করেও কিছু মানুষের মাঝে নিজের চলে যাবার এত হাহাকার রেখে গেছে যে লোক, তার শাস্তি কোথায়?-“জয় ভাই? আমি কিন্তু একটুও সহ্য কইরব না এইসব। আপনে কইছিলেন পলাতক হইলে তারপর দ্যাশের বাইরে দেখা হবে। আমি তাই সেই আশায়

সঙ্গ ছাড়ছি। আইজ কিন্তু কথার হেরফের হইছে ভাই। এইটা মানবোই না আমি। নাহ্! এই তো কথা আছিল না। আপনে কইলেন যা কবীর, আমি আসতেছি। আপনে যাইবেন না? আইজ আর আপনেরে ছাইড়া যাইতাম না। আবার ফাঁকি মারবেন আপনে জানি আমি। চলেন আমার সাথে চলেন। একসাথে যাব। এত পুলিশের সামনে পড়ছেন কেমনে? আপনে আমারে কথা দিয়া কথা রাখবেন না এইডা হইতো না। ওঠেন ওঠেন ওঠেন। এত রক্ত কীসের? ভাবী, এত রক্ত কার রক্ত? উঠে না ক্যান ওয়? আপনে কিছু কন কইলাম।

আপনের কথা শুনে। কন কিছু। কন যে কইবরায় ডাকে।''

অন্তূ জয়কে দেখে। কী মিছে আশ্বাস সবার! তার কথা নাকি জয় আমির শোনে। সে কত অনুরোধ, কত প্রচেষ্টা করেছে কিছু প্রাণ বাঁচাতে, তাদের সঙ্গে পাপীষ্ঠ জয় আমির কী করে এসেছে কে জানে! সে যে এতবার থামতে বলল, জয় আমির কি থেমেছে? বরং নিজের পরিকল্পনামতো ঠিক আত্মহত্যার দিকে এগিয়ে গেছে সুকৌশলে, তবু পাপ থেকে ফেরেনি।চোখের ভাষায় জয়কে ডাকে, 'বাঃ রে! সবার দেখছি কত কত আবদার, আবেদন আপনার কাছে। আমার নেই কেবল। আপনার

কাছে শুধু আমারই কিছু চাওয়া-পাওয়ার ছিল না দেখছি। বেশ তো! যা চেয়েছি তা দেবেন না বলে পালালেন কত রঙ্গ-কৌশল। একটা পাপ-বিরতির জীবন, একটি বন্দিত্বের প্রায়শ্চিত্য.... অসম্ভব আবদার রেখে সবার থেকে আলাদা হলাম। সবার মতো আবদার প্রকাশ করে কাঁদতে পারছি না। আমার-আপনার ছিলই বা কী, জয় আমির? একটি অসম্পর্ক, একটা বিরোধ, তথাকথিত বৈধ একটি পরিচয়! তার ভিত্তিতে কী-ই বা চাইবার থাকতে আছে আপনার কাছে, বলুন তো! এক জীবনে কারও মেয়ে, বোন ও কিছু বন্দির কান্ডারী হতে গিয়ে স্ত্রী ও মা হওয়া

হলো না। একটি বাপ, ভাই ও কিছু বন্দির দায়ে সন্তান ও স্বা....'

অন্তূ থামে। খানিকক্ষণ জয়কে দেখে। ঝিরঝির করে বৃষ্টি ঝরছে শ্যামলা মুখটার ওপর। বিগতদিনে বেড়ে ওঠা দাড়ি-গোফ চুইয়ে পানি পড়ছে। অন্তূ শুধায়,-'আপনি কে? আমার কে আপনি? স্বামী হবার যোগ্যতা কি আছে আপনার? একটা আমজাদ আলী প্রামাণিকের মতো পুরুষ আমি চেয়েছিলাম আপনার স্থলে। এলেন আপনি। দাবানলের আগুনের মতো দাউদাউ করে জ্বললেন, জ্বালালেন–আজ যখন নিভেছে আপনার শিখা, চারপাশে তাকালে দেখছি কেবল বন উজাড়

ছাই, তছনছ হওয়া বিদ্ধস্ত প্রকৃতি। কোথাও একফোঁটা জীবন নেই, কেবল দহনের ধোঁয়া! কেন এসেছিলেন আমার জীবনে? আমি তো চাইনি, কস্মিনকালেও আপনার মতো নোংরা পুরুষকে চাইনি। অন্তূরা কখনও আপনাদেরকে চায় না। তবু এলেন– পোড়ালেন, চলে গেলেন। এ আপনার সেচ্ছাচারিতা নাকি আমার নিয়তি?এলেন যখন, জীবনটা গুছিয়ে নিলেও হতো! আমার তো বাপ নেই, তিন কবুল পড়ার পর আপনার কি কর্তব্য ছিল না আমার এক জীবন কাধে বয়ে দেবার? অথচ আপনি আমার রুহ্ অবধি পুড়িয়ে ছাই করেছেন

দিনের পর দিন। কারণ কবুলের মর্যাদা আপনি বোঝেন না, পাপীষ্ঠ! এত অসহায় হয়ে এক নারীজীবন কী করে পাড়ি দেব একটাবার জিজ্ঞেস করেছেন? জিজ্ঞেস করেছেন, বাপ হারিয়ে অন্তূ কত অসহায় হয়ে পড়েছিল! কখনও কান বাঁধিয়ে অন্তূর বুকের নিঃশব্দ আত্মচিৎকার শুনেছেন? আপনি শুধু আরমিণকে দেখেছেন। বিয়ের পর তথাকথিত স্বামী হিসেবে কথা ছিল আপনাকে অবলম্বন করে দাঁড়ানোর। অন্তূর বুকটা যে আজ হু হু করে কেঁদে উঠল! জয় আমিরটা দেখল না এই অন্তূকে। দেখলে অবাক হয়ে যেত। আফসোসে আরেকবার মৃত্যুকে বরণ করতো

কি!?-‘কিন্তু আপনি স্বামী হলেন না, আপনি হলেন জয় আমির। এত পাপ, এত নিষ্ঠুরতা! কোনোদিন শুধালেন না, এসব দেখে ব্যথা পাও? কোনোদিন জানতে চাইলেন না, আমার কাঠিন্যের নিচে নারীত্বের স্তর কতটুকু পুরু! কারণ আপনি নাকি আমার কান্না দেখেননি! তাতে বড় আফসোস আপনার। তাহাজ্জদে বসে মালিকের কাছে কেঁদে মাতাল হয়ে আপনার ঘরে ফেরার সময় হবার আগেই কঠিন হয়ে বসে থেকেছি, আপনিও সমস্ত সীমা পেরিয়ে পাপ করে গেলেন। সেই সুবাদে ভেতরের নারী অন্তূকে হারিয়ে আমি হলাম কেবল একজন হবু-আইনজীবী। তাই

আপনিও কেবল আমজাদ আলীর প্রামাণিকের প্রতিবাদী অন্তূকে দেখলেন, উকিল হবার স্বপ্ন দেখা ন্যায়বিচারপ্রবণ আরমিণকে দেখলেন। জয় আমির, আপনি আমায় দেখেছেন কোনোদিন? যে মেয়েটা একটু একটু করে নারীজীবনের সমস্ত শখ-আহ্লাদের গলা কেটে কিছু প্রাণ বাঁচাতে আপনাদের সাথে লড়াই করে গেছে, শেষে না সেই প্রাণগুলো বেঁচেছে, না সে নিজে। আমার বয়স কত? চব্বিশ? বুড়ি হয়ে গেছি আমি? বলুন না! আপনি এমন এক বৈধ পুরুষ আমার, যে হয় যাবে কারাবাসে, নয় নরকবাসে। আর এ দুটোর কোথাও না গেলে অবাধ পাপাচারে। যেখানে

শুধু নিরীহর রক্ত, ক্ষমতার দাপট ও ত্রাস! কোথাও তাকে নিয়ে সুস্থ সংসারের অপশন নেই। অথচ এই নারীজীবনে স্বামীর জায়গার দখলদারীত্ব সেই পাপীষ্ঠ পুরুষটির। কোনোদিন জিজ্ঞেস করেছেন, এই জীবনের নারীত্বকে বিসর্জন দিতে আমার কলিজা থেকে কতটুকু রক্ত ঝরে গেছিল? সেই ব্যথার তীব্রতা কতখানি ধারণা করতে পারেন? নারী হয়ে জন্মে নারীত্বকে বর্জন...অথচ আপনি জয় আমির না হলে আমার একটা সংসার হতো, আমার সন্তান আমার গর্ভে থাকতো, আমার একটা জীবন হতো, একজন স্ত্রী ও মা আমি হতাম। সব কেড়ে নিয়েছেন। জবাব দিন–

যখন এলেনই, কেন জয় আমির হয়ে এলেন? যে আপনি জয় আমির, সে কেন আমায় তিন কবুলে বাঁধলেন? আজ সেই আপনি যে স্বার্থপরের মতো পালালেন, আমি কোথায়, কার কাছে যাব? আমার আছে কে? আমার আশ্রয় কোথায়? আপনি কারাগারে যেতেন, তখনও আমাকে আমার সন্তান পিতার পরিচয়হীনতায় মানুষ করতে হতো, কারণ আপনার মতো পাপীর সন্তান হওয়া কোনো সন্তানের জন্য শুধুই লাঞ্ছনার। যেভাবে আপনি মানুষ হয়েছেন, আপনার মতো সেই একই জীবন আমার সন্তানও পেত, শুধু প্রেক্ষাপট ভিন্ন। কেন? আপনাকে কেন কারাবাসেই

যেতে হবে? এত পাপ কেন লেগে থাকবে আপনার হাতে? ঠিক আছে থাকল। আমি তার জবাবদিহি চাইতাম না। কিন্তু আমার জীবন নষ্ট কেনোওওওওওও করেছেএএন.... আপনার মতো জাহিলের স্ত্রী কেন হতে হয়েছে আমাকে?আপনি আমার কাগজকলমের স্বামী, হৃদয়ে কতটুকু কেমন–জিজ্ঞেস করেছেন কখনও? জিজ্ঞেস করলে হয়ত বলতাম, 'আপনি একটি সূচের বিষমাখা সরু প্রান্ত, যা আমার হৃদয়কে প্রতিক্ষণে খুঁচিয়ে রক্তাক্ত ও ক্ষত-বিক্ষত করেছে।' তা শোনার পর কি স্বামী হবার চেষ্টা করতেন? তবু ক্ষমা পেতেন না। আমি ভুল ছিলাম। আমি

আপনাকে ক্ষমা করতে পারিনি। যদি আপনার শাস্তি মৃত্যু হয় তো আমি ক্ষমা করেছি আপনাকে। কিন্তু অন্তূর ইজ্জত, আমজাদ প্রামাণিকের প্রাণ ও পরিবারের জীবনের ঋণ তোলা রইল।এত হিসেব গড়মিল রেখে বর্বর শুয়ে থাকা পাপী পুরুষ, আপনি আমার স্বামী নন। আপনি আমার আসামী, দূর্ভাগ্যবশত আমার সন্তানের বাপ। আপনার কাছে আমার কিছু চাইবার নেই। এ বিরোধ মিটল না, আপনি শর্ত ছেড়ে পালালেন। কিন্তু যে আরমিণের আপনার কাছে কিচ্ছু চাইবার নেই, সেই আরমিণ আজ মিটে গেল। আজ থেকে সে কেবল একজন পাপীষ্ঠ বাপের পাপের

প্রায়শ্চিত্যে অকালে প্রাণ দেয়া সন্তানের মা।
মাহেজাবিণ আমির।”

যেদিন এই লোক অন্তূকে পলাশের কাছ থেকে বাঁচিয়ে আনলো। অন্তূ কৃতজ্ঞতাটুকু জমিয়ে রেখেছিল। আমজাদ সাহেব তাকে কৃতজ্ঞতা শিখিয়েছেন। পরেরবার দেখা হলে মিটিয়ে দিতো বোধহয়। হয়ত একটু ইতস্তত করে গম্ভীর গলায় বলতো, ‘ধন্যবাদ, জয় আমির। তখন মানসিক অবস্থা ভীষণ খারাপ ছিল। আমার উচিত হয়নি থুতু দেয়া। একটা সত্যি কথা বলি? বিশ্বাস করবেন? আমি মিথ্যা বলি না। থুতুটুকু পলাশের জন্য বরাদ্দ ছিল। তা আপনাকে দিয়ে বসেছি। আমি আপনার

ছোট বোনের মতো। আমার বড় ভাই আমাকে ওই পরিস্থিতিতে ঠেলে দিয়েছে, আর আপনি আমার বড়ভাইয়ের মতো কাজ করে আমায় বাঁচিয়ে এনেছেন। সিনিয়র আপনি। আমি ছোট মানুষ। ভুল হয়েছে আমার।'কিন্তু এরপর? এই ক্ষমা চাইবার পর জয় আমিরের প্রতিক্রিয়া কেমন হতো জানা নেই। কিন্তু অন্তূ জানতো না, ইতোমধ্যে তার সঙ্গে এর চেয়েও খারাপ কিছু করবার পরিকল্পনা জয় আমির ও হামজা করে রেখেছিল। হয় পলাশের রূফটপ নয়ত ক্লাবঘরের দোতলা। কিন্তু জয় আমির মাঝখানে থুতুর বদলা নিতে গিয়ে ঘটনা বদলে দিলো। অন্তূর জীবনটা কেড়ে নিলো

নোংরা ছলনার কৌশলে। অথচ লোকটা তাকে বারবার ছলনাময়ী ডেকে গেছে। যে কিনা নিজে ছলনায় মেরেছে অন্তূকে!জয় আমির যখন ঘুমাতো, অন্তূ কোনোদিন নজর বুলিয়ে দেখেনি। ইচ্ছে বা রুচি হয়নি। আজ দ্বিতীয়বারের মতো দেখল। বুক থেকে রক্ত চুইয়ে বৃষ্টির পানির সাথে ধুয়ে যাচ্ছে। মুখে একরত্তি ব্যথার লক্ষণ ফুটে ওঠেনি, ঠোঁটদুটো এখনও হাসছে, যে হাসিটা তার ঠোঁটে চিরস্থায়ী। অন্তূ আবার অবিশ্বাসে পড়ে, এই লোক উঠে এসে গা ঘেঁষবে না? অন্তূর যে কী হলো আজ! আজ তার ভেতরে বড্ড নারীত্বের লাফালাফি সে টের পেল। সে আজ এক

মুহুর্তের জন্য সদ্য বিধবা হয়ে উঠল। জয় আমিরকে তার ছুঁতে ইচ্ছে করল। তার দেখতে ইচ্ছে করল আগ্নেয়াস্ত্র থেকে ছুটে আসা বুলেট ওই পাষাণ বুকে কেমন ক্ষত তৈরি করেছে।

জয় আমিরের একটি আকাঙ্ক্ষিত আবদার ছিল। সে রুমে ঢুকেই অন্তূকে বলতো, 'শার্টটা খুলে দাও তো, ঘরওয়ালি!'

অন্তূ দেয়নি কক্ষনো। আজ সে জয় আমিরের বুকের ক্ষত দেখতে আলগোছে শার্টের বোতামগুলো খুলে আলগা করল। রক্ত জমাট বেঁধে ক্ষতর মুখ বুজে গেছে। থোকা থোকা রক্তের চাপ বুকের ওপর, সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে

তিরতির করে রক্তের ধারা বয়ে এসে বৃষ্টির পানির সাথে মাটিতে মিশে যাচ্ছে। এই রক্তে হামজার ভাগ আছে। কত অংশ হামজার সেটা জানা নেই।হামজাকে কনস্টেবল জানায়, “ও হামজা সাব, জয় আমির ক্রসে গেছে...” হামজার দম বন্ধ হয়, চেয়ারের ওপর গা ছেড়ে দেয়। কেমন মৃত পথযাত্রীর মতো সীমাহীন পিপাসায় যেন একটা ঢোক গিলল সে কোনোরকম। ঘেমে গেছে শরীর। তারপর মুহুর্তের মধ্যে গলা টিপে পায়ের তলে করে কনস্টেবলকে, “আরেকবার বল কথাটা। উচ্চারণ কর, খানকির চ্যাংরা। তোর জিহ্বা ছিঁড়ে চিবিয়ে খাবো...তোর আইনের মায়রে

কেমনে চু÷দ<তে হয়, খালি একটাবার...
''কয়েকজন মিলে অসুস্থ হামজাকে ছাড়াতে পারে না যতক্ষণ না হামজার স্নায়ু শিথিল হয়ে সে হুড়মুড় করে পড়ে গেল মাটিতে। মৃগী রোগীর মতো কাঁপতে লাগল শরীর। শ্বাস-প্রশ্বাস হাঁপানি রোগীদের মতো। জয় কোথায়?
জয়ের গোসল হচ্ছে। সেই শেষরাত থেকে সে ভিজছে রক্ত ও পানিতে একাকার হয়ে। আমির নিবাসের ভিটায় একুশ বছর পর তার আবার গোসল হলো। এতক্ষণ সে ভেজা ঘাসে শুয়ে ছিল। এখন তার জন্য একখানা খাটিয়া এসেছে। তাকে সেখানে শোয়ানো

হলো। এবারের গোসল শেষে হুমায়িরা দাবরে ধরে পোশাক পরিয়ে দিলো না। কারণ জয় আজ ছুটছে না। তাই কয়েকজন মৌলবি মিলে তার ক্ষত-বিক্ষত দেহটা সাদা ধবধবে পাঁচ টুকরো কাপড়ে মুড়ল। মৌলবিরা জানে না জয় বেঁচে থাকলে ওই মৌলবিদের জানের ঝুঁকি ছিল।

অন্তূ দেখল আমজাদ সাহেবের শেষ গোসলের দৃশ্য। এবার সে কেঁদে উঠল। তার কেন যেন মনে হচ্ছে, এবার শেষবারের মতো সে হারালো, আজ গিয়ে সে চির একলা হলো, আজ সে এমন এক নারী হলো যার আগে-পিছে শুধু। আজ সে ফ্রন্টইয়ার্ডের গোল

পিলারের সাথে হেলান দিয়ে নিশ্চুপ বসে থাকা দর্শক। নাকে ভুরভুর করে ঢুকছে কর্পূর, গোলাপজল, সুরমার গন্ধ! সেই গন্ধের সাথে আমজাদ সাহেবের শরীরের গন্ধ মিশে একাকার! অন্তূ আবেশে চোখ বুজে নিলো।

অনুমতি-সাপেক্ষে বন্দি হামজাকে আনা হলো আমির নিবাসে। দুপুরের গড়িয়েছে তখন। গুড়োবৃষ্টি ঝরছে, গায়ে না লাগার মতো। কিন্তু আকাশে ঘন কালো কুটকুটে মেঘ। আকাশের দুঃখ কমছে না।

হামজা পুলিশভ্যান থেকে নেমে বিভ্রান্ত হলো। এত লোক আর আমির নিবাস! পা জমে গেল মাটিতে। তবু সেই ভারী পা টেনে হামজা

জয়ের সামনে পৌঁছাল, কিন্তু আর শরীর ভর রাখতে পারল না, পড়ে গেল মাটিতে। জয় শুয়ে আছে খাটিয়ায়। নাকে দুটো তুলো গোজা। কী আশ্চর্য স্বপ্ন! তুলোদুটো লাল হয়েছে। হামজা আস্তে কোরে সেই দুটো খুলে নিলো। কী বিশ্রী লাগছে তুলো নাকে। শ্বাস নিতে দেবে না নাকি এই মৌলবিরা? নাক দিয়ে নালির মতো সরু ধারায় রক্ত আসছে। হামজা মনোযোগ মেলে দেখে সেই রক্তের ধারা। কী শান্ত সেই ধারা, গাঢ় লাল-খয়েরী রক্তের বর্ণ! ধীরে ধীরে জয়ের দাড়ি ও গাল চুইয়ে থুতনি ছুঁচ্ছে। হামজা তাই তার অবশ হাতখানা এগিয়ে রক্তগুলো আঙুলের ডগায়

মুছে নেয়।জয়ের কী হয়েছে সে বুঝতে পারছে না। বোঝার জন্য সে আস্তে আস্তে জয়ের বুকের ওপরের কাফন সরালো। কী বিশ্রী দেখতে দুটো জখম, আরেকটু নিচে নামলে হামজা আরেকটা দেখতে পেত। হামজার হাতদুটো তড়িতাহত রোগীর মতো ঝিরঝির করে কাঁপে। সে ঝুঁকে ছিল জয়ের মুখের ওপর, আর সামান্য ঝুঁকে কপালে একটা চুমু খেল। জয়কে একটু বুঝিয়ে বলা দরকার, নয়ত বুঝবে না জয়, খুব অবাধ্য সে। সে তার কম্পিত শক্ত হাতদুটো দিয়ে জয়ের মুখটা আলতো করে হাত বুলিয়ে দেয়। নেড়েচেড়ে দেখে জয়ের ঠান্ডা হয়ে মুখটা।

-"শোন জয়! তোকে বলা হয়নি। আমার শরীরটা ভালো না। খুব শিগগির প্যারালাইজড হয়ে যাচ্ছি আমি। তুই শুনে কষ্ট পাস না। এজন্যই চেয়েছিলাম তুই চলে যা, তারপর আমি যাব। একসাথে চিকিৎসা আর নিরাপত্তা দুইটাই নিশ্চিত হবে। আমার আজকাল রাতে ভুলভাল স্বপ্ন আসে। আজও আসছে। আমি দেখছি তুই পালাসনি। যে আমির নিবাসের শিকারী ভিটে থেকে তোকে আঠারো বছর ধরে দূরে রেখেছি, তুই বরং আমার অবাধ্য হয়ে সেখানে গেছিস। তারপর তো জানিস ওখানে কী কী হয়। এসব স্বপ্নের কোনো মানে নেই, আমি জানি।"আবার ঝিরঝিরে

বৃষ্টি নামল, হামজা থামল, থমকালো। জয় শুয়ে আছে। বিকেল হয়ে আসছে। আজকের ঘুমটা কেমন জয়ের? সে চোখের সবটুকু তৃষ্ণা মিটিয়ে জয়কে দেখল। তার ঘোলা চোখে জয়ের দাড়ি-গোফের জোয়ান মুখটা ঝাপসা হয়ে আসে। সে দেখে একটি কিশোরকে। হুমায়িরার ছেলে। বয়স দশ। যার পেট ভরানোর জন্য হামজার দু'মুঠো খাবার জোগাড় করা খুব জরুরী। জয়কে একটা স্কুলে ভর্তি করাতে হবে। আমির নিবাস থেকে দূরে রাখতে হবে। হামজাকে ছুটতে হবে, খুব ছুটতে হবে। এই দিন দূর করতে হবে, প্রতিশোধ নিতে হবে। জয়কে

সাথে নিয়ে অনেকখানি ছুটতে হবে।হামজা ডেকে উঠল, “জয়! শোন আমার কথা। একটাবার শোন। আমি তোর সব কথা মেনে নেব। তোর সন্তানকে মেরেছি না? তুই চাইলে আমি শরীরের ততখানি মাংস কেটে নিবি, শোধ যাবে। নাকি তবু হবে না? কী চাস তাহলে? রক্ত চাস? দেব। তাকা তুই। একটু হাস, ভাই বলে ডাক। আমি সত্যি মরে যাব। আমি অসুস্থ, বুঝলি! এক্সিডেন্টটা সিরিয়াস মামলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্পাইনাল কর্ডে ঠাপ খেয়েছি। বেশিদিন বাঁচব না মনেহয়। তোকেই তো সব সামলাতে হবে তারপর। বুঝে নিতে হবে এখন থেকেই সব। আমি

মরলে তুই কাঁদিস না। আমি তোর সন্তান মেরেছি। ওইজন্যই তো বলছি, তুই কিন্তু পুরোনো হামজাকে পাসনি, জয়। আজ আমার ভেতরে এক তিল পরিমাণ শক্তি নেই। তবে আমার মনেহয় এত বড় পাপ আমি আমি করিনি যার শাস্তি হিসেবে আমি তোকে এভাবে দেখব। আমার হাতে গড়া তুই। আমার সামনে দিয়ে চলে যাবি কী রে! আমার অধিকার নাই? এই তোর যে বুকে গুলি চলেছে, ওই বুক প্রসস্থ করতে আমার বুক ক্ষয় গেছে। এত সহজ নাকি, হ্যাঁ? ওই যে রক্ত ওখানে দলা ধরে পড়ে আছে, ওই রক্ত কার? এই ভিটা আর রক্তের সাথে তোর

লেনদেন কবে চুকে গেছে। ওই রক্ত আমার। তোর রক্ত-মাংস সব আমার দান। সেই রক্ত তোর এই নেমোকহারাম ভিটায় বিসর্জন যাবে, আমি মেনে নেব না। ওঠ, কোর্টের তারিখ আছে সামনে। এবার পালানো হলো না। কিছুদিন জেল খাটা লাগবে এবার। চল, ওঠ।''হামজা আচমকা তীরবিদ্ধ পশুর মতো গর্জন করে উঠল, "ওঠ শুয়োরের বাচ্চা। বেইমানের বাচ্চা। জীবন দিলাম আমি, পালন করলাম আমি, সেই জান তুই হেলায় দান করছিস বাপের ভিটায়? জানোয়ারের বাচ্চা তোর বাপের ভিটার অধিকার আছে তোর ওপর? তোকে মানা করিনি এখানে আসবি

না? তোকে দেড় যুগ ভুলিয়ে রাখলাম, শিখালাম এই ভিটা তোর না, তোর না, তোর না। তোর কাল আছে, তোর মরণ আছে এখানে। তুই আমার অবাধ্য হলি কীতআ থআমআকরে? তোকে আটকাতে পারলাম না আমি। পাসপোর্ট কোথায়, হারামজাদা? কেন এসেছিস এখানে? জবাব দে, তাকা জয়। কেন এসেছিস? কথা বল, কথা বল, কথা বল...''হামজার দম আটকে এলো। সে একটু শ্বাসের আশায় আকাশের দিকে তাকায়। আহত জানোয়ারের মতো ভোঁতা গোঙানি বের হয় গলা দিয়ে। সে কাঁদতে জানে না। অথচ চোখ আজ পাগল হয়েছে তার। বুকের

মাঝখানে দুটো আঙুল গেড়ে বারবার ঘষতে লাগল। বৃষ্টিটা তার উপকারে এলো। বৃষ্টির পানির সাথে ঝুপুঝপ করে যে কত ফোটা নোনাজলও জয়ের মুখের ওপর পড়ল, জনগণ টের পেল না। মাটি খামচে ধরে খাটিয়ার পাশে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে রইল ক্ষণকাল। কোন উপায়ে সে বিশ্বাস করবে কথাটা? এসব মিথ্যা আয়োজন কখনোই যথেষ্ট নয় তাকে বিশ্বাস করাতে যে জয় নেই...জয় নেই মানে কী? বাক্যটাই বেমামান।

না আর ভাবা যাচ্ছে না। আশ্চর্যজনকভাবে তার গোটা শরীরে মুহুর্তের মধ্যে খিঁচুনি উঠে গেল। ডাক্তাররা বলবে এটা হলো

সাইকোজেনিক নন-এপিলেপটিক সেইজ্যর্স।
সে দুই হাতে ঘাস খামচে ধরে নিজেকে সামলানোর ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে গেল কিছুক্ষণ।
আবার পালা এলো জয়কে ডাকাডাকির।
এক্ষুনি উঠবে জয়। কবীর এসে পাশে বসে, কবীবের শরীর থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। বদ্ধ উন্মাদের মতো দেখতে লাগে তাকে। সে হামজাকে সামলানোর অবস্থায় নেই। কবীর ঘাসের ওপর উদ্ভ্রান্তের মতো বসে থাকে। সে বিশ্বাস করার চেষ্টায় আছে, জয় ভাই নেই।
নেই মানে কী? কোথায় গেছে?
যায়নি, যাবে। সেই মৃতের খাটিয়া থেকে জয়কে দুইহাতে বাহুতে আঁকড়ে বুকের সাথে

আষ্ঠেপৃষ্টে জড়িয়ে নিলো। পারলে এই মুহুর্তে বুকের ভেতরে লুকিয়ে ফেলা উচিত জয়কে। কারণ মৌলবিরা হিংসুক নজরে দেখছে, নিয়ে যাবার পরিকল্পনা করছে জয়কে। সে জয়কে বুকের সাথে চেপে ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে আহত জানোয়ারের মতো এক আর্তনাদ করে উঠল, যে চিৎকার উপস্থিত জনতার পশম শিউরে তোলে।

কতক্ষণ ওভাবে বুকের সাথে মিশিয়ে চেপে ধরে রইল বলা যায় না। জয়ের নাক দিয়ে রক্ত আসছে, সেই রক্তে হামজার দেহ মেখে উঠল। আস্তে আস্তে হামজার শরীরের প্রতিটা কোষ শিথিল হয়ে এলো। খিঁচুনি ভয়াবহ রূপ

নিলো। জয়কে ছাড়িয়ে নেয়া তবু মুশকিল তার কাছ থেকে। কিন্তু তার হাতের স্নায়ুকোষ কথা শুনল না। দেহটা মাটির ওপর গলাকাটা মুরগীর মতো ছটফট করে লাফাতে লাগল। তুলির মেয়েটা কাঁদল এবার। মামা কাঁদছে, জয় শুয়ে আছে। এতক্ষণ ধরে কাঁদল, জয় উঠল না। তার মানে গুরুতর ব্যাপার। সে গিয়ে তার কচি কচি ছোট ছোট হাত জয়ের মুখে বুলিয়ে দিলো। রক্ত লেগে গেল তার কচি হাতেও। সে ফুপাতে ফুপাতে ডাকে, "জয়! ওথো না কেন? মামা দাকছে যে। ওথো জয়। আমরা দেখো নতুন একতা দায়গায় এছেছি। একতু ঘুরতে নিয়ে দাবে

কি? ওথো না, জয়...তুমি শুয়ে থেকো পরে বাছায় গিয়ে। এখুন ওথো।''

তুলি সরিয়ে নিলো। তাতে কান্নার বেগ বাড়ল কোয়েলের। সে যাবে না জয়ের কাছ থেকে। কী বুঝল সে কে জানে। সে যেন বুঝতে পেরেছে, তারা দূরে গেলেই জয়কে সরিয়ে নেয়া হবে।অন্তূর হাঁটতে সমস্যা। তার জননদ্বার তখনও লাল তরলে সিক্ত, যেমনটা জয় আমিরের বুক। কয়েকজন স্থানীয় মহিলা জয়ের বউকে ধরে এনে খাটিয়ার পাশে বসায়। অন্তূও ঠিক হামজার মতো একইভাবে কেবল চোখ ভরে দেখে জয়কে। কিছু বলার নেই তাদের। শুধু বিশ্বাস করার হিসেব

মেলানোর আছে, কী ঘটে গেছে! একজন জানের সঙ্গী, আরেকজন জানের দুশমন, অথচ দুজনের কাছে জয় সবচেয়ে জটিল বন্ধনে বাঁধা।

অন্তূর হাতের মুঠোয় তখন জয়ের ব্যবহৃত গলার শিকল আকৃতির লকেটওয়ালা চেইন, ব্ল্যাক টাংস্টেনের আংটি, রূপার রিস্টলেট। সেসব জয়ের দেহ থেকে খুলে নিয়ে তার স্ত্রীর হাতে দেয়া হয়েছে। সে হাতের মুঠোয় চেপে ধরে ওগুলোকে অনুভব করে। কঠিন ধাতব জিনিসগুলোতে জয় জয় রব।অন্তূ জয়ের ওপর ঝুঁকে বসে। অন্তূকে অবাক করে টুপ করে এক ফোটা চোখের পানি জয়ের গালের

ওপর পড়ে। অন্তূ বিস্ময়ে পড়ে, “যেদিন আব্বুকে এভাবে দেখেছি, সেদিন মনে হয়েছিল আপনাকে এভাবে দেখলে আমি হাসব। অথচ হাসছি না আমি। আজ খুশির দিন হবার ছিল আমার, খুশি নই আমি। আমার হিংসে হচ্ছে আপনার ওপর। আজ আজাদ হলেন আপনি। কয়েদী আমি হলাম। আমার আসামী মুক্ত হয়ে গেল। আমার-তার লড়াই ফুরিয়ে গেল। আমার ভীষণ কান্না পাচ্ছে। আপনি দেখবেন না আমার কান্না? আমার বুক ভেঙেচুড়ে কান্না পাচ্ছে। এই জীবন খুব ভার হবে। আমার কাঁধে ব্যথা অনুভূত হচ্ছে....সব দায় আপনার, জয়

আমির।''ঝুপঝুপ করে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে অন্তূ কথাগুলো বলে। তার কণ্ঠস্বর কী যে সুন্দর শুনতে লাগে—

“আখিরাতে দেখা হলে এই বিরোধের খাতা আমি আবার খুলব। ততদিন মুলতুবী রইল।''

অন্তূ ডুকরে কেঁদে উঠল। সে বসেই রইল। একসময় তাদের পাশ কাটিয়ে একদল খাটিয়া তুলে নিয়ে চলে যায়। জয় আমির নিজের পরিচয়, ভিটে-মাটি ও পেছনে একজন হামজাকে মাটিতে ছটফট করা অবস্থায় ফেলে দিব্যি চার পায়া খাটিয়ায় চড়ে কোথাও চলেছে। তার পাপ তার আগে আগে পা বাড়িয়েছে। সেটা অদৃশ্য বলে দেখা গেল না।

মালিকের কাছে পাপের হিসেব আজ সবকিছুর আগে। সেখানে মায়া থাকবে না, স্মৃতি অথবা মানবিকতা নয়, থাকবে শুধু ঘুটঘুটে অন্ধকার ও হিসেবের খাতা। প্রতিটা পাপ-পূণ্যের হিসেব দিতে জয় আমির ঘটা করে এগিয়ে গেল অনন্তে...যাযাবর জীবনযাপনকারী পাপীষ্ঠ জয় আমিরের স্থায়ী ঠিকানা হলো এতদিনে। তার ঠিকানা হলো পূর্বপুরুষদের পুরোনো গোরস্থান। ঘোড়াহাটের কেন্দ্রীয় কবরস্থান। এই ঠিকানায় দাখিল হবার পর হয়ত আজ জয় আমির কথা বললে কেবল গলা ছেড়ে বলতো,

গুরু ঘর বানাইলা কী দিয়া, দরজা-জানলা কিছু নাই....জয় আমির কবরে শায়িত হবার সাথে সাথে তাকে সর্বাধিক ভালোবাসা ও ঘৃণাকারী দুজন হাসপাতালের বেডে শায়িত হলো। মাহেজাবিণকে রিমি ও কবীর টেনেটুনে জোরপূর্বক ভর্তি করালো।

রিমির কত অভিমান জমেছে, তা জানে আরমিণ? সেই অভিমান নাকের ডগায় রেখে রিমি অভিযোগ করে, "একাটাবার আমায় অন্তত বলতে পারতেন, আপনার পেটে সন্তান। এটুকু বিশ্বাস করা যায় না, না? আমি খুব খারাপ মহিলা, হ্যাঁ? আপনার এইটুকু

ব্যাপার জানার যোগ্যতা আর অধিকার নেই আমার…''

মাহেজাবিণ রিমির হাতদুটো হাতের মুঠোয় জড়িয়ে ধরল, "রিমি, রিমি! শুনুন আমার কথা। আপনি পতিভক্তা, সরলা নারী। যদি ফাঁস হয়ে যেত একথা! জানেন এই ভয়ে কতরাত রবের কাছে কেঁদেছি আমার পেটটা যেন উঁচু অবধি না হয়, আমার যেন বমি না হয়, আমি যেন দূর্বল না হই… যতদিন পাপীরা বন্দিত্বে না যাচ্ছে।''

রিমি কেঁদে ফেলল।দিনকয়েক অবজার্ভেশনের পর ডাক্তারেরা হামজার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার একটি লম্বা ফিরিস্তি দিলেন।

এক্সিডেন্টের ফলে হামজার মেরুদণ্ডের স্পায়নাল কর্ডে যে ভয়াবহ ক্ষতিটা হয়েছিল, তাতে হামজার শরীর ধীরে ধীরে প্যারালাইজেশনে যাচ্ছিল। কিন্তু এর মাঝে তার মস্তিষ্ক অসহনীয় পর্যায়ে, নিউরোজেনিক শক পেয়েছে। তাতে প্রথমে ব্লাডপ্রেশার লো হয়েছে, সেক্ষেত্রে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুরজ্জুতে অক্সিজেন যাতায়াত কমেছে। কর্টিসলের মাত্রা বাড়ায় নিউরোটক্সিক-কন্ডিশন তৈরি হয়ে স্নায়ুসংযোগ নষ্ট হয়ে গেছে পুরোপুরি। তাদের অবজারভেশন তাদেরকে হামজার মোটর নিউরন ধ্বংসের বার্তাও দিয়েছে। এসব বর্ণনা রোগীর লোককে দেয়া হয় না। তারা বড়জোর

সবাইকে জানিয়ে হামজাকে তার জীবনের সবচেয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত একটি বস্তুর সাথে জুড়ে দিতে পারে। সেটা হলো হুইল চেয়ার। যেখানে হামজা এক জীবন পক্ষাঘাতে কাটাবে।কিন্তু হামজাকে কোন উপায়ে এই সাজা কবুল করানো যাবে? সে তো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে ফাঁসিতে ঝুলে পড়বে। এক জীবন পঙ্গু হয়ে সে বাঁচবে না, জয়কে ছাড়া বাঁচবে না, সে যে ক্ষমতা-প্রতিপত্তির পেছনে নিজেকে ক্ষয় করেছে, তা হারিয়ে সে বাঁচবে না। তার কাছে না বাঁচার অসংখ্য কারণ থাকতে সে বেঁচে থেকে ভয়াবহ জীবন পাড় করার মতো উন্মাদ নয়।সপ্তাহখানেক

পর হাসপাতালে কবীর এসেছি মাহেজাবিণের কাছে। তুলি ওই তো মেঝের ওপর বসে আছে দেয়ালে হেলান দিয়ে। কোয়েলের সাহস নেই মায়ের কাছে গিয়ে আহ্লাদ করার। তার কথা শোনার, সাথে খেলার, আহ্লাদ দেখার একটা লোক আজ কয়টাদিন ফাঁকিবাজি করছে খুব। হাসপাতালের বারান্দায় আজ কতগুলো দিন ধরে অপেক্ষা করে সে রোজ। জয়টা কী পরিমাণ বেয়াদব হয়েছে ভাবা যায়? বড়মামা হাসপাতালে, আরমিণ মামণি হাসপাতালে, অথচ বেয়াদব জয় একটাবার এলো না দেখতে। তার মায়ের মেজাজটা এত খারাপ হয়েছে! যেন কোয়েলকে চেনেই না!

আজ কয়টাদিন কবীর মামা তাকে খাওয়ায়, কবীর মামার কাছেই সে থাকছে, জয়ের কথা মনে পড়লে সে কবীর মামার গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করছে জয়ের কথা। কবীর মামা যে খুব ভালো কিছু করছে তা না। শুধু চেয়ে থাকছে কোয়েলের দিকে, মুখে একটুও হাসি নেই, কেমন চোখদুটো লাল হয়ে যায়, যেন কাঁদবে। মায়ের কাছে যেতে ভয় লাগে। কর্কশভাবে তাড়িয়ে দেয়, একা থাকতে চায়। কোয়েল খুব কষ্টে আছে। তার মনে আছে সেদিন সে জয়কে উঠিয়ে নিয়ে কিছু মানুষকে চলে যেতে দেখেছে। কোথায় নিয়ে গেছিল সেটা জানা হয়নি। মায়ের কাছে জিজ্ঞেস

করার অবস্থা নেই।তুলিকে দেখতে পাগলিনী লাগে। সে খায় না কিছু। মাথায় তেল-চিরুণী পড়েনি বহুদিন যেন, শরীরের দুধ-আলতা রঙে আলকাতরার ছোপ পড়েছে। সে একটি নোংরা বাপের অবৈধ মেয়ে। মানুষ হয়েছে বাপের সৎ মায়ের কাছে। ছোট বোনের মতো একটা তরু ছিল, চলে গেছে। বিয়ে হয়েছিল এক নষ্ট পুরুষের সাথে। তাকে তার ভাইয়ের মতো দেখতে হামজা খুন করেছে। তার বাপের বোনের ছেলে, আত্মীয় বলতে একটা জয় ছিল, তাকে তুলি সপ্তাহখানেক আগে চারপায়া পালকিতে চড়ে পালাতে দেখেছে। সবাই কি তুলির দায়ভার উঠানোর ভয়ে

এভাবে পালিয়ে যাচ্ছে? তার এখন এই মহাবিশ্বে কেউ নেই আর। সে একজনের আছে। তার মেয়ের মা সে। কিন্তু তার সাধ্যি নেই সেই মেয়ের ক্ষুধা নিবারণে এক ছটাক দুধ কিনে পান করানোর।কোয়েলকে ডেকে নিয়ে মাহেজাবিণ কোলে বসায়। প্রগাঢ় স্নেহে দুটো সিক্ত চুমু খায়। মাথায় হাত বুলায়। এক এতিম শিশুকন্যা, ঠিক তারই মতো। যার দুনিয়ায় আপন বলতে এক অসহায় মা ছাড়া কেউ নেই।

কবীরটা থুতনি বুকের সাথে ঠেকিয়ে খুব কাঁদল অন্তূর কাছে। ছেলে মানুষের কান্না অদ্ভুত এক দৃশ্য! অন্তূর মায়া হয়। এক

পাপীষ্ঠের জন্য এক যুবকের এই বুকভাঙা কান্নায় সে অবাক হয়। অদ্ভুত অনুভূতি হয় তার।

-"আমারে ক্ষমা করে দিয়েন, ভাবী। আমি সেইদিন জাইনলে আপনারে সাথে করে নিয়ে ম্যালাদূর পালাইতাম। আপনারে ওই বাড়িত রাখে যাইতাম না। আরও কত পাপ করছি, আমারে ক্ষমা কইরেন...আমার কত ভুল হইছে, কত অকাম না বুঝেই করছি, কষ্ট দিছি আপনারে.."

-"আপনি যা উল্লেখ করছেন সেগুলো আমার কাছে কোনো অপরাধ নয়। আপনি এটাই বা কেন ভাবছেন সেদিন আমি যেতাম আপনার

সাথে? কোথায় যেতাম? কাদের সাথে? আপনাদের পথে চলে সুরক্ষিত থাকার লোভ আমার ছিল কবে? একটা কথা বলুন তো!''কবীর মাথা তোলে।

-"আপনাদের মনে হয় আমি নিজের সাথে ঘটা অন্যায় মাথায় তুলে রেখে প্রতিশোধের নেশায় এতকিছু করলাম?''

কবীরের কাছে জবাব নেই।

মাহেজাবিণ মলিন হাসে, আনমনে, নিজমনে বলে, "আমি যেদিন বড়ঘরের বাচ্চাদেরকে দেখেছি, আমি একজন মুরসালীন মহানকে দেখেছি, আমার জীবন ও পরিস্থিতির ওপর থাকা সমস্ত ক্ষোভ পানি হয়ে গেছে। ধৈর্য

বেড়ে অসীম হবার পথে। আমি এক এমন পুরুষকে দেখেছি, যার জীবনের ত্যাগ-তিতিক্ষা, আদর্শ ও হারানোর সামনে আমার জীবনের ক্ষয় নেহাত তুচ্ছ। ওদেরকে দেখার পর থেকে আমি আর প্রতিশোধের কথা ভাবার ফুরসত পাইনি লজ্জায়। ছোট ছোট শিশুদের জীবনে যারা এমন দূর্ভোগ আনতে পারে, সেই তুলনায় আমার সাথে তারা কীইবা এমন করেছে!? আমি আপনার বড়ভাইদের কাছে কৃতজ্ঞ, আমাকে তুলনামূলক এত শান্তির জীবন দেবার জন্য। মুমতাহিণার তুলনায় আমি ভাগ্যবতী, মুরসালীন মহানের তুলনায়, তরু-রূপকথা আপা আর ছোট

বাচ্চাদের তুলনায়... আমার এরপরেও জীবনের প্রতি ক্ষোভ থাকলে আমি অকৃতজ্ঞদের দলে পড়ে যাব। আমার রব আমাকে অবশ্যই ভালোবাসেন। আমি কিছুই হারাইনি। তিনি যা আমানত আমায় দিয়েছিলেন, তিনিই কেড়ে নিয়েছেন। কিছুই তো আমার নয়!''কবীর মাথা তুললই না অনুতাপ ও দুঃখে ব্যাকুল হয়ে পাগলের মতো বারবার ফুঁপিয়ে নাক টানতে লাগল, "জয় ভাই মুরসালীন মহানরে মারে নাই।''

-"আর বাচ্চাদেরকে? ওদেরকেও কি মারেনি সে?'' মাহেজাবিণ যেন একটু সপ্রতিভ হয়।

-“আহাদরে জয় ভাই মারছে, সাথে আরও কয়ডারে...বাকি বাচ্চাগোরে এমপির কাছে দেয়া হইছিল। ওরা এহন গুম হইয়া গ্যাছে। নাই আর।”মাহেজাবিণ চোখ বোজে। মৃত মানুষটার ব্যাপারে আর ঘৃণিত সত্য শোনার শক্তি তার নেই। সে সত্যিই অনেক চেষ্টা করেছে জয় আমিরকে ক্ষমা করার। সে ব্যর্থ। বারবার যখন নিজের সাথে ঘটা সকল অন্যায়ের জন্য সাফ মনে জয় আমিরকে ক্ষমা করে দিতে সফল হয়েছে তখন তার এই পাপগুলো এসে তার চেয়েও বেশি ঘেন্না জড়ো করেছে বুকের ভেতরে। সে হাত

উচিয়ে ধরে থামায় কবীরকে। কবীর মুখটা নুইয়ে অপরাধী হয়ে বসে রইল। মাহেজাবিণের ভেতর থেকে ব্যথা সামান্য ঝাপসা হয়। কবীর তার ওপর যেন শুরু থেকে সদয় ছিল। তার মায়া হয় কবীরের ওপর। ইচ্ছে করে সান্ত্বণা দিতে। কিন্তু সে পারে না। তার মুখটা অন্তরের মতো নয়। নারকেল ভালো উদাহরণ তার ক্ষেত্রে। সে মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করে, “তার পাপ নিয়ে আপনার এত অপরাধবোধ!? কে আপনি জয় আমিরের? বন্ধু? সঙ্গী? আত্মার সম্পর্ক? কে? ”কেমন করে মাথা নাড়ে কবীর, “জানা নাই।

আমার জানা নাই।'' কবীর আবার কেমন কাতর হয়ে পড়ল এই প্রশ্নে।

মাহেজাবিণ তখন এক প্রশ্ন রাখে, "আপনি বিয়ে করেছেন, কবীর ভাই?''

কবীর তাকায় অন্তূর দিকে। নিজেকে সামলায়। তার বুকে শান্তি আনে অন্তূর ডাক। সে তাচ্ছিল্য করে ব্যথিত হাসে, "যে বিয়ে দিবে সেই তো ফাঁকি দিয়ে পালাইছে...''

-"তার ঘরওয়ালি হিসেবে আমি যদি দায়িত্বখানা নিই?''

কবীর বিশ্বাস করতে পারে না। তার আধভেজা চোখদুটো বিস্ময় ও প্রশান্তি-উল্লাসে চিকমিক করে ওঠে।

মাহেজাবিণ বলে, "একজন সুন্দরী অসহায় কনে আছে আমার হাতে। তার আছে তার চেয়েও সুন্দরী নিষ্পাপ এক শিশুমেয়ে। বলুন, কবুল?"কবীর বিভ্রান্ত হয়। কথা বলতে পারে না। তার বুক কাঁপে দুরুদুরু করে।

মাহেজাবিণ তুলির দিকে ইশারা করে, "দেখুন তো, পছন্দ হয়?"

কবীর একনজর তুলিকে দেখে। তার অস্থির লাগে। পাটোয়ারী বাড়ির মেয়ে! সবসময় সমীহের নজরে দেখা নারীকে সে হবু স্ত্রীর চোখে দেখতে গিয়ে থতমত খায়।

-"সেই লোক আপনাকেও বিয়ে দিতে চেয়েছিল, তাকেও। সে তো ভালো লোক ছিল

না! ছিল এক নম্বরের সুযোগসন্ধানী। সুযোগ বুঝে ওয়াদা ছেড়েছুঁড়েই পালিয়েছে।”

কবীর মাথা নত করে।

মাহেজাবিণ খুব সামান্য হাসে, “মাথা যদি সম্মতিতে নত হলো, তো আমি আপনার কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব, কবীর ভাই।

”কবীর আপ্লুত হয়ে ছটফট করে ওঠে। নিজের মুখ-চোখে দুই হাত বুলায় অপ্রস্তুতিতে। কোয়েল বুঝতে না পেরে একবার কবীর মামা আবার মামণির দিকে চায়।

কবীর শুধায়, “কোথায় যাবেন আপনে হাসপাতাল থেকে?”

মাহেজাবিণ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে, “একটা উপকার করুন আমার। এর কোনো দাম দিতে পারব না কিন্তু। আমার কাছে কিছু নেই।”

-“লজ্জা দিতেছেন অধমরে?”মাহেজাবিণ মাথা নাড়ে, “রউফ কায়সারকে একটা খবর দেবেন। সে যেন একটু দেখা করে আমার সঙ্গে।”

কবীর জিজ্ঞেস করে না, কেন। চুপচাপ সম্মতিতে মাথা দুলায়। অন্তূ তুলি ও রিমিকে ডেকে নেয়। কবীর তাতে আরও দ্রুত দূরে সরে গেল। তার অদ্ভুত রকমের অস্থির লাগছে। তার একবার এক্ষুনি কবরস্থানে

যাওয়া দরকার। তার বিয়ের কথা চলছে, বিয়ের ঘটক যে লোকের ঘরওয়ালি তার কাছে একটু ক্ষোভ ঝারা দরকার।
অন্তূর পেছনে এমপির গোটা পার্টি পড়ে আছে। এখন সে পুরস্কার-ঘোষিত নিখোঁজ ছাগলের মতো। যে যেখানে পাবে পুরস্কারের লোভে শিকার ধরে নিয়ে দিয়ে সম্মানী আদায় করবে। বাপ্পীর লোক হাসপাতালে আসেনি তার কারণ হামজাকে পাহারা দিতে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে হাসপাতালে। সাথে কবীর নিজেদের গোটা দলবল আশাপাশে ভিড়িয়ে রেখেছে। হামলা হলে হাসপাতালে একটি সংঘর্ষ নিশ্চিত হবে।পাটোয়ারী বাড়ি হামজার

নামে। যৌথ মালিকানায় কেউ নেই। সুতরাং আইনতভাবে তার বাড়িটি সরকারীভাবে বাজেয়াপ্ত হবার কথা। কিন্তু হলো যেটা– হামজা যে বাড়ির ব্যবসায়িক গোডাউনে টর্চার সেলের মতো জাহান্নাম খুলে রেখেছিল সেই বিষয়টি চাপা দেয়া হলো। হামজা দলীয় কর্মী। তার বাড়িতে এমন কিছু রয়েছে, ঘটেছে, এটা সরাসরি জানতে দিলে জনগণের ভেতরে ক্ষোভ পয়দা হবে, বিষয়টা খুব খারাপ হবে। হাজার হোক হামজা সরকারী দলের কর্মী, তার কর্মের ক্রেডিট দলের নামে যায়। সুতরাং ওটা ইস্পাত-লোহার গোডাউন হিসেবে রয়ে গেল। কিন্তু হামজার অপরাধ,

এবং সেটা একটাই এমপির খুন। নয়ত বাকিগুলো ধরা হতো না। বাড়ির মালিকানায় কেবল সে আছে, তাই পাটোয়ারী বাড়িটাকে সিলগালা করা হলো। আইনত অনুমতি যদি পায় কখনও তবে ওখানে কেউ বসবাস করতে পারবে।

হামজার চিকিৎসার জন্য ওয়ার্কশপের কাঁচামাল খুব সুলভমূল্যে বিক্রি করল রিমি। লাভ হলো না কিছুই। থেরাপি মনের সান্ত্বণা বৈ কিছু নয়। মস্তিষ্কের ওপর হাত ঘুরানো মুশকিল। হামজার স্পাইনাল কর্ড পুরোপুরি ধ্বংস। জীবন্মৃত হয়ে উঠল হামজা। দেখলে মনে হয় না সে জীবিত আছে। চলমান

জগতের সঙ্গে মানসিক ও শারিরীকভাবে সকল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে সে চলে গেছে সাবকনশ্যস রেনমে।রিমির বাড়ি থেকে লোক এলো এতদিন পর। মেয়েকে তারা ত্যাগ করেছিল। যখন হামজার প্রতিপত্তি বাড়ছিল, কিন্তু তা রিমির বাপ-চাচাদের কাজে লাগেনি, তখন মাজহার কতবার বলেছে রিমিকে তালাক দিয়ে চলে আসতে। রিমি যায়নি। তার স্বামী কোনো স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার নয় এটা বলে অপমান করে তাড়িয়েছে। হামজা সচল থাকা অবস্থায় সাহস ছিল না ও বাড়ির কেউ রিমিকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। এমনকি মাজহারের মৃত্যুর পরেও না। মাজহার ও ঝন্টু

সাহেব মরার পরেও সাহস হয়নি সরাসরি দুই ভাইয়ের ওপর আঙুল তোলার। কিন্তু এখন হামজার দিন ফুরিয়েছে, তারা রিমিকে ছাড়িয়ে নিতে এলো।হামজার সামনেই রিমির বাবা দাঁড়িয়ে বলল, "তোরে বিয়ে দিয়ে দেয়া মানে বিক্রি করা রে? চল, বহুত হইছে। এক মরার ঘর করার জন্য পড়ে থাকবি? আর তার ঘরই বা কই? সরকারে তো সিল মারছে সেইখানেও। এই হাসপাতালে দাসীর মতোন পড়ে থাকবি? আমার সাথে চল। এই বয়সে এই সর্বনাশ, ক্যান মেয়ে কি আমি খেলা খেলতে জন্ম দিছি?আর কীসের আশায় পড়ে

থাকবি? একটা সন্তান হইবো না, না খেয়ে মরা লাগবে..''

খুব বড় বড় কথা বললেন আজ রিমির বাবা। হামজা এতগুলো দিনে চলমান পরিবেশের কোনোকিছুতে মনোযোগ দেয়নি। জয় আর নেই, এই কথাটা নিজেকে বিশ্বাস করানোর ব্যস্ততায় আর কোথাও মনোযোগ দেয়ার ফুরসত পায়নি। আজ আড়চোখে রিমির দিকে খেয়াল করে। তার চোখে রিমিকে আটকে রাখার প্রয়াস নেই, অধিপত্য নেই, শুধু নির্বাক এক পক্ষাঘাতগ্রস্থ হিসেবে সে দূর্বল চোখদুটো তুলে রিমির প্রতিক্রিয়া খেয়াল করতে চাইল। রিমি বলে, "আব্বু, আপনি আমার স্বামীর

ব্যাপারে কথা বলছেন। সে অসুস্থ, মৃত নয়। আর আমি তার সঙ্গে পালিয়ে আসিনি, আপনারা বিয়ে করিয়ে সঙ্গে দিয়েছিলেন। এরপর তার সঙ্গে থাকাটাই আমার জীবন। সেই 'সঙ্গে' ঘর থাকুক ন। যদি কোনো দরকারে আপনার কাছে যাই, ফিরিয়ে দেবেন না এইটুকুই অনুরোধ। যেমন তার স্ত্রী আমি, আপনার মেয়েও। আপনাদের পার্টিতে কী হয়েছে তা মনে না রেখে মনে করুন না যে আপনার মেয়ের জামাই অসুস্থ। সে সুস্থ হোক তারপর নাহয় তার অপরাধ হিসেব করব!"

রিমি বাবা মেয়েকে ধরে কেঁদে ফেললেন। তিনিই সতেরো বছর বয়স্কা ছোট্ট মেয়েকে

এই রাক্ষসের কাছে বিক্রি করেছিলেন ক্ষমতার স্বার্থে, আজ এমনটাই উপলব্ধি হলো তাঁর। আজ মেয়ে নারী হয়েছে, বড় হয়েছে, ভারী কথা শিখে গেছে। কিন্তু হারিয়ে গেছে জীবনের সকল চাঞ্চল্য আর রঙ! পরনের শাড়িটা মলিন, মুখটায় যেন বার্ধক্য এসে জমেছে! বয়স এখনও তেইশ পেরোয়নি। এর দায় কার? তাঁর নিজের সিংহভাগ! মেয়ের কাছে বড় লজ্জিত হয়ে বুকে ব্যথা নিয়ে ফিরে গেলেন তিনি।হামজার আজ তার আবার মরার শখ জাগে। তার মনে হলো রিমির সাথে সে জুলুম করেছে কিন্তু কী জুলুম? সে তো এমনই! তা মানতে পারল না কেন রিমি?

রিমির কাছে সে ক্ষমা চাইবে? কী বলে ক্ষমা চাইবে? সে তো অপরাধ করেনি! তার পথটাই ছিল ওটা। সে যা করেছে সেটাই তার কাজ ও নীতি–রাজনীতি। দোষ রিমির। সে কেন আরমিণের মতাদর্শে লালিত হতে গেছে? রউফ কায়সারের কাছে মাহেজাবিণ নিরাপত্তা চাইল। দিনাজপুর থাকার নিরাপত্তা। থার্ড ইয়ারের ফার্স্ট সেমিস্টারের পরীক্ষা সে দিতে পারেনি। মনোয়ারা রহমানের কাছে গর্ভাবস্থাকালীন সংকটে অনুপস্থিতির আবেদন ও রিপোর্ট জমা দেবার পর মনোয়ারা রহমান কনসিডার করলেন। গোটা ভার্সিটি ও অঞ্চল থমকে গেছিল জয় আমিরের মৃত্যুর সংবাদে।

কেউ কেউ লাশ দেখতে না পাবার আফসোসে গুম রইল। এ নিয়ে ভার্সিটি প্রাঙ্গনে মৃদু ক্ষোভ বইল, লাশ কেন ঘোড়াহাটেই দাফন করে শুধু খবর আনা হয়েছে! জয় আমিরের কী আছে ঘোড়াহাটে? সব তো বাঁশের হাট আর বিশ্ববিদ্যালয়ে তার! বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকার ছিল জয় আমিরের ওপর।পরীক্ষা দেবার অনুমতি পেল মাহেজাবিণ। পড়ালেখার খরচ ও এতগুলো পেট চালাতে মাহেজাবিণের উপার্জন দরকার। সব ব্যবস্থা না করে মা ও ভাবীকে দিনাজপুর আনা যায় না। নিজের জন্য তখন দামী ওষুধের ফর্দ লিখে দিয়েছে ডাক্তার। সেই পেসক্রিপশন কোথাও হারিয়ে

ফেলল সে! ওষুধ কেনার পয়সা নেই, পেসক্রিপশনের কী কাজ!

দিনাজপুর থাকা তখন বাঘের খাঁচায় মুরগীর মতো। রউফ কায়সার কতটুকু নিরাপত্তা দিতে পারে তাকে? স্বল্প পরিচয়, এছাড়া একজন সরকারী কর্মকর্তার কাছে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা আশা করাটা বেমানান।

আমজাদ সাহেবের বাড়ির পেছনে এককাঠা জমি পড়ে আছে এখনও, ছোট কস্তুরীর খাল হিসেবে। ওটুকু বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়ে অন্তূ কুষ্টিয়া যাবার প্রস্তুতি নেয়। অনুমতি সাপেক্ষে পাটোয়ারী বাড়িতে শেষবারের মতো ঢুকেছিল সে সেদিন। শুকনো রক্তে জড়ানো ড্রয়িং

স্পেস পেরিয়ে অন্তূ সোজা সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে যায়। আকাশ একটু মেঘলা, বাতাস বইছে খুব। তাতে ধারণা করা যায় বৃষ্টি নাও আসতে পারে।মালিক নেই আজ কতগুলো দিন। তবু গুনলে কবুতর সংখ্যায় বেশি পাওয়া যাবে। এমনটা হতো। জয়ের কেনা কবুতর উড়াউড়ি শেষে সাথে নতুন কবুতর নিয়ে আসতো। কারণ কবুতররা জেনে গেছিল জয়ের ছাদে ভিআইপি খাবার মেলে। কত জাতের কবুতর! সবচেয়ে বেশি সাদা পায়রা। প্রত্যেক জাতের জন্য আলাদা আলাদা খোপ। আজ কয়দিনে ভীষণ নোংরা করে ফেলেছে ছাদ ও খোপগুলো। সাদা পায়রাগুলো দেখে

অন্তূর চোখে বিভ্রম তৈরি হয়। কবুতর ঝাপসা হয়, সে দেখে বড়ঘরের কবুতরগুলোকে। সাদা ধবধবে পাঞ্জাবি, পাজামা, টুপি পরা নিষ্পাপ কবুতরের ঝাঁক! ঠিক এদের মতোই বহুদিন না খাওয়া, পিপাসায় কাতর! অন্তূ ধপ করে বসে পড়ে ছাদের ওপর। অসুস্থ লাগে তার খুব। জয় আমির কী করেছে তাদের সাথে! সে কলঙ্কিত এক নারী। সে এমন এক পাপীষ্ঠর ঘরের স্ত্রী, যার পাপ নিকৃষ্টতাকে হার মানিয়েছে।এই কবুতরগুলোকে ঠিক রোজ দানা খাইয়েছে জয় আমির, পানি পান করানোর জন্য কতগুলো সৌখিন পাত্র ছাদজুড়ে রাখা, কত রকম দামী শস্যের

আয়োজন ছিল সাদা পায়রাগুলোর জন্য! অথচ নিষ্পাপ ছোট ছোট মানব সন্তানদের জন্য সামান্য প্রাণভিক্ষা দেবার প্রয়াস ছিল না যার মধ্যে তার বিধবা স্ত্রী হিসেবে মাহেজাবিণ আজ সাদা পায়রাগুলোর সম্মুখে অনেকক্ষণ বসে রইল।

নিজেকে ধিক্কার দিলো। তার হঠাৎ-ই মনে হলো বাংলাদেশের আইন জয় আমিরদেরকে শাস্তি দিতে প্রস্তুত নয়। আচ্ছা সে কি এই কাজটা করতে পারতো না? সে কেন পারেনি ঘুমের মাঝে জয় আমিরের গলাটা কেটে দিখণ্ডিত করে ফেলতে! হামজার পাটোয়ারী তার পাশের ঘরে কতরাত বেঘোরে ঘুমিয়েছে!

কীসের আদর্শ মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিল যে আদর্শে নিষ্পাপ শিশুগুলোর প্রাণ বাঁচাতে দুটো রাক্ষস বধ সে করতে পারেনি হাজার সুযোগ পেয়েও? যে দুটো নাগালে ছিল তাদেরকে বধ তো সে করতেই পারতো! এমন দুজন খুনীকে হত্যা করে এক জীবন কারাগারে কাটানোর চেয়ে সুখের আর কী হতো! এই ধিকৃত, ধ্বংসপ্রাপ্ত জীবন অসহনীয়! সে কোন আইনের আইনজীবী হতে চায়? আইন কোথায়? যেখানে আইন নেই, সেখানে আইনজীবীর কীসের? দেশ কোনদিকে হাঁটছে, কাদের হাত ধরে এগোচ্ছে? সেই দেশে কীসের আইনজীবী হবে সে? সে কী করে

এক ভুল দেশে জন্মে এক ভুল স্বপ্ন লালন করেনি নিজের মাঝে?ছেড়ে দিয়ে পোষা পায়রা জয়ের। উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। সারাদিন এদিক-ওদিক উড়ে এসে দানা খাওয়ার সময় অথবা সন্ধ্যা বেলায় ঠিক ফিরে আসে তারা জয় আমিরের তৈরি নীড়ে। মাহেজাবিণ আবার তাচ্ছিল্যে হাসে। সামান্য পায়রাকে কতটা স্বাধীনতা দিয়ে পালন করেছে লোকটা, অথচ মানুষ তার কাছে এই সুযোগ পায়নি। সে নিজেও বোধহয় পারেনি মানুষগুলোর জন্য কিছু করতে! আজ পায়রাগুলোকে অন্তত মুক্ত করা যাক! এ বাড়িতে ওদেরকে দানা-পানি দেবার মতো

আর কোনো প্রাণ থাকবে না।সে তাদেরকে তাড়িয়ে দিতে চাইল। তারা মাহেজাবিণকে খুব চেনে। তারা বরং খুশি হয়েছে। বাড়ির লোক এসেছে, কিছু খাবার মিলবে। তারা উড়বে কেন? এটাই তো আবাস তাদের। তারা বাকবাকুম রবে জয় আমিরকে ডাকল কিনা কে জানে! তাদেরকে তাড়ানো গেল না। মাহেজাবিণ রুমে এসে গম পেল। সেগুলোর সাথে বাসি পানি তুলে নিয়ে গিয়ে শেষবার সে কবুতরগুলোকে খেতে দিলো। ঝেপে এলো সবগুলো তার পায়ের কাছে। দুটো সাদা পায়রা তুলে আদর করে মাহেজাবিণ। বাকিরা গা ঘেষে। তাদেরকেও হাতে তুলে

আদর দেয়। আহ্লাদে সমস্বরে ডাকে। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। তাকে যেতে হবে। একবার পেছন ফিরে কবুতরগুলোকে দেখে নেমে এলো সিঁড়ি বেয়ে। এরপর বহুদিন কোনো মালিককে এবং খাবার না পেয়ে ওগুলো গন্তব্যহীন উড়াল দেবে পাটোয়ারী বাড়ি ছেড়ে। তখন এই বাড়ি পুরোপুরি প্রাণমুক্ত হবে!অন্তূ নিজের রুমে এলো। নিজের রুম নয়। জয় আমিরের রুম! সে ভাগ পেয়েছিল। সেখানে ঢুকতেই তিন দেয়ালজুড়ে বড়বড় ফ্রেমে টাঙানো ছবি নজরে পড়ে। অন্তূ রুমটা দেখে। বিছানাটা পড়ে আছে। জয় আমিরের বালিশটাও। চাদরটা জড়ানো। রুমজুড়ে

ভ্যাপসা একটা গন্ধ। জয় আমিরের শরীরের ঘাম-রক্ত-পারফিউমে মেশা বাসি গন্ধের সাথে আরও কিছু গন্ধ মিশে বদ্ধ ঘরটায় অদ্ভুত এক গন্ধ জড়ো হয়েছে।

আলমারী ভর্তি প্যান্ট-শার্ট, লুঙ্গি, পারফিউম, ঘড়ি...রুমের আসবাব, বাথরুমের সরঞ্জাম, সেখানকার হ্যাঙ্গারে ঝুলছে তার গামছা, দুটো নোংরা তোয়ালে, বাথরুমের শুকনো মেঝেতে পড়ে আছে দুটো ভেজা লুঙ্গি। অন্তূর অস্থির লাগে। সে বসে মেঝের ওপর। মাগরিবের আজান হলো তখনই। সে আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে ওযু করে। বহুদিনের শুকনো বাথরুম ভিজে ওঠে তাতে। মাহেজাবিণ জয় আমিরের

ঘরটাতে শেষবার মাগরিবের নামাজ আদায় করে। নামাজ শেষে একাকিত্বের সুযোগে হু হু করে কাঁদে সে। তার সন্তান নেই, বাবা কবরে শায়িত, আজ কতকগুলো দিন আসামীও! জীবন খুব ভারী লাগে তার। সকাল থেকে কিছু খাওয়া নেই। খিদেও নেই। কান্না করার ফলে শরীর ও মন আরও অবসন্ন হয়ে এলো।

বেশ কয়েকবার বিভ্রম তৈরি হলো– ভারী পা মেলে জয় আমির ঢুকল অসময়ে হুট করে ঘরটায়। বেশিরভাগ সে রুমে আসতো তখন অন্তূ নামাজে থাকতো। আজও এলো, মাহেজাবিণ মোনাজাত ছাড়তেই জয় আমির

এসে জায়নামাজের পাশে বসে। মাহেজাবিণ তাকায় না। তার অস্বস্তি হয়।-"এত জ্বালাতন করছেন কেন?"
-"তুই এসেছিস, আরমিণ। আমি তো এখানেই আছি।"
-"এখানেই? এই ঘরে?"
জয় আমির বেহায়ার মতোন মুচকি হেসে জায়নামাজের ওপর শোয়। অন্তূর কেমন অদ্ভুত আগে, গা ছমছম করে যেন। সব কেমন জীবন্ত লাগে। সে তাড়া দেয়, "নাপাক আপনি। উঠুন জায়নামাজ থেকে।"
-"পাক তো তুমিও। তোমার ভেতরে জায়গা পেলাম যে!"

-“পেলেন?”

-“স্মৃতিতে পেলাম না? স্মৃতিই তো মানুষের ভেতর-ঘর, ঘরওয়ালি!”

মাহেজাবিণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, “ঘৃণিত স্মৃতি!”-“আরেহ্ উকিল ম্যাডাম, চলবে। আমি তো ঘেন্নাতেই থাকতে চেয়েছি, ভালোবাসা আমার পোষায় না। আপনার চোখের ঘেন্নায় আজীবন আমার বসবাস হোক, পরের জন্মে আবার সেই ঘেন্নার সাথেই ভার্সিটির মাঠে আমার-আপনার দেখা হোক!”-“একবার ধ্বংস করে তৃপ্ত হননি? আবারও সেই অভিশপ্ত সাক্ষাতের সাধই কেন?”

এর জবাবে অন্তূ প্রতিধ্বনির মতো একটি আওয়াজ পায়,

“আমরা কেবল পুনরায় সাক্ষাতের জন্যই বিদায় নিই।”

কথাটা বলে কি জয় আমির চোখ মারল? এরপরের মুহুর্তে মাহেজাবিণ গা শিউরে ওঠে, বিভ্রম ছোটে। আওয়াজটা কানে বাজে। জয় আমিরের কণ্ঠস্বর! বজ্রধ্বনির মতো তীক্ষ্ণ, গভীর-পৌরুষ ধ্বনি, যেন পাথরের ওপর গড়িয়ে চলা কোনো গম্ভীর নদীর, হিংসুটে স্রোতের গর্জন!

‘আমরা শুধু আবার দেখা হবার জন্যই বিদায় নিই।’ কথাটি সে শুনেছে। বিখ্যাত কেউ বলেছিলেন। ইংরেজি পঙক্তি!

‘We only part to meet again’যতদ্রুত সম্ভব এখান থেকে বেরোতে হবে। রোজ স্বপ্নে অন্তূ প্যানিক অ্যাটাকের শিকার আজকাল। কখনও আব্বু, কখনও ছোট্ট একটি শিশু কখনও বা জয় আমির! কখনও বা একটি লোহার খাঁচায় অনেকগুলো রক্তাক্ত সাদা পায়রার ঝাঁক, তাকেই ডাকে, ডানা ঝাপটায়, সে তাদেরকে মুক্ত করতে হাত বাড়াতেই স্বপ্ন ভেঙে সে ক্ষুধার্ত দুনিয়ার জেগে ওঠে! যেখানে সে একজন ধ্বংপ্রাপ্ত নারকীয় জীবনের

প্রতিনিধি!সে ওঠে। এই কক্ষের কোনায় কোনায় পাপী লোকটার ঘ্রাণ আর খেয়ালে জড়ানো তেতো স্মৃতিরা থমকে আছে। মাহেজাবিণকে দেখছে। এত এত স্মৃতিদের নজরের সামনে মাহেজাবিণ অসুস্থবোধ করল। কেমন মানুষের ঘর সে করেছে! তার নারীজীবনের সংসারজীবনের সাক্ষী এই কক্ষটা। আটমাসের সংসার। এই কক্ষে একটা জয় আমিরের গল্প আছে, একটা আরমিণের গল্প আছে। দুটো মিলিয়ে দুই বিরোধী পথিকের গল্প আছে।

নিজের বইপত্র গুছিয়ে নিয়ে সে আলমারী খোলে আবার। তার ভয় লাগতে লাগল।

আবার না জানি লোকটা এসে পাশে দাঁড়ায়। সে অস্থিরবোধ করে। ছবিগুলোতে জয় আমিরের হাস্যজ্জ্বোল দুর্বোধ্য চোখ তাকেই দেখছে!

আলমারিতে সেই পায়ে পেষা সিগারেটখানা পায় সে। সিগারেটটা ছোঁয় না অন্তূ। ওটা অশুভ। আলমারি আটকানোর সময় একখানা কাগজ পায়। কাগজ দেখেই মাহেজাবিণ বোঝে জয় আমিরের হাতে রাখা ওটা, তার জন্যই রাখা–কাগজটা মুচড়ে গেছে, এলোমেলো অযত্নে পড়ে আছে তাকের ওপর। কাগজটা খুলে তার হৃদস্পন্দনের দ্রুতি বাড়ে। মুরসালীন মহানের চিঠি!সে

সকল গল্পকে দরজার পেছনে বন্দি করে বেরিয়ে আসে রুম থেকে। একটা বিছানা, তিনটে দেয়াল, একটি ড্রেসিং টেবিল, কাঠের আলমারী, কয়েকটি ফুলদানী, শার্ট ঝুলানোর হ্যাঙ্গার, কাউচটা গল্পগুলো গিলে চুপ করে শেষবার দেখে মাহেজাবিণকে।মাহেজাবিণ জানে না মরিয়ম বেগম কোথায় থাকেন। সে গেল সেই বাড়িতে, যেখানে আনসারী মোল্লা ও রউফ কায়সারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল তারা। যাবার পথে আত্মরক্ষার জন্য সঙ্গে একটি ছুরি নেয়। রঙচটা পুরোনো জীর্ণ-শীর্ণ বাড়িটি বাঁশেরহাট থেকে কমবেশি বিশ মিনিটের পথ, সুইহারী আশ্রম ও দিনাজপুর

সরকারী কলেজের মাঝামাঝিতে। হেঁটে গেলে ঘণ্টাদেড়েকের পথ।

মাহেজাবিণ পৌঁছাল বিকেলের দিকে। আশা রাখল, কাউকে অন্তত পাবে, তার কাছে মরিয়ম বেগমের ঠিকানা জেনে নেবে। তার বুক ধুকপুক করে। দেখা হলে সে কী করে একজন মায়ের কাছে বলবে, আপনার মুরসালীন মহান মুক্তি পেয়েছে, এই পরাধীন দেশ থেকে তার বিপ্লবী আত্মা স্বাধীন আসমানে উড়াল মেরেছে।

আশ্চর্যজনকভাবে একজন নারী বেরিয়ে এলেন সেদিন দরজা খুলে। মলিন কাপড়ের হিজাব, মুখটা আবৃত তার প্রান্তে। অন্তূ

নিকাবের মুখ খুলে সালাম জানায়, “আসসালামুআলাইকুম, চাচিআম্মা! ”-“ওয়ালাইকুমুসসালাম।” উল্লাসিত হয়ে অন্তূকে জড়িয়ে ধরে কপালে-মুখে চুমু খান নারীটি। শরীরে কী সুন্দর মা মা ঘ্রাণ! অন্তূর অস্থির লাগে।

-“আপনি কি চেনেন আমাকে, চাচিআম্মা?”

-“আগে ভেতরে আয়। আয়, আয়!”

অন্তূকে নিয়ে গিয়ে মলিন এক বিছানায় বসায়।

-“তোর অপেক্ষায় আল্লাহর কাছে রোজ মোনাজাত করি, এতদিন পর আসলি।

আমারে চিনিস না, না? আমি কিন্তু তোরে খুব চিনি।''

-"কে আমি?''

কী অদ্ভুত এক হাসি হাসেন নারীটি, "জয়ের বউ!''মাহেজাবিণ আজ লজ্জিতবোধ করে এই পরিচয়ে। তা সামলে শুধায়, "আপনি কে?

-"মুরসালীনের খোঁজ আনিস নাই?''

অন্তূর হৃৎপিণ্ড দ্রিমদ্রিম করে বাড়ি পাড়তে লাগল। এটা কি মুরসালীন মহানদের বাড়ি? নারীটি কে? চেহারাখানা কি মুমতাহিণার মতো নয়? অন্তূ ঢোক গেলে।

মরিয়ম বেগম পানি আনলেন। কিছু খেজুর ও দুই পিস কেক এনে হাত ধরেন মাহেজাবিণের।

-“খা, মা। নে, মুখে দে। ঘরে আর কিচ্ছু নাই।”

মাহেজাবিণ মায়ের স্নেহ অনুভব করতে লাগল।-“মুরসালীনটা কোথায় রে এখন? তোর স্বামীর জাহান্নামে এখনও পচতেছে? জয়রে আনলি না! ও কেমন হইছে দেখতে? আমার কথা মনে আছে ওর? মনে থাইকলে আমার গর্ভের ধনগুলারে এমনে কোরবানী করতো না। মনে নাই ওর। ছোটবেলার কথা তো! সেই কবেকার কথা—ওরে আর

মুরসালীন-মুস্তাকিনরে এক দস্তরখানে বসায়া দুইটা ডিম তিনজনরে ভাগ করে দিছি। জয় এতিম তো। ওরে একটা গোটা ডিম দিতে বলে যাইতো তোর চাচায়। নয়ত আল্লাহ নারাজ হয়। মুরসালীন আমার খুব খিটখিটে। কথা হইছে কোনোদিন ওর সাথে? ও আমার সাথে ঝামেলা করতো, 'আম্মা ওই জয়রে আপনি বেশি ভালোবাসেন, আমার আর ভাইয়ের চাইতেও?''মরিয়ম বেগম হিজাবের এক প্রান্তে চোখ মুছে হাসেন, "জয় আসলে ওরে আমি খালি জিগাইতাম, ওর কি মনে পড়ে না কিছুই? আমার কথা মনে পড়লে আমার ছেলে দুইটারে কম ব্যথা দিতো। ওরে

আনিস তো মা, এরপরের দিন। আমি তো চিনি না বাড়ি। কতবড় হইছে, বিশাল ব্যাটাছেলে হইছে না রে? তখন ছিল না। ওর খালি জ্বর আসতো। জ্বর আসলে পালায়ে মাদ্রাসা থেকে আমার কাছে আসতো লুকাইতে।দেখি নাই কতদিন। যাইতে চাইছি কতদিন। চিনলে কবে যাইতাম। হামজা আমারে চিনে না। জয় কি ভুলছে? মুরসালীন আমারে বাড়ি থেকে বাইর হইতে নিষেধ কইরে গ্যাছে। জাহিলটা আর ফিরে নাই। আমি চিনি না বলে যাইতে পারি না জয়ের কাছে। এখন কত কাছে থাকি। মুরসালীন

বলছে, এই বাড়িটা খুব দূরে না। এখন আসছিস, জয় জানে?"

মাহেজাবিণ আস্তে কোরে বলে, "জানে না।

"-"না জানায়ে ক্যান আসছিস? জানলে যদি খারাপ হয়? কোথায় সে?"

মাহেজাবিণ গভীর মনোযোগে এক কোমল, মমতাময়ী পৌঢ়া নারীকে দেখতে দেখতে বলে, "নেই সে।"

বোঝেন না মরিয়ম, "নাই? নাই কী?"

মাহেজাবিণের গলাটা কাঁপে, "আপনি আমায় দুজন মৃত মানুষের ব্যাপারে অনেক কথা শুনিয়ে দিলেন, চাচিআম্মা।"

মরিয়ম বিশ্বাস করেন না। দুজন মৃত মানুষ? কারা মৃত? উনার হাতে এখনও এটো লেগে আছে জয়, মুরসালীন ও মুস্তাকিনের ভাত মেখে দেয়া এটো হাত। এরপর জয় হারিয়ে গেল। তবু তিনজনের হাত মাখতে হয়েছে। মুমতাহিণা, মুরসালীন, মুস্তাকিন...মরিয়ম সহ্য করতে পারেন না, বিশ্বাস করার পদ্ধতি জানা তাঁর নেই। তার হাতে ভাত খাওয়া চারজন একে একে ফুরিয়ে গেছে! তাঁর হাত ও তিনি তো এখনও অক্ষত! এটা নিয়তির কেমন খেলা?

মুরসালীন তো এই কথা দিয়ে যায়নি! এবার আর ক্ষমা নেই শয়তান ছেলের। সে বলে

গেছে, ফিরে আসবে। কারণ উনার আর কেউ নেই। আল্লাহ এতটা নিষ্ঠুর হবেন কেন তাঁর ওপর? কী আশ্চর্য কথা! মরিয়ম বেগম তো দুশ্চিন্তাই করেন না। কারণ তিনি জানেন জয়ের কাছে বন্দি মুরসালীন। জয় কি মুরসালীনকেও মারবে? উনার ধারণা মারবে না। কারণ তিনি যে বোকা, এটা তিনি জানেন না। জয় তাঁর স্বামী ও বড় সন্তানকে নিজ হাতে মেরেছে, মেয়েটা জয়ের দোসরদের হাতে ইজ্জত হারিয়ে প্রাণ দিয়েছে, তবু সরলা নারী জয়ের ওপর ভরসা রেখে আজও বিশ্বাস করতে চান না মুরসালীনকেও ছাড়া হয়নি তার বুকে ফেরার জন্য।মাহেজাবিণ চিঠিটা

দেয়। মরিয়ম অল্প শিক্ষিতা। মুরসালীনের চিঠি পড়তে পারবেন। মুরসালীনকে বাংলা লেখা তিনিই তো শিখিয়েছেন! আজ কত বড় নিমোকহারাম হলে মুরসালীন সেই বাংলায় উনার কাছে শেষ চিঠি ছেড়ে যায়! এমন ছেলেদের না জন্ম দেয়া উচিত। তিনি বোকা নারী। তাই তিনটে সন্তানকে পরপর নয়মাস করে গর্ভে ধরে পথে ছেড়ে দিয়েছেন দুনিয়ার ক্ষুধা মেটাতে।

তিনি অবিশ্বাসের সাথে চিঠিটা খোলেন। এক অবাধ্য ছেলের এলোমেলো হাতের লেখা—

আমার প্রাণপ্রিয় আম্মা,আপনার মুরসালীন বেঁচে থাকবে, আম্মা। মুরসালীনদের মৃত্যু

নেই। আপনি শুধু লাখোদের মাঝে খুঁজে নিতে পারলেই কতশত মুরসালীনকে পাবেন। আমি বেঁচে রইলাম।

আজ আর কিছু লিখব না। আজ শুধু ভাবব। মৃত্যু কি শেষ না শুরু! এই শহরে মৃত্যু কি আসক্তি নাকি অনীহা!

মরিয়ম কাঁদলেন না। চিঠিটাতে একটু পরপর চুমু খেলেন, অল্প হেসে চিঠিখানা বুকের সাথে বাহুডোরে চেপে ধরে আকাশের দিকে মুখ তুলে চেয়ে থাকলেন। যেমনটা শিশু জন্মালে নতুন মায়েরা শিশুকে কোলে তুলে করে, ওমন।

মাহেজাবিণের সহ্য হয় না। তার চোখ দিয়ে ঝুপঝুপ করে পানি ঝরে পড়ে। মুখটা শক্ত, অথচ থুতনিটা তার থরথর করে কাঁপে, বুকের উঠানামা অস্বাভাবিক বাড়ে। একটি মুরসালীন মহানের চিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ব্যথায় হেসে ওঠা দৃঢ়প্রত্যায়ী এক সিংহপুরুষ! কানে বাজে মুরসালীনের খালি গলায় গেয়ে ওঠা বজ্রের মতো ধ্বনি–

সেদিন আর রবে না হাহাকার, অন্যায়-জুলুম-অবিচার

থাকবে না অনাচার, দূর্নীতি কদাচার,

সকলেই শান্তিতে থাকবে

সেইদিন আর নয় বেশি দূরে, কিছুপথ গেলেই মিলবে

কোনো একদিন এদেশের আকাশে.....আছরের নামাজ মাহেজাবিণ মরিয়মের সাথে আদায় করলেন। মরিয়ম কাঁদলেন না। পাথরের মতো তার সহনশীলতা যেন। অস্বাভাবিক নয়। যে নারী যৌবন থাকতে বিধবা হয়েছেন তিন সন্তান নিয়ে, এরপর তিনজনের মৃত্যুর খবর তিনি পেয়েছেন জীবন্ত কানে, তার ভেতরে কতটা দৃশ্যমান উন্মাদনা অবশিষ্ট থাকতে আছে? তার বেঁচে থাকাই বাহুল্য আজ। তাঁর সিজদাগুলো লম্বা হলো। কে জানে রবের কাছে কী বা কী সন্ধি করলেন!

মাহেজাবিণ লজ্জায় মাথা তুলতে পারে না। সে আজ একটি মায়ের সামনে বসে আছে, এক নিকৃষ্ট পাপীর স্ত্রী হিসেবে, যে সেই মায়ের তিনটি সন্তান ও স্বামীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হত্যাকারী। তার আজ মনে হলো–এই গ্লানি ও লাঞ্ছনা সেদিন জয় আমিরের নাটকীয় আয়োজনে নষ্টা প্রামাণিত হবার চেয়ে বেশি। কেননা সেদিন মন অন্তত জানতো সে নষ্টা নয়। আজ মনটাই আগে জানে সে পাপীর স্ত্রী! আব্বু বলতো, 'অন্তূ রে! আমরা যখন সিজদা দিই, সিজদার স্থানটা তখন আর জমিন থাকে না, ওটা আল্লাহর পাক কদম হয়ে যায়। আমরা তখন ভক্তিভরে কপালটা ঠেকাই মহান

রবের পায়ের ওপর।’ মাহেজাবিণ তাই সিজদায় রবের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে এক জীবনের এই লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি ও ক্ষমা চায়। ডুকরে কাঁদে পাগলের মতো। থরথর করে কাঁপে তার সিজদারত শরীর। মরিয়ম তাকে সামলান। উষ্ণ বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে বলেন, “আমার মুমতাহিণা আজ কতদিন পর নামাজ পড়ল আমার সাথে বসে। ”মাহেজাবিণ কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয় মরিয়মের কাছে একটি মুমতাহিণা হতে পেরে। মুমতাহিণা হতে ভাগ্য লাগে। সে ঠিক করে ফেলে মার্জিয়ার মেয়ে হলে আজ এই মুহুর্তে তার নাম হলো মুমতাহিণা। মাহেজাবিণ

আজীবন এই নামে ডাকবে অন্তিকের মেয়েকে, প্রতিবার মুমতাহিণা জেগে উঠবে তার ডাকে।

মাহেজাবিণ ফজলে রাব্বীকে পেল। যে মরিয়ম বেগমের দেখাশোনা করে। দাওরাহ্ বিভাগের ছাত্র ছিল। মাদ্রাসা বন্ধ হবার পর মুরসালীন ভাইয়ের মায়ের সেবায় রয়ে গেছে। এটা তার কাছে ইবাদতের মতো।

মাহেজাবিণ মরিয়মের দুটো হাত জড়িয়ে ধরে অনুরোধ করে ওঠে, "আপনি আমার সাথে যাবেন, চাচিআম্মা! এখানে আর কে রইল আপনার? আমার আম্মু আছে আপনার মতো। স্বামী-সন্তান আল্লাহ নিয়ে গেছেন। তার শুধু

একটা অন্তূ আছে। সেই অন্তূ আপনারও হতে চাইলে আপত্তি হবে খুব?''মরিয়ম এবার কাঁদলেন, "যাতে তুইও ধোকা দিতে পারিস আমারে? যেমনে ওই তিনটায় দিছে?''

মরিয়ম রাজী হন না। তার কাছে ওসব চিঠির মূল্য নেই। মুরসালীন তাকে এখানে অপেক্ষা করতে বলে গেছিল, তিনি করবেন। ফিরবে কিনা সেটা মুরসালীন জানে। তিনি দেখতে চান মুরসালীন কতবড় অবাধ্য হয়েছে!

মাহেজাবিণ ব্যর্থ হয়। এক মায়ের জেদ ও মায়ার কাছে হার মানতে হয় সেদিন। তার একটা শখ ছিল এক নজর মুস্তাকিন মহানের ফটো দেখার। মুস্তাকিনের ছদ্মবেশে পরাগ

আজগরের কাছে প্রতারিত হয়ে সে জীবনে সর্বপ্রথম পরপুরুষের ছোঁয়ায় নাপাক হয়েছে। তার দেখতে মনে চায় এমন মায়ের গর্ভে জন্মানো আসল মুস্তাকিন কেমন ছিল? সে সেই স্থলে থাকলে নিশ্চয়ই নিজের সবটুকু দিয়ে অন্তূকে রক্ষা করতো সেদিন!তারপর মাহেজাবিণ কবীরের সাথে কুষ্টিয়া গেছিল দু'দিন পর। একটা পার্টি দেখে ফেলেছে কবীর। জমিটুকু বিক্রি হয়ে যাবে আশা করা যায়। মাহেজাবিণ তুলি ও কোয়েলকে সাথে নিলো। রিমি ও হামজা তখনও হাসপাতালে। পুলিশ পাহারায় হামজার চিকিৎসা চলছে তখন। নির্দিষ্ট মাত্রার সুস্থতা না এলে তাকে

আদালতে হাজির করা যাবে না। মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেবার ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা দাঁড়িয়ে যাবে।

মাহেজাবিণ কবীর, তুলি ও কোয়েলকে নিয়ে কুষ্টিয়া পৌছানোর পর মাহেজাবিণ অন্তিকের মেয়েকে পায়। এবারের ঈদুল ফিতরের চাঁদরাত্রির শেষভাগে মার্জিয়ার নাড়ি ছিঁড়ে এতিম কন্যা দুনিয়ায় এসেছে, যখন জয় আমির দুনিয়ার মায়ার সুঁতো ছিড়ে দুনিয়া থেকে পালিয়েছে। মার্জিয়া মাহেজাবিণকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ভাসায়। যেন তার কত যুগের প্রতীক্ষা পুরো করে মাহেজাবিণ তার চৌকাঠে পদার্পন করেছে।মাহেজাবিণ তখন

আবারও উপলব্ধি করে তার ধ্বংসপ্রাপ্ত জীবনটা কতগুলো জীবনের ভরসাস্থল! এখন তার নিজের জন্য নয়, বাঁচতে হবে অনেকগুলো বাঁচতে চাওয়া প্রাণের জন্য। সে বুঝতে পারে না কবে হয়ে উঠেছে সে এমন ভরসার কেন্দ্র? সে চাইছিল মরে যেতে, চাইছিল কারাবরণ করতে! অথচ কতগুলো মুখ তার দিকে মুখ তুলে চেয়ে! মার্জিয়ার চোখের ভরসা মাহেজাবিণকে বাঁচতে শেখালো। রাবেয়ার হাসিমুখের ডুকরে কেঁদে ওঠা তাকে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে বলল। সদ্য জন্মানো এক অভাগী শিশু প্রথমবার কোলে চড়ে তার আঙুলটা মুঠপাকানো হাতে চেপে

ধরে রইল। মাহেজাবিণকে বলল, বেঁচে থাকতে। বলল, তার প্রতিশ্রুতি আদায় করতে, ফুপু কম, বাপ হয়ে পালন করতে। জমটুকু চারলাখের বেশিতে বিক্রি করা গেল না। একে তো পেছনের জায়গা, তার ওপর কস্তুরীর খাল। আমজাদ সাহেবের পরিত্যক্ত বাড়িটা হয়ে উঠল একটি অসহায় নারী-শিশুদের আশ্রম। যেটার দেখভালের দায় মাহেজাবিণ আরমিণ অন্তূর। তুলি, কোয়েল, রাবেয়া, মার্জিয়া, মার্জিয়ার মেয়ে...কবীর মাহেজাবিণের সহকারী। তার ছেলেরা সেখানকার পাহারাদার।

হামজার আদালতের তারিখ পেছালো। কয়েকমাস অবধি পিছিয়ে গেল। পুলিশ হেফাজতে তার যথাসম্ভব চিকিৎসার চেষ্টা চলতে লাগল। যা ব্যর্থ! হামজাকে ট্রমা থেকে বের করা অসম্ভব, যা তার স্নায়ুকে প্রতিক্ষণে পুরোপুরি মৃত করে তুলছিল। তার মস্তিষ্ক অবজার্ভ করার পর নিউরোলজিস্ট ও সাইকিয়াট্রিস্টদের সম্মিলিত বোর্ড বসতে লাগল। উপরমহল থেকে টুকটাক গোপন প্রচেষ্টাও চলতে লাগল তাকে বিদেশ পাঠানোর ব্যবস্থায়। হাজার হোক সে একজন সম্ভাবনাময় নেতাকর্মী ছিল। তার সুস্থতা সবার কাম্য।সেই সময়টাতে বাংলাদেশের

রাজনৈতিক অস্থিরতা কিছুটা কমে এসেছে। ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবরের ১২ তারিখ। বিকেলের দিকে মাহেজাবিণের দরজায় দোলন সাহেব এলেন। সঙ্গে একখানা মাঝারি ফাইল।

দোলন সাহেব সোফায় বসে চারপাশটা দেখতে দেখতে মাহেজাবিণের হাতে ধরিয়ে দিলেন ফাইলটা। ভেতরে দুটো কাগজ। দুটোই হাতে লেখা। প্রথমটা খুলে সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রী ও আইনজীবী হবার স্বপ্নদেখা মাহেজাবিণের মনে হলো এটা কোনো হাতে লেখা উইলপত্র–হলোগ্রাফিক উইল।

নিচে জয় আমিরের হস্তসাক্ষর।
তারিখ– ২৩ এপ্রিল, ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ।দেখেই বোঝা যায় বহুদিন পর এই বাংলা লেখাটুকুর জন্য কলম ধরা হয়েছিল। তবু গোটা গোটা হাতের লেখা। অল্প যত্ন, কিছুটা দায়সারাপনা। জয় আমিরের হাতে লেখা উইল-পত্রটি পড়তে শুরু করে মাহেজাবিণ—আমি জয় আমির। জাভেদ আমিরের একমাত্র পুত্র। জন্ম: ঘোড়াহাট, দক্ষিণ দিনাজপুর। স্থায়ী বসবাসযোগ্য কোনো বাসগৃহ আমার নাই। ধর্ম: অধর্ম। আজ সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে, সদিচ্ছায় এই হাতে লেখা উইলটি লিখতে বসেছি।

এই উইলে আমি বলে যাচ্ছি, আমি মরার পর আমার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বাড়ি, নগদ অর্থ ও সমস্ত নিজস্বতা নিম্নলিখিতভাবে মালিকানাধীন ও পরিচালিত হবে—আমার স্ত্রী মাহেজাবিণ আরমিণ অন্তূ, পিতা: জনাব আমজাদ আলী প্রামাণিক, জন্ম: বাঁশেরহাট, দিনাজপুর সদর। আমার মৃত্যুর পর আমির পরিবারের সমস্ত সম্পত্তির অর্ধেকটার উত্তরাধিকারী হবে সে। আমার বাপের প্রধান বাসভবন আমির নিবাস, যেটা ঘোড়াহাটে অবস্থিত। তা আমার স্ত্রী আরমিণ অর্ধেকটা পাবে এবং সেটুকুর সম্পূর্ণ মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ তার হাতে থাকবে।

বাকিটা পাবে আমার একমাত্র চাচাতো ভাই জিন্নাহ আমির, পিতা: জনাব জয়নাল আমির। আমার মৃত্যুর পর আমার পৈতৃক সম্পদ সংরক্ষিত থাকবে তাদের দুজনের উদ্দেশ্যে। তা সমান দুইভাগে তাদের দুজনের মাঝে বণ্টিত হবে। এবং আমার ব্যক্তিগত অর্থের মালিকানা পাবে শুধু আমার স্ত্রী। আমি নিশ্চিত করতে চাই, আমার মৃত্যুর পর আর্থিকভাবে কোনোরূপ সমস্যার সম্মুখীন তাকে হতে হবে না। আমির বাড়ির বউ আর্থিক সংকটে ভুগলে বিষয়টা ভালো দেখাবে না।

আমার ব্যাংক একাউন্ট নম্বর–*****
(সোনালী ব্যাংক, বাংলাদেশ) এবং আমার

অন্যান্য সকল অর্থের হকদার আমার স্ত্রী আরমিণ হবে।
আপাতত সে একজন শিক্ষার্থী। এই উইলও চেইকবই তার কাছে হস্তান্তরের পর থেকে প্রতিমাসে সে আমার ব্যাংক একাউন্ট থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ তার শিক্ষা ও যাবতীয় খরচ বাবদ পাবে। এছাড়া সে চাইলেই যেকোনো সময় সেই অর্থ থেকে ইচ্ছেমতো অর্থ উত্তোলন ও খরচ করতে পারবে।
আমি আমার পরিচিত এক সম্ভাব্য শুভাকাঙ্ক্ষী ও আইনজীবী দোলন স্যারকে উইলের এক্সেকিউটর হিসেবে নিযুক্ত করছি। তিনি আমার স্ত্রীর কাছে উইলপত্র ও সমস্ত দলিল-

দস্তাবেজ পৌঁছে দেবেন। নিশ্চিত করবেন আমার ইচ্ছানুযায়ী আমার স্ত্রী ও ভাইয়ের কাছে আনুষঙ্গিক কাগজ ও মালিকানা পৌঁছেছে।

২৩/০৪/২০১৫

জয় আমির

নিচে দুজন সাক্ষীর সাক্ষর। দোলন সাহেব ও দ্বিতীয়টি কবীর।মাহেজাবিণ চুপচাপ অনেকক্ষণ উইল-পত্রটির দিকে তাকিয়ে রইল। যে সময়ে উইলপত্রটি লিখেছে জয় আমির, তখন তাদের সম্পর্ক ছিল চূড়ান্ত বিরোধের। এছাড়া নিজের মৃত্যুর এত নিশ্চয়তা রেখে কেউ দিব্যি পাপের জীবনটা

সাবলীলভাবে বয়ে যেতে পারে, না থেমেছিল হাসি, না কদম!

দোলন সাহেব দলিলের কাগজপত্র মাহেজাবিণের দিকে এগিয়ে দিলেন। পুরোনো হলদেটে কাগজ, তবু কচমচে, তা থেকেও একপাঁজা বিশাল ধন-ঐশ্বর্যের ধোঁয়া ঠিকরে বেরোচ্ছে। মাহেজাবিণ নির্লিপ্ত চোখে সেই দলিলখানা একনজর চোখে দেখল কেবল, হাতে ছুঁলো না।দোলন সাহেব বললেন, “দরকার ছিল না। ওর এ কূলে-ও কূলে কেউ নেই। ওই যাযাবর মরলে স্ত্রী হিসেবে এমনিই ওর সব তুমি পেতে। তবে মজার ব্যাপার হলো ক্ষ্যাপা আমির তখন জানতো, খুব অল্প

দিনের মধ্যে মুরসালীনকে অত্যাচার করে সে জিন্নাহ আমিরকে খুঁজে বের করে ফেলবে। তখন তোমরা দুজনই হবে আমিরদের সম্পত্তির দুই ভাগীদার। জিন্নাহ্ আর নেই। এখন আর এই উইল না থাকলেও সমস্ত সম্পত্তি একমাত্র তোমার! বিশাল ধনী মহিলা হলে আজ থেকে। আগেও ছিলে অবশ্য, আমির বাড়ির ব্যাটার বউ!''

দলিল ও চেইকবই এগিয়ে দিলেন দোলন সাহেব, ‘‘নাও, দেখে বুঝে নাও সব ঠিক আছে কিনা! আমার কাধ পাতলা হোক। এই দায় মিটিয়ে কাধ ঝেরে আমি দুই ভাইয়ের পেছনে লাগব কাল হয়ে। দেখলে না। এজন্য

আমাকে উল্লেখ করেছে সম্ভাব্য শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে। জোচ্চর আমিরের ব্যাটা!''

অন্তূ দলিল ও চেইকবইটা মৃদু হাতে ছুঁড়ে ফেলে দিলো টেবিলের ওপর। ক্লান্ত চিত্তে হেলান দিয়ে বসে বলল, "উইল লেখার কথা মাথায় কেন এসেছিল তার?''-"অকাম করে বেড়াতো, আর এটা জানতো না যে দিন ঘনিয়ে আসছে?''

-"শুধুই তাই?''

-"ছোটচাচা ক্রসে যাবার পর ওর একটা বদ্ধ ধারণা হয়ে গেছিল ও-ও ক্রসে মরবে, পুলিশের গুলিতে...''

মাহেজাবিণ কপাল চেপে ধরে। কী আশ্চর্য এক মানুষের ঘর করেছে সে! কোন পরিবারের উত্তরাধিকারী আজ সে? ওটা পরিবার? না, একঝাঁক নরকের অতিথি! সেই অতিথিদের কাতারে কীভাবে কীভাবে যেন তার নাম লিখিত হয়ে গেছে। কথাটা অদ্ভুত শোনায়– আমিরদের ব্যাটার বউ!

দোলন সাহেব মনোযোগী হলেন, "এবার বর্তমানের জরুরী খবরে আসি।"

-"বলুন।"

-"সামনের সপ্তাহে কোর্ট।"

-"শুনলাম।"

-“সাক্ষীর সাথে কথা বলা প্রয়োজন। তুলি কোথায়? তো তোমার সেই পরিকল্পনামতো– আর সব অপরাধ তো আছেই, সাথে তুলির স্বামী এমপির আত্মীয়, তার মৃত্যু যোগ করলে একটা ভয়াবহ কেইস পেশ করা যাবে আদালতে। কোথায় তুলি?”-“শ্বশুরবাড়ি।”

-“ভালো কাজ করেছ। মাতব্বরদের যোগ্য বধূ। এভাবে পরিচালনা করার দক্ষতা দেখেই বউ ঘরে তোলা উচিত। আমিররা না চাইতেও পেয়েছে।”

-“ব্যাঙ্গ করছেন, স্যার!”

গম্ভীর হয়ে বললেন দোলন সাহেব, “না। মাতব্বরদের যোগ্য বউ হও বা না, বাপের যোগ্য মেয়ে তুমি।”

-“এটাও ব্যাঙ্গই ছিল, স্যার।”

দোলন সাহেব চুপচাপ কিছুক্ষণ মাহেজাবিণকে দেখে বললেন, “তোমাকে জুনিয়র হিসেবে পেতে আগ্রহী আমি। যদি তুমি আমার আন্ডারে প্রাকটিস করতে চাও তো, আমি খুশিই হবো।”

মাহেজাবিণ সামান্য হাসল, “সবে থার্ড ইয়ার শেষ হচ্ছে স্যার। এখনও অন্তত বছর দুয়েক!
”

-“চলে যাবে দিন।”

মাহেজাবিণ গভীর শ্বাস টানে। সব হারিয়ে কিছু পাওয়াটাকে প্রাপ্তি হিসেবে ধরাটা কতটা যুক্তিসঙ্গত? সব হারানোর পর সে স্বপ্নের পথে পা বাড়াতে চলেছে। মাঝখানে জীবন তার সঙ্গে এক অনন্য আদিম খেলা খেলে নিলো!

-"তুলিকে হাজির করতে হবে কোর্টে। এখন কথা হলো, সে কি উইটনেস হবে তার ভাইয়ের বিপক্ষে?"

-"স্যার, ছেড়ে দিলে হয় না?"

-"কাকে? হামজাকে? তুমি বলছো? তুমি?"

-"শাস্তি কি শুধু আইন দিতে পারে, স্যার? আইনের ওপর যে মহান আইন রয়েছে, তার মতোন শাস্তি আইনের দেবার সাধ্যি কোথায়?

তথাকথিত আইনের আনুষ্ঠানিক নাটকীয়তা থেকে বাঁচিয়ে দিন।”

-“তুমি আসলে কী চাও?”

-“মৃত্যুদণ্ড না হোক! জীবিত থাকুক।”

দোলন সাহেব মাথা নাড়লেন, “তুমি তাহলে আসল শাস্তির কথা বলছো। হামজা বাঁচতে চায় না, আমি ওকে জানি।”মাহেজাবিণ বিরবির করে বলে, “কাপুরুষ একেকটা। পাপ করবে দাপটের সাথে কিন্তু শাস্তি ভোগ করার সময়ে লেজ গুটিয়ে পালাবে কুকুর অথবা মাছ-চোর বিড়ালের মতো।”

দোলন সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি রিমির কথা ভেবে হামজার মুক্তির আশা রাখছো?”

মাহেজাবিণ চুপ থাকে। কারও সামনে আবেগ প্রকাশে অক্ষম সে। সে বলতে পারে না রিমির কান্না ও নির্লিপ্ত-মৃত চেহারা তার বুকে কতটা ব্যথার উদ্রেক করে। এছাড়া দিন যত যাচ্ছে, তার ধৈর্য বাড়ছে, মনোভাব বদলাচ্ছে। সে বড় হচ্ছে। আজকাল মস্তিষ্কটা ঠান্ডা হয়েছে, আগের মতো টগবগ করে না। শান্ত-শীতল ভাবনারা খুব ভাবায় তাকে। সে বুঝতে শিখেছে যে পথে ক্ষমা নেই, ধৈর্য ও খোদায় ভরসা নেই, সেই পথেই হিংসাপরায়ন জয়

আমিরদের জন্ম। সে হিংসাপরায়ন নয়। কেবল অন্যায়কে থামাতে সঠিক আইন প্রয়োগে বিশ্বাসী।

মাহেজাবিণ শুধায়, "এত কঠিন অসুস্থতার মাঝে কী শাস্তি হতে পারে হামজার?"

-"দুইরকম কাণ্ড ঘটতে পারে। রাজনৈতিকভাবে ধরলে সে যত সুস্থ হবে উপরমহলের কাঠি নাড়ানাড়িতে তার শাস্তি তত কমে আসবে। আর যদি আইনতভাবে ধরো তো সে যত অসুস্থ হবে তাতে তার শাস্তি কমবে। এখন যেহেতু সুস্থ হবার চান্স দেখা যাচ্ছে না, তাই আইনতভাবে বিবেচনার

বিষয় হতে পারে।”-“আপনি কোন উদ্দেশ্যে কেইস লড়বেন, স্যার?”

দোলন সাহেব একটু রহস্য করে হাসলেন।

-“স্যার, আপনি মুরসালীন মহানের ওপর প্রবল স্নেহ রাখেন, তাই না? আমি আপনাকে খুব একটা বুঝতে পারি না। খুব জটিল মানুষ আপনি। আপনি মুরসালীন মহানকে মারার অপরাধে হামজার ওপর ক্ষুব্ধ, এও কিন্তু জানি আমি।”

-“আর কী কী জানো?”

-“জানার কথা ছাড়ুন। আপনি এলেন বিরোধী দলীয় আইনজীবী ও সমন্বয়কারী হয়ে, অথচ

বনে গেলেন সেই বন্দি-বিপ্লবীর শুভাকাঙ্ক্ষী, এর ব্যাখ্যা কী, স্যার?''

-"আমি মুরসালীনের শুভাকাঙ্ক্ষী, কে বলল?''

-"বাতাসে খবর পেয়েছি।''

-"বাতাস ভুল খবর দিয়েছে।''

মাহেজাবিণ অল্প হাসল। তারপর আনমনা হলো। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। দোলন সাহেব অপেক্ষায় রইলেন তার দ্বিধা ভেঙে কিছু ভয়ানক বলার।

-"স্যার!''

-"হু হু!''

-"আপনাকে বললে আপনিও কি ঠেকাবেন আমায় সারেন্ডার করা থেকে?''

-“আবার সেই একই কথা? বিষয়টা মাথা থেকে বের করতে পারছো না কেন?”

-“স্যার, আমি খুনী।”

-“আমার সামনেই হয়েছিল খুনটা। তুমি কি আমার চেয়ে বড় আইনজীবী হয়ে গেছ?”

-“স্যার, আপনি দুনিয়ার আদালতের আইনজীবী। আমাকে দাঁড়াতে হবে সেই আদালতে, যেখানকার বিচারক আমার মহান রব। আমি মানুষের চক্ষুলজ্জার ভয় পাই না।”দোলন সাহেব বিরক্ত মুখে খিটখিট করতে করতে বললেন, “এসব নীতিবোধ ছাড়ো। আর ভাবো তুমি জেলে গেলে একগাদা জীবন রাস্তায় নেমে আসবে। তাই চুপচাপ মানবধর্ম

পালন করো। এটাকেই তুমি ওই খুনের সাজা হিসেবে নাও না, দেখবে মনে হবে অপরাধের চেয়ে শাস্তি বড় হয়ে গেছে। আর বাদীপক্ষ যখন অভিযোগ আনেনি পুলিশের কাছে, ব্যক্তিগতভাবে তোমার ক্ষতি করার জন্য লেগে আছে, তারপর কীসের অনুতাপ? আইনের ভাষায় একজন সম্ভাব্য খুনীকে মেরেছ তুমি। এ নিয়ে আর কথা না বলো!''

মাহেজাবিণ বুঝল না এই অদ্ভুত মানুষটির ওপর তার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত কিনা। সে অনুতাপ ও দ্বিধায় একাকার হয়ে আস্তে কোরে বলল, ‘‘আমার হামজার সাথে কথা বলার আছে। আপনি কোর্টের প্রস্তুতি নিন।''

দোলন সাহেব চলে গেলেন। মাহেজাবিণ বসে রইল কতক্ষণ ওভাবেই। দলিল ও চেইকবই দুটো দেখল। উইলপত্রের সাথে আরও একটি পৃষ্ঠা। ওটা পড়ল না। এইসব দলিলপত্র, সম্পত্তি এসব তার কোনো কাজের নয়। দলিলটা নিজের কাছে রাখাও ভার মনে হচ্ছে। এসব দিয়ে সে কী করবে? ওভাবেই পড়ে রইল ওগুলো।

তার খিদে পায় না আজকাল। রাবেয়া এসে বসলেন পাশে। মাহেজাবিণ কারও সাথে আলাপে থাকলে কেউ আসে না সোফার ঘরে।-“খাবি না?”

মাহেজাবিণ চকিতে তাকাল। রাবেয়ার হাতদুটো ধরে সোফায় বসিয়ে সে মেঝেতে বসে রাবেয়ার কোলে মাথা রাখল। আব্বুর সাথে চা-মুড়ি খাওয়ার সময় এটা। সেই সোফা, আম্মু, বিকেল সব আছে। নেই শুধু আমজাদ সাহেব আর অন্তূ।

-"কী দিয়ে গেল রে? নেড়ে দেখেন রাবেয়া কাগজগুলো। পড়তে জানেন না খুব একটা তিনি। তবু কী বুঝে বললেন, জয় কিছু রেখে গেছে নাকি রে তোর জন্যে?"

-"হ্যাঁ, আম্মু। একটা পোড়া-কয়লার জীবন।"

রাবেয়া আগাগোড়াই ভয় পান মেয়েকে। আজও মেয়ের মাথায় হাত হাত বুলাতে

বুলাতে ভাঙা স্বরে বললেন, “একদিন নিয়ে চল না জয়ের কবরের কাছে। আমি দেখ...”
মাহেজাবিণ তাকালে তিনি থেমে গেলেন।
-“তোমাকে কতবার বলেছি এই আবদার বাদে যেকোনো কিছু চাও।”
-“আর কী চাই বল তো তোর কাছে? বাপের কাজ করতেছিস যে তুই আমার। কিন্তু এইটাই চাই এখন।”-“কেন?”
-“এতিম ছেলে...”
-“আমিও আম্মা। তুমিও...ওই লোকটার কারণে।”
-“ভুলে যা, অন্তূ। মরা মাইনষের ওপর অভিযোগ রাখতে নাই। শিখাই নাই আমি

তোরে? এত নিষ্ঠুর হইতে নেই, কত বোঝাইছি তোরে! চল না যাই!”

মাহেজাবিণ কথা বলে না। মায়ের ভিজে ওঠা চোখে তাকিয়ে থাকে।

-“জানিস ও একদিন গেছিল কুষ্টিয়া! আমারে কী বলে আসছিল জানিস? ও মরলে আমি কাঁদব কিনা!”

বলেই আশ্চর্যজনকভাবে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন রাবেয়া। মাহেজাবিণের চোখ ভিজে ওঠে আজ মায়ের কান্নায়। কী আশ্চর্য হয় এই মায়েরা! অন্তূ অবাক হয়। আজ তিনমাস ধরে অন্তূকে একা পেলেই ভীতু স্বরে আবদার করে বসেন জয় আমিরকে দেখতে যাবার।-“ও

আমার ব্যাটার দরদ বোঝে নাই। ওর তো ব্যাটা ছিল না। কিন্তু আমি তো মা রে অন্তূ। ওর মতোন এক জোয়ান ছেলেরে নয়মাস পেটে ধরা মা আমি। জানিস ও যেইদিন প্রথম আমার বাড়ি আসে আমি ওরে বলছিলাম, আমারে মা ডাকতে। সেদিন ও আমার ব্যাটার জান নেয় নাই। সেইদিন তো কথা দিয়ে দিছি রে আমি। মা-ই হলাম নাহয় আমার ব্যাটার খুনীর। একবার নিয়ে যা আমারে ওর কবরে। অন্তিকের কবরে গেছি আমি দোয়া করতে। ওর কবরটা দেখলাম না যে... আমার মেয়ের ইজ্জত, ছেলের জান নেয়া লোকের কবরটা দেখায়ে আনবি আমায়।''মাহেজাবিণ রাবেয়ার

হাঁটু জড়িয়ে ধরে মাথায় ঠেকায় কোলের ওপর। টুপ টুপ করে কয়েক ফোঁটা পানি রাবেয়ার মলিন শাড়িতে পড়ে, সুতির শাড়ি তা আলগোছে শুষে নেয়। তখন রাবেয়ার মৃদু কান্নায় কাঁপছে। মাহেজাবিণের চোখের সামনে নিজের সন্তানের রক্তাক্ত পিণ্ড ভেসে ওঠে। সে আচমকা বাঁধ ভাঙা নদীর মতো হু হু করে কেঁদে ওঠে। সে নিজেও মা। এক অকালমৃত রক্তপিণ্ডের গর্ভধারিনী মা, আরেক এমন মায়ের কোলে মাথা রেখে কাঁদে যে মা তার নিজের সন্তানের খুনীর জন্য চোখের পানি ফেলতে নিংসংকোচ! আচ্ছা সে কি পারবে তার সন্তানের খুনীকে ক্ষমা করতে? হামজার

মুখটা মনে আসতেই আতঙ্ক ও ঘেন্নায় দম আটকে এলো তার।মাহেজাবিণ অপ্রকৃতস্থের মতো মাথা নাড়ে, “কিন্তু আমি পারব না। আমি পারব না, নাহ্, না না না না না.... আমার সন্তানের খুনীকে আমি ক্ষমা করব না, আম্মু। কোনোদিন না। ওর বাপও ক্ষমা করে যায়নি। তুমি জানো, তুমি জানো আম্মু, ওই খুনী পায়ে পা তুলে বসে অর্ডার দিলো আমার সন্তান আমার নাড়ি থেকে ছিঁড়ে আনার। তুমি জানো আম্মু, কীভাবে আমার গর্ভফুল থেকে ছিঁড়ে আনা হলো ওকে? তারপর মেঝের ওপর ফেলে রাখলো। আমি দেখলাম ওকে। আমার থেকে বিচ্ছিন্ন রক্তে মাখা একটা ছোট্ট

মাংসের দলা....আজও আমার তলপেটে অসহ্য ব্যথা হয়, আমার নারীদ্বার চিড়ে আসে, শুধু কোলে আমার বাচ্চা নেই, আমাকে মা বলে ডাকার কেউ নেই। আমার নারীজনম ব্যর্থ গেল...আমি ক্ষমা করব না, করতেই পারব না আমি ক্ষমা। তুমি পারো, মরিয়ম চাচি পারে, আমি পারি না।"

রাবেয়া অস্থির হয়ে দুহাতে মেয়েকে সামলান। অন্তূ উন্মাদের মতো বুকে হাত ঘষতে লাগল। এই চারমাসে অসংখ্যবার অন্তূর এই গোপন পাগলামির সাক্ষী রাবেয়া। দুনিয়া দেখে না এসব, এই পাগলামি শুধু তার সামনে

দৃশ্যমান। কেউ কেউ বলে, মায়ের ভাগ্য মেয়ে পায়। কথাটা সত্য হবার সম্ভাবনা প্রবল।

—

কবীরদের বাড়ির মেঝে পাকা, ইটের গাঁথুনির দেয়াল, তার ওপরে টিনের ছাদ। কবীর আগে পেশা হিসেবে রাজনীতির পাশাপাশি হামজার ওয়ার্কশপের দেখাশোনার কাজ করেছে। ওয়ার্কশপ বন্ধ হয়েছে। সে এখন বড়বাজারে এক মুদি দোকানের কর্মচারী। মাসিক বেতন খুব বেশি নয়। তাই দিয়ে যা হয়।

তুলিকে বিয়ে করা নিয়ে মায়ের সাথে মতবিরোধ জন্মেছিল খুব। বিবাহিতা, মেয়েসহ এক মহিলাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে অবিবাহিত

ছেলে, এটা কোনো মা মেনে নেন না। কবীর মাকে বোঝালো, ওটা কোনো বিবাহিতা, অন্যের মেয়ে কোলে মহিলা না। ওটা জয় আমিরের ফেলে যাওয়া জিম্মেদারী। তা কাধে তুলে নিতে না পারলে কবীর দম আটকেই মরে যাবে। কোয়েলের দিকে তাকালে তার ভেতরে যে স্নেহ জেগে ওঠে তা মা বুঝবে না।

মাহেজাবিণ তুলিকে ডেকে বসিয়ে বসেছিল, “আপু, আমি ছোট মানুষ। আপনার ভারী জীবনটা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবার মতো শক্ত মেরুদণ্ড আমার নেই। তবু একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। আপনি শুধু একবার না বললে

না।”-“এভাবে বলছো কেন? তুমি তো আমার বাপ, আরমিণ। যে দায়িত্ব তুমি পালন করলে এতগুলো দিন, আমার বাপও করেনি কোনোদিন।”

-“আমি আপনার বিয়ের প্রস্তাব এনেছি।”

তুলি নির্বাক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শুধায়, “আমার বিয়ে?”

-“কবীর ভাইয়ের সাথে।”

তুলি ওভাবেই তাকিয়ে থাকে।

-“সে ভালো-খারাপ সেই প্রশ্নে না যাই। কোয়েলকে ভীষণ ভালোবাসে লোকটা। জয় আমিরের প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তার যেকোনো আত্মীয় ও জিম্মেদারীর ওপর জান

কোরবান তার। আমার মনেহয় আপনি অন্তত সম্মান আর বেঁচে থাকার খোড়াকটুকু পাবেন। এর বেশি আমার সাধ্যি নেই, আপু। আমার পায়ের নিচে শক্ত মাটি থাকলে আমি... আমায় ক্ষমা করতে পারলে করবেন..''

তুলি মাহেজাবিণের হাতটা ধরে থামায় ওকে। কিন্তু হ্যাঁ বা না কিছু বলেনি মুখে। অন্তূ নিরবতাকে সম্মতি ধরে নিয়েছিল।কবীর তাকে ঘরে এনে এখনও এমন আচরণ করে যেন সে জয় আর হামজার বাড়ির সম্মান, তার ছোট্ট ঘরে অতিথি হয়ে এসেছে। কোথায় রাখবে, কোথায় বসাবে, কী খাওয়াবে, কীভাবে ভালো রাখবে— ব্যস্ততা অশেষ।

বিয়ের চারদিন পর দুপুরে খুব ঘেমে বাড়ি ফিরল। তুলি গামছাটা এগিয়ে দিয়ে বলল, “দ্রুত গোসল করে আসুন। খেতে দিই। আমারও খুব খিদে পেয়েছে।”

কবীর ব্যাতিব্যস্ত হলো, “আপনে খান নাই এখনও? ক্যান? শরীর খারাপ? কী হইছে? বেলা তো ম্যালা হইলো, খান নাই ক্যান?”

-“আরে! আগে ‘আপনি আপনি’ করে কথা বলা বন্ধ করুন। এত জোরে জোরে ‘আপনি আপনি’ করছেন, লোক শুনলে কী মনে করবে? আর আমি কি বয়সে বড় আপনার? ”কবীর লজ্জা পেয়ে গেল। তার তো মুখেই আসবে না বোধহয়। সারাজীবন আপামণি

বলে ডেকে অভ্যস্ত সে। কতবার হামজার হুকুমে তুলির শ্বশুরবাড়ি থেকে তুলিকে আনা-নেয়া করেছে সে! আজ তার ঘরের বউ সেই নারী।

তুলি বলল, "আপনার সাথে খাব বলে খাইনি। কোয়েলও খাবে। ওকে ঝাল খাওয়া শিখতে হবে এখন। তরকারী দিয়ে ভাত চটকে খাওয়ার অভ্যাস করাতে হবে।"

কবীর সঙ্গে সঙ্গে মুখ গোমরা করে, "ক্যান? আমার সাধ্যি নাই ওরে দুধ-মিষ্টি খাওয়ানোর এই জন্যে? ঝাল খাওয়া শিখার কোনো দরকার নাই। আমি এত অধম না।"

তুলি এবার ধমকে উঠল মৃদু, “কী আশ্চর্য! একবারও বলেছি তা? ও কি এখনও দুধের বাচ্চা আছে? বয়স পাঁচ হবে। সামনের বছর স্কুলে ভর্তি করাতে হবে। এখনও ভাত না শিখলে কী খাবে?”

কবীর মিইয়ে গেল ধমক খেয়ে। তুলি টের পেয়ে একটু স্বর নরম করে বলে, “যান, ওকেও গোসল করিয়ে আনুন। এ বাড়িতে এসে সারাদিন মাটিতে খেলার অভ্যাস হয়েছে।”পরক্ষণেই তার মনে পড়ল, সে কথা বলছে ইমোশোনাল বয় মোহাম্মদ কবীর আবেগী সাহেবের সাথে। আবার মাটিতে খেলাকেও নিজের গরীবী ধরে নিয়ে মুখ

কালো করে তার আগেই সে বলল, “ভালোই হয়েছে। খেলার সাথী পেয়েছে। খেলাধূলায় মন ভালো থাকছে। যান, গোসল সেরে আসুন। আমি ভাত বাড়ি।”

কবীরের মা তুলিকে কোনোভাবেই পছন্দ করতে পারেন না। তবু বিয়ের এই দুটো মাস পার করে তার মনে হলো–সে এই প্রথম সংসার করছে। আগে কখনও করার ভাগ্য হয়নি তার। মাটির চুলায় রান্না, একটা বখাটে অল্প কামানো নিজের ভাইয়ের চ্যালা তার খুব যত্নশীল স্বামী, অসুস্থ শ্বশুর, একটু খিটখিটে শাশুড়ি, টিনের ঘরে দিনের বেলার গমগমে গরম সব মিলিয়ে তুলির মনে হলো এতদিনে

সে নারী হয়েছে, এতদিনে সেই নারীর একখানা টানপোড়েনের সংসার হয়েছে, যে সংসার অধিকাংশ বাঙালি মেয়ের নারীগত অধিকার।এখানে এসি চলা রুম, মূল্যবান আসবাব যেমন নেই তেমন নেই রাতভর মদ পান করে এসে চুল ধরে আঁছড়ে মারা স্বামী নামক আসামী, নেই মাতাল এক কাপুরুষ, যার সম্মুখে স্ত্রী ধর্ষিতা হলেও তা স্বাভাবিক ঘটনা...

কোয়েল নিজের ঔরসগত বাপ হারালেও পেয়ছে একটা কবীর মামাকে। তুলি কোয়েলকে অন্য ডাক শেখায়নি। কোয়েল তার তোতলা মুখে ‘কবীল মামা’ ডেকে যে

আরাম ও স্নেহবোধ করে তা তুলি দেখেছে ওটা হুট করে কবীর মামা থেকে অন্যকিছু ডেকে সে পাবে না, মস্তিষ্কে বিরূপ প্রভাব পড়বে। কবীল মামা কোয়েলের ভেতরে জয়ের স্মৃতি দমিয়ে রাখতে সচেষ্ট। কোয়েল দিনে কমপক্ষে চার-পাঁচবার জয়ের খোঁজ চালায়। তার অভ্যাস এবং বিশ্বাস কবীল মামার কাছে জয়ের খোঁজ থাকে, কবীল মামাকে পাওয়া মানে জয়কে খুঁজে পাওয়া। কিন্তু আজকাল কবীল মামা প্রতারণা করছে বারবার।তুলি চোখ বুজে গভীর এক দম ফেলে জীবনের সমস্ত অন্ধকারটুকু এক ঢোকে গিলে আকাশের দিকে তাকিয়ে সৃষ্টিকর্তা ও

আরমিণের ওপর কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে তার চোখ ভরে ওঠে, বুকে ব্যথা হয়! আজ তরুটা বেঁচে থাকলে জয়ের বউ তারও একটা ব্যবস্থা ঠিক করতো। পাকা এক সিনা চওড়া, কাধ শক্ত কর্ত্রী ঘরে তুলে এনেছিল পাপী জয় আমির। তরু যে পুরুষকে ভালোবেসে গেছে আমরণ, তার তুলে আনা কর্ত্রী একহাতে গোটা একটি জিন্দা-লাশের মিছিল সামলে নিতে পটু, তরুটাকেও ঠিক একটা জীবন দিতো সেই নারী! তার আগেই তরুনিধী পালিয়েছে। বোকা তরু, ধিক্কার তার নারীত্বকে।

তুলির ঘরের কবীরটা একটু পাগল। কোয়েলকে ঘাঁড়ে চড়িয়ে প্রায় রোজ একবার যায় ঘোড়াহাঁটের কবরস্থানে। কীসের টানে যায় কে জানে!কোর্টের তারিখের চারদিন আগে মাহেজাবিণ ঘোড়াহাট যায় রাবেয়াকে নিয়ে। সঙ্গে কবীর। নারীদের অনুমতি নেই কবরস্থানের সীমানায় প্রবেশে। ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে মাহেজাবিণ সালাম জানায়, ‘আসসালামুআলাইকুম, ইয়া’আহলাল, কুবর।’ রাবেয়া ফটক ধরে মতো চেয়ে থাকেন ভেতরে, সন্তানের খুনীর শেষ ঠিকানা খোঁজেন ঝপসা চোখে। কবীর ভেতরে ঢুকে জয়

আমিরের কবরের পাশটায় দাঁড়ায়। স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে।
উঁচু ঢিবির মতো মাটি, লম্বায় ছাড়ে ছয় হাত মতো কবরখানা, তার নিচে জয় আমিরের লম্বা দেহটা শায়িত। এতদিনে কি সেই শক্ত-পোক্ত ক্ষতবিক্ষত দেহ অক্ষত আছে? মিশে যায়নি মাটির সাথে? দাপুটে জীবন, ব্যথাহীন শরীর, পাপী পৌরুষ, সাথে বুকের সমস্ত হাহাকার.. সব গিলে খেয়েছে মাটি আজ। মাটি এমনই। কত সভ্যতা, কত পাপ অথবা পূণ্য, কত বাহাদুরী সব গ্রোগ্রাসে গিলে যায়। আজ কবীর দাঁড়িয়ে আছে এত কাছে, জয় আমির আজ হেসে উঠল না। মিশ্র আঞ্চলিক

ভাষায় দুটো গালিসমেত কিছু রসিক কথাবার্তা বলল না। মাহেজাবিণ দূর থেকে দেখে ছোট্ট একটি লাঠির আগায় বোর্ড টাঙানো কবরের পাশে। কবরের মাটি কেনা। আবছা দেখা যায়, তাতে লেখা–মৃত: জয় আমির

পিতা: জাভেদ আমির

ঠিকানা: ঘোড়ার হাট, দক্ষিণ দিনাজপুর

মাহেজাবিণ শুধুই চাতকের মতো চেয়ে দেখল নিষ্পলক। জয় আমিরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ থেকে শেষ বিদায় অবধি সবটা চোখের পর্দায় ভেসে উঠে আবার নিভে গেল। বুকে চাপ ধরা এক বদ্ধ দমে হাঁপিয়ে উঠল সে। একটি পর্বতের অতখানি ভার তার শরীরটা শিথিল

করে তুলল। তখনই আচমকা রাবেয়া হু হু করে কেঁদে উঠলেন। মাহেজাবিণ ঝাপটে ধরে মাকে।-“কাঁদছো কেন, আম্মু? মানা করেছিলাম আসতে। জরুরী নয় তুমি যাকে আপন ভাববে, সেও তোমাকে তোমারই মতো আপন করবে। জরুরী নয় তুমি যাকে ভরসা করবে সে ভরসার যোগ্য হবে, যাকে স্নেহ করবে সে স্নেহের মর্যাদা বুঝবে। জয় আমিরেরা কারও আপন হয় না। চলো এখান থেকে। নয়ত কাঁদবে না, খবরদার। কান্না করাতে আনিনি তোমায় এখানে আমি।” রাবেয়া ধুলোর ওপর বসে পড়লেন। কবীর এলো, “কী হইছে চাচীর? কী সমস্যা? অসুস্থ

লাগতেছে নাকি? কাঁদতেছে ক্যান?
''মাহেজাবিণ রাবেয়াকে ধরে তুলে বলল, "এমনিই কাঁদছে। কাঁদার কোনো কারণ তার জীবনে নেই, তবু কাঁদছে। চলুন, আমরা যাই। বেলা পড়ে গেল।''

অন্তূ বেশ কিছুদূর এগিয়ে ঘাঁড় ফিরিয়ে দেখে একবার বিরোধীর কবরটা। এখন আর বোর্ডে লেখা জয় আমিরের পরিচিতি দেখা যাচ্ছে না। অনেকগুলো কবরের মাঝে জয় আমিরের কবরখানা মিশে গেছে, চোখে ধাঁধা তৈরি হলো, সঠিক অবস্থান বোঝা যায় না তখন আর।

পথে মাহেজাবিণ রাবেয়াকে নিয়েই ঢুকেছিল মরিয়ম বেগমের কাছে সেদিন আর খালিহাত ফেরেনি সে। রাবেয়া প্রচণ্ড পরিমাণে বন্ধুসুলভ, সরলা নারী। বোন পাতানো হয়ে গেল তার। তিনি মরিয়ম বেগমকে বললেন, "শোনো বোন, আমার কেউ নাই। স্বামী নাই, ছেলে নাই। কিন্তু আমার মা আছে। তুমারও কেউ নাই। চলো আমার সাথে। আমার মা তোমারও মা। আইজ থেকে দুই বোন আমার মা'র জিম্মেদারীতে বাস করব।"এই আবদার ফেলা বড় দায়। মরিয়ম বেগম দুটো মলিন শাড়ি, একটা নিজের হিজাব ও ছোটখাটো একটি পুটলি বাঁধলেন মাহেজাবিণের দায়িত্বে

গা ছাড়ার জন্য। শেষে তিনি আরেকটি ছোট হিজাব পুটলিতে রাখলেন। ওটা মুমতাহিণার। গোলাপী রঙা প্রিন্টের কাপড়ে তৈরি। ওতে এখনও মুমতাহিণার গন্ধ লেগে আছে। ওটা ফেলে যেতে পারেন না মরিয়ম।

আমজাদ সাহেবের চার কক্ষের ছোট্ট ইটের গাঁথুনির বাড়িটা অনেকগুলো জীবন্মৃতর আবাস হলো। রিমির জায়গা হলো মাহেজাবিণ এর কক্ষে।আদালতে নেবার দু'দিন আগে সরকারী হাসপাতাল থেক হামজাকে পুলিশফাঁড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। ডিটেনশন সেলের ভেতরে হুইল চেয়ারে অনড় হামজাকে দেখে মাহেজাবিণের মনে

পড়ল তার গর্ভপাতের নির্দেশ দিয়ে আমির নিবাসের কেন্দ্রীয় চেয়ারখানায় হামজার বসে থাকার দৃশ্যটা। দোলন সাহেব সেলের বাইরে একটি মরিচা ধরা লোহার চেয়ারে বসলেন। মাহেজাবিণ সেলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে মুখের নিকাবটা খুলে ফেলল।

-"আপনার ওপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক, হামজা সাহেব।"

সে নেকাব খুলতেই চোখ থামল হামজার। নিষ্পলক দেখল নারীটিকে। কঠোর সৌন্দর্য আজও চেহারায় লুটোপুটি খায়। চোখের নিচে কালি, তবু চোখজোড়ার সৌন্দর্য একরত্তি ম্লান হয়নি, আর না আগুন নিভেছে। ঠোঁট, নাকসহ

ত্বকের রঙ সবটা প্রতিক্ষণে অ-মৃত সৌন্দর্যের ঘোষণা দিচ্ছে। এবং তা ভয়াবহ। সেই সুশ্রী চেহারায় নজর বুলিয়ে হামজার পৌরুষ চোখে সামান্য অনুরাগ আসে না, বরং দমে থাকা আক্রোশ পর্বত ফুঁড়ে বেরোনো ম্যাগমার মতো দগদগ করে ওঠে।সে বহুদিন পর এক টুকরো বাহ্যিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে হাসে, "ভাবিনি শেষ জীবনে এক চার আনার মেয়েলোকের সঙ্গে বিরোধ লড়তে হবে।" মাহেজাবিণও হাসে একটু, "কেন ভাবেননি? ভাবেননি কেন, হামজা সাহেব! ধ্বংসের খেলা তো খেলেছেন এক মেয়েলোকের জীবনের সাথেই, তাহলে এটা কেন ভাবেননি যে

খেলার বাজি পাল্টাতে পারে? আপনারা কেন এত নিশ্চয়তা রাখেন সব নারী রিমি হয়।”
-“রিমিকে আর রিমি রাখোনি।”
-“বিশ্বাস করুন সামান্য প্রচেষ্টাও ছিল না আমার, তাকে পরিবর্তনে।”
হামজার চেয়ার বয়ে নিয়ে এগিয়ে এসে কম্পিত বাম হাত দ্বারা সেলের শিক চেপে ধরে, “চুপ, কুচক্রী মেয়েলোক!-“কুচক্রী বলতে কী বোঝেন? নাকি আপনারা দুই ভাই শুধু শব্দ জানেন, অর্থ ছাড়া। যার তার জন্য যা তা! এক কাপুরুষ মূর্খ আমাকে বলে গেছে ছলনাময়ী, আবার আপনার কাছে কুচক্রী। আপনারা কি নিজেদেরকে জমিনের ওপর

সৃষ্টিকর্তা প্রেরিত শান্তির দূত মনে করেন নাকি?''

হামজারর শ্বাস-প্রশ্বাস গভীর হয়, সে ঠান্ডা বিস্ময়ে বলে, ‘‘আজও সেই দুঃসাহস!

-‘‘এটা আমার অলংকার।''

-‘‘সব হারিয়েছ এর দায়ে। জিততে পারোনি।
''

-‘‘আপনি পারলেই হতো! আমি তো অবলা, শক্তিহীন, নির্বোধ মেয়েলোক। অজায়গায় দুঃসাহস দেখিয়েছি। আপনি হারলেন কীসের দায়ে?''মাহেজাবিণের জিতে যাওয়া চোখে চোখ রেখে লাল হয়ে ওঠে হামজার চোখজোড়া। চোয়াল ও পক্ষাঘাতগ্রস্থ হাতদুটো

অবধি থরথর করে কাঁপে। ভেতরের যন্ত্রণা ও দহন লুকানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা ব্যর্থ যেতে থাকে।

-“পিঠপিছে ছুরি গেঁথে বাহাদুরী দেখাইও না, নাদান মেয়েলোক। জয়কে টার্গেট না করে আমার অন্য যেকোনো কিছুতে হাত রাখতে.... তুমি জানো, আমি খুব ভালোভাবে জানি তোমার নরম-কোমল, চুড়ি পরা হাত কীভাবে মটমট করে ভাঙতে হয়। পুরুষ নাচাতে ভালোই জানো, জানা ছিল না। জয়কে কব্জা করে খুব খেললে।”

-“বুঝলাম, পাগল হয়ে গেছেন আপনি। খারাপ না, এ আর এমন কী! কতলোক এমন

হয়েছে আপনার খাতিরে! আমি ও আমার ভাতিজি হয়েছি বাপ হারিয়ে, আমার মা ও ভাবী স্বামী হারিয়ে, কত মেয়ে হয়েছে ইজ্জত হারিয়ে, অসংখ্য মা হয়েছে তাদের সন্তান হারিয়ে। সব চলে, হামজা সাহেব। টেইক ইট ইজি। আপনি আর কত বড় খেলোয়ার! আসমানের উপরে যে মালিক বসে আছে, তার খেলা খেলার ঊর্ধ্বে।''হামজা কিছুক্ষণ চোয়াল এঁটে ঠান্ডা নজরে দেখে মাহেজাবিণকে। এরপর শুধায়, "কেন এসেছ? ''

-"দেখা করতে এলাম। কত পুরোনো আর গভীর সম্পর্ক আমাদের!''

হামজা হাসে, “আসলেই। উদ্দেশ্য বলো।”
-“আপনি আর সেই যোগ্য আছেন যে আপনাকে কোনো গুরুতর উদ্দেশ্য বলতে এতদূর বয়ে আসব?”
-“আমার পঙ্গুত্বকে তাচ্ছিল্য কোরো না। তোমার তো আমার পঙ্গুত্বকে পুঁজো করা উচিত। তুমি জানো, এটাই তোমাকে বাঁচার সুযোগ করে দিয়েছে।”
মাহেজাবিণ খানিকটা ঝুঁকে ফিসফিস করে বলে, “জানি। তবে আপনি কি জানেন আপনাকে পঙ্গু হয়ে বাঁচার সুযোগ আমি দিয়েছি?”-“বেশিদিন টিকতে পারবে না, আমি না চাইলে।

-“আজ তিন মাস আছি।”

-“তিন যুগ নয়।”

-“আপনি নিজেকে দেখুন। আপনার-আমার দ্বৈরথ কাউকেই টিকতে দেয়নি, হামজা সাহেব। দুজন দাঁড়িয়ে জলসিঁড়ির দুই ধাপে। যখন-তখন তলিয়ে যাব।”

এই পথের শুরু ভার্সিটির এক টিচাররুমে। যেদিন হামজা তার এক মামুলি শিকারকে চোখ তুলে দেখার প্রয়োজন অবধি বোধ করেনি। আজ তারা প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে কারাগারের এপার-ওপার। অনেকক্ষণ সময় দুজন দুজনের চোখের দিকে অপলক তাকিয়ে রইল। নিঃশব্দ এক দামামা বেজে উঠল

দুজনের বুকের ভেতরে। যে যুদ্ধে কেউ জেতেনি, হেরেছে দুজন, হারিয়েছে দুজন। দুজনের চোয়াল শিথিল হয়ে এলো। সিক্ত হলো চিত্ত। তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত দুই বিরোধী আজ খালিহাত।

সেল খুলে আইনজীবী ও মাহেজাবিণকে ভেতরে যেতে দেয়া হয়। হামজা শান্ত-পরিশ্রান্ত গলায় বলে, "তুমি বয়সে অনেক ছোট আমার।"-"তা ভেবে জীবন ভিক্ষা দিতে পারতেন।"

হামজা মাথা দোলায়, "অনেক ছাড় দিয়েছি।"

-"ছাড়ই এমন!?"

-"তুমি কোনো ক্ষতি করোনি আমার?"

-"আপনার ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে আজ অবধি কিছু করিনি আমি। কেবল আপনার কালো হাতদুটোকে ঠিক এরকমই পঙ্গু অবস্থায় দেখতে চেয়েছি।"

-"তাতে আমরা শেষ হয়ে যাব?"

-"দশজন যদি বিশটা অপরাধ করতে পারে, আটজন ষোলো। মাইনাস ফোর। অল্প থেকে শুরু হোক। এবার বলুন, হাত তো খালি, কী পেলেন এই অসুস্থ পথচলায়?"

-"তুমি কী পেলে? আমার কাছ থেকে জয়কে সরিয়ে তুমি.."-"কূটনি মহিলাদের মতো অপবাদ রটানো ছাড়ুন। জয় আমির আত্মহত্যা করেছে। তাকে কেউ মারেনি। সে ছিল এক

কাপুরুষ, পাপ করেছে বুক ফুলিয়ে, শাস্তির পালা এলে পিঠ এগিয়ে দিয়েছে ঝাঝরা হতে। ”

হামজার চোখে এক পৃথিবী ভঙ্গুরতা এসে ভর করে। দাঁতের মাড়ি চেপে ধরে। তারপর আচমকা বাম হাতে মাহেজাবিণের গলা চিপে ধরে। হাত শিথিল, অসাড় প্রায়, তবু পৌরুষ থাবা।

-“তুমি থামাওনি। সে তোমার জন্যই...”

মাহেজাবিণ সামান্য বিচলিত হয় না, গলা মুক্ত করার চেষ্টা না করে বলে, “সেদিনের সতর্কবাণী মেনে নিলে আজ আপনি অন্য অবস্থায় থাকতে পারতেন। বলুন তো জয়

আমির আত্মহত্যা কেন করল?''হামজার শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। আবার একলেমসিয়ার মতো এক প্রকার খিঁচুনির উদ্রেক হতে লাগল। মাহেজাবিণকে ছেঁড়ে দিয়ে থরথরিয়ে কাঁপা হাতের দুই তালুর দিকে তাকিয়ে থাকে হামজা।

-"তুমি জানো? এই দুই হাতে আমি কতবার ওর কপালে জলপট্টি দিয়েছি। তখন আমার কাছে জ্বরের সিরাপ কেনার পয়সা থাকতো না। কত দুপুর পুকুরে ঝাপ পেড়ে সাতার শিখিয়েছি। তুমি তখন ছিল? নাহ্! কেউ ছিল না। শুধু আমি ছিলাম। আজও ও পারতো একসাথে সাতার কেটে বর্ডার পার হয়ে

পালাতে আমার সাথে। আমাকে রেখে চলে গেছে, নিমোকহারাম।”

মাহেজাবিণ ম্লান হাসে, “কেন চলে গেছে, তা ভাবছেন না কি ভয়ে? কোথাও কারণটা আপনি না হোন!”

হামজার চোখে কাতরতা দেখা যায়।

মাহেজাবিণ উদাস স্বরে জানায়—“একজন ভরসাহীন মানুষ নিজের জীবনের সবটুকু ভরসা ও ভালোবাসা দিয়ে দেয়া মানুষটির কাছে হেরে যায়, মানুষ আর একটুও বাঁচার স্পৃহা কোথাও খুঁজে পায় না। বোঝেন এসব কথা? কখনও ভেবেছেন, আপনি জয়কে কতবড় জখম দিয়ে দুনিয়াছাড়া করেছেন?

যার চেয়ে বড় জখম আর দেয়া সম্ভব নয় কোনো মানুষকে, ঠিক ততখানি আঘাত আপনি করেছেন জয় আমিরকে। সেই জয় আমিরকে, যে আপনার নামে নিজের সবকিছু বকসে দিয়েছিল, আপনার পালিত পশু হয়ে বেঁচে ছিল, নিজের পরিচয় ও গর্ব বিসর্জন দিয়ে। এবার ভাবুন, যখন সে জানতে পারল তার জীবনে সে সব হারানোর পর নিজের বেঁচে থাকা রুহটা অবধি যাকে সঁপেছিল, সেই বড়সাহেবই তাকে তার জীবনের সবচেয়ে বড় আঘাতটা করেছে, তার কেমন লেগেছিল? আমি আপনাকে সময় দিলাম দুই মিনিট। ভাবুন।''

হামজার হৃদস্পন্দনের গতি অসুস্থ পর্যায়ে বেড়ে গেল। হতবিহ্বল হয়ে পড়ল সে। ইশারায় মাহেজাবিণকে থামাতে চাইল।-“আপনি আমার সন্তান ছিঁড়ে নিয়েছেন, শুধুই আমার ভেবে। ভুলে গিয়েছেন পরের জন্য কাটা খালে নিজে পড়া দুনিয়ার পুরোনো নিয়ম। বাচ্চাটা আপনার জয়ের ছিল, জয়ের জয়ের। সেই জয়, যে আপনার খাতিরে পাপ আর পূণ্যকে এক পাত্রে গুলিয়ে জীবনের বিষ-পানীয় তৈরি করেছিল। একটা তেতো সত্যি বলি? আমি যে মুহুর্তে আপনাকে দুশমন হিসেবে সচেতন করেছিলাম, ওই মুহুর্তে আমি মূলত আপনাকে

জয় আমিরের মৃত্যুর খবরটা শুনিয়েছিলাম। শুধু খুলে বলিনি বাক্যটা।''

-"তুমি জানতে? কী জানতে?''-"আপনি কেন জানতেন না, এটাই বিস্ময়কর প্রশ্ন। যে মানুষ বেঁচে থাকতেই নারাজ, মরণে তার চরম আগ্রহ, যে লোকটা নিজের পরিচয়ের পেছনে উন্মাদের মতোন ছুটেছে বছরের পর বছর। তার কাছ থেকে একে একে সমস্ত পরিচয় কেঁড়ে নেয়া হলে তার বাঁচার প্রশ্ন আসে কোত্থেকে? আপনি দেখেননি জয় আমিরের মৃত্যুকে আলিঙ্গনের তোড়জোর।আমি দেখেছি আপনার কাছ থেকে ফেরার পর তার মৃত্যুতৃষ্ণা....

সে মৃত্যুর আগেও শুধু একটাবার আমার কাছে স্বীকৃতি পেতে চেয়েছিল সে বেঁচে থাকলে অন্তত কেউ তার সঙ্গী হতো। অথচ আমি দেখছিলাম সে পালাবে, এই অল্প সময়ে সে শুধু বিশ্বস্ত কাউকে নিজের রেখে মরতে চায়।''

হামজা বিদ্রুপের হাসি হাসে, “তুমি জয়ের বিশ্বস্ত কেউ হতে?মাহেজাবিণ আর জবাব দেয় না। চুপচাপ চেয়ে থাকে হামজার দিকে। তাকে কখনোই কোনো অসুস্থ মানুষকে ব্যাঙ্গাত্বক চোখে দেখার শিক্ষা দেয়া হয়নি। হামজাকে দেখে তার খারাপ লাগছে না ভেবে খারাপ লাগে তার।

বিশ্বাসঘাতকতা তার ধর্ম নয়। জয় আমির মানুষ চিনতো খুব। সেদিন আরমিণ রাজী হওয়া মানে জয় আমিরের পাপা মেনে নেয়া, আর পাপ মেনে নিলে আরমিণ হতো তার সবচেয়ে বিশ্বস্তজন, আমরণের সাথী, কারণ আরমিণ ঠিক সাদা পায়রার মতোই পবিত্র আত্মা– এটাই জয়ের ধারণা ছিল। কিন্তু মিথ্যে আশা আরমিণ দেয়নি সেদিন তাকে। কারণ জয়ের পাপ হাশরেও কবুল নয় তার। আর জয় আমির আর বাঁচতে চায়নি। কারণ তার সহ্যক্ষমতা বিদীর্ণ হয়ে গেছিল এবার।

হামজার শরীর ঘেমে টুপটুপ করে পানি পড়তে লাগল, যেমনটা সদ্য গোসল করা

মানুষের শরীর বয়ে যায়। দোলন সাহেব উঠে দাঁড়ালেন, “শান্ত হও, হামজা।”-“স্যার ওই চতুর মেয়েলোক কী বলছে? ওকে থামতে বলুন।”

-“ও থেমেছে। তুমি নিজেকে থামাও...”

বদ্ধ সেলের কংক্রিটের চার দেয়াল হামজাকে একটা বার্তা দেয়—

‘এক বিরোধিনী তোমার জয়ের রক্ত গর্ভে ধারণ করে সে হলো জয়ের সর্বোচ্চ আস্থাভাজন, তুমি আপনজন সেই রক্ত ধ্বংস করে হলে একমাত্র দূর্জন।’

দোলন সাহেবের সঙ্গে কেইসের ব্যাপারে কিছু কথা হবার পর হামজা শেষবার একবার

রিমির সঙ্গে দেখা করতে চায়। তারপর মাহেজাবিণকে ডাকে–

"আরমিণ! তুমি আর মুরসালীন পথে অন্ধকারকে পেয়ে বাধ্য হয়ে তা গ্রহণ করেছ। আমি অন্ধকারে জন্মেছি, আমি অন্ধকারে গড়ে উঠেছি।"

-"অথচ তা কখনোই হামজা এবং জয় আমির হয়ে ওঠার শর্ত হতে পারে না।"

হামজা হাসল, "সাবধানে থেকো। তোমার পথ ঠিক ততটা কঠিন হবে, যতটা তোমার কল্পনার সীমানায় নেই।"

-"ধন্যবাদ আপনার শুভাকাঙ্ক্ষার জন্য। দেখা হচ্ছে আপনাদের নিজস্ব আদালতে।

''অক্টোবরের ২০ তারিখ, ২০১৫ তে আসামী হামজার বিচারকার্য হয়েছিল অদ্ভুত। যাকে বলে অনাকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু রাজনীতি মাত্রই অনাকাঙ্ক্ষার সমন্বয়মাত্র।

প্রথম আধাঘণ্টা কেবল হামজার রাজনৈতিক জীবনের ফিরিস্তি ও তার শারীরিক অবস্থা বর্ণনায় কেটে গেল। হামজার পক্ষের উকিল হামজাকে কেবল একজন পক্ষাঘাতগ্রস্থ পঙ্গু রোগী হিসেবে যুক্তি-তর্ক স্থাপন করে সেটা আদালতে উপস্থিত জনতার ভেতরে ফিট করতে করতে তিনি ঘেমে উঠলেন। দোলন সাহেবের সঙ্গে ভালো রকমের তর্ক হলো। কিন্তু মানবিকতার কথা নেই কোনো। ডিফেন্স

মহোদয় রজব আলমগীর মানবিকতার ওপর প্রশ্ন তুলে পুরো আদালতকে আবেগী করে তুলতে সফল হয়ে গেলেন।অবাককর ঘটনাটা খুব কম সময়ে ঘটে গেল। হামজা এমপির খুনই করেনি। সে করতেই পারে না। কারণ এমপির খুন তার এক্সিডেন্টের কমবেশি দুই-সপ্তাহ পরে সংঘটিত হয়েছে। হামজার চিকিৎসক এসে চমৎকার সাক্ষী দিয়ে গেলেন যে, সম্ভবই না। কড়কড়ে কাগজের রিপোর্ট পেশ করা হলো—হামজার মেরুদণ্ড(স্পায়নাল কর্ড) সড়ক দূর্ঘটনায় কী পরিমাণ ড্যামেজ, এই অবস্থায় রোগী নিজ শক্তিতে চলাচল করতে অবধি অক্ষম, সে কী করে এমপির

খুন করতে পারে? তাকে এমপি মার্ডার কেইসে ফাঁসানো হয়েছে কেননা এমপি জীবিত অবস্থায় তাকে ভালো চোখে দেখতো না।

এছাড়া তার অপরাধ কেবল রাজনীতিতে একটু অনৈতিকতা আর কী! ওসব কোনো গোণায় ধরার মতো বিষয় নাকি? ১৬ই জুলাই দিবাগত রাতে পাটোয়ারী বাড়িতে যে বেশ কয়েকটি খুনের ঘটনা ঘটেছিল, তা জয় ঘটিয়েছিল আদালতে প্রমাণ হয়ে গেল। হাতকাটা সেই ডাক্তার সাক্ষী দিলো। মাহেজাবিণ পাথরের মতো বসে দেখল শুধু। শেষ সময়ে হুইল চেয়ার ঠেলে হামজাকে

আদালতে আনা হয়েছিল। বিচারক মহোদয় নিজেই কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা হামজার অবস্থা দেখে। এরকম এক নিষ্পাপ, অসুস্থ যুবক এমন ধরণের অপরাধ করতে পারে? হামজার নামে অভিযোগ হলো–সে নাকি এমপির ও এমপির স্ত্রীর ভাগিনা যে কিনা নিজের বোনের। স্বামী, তাকে খুন করেছে। এটা কখনও বিশ্বাসযোগ্য? নিজের বোনের স্বামীকে কেউ কেন খুন করতে যাবে? এছাড়া হামজার অবস্থা দেখার পর নতুন মোড় এলো, হামজার এই অবস্থা করেছে জঙ্গিগোষ্ঠী ও বিরোধী দলের কর্মীরা সম্মিলিতভাবে।

অতিসত্বর তাদেরকে বিচারের আওতায় আনার হুকুম দিয়ে আদালত ফুরোলো। দোলন সাহেব সব বুঝলেন, চুপচাপ গিললেন। হামজাকে আবার স্থানান্তর করা হলো পুলিশফাঁড়িতে। দোলন সাহেব গেছিলেন তার সঙ্গে সাক্ষাতে। হামজা হেসে ফেলল তাকে দেখে—-"স্যার, আপনি আমার ওপর এত আক্রোশ কবে জমিয়েছেন?"

-"কে বলে আক্রোশ?"

হামজা হাসে, "অবাক হননি তো আবার আদালতে?"

-"প্রশ্নই ওঠে না। আমি আনাড়ি বা অবুঝ-চোখকানা জনতা নই হামজা। আমার আন্দাজ

ও জানা সম্বন্ধে তোমার ধারণা থাকা দরকার। শুধু বলো, তুমি কি এটাই চেয়েছিলে?''
-“না। কয়েকদিন আগ অবধি চাইনি। তবে যেদিন আমার নারী-বিরোধী ও আপনি সাক্ষাতে এলেন, তারপর চাওয়াটায় বদল এলো। কী করব, স্যার? এক কোমড়ভাঙা মাগী মানুষ আর আপনার মতো হুট করে মানবিকতার গান গাওয়া উকিল মশার কাছে হারা তো আমার সাজে না!''আদালতের তারিখের দু'দিন আগে উপরমহলের সদস্য এলো হামজার কাছে। হামজার পরিকল্পনা তখনও— আদালতে উঠেই গড়গড় করে

জীবনের সব সত্যি বলে দিয়ে ফাঁসির মালা গলায় চড়ানো।

এটা জেনে উপরমহল ক্ষেপে ক্ষেপণাস্ত্র। হামজা যে ভাঙা জাহাজের ছেঁড়া পাল হয়ে গেছে, যা দমকা হাওয়ায় দিগ্বিদিক হন্য হয়ে কেবল পতপত করে উড়ছে। তাতে উপরমহলের কোনো যায়-আসে না। তারা কেবল চান আদালতে সরাসরি হামজার কার্যক্রম সামনে না আসুক, কোনোভাবেই না। এটা হামজার নয়, দলের অস্তিত্ব ও নামের প্রশ্ন। এসব কাজ খোলা ময়দানে আসার মতো নাকি? আদালতে হামজা স্বীকার করবে যে সে একগাদা শিশু ও মুরসালীনের মতো

যুবকদেরকে বড়ঘরের মতো কুঠুরিতে আঁটকে রেখে রক্তের খেলা খেলেছে, এটা হতে দেয়া যায় নাকি?উপরমহল থেকে হামজাকে শাসিয়ে যাওয়া হলো যে— তার কিছুই সামনে আসবে না। সে প্রায় বেকসুরমতো খালাস পাবে, অথবা জনগণের মনের সান্ত্বণার জন্য তার ছোট-মোটো অভিযোগে দু-চার মাস কারাগারে কাটানো লাগতে পারে। এর জন্য যা যা দরকার, যা প্রমাণ, সাক্ষী, হাতে বানানো আদালত সব ব্যবস্থ্ উপর থেকে হয়ে যাবে, হামজা কেবল চুপ থাকবে, চুপ। এটুকুই তার কাজ। না হলে হামজার বউ, বোন, বোনের মেয়ের সাথে খুব একটা ভালো আচরণ করা

হবে না। তার সাথে কী করা হবে, তা বলা যাচ্ছে না। আর তার বলা কথাগুলো ধামাচাপা দেয়া অসম্ভব কিছু না।এসব কথা দোলন সাহেবকে হামজা বলল না। সে শুধু আরমিণের কাছে হারতে রাজী নয়।

এরপর উপরমহলের নজরদারীতে রইল সে। কিছুদিন পর পাটোয়ারী বাড়ির সিলগালা খুলে দেয়া হলো। রিমিকে সঙ্গে নিয়ে সেই মারণকুঠুরিতে বসবাস শুরু হলো। শরীরের অবনতি-উন্নতি কিছু নেই। বাম হাতটা কোনোমতো নড়াতে পারা যায়। চিকিৎসার জন্য পয়সা দরকার অগাধ, তবু নিশ্চয়তা নেই সামান্য কিছুটা উন্নতিও হবে কিনা!

নিউরোলজিস্টরা হাল ছেড়ে দিয়েছেন। শরীর প্রায় সবটা অবশ। তার ভেতরের প্রতিক্ষণের অন্তরজ্বালা তাকে ধীরে ধীরে এক অদ্ভুত মৃত্যুর দিকে নিয়ে চলল। দিনকে দিন সে হয়ে উঠল ঠিক তার হুইল চেয়ারটার মতোই জড়-অসাড় আসবাব।আর রিমি তার জড় সেবিকা। যে সঙ্গ ছাড়েনি অথচ সঙ্গে নেই। হামজা রোজ প্রহর গোণে কবে জয় স্বপ্নে এসে একবার হেসে ভাই বলে ডেকে যাবে। হামজা শুনেছে মৃত মানুষ স্বপ্নে ডাকলে তারপর খুব শীঘ্রই মানুষ সেই মৃতর সঙ্গে চলে যায় জীবন ছেঁড়ে। সে রিমির কাছে রোজই অনুরোধ করে চলে যেতে। এক পঙ্গু,

চলনশক্তিহীন মানুষের দেখভাল করে জীবন নষ্ট করার মানে নেই। তাকে ফেলে চলে গেলে কয়েকটা দিনই মাত্র হামজা বাঁচবে এই অরুচিকর দুনিয়ায়। এটা হামজার একমাত্র চাহিদা আজ। সে যেতে চায়, বহুদূর...যতদুর জয় পৌঁছে গেছে।মাহেজাবিণ থামলে সিস্টার ক্যাথারিন সেদিন এ পর্যায়ে মিনিট দশেক চুপ থেকে আস্তে কোরে শুধু বলেছিলেন, "জয় আমিরের রেখে যাওয়া দ্বিতীয় কাগজটা কোথায়? দেখেছিলে সেটা?"৩০ জুন ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দের সূর্য-ওঠা সকালে মাহেজাবিণ বসার কক্ষ থেকে উঠে আব্বুর রুমে যায়। বহুদিন বন্ধ পড়ে থাকা ধুলো জমা আলমারীটি খোলা

হলো সেদিন। একটি গোল কোরে মোড়ানো কাগজ মাহেজাবিণ বের এনে সিস্টারের হাতে দেয়।

হাতটা একটু শিউরে ওঠে সিস্টারের। মোড়ানো কাগজটি ভারী। ভেতরে কিছু একটা। মোড়ক খুলতেই আরেকটি ছোট্ট কাগজ জড়ানো ভারী বস্তুটি হাতে আসে। একটি হাতঘড়ি। সেটার চকচকে প্লাটিনামের গোলক-প্রান্তে ভোরের আলো পড়ে তা চিকচিক করে ওঠে। ওটার ডায়ালের সাথে মুড়ে থাকা চিরকুটটি খুলে পড়েন সিস্টার—

উকিল ম্যাডাম,

চিহ্ন না দেখা গেলে শালার মানুষ নিজের গায়ের জন্মদাগ ভুলে যায়, আমারে কী মনে রাখবে? এই আমার চিহ্ন রইল। রেখে দিয়েন আপনার কাছে। নয়ত আমাকে মনে রাখার মতো কেউ হয়ত থাকবে না দুনিয়ায়। কেউ মনে না রাখলে এই দুনিয়া দিব্যি একটা আস্ত জয় আমিরকে ভুলে যাবে। এইটা ঠিক না। বড় সাহেব দিছিল এইটা আমার পঁচিশতম জন্মদিনে, ২০১২-তে, পঁচাত্তরতমতেও যেন থাকে; আপনার কাছে। ততদিন আমি থাকব না। ওহ, হাহ্! এইটা সেই ঘড়ি, যেইটা আমার হাতে ছিল সেইদিন, যেইদিন আপনার সাথে ভার্সিটির মাঠে আমার প্রথম দেখা।

আবার এইদিনও, যেইদিন আপনার নামে আমি একটা বলি চড়াইতে আসছি। এই শালা ঘড়ি আমার জন্যে কুফা আর আস্ত একখান বেইমান। থাকে আমার হাতে, অথচ শালার কাঁটা টিকটিক করে আপনার নামে। তো ওইটা আপনার কাছেই থাকুক।সিস্টার সাতবার পড়লেন লেখাটুকু। হাতটা শিরশির করছে বোধহয়। এলোমেলো নজর তুলে তাকালেন মাহেজাবিণের দিকে। মাহেজাবিণ মৃদু হেসে ভ্রু নাচায়। ঘড়িখানা দেখতে ইশারা করে। জয় আমির হাতঘড়ির ক্ষেত্রে খুব সৌখিন ছিল।সব অক্ষত থাকলে নিশ্চয়ই আজও পাটোয়ারী বাড়িতে তার কক্ষের

আলমারীতে নামী-দামী ব্রান্ডের বেশ কয়েকটা ঘড়ি তোলা আছে। সেইকো-অ্যাসট্রোন, পাটেক ফিলিপ, ক্যাসিও...

সিস্টার ঘড়িখানা হাতে তুলে নেন। বেশ ভারী। অডেমার্স পিগুয়েট ব্রান্ডের রয়্যাল অ্যাক মডেলের হাতঘড়ি ওটা। দাম কমবেশি লাখখানেক হবার কথা। এক অন্ধকার সমুদ্র অথবা কালচে স্যাফায়ার (নীলমণি) রত্ন-রঙা ঘড়ির ডায়ালটিতে সিস্টারের চোখ ধাঁধায়। ওটার ডায়ালের যে গম্ভীর রঙ, তার আনুষ্ঠানিক নাম মূলত 'ব্লু গ্রাঁন্দ ট্যাপিসেরি। সেই চকচকে ডায়ালে জয় আমিরের চিহ্নরূপে লেপ্টে আছে পুরোনো কবেকার শুকনো লাল

তরলের ছাপ। একটা বলি চড়ানোর দিনের পরিহিত ঘড়ি যে! রক্তটুকু জয় আমিরের, এটা সিস্টার জানেন। কারণ সেই রক্তে হাত ছুঁইয়ে উনার মনে হচ্ছে এই রক্ত খুব চেনা, বহুপুরোনো জানা-শোনা।

উনাকে চোখের ছটফটানি দেখে মাহেজাবিণ হাসে, "কেমন লাগছে আপনার বহুল আকাঙ্ক্ষিত, অদেখা পাপীর চিহ্ন ছুঁয়ে? আরও কিছু আছে। চাই?" মাহেজাবিণ উঠে যায়। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে সেন্টার টেবিলের ওপর কিছু ধাতব পৌরুষ-অলংকার রাখে। দুটো ব্ল্যাক টাংস্টেনের আংটি, একটি রূপোর তৈরি রিস্টলেট, একটি প্লাটিনাম ধাতুর তৈরি

শিকল আকৃতির চিকন ফিগারো-চেইন। তার লকেটটির আকৃতি J অক্ষর। প্রতিটা বস্তুতে রক্তের ঘ্রাণ ও আবছা ছাপ লেগে থাকা জিনিসগুলো হাতে ছুঁয়ে সিস্টারের মনে হলো তিনি এবার সচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন জয় আমিরের রক্তাক্ত নিথর দেহখানা, গুলি বুক ফুঁড়ে বেরোনোর পর রক্তে চেইন ও রিস্টলেট ভিজে ওঠার দৃশ্যটি। হামজার হাহাকার আর আরমিণের স্তব্ধতা।

এরপর জয় আমিরের রেখে যাওয়া বড় কাগজখানা সেদিন ভোর সকালে সিস্টার ক্যাথারিনের চোখের নোনাজলে ভিজেছিল।

একটি A4 আকারের কাগজ, তার দু'পাশ

ভর্তি লেখা। চিঠি নয়, পত্র, দরখাস্ত, কোনো সংবাদ অথবা ইচ্ছেপত্র নয় ওটা। কেবল একটি কাগজ, যার এপাশ-ওপাশ লেপ্টানো রক্তের ছোপ ছোপ দাগে, আর পৃষ্ঠাখানা ভরে কীসব লেখা!

চোখের অঘটন টের পেয়ে তিনি দ্রুত তা আঙুল বুলিয়ে মোছার চেষ্টা করেন। লাভ হলো না। ততক্ষণে সিস্টারের চোখের সবটুকু পানি পৃষ্ঠাখানা শুষে ভিজে উঠেছে। এতে কাগজের তৃষ্ণা মিটেছে কিনা বলা যায় না। কিন্তু সিস্টারের তৃষ্ণা বাড়ল। সেই তৃষ্ণা মেটানোর প্রথম ধাপে তিনি জানতে চাইলেন, মাহেজাবিণের ২০১৫ থেকে ২০১৮ অবধি

আসার যাত্রা সম্বন্ধে কৌতূহল গাঢ়। একের পর এক প্রশ্ন করছিলেন।অনার্স শেষ বর্ষে থেকে মাহেজাবিণকে পড়াশোনায় মনোযোগী হতে হয়েছিল পুরোদমে। এ সময়টাতে নিরাপত্তা দেবার জন্য কবীর চুপিসারে সর্বদা প্রস্তুত ছিল বাহিনী নিয়ে। এটার পেছনে তুলিরও হাত ছিল। সে শ্বশুরবাড়ি থেকে মায়ের বাড়ি আসার মতো তখন নাইয়রে আসে মাহেজাবিণের কাছে, সেই নারীকে নিরাপত্তা না দিলে সে কবীরের ঘর নাও করতে পারে। কিন্তু এটা মাহেজাবিণের পছন্দ ছিল না। এখানে একটা ঋণ জমা হবার ব্যাপার রয়ে যায়। কারও কাছে ঋণী হলে

মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়, এক্ষেত্রে বিনয়ী হতে হয়, আর বিনয় কেবলই মানুষকে সত্য থেকে পিছপা করে। তবু কবীর পিছু ছাড়েনি। এছাড়াও সে নিরাপত্তা পেয়েছিল মুরসালীনের শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে, মরিয়মের খাতিরে। মরিয়মকে মুরসালীন যাদের কাছে রেখে যাত্রায় বেরিয়েছিল, তারা মরিয়মের দেখভাল করা নারীটির নিরাপত্তা দিতে সদা-প্রস্তুত। যেটা খুব সক্রিয় কিন্তু আড়ালে। তারা নীরবে রোজ আমজাদ সাহেবের বাড়ি তো অবশ্যই সঙ্গে মাহেজাবিণের বাইরে চলাচলের সময়টা পেছনে থেকেছে বরাবর। আরও ছিলেন মানসিক সঙ্গের জন্য দোলন সাহেব।২০১৬

এর শুরুর দিকে মাহেজাবিণের অনুরোধে দোলন সাহেব রূপকথার কেইসটি হাতে নেন। দিনশেষে রূপকথা কেবলই এক শিকার। ততদিনে অবশ্য রূপকথার ভেতর থেকে মুক্তির সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ফুরিয়ে গেছিল। কিন্তু দোলন সাহেবের প্রচেষ্টায় সে খালাস পেল বাংলাদেশের আইনি বন্দিশালা নামক উন্মাদখানা থেকে।

তাকে নিতে আসার জন্য কেউ নেই জেনে বেরোবার পর সে পেয়েছিল এক অনাকাঙ্ক্ষিত নারীকে। যাকে সে কারাগারে বসে দিনের দিন একটাবার দেখা করতে আসা মানুষদের কাতারে চেয়েছে। মাহেজাবিণ

রূপকথাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল আমজাদ সাহেবের বানিয়ে রেখে যাওয়া ছোট্ট আশ্রয়কেন্দ্রে।এতগুলো মানুষের পেট চালানোর জন্য আমজাদ সাহেবের সামান্য জমি বিক্রির পয়সা নেহাত তুচ্ছ। জয় আমিরের রেখে যাওয়া পয়সা বলতে কিছু আছে, তা কখনও মাহেজাবিণের খেয়ালে থাকেনি। কিন্তু সে ভাবী, আম্মু ও মরিয়মকে ঠিকই আলাদা করে জিজ্ঞেস করেছিল, "আপনারা চাইলে জয় আমিরের রেখে যাওয়া এই টাকা নিজেদের জন্য খরচ করতে পারেন। অনুমতি পেলে আপনাদের খরচে ওই অর্থ ব্যয় হবে।"

মার্জিয়া কিছুদিন কথা বলেনি তার সাথে। সেই দিনগুলোতে মাহেজাবিণ খুব ছটফট করে একদিন গিয়ে ভাবীর কাছে বসে জিজ্ঞেস করে, "কথা বলেন না কেন আমার সাথে? ঠিকমতো খান না, অরিবাকে আমার কাছে আসতে দেন না। কী করেছি আমি? কোনো ভুল করলে শাস্তি দেন, তবু এভাবে মুখ ফিরিয়ে থাকবেন না।"

মার্জিয়া হেসে ফেলে, "আমার মতোন মেয়েলোকের সাধ্যি কোথায় অন্তূ, তোমার থেকে মুখ ফিরায়ে থাকার? তোমার ঘাঁড়ে খাচ্ছি, পরতেছি।"হাসতে হাসতে কেঁদে

ফেলার দৃশ্য খুব ভয়ানক হয়। সেই দৃশ্যই দেখা গেল মার্জিয়ার মুখে—

“ভাবো তো, অন্তূ! কতবড় বোঝা আমি আর আমার এতিম মেয়ে এই দুনিয়ার? তুমি বলছিলা, আমার আর সন্তানের ভার নিবা। পারতেছ না। তুমি আমার আর আমার মেয়ের পেট চালাইতে সেই লোকের পয়সায় নির্ভর করতে চাও, যে আমার সোহাগ কাড়ছে আমার কাছে। আমার পেটের মেয়েরে এতিম বানাইছে। বলো, এর চাইতে লজ্জার কিছু হইতে আছে? বলো তো অন্তূ? দুনিয়ার ওপর কোনো মা-মেয়ে কতটা ভারী হইলে স্বামী

আর বাপের খুনীর পয়সা খাওয়ার কথা ওঠে? বলো!’’

মাহেজাবিণের হাতদুটো চেপে ধরে অঝোরে কেঁদে ফেলল মার্জিয়া, “এত খাই আমরা? তোমার যাতে ভার না হয়, আমি না দর্জির কাজ করি অন্তূ? তুমি ক্যান একটাবার ভাবলা না এই কথা আমার সামনে উচ্চারণ করা ঠিক হবে না তোমার? আমি জানি আমি অকাল বিধবা, আমার স্বামী নাই, একটা দুধের মেয়ে। তাই বলে তুমি আমার স্বামীর খুনের রক্তমাখা পয়সা আমার জন্য বরাদ্দ করতে চাইবা, অন্তূ? আমার তো বাপের বাড়ি সচ্ছল না অন্তূ। তাই আমি চাইলেও ওদের

কাছে যাইতে পারব না....''মাহেজাবিণ সহ্য করতে না পেরে ধমকে উঠল, “চুপ করুন, আপনি। কথা বলার সুযোগই দিচ্ছেন না। পাগল হয়েছেন? আমাকে কি পাথর লাগে আপনাদের? অমানুষ, জানোয়ার ভাবতে ভালো লাগে সবার? সবাই কী মনে করেন নিজেদেরকে? এক আপনাদের ব্যথা আছে, শোক আছে, ঘেন্না আছে, অভিযোগ আছে— আর আমি গাছ? গাছেরও তো ব্যথা থাকে। আপনারা কেউ সেটাও ভাবেন না আমায়।'' মাহেজাবিণের চোখ ছলছল করে। কিন্তু জল গড়ানোর অনুমতি নেই বলে গাল শুকনো রয়ে যায়।

-“ওটা আমার দেনমোহরের টাকা। আসামী হিসেবে ওটা অন্তত স্বামী হিসেবে দিয়ে গেছে আমার আসামী। আমি এই যে এই অপদার্থ জীবনটাকে সেই নরকের অতিথির কাছে বিক্রি করেছিলাম বাপ আর সমাজের দায়ে, সেই টাকা ওটা। ওটা অবশ্যই জয় আমিরের দেয়া টাকা, কিন্তু ওতে অধিকার শুধু আমার।
”

-“তাহলে তুমি ক্যান আজ পর্যন্ত ওই টাকা থেকে এক আনা পয়সা খরচা করো নাই নিজের জন্যে? অসুখে যে মরবা কখন জানি, এক পয়সাও কেন নিজের জন্যে ভাঙো নাই? তাইলে আমার মেয়ে আর আমার জন্য ওই

টাকার প্রশ্ন উঠাইলা ক্যান?''মাহেজাবিণের কাছে জবাব নেই। সে চুপচাপ উঠে চলে এসেছিল মার্জিয়াকে শান্তিমতো কাঁদতে দিয়ে। মার্জিয়ার মতোন রাবেয়া কথা বন্ধ করেননি, শুধু চুপচাপ কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলেছিলেন, "তোর বাপের পয়সা আমার জন্যে যথেষ্ট হচ্ছে না, অন্তূ? খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে আমার খরচা?''

মাহেজাবিণ লজ্জায় আর তাকাতে পারেনি আম্মুর দিকে। আর মরিয়ম বলেছিলেন, "আমি তো জয়ের জিম্মায় আসি নাই। আইছি আমজাদ ভাইজানের মেয়ের আশ্রয়ে।''

সুতরাং জয় আমিরের সঁপে যাওয়া সম্পত্তির দলিল, নগদ অর্থের চেইকবই প্রভৃতি রাবেয়ার কক্ষের আলামারীতে ধুলোয় ভারী হতে লাগল।জমি বিক্রির টাকা থেকে সামান্য কিছু নিজের পড়ালেখার জন্য রেখে বাকিটা সবার চিকিৎসা, পোশাক, খাবারে লেগে যেতে লাগল। কিন্তু নিজের মারাত্মক অসুস্থতাকে এড়িয়ে যেতে মাহেজাবিণ দক্ষ। অরিবাকে একটি সুন্দর জীবন দেবার প্রতিশ্রুতি মিথ্যা হতে লাগল। তার দুধের দাম, যাবতীয় খরচায় সে হিমশিম খেতে লাগল। পরনের ছেঁড়া জামাটা কেউ দেখার আগেই রাতে

সেলাই করে নেয়া রোজকার কর্ম হয়ে দাঁড়াল।
তার তখন শুধু একজন ফিজিওলজিস্ট নয় সঙ্গে সাইকোলজিস্ট নিয়মিতভাবে প্রয়োজন। সারাদিন যেমন-তেমন, রাতগুলো ভয়াবহ। মানসিক অসুস্থতা চরমে পৌঁছাতে লাগল। মাঝেমধ্যেই মানসিক যন্ত্রণা আত্মহত্যার লোভ দেখাতে অবধি ছাড়েনি তাকে। চেহারার লাবণ্য, মুখের হাসি, শরীরের সুস্থতা বিলীন হয়ে গেল। শুধু চলতে লাগল তার জীবন-যুদ্ধ ও পড়ালেখা।
মার্জিয়া সেলাই মেশিনে পা চালাতে চালাতে তাকে ডেকে প্রায়শই বলতো, “তুমি জানো

তুমি পাগল? অন্যভাবে এইটারে বলে বদ্ধ উন্মাদ। নাইলে এমনে মানুষ বাঁচে? এতটা পারে?"-"আপনার কথা বলুন। আপনি যুবতী নারী, ভাবী। ছোট্ট একটি মেয়ে আপনার। বিয়ে করতে রাজী হোন। আমি ব্যবস্থা করব। এই জীবন এভাবে যাবে না।"

-"তুমি কী চাও? আমি সব ভুলে অন্যকারও সাথে সুখী হবো?স্বপ্নের মতো সহজ সব? আর আমার মেয়ে অন্যলোকের ঘরের বোঝা হবে?"

-"ওকে আমি রাখব।"

-"বাপহীন জীবন আমার মেয়ে জীবন পাওয়ার আগেই পাইছে, অন্তূ। মা-হীন জীবন আমি

তাকে দেব না। তুমি কী বলো, মনে আছে? নিজে যেমন বিয়ে বলতে একবার, একজন, একজনম বোঝো, তোমার নাকি এক জীবনে, এক নারীত্বে এক পুরুষই সই—আমাকেও তা-ই বুঝতে দাও! তাও তো তোমার স্বামী ছিল পাপীদের সর্দার, আর আমার কিনা এক নাজুক শিকার। এ কথা আর কোনোদিন বোলো না আমাকে।''এ পর্যায়ে সিস্টার ক্যাথারিন এক টুকরো হেসে বলেছিলেন, "আমি তোমার গল্পে বহুবার ঘুরে মাঝেমধ্যেই এক জায়গায় ঠেকেছি, মাহেজাবিণ। সতী নারী, তুমি। অথচ বিধাতা তোমার সতীত্বের কী কঠোর পরীক্ষা নিলেন বলো তো! সত্বী

নারীকে তিনি পতি দিলেন পাপী। এত পাপ তোমার পতি করেছে, অথচ তার একচুল হক তুমি নষ্ট করোনি তার অজান্তেও! জয় আমিরের হাতের বৈবাহিক রেখা খারাপ ছিল না, বলো! একটাবার সেই খুনী হাতদুটো দেখলে আরও ভালো বুঝতাম! সে কী করে সতী পেল?''

"সে সতী পায়নি, মাদাম। সতীত্ব লুট করে তবে গ্রহণ করেছিল আমায়। আমি যখন তার হয়েছি, আর সতী ছিলাম না।''

-"গর্দভ, তুমি। চুপ করে শোনো আমার কথা। হিন্দু পুরাণ পড়েছ?''

-“না।”-“সেখানে বলা আছে—সতী নারীর চোখের জলের অভিশাপে রাজ্য পুড়ে ছাই হয়। বুঝলে?”

মাহেজাবিণ চুপ করে রয়। সে কি সত্যিই সতী নারী? সেচ্ছায় একটুও অসতী সে হতে পারে না কখনও? আরও এমন ঘটনা আছে, সিস্টার সেসব শুনলে আরও বেশি করে এসব বলবেন।

সেসবের মাঝে মাহেজাবিণের কাছে একদিন সংবাদ এসেছিল, পরাগ আজগরের ফাঁসির রায় দিয়েছে। পরাগ একটাবার তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। মাহেজাবিণ গেল না। পরপুরুষের সঙ্গে অকারণে দেখা করার প্রশ্ন

ওঠে না। তবে খারাপ লাগল কিছুটা। কিন্তু রূপকথা অনুরোধ করলেও সে যায়নি। তার কাছে তখনও জীবন্ত-যন্ত্রণা–পলাশের রূফটপের সেই সন্ধ্যারাত। যেখানে তাকে অসৎ হাত ছুঁয়ে দিয়েছিল, আর পরাগ আড়ালে তার প্রতিনিধিত্ব করেছিল।

মাহেজাবিণের পড়ালেখার পরিকল্পনা আমজাদ সাহেব ঠিক করে রেখে গেছিলেন। মাহেজাবিণের ইচ্ছে ছিল কোনো স্বনামধন্য সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবিতে অনার্স শেষ করে মাস্টার্স অফ ল করার, উচ্চতর শিক্ষাসমেত উকিল হবার। আমজাদ সাহেব আপত্তি করলেন। মাহেজাবিণকে নিজ

জেলায় হাবিপ্রবিতে সমাজবিজ্ঞানে অনার্স করাতে মনস্থির করলেন তিনি। এরপর অনার্স শেষে দুই বছর মেয়াদী এলএলবি কোর্স শেষ করে বার কাউন্সিল পরীক্ষায় বসানোর পরিকল্পনা চূড়ান্ত হলো। কিন্তু মাহেজাবিণের বরাবরই মনে হয়েছে এটা তার জন্য খুব বড় কোনো ক্যারিয়ার হবে না। তবে সে হিসেবেই পড়ালেখা চলতে লাগল তার।আমজাদ সাহেবের মৃত্যুবার্ষিকী ২৭-নভেম্বর তারিখে। ২০১৬ এর সেই তারিখটিতে রাবেয়া খুব জেদ ধরেছিলেন স্বামী ও পুত্রের কবর জেয়ারতে যেতে। মাহেজাবিণের সাহসে কুলায় না বিষয়টা। সে

শেষবার যেবার উন্মাদের মতোন ছুটে আব্বুর কবরে চলে গেছিল, তাকে ধরে এনেছিল জয় আমির। আজ মাকে নিয়ে গেলে নাজানি মায়ের চেয়ে সে বেশি বেসামাল হয়। সঙ্গে তাই ভাবীকে নিয়েছিল। এটাও ভুল সিদ্ধান্ত হলো। দুজন আরও বেশি বেকায়দা হয়ে পড়ল। তার একটা কারণ আছে, অন্তূর কাছে রোজ আমজাদ সাহেব আসছেন, কথা বলছেন, সময় দিচ্ছেন। রাবেয়া ও মার্জিয়া তো তা পায় না।মার্জিয়াকে সামলানো গেলেও রাবেয়ার কী হলো কে জানে! বহুক্ষণ যাবৎ নিথর হয়ে গোরস্থানের ফটক চেপে ধরে অপলক চেয়ে ছিলেন স্বামী-সন্তানের কবরের

দিকে। এরপর একদম শান্ত-শীতল বাড়ি ফিরলেন।

বাড়ি ফিরে রাবেয়া স্ট্রোক করলেন। ঠিক যে সময়ে আমজাদ সাহেবের স্ট্রোক হয়েছিল, রাত্রির সেই তৃতীয় প্রহরে আরেকটি কালরাত্রি নামল মাহেজাবিণের জীবনে। বাড়িতে পুরুষ বলতে কেউ নেই, কিন্তু ঠিক গেইট খুলে মরিয়ম কয়েকটি যুবক ও পুরুষকে ভেতরে নিয়ে এলেন, খুব স্বাভাবিকভাবে। সেদিন মাহেজাবিণ জানতে পারল তাদের বাড়িটা দিনরাত নিরাপত্তায় ঘেরা, যেন তার অনিষ্ট করতে কেউ এ-মুখো না হতে পারে।

রাবেয়াকে নিয়ে ছয়দিন একাধারে হাসপাতালে কাটানোর পর ডাক্তার রাতে বলে গেলেন, ‘কাল-পরশু রিলিজ করা যেতে পারে। সি ইজ আউট অফ ডেঞ্জার।’ কথাটা বলা ঠিক হলো না। কারণ ওই কথা শুনেই সেই রাতের শেষে ফজরের ওয়াক্তে রাবেয়ার মস্তিষ্ক বড় স্ট্রোকটা হাসপাতালে অবস্থাকালে ঘটালো। শিরা ছিঁড়ে সরাসরি রক্তপাত। মাহেজাবিণ সেবার প্রথমবার মনস্থির করেছিল জয় আমিরের পয়সা খরচা করার। দরকার পড়লে সেই অপারেশনে সে সব টাকা খরচা করে দেবে এই নিয়ত করার পর ডাক্তারেরা ঘাঁড় নাড়লেন। মানে কী?

মাহেজাবিণ বুঝতে চায় না সেই ঘাঁড় নাড়ার মানে। জীবনকে সে এত সেচ্ছাচারিত্ব কোনোভাবেই করতে দিতে পারে না। জীবন পেয়েছে কী তাকে? ডাক্তারদের কাজ কী? একবার ঘাঁড় নেড়েছে, আব্বু পালিয়েছে তাতে। আবার সেই ঘাঁড় নাড়ানি!সেই সকাল পেরিয়ে সন্ধ্যা হবার আগেই রাবেয়ার জবান বন্ধ হয়ে গেল। তখন মাহেজাবিণ আছরের ওয়াক্তে যোহরের কাজা আদায় করছে হাসপাতালের নোংরা বারান্দার কোণে। মরিয়ম গিয়ে আলগোছে তুলে আনেন মাহেজাবিণকে। মাহেজাবিণ এসে দেখে, আম্মু কাঁদছে। বাপ-মায়ের ওপর সমস্ত বিশ্বাস

সেদিন মাহেজাবিণের ফুরিয়ে গেল। এরা একেকটা চূড়ান্ত পর্যায়ের বেইমান। খুব মায়ায় পালে, তারপর সংকটে রেখে হাসপাতালে শুয়ে কাছে ডেকে নিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে কাঁদে। এই কান্নার একটা বিশেষত্ব আছে। এই কান্নার পর চোখ বুজে ফেলে এরা। তারপর হাজার কিছুতেও আর চোখ খোলে না। কোনোভাবেই না।

মাহেজাবিণ একেক কদম পেছায়, তার ক্ষোভ ফেটে পড়ে, "না আম্মু। তোমার মুখে-চোখে আব্বুর ভাব দেখছি। আমি এবার আর বোকা হবো না। তুমি হাজার ডাকলেও আমি তোমার কাছে বসব না। তুমি শেষ বিদায় চাইতে

কাছে ডাকবে, আর আমি তোমার কাছে বসে তা দেব-নেব? পাগল না আমি।''

কিন্তু পরক্ষণেই মাহেজাবিণ হুড়মুড় করে গিয়ে বসে মায়ের কাছে, "এই এই শোনো আম্মু! কেন জন্ম দিয়েছিলে আমায়? বলো আজ। বলো বলো। আজ শুনি। কেন জন্ম দিয়েছিলে? চোখের সামনে বাপ চলে যাবে, ভাই যাবে, সন্তান যাবে অকালে, এক পাপী স্বামী সে পালাবে কৌশলে, তারপর তুমি... এইসব চোখ বড় বড় করে দেখব, আমি সব দেখব, শুধু দেখব তোমাদের তামাশা এই জন্য জন্ম দিয়েছিলে তো? অস্বীকার করলাম। আমি আমার এই অভিশপ্ত জনমকেই

অস্বীকার করলাম। এই জীবন আমি মানি না। আমি এত বড় আয়ু চাইনি। নাকি তোমরা সবাই নিজেদের আয়ু কেটে কেটে আমাকে দিয়ে দিয়ে যাচ্ছ যাতে বেঁচে থাকি আর দেখি, এ সাজার জনম না ফুরুক আমার! কীসের সাজা, আম্মা? তুমি বলো। জন্ম তো তুমি দিয়েছ, জন্মে কোনো পাপ থাকলে তোমার জানার কথা। বলে দাও আজ। আমার রইল কী? কী নিয়ে বাঁচার জন্য জন্ম দিলে, আবার সেই জন্মে বাঁচার জন্য রেখে যাচ্ছ, বলো।"

রাবেয়া জিহ্বা নাড়লেন, কথা বেরোলো না। তাই তিনি অন্তূর সামনে হাতদুটো জোড় করে ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। ছলছলে ভেজা

চোখদুটোয় ঠোঁট নেড়ে শেষবার অন্তূকে কত কী বলার আঁকুতি যে সেখানে! কিন্তু বলা হলো না বলে শুধু থুতনিটা থরথর করে কাঁপল তাঁর। মাহেজাবিণ সহ্য করতে না পেরে আম্মুর শিথিল দেহটা তুলে বুকের সাথে জাপটে মিশিয়ে ধরে।-“যেও না, আম্মু। আমার আর কেউ নেই এই দুনিয়ায় বিশ্বাস করো। বাপ, ভাই, সন্তান, স্বামী, আশ্রয় কিচ্ছু নেই। আমার মাথায় তেল দেবার জন্য একটা তোমার মতো সরলাকে খুব দরকার পড়বে, কোথায় পাব, কোথায় যাব? একজন চলে গেছে আমাকে রাস্তা পার হওয়া না শিখিয়ে, তুমিও যাচ্ছ... কেউ বললে না, চল অন্তূ, সঙ্গে

চল। এত খারাপ না আমি। বিশ্বাস করো। কেউ তো সঙ্গে থাকো! কেউ তো থাকো, কেউ তো থাকো আমার। এত বড় দুনিয়ায় আমি একা বিলীন হয়ে যাব, আম্মু। আমার গর্ভের এক টুকরো ধন ওরা ছিঁড়ে নিয়েছে। যার গর্ভে আমি ছিলাম, সে আমার মায়া ছিঁড়ে চলে যাচ্ছে....আমার অপরাধ কী?''

ততক্ষণে কেউ মাহেজাবিণকে বলেনি, তার অভিযোগ শোনার বদলে তার আম্মু অনেকক্ষণ আগেই তার বুকে মিশে থাকার নাম কোরে চুপিসারে পালিয়েছে।১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্মানো মাহেজাবিণ আরমিণ অন্তূ তার বয়স প্রায় চব্বিশ হতে না হতেই সকল

রক্তের সম্পর্ক থেকে মুক্ত হলো সেইবছর। চারটিখানি কথা নয়। একটি মেয়ে, যার জীবনে নিজের বলতে কিচ্ছুই না থাকার এই মহান প্রাপ্তি অর্জনের সাধ্যি সবার থাকে না। সেই বছরই অনার্স শেষ করে ২০১৭-তে তাকে ভর্তি হতে হলো–ল কোর্সে। তখন থেকেই দোলন সাহেবের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ও আলোচনায় থাকতে লাগল। ল-তে ভর্তি হবার কালে মাহেজাবিণ চব্বিশ বর্ষীয়া এক সর্বহারা বিধবা নারী। তখন থেকে তার পরণে শোভা পেতে লাগল টিন্ট ব্লু রঙের শাড়ি। যা সাদারই নীল-সংস্করণ মাহেজাবিণের জন্য। সরাসরি সাদা নয়,

সাদাকে ধোঁকা দিতে সে বরং বেছে নিলো টিন্ট-ব্লু। এবং ল ভর্তি হবার সাথে সাথেই সে হয়ে উঠল পেশাগত নারী, খুব শীঘ্রই হতে যাওয়া অ্যাডভোকেট মাহেজাবিণ আমির। দোলন সাহেবের সহকারীর ভূমিকা পালনে সচেষ্ট হলো সে। মামলা সংক্রান্ত নথি পর্যবেক্ষণ, মক্কেলদের সঙ্গে টুকটাক আলোচনা, ঘটনা শোনা ও নিজে চিন্তা করা, দোলন সাহেবের প্রতিক্রিয়া ও চলন খেয়াল করা ইত্যাদির সাথে সাথে কোর্টে শুনানিতে হাজির হওয়া, আদালতের প্রক্রিয়া, বিচারকদের বক্তব্য, পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত অনুধাবণ, দেশ সমাজের পরিস্থিতি নিজের

মধ্যে পর্যালোচনার এ পর্যায়ে সে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল অবশেষে নিজের স্বপ্ন ও গন্তব্যের পথে। সাথে আইনি গবেষণা, কেইস স্টাডি, দোলন সাহেবের দেয়া ফাইল সলভ করার চেষ্টা তার নারকীয় রাতগুলোর ঢাল হতে লাগল একটু একটু করে।এ সময় আব্বু তাকে সর্বক্ষণ দেখে। সেই মেহেদি রাঙা দাড়ি-গোফের মাঝখানে গম্ভীর এক টুকরো হাসিমাখা মুখ ও উজ্জ্বল চোখদুটো হবু অ্যাডভোকেট মাহেজাবিণ আমিরের সমস্ত কার্যক্রম অনুসরণ করে। মাহেজাবিণ টের পায়। এক মুহূর্তও সে নিজেকে একা ভাবতে পারে না। সর্বক্ষণ চারপাশে আব্বুর অস্তিত্ব ও

গন্ধে বিভোর মাহেজাবিণ সব ভুলে কেবল গন্তব্যের পথে ছুটতে লাগল। একটি কোচিং সেন্টারে তাকে শিক্ষকের কাজ করে সামান্য আয়ও করা শুরু করতে হলো। অন্তিকের মেয়েটা বড় হচ্ছিল। তাকে একটি সুন্দর জীবন দেবার দায় যে তার!

এলএলবি প্রথম বর্ষ শেষ করে ২০১৮ তে দ্বিতীয় বর্ষে উন্নীত হবার পর পুরোনো বিপদ হাতছানি দিতে লাগল তাকে। এতদিন তার কাছে জয় আমিরের আরও দুটি আমানত ছিল। একটি কুড়াল ও জয় আমিরের নিজের ব্যবহৃত পিস্তলটি—সেমি-অটোমেটিক গ্রান্ড পাওয়ার K-100। পিস্তলটি যখন তার কাছে

আসে, ওটার ম্যাগাজিন ছিল খালি। তাই দোলন সাহেব মাহেজাবিণকে দুটো 9mm প্যারাবুলাম ক্যালিবারের বুলেট দিয়েছিলেন। সেটা বাড়িতেই থেকেছে। কখনও সঙ্গী করে বাইরে বের হওয়া হয়নি।২০১৮-তে সেই কাঙ্ক্ষিত নির্বাচনের হিড়িক লাগল, যেই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হামজা রক্ত ও নীতিহীনতায় হাত ও প্রবৃত্তি ডুবিয়েছিল। সেই নির্বাচনী বছর এলো, কিন্তু হামজা ততদিনে হুইল চেয়ারে লেপ্টে থাকা এক শ্বাস গ্রহণকারী মরদেহ। এই বছরগুলোতে নেহাত কমবার হামজার ওপর হামলা হয়নি। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছু করা যায়নি। প্রায় আড়াইটা

বছর মাহেজাবিণকেও ধরে বধ করার কম প্রচেষ্টা বাপ্পী ও তার দলবল চালায়নি। মাহেজাবিণও হাতে আসেনি তাদের। তাই নির্বাচনের আগে আবারও পুরোনো সেই ক্ষতগুলো দগদগ করে উঠল।

এর যথাযথ কারণ আছে। বাপ্পীর কাকাকে হামজা কতটা যত্নসহকারে খুন করার পরেও তার কোনো উল্লেখযোগ্য শাস্তি হয়নি। জয়ের বউ কামরুলকে খুন করার পরেও তারও কোনো শাস্তি না হয়ে বরং আইন পড়ছে। অথচ মাঝখান থেকে কাকা চলে যাওয়ায় তাদের দলছুট হয়েছে, নতুন ও প্রতিপক্ষরা নির্বাচনে অংশ নেবার জন্য প্রস্তুত, অথচ

কাকা নেই। জয়ের বউ ও হামজাকে শেষ করা খুবই দরকারী মনে হলো এ পর্যায়ে। ওই দুটো তাদের গলার কাঁটার মতো বিঁধে ছিল বিগত দিনগুলোতে।

ক্যারেন্ডার বলছে–২০১৮ এর ফেব্রুয়ারি চলে। হামজার বই পড়ার অভ্যাসটা রয়ে গেছে তখনও। বিগত দিনগুলোতে চিকিৎসার পেছনে বেশ দৌড়েও কেবল উন্নতির মাঝে হাত ও মুখ সচল হয়েছে। পা দুটো চলাচল হলেও মেরুদণ্ড যেখানে অচল, নিজ থেকে হাঁটাচলা অসম্ভব।

রিমি রাতের জন্য হালকা খাবার রান্না করে নিয়ে সেদিন রুমে এলো রাত এগারোটায়। হামজা বিছানার হেডবোর্ডে হেলান দিয়ে ছাদ দেখছে। বইটা পাশে পড়ে আছে। চোখের চশমা খোলেনি। রিমি চুপচাপ গিয়ে বারান্দায় দাঁড়াল। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়। শীত ভালোই। তবু তার খারাপ লাগল না ঠান্ডা হাওয়া, গা শিনশিনে বাতাস। বারান্দা থেকে ঘাঁড় ফেরালে আধশোয়া হামজাকে দেখা যায়। স্বাস্থ্য আর আগের মতো বলবান, সুঠাম নেই। শরীর শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে এসেছে মেডিসিন-ড্রাগ ও থেরাপির প্রভাবে। চোখের নিচে কয়লার কালি, কোটরের খুব ভেতরে অসুস্থ,

ফ্যাকাশে লাল চোখদুটো। আজ খুব একটা চাতুর্য দেখা যায় না। শান্তভাব চিরায়তভাবে রয়ে গেছে। দেখলে কখনও কখনও মৃত লাগে। যেন কৃত্রিম উপায়ে একটি প্রাণরসহীন ফলকে তাজা রাখার চেষ্টা।খুব একটা কথা হয় না লোকটার সঙ্গে সারাদিনে। রিমি যে কীসের দূরত্ব বজায় রাখতে শিখেছে তা সেও জানে না। একটি মৃত বাড়ি, প্রাণহীন, লাশেদের স্মৃতির ইটে গাঁথা বাড়িটির ভিত। রিমি প্রতিক্ষণে দেয়ালের গা থেকে ছিটকে আসা আর্তনাদ শুনতে পেয়ে কেঁপে কেঁপে ওঠে। বিভ্রম তৈরি হয় সারাক্ষণ। সে তরুকে দেখে, জয়কে দেখে হাত-পা না ধুয়ে ঘামমাখা

শরীরে টেবিলটায় খেতে বসতে, আরমিণকে দেখে রান্নাঘরে রান্না করতে। ভ্রূণটিকে রিমি নিজহাতে পাটোয়ারী বাড়ির বাগানেরর এক কোণে দাফন করেছে। রোজ সেখানে দুটো ঘণ্টা সে কাটায়। কিন্তু যখন সেখান থেকে উঠে সে। চলে আসে, সে টের পায় তার পেছন পেছন জয় আমিরের সন্তানও উঠে সঙ্গে আসছে। সে আজ বড় হয়ে গেছে। তার বয়স আড়াই বছর। সে রিমির সাথে সাথে ভুরভুর করে ঘুরে বেড়ায় সারা বাড়ি। বাপের বন্ধ কক্ষটা দেখে। সেখানে তার বাপের যুগ কাল কেটেছে, হয়ত দরজা খোলা পেলে গিয়ে দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলো অভিভূত চোখে

দেখতো। ওই কক্ষে তার মায়ের গন্ধও মিশে আছে। কিন্তু মা এই বাড়িতে কখনোই আসে না। কেবল তার পরিচয়টুকু সঙ্গে করে ছুটে বেড়াচ্ছে বিক্ষিপ্ত ফোটনের ন্যায়। এতসব বিভ্রমের ভিড়ে হামজাকে আলাদা করে দেবার মতো সময় রিমির হাতে থাকে না।বহুদিন সে রাতে ঘুমায়নি। চোখের পাতা মিলিত করা খুব দুঃসাধ্য! বিরাট একটি মৃত বাড়িতে মৃত একটি পাপীর জীবিত লাশের পাশে ঘুমানো যায় না। তবু চুপচাপ শ্বাস আঁটকে ঘুমের ভান করার অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু দু'দিন আগে শেষরাতের দিকে তার সেই ভান ভেঙে হামজা ডেকে বলল,

-"এখানে পড়ে আছো কেন?"

-"তো কোথায় যাব?"

-"যাওয়ার জায়গা নেই বলে পড়ে আছো?"

-"না। এটাই আমার ভাগ্য।"

-"ভাগ্য বলতে কিছু হয় না, রিমি। চলে যাও।
"

-"কোথায় যাব?"

-"দুনিয়াটা অনেক বড়।"

-"আমার দুনিয়া খুব ছোট। তার বাইরে আমার কিছু নেই।"

-"সে ছিল যখন আমি তোমায় ধরে রেখেছিলাম। আজ তুমি মুক্ত। তবু এখানে জোর করে পড়ে থেকো না। রিমি, তুমি কি

করুণা করছো আমার ওপর?''–“জোর করে পড়ে আছি কে বলল? আপনি সুস্থ হোন, চলে যাব।''

-“এটা যদি ভালোবাসা হয় তো ঠকে যাবে তুমি।''

-“আর কী ঠকবো?''

-“আমি সুস্থ হলে আবার পাপ করব। এবার আগের বারের চেয়েও নিকৃষ্ট হবে সেসব পাপ।''

-“তাহলে তো আমার উচিত নয় আপনার সেবা করা।''

হামজা হেসে ফেলল, “সেটাই তো বলছি। ছেড়ে দাও।''

-“পাপ করতেই জন্মেছেন?”
-“আমি জানি না, রিমি। আমার জন্ম সম্বন্ধে আমার জানা-শোনা নেই। কেন জন্মেছি তা জানতে হলে জন্ম কোথায় এবং কাদের ঘরে নিয়েছি তা জানা জরুরী ছিল।”
রিমির কঠোরতা অথবা নির্লিপ্ততা এখানে ফুরোয়। সে শাড়ির আঁচল ঠিক করে বুকে তুলে নিয়ে উঠে বসে।
-“আর কেন পাপ করবেন? কী কারণে, কোন উদ্দেশ্যে?”
-“আমি কয়েকটা খুন করব, রিমি। একটু বিশৃঙ্খলা করব সমাজে আর আইনকে খুব

নোংরাভাবে ভেঙে দেবার চেষ্টা করব।

''-“পাগল হয়েছেন আপনি?''

-“না। আমার মস্তিষ্ক এখনও ঠিক আছে।''

-“আইন তো ভেঙেছেনই। আইন কবে মেনেছেন আপনি?''

““না। আইনত বৈধ কাজ আমি করিনি ঠিকই, তবে আইনের ওপর আমার কখনোই বিদ্বেষ ছিল না।''

-“এখন কেন জন্মেছে? আইন জয় আমিরকে মেরেছে তাই?''

হামজা একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর অদ্ভুত-অলৌকিক সুরে বলল, “এইমাত্র জয় এসেছিল আমার শিয়রে।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল, একটু দুষ্টু হাসল, কয়েকবার 'ভাই' বলে ডাকল, কিন্তু আমি উঠলাম না, চোখ খুললাম না। ও যখন আস্তে কোরে রুম থেকে বেরিয়ে গেল আমি তখন চোখ খুলে তোমায় ডাকলাম।"

রিমির গা শিউরে উঠল, শিরশির করে উঠল শরীর। হামজার বিশ্বাস স্বপ্নে যেদিন জয় এসে ডাকবে তাকে, তারপরদিন সে মারা যাবে। জয়ের সাথে মিলিত হবে আবার। সেই দিনের অপেক্ষায় সে অধীর। যদি তা-ই হয় তাহলে সুস্থ হয়ে আবার পাপ করার কথা বলছে কেন? কারণ সেই পাপগুলোও হবে জয়কে হত্যার প্রতিশোধমূলক। আর তারপর

সে জয়ের ডাকে সারা দেবে। এজন্য আগে থেকেই রিমিকে চলে যেতে বলছে। রিমি দম আটকে বসে রইল অনেকক্ষণ। হামজা শুয়ে পড়ল আবার। রিমি বুঝতে পারে দিনদিন হামজার মানসিক অবস্থার ব্যাপক বিপর্যয় ঘটছে। তার মস্তিষ্ক আজও তার এত এত হারানো মেনে নিতে পারেনি। ক্ষমতা, সম্মান, হাতের মুঠোয় সমাজ ও জনতা, জয়...

রোজকার মতো আজও আনমনে, অপ্রকৃতস্থের মতোন ছাদের দিকে চেয়ে আছে। অধিকাংশ সময় এটাই তার কাজ। কোনো এক শূন্যে এমন নিথর দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে, মৃত অথবা জীবিত শনাক্ত

করা যায় না। রিমির অন্তরাত্মা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে তখন। রিমি বারান্দা থেকে ফিরে হামজাকে খাইয়ে, ওষুধ দিয়ে নিজেও শুয়ে পড়ল।

রাত দুটোর দিকে আচমকা জানালার কাঁচ ফুঁড়ে কিছু মেঝেতে পড়ে সেটাও ঝনঝন করে ভেঙে গেল। এক টুকরো কাঁচ ছুটে এসে হামজার শরীরে লেখে জখম তৈরি হলো। এরকম পরপর কয়েকটা আওয়াজ হলো। মেঝেতে তখন দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। রিমি উঠতে চাইলে হামজা ঝাপটে ধরে রাখে তাকে। আগলে নেয় নিজের

আড়ালে। রিমি অস্থির হয়ে মৃদু কাঁপতে লাগল।

হামজা বলল, ককটেল ছুঁড়েছে। অ্যালকোহলে লাগা আগুন, নিভে যাবে খানিক পর। উঠো না। যেই থাকুক বাইরে, তারা চাইছে আমরা মেঝের মাঝ বরাবর যাই। আক্রমণ সহজ হোক।

রিমি কম্পিত কণ্ঠে বলল, কারা, কারা করছে এমন?

এ ধরণের কাজ করতে পারে, এমন লোকের তো অভাব রাখিনি আমি, রিমি। শান্ত হও, কিছু হবে না। আমি আছি।

রিমির বলতে ইচ্ছে করল, আপনি অসুস্থ। আপনাকে সামলাতে আমাকে লাগবে, আপনি কী করবেন? কাউকে প্রয়োজন এখন।বলল না। তখনই সে টের পেল হামজার বুক থেকে তিরতির কোরে রক্ত ঝরছে। সে আবারও আৎকে উঠল। নিচতলার সিঁড়ি সংলগ্ন ফটকেও আওয়াজ হলো। অর্থাৎ আততায়ীরা ভেতরে ঢোকার প্রচেষ্টায় ত্রুটি করছে না। রিমি অস্থির হয়ে হামজার বুকে হাত চেপে ধরল, তার হাত ভিজে উঠল।

আপনি কি কিছুই করবেন না? রক্ত পড়ছে তো। বাইরে কারা থাকতে পারে?

কবীর হামজার কাছে আসে না। আজ অবধি হামজার সামনৃ আসেনি সে। মাঝেমধ্যে রিমির ডাকে আসে, রিমির সঙ্গে কথা বলে ফিরে যায়। হামজাকে চোখের দেখাটুকু অবধি দেখার প্রবণতা তার নেই। তবু রিমি তাকেই কল করল। কিন্তু কবীর তার ছেলেদেরকে নিয়ে পাটোয়ারী বাড়িতে পৌঁছানোর আগেই প্রায় ঘণ্টাখানেকের তাণ্ডব শেষ করে বাপ্পী লোকজন নিয়ে চলে যায়। খুব কৌশলে। বহুদিন আগেই তারা পাটোয়ারী বাড়ির দূর্গঘেরা উঁচু সুরক্ষিত প্রাচীর টপকে ভেতরে আসার ব্যবস্থা করে নিয়েছে।সেই ঘটনা মাহেজাবিণ জানল না। পরদিন বিকেলের পর

দোলন সাহেবের কাছ থেকে ফেরার পথে সন্ধ্যা নেমে এলো। দোলন সাহেবের বাসা থেকে বাঁশেরহাট ফেরার পথে মাঝে সুইহারী খ্রিষ্ট আশ্রম পড়ে। তার আগেই মাহেজাবিণ টের পেল তার চেনা-অচেনা কয়েকজন লোক তাকে অনুসরণ করছে। এটা প্রথম নয়। বিগত দিনগুলোতে বাইরে বেরোবার পর সে কখনোই আশা রাখেনি আবার জীবিত হালে বাড়ি ফিরবে। বহুবার জানের ঝুঁকি তাকে ছুঁয়েও পাশ কাটিয়ে গেছে। সেদিন সেটা তীব্র হলো।

মাহেজাবিণ এখন রাস্তা পাড় হতে শিখেছে। কারণ আব্বু নেই এখন তার হাতটা ধরে

রাস্তা পাড় করবার জন্য, কিন্তু তার পথ ফুরোয়নি। তা বরং দূর্গম হয়েছে। রাস্তা পাড় হয়ে দ্রুত রিক্সা তো ধরল সে, কিন্তু লোকগুলো এসে রিক্সাওয়ালাকে থামিয়ে বলল, যাত্রী নামায়ে দ্যান, মামা। ওয় আর যাইতো না।রিক্সাওয়ালা একটু ইতস্তত করেছিল বটে, কিন্তু সে সচেতন নাগরিক। যারা তাকে কথাটা বলছে, তাদের কথা শোনাটাই বুদ্ধিমানের বৈশিষ্ট্য। মাহেজাবিণ নিজে থেকেই নেমে দ্রুত পা চালাতে লাগল। এক পর্যায়ে সে দৌড়াতে লাগল। শীতের সন্ধ্যা, তবু বোরকার নিচে শরীর ঘেমে চুপচুপে হয়ে উঠল। কিন্তু পেছনের লোকগুলো

তাকে বেশিদূর দৌঁড়াতে দেবে না বলে একখানা চাপ্পর ঠিক ডান পা তাক করে ছুঁড়ল। পায়ের কব্জার ওপরের এক দলা মাংসপেশি আলগা করে নিয়ে চাপ্পর পড়ে যায় মাটিতে, সাথে মাহেজাবিণও। আশপাশটা ফাঁকা, কেউ থাকলেও তাকে রক্ষা করতে আসার বেকুবি কেউ করবে না। জনগন বরাবরই সচেতন। মাহেজাবিণের সাথে সেদিন ভয়াবহ কিছু ঘটার ছিল।মাহেজাবিণ রক্তাক্ত পা নিয়ে আবার দৌঁড়ায়। বিশেষ লাভ হবার নয়। তাকে ধরে ফেলল বাপ্পী। বাপ্পী সেই কালেই হামজার কাছে জয়ের বউকে আবদার করেছিল। অর্থাৎ শুধু জানের বদলে

জান নয়, তারা আরও কিছু চায়। মাহেজাবিণ আবার মাটিতে পড়ে গেলে বাপ্পী এলোপাথারি মুখে, বুকে, মাথায় লাথি মারতে লাগল। মাহেজাবিণের ঠোঁট-মুখ ফেটে রক্ত ছুটে এলো। তার নেকাব আবারও সেদিন খুলে ফেলা হলো এলোমেলো আঘাতে বোরকা ছিঁড়ে গেল খানিকটা। বাপ্পী মাহেজাবিণের গলার ওপর পাড়া মেরে উঠে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

মাহেজাবিণ অস্ত্রহীন, ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় প্রায় অজ্ঞান হবার আগে তার চেতনা তাকে সতর্ক করে। আজ তার সত্যি সত্যি ইজ্জত হারা হওয়া লাগতে পারে। তার কীভাবে

নিজেকে তুলে নিয়ে তাদের হটিয়ে রক্তাক্ত শরীরটা কোনোরকম টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল সুইহারী চার্চের আশ্রমে। সে জেনে প্রবেশ করেনি সেখানে, কিন্তু ঢুকে পড়েছিল একটি আশ্রয়কেন্দ্রে। আর কিছু মনে নেই তার।

যখন তার আবার চেতনা ফিরল, সে চোখের সামনে দেখতে পেল একজন ব্রতী খ্রিষ্টান সিস্টারকে। সিস্টার মেরি ক্যাথারিন। প্রায় মাসখানেক মাহেজাবিণ সেখানে সিস্টার ক্যাথারিনের সেবায় থেকেছে। একসামে এক লক্ষের অধিক প্রশ্ন ও কৌতূহল ক্যাথারিন জমিয়েছিলেন এক অজ্ঞাত যুবতী নারীকে

নিয়ে। মাহেজাবিণ জবাব দেয়নি। সে বলছিল বলবে কখনও। সিস্টার ক্যাথারিনকে সে আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছিল।এর মাঝে হামজা অসংখ্য সংবাদ পাঠায় তার কাছে। হামজারর আন্দাজশক্তি তার চূড়ান্ত অসুস্থতারও ঊর্ধ্বে। সে নিজের ওপর হওয়া হামলার সেই রাতেই আন্দাজ করেছিল এরপর আরমিণের পালা। এরপর সে পরদিন জানতে পারল আরমিণ নিখোঁজ। মাহেজাবিণ গোটা একমাস পুরো চেনা জগত থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেছে। মার্জিয়া কেঁদে কেঁদে পাগল হয়েছে। কোনো খবর নেই, জানা নেই মাহেজাবিণ কোথায়! তখনও মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত, জয় আমিরের

বলাৎকার স্ত্রী। সে নিখোঁজ। কোন চিল-শকুনে টেনে ছিঁড়ে খেয়েছে! ওই হদিস আর পাওয়া যায়!

রিমি সেবার প্রথম পাটোয়ারী বাড়ির সীমানা ছেঁড়ে বেরিয়ে বারবার আমজাদ সাহেবের কুটুরিতে যাতায়াত করেছে। রূপকথার সঙ্গে কথা বলে চলে আসতে হয়েছে। রূপকথার দৃঢ় বিশ্বাস সকলকে বিশ্বাস জুগিয়েছে, মাহেজাবিণ ফিরে আসবে। ওই মেয়ে ফুরোতে পারে না। তার জীবন যেসব ঝড়ে টালমাতাল হয়েও আজও বহমান, সে হুট করে এভাবে ফুরিয়ে যাবে না।হামজা ওই মাসখানেকের সময়টাতে আরমিণের খোঁজে চরম ব্যস্ত

হয়েছিল। কেননা বাপ্পীর ধারণা হামজাকে জয়ের বউ এবং জয়ের বউকে হামজা–দুজন দুজনকে টিকিয়ে রেখেছে। দুজন মিলে এমপিকে ধ্বংস করে ছেড়েছে। দুজন এক। সুতরাং দুজন চিরবিরোধী দুশমন ঘটনাক্রমে এক বাপ্পীর দুশমন হয়ে ওঠার ব্যাপারটিতে হামজা হেসেওছিল। সে নিজেও চিন্তিত হয়ে উঠেছিল বিরোধী নারীর এভাবে নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায়।

মাসখানেক পর কিছুটা সুস্থ হয়ে খোঁড়া পায়ে মাহেজাবিণ বাড়ি ফিরল। তার পরদিনই হামজার লোক এলো মাহেজাবিণের কাছে। মাহেজাবিণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে এটা বুঝে যে

তাকে এখন অবধি হামজা নজরে রেখেছে। এই লুকোচুরি খেলার শেষ কোথায়? হামজা তাকে একপাক পাটোয়ারী বাড়িতে ডেকেছে, কিছু আলাপ-আলোচনা করার আছে বলে। তার জবাবে মাহেজাবিণ ক্লান্ত হাতে একখানা ছোট্ট চিঠি লিখেছিল কেবল,আপনার সঙ্গে আমার কোনো আলাপ-আলোচনা থাকতে পারে না। শেষবার যেখানে দেখা হয়েছিল, আমি আশা রাখি আবার দেখাটা আমার-আপনার সেখানেই হবে। সেদিন আপনার বিপক্ষের আইনজীবী হিসেবে আমি থাকলে খুব অবাক না হবার পরামর্শ থাকবে আমার। এবং কথাও সেখানেই হবে। আপনি আসামী

এবং আমি প্রসিকিউটর হিসেবে অনেক কথাই হবে আশাকরি। খুব শীঘ্রই। ততদিন অপেক্ষা করুন। এবং যথাসম্ভব সুস্থ হোন। আপনার সুস্থতা একান্ত কাম্য।

পুনশ্চ: রিমিকে আমার অনুরাগ জানাবেন। সে এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে, দেখা হয়নি। তাকে আসতে বলবেন। আমি আর কখনও পাটোয়ারী বাড়িতে পা রাখব না, তা বলে তার সঙ্গে আমার পরিচয় ফুরোবে না।

এরপর গুনে গুনে কেটে গেল মাঝখানে কমবেশি তিনটে মাস। হঠাৎ-ই একদিন—২৯ জুন বিকেলে মাহেজাবিণের ঠিকানায় এসে পৌঁছালেন সিস্টার ক্যাথারিন মাহেজাবিণের

জীবনে আসা অবরুদ্ধ নিশীথগুলোয বিবরণ শুনতে। মাহেজাবিণের ল শেষ হতে তখন খুব বেশি দেরি নেই। আর কিছুদিন। এরপর বার কাউন্সিল পরীক্ষা, সেখানে উত্তীর্ণ হলে সে একজন আইনজীবী। অ্যাডভোকেট মাহেজাবিণ আমির।

সিস্টার ক্যাথারিন অতীত শুনতে শুনতে গোটা একটা রাত, তারপরেও একটি দিন অবধি মাহেজাবিণের কাছে কাটিয়ে গেছিলেন। সাথে প্রতিশ্রুতি নিয়ে গেছিলেন খুব শীঘ্রই একটাবার পাটোয়ারী বাড়িতে মাহেজাবিণকে সঙ্গে নিয়ে তিনি যেতে চান। মাহেজাবিণ যেতে না চাইলেও জোরপূর্বক নিয়ে যেতে

চান। জয় আমিরের ফটো দেখতে চান, হামজার অবস্থা তিনি সচক্ষে দেখতে চান। তার নিষ্পাপ বধূ, রিমিকে দেখতে চান। কিন্তু পরিকল্পনা করাটাই উচিত নয় জীবনে। সেদিনের পাঁচ মাস পর মাহেজাবিণ খবর পেল সুইহারী মঠের একজন সিস্টার মেরি ক্যাথারিন মৃত্যুবরণ করেছেন। মাহেজাবিণ গিয়েছিল দেখতে। তখন আর মাহেজাবিণের কাছে পাটোয়ারী বাড়ি দেখার আবদার করা ব্রতী নারীটিও জীবিত নেই। তাঁর আবদারে আরেকটিবার হয়ত মাহেজাবিণ পাটোয়ারী বাড়িতে, এবং অভিশপ্ত আমির নিবাসে কদম রাখতো। তা আর হয়নি।সিস্টার ক্যাথারিন

কেবল মঠে শিক্ষাদানের কাজই নয়, তিনি হাসপাতাল এবং আশ্রমগুলোতে অসুস্থদের সেবায় নিয়জিত ব্রতী ছিলেন। তার কাছেই গোপন রয়ে গেল মাহেজাবিণ এক জীবনের বিবরণ।

এরপর আরেকটি বছর কেটে গেল সেইদিন থেকেও— যেদিন মাহেজাবিণ নিজের দূর্গম জীবনের অতীতের পাতাগুলো মেলে ধরেছিল এক সংসারহীন নারীর কাছে। আজ আবার ২৯ জুন কিন্তু খ্রিস্টাব্দ ২০১৯। আজ সে একজন প্রাকটিসিং অ্যাডভোকেট। এই তারিখটি একটু অদ্ভুত। জয় আমিরের জন্মদিন এটি। এ বছর ৩২তম জন্মদিন।

লোকটা জন্মদিনের হিসেবে মাহেজাবিণের কাছে কয়েকটি জিনিস গচ্ছিত রেখে গেছে। ৭৫তম জন্মদিন অবধি উল্লেখ করেছে সেগুলো রেখে দিতে। এবং সেই হিসেবের সাথে একটি রক্তমাখা ঘড়ি রেখে গেছে, যেটি বের করতে হলে একটি কাগজ টান করতে হয়। সেই কাগজটিতে জয় আমির কিছু হিজিবিজি লিখে রেখে গেছে। এইসব তারিখগুলোতে ঘড়িখানা হাতে নেবার পর মাহেজাবিণ কাগজখানা নাড়তে-চাড়তেই দু'একবার চোখ বুলায়। চোখ বুলাতে গেলে একবার পড়ে ফেলে—আমি না মরলে এই কাগজ তোমার পাবার কথা না। আচ্ছা, আমি

কি শালা বুড়া হয়ে মরছি? বয়স কত হইছিল? দুই-চাইরটা বাচ্চা-কাচ্চা হইছিল তোমার-আমার? হাসি পেয়ে যাচ্ছে লিখতে বসে। জীবনে ভাবি নাই মরার আগে কোনোদিন এইসব ঢং করে মরা লাগবে। তো কেমন কাটে দিনকাল? সব ঠিকঠাক? এখন আমি নাই, আমার পাপ নাই। সুখ আছে, সুখ?

সুখ কী, জানো? পাখি। শালার পাখিদের আবার রীতি-নীতি অন্যজাতের। তুমি যেই পাখিরে খাঁচায় পুষতে চাইবা, ওই শালা জীবনেও আপন হবে না। সুযোগ পাইলেই উড়াল মারবে, ফিরে তাকাবে না। সহজ না,

ম্যাডাম। আপনার জীবন খুব কঠিন হবে। আপনি আইনজীবী হবেন, হন। তাই বলে আমার মতোন জয় আমিরদের বিপক্ষের হইয়েন না।এক জয় আমিরের বিপক্ষে গেলেন, আপনি তার হয়ে গেলেন। আবার কোন শালার বিপক্ষে যাবেন, সেই শালায়.. নাহ্, বিপক্ষে গিয়ে একবার দেখলেন তো, কী হয় এই পথে! আপনি পথিক ভালো, কিন্তু আপনার পথ না। এই দুনিয়া আপনার নীতিবোধ কেড়ে নিয়ে আপনাকে পরী থেকে শয়তান বানাতে সর্বদা সচেষ্ট।

হার্ভি ডেন্ট বলেছিল–You either die a hero or live long enough to see yourself become the villain.
-হয় তুমি নায়ক হিসেবে মৃত্যুবরণ করো, নয়ত বেঁচে থাকো নিজেকে একসময় খলনায়ক হয়ে যেতে দেখার জন্য!
আমি মরলাম না। বেঁচে রইলাম। সেদিন মরলে কী হতো জানো? সর্বহারা এক ত্যাগী নায়ক, নিষ্পাপ জয় আমির হিসেবে মরে যেতাম। কিন্তু বেঁচে থাকতে গিয়ে আমি নিজেকে তোমার মতো নীতিবানদের চোখে ঘৃণিত এক পাপীষ্ঠ হয়ে যেতে দেখলাম। কিন্তু আমি থামালাম না নিজেকে। আমার মন

চাইল না। কারণ আমি ততদিনে শিখে গেছি মানুষেরা বাঁচে না, বেঁচে থাকতে হলে অমানুষ হতে হবে। যে রাজনীতির দায়ে আমি বাপ হারাইছি, মারে নষ্ট হয়ে মরতে দেখছি, দাদার মাথা গলা থেকে আলাদা দেখে চাচার কোলে চড়ে নিজের পরিচয় থুয়ে বাইর হয়ে আসছি পথে, যেই পথে খালি খিদে। নিজের পেটে খিদে, পথের খিদে, পথের পথিকদের খিদে... এই পথে রোজ আমার মতো জয় আমিরেরা পয়দা হয়, কিন্তু শালা দুনিয়ার কিচ্ছু যায়-আসে না। রোজ খবরের পাতায় মানুষ আমার মতোন জয় আমিরদের সব হারানোর গল্প পড়ে, তারপর চশমাটা খুলে দুটো দীর্ঘশ্বাস

ফেলে খবরের কাগজটা সরিয়ে রাখলেই শেষ। আমরা ইনসাফ পেলাম কিনা, এক ম্যাচ রাজনীতির খেলায় সব হারানো আমরা কীভাবে বাঁচব, খিদের জ্বালায় কোন পথে একমুঠ ভাত খেয়ে বেড়ে উঠব, কী শিক্ষা পাব তা সমাজের দেখার সময় হলো না।কিন্তু যখন কিছুকাল পর এই আমরা জয় আমির হয়ে সমাজের সামনে হুমকি হিসেবে দাঁড়াই, তারা তখন ভাবে এই অমানবিকেরা কারা? এদের নীতিজ্ঞান নেই কেন, মনুষ্যত্ব কোথায়? এদের জন্ম কীভাবে হলো? এরা এত ক্ষুধার্ত, ছিঃ! ভালো শিক্ষা পায়নি কেন?

তুমিও হবে, হয়েছও খানিকটা, আরও হবে। তুমি আর নীতিবান নেই। তোমার ভেতরে নমনীয়তা ফুরিয়ে আসছে। তুমি একসময় ক্ষমা করতে ভুলে যাবে। তুমি শিখে যাবে বাঁচতে হলে কঠোর হতে হয়, স্বার্থপর আর ক্ষমতাপরায়ন হতে হয়, মাফ করতে ভুলে যেতে হয়। বুকে সব হারানোর ব্যথা দমিয়ে রেখে বেশিক্ষণ অহিংসার বুলি ছাড়া খুব কঠিন, জুনিয়র। চট করে নীতির সুঁতো ছিঁড়ে প্রতিশোধের আগুন দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। তখন মানুষ আর মানবিক থাকে না, জয় আমির হয়ে যায়। তুমিও ধীরে ধীরে জয় আমির হয়ে যেতে পারো। মানুষ তখন

তোমার নিষ্ঠুরতায় ভয় পাবে, রেগে যাবে মনে মনে। মানুষ ব্যথা পেতে পেতে যেদিন ব্যথা সওয়ার ক্ষমতা লাভ করে, সেদিন থেকে সে মানুষের ব্যথা অনুভব করার ক্ষমতা হারায়। যা নীতিবানদের চোখে অমানবিকতা।শোনো জুনিয়র,

তুমি ভাবো তুমি অন্যায় দেখে, অন্যায় সয়েও সৎ থাকতে পারবে। তুমি ভুল। দুনিয়া ভালো না। আমার অভিজ্ঞতা বেশি। একটা যুক্তিহীন সত্যি শোনো–সৎপথ মানুষকে অসৎ বানায়। সৎ থেকে তুমি শুধু হারাবে। তাতে তুমি সততার ওপর বিশ্বাস হারাবে, দ্বিধায় পড়বে, তারপর তুমি সৎ-অসৎ এর পার্থক্য ভুলে

যাবে। কারণ ওই যে বললাম–বুকের হাহাকার নীতির চাইতে বেশি শক্তিশালী, মানুষের বিবেক ধ্বংস করতে ওর একবার নড়ে ওঠাই যথেষ্ট। নিজের ভাগ্য নিজেকে লিখতে হয়। আর তারপর সেই ভাগ্যলেখক ছোটে মানুষের ভাগ্য নষ্ট করতে। এটা নীতি—

এসব আমার নীতি। তোমার সাথে মিলবে না বোধহয়। আমাদের বড়ঘরে এক বিপ্লবী আছে, তোমার তার সাথে দেখা হবে না। তার সাথে মেলে নাই। সে আমার মতো খলনায়ক হয় নাই, সে বিপ্লবী হয়েছে। তুমিও হয়ত সেই পথেই যাবে। কারণ তোমরা এক পর্যায়ে বাধ্য হয়ে অন্ধকারকে গ্রহণ করেছ, আমি

অন্ধকারে জন্মেছি, আমি অন্ধকারে গড়ে উঠেছি।এক পাশের পৃষ্ঠা শেষ। এবার আরও ছোট ছোট অক্ষরে লেখা লাগবে। কতদিন পর এতখানি বাংলা লিখলাম, হাত কাঁপতেছে। বাতাসে পৃষ্ঠা উড়তেছে খুব, আরও সমস্যা। আমি এখন কোথায় জানো? একুশ তলার ছাদের ওপর পা ঝুলায়ে বসে আছি। খাতা কোলের ওপর, মোবাইল গালে ধরে ফ্ল্যাশ অন করে লিখতেছি। বিল্ডিংটা পলাশের চাচার। ওই ভ্যাড়াচ্চুদারে মারছি আধঘণ্টাখানেক হবে। জানটা দিলো একটা ভুলভাল আবদারে।

তোমাকে সেবার দেখলাম ভার্সিটির মাঠে, অন্তিকের বোন। এনাফ জুনিয়র এক চেংরি। শালী আমারে পাত্তাই দিলো না! হামজা ভাইরে বলি নাই। ছোট্ট এক জুনিয়র মেয়ে আমার সাথে এতবড় দুঃসাহস দেখায়ে চলে গেল, তা কাউকে বলা যায় না। যা কাউকে বলা যায় না, তা কোদাল হয়ে মন খুঁড়তে থাকে, বুঝলে? আমি সেই রাতে আড়াই বোতল মাল এক চুমুকে শ্যাষ করে একেবারে বেহেড হইছি। এরপর রাতে স্বপ্নে দেখলাম, তোমার সাথে ঘুরতে গেছি, এক মরুভূমিতে। এত মাল খেয়ে ঘুমাইছি, তাও শালা স্বপ্নে মরার পিপাসা পাইল। তুমি গেছো পানি

খুঁজতে। কিন্তু পানি পাওয়ার আগেই এক ধুলিঝড়...

আর তোমার খোঁজ নাই। তুমি ধুলিঝড়ে তছনছ। আমি পিপাসা নিয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। ফজরের আজান হচ্ছে তখন। জ্বর আসল সেদিন সকালে আমার।এক সাক্ষাতে এইরকম মারাত্মক স্বপ্ন যে চেংরিরে নিয়ে দেখা যায়, তার পিছু ছাড়া যায় না। কিন্তু বিশ্বাস করো জুনিয়র, আমার কোনো প্ল্যান ছিল না তোমারে বিয়ে করার। ছেহ্! প্রশ্নই ওঠে না। আমার বিয়ে করার কথাই ছিল না। অন্তত তোমার মতো সাদা পায়রারে। করলে তরুরে করা লাগতো মনেহয়, হামজা ভাইয়ের

ইচ্ছায়। তোমার জন্যে জয় আমির না। জয় আমিরদের জন্যে কখনোই তোমাদেরকে বানানো হয় না। সব অপরিকল্পনায় হয়ে গেছে। কসম আমি বিশ্বাসই করি নাই আরমিণরে আমি বিয়ে করছি। এইজন্যে নিজেরে মানাইতে দুই-তিনদিন তোমার বাপের বাড়িতে তোমারে দেখতেও গেছিলাম সত্যিই এই ধরণের ঘটনা ঘটে গেছে কিনা! তো যা বলার জন্যে এই বাল লিখতে বসা। অপরিকল্পিতভাবে যে অঘটন ঘটে গেল, তার আবার একটা শর্ত বাকি রয়ে গেছে। আমার-তোমার বিয়ে ইসলামমতে হইছে। ওইখানে দেনমোহরের কথা উঠছিল। আমি জানতাম

ছাড়ার সময় এইটা দেয়া লাগে। কিন্তু কাজী শালা বলল, এইটা তোমার হক। আদায় করে দিলাম।তোমার দেনমোহর শোধ। তো এখন কী? আমার সব ছোঁয়া ভুলে যাবা? মানুষ কিছু দিয়ে মূল্য না পাইলে তা আজীবন মনে রাখে, মূল্য পরিশোধ হইলে দেনাপাওয়া শেষ, সাথে স্মৃতিও। না, তুমি নিজেরে বিক্রি করো নাই। আবার কোনোদিন আমার নামেও করবা না, এইটা নিশ্চিত। চাইলাম না তোমারে। যাও! তোমারে চাইলে ওইটা আরেক পাপ। কম নাই আমার পাপ জীবনে, আরেকটা বাড়ালাম না, তাতে কী হবে? তোমারে চাইলে আমার

পাপে ভাঁটা পড়ার প্রবল সম্ভাবনা। পাপ আমি ছাড়ব না, তোমারে আমি চাইব না!

তোমার বাপের জমি বিক্রি করা বারোলক্ষ টাকা আমার একাউন্টে থাকল। আর যা ঋণ ছিল তোমার আব্বার, ওইটা আমি শোধ করে দিসি। দেনমোহর ধরো দুইলাখ বেশি দিলাম। আমার জানা নাই নির্ধারিত এমাউন্টের বেশি দিলে সমস্যা আছে নাকি। থাকলে থাকল। স্বামী হিসেবে কিছু দিলে সমস্যা থাকার কথা না। না স্বামী না, আসামী। লেখা কাটলে সৌন্দর্য নষ্ট হয়। তাই কাটব না। তুমি স্বামী না পড়ে আসামী পড়ো।শোনো, যে টাকা জমা থাকল ওইটা যদি আমার দেয়া দেনমোহর

হিসাবে খরচ নাও করো তো তোমার বাপের জমি বেচা টাকা হিসেবে খরচা কোরো। মনে করবা আমি দেই নাই, তোমার বাপ দিছে। টাকা ছাড়া এক পাও চলতে পারবে না। উকিল হবার জন্যে ভালো রকম টাকা লাগবে। ঘটনা হইল আপনার মতো উকিল খুব দরকার, ম্যাডাম। তাইলে হয়ত আমার মতো জয় আমিরেরা মায়ের লাশ দেখিয়ে আপনার কাছে অপরাধীর শাস্তি আশা করতে পারবে, অপরাধীকে ফাঁসিতে ঝুলতে দেখে তাদের আগুন নিভবে, আমার মতো পাপী তৈরি হবে না আরেকটা! কিন্তু ঘটনা হলো উকিল হিসেবে সবাই আপনাকে দেখবে, আমি

বাদে। এইটা অবশ্য ভালোও। আমার মতো আইনবিদ্বেষী পাপীর ঘরওয়ালি আইনজীবী, বিষয়টা বেমানান। আপনি যখন উকিল হবেন ততদিন আমি থাকব না বোধহয়—আমি আর বাঁচব না বেশিদিন। খুব অল্প সময় আছে আমার। এই দিনগুলোতে আমি মাত্রহীন পাপ করব। তোমার ঘেন্না আরও বাড়বে। তারপর যদি বেশ কিছুদিন বেঁচে থাকি তো ক্যান্সারে মরব। নাহলে গুলি খেয়ে। আমি মরার পর আমিরদের একটা উত্তরাধিকারী দরকার। তাই মরার আগে জিন্নাহ্কে খুঁজে বের করার কাজটা বাকি। আর ওকে খুঁজতেই খুব ভয়াবহ কিছু পাপ করা লাগবে আমার।

এরপর শেষ। পাপ থামাতে হলে পাপীকে মরে যেতে হয়। এমনিতেও রক্তের অবস্থা খারাপ। ব্লাড-সেলের পেছন মারা গেছে, বোন-ম্যারো ড্যামেজ। বেদম মাইর খাওয়ার পর কোনো বার ঠিকমতো চিকিৎসা করা হয় নাই, ক্যান্সার না হইলে আমি অলৌকিক মানুষ হয়ে যাইতাম। ম্যালা সমস্যা শরীরে। এখনও মাংসের ভেতরে কামড়াচ্ছে। শরীর ভালো না। জ্বর আসবে মনেহয়।জীবনে ভালো আমি হইতে পারতাম। হইলাম না কেন জানা নাই। আমির পরিবারে বড়বাবা ছাড়া কেউ আমার মতোন ছিল না। সবচাইতে বড় দ্বন্দ্ব কোথায় লাগছে জানো? আমি পাপ করতে না

চাইলে দুনিয়া ছাড়তে হবে, আর বেঁচে থাকলে আমি পাপ ছাড়ব না। আমার কাছে পাপের কারণ নাই। কিন্তু খুন আবার মদের মতোন। প্রথমবার জোশে এক ঢোক গিললে পরেরবার নেশায় এক বোতল লাগে। এরপর হাতের বাঁধন ছুটে গেলে আর বিবেক কাজ করে না। আর আমি তো রক্তে অভ্যস্ত খুব ছোটকালে। আমার কাছে পাপ পাপ না। আমি পাপ-পূণ্য বুঝি না।

তো ঘেন্না-টেন্না করো তো এখনও নাকি!

বেশি করার দরকার নাই। আমার ইগোতে লাগবে। তবে শেষ হওয়া যাবে না কিন্তু! ওইটুকু আমার। আর কিছু নাই তোমার কাছে

আমাকে দেবার মতোন। তুমি নিজেই কাঙাল। কিচ্ছু নাই আমার জন্য তোমার কাছে। তোমার ওই ঘৃণাটুকু আমার থাকলে ক্ষতি নাই। আমি নিজে এই জীবনে আমার থেকে পরিবার কেড়ে নেয়া আসামীদের ক্ষমা করি নাই, তুমিও কোরো না। এইখানে আমার-তোমার নীতির মিল থাক।

পৃষ্ঠা শেষের দিকে। হাতও কাঁপতেছে খুব। এই কাগজ যখন পাবে তুমি, আমি তখন বহুদূর। এই পাপের জনমে আর দেখা হবে না তোমার সাথে। তোমার চোখে ঘেন্না দেখার সুযোগটুকু হারিয়ে আমি পালাব। আমার

তীর্থযাত্রা খুব সামনে। এখন একটা গান মনে পড়তেছে–

আমি মরে গেলে জানি তুমি কাঁদবে না,

ওখানেই শেষ করে দিও...

চাইব না কিছুই তো আর,

শুধু... মনে রেখো কোনো একদিন.......

পৃষ্ঠা শেষ। আর এক লাইন লেখা যাবে।

তো–

বিদায় আমার পাপী জীবনের অনাকাঙ্ক্ষিত মেহমান, আমার ঘরের দুশমন। জয় বাংলা...

কাগজ ফুরোয় এখানে। শেষের দিকের লেখাগুলো ক্রমান্বয়ে ছোট হয়েছে। লেখার ধাঁচে এলোমেলো ভাব এসেছে।

এই বছর কয়েকে কাগজখানা মাহেজাবিণ মোট ছয়বার পড়েছে। প্রথম যেদিন পড়েছিল, দুবার। এরপর তারিখ এলে পড়া হয়। এর একটা কারণ আছে। প্রত্যেকবার কাগজখানা পড়ার পর সেও ফিরতি কিছু লেখে। এবারেও একখানা কাগজ তুলে নিয়ে লিখতে বসল—

জয় আমির,

আপনার কাগজখানা যখন আমি পেয়েছি, তার অনেক আগেই আপনাকেসহ আমি ক্ষমা করে দিয়েছি আমার সকল অন্যায়কারীকে। আমার-আপনার পথ কখনোই এক ছিল না। আপনি ধারণা করতেন, পরিস্থিতি মানুষকে খারাপ বানায়, আমাকেও জয় আমির বানিয়ে তুলবে।

নাহ্ আমি আপনার মতো কাফের হয়ে জন্মাইনি। আমি আজও এক সৃষ্টিকর্তায় ভরসা রাখি যিনি আপনার হাল এমন করেছিলেন যে আপনার শত্রুরাও কেঁদেছে আপনার পরিণতিতে। যিনি আপনার গুরুর পরিণতি এমন করে রেখেছেন যা দেখে আমি অবধি তার পরিণতির ওপর সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছি। সেই আল্লাহ্ তায়ালাতে এতকিছুর পরেও আমি অটল বিশ্বাস ও ভরসা রাখি। আপনার আশা আমায় নিয়ে ভুল ছিল। পরিস্থিতি মানুষকে জয় আমির বানায়, এটা সঠিক তখন, যখন মানুষটার ভেতরে আপনার মতো স্বার্থপরায়নতা রয়েছে। ঈমানদার

কখনোই স্বার্থের ভিত্তিতে ধর্ম ও মানবিকতা পালন করে না। সর্বাবস্থায় এক আল্লাহ্ ও মানবিকতার ওপর কায়েম থাকাটাই ঈমান। আপনার মতো নড়বড়ে ঈমানদার আর স্বার্থপর এমনিতেও ভালো মানুষ হয় না পৃথিবীতে।মাকে ধর্ষিতা হতে দেখলেন, দু'চারবার আল্লাহ্কে ডাকলেন, তিনি সাড়া দিলেন না, আপনার কাছে হয়ে গেল সেই মহান সত্ত্বা অস্থিত্বহীন! বাঃ রে! ঈমান তো হাতের মোয়া নয়। মুরসালীন মহানকে তো দেখেছেন! হাজার ফোঁটা রক্তেও একই দৃঢ়তা, একই বিশ্বাস! আপনি ঈমানদারদের ইতিহাস জানেন না। তাঁরা চূড়ান্ত বর্বরতার সামনেও

সেই এক রবের সাক্ষ্য দিয়ে প্রাণ হারায় হাসতে হাসতে। আপনি তাদেরকে জানলে নিজেকে অবশ্যই একজন মুসলমানের ঘরের সন্তান হিসেবে ধিক্কার দিতেন।আপনি জন্মেইছিলেন অবিশ্বাসী হয়ে, পরিস্থিতির দোষ দিয়ে গা বাঁচাতে চাইলে ওটা আমার কাছে অগ্রহণযোগ্য। আপনি প্রতিশোধের কথা বলেছেন, মেনে নিলাম যান। যারা আপনার সঙ্গে অন্যায় করেছিল তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন। তারা সংখ্যায় কয়জন? অথচ আপনার হাত শত মানুষের রক্তে রাঙা। ওগুলো কী ছিল? কীসের প্রতিশোধ ছিল, নিরীহ, নিষ্পাপ প্রাণগুলোর অপরাধ কী ছিল?

আমি জানতাম আপনার চিন্তাধারা অসুস্থ, এজন্য কোনোদিন বোঝাতেই যাইনি, রুচি পাইনি আপনাকে খুলে বোঝানোর। কারণ আপনি আপনার এই গোজামিল তত্ত্বে দৃঢ়বিশ্বাসী। এটা বুঝেই আপনার একমাত্র শাস্তি নির্ধারণ করেছিলাম যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

আজ মনেহয় আপনি থাকলে আমি আলোচনায় বসতাম একদফা আপনার সঙ্গে। অনেক কথা বলার বাকি রেখেই আপনি চলে গেলেন। আমার ভেতরের বহুকথা আপনার না শোনা রয়ে গেছে। আবার কখনও সামনে এসে দাঁড়ালে বলব। কিন্তু ফিরে যদি আমাকে

আমার স্থানে না পান, এই কাগজগুলো দেখে নেবেন।আপনি আমার চোখের ঘেন্নায় খুব অভ্যস্ত আর আগ্রহীও! অথচ আপনি জানেননি ঘেন্না ছাড়া সামান্য পরিমাণ কৃতজ্ঞতাও ছিল সেখানে। একদিন আপনি আমার ইজ্জত বাঁচালেন, এক খু-খার অমানুষের সাথে একটুখানি শত্রুতা করলেন, আব্বুকে কাধে তুলে বয়ে নিয়ে এলেন। এরপর খানিকটা কৃতজ্ঞতা জমতে পারে না আমার ভেতরে? আপত্তি কোথায়? অনেকখানি কৃতজ্ঞতা জমিয়ে রেখেছিলাম আপনার জন্য। কিন্তু সেটুকু নিবেদনের সুযোগ না পাওয়ার ব্যথার গভীরতা আপনি মাপতে পারবেন না। আপনি

তার আগেই আমাকে মেরে ফেললেন। খুব নিষ্ঠুর রকম মৃত্যু। সামান্য ছাড় দিলেন না। আমি কেন দেব? কেন? আপনি যদি থুতুর যোগ্য হয়ে সামান্য থুতু বরদাস্ত না করতে পারেন, আমি কেন এতকিছু বরদাস্ত করে আপনাকে ছাড় দেব?

আমার এই জীবনের দায় কার? আজও রাস্তায় বেরোলে গুঞ্জন শুনতে পাই জয় আমিরের বউ যায়। অথচ আমার কোথাও আপনি নেই। আপনি এই জগতের কোথাও নেই যেখানে গিয়ে আমি আপনার বিশাল বড় কলিজাটা ছিঁড়ে এনে আমার কলিজার আগুন নেভাতে পারি। আমার ভেতরে প্রতিমুহূর্তে

আপনাকে সামনে রেখে হাজারও আলাপ পাড়ার জেদ ওঠে। কিন্তু আপনি নেই। কেন? আপনি নরক স্বীকার করে পাপ করলেন, আমার জীবনটা নরক করে সেখানে পৌঁছালেন।কারণ আপনি জয় আমির হিংসুটে। আপনি ঠিক গুনে গুনে আপনার জীবনের সকল বৈশিষ্ট্য আমাকে দিয়ে গেছেন, যা আপনি বয়ে গেছেন। আমি আজ ঠিক আপনার মতোই নিঃস্ব, কাঙাল, আত্মচিৎকার গিলে হেসে বেড়ানো জীবন্মৃত আত্মা। আমি আপনাকে ক্ষমা করব না। কখনোই না। আপনি চাইলে সব ছেড়ে ফিরতে পারতেন, আমি নাই বা মানলাম, আপনি বেঁচে থাকতে

পারতেন। আপনি কোনোটাই করেননি। আপনার ক্ষমা নেই। যতবার আপনার কথা উঠবে আমি বলব—জয় আমির আমার আসামী, তার স্থান কেবল আমার কাঠগড়ায়। যার কেইস আমি লড়ে যাব আজীবন, কিন্তু শুনানির রায় আসবে না কখনও।

তো সিনিয়র, যা বলতে আজ কলম তুলেছি। সামনের মাসে আপনার বড়সাহেবের বন্ধ হওয়া কেইস ফাইল আবার খুলতে যাচ্ছি। আমার প্রথম কেইস হাতে নিতে যাচ্ছি। আজ আপনি থাকলে কী করতেন, জানি না। হয়ত আমায় থামাতে চাইতেন, আরেকবার বদনাম করে অথবা মারধর করে আঁটকে রাখতেন

কোনো বন্দিশালায়! জানি না। তবে আমার পরিকল্পনা খুব একটা ভালো নয়। আমি খুব খারাপ কিছু করার চেষ্টা করব আপনার বড়সাহবের সঙ্গে। নিজের সন্তানের খুনী নাকি অনেকগুলো প্রাণের নাশক হিসেবে–বলতে পারছি না।এটুকু লিখে উঠে পড়ল অন্তূ। অস্থিরতা ঘিরে ধরল খুব তাকে। উঠে গিয়ে বেলকনির গ্রিলে মাথা ঠেকিয়ে আনমনেই গুনগুন করে উঠল। মাঝেমধ্যেই তার কানে ভেসে আসে আজকাল একটি গানের দু-চারটি কলি, তা-ই গেয়ে উঠল

সে—

না জানি কোন অপরাধে দিলা এমন জীবন

আমারে পুড়াইতে তোমার এত আয়োজন...
সুখে থাকার স্বপ্ন দিলা, সুখ তো দিল না
কত সুখে আছি বেঁচে, খবর নিলা না...
আমি ছাড়া কেউ নাই আমার দুঃখের পরিজন
আমারে ডুবাইতে তোমার এত্ত আয়োজন.....

পাড়ার অথবা কর্মক্ষেত্রের মহিলাদের খুব চিন্তা তাকে নিয়ে। সেদিন একজন জিজ্ঞেস করল, "তুমি বিয়ে করবা না?"মাহেজাবিণ বলল, "আমি কি অবিবাহিত?"

কত প্রশ্ন জবাবহীন অবস্থায় দিন-রাত চক্রাকারে বয়ে যায়। মাহেজাবিণের বড় কৌতূহল জাগে জয়নাল আমিরের স্ত্রী অর্থাৎ জিন্নাহ আমিরের মায়ের ব্যাপারে। সেই

নারীটি কে, কোথায় থাকেন, জীবিত অথবা মৃত! জানা হয়নি কখনও। সে কীসের অপরাধে এই জীবন পেয়েছে তাও অজানা। তার কোথাও কেউ নেই। মূলত এক শিশু ও জোয়ান একটি নারীর ভার বইতে তার এই বেঁচে থাকা। অবশ্য বেঁচে থাকার কোনো নিশ্চয়তা তার নেই। অবরুদ্ধ নিশীথ কখনও ফুরোয় না। কেবল চক্রাকারে ঘুরে বিভিন্ন বিন্দুতে স্থির হয়। এই শহরে রোজ চলে ঘটা করে অবরুদ্ধ নিশীথের খেলা।রূপকথা মাহেজাবিণের কাছে বেশ কিছুমাস ছিল। তার শরীরে যে-সকল ক্ষতের দাগ পলাশের বদৌলতে ছিল, তা ঢেকে গেছিল কারাগারের

অযাচিত উন্মাদ-অত্যাচারে। ইনফার্কশনের প্রভাবে ক্ষত থেকে পুঁজ ও রক্ত পড়ার ঘটনা নিয়মিত হয়ে উঠেছিল। তা মাহেজাবিণ নিজ হাতে পরিস্কার ও ড্রেসিং করে দিতে দিতে এমন সব গল্প তাকে শুনিয়েছে যা রূপকথার আন্দাজের চেয়ে কিছু বেশিই ছিল।জয় আমিরের রেখে যাওয়া টাকাগুলো মাহেজাবিণ তাকে দিয়েছিল চিকিৎসার জন্য। সে গ্রহণ করেনি। তার নামে যথেষ্ট অর্থ আছে। এছাড়া শিক্ষাগতভাবে বিদেশী ডিগ্রিপ্রাপ্ত রূপকথা আজগর আজ পথের পাগলি অথবা কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত, মাংস খসে পড়া কুকুরের চেয়েও তুচ্ছজীব। একটি ছোট্ট ফ্ল্যাট ভাড়া করে

থাকছে। মাহেজাবিণ তাকে ছাড়তে চায়নি, ভয় ছিল সে আত্মহত্যা করবে। মাহেজাবিণ বোকা। মাহেজাবিণের কোনো ধারণা নেই তার সহনশীলতা সম্বন্ধে। তার শরীরটা আজ ব্যথা-অনুভূতিহীন ঘরের কোণে পড়ে থাকা আসবাবের মতো বৈকি!

একটি অসুস্থ পরিবার থেকে উঠে আসা অসুস্থ শরীর ও মনের অধিকারিনী কিনা সে!তার বাপের বিশাল বড় বাড়ি সিলগালা মারা। পলাশের আরও বাড়ি আছে, যা পুলিশের অশনাক্ত, কিন্তু সে যায়নি। সে একটি নতুন ফ্ল্যাটের বেলকনিতে, দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসে পুরোনো দিন স্মরণ করে হাসতে

চায়। তার একটা শখ আছে। শরীরের ক্ষতগুলোতে পচন ধরা অবস্থা। সে শুনেছে মানুষের মাংস পচলে তাতে পোকা হয়। এটা কখনও দেখা হয়নি। তার শখ হলো তার শরীরের ক্ষতগুলো ঠিকমতো পচে উঠলে সেখানে পোকা হোক। সেই পোকাদের কাছে সে বর্ণনা করবে শরীরের ব্যথা ও একটি সুস্থ জীবনের তৃষ্ণা কেমন হয়। তার মস্তিষ্ক খুব বেশি অনিয়ন্ত্রিত হতে গেলে সে দৌড়ে অন্তূর কাছে চলে যায়। অন্তিকের মেয়ের সাথে খেলে। এই তো সেদিন তার মনে হলো সেও নারী। জরায়ু আছে, গর্ভধারণ ক্ষমতা আছে, তার বিয়েও হয়েছিল। হতেই পারতো তারও

এমন একটি সন্তান।পরক্ষণেই নিজের ভাবনায় হেসেছে সে। সবাই কেন সব ধরণের আকাঙ্ক্ষা রাখবে? মাহেজাবিণের ভয় সে যখন তখন আত্মহত্যা করতে পারে। কিন্তু সে কখনোই আত্মহত্যা করবে না। সে বেঁচে থাকতে চায়। দেখতে চায় এই দুনিয়াটা আরও কেমন হতে পারে। ব্যথা তাকে ব্যথা দিতে পারে না, সেক্ষেত্রে তার চেয়ে শক্তিশালী আর কে আছে? এমন শক্তিশালী নারী সে মরবে কেন? সে বাঁচতে চায়। এই তো সেবার পরাগের ফাঁসি হলো না। তাকে কারা যেন বাঁচিয়ে নিলো। বাঁচিয়ে নেবার বদলে পরাগের কাছে তার ত্রাসের

ব্যক্তিত্ব কেনা হলো। সে কারাগার থেকে বেরিয়ে আবার ফিরল ত্রাসে। কিন্তু এবার সেই ত্রাসের সাম্রাজ্য তার অবৈধ বাপ বা পলাশের নয়। এবার অন্যের জন্য সে কেবল কাজের কাজী।

পরাগ রূপকথার সাথে জোর করে থাকে। রূপকথার ফ্ল্যাটেই থাকে। রূপকথা যুদ্ধ ঘোষনা করেছিল না থাকতে দেয়া নিয়ে। পরাগ গ্রাহ্য করেনি। করার কথাও নয়। রূপকথা পরাগ ছাড়া এবং পরাগের রূপকথা ছাড়া তো কোত্থাও কেউ নেই। একই বাপের সন্তান হিসেবে চিরকাল রূপকথা পরাগের বোন। রূপকথা বললেই পরাগ রূপকথাকে

একা ছেড়ে দেবে নাকি?কোর্টে আসা-যাওয়ার পথে বেশ কয়েকবার তার সাক্ষাৎ হয়েছিল মাহেজাবিণের সাথে। কথা হয়নি। কেবল চোখভরে দেখেছে সে জীবন-ঝড়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে তবু নীড়ের গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়া অ্যাডভোকেট নারীটিকে। কয়দিন পর নাকি হামজার কেইস আবার রি-অপেনের কাজ হাত নেবে অ্যাডভোকেট সাহেবা। পরাগ সাহায্য করবে বলে ঠিক করেছে। নৈতিক উপায়ে না হোক অনৈতিক উপায়ে।

হামজার কেইস আবার রি-অপেন করাটা নেহাত সহজ কাজ নয়, প্রাণের ঝুঁকিসহ অসীম হয়রানির পথ। তবু এই কাজে হাত

দিতে সে বদ্ধপরিকর। এবং সেই দিনের দু'দিন আগে মাহেজাবিণের দরজায় কেউ এলো। তখন মাগরিবের নামাজ শেষ হয়েছে সবে। গোধূলি লগ্ন যাকে বলে। মার্জিয়া দরজা খুলে একটি নারীকে পেল। চিনতে পারল না। সে দেখেনি কখনও।

ভেতরে ঢোকার তাড়া নেই নারীটির মাঝে। মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল, "তুমি সে নও, যার কাছে আমি এসেছি।"

মার্জিয়া ডাকে, "অন্তূ!"মাহেজাবিণ দরজার কাছে যায়। নারীটি আপাদমস্তক তাকে দেখে। একটি সাদাটে নীল শাড়ি পরা। চোখদুটো কী ভীষণ গভীর, গম্ভীর আর ব্যথাসিক্ত! মুখের

গড়ন দেখলে বলতে মন চায় বড় যত্নে সাজানো সুশ্রী চেহারাখানা। একবার তাকালে আবার তাকিয়ে দেখার ইচ্ছে জাগা চেহারা থাকে কিছু, তেমন চেহারা মাহেজাবিণের। ঘাঁড়ের কাছে হালকা কোকড়া চুল পেচানো একটি খোঁপা।মাহেজাবিণও চিনল না নারীটিকে। কখনোই দেখেনি সে। নারীটির মুখে স্মিত হাসি। চোখদুটো তাকেই দেখছে অপলক। বয়স কত হবে? চল্লিশের বেশিই! আপপৌরে করে শাড়ি পরা। তার ওপর একখানা কাতান ওড়না জড়ানো। মাথা, মুখ আবৃত তাতে। মাহেজাবিণকে দেখে মুখে ধরে রাখা ওড়নার প্রান্ত ছেড়ে দেয়ায় মাহেজাবিণ

দেখতে পায় এক অনন্য চেহারার নারী।
একটু সামান্য সাজগোজে সৌখিন বোধহয়! চোখের কাজল, ঠোঁটের সামান্য লিপষ্টিক তা-ই বলে।

মাহেজাবিণকে দেখা শেষ হলে নারীটি মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করে, "তুই তাহলে জয় আমিরের বউ, হু?"

মাহেজাবিণ হ্যাঁ-না কিছু বলে না। সে বুঝতে চায় নারীটি কে, কেন এসেছে তার কাছে।